ঋতুকালে পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়। কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির দ্বারা কৌমারাবস্থায়, ঋতুকাল পরিত্যাগ করিয়া অন্যাবস্থায় পরপুরুষ সংসর্গে কোনরূপ পাপ [illegible] ঋতুকালে যে পরপুরুষান্তর গমনে হয় না তাহারও দৃষ্টান্ত প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মবৃ[illegible] বড় ভাই দ্বৈপায়ন মাতা সত্যবতী ভ্রাতৃবধূ ঋতুমতী অম্বিকা অম্বালিকা উৎপাদন [illegible]রেন। দ্বৈপায়ন স্বধ[illegible] মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। উঁহার জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রখরতা ও বিশেষ দেখা যায়। তিনিও যখন এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহা অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইত না। পরে পাণ্ডুও এই সব আদর্শ উদ্ধৃত করিয়া ঋতুমতী কুন্তীকে পর পুরুষ কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছেন। যযাতি ও দেবযানীর নিকট শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—"যে পুরুষ ঋতু রক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়।" এই কারণেই যযাতি অসুররাজ কুমারী শর্ম্মিষ্ঠাকে পূজনীয়া মানিয়া লইয়াও অপরিণীতা ঋতুমতী শর্ম্মিষ্ঠার ইচ্ছানুসারে সহবাসে বিরত হন নাই।

শাস্ত্রে ইহাও দেখা যায়, পুত্র দ্বাদশ প্রকার। বন্ধু দায়াদ ছয় প্রকার, যথা—ঔরস, ক্ষেত্রজ (প্রণীত), দত্ত, ক্রিত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ। এই প্রকার অবন্ধু দায়াদ ও ছয় প্রকার; যথা—কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র। কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন,—ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলপ্রদ। পাণ্ডুও কুন্তীকে বলিয়াছেন,—"আপৎকালে দেবর কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনে কোনরূপ পাপ নাই।" এই জন্যই হয়তো বিখ্যাত [illegible]র্ষি উতথ্যের স্ত্রী মমতার গর্ভোৎপাদন করিতে দেবর বৃহস্পতি সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখন বিজাতীয় পুরুষান্তর [illegible] তোমার সহ আমার [illegible] না,—সে যে তদানীন্তন সমাজে ছিল কিনা বিচার্য্য। কুন্তী [illegible] যত বলিয়াছেন, স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষ সংসর্গে পাপ [illegible] কিন্তু পাণ্ডু কুন্তীকে উপদেশ দিয়াছেন, "আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব [illegible]কে তুল্যজাতি বা শ্রেষ্ঠজাতিদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা [illegible]" মহাভারতে ইহাও পাওয়া যায়—[illegible] [illegible] বিজাতীয় কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াদি [illegible] পরাক্রান্ত মহারথ পুত্র [illegible] উৎপাদন করাইয়া [illegible] হীনবর্ণ পুরুষ উচ্চবর্ণ কন্যায় [illegible] ক্ষত্রিয় যযাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর [illegible] তাহার প্রমাণ। (এইখানে ইহাও বলা [illegible] [illegible] যুগে অধিকাংশই [illegible] [illegible] লোকই দেখিতে পাওয়া যাইত না [illegible] শৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের ব্যত্যয় ঘটিত না।

উপরোক্ত অংশগুলি আলোচনা করিলে ইহাই [illegible] যায়, স্বজাতীয়া, বিজাতীয়া, অন্যা, পরিণীতা, [illegible] রমণী পুরুষান্তর সহবাসে পাপলিপ্ত হইত না। কেবল মাত্র সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে [illegible] কালোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রচারিত [illegible] ও সমাজ ব্যবস্থাপকবৃন্দের [illegible] সমাজে পালিত হইত। যাহা পাপ—তাহ[illegible] সম্মত হইয়াই আসিতেছে। কিন্তু এতই দুঃখের [illegible] সর্ব্বযুগেই নির্দ্দিষ্ট হিংসা, পরস্বাপহরণ [illegible] বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাপকের চক্ষুর আড়ালে থাকিয়া অনির্দ্দিষ্ট এবং অসত্য বিষয়গুলিই সমাজরক্ষকের বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া সমাজ সংস্করণে বিশেষ প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থাগুলিকে শাস্ত্রবাক্য [illegible] করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে সমাজ শৃঙ্খলা-সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সর্ব্বকালেই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বহু দেখা [illegible] সম্বন্ধেই কি আমরা [illegible] ব্যবস্থা [illegible] পাষণ্ড সতীসাবিত্রীসদৃশ স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] গমন করিতেছে! সমাজ তাহাদের এই ভীষণ অপরাধ

[illegible] সিতেছে কিনা? পূর্ব্বকালীন [illegible] সর তো কথাই নাই।

[illegible] মরা অসত্যকে জাহির করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ [illegible] নাবৃত চরিত্রহীন চরিত্রহীনাকে সমাজে বিশেষভাবে সমাদর দিয়া আত্মরক্ষার্থে অসমর্থ হওয়ায় পরপুরুষধর্ষিতা বিশেষচরিত্রবতী রমণীগণকে সমাজ হইতে পরিত্যাগ করিয়া সমাজকে শ্রীহীন ও পাপলিপ্ত করিতেছি। আর যদি কোন রমণী একবার জীবনে ভুলবশতঃ বা যৌবনের উত্তেজনাবশতঃ পদস্খলিতই হইয়া পড়ে, তাহাকেই বা সমাজ পতিত করিবার যুক্তি কি আছে? আমরা মহা-পাপলিপ্ত বহু নারী পুরুষকে লইয়া সংসার করিতেছি। কোন বিধবার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও সেই পাতকীকে সমাজপতিত করি না। কোন সতী সধবা রমণীকে কুমন্ত্রণায় বশীভূত করিয়া অথবা তাহাকে স্বাশ্রয়ে অসহায় পাইয়া কোন পুরুষ তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিলে সেই মহাপাপীকেই কি আমরা সমাজ পতিত করিয়া থাকি? এবম্বিধ হত্যাকারীও সমাজত্যক্ত না হইয়া সমাজে সমাদর পাইয়া আসিতেছে। দয়ামায়াহীনা সৎমা সতীনের পুত্রকন্যার উপর হিংস্র পশুবৎ ব্যবহার করিলেও তাহাকে আমরা সমাজের পক্ষ হইতে সমাদর জানাইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হই না। কত বধূর প্রাণ সংহার করিয়াছে, এমন পিশাচিনীর সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে বহু পাই, তাহাদের কতক রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়—কতক হয় না। কিন্তু সমাজ সেই মহাপাপিনীদেরও সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে অন্যের মতই আশ্রয় দিতে কোনদিনই কৃপণতা প্রকাশ করে না। অথচ আত্মরক্ষার্থে অসমর্থা হতভাগিনীদের উৎকর্ষ চরিত্র হইলেও সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। বর্ত্তমান সমাজ এইপ্রকার সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা পূর্ব্বক মিথ্যা অসার বিষয়গুলি অঙ্গীকার করিয়া মহাপাপকে বিশেষভাবে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে। তথাপি কি বলিতে হইবে—সমাজ আমাদের নিষ্পাপ—একমাত্র ধর্ষিতা রমণীগণই পাপিনী?

সংশয়

শ্রীনলিনী সেন

আমার বসন্ত প্রাতে মাধবীর সাথে
যত ভালবাসা আমি তুলে দিই হাতে
সে কি তুমি নিজ হাতে নাও?
আমার পূজার দীপ জ্বালি সযতনে
অনিমেষে চেয়ে যবে থাকি মুখপানে
ওগো তুমি দেখিতে কি পাও?
আমার শারদ প্রাতে শেফালির সনে
তোমার চরণ খানি আনি ক্ষণে ক্ষণে
যে সুখে দোলায় মোর মন,

আমার পূর্ণিমা রাতে উন্মুখ এ হিয়া
তোমারে পাইতে চায় যেমন করিয়া
তোমারে তা দোলায় কখন?
আমার মালিকাখানি পরাই যখন
দোলাই তাহার সাথে জনম মরণ
তখন কি মুখ চেয়ে হাসো?
দুঃখ সুখ ভরা এই জীবনের ডালি
হে প্রিয় তোমার হাতে দিই যবে তুলি
তখন কি মোরে ভালবাস?

নব-বর্ষফল

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

জ্যোতিষে আমার বিদ্যা হ'য়েছে বিপুল,
লোকে বলে গণনায় নাই মোর ভুল।

গণিয়া জেনেছি যেই নববর্ষ ফল,
প্রকাশ করিয়া তাহা কহি অবিকল।

সাতবার দুই পক্ষ মাসে ষোল তিথি,
এবারো রহিবে সেই চিরকেলে রীতি।

যদি সাগরের জল না শুকায়ে যায়,
হইবে জোয়ার ভাটা সন্দ নাহি তায়।

রবি শশী পড়ে যদি রাহুর কবলে,
অবশ্য গ্রহণ হবে সে-গ্রাসের ফলে।

সৃষ্টিনাশা অনাবৃষ্টি নাহি হয় যদি,
পূর্ণ হবে জলে বরষায় খাল বিল নদী।

রয় যদি হল জল বীজ আর মাটী,
চাষীর চেষ্টায় শস্য জন্মিবে খাঁটি।

প্রমাই থাকিতে কারো মরণ না হবে,
টিকে যাবে তারা সুখে দুখে র'বে।

বেয়াধিতে ভগ্ন স্বাস্থ্য রুগ্ন হবে যারা,
কেহ হবে নিরাময় কেউ যাবে মারা।

যেদিন যখন যার ফুরাইবে আয়ু,
তখনি বাহির হবে তার প্রাণ-বায়ু।

একবার মারা গেলে বাঁচিবেনা আর,
কহিনু চরম তত্ত্ব নিদানের সার।

জন্মিবে যে সব শিশু নব প্রাণ-পেয়ে,
কতক হইবে ছেলে বাকি গুলি মেয়ে।

যেথা যত হবে বিয়ে দেখিলাম গ'ণে,
সংখ্যায় সমান রবে বর আর ক'নে।

সাধন সিদ্ধির পন্থা ধরি' মনোমত,
পড়িবে পাশের পড়া ছাত্র-ছাত্রী যত—
পরীক্ষায় সকলের মিটিবে না আশ।
কেউ খাবে ডিগবাজী কেউ হবে পাশ।

মালিকানী স্বত্বে হবে মালি মকদ্দমা,
বিকাইবে বাকি করে বহু জমী জমা।

আর্থিক ভাগ্যের ভোগ যত টুকু যার,
কেহ বা করিবে কর্জ্জ কেহ দিবে ধার।

আয়ের স্বাধীন পথ সন্ধান না করি,
উঠে প'ড়ে সকলেই খুঁজিবে চাকরি।

মসিজীবীদের হবে দুর্গতি চরম,
রহিবে বাজার দর নরম গরম।

আ-ঢাকা আর্টের চর্চা হবে খোলা খুলি,
সেয়ানে সেয়ানে মিলে হবে কোলা কুলি।

ভাত কাপড়ের রো'ক্ যতই অভাব,
ঘুচিবে না এ দেশের নবাবী স্বভাব।

এ-পারে আঘাত দিবে ও-পারের ঢেউ
কেহ খাবে হাবুডুবু ভেসে যাবে কেউ।

বাসি রসে রসিবেনা সকলের মন,
ডাইভোর্স বিল নিয়ে হবে আন্দোলন।

প্রগতির পথে নারী হবে স্বতন্তরা,
হতভম্ব পুরুষেরা র'বে জ্যান্তে মরা।

নারীর পৌরুষ স্পৃহা নরে নারী ভাব,
আড়গবী পথে হবে আজব এ লাভ।

ফুটিবে সাহিত্যাকাশে যে-গ্রহের আলো,
সে কথা প্রকাশ করি না বলাই ভালো।

স্বাস্থ্যের রিপোর্ট পরে করা যাবে পেশ,
সংক্ষিপ্ত বর্ষফল এই খানে শেষ।

উর্ব্বশী

একাঙ্কিকা

শ্রীনলিনী দাস গুপ্ত বি-এ

দৃশ্য :—

মানস সরোবরের তীরদেশ—সবে মাত্র পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে, পূর্ণশশীও যেন ম্লান ; কী বিপুল অন্তর্দ্বন্দ্ব, কী এক দুরু দুরু আশঙ্কা তার মাঝে এনেছে অভূতপূর্ব্ব শিহরণ,—জগতের বুকে নেই তার সেই বাঞ্ছিত স্নিগ্ধ, শান্ত, কিরণজাল। এক উদাস করুণ বিহ্বল হাওয়া জোরে জোরে শ্বাস ফেলিয়ে বদ্ধ বুকের গুমোট ব্যথাকে স্বচ্ছ ক'ত্তে চেষ্টা পাচ্ছে। মানস সরোবরের সোনার পাপড়ি একের পর একে নেতিয়ে পড়েছে, কী যেন এক আশঙ্কায় তারা মূহ্যমান,—চির বসন্তের লীলা-ভূমির প'রে আজ জড়তা, নিথরতা সাজ বিছায়ে দিয়েছে—দূরে আকাশের বুক চিরে বেড়িয়ে আসছে সৌন্দর্য্য পিয়াসীদের বুকফাটা মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ—'ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও'—।

যবনিকা উঠ্‌তেই দেখা গেল রাজা পুরুরবাকে, যৌবনে যেন বার্দ্ধক্যের ছোঁয়া লেগেছে ; আশঙ্কার করাল বিভীষিকা প্রতি মুহূর্ত্তকেই তার বিষিয়ে তুলছে—আজ তার সেই ভয়ঙ্কর, নিষ্করুণ বাস্তব রক্তার্দ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তার সাম্‌নে এগিয়ে আসছে,—রাজা উন্মত্তপ্রায়,—ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বস্থিতা উর্ব্বশীর মুখখানি তুলে ধরে চেয়ে থাকে নিস্পন্দ, অপলক ভাবে, দৃষ্টির মাঝেও এক ধারালো ক্ষুধা—কিয়দ্দূরে মর্ত্তের সৌন্দর্য্য পিয়াসী আত্মা হাত দুখানি জোর ক'রে দাঁড়িয়ে, বড় সকরুণ, ব্যথা ভরা তার দৃষ্টি,—

রাজা,—দোবনা—দোবনা—ওগো! আলোর বন্যা, ওগো সৌন্দর্য্যের প্রাণ মাতানো উচ্ছ্বাস, তোমায় ছেড়ে দোবনা,—স্বর্গ কাঁদছে, কাঁদুক, মর্ত্তও তো কাঁদছে,—চেয়ে দেখ, সুন্দর আজ কী রিক্ত, কী সর্ব্বহারা সাজ প'রে তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে,—চায় তোমার করুণা—দয়া কর দেবী, দয়া কর—।

সুন্দর,—দেবী, আমি মর্ত্তের সৌন্দর্য্য পিয়াসী আত্মা ; তোমার সাথেই নেবেছিলুম ধরার বুকে, মর্ত্তকে দিয়েছি সুন্দরের স্বাদ, সবুজের স্পর্শ, তাদের জীবনযাত্রা হ'য়েছিল এক অপূর্ব্ব ছন্দে লীলায়িত,—কী অনন্ত, সুমহান, সুশোভন হ'য়েছিল তাদের দৃষ্টি—তারা তাদের জীবনকে চায় পরিপূর্ণভাবে তাদের সীমার মাঝে পেতে,—। তারা তোমায় ছেড়ে দেবেনা—নিওনা, নিওনা কেড়ে তাদের প্রাণের স্পন্দন, আলোর রশ্মি—।

উর্ব্বশী—রাজা,—(অব্যক্ত বেদনায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল)

রাজা—স্বর্গ হারিয়েছিল তোমায়—তাদের চোখের দীপ্তি গেল নিভে, প্রাণের স্পন্দন গেল নীরব হ'য়ে,—তাদের আত্মার বুকে নেবেছিল মরুভূমির তীব্র দাহন—আকুল পিয়াসায় তারা ফেটে যাচ্ছে, তাই জানিয়েছিল মর্ম্মস্পর্শী আবেদন, উদ্বোধন ক'রেছিল তোমায় সারা প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে। তাদের ব্যাকুল আহ্বানে সাগরের বুক চিরে তুমি বেড়িয়ে এলে বরাভয় নিয়ে, সাথে ক'রে নিয়ে এলে অমৃতের বার্ত্তা,—মুঞ্জরিত হ'লো তাদের প্রাণ। আবার যেদিন তোমায় তারা হারালে, সেদিনও স্বর্গের বুকে উঠেছিল ক্রন্দনের রোল, কেমন ক'রে তোমায় রাখবে, তুমি যে পেয়েছিলে অবজ্ঞা—।

সুন্দর—দুর্ব্বাশার শাপ মর্ত্তবাসীর পক্ষে হ'লো বর—তারা অভিনন্দন ক'রলো তাদের মানসীকে, তার পায়ে ঢেলে দিল পুষ্পাঞ্জলি, তাদের কল্পনা পেলো সজীব, সজাগ রূপ—তুমি তাদের চোখের আলো, মনের তৃপ্তি, কামনার আবেগময়ী প্রেরণা, যেতে তোমায় দোবনা—দোবনা—

উর্ব্বশী—ওগো রাজা—অপ্সরার কি প্রাণ নেই,—হৃদয় নেই, সেখানে কি শুধু মরুভূমির ঊষর বালিস্তূপ ? তোমাকে নিয়ে গড়েছিলুম আমার নষ্টনীড়,—আমার

হারিয়ে যাওয়া ভাষা প্রাণ পেয়েছিল তোমারই প্রেমে অবগাহন ক'রে—আমি নিয়ে এসেছিলেম হতাশা, অভিশাপ, তুমি পরায়ে দিলে আশার পারিজাত, সুন্দর আমায় ক'রেছ তুমি—ওগো আমার বরেণ্য—আমার প্রিয়,—

রাজা,—দেবী আমার—(উর্ব্বশীকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন)

উর্ব্বশী—আমায় যে যেতে হবে দেবতা,—ঐ আকাশ পারের বাণী আমায় ডাক্‌ছে—ঐ তারার দেশ থেকে নীরব ভাষার মধ্য দিয়ে উঠছে এক তীব্র গুঞ্জরণ—এক অস্পষ্ট হাহাকার—স্বর্গ আজ বিক্ষুব্ধ,—দেবরাজের মাথায় টনক প'ড়েছে—দেবতা আজ মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়—

সুন্দর,—মর্ত্তওতো ভিক্ষা চায় মা—তাদের প্রাণের উৎসও যে যাবে শুকিয়ে,—

উর্ব্বশী—ওরে ছেলে মায়ের দেখলি শুধু উপরকার আবরণটা—ভিতর দেখলিনে—যদি দেখতে চাস, তবে দেখবি সেখানে র'য়েছে বাৎসল্যের ফল্গু ধারা—গোপনের মধ্য দিয়েই সে হ'য়ে উঠে নবীন—তরুণ—স্বার্থক। মর্ত্ত যে স্পন্দন পেয়েছে তাদের কল্পনায়, যে শিহরণ দোলা দিচ্ছে তাদের মানস লোকে, সেখানে শুধু সৌন্দর্য্যকেই বেঁধে রেখে শান্ত হবে না। যাহা মঙ্গল—যাহা শিব—যাহা কল্যাণ। তারাই এসে দেখা দিবে মূর্ত্ত হ'য়ে, আমি শুধু প্রেরণা,—আমার ভাণ্ডার যে শূন্য হ'য়ে গেছে সুন্দর!—

রাজা—কিন্তু আমারতো আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়'ন দেবি—সেখানে এখনও অভাব, এখনও কামনার দাব দাহ। তুমি এসেছিলে, সাথে ছিল বসন্ত, সাথে ছিল জ্যোৎস্না, আর ছিল—আর ছিল আমার আত্মার ঐকান্তিক ক্ষুধার তাড়না—। যখন ধরা দিলে তখনই আমার জাগরণ—আমার প্রাণের উদ্বোধন—পরিপূর্ণ ভাবে তোমায় এখনও যেন পাইনি, যেন পেয়ে যেতেই হারাতে চলছি—

উর্ব্বশী,—রাজা,—ক্ষণিককে দাও ছুড়ে ফেলে,—অনন্তকে, মহানকে নাও বরণ করে,—ওগো! যাত্রী তুমি অসীমের, অপার্থিবের—জানি, আমি চলে যাব তোমার দৃষ্টির বাইরে, কিন্তু যে ব[illegible] তোমা[illegible]ছ আমার প্রাণকে তাকেতো ছিনিয়ে নেয়া [illegible] না,—সে যে তোমার,—আমার সত্য,—আমার দীক্ষা,—আমার যত কিছু গর্ব্বের, সবই যে তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলেছি,—

রাজা,—আমি তো কল্পনার পূজারী নই দেবী,—আমি পূজা করি আমার বাস্তবকে, আমি বিশ্বাস করি আমার চোখের দেখাকে। কল্পনাকে হারিয়ে ফেলেছি,—বিসর্জ্জন দিয়েছি তাকে ঐ মানস সরসীর কালো জলে, যেদিন,—যেদিন পরিপূর্ণ সত্যালোকে, শান্তির বার্ত্তা বহন করে তুমি দাঁড়ালে আমার চোখের আগে,—বিস্মিত আমি, বিমূঢ় হ'য়ে চেয়ে রইলুম তোমার চোখের পানে,—

উর্ব্বশী,—(পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়েছে) দেববালা মর্ত্তের সন্ধান রাখতো না—মর্ত্তের বাণী জানতো না,—জানতো না তার বৈচিত্র্যের খোঁজ। আমি ভাবলুম এ কোন দেশ, এখানেও কি সূর্য্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস আছে, কানের মাঝে তখনও খেলা ক'চ্ছে দেবতাদের প্রণয় সম্ভাষণ,—চেয়ে দেখি দূরে কে ব'সে,—উদাস, উন্মত্ত তার দৃষ্টি, চেয়ে আছে ঐ চাঁদের পানে। তা চাউনি, বিহ্বলতা, অপ্সরীর প্রাণে তুললো আলোড়ন, অপ্সরীর মাঝের নারী উঠলো জেগে,—তার প্রেমিকা মন,—আমি চাইনি, যেতে চাইনি, তবু,—তবু চালিয়ে নিল সেই উদাসীর কাছে,—

রাজা,—সে যে আমার প্রাণের ব্যাকুলতা,—ব্যগ্রতা,—আমি চেয়েছি, তোমায় চেয়েছি, তুমি কেমন করে সরে য'বে,—দুর্ব্বাশার শাপ মিথ্যা,—আমি—আমিই তোমায় স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি,—

উর্ব্বশী,—তোমায় দেখলুম,—তোমার রূপ,—তোমার যৌবন, তোমার আবেশ-মাখা দৃষ্টি আমায় মুগ্ধ ক'রলো আমায় মাতিয়ে তুললো—ঝরণার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হ'লো আমার গতি, তোমার সামনে দাঁড়ালুম,—তোমার হাত ধরে শিরায়, শিরায় উপভোগ ক'রলুম তোমার স্পর্শ,—যৌবন আমায় দোল দিল, আমায় পাগল করে তুললো,—

রাজা,—আমার রাণি, আমার দেবী,—

উর্ব্বশী,—কী উত্তপ্ত,—কী চঞ্চল,—কী মধুময় তোমার

স্বর্গ,—র[illegible] ধ্বনিয়ে তুললো বিদ্যুৎ প্রবাহ,—দেবতা হ'লো [illegible], চোখের মধ্য দিয়ে হ'লো ধারার বাণীর বিনিময়, কানের মাঝে উঠলো মর্ত্তের সাহানা তান, আর বক্ষের মাঝে বইল প্রেমের গঙ্গা—তোমার মাঝ থেকে পেলাম ধরণীর রূপ-রস-বাণী, যে বাণী তোমার হয়েই জগৎকে দিয়েছি, যার উৎস হ'য়েছিল তোমারই প্রেমের আহ্বানে,—

রাজা,—আর,—আর, আমার চোখে তখন তোমার হারানো স্বর্গই পেলো রূপ, তুমি ভুললে স্বর্গ, আমি ভুলে ফেললুম আমার মাটিকে, আমার অস্তিত্বকে,—নিজকে ছিনিয়ে নিলুম, বিশালতা থেকে, অসীম থেকে,—

উর্ব্বশী,—বসন্ত তখন দেখা দিয়েছে ধরার বুকে,—মানস সরোবরে লাগলো যৌবনের হাওয়া, তার বুকের মাঝে কমলের দলে হ'লো নবীনের মুঞ্জরণ,—কোথায় নন্দন কানন,—কোথায় পারিজাত কুসুমদাম,—নিজেই গ'ড়ে তুললুম এক অপূর্ব্ব স্বর্গ, যে স্বর্গের প্রকাশ হয়, অনুভূতির মাঝে, আত্মার উপভোগের মাঝে, তৃপ্তির মাঝে, —আমি ভুলে গেলুম,—সব ভুলে গেলুম,—

রাজা,—তুমি ছুঁইয়ে দিলে বিভূতির জীয়ন কাঠি, আমার মনে লাগলো অলকার দোল,—নেশায় হ'য়ে উঠলুম বিহ্বল, পাগল,—পেলাম তোমাকে নিবিড় ভাবে,—তবু যেন পাওয়া হয়নি, প্রাণের মাঝে এখনও বিশ্বের ক্ষুধা,—কামনার অসহ্য জ্বালা,—

(আকাশের বুক থেকে তখনও বেড়োচ্ছে সেই চিরন্তন সুর,—'ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।' তার সঙ্গে ভেসে উঠলো—অশরীরি সঙ্গীত তান, সে তানে হ'য়েছিল সুষমার মুঞ্জরণ সৌন্দর্য্যের উদ্বোধন, জাগরণ, দেবতার আত্মার সেই চরম প্রার্থনা, ঐকান্তিক আবেদন,—'স্বাগতম, ওগো অবজ্ঞাতা, ওগো অচিন্ দেশের যাত্রী স্বাগতম !'—)

উর্ব্বশী,—আমায় ডাকে,—ডাকে, আকাশের বুকে বেজে উঠলো সেই মর্ম্মস্পর্শী সুর,—যার আহ্বানে সাগরের দেশ থেকেও আমার সাড়া দিতে হ'য়েছে,—এযে সেই গান,—এযে সেই গান,—

[উর্ব্বশী উন্মনা,—আকাশে, বাতাসে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে সেই সুরের রেশ,—

'স্বাগতম—স্বাগতম—']

রাজা,—উর্ব্বশী,—আমার সাধনা,

সুন্দর,—মা—মা,—

উর্ব্বশী,—ওরে বাঁশী বেজে উঠেছে, প্রাণের তন্ত্রীতে ছোঁয়া লেগেছে,—এতো আবাহন নয়,—উদ্বোধন নয়, এযে চিরন্তন বিদায় সঙ্গীত, এ যে বিশ্বজগতের বিরহের মূর্চ্ছনা, রণিয়ে,—রণিয়ে বেজে উঠছে সেই তান,—আকুল করা,—পাগল করা, —রাজা বিদায়,—ধরণী বিদায়,—

(সহসা ঘোর তিমির জাল জগতের বুকে ছড়িয়ে প'ড়লো,—চাঁদের অস্তিত্বও গেলো নিভে—উঠলো আলোড়ণ, বিশ্বের সে চরম দুর্দ্দিন, সুরু হ'লো ভয়ঙ্করের প্রলয় নর্ত্তন, ধ্বনিত হ'লো বিশ্ববাসীর বুকভাঙ্গা কাতর ক্রন্দন —'আলো চাই, —চাই আলো'—তার মধ্যে ভেসে উঠলো বরাভয়,— স্পষ্ট, সুস্পষ্ট—সে উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বর)

উর্ব্বশী,—ওগো ধরণী ! বিদায়—বিদায়—তোমাকে দিয়ে গেলুম আমার সব সম্পদ—স্বর্গ থেকে আমি তা নেইনি ; সে যে আমার মর্ত্তের আহরণ, আমার সৌন্দর্য্য আমার মাধুর্য্য, আমার বিভূতি অটুট হোক বিশ্বের কল্পনায় বিশ্বের মানস লোকে হোক্ আমার স্বর্গ প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের অনুভূতির মধ্য দিয়ে বেজে উঠুক আমার চলার পথের বাণী। স্বর্গের শুধু আমি অপ্সরী, বিশ্বের আমি নারী,—মহিয়সী মাতৃমূর্ত্তি, কল্যাণময়ী সেবিকা, সৌন্দর্য্যের উপাস্যা,—

রাজা—আমায় কি দিবে উর্ব্বশী,—আমায় কি দিবে,—

উর্ব্বশী,—তোমায় দিলুম আমার প্রেম, আমার বিরহী হৃদয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা,—তোমার সাধনায় আমার জন্ম, তোমার কণ্ঠে রেখে গেলুম বিশ্বের বিরহী চিত্তের মূর্চ্ছনা,—বিরহী আত্মা তোমার কাছ থেকেই পাবে সত্যের প্রেরণা, প্রেমের প্রেরণা, কর্ম্মের প্রেরণা,—

(আঁধারের বুক চিরে বেড়িয়ে এলো পুষ্পক রথ, তার মধ্যে উর্ব্বশী আরোহণ করলো, রথ ধেয়ে চ'ললো স্বর্গের দিকে)

রাজা,—(উদ্ভ্রান্ত ভাবে) উর্ব্বশী,—উর্ব্বশী,—

(দূরে শূন্য পথে উত্তর হ'লো,—

স্বামীন্—রাজা—

রাজা মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়লো ধরার বুকে—চাঁদ ভেসে উঠলো,—)

—:০:—

ওতপ্রোত

—গল্প—

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

"লাগ্গা এ লালাজী"

কিশোর দিল্লীতে চশমার দোকান খুলেছে বছর দুই হল। আজকে কি কাজে লাল কেল্লার পাশ দিয়ে চলেছিল, হঠাৎ পেছনে ওই ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলে এক টঙ্গাওয়ালা তাকেই ডাকছে; টঙ্গার ভেতরে একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর তার পাশে, স্ত্রী বলেই মনে হয়—একটি সুবেশা তরুণী। কিশোর থমকে দাঁড়াল—টঙ্গাটা কাছে এসে দাঁড়াতে ভদ্রলোক নমস্কার করে বল্লেন "মশাই আপনাকে বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে; আমার অনুমান কি ঠিক?"

কিশোর ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

টঙ্গার আরোহী আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন "বাঁচা গেল—আচ্ছা এখানে বাঙ্গালীর কোথায় থাকা উচিত বলতে পারেন? আমিত মশায় তিরিশটা হোটেল আর ধর্ম্মশালা দেখালুম—তা এনার আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না—আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেছে......"

কিশোর সহাস্যে বক্তার সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তরুণী চেঁচিয়ে উঠল "তুমি? কিশোরদা, তুমি এখানে কবে এলে......"

কিশোরও অবাক! পলুইত—তাদের বেনেটোলার বাড়ীর পাশের সেই পল্লবিকা! ওঃ আজ চার বছর তাদের দেখা শোনা নেই। মা মারা যাবার মাস তিনেক পরেই কিশোর কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ে—তারপর কত দেশ বিদেশ বেড়িয়ে হটাৎ দিল্লীতে এক চশমাওয়ালার সঙ্গে থেকে গেল কি করে তা কিশোরের চেনা অচেনা কেউই তার খবর পায়নি। কিশোর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সাধারণ ভাবে বললে "আছি অনেক দিন—তারপর বেড়াতেই এসেছ বোধ হয়?..."

পল্লবিকা ফিরিঙ্গি মেয়েদের মতন ভ্রূদুটোকে নাচিয়ে হেসে উঠল "—কাজেই! হ্যাঁ ইনি আমার বাল্যবন্ধু কিশোর কান্তি মিত্র আর ইনি বুঝতেই পারছ?"

আর এক দফা নমস্কার আদান প্রদান হয়ে গেলে কিশোর ব্যস্ততা দেখিয়ে বল্লে "রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে আলাপ পরিচয় তত সুবিধের হচ্ছে না—তার উপর তোমরা নবাগত, আগে একটা ডেরা ডাণ্ডার বন্দোবস্ত হোক" বলে টঙ্গা ওয়ালার পাশে বসে পড়ে আদেশ করে "চালাও রায়সিনা"

ছোট ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে টঙ্গা ছুটে চলে। পলুর স্বামী অনুপম বাবু সমস্ত রাস্তাটাই এটাকি ওটাকি করে সব জেনে নিতে নিতে চলেছিলেন। লাল কেল্লার বিরাট প্রাচীর বেষ্টনের পরিমাপ—ঘণ্টাঘরের উচ্চতা, জুম্মা মসজিদের সোপান সংখ্যা, সবই তিনি দেখে টুকে রাখছিলেন, কলকাতায় ফিরে মাসিক কাগজে সচিত্র ভ্রমণ লেখবার ইচ্ছে আছে। কিশোর সাধ্য মত তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে উত্তর ভারতের ভূমিকম্প চলছিল। বিস্মৃত জীবন আবার কঠোর ভাবে তার চোখের সামনে এগিয়ে আসে; পলুকেত ভুলেই গেছল—আবার কেন যে তার সামনে এসে দাঁড়াল। আজ তার এই ছন্ন ছাড়া জীবনের জন্য পলুইত দায়ী—সে যদি তাকে অমন করে খেলিয়ে নিয়ে অবশেষে ছেঁড়া নেকড়ার মত ছুঁড়ে না ফেলত তাহলে কিশোরের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ অন্যরকম হত না? নিশ্চয়ই হত। আজ যেমন করে অনুপম তার পাশে বসে রয়েছে, যেমন করে পলু তার কাঁধের ওপর শ্রান্ত হাত খানা তুলে দিয়েছে—এ সমস্তই একমাত্র কিশোরের প্রাপ্য ছিল। কিশোর না হয় বিনয়ের সঙ্গে রোজ রোজ যা তা বায়স্কোপে যেতে পলুকে মানাই করেছিল; কি আর এমন দোষ হয়েছিল তাতে। না হয় যেতই—

কিন্তু তাই [illegible] । কি করে মুখের উপর বললে "তুমি আমায় শাসন [illegible] আস কোন সুবাদে—আমি বিনুদার সঙ্গে যাই-ই করি না তোমার কি তাতে ?—" সে অপমানও সে সহ্য করেছিল। কিন্তু পলুর বাবা যে দিন তাকে ডেকে রক্তচোখে চেয়ে বললেন "—বিনয়ের কাছে শুনলাম তোমার চরিত্র, তুমি আজ থেকে আর এখানে এসনা বাপু..." সেই দিন আগ্নেয় গিরির মত সে ফেটে পড়েছিল। এত বড় আস্পর্দ্ধা ওই বুড়র, রাগে কাঁপতে কাঁপতে চলে এসেছিল "—হ্যাঁ আপনার ওই পাড় ঢলানী মেয়ের মত আমার চরিত্র নয় একথা ঠিক, তবে এতকাল এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করছি যাবার সময় একটু উপকারই করে যাচ্ছি, হ্যাঁ সকল পুরুষই আমার মত নয়—সেইজন্যে আপনার মেয়ের দিন হয়েও আসছে, ভাল চান একটা শিগ্‌গির বিয়ে দেবেন—বুঝেছেন ? ওই বিনয়ের জন্যে বলছি—না শোনেন পরে কাঁদতে হবে" "রাগের চোটে দরজাটায় প্রবল ধাক্কা দিয়ে সে দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই তার মা গত হলে, ভায়েদের স্বার্থপরতা, ভাজেদের কৌটিল্য, বোনেদের ঝগড়া আর সইতে না পেরে পথে বেরিয়ে পড়ে। সেই থেকে কিশোরের খোঁজ খবর কেউ পায়নি, অবিশ্যি খোঁজ নেবার মত লোক বড় একটা কেউ ছিল না বলেই।

পলুও ভাবছিল অনেক কথা। কৈশোরের সাথী এই তরুণকে কত দুঃখই না সে দিয়েছে। সেই বিনয়; ভাবতেও তার গা শিউরে উঠল; কি কাণ্ডই একদিন সে করলে ! ভাগ্যিস পলু বুদ্ধি করে ছুটে গিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিল তা না হলে সেদিন মাতাল অবস্থায় সে কি না করত—হতভাগা পাজী লম্পট! আগে জানলে সে কখনোই কিশোরদাকে অমন করে দুঃখ দিত না। আহা কিশোরদা তাকে কি ভালই বাসত একটা নূতন ফিল্ম এলেই ছুটে আসত। "—যাবে পলু ......" আজ প্লাজা কাল রিগ্যাল পরশু গ্রাণ্ড টিসাইটাল তাকে খুশী করবার কি অক্লান্ত সেবা। আর আজ—পলু সবলে একটা নিশ্বাস চেপে নিলে। হ্যাঁ—সে চেহারাও আর নেই ওর, গালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে চোখের কোণে কালি পড়েছে, গায়ে ধুলা, রোজ বোধ হয় স্নান করেনা। পলু মিহি গলায় প্রশ্ন করে "—তুমি এখানে কি কর কিশোরদা।"

কিশোর একটু নড়ে উঠল "—কিছুই করিনা বলতে গেলে, ঘড়ি সারাই—এক দিল্লিওয়ালার দোকানে ঘড়ি মেরামত করি—"

অনুপম হাসি চাপে। এই তার স্ত্রীর বাল্য সখা! ঘড়ির মিস্ত্রি! নাঃ পলুর বাহাদুরী আছে, অনুপম হঠাৎ বলে বসে "—তা কোলকাতায় কি ঘড়ির দোকানের অভাব— সেখান ছেড়ে এখানে কেন ?" প্রশ্নটা বেশ অভদ্রের মতনই শোনাল।

কিশোর টিপ্পনি বাটার ধরণে উত্তর দেয় "কোলকাতা হলে অবিশ্যি ঘড়ি মিস্ত্রি থাকতে হত না—হাঁ সে দেশ জন্মভূমি হলেও কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে—"

পলুর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায়; অনুপমের কানে কানে বলে "কিশোরদা সেখানে প্রোফেসরী করতে ঢুকেছিল—খেয়ালবশে আখের নষ্ট করেছে..."

অনুপম চমকে উঠে নির্ব্বাক হয়ে গেল।

পলু কথাটাকে ঘোরাবার জন্যে বলে "—আচ্ছা কিশোরদা—দূরে ওই একটা সিঁড়ির মত উঠে গেছে ওটা কি ?"

কিশোর মুখ ফিরিয়ে বললে "—ও হল যন্তর মন্তর মানে মানমন্দির; ভারতবর্ষে এইটেই সব চেয়ে বড় অবসারভেটরী. নিয়ে যাব অখন একদিন—এই সবুর—বাঁয়ে সবুর..." সে একটি ছোট একতলা বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেবে ডাকল "—সোনিয়া..."

বেশ বাড়ী খানি—গেটের ওপর এক রকম লতানে গাছ—অজস্র ফুলের ভারে ঝুলে পড়েছে, রোয়াকের চার দিকে মাটির টব সাজানো তাতে নানা জাতীয় সিজন ফ্লাওয়ার ফুটে গৃহস্বামীর সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। সামনের বারাণ্ডায় একটা লালমোহন পাখী দাঁড়ের ওপর দোল খাচ্ছিল, হঠাৎ এক সঙ্গে এত গুলি লোক দেখে ক্যাঁ ক্যাঁ করে চীৎকার করে উঠল...

কিশোর উঠে গিয়ে পাখীটার গায়ে হাত বুলিয়ে আর একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকলে "—কাঁহারে সোনিয়া..."

অগ্নি শিখার মত একটি রূপসী তরুণী সামনের ঘরের পর্দ্দা ঠেলে বহিরে এসে দাঁড়াল "—ভাই সাব! আপ এস্তে সবেরে আয়েহেঁ ?..."

কিশোর ঈষৎ গম্ভীর ভাবে আঙ্গুল দিয়ে বাহিরের দিকে দেখিয়ে বললে "—মেরি পুরানে দোস্ত—থোড়ি রোজ রহিয়েঁ,—মঙ্গনে হিঁই পর বোলাকে লায়া হুঁ..."

তরুণী মধুর হেসে অগ্রসর হতে হতে বলে "—আপকা খুশী ভাইসাব—আইয়ে..." সাদরে পলুর হাত ধরে সে টঙ্গা থেকে নামিয়ে নেয়।

পল্লবিকা শুকনো মুখে তার আশ্চর্য্য রূপের দিকে দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ইতঃস্তত করে। এ কোথায় তাদের আনা হল!

কিশোর বুঝতে পেরে বলে "—এটা আমার আস্তানা—আতিথ্যের ত্রুটি হবে না, এটুকু জোর করে বলতে পারি... আর এটি আমার বোন; "সোনিয়া মেরি পাশ আখাওতো" শেষের দিকটা তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা বস্তু ছিল যা শুনে পলু মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারে কিশোরের কলকাতা না ফিরে যাবার কারণ কি।

সোনিয়া স্বচ্ছন্দ লঘু গতিতে এগিয়ে এসে কিশোরের হাতখানা ধরে বালিকার ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বললে "—ফরমাইয়ে—"

কিশোরের রূপান্তর ঘটে যায়। পলু বিস্মিত ভাবে দেখলে, চার বছর আগেকার কিশোর এই মাত্র আবার ফিরে এসেছে। ঠিক আগেকার মত তার চোখ দুটোয় ভরে উঠেছে অজস্র স্নেহ—কঠিন বাহু শিথিল হয়ে আস্তে আস্তে ওই রূপমতীর সুচারু দেহলতাকে ঘিরে ফেলে, যেমন করে আগে সে পলুর সঙ্গে কথা কইত তেমনি করেই সে সোনিয়ার মুখের ওপর নিজ মুখ নত করে এনে বললে "—ইন্‌লোগকোঁ রসুই ওসুইকে সব বন্দবস্ত হোনা চাই, হাম কো অবহি দুকানমে যানে হোই বহিন—"

সোনিয়ার টানা চোখে কি শান্ত সৌন্দর্য্য; তাকে বাঙ্গালীর ধরণে সাড়ী পরে যা মানিয়েছে—তা অনেক সময় বাঙ্গালীর ঘরেও দেখা যায় না। কিশোরের ইচ্ছানুসারে সোনিয়া পায়জামা পরা ছেড়ে দিয়েছে। কিছু মাত্র ব্যস্ততা না দেখিয়ে সে কিশোরের গায়ে হাত বুলিয়ে চললে "—আপ খুশীসে যাইয়ে তো ভাইসাব, মুঝে সব ঠিক করেঙ্গে—"পরে এদের দিকে ফিরে হাত দুখানি যুক্তকরে বলে "—আইয়ে—মেহেরবান—ইয়ে আপেইকো ঘর মোকান সমঝিয়ে—"

অনুপম ত ব্যাপার দেখে থ' বনে গেছল। বাঙ্গালীর ছেলে দিল্লীওয়ালীর সঙ্গে এত পীরিত জমালে কি করে? সোনিয়ার ওই মধুর আহ্বানে শশব্যস্ত ভাবে সে দালানে উঠে এসে পলুর কাছে দাঁড়াল—

সোনিয়া তাদের নিয়ে পাশের একটি সাজানো ঘরে বসায়। এটা তার নিজের ঘর, এক কোণে নক্সা-কাটা একটি প্রকাণ্ড খাটিয়া পরিষ্কার বিছানা পাতা, তার ওপর একটা খোলা বই পড়ে রয়েছে, বোধ হয় এতক্ষণ সে তাই পড়ছিল! ঘরের মাঝখানে একটা চন্দন কাঠের টেবিল তার ওপর ফুলদানীতে চামেলি ফুলের তোড়া; ও পাশের দেওয়ালে হাতির দাঁতের কারু-কার্য্য করা সুর বাহার টাঙ্গানো; মানে মেয়েটির সখের যে অন্ত নেই তা ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। কিশোর হাসি মুখে বললে "—তাহলে তোমরা একটু জিরোও—আমি একবার দোকানটা ঘুরে আসি—"

পলু কিশোরের কাছে এসে চুপি চুপি জিগেস করে "—আচ্ছা কিশোরদা এরা কি মুসলমান?"

কিশোর চকিতে সোজা হয়ে উঠল "—এরা যাই-হোক তোমাদের তাতে অসুবিধা হবে না—কারণ আমার রান্নাটা হিন্দু ব্রাহ্মণেই করে থাকে—"

পলু একেবারে নিভে যায়—"না না আমি সে জন্যে বলিনি, জানইত কলকাতার চিনে হোটেলে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে—এমনি জেনে নিচ্ছিলুম—"

কিশোর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে অনুপমের দিকে চেয়ে বলে "—আচ্ছা:—আমি এই ঘণ্টা খানেকের ভেতর ঘুরে আসছি—" জবাব শোনবার অপেক্ষা না করেই সে বেরিয়ে গেল।

সোনিয়ার মোহিনী গুণে পলু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল! সে ক্রমে ভুলে যাচ্ছিল যে সে মুসলমান—

পাঞ্জাবী মুসলমা... কিছুইত অসুবিধে হয় না। পলু শুয়ে বই পড়ছে—সোনিয়া এসে তার কাঁধে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল. কিরে পাগলী! জবাব দেয় না—ফিক করে হেসে আবার তেমনি করে পড়ে থাকে ; বলত—তাকে কখনো পর ভাবা যায়? তার স্বামী ইব্রাহিম খাঁও লোক বশ করতে কম যান না। ইতিমধ্যেই অনুপম তাকে পেয়ে বসেছে। ইব্রাহিম ভাইসরিগাল হাউসের কন্ট্রোলার. রোজ আপিস থেকে আসতে তার সন্ধ্যা হয় যেত, কিন্তু এদের পাল্লায় পড়ে আজ কদিনই তাকে চারটের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হচ্ছে; এদের নিয়ে দিল্লীর নানা স্থানে ঘুরিয়ে বেড়ানো তার যেন চাকরীর একটা অঙ্গ হয়ে পড়েছে। কিন্তু কিশোরের ব্যবহার সব চেয়ে আপত্তিকর—তার কাজটা ইদানীং এত বেড়ে গেল কি করে তা সোনিয়া বুঝতে পারে না। সেই সকালে বেরিয়ে যায় আর ফেরে একেবারে রাত দশটায়। তার অতিথিদের সঙ্গে কোনদিন হয়ত আধঘণ্টা হালকা গল্প করতে শোনাগেল—কিন্তু তার পরদিন একেবারে দর্শন নেই। পলু একদিন চেপে ধরে "—আচ্ছা কিশোরদা তুমিত আমাদের একদিনও কোথাও নিয়ে গেলে না? কি এত তোমার কাজ বাপু! ভাগ্যিস খাঁ সাহেব ছিলেন তবু একটু বেড়িয়ে বাঁচছি—"

কিশোর ফিকে হাসি হাসে "—বাঃ—আর সোনিয়া কিছু করে না নাকি? আমিত তার ওপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত আছি—হ্যাঁ কদিন অনেক গুলো ঘড়ি ডেলীভারী দিতে হল কিনা, তাই বড় একটা সময় পাচ্ছি না—আর তোমরাত আমার চেয়ে যোগ্যতর গাইড পেয়েছ পলু—"

পলু ঠোঁট খানা উল্টে বললে "—ছাই, সেত উনি পেয়েছেন—সমস্ত রাস্তা উর্দ্দু আর ফার্সী কথায় যেন জ্বালাতন হতে হয়। সেদিন হুমায়ুন টুম্ব দেখতে গেছলুম আমি জিগেস করলুম এটা কি? ইব্রাহিম তড়বড় করে হাত মুখ নেড়ে বললে "—হুমায়ুনকে মখবরা—আরে গেল, মখবরা কিরে মুখপোড়া। অনেক কষ্টে অবশেষে ইংরিজীতে ওঁকে বুঝিয়ে দিলে—মখবরা That's a tomb উনিত সারা রাস্তা মুখস্থ করতে করতে এলেন—মখবরা—হুমায়ুনকে মখবরা—"

কিশোর মজা পেয়ে বললে "—আচ্ছা সোনিয়ার সঙ্গে তা হলে তোমার আলাপ চলে কি করে?—"

পলুর সর্ব্বাঙ্গে একটা নির্ভরতার ঢেউ খেলে গেল, খাটিয়ার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পরে বললে "—সোনিয়া? কি জানি বাপু তার কোনো কথা বুঝতেই আমার কষ্ট হয় না, সেত বললে তুমি তাকে বাংলা শিখিয়েছ, তাই খিচুড়ি শুনছি, কিন্তু বেশ লাগে শুনতে—আচ্ছা কিশোরদা তুমি এদের সঙ্গে জুটলে কি করে তাও শোনা হল না?"

কিশোর ক্লান্ত ভাবে হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে বলে "সে সব শুনতে গেলে তোমার মনে ব্যথা লাগতে পারে কারণ"—হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে আসে—"কারণ তাতে তোমার পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা অনেকটাই জড়িয়ে আছে কি না—থাক না, অপ্রিয় আলোচনা করে অতিথির অসম্মান হবে—"

পলুর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, বুকের স্পন্দনও দ্রুত হয়ে আসে তবু হাসবার চেষ্টা করে বললে "—ভালইত কিশোরদা আমাদের দুজনের মাধ্য কথা গুলার একটা শেষ আলোচনা হয়েই যাক না—"

তার সাহস দেখে কিশোর স্তম্ভিত হয়ে যায়। পলু সেই একই রকম আছে—নিজের দোষ স্বীকার করতে সে কিছুতেই চাইত না—আজও যে চায় তাত মনে হচ্ছে না! কিশোরের ভেতরে একটা দানবের আবির্ভাব হয়, হ্যাঁ সে উদ্ধত অহঙ্কারী নারীকে এমন আঘাত দেবে, দেওয়া উচিত—ওই জাতীয়া স্ত্রীলোক মনুষ্য সমাজের অমঙ্গল, তার কণ্ঠে সে বলে ফেলে "—বেশ কিন্তু আজ আর আমি একা নই আমার সাথী আছে তাকে সমানে রেখেই আলোচনা করব—কারণ সেও অনেক দিন থেকে জানতে চায় কে আমার এই দশা করেছে—"বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পলু বিছানায় বসে দারুণ উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। কি করবে সে—কেন এই সুপ্ত সিংহের ঘুম ভাঙ্গাল—এখন তার আঘাত প্রতিরোধ কে করবে! কটুক্তি? তা সে সহ্য করতে পারবে—বলুক যত ইচ্ছে ও বলুক পলু একটাও প্রতিবাদ করবে না; গালাগাল দিয়েও যদি তৃপ্তি পায় তাহলে দিক, কিন্তু অনুপমকে

কিছু বললেই সর্ব্বনাশ। কিশোর প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে যদি তাই করে? যদি বলে দেয় তার বাল্যলীলা তাহলে কি হবে—পলু উঠে সোনিয়ার ঘরে ছুটে গিয়ে বলে"—সোনিয়া তোমার ভেইয়াকে ধরে নিয়ে আজ কোথাও বেড়াতে চল না—যাবে?

সোনিয়ার পাতলা ঠোঁট মিষ্টি হাসিতে ভিজে ওঠে "—ভেইয়াকে? জরুর লেঙ্গে আচ্ছা সবুর করিয়ে, ময় পকড়তাহুঁ—বলে শিশু কুরঙ্গিণীর মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরে কিশোরের হাত ধরে টানতে টানতে এনে বললে "—আভি ভাগতা থা—"

পলু মুহূর্ত্তকাল সেই দিকে চেয়ে চোখ নাবিয়ে নেয়।

কিশোর তার রকম দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তা হলেও নিজের দোষ স্বীকার করছে; সে তার মনের ক্ষোভ চাপা দিয়ে বললে "কোথায় বেড়াতে যাবে পলু?"

পলু মুখখানা নত করেই বললে "তুমি যেখানে নিয়ে যাবে কিশোর দা?"

সোনিয়ার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে কিশোর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে "আমি যেখানে নিয়ে যাব? আমি নিয়ে যাবার কে! তোমরা কোথায় যেতে চাও তাই বল—"

পলু ব্যথিত নয়নে কিশোরের মুখের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। সেই কিশোরদা—পলু একটু অভিমান একটু ঠোঁট ফোলালেই যে গলে যেত—সে আজ আর একজনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রকে উপহাস করছে—

সোনিয়া কিছু বুঝতে না পেরে লহর তুলে হেসে ওঠে "—কেয়া তাজ্জব—যানেকা যাগা নেই মিলতা? আরে ইধার নিজামুদ্দিন, উধার মেহেরৌলি, চলিয়ে বহিনজী ইন্দর পরস্থ আপ লোককা তীরথ হায়—দুই চলিয়ে—"জিজ্ঞাসু নয়নে সে উভয়ের পানে চায়।

কিশোর পলুর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে একটু নরম হয়। কি দরকার, একে আঘাত করে কিই বা তার ব্যথার লাঘব হবে; এতদিন সহ্য করে এসে আজ সে এত অস্থির হয়ে পড়ছে কেন; সবলে নিজেকে সংযত করে কিশোর হেসে ওঠে—"এখনও তোমার অভিমানটা কিন্তু ঠিক তেমনি আছে পলু, যাক সোনিয়ার মতে তীর্থস্থানে যাওয়াই ভাল—তোমার ইচ্ছেটা এবার বলে ফেল—"

পলু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিশোরদা শান্ত হয়েছে—বাব্বাঃ কি ভয়ই যে ধরিয়ে ছিল প্রথমে। স্মিত মুখে সে বললে "—তাই ভাল—কুতবমিনার অনেকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে—কখন যাওয়া হবে কিশোরদা?" তার আর তর সইছিল না।

এইমাত্র যেখানে আসন্ন ঝড়ের গুমোটে গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়তে পাচ্ছিল না, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল—তখনই সেখানে কি করে ঝির ঝিরে মলয়ের প্রশান্ত পরশ এল! কিশোর মনে মনে হাসে—এইত এদের জীবন, এরা আবার তর্ক করে বুদ্ধি দিতে আসে। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বললে "—বিকেলেই যাওয়া যাবে—তোমরা তৈরী থেক—ছোড়দে সোনিয়া মেরা কাম হায় আভি—"

সোনিয়া হাসতে হাসতে তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে "—আরে যাইবে নাইজী—আপকোত হর ঘড়ি কাম হায়--কাম হ্যয় না খাণ্টা হ্যয়—যাইয়ে—মগর পাক্কা তিন বাজে হাজির হোনা চাহি—"

কিশোর তার চকচকে গালে মৃদু আঘাত করে বেরিয়ে যায়। পলু চুপ করে ভাবছিল—সে কিশোরকে পেলে সুখী হত না অনুপমকে পেয়ে হয়েছে! বোধ হয় দুজনকেই ওর দরকার—কথাটা হাসির হলেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এরা দুজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির এবং সেই জন্যে পলুর একজনকে নিয়ে চলছে না—অন্তত অনুপমের চেয়ে কিশোর এখন তার কাছে—কাম্য—কিন্তু সেত এক রকম হাতছাড়া হয়ে গেছে, এই সোনিয়াই ঘটিয়েছে। পলু স্থির দৃষ্টিতে সোনিয়ার পানে চেয়ে থাকে।

"—হনোজ দিল্লী দূর অস্ত" (দিল্লী এখনো বহু দূর) এই প্রবাদবাক্য অনুপম হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছিল। দেওয়ানইখাসের ছাদের ওপর থেকে যমুনার সূর্য্যাস্তের একটি ফটোগ্রাফ তুলে অনুপম শ্রান্ত ভাবে বাদশাহের

স্ফটিক চৌকীর ওপর বসতে যাচ্ছিল, ইব্রাহিম হাঁ হাঁ করে তাকে ধরে ফেল্লে "—করেন কি ওযে বাদসার আসন—"

অনুপম বিরক্ত ভাবে বললে "—খাঁ সাহেব বাদসাহের এত বড় কেল্লাটাত গোরা সৈনিকের ব্যারাক হয়ে রয়েছে, আর এই পাথরের বেদীটা দখল করলেই যত দোষ ?

ইব্রাহিম অপ্রস্তুত হয়ে বললে "তা ঠিক, সাত নয় কোটি টাকা দামের ময়ূর সিংহাসনই কার ভোগে লাগছে কে জানে—আর এত একটা সামান্য পাথরের চৌকি, তবে কি জানেন ? যা আছে তারও সম্মান দখানো আমাদের কর্ত্তব্য "—কথাটা সম্পূর্ণ না করে সে একটু হাসল।

অনুপম ইব্রাহিমের কথায় সচেতন হয়ে বললে "—ঠিক —দেখুন খাঁসাহেব আমি এই দেশ ঘুরেছি কিন্তু দিল্লীর অধিবাসীর মত সুন্দর চেহারা এবং সৌজন্য কোথাও দেখিনি। সামান্য দোকানদারেরও মুখ চোখ দেখলে মনে হয় যেন কোনো রাজবংশধর, আর কথাবর্ত্তায় এত সহবৎ যা আমাদের বাংলা দেশে অনেক শিক্ষিত পরিবারে বিরল—ধরুন না আপনাদের কথাই--"

ইব্রাহিম সবেগে বাধা দেয় "—না বাবুসাব আমাদের প্রশংসা শুনতে নেই—দোষ করে থাকলে সংশোধনের জন্য অভিযোগ শুনতে পারি..."

অনুপম চমৎকৃত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে, অবশেষে হেসে ফেলে "—মন্দ প্রেজুডিস নয়—আচ্ছা তাহলে থাক, কিন্তু উপস্থিত বসা যায় কোথায়—আর যে পা চলে না।..."

ইব্রাহিম তার সুপুষ্ট হাত দিয়ে অনুপমের ক্ষীণ দেহটা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে "বাংলা দেশকে যে আওরাতাবাদ বলে তা মিথ্যে নয়—চলুন আঁধিয়ারী বাগে বসে শ্রান্তি দূর করবেন..."

দুজনে আঁধিয়ারী বাগে নেমে এসে কেল্লার হোটেলে খবর দিয়ে চা আনাল। বাগানের চতুর্দ্দিকে অগুন্তি "নহর" অল্প জলে ভিজে রয়েছে বলে জায়গাটার উষ্ণতা অনেক কম ; অনুপম আরাম করে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে '—বাঁচা গেল'

ইব্রাহিম একটা সিগারেট ধরিয়ে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে "—এমন দিন ছিল বাবুসাব যখন ৫৩ বাইশ সুবা শোভিত আম দরবারে ঢুকতে পাওয়া মস্ত বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল—আর আজ মুচি মেথরও ঢুকছে। ওই ইতিহাস বিখ্যাত দেওয়ান ই খাসে কত রাজ চক্রবর্ত্তী কত শূরশ্রেষ্ঠের শুভাগমন হয়েছে, এইখান থেকেই ডাক্তার হ্যামিল্টন সম্রাট ফররুখশায়েরকে ব্যাধি মুক্ত করে ৩৮টি কুঠি স্থাপনের সনন্দ পেয়ে এদেশে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। এই কক্ষেই নাদির শাহ মহম্মদ সাহের কোহিনুর শোভিত পাগড়ি কৌশলে করায়ত্ব করেন, এই কক্ষেই বিদ্রোহী সিপাহীরা বাহাদুরসাকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে—আবার সাত মাস না যেতেই এই কক্ষেই ইংরেজ, বাহাদুর সাহের বিচার করেন, এর তুলনা হয় না বাবুসব—লর্ড কার্জনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই আজও আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি, তা না হলে এতদিনে এই বিরাট কেল্লা ধূলোর সঙ্গে মিশে যেত..."

অনুপম সেইদিকে চেয়ে বলে "—আচ্ছা রঙমহলে যে হামাম দেখলুম ওটায় সহস্রধারা ফোয়ারা ছিল বল্লেন, সেটা কি হল ?"

ইব্রাহিম বলসে "—কেন রয়েছে ত, দেয়ালের গায়ে হাজারটা ফুটো দেখছেন না ? বেগমদের স্নানের জন্যে ওই হাজার ধারা তৈরী হয়েছিল। লর্ড কার্জ্জনের পরীক্ষা করে দেখবার সময় বন্ধ হয়ে গেছে—ওর চাবি খুলে দিলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মত অজস্র জল ছড়িয়ে পড়ে স্নানার্থীর অশেষ সুখ বিধান কোরত..."

প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে অনুপম বললে "—বাঃ তখনকার দিনেও শাওয়ার বাথ ছিল তা হলে ?"

ইব্রাহিম অবজ্ঞাভরে বললে "—বলেন কি, ফ্রেঞ্চ বাথ হয়েছে কদিন ? এ সব ত আমাদের সৃষ্টি ওরা নকল করেছে মাত্র—দেখছেন না তাজমহলের একটা নকল বাড়ী তৈরী করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে গেল—"

অনুপম এবার একটু প্রতিবাদের সুরে বললে

"—ছকটা অনেকটা সেই ধরণের হলেও ও দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই তৈরী, তাদের স্থাপত্য বাস্তবিক অদ্ভুৎ কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অন্যদিকে বিচার করলে তার চাইতেও অদ্ভুৎ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই ত আপনাদের কতকটা সহায়—আর ওখানে গর্ত্তকাটা পুকুর এবং সিজন ফ্লাওয়ার গাছ বসিয়ে কত করতে পারা যায় বলুন?'

ইব্রাহিম উচ্চহাস্য হেসে ওঠে"—বাবুসাহেবের নিজের দেশ কিনা মন্দ হলেও ভাল হয়েছে—ভাইসাব বাঙ্গালী হলেও কোনো পক্ষপাত দেখান না কিন্তু, হ্যা লোকটার কলিজা আছে বটে! যখন বলতে আরম্ভ করেন আমিও বোবা বনে যাই আর আমার স্ত্রী সোনিয়া তার কথা যেন কোরাণের বয়েতের মত মনে রাখে, সাবাস মরদ বটে!" ইব্রাহিমের মুখ শ্রদ্ধায় ঝল মল করে ওঠে।

সুযোগ পেয়ে অনুপম বলে বসে "—ওকে আপনারা কোথায় পেলেন? ওঁকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে?—"

"তোবা তোবা" ইব্রাহিম কুণ্ঠিতভাবে বললে "—বলেন কি বাবুসাব? আমরা কারো ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করব, কেন, আকবর বাদসাহের কাছে কত মতবাদী আসত তর্ক করত, বাদসা তাদের সকলের ধর্ম্মই স্বীকার করতেন। ভাইসাব একটা বয়েৎ শিখিয়েছেন "—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" ভারী খাটি কথা বাবু সাব, আমার ইচ্ছে আছে আমি আপনাদের শাস্ত্র কিছু কিছু পড়ি—বড় চমৎকার জিনিষ আছে আপনাদের শাস্ত্রে, সোনিয়া তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে কিনা, কি সব বই পড়ে—রামায়ণ মহাভারত, আমায় তার থেকে দু একটা কিস্সা শুনিয়েছে, "বড়ি ইনসদার চিজ—',

অনুপম আশ্চর্য্য হয়ে বললে "—বটে? উর্দ্দুতে বুঝিয়ে দেয় বুঝি——"

ইব্রাহিম সোৎসাহে ঘাড় নাড়ে—"হ্যাঁ—সোনিয়া ওঁকে আবার কোরাণ পড়ায়—আমি এদের দুজনকে দেখে ভাবি—জাত বলে মূলতঃ সত্যিই কিছু নেই ওটা বুজরুকী আর অহঙ্কার। হিন্দু মুসলমানের একতা সম্ভব হচ্ছে না কেবল মূর্খতার জন্যে। সকলে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠুক দেখবেন একদিনে এই দুই মহাজাতি মিলিত হয়ে গেছে। একদিকে আজানের গম্ভীর ধ্বনি আর একদিকে মহিম্ন স্তোত্র ধ্বনিত হচ্ছে। এ দৃশ্য আমারই বাড়ীতে প্রত্যক্ষ দেখছি ত; একঘরে ভাইসাব তাঁর দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে পূজা করছেন—তার পাশের ঘরেই আমরা চেরাগ গুগ্‌গুল জ্বেলে নমাজ করছি; আমার মন অনেক উঁচু হয়ে গেছে—এই কিশোর বাবুর সংসর্গে আমরা স্বামী স্ত্রী পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছি—আমার দিল ভরে গেছে বাবুসাব—দিল ভর গিয়া"—ইব্রাহিম ভক্তিতে ভারী হয়ে পড়ে।

অনুপমের শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এই হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের পর এমন ঘটনা যে হতে পারে তা কে জানত। দেশে দেশে ছুঁৎমার্গ ত্যাগের অভিমান চলছে, অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্যে সভা হচ্ছে—সাম্প্রদায়িক সমস্যার আলোচনা হচ্ছে; কিন্তু নিভৃতে নির্জ্জনে সে সমস্যার সমাধান যে অনেক আগেই হয়ে গেছে এ খবর তারাত পাচ্ছে না! তারাত বুঝছে না যে ওসব সভা সমিতি করলে হয় না—বক্তৃতা দিলে হয় না, হয় প্রাণের আকুল আহ্বানে—হয় মানবতার চরম ভাব বিকীরণে; অনুপম উঠে দাঁড়িয়ে বললে "—দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যে জ্ঞানার্জ্জন করলুম তার তুলনা হয় না খাঁ সাহেব—আজ মনে হচ্ছে বুঝি ওই কিশোর বাবুর মত গৃহত্যাগী স্বজাতি বিদ্রোহী হতে পারলে আমিও সুখী হতুম—চলুন বাড়ী ফেরা যাক—কিশোর বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে—"

ইব্রাহিম চলতে চলতে বলে "ভাইসাব এদিকে খুব ধীর হলেও বড় সেন্টিমেন্টাল—তাঁর স্বদেশের প্রতি বীতরাগের কারণ কিন্তু আজও ভাল করে বোঝা গেল না—সোনিয়া বলে এতে নারী ঘটিত ব্যাপার আছে—নইলে পুরুষ মানুষ অন্য কোনো আঘাতে এমন হয়ে যায় না—"

অনুপম লাফিয়ে উঠল "—ঠিক বলেছেন খুব সম্ভব ভাই—আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানে সেত তার বাল্যবন্ধু আজই জিগেস করতে হবে।"

কথা কইতে কইতে তারা কেল্লার বাইরে চলে আসে।

মুসল্লিদের কাতারে কাতার মানুষ এগিয়ে চলেছে জুম্মা মসজিদের দিকে। সান্ধ্য অন্ধকারে অদূরস্থিত জুম্মা মসজিদের বিরাট লাল গম্বুজ সকলের মনে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য এনে দিয়েছিল। ইব্রাহিম বললে "—তারাত সবাই ওল্ড দিল্লী দেখতে গেছে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কি করবেন, যদি মেহেরবাণী করে একটু অপেক্ষা করেন তা হলে আমিও নমাজটা পড়ে আসি—?" উত্তরাপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনুপম তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে ফেলে "—ও কি বলছেন—আমি অপেক্ষা করতে বাধ্য—একি একটা কথা হল? যান আপনি কাজ শেষ করে আসুন আমি এই সিঁড়িতে বসছি—"

ইব্রাহিম ধীর গতিতে দীর্ঘ প্রসারী সোপান অতিক্রম করে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজিদের ভেতর চলে গেল।

× × +

তিনটা বাজতেই কিশোর এসে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে বাসে যাওয়াই মত ছিল—কিন্তু পলু হঠাৎ বায়না ধরলে "—না টাঙ্গা করে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে—অগত্যা তাই করতে হল। পথে কিন্তু গল্প করবার তেমন ইচ্ছে কারোর দেখা গেল না, আর্দ্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই গাড়ীর ঝাঁকুনিতে সোনিয়ার ঘুম পেয়ে গেল—সে টঙ্গার হাতলে মাথা রেখে দিব্যি ফুলে ফুলে ঘুমুতে লাগল! পলু ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে বললে "—আমরা কি সারা রাস্তা চুপ করেই থাকব কিশোরদা?"

ম্লান হেসে কিশোর বললে "—কি করতে হবে তাহলে?—"

"—অন্ততঃ পথের দুধারে যা রয়েছে সে গুলোর পরিচয়ত দিতে পার!" পলু একটু উত্তেজিত ভাবেই কথা বললে।

কিশোর তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করে "—পথের দুধারে ওই পত্রহীন নীল কাঁটা গাছ হল করেলি কাঁটা ভীষণ বিষাক্ত। ওই দূরে যে টুম্ব ওটা মনসুরকে মখবরা, তার পরেই এই বিস্তীর্ণ মাঠে, স্থানে স্থানে যে সব ধ্বংশ স্তূপ পড়ে রয়েছে তার পরিচয় নেই, তোমার ডানদিকে দু'মাইল দূরে ছবির মত সফদর জঙ্গ টুম্ব দেখা যাচ্ছে—" কিশোর যেমন হঠাৎ আরম্ভ করেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।

পলু আগ্রহের সঙ্গে কিশোরের নির্দ্দেশ মত সব দেখছিল হঠাৎ থেমে বিস্মিত হয়ে বললে "—থামলে যে বড়—"

কিশোর নির্ব্বিকার হয়ে বললে "—আরত কিছু এদিকটায় বলবার মত দেখতে পাচ্ছি না।"

পলু স্তম্ভিত হয়। কিশোরের দিকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল "—তবে নিয়ে এলে কেন—চাই না চাই না যেতে আমি, এখুনি গাড়ী ফেরাতে বল, বললে?" তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে, থমু লাল হয়ে ওঠে, যেন বুকে বিষম লেগেছে।

পলুর চীৎকারে সোনিয়া ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে "—কেয়া হুয়া—চিল্লায়া কৌন!—"

কিশোর শান্ত ভাবে পলুর দিকে না চেয়েই উত্তর দিল "—চটে যাবার মত কিছুই করলাম না অথচ শুধু শুধু ঝগড়া কোরছ—ফিরব কোথায় এখান থেকে! এসেই যখন পড়েছ তখন ফেরাটা বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে না। ওই দেখ তোমাদের ছবিতে দেখা কুতব মিনার দেখা যাচ্ছে—এত বড় মনুমেন্ট ভারতে আর কোথাও নেই; ওর ওপর উঠে যমুনাকূলের দিকে তোমায় মহাভারতবর্ষের শাশ্বত রাজধানী ইন্দ্র প্রস্থের বিরাট শ্মশান দেখাই আগে—তারপর ফিরে গিয়ে রাগ টাগ কোরো—" তার কথায় এমন একটা আদেশের ভঙ্গি ছিল যার বিরুদ্ধাচারণ করা পলুর সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়তঃ ওই রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ায় পলুরও বড় লজ্জা করছিল—তাই সে নীরব হয়েই রইল।

সকলের আগে তারা কালকা দেবীর মন্দিরে গেল। সোনিয়া বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—মুসলমান হয়ে সে মন্দিরে যাবে কেমন করে? ওরা যোগমায়ার মন্দির প্রদক্ষিণ করে বাইরে আসতে সোনিয়া পলুকে উদ্দেশ করে বললে "—মুঝে একঠো বাত সোচ রহেথি—! থয়ের একঠো এ্যায়সা মন্দির বানানা চাই জিসমে মুসলমান ভি ঘুসমে পাওনে হমলোগকো মহজিদমে সব কোই আ যা সক্তা—চলিয়ে ভুল ভুলায়েন মসজিদ উওলোকতা হ্যায়—"সে

পথপ্রদর্শকের ধরণে অগ্রসর হতে আর সকলে তার অনুগামী হল।

বৈরাম খাঁর ছেলে আদম খাঁর টুম্ব এটা, সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে সোনিয়া গলি গলি ঘুরতে ঘুরতে সহসা কোনদিকে গেল আর দেখা গেল না, পলু সভয়ে কিশোরের হাত চেপে ধরে বললে "—সোনিয়া কোথায় গেল, এঁ্যা একি রকম গোলক ধাঁধার মত বাড়ী—ডাক ডাক শীগগির ডাক ওকে—"

কিশোর তার হাত ছাড়িয়ে নেবার কিছু মাত্র চেষ্টা না করে, চলতে চলতে বললে "—হ্যাঁ এটা প্রাচ্য দেশীয় ল্যবরিন্থ—সোনিয়ার জন্যে কিছু ভয় নেই সে ঠিক এতক্ষণে আমাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—"

শুনে পলুর ভয় অনেকটা কমে যায়। তবু একটা অবলম্বনের মত কিশোরের হাতটা সে বেশ জোর করেই ধরে রাখে, ছোট মেয়ে মেলা দেখতে যাবার সময় হারিয়ে যাবার ভয়ে যেমন করে বড়দের আঁচল ধরে থাকে। কিশোরের বেশ লাগছিল। এই জনশূন্য নীরব স্থানে একটি নারী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সেই নীরবতাকে যেন আরো পরিস্ফুট আরো মুখর করে তোলে। কিশোর তার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বললে "—তুমি পথে অমন রেগে গেলে কেন পল ?"

পল ? কত কাল—কত কাল তাকে এ নাম কেউ শোনায় নি, এ আদরের নামেত তাকে আর কেউ ডাকে না। পলু আনন্দে শিউরে উঠতে থাকে—কিশোরের গা ঘেঁষে চলতে চলতে পলু বললে "—দূর—তোমার ওপর রাগ কোরব কেন, তোমার ওপর রাগ যে করা যায় না ছাই—"

সহসা পাশের দেয়াল থেকে কলরব তুলে সোনিয়া ছুটে আসে "—কেঁও ঢুঁড়কে নিকালা ?—"

দুজনেই থতমত ভাবে হাত ছেড়ে দেয়। পলুর কথা না হয় বাদ দেওয়া চলে—কিন্তু কিশোরের এই গোপনতা কেন ? সোনিয়ার কাছে লুকোচুরী করা তার মোটেই উচিত নয়, বিশেষতঃ সে যখন কোনো অন্যায় করেনি বা করতে যাচ্ছেও না। কিশোর নিজের ওপর রেগে ওঠে —তার মন এখনো কলুষিত আছে নাকি—পলুকে কি সে এখনো স্নেহ করে ! যদিই করে তাতেই বা দোষ কি—এক কালে ওইত তার সর্ব্বস্ব ছিল ? কিন্তু—কিশোর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে নির্ব্বাক হয়ে চলতে থাকে।

সোনিয়া মনে করলে তার অনুপস্থিতিতে এরা বিরক্ত হয়েছে, একটু মনক্ষুণ্ণ হয়ে বললে "—ভাই সাব নারাজ মৎ হোনা—মেরা কসুর হুয়া—"

পলুও নত মুখে চলছিল, সোনিয়ার ওই কথায় তার বুক উদ্বেল হয়ে ওঠে। কত বড় সরল হৃদয় এই বালিকার তাই—তাই সে কিশোরের মত মুক্ত পাখীকে বাঁধতে পেরেছে, পলু আদর করে বাঁ হাত দিয়ে তার কটি বেষ্টন করে বললে "—দূর পাগলী তোর ওপর যে রাগ করতে পারে—সে দুর্ব্বাসা—"

সোনিয়া আরো ভয় পায় "—দুর্ভাষা—বুরা বাত ? নেই নেই বুরাবাত নেহি বোলেঙ্গি—"

কিশোর প্রাণ খুলে হেসে ওঠে, পলুও তাতে যোগ দেয়।

মেঘ কেটে গেল। সোনিয়া রহস্যটা উপভোগ করে খুশী হয়ে ওঠে। গোলক ধাঁধার বাইরে এসে সে দরজার সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথর দেখিয়ে গল্প সুরু করে দেয়। পাথরের নীচে কত বড় সুড়ঙ্গ আগরা অবধি চলে গেছে, কেমন করে একজন ইংরেজ পর্য্যটক সস্ত্রীক ওর ভেতর ঢুকে গিয়ে আর বেরিয়ে না আসায় সরকার বাহাদুর পাথর দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন ইত্যাদি—"

কিশোর তাড়া দেয়—গল্প পথ চলতে চলতে হোক না হলে দেরী হয়ে যাচ্ছে—

একটু পরেই সকলে কুতব মিনারের পাদদেশে পৌঁছে গেল। আশে পাশে খেলনা ছবি প্রভৃতির দোকান খোলা হয়েছে—বিদেশীরা বেড়াতে এসে কিনবে বলে। সেই খানে চা খেয়ে মিনারের তিনশ উন আশাটা সিঁড়ি বেয়ে তারা তিন জনে একেবারে সর্ব্বোচ্চ বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। সে কি মহান দৃশ্য। দুশ আটত্রিশ ফিট ওপর থেকে ময়দানব রচিত অপূর্ব্ব সভাভূমি দেখবার

সময় মনে যে কি ভাবের উদয় হয় তা যারা দেখেছে—দেখবার মত চোখ এবং মন নিয়ে যারা দেখেছে তারাই জানে। একদিকে হস্তিনাপুর আর একদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ—ইন্দ্রের অমরাবতীকেও নাকি হার মানিয়েছিল। এই খানেই সহস্র-রাজন্য-বর্গের সামনে দুর্য্যোধনের অপমান হয়; তাকে সুযোধন হতে দিলে কই? তাই না কুরুক্ষেত্র মহারণ? তাই না ভারত গ্রন্থের পাতায় পাতায় কেবল রক্ত কেবল হিংসা কেবল অভিমান! যে দিন থেকে এর গঠন হয়েছে সেই দিন থেকে জাতির পর জাতি এসে এই খানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছে—আবার তার সাধ না মিটতেই আর এক জন এসে এর সিংহাসন অধিকার করছে। কিশোর হাত তুলে দেখায়—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছায়ার মত ওই তোগলকাবদ ওই হল দ্বিতীয় দিল্লী—তৃতীয় দিল্লী হচ্ছে আগরা।

পলু বিমুগ্ধ চোখে বায়নাকুলার ঘোরাতে ঘোরাতে বললে "—আশ্চর্য্য কিশোরদা হাজার হাজার বছর ধরে এই স্মৃতি চিহ্ন বুকে করে থাকা স্থান মাহাত্ম্যের পরিচায়ক—"

কিশোর সগর্ব্বে বলে ওঠে "—মাহাত্ম্য স্থানের নয় মাহাত্ম্য মানুষের। এখানে সত্যিকার মানুষ ছিল, ওই দেখ বহু দূরে পৃথ্বিরাজের যজ্ঞশালা, ওই হিন্দু নৃপতির সহস্র কাহিনী বুকে করে এর মাটি ধন্য। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তার নীচের দিকে চেয়ে দেখ ধাতুময় অশোক স্তম্ভ—তার পাশেই পড়ে আছে আলাউদ্দীন খিলজীর অসম্পূর্ণ মিনার—এই হিন্দু মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র—এই অপূর্ব্ব বিদ্যায়তন থেকে কত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার ইতিহাস আজ লুপ্ত হয়ে গেছে—কিন্তু এরা সাহঙ্কারে মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করছে—প্রণাম কর পলু প্রণাম কর—"সে ভাবগম্ভীর হয়ে কার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালে—

কিশোরের এই ভাব প্রবণতায় পলুর হাসি পাচ্ছিল, প্রণাম করবে কাকে! তবু কি মনে করে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বললে "—সুন্দর! শ্মশানের যে এত মাধুর্য্য থাকতে পারে—ধ্বংসের যে এত রূপ আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না, সোনিয়া এইখানে একটা বেহাগ শোনাওত কেমন লাগে দেখা যাক—"

সেই আকাশ চুম্বি স্তম্ভের শিখর থেকে সোনিয়ার সুমললনা লাঞ্ছিত কণ্ঠধ্বনি বায়ু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল

—ইস দুনিয়ামে আপনাই
জিসনে যাঙ্গা উসকে মিলা
স্রেফ রোনেকো বাদসাহী

সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়; সোনিয়ার গানের জন্যেই বোধ হয় অন্ধকার আসতে আসতে থমকে দাঁড়াচ্ছিল—ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ জুড়ে দূরে কাছে একটা অননুভূত নিঃসীম স্তব্ধতা।

কিশোর উদাস ভাবে শুনছিল—গান শেষ হতে বললে "—নাঃ দোষ কাউকে দেওয়া চলে না, মানুষ তার স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বভাবের প্রতিকূলে যুদ্ধ করে কেবল কষ্টই পায়! যেমন আমি পেলুম, কি দরকার ছিল আমার এত সতী হবার? না হয় তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে আমার উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ আর একজনের গলা ধরে ঝুলে পড়া কি বল পলু?"

পলু উত্তর দেয় না—সীমাহীন চোখে মাঠের দিকে চেয়ে বোধ হয় ঠিক সেই রকমই কোনো কথা ভাবছিল।

কিশোর বলতে লাগল "—তোমার ব্যবহারে মনস্তাপ পেয়ে ও রকম উপন্যাসের নায়কের মত দেশ না ছেড়ে এলে বোধ হয় ঘড়ি মিস্ত্রি হয়ে জীবন কাটাতে হতনা। আঃ কত স্বপ্নই দেখেছি ছেলে বেলায়—মানুষ হব! গণ্যমান্য লোক হব আর তুমি হবে আমার সঙ্গিনী, যে দিন সে ভুল ভাঙ্গল সব—যেন, সব যেন কেমন ধোঁয়ার মত হয়ে গেল। ওঃ কি দুঃসহ জীবন গেছে, কত দিবারাত্র অহরহ শুধু তোমার কথাই ভেবেছি—কখনো হাউ হাউ করে কেঁদেছি—কখনো পাগলের মত তোমায় অভিসম্পাত করেছি, আবার কখনো শান্ত হয়ে ভেবেছি এত হয়েই থাকে—আমার এত দুঃখ পাবার কি দরকার তার চেয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে! বেরিয়ে পড়লুম—বৌদি যেদিন শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, "দুমড়ো মিনসে বসে বসে ভায়ের অন্নধ্বংস করতে ঘেন্নাও হয় না" —নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়লুম। তখনো আমার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি লেগেছিল, এই বৌদি প্রথম যখন আসেন তখন আমাদের বাড়ীর মধ্যে আমার সঙ্গেই তাঁর ভাব

হয় সব চেয়ে বেশী; মা বকলে আমার কাছে কাঁদতে আসত—আমি তার হয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করেছি কেন তুমি ওই ছেলে মানুষ বউকে বকবে! মা তেড়ে আসতেন "তোদের মত বেহায়া পুরুষ গলায় দড়ি দেয় না কেনরে—ভাজের হয়ে মার সঙ্গে কোঁদল করতে লজ্জা করেনা?" বিষণ্ণ মুখে ফিরে এলে বৌদি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিত "কেন ভাই তুমি আমার জন্যে বকুনি খেতে যাও" হ্যাঁ সেই বৌদিই ক্রমশঃ এক কাপ চা দিতে হলে হোটেলের রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যাক বেরিয়ে ত পড়লাম আর সঙ্গে করে নিয়ে এলাম নিঃসঙ্গ জীবনের অসহায় অবস্থা; খেতেত পেতেমই না অর্দ্ধেক দিন, মুটে গিরিও করেছি, আবার রোজ তারিখের মজুরী পেলে মাটি কাটতাম খোয়া ভাঙ্গতাম—দৈহিক শক্তিতে যতদূর পারা যায় তা করেছি। মাস ছয়েকের ভেতর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল—এমনি অবস্থায় আজিমগঞ্জে এক বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয় হল—খেতে এবং থাকতে দেবার কড়ারে তাঁর দুটি ছোট ছেলেকে পড়াবার ভার পেলুম। কিন্তু থাকবার যো কি, তাঁর মেয়ে অলকা থাকতে দিলে কই? তাকে ভাল না বাসলেও বিশ্বাস করেছিলুম; আমার বংশ পরিচয় এবং জীবনেতিহাস শুনিয়ে মনের ভার লাঘব করতুম—সেই জন্যেই হোক বা আর কোনো কারণেই হোক সে আমায় ভাল বাসে ফেল্লে—কাজেই একদা নিশীথ রাত্রে আবার অনির্দ্দিষ্ট পথে চলা সুরু হল—

দিল্লী এসে পড়লুম। অলকাদের বাড়ী বছর দুই কাটিয়ে অভ্যাসটা এমন খারাপ হয়ে গেছল যে কায়িক পরিশ্রমে আর অন্নসংস্থান করতে পারছিলুম না। প্রথম দুদিন ধর্ম্মশালাতে কাটিয়ে তৃতীয় দিনে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে উঠলুম, তোমরা সে জ্বালা বুঝতে পারবে না—নিরুপায়ের জঠরাগ্নি সময় বুঝে যেন প্রতিশোধ নেবার মত করে জ্বলে ওঠে; ভাবলুম শেষে কি ভিক্ষে করতে হবে আমায়! এক পেশওয়ারী ভদ্রলোক আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললে "নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আস্তানায় পড়ে থাকগে, লোকের মুরদ (মানৎ) থাকলে সেখানে সেরমন খাবার ধরে এমন একটি "এক পথরকা কাটোরা' ভর্ত্তি করে কোনো দিন দুধ কোনোদিন হালুয়া গরীবকে বিতরণ করা হয়।" হাঁটতে হাঁটতে ওই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মুক্ত পুরুষ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হলুম। মসজেদের চাঁদোয়ার মাঝখানে আলাউদ্দিন খিলজীর তৈরী মস্বর বা সোনেকা কাটোরা ঝুলছে; সারি সারি উটপাখীর ডিম টাঙ্গানো রয়েছে, আমি পীরের প্রসাদ সাদা বাতাসা আর জল খেয়ে সেইখানেই ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গল চার দিন পরে—শুনলাম বিষম জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখে মোল্লা সাহেব তুলে এনে এই খোড়ো চালে শুইয়ে রেখে গেছেন, তিনি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনে বল্লেন 'রহ যা বেট তুমহারা বন্দবস্ত হো যাগা'—কিছুদিন সেইখানে প্রসাদ পেয়ে পেয়ে গায়ে একটু শক্তি পেলুম। সর্ব্বদাই মন হু হু কোরত তাই কখনো কখনো পথে বেরিয়ে পড়তুম। একদিন রাত্রে এমনি ঘুরতে ঘুরতে লোদি রোড বরাবর এসেছি হঠাৎ চাঁদের আলোয় দেখলুম কিছু দূরে একজন টঙ্গাওয়ালা জোর করে একটি যুবতীকে টঙ্গা থেকে নামিয়ে মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটতে ছুটতে তার পিছনে গিয়ে মাথায় উপর্য্যুপরি ঘা তিনেক লাগাতেই সে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েটি তখন ভয়ে আধমরা হয়ে গেছল—আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাত ধরে আমার আস্তানায় নিয়ে এলুম। শুনলুম সে এইখানেই পীরের কাছে মুরাদ জানাতে আসছিল—সোজা রাস্তা মেরামত হচ্ছে বলে ঘুরিয়ে এনে এত রাত করে তারপর—

সে আর বলতে পারলে না—জানুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ভাবিত হয়ে পড়লুম, কি করা যায় এখন ত সকলেই ঘুমুচ্ছে আর অন্য কাউকে ডেকেই বা কি হবে? তারাওত আমারই মত কাছাখোলার দল। কুণ্ঠিতভাবে তাকে অসুবিধাটা নিবেদন করে বল্লুম 'আমি না হয় বাইরে কোথাও কাছেই শুয়ে থাকছি তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমোও—কাল সকালে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দোব—"

অত্যন্ত ভীত হয়ে সে আমার হাত চেপে ধরে বললে

'—আপনি আমার ভাই—ঘরে থাকলে কোনো দোষ হবে না, এখানে একলা কি করে থাকব ?…' ওর চোখে যে বিশ্বাস আর কাতরতা দেখলুম তাকে উপেক্ষা করতে প্রবৃত্তি হল না। নিজের খাবার থেকে তাকে কিছু খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লুম।

নিশীথ রাত্রে চিরঅনভ্যস্ত আমি সেই কিশোরীর সান্নিধ্যে কেমন একটা আত্মতৃপ্তি কেমন একটা সম্পূর্ণতার আস্বাদ পেলুম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙল তখন বোধ হয় রাত তিনটে হবে—চারিদিক ঝম ঝম করছে, মসজিদের গম্বুজে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে নির্জ্জনতা যেন আরো গভীর করে তুলেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম একহাত ব্যবধানে আমার চ্যাটাইটার এক ধারে মেয়েটি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—পরম নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছে। শুভ্র ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম উঠে মুখখানাকে যেন আরো কমনীয় করে তুলেছে, কতই বা বয়স হবে ওর সতেরো আঠারোর বেশী নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু ওর মুখখানা বয়সের চেয়ে অনেক কচি। উঠে বসলুম। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ আমার ভেতরে জেগে উঠল এক দেবতা—সত্য সুন্দর দেবতা! সত্যি বলছি পলু সেই জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে ভুলে গেলুম তোমার ছলনা—ভুলে গেলুম স্বজনের হিংসা; দিনের পর দিন রাতের পর রাত যা ভেবে ভেবে পাগল হতে বসে ছিলুম—নিদারুণ যন্ত্রণায় বুকটা দুহাতে পিষে ফেলতুম; সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে হল ওর ওই সুকুমার দেহখানা বুকে চেপে ধরলে এখুনি সব জ্বালা শীতল হয়ে যায়, ওর ওই ঠাণ্ডা গালের ওপর গালখানা পেতে দিতে পারলে আমি যেন শান্তি পাই—হঠাৎ বিছে কামড়ালে যেমন হয় তেমনি ভাবে চমকে উঠলাম। একি আমার মনে কি তৃষ্ণা জেগে উঠল—সর্ব্বনাশ! একি ভাবছি আমি—পরক্ষণেই অন্তর দেবতা আমায় বলে দিলে, না না এ আমার বড় আপনার—তা যদি না হত তা হলে ও কখনো অপরিচিত পুরুষ, ভিন্নদেশীয় পুরুষের কাছে এত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারে? আঃ সেকি প্রশান্তি—আমার ছন্নছাড়া জীবনে ক্ষণেকের সম্প্রদানে যে এত মধু ঢেলে দিতে পারে সে আমার কে? তাকে কি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় হ্যাঁ একে বোনটি বলেই মনে করতে ইচ্ছে হয়—ছোট্ট বোনটি—ভারী মিষ্টি লাগেত মনে করতে, আমার বোনটি! আমি সন্তর্পণে ওর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে সে জেগে উঠল। প্রথমটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তারপর ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠে। একটু ভয় করেছিল কিনা বলা শক্ত—কিন্তু ভয় হলেও সে ওঠেনি—অসহায়া বালিকা কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি তাকে হাওয়া করতে করতে মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম "—বহিন—" অনেকক্ষণ ধরে সে আমায় দেখতে লাগল—কি দেখছিল তা জানি না তবে ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল—শান্ত স্নিগ্ধ হাসি। সে আস্তে আস্তে আমার কোলে তার সুগোল নরম হাতখানা তুলে দিয়ে চোখ বোজে—সারারাত সেই হাতখানা কোলে করে বসে রইলুম। ভিক্ষুক একসঙ্গে অনেক ধনরত্ন পেলে যেমন হারাবার ভয়ে দিবারাত্র সেটা আঁকড়ে ধরে রাখে—তেমনি করে সেই মেয়ের মত নরম ধবধবে হাতখানি নিয়ে আমি বিনিদ্র চোখে রাত কাটিয়ে দিলুম। সে কি সুখ সে কি প্রশান্তিতে আমার মন ভরে গেল তা বোঝাতে পারব না। সকালে মোল্লা সাহেবের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে সব বল্লুম—তিনি আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে হাসলেন "—ইয়া খোদা—মিল গিয়া? লেকিন বহুৎ হুঁসিয়ার রহনা বেটা—" তিনি দুই হাতে মেয়েটির মুখ তুলে ধরে দেখতে দেখতে কি সব বিড় বিড় করে বল্লেন, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে ফিরে বল্লেন "—বাচ্চা তুমনে আসলি আদমি হ্যায়—যো কৌম নেহি মানতা উসকো দিল বহুৎ দরাজ হো জাতি; তুমনে ইয়ে ফকিরকে মাজারকো তাজিম রাখ্যা—যাও বাচ্চা অব তুমহারা কোই মুশিবৎ নেহি—" বলে আত্মসমাহিতের মতন চোখ বুজে উদার কণ্ঠে সুর তুললেন "—আস্‌হাদু আল্লালা ইলাহা ইল্লালা—" কিশোর পরিশ্রান্তের মত চুপ করলে।

অত্যন্ত অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে পলু বললে "তার পর সোনিয়া আর তোমায় ছাড়লেনা বুঝি?" তার কথার ধরণে মনে

হল যেন না ছাড়াটা মস্ত অপরাধ হয়েছে। কিশোর আবার তার স্ব-সত্ত্বায় ফিরে আসে। দুই হাতে সোনিয়া'র মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে বিগলিত কণ্ঠে বললে "তাই বটে—কিন্তু ছেড়ে দিলেও আমি যেতে চাইতুম কিনা বলা বড় শক্ত। আমি হিন্দু এবং বাঙ্গালী ও মুসলমান এবং পাঞ্জাবী এই দুস্তর ব্যবধান কত শীঘ্র এবং কত সহজে ছাড়িয়ে আমরা পরস্পর এমন ভাবে মিলে গেলুম যে ওর স্বামী ইব্রাহিম বিস্মিত হয়ে উঠল; কিন্তু এতটুকু ওর ঈর্ষা হয়নি, সোনিয়া যে আমায় এত ভাল বাসে ইব্রাহিম তাতে যেন আর খুশী হয়। কত বড় মহাপ্রাণ লোক বলত পলু—কে পারে? এমন করে নিজের স্ত্রীকে অপর পুরুষের হাতে কে পারে ছেড়ে দিতে। ভাই বোন পাতান হলেই যে তারা ভাই বোন হয়না তাত সকলেই জানে, এই যে সব অমুকদা অমুকদা পাতাও কজন তাদের ভেতর ভাই আছে? আর অতদূর যাবারই বা দরকার কি, হ্যাঁ এদিক থেকে ইব্রাহিম যথেষ্ট সাহস এবং সহৃ-মনের পরিচয় দিয়েছে—সে সাহায্য না করলে আমাদের দুজনের এই সম্বন্ধ এত নিবিড় হয়ে উঠত না—"

সোনিয়া স্নেহ ব্যাকুল স্বরে ডাকে "—ভাই সাব।" এতদিন পরে কিশোরের এই ভাবান্তরে সে বুঝতে পেরে ছিল কিশোরের জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কে পলুই প্রধান অভিনেত্রী ছিল।

সজল চোখে পলু দেখে। অতীত জীবনের ব্যথার কালিমার কোনো চিহ্নই আর তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। আনন্দ উজ্জ্বল বাসন্তী পূর্ণিমায় যেমন সহজ অন্ধকারও নিজেকে হারিয়ে ফেলে লুকিয়ে ফেলে, দীর্ঘ উপবাসী প্রচুর খেয়ে উঠলে তার মুখের প্রতিটি রেখাতে যেমন তৃপ্তির লাবণ্য ঝলমল করে ওঠে, এদের মন থেকে দৈন্যের সমস্ত চিহ্নই মুছে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ত সুষমার আলো উৎসারিত হয়।

অন্ধকার হয়ে গেছল, কিশোর টর্চটা জেলে মিনারের সিঁড়ি দিয়ে সকলের আগে নামতে নামতে বললে "—জানলে পলু প্রথমে মনে করেছিলুম তোমায় খুব বকব, পরে ভেবে দেখলুম তুমি না তাড়িয়ে দিলেত আমি এ সম্পদের অধিকারী হতুম না, এ জিনিষ যে সম্ভব হয় তা জানতুম না—আমার মনে চিরকাল আক্ষেপ থেকে যেত নারীমাত্রেই অবিশ্বাসিনী অন্তত সকলেই হৃদয়হীনা।"

পলু একরকম অদ্ভুৎ স্বরে বলে "—ভাই বোন হওয়া আর স্বামী স্ত্রী হওয়ায় একটু তফাৎ আছে কিশোরদা। তুমি আমার ভাই হতে চাইলে—আমি সোনিয়ার চেয়ে কম যেতুম কিনা কেমন করে জানলে? তুমি যা চেয়েছিল তাত এখনো পাওনি কিশোরদা কেমন করে এর মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে এসে পড়লে স্ত্রীলোক মাত্রেই কি? আগে একটা বিয়ে কর অন্তত: তার চেষ্টা কর—তবেত।"

কিশোর গম্ভীর হয়ে বললে "হুঁ!" সে বুঝতে পেরেছিল, নারীর স্বভাবজ ঈর্ষা পলুর মনে ধূমায়িত হয়ে উঠছে। সোনিয়ার অসামান্য ভাব সম্পদ সে অস্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছে। তাই একটু গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে "—চার বছর আগে তোমার এ যুক্তি ছিল না পলু—তবে জেনে রাখ আমি শুধু এইটুকু জেনেই তৃপ্ত যে নারী জাতির মধ্যে সোনিয়া আছে—আর কিছু জানতে চাইনা —ওঠ টঙ্গায় ওঠ— কা হো শো গয়া?—" টঙ্গা ওয়ালার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সবাই উঠে বসল।

নিঃস্তব্ধ পুরাতন দিল্লীর জনশূন্য পথে ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে টঙ্গা ছুটে চলে। পথে তাদের আর কোনো কথাই হল না। আর কি কথাই বা হবে? তাদের সমস্ত কথাইত ফুরিয়ে গেল—অন্তত পলু এবং কিশোরের মধ্যে আর কোনো কথা না থাকাই উচিত।

× + + +

ডাউন দিল্লী একস্প্রেস ছাড়তে আর দুমিনিট দেরী আছে। অনুপম মামুলী কায়দায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললে "—খুব অত্যাচার করে গেলুম এসে…"

কিশোর মিষ্টিকরে হেসে জবাব দিল "—হ্যাঁ এ পক্ষের অত্যাচার আর সহ্য হল না বলেই না পালাচ্ছেন… কিন্তু আমরা মানে, ধরুন সোনিয়াকে নিয়ে একদিন

আপনাদের ওখানে উদয় হলুম, অত্যাচারটা তাহলে বেশ মানান সই হয়…কি বল পলু ?…"

পলু সাগ্রহে ট্রেণের জানলা থেকে কিশোরের কথা-গুলো শুনছিল, এই বার একেবারে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল "—যাবে কিশোরদা সত্যি যাবে ?…"

কিশোর ব্যস্ত হয়ে বললে "—আরে ওঠ ওঠ ওঠ এখুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে…"

"না—আগে তুমি বল—বল না—" পলু যেন আব্দেরে খুকী হয়ে উঠল।

কিশোর কৌতুক করে বললে "—তা হলে কি হয় পলু ? আমি যদি ফের বাড়ী ফিরে যাই…"

"—তাহলে ?" পলুর চোখে কি যেন আবেশ ঘনিয়ে আসে—"তাহলে গত জীবনের একটা প্রকাণ্ড ভুল বড় সুন্দর ক'রেই শোধরাতে পারি…"

প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল। কিশোর পলুকে ধরে গাড়ীতে এক রকম জোর করে তুলে দিয়ে তার কানে কানে বললে"—শুনে লোভ হচ্ছে—কিন্তু—কিন্তু সোনিয়ার কাছে অবিশ্বাসী হতে পারব না পল…"গাড়ী চলতে সুরু করে দেয়।

পলু জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে "—একটা কথার জবাব দিয়ে যাও কিশোর দা,—যদি কখনো তোমাকে সোনিয়ার কাছ ছাড়া হতে হয়—তখন ?…"

কিশোর চেঁচিয়ে উত্তর দিলে "—তোমার কাছেই যাব—"

মনে কি পড়ে ?

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

মনে কি পড়ে বঁধু, শতেক মধুবাণী
সে মধু যামিনীর ?
কি কথা বলেছিল তাহারে কানে কানে
স্তব্ধ নদীতীর ?
মনে কি পড়ে সখা, নদীর কূলে দেখা,
রূপসী তরুণীরে ?
জান কি নিষ্ঠুর, কত সে ব্যথাতুর
আজি সে আঁখি ঝরে ?
তাহার হাসি গান লভেছে নির্ব্বাণ
তোমার আঁখি কূলে,
আজি কি তুমি আর, সোহাগে পুন তারে
ধরিবে বুকে তুলে ?
তোমার মোহজাল গিয়াছে কেটে আজ
চাহনা তারে আর,
সঁপিল তোমারে সে, সরল হিয়াখানি
বুঝ কি ব্যথা তার ?
তোমার খেলা শুধু, তাহার প্রাণ লয়ে
একি সে টানাটানি
জান কি কত কথা মিথ্যা কত গাথা
হ'তেছে কানাকানি ?
হৃদয় লয়ে কেন, এ খেলা খেলেছিলে,
নিঠুর প্রাণনাথ
নিমেষে নিলে কেড়ে আঁখির সব আলো
প্রাণের সব সাধ ?
দুঃখ নাহি তাতে সে যে গো বেদনাতে,
তোমারে স্মরে নিতি,
স্মৃতির পূজাটুকু লয়োনা কেড়ে ওগো
(সে) চাহেনা স্নেহ-প্রীতি।

আমি

শ্রীগিরিবালা রায়

ওগো, আমি,—

তোমায় নিয়ে কি করলুম? যখন তোমায় পেয়েছিলুম—হৃদয়ের কুঞ্জবনে—তখন শুধু বুক ফাটা বেদনাই ছিল আমার অদৃষ্টের দান। বিধাতা এ জীবনটাকে শুধু বিড়ম্বনার সূত্রেই গেঁথেছিলেন।

জীবনের সচেতন ক্ষেত্রের প্রতি যখন নূতন দৃষ্টিপাত করেছিলুম—কি দেখেছিলুম? খালি ধূ ধূ মরুভূমি! দিনের পর দিন—আমি, ওগো আমি যখন তোমায় নিয়ে কাটাচ্ছিলুম—খেই হারিয়ে কি বসিনি? তোমায় আনন্দ দেবার জন্যে এ জীবন মরুতে ওয়েসিসের সন্ধানে কি পাগল হইনি? কি ফল—ওগো, কি ফল হ'লো তা'তে?

আমি, ওগো আমার সবচেয়ে প্রিয় আমি, আমি—তোমাকেই তো ভালবাসি!—তাই তো সে দেখা দিয়েচে—আমিই তো তা'কে ডেকে এনেছি—যে তোমায় আরো অসহায় করেচে—যে সত্যের সন্ধানে আপনহারাকে আরো দিশেহারা করেচে।

দস্যিতের বেশে নিষ্ঠুর সে যে, তবু—তবু তো তারই প্রতীক্ষা। তোমায় যে আমি দান করেছি সর্ব্বহারা করে—নিঃসঙ্গের সঙ্গলাভের জন্যে। এ যে বড় নিষ্ঠুর সত্য! কিন্তু জান? তবু আমি সুখী, তোমায় একান্তে বিকিয়ে দিয়ে আমার আজ বড় আনন্দ!

মানুষের—নির্ম্মম সৃষ্টি—ঐ সমাজ!

যে আগুনে হাত দেয় সে পুড়ে মরেছে, যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়—ডুবে মরেছে—রত্নের সন্ধান কয় জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে?

দুর্ভাগার রত্নমালা ছিন্নসূত্রেই গাঁথা হয়—বস্তু-জগতের এই যে নিয়ম।

মূর্খ আমি, তবু বাতায়নে? আজ মেঘলা দিনের বাদল হাওয়া আরো কাদাল করেচে? অসহায়ত্বের সীমাহীন বোঝা—আরো ভারি হয়েচে—কার প্রতীক্ষায়? সে যে দৈত্যের মতো তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেচে—রিক্ত করেচে তোমায় সকল সম্পদ হতে, শুধু জুড়ে দিয়েচে আরো অনেক খানি বেদনার বোঝা তোমার অন্তহীন বেদনার সাথে! এইতো তোমার প্রাপ্তি!! তবু তুমি তাকেই চাইছ—? প্রকৃতির রীতি—দুর্ব্বার, অমোঘ!

দিন যায় রাত আসে, অন্তহীন আশা তোমায় বাঁচিয়ে রাখে ঐ অভিসারের মোহে।

তাই তো বল্‌ছি আমি, মানুষ যে চায় দুঃখ! সব চেয়ে দুঃখকেই তারা ভালবাসে। তাই আদর করে বরণ করে নিয়ে আসে তাকে। ভালবাসার দান দুঃখ আর তার সমাপ্তি কান্না! তা'তে কারুর কিছু এসে যায় না! পর্ব্বত গাত্রে ধাক্কা খেয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করে এ স্বাভাবিক গতিই তার পরিণতি। আর মানুষের জীবন কঠোর নির্ম্মমতার ঘাত প্রতিঘাতে ভেসে যায় এই তার চরম সত্য!

আঁখি বেয়ে বারি ঝরে

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

১

জানি আসিবে না, শুধু ছল্ তব,
তবু চঞ্চল মন;
পথ পানে চেয়ে স্পন্দন হীন
ছল ছল দু'নয়ন!
প্রভাত রবির পথ চলা, হায়,
ফুরাইয়া আসে গোধূলি বেলায়,
সন্ধ্যা বধূর শিঞ্জিনী বাজে
মুখরি' কুঞ্জ বন;
পথ পানে চেয়ে ভিজে উঠে মোর
অভিমানী দু'নয়ন!

২

কালো যমুনার তীরে আসে যবে
জ্যোছনা সিনান লাগি'—
ব্যাকুলা চকোরী চলে অভিসারে
পিতম দরশ মাগি'।
অলি পরশনে দোপাটী বধূর
তৃষিত অধরে লালিমা মধুর,
সুপ্ত কামনা অন্তরে তা'র
অকারণে উঠে জাগি'।
বল্লরী-ভুজ বন্ধনে চখা,
প্রিয়তমা অনুরাগী।

৩

পেয়ারা পাতার বুক উঠে দুলে
মরুত কি কহে যায়!
লজ্জাবতীর শঙ্কিত হৃদে
সঙ্কোচ গুমরায়।
তাজমহলের মর্ম্মর তলে
মহীয়সী "তাজ" ভাসে আঁখি-জলে,
উদয় অচলে পরভাতে নিশা
পথ খুঁজে নাহি পায়।
মদির স্বপন নয়নে আমার
পাখী ডাকে টুটে যায়!

৪

অচিন্ পথিকে ডেকেছিলে যবে
অসীম মমতা ভরে,
মরুপথে তার ফুটেছিল ফুল
মল্লিকা থরে থরে।
পূজারী তোমার মুক্ত দেউলে
নিত্য এনেছে যে কুসুম তুলে,
অঞ্জলি তুমি নিয়েছ পুলকে
প্রসারিত দুটী করে।
শূন্য দেউলে আজি যে একলা
আঁখি বেয়ে বারি ঝরে।

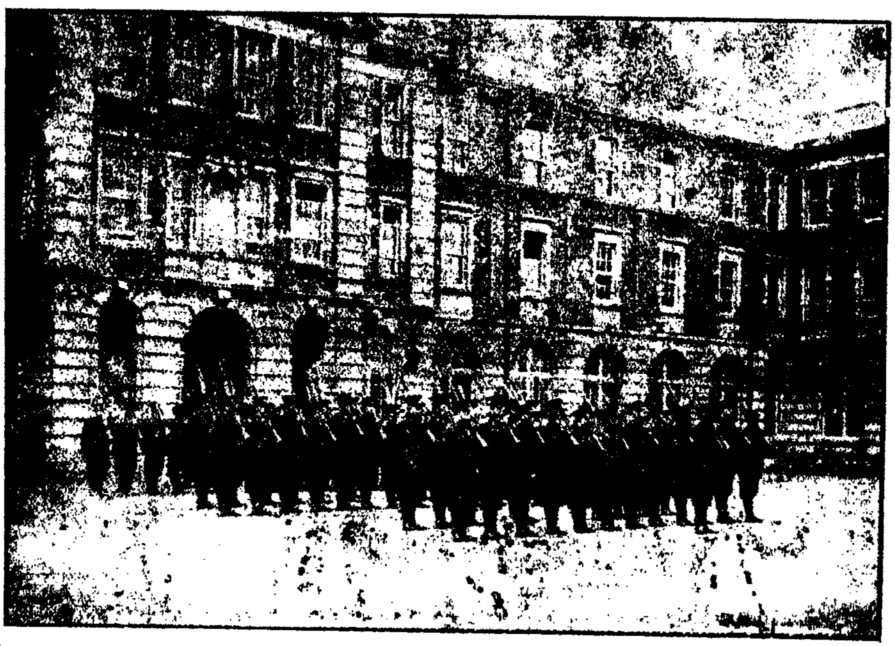


কলিকাতা—কলেজ স্কোয়ারের একটী দৃশ্য

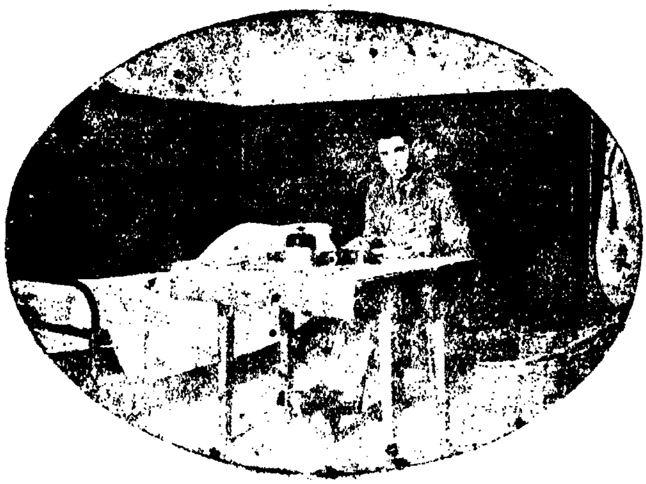


পল্লী-পুষ্করিনীর একটী দৃশ্য

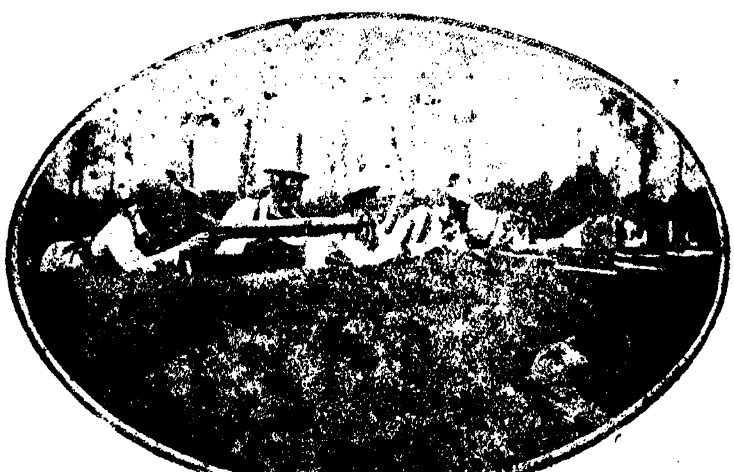
বিলাতে সামরিক বিদ্যালয়



সামরিক বিদ্যালয়—স্যাণ্ডহার্ষ্ট, ইংলণ্ড
(ভারতীয়েরাও এই বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়া থাকেন)



সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বাস-কক্ষ



শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যভেদ শিক্ষা
(একজন ভারতীয় ছাত্রও এইদলে রহিয়াছেন)



স্বর্ণ-মন্দির—অমৃতসর



ভূমিকম্পের দৃশ্য—জাপান

একরাত্রি

গল্প

শ্রীপ্রভাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(এক)

পুরা জীবন কাব্যখানি বিস্মৃত হইলেও হয়তো তাহার কয়েকটী পাতা লোকে ভুলিতে পারে না কিছুতেই। আজ পথ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই কথাটাই ভাবিতেছি।......

নিশুতি রাত্রি। পোষা পাখীটার আর্ত্ত চীৎকারে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল বুঝি সেটা কোন কিছুর আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া খাঁচার ভিতর ঝট্ পট্ করিয়া কহিতেছে—'রক্ষা কর ওগো রক্ষা কর।'

জানালা দিয়া একবার বাহিরে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। বারান্দা হইতে উঠানের কতকাংশ আমগাছের ছায়ায় অন্ধকার—কিছুই দেখা গেল না। তবু মনে হইল যেন কোন প্রাণীর অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

পাশে স্বামী ঘুমাইতেছিলেন। ডাকিলাম 'ওগো।' সাড়া পাইলাম না। গায়ে হাত দিয়া পুনরায় ডাকিলাম, 'ওগো শুনছো'? তবুও সাড়া নাই। সেদিন শনিবার বুঝিলাম ভাঙের নেশাটা অতিরিক্ত হইয়াছে—সহজে সাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। সাড়া পাইলেও সাহায্য পাইবার আশা দুরাশা মাত্র।

পাখীটা পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল।

প্রদীপটা জ্বালাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু বালিশের পাশে দেশালাইটা খুঁজিয়া পাইলাম না কিছুতেই। অন্ধকারে বিছানা ছাড়িয়া দরজার কাছে উঠিয়া আসিলাম। খিল খুলিতে গিয়া এক অজানা আশঙ্কায় গাটা কেমন যেন ছম ছম করিয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিলাম পাখীটা চুপ করিয়াছে—কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

শয্যায় ফিরিব কি না ভাবিতেছি—হঠাৎ পাখীটা পুনরায় ঝট্ পট্ করিয়া উঠিল। সাথে সাথে স্পষ্ট বিড়ালের মিয়াও শব্দ। বুঝিলাম কোন অতি লোভী বিড়াল দস্যু নির্জ্জনতার সুযোগ পাইয়া খাঁচা শুদ্ধ ময়না পাখীটাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। তারপর বিড়ালটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে দূর দূর করিতে করিতে বারান্দার অপর প্রান্তে ময়নার খাঁচাটার দিকে অগ্রসর হইলাম।

পিছন হইতে সহসা কে যেন দুই হাতে সবলে মুখ চাপিয়া ধরিল। আর একজন ধরিল দুই হাত, আর একজন দুই পা। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে শূন্যে তুলিয়া উঠানে লইয়া আসিল, তারপর কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে লাগিল।

সহসা আক্রান্ত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। এইবার নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু বাঁধন ভেদ করিয়া কোন স্বরই বাহির হইল না। সবলে হাত পা ছুড়িলাম, কিন্তু তাহাও নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। দুর্বৃত্তেরা আমাকে নাগ পাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু অন্ধকারে চিনিতে পারিলাম না কাহাকেও। চিনিতে না পারিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম স্বেচ্ছায় ফাঁদে পা দিয়াছি—পাখীর চীৎকার ও বিড়ালের রব শুধু আমাকে ধরিবারই কৌশল। বুকের ভিতর হৃদয়টা খাঁচার পাখীর মতই মাথা খুড়িয়া মরিতে লাগিল।

বাড়ীর পিছনে আম কাঁঠালের বাগান—খিড়কী দিয়া যাওয়া যায়। শুষ্ক পাতার মর্ম্মর শব্দে বুঝিলাম পায়ণ্ডেরা আমাকে সেই পথে লইয়া চলিয়াছে। বাগান পার হইয়া তাহারা একটু থামিল। তারপর আমাকে বাঁশ ও কাপড় দিয়া ঘেরা একটি কোন কিছুর মধ্যে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনুমানে বুঝিলাম সেটা ডুলি। হাত পা ছুঁড়িবার একবার শেষ চেষ্টা করিলাম সে শুধু

সাপের বদলে ব্যাং এর নিস্ফল ধড়ফড়ানির মত। আমাকে তাহারা জোর করিয়া বসাইয়া ডুলির সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—আর বিন্দু মাত্র নড়িবার ক্ষমতাও রহিল না।

চোখের বাঁধনটা কি জানি কি করিয়া অল্প সরিয়া গিয়াছিল। চাহিয়া দেখিলাম লোকগুলি কাছে দাঁড়াইয়া এক ভদ্রবেশী যুবকের সহিত মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছে। অদূরের গাছের ফাঁক দিয়া পঞ্চমীর এক ঝলক ফিকে জ্যোৎস্না আসিয়া যুবকের মুখে পড়িয়াছিল। সভয়ে চিনিলাম সে মনসুর আলি। মুখে তাহার তখন পিশাচের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মনসুর জিজ্ঞাসা করিল, ভালকরে বেঁধেছিস তো?

দস্যুরা কহিল হ্যাঁ হুজুর, নড়বার যো নেই।

'তাহলে এবার চট পট সোয়ারী নিয়ে চল—পৌঁছে দিলেই পুরো বকশিশ পাবি। ঐযে এদিকটা খোলা রয়েছে রে—ঢেকে দে ব্যাটারা ভাল কোরে। আচ্ছা দাঁড়া, আমিই দিচ্ছি।'

মনসুর কাছে আসিয়া বসিল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এইযে চেয়ে রয়েছ তুমি! দেখতে পেলে চলবে না তো! দাঁড়াও, ভাল কোরে বেঁধে দি।

তারপর চোখের বাঁধনটা শক্ত করিতে করিতে বলিল, তোমার খুব কষ্ট হোচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি উপায় নেই। যদি নিজে থেকে আসতে চাইতে তা হলে আর এমন কষ্ট দিতে হতো না। যাহোক করে দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দাও তারপর খুলে দোবো।

ইচ্ছা হইতেছিল সেই নরপশুর মুখে পদাঘাত করি। কিন্তু মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করিবার উপায় ছিলনা।

গ্রামের এক তালুকদারের পুত্র এই মনসুর আলি। আমার উপর তাহার প্রথম সুদৃষ্টি পড়ে মাসখানেক আগে। বৈকালে রান্নার আয়োজন করিতেছিলাম। রান্নাঘরের প্রায় গা ঘেসিয়া একটা সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কিছু দূরে বড় রাস্তায় গিয়া মিশিয়াছে। হঠাৎ বাহিরে দৃষ্টি পড়িতে দেখি—এই যুবক জানালার অদূরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। চোখে চোখ পড়িতে সে মৃদু হাসিল—মাথায় কাপড় টানিয়া চকিতে সরিয়া আসিলাম।

পরদিন আবার দেখা। আবার সেই মৃদু হাসি।

স্বামীর কাছে নালিশ করিলাম। সমস্ত শুনিয়া স্বামী কহিলেন, "কি রকম বোলে? শ্যামবর্ণ—দশ আনা ছ আনা চুল কাটা ফুল বাবুটী? বুঝেছি, ও আবদুলের ছেলে মনসুর। ছোঁড়া ভারী বয়াটে। তুমি জানলার কাছে যেয়োনা আর। জানালাটা ভেজিয়ে রেখো বরং।"

কহিলাম, "এর বিহিত কোরবেনা কিছু?"

স্বামী বলিলেন, "আর কি বিহিত কোরবো গো? লোকের পথ চলাও বন্ধ করা যায়না—চোখও বেঁধে দেওয়া যায় না।"

ফিরিয়া আসিলাম এবং পরদিন হইতে স্বামীর আদেশ মত জানালাটা ভেজাইয়া রাখিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন মনসুরের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ভাবিলাম আপদ গিয়াছে। কিন্তু আপদ যে যায় নাই বরং লাগিয়াই আছে তাহা টের পাইলাম পাঁচ ছয় দিন পরে।

সন্ধ্যার পর উনানে রান্না চাপাইয়া বসিয়া আছি, পাশের জানালাটায় খুট্ করিয়া একটু আওয়াজ হইল। চাহিয়া দেখিলাম জানালাটা একটুখানি ফাঁক হইয়াছে। বুঝিলাম, বাতাস নয়—সেই বয়াটে ছোঁড়াটা। আরও কয়েকদিন অমন শব্দ শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তেমন লক্ষ্য করি নাই।

কি করা উচিত ভাবিতেছি হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়া একখানা খামে আটা চিঠি গায়ে আসিয়া পড়িল। এত রাগ হইয়া গেল যে বলিবার নয়। এই হতভাগা ছোঁড়া ভাবিয়াছে কি? বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলাম। তারপর উঠিয়া গিয়া সশব্দে জানালাটা খুলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু মনসুরের দেখা পাওয়া গেলনা। বুঝিলাম সে তাহার মনের কথা আমাকে জানিবার সুযোগ দিয়া সেদিনকার মত সরিয়া পড়িয়াছে।

খামখানা খুলিয়া পড়িলাম—অশ্রাব্য। সোজা স্বামীর ঘরে গিয়া চিঠিটা তাহার সামনে রাখিয়া কহিলাম, "এই

দেখো সেই ছোঁড়াটার কীর্ত্তি। তুমি যদি এর বিহিত না করোতো ভয়ানক ঝগড়া কোর্‌বো।"

স্বামী খানকয়েক সংস্কৃত পুঁথি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া কহিলেন "কি হোয়েছে গো? ঝগড়া কিসের?"

খামখানা ইসারায় দেখাইয়া কহিলাম "পড়ে দেখো।"

চিঠিটা পড়িয়া স্বামীর মুখ গম্ভীর হইল। সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "তা তুমি আমায় কি কোরতে বল?"

বলিলাম, "এর বাপকে বল ছেলেকে শাসনে রাখতে। আর তাতে যদি কোন ফল হবেনা মনে কর, তবে চিঠিটা নিয়ে কাল সকালে থানায় যাও।"

স্বামী জিব কামড়াইয়া বলিলেন, "বল কিগো! সর্ব্বনাশ! এ কেলেঙ্কারি লোক্‌কে জানালে আর রক্ষে নাই। তার চেয়ে চেপে যাওয়াই ভাল।"

কহিলাম, "কিন্তু চেপে গেলেই যে প্রশ্রয় পাবে বেশী?"

স্বামী কহিলেন "তাই বলে আমি তোমার জন্যে তো সমাজচ্যুত হোতে পারবো না।"

স্তব্ধ হইয়া গেলাম। এই সমাজ! দোষীর শাস্তি বিধান না করিয়া প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়াটাই কি পদ্ধতি?

স্বামী কহিলেন, "এবার থেকে জানালাটায় ছিট্‌কিনি দিয়ে রেখো। আর দুপুরে আমি যখন থাক্‌বোনা, তখন সদর দোর আটকে রেখো ভাল কোরে।"

চলিয়া আসিলাম। কিন্তু যুবকটীকে একটু শাসন করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পরদিন সন্ধ্যায় ও জানালাটা ভেজানোই ছিল। চট্ করিয়া শব্দ হইতেই বুঝিলাম আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া জানালাটা খুলিয়া ফেলিলাম। মনসুর আলি চট করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় ভয় হইয়াছিল কি জানি যদি গরম ফেন বা অন্য কিছু গায়ে ফেলিয়া দি! লোকটা শুধু পাপী নয়, কাপুরুষও বটে! মনে মনে হাসিলাম—ঘৃণার হাস।

মৃদুস্বরে ডাকিলাম "শুনুন।"

মনসুর হাসিমুখে নিকটস্থ হইল।

কহিলাম, চিঠিখানা আপনি লিখে ছিলেন?

মনসুর বলিল, হ্যা।

আপনি বিয়ে করেননি এখনো?

মনসুর কহিল, না। তুমি যদি রাজি হও তাহলে—কথাটা শেষ না করিয়াই সে হাসিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল সে যেন ফোর্ট উইলিয়ম দখল করিয়া বসিয়াছে!

কহিলাম, আপনার মা বোন নেই?

মনসুর সবিস্ময়ে কহিল কেন বলতো?

মেয়েদের শুধু কুভাবেই ভাবতে শিখেছেন, মা বোন হিসেবে ভাবতে শেখেননি দেখছি। লেখাপড়া শিখেছেন এমন হীন চরিত্র কেন?—ছিঃ।

মনসুর চুপ করিয়া রহিল।

কহিলাম, "কি তবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে? দূর হোয়ে যান্. আর এপথ মাড়াবেন না কখনো। এই নিন্ আপনার চিঠি।"

চিঠিট বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

তারপর পনের কুড়ি দিন মনসুরের সাড়া পাই নাই। ভাবিয়াছিলাম আমার ভৎসনায় ফল হইয়াছে, যুবক নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সে যে এমন হীন ষড়যন্ত্র করিতেছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই।

(দুই)

কোন পথে কতক্ষণ কাটিয়া গেল বলিতে পারি না। মনে হইতেছিল পথ বুঝি আর ফুরাইবে না, কিম্বা ফুরাইবার আগেই হয়তো আমার জীবনের অবসান ঘটিবে। মানুষ বিপদে পড়িলে প্রথমে আত্মশক্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর অন্য কোন মানব শক্তির আশায় উন্মুখ হয়, তাহা নিষ্ফল হইলে শেষে এক মহাশক্তির শরণাপন্ন হয়। আমিও মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

হাত পায়ের অসহ্য বন্ধন-যন্ত্রণা ক্রমশঃ সহিয়া আসিল। বোধ হয় রক্ত চলাচলের বাধা জন্মিয়া দেহ অবশ হইয়া

আসিতেছিল। বুঝিলাম তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি—আর কিছুক্ষণ এরূপ অবস্থায় কাটিলে জ্ঞান হারাইব।

সহসা মনসুরের গলা শুনিলাম, "ওরে! এই গাছতলায় ডুলিটা একবার নামা,—একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।"

বাহকেরা ডুলি নামাইল বুঝিতে পারিলাম।

মনসুর কহিল, রাতা রাত পৌঁছুনো চাই কিন্তু। বুঝলি?

একজন উত্তর দিল, আরতো মোটে ঘণ্টা খানেক পথ হুজুর—এখনো ঢের রাত আছে।

দেশালাই জ্বালাইবার শব্দে ও তামাকের তীব্র গন্ধে বুঝিলাম পাষণ্ডগুলি বিড়ি খাইতে খাইতে সেখানে খানিকক্ষণ জটলা করিবে।

কতক্ষণ কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। হঠাৎ একজন কহিল, একটা কিসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না হুজুর?

মনসুর কহিল চুপ।

বোধ হয় কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিয়া মনসুর কহিল কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে বোধহয়। বিড়ি টানিসনে কেউ চুপ কোরে থাক। আলো দেখলে এই দিকেই এসে পড়তে পারে।

আশার ক্ষীণ আলোরেখা দেখিয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সচেতন হইয়া উঠিল। তবেকি সত্যই ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন? কান খাড়া করিয়া শুনিলাম শব্দটা নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

একজন কহিল, ঐযে দেখা যাচ্ছে হুজুর—এদিকেই আসছে। পালানো যাক। কি জানি পুলিশও হতে পারে।

মনসুর কহিল, দূর বোকা। এসে পড়েছে এখন আর পালাবি কোথায়? ঘোড়ার সাথে দৌড়ে পারবি নাকি? তার চেয়ে চুপ চাপ করে বসে থাক সব। এসে যদি জিজ্ঞেস করে কিছু আমি জবাব দেবো'খন। আর যদি পুলিশই হয়, এতগুলো মরদ আছিস কি কোর্ত্তে? একটার ভয়ে পালাবি? তোবা! তোবা!

লোকগুলি সায় দিয়া কহিল, হুজুর ঠিক বলেছেন। আমরা চারজন হুজুর আর এক—পাঁচ। আর ও লোকটাতো একা। লাঠি দিয়ে দু-এক ঘা বসালে ঘোড়া আপনি ওকে পিঠে নিয়ে ছুটবে। হেঃ হেঃ।

বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এই নরপশুগুলি একটা খুনখারাপি করিয়া বসিবে নাতো।

শব্দে বুঝিলাম ঘোড়াটা ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ অদূরে থামিয়া পড়িল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জায়গাটার নাম কি মশাই?

মনসুর কহিল, এতিমপুর। আপনি কোথায় যাবেন?

আগন্তুক কহিলেন, যাবো বীরনগর জমিদারদের বাড়ী। কোন পথে গেলে সুবিধা হবে বলুন তো।

মনসুর কহিল, এই রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যান। ক্রোশ তিনেক পথ গেলে একটা মস্ত বড় বটগাছ পাবেন এ গাছটার চেয়ে অনেক বড়। সেখান থেকে দুক্রোশ পশ্চিমে গেলে বীরনগর পাবেন।

আগন্তুক বলিলেন, তার চেয়ে এই জঙ্গল দিয়ে সোজা উত্তর পশ্চিম যাই যদি?

মনসুর বলিল, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবেন বটে কিন্তু গোটাতিনেক শ্মশান পেরুতে হবে। আর বুনো শুয়োর ও আছে।

আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, ভূতের বা শুয়োরের ভয় আমার নেই।—এই পথই ভাল। আচ্ছা, আসি তাহলে, নমস্কার।

আশার ক্ষীণ আলোটুকু নিভিয়া আসিল। মুখের বাঁধন কোনরূপে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বৃথা।

হঠাৎ আগন্তুক কহিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা আপনারা এত রাত্রে কোথায় যাবেন?

মনসুর বলিল, কোলকাতা। শেষ রাত্তিরের ট্রেন ধরতে হবে কিনা তাই।

আগন্তুক কহিলেন, ও-তাই বলুন। ষ্টেশনে যাবেন।

চোখ বাঁধা থাকিলেও হঠাৎ মনে হইল যেন এক ঝলক আলো আসিয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক প্রশ্ন করিলেন, ওটা ডুলি না? আমার বুকের মধ্যে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল বৃথা

াধ্য নড়িয়া চড়িয়া নিজের অসহায় অবস্থাটা জানাইতে চষ্টা পাইলাম।

মনসুর কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ আমার স্ত্রী আছেন।

আগন্তুক হাসিয়া কহিলেন, ও—সস্ত্রীক চলেছেন? া—হা—হা। আচ্ছা আমি আসি তাহলে।

পরমুহূর্ত্তেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। ব্দটা ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে বুঝিলাম। আমার নে হইতে লাগিল যেন আমার সমস্ত আশা ভরসা পদ-লিত করিয়া দিয়া ঘোড়াটি তাহার আরোহীকে লইয়া ুটিয়াছে। কিছুক্ষণ পর আবার সেই নিস্তব্ধতা।

মনসুর হাসিয়া বলিল, যাক আপদ বিদেয় হয়েছে।

একজন সঙ্গী কহিল, হুজুর যেমন পটা পট বোলেছেন আমরা হোলে এত বোলতেই পারতাম না। া—হা—হা।

তোরা হলে কি কোরতিস?

আমরা হলে কি আর কোরতাম। বেয়াড়া রকম দেখলে লাঠির এক ঘায়ে——

মনসুর হাসিয়া বাধা দিল, দূর ব্যাটারা, লোকটার কোমরে চামড়ার খাপে কি ঝুলছিল দেখেছিস?

সঙ্গীরা কহিল, হ্যা হুজুর। কি ওটা?

মনসুর কহিল রিভলবার।

রিভোলার!!

হ্যা-রে ও এক রকম বেঁটে বন্দুক। এক সঙ্গে আট দশটা গুলি ছোঁড়া যায়। আর এক এক গুলিতে এক এক জনের মাথা ভাঙে। ওর কাছে তোদের লাঠি একদম অচল।

লোকটা দারোগা নাকি?

কি জানি। দারোগা না হলেও বড়লোক নিশ্চয়। যাচ্ছে ও বড় জমিদারের বাড়ী।

এখন ভালোয় ভালোয় যেতে পারলে হয় হুজুর।

মনসুর বলিল, হ্যা, আর জিরিয়ে কাজ নেই—খুব হোয়েছে! এইবার সোয়ারী তুলে নিয়ে চল। রাস্তার মাঝখানে থাকা ভাল নয়। আবার কে এসে পড়বে।

বাহকেরা ডুলি তুলিয়া অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া মনসুর বলিল, ওরে, আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

ডুলি থামিয়া পড়িল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম শব্দটা বায়ুবেগে নিকটস্থ হইতেছে।

একজন কহিল, "সেই লোকটাই যে ফিরে আসছে হুজুর! পালান—পালান। নিশ্চয়ই বেটা পুলিশের লোক।"

তাড়াতাড়ি ডুলি সমেত আমাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডগুলি দ্রুতপদবিক্ষেপে ছুটিয়া পালাইল, বুঝিতে পারিলাম।

ঘোড়ার খুরের ক্রম বর্দ্ধমান খটাখট শব্দের সাথে সাথে বন্দুকের গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। এক-দুই-তিন-বার। ডুলিটা মাটিতে ফেলিবার সময় কোমরে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা যেন আঘাত বলিয়াই মনে হইল না। মুক্তির আনন্দে আমার বুকটা নাচিয়া উঠিল। মনে হইল বিপদ বারণ ভগবানের চরণে এই অসহায়া নারীর বিপদের বার্ত্তা বুঝি পৌছিয়াছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম—বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ ডুলির নিকটে আসিয়া থামিয়া পড়িল। অনুভবে বুঝিলাম আগন্তুক লাফাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া ডুলির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় বন্ধ চোখে যেন একটা আলোর আভাস পাইলাম।

আগন্তুক বলিলেন, ডুলিতে কেউ আছেন কি? সাড়া দিন, তা নৈলে আমাকেই দেখতে হবে। কেউ আছেন?

সাড়া দিবার মত আমার অবস্থা ছিলনা। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর বুঝিলাম আগন্তুক পর্দ্দা সরাই-তেছেন। সহসা তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, কি সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছিলুম তাই! গ্যাগড্ অ্যাণ্ড কিডন্যাপড্! (gagged ard kidnapped)

আগন্তুক তাড়াতাড়ি মুখের বাঁধনটা খুলিয়া ফেলিলেন আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম, হাত পায়ের বাঁধন গুলো দয়া করে খুলে দিন আগে। বড্ড যন্ত্রণা হোচ্ছে।

ছুরি দিয়া হাত পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিবা মাত্র আমি নিজেই ধীরে ধীরে চোখের আবরণ সরাইয়া ফেলিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না—মনে হইল বুঝি অন্ধ হইয়া গিয়াছি।

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলিলেন, একি! এযে কমল! কমল—কমলমণি! তুমি?

বহুদিনের সেই পরিচিত স্বর, মধুময় সম্বোধন কিছুতেই ভুলিতে পারি নাই। চোখে না দেখিলেও চিনিলাম। বলিলাম, কে? নরুদা? তুমি আমার মুক্তিদাতা?

পরক্ষণেই জ্ঞান হারাইলাম,—বোধহয় অতিদুঃখের পর অতি আনন্দে।

(তিন)

বাবা ছিলেন তখন কলিকাতার কোনও কলেজের প্রফেসর। আমি পড়িতাম মেয়েদের স্কুলে।

সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের বাস হইতে নামিয়া বেণী দোলাইতে দোলাইতে বই হাতে স্লিপার পায়ে চঞ্চল চরণে বাড়ীতে ঢুকিতে ছিলাম। পাশের ড্রইংরুম হইতে বাবা ডাকিলেন, কমল, দেখবি আয় মা কে এসেছে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চাহিয়া দেখিলাম বাবার কাছে চেয়ারে বসিয়া এক সুদর্শন অপরিচিত যুবক।

বাবা ডাকিলেন, দাঁড়ালি কেন মা? ভেতরে আয়। একে আর লজ্জা করেনা।

ধীরে ধীরে বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। যুবকটীর মুখের দিকে দুই একবার চাহিলাম—তিনি ও চাহিলেন। মুখে তাহার সরল মৃদু হাসি—ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। মাথা নাড়িয়া কহিলাম, আমি কিন্তু কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌ছিনে বাবা।

বাবা হাসিয়া কহিলেন, ও নরেন। আমার কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। তুই আর চিন্‌বি কি করে মা? সুরেন কাকাকে মনে পড়ে তোর?

কহিলাম কই—না।

তুই তখন খুব ছোট ছিলি মা। সুরেন ছিল আমার বাল্যবন্ধু। তোকে বড্ড ভাল বাসতো সে। নরেন সেই সুরেনের ছেলে। একে আজ কলেজে হঠাৎ আবিষ্কার কোরে ফেলেছি। সুরেন নেই—কিন্তু তার সুন্দর স্বভাব খানা আর চেহারার একটা আভাস নরেনের ভেতর বেশ পাওয়া যায়। বাবার গলাটা পরলোকগত বন্ধুর স্মৃতিতে ভারী হইয়া আসিল।

আমি নত হইয়া নরেনদাদাকে প্রণাম করিলাম। নরেনদাদা স্মিত আস্যে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

বাবা কহিলেন, নরেন কাল থেকে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে মা—আমি রাজি কোরেছি। সুরেনের ছেলে আমি থাকতে মেসে থাকবে এ হোতেই পারেনা।

আমি কহিলাম, বেশ তো বাবা। কালকে কেন? নরেনদা আজকেই আসুন না কেন? নরেনদার দিকে চাহিলাম।

নরেনদা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আজ আর নয় কমল। গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে একটু দেরি হবে। কালকে রোববার।

বাবা কহিলেন, আর এক কথা মা। তুই সেদিন বোল্‌ছিলিনে ইংরিজিতে ভাল নম্বর পাস্‌নি? একজন প্রাইভেট্ টিউটর হোলে ভাল হয়?

লজ্জিতা হইয়া কহিলাম, হ্যাঁ বাবা। তুমি তো দিন রাত নিজের পড়া নিয়েই থাকো, আমায় কিছুই বোলে দাওনা।

বাবা কহিলেন, নরেন চৎকার ইংরিজি জানে—ওকেই তোর প্রাইভেট টিউটর রাখবো ভেবেছি।

আমি মহানন্দে কহিলাম, সত্যি? তা হলে বেশ হয় কিন্তু। আমাকে কিন্তু ইংরিজিতে ভাল নম্বর পাইয়ে দিতে হবে নরেন দা?

নরেন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কোর্‌বো নিশ্চয়ই।

পরদিন হইতে নরুদা আমাদের পরিবারেরই একজন হইয়া পড়িলেন।

নরুদার শিক্ষকতায় অল্পদিনের মধ্যেই লেখাপড়ায় আশ্চর্য্যরূপে উন্নতিলাভ করিলাম। বাবা মা অত্যন্ত খুসী হইলেন।

তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পরে মার কাছে শুনিয়াছিলাম, নরেনদাকে আমাদের পরিবার ভুক্ত করিবার মধ্যে বাবার তিনটী উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল।

প্রথমতঃ—আমার শিক্ষার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা। দ্বিতীয়তঃ—বন্ধুপুত্র প্রতিভাবান ছাত্রটীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা—কারণ নরেনদা পিতার মৃত্যুর পর বহুকষ্টে পড়াশুনা চালাইতেছিলেন। তৃতীয়তঃ—আমাদের উভয়কে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা। এই তৃতীয় উদ্দেশ্যটী মা স্পষ্ট না বলিলেও আমি আভাসে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

বাবার প্রথম উদ্দেশ্য দুইটীর সহিত তৃতীয় উদ্দেশ্যটীও সমভাগে সফলতার পথে অগ্রসর হইল। আমি ও নরুদা পরস্পরের প্রতি ক্রমশঃই অনুরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। আড়াল হইতে পাইতাম বাবা মা মহানন্দে আমাদের বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

নরেনদা আই সি এস পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আমারও সেবার পরীক্ষার বৎসর। নরেনদার সহায়তায় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বাবা স্থির করিয়া ফেলিলেন পরীক্ষাটা চুকিয়া গেলেই শুভ কার্য্যটা সমাপ্ত করিয়া ফেলিবেন।

কিন্তু এই সময়ে সহসা বজ্রপাত হইয়া গেল। তিন দিনের জ্বরে বাবা স্বর্গারোহণ করিলেন। শোকার্ত্তা মাকে ও আমাকে লইয়া নরেনদা আমাদের দেশের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

আমাদের বিবাহ কালাশৌচ বাবদ এক বৎসর পিছাইয়া গেল। আমার পড়াশুনা ও আর হইল না। প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলাম। নরেনদা উৎসাহ দিলেও ঠাকুরদা কিছুতেই রাজি হইলেন না। কারণ তিনি ছিলেন পুরা মাত্রায় রক্ষণ শীল।

আই সি এস পাশ করিয়া নরেনদা এক বৎসরের জন্য বিদায় লইয়া বিলাত রওনা হইলেন। আমি আড়ালে কাঁদিয়া বুক ভাসাইলাম। নরুদা সান্ত্বনা দিলেন, কাঁদ্‌ছো কেন কমল? একটা বছরতো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া তুমি লেখাপড়া শিখেও যদি এমন অবোধ উতলা হও তাহলে—

কহিলাম, না কাঁদ্‌বো না নরুদা। কিন্তু আমায় যেন কেমন মনে হোচ্ছে তোমায় ফিরে পাবোনা।

নরেনদা হাসিয়া কহিলেন, পাগলী! জাহাজ থেকে নেমেই সোজা তোমার কাছে চলে আসবো দেখো। আর ততদিনে অশৌচ ও কেটে যাবে। আমাদের মিলনের কোন বাধাই থাকবেনা।

কহিলাম, চিঠি লিখো কিন্তু।

নরেনদা কহিলেন, নিশ্চয়।

কয়েক মাস নরেনদার চিঠি রীতিমত পাইয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল। অনেক কাঁদিলাম, অনেক অনুনয় করিয়া লিখিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না।

বাবা ছিলেন শান্ত স্বভাব, সরল প্রাণ, সদা হাস্যময়, আর আধুনিকতার পক্ষপাতী। কিন্তু ঠাকুরদাদা ছিলেন ঠিক্ তাহার বিপরীত। এমন পিতার যে এরূপ পুত্র হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কালাশৌচ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাকে গঞ্জনা করিতে লাগিলেন "আর কতকাল নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকবে বৌমা? কমলি যে বুড়ী হোতে চল্‌লো!"

মা কহিলেন, ওর ইচ্ছে ছিল নরেনের সাথে বে দেবেন আর কটা মাস পরেই তো নরু ফিরে আসবে বাবা?

ঠাকুরদাদা কহিলেন, হ্যা তা হয়তো আসবে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে সে হোতে দি কি কোরে? ওরা আমাদের করনীয় ঘরতো নয়—ছোট বামুন। আর তাছাড়া সেই ম্লেচ্ছদের দেশে সব অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে জাতের কি আর কিছু রাখবে মনে কোরছো বৌমা?

মা মৃদুস্বরে কহিলেন, নরু আমায় তেমন ছেলে নয় বাবা।

ঠাকুরদা অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। কহিলেন, হা দেখো যখন একটা মেম বিয়ে কোরে আনবে তখন আমার কথা সত্যি হয় কিনা।

মা কথা কহিলেন না। আড়ালে গিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হ্যারে কমলি? নরু কতদিন চিঠি দ্যায়নি রে?

আমি ম্লানমুখে কহিলাম, অনেকদিন মা।

মা চিন্তিতা হইয়া বলিলেন, তাইতো মা উনি যা বোল্‌ছেন—হোতেও তো পারে!

আমি কথা কহিলাম না। নরেনদা আমাকে ভুলিয়া যাইবেন, এক বিদেশিনীকে চিরসঙ্গিনী করিয়া আনিবেন,

ইহা যেন কল্পনা করিতেও চোখে জল আসিল। নানারূপ বীভৎস দুঃস্বপ্নে আমার নিশা পোহাইতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা বুঝাইতে লাগিলেন, তাহার জানিত একটী ভাল পাত্র আছে। বনেদী ঘর—মহা কুলীন। পাত্রটী কোনও স্কুলে পণ্ডিতী করেন। তাহা ছাড়া ঘর বাড়ী, জমি জমা,—বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। ইহাকে হাত ছাড়া করিলে শেষে পস্তাইতে হইবে। এমন কি এতবড় অরক্ষণীয়ার আর বর জুটিবে কিনা সন্দেহ।

মার ক্ষীণ আপত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে একদিন তিনি সত্য সত্যই মত দিয়া ফেলিলেন। আশা হতাশার দোটানায় পড়িয়া আমি অবিবাহিতা জীবন যাপনই শ্রেয় মনে করিলাম। কিন্তু মা বুঝাইলেন, কি কোরবি মা, একটা অবলম্বন তো চাই?—আমরা তো আর চিরদিন থাকবোনা। আর আইবুড়ো থাকবি শুনলে শশুর আর রক্ষে রাখবেন না, এমনিই তো লেখাপড়া শিখেছিস বোলে চটে আছেন। বরাতে যদি সুখই থাকবে তো এখানেই সুখী হবি তুই। রাজি হ। নরেন যদি মা তোকে ভুলে যেয বে কোরতে পারে তো তুইবা পারবিনে কেন?

কিন্তু আমি রাজিও হইলাম না গররাজিও হইলাম না। তবু এক ম্লান সন্ধ্যার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমার বিবাহের মন্ত্রপাঠ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গেল।......

প্রথম শশুর বাড়ী যাইবার দিন অবিশ্রান্ত কাঁদিয়া ছিলাম। পিতৃগৃহের প্রতি আমার অসীম মায়ার পরিচয় পাইয়া পড়শীদের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। কিন্তু সে দিন কেন কাঁদিয়া ছিলাম তাহা আমিই শুধু জানি আর জানেন নরেন দা।

ঠাকুরদাদার বাক্সটায় সেদিন চাবী দেওয়া ছিলনা। কৌতুহল বসে খুলিয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে সঞ্চিত রাহয়াছে আমার না পাওয়া নরেনদার লেখা এক তাড়া চিঠি। আমাকে শদ ব্রাহ্মণের ঘরে দিয়া নিজের জন্য স্বর্গে স্বর্ণসিংহাসন রচনার লোভে ঠাকুরদা যে আমাকে এমন করিয়া বলি দিতে পারেন, তাহা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

নরেনদাকে চিঠিতে—বিস্তারিত জানাইয়া তাহার চরণে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নূতন সুকঠিন কর্ম্মক্ষেত্র স্বামীর গৃহে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম শুধু আমার সাধের ময়না পাখীটা—নরেনদার দেওয়া।

তাহার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কেহ কাহারও সংবাদ রাখি নাই।

(চার)

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম নরেনদার কোলে মাথা রাখিয়া ঘাসের বিছানায় শুইয়া আছি। নরেনদা আমার মুখের দিকে স্নেহাতুর চোখে অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছেন, আর ধীরে ধীরে আমার মাথার চুলগুলির ভিতর আঙ্গুল চালাইতেছেন।

এইবার চোখ মেলিয়াই আরাম বুঝিলাম। ভারী শান্তি লাগিতেছিল। এত শান্তি এত তৃপ্তি বুঝি অনেক দিন পাই নাই।

নরেনদা আমার মুখের পরে নত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কই জেগেছ?

উত্তর দিলাম, হ্যা নরুদা।

একটু সুস্থ বোধ কোরেছ কি?

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, হ্যা।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া নরেনদা কহিলেন, ইস, কতদিন পর তোমায় দেখলুম! কিন্তু এমন বীভৎস ভাবে দেখা হবে তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কহিলাম, ভগবান তোমায় ঠিক সময়েই পাঠিয়েছিলেন নরুদা। তা নৈলে—চোখে জল আসিল।

সমস্ত ব্যাপারটা নরেনদাকে বলিলাম। শুনিয়া নরেনদা সক্রোধে কহিলেন, আগে যদি ঠিক বুঝতে পারতুম কমল, তবে বদমাস গুলোকে গুলি করে মারতুম।

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, আমার কিন্তু এখন আর ওদের উপর একটুও রাগ নেই নরুদা।

নরেনদা সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন বলত?

কহিলাম, ওদের জন্যই তো তোমায় এত দিন পরে দেখতে পেলুম।

নরেনদা হাসিয়া কহিলেন, ও-তাই! আমি কিন্তু ও বেটাদের সহজে ছাড়বনে। কালকে দারোগাকে পাঠিয়ে দেবো, একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ো।

জানিলাম নরেনদা তখন আমাদেরই সাবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

কহিলাম, তা কোরোনা নরেনদা। আদালতে আমি যেতে পারবো না ভাই। এ নিয়ে যদি একটা হৈ চৈ হয় তা হলে ওর বাড়ী আমার স্থান হবে না আর।

নরেনদা কহিলেন, তাই নাকি? তাহলে যাইহোক ঐ লোকটা আর যাতে তোমার উপর অত্যাচার করবার সুযোগ না পায় তার একটা ব্যবস্থা করবোই।

কহিলাম, তা যা হয় করো। কিন্তু আজকের ঘটনা আর কাউকে জানাবে না বল? নরেনদার হাত ধরিলাম।

নরেনদা হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে কমল। আর যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখো, আমায় জানিও। এইবার চল। উঠতে পারবে?

হ্যাঁ পারবো, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নরেনদা কহিলেন, তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায় বোল্লে?

কহিলাম, নবগ্রাম।

সে কোন দিকে?

ওরা এ জায়গাটার নাম এতিমপুর বোল্‌ছিলো না? তা যদি সত্যি হয়, তা হলে এখান থেকে সোজা পূব দিকে প্রায় চার ক্রোশ পথ হবে।

চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

কহিলাম, কিন্তু যাবো কি কোরে?

নরেনদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই তো? ঘোড়ায় চড়তে পারবে না কমল?

কহিলাম, সেই ছেলে বেলায় তোমার সাথে যা চড়েছি দু—একবার। আরতো চড়িনি।

নরেনদা হাসিয়া কহিলেন, সেই ছেলেবেলার অভিনয়-টাই তা হলে করা যাক্ চল। আরতো উপায় নেই কমল? কি বল?

বুঝিলাম, আমি এখন পরস্ত্রী, তাই নরেনদা সঙ্কুচিত হইতেছেন। মৃদু হাসিয়া কহিলাম, তাই চল নরুদা।

ঘোড়াটা একটু দূরে গাছের সাথে বাঁধা ছিল। কাছে গিয়া কহিলাম, তুমি যখন এসেও আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে নরুদা, তখন আমার বুকের ভেতর যা হতাশার যন্ত্রণা হোচ্ছিল। গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে এলে কি মনে কোরে?

নরেনদা কহিলেন, লোকগুলোর হাব ভাব দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হোলো। ডুলি বইবে দুজন অথচ লাঠি নিয়ে সঙ্গে চলেছে চারটা গুণ্ডা। যাচ্ছে সস্ত্রীক সেই কোল্‌কাতায়, অথচ পোটলা পাটলি কিছুই সঙ্গে নেই। তারপর খানিক দূর গিয়ে গাছের আড়াল থেকে যখন দেখলুম যে ষ্টেশনের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে সব উল্‌টো দিকে তখন নিশ্চয় বুঝলুম এর ভেতর গলদ আছে।

সেই পূর্ব্বের মতই নরেনদা, আমাকে অবহেলে পাঁজা কোলে করিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া দিলেন। তারপর নিজে উঠিয়া বসিলেন। আমি রহিলাম ঠিক তাহার বুকের কাছটীতে। ঘোড়া অল্প অল্প ছুটিতে লাগিল। নরেনদা কহিলেন, সেই পুরোনো দিনগুলো মনে পড়ে কমল?

মৃদুস্বরে কহিলাম, পড়ে?

নরেনদা বলিবার পূর্ব্ব হইতেই সেই পুরাতন স্মৃতিগুলি আমার মনে ভাসিতেছিল। সেদিনে আর এ দিনে কত প্রভেদ। পূর্ব্বে মনে হইত না, কিন্তু আজ মনে হইল যেন নরেনদার বুকের অত কাছে থাকিয়াও কতদূরে আছি। মাঝে এক দুস্তর সাগরের ব্যবধান! তবুও যে অনাবিল আনন্দের পরশ সেদিন উপভোগ করিয়াছিলাম, তেমন আনন্দ বিবাহের পর হইতে অদ্যাবধি আর কখনও পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ফেলিলাম, বিয়ে কোরেছো নরুদা?

নরেনদা কহিলেন, না।

সবিস্ময়ে কহিলাম, করনি? এবার কিন্তু কোর্‌তে হবে তোমায়। আমি ক'নে পছন্দ কোরে দোবো।

নরেনদা কহিলেন, ঐটে কিছুতেই পার্‌বোনা কমল —মাফ কোরো।

কেন বলতো?

নরেনদা কহিলেন, এমনি।

এমনি নয়, বোল্‌তে হবে নরুদা।

নরেনদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কেন, তাকি বোঝনা তুমি? সত্যিকার বিয়েতো একবারই হয়।

বুঝিয়াছিলাম অনেক আগেই। তবু নরেদার নিজ মুখে কথাটা শুনিয়া দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

নরেনদা সস্নেহে আমার মাথাটা একহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ছিঃ কমল! অতীতটাকে ঝেড়ে ফেলে যে বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার সেইতো বুদ্ধিমতী।

কহিলাম, তাই যদি সত্যি হয়, তবে তুমিও বা বে কোরতে চাওনা কেন?

নরেনদা কহিলেন, ভবিষ্যৎ ভেবে। অনর্থক বোঝা বইতে যাবো কেন বল? কিন্তু তুমি যখন বোঝা মাথায় তুলেই নিয়েছ, তখন দেখতে হবে যাতে সেটা ক্রমে লাঘব হোয়ে আসে।

আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

নরেনদা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামী তোমায় ভালবাসেন কমল?

কহিলাম, কি জানি।

কি জানি নয়। তোমায় ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারে এ আমার বিশ্বাস হয়না। বিশেষতঃ তোমার স্বামী।

স্বীকার করিলাম তা বোধ হয় বাসেন নরুদা। অন্ততঃ কোনদিন অনাদর করেননি।

নরেনদা কহিলেন, তবেই ছাখো, তুমি তার কাছ থেকে শুধু নিয়েই যাচ্ছ—সত্যিকার কিছুই দিচ্ছনা তাকে। কিন্তু লেন দেন নিয়েইতো জগৎ? যদি পরজন্ম মানো তবে এঋণ শুধতে তোমায় ফিরে আস্‌তে হবে আবার।

চিন্তিত হইলাম। নরেনদা যাহা বলিলেন তাহাই কি জীবনের সত্য?

নরেনদা আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় ব্যাপারটাকে তরল করিবার জন্যই প্রশ্ন করিলেন, ছেলে পুলে হয়েছে কমল?

মৃদুস্বরে উত্তর দিলাম না।

নরেনদা হাসিয়া কহিলেন, খোকা হোলে আমায় খবর দিও কিন্তু। ষষ্ঠীর দিন পেট পুরে খেয়ে আস্‌বো।

নির্জ্জন উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া ঘোড়াটা মৃদুমন্দ ছুটিতেছিল। উপরে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের নীচ দিয়া কদাচিৎ দুই একটা নিশাচর পক্ষী দূরের গাছগুলির দিকে উড়িয়া যাইতেছিল। চাঁদের অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিলাম রাত্রি তৃতীয় প্রহর গত হইয়াছে। কহিলাম, একটু ছুটে চল নরুদা! রাত থাকতে কিন্তু পৌঁছানো চাই ভাই।

ঘোড়াটাকে ছুটিবার ইঙ্গিত করিয়া নরেনদা কহিলেন কেন বলতো?—নরেনদার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম।

নরেনদা কহিলেন ও বুঝেছি কমল; পাড়াপড়সীরা টের পাবার আগেই ঘরে ফিরতে চাও? কিন্তু তোমার স্বামী নিশ্চয়ই এতক্ষণ হৈ চৈ করে নিয়েছেন।

কহিলাম, সে সম্ভাবনা খুব কম। যে অবস্থায় দেখে এসেছি তাতে সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙবে বোলে মনে হয় না।

নরেনদা আমার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

আমি হাসিয়া কহিলাম, তুমি যা ভাবছো তা নয় নরুদা। মাঝে মাঝে সিদ্ধির সরবৎ ছাড়া আর কোনও নেশা ওর নেই।

নরেনদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তাই বল।

সেই আম কাঁঠালের বাগান। ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া দুইজনে বাগান পার হইয়া খিড়কীর কাছে গিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইলাম। কি যেন বলিতে যাইতেছিলাম, নরেনদা বাধা দিয়া কহিলেন, তুমি আগে দেখে এসো কমল, তোমার স্বামী জেগেছেন কিনা। নৈলে আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে যেতে পারবো না তো। আর যদি জেগেই থাকেন তাহলে তার কাছে আমার কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

খিড়কী খোলাই ছিল। চট্‌ করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া কহিলাম, তিনি জাগেননি নরুদা—এখনো তেমনি ঘুমুচ্ছেন।

নরেনদা কহিলেন, বেশ। তাহলে আমি আসি কমল? পারতো অতীতটাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলো।

কহিলাম, তাকি কখন পারবো নরুদা?

নরেনদা কহিলেন. চেষ্টা কোরো। নিতান্তই না পারো যদি তবে মনে রেখো, নরুদা তোমার দাদা ছাড়া আর কিছুই ছিল না কোনদিন।

নরেনদাদার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলাম। কহিলাম, আশীর্ব্বাদ কর নরুদা যেন অসম্ভবও সম্ভব হয়।

নরেনদা ধীরে ধীরে মাথার উপর হাতখানা রাখিলাম। চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায় তাহার চোখে মুখে একটা গভীর ব্যথার ছাপ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

নীরবে বিদায় লইয়া নতমুখে ছল ছল চোখে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বিছানায় ঘুমন্ত স্বামীর পাশে বসিয়া বসিয়া শুনিলাম ঘোড়ার খুরের খটাখট্ শব্দ উল্কাবেগে দূর দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

গান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মোর প্রিয়তমের নয়ন তুমি কি যাদু জানো!
যেন নিশীথ রাতের চাঁদের মতন স্বপন মাখানো!
যেন ফাগুন সমীরণ——
নূপুর বাজায় লতায় পাতায়—জাগায় শিহরণ!
যেন নীলসায়রের তরঙ্গে জলতরঙ্গ বাজানো!
কি যাদু জানো!
যেন শিশিরের ধোয়া উষার আলোর দোদুল কাশের ফুল
বকুল বীথি আকুল-করা পথভোলা বুলবুল!
যেন কত দিনের চেনা সুরে
গানের মিঠে আওয়াজ দূরে,—
কানুর বেণুর তানের মতন পরাণ মাতানো!
কি যাদু জানো!

গান

কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

কুহু—কুহু, কুহু কুহু
বনের ধারে লুকিয়ে ওরে
ডাকিস্ কেন মুহুর্মুহু।
এই এখানে ওই ওখানে
আকাশ ভাসে সুরের বানে,
সুধা ধারায় পরাণ মাতায়
—গাহিস কিরে শুধু শুধু।
তোর সে ডাকে ও কোয়েলা
বসন্ত আজ হল উতলা,
জাগল ফুলের অমল কলি,
বহিল উদাস হাওয়া হুহু।

গান

কথা—শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়

মঙ্গল কর মঙ্গলময়
ঘুচাও দুঃখ ভয়,
দাওগো শক্তি হৃদয়ে ভক্তি
সাধনে শান্তি—করমেতে জয়।
(আমি) নিখিল বিশ্ব ভুলি
আপনারে দিব বলি
মম জীবন মরু মাঝারে
তুমি হে প্রেমময়।

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্তা লইয়া রচিত। বাংলার হরিজন সমস্তা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্তা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকারও অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ]

অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই, বরং যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া স্বামীর জন্য প্রস্তুত আহার্য্য তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন।

অনেক হাসি গল্পের পর বাহিরে আসিয়া যখন নিতান্ত হঠাৎই দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া একেবারে চাবী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মাধববাবু নারীকে সহজে অধিকার করিবার গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন।

মুহূর্ত পরেই আসল ব্যাপারটা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে ভবিষ্যৎ চিন্তাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। কাল সকালে যখন সুরমা গ্রামের প্রতি লোককে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইবেন জমিদার মহাশয় কিরূপভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই কল্পনায় তিনি পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি দরজা জানালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষে অনেক সাধ্য সাধনা, অনুনয় বিনয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরমা দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়াছিলেন—তাঁহার মত পশু প্রকৃতি লোককে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা সুরমার নাই। যাহার গৃহে মাতা, স্ত্রী, ভগ্নি রহিয়াছে, সে অপরের বিবাহিতা পত্নীর উপর অত্যাচার করিতে আসিয়াছে, এই সত্যটাকে তিনি সকলকে প্রত্যক্ষ করাইতে চান। সেই জন্যই মাধববাবু আজ এ গৃহে বন্দী থাকিবেন এবং কাল সকালে সুরমার স্বামী আসিয়া মাধববাবুর মাতা ভগিনী এবং স্ত্রীকে আনাইয়া তাঁহাকে দেখাইবেন। সেই সময় গ্রামের পাঁচজন লোককেও ডাকা হইবে, তাঁহারা আসিলে মাধববাবুকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

শত সহস্র অনুনয়েও কোন ফল হয় নাই, অবশেষে মাধববাবু লিখিয়া দিয়াছিলেন ভবিষ্যৎ তিনি আর কোনও ভদ্র মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। এই লেখা হস্তগত করিয়া সুরমা সে রাত্রে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

বাহিরে তখন ঝড় ও বৃষ্টির মাতামাতি সুরু হইয়াছিল। দরজা খুলিয়া মাধব বাবুকে বাহির করিয়া দিয়া সুরমা ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনি কেবল যে মৌখিক প্রতিজ্ঞাই করেছেন তা নয়, আপনার লেখা প্রমাণ ও আমার কাছে রইল,—কেবল এই লেখার পরে নির্ভর করেই আপনাকে মুক্ত করে দিলুম এ কথা মনে রাখবেন—ভুলবেন না।"

মাধব বাবু শুষ্কমুখে বলিয়াছিলেন, "তোমাকেও একটা অনুরোধ করে যাই সুরমা, আর কোনদিন তোমার সামনে না এলেও আমার এ অনুরোধ তুমি রেখো। প্রতিজ্ঞা কর আমার লেখা তুমি কাউকে দেখাবে না, আমার কথা কাউকে বলবে না?"

সুরমা বলিয়াছিলেন, "যদি আর এ রকম উচ্ছৃঙ্খল না দেখতে পাই নিশ্চয়ই বলব না বা দেখাব না।"

ইহার পরই তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান, মাধব বাবুও কলিকাতা বাসী হন।

তিনি মাঝে মাঝে একবেলা—কখনও দুই একদিনের জন্য দেশে আসিতেন, সুরমার সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই।

আজ এ মাধব চৌধুরীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সদিনকার সে মাধব চৌধুরীর সহিত ইহার প্রকৃতির মিল হয় না। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স পার হইয়া গিয়াছে, যৌবনের সে উদ্দামতা চরিত্রে আর নাই, গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। সুরমারও বয়স হইয়াছে, প্রথম দর্শনেই তিনি এখন মানুষ চিনিতে পারেন।

একমাত্র কন্যার অসুখে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন; স্নেহ কাতর পিতার এই ব্যাকুলতাই সুরমাকে আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল।

না, মানুষের সত্যই পরিবর্ত্তন হয়, মহাপাপী ও মহাসাধু হইতে পারে, কথাটাকে উপহাস করিয়া একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

হাতের আলো মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন।

পলাশের ব্যারাম, ব্যারাম কঠিন না হইলে ডাক্তারের জন্য এতটা ছুটাছুটি কেহ করিত না। আর একবার এমনই এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে দীনেশ পলাশের চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, পিতা ও কন্যা সে জন্য আজ ও দীনেশের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া আছেন।

পলাশ মাঝে মাঝে দীনেশকে পত্র দিত। সুরমা সে সব পত্র দেখিয়াছিলেন। দীনেশ যখনই কলিকাতায় যাইত, পলাশের সহিত দেখা না করিয়া ফিরিতে পাইত না। পলাশের জীবনদাতা বলিয়া মাধব বাবু ও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

সেবার পলাশ গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছিল মাধববাবু আসিতে পারেন নাই। দু দিনের জন্য গ্রামে আসিয়া সে দীনেশের সহিত আসিয়া দীনেশের দিদিকে প্রণাম করিয়া গিয়াছিল।

অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত তাহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুরমা বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম পলাশ রাখা উচিত হয় নি, গোলাপ রাখা উচিত ছিল।"

মেয়েটী নতমুখে কেবল হাসিয়াছিল।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় সুরমা দীনেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁরে দীনেশ, আমি যদি মাধব বাবুর কাছ হতে পলাশকে চাই, তিনি দেবেন নাকি?"

দীনেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিয়াছিল, "পলাশকে চাইবে,—তার মানে—?"

দিদি বলিয়াছিলেন, "তোর জন্যে—!"

দীনেশ হাসিয়া উঠিয়াছিল, বলিয়াছিল—"ক্ষেপেছ দিদি, আমার নাম করে পলাশকে চাইতে গেলেই তুমি লোক হাসাবে। পলাশের জন্যে পাত্র ঠিক রয়েছে, বছর খানেকের মধ্যে সে বিলেত হতে ফিরলেই ওদের বিয়ে হবে।" তথাপি সুরমার মনে হইত তিনি নিজে যদি মাধব বাবুর কাছে কথাটা তুলেন মাধব বাবু অমত করিবেন না।

কিন্তু সে কথা তিনি তুলিতে পারেন নাই।

আজ পূর্ব্বদিনের সেই সব কথাই সুরমার মনে জাগিতেছিল, তিনি অন্যমনস্কভাবে আলোর দিকে তাকাইয়াছিলেন।

(১৯)

রাত্রি প্রায় একটার সময় দীনেশ ফিরিয়া আসিল।

সুরমা জাগিয়া বসিয়াছিলেন, দীনেশের সাড়া পাইবামাত্র দরজা খুলিয়া দিলেন, সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল রে, পলাশকে দেখতে গিয়েছিলি, কেমন আছে সে, কেমন দেখলি?"

দীনেশ কোট খুলিয়া দেয়ালের হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

সুরমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাকে দেখতে গিয়েছিলি?"

দীনেশ উত্তর দিল, "না গিয়ে রক্ষে আছে দিদি? তুমিই তো বলে পাঠিয়েছ, কেবল তোমার কথা রাখার জন্যেই আমি গেছি, নইলে কখনো যেতুম না।"

সুরমা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অমন কথা বলিসনে দীনু। লোকে কথায় বলে—বাদি বেঁচে থেকে বাদ সাধুক—এ কথা জানিস তো? মাধব বাবু যাই করুন, আজ তাঁর এমন একটা বিপদের সময় সে কথা মনে করে রাখা কি উচিত হবে ভাই? যাক, আমার কথা রাখতেও যে তুই গিয়েছিলি এর জন্যে ভারি খুসি হয়েছি। কেমন দেখলি পলাশকে?

দীনেশ বলিল, "অনেকটা সামলেছে। সেই সন্ধ্যা হতে ওখানে তার কাছে বসে, এখনও কি কিছুতেই আসতে দেয়? হাতখানা শক্ত করে ধরেছিল, যেই ঘুমিয়েছে সেই পালিয়েছি।

দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

দীনেশ বলিল, "সকাল হতে সামান্য জ্বর হয়েছিল, সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।"

উৎকণ্ঠিতা সুরমা বলিলেন, "সামান্য জ্বরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়বার মানে—?"

দীনেশ কি করিতেছিল—উত্তর দিল না।

একটু পরে বলিল, "আজ আর কিছু খাব না দিদি, মাধব বাবু খুব খাইয়ে দিয়েছেন।"

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, "আলো নিভিয়ে দিয়ে তুমিও শুয়ে পড় গিয়ে দিদি।"

সুরমা আলোটা কমাইয়া তাহার চোখের আড়ালে রাখিয়া বলিলেন, "তুই ঘুমো, আমি যাচ্ছি।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া দীনেশ বলিল, "শুনলুম অজিত ফিরে আসছে, সেই কথা শুনেই পলাশের এই অসুখ হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সুরমা বলিলেন, "তার মানে?"

দীনেশ উত্তর দিল, "সে অজিতকে বিয়ে করতে চায় না।

সুরমা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তুই বলিস কিরে,—অমন ভালো ছেলে, তাকে সে বিয়ে করতে চায় না?

দীনেশ আস্তে আস্তে বলিল, "পলাশ আজ আমায় অনেক কথা বলেছে দিদি, তাতে জেনেছি অজিত লেখা পড়ায় ভালো হলেও মানুষ হিসাবে সে ভাল লোক নয়। এ কথা মাধব বাবু পর্য্যন্ত সম্প্রতি শুনেছেন।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পলাশ নিজে তোকে এসব কথা বলেছে দীনু?

দীনেশ বলিল, "অনেক কথা বলেছে দিদি, কিন্তু এখন থাক সে সব কথা. আমার ভারী ঘুম আসছে, কাল সেসব কথা হবে।

একটু পরেই দীনেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙিয়াই বিছানায় শুইয়া থাকিয়াই দীনেশ হাঁকিল, সব গুছিয়ে নাও দিদি; আজই রওনা হতে হবে সে কথাটা মনে রেখো।"

সুরমা বারাণ্ডা হইতে উত্তর দিলেন, "আজই তুই যাচ্ছিস কি করে, একটা ভার হাতে নিয়েছিস্ না?

দীনেশ একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বলিল, "রোগীর ভার তো আমি নেই নি দিদি। ওদের ফ্যামিলী ডাক্তার আজই কলকাতা হতে এসে পৌঁছাবেন, কাজেই রোগীর দায়িত্ব আমার নেই! তা ছাড়া রোগী বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, ওর জন্যে আমায় একটুও ভাবতে হবে না।"

সুরমা আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইলেন, বলিলেন "তবু একবার গিয়ে ওদের বলে আসা কর্ত্তব্য তো।"

দীনেশ বলিল. "সে কর্ত্তব্য আমি পালন করব বই কি, —এখনই গিয়ে বলে আসছি।"

প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত সে যখন জমিদার বাড়ী গিয়া পৌঁছাইল তখন মাধববাবু সামনের বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন।

দীনেশকে দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম দীনেশ, এখনই তোমার কাছে কাউকে পাঠাব মনে করেছিলুম। যাক্ তুমি নিজেই এসে পড়েছ আমায় আর কাউকে পাঠাতে হল না ভালই হল।"

দীনেশ বলিল, "আমিও আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যেতেই এসেছি।"

মাধববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কি কথা বল।

দীনেশ বলিল, "আজই একবার আমাকে যেতে হচ্ছে; আমার এক আত্মীয়ের ভারি অসুখ, না গেলে হয়তো তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া মাধববাবু বলিলেন. "না না তুমি আজকেই চলে যেয়ো, আমি তোমায় এখানে আটক করে রাখতে চাইনে রাখবোও না। পলাশ, বেশ ভালোই আছে, তার জন্যে তোমায় আটক করে রাখা আমার ভারী অন্যায় হবে।"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তার পর আমার কথাটা শোন দীনেশ। ভুল সবারই হয়ে থাকে আমারও

হয়েছিল—আমি নিজের গাম্ভীর্য্য ঠিক বজায় রাখতে পারিনি, অন্যের কথায় কান দিয়েছিলুম। আমার সেই দৌর্ব্বল্যের অবকাশে তুমি কাজে জবাব দিয়ে চলে গেছলে, আজ সেই কাজে আমি তোমাকেই ফিরিয়ে পেতে চাই। তোমার কাজ তুমি তুলে নাও,আমি নিশ্চিন্ত হই। আজও ঐ ডাক্তারখানায় একটা ডাক্তার পেলুম না, রোগে একটি ফোঁটা ওষুধ না পেয়ে তোমার দেশের লোক মরে যাচ্ছে ওরা সবাই মরবে তুমি কি তাই চাও দীনেশ?

তোমার দেশের লোক—

কথাটা শুনিয়া দীনেশ হাসি রাখতে পারে না।

তাহার দেশের লোকই বটে। এই পরশ্রীকাতর লোকগুলা রোগে ভুগিয়া মরে মরুক তাহাদের সামনে আলমারী ভরা নানা ঔষধ সাজানো থাকে তাহারা একটি ফোঁটা ঔষধ না পাক, তাহাতে দীনেশের কি?

মুখ ফুটিয়া সে বলিল, আমার দেশের লোক কতখানি আমার শুভকামনা করে তাতো জানেন আপনি, তবে আমিই বা কেন ওদের মঙ্গলের চেষ্টা করব বলুন দেখি? দুধ কলা দিয়ে সাপের প্রাণ বাঁচাব, সেতো আমাকেই ছোবল দেবে?

মাধববাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ছোবল দিক বা [illegible] তা ভেবে তাকে বাঁচানো চলে না দীনেশ! [illegible] অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই, ওর সময় বর্ত্তমান, [illegible] কেবল বর্ত্তমান নিয়েই চল। তোমার স্বার্থ না [illegible] জমিদার হিসাবে আমার স্বার্থ যথেষ্ট রয়েছে। [illegible] প্রজা সেই হিসাবে ওরাই আমার সম্পত্তি। [illegible] থাকে, আমাকেও বেঁচে থাকতে হবে, যদি [illegible] লোকেও মরতে হবে, এ কথাটা তোমায় [illegible] করে বুঝিয়ে বলতে হবেনা দীনেশ। [illegible] আমি সেইজন্যেই বাঁচিয়ে রাখতে চাই, [illegible] তোমায় আমার দরকার।"

[illegible] করিয়া রহিল।

[illegible] বলিলেন, "এর জন্যে আগে তুমি যা পেতে [illegible] আমি প্রতিমাসে তোমায় দেব, তোমায় [illegible] তেই হবে,—বুঝেছ?"

[illegible] রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,"বুঝেছি কিন্তু টাকার প্রলোভন আমায় দেখানোর আগে সে কথাটা মনে রাখুন ওরা আমার কি রকম শত্রুতা করেছে, এখনও করছে। আগে সে কথাটা ভাল রকমে জানলে আমায় আর অনুরোধ করতে পারতেন না।"

মাধববাবু বিস্ফারিত চোখে বলিলেন,"প্রলোভনের কথা বলোনা দীনেশ, আমি তোমায় প্রলোভন দেখাচ্ছিনে। এরা বড় হতভাগা দীনেশ, এরা নিরেট মূর্খ, তাই সে গাছের ডালে দাঁড়ায়ে সেই ডালই কাটে। নিজের ভালো ওরা বুঝতে পারে না, অথবা বুঝেও বুঝেনা, তাই সব জেনেও চিরন্তন সেই পুরাতন নিয়েই পড়ে আছে। ওদের অজ্ঞতা মনে করে ওদের দয়া করা উচিত দীনেশ, সত্যই ওরা বড় হতভাগা। তোমার কথা আমি সবই জানি, আমাকে নূতন করে সে সব কথা শুনে—চোরের উপর রাগ করে মাটীতে ভাত খেয়ে আর কি লাভ হবে বল।"

দীনেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আপনি ক্রাইষ্টের মত বলতে চান ডান গালে কেউ চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দাও। সোজা কথায় ওদের সেবাই করে যেতে হবে।"

মাধব বাবু বলিলেন, যদি বলি। অস্পৃশ্য বলে কাউকে সেখানে ফেলে রেখো না, এ কথা তোমাদের মনে জেগেছে তাই আজ তোমরা যেখানে সেখানে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ। তোমাদের দেশে যারা আছে, আগে তাদের ময়লা মনগুলো সাফ কর তারপর তোমাদের সমাজের বাইরে যারা আছে তাদের দেখ। একটা কথা জানো দীনেশ, আঘাতের কালে আঘাত দিলে কোন লাভ হয় না; কঠোরতা বা নিস্পৃহতা দিয়ে একটা চিত্তও জয় করা যায় না, চিত্তজয় করতে চাই আন্তরিকতা পূর্ণ প্রেম। এই খানেই প্রকৃত কাজ হবে দীনেশ, তোমার শত্রুদের তুমি অতি সহজে প্রেম দিয়ে জয় করতে পারবে। ওরা যাই করুক, তুমি ওদেরই সেবা করে যাও।"

দীনেশ হাসিল, বলিল, "ক্রাইষ্ট বা বুদ্ধের উপদেশ বাণী আবৃত্তি করতে পারে অনেকেই কিন্তু উপদেশ মত কাজ করার শক্তি যে অনেকেরই থাকে না এ কথাও আপনাকে বলতে, হবে না। সবাই যদি ক্রাইষ্ট, বুদ্ধ অথবা নিমাইয়ের

মত প্রেম বিলিয়ে যেতে পারত তা হলে পৃথিবীই যে স্বর্গ হয়ে যেত।"

মাধব বাবু বলিলেন,"কিন্তু মানুষই স্বর্গ নরক সৃষ্টি করে দীনেশ। স্বর্গ নরক কবির কল্পনা মাত্র, স্বর্গ নরক রয়েছে মানুষের মনে; মানুষের কাজের মধ্যে তারই ছুটি ফুটে ওঠে। যদি মন হতে এই ঘৃণা ভাব দূর করে দিতে পার তোমার অন্তরই হয়ে উঠবে স্বর্গ; যদি না পার চিরকালই তোমায় ওই নিবষ কালো অন্ধকারে ডুবে থাকতে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া দীনেশ বলিল, "আমি রাজি হলেও আমার দিদি নিশ্চয় রাজি হবেন না।"

মাধব বাবু বলিলেন, "তাঁকে বলে রাজি করার ভার আমি নিচ্ছি।"

দীনেশ বলিল, "তিনিও আজ আমার সঙ্গে আসামে যাচ্ছেন, আট দশ দিন পরে ফিরবেন। তখন বরং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা যাবে।"

মাধব বাবু বলিলেন,"সেই ভালো। ততদিনে অজিতও এসে পৌছাবে; তার সামনে এ সব কথা হতে তোমার অমত হবে কি?"

দীনেশ একটু হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না। এক দিন তিনিই তো আমাদের জমিদার হবেন, গ্রামের লোকের স্বভাব তাঁরও জেনে রাখা ভালো।"

বিদায় লইয়া সে চলিয়া আসিবার সময় দীনেশ একবার মুখ তুলিয়া দ্বিতলের রেলিং ঘেরা বারাণ্ডার পানে তাকাইল।

বারাণ্ডায় শীর্ণ কায়া একটী তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পানে চোখ পড়িতেই দীনেশ মুখ ফিরাইয়া দ্রুত সামনের দিকে চলিল।

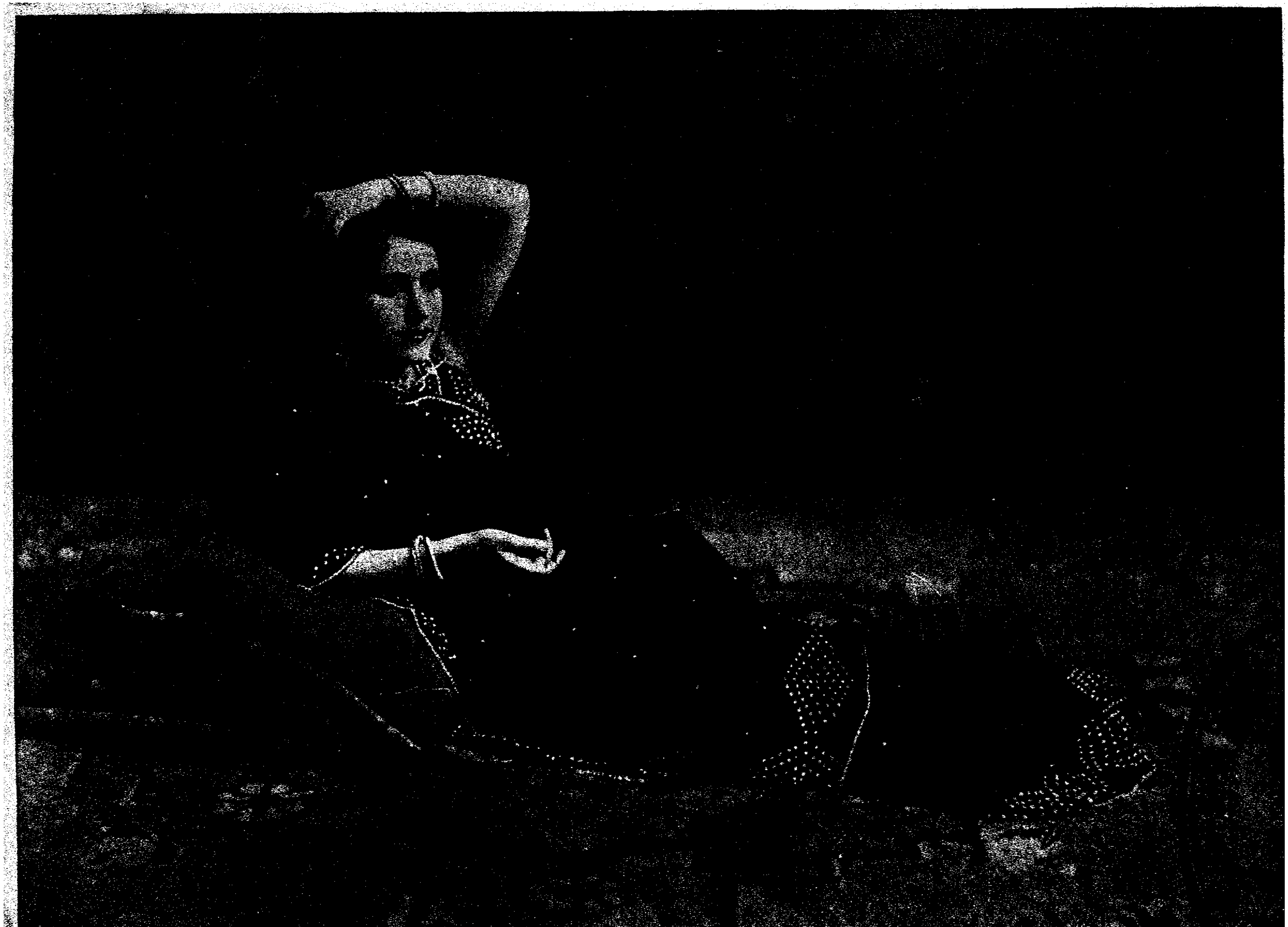
" চলবে

বৈশাখ

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হে বৈশাখ! হে রুদ্র আমার!
কী ঘোর তপস্যা শেষে,
আসিলে সন্ন্যাসী বেশে,
সর্ব্বনেশে সন্তান ভূমার।
পিঙ্গল-ও-জটাজালে
কী লেখ গগন ভালে?
কী জানাও তুমি বার বার?
নটরাজ! হে আমার গুরু!
সুনীল অম্বর' পরে,
কপিল ও জটা ভারে,
কার লাগি' মেঘ কর সুরু?
ঈশানের কোণ ছেয়ে,
পলকে আসিছে ধেয়ে,
গুরু, গুরু বাজায়ে ডমরু।

ওগো মৃত্যু! ওগো সর্ব্বনেশে!
গাহি প্রলয়ের গান,
কাঁপায়ে নিখিল প্রাণ,
ভেঙ্গে ধ্যান এলে একী বেশে?
আবরি সুনীলাম্বর,
গর্জ্জি' কর্ কর্ কর্,
মুমূর্ষকে উড়ালে নিঃশ্বাসে।
হে বৈশাখ, রক্ত চক্ষু ঘোর!
উন্মাদের প্রায় আসি,
হাসি ঘোর অট্টহাসি,
দাও গ্রাসি বিগত বৎসর।
প্রলয় নিঃশ্বাস ফেলি',
পুরাতনে দাও ঠেলি',
হে বৈশাখ! হে পরাণ চোর
... আমার
... আমার।



পেসেন্স কুপার

(সারদা পিক্‌চার কোম্পানীর সৌজন্যে

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

Patience Cooper

স্বরলিপি

কথা—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

সুর—কাজি নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

বিজলী খেলে আকাশে কেন
কে জানে গো কে জানে।
কোন্ চপলের চকিত চাওয়া
চমকে বেড়ায় দূর বিমানে
মেঘের ডাকে সিন্ধু কূলে,
অশান্ত স্রোত উঠ্‌ল দুলে,
সজল ভাষায় শ্যামল যেন
কইল কথা কানে কানে॥
বারি-ধারায় কাঁদে বুঝি
মোর ঘনশ্যাম মোরে খুঁজি,
আজি বরষার দুখের রাতে
বন্ধুরে মোর পেলাম প্রাণে

II র্সা -া ধা ধা পা -া -া -া | ক্ষা পা ধা ধর্পা | মা -া -া -া
বি জ লী খে লে ০ ০ ০ | আ কা শে কে | ন ০ ০ ০

সা মা মা মা পা -া -া -া | মা গা মা রা | সা -া -া -া
কে ০ জা নে গো ০ | কে ০ ০ জা | নে ০ ০ ০

সা মা মা মা পা -া -া -া | ধা না র্সা ধনা | পা -া -া -া
কো ন চ প লে ০ ০ র | চ কি ত চাও | য়া ০ ০ ০

র্রা র্সা না র্সা পা ক্ষা পা পা | মা মা রা রা | সা -া -া -া II
চম্ কে ০ ০ বে ০ ড়া য় | দূ র বি মা | নে ০ ০ ০

II পা পা পর্সা র্সা | র্সা -া -া -া | র্রা -া র্রা ০ধা | র্সা -া -া -া

মে ঘে র ডা | কে ০ ০ ০ | সি ০ ন্ধু কূ | লে ০ ০ ০

পা পা র্রা র্রা | র্রা -া -া র্রা | পা ধা ধা পধা | মা -া -া -া

অ শা ০ স্ত | স্রো ০ ০ ত | উ ঠ্ ল দু | লে ০ ০ ০

মা মা মা মা | মা পা -া পা | ধা না র্সা ধনা | পা -া -া -া

স জ ল ভা | ষা ০ ০ য় | শ্যা ম ল যে | ন ০ ০ ০

পা পা ধপা মা | গা -া -া -া গা মপা মা রা | সা -া -া -া II

ক ই ল ক | থা ০ ০ ০ কা ০ নে কা | নে ০ ০ ০

II রা গা মা গা | রা জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা রা | সা -া -া -া

বা ০ রি ধা | রা ০ ০ য় কাঁ ০ দে বু | ঝি ০ ০ ০

রা মা মা মা মা -া -া পপা | পা ধা ণা ধা পা -া -া -া

মো র ঘ ন শ্যা ০ ০ ম | মো ০ রে খুঁ জি ০ ০ ০

না না না র্সা | না র্সা -া র্রা | র্রা র্মা র্রা র্রা র্সা -া -া -া

আ জি ব র | ষা ০ ০ র | দু খে র রা তে ০ ০

রা -া মা মা | পা -া -া পা মা মা মা রা সা -া -া -া IIII

ব ০ ন্ধু রে | মো ০ ০ র পে লা ম্ প্রা ণে ০ ০ ০

এই গানের রেকর্ডের স্বত্ব গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁহাদের হিজ্ মাষ্টার ভয়েস্ রেকর্ডের জন্য ক্রয় করিয়াছেন।

দেবদাস ও পাতালপুরী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

যাঁহারা সিনেমা দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেকেই হয়ত সম্প্রতি ছবি দুইখানি দেখিয়া থাকিবেন। সাধারণ দর্শকের চক্ষু দিয়া ছবি দুইখানিকে বিবেচনা না করিয়া নানারূপ টেকনিকের দিক হইতে আমি ছবি দুইখানির তুলনা মূলক সমালোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলিয়া রাখিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে চিত্র জগতে ফটোগ্রাফি আর্টে বাংলা বোম্বাইয়ের অনেক উপরে। বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার ছায়া জগতের এই দিকটাকে অনেক উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিভূতি দাসের চাঁদসদাগর, যতীন দাসের হিন্দী সীতা, নীতিন বোসের হিন্দী চণ্ডীদাস ও ইহুদি-ক্যা-লাড়কি, বাস্তবিকই উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক। কালী ফিল্মের ফটোগ্রাফি এতদিন বাংলার আদর্শে কিছু নিম্নেই ছিল। কিন্তু ননীগোপালের ফটোগ্রাফি কালী ফিল্মকে এই নিম্ন শ্রেণী হইতে উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। বাংলার আর একটি বিশেষত্ব ইহার সাবলীল রেকর্ডিং। যাঁহারা রেকর্ডে গান শুনিয়া থাকেন বা যাঁহারা রেডিওতে গান শুনেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন Amplifier ব্যবহার করিবার জন্য, খুব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতেও কেমন একটা যান্ত্রিক আবহাওয়া আসিয়া পড়ে। সিনেমার অনেক ছবিতেই এই দোষ খুব প্রবলভাবে বিদ্যমান। বোম্বাই ছবিগুলিতে প্রায়ই এই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলায় এক নিউ থিয়েটারের ছবিগুলি ব্যতীত এই দোষ অল্প বিস্তর প্রায়ই আছে। কিন্তু Metallic শব্দ ছাড়াও শব্দের ও একটা সাবলীল ভাব আছে। মনে করুন এক জায়গায় একটি বাঁশী খুব করুণ রবে বাজিয়া উঠিল—খুব স্বাভাবিক ভাবে ইহার রেকর্ড করিতে গেলে উহার রেশ টাকেও স্থান দিতে হইবে। শব্দের এই রেশকে ছবির মধ্যে স্থান দেওয়া খুবই শক্ত এবং উহা সম্ভবপর হইলে কত সুমধুর হয়—তাহা যাঁহারা বিখ্যাত বিলাতি চিত্র Dumbs বা Kid Millions দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

ছবিতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বস্তু উহার Tempo. এই tempoর উত্থান-পতনেই ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণের অবগতির জন্য—উহার একটু ব্যখ্যা এখানে দিতেছি। গতি বা motion এ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হীন অবস্থা তখনি হয় যখন উহা গতিহীন হয়। গঙ্গার জল যখন তালে তালে নৃত্য করিয়া ধাবিত হয়—তখন উহার tempo বা সঙ্গীত পূর্ণ গতি আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন জাহ্নবী শান্ত ভাব ধারণ করে—তখন মনে করিতে হইবে—স্রোতস্বতী নিদ্রিতা বা উহার জীবনী শক্তি কোন মহান শক্তি কর্তৃক আক্রান্তা ও অভিভূতা। ছবির tempo ও ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার গতিতে যদি সঙ্গীত মুখরিত হয় এবং স্পন্দনের সহিত আমাদের হৃদয় তন্ত্রী নাচিতে সুরু করে তখন বুঝিতে হইবে উহার tempo আছে।

এখন দেখা যাক আমাদের আলোচ্য ছবি দুইখানিতে এই সব টেকনিকের কোন্ অংশ বিদ্যমান আছে। গল্পের ও আর্ট আছে। ছবির গল্প ও নাটকের গল্প এক নয়। নাটকের গল্প ঘাত প্রতিঘাতে গড়িয়া উঠে। উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় আবৃত্তির ঝঙ্কারে। ছবির গল্প আরম্ভ হয় উন্টা দিক হইতে অর্থাৎ পরিশেষটাকেই প্রথম মানস-চক্ষে ফুটাইয়া—তাহার ছবির পার্শ্বে—অপর ছবি সমস্ত পর পর সাজাইয়া যাইতে হয়—এবং সর্ব্বশেষে যে ছবি আসিয়া দাঁড়ায়—তাহাই উহার প্রথম ছবি। পাতাল পুরীর প্রথম দৃশ্যে আমরা একটী সাঁওতাল যুবককে যুবতীর সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখিতে পাই, দেবদাসের আরম্ভ আরও সাধারণ ভাবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। এখন দেখা যাক এই চিত্রের সহিত উহাদের শেষ চিত্রের সামঞ্জস্য কিরূপ। পাতাল পুরী নামটিই কিরকমের, ইহার মধ্যে উহার Plot

এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। উহার আরম্ভের সহিত শেষের সামঞ্জস্য আছে—অর্থাৎ ছবিখানি মিলনান্তক। ইহা কিন্তু খুবই দোষের। পাঠক যদি প্রথম ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারেন যে—শেষে কি হইবে—তাহা হইলে সমস্ত ছবিখানিই Boring হইয়া উঠে। পাতালপুরী এইজন্য খানিকটা Boring. নূতনত্ব অনিবার চেষ্টা যে পাতালপুরীতে নাই, একথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু তাহার প্রভাব বড়ই ক্ষীণ। নায়ক-নায়িকা একত্র দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করিয়া বাস করিতে থাকিলেই মণ্ডেল গল্পের অবসান হয়। টুমনি মুংরার একত্র অবস্থান এই জন্যই ইহাকে অনেক প্রাণহীন করিয়া করিয়া দিয়াছে। মোটকথা এই যে Motion Picture মোশন না থাকিলেই উহা দোষ যুক্ত হইয়া পড়ে।

দেবদাসকে খুব সাধারণ ভাবে দর্শকের নিকট উপস্থিত করিলেও—উহার শেষের সহিত ভাল সামলাইবার জন্য—উহা ধাপে ধাপে বেশ উঠিয়াছে। দেবদাস পার্ব্বতীকে চাহে—কিন্তু পার্ব্বতী মায়া মরীচিকার মতন সরিয়া গিয়াছে, ইহাতে দর্শকের আগ্রহই বাড়িয়া গিয়াছে। শেষের দৃশ্যটি অতুলনীয়, আমি মনে করি উহাত শরৎ বাবুর উপরও কারসাজি করা হইয়াছে। পার্ব্বতী ও দেবদাস পরস্পর পরস্পরকে চাহিয়াছিল, কিন্তু—সমাজ ও পিতা মাতা বৈরী হইয়া তাহা সম্ভবপর হইতে দিল না।—হৃদয় কিন্তু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। মৃত্যু শত বন্ধন মুক্ত করে এই জন্য প্রাণ হীন দেবদাসের শব যেমন দাহ হইতেছে দেখান হয়—ঐ সঙ্গে সঙ্গেই পার্ব্বতীর শব-যাত্রা সুরু হইয়াছে তাহাও দেখান হয়। উহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ—প্রাণ হইতে যেন আপনা হইতেই শব্দ হয়—প্রিয় দাঁড়াও, আমি তোমারই।

Tempo এর দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, পাতাল পুরীতে কোন রূপ tempo আছে বলিয়া মনে হয় না। Motion থাকা প্রয়োজন এই জন্য Motion আছে এ কথা সত্য, কিন্তু ঐ Motion এ কোনরূপ ছন্দ নাই, উহা একেবারেই flat টুমনিকে শরাঘাত করিবার জন্য মুংরা উদ্যত—উহা একেবারেই প্রাণহীন। দেবদাসের Tempo কিন্তু প্রাণ আছে, উহার খুব সাবলীল গতি না থাকিলেও, উহা আমরা বেশ অনুভব করি পল্লী গ্রাম হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য পিতা মাতার নিকট হইতে দেবদাস যখন বিদায় হইতেছে, কিম্বা দেবদাস যখন মৃতপ্রায় রাস্তার ধারে পতিত থাকে, কিম্বা দেবদাস যখন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে দেখা হয়, তখন যেন মনে হয় Tempo মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে। Background music বা নেপথ্যে সঙ্গীতের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে পাতালপুরীর দুই এক স্থলের নৈপথ্য সঙ্গীত খুবই মনোরম ও শ্রুতিমধুর, কিন্তু দেবদাসের সঙ্গীত সর্ব্বত্রই সুন্দর। ভাব ও গতির সহিত উহার মিলন খুবই স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছে।

ফটোগ্রাফির দিক হইতে বিচার করিলে এই কথাই বলিব যে পাতালপুরীর ছবি ভাল হইলেও দেবদাসের ফটোগ্রাফি অতুলনীয়। দুইখানি ছবিতেই একখানি চলন্ত ট্রেণের চিত্র দেখান হইয়া থাকে। চলন্ত অবস্থায় ফটোগ্রাফ লওয়ার নাম Akeby shot দেবদাসের Akeby shot দেখিয়া আমাদের কলম্বিয়ার প্রাইজ পাওয়া ছবির It happened one night এর কথা মনে পড়ে। উহাতে একটি চলন্ত মোটর বাসের দৃশ্য দেখান হয় তাহার বাস্তবিকই তুলনা হয় না। ছায়াচিত্রে ফটোগ্রাফিতে যদি Suggestion থাকে—তাহা হইলে উহার ফল বড়ই কার্য্যকরী হয়। দেবদাসের ফটোগ্রাফিতে এই গুণ খুব অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। তারপর রেকর্ডের কথা। একথা খুবই সত্য যে পাতালপুরীর রেকর্ডিংএ কোনরূপ বাজে শব্দ—বা শব্দের উত্থান-পতন বেশ ভাল ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহা একেবারেই যন্ত্রের মতন প্রাণহীন—রেশ যে আছে তাহা কয়েকটী স্থল ছাড়া ধরিতেই পারা যায় না। দেবদাসে এই রেশ বেশ আছে, কিন্তু রেশেও অধঃ-উর্দ্ধ গতি চাই, তাহা উহাতে নাই।

মোট কথা পাতালপুরী ও দেবদাস দুইখানি দেখিবার মত ছবি হইয়াছে। তবে দেবদাসএ প্রযোজক যেরূপ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন, পাতালপুরীতে তাহার প্রযোজক সেরূপ সফলকাম হইতে পারেন নাই।

—

নূতন ছবি

গুরুচরণ

এই মাসে যে কয়খানা ছবি মুক্তি লাভ করিল—

১। পাতালপুরী

২। দেবদাস

৩। বাসবদত্তা

ইহার ভিতর একমাত্র 'দেবদাস' যা ভাল হইয়াছে। সত্যই আমাদের দেশের ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠাতাদের এরূপ অসাফল্যতার জন্ম আমরা দুঃখিত। ভাল ছবি তুলিতে হইলে প্রয়োজন ভাল পরিচালকের, সুদর্শনা অভিনেত্রী' আর সুঅভিনেতাদের। সুঅভিনেতার অর্থ সর্ব্বদাই নামজাদা অভিনেতা নয়। আর রুচির দিকে লক্ষ্য রাখাও একটা কর্ত্তব্য। তবে রুচি মানে সুরুচি—শিল্পকলার ভিতর নিম্নশ্রেণীর জঘন্যতা বাস্তবিকই নিন্দনীয়। Song of Songs বই আর 'তুলসীদাস' 'কলঙ্কভঞ্জন' ও বই। তুলনা করিলে নিরূপণ করা যায় কাহার কত মূল্য। আমাদের দেশে আজ কাল দু'একটা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস-এর গল্প বা রোমাঞ্চকর বা বঙ্গচিত্র গোছের ছবি তুলিবার চেষ্টা করা মন্দ নয়। অবশ্য আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তারাও বেশ ভুল বুঝিয়া থাকেন। কেননা তাঁহারা অনেক সময়ে আগে পয়সার দিকটাই বিচার করিয়া দেখিতে যান। কিন্তু তাহার ফলে পরে ঠকিতে হয় নিশ্চয়ই।

পাতালপুরী (শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর প্রযোজনায় তুলিয়াছেন কালী ফিল্মস্) ছবিখানি গড়িয়া উঠিয়াছে সাহিত্যিক শৈলজাবাবুর একখানি উপন্যাস অবলম্বন করিয়া, আর উহাতে অভিনয় করিয়াছেন, তিনকড়ি বাবু, জীবন গাঙ্গুলী, শিববালা আর মায়া প্রভৃতি। এই মায়াকে আগে কোন প্রধান ভুমিকায় নামানো হয় নাই, এই প্রথম। ইহার আগে বিষমঙ্গলে ইহাকে বণিকপত্নীর ভুমিকায় দেখিয়াছিলাম। ফিল্ম-অভিনয় করিবার মতো চেহারা ইহার আছে, এবং ভবিষ্যতে ইঁহার আরো ভালো অভিনয় আশা করি।

সে যাক্ "পাতালপুরী" ছবিখানি প্রথমত দীর্ঘ লাগে এবং ট্রেণের এত 'একলি সট্' বেশ বিরক্তিকর ঠেকে। তাছাড়া মাঝে মাঝে পরিচালনার খুঁত অতি সাধারণ দর্শকএরও চক্ষুপীড়া উৎপাদন না করিয়া পারে না। তাহা ছাড়া আর একটা জিনিষ যে বইটার মধ্যে একটুও আকর্ষণী শক্তি নাই। মাঝ মাঝে অবশ্য climax এর element যে একেবারে নাই, তা অবশ্য বলা চলে না। শেষের দিকটা (যাহারা বই না পড়িয়াছে) তাহাদের শেষ-টুকুর জন্য বেশ কৌতুহলও জাগে। সেইজন্য মনে হয় একটু সাবধানে বইখানা তুলিলে বোধ হয় বইখানার আদর হওয়া অসম্ভব হইত না। তাহা ছাড়া সিনারিও রচনা যে খুব ভালো হইয়াছে তাহা নহে। সম্পাদনা এখানা আর একবার করা চলিতে পারে। অভিনয় মোটের উপর ভালোই হইয়াছে। শিববালা সুঅভিনয়ই করিয়াছেন এবং গানও বেশ। মায়ার অভিনয়ে একটু আড়ষ্টতা ছিল। জীবনবাবুর অভিনয় এক এক জায়গায় প্রাণহীন হইলেও কতকক্ষেত্রে সুন্দর হইয়াছে। তিনকড়িবাবুও মন্দ নয়—তবে এ বয়সে আর গান গাহিবেন আশা করি নাই। এ ছাড়া অন্যান্য ভুমিকাও মন্দ নহে। তবে শব্দযন্ত্রীর কার্য্য আমাদের একেবারে নিরাশ করিয়াছে। তবু চিত্রশিল্পীর প্রশংসা অনেক জায়-গায় করা যায়। জায়গায় জায়গায় Back ground music ও বেশ বেমানান শোনাইয়াছে।

দেবদাস : কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তুলিয়াছেন নিউথিয়েটার্স লিমিটেড। শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দেবদাস' কেই ইহারা চিত্ররূপ দান করিয়াছেন। দেবদাসের ভুমিকায় প্রমথেশ, চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবতী, পার্ব্বতী যমুনা, চুনীলাল : অমর মল্লিক ও ধর্ম্মদাস : মনোরঞ্জন

ছাড়া ভিক্ষুক ও জনৈক ভদ্রলোকের ভূমিকায় কৃষ্ণবাবু ও মিঃ সায়গল দেখা দিয়াছেন।

বইখানি যে মোটের উপর তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে তাহা বোধ হয় খুব রসজ্ঞ দর্শকও অস্বীকার করিবেন না এবং দেবদাস বইখানির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও যে একপ্রকার অক্ষুণ্ণই থাকিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক। প্রথম হইতেই পরিচালকের সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় দর্শককে আনন্দ না দিয়া পারে না যদিও মাঝে মাঝে ত্রুটির অভাবও পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলা ছবি হিসাবে পরিচালনার দিক দিয়া যে একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। Back ground music ও বইখানির জন্য রচিত Symbolic গানগুলি বাস্তবিকই উপভোগ্য। Scenerio রচয়িতার কিছু রচনা করিতে হয় নাই সত্য কিন্তু সাজানো ও সমাবেশ করার কৃতিত্বও প্রশংসনীয় যদিও শেষের দিকে দু'একজায়গায় একটু একঘেয়েমি আসিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্য নির্ব্বাচনও ভালো হইয়াছে। তারপর অভিনয় হিসাবে তৃপ্তি আমাদের দিয়াছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। এঁর ভাবাবেশপূর্ণ অভিনয় ও সংযমপূর্ণ সুন্দর অভিব্যক্তি অতুলনীয় হইয়াছে; তাহা ছাড়া ইঁহাকে মানাইয়াছিলও চমৎকার! যমুনার অভিনয়ও কম সুন্দর হয় নাই, প্রথম আরম্ভটুকু ত হইয়াছিল ভয়ানক impressive, তবে এর চেহারাটা তেমন ভালো মানায় নাই। বিশেষতঃ Sideview গুলি; তবে ইনি বিশেষ Smart বলিয়া মনে হইল। প্রমথেশের অভিনয় ভালো হইলেও আগাগোড়া সমান হয় নাই। যেমন 'পার্ব্বতীকে মারিবার সময়। এজায়গায় দুজনের অভিনয় হইয়াছে খারাপ। জায়গায় জায়গায় অবশ্য এঁর অভিনয় বেশ উচ্চশ্রেণীর হইয়াছে। অমরবাবু নামোপযোগী সুঅভিনয় করিয়াছেন, মনোরঞ্জনও তাহাই। আর গানের দিক দিয়াও আমাদের তৃপ্তি দিয়াছেন, কৃষ্ণবাবু ও মিঃ সায়গল। অহিবাবুর গান খানিও ভালো হইয়াছে। ইঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ভূমিকায় নিন্দা করিবার নাই। আলোক শিল্পী ও শব্দযন্ত্রী দুজনকেই আমরা তাঁদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

ফরসেকিং অল আদার্স:—

খ্যাতনামা পরিচালক ভ্যান ডাইকের পরিচালনায় একখানি সুন্দর হাস্য মধুর মিলনাত্মক ছবি বইখানিতে অভিনয় করিয়াছেন, ক্লার্ক গেব্‌ল, জোয়ান ক্রফোর্ড, রবার্ট মণ্টগোমারী, চার্লস বাটারওয়ার্থ প্রভৃতি।

গল্পাংশ:—মেরী এবং ডিলের বিবাহের কথা ঠিক ঠাক্। এমনি সময় ডিল হঠাৎ কোনিকে বিবাহ করিয়া বসিল। মেরী বেচারা রাগিল, ব্যথা পাইল অনেক বেশী! এবং পুরাণো বাল্যবন্ধু জেফ এর সাথে নানা খেলা ধুলায় মন দিল। কিন্তু মনে মনে সে ডিলকে ভুলিতে পারিল না। এমনি ভাবে হয় গল্পের সুরু—এবং নানা ঘটনার ভিতর দিয়া শেষ পর্য্যন্ত ডিলের সহিত হয় জেকেরই বিবাহ। ইহার ভিতর ব্যথার পাশেই হাস্যরসেরও সুসমাবেশই আরো চমৎকার হইয়াছে! আর সিনারিও রচনা হইতে টেক্‌নিক্ পর্য্যন্ত ভারী মনোরম লাগে! অভিনয় ত অনবদ্য। প্রশংসা যেন কেহই কম পাইবার যোগ্য নন! ক্লার্ক এর সেই পরিচিত হাসি, সুন্দর কথার ভঙ্গি, জোয়ানের চলন আর টানাটানা কথার সাথে চোখ-মুখ, আর মণ্টগোমারির তাহারই ভিতর মাঝে মাঝে গাম্ভীর্য্য বাস্তবিক উপভোগ্য! চার্লস বাটার-ওয়ার্থও সুঅভিনয় করিয়াছেন, কোনির ভূমিকায় ফ্রান্সিস্‌ও উল্লেখ যোগ্য। মোট কথা, এমন মনোরম ছবি সকলেরই দেখা উচিত।

দি ম্যান হু রিক্লেম্‌ড হিস হেড

অভিনয় করিয়াছেন, ক্লদেৎ রেইনস্, জোয়ান চেনেট্, লাওনেল, অ্যা ট্‌ উইল ও বেবি, জিন।

দি ইন্‌ভিজিভল ম্যান এর মতো ছবি দেখিয়া যাঁহারা আনন্দ পান—এ ছবি খানিও তাঁহাদের পূর্ণ তৃপ্তিদান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস! ভীতিপূর্ণ, চমকপ্রদ, ঘটনাবলী কৌতুহলী হইয়া দেখিতে হয়!

সাহিত্যে হাস্যরস

।যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বাংলার বড়ই দুর্ভাগ্য যে বাংলায় যথেষ্ট গীতিকবিতার প্রাচুর্য্য থাকিলেও হাস্যকবিতার একান্তই অভাব। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোনরূপ হাস্য-প্রবণ কবিতা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তবে একথা সত্য কোন কোন খণ্ড কাব্যে স্থান-বিশেষে হাস্য-রসের অবতারণা করা হইয়াছে। খুব সম্ভব বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁয়াই বাংলা ভাষায় প্রথম নিছক হাস্য-প্রহসন। তাহার পর গিরিশ চন্দ্র ও অমৃতলাল নানাবিধ কৌতুক নাট্য লিখিয়া গম্ভীর প্রকৃতি ও ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীকে হাসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের হাস্যরস অবতারণের প্রচেষ্টায় কোনরূপ মৌলিকতা দেখা যায় নাই। রসিকরাজ অমৃতলালই প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে এই পথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক। তাঁহার সুমধুর অমৃতমদিরা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, নাট্যকার অমৃতলাল হাস্য-রসপ্রবণ কবিতা রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। চৈত্র সংক্রান্তি জেলে পাড়ার সংএ তিনি টপ্পা-ধরণের যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া দিতেন কিম্বা পূজার বাসরে যে হাস্য-রসের অবতারণা করিতেন তাহার মধ্যে শুধুই যে মৌলিকতা ও গবেষণা থাকিত তাহাই নহে, তাহার মধ্যে দেশের জন্য হৃদ্যতাও যথেষ্ট থাকিত। 'বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব,' তাঁহার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, বাঙ্গালী এখনও তাহার এই অপূর্ব্ব গাথা ভুলিতে পারে নাই।

হাস্য-রসের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিবার আমাদের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার গতি, উৎপত্তি ও বিকাশের একটা সাময়িক আলোচনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচীন গ্রীসে বিশ্ব-বিখ্যাত ট্রাজিক কবিগণের আবির্ভাবের সহিতই আমরা অদ্ভুত হাস্যরস পরিবেশনকারী কবি অরিসটোফেনিসের (Aristophanes) এর দর্শন পাই। তিনি তাঁহার ব্যঙ্গ-চিত্রে সক্রেটিস হইতে আরম্ভ করিয়া কাহাকেও কষাঘাত করিতে বাকি রাখিতেন না। তাহার লেখায় বিশেষত্ব এই ছিল যে, মানুষের ক্ষুদ্রত্ব ও অল্পতাকে কবিতারূপ ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে বাড়াইয়া সাধারণের নিকট সেই সমস্ত দোষাবলী ধরিয়া দেওয়া। রোমীয় যুগে হাস্যরসের চর্চ্চা তেমন বিশেষ হয় নাই, মধ্য যুগে ধর্ম্মের মেরুদণ্ডে পিষ্ট হইয়া ইউরোপ বাসীগণ হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল বলিলে বোধ হয় কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মিলটনের যুগে হাস্য পিউরিটান সরকারের নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণিত হইত। কতকটা গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংলণ্ডে সাধারণের অবস্থা যখন একটু ভাল হইতে আরম্ভ হয় তখন আমরা বিখ্যাত হাস্য-রসিক অমায়িক এডিসনের (Addison) আবির্ভাব দেখিতে পাই। তাঁহার Spectator, সপ্তাহে সপ্তাহে নানারূপ হাস্যরসের বার্ত্তা বহিয়া তখনকার ইংরাজগণের প্রীতি বর্দ্ধন করিত। এডিসন কবি ছিলেন না, যদিও দুই একটা কবিতা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সত্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল তাঁহার প্রবন্ধগুলির উপরেই। এডিসন সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া হাস্য জগতে এক নূতন যুগের সূত্রপাত করেন। তাঁহার ব্যঙ্গে কোনরূপ গাত্রদাহ বা ঈর্ষা লক্ষিত হইত না। খুব সাবলীলভাবেই তাহার গতি প্রবাহিত হইত। তাহার পর ফরাসী কবি ভলটেয়ার তাঁহার তীক্ষ্ণধার তরবারী দ্বারা, Aristo-

phanesএর হাস্যরসকে যুগধর্ম্মানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া ইউরোপে তাহার নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ভলটেয়ার কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। যেখানেই কদর্য্যতা তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে তাহার গায়ে অতিরঞ্জিততার ছাপ দিয়া সাধারণের নিকট তাহার আলেখ্যকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছেন। এডিসন সাহেব কিন্তু তাহা করিতেন না। তিনি মানুষের ক্ষুদ্রত্বকে সহানুভূতির আবরণে রস সঞ্চারিত করিয়া অনেকটা মিষ্টান্নের ন্যায় মুখ-রোচক করিয়া পরিবেশন করিতেন।

রসরাজ অমৃতলাল এই সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। তাঁহার পদ্যে ও নাটকে আমরা পরশ্রীকাতরতার তীব্র গন্ধ অনুভব করি না। তাঁহার সমস্ত চিত্র নাট্যই সহানুভূতি ও দেশ ভক্তিতে পরিপূর্ণ। দ্বিজেন বাবুও হাস্যরসের কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় স্বচ্ছভাব আছে এবং তাহা সুন্দর। কবি রজনীকান্তের কবিতা তাঁহার গুরু দ্বিজেন্দ্রলালের কতকটা অনুকরণে হইলেও তাহাও অতি সুন্দর।

প্রকৃত হাস্যরসের অভাব আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা। আত্ম বিস্মৃত জাতি আমরা, সত্যকথা বলিতে কি আমরা হাসিতে ভুলিয়া গেছি বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। কাজেই আমাদের মধ্যে জয়দেব, চণ্ডীদাস, মাইকেল, নবীনচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ থাকিলেও, আমরা হাস্যরসের নূতন কবিকে আবিভূ ত হইতে দেখিলে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠি। শ্রীযুত সুধাংশুকুমার হালদার একজন বাংলার কৃতী সন্তান। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বরপুত্র ছিলেন এবং স্বীয় কৃতকার্য্যতার ফল হিসাবে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের অন্যতম আই-সি-এস কর্ম্মচারী। শুনা যায় বঙ্কিমবাবুই নাকি আই-সি-এস রমেশচন্দ্রকে বাংলা লেখার অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। তাহার পর আই-সি-এস্ গণের বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি বড় একটা দেখা যাইত না। বর্ত্তমান সময়ে কয়েকজন আই-সি-এস বাংলার খ্যাতনামা লেখক হইয়া উঠিয়াছেন, মিঃ হালদার তাঁহাদের মধ্যে একজন। অনেকেই বিচিত্রা প্রমুখ মাসিক পত্র মারফৎ তাঁহার গল্প ও কবিতা পাঠ করিয়া থাকিবেন, বর্ত্তমানে এই প্রবন্ধে তাঁহার এক অভিনব হাস্য কাব্য 'হাসির মেঘদূতের' সহিত পাঠকগণকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহি।

কালিদাসের মেঘদূত বিরহের উচ্ছ্বাস। বাংলায় চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। উদীয়মান কবি সেইজন্য তাঁহার মেঘকে দূত পদে বরণ করিয়া এডিসনের ঢংএ যে নূতন কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য।

বাংলার হতভাগ্য শিক্ষিতগণ অনেক সময়েই বিবাহ করিয়া গৃহে তাহাদের যুবতী পত্নীকে রাখিয়া সামান্য মাহিনায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিদেশে গমন করিতে বাধ্য হন। সেখানে তাহাদের বিরহী মন সদাই উদাসী হইয়া গৃহ-পানে ছুটিয়া থাকে। যৌবন উন্মেষের সহিত যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হয়—তখন মানুষ চাহে ভোগ, রসাল ও কায়িক। বাংলার হতভাগ্য যুবকগণ ঠিক এই সময়ে অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনে দূরদেশে, অনেকটা বন্দী ও একেলা ভাবে—নানারূপ ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা করিতে বাধ্য হন। হাসির মেঘ দূতের ইহাই পূর্ব্বমেঘ। পাঠকের অবগতির জন্য তাঁহার অপূর্ব্ব লিপিকুশলতার দুই একটী পরিচয় নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

'শকুনির মত হেথা বড় বড় মচ্ছড়
কী করে কাটাব আমি পুরো এক বচ্ছর।'

এখানে বচ্ছর অর্থে—যে পর্য্যন্ত না মোটা মাহিনা হয় অর্থাৎ সপরিবারে থাকিবার মতন সঙ্গতি হয়।

সহি বিরহের জ্বালা
চল্ চল্ করে বালা।

অদ্ভুত চিত্র। মানস চক্ষে প্রিয়ার প্রেমাপ্লুত বদনখানি ভাসিয়া যায়—কিন্তু হা অদৃষ্ট—বিরহ সহ্য করিতেই হইবে, কেননা 'কলির কুবের'—তাহাকে এইখানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

চাকর? বল কি ভ্রাতা!
একি তব কলিকাতা?
উড়িয়া বামুন জুটে
কান তাল গেল পলায়ে।

অম্বাবলম্বী বাঙ্গালীর জলন্ত আলেখ্য। বিদেশে অল্প বেতনে চাকুরী করিতে গেলে এরূপ অবস্থা অনেকেরই হয়।

আবার—

আমি রাঁধি চেখে চেখে
রান্নার বই দেখে,
ছিনু ভাই চির দিন,
গৃহিণীর অঞ্চল।

এই আলেখ্য খানির উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এও ভাবে—

তাহারে স্মরিলে হায়
মাথা যে ঘুরিয়া যায়!
মনে হয় আমি যেন
পড়িয়াছি পগারে।

পত্নীর উপর আত্মনির্ভরতা কতটা তাহা বলিতে কবি বলিতেছেন:—

প্রিয়া মোর বলেছিল, লাগিলেই ঠাণ্ডা,
কুইনিন খেয়ে যেন রাখিবার প্রাণটা!

বাংলার মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা।

ছোট লোকের দেমাক ভারি,
চাইনে কিছু তাদের কাছে,
বড়র কাছে হলেও বিফল
চাইতে চল
কী লাজ আছে।

পূজার ছুটিতে এইরূপ কয়েদীগণ মুক্তি পাইয়া থাকেন। তাই স্বামী-বিরহিণীগণ বর্ষা আসিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া বলিতেছেন।

বর্ষা! বর্ষা! আসিয়াছে বর্ষা!
ফর্সা! ফর্সা! মন হল ফর্সা!
স্বামী মহাশয়গণ করিবেন আগমন
আর নাহি সংশয়, হল এবে ভরসা।

প্রথম অঙ্কে কবি বিরহ কাতর বর্ত্তমান যুগের যক্ষকে বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কে—ভৌগলিক ইতিবৃত্তে বিরহ-বিরহীগণের এক Cinematographic আলেখ্য দিয়াছেন। কবিতা হিসাবে ইহা যেমন অতুলনীয়—ইহার ভাব ধারণাও সেইরূপ মনোরম। আমরা দুই এক স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের আঁখি'পরে পথমাঝে যুবকেরা
পড়িতেছে ধুপ্ ধাপ নিত্য।
জালিকাটা জানালার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুরধার
ছুঁড়ি শর বিঁধিবারে চিত্ত।

এই আলেখ্যখানি নিত্যই কলিকাতার রাস্তাঘাটে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

তোমরা নারীর জাতি—নেশার কি জান ছাই!
জীবনে ত কোন দিন নেশা কিছু কর নাই।

অনেকে হয়ত বলিবেন এই প্রগতির যুগে ইহা anachronism, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কবি মাসিক ১৫টাকা হইতে ৩০ টাকা বেতনভোগী এবং বিদেশ বাসী বর্ত্তমান যক্ষপত্নীগণের কথাই বলিতেছেন।

চলিয়াছি অভিসারে কাঁটা দেয় গাত্রে
মাড়াইনু এটা কিগো, মিউ, মিউ!
বিড়ালের ছানা এল কোথা হ'তে রাত্রে
জ্বাল মেছো টর্চ বাতি!

ইহা যেমন সরস ও সহৃদয়তাপূর্ণ তেমনি বাস্তবের চরম।

প্রিয়জন সঙ্গমে প্রণয়ের তাপ বিনা
নাহি আর সন্তাপ চিহ্ন।

একেবারে বাংলার কেরাণী বধূদের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী। শেষ অঙ্কে, অলকার কক্ষে বিরহী যক্ষ হঠাৎ হাসিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইতেছেন, তখন হয়ত পত্নী তাঁহারই প্রেরিত পত্রখানি বুকে রাখিয়া শয্যার উপর তাহার বরবপু এলাইয়া দিয়া সংসারের কাজ ছাড়িয়া পাঠ করিতেছিলেন। যক্ষ পত্র দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কি করিবেন, হঠাৎ আফিস বন্ধ হইয়া গেল, এবং সেইজন্য দ্রুতগামী এবং প্রথম আয়ত্তাধীন ট্রেণে চড়িয়াই একেবারে প্রিয়ার কক্ষে আবির্ভাব।

ইহা বাংলার সাধারণ দৃশ্য।

এসেছি প্রিয়া ওগো, এসেছি ফিরে—
নয়ন যায় ভেসে পুলক নীরে!

আবার—হয়ত পদবৃদ্ধি হইয়াছে—

তুষ্ট হন পতি শান্ত রোষ
হয়েছে মার্জ্জনা যক্ষ দোষ।
আজিকে বিরহের অন্ত তার
জাগুক হাসি গান পুনর্ব্বার।

একটু আগে ননদ শাশুড়ীর গঞ্জনায় ব্যথিতা হইয়া নব-যক্ষ পত্নী ভাবিতেছিলেন,

মুখেতে বলা সোজা কাজেতে নহে।
মনেরে বুঝায়েছি, আর না সহে।
এ গৃহে চারিদিকে তাহারি স্মৃতি
হৃদয় ভরি উঠে তাহারি গীতি।
বারেক নাহি দেখা পাইলে যারে,
আকুল হইতাম, আজিকে হা রে।
কেমনে আছি বেঁচে বেদনা সহি
কেমনে গুরুভার এ দুখ বহি।

এইরূপে সকল দুঃখের অবসান হইল। হাসির মেঘদূত হইতে আমরা কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম মাত্র, কিন্তু ইহার সর্ব্বত্রই এইরূপ কবিতায় পরিপূর্ণ।

আমরা কবি সুধাংশু কুমারকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই বিয়োগান্ত-বঙ্গে তিনি যদি মিলনান্ত হাস্য রসের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন—তবে বাঙ্গালীর পরম বন্ধু বলিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

অভিসারিকা

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

এল, ফাগুন মাধুরী রাতি
জ্বলে লাখ তারার বাতি
বঁধু দুয়ার খোল, বঁধু নয়ন তোল
মম চরণে নূপুর সঘন বোলে।
পিউ কাঁহা কাঁদিছে পাপিয়া
হের মলয় চলে পিয়াসা নিয়া
দুয়ার খোল বঁধু নয়ন তোল
আলসে কবরী মম পড়িছে ঢলে।
হেনা-বাস পরাণ মাতায়
ওই কানন উতল গন্ধ বিলায়
কাঁদে তটিনী একাকিনী নিরজনে
মম বিধুর হিয়া আজি বাঁধন টুটে।
চাঁদের আলো উজল করা
কোথা বাজিছে বাঁশী আপন হারা
কোকিল কুহু রবে দিক শিহরে
মম চঞ্চল অঞ্চল পড়িছে লুটে।
আজি তিথি আনে পিয়াসা
আনে গানের মদির নেশা
চোখে আবেশ জাগে, জড়তা লাগে
হের গগণের চাঁদ যেতে চাহেনা ফিরে।
নিশি চলে যেতে চায়
ব্যথায় দিক মুরছায়
দুয়ার খোল বঁধু নয়ন তোল
হায়! চাঁদ পশ্চিম কোণে পড়িছে ঢলে।

বীমা কোম্পানী পরিচালনা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল

·ইহাদের অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাশালী "আশা" দূর ভবিষ্যৎকে কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া দেখায়, বহু বহু দূরবর্ত্তী কোন দূরের কল্পনা আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করে এবং পরাজয়শীল



শ্রীপূর্ণ চন্দ্র রায়

জুয়ারীর মত প্রত্যেক পরাজয় ঐ ক্রীড়াতে আমাকে আরও উৎসাহিত করিতে থাকে..." কাউপার

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বীমা ব্যবসায়ীদিগের একটি সম্মেলনী গঠনের প্রারম্ভিক সভায় লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'জীবন বীমা ব্যবসায় নহে মোটেই, ইহা সমাজ-সেবা। রামকৃষ্ণ সমিতি এবং জেনারেল বুথ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ত্রাণ সমিতি (Salvation Army) হইতে আমরা সেবা গ্রহণ করিয়া থাকি সুতরাং জীবন বীমার বিষয়ে বর্জ্জনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না ।......'

অবশ্য ভারতীয় হিসাবে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের স্বদেশবাসিদিগের নিকট, তাঁহাদের দেশাত্মবোধের নিকট, তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবহারের (custom) জন্য সানুনয় আবেদন করিব। কিন্তু বিদেশী জীবন-বীমা কোম্পানী বর্জ্জনের আন্দোলন হইতে ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। লেখকের এই আন্দোলনের প্রচেষ্টা তৎকালে অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভারতীয় সমব্যবসায়ীগণ প্রকাশ্যে এবং সংবাদ পত্রে নানা প্রকার বিদ্রূপ সূচক সমালোচনা দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে ইংলণ্ডে পোষ্ট ম্যাগাজিন লেখকের স্বদেশাত্মবোধ সম্পর্কীয় মন্তব্য অকুতূহলে হজম করিয়া তাঁহার বক্তব্যে ভারতীয়দিগকে তিনি বৈদেশিক কোম্পানীতে বীমা করিবার উপদেশ দিয়াছেন এইরূপ কদর্থ করিয়া একটী রুচিকর টীপ্পনী (টীকা) বাহির করিয়াছিলেন। লেখক তাহার প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলে তাহা উপেক্ষিত হইল। তাঁহার কোন পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থনকারী ছিল না,—তিনি এই অবমাননা নীরবে সহ্য করিলেন।—তাঁহার উদ্দেশ্যের সততাই তাঁহার এক মাত্র সান্ত্বনা হইল। ক্রমে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে

সঙ্গে হাওয়াও উল্টাইয়া গেল;—দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই জীবন বীমা আফিস সমূহের সমিতির তদানীন্তন সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লেখকের 'জীবন-বীমা সমাজ সেবা' সম্বন্ধীয় মন্তব্য বর্ণে বর্ণে উদ্ধৃত করিলেন। ক্রমে অপরাপর স্বনামধন্য মহাশয়গণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং আজ (ক) জীবন-বীমা জন-সেবা করে এবং (খ) জীবন-বীমা কোম্পানী সমূহ কেবল মাত্র বীমাকারী দিগের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহৃত ও পরিচালিত হওয়া উচিত এই দুইটী বিষয়ে আর মতানৈক্য নাই। উল্লিখিত দুইটী বিষয় মানিয়া লইলে আমার তৃতীয় নির্দ্দেশ, জীবন-বীমা কোম্পনী সমূহের নিজেদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিত নহে এই কথা উপপাদিত প্রতিজ্ঞার ন্যায়-ই স্বীকার্য্য। কিন্তু অদ্যাবধি বর্ত্তমান বীমা ব্যবসায় জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই। আমার এই নির্দ্দেশ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বিশেষজ্ঞদিগের এই সম্মেলনে জীবন বীমা কোম্পানী কি তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু বীমা বিষয়ে অনভিজ্ঞ যাহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন তাহাদের কথা ভাবিয়া কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। যে যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহার লগ্নিদ্বারা পুনরায় ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যিনি মেয়াদী সময়ের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন অথবা যাঁহাদের মেয়াদী সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন তাঁহাদের মধ্যে উহা বণ্টন করা যায় তাহাকে জীবন বীমা কোম্পানী বলিতে পারি।

অভিজ্ঞতা হইতে মৃত্যু হার এবং সুদের নিরূপিত হার নির্দ্ধারিত হয়। ইহার উপর নির্ভর করিয়া চাঁদার হার স্থির করা হয়। এই চাঁদা হইতেই মেয়াদী সময়ের পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে অথবা মেয়াদী সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে হয়। এই চাঁদা মূল চাঁদা (Net premium) বলিয়া পরিচিত। কোন কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্রে(Prospectus) এই হার উদ্ধৃত হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে উহাতে আমরা পাই যাহা কোম্পানীর চাঁদা (office premium) বলিয়া অভিহিত হয়। এই চাঁদার হার মূল চাঁদার হার হইতে অনেক উচ্চ। তাহার কারণ, বীমাকারী-সংগ্রহ, চাঁদা সংগ্রহ, সংগৃহীত চাঁদার ব্যবহার ও সংরক্ষণ, দাবী পরিশোধ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যয় ভার রহিয়াছে।

এবম্বিধ প্রকার ব্যয় না থাকিলে চাঁদার হার যথেষ্ট অল্প হইত এবং একই পরিমাণ টাকার অধিকতর টাকার বীমা সম্ভব হইত! বীমা পরিকল্পনার এই আদর্শ সম্বন্ধে গত বৎসর আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা হইতে কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কল্পনা করিয়াই পরমেশ্বর দুঃখক্লিষ্ট মানব জাতির প্রতি অনুকম্পাবশতঃ একটী অলৌকিক যন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। ইহার মধ্যে একদিকে প্রত্যেকের আয়ের এক ষষ্ঠাংশ জমা দেওয়া অপরিহার্য্য। এই সংগৃহিত অর্থ শতকরা পাঁচ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বর্দ্ধিত হইয়া এই যন্ত্রের সুগভীর গহ্বরে স্থান লাভ করিবে। অপর দ্বার দিয়া বাহির হইবে এই ক্রম-বর্দ্ধিত তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ। উহা দ্বারা বীমাকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার পরিবার বর্গের অথবা মেয়াদী সময়ের পরে বীমাকারীর দাবীর টাকা প্রদত্ত হইবে। ইহাতে সংগঠন কঠোরতা নাই, প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন নাই, জীবন-নির্ব্বাচনের জটিলতা নাই. লগ্নি করা বা দাবী দেবার আড়ম্বর নাই। ইহাই হইতেছে বীমা-বিদের কল্পনা প্রসূত সুখরাজ্য,—আদর্শ বীমা পরিকল্পনা। এই আদর্শেই সর্ব্বনিম্ন চাঁদার হার ও সর্ব্বোচ্চ লাভ সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ অলৌকিক যন্ত্রের সৃষ্টি ভগবান করেন নাই। মানব জাতিকে সমুচিত বুদ্ধিবৃত্তি, আদর্শস্থানীয় কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সমাজোপযোগী অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন; যেন সে স্বীয় কার্য্যের সহায়তায় স্বকার্য্যোদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। ক্রমবর্দ্ধমান মানব ক্রমে সম্প্রদায় এবং পরে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমাজের উন্নতির আমলেই সৃষ্ট হইল রাজ্য এবং;

জাতি (State) আদর্শ অবস্থায় এই অলৌকিক যন্ত্রের অভাব অনেকটা পুরণ করিতে পারে বাধ্যতামূলক সরকারী বীমা (State Insurance)। ইহাতে সংগঠন, প্রচার, ব্যবসায় সংগ্রহ প্রভৃতির বহুল ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি ফলে বীমাকারীর পক্ষে নিম্ন চাঁদাহার এবং উচ্চ লাভ পাওয়া সম্ভব হয়। আদর্শ অবস্থা শুধু কবির কল্পনায়ই স্থান পাওয়ার উপযুক্ত;—মানুষ বৃথাই সেই আবহাওয়া এবং অলৌকিক যন্ত্রের আশায় আশয় প্রথমে দিন গুনিয়াছে। পরিবর্ত্তে সে পাইয়াছে সয়তানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার সহিত হীন প্রবৃত্তি নিয়ে। এই রূপে মানব আদর্শ জাতি হইতে দূরে, আরও দূরে পিছাইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থায়, কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধীয় ব্যয় প্রভৃতি (Management expenses) সংগ্রহের নিমিত্ত মূল চাঁদার স্কন্ধে বোঝা চাপাইয়া উহা ভারী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কল্পনাত্মক ভাবে দেখিতে গেলে উক্ত খরচ পত্র যতই অল্প হইবে, বীমাকারীর লাভ ততই অধিক হইবে। অংশীদার বিশিষ্ট কোম্পানীর অংশীদারদিগের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে ন্যায়তঃ কোন প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অংশীদারদের মূলধন কোম্পানীর মোট সংস্থানের (Total funds) তুলনায় অতি তুচ্ছ। উদ্বৃত্তের (surplus) শতকরা হার অথবা বিনিকৃত লভ্যাংশের হার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি ভারতবর্ষেই যে কোম্পানীটার বার্ষিক আয় দুই কোটীর উপর এবং মোট সংস্থান প্রায় পনের কোটী তাহার প্রদত্ত মূলধন (Paid up capital) মাত্র ৬ লক্ষ টাকা (পূর্ব্বে ৩ লক্ষ ছিল)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে তিনটী বিষয়ে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার;—

(ক) কিরূপ পরিমান নূতন কার্য্য সংগ্রহ ও নির্ব্বাচন।

(খ) ব্যয় যাহাতে মূল চাঁদার উপরে যে উদ্বৃত্ত চাঁদার আয় হয় তদপেক্ষা বেশী না হয় সে জন্য সাবধানতা।

(গ) চাঁদার হার নির্দ্ধারণের সময় অথবা কোম্পানীর ব্যয় ও স্থিতি নির্দ্দেশের (valuation) সময় যে হারে সুদের পরিমাণ ধরা হয় সেই হারে নিরাপদ ভাবে সংস্থান নিয়োগ।

(ক) কার্য্য-সংগ্রহ ও জীবন-নির্ব্বাচন।

কোন বিশেষ এক তারিখে কোম্পানীর খাতায় যে সংখ্যক বীমাকারীর (cases) নাম থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, বাতিল, সমর্পন প্রভৃতির জন্য তাহা ক্রমে কমিতে থাকে। কোম্পানীর কার্য্য চালাইবার জন্য, খরচার জন প্রতি হার (Over head charges) অল্প রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং বীমার সুবিধার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় অজ্ঞাত জন সাধারণকে জানিবার সুযোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর নূতন কার্য্য সংগ্রহের প্রয়োজন। কথা হইল এই। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিতে পাই? নূতন কথা সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমরা ধরিয়া লইয়াছি, বীমা কোম্পানীগুলির অস্তিত্বই কেবল নূতন কার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত। কোম্পানী যদি কোন প্রকাশে প্রতিবেশী কোম্পানী অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য সংগ্রহে সক্ষম হয় তবে নিজেকের কার্য্য এবং উন্নতি এত সপ্রসংশ দৃষ্টিতে দেখিবে যে গর্ব্বে অধীর হইয়া উঠে। কি হারে অর্থব্যয় করিয়া এই কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছে বা লব্ধ কার্য্যে (procured business) কোন শ্রেণীর বোধ হয় কেহ তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার অবসরও পান না। এমন কি বড় বড় কোম্পানীগুলি পর্য্যন্ত এই অস্থায়ী উন্নতির জন্য প্রতিযোগীতাপরায়ণ এই বিশদৃশ প্রতিদ্বন্দীতার মাঝে ব্যয় হারের (expense ratio) কথা ভুলিয়া যায় এবং জীবন বীমা ব্যবসায় যে সেনা-শক্তুর উপর আবর্ত্তন করে সেই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জীবন নির্ব্বাচন (Selection of risks) কার্য্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বীমাকারীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই যদি কোম্পানী পরিচালনা করিতে হয় তবে যে কোন উপায়ে ব্যবসায় সংগ্রহের এই হাকারজনক প্রতিদ্বন্দিতা কেন? ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে এই প্রতিযোগিতার জন্য তাহাদিগকে না হয় ক্ষমা করা যাইতে পারে কারণ, এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের

সংগঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-বীমা কোম্পানীগুলিকে এই দ্বন্দ্বে যোগদান করিয়া বিপদ-সঙ্কুলভাবে ব্যয়হার বর্দ্ধিত করিতে এবং জীবন-নির্ব্বাচনে সংযম হারাইতে দেখিয়া বাস্তবিকই হতাশ হইতে হয়। পরিমিত নির্দ্দোষ উন্নতি নূতন কার্য্য সংগ্রহের বর্ত্তমান কদর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

(খ) সংযত ব্যয় (Control overexpense)—

অনুষ্ঠান পত্রে (Prospectus) যে চাঁদার হারের উল্লেখ দেখা যায় তাহা যে মূল চাঁদা এবং অতিরিক্ত চাঁদার (loading) সমষ্টি একথা সর্ব্বজন বিদিত। মৃত্যু নিবন্ধন হউক অথবা মেয়াদী সময়ের অধিক বাঁচিয়া থাকা কারণেই হউক, সময়ে দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে হয়। ঐ অর্থের সংস্থাপনের নিমিত্তই উল্লিখিত মুল চাঁদা এরূপ নিরাপদ লগ্নিতে নিয়োগ করিতে হয় যে মুল চাঁদা নির্ণয় করিবার সময় কোম্পানার সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণের সময় যে হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাবে করা হয়। ঐ সকল লগ্নি অন্ততঃ তদনুরূপ সুদ অর্জ্জন করিতে পারে। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতার আমলে অপেক্ষাকৃত নীচ মৃত্যুহারের আনুকূল্যে বীমা সংস্থান তহবিলে উদ্বৃত্ত রাখা অসম্ভব। সর্ব্বথা পতনশীল সুদের বাজারে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে সুদের আয় হইতেও কিছু উদ্বৃত্ত রাখা তুল্যরূপই অসম্ভব। অতএব, উদ্বৃত্ত পত্রে অঙ্কের কসরৎ দ্বারা কাগজে-কলমে কোম্পানীর সুষ্ঠু অবস্থার পরিচয় দিলেও যে সকল কোম্পানী অতিরিক্ত চাঁদা (loading) অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে তাহারা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থার অপ্রতুলতা উপলব্ধি করিবে। আমাদের মধ্যে কয়জন মূলচাঁদার (Net premium) অংশও ব্যয় করিতেছেন না? এরূপ হইতেছে কেন?—নূতন ব্যবসায় সংগ্রহের নিমিত্ত কদর্য্য প্রতিযোগীতাই তাহার কারণ। ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল নূতন কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে, পুরাতন প্রতিষ্ঠান গুলিকে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সুবৃহৎ বিদেশী কোম্পানী-গুলির প্রতিদ্বন্দ্বীতা। এই সকল কোম্পানীর মোট বাৎসরিক কার্য্যের তুলনায় উহাদের ভারতীয় কার্য্য সংগ্রহ অতি অল্প তাই ভারতবাসীগণকে প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীতে বীমার সংস্থান সুযোগ দিবার অছিলায় ক্ষুদ্র দেশী কোম্পানীগুলির সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বদেশে যে পরিমাণ খরচ হয় সে তুলনায় এখানে অনেক অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই ক্ষুদ্র ভারতীয় কোম্পানীগুলি তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তই ব্যয়ের নিরাপদ সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু খরচের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া এই কদর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, পরিণামে সেই নিরুপায় বীমাকারী-দিগকেই ব্যয়বাহুল্যের ফলভোগ করিতে হইবে। আমরা অস্তিত্ব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর এইসকল ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বটে—কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত বিধ্বংসকারী কার্য্যক্রম কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। অপর পক্ষে, আমরা দেখিতে পাই বৃহৎ, সুপ্রতিষ্ঠিত দেশী কোম্পানীগুলিও ব্যয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মাতিয়া নূতন কার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত অগণিত গঠনকার্য্যে পারদর্শী কর্ম্মচারী পরিদর্শক কর্ম্মচারী এবং মোটা বেতন-ভোগী ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেছে। ঐ সকল নূতন কার্য্যের একাংশ নির্ব্বিঘ্নে এবং লাভজনক ভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোম্পানী গুলির জন্য তাহারা ত্যাগ করিতে পারে। ফলে ইহাদের অল্পব্যয়জনিত উদ্বৃত্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমাকোম্পানীর কার্য্যক্রমানুসরণে বীমাকারীদিগের সুখ সুবিধার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। কিন্তু সুবৃহৎ অঙ্কের অলীক কল্পনার বশীভূত হইয়া আমাদের স্বনামধন্য মহাজনগণ বোধ হয় মানসিক সাম্যাবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

(পরবর্ত্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

বীমা প্রসঙ্গ

বহুমুখী সমালোচনা :—

বীমা কোম্পানীর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে সব দেশেই সমালোচনা হয় কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের আশ্চর্য্য রকম কৌলীন্য আছে। দৈনিক সংবাদ পত্র আছে, বীমা বা ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা আছে, সর্ব্বোপরি আছেন বিভিন্ন কোম্পানীর এজেণ্ট বা দালাল। ইহার মধ্যে শেষোক্ত সমালোচকদের মধ্যে শত করা ৯০ জনের আলোচনাবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহারা যে আলোচনা করেন তাহাতে কোম্পানী বিশেষের কেন ভারতীয় বীমা স্বার্থেই বিশেষ আঘাত পুরে। আমাদের দেশের এজেন্টগণ,—মোটামুটি বলিতে পারা যায়,—ব্যবসায় সংগ্রহ করেন বটে কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত সংগ্রহ কারী (Scientific producer) তাঁহারা আদৌ নহেন। ভারতে পলিসি বাতিলের হার অতি মাত্রায় বেশী এবং তাহার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী এজেন্টের অমনোযোগিতা অথবা অদূরদর্শিতা। ব্যবসায় সংগ্রহ ব্যাপারে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা প্রতিযোগী কোম্পানীর অপবাদ দিতে মিথ্যার আশ্রয় লইতেও ত্রুটি করেন না। প্রত্যেকটি কোম্পানীর এজেন্টদের মধ্যেই এ রীতি চলনসই। ফলে জন সাধারণের এক বা অপরের নিকট সকল দেশী কোম্পানীই যে শুধু সন্দেহের বস্তু হইয়া পড়ে তাহা নহে, —এজেন্টগণও জন সাধারণের নিকট ধাপ্পাবাজ বলিয়া অপযশ অর্জ্জন করেন। এই অবস্থা দূর করিতে হইলে শিক্ষিত সমাজকে এজেন্টের দলে টানিয়া আনিতে হইবে; শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় চলিবে না, উপরন্তু চাই—বীমা বিষয়ে এবং বীমা বিক্রয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দীক্ষা। শিক্ষিত সমাজ আজকাল এজেন্টের খাতায় নাম লিখায় দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন সত্য কিন্তু শেষোক্ত বিষয় কবে তাঁহারা আয়ত্ব করিবেন, কে জানে!

প্রতিযোগী কোম্পানী সম্বন্ধে এজেন্টদের সত্যমিথ্যা পূর্ণ কদর্য্য সমালোচনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিতেছি। সাংবাদিকদিগের মধ্যে ও যে ক্ষতিজনক সমালোচনা কম হয় তাহা নহে। সমালোচনার উদ্দেশ্য কি? যাহাতে ত্রুটী বিচ্যুতি সম্বন্ধে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী সময় থাকিতে সজাগ হইতে পারেন,—এইতো? তাহাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে বাঁধনহারা সমালোচনা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই সাধনা করে। কোম্পানী ভুল-ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবার অবসর পায় না। ফলে সহস্র সহস্র গরীব বীমাকারী যথা সর্ব্বস্ব হারায় এবং কোন কোম্পানী বিশেষের পতনে সমব্যবসায়ী সমস্ত কোম্পানী-কেই সে দুর্নামের অংশ লইতে হয়। ইহা কি জাতীয় ক্ষতি নহে?

কে শোনে।—

রেজেষ্টরীকৃত কোম্পানীর তালিকা হইতে দেখা যায় বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গদেশে মোট ৯টী কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। উহার মধ্যে তিনটী ব্যাঙ্ক, ১টী সংবাদপত্র প্রকাশক কোম্পানী, ১টী বীমা কাগজের লগ্নি কারবার এবং ৪টী বীমা কোম্পানী। অর্থাৎ রেজেষ্টারী কৃত কোম্পানীর মধ্যে ৪৪.৪% "বীমা" কোম্পানী। বৎসরে যতগুলি কোম্পানী এইভাবে সরকারের খাতার নাম লেখায় তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিয়া নূতন বীমা কোম্পানী রেজেষ্টরীর সংখ্যা এত উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাইলে ও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন উল্লিখিত ৪টিই প্রভিডেন্ট কোম্পানী এবং কোনটিরই রেজেষ্টরীকৃত মূলধন ২০,০০০, টাকার অধিক নহে।

একশ্রেণীর সমজদার লোকের সৌভাগ্য, ভারতে বিক্রিকৃত মূলধন রেজেষ্টারীকৃত মূলধনের কমপক্ষে কত অংশ না হইলে চলিবে না তাহা সরকার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া দেন নাই। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ নিজেদের সুখ সুবিধা বুঝিয়া যাহাতে শুধু বৎসরের আফিস খরচটা

অংশ বিক্রয় করিয়া উঠে এরূপ সংখ্যক অংশ বিক্রয় করিতে পারিলে ও কার্য্যারম্ভের সনদ যাহাতে সরাসরি মঞ্জুর হয় সে দিকে আইনের ব্যবস্থা আছে। এজন্য অবশ্য ঐ সকল কোম্পানী ছাড়া আর কেহ সরকারকে প্রশংসা করেন না।

প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হাজারে হাজারে রেজেষ্টরী হউক, লিকুইডিসনে যাক, কিন্তু জন সাধারণকে কেন তাহা বুঝিতে দেওয়া হয় না? এই সকল কোম্পানীর নাম হইতে বুঝিবার সাধ্য নাই যে এগুলি বীমা কোম্পানী নহে। কার্য্যক্ষেত্রে এইসকল কোম্পানী যেরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিতেছে তাহাতে তাহাদের ক্ষতির তুলনায় খাঁটি বীমা কোম্পানীগুলির ক্ষতি হইতেছে অসাধারণ।

বীমাব্যবসায়ীগণ অবস্থার জটিলতা অনেকদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন এবং কাগজে-কলমেও বহু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা ফলপ্রসূ হয় নাই। এ বিষয়ে সংহিত ব্যবসায় বাণিজ্য সংবাদ (Federation of chambers of Commerce & Industry) এর গত অধিবেশনে সভাপতি মিঃ লালাভাই যাহা বলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

রেজেষ্টরী মূলধনের সহিত বিলিকৃত মূলধনের হার আইনদ্বারা স্থির হইলে অকর্ম্মণ্য প্রভিডেণ্ট কোম্পানী প্রতিদিন গজাইতে পারিবে না; অশিক্ষিত জন সাধারণের জালে পড়িবার ভয় কমিবে এবং প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলি ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানী নামে রেজেষ্টরী হইবার রাস্তা আইনের সাহায্যে বন্ধ হইলে ইহাদের কৃতকর্ম্মের দুর্নামের হাত হইতে খাঁটী বীমাকোম্পানীগুলি রক্ষা পাইবে। সকল আইনরদ-বদলের জন্য চেষ্টা হইতেছে অনেকই কিন্তু জন সাধারণের সমূহ সর্ব্বনাশ হইবার পূর্ব্বে কি সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে।

বসুধৈব কুটুম্বকম্।—

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সংরক্ষণ নীতি পালন করা হয়; বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে শিল্প বাণিজ্য রক্ষা করিবার ভার সরকারের। এই সংরক্ষণ নীতি পালনের প্রয়োজন হয় বিশেষ করিয়া যে সকল শিল্পবাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বি বিদেশীটী হইতে বয়সে ছোট এবং শক্তিতে খাট সেই সকল ক্ষেত্রে। ভারতে বীমা ব্যবসায় সবে মাত্র বাল্যাবস্থা পার হইয়াছে বলা চলিতে পারে। কিন্তু তাল সামলাইতে হইতেছে ইহাকে প্রৌঢ়ত্বের। কাজেই কৈশোর পার হইতে না হইতেই যদি শিল্পটীকে বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ কঙ্কাল লইয়া দিন গুজরাইতে হয় তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

ভারতের বাজারে সকল অভারতীয়ই ভাত করিয়া খাইতে পারে কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তনে পড়িয়া মনে হয় ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে বাহিরের বাজারে ব্যবসায় করিবার অধিকার নাই। ভারতবর্ষে ইউরোপের কোন বণিক দেশের কোম্পানী দোকান না খুলিয়াছে? শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে যে সকল আইনগত অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়, এ গুলিকে সে সকল অসুবিধায় পড়িতে হয় না। সম্প্রতি একটি ভারতীয় বীমা কোম্পানী ইটালিতে ব্যবসায় সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ইটালির সরকার না কি উহার অনুমোদন করেন নাই। ইহা লইয়া ভারতীয়-মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

শুধু ব্যবসায়ের বাজারে নহে, ব্যবস্থা পরিষদে পর্য্যন্ত ইটালীয় সরকারের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে এবং ঐ সম্পর্কে ভারত সরকারের মতি গতি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। স্যার জোসেফ ভোর উত্তরে বলিয়াছেন, ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ১৫ই জুন ইটালীয় সরকার এবং গ্রেট বৃটেন এর মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়, ভারতের পক্ষে ও উহাই প্রযোজ্য। উহাতে প্রকাশিত আছে উভয় দেশের প্রজাগণ পরস্পরের দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ে দেশীয় প্রজাগণের ন্যায়ই সুবিধা ভোগ করিবে। কার্য্যতঃ তো দেখা যাইতেছে উল্টা। তবে এবিষয়ে না কি ভারত সরকার ইটালীয় সরকারের চিঠির প্রতীক্ষায় আছেন। চিঠি আসুক বা না আসুক, আমরা চাই বিদেশে ব্যবসায়ের অধিকার, যে অধিকার বিদেশীয়গণ আমাদের মাটিতে ভোগ করিতেছে।

হিন্দু মিউচ্যুয়াল লাইফ এসিয়োরেন্স লিঃ

আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৪ সালের উদ্বৃত্ত-পত্র আলোচনার জন্য পাইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ১১,১১,০০০৲ টাকার ৯২১টী বীমার প্রস্তাব পাইয়া ৯,২১,০০০৲ মূল্যের ৭৬৯টী পলিসি প্রদান করিয়াছেন। জীবন নির্ব্বাচন এবং এজেন্ট নিয়োগ সম্বন্ধে কোম্পানী যেরূপ সতর্ক তাহাতে সংগৃহীত ব্যবসায় সন্তোষ জনক সন্দেহ নাই। আলোচ্য



এজেন্সী ম্যানেজার—মিঃ এ, সি, রায়

বর্ষে ৬০,০০০,টাকার ৪৪ খানা পলিসি পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে এবং ইহা পূর্ব্বে বৎসরের তুলনায় সন্তোষ-জনক; একটী বিশেষ পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি (special revival scheme) কোম্পানীর পরিকল্পনায় আছে। ইহা কার্য্যকরী হইলে বহু বীমাকারী উপকৃত হইবেন। এ দিকে যে কোম্পানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা ধন্যবাদার্হ।

উক্ত বর্ষে কোম্পানী মোট ১,৪৩,৪৪৯ টাকার দাবী মিটাইয়াছেন। দাবীর টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিবার সুনাম কোম্পানীর পক্ষে গৌরবের বস্তু। এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কোম্পানী গুলির মধ্যে হিন্দু মিউচুয়ালের কৃতিত্ব উল্লেখ যোগ্য। দরিদ্র, অসহায় দিগের গৃহে গিয়া বীমার নগদ টাকা ইহারা প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের প্রদত্ত দাবীর তালিকা উদ্বৃত্ত পত্রের মধ্যেই প্রকাশিত করিয়া কোম্পানী সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

কোম্পানীর মোট বীমা তহবিলের পরিমাণ ৬,৩০,৩৬৩৲। পূর্ব্ব বৎসরে উহা ৫,৬৬,৫৩০৲ ছিল অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে—৬৪,৮৩৩৲ বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কোম্পানী লগ্নির অধিকাংশই নির্ভর যোগ্য সিকিউরিটিতে এবং বিশিষ্ট কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত রাখিয়াছেন। ইহাতে ধন-নিয়োগে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কোম্পানীর বাতিল পলিসির হার শতকরা কিঞ্চিৎ—অধিক ১০ ভাগ। এই অনুপাত ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। ব্যয় হার ৩৩ ১।৩% মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। বীমা জগতে সুপরিচিত বীমাবীদ মিঃ পি সি রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে হিন্দু মিউচুয়াল একটী প্রথম শ্রেণীর নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমান রিপোর্টে প্রকাশ কোম্পানী হেড অফিসের বাটী নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ'এ জমি খরিদ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন একই বৎসর মূল্যবান স্থান ক্রয় করিয়া, প্রায় ৬৫,০০০৲ টাকা বীমা তহবীলে রাখিয়া এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দাবী মিটাইয়া গৃহনির্ম্মাণে মনোযোগ দেওয়ায় কোম্পানীর স্বচ্ছলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৩৩এ কোম্পানীর কার্য্য প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ও নূতন কার্য্য সংগ্রহ ব্যপারে এজেন্সী ম্যানেজার কর্ম্মপ্রিয় মিঃ এ সি রায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা বাঙ্গলা দেশের সর্ব্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

গ্রন্থ-পরিচয়

'বালির বাঁধ' উপন্যাস। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার রচিত। প্রকাশক শ্রীঅজিত শ্রীমাণী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা। প্রফুল্লবাবু ইতিপূর্ব্বে 'অনাগত', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'বিদ্যুৎ লেখা', 'শোকারণ্য' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সে-সব উপন্যাসগুলি ছিল সমস্যামূলক। উপন্যাস রচনার সময় সামাজিক বা জাতীয় যে যে বিশেষ সমস্যা লেখকের মন অধিকার করিয়াছিল সেই সমস্যাগুলিই তাঁহার উপন্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান উপন্যাস **'বালির বাঁধ'** একটু ভিন্ন ধারায় রচিত হইয়াছে—ইহা বিশেষ কোন সমস্যা মূলক নহে—নিছক একখানি রোমান্স। রোমান্সখানি বর্ত্তমানকালের যুবক যুবতীর জীবন যাত্রা, প্রেম—এবং তাহার আনুষঙ্গিক নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এমন ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে যাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক এবং সুখপাঠ্য। প্রভার জীবনের দুঃখ, হতাশা ও দারিদ্র্য লেখক যে নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়াছেন আবার তাহার অসীম বিপদের একমাত্র আশ্রয় বিমানের উপর ধীরে ধীরে তাহার চিত্তের আকর্ষণও তেমনি সুন্দর ভাবেই দেখাইয়াছেন। অসহায় নারী জীবন-পথে স্ব-চেষ্টায় দাঁড়াইতে গেলে তাহাকে কত ভাবে বিব্রত হইতে হয় প্রভার জীবন্ত আলেখ্যে তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। শীলা আধুনিক নারী—সে বিমানকে ভাল বাসে এবং তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে স্থির—কিন্তু বিমানের জীবনের উপর প্রভার আকস্মিক আগমনে ও নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়া প্রভাকে নিরুদ্দিষ্টা করিল ও বিমানকে ছন্নছাড়া করিতেছিল শীলা সেইখানেই বিমানের পাশে আসিয়া তাহার সহধর্ম্মিণীরূপে দাঁড়াইয়া পুরুষের চিত্তের ব্যথা নারী কি ভাবে মুছিয়া ফেলিতে পারে তাহাই দেখাইয়া দিল। সমাজের এবং জীবনের বিবিধ সমস্যায় ও চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের প্রেম-সৃষ্টি কাম-পঙ্কিল হইয়া বালির বাঁধকে ক্লেদাক্ত করে নাই, ভাগ্য বিড়ম্বিত নর-নারীর উপর সহানুভূতিই জাগাইয়াছে। প্রফুল্ল বাবুর ভাষা ও ঘটনা সংস্থান চমৎকার। আনন্দ বাজার পরিচালনায় প্রফুল্লবাবুর কৃতিত্ব সর্ব্বজন বিদিত। সেই গুরুকার্য্য ভারের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া যে ভাবে অসীম ধৈর্য্য ও শ্রম সহকারে সুন্দর সুখপাঠ্য উপন্যাস রচনা করিতেছেন এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। 'বালির বাঁধ' পড়িয়া সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাই তৃপ্তি লাভ করিবেন আশা করি।

প্রদীপ ও চেরাগ, গল্পের বই। লেখক মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা। প্রকাশক—দি মুসলমান বুক এজেন্সী। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা। বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝে এমন এক একটী বই দেখা যায় যে তার অভিনবত্বে মনে চমক লাগে। তখন ঐ লেখকের লেখা আরো বই আমরা পড়তে চাই, কিন্তু দেখি আর ত নাই! লেখক শ্রীযুক্ত মোহম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত 'প্রদীপ ও চেরাগ' নামা গল্প সংগ্রহটি এই শ্রেণীর বই। তিনি এত ভালো লিখবার ক্ষমতা রাখেন অথচ আরো লিখছেন না কেন? এই হ'ল আমাদের অভিযোগ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা অনেক দিন ধরে কলম চালাচ্ছেন তাঁদের অনেকের লেখার চেয়ে এই বইখানা আমাদের ভালো লেগেছে। তিনি গল্প বলতে জানেন, তাঁর বলবার কথা অনেক আছে; ভঙ্গীটিও সুন্দর। ব্যক্তিগত মতামতে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নেই—বরং তার উল্টো। হিন্দু মুসলমান সমন্বয়-সাধন রচনার গূঢ় ইঙ্গিতে ব্যক্ত হলেও প্রচার-চেষ্টা পরিস্ফুট হয়ে কোথাও রচনার রসকে ক্ষুণ্ণ করে নি। ভাষাটি কবিত্বপূর্ণ, আভিজাত্য যুক্ত, মহৎ ভাব প্রকাশের পক্ষে অনুকূল।

তিনটি ছোট গল্পের সমষ্টি এই বইখানি। প্রথম গল্পটির নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

"প্রদীপ ও চেরাগ" গল্পটিতে বাস্তবের চাইতে কল্পনার ভাগ বেশী। বস্তুগত সত্যের চেয়ে ভাবগত সত্য সপ্রকাশ হয়েছে উজ্জ্বল বর্ণে। লেখকের বোধ হ'ল তাই লক্ষ্য। পরিণত মনের কাছে গল্পটির কারুণ্য উপভোগ্য, ইহার দর্শন (Philosophy) প্রণিধান যোগ্য।

মসজিদ ও মন্দির গল্পে লেখক যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা বাস্তব জগতেরই লোক; চিনতে দেরী হয় না। ঘটনার অবতারণা স্বাভাবিক, সমস্যা মনকে দোলা দেয়। যাদের আমরা ছোট বলে জানি, মহত্ত্বের বীজ তাদের মধ্যে থাকা সম্ভব এবং যাদের বড় বলে জানি সব সময়ে সে জানাটা সত্য নয়।

"দোস্ত দুষমণ" গল্পটি পড়লে মনে হয় এটা একেবারে নিছক গল্প নয়। খানিকটা সত্য আছে,—এবং আর্টিষ্টের হাতে পড়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। খুব দরদ ভরা প্রাণ নিয়ে গরীবের দুঃখ লেখক দেখেছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন। টালীগঞ্জে রাসের ভীড়ে এরা এর আগে আমাদের চোখে পড়েছে—কিন্তু সহানুভূতির স্পর্শমণির অভাবে চিনতে পারিনি।

সমস্ত রচনা গুলির মধ্যদিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন যে সাম্প্রদায়িকত্ব স্ব স্ব সমাজগত—হৃদয়ের সত্য সম্বন্ধ শুধু মানব ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সব সাহিত্যিকের মহৎ সম্ভাবনা আছে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কলম্বিয়া রেকর্ড

মে মাসে কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী কয়েকখানি সুন্দর গান বাহির করিয়াছেন। শ্রীবীরেন্দ্রলাল বল, রাণীবালা ও প্রভাবতীর গানগুলি আমরা সকলকেই শুনিতে বলি। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান গম্ভীর মুখেও হাসি ফুটাইয়া তুলিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নব বর্ষে

বর্ত্তমান বর্ষে পুষ্পপাত্র নবম বর্ষে পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত পুষ্পপাত্র নানা ভাবে যাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে নব বর্ষের প্রারম্ভে তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পুষ্পপাত্রের লেখক লেখিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা ও বিজ্ঞাপনদাতৃদিগকের সহায়তায়ই বর্ষের পর বর্ষ ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধারণের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও সাধারণের শুভেচ্ছাই আমাদের কাম্য।

সম্রাটের রজত জয়ন্তী

মহামান্য ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর গৌরবময় রাজত্ব-কালের ২৫ বর্ষ চলিয়াছে—তাই সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে সাধারণ উৎসব দরিদ্র ভোজন, স্কুলের ছাত্রদের আনন্দ-ভোজ, নানারূপ আলোর বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইবে ইহা ছাড়া হাসপাতাল ইত্যাদির উন্নতির জন্যও অনেক অর্থ প্রদত্ত হইবে।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

বিদায়গামী মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৩০শে মার্চ্চ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন। কলিকাতার মেয়রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ব্যাপারটা অভিনব—তাই ইহাতে হৈ চৈ খুবই পড়িয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে নলিনীবাবুর কুৎসা সম্বলিত কতকগুলি যা-তা লেখা বাহির হইয়াও কলিকাতার রাজপথে বিক্রীত হইয়াছে। মামলায় খালাস পাইয়া সেই দিনই বিদায়গামী মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার নূতন মেয়র নির্ব্বাচন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস দুই দলের সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ভাবে মিঃ ফজলুল হক মেয়র ও শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসী দলের সমর্থনেই প্রধানতঃ মিঃ হক মেয়র হইতে পারিলেন—আশাকরি কংগ্রেসের উচ্চ আদর্শ তিনি সহরের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। মেয়র মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, আর ডেপুটি মেয়র হিন্দুসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—সুতরাং এক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমান মিলন হইয়াছে ভাল। আমরা নবনির্ব্বাচিতদের কর্ম্ম সাফল্য কামনা করি। এবং বিদায়গামী মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অমৃত বাজারের মামলা

হাইকোর্ট অবমাননার অভিযোগে অমৃত-বাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছিল। গত ৮ই এপ্রিল কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি স্যার হেরল্ড ডার্বিসায়ার, বিচারপতি স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি কষ্টেলো, বিচার-পতি লর্ট উইলিয়মস্ ও বিচারপতি জ্যাক সমবায়ে গঠিত ফুলবেঞ্চ বিচার সমাধা হয় এবং অমৃতবাজার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষের তিনমাস বিনা শ্রম কারাদণ্ড এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত তড়িতকান্তি বিশ্বাসের একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্ট সম্বন্ধে সম্প্রতি বাংলা কৌন্সিলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু কতকগুলি আলোচনা করেন—শাসন পরিষদের সদস্য স্যার বি-এল-মিত্র তাহার জবাবও দিয়াছিলেন। এই সব প্রসঙ্গ লইয়া গত ২৩শে মার্চ্চের অমৃতবাজার পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—তাহাতে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে লেখা হইয়াছিল—'বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আজকাল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ

শাসকদিগের সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসেন, তাহারফলে বিচারকদের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। এক সময় ঐ স্বাধীনতার জন্যেই হাইকোর্ট সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল।" ভারত বিখ্যাত আইনজীবি স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু এই মামলায় সম্পাদক তুষার বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ও অপর তিনজন বিচারপতি এক মত হইয়া তাঁহাদের রায়ে বলিয়াছিলেন—ঐ প্রবন্ধে আদালতকে অবমাননা করা হইয়াছে। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র রায়ে বলিয়াছেন—প্রবন্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ করা যায় বটে কিন্তু তাহার বিচারের অধিকার এ আদালতের নাই। রায়ে প্রধান বিচারপতি সম্পাদককে বলেন···আপনি আপনার লেখার জন্য দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। কাজেই আপনাকে জেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। মুদ্রাকরকে বলা হয়—ইংরেজী জানেন না অজুহাতে আপনাকে মুক্তি দেওয়া যায় না।

পত্রিকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে প্রীভি কৌন্সিলে আপীলের আবেদন করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১৯১৭ সালের মে মাসে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের মামলার বিচার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার জন্য অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হইয়াছিল। তাহাতে মিঃ জ্যাকসন, নর্টন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি অমৃতবাজারের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, ফলে ডিরেক্টর মতিলাল ও পিযুষকান্তি ঘোষ, সেক্রেটারী মৃণাল কান্তি ঘোষ প্রভৃতি মুক্তি পান— শুধু মুদ্রাকরের ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল।

স্যার তেজবাহাদুর সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় আইনজ্ঞ হইলেও এবারকার মামলায় অমৃতবাজারকে কেন বাংলার বাহির হইতে আইনজ্ঞ আনিতে হইল এ সম্বন্ধে অনেকই প্রশ্ন করিতেছেন।

অমৃতবাজার দুঃখ প্রকাশ করিলেই তাহাদের শাস্তি না হইতে পারিত প্রধান বিচারপতির কথায় এইরূপ বোঝা যায়—কিন্তু অমৃতবাজার তাহা করেন নাই—মনে হয় তাহাদের 'প্রিন্সিপল' বজায় রাখিতেই তাহারা দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

ফিরোজাবাদে জীবন্ত অগ্নিদাহ

এবার মহরমের মিছিল উপলক্ষ্যে অনেক স্থানে ছোটখাট দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু যুক্ত প্রদেশের ফিরোজাবাদে যে কাণ্ড হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। ফিরোজাবাদ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। ইহারা দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু বাকী মুসলমান। মহরমের মিছিল যখন বাজারে পৌছে তখন নাকি এক বাড়ী হইতে তাহার উপর ঢিল পড়ে। তখনি ঐ বাড়ী আক্রান্ত হয় এবং সমস্ত বাজারে দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু হয়। সম্ভ্রান্ত ডাক্তার জীবরামের দ্বিতল বাড়ী আক্রান্ত হয় —দাঙ্গাকারীগণ দোকান হইতে কেরোসিন লুঠিয়া ঐ গৃহের দরজায় ঢালিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। দাঙ্গাকারীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ডিসপেনসারীর দ্রব্যাদি ভাঙ্গে। ডাক্তার জীবরাম, তাঁহার ভৃত্য, কম্পাউণ্ডার, দুইটি মেয়ে, ভ্রাতুষ্পুত্রী পুত্র ও পাঁচটি রোগীসহ এক ঘরে ঢুকিয়া অর্গল বন্ধ করেন। ঐ ঘরের বাহিরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগুন দেওয়ায় সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে— কেবল একজন বাঁচিয়া আছে। ফিরোজাবাদে আরো হিন্দু হত আহত হইয়াছে কিন্তু সবচেয়ে নির্ম্মম এই ডাঃ জীবরামের পরিবারবর্গের জীবন্ত অগ্নিদাহ ব্যাপার।

করাচীর শোচনীয় ব্যাপারে মুসলমানেরা এবং অনেক হিন্দুও বলিয়াছেন—সরকার সে ঘটনায় যথোপযুক্ত সতর্কতার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বর্ত্তমান ফিরোজাবাদের ঘটনায় হিন্দুরা বলিতেছেন—সরকার পূর্ব্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিত না। এ সম্বন্ধে বাংলার অন্যতম মুসলমাননেতা মিঃ ফজলুল হক বলেন—নিখিল ভারত মোস্লেম লীগ করাচীগুলি চালান সম্পর্কে দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ফিরোজাবাদে যে কাণ্ড হইয়া গেল সে সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই; যাহারা এই সকল অপরাধে অপরাধী তাহাদিগকে তাহাদের সম্প্রদায়ের বয়কট করা উচিত।

মোস্লেম লীগ ও মুসলমান নেতারা ঢাকা, পাবনা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুর গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও হত্যা সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই এসব আরো ব্যাপক হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। করাচীর ব্যাপারে মুসলমানেরা প্রকাশ্য তদন্ত চাহিয়াছেন কিন্তু সরকার তাহাতে রাজী হন নাই—বর্ত্তমান ফিরোজাবাদের ব্যাপারে হিন্দুরা প্রকাশ্য তদন্ত চাহিতে পারেন। এই সাম্প্রদায়িক ব্যাপার বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেরই উদ্যোগী হইয়া নিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমান সদস্য লইয়া একটি তদন্ত কমিটী অবিলম্বে গঠন করা সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। সাম্প্রদায়িক ব্যাপার দিনের দিন যেরূপ ঘৃণ্য নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত রূপ ধারণ করিতেছে এবং মস্তিস্ক অন্তরালে থাকিয়া সাধারণকে উস্কাইয়া যে ভাবে এই সব কার্য্য করিতেছে তাহাতে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান না করিলে দেশে লোকের বাস করাই যে মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে।

সাধারণ কার্য্যে মন্ত্রীর দান

মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়। ভারতে উচ্চ রাজকার্যের জন্য যে অধিক বেতনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা যাহাতে হ্রাস পায় সেজন্য বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে। দেশের প্রতিনিধি মন্ত্রীরা বেতন কম করিয়া লইবেন বা বেতনরূপে প্রাপ্ত অর্থের কিছু দেশের কার্য্যে অন্ততঃ ব্যয় করিবেন এমন আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিকেও মন্ত্রীদের দিক হইতে আশাপ্রদ কিছু দেখা যায় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে দু'একজন মন্ত্রী এদিকে দেশবাসীর আশা কিছু মিটাইয়াছেন তাহার মধ্যে বিহারের মন্ত্রী স্যার গণেশ দত্ত সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীত্ব লইবার পর হইতে বেতনের অধিকাংশ অর্থই তিনি জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত এক পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি ৪ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন। বাংলার মন্ত্রীদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে একথা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইত বটে—কিন্তু তাঁহারা কেহ কোন দিন এবিষয়ে উপরহস্ত হন নাই বলিয়াই মনে পড়ে—আর দেশের লোকও এদিকে আশা নাই বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেও এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

শ্যামরাজের বেকার বীমা

রাজ্যহারা রাজাদের মধ্যে শ্যামদেশের রাজা প্রজাধিপকে বিশেষ বুদ্ধিমান ও সুচতুর রাজনীতিক বলিতে হয়। ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বীমা করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে তিনি যদি কখনও বেকার হন তবে বীমা অনুযায়ী অর্থ তিনি পাইবেন। তিনি লণ্ডন ও প্যারিসের বীমা কোম্পানীতে প্রথমে ৪০ লক্ষ ডলার প্রদান করিয়া তৎপরে যথারীতি প্রিমিয়াম দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন —সুতরাং এখন বেকার। রাজা প্রজাধিপক এখন জীবনের অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত ৪০ হাজার ডলার নিয়মিত পাইবেন। বীমার প্রথম সাপ্তাহিক অর্থ তিনি সম্প্রতি পাইয়াছেন।

এ ভাবের কোন রাজার বেকার বীমা শ্যামরাজই বোধহয় প্রথম করিলেন। রাজ্যচ্যুত রাজাদের মধ্যে দু' একজনের প্রচুর অর্থ আছে শুনি—আবার কেহ কেহ অর্থাভাবে আছেন শোনা যায়। শ্যামরাজ এদিক দিয়া একটা নূতন পন্থা দেখাইলেন। বর্ত্তমান কালে অনেক রাজ্য ও রাজাদের যেরূপ ওলট পালট হইতেছে তাহাতে রাজাদের কেহ কেহ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বেকার বীমার আশ্রয় লইতে পারেন।

মহাত্মার মৌনব্রত

মহাত্মা গান্ধী ইতি মধ্যে একমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—সত্যানুসন্ধানে মৌনব্রত দরকার। মৌনতার মধ্যে আত্মা সুস্পষ্ট রূপে কর্ত্তব্য পথ দেখিতে পায়। পূর্ণ বিকাশের জন্য আত্মার বিশ্রামের দরকার। ইহাতে এত শান্তি পাওয়া যায় যে পরে সাপ্তাহিক মৌনব্রত ছাড়াও মাঝে মাঝে কয়েক-দিনের জন্য মৌনী থাকিতে পারি।

মিঃ জিন্নার অভিলাষ

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন—হিন্দু মুসলমানের একতা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। জাতীয় উন্নতির পক্ষে এ মিলন অপরিহার্য্য সত্য এবং উহা যত শীঘ্র হয় ততই দেশের পক্ষে শুভ। ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ঐক্য নাই—ইহা ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট জানেন সুতরাং ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইয়াও কোন ফল হইবে না। তিনি একথাও বলেন যে—বহুদিন তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রহিয়াছেন কিন্তু এবার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন সেরূপ কোনও বার পান নাই।

সাম্প্রদায়িকতা একেবারে ছাড়িয়া ভারতীয় হিসাবে ভারতের মঙ্গল চেষ্টা না দেখিলে ভারতের কোন আশাই কোনদিক দিয়া দেখা যাইতেছে না। মিঃ জিন্নার মত বুদ্ধিমান নেতাদের তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই ভাবেই আন্দোলন চালান কর্ত্তব্য।

'পুষ্পপাত্র' কার্য্যালয়ে 'রবি-বাসর'

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আহ্বানে বিগত ১৭ই চৈত্র তারিখে ৪৪ নং বাদুড় বাগান স্ট্রীটস্থ পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়ে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য সেবিগণের এই শ্রেষ্ঠতম মিলন সভার অধিকাংশ সদস্যই সেদিন উপস্থিত থাকিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পুষ্পপাত্র কার্য্যালয় সেদিন উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় এম-এল-সি মহাশয়কে সংবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

প্রথমে শ্রীমান সরোজ ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুনীন্দ্রদেব ও সভাপতি মহাশয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইলে, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় সুকবি শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার বসু রচিত একটী প্রশস্তি গীতি গান করেন। তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত জলধর সেন রবি বাসরের পক্ষ হইতে মুনীন্দ্রদেবকে সংবর্দ্ধনা করেন। তিনি বাঁশ বেড়িয়া



কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়

রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কীর্ত্তিকাহিনী এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের দানের কথা উল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমানে কুমার মনীন্দ্রদেব এদেশে গ্রন্থগার আন্দোলন প্রবর্ত্তনে যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতেছেন, সে জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন। কুমার যে স্পেনদেশে আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সে জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে মুনীন্দ্র দেবের প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিয়া, বিদেশ হইতে তাঁহার এই সম্মানলাভে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে মুনীন্দ্রদেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়, আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার কংগ্রেসের এবং ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় বিবৃত করেন।

শেষে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুমারী আভাময়ী বসু একটী কীর্ত্তন ও কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায় একটী হাসির গান গাহিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত কয়েকটী গান শুনিয়া সকলে প্রীত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে রবি-বাসরের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় আহ্বানকারী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৃহস্বামী ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়কে তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন ও আয়োজনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলে, রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

রবি-বাসরের নিম্নলিখিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন—ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মন্মথ নাথ ঘোষ এম-এ, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ডের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি, নরেন্দ্রনাথ বসু, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীনিধিরাজ হালদার, শ্রীননীমাধব চৌধুরী, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, মাসপয়লা সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীনলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, শ্রীচরণদাস ঘোষ, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পাল, শ্রীভূতনাথ দে, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। সদস্যগণ ব্যতীত শ্রীমতী শ্যামালতা বসু, পুষ্পপাত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, এবং পুষ্পপাত্রের সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রসূতি ও শিশু

শিশু সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হয় সকল পিতামাতাই ইহা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করিয়া থাকেন। সুন্দর এবং সবল শিশু যেন একটী লোভনীয় জিনিষ; সকলেই ইহাদিগকে আদর করিতে চায়। বাস্তবিকই টাকা পয়সা ধন দৌলত অপেক্ষা সুন্দর সবল শিশুই পিতামাতার অধিক গৌরবের জিনিষ। দুর্ব্বল এবং রুগ্ন ছোট শিশুকে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্রই তাহারা বড় হইয়া উঠিবে, অথচ তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ তাহাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। আজ যে অসহায় শিশু কালই সে হয় ত বড় হইয়া সংসারী হইয়াছে এবং এক পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন যুবক কাজেই দেশের অনেক কিছু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই এখন দেশের আশা ভরসার স্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে নিজেই যদি হীন স্বাস্থ্য হইয়া কোন কঠিন কাজ করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে দেশ তাহার নিকট কিছুই আশা করিতে পারে না। ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়; পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাহার মাতৃভূমি তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য যে, যে দেশের যুবকবৃন্দ যত সবল, কষ্ট সহিষ্ণু এবং উদ্যমশীল, সেই দেশ তত উন্নত। এই সত্য কেবল বর্ত্তমান যুগ কেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আবাহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ইহাতে দেশের জনবলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। পিতামাতা হইতে অর্জ্জিত সিফিলিস যক্ষা প্রভৃতি রোগে মৃত মুষ্টিমেয় শিশুর সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ উপযুক্ত জীবনীশক্তির অভাব বশতঃ, গরহজমজনিত কোন প্রকার রোগ বশতঃ অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। নানা কারণ বশতঃই শিশুদের এই সমস্ত রোগ হইতে পারে। তবে প্রধান কারণটি বোধ হয় মাতার অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা। আমাদের দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই অনেকে নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। গর্ভাবস্থায় সাধারণত সকল স্ত্রীলোকের শরীরই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে এই দুর্ব্বলতা মিশিয়া এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয় ফলে এই সমস্ত গর্ভজাত সন্তানের অনেকেই দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া অচির-কাল মধ্যেই ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যাহারা বাকী থাকে তাহাদের জীবনের মেয়াদ ও বেশী দিন হয় না। আমাদের দেশের গড় পড়তা বাঁচিবার কাল ২৫ বৎসরেরও কম। অবস্থার এই জটিলতা আরও বাড়াইবার জন্য দারিদ্র রাক্ষস হাঁ করিয়া মুখব্যাদন করিয়া আছে। ফলে অনুকূল হাওয়ার মধে সুস্থ হইতে পারিত এই প্রকার অনেক শিশুই অল্পায়ু অথবা হীনবল হইয়া জীবন ধারণ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিশু রোগের আসল কারণটি হইতেছে প্রসূতির অসুস্থতা। সুতরাং দেশের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রসূতিগণের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থা হইতেই প্রসূতি দিগের রীতিমত গৃহকর্ম্ম করা উচিত। তাহাতে একদিকে যেমন শরীরের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয় অপর দিকে তেমনই প্রসূতির সুখ প্রসব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে দুই দিকেই লাভ। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের ধারণা এই যে গর্ভিণীকে কাজ করিতে না দিয়া বিশ্রাম দেওয়া উচিত। ইহা ভুল ধারণা এবং ইহাতে অপকার ছাড়া উপকার হইতে কখনও দেখা যায় নাই। গর্ভাবস্থা হইতেই গর্ভিনীর পুষ্টিকর দ্রব্যের আহার করা উচিত। ইহাতে প্রসূতির যেমন

উপকার হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও তেমনই উপকার হইয়া থাকে। প্রসবান্তে আমাদের দেশের অনেক মহিলাই সুতিকা নামক ভীষণ রোগে ভুগিয়া থাকেন। এই সুতিকা হওয়ার ফলে প্রসুতির অজীর্ণ, পেট-ফাঁপা, দুধ শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি রোগ হয় এবং পরিণামে ভয়ঙ্কর রক্তহীনতা রোগ দেখা দিয়া প্রসুতিকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। প্রসবান্তে প্রসুতিকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে এবং এমন পথ্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহা গুরুপাক নহে কারণ তখন পাকস্থলী এবং পেটের অন্যান্য যন্ত্র শুকাইয়া যাওয়ার দরুণ শিশু পেট ভরিয়া দুধ খাইতে পারে না এবং সেই জন্য খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্তন দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত খাদ্য। সুস্থ-মাতার দুধই শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃত উপাদান এবং ইহাই শিশুকে নানাপ্রকার রোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে। দূষিত দুধ খাইয়া শত শত শিশু অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রসুতির দুগ্ধই শিশুর অপক্ক হজমী নাড়ীর পক্ষে অনুকুল এবং একমাত্র ইহাই শিশুকে সুস্থ এবং সবল করিয়া তুলিতে পারে। বুকের দুধ বরিবার নিমিত্ত এবং শুষ্ক দুধকে পুনরায় বাড়াইবার নিমিত্ত প্রসুতির শালিধান্য চাউলের ভাত, বাজশাক, রশুণ, লাউ, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর খাওয়া উচিত। অবশ্য ইহা প্রকৃত চিকিৎসা নহে ইহা হইতেছে পথ্য মাত্র, ঔষধের আনুষঙ্গিক।

প্রসুতির শুষ্ক স্তনে দুগ্ধ পুনরায় করিবার নিমিত্ত এবং তাহার রক্ত হীনতা রোগ দুর করিবার জন্য আমি অনেক ক্ষেত্রে রুচিটোন নামক সুপ্রসিদ্ধ টনিক ব্যাবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। ইহা বিখ্যাত রুচি কোম্পানীর তৈয়ারী একটী যুগান্তকারী মহৌষধ। ইহা সেবনে প্রসুতির হজম শক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হয়, এবং জরাজীর্ণ দেহ পুন গঠিত হইয়া রক্তহীনতা চিরতরে লুপ্ত হয়। রুচিটোন গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবের পর বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে সেবন করিলে প্রসুতির ত কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকেই না, শিশুরও চিররুগ্ন হইবার অথবা অকাল মৃত্যু হইবার ভয় থাকে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শিশুকে বাজারের কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করিয়া তাহার মাতাকে নিয়মিত ভাবে "**রুচিটোন**" সেবন করাইলেই শিশু প্রকৃতিদত্ত খাদ্য (স্তন্যদুগ্ধ) খাইয়া স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য উভয়ই লাভ করিতে পারে।

ডাঃ বিপিনচন্দ্র পাল, এম, বি

মায়া

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তুমি যেন মোর চির-সোহাগিনী
হৃদয়-ভাগিনী বধূ,
প্রেমের পাত্রে ভরিয়া রেখেছি
তোমারি লাগিয়া মধু,
কামনা বাসনায় করিও স্নিগ্ধ
স্নেহে সে আধার চুমি,
পান করো, ওগো! পান করো তার
প্রতিটি বিন্দু তুমি।
কণ্ঠে পরেছি বর-মালা তব,
প্রীতি-শৃঙ্খল পায়ে,
শীতল হয়েছে এ দেহ তোমার
আলিঙ্গনের ছায়ে,
ক'রেছি ছলনা অযুত লক্ষ
ব'লেছি 'এসোনা কাছে,'
ওই মুখ তবু যেমনি দেখেছি
সব পণ ভাঙিয়াছে।

শাস্ত্র শাসায়, না করিলে দূর
তোমার লোভন ডোর—
সাধনার পথে বহু বাধা হবে,
বিপাকে পড়িব ঘোর,
হে মনোহারিণী চিত্ত-চারিণী
বিমোহিনী প্রিয়া মম,
তোমার পরশে সে নীতি-শাসন
উড়ায়েছি ধূলি-সম।
সাধু কহে 'মূঢ়! মায়ার যাদুতে
ভুলিয়া, প'ড়োনা ফাঁদে'—
তিলেক তাহারে ছাড়িতে তথাপি
বিষাদে পরাণ কাঁদে,
বুঝিতে না পারি রক্ষা কে করে
মুগ্ধ এ নিরুপায়ে
তারি হাতে হাল ছাড়ি দিয়া তাই
উঠিনু মায়ারি নায়ে।

পঞ্চ-পাত্র—



৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৯ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ { ২য় সংখ্যা

পুষ্পপাত্র

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ছিল মোর পুষ্পপাত্র, বহু পুরাতন
পিতৃদের ফুলদানী মরিচা পাণ্ডুর,
মাজিয়া ঘসিয়া তার মলা করি দূর
কেহ কভু করে নাই তার প্রসাধন।
ছিল পড়ি এক কোণে, বহু নিষ্ঠীবন
লভিয়াছে বহুমুখে তাম্বূল কর্ব্বুর
কলঙ্কের চিহ্নগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর
ছিল মাখা, লাঞ্ছিতের যোগ্য আভরণ।

তুমি এলে ঘরে মোর, ধূলি হ'তে তুলি'
নিলে পুষ্পপাত্রটিরে; বহু সম্মার্জ্জনে
ঘুচালে কালিমা তার, উঠিল ফুটিয়া
হেমদ্যুতি কাংস্য ঘটে। পুষ্পগুচ্ছগুলি
অঞ্চলে লুকান ছিল, অতি সযতনে
সাজালে কুসুমদানী পত্রপুষ্প দিয়া।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ভাব গৌরব

শ্রীসুধীর চন্দ্র গুপ্ত

কাব্য কি? কাব্য কাহাকে বলে? রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব বলিয়াছেন "যে কোনও দিন সন্দেশ খায় নাই তাহাকে যেমন সন্দেশের মিষ্টত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় না, বালককে যেমন রতিসুখ বুঝান যায় না, সেইরূপ যে ব্রহ্মোপলব্ধি করে নাই তাহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র"—"উলুবনে মুক্তা ছড়ান"। কাব্য সম্বন্ধেও এই কথাটী খাটে। "কি পুছসি অনুভব মোয়"—অনুভবের কথা—রসোপলব্ধি। কারণ বর্ণনা করা অসম্ভব, সুতরাং সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে রসোপলব্ধি হইবে না; "রসে অনুমগন"—রসে নিমজ্জিত হইতে হইবে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "তাহাকে প্রতিদিনের সুখ দুঃখে সমাকুল যুদ্ধমান ঘর্ম্মসিক্ত কর্ম্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে"—নতুবা কাব্যরস আস্বাদন করা কঠিন। বিভিন্ন ব্যক্তির মন বিভিন্ন ধাতু, চরিত্র, ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে গঠিত; সেইজন্য কাব্যসম্বন্ধে প্রত্যেকের অনুভব বিভিন্ন—কেহ বলেন "Poetry is the criticism of life"—জীবনের সূক্ষ্ম রসানুভূতিই কাব্য; কেহ বলেন "মানস লোকের স্বপ্নকে ভাষায় রূপান্তরিত করাই কাব্যসৃষ্টি"; ওয়ার্ডস্বার্থ বলেন "Poetry is nothing but emotions recollected in tranquility"—মনের প্রশান্ত অবস্থায় স্মৃতিকে ভাষাদানই কবিতা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। রবীন্দ্রনাথও এই সংস্কৃত মতের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি বলেন শুধু রসাত্মক হইলেই হইবে না—সত্যাত্মকও হওয়া চাই। দণ্ডি বলেন "কথ্যতে কাব্যমিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"—মানব সমাজের মঙ্গলজনক অলৌকিক আনন্দদায়ক পদাবলীই কাব্য। অতএব সংস্কৃত প্রভৃতি মতে, "কাব্যস্য হি দ্বিধা রূপং গদ্যং পদ্যস্তথোভয়ম্"—কাব্য সম্যক গদ্য, সম্যক পদ্য অথবা গদ্যপদ্য সম্বলিতও হইতে পারে। সেই জন্য সংস্কৃতে কাব্যশাস্ত্র বলিতে কবিতা, নাটক, নভেল, জীবন চরিত প্রভৃতি যাবতীয় রসাত্মক রচনাকেই বুঝায়। সংস্কৃতে যাহাকে কাব্যশাস্ত্র বলে—ইংরাজীতে তাহার নাম 'Literature'—বাংলা ভাষায় 'সাহিত্য'। বাংলা ভাষায় কিন্তু কাব্য সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ পদ্যময় অর্থাৎ 'ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ গীত' রচনাকেই বুঝায়। সেই জন্য যদিও প্রকৃতপক্ষে রসাত্মক রচনা মাত্রকেই কাব্য কহে তথাপি বাংলা ভাষার প্রচলিত অর্থানুযায়ী দৃশ্যকাব্য উপন্যাস, উপাখ্যান, জীবন চরিত প্রভৃতি গদ্যপ্রধান রচনা কাব্যাদর্শের গণ্ডীর বহির্ভূত।

যে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের ভাবগৌরব ও রচনা নিপুণতা বৈদেশিক শ্রেষ্ঠ সমালোচকদেরও মন মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার বয়স বেশী হইলে সত্তর আশী বৎসর হইবে। কিন্তু এই সত্তর আশী বৎসরের মধ্যে কোন সাহিত্য এত শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে কেমন করিয়া? সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোনও সাহিত্যের বিকাশ হইতে যুগ যুগ কাটিয়া যায়। অনুপরমাণু মৃত্তিকা জমিয়া জমিয়া যেমন দ্বীপের সৃষ্টি হয়, জলকনার বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় দ্বারা যেমন সাগরের উৎপত্তি, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইপ্রকার। যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য কবির অনন্ত সাধনার ফলে এক একটী ভাষার—এক একটী সাহিত্যের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তবে এই ব্যতিক্রম কেন? আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত অনেক পণ্ডিত হয়তো বলিবেন,—"এ ব্যতিক্রম আর কিছুর জন্যই নহে উহা 'occidentalization' অর্থাৎ প্রতীচ্য সভ্যতার আলোকপাতের ফলে। বাঙ্গালী সাহিত্যকগণ ইংরাজী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া সেই সেই সাহিত্যের ভাবধারা বাংলা-ভাষায়—বাংলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সুতরাং বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের

অন্যান্য বিভাগে হয়তো এ কথাটা অনেকাংশে সত্য, কিন্তু কাব্য সাহিত্যে ইহার তাৎপর্য্য, কতখানি তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। হার্ণ সত্যই বলিয়াছেন, বাণিজ্য, সভ্যতা, রীতি নীতি প্রভৃতি বিষয়ে একজাতি অন্য জাতির অনুকরণ করিতে যত শীঘ্র সক্ষম হয়, কাব্য গান প্রভৃতি fine Arts এর ক্ষেত্রে তত হয় না।" ইহার কারণ কিছুই নহে ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিরই একটী স্বকীয় ধর্ম্ম অথবা রচনাগত পদ্ধতি আছে যাহার মূল জাতির মর্ম্মস্থান—শত অনুকরণেও এই বিশিষ্ট ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করা যায় না।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করিলে আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাব গৌরবের কারণ শীঘ্রই বোধগম্য হয়। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সংমিশ্রনের ফলে যেমন বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ আর্য্য এবং অনার্য্য ভাষার সংমিশ্রণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের ভাবধারা অতি প্রাচীন কালের ভাষাগুলি হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়াছে সন্দেহ নাই। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে নানারূপ নূতন নূতন 'Technique'—কাব্য ছাঁচের আমদানী হইয়াছে বলিয়া আধুনিক কবিগণের রচনায় প্রাচীন রস ও ভাবধারা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার বেশভূষা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, সেইজন্যে ইহা বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব বলিয়া আমারা ভুল করিয়া বসি। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় ভারতীয় ভাব বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় তাহা বৈদেশিক ভাবাপন্ন নহে। বাংলা কাব্য গোলকুণ্ডার অপরিমার্জ্জিত হীরাকে যদি বৈদেশিক উপায়ে পরিমার্জ্জিত করিয়া শ্রেষ্ঠ মূল্য পাওয়া যায় তবে তাহা গোলকুণ্ডারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

বাংলা কাব্য সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিতে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মালাধর বসুর ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে অনূদিত গ্রন্থ সকলের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। এই সকল মহাকাব্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও নৈতিকচরিত্র গঠনে, সাহিত্য ও ভাবধারার বিকাশে যত সাহায্য করিয়াছে এমন আর কিছুতেই করে নাই। যদিও ঐ সকল গ্রন্থ বংলা ভাষায় মৌলিক রচনা নহে, যদিও একবারের বেশী বাল্মিকী, কি বেদব্যাস কি শুকদেবের জন্ম হয় নাই, তথাপি "তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গের কাব্য রস তৃষা পরিতৃপ্তির জন্য কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতির "নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।" সাহিত্য মহাকাব্যের যুগ হয়তো চলিয়া গিয়াছে, মহাকায় অদ্ভুত পিরামিড সৃষ্টি আজ আর সম্ভবপর নহে কিন্তু মহাকবিদের পদচিহ্ন ধ্যান করিয়া "পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, দমনিয়া ভব-দম-দুরন্ত শমনে।"

"ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয় কৃত্তিবাসী মুকুরে বাল্মিকীর রামায়ন সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই" সত্য; "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" দেবতুল্য রামের বিরহাবস্থার উদ্ভ্রান্ত যুগান্তকারী মূর্ত্তি, শালবৃক্ষের মত বজ্রতুল্য বাহুপ্রভৃতির চিত্র "কাত্তিবাস কৃত্তিবাস" কবি আঁকেন নাই সত্য; কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র এবং সৌহার্দ্দ, কৌশল্যার শোকবিহ্বলতা, সীতার "বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূর" ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী, তুলসী চন্দনে-লিপ্ত বিগ্রহের মত—ভক্তজনের আরাধ্য দেবতার মত প্রেমাশ্রুপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র, মূলাপেক্ষাও অনুবাদে সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালীর ভাবে প্রভাবিত ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রামায়ণ এই জন্য বঙ্গে এত আদরের বস্তু।

"কাশীরামদাসের মহাভারত অত্যন্ত সুন্দর এবং জীবন্ত।" এক একটা অধ্যায় পড়িতে সরল অনারম্বর নির্ম্মল সংসারের কল্যাণধর্ম্মের চিত্র, জগৎপূজ্য বুদ্ধ-বীর ও প্রেমিকগণের শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। নিঃসম্বল, অর্দ্ধভুক্ত পরাধীন বাঙ্গালী জাতিও এই সকল পৃথিবী বিজয়ী, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাপন্ন সংযত মহিমামণ্ডিত পূর্ব্বপুরুষগণের কাহিনী পাঠ করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গিয়া হৃদয়ে গর্ব্ব সাহস ও শক্তি অনুভব করে। এই সকল মহাকাব্য পাঠ করিয়া "কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে, কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তিলাভ করিতেছে, কত স্বদেশ বৎসল

ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছে, কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রবাদ আছে যে কল্পতরুর নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়—রামায়ণ এবং মহাভারত হিন্দু সন্তানের নিকট কল্পতরু সদৃশ। এই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির একাধিক অনুবাদ হইয়াছে সত্য কিন্তু ভাবের মৌলিকতায় ও ভাষার সরলতায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত এবং মলাধর বসুর (গুণরাজখাঁ) ভাগবতই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছে—মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রসাদ পর্য্যন্ত তাহাদের আদর ও প্রধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মহাকাব্য এবং পুরাণ সাহিত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়াও কত কবি কত কাব্য লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থের মূলভাব অনুপ্রেরণা ঐ সকল মহাকাব্যেরই দান।

অনুবাদ সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রথম শ্রেণীর উচ্চভাব সম্বলিত কাব্যের সংখ্যা বাংলা ভাষায় বিরল নহে। "বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে অপূর্ব্ব কবিত্বখনি পল্লীগাথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এ দেশ ভাবজগতে দ্বিতীয় গোলকুণ্ডা'র স্থান অধিকার করিবে।" য়ুরোপ প্রভৃতি বৈদেশিক চিন্তাবীরগণও চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর অপরিণত বঙ্গভাষায় অশিক্ষিত কৃষকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও উচ্চভাবরসপূর্ণ আদর্শ কাব্যসৃষ্টির মাদকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। জগতের অন্য কোন দেশের কৃষক কবি এই প্রকার উচ্চাঙ্গের কাব্য-শিল্পের পরিচয় দিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। পল্লী-গীতিকা ও গাথাকাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পংক্তিতে পংক্তিতে কৃষকের সরল ও অনড়ম্বর ভাষায় যে কবিত্ব উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে,—নীল সাগরের মত অনন্ত আকাশের তলে, 'বনরাজীনীলা' প্রকৃতির কোলে 'বংস' 'ধনু' প্রভৃতি প্রবল নদী সৈকতে স্বাধীনভাবে যে আদর্শপ্রেম শতদলের মত বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তুলনা অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও মেলে না। বঙ্গদেশের প্রেম সাধনা যে কতখানি প্রসারলাভ করিয়াছিল পল্লী পালাগানগুলিই তাহার প্রমাণস্থল।

আমরা পূর্ব্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিকায় পার্থিব "প্রেমের সীমা কোন্‌খানে"—স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথায় মিশিয়া যায় তাহার চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য মানুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া যত কষ্ট ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছে অথবা করিতে পারে পল্লীকবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেয় নাই। অগাধ সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তি দীনহীনা পর্ণকুটিরবাসিনীর পায়ে প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে; দরিদ্রা নারী প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'ধন জন যৌবন'—আপনার যথা সর্ব্বস্ব প্রেমিকের পায়ে সমর্পণ করিয়াছে। "কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়া ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের আগুনে জীবন আহুতি" কি সুন্দর! কি গৌরব ব্যঞ্জক! "কত বিরহীর অশ্রু মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্মসমর্পণ ও হত্যা কত প্রেমিকের শ্বেতাব্জ সুন্দর নির্ম্মলতা কত বীরোচিত ধৈর্য্য, মূর্ত্ত সহিষ্ণুতা পল্লীগীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে।

এই পল্লীগাথাগুলির মধ্যে শত শত কবিত্বময় বর্ণনা নৈপুণ্য—বাংলার পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, চোখের সামনে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরে; মন স্বতঃই ভাবের এক উচ্চ গ্রামে বিচরণ করিতে থাকে। এই সকল কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যে ছুঁৎমার্গ অথবা জাতি বিচার নাই—হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ সকলেই মানুষ—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই বাণী কাব্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

সমস্ত পালা গানগুলির মধ্যে "কঙ্ক ও লীলা" স্বর্গের পারিজাত বনের মত। বংশীবর মুগ্ধ সরলা লীলা—অচ্ছোদ নীল সরোবরের নিষ্কলঙ্ক কমলিনীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সখ্য, দাস্য মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রেম লীলাচরিত্রে এক হইয়া গিয়াছে তাহা একান্তই কালিমা বিহীন—ইন্দ্রিয় জগতের অনেক উর্দ্ধে। কাব্যের বর্ণনাও কবি অতি নিপুণ হস্তে দুই একটী তুলির টানেই অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ষা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন "হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নেমে আসে"—মাত্র একটী পংক্তিতে আলুলায়িত মেঘকুন্তলা বর্ষা সোনার

ঝরি হস্তে ভূতলে জল বর্ষণের কি সুস্পষ্ট ও সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে! কবি অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।

বউ কথা কও বলি কান্দে পথে পথে॥"—অবিশ্রাম বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে পাখীটী মানিনী স্ত্রীর মান ভাঙ্গাইবার জন্যই যেন 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও' বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

বাংলা ভাষার আর একটী সম্পদ মঙ্গল কাব্যগুলি বাঙ্গালী জীবনের যেমন প্রধান অবলম্বন ধর্ম্ম বাঙ্গালী জাতির কাব্যপ্রেরণার মূলও এই ধর্ম্ম। আচার বিচারে ভারতবর্ষ শাস্ত্রের অনুগত হইলেও ধর্ম্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন মতাব-লম্বিতার জন্যই শৈব শাক্ত প্রভৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল এবং এই ধর্ম্ম কলহের ফলেই বাংলাভাষার তথা বাংলা কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। শত শত কবি সেই এক লাউসেন, চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর প্রভৃতির কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে একঘেয়ে মঙ্গল কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। নানা কবি একই 'চৌতিশাস্তোত্র' ও 'বারমাস্যা' বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অল্প কয়েকটী বিষয় লইয়া কারবার ও একঘেয়ে ভাব দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো ঘৃণার সহিত বলিতে পারেন "তখনকার সাহিত্যে স্বাধীনতার বাতাস বহে নাই, সুতরাং তখনকার কাব্যসাহিত্য ভাব সৌন্দর্য্য হীন হইয়াছে।" এই কথাটী কতকাংশ সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে—মরুভূমিতেও "ওয়েসিস্" দেখা যায়;—মঙ্গল কাব্যের মধ্যেও বিজয়গুপ্তের "মনসামঙ্গল", কবিকঙ্কণের "চণ্ডীমঙ্গল", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি কাব্যাদর্শানুসারে উচ্চ আসন লাভ করিবার উপযোগী।

যদিও কবিকঙ্কণ, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহাদের রচিত মঙ্গল কাব্যের গল্প এবং 'Technique' এর জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট ঋণী তথাপি তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনার মধ্যেই কিছু মৌলিকত্ব ও বিশিষ্টতা আছে।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন "কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর।" শেকস্পীয়রের হাতে যে চিত্রাঙ্কণের তুলি ছিল মুকুন্দরামের হাতেও সেই একই তুলি ছিল কিন্তু তাহার চিত্রগুলি সেইরূপ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ভাড়ুদত্ত, 'মুরারিশীল' প্রভৃতি দুই একটী চিত্রে, এবং স্থানে স্থানে কব্যের রচনা কৌশল সুন্দর। বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গলের" চাঁদসদাগরের মত বলবান চরিত্র চণ্ডীমঙ্গলে একেবারেই নাই। যে মনসা পূজা প্রচারের জন্য চাঁদসদাগরেকে শত প্রলোভন দেখাইয়াছে, যে মনসা তাহার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর ডুবাইয়া দিয়াছে, ছয় পুত্রকে বধ করিয়াও সে মনসা ক্ষান্ত হয় নাই 'চাঁদবেনে' লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহাকে 'কানী' বলিতে কসুর করেন নাই। এইরূপ পৌরুষ-ব্যঞ্জক চরিত্র যে কোন সাহিত্যের প্রধান প্রধান চরিত্র হইতে কোনও অংশে হীন নহে। রমণী চরিত্র সৃজন ব্যাপারে বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কবি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির আদর্শই বজায় রাখিয়াছেন "সরলা মিরাণ্ডা, স্নেহশীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেসদিমোনা ইঁহারা সকলেই ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা খুল্লনা বেহুলা প্রভৃতির ন্যায় বিলাতী সুন্দরীগণ সুগৃহিনী নহেন, বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দীন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে এই স্থানে কাব্য ও নীতি হিসাবে মুকুন্দ প্রভৃতি কবির নির্ব্বোরোধ শ্রেষ্ঠত্ব।" ইংরেজ সমালোচক-গণও মুকুন্দরামের কাব্যপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশীয় শ্রেষ্ঠ পল্লীসাহিত্যিক Crabbe এর সহিত তুলনা করেন। অনুরূপস্থানে অনুরূপ শব্দ চয়ন, উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল ছন্দবৈচিত্র প্রভাবে ভারতচন্দ্রের কাব্য ইংরেজকবি Swinebourne এর মত "ভাষার তাজমহল" বলিয়া খ্যাত।

বাংলাভাষায় কাব্য সাহিত্যে আদি এবং মধ্যযুগে যে অনুকরণ প্রিয়তা দেখা গিয়াছিল আধুনিক যুগে অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষ ভাগে মিশনারীদিগের চেষ্টায় বাংলাভাষায় মুদ্রণের ব্যবস্থার ফলে এবং ইংরেজী ও অন্যান্য প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা ভাষায় এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসর বাংলা সাহিত্যের কোনও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও চলে। কিন্তু পরে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার ফলে কাব্য সাহিত্য নূতন জগতে প্রবেশ করিল; নব নব ছন্দ ও কাব্যরীতি (অমিত্রাক্ষর, সনেট প্রভৃতি) বাংলা কাব্যকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল

মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ছায়াবলম্বনে জাতিবৈরকে ভিত্তি করিয়া পৌরাণিক বৃত্রাসুরের ঘটনা লইয়া কবি হেমচন্দ্র যে 'বৃত্রসংহার' কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতে যুদ্ধবর্ণনা প্রভৃতি অনেকাংশ 'বৃত্রসংহার' 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতেও শ্রেষ্ঠ।

নবীন চন্দ্রের প্রতিভালোকপাতে কাব্য সাহিত্যের অন্য এক অন্ধকার কক্ষ আলোকিত হইল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যরচনা ঘটনাবৈচিত্র্যেপূর্ণ নহে, তাহা স্বদেশিকাতয় অনুপ্রাণিত নহে। সুতরাং নবীনচন্দ্র তাহার "পলাশীর যুদ্ধ" "কুরুক্ষেত্রে" প্রভৃতি কাব্য প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা দ্বারা বাংলা কাব্যের বহুকালের অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। তাহার রচিত "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্রে" এবং "প্রভাস" কাব্যে অতিমানব শ্রীকৃষ্ণের আদি মধ্য এবং অন্তলীলা এমন সুন্দর ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে এই সকল কাব্যকে অনেকে 'বিংশ শতাব্দীর মহাভারত' বলিয়া মনে করেন। "এক জাতি মানব সকল—

এক বেদ মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম—

একই ব্রাহ্মণ তার মানব হৃদয়"। এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া মহামানব শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও বেদব্যাসের বুদ্ধিবলে "খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে" এক মহারাজ্য—এক মহাভারত সৃষ্টি করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আধুনিক 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হরিজন আন্দোলনের' কথা কবিবর নবীনচন্দ্র কবে কাব্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ভাবিলে যুগপৎ বিস্ময়াবিষ্ট ও পুলকিত হইতে হয়। এই জন্যই লোকে বলে প্রতিভার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা 'Dialogue form' এ লিখিত হইলেও ওখানি মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের মতই একখানি খণ্ডকাব্য ভাষা, ভাব, অলঙ্কার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি হাত ধরাধরি করিয়া কাব্যকুঞ্জ আমোদিত করিয়া চলিয়াছে!

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতিকাব্য। এই গীত কাব্যের ধারা বাংলা ভাষার আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাহত ভাবে 'বহতা' নদীর মতই ক্রমশ বিবর্দ্ধমান হইয়া বহিয়া আসিয়াছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টির ফলে বাংলার গীতকাব্য সীমহীন সাগরের মতই বিশাল হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য কব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র গীতকাব্য লইয়াই বঙ্গ সাহিত্য বিশ্বের সমৃদ্ধ অন্যান্য সাহিত্যের সহিত একই পংক্তিতে আসন পাইতে পারে। রবীন্দ্র নাথের কাব্যে মুগ্ধ হইয়া জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক Johan Bojer বলিয়াছেন, He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the cross but the Lotus"—তিনি ভারতবর্ষের যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় তথ্য ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা 'ক্রশ' নহে একটী 'শতদল'। বোয়ার কেন এই শতদল যে দেখিবে সেই বলিয়া বসিবে, "নয়ন না তিরপিত ভেল"; সেই এই রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গাহিয়া উঠিবে "জীবন যৌবন সফল করি মানলু।

বাংলার "নির্জ্জন গগনে","গভীর অরণ্যছায়া", "ঘন পল্লবিত কুঞ্জে",উষার গলিত স্বর্ণ","অবসন্ন দিবালোক", "সন্ধ্যার কনকবর্ণে","নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে","শরৎ প্রত্যুষে" "বসন্ত বাতাসে", "মাহ ভাদরে" কি যেন একটী মোহ মাদকতা আছে যাহার তুলনা মিলেনা। সেইজন্য কবি গাহিয়াছেন,"এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি"। সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" বঙ্গ প্রকৃতির এই মাধুরীর ফলে—তাহার যাদুদণ্ডের অপূর্ব্ব সংস্পর্শে অরসিক ব্যক্তিও রসাস্বাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, অকবিও গান গন গাহিয়া ওঠে। এই কারণ বশতই কাব্য সাহিত্যে বিশেষতঃ গীতকাব্যে সহস্র কবির দাম

আমাদের বাংলা ভাষায় পুঞ্জিত হইয়াছে কিন্তু গভীর গবেষণাপূর্ণ গদ্য রচনা তত প্রসার লাভ করে নাই।

যে কোনও দেশের সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পদ্য সৃষ্টি গদ্যের অনেক পূর্ব্বে হইয়াছে। বাংলা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় হয়তো প্রথমে গান, ছড়া প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে কিন্তু সৃষ্টির অগ্র পশ্চাৎ তারিখ শাল প্রভৃতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই কারণ আমরা বসিয়াছি রসালোচনা করিতে; রসালোচনায় ঐ সকল আমাদের কোন ও প্রয়োজনেই হয়তো আসিবেনা সুতরাং প্রথমতঃ বাংলাদেশের "ছেলে ভুলানো ছড়া গুলির ভাব গৌরব বিশ্লেষণ করিলে কোন ক্ষতি নাই।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান—এই ছড়াটী বাল্যকালে কাহার নিকটই না মোহমন্ত্রের মতো ছিল? "আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা। চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।"—এযে আমাদের চিরপরিচিত বাঙ্গালী ঘরেরই চাঁদ যাহাকে লইয়া বঙ্গের বধূ জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলেন "ধনকে নিয়ে বনকে যাবো সেখানে খাবো কি।

বাংলাদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—কানু ছাড়া গীত নাই। সত্যই এই কানুকে লইয়া বাংলা কাব্যসাহিত্য যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে—যে রসের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাহা অন্যান্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। বাংলার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, চৈতন্যদেবের অভ্যুত্থানের পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত অসংখ্য বৈষ্ণব সাধক ও কবির অভ্যুদয়ের ফলে ভাব এবং ভক্তিরসে রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ প্লাবিত ছিল। এই সকল কবির মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, শশীশেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসকল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী, এবং যুগাবতার মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া গীতিকাব্য রচনার ফলেই বাংলাকাব্য সাহিত্যে এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে অন্যান্য ধর্ম্মের মত বৈষ্ণবগণ ভগবানকে অনন্তশক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া মানবজগতের পরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখেন নাই। তাঁহারা কখনও দাস হইয়া, কখনো সুবলাদি সখা হইয়া কখনও যশোদার মত মাতৃভাবে কখনও বা রাধার মত প্রেমরসে বিগলিত হইয়া তাঁহাদের পরকীয় নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য প্রভৃতি রসের মধ্যে গুরুপরম্পরায় মাধুর্য্য অথবা উজ্জ্বল রসই শ্রেষ্ঠ সেইজন্য রাধার পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, মিলন, বিরহ প্রভৃতি লইয়াই শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাগণ অধিকাংশ পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই পদাবলীর মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের একটী অখণ্ড সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহা পাঠকদের মনে অপূর্ব্ব ভাবরস জাগাইয়া তোলে।

আদি কবি চণ্ডীদাসে পূর্ব্বরাগ এবং বিরহের পদ, ভাষার বালসুলভ সরলতা এবং ভাবের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা মনকে ভাবের বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়। চণ্ডীদাসের রাধাকে যখন আমরা প্রথম দেখিলাম তখনই তাঁহার ভাবাবেশে—কৃষ্ণনাম শুনিয়াই সে মুগ্ধ—"কেবা শুনাইল শ্যামনাম"—এই নামের মধ্যে কত না 'মধু'। ইহা মানুষকে ঘর সংসার ভুলাইয়া দেয়; এ নাম জপ করিতে করিতে প্রাণ অবশ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্যের আরাধ্য দেবতার নাম কীর্ত্তনের এমন সুন্দর রসময় কারণ বর্ণনা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুধাবনের বিষয়। বিদ্যাপতির বর্ণনাকৌশল অলঙ্কার চয়ন রীতি, ভাষার কারুকার্য্য প্রভৃতি কোন বাংলা ভাষাভিজ্ঞ লোককে না মুগ্ধ করে! চণ্ডীদাসের কবিতা যেমন কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের পদগুলিও পাঠ করিয়া পাঠক অথবা শ্রোতা বলিয়া ওঠে, সেই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু শ্রুতিপথে পরশ না গেল। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে গোবিন্দদাসের রচনা বিদ্যাপতির এবং জ্ঞানদাসের রচনা চণ্ডীদাসের ভাবে অনুপ্রাণিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কৃষ্ণকমল গোস্বামীকৃত শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ কাব্যে বাহুল্য দোষ প্রভৃতি থাকিলেও তাহার ভাব গৌরব অতি উচ্চ দরের। বাংলার পল্লীগাথায় পার্থিব প্রেমের যে চূড়ান্ত

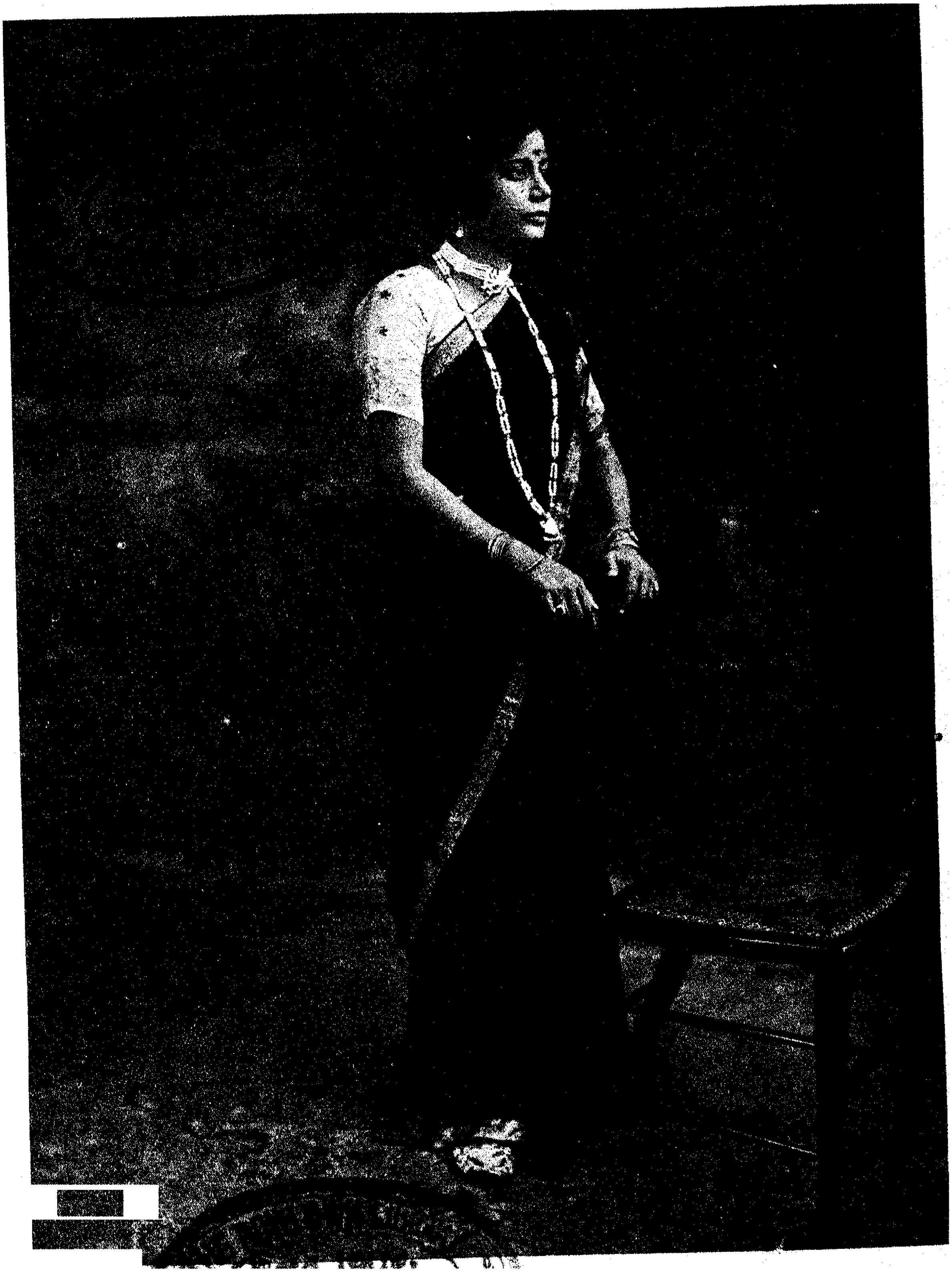
অঙ্কিত হইয়াছে বৈষ্ণব কাব্যে তাহাই স্বর্গীয় প্রেমের সর্ব্বশেষ কক্ষে বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন আসিয়া পৌছিয়াছিল।

ভক্তি ও প্রেম বিষয়ক গীতকাব্য বাংলাভাষায় এত বহুল পরিমাণে দেখা যায় যে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে প্রত্যেক পাঠকই তাহার স্ব স্ব রসানুভূতি অনুযায়ী যাহা যাহা তাহার কাছে ভাল লাগিয়াছে তাহাই অন্য ব্যক্তিকে শুনাইতে ভালবাসে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে ভাল লাগা কবিতার সংখ্যাও এত বেশী যে সব সময়ে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা সম্ভবপর হইয়া উঠে না অনেক কিছু বাদ দিতে হয়।

আদ্যাশক্তি কালীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আপনভোলা ভক্ত রামপ্রসাদ যে ভাবলোকের সন্ধান বাঙ্গালীকে দিয়াছেন—"সে দেশের কথা এদেশে কহিলে" প্রত্যেক রস সম্বিৎসু ব্যক্তিকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আদ্যাশক্তি যে তাঁহার গর্ভধারিণী মা নহেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তিনি কখনও মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন "আমায় দেও মা তবিলদারী", কখনও আব্দার করিয়া বলিতেছেন, "তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচি", কখনও বা অভিমান করিয়া বলিতেছেন, "মা হওয়া কি মুখের কথা—কেবল প্রসব ক'রে হয়না মাতা"।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্য সাহিত্য হইতে "হেম মধু বঙ্কিম, নবীন" এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের রস রচনায় প্রবেশ করিলে আর "কূল কিনারা" পাওয়া যায় না—এই কাব্য সাহিত্য বিরাট সমুদ্রের মত—"নাহি তল নাহি তীর"। পূর্ব্বেই আমরা হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতির কাব্য সাহিত্য লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি তবে তাঁহাদের গীতকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। গীতকাব্যকে সাধারণতঃ—প্রেম বিষয়ক, ধর্ম্ম বিষয়ক, স্বদেশ বিষয়ক, মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এবং হাস্যকৌতুক বিষয়ক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যের প্রেম বিষয়ক গীতিকবিতা অতুল প্রসাদের "গীতিকুঞ্জের" ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাগুলি, হেমচন্দ্রের "আর ঘুমাইওনা দেখ চক্ষু মেলি" প্রভৃতি কবিতা, নজরুল ইসলামের উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির হাস্যকৌতুক বিষয়ক রচনা বাঙ্গালীর এবং বাংলাভাষার গৌরব করিবার বস্তু সন্দেহ নাই। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গীতকবিতা রচনায় পারদর্শী। তাঁহার "গীতাঞ্জলির" ছন্দবিহীন অনুবাদেও বিশ্ব মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠে, "A Great Soul of an incomparably great nation" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে বাংলা কাব্যে সাধারণতঃ "epic" অথবা "Classical element" প্রধান ছিল, অর্থাৎ তখনকার কবিতা ছিল বস্তুতান্ত্রিক— কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা "Lyric" অথবা "Romantic"—"Subjective" অর্থাৎ কবির বর্ণনীয় বিষয় হইতে তাহার মনের পরিচয়টাই বেশী পাই; সেই জন্য কাব্য যেমন রসময় হইয়া উঠে পাঠকও তেমনই মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

বাংলা কাব্যের ভাব গৌরব এবং রসবৈচিত্র্য সামান্য নহে; পরন্তু তাহা ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার কাব্য সাহিত্যের পাশে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখে। বাংলা সাহিত্য বয়সে এখনও শিশু,—যতদিন যাইতেছে ততই ইহার ভাণ্ডার মণি মাণিক্যে ভরিয়া উঠিতেছে; কত রত্ন এখনও জহুরীর চক্ষুর অগোচরে "পুঁথি" আকারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল অনন্ত সম্ভাবনার কথা ভাবিয়াই বাংলার কবি গাহিয়াছেন, "বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা সত্য হউক" সত্য হউক।



লীলা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ কলিকাতা

অসতী

—গল্প—

শ্রীনকুড় চন্দ্র মিত্র বি-এ

[নারী ভুল করিয়া বাহিরে গেলে বাহিরেও তাহার নির্য্যাতনের সীমা থাকে না—আবার ঘরে ফিরিতে গেলেও সে দেখে গৃহ-দ্বার তাহার জন্য রুদ্ধ। এমনি অবস্থায় পড়িয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য অসহনীয় ক্লেশ সহিয়াও ঘরে আসিয়াও পুটি যখন অসতী নামই পাইয়া আবার ঘর ছাড়িয়া পথে পা বাড়াইল তখন তাহার স্বামী তাহার পথের-সাথী হইয়া কেমন করিয়া স্বামীত্বের মর্য্যাদা রাখিল সুলেখক নকুড়বাবু এই গল্পে তাহাই দেখাইয়াছেন।]

পর পর কয়বৎসর চাষে লোকসান খাইয়া প্রসন্ন নিজের গাঁ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিল, কলিকাতার সহরতলীতে এক আড়তদারের দোকানে খাতা লিখিতে। যাইবার সময় বালিকা বধূ কাঁদিয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছ? তোমায় ছেড়ে আমি থাকব কি করে?

পুটিরাণীকে প্রসন্ন কাছে টানিয়া বসিল, কেঁদ না চুপ কর।

পুটি বলিল, আমার মা বাবা নেই, কার কাছে, তুমি আমায়……কান্নায় তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

সস্নেহে পুটির একটা হাত অপনার কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া প্রসন্ন বলিল, আমার মা বাবা রহিলেন, তাঁদের কাছে থাকবে। মাঝে মাঝে আবার আমি আসব—চিঠি দেব।

মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া পুটি নীরবে কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। তারপর হঠাৎ আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে আমি একটা দিনও—।

পুটির অশ্রুবিগলিত মুখখানি প্রসন্ন বুকের মধ্যে পুরিয়া বলিল, ছিঃ, চুপ কর। পারবে থাকতে—ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে যাবে। বলিয়া কাপড় দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল।

পুটি চুপ করিল।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। আটমাস কাটিল। বছর ঘুরিতে চলিল। প্রসন্ন কাজের ভিড়ে আর এ পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরিতে পারে নাই। পুটু খায় দায়, শাশুড়ীর সঙ্গে-সাথে সংসারের কাজকর্ম্ম করে, আর প্রতিদিন সকালে শয্যাত্যাগের সময় কপালে দুইহাত ঠেকাইয়া ভাবে, আজ স্বামী তাহার নিশ্চয় আসিবেন। দিন কাটিয়া যায়, সন্ধ্যা বহিয়া যায়—স্বামী আসেন না। পুটি জানিত না যে, প্রসন্ন গৃহত্যাগ করিয়াছিল একটা কঠিন সংকল্প লইয়া। দুই শত টাকা অন্ততঃ সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত সে ফিরিবে না—কারণ তাহাদের সংসারের ভিতরের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার উপর একটা ভারী দেনা চাপিয়া গিয়াছিল।

আচ্ছা, আজ না হয় তিনি নাই আসিলেন—কাল আসিবেন। এই ভাবে পুটি দিনের পর দিন গোণে। পাড়া বেড়াইবার নাম করিয়া বৈকালে সে টগরদের বাড়ী গিয়া তাহাদের উঁচু দাওয়াটায় বসিয়া গল্প সল্প করে, আর মাঝে মাঝে আড়চক্ষে তাহাদের উঠানের গা দিয়া প্রসারিত পাড়ার ছোট্ট রাস্তাটির দিকে চাহিয়া দেখে—কারণ প্রসন্নকে বাড়ী আসিতে হইলে ঐ পথ দিয়াই আসিতে হইবে। আশানৈরাশ্যের প্রাত্যহিক ঘাত-প্রতিঘাতে পুটীর প্রাণটুকু যেন দম্-মরা হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রসন্ন তবুও বাড়ী ফিরিল না।

সেদিন ও পাড়ার মধু বেরার ছেলে নিরাপদ নিজেদের কি একটা প্রয়োজনে খিদিরপুর গিয়াছিল। প্রসন্নর সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। প্রসন্ন ভালই আছে। তবে একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। তাহার হাত দিয়া প্রসন্ন গোপনে পুটির জন্য দু'টা রুপার আঙট পাঠাইয়াছে। আসিবার কথা কিছু স্পষ্ট বলে নাই। পুটু কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিল যে, তাহার পায়ের দুটা আঙট, দেখিয়া অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল—একবার ভাবিল, দূর করিয়া সে উহা পুকুর জলে ফেলিয়া দিবে, তারপর কি ভাবিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঐ দুটাকে অত্যন্ত সংগোপনে তাহার ছোট টিনের ট্রাঙ্কটায় তুলিয়া রাখিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পুটি ভাবিল, গহনায় কি হইবে, মানুষ কই? পুটি আর স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে

পারিতেছিল না। আর কি সহ্য যায়? মধ্যে মধ্যে আসিব বলিয়া গেলেন, এই কি আসা?

বাপের বাড়ীর কেহ জীবিত ছিল না—থাকিলে সে না হয় দুই দিন ওখানে গিয়া ঘুরিয়া আসিত। পুটি অস্থির হইয়া পড়িল। কিছু তাহার ভাল লাগে না। সংসারের কাজে কর্ম্মে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখিতে চায়, কিন্তু হাত কাজ করে—মন সর্ব্বদাই চিন্তা-মগ্ন! হঠাৎ কেহ বাড়ী ঢুকিলে সে চমকিয়া উঠে—বুঝি তিনি আসিলেন! হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে, ভাবে—তাঁহার কণ্ঠস্বর! পথ দিয়া কাহাকেও ব্যাগ পুটুলি লইয়া আসিতে দেখিলে সহসা তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

পাড়ার লোকে পুটিকে দেখিলে ব্যথার নিশ্বাস ফেলে পুটির মনের দুঃখ সকলেই বুঝে। ধাড়াদের মুরলী একদিন বলিল—নতুন বৌ, কাল আমি বোধহয় খিদিরপুর যাব। তা প্রসন্নদার খবরটাও নিয়ে আসবো।

করুণ স্বরে পুটু বলিল, যাবে ঠাকুরপো?

—হাঁ যাবো।

পুটি নিঃসঙ্কোচে কহিল, তা হ'লে একবার আসবার কথা বল্বে?

—বল্বো। কিন্তু আসবেন কি?

পুটি বলিল, আমার নাম ক'রো তাহলে—

মৃদু হাসিয়া মুরলী বলিল, সে দাবী তোমার যদি আর থাটতো নতুন বৌ, তাহলে তিনি ইতিপূর্ব্বেই আস্তেন।

একটি চুপ করিয়া থাকিয়া পুটি বলিল, আমার কথাতেও আস্বেন না?

—কি করে বল্বো বল!—আস্তেও পারেন, নাও পারেন।

পুটি কোন জবাব দিল না। খানিক পরে হঠাৎ বলিয়া বসিল, আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো, ঠাকুরপো?

মুরলী ঢোক গিলিয়া বলিল, খিদিরপুরে?

—হাঁ।

—কিন্তু তোমাদের বাড়ীর লোকে রাজী হবেন কেন?

—না হন, লুকিয়ে যাবো।

—লুকিয়ে?

—হাঁ তাই।

বলিয়া পুটু অত্যন্ত অকস্মাৎ মুরলীর হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমার এই উপকারটুকু তুমি করবে না, ঠাকুর পো?

মুরলী ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, উপকার?...আচ্ছা তা...। এদিক ওদিক একবার তাকাইয়া মুরলী পুনরায় বলিল, আজ সন্ধ্যায় যখন হালদারদের ঘাটে কাপড় কাচতে আসবে তখন একটু অপেক্ষা করো—পাকা কথা তোমায় বলে যাবো। লুকিয়ে যেতে হলে রাত থাক্‌তে বের হতে হবে, বুঝলে?

মুরলী চলিয়া গেল।

পুটি যাহা বলিল তাহাই করিল। বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে মুরলীর সহিত স্বামী সন্দর্শনে ভোর রাত্রেই গৃহত্যাগ করিল।

কিন্তু মুরলী যেখানে আসিয়া তাহাকে ট্রাম হইতে নামাইল, সেটা খিদিরপুর নয়—শ্যামবাজার।

পুটি বলিল, ঠাকুর পো, কই, দোকান কই? তখনি আবার বলিল, দেখ তুমি আগে গিয়ে দেখা কর—আমি একটু দূরে দাঁড়াই—নইলে হয়ত চটে যাবেন।

মুরলী বলিল, আচ্ছা সঙ্গে এস।—বলিয়া অগ্রসর হইল। পুটি পিছন পিছন চলিল।

চারিদিকের দোকান পত্র ও লোকজনের হৈ হৈ শব্দে পুটি কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ আবার বলিয়া উঠিল, ঠাকুর পো, কই কত দূর?

মুরলীর দিকে চাহিতেই পুটি দেখিল, মুরলীকে একজন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেছে। পুটি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ভদ্রলোকটি মুরলীকে ছাড়িয়া একবার পিছন ফিরিয়া পুটির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দ্রুত ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। দৃষ্টিটা পুটির মোটেই ভাল লাগিল না। সজোরে একটা

আবীর

—গল্প—

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী

[নারীর বাহির দেখিয়াই আমরা অনেক সময় অনেক ধারণা করিয়া বসি তাহার ভিতরের কথা কিছু না জানিয়াও। এমনি একটি মেয়ের অপূর্ব্ব চরিত্রের কথা এই গল্পটিতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকা নূতন হইলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এই গল্পেই তাহার প্রমাণ পাইবেন।]

পূর্ণিমা রাত্রি, পৌষের হিম কুহেলিকা জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কনকনে শীত, তার মধ্যে দুইদিন যাবৎ সূর্য্য দেব এমন ভাবে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন যে, আটচল্লিশঘণ্টার মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যেও তাঁর সামান্য কিরণ রশ্মি ধরণীর বুকে নিক্ষেপ করেন নাই। বহরমপুর সহর যেন দ্বিতীয় দার্জ্জিলিংএ পরিণত হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় আটটা, এমন সময় বহরমপুর সহরে একটা মেসে, মেস বলিতেই কেহ যেন না মনে করেন, যে এটা ছাত্রাবাস। এ মেসে ছাত্র একটিও নাই, আছে কয়েকটি ছাত্রের বাবা। অবশ্য কেহ বা আফিসে কাজ করেন, কেহবা স্কুলে মাষ্টারী করেন, কেহবা কলেজে প্রফেসারী করেন, এমনি কয়েকটি বাবুতে মিলিয়া এই মেসে বাস করেন। একে শীতকাল, তায় আবার সমস্ত দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। বাবুদের সকলেরই ইচ্ছাতে মাংস পোলাও ইত্যাদিতে ফিষ্টের যোগাড় হইয়াছে। রন্ধনের বিলম্ব হেতু কয়েক জন একত্র হইয়া লেপের নীচে থাকিয়াই গল্প গুজব করিতেছিলেন। বাবুদের বয়স কাহারও চল্লিশ পার হয় নাই, অতএব যৌবনের চাঞ্চল্য গেলেও তার মাদকতা এখনও যায় নাই। তাছাড়া, সকলেরই একটা না একটা ঠেকায় আজকালকার ধরণে স্ত্রী সঙ্গে লইয়া বিদেশে বাস করিবার সুযোগ না থাকায়, শয্যার সঙ্গিনীর অভাবটা কতকটা বা কর্ম্মক্লান্ত দেহটা শয্যায় এলাইয়া দিয়া সুদূরের প্রেয়সীর মুখখানি ভাবিয়া কতকটা বা বন্ধুবান্ধবের সহিত রসালাপ করিয়া মিটাইতেন।

আজও তেমনি সব আলাপ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে যোগেন বাবু ইনি দলের মধ্যে রসিকপ্রবর নামে অভিহিত। হাসিয়া বলিলেন আচ্ছা ভাই, নিজের নিজের স্ত্রীর গল্প তো সবাই করো, আর তা শুনেছিও ঢের। আজ একটা নূতন রকম গল্প করা যাক কারণ সবেরই যেমন একটা বৈচিত্র্য থাকা দরকার তেমনি গল্পের মধ্যেও বৈচিত্র্য না থাকলে একঘেয়ে গল্প তেমন জমেনা। হরেন বাবু বলিলেন, ওসব নিত্য নূতন বৈচিত্র্য তোমার মাথায় খেলে ভাল, আমাদের এ মগজের কর্ম্ম নয়।

আহা ভাই এত অল্পেই হাল ছাড়ছো কেন? সবেতো পয়ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছো, এরি মধ্যে যদি হাল ছেড়ে দাও তবে দেখছি, পঁচিশের কোঠায় যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে নূতন পথ দেখতে হবে। সেটা কি তোমার পক্ষে সুখের হবে?

নগেন বাবু বলিলেন, "ওহে, যোগেন আমরা তো সবাই হাল ছেড়ে দিয়েই আছি। কুড়ি আওলী, পঁচিশ আওলী, ত্রিশ আওলীরা যদি নূতন পথ খোঁজেনই তাতে বাধা দেবার তো কেউ নাই।

সবাই একবার, হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

যোগেন বাবু বলিলেন, আচ্ছা, তোমাদের মগজ থেকে যখন নূতন কিছু বেরুবেনা, তখন আমাকে দেখছি একটা কিছু বার করতে হবে। কিন্তু ভাই আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি, যা, বোল্‌বো সবাই ঠিক ঠিক জবাব দেবে। বল, সত্য করো, তবে আমি আরম্ভ করি।

সবাই একবাক্যে সত্যি করিলেন, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে, তবে সে বিষয় যিনি যাহা জানেন, তাহা অকপটে বলিবেন।

যোগেন প্রশ্ন করিলেন—তোমরা ভাই জীবনে কেউ কখনও লভে পড়ে ছিলে?—সবাই হো হো করিয়া একচোট হাসিয়া লইলেন।

যোগেন বাবু বলিলেন এইতো, গোড়াতেই সত্য ভঙ্গ করতে সুরু কল্লে!

হীরেন বাবু বলিলেন ধ্যেৎ, আমাদের আবার একটা জীবন! ওসব হলো আজকালকার ছেলেদের জন্য।

যোগেন বাবু বলিলেন মশাইতো বড় সেকেলে নন, এইতো সবে ত্রিশ, বত্রিশ।

আরে ভাই, ত্রিশ, বত্রিশ হলে হবে কি অভিভাবকেরা লভে পড়বার অবসরই দিলেনা। আমরা হলুম কুলীনের বাচ্ছা, ষোলর কোঠা পার হতে না হতে গলায় গেঁথে দিলে মস্ত ঘণ্টা। মানুষ যে বয়সে লভে পড়ে সে বয়সে দু ছেলের বাবা। তখন ছেলের লভে পড়বো না তার মায়ের লভে পড়বে কিছুই ঠিক করতে না পেরে, একদম চাকুরী নামে প্রেয়সীর লভে পড়ে একেবারে গৃহছাড়া, প্রবাসে এসে মেস-বাসী হয়ে আছি। আবার সকলের অট্টহাসি।

ঘরের একধারে একখানি তক্তপোষে পরিষ্কার শয্যায় আরামে শয়ন করিয়াছিলেন অমল চন্দ্র রায় নামে একটি ভদ্রলোক। ইনি কোন কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ইহার বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল। তবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, সেটাকে কাজে না লাগাইয়া মর্চ্চা ধরানো ইহার অভিপ্রায় নয়। তাছাড়া নিজের উপার্জ্জনের টাকা ব্যয় করিয়াও একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। অতএব অমল বাবু কলেজ হইতে বাহির হইয়া একদিনও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন নাই। তবে ধনীর সন্তান হইয়াও সহরে একটা বাড়ী লইয়া স্ত্রী পুত্র সহ বাস করিবার ও উপায় নাই। কারণ অমল বাবুর বয়স আটত্রিশ উনচল্লিশ হইলেও এখনও তাহার পিতামহ জীবিত। সংসার খুব বড়— বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে। মাতা একাকী সব দিকে সামলাইতে পারেন না, বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা যত্ন করিতেই তার দিবসের অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়। শাশুড়ী না থাকায় শ্বশুরের প্রতি প্রবীণা পুত্রবধূর দৃষ্টিটা অতিমাত্রায় ছিল। সংসারের এদিক সেদিক্, অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদির আদর আপ্যায়ন করিতে সংসারে অমল বাবুর স্ত্রীই একমাত্র সুপারগ। তাই বিদেশে আসার কথা দূরে থাকুক অন্যকেহ আভাসেও যদি কোনদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলেছে অমনি অমল বাবুর মা বলিয়াছেন—"অমন কথা তোমরা মুখে এননা; বড় বৌমা বিদেশে গেলে, ওর সংসার, শ্বশুর, শাশুড়ী এসব কে দেখবে? বড় বৌমা আমার ঘরনী গৃহিণী ছেলেপুলের মা, ওর কি এখন বিদেশে যাওয়া পোষায় না তা ভালই দেখায়? কই আমরাতো জীবনেও কখন বিদেশে যাইনি।

বলা বাহুল্য অমল বাবুর পিতা কোন একটা সবডিভিসনে ওকালতি করিতেন। তিনিও তাহার পিতামাতার সেবার জন্যই স্ত্রীকে কোনদিন নিজের কাছে লইয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বৌ বিদেশে লইয়া যাওয়াটা যেন উহাদের বংশে নিষিদ্ধ ফল গোছের। অতএব অমল বাবু একাকী একটা বাসা করিয়া থাকা অপেক্ষা বন্ধুপরিবেষ্টিত মেসের জীবন যাপনেই আরাম ও আনন্দ বোধ করেন বলিয়া আজ তের বৎসর মেসে মেসে কাটাইতেছেন। তবে দেখা যায় দু দিনের ছুটি থাকিলেও অমল বাবুর গৃহে যাওয়া বাদ যায়না। ঐ জন্য অবশ্য বন্ধুমহলে ঠাট্টা বিদ্রূপেরও অন্ত থাকে না অমল বাবু লোকটী সদালাপী ও মিষ্টভাষী। দেখিতে সুপুরুষও বলা যায় না, কিন্তু কুশ্রী বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই মাধুর্য্য পরিপূর্ণ থাকিত। বয়স আটত্রিশ উনচল্লিশ হইলেও ত্রিশের বেশী বলা যায় না। এমনি ছিল তার চেহারাটি ও ততোধিক ছিল তাহার মনটীও কাঁচা। এ বয়সেও যেন তাঁহার মধ্যে একটী কিশোর বালক সুপ্ত থাকিত। কারণে অকারণে জাগ্রত হইয়া অনেক সময় এই নীরস বৈচিত্র্যহীন মেসের জীব কয়েকটীকে বিশুদ্ধ আনন্দ ধারায় স্নান করাইত। পঠদ্দশা হইতে আজ পর্য্যন্ত চরিত্রবান বলিয়া খ্যাতি থাকায় তাঁহার বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য লাভকে অনেকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত। ছোট বড় সকলেরই সহিত নির্ব্বিচারে তিনি আলাপ করিতেন। বন্ধু মহলেও গল্প জমাইতে তাঁহার জোড়া ছিল না। কিন্তু আজিকার এই গল্পের মধ্যে তাঁহাকে একটি বারের জন্যও যোগ দিতে না দেখিয়া রসিক প্রবর যোগেন বাবু প্রথমে বলিলেন "বলি, কি দাদা, আজ যে একেবারে চুপ চাপ। বলি, হ'ল কি? প্রেয়সীর চিন্তা ছেড়ে, আমাদের এই সরস

গল্পের উপর তোমার মুখ নিসৃত বাক্যের একটু বুকনি লাগিয়ে দাও। তোমাকে বাদ দিলে যে আমাদের গল্পই জমে না। আজকের এমন কনকনে শীতে লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে অভিনব বৈচিত্র্য রঞ্জিত প্রেমের গল্প শুনতে কি আরাম বলতো দাদা?

হিরেন বাবু বলিলেন—ওহে দাদাটি আমাদের মহাদেব; তায় বয়সও হ'ল ঢের, ওর রাশে আর লেগ না ভাই। ওর কি এখন আর লভে পড়বার বয়স আছে?

হরেন বাবু বলিলেন, "দূর গাধা" লভে পড়বার বয়স কি এখন তোর আমারই আছে? পূর্ব্বে কেউ কখনও পড়েছিলেন না কি, সেইটেই হচ্ছে আমাদের এ মিটিং এর জিজ্ঞাস্য বিষয়। এখন সকলে মিলিয়া অমল বাবুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

যোগেন বাবু বলিলেন, বলতো দাদা তুমি জীবনে কখনো লভে পড়েছিলে না কি? অমল বাবু এতক্ষণ নিরুত্তরই ছিলেন। এবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে আগে এ বিষয়ে মিটমাট হয়ে যাক্ তারপরে বুড়োর লভের কথা শুনো

এই মেসে যে কয়েকজন থাকিতেন, তন্মধ্যে অমল বাবুই বয়োজ্যেষ্ঠ; এজন্য সকলে তাঁহাকে দাদা বলিয়া ভাবিত। এরপর কে কবে ভ্রাতার শ্বশুরবাড়ী যাইয়া তাঁহা শ্যালিকার নয়নে সুপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়া, তাঁহার লভে পড় পড় হইয়াছিলেন, বৌদিদির চোখ রাঙানিতেও বিদ্রূপের ভয়ে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কে বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া বাসরে মেয়ে মজলিসের মধ্যে কোন হরিণ-নয়নার কোমল কটাক্ষে পড়িয়া সামাল্ সামাল্ ডাক্ ছাড়িয়াছিলেন, কে চলন্ত গাড়ীর গবাক্ষ পথে মুহূর্ত্তের জন্য একখানি চাঁদমুখ দেখিয়া, আত্মবিহ্বল হইয়া ফেরি-ওয়ালার আচম্কা ধাক্কায় গাড়ী চাপা পড়ার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কে নির্জ্জন পুকুর ঘাটে রূপসী পল্লী নারীকে দেখিয়া কাঁচা মাথায় প্রেমের কবিতা লিখিয়া, অভিভাবকের হস্তে ধরা পড়িয়া কানমলা খাইয়া, নাকে কানে খত দিয়া কবিতার উপসংহার করিয়াছেন; কেউ বা টিপার্টিতে কেউ বা গার্ডেনপার্টিতে এমনি কতরূপে, কতভাবে, সকলেই সকলের লভে পড়িবার কথা অকপটে বলিয়া যাইলেন।

তারপর অমলবাবুর পালা। তিনি বেশ একটু গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, ভাই, তোমরা যে জিনিষটা নিয়ে এত হাসি ঠাট্টা করছো, আমার কাছে সেটা মোটেই হাসির বিষয় নয়। মানুষের অন্তর্জ্জগতের বিশেষ দিক নিয়ে, তার মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ জিনিষ নিয়ে এতটা হাসি তামাসা করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়।

অমলবাবুর কথাগুলির মধ্যে পরিহাসের বিন্দুমাত্র রেশ ছিল না। তাঁহার গম্ভীর মুখনিসৃত, পরিহাস বর্জ্জিত কথাগুলি শুনিয়া উপবিষ্ট ভদ্রলোক কয়েকটির চোখে চোখে কেমন যে একটা হাসি মুহূর্ত্তের জন্য খেলিয়া গেল, তাহাকে বিদ্রূপও বলা যায় না অথচ পরিহাসবর্জ্জিত বলিতেও বাধে। তবে, কৌতূহলটা যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার নাই। সকলেই অমলবাবুর চিন্তাযুক্ত গম্ভীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। মুখ ফুটিয়া কেহই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, যে বিষয়টা কি এবং এমন পরিহাসশূন্য 'লভের' সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা?

অমলবাবু কহিলেন, তোমাদের সে কাহিনী শুনে লাভ নেই। তোমাদের এমন সরস মজলিসের মধ্যে সে কাহিনীটা বড়ই বেখাপ্পা ও রসশূন্য বোধ হবে।

সবাই সমস্বরে বলিলেন, না, দাদা, আমাদের মোটেই রসশূন্য লাগবেনা। তোমার এ হেঁয়ালি যদি না শোনাও, তাহলে তো এ মজলিস আজ জমবেই না, এমন কি মাংস পোলাওযুক্ত সাধের ফিষ্টি তাও কারও মুখে সুখাদ্য বলে গণ্য হবে না। দোহাই, দাদা, অতটা গম্ভীর হয়ো না, কথাটা আমাদের শুনিয়ে কৌতূহলটার নিবৃত্তি করে দাও।

অমলবাবু তেমনই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নেহাৎই যদি তোমরা না শুনে ছাড়বে না, তবে আমাকে বোলতেই হবে। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। সব কথা যে আজ গুছিয়ে বলতে পারবো, তা, মনে হচ্ছে না। এ গল্প শুনবার আগে তোমরা সবাই একটা কথা দাও।

সবাই আবার তাঁহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই বলিলেন, কোন দিন ভুলক্রমে তোমরা এ প্রসঙ্গ নিয়ে

বিদ্রূপ করবেনা, বলো? সকলেই একবাক্যে অঙ্গীকার বদ্ধ হইলেন। অমলবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, কোন গার্ডেনপার্টিতেও না, কোন টি পার্টির টেবিলেও না, কোন বিবাহ বাসরে মেয়ে মজলিসেও না, কোন চলন্ত গাড়ীর গবাক্ষ পথেও না, কোন থিয়েটার বায়স্কোপের রঙ্গমঞ্চেও না, বা কোন নির্জ্জন নিরালা বাপীতটেও নয়। দেখা হয়েছিল, শরতের রাত্রে, এক কর্ম্ম কোলাহল মুখর বাড়ীতে দধির হাঁড়ি হস্তে; সে ছিল তখন পরিবেশনে-রতা। তারপর শুভদৃষ্টি হল শরতের সকালে কার্য্যোপলক্ষে চলন্ত অবস্থায়। আমিও বিপরীত দিক থেকে আসতে হঠাৎ কলিসন হবার ভয়েই হয়তো একটু পাশ কেটে সরে দাঁড়াবার সময় একটু চকিত চাহনি। বলা বাহুল্য, বিনিময়টাও বাদ যায় নাই।

যোগেনবাবুর ধাতে বেশীক্ষণ নীরব থাকা সহ্য হইল না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ও বাবা! তোমার মধ্যেও দাদা এ রোমান্স? আমি তো মনে করতুম এ ব্যাধিটা, আমাদের মত লোয়ার ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে চলিত। তোমার মত হাই ক্লাসের ছাত্রও যে এ ব্যাধি থেকে নিস্তার পান নি, শুনেও একটু সান্ত্বনা পেলুম। তা, দেখা মাত্রই বুঝি, সেই চন্দ্রবদনার পায়ের তলায় নীরবে মন প্রাণ সমর্পণ?

অমলবাবু এ পরিহাসে বিন্দুমাত্র যোগদান না করিয়া বলিলেন, চন্দ্রবদনা কিনা, জানিনা, তবে স্ফোটক-বদনা যে তখন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সবাই হাসিয়া বলিলেন, দাদা! সাহিত্য জগতে অনেক রকম বদনীরই ব্যাখ্যা শুনেছি, স্ফোটকবদনী শব্দটা পেয়েছি বোলে তো মনে হয় না? তোমার কৃত এ নূতন অভিধানের শব্দের মানেটা তুমিই বুঝিয়ে দাও।

অমলবাবু একটু হাসিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, এই সোজা কথাটারও মানে বুঝলেনা? অর্থাৎ যে দিন আমি প্রথম চকিতে তার মুখখানি দেখেছিলুম, তখন তার মুখের অনেক স্থানেই, গরমে ফোড়ার মত উঠেছিল।

আবার সকলে প্রশ্ন করিল, তিনি কুমারী না, বিবাহিতা?

অমল বাবু বলিলেন, তিনি সম্বন্ধে আমার ঠান্‌দি।

এবার সবাই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বেশ, বেশ, ঠান্‌দির সঙ্গে লভে পড়া একটা নূতন রকম রোমান্সের সৃষ্টি। এ লভটা জমবেও ভাল।

অমলবাবু বলিলেন, তোমাদের মত বয়োবৃদ্ধ চঞ্চলমনা ছোকবাদের কাছে বলবার এ গল্প নয়।

সকলেই বুঝিলেন, তাঁহাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ না করার অঙ্গীকার সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের অভ্যস্থ স্বভাব ছাড়িতে না পারায়, তিনি রাগিয়া গিয়াছেন। অতএব, যোগেনবাবু মধ্যস্থ সকলের হইয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, ভাই, ওদের কোন দোষ নেই। কেবল মাত্র দোষের আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়াছিল। অতএব দয়া করে সেই লোলরসনা, বিগত যৌবনা, স্ফোটক বদনার সঙ্গে প্রেমে পড়ার সরস গল্প থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রোনা।

অমল বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দেখা যাক, কতক্ষণ এই ভব্যতা রক্ষা হয়। হাঁ তোমরা ঠান্‌দি শুনেই চমকে উঠছো। কিন্তু তিনি মুক্তাবিনিন্দিতা দন্ত সমন্বিতা পরিপূর্ণ যৌবনা, সুশ্রী, সুমার্জ্জিত রুচি ও আমাপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের ছোট।

আমার এক ঠাকুরদাদা, তাঁকে চতুর্থ পক্ষ করে এনেছিলেন আমাদের কুলীন বামুনের ঘরে এমন বিবাহ বিরল নয়। তবে আমি ভাবি, তাঁর অকুলীন বাপ এমন মেয়ে ওইরকম বরে কি করে দিলেন।

প্রথমবার তার সঙ্গে আমার ওই পর্য্যন্ত চেনা শোনা। আমি তখন বি, এ, পড়ি; সুতরাং বলেজ খুলতেই কলকাতায় চলে এলুম। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা কুলীন সন্তান, অতএব বিংশতি বর্ষে পা দিতে না দিতে ঠাকুরদাদা আমাকে একরূপ নিরক্ষরা, ত্রয়োদশবর্ষীয়া, এক শ্যামাঙ্গী গ্রাম্য বালিকার হাতে দিয়ে, অরক্ষণীয়া হবার বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যাই হোক্ তখন নবীন বয়স, নবীন যৌবন, ইংরাজী সাহিত্যে রাশি রাশি প্রেমের গল্প পড়ে, সেই রঙ্গীন চিত্র মানসপটে এঁকে সর্ব্বদা ভরপুর থাকতুম। তখন সেই অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকাকে কেন্দ্র করে, তারই উদ্দেশে, শত শত কবিতা লিখে তারই করকমলে, আকুল আগ্রহে পত্র পাঠিয়ে প্রত্যুত্তরের

আশায় ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করে, শুধু তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি, এমনি কয়েক ছত্র লেখা পেয়ে, অন্তরে অন্তরে গোপনে কত যে নৈরাশ্যের অশ্রুজল ফেলেছি তার হিসাব আজ এত দিনে সম্যক দিয়েও উঠতে পারবো না আর তা দেবার প্রবৃত্তিও নেই।

যাক্ সে কথা! এমনি এক পৌষের শেষে সেই অশিক্ষিতা বালিকা, যদিও সে আর বালিকা নহে, সে একেবারে অষ্টাদশী, একটি সন্তানের জননী। আমারও তখন ২৪।২৫ বছর বয়স। বিশেষ প্রবাসে প্রেয়সীর পত্র এ সময়ে বড়ই মধুর। যদিও মধুত্বের ভাগ প্রিয়ার লেখাতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল, তথাপি মধু অভাবে গুড়েই সন্তুষ্ট থাকবার চেষ্টা ক'রতুম। এমনি একটা মেসে, কলেজ থেকে এসেই তার চিঠি পেলুম। শিরোনামা নেই সেই চিরপরিচিত অতি যত্নে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বুঝতে বিলম্ব হলনা, এ আমার অন্তরতম দেশের প্রিয়জনের পত্র। খামখানা ছিঁড়তেই তার থেকে যা বের হ'লো তার দিকে আমি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। প্রথমে খামখানা হাতে ক'রে অন্যবার অপেক্ষা তার ওজন একটু বেশী বলেই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলুম এই শীত ঠাণ্ডায় তার বুঝি অসুখ বিসুখ করেছে, তাই এ দীর্ঘ পত্র কিন্তু এ দেখছি যে আমার আন্দাজকে একদম ডিঙিয়ে গেছে। চিঠিখানি আটপৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। তার প্রথম থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতি লাইনে, প্রতি বর্ণে, প্রতি শব্দে ভালবাসার অফুরন্ত ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। সে চিঠি একবার কেন, বার বার পড়লেও মনে তৃপ্তি হয় না, সে তো চিঠি নয়, আমার চোখের সম্মুখে তার অক্ষরগুলি যেন কোন এক অজানা অচেনা সুন্দরীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আমার সঙ্গে কথা কইছে। আমি সে চিঠি থেকে আমার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য সরাতে পারলুম না। এমন কোরে মানুষের মনের ভাব যে কেউ বিশ্লেষণ কোরে লিখতে পারে এ আমার ধারণাই ছিল না। মুক্ত বাতায়ন পথে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলে চিঠিখানি হাতে নিয়ে যেন একটা কি ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে গেলাম।

আমার সুখানুভূতি ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি রমেশের চোখ এড়াতে, চিঠি খানা সার্টের পকেটে ফেলতেই, সে হাতখানা ধোরে ফেল্লে। ওকি ভাই, কার প্রেম পত্র এত কোরে লুকান হচ্ছে? ওতে তো প্রেমের কথার মধ্যে আছে, ছেলেদের অসুখ আর সংসারের কাজের লিষ্ট। কেন জানিনা আমার স্ত্রীর সব চিঠি গুলি বন্ধুমহলে দেখালেও, আজকের এই চিঠিখানি দেখাতে কিছুতেই মন সরলো না। এ চিঠি খানির মধ্যে যে সুধা সঞ্চিত আছে, তার উপভোগের আনন্দের ভাগটা কাউকেই দিতে মন চাইছেনা। তাই তাকে সাতরাজার ধন এক মাণিকের মত বুকপকেটে ফেলে, বোধহয় আমার স্বভাবের বহির্ভূত গম্ভীর স্বরে বল্লাম ও ভাই, তার চিঠি নয়, আমার এক আত্মীয় তাঁর মেয়ের ভাল পাত্রের জন্য লিখেছেন।

রমেশ হেসে বল্লে, যাক আমি কারো ঘরোয়া খবর জানতে চাইনা। আমি যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। গল্পটার প্রথম পরিচ্ছেদে বক্তাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া হরেন বাবু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, দাদা আমাদের এমন কোরে খাবি খাইয়ে মারা কি তোমার উচিত, না তোমার ঠানদির উচিত? এই বলিয়া তিনি একটু হাসলেন।

অমল বাবু বলিলেন, তারপর দু'চার খানা চিঠিতে বেশ বুঝতে পারলুম, আমার স্ত্রীর মুহুরী এ আমার সেই ঠান্‌দি। আমার ঠাকুর্দা ব্যবসা ব্যাপদেশে বিদেশে বাস কোরতেন, বলাবাহুল্য ঠান্‌দি আমার সেই স্থানেই থাকতেন, কেন জানিনা সেবারে দেশে ছিলেন। এমনি কোরে চিঠির ভিতরে তার অন্তরের স্বরূপটি জেনে নিয়ে, বি, এ, পরীক্ষার পড় বাড়ী গিয়ে একদিন নিজেকে সংযত কোরতে না পেরে, তাকে ৩২পৃষ্ঠা এক চিঠি লিখে ফেল্লুম। সে চিঠিতে প্রেম নিবেদন ছিল না, ছিল শুধু দেবীর প্রতি ভক্তের আত্ম নিবেদন। সে আমার সঙ্গে মুখে কোন কথা বোলতনা, তবে চিঠি গুলির মধ্যে, তার নিষ্কলুষ ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই ধরবার উপায় ছিল না। এমনি ভাবে প্রায় দু'তিন বছর কেটে গেল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব থাকলেও

আমি তার দিকে একটু ঝুঁকেছি বুঝতে পেরে আমায় সেই অশিক্ষিতা স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল। যাক এটা স্ত্রী জাতির প্রকৃতিগত স্বভাব। মুখে কিন্তু সে কোন দিন ঠাট্টা বিদ্রূপ ছাড়া, এ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই তুলতো না। তার অবসর পেত না, কারণ, আমি বিদেশে থাকতুম আর সেও বিদেশে থাকতো। যদি কখনো দেখা হ'ত, সে আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে, বৌ সেজে থাকতো। বোধহয় অযথা একটু কাঁপতো, তার প্রমাণও পেলুম একদিন। আমাদের বাড়ীতে তাকে কি একটা কাজে রান্নার জন্য আনা হয়। সে রন্ধনেতে দ্রৌপদী স্বরূপ ছিল। আমি ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করছিলুম, সে আর আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিল। সব জিনিষই সে তার নিপুণ হস্তে সাজিয়ে রাখছিল, আমার স্ত্রী শুধু আমার হাতে তুলে দিচ্ছেলেন। একবার আমার স্ত্রী কি একটা রন্ধনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় আমিও কি একটা তরকারী চাইতে গেছি। তাকে বাধ্য হয়ে আমার হাতে তুলে দিতে হল। উঃ! সে কি ভীষণ হাতের কাঁপুনি, আমি পাত্রটা শক্ত করে না ধরলে, বোধহয় একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেত।

আমি যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কেবল তার বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ ও গুণে তা নয়। তার 'ক্যারেক্টার' সম্বন্ধে আমাদের শতখানি গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই আইডিয়া ভাল ছিলনা। সেই সব কুৎসিত গুঞ্জরণ শুনতে শুনতে আমারও কেমন একটা কৌতূহল হয়েছিল যে ওই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কি এমন রহস্য আছে, যার দ্বার উন্মোচন করতে পারবোনা। তার সম্বন্ধে লোকের এরূপ খারাপ আইডিয়া কেন যে হয়েছিল তার কারণ কোনমতেই সংগ্রহ করতে পারিনি। সে ছিল কলিকাতার শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মেয়ে, বৃদ্ধের স্ত্রী। আরও ছিল, ভগবানের দান তার মাধুর্য্য মণ্ডিত মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য।

কয়েক বছর পরে বৃদ্ধ ঠাকুরদা অজানা দেশের জরুরী তলব পেয়ে সুন্দরী তরুণী ভার্য্যার মমতা ত্যাগ কোরে চলে যাওয়াতে সে অনেকদিন কলিকাতায় তার মামীর কাছে ছিল। কিছুদিন পড়ে, কি একটা মামলা মোকদ্দমার জন্য সে দেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

সেটা ছিল ফাল্গুন মাস, আমার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে, আমিও একমাসের ছুটি নিয়ে দেশে বাস ক'রছিলুম। অনেক দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল। মুখখানির সেই সরল হাসিটুকু তখনও পূর্ব্বের ন্যায় রয়েছে, তবে বিশেষ লক্ষ্য ক'রলে, সেই হাসির অন্তরালে কি একটা গভীর বিষাদ স্থায়ী রূপে বাসা বেঁধেছে, তাও বেশ ধরা যায়। ভাগ্যচক্রের বিড়ম্বনায় তেমন মুষড়িয়া না পড়লেও, তার বেশ একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সেটা আমার কাছে গোপন রহিল না।

তার চরিত্রের একটা দিক তোমাদের বলিনি। গ্রামের লোকে তাকে যেমন আড়ালে নিন্দা করতে ছাড়তোনা, তেমনি বিপদের সময় তার দু'খানি কোমল হস্তের সেবা ব্যতীত বাঁচতো না। আমার একবার ভয়ানক অসুখ হয়। বিয়াল্লিশ দিন একজ্বর হয়েছিলুম। সেই সময় সে আমার সহিত শুশ্রূষার দায়ে কথা বোলেছিল। সে আমার স্ত্রীর সখী ছিল, তাই তার শ্রম লাঘবের জন্যও বটে, কতকটা তার সেবাপ্রবণ চিত্তের প্রেরণায়ও বটে, সে আমার সেবার অনেক ভার নিয়েছিল।

যোগেন বাবু আর তাঁহার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারিলেন না। হাসিয়া বলিলেন—বাঃ, দাদা বেশতো জগৎসিংহ আয়েষার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল। সকলেই শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অমল বাবু বলিতে লাগিলেন,—আমার ভ্রাতার বিবাহ মাঘের শেষে হয়ে গেল। আমার স্ত্রী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে দশদিনের জন্য পিত্রালয় যশোরে চলে গেলেন। তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সখীর এ বাড়ীতে আগমনও পনের আনা কমে গেল। তার দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া বিরল হয়ে উঠল। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা। মনটা ফাগুনের উতল হাওয়ার মত উতলা হয়ে উঠল। তারই প্রেরণায় সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে একটা বালক ভৃত্যের হাতে খানিকটা আবীর একটা খামে পুরে, তার উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাপূত ভালবাসার অভিব্যক্তি কয়েক লাইন লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিলুম।

তার পরের দিন আমিও পাড়ার সব যুবকবৃন্দ মিলে আবীর কুঙ্কুম দ্বারা হোলি খেলে বাড়ী বাড়ী সংকীর্ত্তন

ক'রে ফিরছি, এমন সময় আমাদের দলের অবনী বল্লে, অমলদা তোমরা খেল ভাই, আমাকে এখনই ষ্টীমার ঘাটে ছুটতে হবে। বোল্লুম কেন, আজকে আবার তোকে কোথায় যেতে হবে? সে বল্লে, আমাকে রাঙা ঠানদিকে কলকাতায় পৌছে দিতে হবে, তাঁর মামীর অসুখ, আজ তার পেয়েছেন।

মুহূর্ত্তে হোলি খেলার সমস্ত আমোদ যেন মাটী হয়ে গেল। গ্রামে থাকা সত্ত্বেও দিনান্তে যাকে একবার দেখতে, যার একটা কথা শুনতে পাইনা, তার যাবার সংবাদটা কেন যে অমাকে এরূপ বিষাদে অবসন্ন করে দিল, তার কারণ বুঝতে পারলুম না। আমি ছিলুম দলের পাণ্ডা। সকলকে বলে দিলুম, যে আজ আর খেলা হবে না, সারাদিন তাদের সঙ্গে মহলা দেবার দরুণ আমার অত্যন্ত মাথা ধরেছে। হঠাৎ এরূপ আমোদ ভঙ্গ হওয়ার জন্য সকলে অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল। কিন্তু আমাকে বাদে আমোদ ভাল জমবে না জেনে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

আমি বাড়ী এসে দাঁড়াইতেই ঠাকুরদার ঘরে আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি সেই অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ চোখে চশমা এঁটে, পঞ্জিকা হাতে উপবিষ্ট। আমি যেতেই, আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, অমু, আজই তোকে যশোর রওনা হতে হতে হবে। পরশু বই এমাসে আর ভাল দিন নাই। নাতবৌকে এদিন বেলা তিনটা ছাপান্ন মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডে যাত্রা করিয়ে, রাত্রের ট্রেন ধরতে হবে। তুই আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে নে, নইলে ষ্টীমার ধরতে পারবিনে। আমার বড়ই আনন্দ হলো কারণ এই ষ্টীমারে সেও যাবে। তৎক্ষণাৎ চটপট করে সামান্য দু'খানা কাপড় জামা সুটকেসটায় পুরে মা, মা বলিতে বলিতে খাবার উদ্দেশে মার ঘরে যেতেই দেখি মা আমার আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে বারান্দায় বসে আছেন। বুঝলুম আমি ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই ঠকুরদার হুকুম সারা বাড়ীতে প্রচার হ'য়ে গেছে। বাড়ীতে ঠাকুরদার কথার উপর কথা বলে এমন সাহস কারও ছিল না। আমি যেতেই মা বলিলেন অমু তাড়াতাড়ি খেয়ে নে বাবা, তোকে এখনই বৌমাকে আনতে যশোর যেতে হবে, তোর ঠাকুরদা বল্লেন। বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন আনমনে বিষাদ ও বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন সবই বাপু বাড়াবাড়ি। বছরকার দিনে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে, এমনিতে তো এসময় বাড়ীতে থাকতেই পায় না। এবারে বিমুর যে উপলক্ষে যদি বা ছুটী নিয়ে এল, তাও আমোদ আহ্লাদ করতে পেল না, বউ কি দু'দিন পরে আনলে চলতো না?"

আক্ষেপোক্তিতে মনের হাসি চেপে বল্লম, তাতে' আর কি হয়েছে, দুদিন বাদেই আসছি। আমার কথা শুনে মা হয়ত আমার মনের ভাব অন্যরূপ বুঝে নিলেন। কষ্টে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস চেপে বল্লেন, বৌমাকে কি আর আমি আনতে বারণ করছি? দু'দিন বাদে দোল শেষ ক'রে গেলেও ক্ষতি ছিল না, তাই বলছিলুম। হায় তখন কেমন করে বোঝাব যে তোমার বৌমাকে এত তাড়াতাড়ি আনবার জন্য তোমার অমুর বিন্দুমাত্র তাড়া নেই। অপ্রতিবাদে ঠাকুরদার হুকুম মেনে, অপার্থিব মাতৃস্নেহ ফেলে কিসের একটা অজ্ঞাত প্রেরণায় যে তোমার অমু এখন তাড়াতাড়ি ক'রে এখনই যেতে রাজি হয়েছে সে কথা প্রকাশ্যে বলবার তার সাধ্য নেই। বোধহয় থাকলেও সে তার যথার্থতা তোমাকে বোঝাতে পারতো না। যার মানে সে নিজেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। সুটকেসটী ভৃত্যের মাথায় দিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হতেই দেখলুম যে ষ্টীমার ভো ক'রে বাঁশী ফুঁকে ভোস ভোস শব্দে ঘাট ছেড়ে চলে গেল। ভাবলুম, হায়! অদৃষ্টের একি পরিহাস! মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে আমার মগজে একটা বুদ্ধি এল, এই ষ্টেসনের পরের ষ্টেসনে প্রায় দু'ক্রোশ হবে, সেখানে প্রায় আধঘণ্টা ষ্টীমারটা দাঁড়ায়। চাকরটাকে বল্লুম তুই সুটকেসটা নিয়ে বাড়ী চলে যা, সেখানে গিয়ে দু'এক দিনের জন্য কাপড় জামার কোন কষ্ট হবেনা। আমি দেখি দৌড়ে গিয়ে পরের ষ্টেশনে ষ্টীমার ধরতে পারি কিনা। চাকরটা অনেক দিনের পুরান, আমার কষ্ট হবে জেনে সে বারণ করলে। আমি তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লাম, একি আর তোদের মত সৌখিন নরম পা। এহচ্ছে রীতি মত ফুটবল প্লেয়ারের পা, তুই এসব বুঝবিনা, আমি চল্লুম। বলিয়া গন্তব্য পথে

জোরে জোরে পা ফেলে যাত্রা সুরু করলুম্। তারপর দেখলুম শুধু হাঁটার কর্ম্ম নয়। তখন সেই জন শূণ্য মাঠের ধার দিয়া অক্লান্ত ভাবে ছুটতে লাগলুম। সেই শুষ্ক ঢেলা সমন্বিত মাঠের ভীম মাধুর্য্য আমার সঙ্গে এক হৃদয়ের প্রভাব বিস্তার ক'রে, আমাকে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করতে লাগলো। আমাকে যেতেই হবে। কোনরূপ বাধা আমাকে সে সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। হৃদয়ের প্রত্যেক রক্ত বিন্দু তারস্বরে বলছিল, দ্রুত এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। দেহমনে সে কি অজেয় বল সঞ্চয় হল। যার অস্তিত্ব আমার আটাশ বছর জীবনেও কোনদিন অনুভব করিনি। অনেক পরিশ্রমে শ্রান্ত সিক্ত কলেবরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছেই তাড়াতাড়ি সিঁড়িবেয়ে উপরে গিয়ে উঠলুম। সামনেই অবনীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে ইতিমধ্যে তাসের আড্ডা জমিয়ে তুলেছে। আমাকে দেখেই বিস্ময়ে বল্লে একি, অমুদা তুমি কখন এলে? ষ্টেসনে তো তোমায় দেখতে পাইনি। দু'এক কথায় তার কৌতূহল নিবারণ করে, একটা নিরিবিলি স্থানে এসে রেলিংটার ধারে দাঁড়ালুম। অল্পক্ষণ মধ্যে নদীর মুক্ত হাওয়ায় আমার শ্রমক্লান্ত দেহ সুস্থ সবল হয়ে উঠতেই, অদূরবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে রেলিং ধরে কে একটি রমণী দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেলুম। তার দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে' তাকে চিনতে দেরী হলনা। এ আমারই শ্রম লব্ধ রত্ন।

আস্তে আস্তে তার নিকটবর্ত্তী হয়ে দেখলুম সে যেন কিসের ধ্যানে আচ্ছন্ন হয়ে নদী বক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাঁহাতের কনুই রেলিং এ ঠেস দিয়ে হস্তোপরি মস্তক ঈষৎ বক্রভাবে ন্যস্ত করে দক্ষিণ হস্তে রেলিংটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বসন্তের নির্ম্মল নীলাকাশে প্রতিপদের জ্যোৎস্নায় আকাশ, ভুবন, নদ নদী প্লাবিত। যাহার সঙ্গ লাভেচ্ছায় দুঃসাধ্য কষ্ট করে এলুম, তার পাশে দাঁড়াতে পেয়ে, তখন আমার মনে কি যে অনির্ব্বচনীয় অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ, এ চলন্ত ষ্টীমারটার গা ঘেঁসে নদীর প্রবল ঢেউগুলির কত উত্তাল হয়ে উঠেছিল তা তোমরা বুঝবে না।

আমি অধিকক্ষণ নীরব থাকতে অসমর্থ হওয়ায় আগমন সূচক একটা শব্দ করতেই দেবীর ধ্যান ভঙ্গ হল। ফিরে চেয়ে আমাকে সম্মুখে দেখেই, সে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। তার সুন্দর চোখ দুটীর নীরব দৃষ্টি যেন বলছিল, তুমি এসেছ? কিছুক্ষণ উভয়েই বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলে নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমি বল্লুম সু, তুমি আজ চলে আসবে এ খবরটাও কি আমায় দিয়ে আসতে নেই।

হাঁ, এখানে তোমাদের কৌতূহল দমনের জন্য একটা কথা বলতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে মুখে তেমন আলাপের সুবিধা না হলেও চিঠি পত্রে মন্দ হয় নি। আমি বাহিরে এমনকি আমার স্ত্রীর সম্মুখেও সম্বন্ধের মর্য্যাদা দিয়ে কথা বলতুম। কিন্তু চিঠিপত্রে বা একান্তে আমার প্রাণ তাকে যে ভাবে সম্বোধন ক'রে তৃপ্তি লাভ করতো, তাই করতুম। আপনি বলতে তো পারতুমই না, ঠানদিও বলার প্রবৃত্তি হত না। তাই তার নামের প্রথম অক্ষর ধরে ডাকতুম। সুজাতা ও আমার একটা নাম রেখেছিল মণি। আমার কথার মধ্যে একটু অনিচ্ছাকৃত অভিমানের সুরই বোধ হয় সে অনুভব করলে। তার স্বভাব সিদ্ধ সরল হাসি হেসে বল্লে, তুমি তারই প্রতিশোধ নিয়ে নদীর তীরভূমি ধরে ঘোড়-দৌড়ের মহড়া দিতে দিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে পড়েছ।

বুঝলুম, দিনের মত জ্যোৎস্না রাতে নদীর ধার দিয়ে দৌড়ান ষ্টীমার থেকে দেখাটা অসম্ভব নয়। নিজের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ায় বেশ একটু আনন্দ মিশ্রিত লজ্জা অনুভব কোরলুম। যার জন্য এত শ্রম সে সেটা দেখেছে মনে কোরে আনন্দও হল। লজ্জা ঢাকতে বোললুম, হোলী খেলে বাড়ী ফিরতেই ঠাকুরদা বোললেন তোমার সখীকে আনতে নাকি এ গোলামকে এখনি ছুটতে হবে। কারণ মহারাণীর যাত্রার দিন নাকি পরশু বেলা তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট পয়ত্রিশ সেকেণ্ড বই এমাস আর নাই।

সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বোললে অত কৈফিয়ৎ কে চাইছে তোমার কাছে! সখীকে আনবার জন্য না এলে, যদি তার সখীর সঙ্গে দেখা কোরবার

উদ্দেশ্যই এসে থাক তাইলেই বা এমন কি কুণ্ঠার বিষয় আছে। বোলে একটু মুচকিয়া হাসিল।

আমি যে তাকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করিনা ভালবাসি না, এটা সে মুখে, চিঠি পত্রেও যেমন জানাতো মনে মনেও এ ভাবটা সে পোষণ কোরতো আজ তারই অভিব্যক্তি বুঝতে পেরে মনটা যেন রাস ছাড়া ঘোড়ার মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অদ্ভুত বিচিত্রের রহস্য জালে সমাচ্ছন্ন এই রমণীর অন্তর প্রদেশ। কোনদিন কি আমি এ রহস্য জাল ভেদ করে আমার কামনার কনক মন্দিরে উপনীত হতে পারবো না। মুক্ত সমীরণ হিল্লোলে আমার দেহের শিরায় শিরায় উন্মাদনা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, আমার চিত্ত ওই রমণীর দুর্ভেদ্য অন্তরের সন্ধানে উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হলো। সকল ভয় সকল সংশয় সকল সঙ্কোচ আমার পশ্চাতে পড়ে রইল। আমার স্বভাবের বিপরীত সাহসের বিপরীত কাজই কোরে বললুম। কোনদিন মুখে কিম্বা চিঠিপত্রেও যে কথা বোলতে নিজের বিবেক বুদ্ধিই নিজেকে শত ধিক্কার দিত শুধু দশজনের কথায় বিশ্বাস কোরে যাকে একদিনও এসব কথা বোলে তার নারীত্বের অসম্মান কোরতে সাহসী হইনি সেই কথাটাই এতদিন পরে আমার মুখ থেকে বাহির হল। বললুম স্থ, চিরদিন কি তুমি আমার কাছে রহস্যময়ী হয়ে থাকবে? তা হবে না, আমি তোমার অন্তরের স্বরূপটা দেখবই। তোমার ভিতরের রহস্য আমাকে জানতেই হবে। উৎসাহে ও উদ্দীপনায় আমার কণ্ঠস্বর বোধ হয় একটু কম্পিত হয়েছিল। আমার হৃদয় নিহিত উন্মাদনার বহ্নিশিখা ও বোধ হয় সে আমার নেত্র পথে দেখেছিল। সে তার সেই চিরাভ্যস্ত সরল হাসি হেসে, নির্ভয়, নির্বিকার চিত্তে আমার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অকম্পিত কণ্ঠে বল্লে—মণি, তুমি কখনও সমুদ্র দেখেছ?

আমি তার এই বেখাপ্পা প্রশ্নে, একটু থতমত খেয়ে বললুম—না!

সে বল্লে, আমি কিন্তু দেখেছি। দূর থেকে তার গভীর জলরাশি দেখলে মনে হয়, এমন সুশীতল পানীয় বুঝি আর নাই। কিন্তু হাজার তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে, ছুটে গিয়ে তুমি যদি তার একবিন্দু পান করতে পার তো আমি তোমার সঙ্গে বাজী রাখতে পারি। সে অসম্ভব লবণাক্ত জল একবিন্দুও মানুষে সহ্য করতে পারে না। বলিয়া যেমন মুখের পানে চেয়েছিল তেমনই চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে একটুও ভাবান্তর লক্ষ্য হল না।

আমি সেদিন মরিয়া হয়েই বুঝি উঠেছিলুম। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের উল্লেখটা সে আমার কোন সমস্যার সমাধানের জন্য করলে, তা বুঝে ও বললুম তীরে বসে ঢেউ গোণার চেয়ে একবার সে জল মুখে দিয়ে দেখতেই তো চাই সে সহ্য হয় কিনা?

সে স্থির কণ্ঠে বল্লে, মণি, তোমার মধ্যে হঠাৎ এ ভাবান্তর কেন? একি আমাকে পরীক্ষা?

বোললুম, পরীক্ষা মনে না করে আর কিছু মনে করাটা কি এতই অসম্ভব স্থ?

সে মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠে, উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, না, অন্য কিছু আমি তোমার সম্বন্ধে মনে করতে পারি না। সামান্য শেয়াল কুকুরের দলভুক্ত করে তোমাকে দেখবার ক্ষমতা আর যারই থাকে, আমার নেই—বোলে নদীর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ রইলুম, কি যে বোলবো খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বুকের ভিতরটায় যে কি রকম কোরতে লাগলো তা অস্পষ্টভাবে অনুভব করা ভিন্ন বুদ্ধি পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। ষ্টীমারের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ শুভ্রফেণের কিরীট পরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে কোথায় মিশিয়ে যাচ্ছে. আবার ছুটে এসে আঘাত প্রতিঘাতের আশ্চর্য্য খেলা খেলছে। আমি মুগ্ধ নয়নে সেই দিকে চেয়ে নিজ বক্ষের অকস্মাৎ এই দুর্দ্দান্ত তরঙ্গের সৃষ্টির কারণ ভেবে না পেয়ে আত্মবিস্মৃতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, দেখ, তোমরা আমাকে কি ভাব? আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমাদের গ্রামের আর আর দশ জনের আমার প্রতি যেমন ধারণা, তুমিও তার থেকে বাদ যাওনা। কিন্তু সে জন্য তোমার কাছে

অভিযোগ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আর দশজন যা মনে করে, তুমি বা তা মনে করবেনা কেন? তবে এটা জেনে রেখো আমি অন্যের বিবাহিতা পত্নী, যার হাতে আমার অভিভাবকগণ অগ্নি ব্রাহ্মণ ও নারায়ণ সাক্ষী করে আমাকে সমর্পণ করেছিলেন, তিনিই একমাত্র আমার দেহের অধিকারী। সংসারের কোন প্রলোভনেই যেন আমি তার অবিশ্বাসিনী পত্নী না হই এই সঙ্কল্পই আমার ছিল। ভগবান করুন, আমি যেন তাঁর বর্ত্তমানে তাঁর আত্মার প্রতি অপমান বা অশ্রদ্ধা না দেখাই। কিন্তু তুমিও যে সেই সব গ্রাম্যদের মত খারাপ ধারণা করতে পার এ আমার ধারণা ছিলনা। তোমাকে খুব উঁচু করেই দেখেছিলাম, তাই তোমাকে তেমন ভাবতে আমার বন্ধুত্বের গর্ব্বে আঘাত লাগতো।

আমি আর স্থির থাকতে পারলুমনা। নির্ব্বোধের মত আবার বললুম সু, আমাকে চিরদিন কি ঐ ক্ষুদ্র বন্ধুত্বের গণ্ডী দিয়েই আটকে রাখতে চাও?

সে বল্লে তার বেশী আর কি পেতে পার আমার কাছে? আর যদি তেমন কোন আশা করেও থাক যেন সে ভুল। বলে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

• আমার যেন সে দিন মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি চেপেছিল তারই প্রেরণায় বার বার প্রতিহত হয়েও তাকে আঘাত করতে একটুও দ্বিধা বোধ করছিলুম না বললুম, আর দশজনের কথা আমি তেমন বিশ্বাস না করলেও আমার সখীর কথা বিশ্বাস করছি। সে ঠিক বলেছিল, তুমি যতই ভাব সখী কিন্তু তোমাকে তেমন ভাল বাসেনা তার হৃদয় জুড়ে আছে আর একজনের ভালবাসায়। তখন সেটা তেমন বিশ্বাস করতে পারিনি কিন্তু আজ বেশ বুঝতে পারছি এইজন্যই ও হৃদয়ে আমার জন্য একটুও স্থান নেই। সে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ করে তার কষ্ট কর ধৈর্য্য বজায় রেখে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল, উপলব্ধি ব্যতীত যার বর্ণনা করা যায় না।

তারপর দৃষ্টি নত করে বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে বল্লে, তা শুনেও তুমি আমার সঙ্গে এই ভালবাসার অভিনয় করতে এসেছ? যাও, তোমার এই বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে থাক। তোমাদের মত খেয়ালী যুবকদের কুৎসিত খেয়ালের রসদ যোগাবার মত শিক্ষা ও প্রবৃত্তি আমার নেই—বলে আবার নিস্তেজভাবে নদী-তরঙ্গ পানে চেয়ে রইল। নির্ম্মল বিচ্ছুরিত চন্দ্র কিরণ তার সুন্দর বদনোপরি নিপতিত হয়ে আরও সুন্দর ও মনোমুগ্ধ করে তুলেছিল, তার অবিন্যস্ত নিবিড় কুন্তলদাম সমীরণ স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে সেই গোলাপীগণ্ড মাঝে মাঝে স্পর্শ করছিল। একটি শুভ্র সেমিজে তাহার সুকুমার, সুগঠিত তনু আচ্ছাদিত থাকায়, তার দেহের শোভা আরও বর্দ্ধিত ও বিকশিত করেছিল। তাকে দেখে মনে হল যেন শ্বেত প্রস্তরে খোদিত একখানি অপূর্ব্ব মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি। সংসারের কোন কলুষতা যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না তার কথা বলার বিচিত্র ভঙ্গীতে আমার ক্ষণেকের মোহ কেটে-গিয়ে আত্মগ্লানির অনুশোচনায় চিত্ত ছেয়ে ফেললো। আমি অধীর, আকুল কণ্ঠে তার সুকোমল চরণ স্পর্শ করে বল্লুম, সু, তুমি এই অধমকে আজ এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা কর। আমি বুঝতে না পেরে তোমার প্রাণে আঘাত দিয়েছি।

মুহূর্ত্তে তাহার মুখের বিষণ্ণতা অপসারিত হয়ে আবার পূর্ব্বের মত সেই সরল হাসি হেসে বল্লে, এজন্য তোমার ক্ষমা চাওয়ার কোন দরকার দেখিনা। সংসারে অপমানিত হবার জন্যই বিধবার সৃষ্টি।

ব্যথিত হয়ে বল্লাম, সু আমাকে আর যাই কেন ভাবনা, আমি তোমাকে অপমান করতে পারি এটা ভাবলে আমার প্রতি অন্যায় করা হয় যে এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

সে বল্লে, এমন অন্যায় ইতিপূর্ব্বে তোমার সম্বন্ধে করিনি। আর তা করিনি বলেই তোমার কাছে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলুম। তোমার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমি তোমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম। আজকের এই ভাবান্তর যে তোমার হতে পারে সে ধারনা ভুলেও কোনদিন আমার মনে স্থান পায়নি। কিন্তু এটা যে তোমার প্রাণের জিনিষ নয় আজ বুঝতে আমার বাকী নেই। এ শুধু নিছক আমাকে পরীক্ষা। কিন্তু, এর কি দরকার ছিল?

বাধা দিয়ে বল্লাম, দোহাই সু এসব কথা আর নয়। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না বল ?

সে বল্লে, দেখ মণি, এ সমুদ্রের জল, এতে একঘড়া ঢেলে দিলে বাড়বেনা বা তুলে নিলে কমবেনা। তোমরা আমাকে ভক্তি কর বা অশ্রদ্ধা কর ভালবাসই বা ঘৃণা কর, যখন একবার তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি তখন তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ অটুটই থাকবে। অতএব এখানে বারবার ক্ষমা চেয়ে ক্ষমার অপব্যবহার কোরনা।

তারপর তেমন করে কথা না জমলেও অনেক সুখ দুঃখের কথা তার কাছে বললুম। একটা কথার জবাবে সে বল্লে, মণি ভগবান যাকে যা দিয়েছেন তাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তার বেশী খুঁজতে গিয়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখটাকেই ডেকে আনা হয়।

বল্লাম, কাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বল ? যে তোমার মত গুছিয়ে একটা কথা বলতে পারে না।

সে একটু হেসে বল্লে, সেকি ছাই আমার মত এত উপন্যাস পড়েছে ? দেখ, তোমরা ঝুটো মণি মুক্তোর জৌলস দেখে মুগ্ধ না হয়ে আসল মাণিকের স্নিগ্ধ আলোক সাহায্যে যদি পথ চলতে শেখ তবে তোমরাও সুখে শান্তিতে থাকতে পার। সংসারে অনেক ব্যভিচারও তাহলে কমে যায়। তাছাড়া তুমি আমার চাইতে আমার সখীকে ঢের বেশী ভালবাস বলেই না তোমার বন্ধুত্ব করতে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান করুন তোমাদের উভয়েরই জীবন সুখে থাকুক।

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল ষ্টীমার থেকে নেমে গাড়ীতে চড়ে কয়েকটা ষ্টেশন বাদে আমি যশোরে নেমে পড়লুম। দেখতে দেখতে ষ্টীমার তাকে নিয়ে আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্ধ্যান হল।

এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া অমলবাবু একটু অবসাদ গ্রস্তের মত যেন চুপ করে রইলেন। মিনিট পাঁচেক নীরব থাকিয়া সকলের উৎফুল্ল দৃষ্টির দিকে চাহিয়া বলিলেন— এ কাহিনী এখানেই শেষ হলে ভাল হত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। প্রায় ৮।১০ বছর হয়ে গেল এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একখানি পত্র ব্যবহারও তার সঙ্গে হয়নি। এবারে পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে শুনলুম সে কি কাজে দেশে এসেছে। অনেকদিন পর হঠাৎ গিয়ে দেখা করতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় তিনি চারদিনের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হলনা।

একদিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী এসে বল্লে, আজ রাত্রে সখী তার ওখানে তোমায় খেতে বলে গেছে। বহু পূর্ব্বে এমন স্নেহের আহ্বান তার নিকট হতে অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু অনেক দিন পরে বলিয়াই না কি বুঝতে পারলাম না খাওয়ার চাইতে যে খাওয়াবে তাহার সান্নিধ্যের আশায় আমার চিত্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যদিও বাহিরে তা প্রকাশ করতে পারিনি। যথাসময়ে তার ওখানে গিয়ে অনেক গল্পগুজব হল। তারপর আহারান্তে বাড়ী ফেরবার সময় হেসে বল্লে "বামুন খাওয়ালে তার দক্ষিণা দিতে হয়। তা না নিয়ে যেওনা"—বলে বাক্স খুলে একটা ছোট কৌটা খুলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেই কৌটা থেকে কয়েকখানি পুরাতন চিঠি ও একখানি খালি খাম বার করে আমার সম্মুখে রেখে বল্লে, মণি, এতদিন যা অমূল্য রত্নজ্ঞানে বুকে করে রেখেছিলুম, আর তার উপায় নাই। আমি এবার কেদার বদরী যেতে ইচ্ছা করেছি, সেই দুর্গম বিপদসঙ্কুল, পার্ব্বত্য স্থান থেকে যদি না ফিরে আসতে পারি এই যত্নে রক্ষিত রত্ন তোমার কাছেই ফেরৎ দিয়ে গেলুম। এদের নিজ হাতে নষ্ট করার মত বল আজও আমার হয় নাই।" বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন অতিকষ্টে একটা রুদ্ধ বেদনা চাপবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার দেহ ঈষৎ কম্পিত হ'তে লাগলো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বল্লেম, সু, তুমি ঐ চেয়ারটায় বস। সে মুহূর্ত্তে নিজেকে সংবরণ করে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লে, তুমি কিছু মনে ক'রনা, অনেক রাত হয়ে গেল, তায় আমার সংসারে আমি একা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল দেখাবে না।

আমি যেন অতীত স্মৃতির স্তূপে ডুবে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। সেই দশ বার বৎসরের সামান্য উপহার আবীরটুকু সে এতদিন এত যত্ন করে রক্ষা করেছে। তার উপদেশে আত্মস্থ হয়ে তার প্রদত্ত জিনিষ হাতে নিয়ে

বল্লেম, সু, সামান্য আবীর তাকে তুমি এত দীর্ঘ দিন এত যত্নে রক্ষা করে আসছো? ভাগ্যিস আমি তোমার বন্ধু। তাইতো ভাবি, তুমি যদি আমার বিবাহিত স্ত্রী হতে—কথাটা শেষ না হতেই হঠাৎ দেখলুম কিশোরীর ন্যায় মুখখানি তার লজ্জায় আমার হস্তস্থিত আবীরের ন্যায় রাঙিয়ে উঠেছে। তাকে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বল্লাম—তা, এখনই তীর্থে যাবার কি এত তাড়া পড়েছে?

সে বল্লে, তীর্থে যাবার কি আবার সময় অসময় আছে। তাছাড়া বয়স তো নেহাৎ কম হ'লনা।

বল্লেম, তবু যদি না আমার ৫।৬ বছরের ছোট হতে।

সে বল্লে, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের ৩৭।৩৮ বছর কিছু না। এবয়সে অনেকে প্রথম বিয়ে করে।

একটু হেসে বল্লুম, যদি তোমার মত কনে পাওয়া যায়।

সেও একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,বালাই আমি কোন দুঃখে তোমাদের মত কাঁচাচুলের পায়ে বিকুতে যাব।

সে আমার মুখের পানে চাইতেই আমি তার অন্তরের কথা পড়ে ফেলে প্রসঙ্গান্তর আনতে বল্লেম, আমারও কিন্তু চুল পেকেছে।

সে বল্লে, ও, কিছু নয়, পুরুষ মানুষ নাকি আবার এ বয়সে বুড়ো হয়।

বল্লেম, সত্যই তুমি তীর্থে যাবে?

সে বল্লে, তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমার মত পাপী মেয়ে মানুষের জন্য তীর্থে আবার স্থান আছে?

বল্লেম, তোমায় পাপ স্পর্শ কর্‌তে পারে না।

বল্লে, এমন স্পর্দ্ধা করে বলবার মত আমার মধ্যে কি পেলে?

বল্লেম, অমন তেজদীপ্ত আলোর কাছে অন্ধকার ঘেসতেই পারে না।

বল্লে, তেজদীপ্ত আলোর কাছে অন্ধকার যেমন আসতে পারে না, তেমনই আলোর পশ্চাতেই যে অন্ধকার আসে তা ভুলে গেলে চলবেনা।

বললুম, না, না, ঐ নির্ম্মল চিত্তাকাশে কোন অন্ধকারই স্থান পাবে না।

সে একটু হেসে বল্লে, যে বসুন্ধরাকে পূর্ণিমা নির্ম্মল জ্যোৎস্নাস্নাত করায় সেই বসুন্ধরার বুকেই কি অমাবস্যা স্থান পায় না? বল্লাম সেই অন্ধকার দূর করতেই বুঝি এ তীর্থ পর্য্যটনের ইচ্ছা?

বল্লে, হাঁ তীর্থ ভ্রমণে শুনেছি সাধু সঙ্গে মনের ময়লা কেটে অনেক জ্ঞানার্জ্জন করা যায়।

বল্লাম, বেশ তীর্থরূপ চশমা চোখে দিয়ে সাধুসঙ্গরূপ আলোকে গিয়ে তোমার যত ইচ্ছে জ্ঞানার্জ্জন কর, তাতে আমার মত পাপীর বাধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি যে এ কৃচ্ছসাধনের কি দরকার ছিল? যে জ্ঞান তোমার স্বভাবজাত তার চাইতে বেশী জ্ঞান বোধহয় কোন সাধু সঙ্গেই দিতে পারবে না। কেন মিছে অকালে এমন প্রাণটা হারাতে যাবে? তাতে যে কেবল আমাকে শুধু দুঃখ দেওয়া হবে তা নয়, বিপন্ন রোগীরাও যে তাদের সেবাপরায়ণা মা হারাবে। তাদের করুণ ক্রন্দন কি তোমার স্নেহসিক্ত অন্তস্থলে পৌঁছে, তোমার তীর্থের মাধুর্য্য তিক্ত করে দেব না?

সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, ওগো অমন করে আর বলো না তাহলে যে আমার যাওয়া হবেনা। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। বলিয়া সেই অটল ধৈর্য্যের পাহাড় যেন প্রখর উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া বরফের ন্যায় গলিতে আরম্ভ করিল। তার সুন্দর দুটী নয়ন প্রান্তে মুহূর্ত্তে জোয়ার এসে মনটাকে কর্দ্দমাক্ত করে দিলে।

সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, মণি আমি যে রক্তমাংসেগড়া আর দশজনের মত একটা মানুষ তা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না?

বাধা দিয়ে বল্লাম, যে আর পাঁচ জনের ন্যায় পূতিগন্ধ বিশিষ্ট নয় তা নিঃসন্দেহ বল্‌তে পারি।

বল্লে, এত বড় কথাটা যে তুমি আমার সম্বন্ধে ভাবতে পার তা আমি ধারণাই করতে পারি না। তবু যদি করে থাক ভাল, আজ আর এ নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছা আমার নাই। আমাকে যদি একটু ভালবেসে থাক তবে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এ বিশ্বাসের অমর্য্যাদা না করি।

বাড়ী এসে নিদ্রিতা পত্নীকে না জাগিয়ে, অবসন্ন দেহ শয্যায় এলিয়ে দিয়ে চিন্তাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলুম। সে এতদিন আমার কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য জালে আবদ্ধ ছিল, যাকে চোদ্দবছরের চেষ্টাতেও চিনতে পারি নি, তাকে মুহূর্ত্তে চিনিয়ে দিল একবিন্দু আবীর। সুজাতার নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, পবিত্র ভালবাসা আমাকেও যে সফল্যের দিকে টেনে নেবে ইহা নিঃসন্দেহেই এখন বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় পূর্ব্বে তাকে যথার্থ রূপে বুঝে এমন করে ভাল বাসি নাই, যেমন এখন বাসছি তাকে আজ হারিয়ে।

এই কথা বলিতে বলিতে অমলবাবুর মুখমণ্ডল প্রেম গর্ব্বে ও আনন্দোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার গর্ব্বোন্নত মুখের মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রোতাগণ মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

(রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' লইয়া সাময়িক পত্র বহু আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গ্রন্থ 'চার অধ্যায়' পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে বর্ত্তমান অলোচনাটি উপভোগ্য হইবে।)

রবীন্দ্রনাথে চার অধ্যায় উপন্যাস জগতে এক সুন্দর অপূর্ব্ব নব সৃষ্টি। উপন্যাসের মধ্যে তাহার গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিল্পী যে ভাবে তর্ক বিতর্কের মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আজ বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে বা রাশিয়ার চিঠি বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে কবি শুধু ঔপন্যাসিক নহেন, শুধু কবি নহেন, তিনি মহা দার্শনিক। তাঁহার সৃজিত ঘটনাগুলির মধ্যে অনেক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি মনস্তত্ত্ববিদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সমস্যার সমাধান করিতে পাঠককে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে একটা Pragmatically efficient psychologyর প্রকাণ্ড স্থান বর্ত্তমান যাহা Romain Rolland বা Tolstoyএর লেখার মধ্যে লক্ষিত হয়।

কবির প্রতিভার এর ছাপ প্রত্যেক লেখার মধ্যে ঝলমল করিতেছে।

তরুণ অতীন ও তরুণী এলা তাহাদের উৎসাহ লইয়া দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কবির প্রতিভার যাদু-দণ্ডে তাহাদের জীবনের ব্যর্থতা মূর্ত্ত জাগ্রত হইয়া অনেক সমস্যা স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। এই ব্যর্থতার মূল কারণ যে কি তাহা কবি স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু কবির ক্যান্ভাস্ এতোই বড়ো যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে নারীর দেশের কার্য্যে স্থান, Co-education, মেয়েদের জীবিকা অর্জ্জন করা ভালো কি সেবিকা হওয়া ভালো, বিবিয়ানা, নারী ও পুরুষের কি সম্বন্ধ, বিবাহ ও মৃত্যু, অভয় চরণ রক্ষিতের কথা, কানা-কানি বিভাগের কথা এই সব বিভিন্ন বিষয় অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

চার অধ্যায় যেন এক করুণ রাগিণী। এর বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও তৎসম্বন্ধে যে সব আলোচনা উপন্যাসে আসিয়াছে যেন এক করুণ রাগিণীর এক একটী বিভিন্ন স্বর—এই সব বিভিন্ন স্বর আসিয়া এক সুন্দর করুণ মর্ম্মস্পর্শী রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে যাহার Improvisation রাগিণীর মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া মূল রাগিণীর ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়াছে। আমাদের হৃদয় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের "ঘরওয়ানাকে" অতি উচ্চে স্থান দিয়াছে। বঙ্গদেশের একাধারে কবি ও শ্রেষ্ঠ "সুরকার" (Composer) দুইজন। প্রথম রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল—উভয়ের লেখাতেই শ্রেষ্ঠ সুরকারের পরিচয় আমরা পাই। তাঁহাদের লেখাতে ইংরাজীতে যাহাকে বলে Musicalisation of fiction or drama তাহাই লক্ষ্য করি। উভয়ের লেখাতেই অনেকগুলি Parallel character দৃষ্ট হয় যাহাদের লইয়া অনেক সুরের মালা সৃষ্ট হয়, যাহা ভাবকে, চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে অথচ মূল ঘটনা বিকৃত হয় না, বা মূল রাগিণীর রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না—Counterpoint লইয়া ইহাদের কারবার—এই স্থলেই রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য লেখকের সহিত প্রভেদ বর্ত্তমান।

যে করুণ রাগিণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া এই উপন্যাসকে এতো প্রিয় করিয়াছে সেই আখ্যায়িকার প্রধান চরিত্র অতীন ও এলা।

এলা—এলার চরিত্রকে সম্যক ভাবে পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এলার পিতা মাতা কাকা কাকীমার ইতিহাস কবি অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন। এলার পিতা বিলাত প্রত্যাগত অধ্যাপক—অধ্যাপনায় তিনি বিশেষ

যশস্বী। এলার মাতার ছিল বাতিকের রোগ শুচিবায়ু-গ্রস্ত। এলার পিতাকে অকারণ স্ত্রীর অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। এলা পিতার এই সহ্য করিবার ক্ষমতাকে কোন দিন সহ্য করিতে পারে নাই—তাহার পিতার প্রতি ছিল "সদা ব্যথিত স্নেহ"। মার অবিচার অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার এলাকে মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। পিতা শান্তির আশায় কন্যাকে পড়াইতে সহরে পাঠাইলেন।

এলার মাতা মায়াময়ী কন্যাকে এই মেম সাহেব তৈরী করার ভাবী আশঙ্কায় যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। এলার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে মেয়েদের ন্যায় অন্যায় বোধকে অসাড় করিয়া আত্মসম্মানকে পঙ্গু করিয়া বিবাহের মঙ্গল বাদ্য ধ্বনিত হয়। এলার ম্যাট্রিক পাশ করার পর তাহার মাতার মৃত্যু হয়। এলার পিতা অধ্যাপক নরেশ দাস গুপ্ত কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিয়া তাহার সংস্কার গত বিমুখতায় বিবাহ দিতে সক্ষম হ'ন নাই। এলার সব পরীক্ষা পাশের পর অবিবাহিতা অবস্থায়ই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এলা তাহার কাকা সুরেশ ও তাহার স্ত্রী মাধবীর নিকটে সাদরে আশ্রয় পাইল। কিন্তু কাকার বাড়ীতে এলার বিবাহে বিমুখতা তাহাকে কাকীমার অপ্রিয় করে। সেই সময়ে আসিলেন ইন্দ্রনাথ সুরেশের বাড়ীতে। ইন্দ্রনাথ এলাকে দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইন্দ্রনাথ বলিলেন এলাকে "নব-যুগের আহ্বান তোমার মধ্যে—তুমি নবযুগের দূতী"। ইন্দ্রনাথকে ছেলেরা মানিত রাজচক্রবর্ত্তীর মত। ইন্দ্র নাথের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। কাকার স্নেহের সহিত কাকার সংসারে তাহাকে লইয়া দ্বন্দ্ব না ঘটে এই কারণে এলা দূরে যাইতে চাহে। সে ইন্দ্রনাথের নিকটে একটা কোন কাজের প্রার্থী হইল। এলাকে কাজ ইন্দ্রনাথ দিলেন। মেয়েদের জন্য কলিকাতায় নারায়ণী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার কর্ত্রীপদ তিনি এলাকে দিতে পারেন কিন্তু কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এলাকে এক প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সংসারের বন্ধনে এলা কোন দিন বদ্ধ হইবে না—এলা 'সমাজের নহে দেশের—এলা সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিয়া নব যুগের আহ্বানে যোগ দিল—ইহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ—ইহার পর আমরা ইন্দ্রনাথ ও এলার দেখা পাই, কলিকাতায় এক চায়ের দোকানে কবি যে ভাবে একটি সামান্য চায়ের দোকানের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এতোই জলন্ত ভাবে বাস্তব যে কবির অভিজ্ঞতার বিরাটত্ব সম্বন্ধে বিস্মিত হইতে হয়। এই দোকানটী কানাই গুপ্তের, এক পুলিশের পেনসন ভোগী সাবেক সব ইন্‌সপেকটরের। ইন্দ্রনাথের পরিচয়ে জ্ঞাত হই যে তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক অথচ তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ অবরুদ্ধ; ইউরোপে থাকা কালীন কোন পলিটিকাল বদনামীর সহিত কখন কখন দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কারণে অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হইয়া আসে, শেষে ইংলণ্ডের কোন খ্যাতনামা বিজ্ঞান আচার্য্যের সুপারিশে অধ্যাপকের পদ তাঁহার জুটিলেও তাহা এক অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। পরে ইন্দ্রনাথের জার্ম্মাণী ফরাসী ভাষায় ক্লাস, বটানি ও জিওলজিতে কলেজের ছাত্রদের সাহায্য করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে একটী গোপন অনুষ্ঠানের "শিকড়" দেখা দিয়াছিল জেলখানার প্রাঙ্গণে—

ইন্দ্রনাথকে এই সময় হইতে রাষ্ট্রীয় অন্দোলনের নেতা-রূপে আমরা দেখি। ইন্দ্রনাথ এলা ও কানাই গুপ্তের তর্ক ও আলোচনার মধ্যে অনেক গভীর সমস্যার উত্তর আছে, উহা হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি—এই উপন্যাস তর্কের ও আলোচনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই তার গবেষণা আলোচনা সবই উপন্যাসে "জায়গা পেয়েছে, জায়গা যোড়েনি" কবি দেখাইয়াছেন যে গল্পের প্লট যাহাই হোক যদি শিল্পীর নিজের সৃষ্ট চরিত্রের সম্বন্ধে Perception of character ঠিক থাকে, সৃষ্ট চরিত্রের বিশেষত্বগুলি এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—। সুতরাং এই উপন্যাসকে intellectual বা অন্য কোন গালভরা বিশেষণে অভিষিক্ত না করিলেও চলে। সে যাহা হউক ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন—ইন্দ্রনাথ বলিতেছেন "ওরা চারিদিক থেকে বদ্ধ করে আমাকে ছেড়ে কর্ত্তে চেয়ে ছিলো—মরতে মরতে আমি প্রমাণ করতে চাই আমি

"......গোলামী চাপা এই খর্ব্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতন মর্ত্তে পারাও একটা সুযোগ" এত বড় আদর্শবাদী ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ যদিও দেশভক্ত কিন্তু দেশভক্তির গোঁড়ামী তাঁকে ইংরাজের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে বাধা দেয় না। ইন্দ্রনাথ বলিতেছেন "আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরী দিই। পরের দেশকে শাসন কর্ত্তে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে—তাতেই মরণ দশা ধরেছে ওদের ভিতর থেকে। এতো বিদেশের বোঝা আর কোন জাতের ঘাড়ে নেই, এতেই ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।" এইরূপ ব্যাপারে যে স্বভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে সভ্যতার উত্থান ও পতনে।

অতীন ও এলা—

এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র অতীন ও এলা—মোকামা ঘাটে ষ্টীমারে এলা ও অতীন্ পরস্পরকে দেখে। এই প্রথম দর্শনেই উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এলার প্রতি আকর্ষণই অতীনকে দেশ সেবার পথে অগ্রসর করে।

অতীনের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়া এলা লইয়া আসিল অতীনকে এই দেশ ব্যাপী নব জাগরণের মধ্যে শুধু নিজের কাছে নয়—সমগ্র দেশের কাছে Amor propre শুধু নয় Amor Patriae ও বটে।

এলা ও অতীনের তর্ক ও আলোচনার মধ্যে দেখি যে নারীর নিকট হইতে পুরুষ শিখিতেছেনা, পুরুষই নারীকে অনেক শিক্ষা দিতেছে। (নারীর নিকটে পুরুষ যে কেবলই শিখিতেছে এইরূপ তর্কের সমাবেশ আধুনিক উপন্যাসে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে) এলা সুন্দরী তরুণী শিক্ষিতা সব পরীক্ষা পাশ করিয়াও অতীনের নিকটে অকপটে স্বীকার করিতেছে "পুরুষেরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো" পরে আবার বলিতেছে "নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙ্গালী মেয়েরা নিজেদের প্রশংসায় মুখরা, দেবী প্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে—। স্বজাতির গুণ গরিমার ওপরে সাহিত্যের রং চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গ রাগেরই সামিল, স্বহস্তে বাঁটা বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে"—এলা নারীর চোখেই পুরুষকে দেখিয়াছে "তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছে।" এলা বলিতেছে "যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুক্‌রো ছেলেদের কথাই ভাবি আমার দেশ তারাই তারা যদি ভুল করে খুব বড়ো করেই ভুল করে, আমার বুক ফেটে যায় আপন ঘরে এরা জায়গা পেলনা। আমিই ওদের মা, ওদের বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে উঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমার সেবা করা আমার সার্থকতা, আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।" এলার এই ভক্তি বর্ত্তমানে ইংরেজী পড়া মেয়ের জগতে বড়ই প্রয়োজনীয়। এই মহাবাণী নারী জাগরণের মেকী আবহাওয়ার মধ্যে অতি শুভ মুহূর্ত্তে কবি রবীন্দ্র নাথের লেখনী হইতে নিসৃত হইয়াছে।

এলা এক দিন বড় উৎসাহে, বড় আশায় অতীনকে দেশ সেবার কার্য্যে লইয়া আসিয়াছিল—"দেশের কাছে বাক্‌দত্তা হইলেও সে অতীনের সান্নিধ্যে আসিয়া এই ব্রত ভঙ্গ করিতে অতীনকে অনুরোধ করে। এই বিপদসঙ্কুল পথে অতীনের সহধর্ম্মিণী হইবার অনুমতি ভিক্ষা করে। কিন্তু অতীনের স্বাধীনতা নাই—তাহার প্রকৃতির স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। সে দেশবাসীকে জাগ্রত করিতে অগ্রসর হইয়াছে সম্পূর্ণ পরাধীন মন লইয়া—সে দেশ সেবার দলের এক কলের পুতুল মাত্র—সে স্বাধীনতার পতাকা তুলিতে ব্যগ্র—কিন্তু সে মনে প্রাণে মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত দাস—তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব সবই সেই কলের পুতুলের ন্যায়, সে পেট্রিয়ট নেতার কথায় নৃত্য করে; নেতার কথায় কার্য্য করে তাহার নিজের স্বভাবকে সে সম্পূর্ণ ভাবে বলি দিয়াছে—এইরূপ পেট্রিয়টিজমকেই ঋষি টলষ্টয় বলিয়াছেন "The irrationality, harmfulness and antiquatedness of patriotisim"

সে নিজের স্বভাবকে হত্যা করিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। অতীন হয় তো দার্শনিক Epictetus এর ন্যায় মনে মনে ভাবিয়াছিল "No one is a slave whose will is free" যাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে সে কি করিয়া সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিবে? কি করুণ কি tragic। অতীন "সাহিত্য-লোকে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"কালের সেই আবর্জ্জনা রাশির সর্ব্বোচ্চে" সে দেখিয়াছিল "অটল বাণীর সিংহাসন"। কিন্তু তাহার ভক্তি হইতে হইল "দলের সতরঞ্চ খেলার বড়ের মধ্যে"। অতীন যদিও দেশের সেবায় ব্রতী তবু সে অন্ধভক্তিতে এখনও ঠিক দেশের সেবায় যোগ দিতে সক্ষম নহে। সেই কারণে সে যখন গাড়োয়ানপাড়াতে "ডিমক্র্যাটিক পিক-নিকে" যোগ দিয়াছিল—যখন গোয়াল ঘরের পার্শ্বে অনেক দাদা খুড়ো সম্পর্ক পাতাইয়াছিল তখন সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে সে ও গোয়ালঘরের অধিবাসী উভয়েই উপলব্ধি হয়তো করিয়াছে—যে "এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না।" তাহার মনে হইয়াছিল "যে এমন মহৎলোক হয়তো আছেন সব যন্ত্রেই তাদের সুর বাজে' সে যদি নকল কর্ত্তে যায় সুর মিলবে না। তাহার দলের লোক যে সময়ে হরিজন পল্লীতে মদ খাওয়া নিবারণ করিতে ব্যগ্র সে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল "মদ তো বন্ধ কর্ব্বে কিন্তু তার বদলে দেবে কি ?"

অতীন এলাকে বলিয়াছে "আমি আজ স্বীকার কর্ব্ব তোমার কাছে—তোমারা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি আমি সেই পেট্রিয়ট নই—পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্ব্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম্ কুমীরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচারণ, নীচতা পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—"

রবীন্দ্রনাথের নিজের টীকাতে বলিয়াছেন "বারে বারে মনে হচ্ছে (অতীনের) দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতর কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্ত্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এলো সেই মুখোষপরা চুরি ডাকাতি খুনো খুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোক স্তম্ভ কখন উঠবেনা। আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোন যথার্থ ফল নেই এতে নিঃসংশয়ে পরাভব সামনে"—

ইন্দ্রনাথ যদিও দলের নেতা ও হঠাৎ আসিয়া কখনও হুইসল বাজাইতেছেন, কখনও টর্চ্চ লইয়া, কখনও সাঙ্কেতিক ভাষায় পত্র লিখিয়া অতীনকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠাইতেছেন কিন্তু তিনিও যে পরাভবের শঙ্কা করেন না তাহা নহে। ইন্দ্রনাথ কানাইগুপ্তের সহিত কথোপকথনে বলিতেছেন "ওদের বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাব বিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানব স্বভাবকে আমি স্বীকার করি......(সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত আশা) নাই রইল তবু নিজের অপমান ঘটাবনা সামনে মৃত্যুও যদি নিশ্চিত হয় তবুও"—

এই উক্তির মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত রহিয়াছে—অতীন আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে "পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্ম্মে বড়ো "কিন্তু এ কথা শুধু অতীনের দলের নহে, দেশবাসী অনেকেই বোঝে না। যাহাদের বাহুবল আছে তাহারা মনুষ্যত্বকে অপমান করিয়া জয় ডঙ্কা কিছু দিনের জন্য বাজাইতে পারে কিন্তু যে দুর্ব্বল তার মানব ধর্ম্ম মনুষ্যত্বই প্রধান বল।

যদিও এই উপন্যাসের অর্দ্ধেক "এলা" ও "অন্তুর" বিরহ বেদনার কথাতে পূর্ণ কিন্তু এই বিরহের অন্তরালে দুইটী মূর্ত্তি মাঝে মাঝেই আমাদের দৃষ্টি পথে আসে —। একটী অখিল আর একটী অক্টোপস বটু।

অক্টোপস্ বটু—

ইহাও সত্য যে অতীনকে এলা চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়াছে, অতীনের বুকের উপর পড়িয়াছে, যে সংযম লজ্জা সঙ্কোচ একদিন এলাকে অতীনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে বাধা দিয়াছিল—যে এলা এক দিন সত্যই বলিয়াছিল "বিয়ে সম্ভব হোত না.....রাগ করোনা অন্তু ভালো বাসি বলেই সঙ্কোচ—আমি নিঃস্ব কতটুকুই বা দিতে পারি" সেই এলা অন্তুকে জীবন সঙ্গীরূপে পাইবার জন্য কেন এতো ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার মূলে ঐ অক্টোপস বটু, বটু—সুন্দরী, অতি সুন্দরী এলাকে পাইবার জন্ত যে দুর্দ্দম লালসা লইয়া আসিয়াছিল তাহা এলার পক্ষে ঘৃণার্হ—সে ঐ অশুচি

"বটুর কাছে নিজেকে কিছুতেই সমর্পণ করিবেনা—তাহাতে তাহার ব্রত ভঙ্গ হয় ক্ষতি নাই—মৃত্যুও শ্রেয়. সেই কারণে এলা উন্মাদ হইয়া চোখের জলে বলিয়াছিল—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা তোমাকে কতো ভালো বেসেছি তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালো বাসার দোহাই মারো আমাকে মারো"—। কি tragic—কি করুণ—

এই আলিঙ্গন, চুম্বন, এই বিরহ বেদনা মানবের লালসাকে খাদ্য দেয় না—মানবের যা মহৎ প্রবৃত্তি সহানুভূতি তাহাই আনয়ন করে—ঋষি রবীন্দ্রনাথের মোহনীয় তুলির এক পোঁচে অখিল আসিয়া উপস্থিত হয় আর এক পোঁচে এলাকে বিদায় দিতে হয় অখিলকে—। এলার "সদা-ব্যথিত" স্নেহ ভগ্নীর সেহ আশ্রয়হীন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসম অখিলের প্রতি এক মুহূর্ত্তে এলাকে লইয়া যায় সেই নীলাকাশে, সেই পবিত্র স্বর্গরাজ্যে—এই স্থলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অতীন ও এলা তাহাদের পবিত্র হৃদয় লইয়া, উচ্চ আদর্শ লইয়া যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল তাহাতে জয়মালা পাওয়া তো দূরের কথা পরাভবের লজ্জা আসিয়া তাহাদের গ্রাস করিল।

অতীনের দলের লোক দেশ সেবার নামে অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব লুঠ করিল। বটু (যাহাকে কবি অক্টোপসের সহিত তুলনা করিয়াছেন) তাহার দুর্দ্দম লালসা ও অশুচি হৃদয় লইয়া এলাকে লাভ করিবার নিমিত্ত অতীনকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যবস্থা করিল। যদি প্রামাণাভাবে অতীনের শাস্তি না হয় বা কম হয়, সেই জন্য পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের মারফত ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে বাঙ্গালী হাকিম জয়ন্ত হাজরার আদালতে যাহাতে মামলা আসে তাহার ব্যবস্থা করিল। এই অকেটাস বটুর ঈর্ষার তীব্র জ্বালা যে কতদূর ভয়ানক তাহা কবি জ্বলন্ত অক্ষরে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

অকটোপস বটু যে কেবল চার অধ্যায়েই দৃষ্ট হয় তাহা নহে। বাংলার রাষ্ট্রীয় অন্দোলনে ঐরূপ অনেক অক্টোপস বর্ত্তমান। শুধু রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে কেন রাষ্ট্রীয় আন্দোলন মূল training school ঋষির আশ্রমেও এইরূপ পুরুষ ও নারী অক্টোপস দেখা দিয়াছে যাহাতে ঋষিকে বাধ্য হইয়া আশ্রম তুলিয়া দিতে হইয়াছে। যে উৎসাহ, যে উদ্যম লইয়া দেশের শত শত পবিত্র তরুণ তরুণী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, যে অতীন ও এলা দেশের হিতে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিল সেই ব্রত উদযাপিত না হইয়া অসমাপ্ত রহিল তাহাদের গভীর নৈরাশ্যে, হৃদয়-ভেদী হাহাকারে।

মূলকথা—রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের মূল সূত্র এই যে নিজের আত্মাকে, নিজের প্রকৃতিহত্যা করিলে মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া থাকে জাতির মনুষ্যত্ব নষ্ট হইলে আত্মার বিনাশ ঘটিলে, সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী—। তখন দেশ সেবার মধ্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মধ্যে অনেক ভণ্ডামী, পাপ, মিথ্যাচারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা জাতিকে জীর্ণ করিয়া অধঃপতনের মুখে অগ্রসর করে।

বোধ হয় এই সব কার্য্য কারণ বিবেচনা করিয়াই সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব গভীর দুঃখে রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন "রবি বাবু আমার খুব পতন হয়েছে"। আজ গভীর ব্যথা লইয়াই সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নে এই অমূল্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন দেশের মঙ্গল কামনায়। বড়ই ব্যথিত হইয়া বাংলার অমর কবি নাট্যসম্রাট দ্বিজেন্দ্রলাল "বঙ্গ আমার জননী আমার লিখিবার পর তাঁহার মেবার পতনে লিখিয়াছিলেন মানসীর কথোপকথনে যে স্থলে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিতেছে "ভাই উচ্ছন্ন যাবে আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখবো"—দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী কন্যা উত্তর দিয়াছে "প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্ব তাকে তুলতে—তবু যদি না পারি ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়ো তেমনি জাতীয়ত্বর চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়ো। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়—ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্—দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক্"

বাঙ্গালীর আর্থিক দুরবস্থার একটি কারণ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

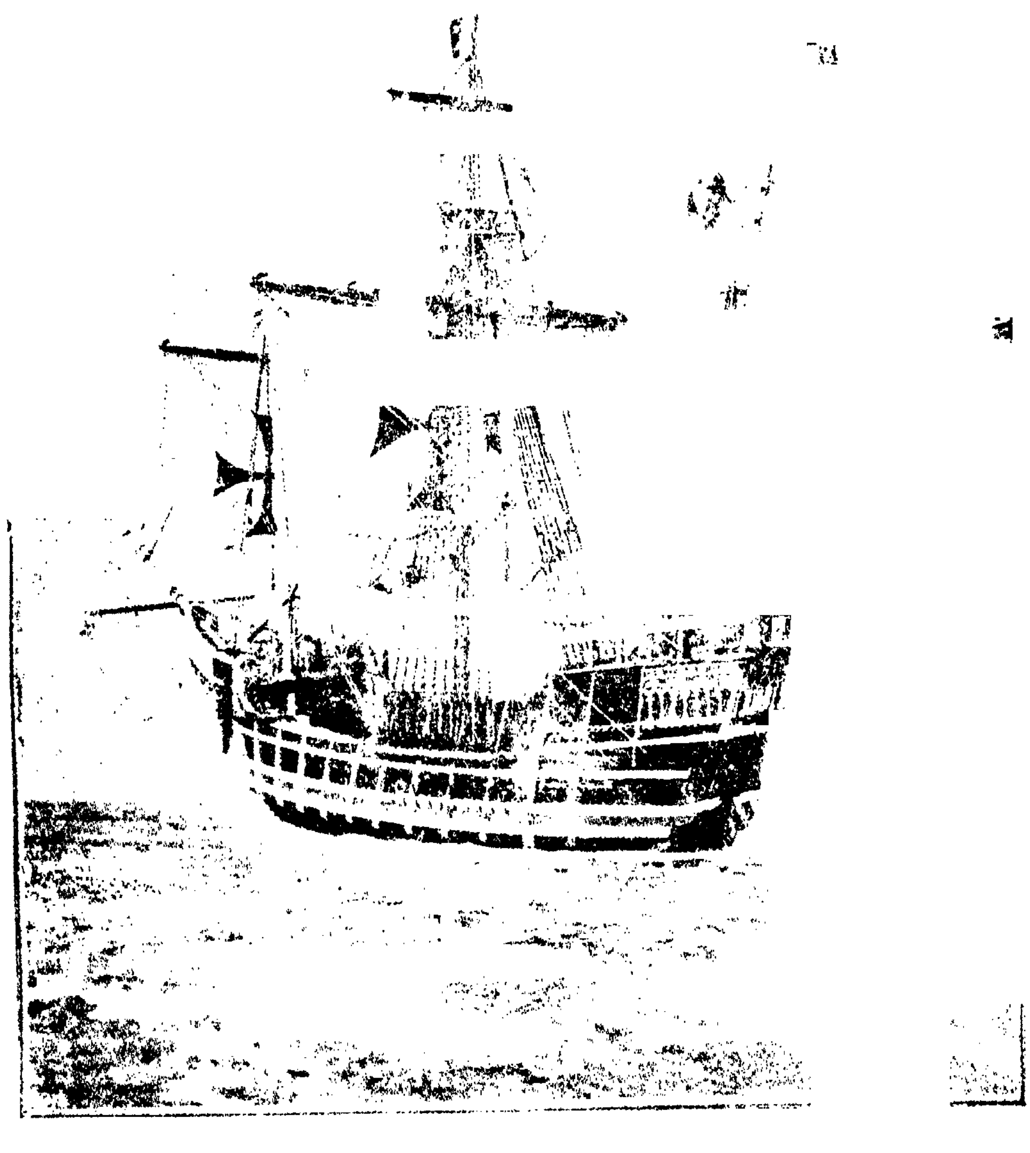
বেকারের মধ্যে অন্য দল আছে, যথা পাইকারী ক্রেতা, বিক্রেতা, দালাল, চালানদার, ঠিকাদার ইত্যাদি যাহারা অপরের বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করে। বাঙ্গালীদের মধ্যে এইসকল শ্রেণীর পেশাদার লোক ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়িতেছে কেন? তাহার কারণ হইতেছে স্ব-প্রাদেশিক প্রেম। পুলিশের ব্যয়ই উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্; এ বাবদ প্রায় চারিকোটী টাকা বজেটে বরাদ্দ হইয়াছে, ইহা যদি ছয় কোটীও হইত অর্থনীতির দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতাম না যদি এই অর্থ এ প্রদেশের লোকদের মধ্যে বাটা হইত; রাজস্ব হইতে যে অর্থ স্বদেশের ও স্ব-প্রদেশের লোকেদের বেতন, ঠিকাদারী ও মাল সরবরাহ মারফৎ—ব্যয় হয় তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া এ প্রদেশের লোকেদের মধ্যেই বিতরিত (?)হয়, কিন্তু যেখানে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে বিহারী, উড়িয়া, পশ্চিমা, মাড়োয়ারী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, ইত্যাদি অন্য প্রদেশাগত লোকের মধ্যে বাটা বা বিতরিত হয় সে অর্থে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর কোন উপকার হয় না। পুলিশ বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা হইতে যদি বাঙ্গালী চৌকিদার, কন্‌ষ্টেবল্‌, ইত্যাদির বেতনে প্রদত্ত হইত, যদি ঠিকাদারী কাজে বাঙ্গালী নিযুক্ত হইত, মাল সরবরাহ কাজ যদি বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দেওয়া হইত তাহা হইলে পুলিশের জন্য বরাদ্দ অর্থ হইতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী উপকৃত হইত, তাহার উপর যদি আবশ্যকীয় মাল বাঙ্গালায় তৈয়ারী বা উৎপন্ন হওয়া চাই এমন কড়ার থাকিত তাহা হইলে পুলিশের জন্য ৪ কোটী কেন ৮ কোটী বরাদ্দ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইতাম না; এ ভাবে যদি গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ অর্থ এ প্রদেশের চাকুরে, ঠিকাদার, মাল উৎপাদক ও আমদানী কারকদের মধ্যে বিলি হয় তাহা হইলে আমারা পুলিশের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি দেখিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, কেন না আমাদেরই প্রদত্ত রাজস্ব বাবদ অর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদেরই হাতে আসিয়া পড়িত। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় ব্যয় বাঙ্গালী মারফৎ করিতে হইবে। ইংরাজ রাজার জাতি, প্রকৃত আবশ্যক ও কাল্পনিক উৎকর্ষতার দরুণ কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী রাখিতে আমাদের আদৌ আপত্তি নাই যদি তাহারা কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০৲ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারী সমুদায় বাঙ্গালীর মধ্য হইতে সংগ্রহ করেন, অথবা বাঙ্গালায় যতগুলি পশ্চিমা কনষ্টেবল রাখা হইবে সেই পরিমাণ বেতনের বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পশ্চিমাদের দেশে নিযুক্ত করিতে হইবে. পশ্চিমাদের অপেক্ষা বাঙ্গালী যে কনষ্টেবলী কার্য্যে কম অপারগ কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা প্রমাণিত হয় না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার প্রধান কারণ ভিন্ন প্রদেশবাসীদের উপর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অযথা আনুকূল্য। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গালা পরিষদে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতির এই ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফল কোনও সদস্য বিশ্লেষণ করেন নাই।

মিনতি

কুমারী পূর্ণিমা সান্ন্যাল

তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু!
ভুলের পথে চলি যদি,
জীবন ভরে নিরবধি,
কোনটা সোজা কোনটা বাঁকা যদি নাইগো বুঝি কভু।

তুমি আমায় ক্ষমা করো তবু।
শেষের দিনে দাঁড়িও এসে,
ক্ষমা ভরা মধুর হেসে,
মরণ ভীতি যাবে দূরে অভয় যেন পাব তবু
তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু।



কলম্বসের সান্টা মেরিয়া জাহাজ
(বিলাতের সায়ান্স মিউজিয়মে এই মডেলটী রক্ষিত আছে)

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের দুইটী দৃশ্য



উদ্যান মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ-মঞ্চ



"নিবেদিতা"

প্রাচীর গাত্রে প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মর মূর্ত্তি



বায়স্কোপ দর্শকদের চিরপরিচিত পরিচ্ছদ

অভাবে স্বভাব নষ্ট

গল্প

শ্রীনীতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

('ক্ষুধিত যে সে কি পাপ না করিতে পারে? এমনি একটা চলিত কথা' সংস্কৃতে আছে একজন অভাবগ্রস্ত লোক কি ভাবে সুযোগ পাইয়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের অর্থ হস্তগত করিল তাহারই করুণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।)

হর্ষের পাশে বিষাদ, বাসর-শয্যার অন্তরালে শর-শয্যা, আনন্দ প্রদীপের পশ্চাতে শ্মশান ক্ষেত্রের প্রজ্বলিত ভীষণ চিতা-বহ্নি,—এইরূপ বৈষম্যপূর্ণ, বিপরীত ভাবাত্মক অচ্ছেদ্য নিগড়ে মানুষ আমরণ বাঁধা। বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় বিধাতার এমনই আইন।

সম্রাটের রজত-জয়ন্তি! অর্দ্ধ পৃথিবী যখন উল্লাস ও প্রমোদ-কোলাহলে উচ্ছলিত তখন অনাহারক্লিষ্ট কুমারীশ ঘরের দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়া বলিতেছিল—তোমাকে হাজার দিন বারণ করেছি ধারে আর জিনিষ কিনো না —বন্ধ ক'রে দাও···তবু ধার ক'রবে?

—তা'বলে আমকাঁটালের দিনে ছেলে পুলেরা দুটো আম খেতে পাবে না?

—না···। একে দুঃখের সংসার, দিন আনা দিন খাওয়া; এর ওপর কি আর ধারের খ্যাচ্‌কানি সহ্য হয়—

অভাব! অভাব! নিত্য অভাব! মাথা কি আর সাধে বিগড়ায়—

কুমারীশ ভাবিতে লাগিল,—এরা ভাবে বুঝি আমার স্বভাবই এইরকম, কেবল ঝগড়া করা, সর্ব্বদা তিতিক্ষে মেজাজে থাকা। তা নয়! খারাপ যতটুকু হ'তে হয় সে শুধু অভাবের জন্য। নইলে—

কুমারীশের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। বাইরে থেকে ডাক আসে,—বাবু বাড়ী আছেন? মাছের পয়সা ক'টা দিন। ফাল্গুন মাস থেকে তো সমানেই ঘোরাচ্ছেন; বলুন যে দেব না,—তা'হলে আর আসি না।

—ভ্যালো আপদ—বলিয়া কুমারীশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাইল।

—কে বাটুল না কি? বাবুতো বাড়ী নেই। এই-মাত্র ভাটপাড়া চ'লে গেল যে—বলিতে বলিতে মা বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

—এমন ক'রলে কি ক'রে আর পারি মাঠাকরুণ। আজ এই দুমাসের মধ্যে সামান্য পাঁচটা পয়সা পেলাম না। তাগাদায় এলেই শুনি—বাবু বাড়ী নেই। আপনি পয়সা ক'টা তেনার কাছ থেকে চেয়ে রাখবেন, আমি কাল হোক্ পরশু হোক নিয়ে যাব'খন। —আমরা গরীব মানুষ, খেটে খেগো—পয়সা ফেলে রাখলে আমাদেরই বা চলে কি ক'রে বলুন?

—আচ্ছা বাবা, তাই চেয়ে রাখবো, তুমি এসে নিয়ে যেও—বলিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

—ছিঃ, এমন ভদ্দরলোক! পষ্ট গলার আওয়াজ কানে গেল আর মাগী বল্‌লে কিনা—বাড়ী নেই! এমন মাছ খাওয়ার মুখে আগুন—বলিয়া বাটুল চলিয়া গেল।

কুমারীশ সবই শুনিতে পাইল। উদাস দৃষ্টিতে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে একবার তাকাইল। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়িয়া তখন প্রলয় নাচন সুরু করিয়া দিয়াছে। টাকা! এ যে একালের সর্ব্বস্ব! অর্থই যে সকল সুখের মূল! কুমারীশের মনে পড়িল শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ—"অর্থমনর্থং ভাবয়···"। কিন্তু,—কিন্তু ও'ব ফাঁকা কথায় টাকার উপর বৈরাগ্য করা চলে, কিন্তু সংসার যখন চাপ দেয়, তখন টাকাই পথ দেখায়। টাকা চাই—টাকা চাই। যেরকম করিয়াই হউক টাকা তাহাকে রোজগার করিতে হইবে। দরিদ্র বলিয়া সে আজ সমাজের মধ্যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মহাঅপরাধীর মত বাস করিতেছে। দুধের ছেলে মেয়েরা পয়সার অভাবে খাইতে না

পাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে। কাল যদি তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়,—দৃশ্যপট সব বদলাইয়া যাইবে না কি? কুমারীশ আর ভাবিতে পারিল না। একটা আধ-পোড়া বিড়ি ধরাইয়া হাঁকিল—মা তেল দাও।

কেহই আসিল না।

কুমারীশ বুঝিল। ···গৃহে তৈলাভাব। তাড়াতাড়ি গামছা খানা টানিয়া লইয়া নদীতে চলিয়া গেল।

কুমারীশের পিতা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তাহাদের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও বেশ স্বচ্ছল ছিল। দেশের সঙ্গে তাহাদের কোনই যোগাযোগ ছিল না। বরাবর বিদেশে বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বিদেশে পিতার মৃত্যুর পর মা আর এক অবিবাহিতা ভগ্নীকে লইয়া কুমারীশ দেশের পৈতৃক ভিটায় নিতান্ত বিদেশীর মতনই সেই প্রথম আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর···?

তারপর যেটুকু, সেটুকু নিতান্তই সাধারণ। ভগ্নীর বিবাহ। চাকুরীর আশায় নিজের বিবাহ। ব্যস্! তারপরে চাকুরীর বাজার মন্দা ও বড় সাহেবের বিলাত যাওয়ার দরুণ শ্বশুর মশায় জামাই এর চাকুরী করিয়া দিতে অপারক হইলেন। কুমারীশ বাধ্য হইয়া গ্রামেই সামান্য একটু আধটু কাজ কর্ম্ম করিয়া কোন দিন বা অনাহারে কোন দিন বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে লাগিল।

অনাহার!—মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক—। প্রথম রিপুর মতই দুর্দ্দমনীয়। দুই দিন অনাহারে থাকিয়া নিরুপায় কুমারীশ স্ত্রীর শেষ অলঙ্কার নাকছাবি বিক্রয় করিতে সহরে গিয়াছিল।

সহর হইতে সে যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন বেলা প্রায় বারোটা। মর্ম্মভেদী চিন্তায় সে আজ ক্ষিপ্ত। জৈষ্ঠ্যের প্রখর রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে এতটা পথ চলিয়া তাহার শরীর ক্রমশঃই যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। শেষে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া হালিসহর ষ্টেশনের ভিতর একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিয়া পড়িল। নাকছাবি বিক্রয় করিয়া মাত্র দুইটা টাকা পাইয়াছিল। এ আর কতদিন? —তারপর—

-দাদা দয়া ক'রে এই খামটায় একটা ঠিকানা লিখে দেবেন,—ইংরাজীতে—?

এক অপরিচিত ব্যক্তি একখানা খাম হাতে কুমারীশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঠিকানা বলুন দিচ্ছি। কিন্তু লিখি কি দিয়ে? বলিয়া কুমারীশ হাত বাড়াইয়া খাম খানা লইল।

—"দোয়াত কলম আমি ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে আনছি"—বলিয়া ভদ্রলোক ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গেল।

ঠিকানা লেখা হইলে চিঠিটা একবার পড়িয়া খামের মুখ বন্ধ করিয়া পকেটে ফেলিল। তারপর পকেট হইতে গোটা দুই বিড়ি বাহির করিল। কুমারীশকে একটা দিয়া নিজেও একটা ধরাইল।

বিড়িতে একটা টান দিয়া নাকমুখ দিয়া গল্‌গল্ করিয়া খানিক ধোঁয়া ছাড়িয়া কুমারীশ জিজ্ঞাসা করিল-আপনার কি এ অঞ্চলে?

আজ্ঞে না। বাড়ী আমার সিরাজনগর। পাটের কারবারের জন্যে এদিগরে আসা—দালালী করি। আজ এ-গাঁয়ে, কাল ও গাঁয়ে এমনি ক'রেই আমার দিন কাটে তবে কাজ কর্ম্মের তেমন যুৎ নেই।

কুমারীশ বলিল--কেন?

—মাড়োয়ারীদের গুতোয় অস্থির হ'য়ে গেলাম মশায় বল্লেন কেন আর দুঃখের কথা। ফট্ ক'রে এমন বাজার দর চাড়িয়ে দিলে যে দু'পয়সা লাভের মাথায় ঝাড়ু মেরে এখন মহাজনের কড়ারমত তিনহাজার মন পাট যে কেমন ক'রে যোগান দেব তাই ভেবে ভেবে পাগল হ'য়ে গেলাম।

কুমারীশ শুনিয়াই যাইতে লাগিল। কোন কথা কহিল না। লোকটী নিজের মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিল,—এই পাল্লাপাল্লির বাজারে মশায় নিজের কাছেও এমন টাকা রাখি না যে টাল্ সামলা'বো মহাজনকে লিখে দিলাম তো হাজার তিনেক টাকা পাঠাবার জন্যে—কবে আসবে কে জানে? টাকার অভাবে মাল মাপতেও পাচ্ছি না ওদিকে মধ্যে পড়ে মাড়োয়ারীরা সব পাচার ক'রে দিচ্ছে—মহা মুস্কিল!

বিড়িটার আর একটা প্রচণ্ড টান দিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর কুমারীশকে একটা নমস্কার

করিয়া লাইন টপ্‌কাইয়া বেলেহাটির দিকে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ লোকটাকে দেখা গেল কুমারীশ একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে সবলে কি যেন একটা ধাক্কা দিতে লাগিল। বেঞ্চিটার হাতলে মাথা রাখিয়া সে গভীর চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত যখন তাহার এলোমেলো হইয়া গেল, এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল একটা যেন পথ সে পাইয়াছে! টাকা উপায়ের একটা ফন্দি যেন সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। —হয় এস্‌পার না হয় ওস্‌পার! পাপ?—কিসের পাপ? পাপ-টাপ আর তার কাছে কিছু নেই—সে আজ মরিয়া।

কুমারীশ উঠিয়া বসিল!—সে আজ মরিয়া—এসংসারে টাকা চাহে না কে? পাগল ও পরমহংস ছাড়া সকলেই টাকার কাঙাল। পকেট হইতে আর একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। তারপর উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর দিকে গেল না; উল্টা রাস্তা ধরিল—বরাবর নৈহাটীর মুখে।

+　　　　+　　　　+

নৈহাটীর পোষ্ট অফিসের সামনে কুমারীশ যখন গিয়া দাঁড়াইল তখন সে রীতিমত ধুকিতেছে! কথা বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। রাস্তার পাশেই একটা টিউবওয়েল ছিল সেইখানে গিয়া কুমারীশ খুব খানিক মাথায় জল থাবড়াইয়া যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। কাপড়ে মাথা মুখ মুছিয়া সটান পোষ্টমাষ্টারের জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

পোষ্ট মাষ্টার একবার তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? আপনার—

কুমারীশ বলিল—"সিরাজনগরে একখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করতে চাই। এখন ক'রলে কখন পৌঁছবে? —ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই—বলিয়া একখানা ফরম জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন।

ফরমখানা লইয়া কুমারীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আমার টেলিগ্রাম পেয়েই যদি উত্তর দেন—অবশ্য টেলিগ্রামে কিংবা T.M.O. করেন তাহ'লে আমি এখানে কখন পেতে পারি?—শেষের দিকটা তাহার গলার স্বর যেন কাঁপিয়া উঠিল।

—সন্ধ্যার আগেই পেতে পারেন। তবে যদি আপনি অপেক্ষা করেন তবেই, নইলে কাল ডেলিভারি পাবেন।

সেই লোকটার মহাজনের ঠিকানা কুমারীশের মনে ছিল। কুমারীশ লিখিল:

বাজার হটাৎ নামিয়াছে। খুব সুযোগ। পাঁচ হাজার টাকা পাঠাও। পোষ্ট অফিসেই টাকার জন্যে অপেক্ষা করিতেছি—রাইচরণ—

লোকটা খামটা বন্ধ করিবার সময় চিঠিটা যখন একবার পড়ে, তখন কুমারীশের প্রেরকের নামটা হঠাৎ নজরে পড়িয়া যায়; টেলিগ্রামের তলায় বসাইয়া দিল।

ফরমটার উপরে একবার চোখ বুলাইয়া পোষ্টমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—এত বেশী টাকার এত জোর তাগাদা কেন? ব্যাপার কি;—কি করেন আপনি?

—"আজ্ঞে পাটের দালালী করি। বাজারটা হঠাৎ নরমে গেল, এই সময় কিছু বেশী মাল গস্ত ক'রে রাখতে পারলে সুবিধে হবে ব'লে মনে হয়, তাই মহাজনকে 'টেলি' করলাম।

বলিয়া কুমারীশ গোটাকতক ঢোক গিলিল;

রসিদ লইয়া কুমারীশ বলিল,—আমি এই বারান্দায় শুয়ে থাকলাম মাষ্টার মশায়; টাকাকড়ি এলে দয়া ক'রে একটা ডাক দেবেন।

গায়ের জামাটা মাথায় দিয়া কুমারীশ শুইয়া পড়িল।

+

ক্লান্ত কুমারীশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

—রাইচরণ বাবু ও রাইচরণ বাবু আপনার টাকা এলো যে—আসুন—বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার এর ডাক শুনিতেই কুমারীশের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল,—ধড়পড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

—আসুন, ভেতরে আসুন। খুচরো নোট নেবেন, না সব একশ ক'রে দিয়ে দেব?

—আজ্ঞে হয়ে কি বলে—খুচরো নোটই দেন। দু' পাঁচ টাকা ক'রে আবার সব ব্যাটাদের দাদন দিতে হবে হবে কি না;—কত পাঠিয়েছেন?

—পাঁচ-হাজার।—সই করুন বলিয়া রসিদ খানা কুমারীশের দিকে আগাইয়া দিলেন।

কোন রকমে নাম লিখিয়া দিয়া (রাইচরণের) নোটের প্রকাণ্ড তাড়াটা বুকে চাপিয়া টলিতে টলিতে যখন রাস্তায় নামিল তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

সম্মুখেই একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া কুমারীশ তাহাতেই উঠিয়া বসিয়া কম্পিতস্বরে হাঁকিল —চালাও ইষ্টিশান।

কুমারীশের মনের মধ্যে একটী প্রশ্ন দোলা দিতে লাগিল—টাকা পেলাম, কিন্তু কিসের বিনিময়ে!

জার্ম্মান সাহিত্যে ছোট গল্প

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

ছোট গল্পের আর্ট লইয়া বহু বাদ বিসম্বাদ থাকিলেও ছোট গল্প না হইলেও যে কোন মাসিক পত্রিকাই চলিতে পারে না, ইহাও তেমনি স্বত:সিদ্ধ। ছোট গল্পের জন্মভূমি ইতালী এবং পরিণতি ফ্রান্সে হইলেও রাশিয়া ও জার্ম্মানী আজি সভ্য সমাজে যে সকল ছোট গল্প উপহার দিয়াছে তাহার মূল্য সাহিত্য জগতে বড় কম নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। জাতি যখন উন্নতির পথে ধাবিত হয়, যখন তাহার আশা ভরসা এবং যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা গগনস্পর্শী হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার সাহিত্যও উন্নত হইয়া উঠে। অধঃপতনের যুগে মর্ম্মন্তুদ ও হৃদয়-বিদারক পদ্য লিখিত হইতে পারে কিন্তু এইযুগে গদ্যের উন্নতি বিশেষ সম্ভবপর হয় নাই। ইহা ব্যতীত আরও একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। জগতে আজ সাম্য ও মৈত্রী প্রচারিত হইলেও. সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব কোনকালে জগতে স্থাপিত হইবে কিনা সে বিষয়ে বেশ সন্দেহই আছে। এইজন্য জল বায়ুর ন্যায় জাতি বিশেষের হৃদয়স্পন্দনও এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভিন্নভাবে স্পন্দিত হয় তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আব-হাওয়াও অনেক জাতির চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। আমার এই সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই সমস্ত বাহ্যিক আবহাওয়া জাতীয় সাহিত্যে প্রচুরভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

জার্ম্মান জাতি চিরকালই আভিজাত্যের ভক্ত। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য অনেকটা উত্তরাধিকারী সূত্রে উক্ত সাম্রাজ্যের অনেকটা অংশ ভোগ দখল করিতে থাকে। বিস্তৃত জার্ম্মান-সাম্রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অংশে বিভক্ত ছিল। উহার প্রত্যেক অংশই একজন feudal অধিপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই অভিজাত গণকে রক্ষা করিতে গেলে, বংশ মর্য্যাদার উপর অগাধ ভক্তি এবং শৃঙ্খলার উপর বিশেষ নজর অত্যন্ত প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যত জার্ম্মান ছোট গল্পের লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের গল্পের মধ্য দিয়া বংশমর্য্যাদার গৌরব এবং শৃঙ্খলার প্রশংসা করিবার জন্য কতকগুলি নীতিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি—ইহার নাম Old Hildebrand. গল্পটী ছোট, রাজা আর্থারের বিশ্ব-বিখ্যাত যোদ্ধাগণের ন্যায় তাহার সকলেই অভিজাত গর্ব্বে গর্ব্বিত কিন্তু ন্যায় রক্ষা করা তাহাদের ধর্ম্ম। যে যুগে মুষ্টিমেয় অভিজাত একটি সমস্ত জাতির উপর রাজত্ব করে, সে যুগে এই অভিজাত সম্প্রদায়কে অবশ্যই নজর রাখিতে হয় যে, অধীনস্থ দুঃস্থ প্রজাগণ যেন পরস্পর কর্ত্তৃক কিম্বা অপর কোন সামন্ত রাজা কর্ত্তৃক অত্যাচারিত না হয়। Old Hildebroand নীতিপূর্ণ এইরূপ একটি ছোট গল্প।

পুরাতন কথা ছাড়িয়া এবার আমরা নূতন যুগে আসিতেছি। Seven marriages without a husband একটি হৃদয়-বিদারক বর্ত্তমান যুগের কাহিনী। এখানে একটু বলিয়া রাখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জার্ম্মাণ ছোট গল্পে হাস্য-রসের স্থান খুবই কম। এই গল্পটীকে হাস্যরসাত্মক করিলে উহার অর্থ কিন্তু অন্যরূপ হইয়া যায়। জাতি যখন যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত থাকে তখন কোন সুন্দরী কন্যার পক্ষে যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে সংসার করা কেমন বিপজ্জনক তাহা অতি নিদারুণভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন ধনীর দুলালী একজন সৈনিককে বিবাহ করে। বিবাহিত সৈনিক যুবক যুদ্ধে গমন করিলে, তথায় শত্রু হস্তে বন্দী হয়। তাহার দুই বন্ধু তাহার পত্নীর ঐশ্বর্য্য ও রূপের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া

পর পর আসিয়া দুইজনেই ঐ নারীকে বিবাহ করে। পরস্পর ঈর্ষা বশীভূত হইয়া সত্য বাহির হইয়া গেলে দুই জনই পলাইয়া যায়। তাহার পর ঐ কন্যার তৃতীয় ও চতুর্থ বার বিবাহ হইয়া গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্বামীগণের হঠাৎ আগমনে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। এইরূপ পর পর যুবতীর সাতবার বিবাহ হইলেও একবারও স্বামী লাভ ঘটিল না। এই গল্পটী যদিও ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত, কিন্তু ঐ যুদ্ধের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ইহার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ আর একটি গল্প The Criminal. একজন ছোট দোকানদারের একটি ছোট দোকান লইয়া বেশ কাটিয়া যাইত, কিন্তু মাঝখান হইতে একজন সুন্দরী তাহার মন চুরি করিয়া লওয়ায়, তাহার মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে সে চুরির আশ্রয় লয়—এবং এই অসৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কয়েকবার জেল খাটিতে হয়। কয়বার জেল খাটিয়া তাহার চরিত্রে নৈতিক অধঃপতন ঘটে—তাহার ফলে শেষবার সে যখন বাহির হইয়া আসে, তখন যে ব্যক্তি প্রেমের ব্যাপারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল তাহাকে খুন করে। এই অপরাধকে লঘু করিবার জন্য সে অবশেষে এক ডাকাতের দলে মিশিয়া যায়। সেখানে দলপতি হইয়াও সে অবশেষে অনুভব করে ক্ষুধার জ্বালা তাহার নিবারণ হইতেছে না, কেননা ডাকাতি কিছু প্রত্যহই করা চলে না এবং ডাকাতিজনিত অর্থ শীঘ্র ফুরাইয়া যায়—কাজেই পেটে ক্ষুধা থাকিয়া যায়। অবশেষে সে মনের গ্লানিতে আসিয়া বিচারকের নিকট ধরা দেয় এবং বিচারক তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গল্পের শেষের দিকে খানিকটা নীতিপ্রচারের ভান থাকিলেও গল্পটী খুবই আবেগপূর্ণ এবং স্বাভাবিক।

Sport of Destiny আর একটী সুন্দর গল্প। এই আজব দেশে যখন সামন্ত রাজ-গণ রাজত্ব করিতেন, তখন রাজ অনুগ্রহ প্রার্থীগণ কেমন করিয়া Cardinal Wolsey এর মতন দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াই আবার অধঃপতনের গতিতে তাল ফেলিয়া চলিতেন—তাহারই একটি জ্বলন্ত দৃশ্য। কিন্তু অধঃপতনের মধ্য দিয়া আবার উন্নতির পথে ফিরিয়া আসিতে পারিলে এই সমস্ত জীব হৃদয়ের কঠোরতাকে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন না। The Inn at Cransal একটি মনোরম গল্প। জাতি কখন উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিয়া জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত—তখন সে চায় শান্তি, সে চায় ক্ষুদ্রগৃহে হাস্যময়ী ও প্রেমময়ী গৃহিণী। সারা-জীবন কর্ম্মক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া দুইটী কর্ম্মশান্ত জীবন একজন কৃষক গৃহস্থের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া কেমন করিয়া শান্তিলাভ করিল, এই গল্পে তাহার সুন্দর আলেখ্য আছে। গল্পটী যেমন স্বচ্ছ ও সাবলীল উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যও সেইরূপ চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর। কর্ম্ম-ব্যস্ত জাতি পল্লীগ্রামের শান্ত কুটীরে কেন ফিরিতে চাহে—তাহারই হৃদয়ভরা ব্যথা। আর একটি গল্প Immense. বড় সুন্দর। জগত চলিয়াছে, কেহ কাহারই দিকে চাহে না। কিন্তু পুরাতন স্মৃতি বক্ষে পুরিয়া অনেক ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি অসহ্য জীবন বহন করিয়া যায়। বর্দ্ধনশীল জাতি পশ্চাতে চাহে না—তাহার সমস্ত সম্পদই ভবিষ্যৎ। কিন্তু পশ্চাতে কতই না স্তূপীকৃত দীর্ঘনিশ্বাস, ভগ্ন আশা পড়িয়া থাকে—কে তাহার খবর রাখে। পুরাতন জাতি ইহাকে বাড়াইয়া ছন্দবন্ধে কাব্য রচনা করে। বর্দ্ধনশীল জাতি মাত্র একটি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হয়।

বিছানা

গল্প

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিরাট নীলামের ঘরটা যেন ঘুমিয়ে রয়েচে। দোতলার পেছন দিকের একটা ঘরে তখনও দু একজন ক্রেতা দাঁড়িয়েছিল। আমিও ছিলাম তাদের ভেতর মিশে। আমাকে ছাড়া আর যে ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল তারা সংখ্যায় বেশী নয়—দু তিনজন লোক, মেয়েরা দাড়িতে ভর্ত্তি তাদের মুখ ও বিপুলকায়, স্ত্রীলোক।

ক্রমে একটি সুন্দর জিনিষ বিক্রয়ের জন্য উঠল। এর প্রায় প্রত্যেক রঙটিই অবিকৃত। সেটি যখন কিনলাম তার ভিতর থেকে এক ঝলক অতি মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বেশ অনুভব করলাম সেই মৃদু সুগন্ধের সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে বিগত বছরের মধুর স্মৃতি।

বাড়ীতে এসে সেটি দিয়ে একটি পুরোন চেয়ারের ঢাকা করব ঠিক করলাম। কাপড়টির মাপ নেবার জন্যে যখন নাড়াচাড়া করচি তখন হঠাৎ তার ভেতর থেকে কি যেন একটা জিনিষ খস্‌খস্ করে উঠল।

লাইনিংটা কেটে ফেললাম। এক তাড়া কাগজ আমার পায়ের সামনে ঝরে পড়ল। সেগুলো হলদে হয়ে গিয়েচে।

কৌতুহল হয়ে সেগুলো যত্ন করে কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম সেগুলো চিঠি—পুরানো ধাঁচে কাগজগুলো মোড়া আর তার উপর একটি নরম হাতের লেখা ঠিকানা।

চিঠিটা এই রকম:

বন্ধু,—আমি অত্যন্ত অসুস্থ, বিছানা ত্যাগ করতে শুদ্ধ অসমর্থ। বৃষ্টির ঝর্ণা আকুল ভাবে ঘরের কাঁচের জানলার ওপর ঝরে পড়চে। —আর আমি চাদরের তলায় বেশ আরামেই উষ্ণতা উপভোগ করচি।

আমার পেছনে তারা বালিশ দিয়ে দিয়েছে। সেই বালিশ গুলিই আমাকে সোজা হয়ে বসতে করচে সাহায্য। তুমি যে আমাকে ছোট্ট একটি সুন্দর ডেস্ক উপহার দিয়েছিলে তার ওপরেই কাগজ রেখে আমি তোমায় চিঠি লিখচি।

বিছানায় আমি তিন দিন পড়ে। বিছানার কথা আজকাল প্রায় সব সময়েতেই ভাবি—এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নেতেও তা বাদ যায় না। ভাবি বিছানা আমাদের সারা জীবনকে করে রয়েচে আচ্ছন্ন…বিছানাতেই আমরা জন্মাই, এর উপরেই আমরা থাকি বেঁচে, আবার মৃত্যুর সময়েও আমরা উপভোগ করি এর সুমধুর ক্রোড়—প্রিয়ার মত আমাদের শরীরকে এ করে থাকে বেষ্টন।

তুমি আমার বিছানাকে চেন, কিন্তু জান কি বন্ধু গত তিন দিনের ভেতর আমি এর কতটা তথ্য আবিষ্কার করেচি; আর তার ফলে একে আমি কতটা ফেলেচি ভালবেসে? কত লোক আমার আগে এর উপর করে গেছে আধিপত্য আর যাবার সময়েও তারা যেন রেখে গিয়েচে নিজেদের কিছু কিছু অংশ এর ওপর!

বন্ধু! আমি বুঝি না লোকে কেন কেনে নতুন বিছানা—কেন কেনে স্মৃতিহীন কাপড়ের স্তুপ? হয়ত আমার এই নগণ্য বিছানার ওপরেই জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত অনেক লোকেই করে গিয়েছে অধিকার। বন্ধু ভাব একবার—না ভাবা নয় অনুভব কর একবার সে সব কথা। তাদের জীবনের ওপারেও কর একবার দৃষ্টিপাত—যাদের জীবন এই চারটে খুঁটির ওপরকার বিছানায়, এই ঝালরের এম্ব্রয়ডারি করা মানুষের মূর্ত্তিগুলো কত না বছর ঘরের ভেতর হয়েছে অতিবাহিত। এই ঝোলান ঝালরের ওপরকার এম্ব্রয়ডারী করা মানুষের মূর্ত্তিগুলি কতনা বছর ধরে দেখে এসেচে কত জীবন নাটকের আবির্ভাব ও তিরোধান।

এই বিছানায় উপস্থিত একটি তরুণীর দেহ এলিয়ে রয়েছে।

সময়ে সময়ে সে ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ফুপিয়ে ওঠে আবার মাঝে মাঝে চীৎকার করে কাঁদে। তার পাশে আবার এখন দেখা যায় একটি নবজাত শিশু, যে শুধু বেড়ালের মত অস্পষ্ট মিউ মিউ শব্দ ছাড়া আর কিছুই পারে না সেই তরুণীটিই দিয়েচে এর জন্ম ...আর সেই শিশুটির ছোট্ট মা তার দিকে চেয়ে নিজের যন্ত্রণার কথা অনেকটাই যায় ভুলে। আনন্দের আতিশয্যে এই নতুন মাটির নিঃশ্বাস প্রায় হয়ে আসে রুদ্ধ: হৃদয়ের আনন্দ যেন ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গলে দুই চোখ দিয়ে ঝরে যায়।

তার পর এখানে আছে দুই প্রেমিক—জীবনে যারা এই প্রথম হয়েচে মিলিত। আনন্দে তারা কাঁপচে, আর আরও নিবিড়ভাবে নিজেদের পরশ উপভোগ করতে,—উপভোগ করতে তাদের পরস্পরের দেহের মৃদু উষ্ণতা! তাদের পরস্পরের ঠোঁট বারে বারে হচ্ছে মিলিত, আর সেই স্বর্গীয় চুম্বন তাদের দুজনকে মিলিত করচে অভিন্ন একটিতে!

যে বাহুপাশ দুই পৃথক শরীরকে একটিতে পরিণত করে, মিলিত করে পরস্পরের আত্মাকে—তার চেয়ে আর কি আছে মধুর কি আছে পবিত্র? দুজনের দেহ যেন তখন একই, দুজনের চিন্তার ধারাও অভিন্ন —প্রেম তাদের ঝরে পড়চে স্বর্গীয় জ্যোতির মত।

এবার বন্ধু ভাব একবার মরণের কথা—তাদের কথা একবার ভাবো বন্ধু যাদের শেষ নিঃশ্বাস এর ওপর পড়েচে লুটিয়ে...যন্ত্রণা যাদের এর ওপর উঠেচে গুমরে! সমস্ত সুখ দুঃখের, সমস্ত আশা নিরাশার, সমস্ত প্রীতি ভালবাসার সমাধি হয়েচে যাদের এই বিছানায়! কত হাসি কান্না এর ওপর রয়েচে ছড়িয়ে, কত দুঃখ-যন্ত্রণা এর ওপর রয়েচে বিছিয়ে,—অতীতের দিকে কত বাহুই না রয়েচে প্রসারিত! গত কত বছর ধরে কত মৃত্যু কাতর মুখ, কত পাণ্ডুর ঠোঁট, কত জ্যোতি-হীন চক্ষু এই বিছানার ওপরেই গিয়েচে মিলিয়ে, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব গিয়েচে চুকে—এই বিছানার ওপর বসে, বন্ধু, তোম'কে আমি এই দীর্ঘ পত্র লিখচি!

এই বিছানাই হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রতিলিপি: এই সত্যই ধরেচি আমি আবিষ্কার গত তিন দিন ধরে। —বিছানা শুধু সুখকর মুহূর্ত্তগুলি অলস তন্দ্রায় কাটিয়ে দেবার জন্যে নয় বন্ধু! কিন্তু এর প্রয়োজন দুঃখ কষ্টও ভোগ করবার জন্যে—জীর্ণ দেহের চির-শান্তির স্থল এই বিছানা।

কত চিন্তাই আমার মনে এখন উদ্বেল হয়ে উঠেচে বন্ধু! তাদের সমস্ত গুলি আমার মনেও থাকে না। তাছাড়া আমি আবার পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েচি—এখন আমার পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে পেছনের বালিসগুলোকে সরিয়ে পা ছড়িয়ে একটু ঘুমনো: একটু বিশ্রাম।

কিন্তু নিশ্চয়ই কাল তিনটের সময় আম'কে দেখতে এসো। লক্ষ্মীটি—ভুলো না যেন। হয়ত' কাল আরও একটু ভাল হব, আর তার যথেষ্ট প্রমাণও বোধ হয় দিতে পারব

এই যে আমার হাত তোমার চুম্বনের প্রতীক্ষায় প্রসারিত, আমার চোখও সে নেশায় হয়ে এসেছে মুদ্রিত।

বিদায় বন্ধু-আমি।

বিরহী

কুমারী ফাল্গুনী রায়

রোদের তাপে মাঠটি যখন ঘুমায় আপন মনে,
ঘুঘুর প্রাণ উঠল কেঁদে—ধরল কাঁদন অকারণে।
ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া
ডাকল তার গোপন প্রিয়া,
ঘুঘু অমনি মেলল পাখা
মিলবে সে যে প্রিয়ার সনে

রঙ্গিন স্বপন উঠছে জেগে ঘুম্-মাখানো আঁখির পাতে
হৃদয়-বীণা উঠল বেজে হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ার সাথে।
সে যে তার চোখের তারা
থাকতে পারে তাকে ছাড়া?
চলছে সে যে প্রিয়ার কাছে
(সে) দোল দিয়েছে মনের বনে।

দেশের নারীহরণ সমস্যায় সমাজের কর্ত্তব্য

শ্রীকনকলতা ঘোষ

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নারীহরণের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ইহা যে একটী গুরুতর সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

যে কোন সুসভ্য দেশের পক্ষে ও তাহার প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক বর্গের পক্ষে এবং তথাকার সুশিক্ষিত জন সমাজের পক্ষে এইরূপ ঘটনার সংখ্যাধিক্য অতীব লজ্জাকর কলঙ্কের ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্বোপরি সমস্ত নারীজাতির নিকট ইহা অত্যন্ত অপমানকর সংবাদ সন্দেহ নাই। যাহারা অপহৃতা হয়, তাহাদের তো কথাই নাই, পরন্তু তাহাদের স্বজাতীয়া মাত্রেরই এই সব শোচনীয় ব্যাপারে অতিশয় লজ্জিতা ও ব্যথিতা হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি।

'নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' যে দেশের শাস্ত্রবাক্য সে দেশে নারীর এবম্বিধ লাঞ্ছনার প্রাবল্য বড়ই পরিতাপের বিষয়।

যাহাতে অচিরে এই সকল শোচনীয় ঘটনার অবসান হয়, তাহার জন্য সকলের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

এই সকল ব্যাপারের অবসান যাহাতে শীঘ্র হয়, তাহার জন্য যাঁহারা যে ভাবে সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া বিবেচনা করি, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। আশাকরি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিলে অচিরেই নারীহরণ সমস্যার সুসমাধান হইতে পারে। যে সকল দুর্ব্বৃত্ত লোক আপনাদের কুপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য, প্রতিনিয়ত সমাজে ও সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে, ও বহু নারীর মর্য্যাদাহরণ করিয়া তাহাদের জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত ভয়াবহ কঠোর দণ্ডাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া শক্তিমান শাসকবর্গ তাঁহাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে ও দেশবাসীর অন্তর হইতে নারীহরণ জনিত আতঙ্ক উদ্বেগের ভাব বিদূরিত করিয়া তাহাদের ধন্যবাদ ভাজন হইতে পারেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দেশহিতৈষী সদস্যবৃন্দ বিশেষ যুক্তি দেখাইয়া এবিষয়ে কঠোর আইন প্রণয়নের জন্য গভর্ণমেণ্টকে উৎসাহিত করিতে পারেন। নারীরক্ষা সমিতির কর্ম্মাগণ পুলিশের সাহায্য লইয়া অপহৃতা নারীগণের সত্বর অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের আশ্রয় দান করিতে ও যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতে, এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইয়া যথার্থ 'নারীরক্ষা সমিতি' নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারেন। অবশ্য, তাহাদের কার্য্যে দেশের ধনবানগণের সাহায্য ও সহানুভূতি থাকা আবশ্যক, নতুবা তাঁহাদের পক্ষে ব্যাপকভাবে কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীগণ সংবাদ পাইবা মাত্র সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যথাসম্ভব তদন্ত করিয়া অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও অপহৃতা নারীর উদ্ধারসাধন করিয়া পরে অন্যান্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্বের ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

এই সকল হইতেছে ঘটনাগুলির বর্ত্তমানতা সম্বন্ধীয় কথা।

ভবিষ্যতে যাহাতে আবার ঐ প্রকার শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত না হইতে পারে, তজ্জন্য চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা সকল সমাজের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করা যায়না। যে সমাজেরই হইক না কেন, 'কুলনারী হরণ' অতিশয় নিন্দনীয় লজ্জা ও অপমানকর ব্যাপার, সুতরাং দশের সম্মিলিত চেষ্টায় ও কর্ম্মতৎপরতায় যাহাতে সত্বর বঙ্গদেশ

হইতে মনুষ্যত্বের অপহ্নতকারী এই সকল শোচনীয় ব্যাপারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহার জন্য সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে, আপনাপন গৃহের অল্পবয়স্কা কন্যা বধূ প্রভৃতির পথে যাতায়াতের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

অসতর্ক হইলে যেখানে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, সেখানে মেয়েদের একা বা অসহায় ভাবে নিদ্রা যাইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। গৃহের প্রবীণ গণের উচিত বুঝিবার মত বয়স হইলেই আপনাদের কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া সকল মেয়েদের মনে নিজ নিজ ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা বোধ সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান জন্মাইবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া, সহায়তা করা।

তাহাদের আপনাপন সতীত্ব ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সহজভাবে মেয়েদের বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যুবকগণের কর্ত্তব্য, সংযত চরিত্র হওয়া, এবং নিজ পরিবারস্থ নারীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

আত্মীয় বা অনাত্মীয়া কাহাকেও কোনো প্রকারে বিপন্ন দেখিলে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় সুখ স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া, যুবকগণের পক্ষে মহত্বের ও সৎসাহসের পরিচায়ক, এবং মানবতার আদর্শে ইহা তাহাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গবিশেষ, এ কথা শিক্ষিত যুবকগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক।

সকল অবস্থার উপযোগী করিয়া আপনাকে গঠিত করিবার জন্য ও আকস্মিক বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লাভ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে শিক্ষালাভ করা, শক্তিসঞ্চয় করা ও চিন্তা করা যুবক যুবতীর সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা নারীর কর্ত্তব্য আপনাকে শক্তিময়ীভাবে গঠিত করা, যাহাতে কোন লোক তাহাকে আপনার ভোগলালসা মিটাইবার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিতে সাহসী না হয়। সতীর তেজ পতিতের পাপ প্রবৃত্তিকে যেন পরাস্ত করিতে পারে। কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কেহ যেন প্রলুব্ধ করিয়া বা ছলনা দ্বারা ভুলাইয়া লইয়া গিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে না পারে তাহার জন্যও নারীগণের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। পথে ঘাটে যেমন ভাবে চলিলে বা যে সময়ে জন বিরল পথে একা বাহির হইলে দুষ্টলোকের মন উত্তেজিত হয় বা তাহারা সুযোগ সুবিধা পায়, সেরূপ ভাবে বা সেরূপ সময়ে নারীদের অসাবধান ভাবে পথে বাহির হওয়া সমিচীন নহে। অত্যাবশ্যকীয় কারণ ব্যতীত অল্পবয়স্কা নারীদের সন্ধ্যায় বা দ্বিপ্রহরে একা একা (উপযুক্ত, সাহায্য করিতে সমর্থ পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গগ্রহণ না করিয়া) নির্জ্জন পথে বাহির হওয়া উচিত নহে।

অনেক সময় সংবাদ পাওয়া যায়, দুর্বৃত্তেরা মিথ্যা-কথায় ভুলাইয়া মেয়েদের কুলের বাহিরে লইয়া যায়। কিন্তু প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মত নারীহরণ ব্যাপারের সংবাদ অবগত হইয়াও কিরূপে যে কোনো কোনো নারী দুষ্টলোকের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু বা বিশেষ পরিচিত আত্মীয় ভিন্ন অপর কাহারো কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সহসা তাহার সহিত মেয়েদের পথে বাহির হওয়া উচিত নহে। জরুরী প্রয়োজন বলিয়া বুঝাইলেও বাটীস্থ গুরুজনগণের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সহসা ভাবাবেগে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিতে যাইলে বিপদ অনিবার্য্য হইতে পারে, একথা সকলেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক। কোনো সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে তাহার সকল দিক যথাসম্ভব আলোচিত হওয়া দরকার বলিয়া মনে হয়। অনেক গৃহে বালিকা বধূর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন হইয়া থাকে; অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে প্রতিকারের পথ না পাইয়া বাধ্য হইয়া অনেকে কাহারো সাহায্য লইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়, এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে। যাহাতে ঐরূপ ঘটনা না ঘটিতে পারে, বধূ নির্য্যাতনকারীগণের তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

যে সকল বধূরা গৃহে লাঞ্ছনা অপমান লাভ করেন

তাঁহাদের যথাসাধ্য ধীরভাবে উহার প্রতিকারার্থে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, আবশ্যকস্থলে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের পথ গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া বর্ত্তমান দুঃখকষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বা অন্যের প্ররোচনায় ভুলিয়া কুলত্যাগ বা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া আপনার ভবিষ্যজীবন বিষময় করিয়া তোলা কোনো নারীর পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারিলে সকলের পক্ষে কল্যাণকর হয়।

বর্ত্তমান যুগে নীতি ধর্ম্ম শিক্ষা, যাহা মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহা লাভ করা ছেলেমেয়েদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান, সংযম শিক্ষা এই সকল না লাভ করিতে পারিলে অনেকের পক্ষেই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব অসংযত চরিত্র হওয়া স্বাভাবিক হয়। সেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিয়া কেহ প্রকৃত শান্তি-লাভের পথ খুঁজিয়া পায় না। ভুলপথে যাইয়া শান্তিতে গিয়া অশান্তির ভার বৃদ্ধি করে মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যকীয় বোধে এই কথাগুলি লিখিলাম। আজকাল বিদ্যালয়ে যাইয়া ছেলেমেয়েরা নানাপ্রকার বিদ্যালাভ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সেখানে নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার অত্যন্ত অভাব হয় পরিলক্ষিত হয়। গৃহেও সকলে সৎদৃষ্টান্ত দেখিতে বা সুশিক্ষালাভ করিতে পারে না; যাহারা তাহা পায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সৎলোক হইতে, ধর্ম্মজীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে।

এই সকল কারণে মনে হয় যাহাতে স্কুল কলেজ-গুলিতে নানাপ্রকার শিক্ষার সহিত, ছেলেমেয়েদের প্রকৃত আত্মোন্নতিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়, দেশ ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের তজ্জন্য সাগ্রহে অগ্রসর হওয়াও বিশেষ আন্দোলন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

পরানুকরণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, বিচার বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছাচারপরায়ণ হওয়া, কাহারো পক্ষে কল্যাণকর নহে। কোনো সমাজের অধীনস্থ নরনারীর পক্ষেই আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেওয়া গৌরবজনক কার্য্য নহে। যুগোপযোগী ভাবে আপনা-দের সমাজকে গঠিত করিয়া লইতে পারিলে সকল দিকেই মঙ্গল হয় বলিয়া মনে করি। এইরূপে সকল দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা ও সত্বর সামাজিক অবস্থার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের সমাজের এই সকল ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্যের অপরাধে, সমাজ-চ্যুতা অসহায় নির্দোষ নারীগণকে সমাজে গ্রহণ করা পাপ না পুণ্যের কার্য্য? এবিষয়েও বিবেচনা করিবার দিন আসিয়াছে।

চলার পথে

শ্রীপ্রতিভা বসু

ওরে আঁধার নিশার যাত্রী, তোদের
অন্ধকারে নাইবে ভয়,
সামনে তোদের তরুণ ঊষা
স্নিগ্ধ উজল আলোকময়।
চলার পথে চল্ এগিয়ে
পিছন পানে চাস্‌না আর,
আসুকনারে হাজার বাধা
মানবে সে যে মানবে হার।

আজ শুধু দেখ জগৎ মাঝে
কোথায় তোদের রইল স্থান,
কোন্ সে যাগের হোমানলে
আত্মাহুতি করলি দান।
সকল বিপদ কেটে গিয়ে
হবে তোদের হবেই জয়,
ধৈর্য্যকে নে সঙ্গী করে—
ওরে তোদের নাইরে ভয়।

প্রথম দর্শনে

—গল্প—

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল্

যখন 'চিত্রবেণু' টকীতে 'কর্ণকুন্তলার' অভিনয়,—অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল, তখন সহরময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল।···নিকাশ রায় ওরফে মিঃ রায় ভাবেন,—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে যখন ওই একই কথা,—তখন ইহা না দেখিয়া আর থাকা যায় না। টকীর কথা উঠিলেই, বন্ধুদিগের মজলিসে তাঁহাকে একেবারে নির্বাক বনিয়া যাইতে হয়।

দু'দিন আগে হইতেই টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা চলিল। কিন্তু আট আনার টিকিট্ত পাওয়া গেলই না,—উপরন্তু এক টাকারও। নিকাশের মনে হয়,—দেখিতেই হইবে—দু'টাকাও যদি লাগে, তা দিয়াও।

···তখন···"শো" আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,—প্রায় ১৫ মিনিট্ আগে। হলঘর আঁধারে ভরপুর। বিলম্বে প্রবেশ নিষেধ'—অন্ততঃপক্ষে কমিকটা শেষ না হইলে। বুঝি বা নিকাশের কপালে, প্রথম প্লেটা বাদই যায়।

বোঝার উপর শাকের আঁটি, আরও গণ্ডা কয়েক পয়সা গেটকীপারের হস্তে ঘুষ দিয়া নিকাশ ঢুকিয়া পড়িলেন। গেটকীপার পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন,—দেখবেন যেন গোলমাল না হয়।

নিকাশ চলিলেন,—কুঁজো হইয়া বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে। অন্ধকারে 'আবছা' 'আবছা' দেখা যায়,—হ্যাঁ, ওইতো সীট্ তাঁহার,—খালিই বটে।...কী সুন্দর বন্দোবস্ত উঁহাদের; যেন পায়রার ঠোঁটে দিয়া চিঠি পাঠানর মতন!...গুঁড়ি মারিয়া সীটের নিকট পৌছিতেই তিনি পিছন হইতে উহার উপর ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কারুকি অত করিয়া দেখার? এখনই হয়ত পিছন হইতে কে আপত্তি তুলিবে।

বামপার্শ্ব হইতে জনৈকা মহিলার সহসা অস্ফুট আর্তনাদ করিলেন। তাইত! নিকাশ সীট্ হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অমনি পশ্চাৎ হইতে শব্দ উঠিল,—'অর্ডার! অর্ডার!' নিকাশ বেচারী এখন যান্ কোথা? সীটের সামনে নিকাশ ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তবুও বামা কণ্ঠের আর্তনাদ্ থামে না! বামার চরণ দুইটা ধরিয়া চুপ করিতে বলিবেন কী?

মিঃ রায়ের সীট্টা খালি পাইয়া, তাহার উপর পা দুইটা আরামে রাখিয়া দিয়া, মহিলাটী অভিনয় দেখিতেছিলেন। মিঃ রায় তবু বদ্ধ হস্ত দুইটী, প্রসারিত করিয়া দিয়া, নিকাশ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—চুপ করুন, মহিমময়ী, চুপ করুন, অন্ধকারে ঠাওর পাইনি।

চুপ করিবার পাত্রীই বটে! হালফ্যাসনে সজ্জিতা যুবতী,—ক্রোড়ে একটা হাতব্যাগ,—পরণে এক রঙিন শাড়ী। যুবতী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—you nonsense!

নন্‌সেন্স! সত্যই কী তাই!···তাই, বটে! তাহা না হইলে অমনতর উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,—অন্ধকারেও যাহার দীপ্ত ছুটে, তাহার প্রতি তাঁহার হুঁস্ করা আগে উচিত ছিল বৈ কি! নিকাশ দমিয়া গেলেন। আহত স্থানে যুবতীকে হস্ত বুলাইতে দেখিয়া বলিলেন,—বড্ড চোট্ লেগেছে, ক্ষমা করুন।

"Shut up, you"—(চুপ কর তুমি—) বাকীটা অস্পষ্টভাব,—যুবতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

তখনও "কর্ণ-কুন্তলা" আরম্ভ হয় নাই,—একটা কমিক্ চলিতেছিল।···অভিনয়ের কলা কৌশলে, রস-সৌন্দর্য্যে নিকাশের চিত্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। একটী গান ভাল লাগায়, স্বপ্নাবিষ্ট নিকাশ মৃদু তালে শীষ দিতেছিলেন, গানটির তালে তালে সুর মিলাইয়া। সহসা পার্শ্বদেশ হইতে আপত্তি জাগিল,—'উহু'। সন্ত্রস্ত হইয়া নিকাশ শীষ বন্ধ করিলেন।···কিন্তু মহিলাটী মৃদু হাসিয়া ফেলিলেন,...'কর্ণকুন্তলা আরম্ভ হইয়া গেল।

কতক্ষণ যায়...মৌতাতের আশায়, একটা সিগারেট

ধরাইয়া, নিকাশ ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন,—আবার মহিলাটী আপত্তি তুলেন,—Not in the face of a lady, Babu অর্থাৎ কী না, মহিলার মুখের ওপর নয়, বাবু ম'শাই। নিকাশ ভাবেন, একী আঘাতটার উম্বল নাকি?

নিকাশ তাড়াতাড়ি, সিগারেটটা ফেলিয়া দিলেন। এতক্ষণে অন্ধকারটা বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনকালে, নিকাশের বোধ হইল,—মহিলাটী সত্যই অকসফোর্ডের এডিসনের জনৈকা নবীনা বঙ্গ-বালা,— চুল পর্যন্তও তাঁহার বব্ করিয়া ছাঁটা—শ্রীবদন হইতে ইংরাজী তো অনর্গল চলিতেছে! ইঁহারই শ্রীপদ তিনি মর্দ্দন করিয়া ফেলিয়াছেন? তাঁহার অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত।'

'ইন্‌টারভাল' হইলে, বিজলীবাতি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিকাশ সহর্ষে দেখিলেন,—যুবতী একাকিনী, দুই একটী আলাপ করা যায় না?—বিশেষ যখন তিনি তাঁহার নিকট অপরাধী। ক্ষমা-প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে একান্তই উচিত,—না চাওয়াটা হইবে যে ভদ্রতা বিরুদ্ধ যে যাহা বলুক, নিকাশ সব সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু··· অভদ্র? কেহ যেন না বলে তাঁহাকে—বিশেষ নারী-সম্ভ্রম ঘটিত ব্যাপারে। তবে আগুন! আগুনে হাত দিয়া হাত পুড়াইবেন?···তবু···ক্ষমাটা চাহিতেই হইবে?

ভয়ে ভয়ে, নিকাশ বলিলেন,—আপনি ক্ষমা না করলে, আমার প্রাণ শান্ত হবে না। উত্তর কিন্তু সোজা হইল না,—পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যুবতী উলটা প্রশ্ন করিলেন,—কখনও টকী দেখেন নি, বুঝি? কী শ্লেষ! টকী সুরু হওয়া অবধি, সত্যই তো নিকাশ টকী দেখেন নাই—হাঁ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিই বটে! নিকাশ সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই মহিলা বলিলেন,—You seem so (তোমাকে দেখে তাই মনে হয়)।

জানেন কি, মিস্,—না, না,—ইয়ে কি বলে, ম্যাডাম্, আমি কল্‌কেতায় বাস কোরেও, একটু সেকেলে।

"Oh, no, no, your get up does not speak so." অর্থাৎ কি-না, তোমার বাহিরটা সেরূপ নয়।

তবু ভাল! এতটুকু সুখ্যাতিও পাওয়া যায়!

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিকাশ বলিলেন,—তাইত? আবার ওপক্ষ হইতে ঝঙ্কার উঠে,—You seem to be frugal and moderate অর্থাৎ কি-না তুমি মিত-ব্যয়ী অর্থাৎ কি-না বায়স্কোপ টকিতে পয়সা খরচ করনা। আবার শ্লেষ?

মেয়েটী এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে চিনিয়া ফেলিল কি করিয়া! হতাশ হইয়া নিকাশ আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—might be, miss (হতেও পারে)।

শুধু মিস্ বলায় যুবতী বেশ খুসী যেন,—দেখা গেল। তাহার পর ইংরাজী-বাঙ্গলায় মিশ্রিত ভাষায় যে সব কথোপকথন উভয়ের মধ্যে হইল, তাহার সার মর্ম্ম এই.—মিসটি সপ্তের সপ্তাহ ব্যাপী অভিনয় মধ্যে মাত্র সাতবার অভিনয়টী দেখিয়াছেন তবু তৃপ্তি হয় নাই সমস্ত প্লেটা মুখস্থ করিয়া ফেলিলে ভাল হয় যেন।

পুনরভিনয় চলিল।—কতক্ষণ যায়! নিকাশের মন আবার কখন স্বপ্ন রাজ্যে তলাইয়া যায়!—শুধু মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তিনীর অস্তিত্ব মনে জাগে,—তাই অন্যমনস্ক ভাবে, সিগারেট্ ধরাইতে গিয়া, নিকাশ কয়েকবার থমকিয়া উঠেন,—সিগারেটটা মুঠার মধ্যেই রহিয়া যায়। আর লেডী? —মুখে রুমাল গুঁজিয়া শুধু মুচকি হাসেন—কী দুষ্ট!

···নায়ক-নায়িকার আকস্মিক বিচ্ছেদ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই, যখন অন্য বিষয়ের অবতারণা আরম্ভ হইল, তখন নিকাশ উঠিয়া পড়িলেন। গেট্‌টীপারের কাছ বরাবর যাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিকাশ আরামে সিগারেট্ ফুঁকিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নট-সম্রাট্ উদয়-শঙ্করের প্রচলিত প্রলয় নৃত্য দৃশ্যে সংযোজনা হইয়াছে বলিয়া দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে অস্ফুট কলরব শোনা গেল—ওটাত ভাল করিয়া দেখা চাই!—নিকাশ দ্রুত ফিরিলেন,—নৃত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই—কখন্ নিজের সীটের কাছ-বরাবর আসিয়া পড়িয়াছেন—

মুখের সিগারেট্‌টী তখনও অর্দ্ধ-দগ্ধ মাত্র!—লেডীকে দেখিয়াই, মুখ হইতে ধূমায়মান্ পদার্থটীকে হস্তে লইয়া, পায়ের নীচে ফেলিয়া নিভাইয়া দিলেন।

নিকাশের অঙ্গ ভঙ্গী সন্দর্শনে লেডী হাসিয়া উঠিলেন,—হাসির স্বর নৃত্য-গীতের সুরতালে মিশিয়া গেল। মৃদুস্বরে বলিলেন,—Are you satisfied with the smoke babu (ধূমপানে তৃপ্ত হয়েছেন?)

সীটে বসিতে বসিতে হাসিয়া নিকাশ বলিলেন,—ধন্যবাদ্ মিস্।

অনেকক্ষণ নিকাশ লেডীর বিরক্তি-ভয়ে কোনও দিকে মুখ ফিরায় নাই অভিনয়ে ক্রমশঃ সে মনটা ভাসাইয়া দিয়াছিল—

পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িলে, সহসা নিকাশের চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখেন—লেডীর হাতব্যাগটি সীটে পড়িয়া আছে শুধু,—অধিকারিণী নাই,—কখন্ বাহির হইয়া গিয়াছেন। ভাবিলেন,—হয়ত কোনও দরকারে বাহিরে গিয়াছে।—

এই আসে, এই আসে আশায়। তাঁহার মনটা ব্যাগ হইতে অভিনয়ে পুরা নিবিষ্ট হইতে চাহিতেছিল না। পার্শ্ব দেশ বা পশ্চাৎ হইতে কেহ যদি উহা সরাইয়া ফেলে—

সিগারেটের আলোয় নিকাশ নিজের হাত ঘড়িটা দেখিলেন—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হইতে যায়, লেডী বাহিরে গিয়াছেন। এখনও সে আসেনা কেন?

অবিবাহিত যুবক তিনি,—দায় ঝঞ্ঝাট কখনও পোহাইতে হয় নাই…তাঁহার পক্ষে এ আবার কি হইল! মনের ভাবিলেন—ব্যাগটা হাতে করিয়া বাহিরটা একবার খুঁজিয়া আসিলে হয়না?

অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল। একে একে সব লোক চলিয়া যায়। নিকাশ শুধু দাঁড়াইয়া,—ব্যাগটা অগুলিয়া।…

হলঘর জনহীন হইলে, নিকাশ ভাবিলেন, আর কেন? বৃথা! নিকাশ ব্যাগটা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু এখন…কি করা যায়, ওইটা লইয়া? আফিস ঘরে জমা দেওয়া—নাঃ, সে আইডিয়া একেবারে বিশ্রী!…যাহার কোমল চরণে তিনি অজ্ঞাতসারে বেদনা দিয়াছেন এবং সে বেদনা,কল্যই হয়ত,—হয়ত কেন, সুনিশ্চয়ই, টন্‌টনে অনুভূত হইবে…আহা, সে কী কষ্টই হইবে তাহার। তাহার অতটুকু হতভাগ্যের ঝঞ্ঝাট্‌টা তিনি পোহাইতে পারিবেন না?

অতএব ব্যাগটুকু তিনি রাখিবেন,—অধিকারিণীর নিকট অক্ষতদেহে পৌছাইয়া দিবেন! কিন্তু ঠিকানার কি হইবে? যুবতীর ঠিকানাটা কিরূপে জানা যায়, ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রেক্ষাগৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।…

মোড় ঘুরিতেই, সহসা নজরে পড়িল,—দৈনিক "ব্যাক্-ওয়াচ" আফিসের সাইনবোর্ডটা,—খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা।…মনের মধ্যে একটা উপায় খেলিয়া গেল। দোতলার উপর, "ব্যাকওয়াচের" অফিস ঘরে, সটান্ উঠিয়া গিয়া, ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া নিম্নের বিজ্ঞাপনটী প্রাতের সংস্করণ জন্য, লিখিয়া দিলেন,

"গত-কল্য, চিত্র বেণুর সন্ধ্যার অভিনয় কালে, কেবা কাহারা একটা লেডিজ হাতব্যাগ ফেলিয়া গিয়াছেন। প্রমাণ সহ স্বয়ং উপস্থিত হইলে, মালিককে উহা দেওয়া হইবে। ইতি এন্ রায়—নং দরমাঘাটা ষ্ট্রীট্।"

প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, দুইটি মুদ্রাও তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলেন। রেট কমাইবার জন্য, বিস্তর বলাতেও ম্যানেজারের হৃদয় কিন্তু দ্রব হইল না।…

পরদিন সমস্ত দ্বি-প্রহরটায় তাঁহার মন বড় চঞ্চল হইয়া রহিল। আহা! লেডীটা যদি তাঁহার বাটী আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়!…

সওদাগরী অফিসের একজন বড় কর্ম্মচারী তিনি,—তাঁহার হাতেই সব কিছু, কাজেই সহকারী কর্ম্মচারীকে বলিয়া, একটা অছিলায়, এক ঘণ্টা আগে বাটী চলিয়া আসিতে তাঁহার কিছুই বাধা রহিলনা।…

সদরে ঢুকিয়াই দেখিলেন,—রহস্যময়ী, রূপের আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, তাঁহার ড্রাইংরুম্‌টী আলো করিয়া, একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন!

মিঃ রায় টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলেন। শিক্ষিতা মহিলা প্রত্যভিবাদন করিতে ভুলিলেন না।

আগেই মহিলা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় বলিলেন,—কাল রাত্রি আটটার গাড়ীতে মামা হাবড়া ষ্টেসনে নাম্‌বেন মনে পড়ায়, তাড়াতাড়ি ভুলে ব্যাগটী ফেলে গেছলাম, মিঃ রায়। যখন মনে পড়ল, দেখি ৯ টা শো'টা শেষ হয়ে গেছে।

বাধা দিয়া মিঃ রায় কিন্তু ইংরাজীতে বলিলেন, —বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার নাম ঠিকানাটা আমার জানা ছিলনা, নইলে, ঐ রাতেই

বাধা দিয়া মিস্ বলিলেন—কী আশ্চর্য্য! আমার নাম ঠিকানা যে ওই ব্যাগেই ছিল দেখেন নি, বুঝি?

উদাস ভাবে, মিঃ রায় বলিলেন—না।

—আমার নাম মিস্ ডলি গুপ্ত,—ঠিকানা ১৭নং পার্ক স্কোয়ার; ব্যাগখানা আনলেই দেখতে পাবেন,—ওর মধ্যেই আমার নামেই কার্ড ছিল।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আনাব বৈ কী! বলিয়া 'বয়' বলিয়া ভৃত্যকে হাঁকিলেন। ভৃত্য আসিলে, মিঃ রায় আদেশ করিলেন,—হামরা বেড রুম্‌কে টেবল পর যো বেগ রাখা হুয়া হ্যায়, উসকো লে আও তুরন্ত।

'যো হুকুম' বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল।

চম্পকাঙ্গুলি, ভৃত্যের উদ্দেশে করিয়া মিস্ ডলি হাসিয়া বলিলেন,—এমন নারী বিবর্জ্জিত দেশে (মিঃ রায়ের বসত বাটীটা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া), বাস কোরেও আপনি কিন্তু, ওই চাকরটাকে এমন কেতা দুরস্ত কোরেছেন যে, সে জানে কেমন কোরে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে সভ্য সমাজের উপযোগী সম্ভাষণ ও সদ্ব্যবহার কোরতে হয়।

—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, মিস্। ওটা, আমার ব্যারিষ্টার মামার পুরাণ চাকর। রেঙ্গুনে যাবার সময় ওটাকে আমায় দিয়ে গেছেন।

মিস ডলি যেন সহসা অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইতি মধ্যে ব্যাগটী আসিয়া পৌছিলে' মিঃ রায় সসম্ভ্রমে অধিকারিণীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

ব্যাগটী খুলিয়াই মিস্ ডলি ঝটিতি একগোছা নাম লেখা কার্ড মিঃ রায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন,—ব্যাগটা খুল্‌তেন যদি, তা হলে খবরের কাগজের আশ্রয়টা নিতে হত না একখানা পোষ্টকার্ডের মারফৎই আপনার ঠিকানাটা পেতুম।

বলিতে বলিতে মিস্ ডলি, পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যাগের সমস্ত জিনিষগুলি একে একে বাহির করিয়া টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিলেন। একটা ছোট আয়না, একটা ছোট চিরুণী, রুজ পাউডার, পোমেটম আদি নারীর সৌন্দর্য্য রক্ষার ক্ষুদ্র সংস্করণের সরঞ্জাম সমূহ, ১খানা ১০০্ টাকার নোট ২খানা ৫্ টাকার ও কতকগুলি রেজকী টেবিলে শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ডাকযোগে প্রাপ্ত একটা ছেঁড়াখাম সমেত চিঠি ও একখানি পুরুষের ফটো সহসা ব্যাগ হইতে মেজেয় পড়িয়া গেল।

ফটো ও পত্রখানি কুড়াইয়া দিতে দিতে মিঃ রায় বলিলেন,—আমি নারীর গুপ্ত তথ্য জানবার কুতুহলকে কোনও কালেই প্রশ্রয় দিই না, মিস্। মিস্ ইঙ্গিতটা বুঝিলেন তাই সহসা মুখ তুলিয়া, মিঃ রায়ের মুখের উপর বিস্মিত-ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। — কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মিসের মুখের উপর যেন সহসা বিজলী খেলিয়া গেল। ললাট দেশ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,-পত্রখান আপনি দেখলেও কোনও ক্ষতি ছিল না,—কারণ ওখানি, পত্র প্রেরকের প্রলাপোক্তিতে পরিপূর্ণ! পত্র প্রেরককে আমি ঘৃণা করি! বলিয়া পত্রখানি দিকে ঠেলিয়া দিতে দিতে কহিলেন,—পড়ে দেখুন।

আজ্ঞে, ক্ষমা করুন, কোনও নারীর কোনও গুপ্ত তথ্যে আমার কোনও আগ্রহ নাই।

—নাই? আচ্ছা থাক্' বলিয়া পত্র ও ফটোখানি ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া মিস্ ডলি বলিলেন,—সত্যই আপনার কালচারে মুগ্ধ হয়েছি মিঃ রায়! আমাদের সমাজের পুরুষ গুলো উচ্চশিক্ষিত বোলে নিজেদের খুব জাহির করে বটে, কিন্তু আসলে তাদের অন্তরটা একেবারে, বিশ্রী, —যেন হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ জঙ্গলে সব! পত্রখানি যদি পড়তেন তা হলে ওরই মারফৎ, আমার কথাগুলোর তাৎপর্য্য বুঝতে পারতেন।—(তৎপরে পত্রপ্রেরককে উদ্দেশ করিয়া) আমি যেন ওর পরিণীতা হয়ে গেছি

এখনই, তাই আমার ওপর এত জোর, অপরের কথা নিয়ে আমায় কটূক্তি পর্য্যন্তও কোরতে লজ্জা করেনি ওর! মামার পিয়ারের লোক কি না, তাই বোধ হয়, এতদূর আস্পর্দ্ধা ওর। মামাকে দেখাবো বোলেই চিঠিটি রেখেছি, জানেন, মিঃ রায়

মিঃ রায় বলিলেন,—শিক্ষিতা মহিলার যে সম্ভ্রম বোঝেনা, সে হাজার শিক্ষিত হয়ে, সমাজের উচ্চস্তরে থাকলে সভ্য মানুষ নামের অযোগ্য।

—ঠিক বোলেছেন, মিঃ রায়। আপনি কিন্তু সত্যই মানুষ নামের যোগ্য। আপনার সভ্যতা অতুলনীয় বলিয়াই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তড়াক্ করিয়া মিস ডলি, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মিঃ রায়ের হস্তধারণ করিলেন। খুব খানিকটা করমর্দ্দন করিয়া মিস্ ডলি বলিলেন,—আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু—অন্তরঙ্গ বন্ধু হোলেন বোলে মনে রাখবেনা।

মিঃ রায়ের মাথাটা সহসা যেন ঘুরিয়া উঠিল, চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়া, মিসের হস্তখানি নিজের বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন,—আপনাকে বান্ধবী পেয়ে আমিও ধন্য হলেম।

উত্তেজনায় মিঃ রায়ের দেহখানি কেমন একটা পুলকের রোমাঞ্চে টল্‌টল্ করিয়া উঠিল। —ডলির হস্তখানি নিজের বুকের উপর আকড়াইয়া রাখিয়া সশব্দে পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার বুকের দ্রুত স্পন্দনটার একটুকুও ডলির নিকট গোপন রহিল না।

ডলি বলিলেন,—আপনাকে বড্ড অসুস্থ বোধ হচ্ছে, চলুন, আপনাকে ওপরে পৌছে দিয়ে আসি—বিশ্রাম কোরবেন।

মিঃ রায় উদাসভাবে বলিলেন,—ধন্যবাদ, মিস্, এমনই সেরে যাবে এখন্।

তবুও…মিঃ রায় পরদিন বন্ধুদের মজলিসে জোর গলায় বলিতে ছাড়িলেন না,—প্রেম বাতুলতা মাত্র।

অ-নামিকা

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

কে তুমি হৃদয় পাতে জ্বালো দীপ, দিবস-শর্ব্বরী
দিয়া রূপ ডালি—
আপনারে প্রেম-দীপে সঞ্চারিয়া প্রজ্বলিত করি!
পুণ্য অর্ঘ ঢালি—
কে তুমি জীবন-কুঞ্জে বাজাতেছ প্রেমিকার বাঁশী
দেহ-রূপালিতে,
যৌবন আগত মোর; প্রতিরোমে প্রেম পুষ্প-রাশি
নারে ডালি দিতে!
দেহের কামনা-গন্ধে উদ্বেলিত যৌবন আমার
রূপ হেরি তব,
হে মোর মানসী-বধূ ধ্বংস কর করুণার ভার
স্নিগ্ধ-অভিনব।

দিবসে ও নিশিমানে খুঁজি তোমা অন্তরের মাঝে
কামনারে স্মরি,
হে আমার কল্পলোক! আসেনি কি অন্তিমের সাঁঝে
রূপ-পরিহরি?
আজো কিগো তোমা লাগি ফিরিব সে কাননে কাননে
প্রেমিকের ক্লেশে—
নিরন্ধ্র পথের মাঝে আজো কিগো প্রেমিকার-সনে
কব কথা, হেসে?
স্বপ্ন-সম তব রূপ চক্ষে মোর করে যবে খেলা
অপরূপ-রূপে,
আমি দীন মোর বুকে ফুটে ওঠে আলোকের মেলা
চুপে, অতি চুপে।

আমার প্রিয়া

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার প্রিয়ার রূপের কথা না বলাটাই দেখছি ভালো,
কোকিল-ছানাও হার মেনে যায় এম্নি তিনি
নেহাৎ কালো!
কালো শুনেই চমকে গিয়ে সিঁট্‌কোনাক' তোমরা নাক
রূপই ধরায়, প্রাণ কিছু নয়; আচ্ছা—ওসব এখন থাক্!...
প্রথম যেদিন মিলন হ'ল আমার কালো প্রিয়ার সাথে
রুদ্ধ ব্যথায় গুম্‌রে মরি নেইকো হাসি বিয়ের রাতে!
সবাই বলে—দেখতে আমি সবার চেয়ে সত্যি ভালো,
সেই আমার-ই দগ্ধ ভালে জুট্‌লো কিনা বিষম কালো!
ঘৃণার বিষে ভ'র্‌লো হিয়া, সুখ কোথা সব গেল উপে,
বাসর-ঘরের মিষ্টি বাঁধন সব ছেড়ে হায় পলাই চুপে!...
ফুলশয্যা আস্‌লো যবে ফুলের মধু গন্ধে ভরি'
কিছুই ভালো লাগ্‌লো নাক' "কালোর" বালাই
নিয়েই মরি!
বৃথাই হ'লো দিন রাতে বৌ-দিদিদের আড়ি পাতা
চুপ্‌টি ক'রে র'লুম শুয়ে বড্ড আমার ধর্‌লো মাথা।
ব্যস্ত হয়ে নতুন প্রিয়া লাজ লজ্জা বিসর্জিয়ে—
বল্‌লে মোরে—"শুয়েই থাকো, ওডিকলোন্ মাথায় দিয়ে।
টিপ্‌বো তোমার কপালখানি যন্ত্রণা কি হ'চ্চে বড় ?"
বাঃ রে!—আমার 'কালো-কোকিল' সেবায় দেখি
বেশতো দড়।
হঠাৎ প্রিয়ার হাতটি ধীরে মিশলো আমার কপাল পরে—
ঘৃণার জ্বালা আপ্‌না হ'তে কমলো বুঝি ক্ষণেক তরে।
রঙের কথা গেলাম ভুলে বক্ষে নিয়ে তাহার মুখ,
সোহাগভরে অধর চুমি—শীতল হ'লো প্রাণের দু'খ।...

বছর দু'য়েক কাট্‌লো মোদের সুখের স্রোতে সদাই ভাসি
প্রেমের কাজল চক্ষে এঁকে প্রেমের নেশায় কেবল হাসি।
এমন মধুর মোহন-ছবি অদৃষ্ট কি সইতে পারে?
ধর্‌লো মোরে বসন্ত রোগ ভগবানের ন্যায়বিচারে!
শিব-অসাধ্য-রোগ এ দেখে আত্মীয় মোর সব পালালো
রইল শুধু 'পরের মেয়ে'—যারেই দেখি সবচে কালো।
বিষম ক্ষতে ভ'রলো দেহ চক্ষে নামে আঁধার ঘোর
সারাটী রাত একলা জেগে কর্‌লো সেবা সেই সে মোর!...
প্রিয়ার হাতের স্পর্শগুণে রোগজ্বালা সব সর্‌লো দূরে
তার পুণ্যেই জীবন পেয়ে গাইছি যে গান খুসির সুরে।
রূপের গরব যেটুকু ছিল ফর্সা আমার রঙটী ব'লে
আজ তারই হায় নেইকো কিছু রোগের সাথেই
গেছে চ'লে!

সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত চাঁদের সুধা অঙ্গে মেখে
প্রিয়ায় বলি—'শুন্‌ছো রাণু! এমনি ঘৃণা আমায় দেখে?
এই দেহ এই মুখটা আমার কী কুৎসিৎ দাগে ভরা,
যৌবনেতেই আমায় যেন ধর্‌লো এসে বিষম জরা!
উজ্জ্বল এই বর্ণ আমার হয়েছে আজ কতই কালো
এও দেখে কি তেম্‌নি ভাবেই বাস্‌বে প্রিয়া
আমায় ভালো?..

কইলোনা সে একটি কথা, রাখলো মাথা আমার বুকে
সুখের নেশায় হয়তো বুঝি মুদ্‌লে আঁখি গভীর সুখে!
সত্যিকারের ভালোবাসা এরাই বুঝি বাস্‌তে জানে,
সত্যিকারের মিলন হ'লো প্রিয়ার মনে আমার প্রাণে!

স্বরলিপি

কথা—শ্রীমতিলাল ধর   সুর—শ্রীশচিন দাস (মতিলাল) স্বরলিপি—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরে এসো বঁধু, এসো ফিরে,
স্বপন সাথে গোপন পথে
নিশীথ রাতের ধীর সমীরে ॥
নিবিড় আঁধারে ঢাকিলে নিশি
ঘুমাবে নীরবে যবে দশদিশি
আসিতে বঁধু বাঁশীটি বাজায়ে
চরণে চরণ ফেলিয়া ধীরে ॥
ঘুমিয়া পড়িলে নিঝুম রাতে
হাতটি বুলা'য়ো নয়ন পাতে,—
জাগিয়া উঠিব পরশে তোমার
বসিব তোমার পাশে অচিরে।
গাগরী ভরিতে চলিলে জলে
পাড়া পড়সীরা কত কি যে বলে
যেওনা বধু যেওনা তখন
যেওনা ভুলেও যমুনা তীরে ॥

মিশ্র বেহাগ   দাদরা

স্থায়ী

\+ . . | ০ . . I + . . | ০ . .
গমা গা মা | পা র্সা না I পা ক্ষপা মা | গা -া -া I
ফি০ রে এ | সো বঁ ধু এ সো০ ফি | রে ০ ০

সন্ সা পা | পা পা পা I মা পক্ষা গা | মা গা -া
স্ব প ন | সা থে ০ গো প০ ন | প থে ০

গা মা পা | না র্সর্রা না I পা ক্ষগা গা | মা গা -া I
নি শী থ | রা তে০ র ধী ০র স | মী রে ০

অন্তরা ও আভোগ

II গা মা পা | না না নধা I না র্সা র্সা | -া র্সা র্সা I
নি বি ড় | আঁ ধা রে ০ ঢা কি লে | ০ নি শি
গা গ রী | ভ রি তে ০ চ লি লে | ০ জ লে

ন্‌া র্সা র্গা | র্গা র্মা র্গা I র্সা নধা পা | হ্মগা মা গা I
ঘু মা বে | নী র বে য বে ০ ন | শ ০ দি শি
পা ড় প | ড় সী রা ক ত ০ কি | যে ০ ব লে

ন্‌া সা মগা | পা পা পা I [গনা] হ্মা ধপা হ্মা | গা মা গা I
আ সি ও ০ | ০ বঁ ধু বাঁ শী টি | বা জা য়ে
যে ও না ০ | ০ বঁ ধূ যে ও না | ত থ ন

গা মা পা | পা র্সা র্গা I র্সা নধা পহ্মা | গা মা গা II
চ র ণে | চ র ণে কে নি ০ য়া ০ | ধী ০ রে
যে ও না | ভু লে ও য মু ০ না ০ | তী ০ রে

সঞ্চারী

II গা মা গা | পা সা ন্‌ধা I হ্মা ধা সা | ন্‌া হ্মা সা I
ঘু মা য়ে | প ড়ি লে ০ নি ঝু ম | রা ০ তে

| গ গ গা জ্ঞা গা পা | গা -া গা] I
ন্‌া সা গা | পা পা পা I হ্মা পা দা | হ্মা -া গা
হা ত টি | বু লা য়ো ০ য় ন | পা ০ তে

ন্‌া সা গপা | পা পা পা I হ্মা ধপা হ্মা | মা গা গা I
জা গি য়া ০ | উ ঠি ব প র শে | তো মা র

গা গা মা | পা র্সা না I পা হ্মা গা | মা গা -া II
ব সি ব | তো মা র পা শে অ | চি রে ০

'আভোগ' অন্তরা ন্যায়; এজন্য আভোগ ও অন্তরা একত্র প্রদত্ত হইল

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলায় হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকারও অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

২০

ট্রেণ চলিতেছিল।

কামরার একপাশে দিদি উৎফুল্ল মুখে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিলেন, দীনেশ এক খানা বই খুলিয়া পড়িতেছিল।

বাহিরের সৌন্দর্য্যের পানে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই, বইখানা সামনে খোলা থাকিলেও সে একটুও পড়ে নাই, সে কেবল অন্যমনস্ক ভাবে বই খানার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিল।

সকালে বারাণ্ডায় আজ সে যে মেয়েটীকে দেখিয়াছিল তাহার মুখখানাই মনে জাগিতেছিল।

পলাশের সহিত পরিচয় তাহার আজই নূতন করিয়া হয় নাই। কলিকাতায় মাধব বাবুর বাড়ীর পাশে তাহাদের মেস ছিল, সে সেই মেসে থাকিয়া পড়িত।

পলাশ স্কুলে যাইত, আসিত, ছাদে বেড়াইত, দীনেশকে সে না চিনিলেও দীনেশ তাহাকে চিনিত।

এই মেয়েটীকেই একদিন দুপুরে স্কুল হইতে আসিবার সময় একটা গলির মধ্যে কয়েকটী বদলোকের আক্রমণ হইতে সে রক্ষা করিয়াছিল। পলাশের সঙ্গে দাসী ছিল, কিন্তু বেগতিক ব্যাপার দেখিয়া সে পলাইয়া গিয়াছিল। পলাশ যখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় রক্ষাকর্ত্তারূপে আসিয়াছিল দিনেশ।

এই দিনেই মাধব বাবু দীনেশের পরিচয় পান ও কন্যার ইজ্জত রক্ষাকারীর পরমভক্ত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হইতে দীনেশ প্রায়ই মাধব বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইত এবং পলাশও অসঙ্কোচে তাহার সহিত মিশিত।

সে আজ দুই বৎসর আগেকার কথা মাত্র।

দীনেশের মনে অনেকখানি আশাই জাগিয়াছিল, পলাশকে পত্নীরূপে লাভ করিবার স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল কিন্তু একদিন তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সে দিন সে শুনিতে পাইয়াছিল পলাশের ভাবী স্বামী অজিত পড়িবার জন্য বিলাতে গিয়াছে, সে ফিরিলে তাহার সহিত পলাশের বিবাহ হইবে।

সেইদিন হইতে সে পলাশকে পাইবার আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

অথচ, মাধব বাবুর অনুরোধ সে এড়াইতে পারে নাই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই সে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহার ডিস্পেনসারীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাঝে মাঝে কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইত এবং মাধব বাবুর জিদে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিতে হইত। পলাশের সহিত তাহার দেখাশুনা হইত, অনেক বিষয় লইয়া আলোচনাও চলিত।

অজিতের সম্বন্ধে কোন দিন কোন কথা সে পলাশের মুখে শুনিতে পায় নাই। দীনেশ কয়েকদিন অজিতের কথা তুলিয়া পলাশের মুখে রেখা জাগিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল, তাহার পর সে এ সম্বন্ধে আর কোনদিন কোন কথাই বলে নাই।

মাধব বাবুর মুখে অজিতের প্রশংসা ধরে না।

ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র পুত্র, নিজেও ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছে, অমন সুপাত্র পাওয়া অনেক পুণ্যের ফল। গর্ব্বে মাধব বাবুর বক্ষ স্ফীত হয়, চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তিনি সকলকে জানান অজিত ফিরিয়া আসিলেই তাহার সহিত পলাশের বিবাহ দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন, তাঁহার সকল দায়ীত্ব ঘুচে।

মাঝে মাঝে তাঁহার ও পলাশের নামে অজিতের পত্র আসে।

পলাশের মুখে এতকাল কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই, সম্প্রতি অজিত সম্বন্ধে অনেক কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে।

সে দিন পলাশ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল, সাগর পারে গেলেই কি মানুষ মানুষ হতে পারে দীনেশবাবু, সাগর পারে না গেলে শিক্ষা কি সম্পূর্ণ হতে পারে না? বিলেতে না গিয়েও আমাদের দেশে কেউ কি মানুষ হতে পারে নি?

দীনেশ বলিয়াছিল, হয় বই কি তবে সাগর পারে যাওয়ার একটা কারণ ধরতে পারি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। বিদেশে না গেলে মানুষের একটা দিক অসম্পূর্ণ থেকে যায়—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় না।

সজল চোখের দৃষ্টি তার মুখের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, অমন অভিজ্ঞতা না হয় নাই বা লাভ হল দীনেশ বাবু তাতেই বা কি আসে যায়? মনুষ্যত্ব নষ্ট করে চরিত্র ধর্ম পদ দলিত করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, সে অভিজ্ঞতার মূল্য কত টুকু; আর আমার মনে হয় সে অভিজ্ঞতা লাভ করার চেয়ে লাভ না করাই ভালো

দীনেশ কিছু বুঝিতে না পারিলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই কি ঘটিয়াছে।

বালিসের তল হইতে লণ্ডন হইতে সদ্য আগত পত্রখানা পলাশ দীনেশের হাতে দিয়া বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইয়াছিল। সেই পত্র পড়িয়া দীনেশ এক মুহূর্ত্তে সবই বুঝিতে পারিয়াছিল।

অধিকাংশ ছেলের মত অজিতও লণ্ডনে গিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে নাই। সে লণ্ডনে অনেক কীর্ত্তি করিয়াছে এবং অবশেষে চোরের মত লুকাইয়া ভারতাভিমুখে রওনা হইয়াছে।

এ সমস্ত কথা আজও পলাশ মাধব বাবুকে জানায় নাই, অজিত ফিরিলে সে তাহার সামনেই সব কথা পিতাকে বলিবে।

হ্যারে দীনু—

দিদির আহ্বান শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়া দীনেশ মুখ তুলিল।

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সামনের দিক দেখাইয়া সুরমা বলিলেন, মাটিতে এত জায়গা থাকিতে মানুষ অতকষ্ট করে গাছের পরে অমন ভাবে ঘর তৈরী করলে কেন রে?

দিদির প্রশ্নে দীনেশ হাসিল—বলিল আত্ম রক্ষার জন্য দিদি। মানুষ কত বড় চালাক দেখেছি—মাটিতে ঘর বাঁধিলে বিপদ যে কোন মুহূর্ত্তে ঘটতে পারে বলেই ঘর বেঁধেছে গাছের ডালে। ইচ্ছামত মই ফেলে নিজেরা যাওয়া আসা করে, অপরের শক্রতা করে নিজেরা থাকে নিরাপদে। এমন স্বার্থপর জাত তো দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই দিদি, তাই অসাধ্যও সাধন করতে পারে।

সুরমা দেখাইলেন আচ্ছা ওইযে পাহাড়ের উপর বাড়ীগুলো—?

দীনেশ বলিল মানুষেই বাস করবে বলে করেছে। নীচে হতে জিনিষ পত্র নিয়ে ওপরে ওঠে, ঘর বাড়ী তৈরী করে।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুরমা বলিলেন পরিশ্রম তো বড় কম নয়।

দীনেশ বলিল, তাতে তোমার আমার কি দিদি, যাদের পয়সা আছে তাদেরই বা কি? পরিশ্রম করবে তারা—যারা খেতে পায় না একটা পয়সার মূল্য যারা বোঝে—পয়সার জন্যে বুড়োর রক্ত জল করে তারাই খাটে;

ব্রহ্মপুত্রের তীরে ট্রেণ হইতে নামিয়া সুরমা স্নানান্তে আহ্নিক সারিয়া লইলেন। ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ওপারে ট্রেনে উঠিয়া চলিতে চলিতে দীনেশ বলিল, আগে কামাখ্যা দেখে তারপর কামপুর যাওয়া যাক দিদি, কি বল?

সুরমা বলিলেন, দেবী দর্শন এখন থাক দীনু, যা করতে এসেছি আগে তাই হোক। ওদের আগে দেখা যাক, তারপর মা কামাখ্যা যদি টানেন তখন পূজো দিয়ে বাড়ী ফিরব।

সুরমা চুপ করিয়া রহিলেন, দীনেশ অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

২১

ষ্টেশন মাষ্টার বাঙ্গালী—

দীনেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল কিছুদিন আগে একটী বাঙ্গালী মেয়ে তার রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে এখানে এসেছিল তারা কোথায় আছে সে খবরটা আপনার কাছ হতে জানতে পারি কি মশাই?

ষ্টেশন মাষ্টার জানাইলেন তিনি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন, কোন খবর তিনি জানেন না। তবে দুই তিনদিনের কথা তাঁহার চাপরাশী পারিসানা তাঁহার স্ত্রীর নিকটে একটী বাঙ্গালী মেয়ের কথা বলিতেছিল সে কথা তিনি জানেন। পারিসানা সে সংবাদ তাঁহাকে দিতে পারে।

ব্যগ্রভাবে দীনেশ বলিল, তাকেই একবার ডেকে দিন; আমরা তার কাছ হতে এ খবরটা পেলে ভারি খুসি হব।

ষ্টেশন মাষ্টার একবার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সুরমার পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, তিনি কি আপনার কেউ হন?

দীনেশ উত্তর দিল, তিনি আমার আত্মীয়া।

ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার চাপরাশীকে ডাকিয়া দিলেন।

দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল, শুনলুম তুমি একটী বাঙ্গালী মেয়েকে জানো—সে আজ কিছুদিন আগে এখানে এসেছে। কোথায় আছে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে আমি তোমায় দশ টাকা দেব,—এখনি দেখিয়ে দিতে হবে।

পুরস্কারের নাম শুনিয়া পারিসানা খুসি হইয়া উঠিল বলিল আমার ঘরের কাছেই তারা থাকে বাবু। কিন্তু সেই লোকটীর ভারী ব্যারাম, আজ কালেই মরে যাবে মনে হয়। আচ্ছা আসুন আপনারা।

সুরমা দীনেশের পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বলিলেন, খুব সময়েই এসে পড়েছিরে; আজ কালই যদি শিবানীর স্বামী মারা যায়, তার পরে আর ওর সন্ধান পেতুম না।

পাহাড় ঘেরা দেশ, চারিদিকে গাছ লতা পাতার জড়াজড়ি; ইহারই মাঝখান দিয়া যে সরু পথ গুলি ইতস্ততঃ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে সে গুলি সত্যই বড় সুন্দর দেখায়।

লতায় পাতায় ঘেরা ছোট ঘরখানা দেখাইয়া পারিসানা বলিল, এই ঘরেই তারা আছে বাবু—

দীনেশ একখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, আর তোমায় দরকার নেই, তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পারো।

সুরমা বলিলেন, তুই আগে যা দীনু, আগে দেখে আয় সে আছে কিনা, তারপর আমি যাচ্ছি।

দীনেশ সন্তর্পণে সরু বারাণ্ডায় উঠিল। দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরের অন্ধকারপ্রায় ঘরখানার মধ্যে সে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

মেঝের উপর সামান্য একটা বিছানায় পড়িয়া আছে একজন লোক, আর তাহারই বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে একটী মেয়ে।

"শিবানী—"

চমকাইয়া সে মুখ তুলিল—।

সত্যই সে শিবানী, কিন্তু হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া চিনিবার যো নাই, সে এত বিবর্ণ এত শীর্ণা হইয়া গিয়াছে।

মুখের উপর একটা আঙ্গুল রাখিয়া অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিল—চুপ—

সে শব্দটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতই শুনাইল।

আস্তে আস্তে পা টিপিয়া সে বাহিরে আসিল।

সুরমা বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, হঠাৎ যেন চিনিতে পারিতেছিলেন না এই সেই শিবানী কিনা।

শিবানী দীনেশের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল, সুরমাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কে দেখিয়া বলিবে একটু আগে এই মেয়েটীই অমন সর্ব্বহারা ভিখারীণির মত কাঁদিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুরমা বলিলেন, এ কি চেহারা হয়েছে শিবানী, আমি যে তোকে দেখে মোটে চিনতেই পারছিনে। এ রকম হল কেন?

শিবানী শুষ্ক হাসিল, বারাণ্ডা দেখাইয়া বলিল, বসুন দিদিমণি। দাদাবাবু, আপনিও বসুন। চালের বাতায় দুখনা চেটাই আছে, টেনে নিয়ে বসুন, আমি ওসব এখন আর ছোঁব না।

দীনেশ বলিল, কিছু পাততে হবে না, আমরা এমনি বসছি। শুনলুম মহেশের বড় ব্যারাম, সে কেমন আছে রে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সুরমার দিকে তাকাইয়া শিবানী বলিল, বসুন দিদিমণি অনেক দূর হতে এইমাত্র এসেছেন—একটু "বিশ্রাম নিন।"

সুরমা বসিলেন, বলিলেন, বসলুম কিন্তু তোর দিকে তাকিয়ে আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি শিবানী—

শিবানীর ঠোঁটের উপর দিয়া একটু হাসির রেখা ভাসিয়া তখনি মিলাইয়া গেল, সে বলিল মানুষের চেহারা কি সব সময়েই সমান থাকে দিদিমনি, অসুখ, বিসুখ, রোগ, শোক, দুঃখ, সবই এই মানুষকেই তো সইতে হয়। ওদের আশার চিহ্ন তাই ফুটে ওঠে মানুষের সারা গায়েই শুধু নয়—মানুষের মনে ও বটে।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, আমার মন হতে কে যেন বলে দিয়েছিল আপনারা আসবেন, যেমন করেই হোক আপনাদের আসতেই হবে। দেখছি—যে এ কথাটা বলে ছিল, সে মিছে কথা বলেনি।

দীনেশ বলিল, 'তোমার ভাইফোঁটার' পত্রটাই তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে শিবানী। খামের ওপর এখানকার পোষ্ট অফিসের ছাপ ছিল, তাইতেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি।

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, সোজা চলে এসেছেন, কামাখ্যা এখনও দেখা হয়নি?

সুরমা বলিলেন, যাবার সময় দেখে যাব ঠিক করেছি।

শিবানী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমারও একবার দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল দিদিমণি, শুনেছি ম্লেচ্ছদের নাকি মন্দিরে ঢুকবার অধিকার নেই, সেই জন্যে আমার যাওয়া হল না। নিজের হাতে পুজো দেওয়াও হল না। এ জন্মে কিছু হল না, দিদিমণি এর পর যদি জন্ম থাকে,—সে জন্মে যেন এ জন্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি—যত সাধ এ জন্মে অপূর্ণ রইল সব সাধ যেন মিটাতে পারি, কেবল সেই প্রার্থনাই করে যাচ্ছি।"

সে কথা বলিতেছিল নেহাৎ কথা না বলিলে নয় সেই রকম ভাবে।

কয়েকটি লোক আসিতেছিল, তাহাদের সাড়া পাইয়া শিবানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোক কয়েকটীর পানে তাকাইয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা কি চায় শিবানী, কি করতে এসেছে?

শিবানী উত্তর দিল, ওদের কাজ আছে দিদিমণি—

তাহার কণ্ঠ স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দীনেশ যেন অনুভবে বুঝিতেছিল. সে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মহেশ কেমন আছে রে শিবানী?

স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শিবানী বলিল, এই সকালবেলায় সে মারা গেছে দাদাবাবু। সেই জন্যই এদের সর্দ্দারকে খবর দিয়ে ছিলুম, সর্দ্দার লোক-জন নিয়ে এসেছে। যেমন করেই হোক শেষ কাজটা তো করতে হবে, মুখে কেবল আগুন ঠেকালেইত চলে না দিদিমনি। ও খৃষ্টান হয়েছিল দায়ে পড়ে, সত্যি মনে প্রাণে ও ছিল হিন্দু, তাই ওকে মাটির তলায় শোয়াতে ও চায় নি, পুড়াবার আদেশ দিয়ে গেছে।

সুরমা ও দীনেশ একেবারে স্তম্ভিত। উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া সুরমা আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিলেন, "শিবানী—"

শিবানী পিছাইয়া গেল, আমায় এখন ছোঁবেন না দিদিমণি, আমি মড়া ছুঁয়েছিলাম।

দীনেশর চোখে পলক পড়িতেছিল না।

মৃত স্বামীর বুকের উপর মুখ খানা রাখিয়া যে অমন ভাবে কাঁদিতেছিল, তাহা কে দেখিয়া বুঝিবে? সে দিব্য কথা বলিয়াছে, কতবার হাসিয়াছে, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক ছিল। তবুও তাহাকে দেখিয়া এতটুকু বুঝাবার নাই তাহার বুকের আড়ালে কতখানি শোকের ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

সিঁথায় সিঁদুর এখনও দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে,

ললাটে সিঁদুরের টিপ এখনও অতি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

যম সাবিত্রীর বক্ষ হইতে সত্যবানকে লইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, এ কথা গল্পে শুনিতে পাওয়া যায়, সে কি সত্য না কেবল গল্পই মাত্র? পুণ্যের প্রলোভনে মানুষকে প্রলোভিত করা এ পাপ কাহার? এই মেয়েটিও তো সাবিত্রির চেয়ে ন্যূন নয়, যম কেমন করিয়া ইহার বক্ষ হইতে প্রাণাধিক স্বামীকে লইয়া গেল?

লোক কয়েকটা একখানা বাঁশ আনিয়া ফেলিল তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া মাদুর জড়াইয়া শব দেহটাকে আনিয়া বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল।

আর্ত্তকণ্ঠে শিবানী বলিল, একটু আস্তে বাঁধ বাবা অমন করে হাত পা গুলো মুচড়ে মুচড়ে ভাঙ্গিসনে আমার চোখের সামনে আমি সহ্য করতে পারছিনে।

তাহার চোখে বিন্দুমাত্র জল ছিল না।

মৃত দেহ বাঁধিয়া লইয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সঙ্গে যাবে মা?"

শিবানী বলিল, না বাবা, যা করবার তা করে দিয়েছি আর আমি কিছু পারব না। এখন যা করবার তোমরাই তা কর গিয়ে।

লোক গুলো শব দেহ লইয়া চলিয়া গেল, আর শিবানী হাতে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া নির্জল চোখে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে সুরমা ডাকিলেন, "শিবানী—"

"আসছি দিদিমণি—"

দ্রুতপদে শিবানী ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া সুরমা উঁকি দিয়া দেখিলেন একটু আগে যেখানে তাহার স্বামীর শবদেহ পড়িয়াছিল সেইখানে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

তুমি কেন আজ স্থির নীরব বসি' গৃহ-বাতায়নে,
আমার স্বরূপ ক্ষণিক প্রেরণা জাগে কী কোমল মনে?
তব জীবনের আঙিনার' পরি আমি নব শতদল,
বাতাসে ছড়াই প্রেম-সৌরভ সঞ্চিত উচ্ছল।
সোণালী স্বপন, হৃদয়ে বপন উৎসার মদিরতা,
কাণ পেতে শোন পিয়াসী মনের একটী তৃষা ও কথা।
তিমির-তমসাতীরে,
তুমি বসে আছো কল্পনাহীন সুখ-নিকেতন ঘিরে।
মন-পারাবত তোমার লাগিয়া উড়িয়া গিয়াছে চলি,
সাগরের জল, শ্রাবণের জল চোখে ওঠে ছলছলি।
দিনের প্রদীপ হের নিভে গেল আঁধারের ফুৎকারে,
প্রেম-সরীসৃপ কুণ্ডলী হ'য়ে ব্যথার তুহিন ভারে
মৃৎ জর্জ্জর, তুমি তা' জান কী যৌবন-সুন্দরী?
শুধু নির্ব্বাক নিজের খেয়ালে লীলা-ভীত অপ্সরী।
পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
তোমার কথাটী খালি মনে পড়ে, আমি কাঁদি শয্যায়।
মোর তনু-তটে বেদনার ঢেউ, প্রগাঢ় অন্ধকার,
আমারে স্মরিয়ো বুকের বীণার তুলি নব ঝঙ্কার।

ছায়ার কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বাসবদত্তা

চলচ্চিত্রের বিশেষ খুটিনাটী না জানিয়া ডিরেক্টর হইতে গেলে যে অপ্রস্তুতে পড়িতে হয়, বাসবদত্তা তাহার জলন্ত নিদর্শন। প্রযোজক রবী বাবুর কয়েকটী লাইন মাত্র পুজি করিয়া বাসবদত্তা চিত্র গঠন করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন—ইহাত খুবই স্বাভাবিক। তাহাদের প্রায় এক সময়েই বোম্বায়ের একখানি বাসবদত্তা ছবি যোড়াসাঁকোর গণেশ টকীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত চিত্রে কোন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বাসবদত্তার অংশ অভিনয় করিয়াছিল। বাবসদত্তার উপন্যাসটী মহাকবি ভাসের রচিত হইলেও, কথা সরিৎসাগর প্রভৃতিতেও উহার বিস্বদস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দি বাসবদত্তাটী মহাকবি ভাসের গল্প লইয়াই রচিত হইয়াছিল। উহার গল্পটী আমাদের রবীবাবুর রাজারাণীর গল্পেরই অনুরূপ। গল্পটী বৌদ্ধযুগের উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্র নগরের। হিন্দী বাসবদত্তার প্রযোজক মহাশয় সুন্দর Set যোজনা করিয়া পাটলীপুত্র ও উজ্জয়িনীর দৃশ্য চাপাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বাংলা বাসবদত্তা এই বাসবদত্তার সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ নাই। আমার মনে হয় প্রয়োজক রবীবাবুর অভিসার নামক গল্পের মাত্র কয়েকটী লাইন সম্বল করিয়া বর্ত্তমান চিত্রটীর রূপ পরিকল্পনা করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হইয়াছেন। ইহাতে Set নাই, acting নাই মাত্র নির্লজ্জভাবে কতকগুলি অশ্লীল দৃশ্য দেখাইয়া লোক জমাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা প্রযোজক মহাশয়কে খানিকটা পড়াশুনা করিয়া প্রযোজনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মানময়ী গার্লস স্কুল

মানময়ী বিখ্যাত হাস্যরসিক রবীন্দ্র মৈত্রের মানসকন্যা। অধুনা লুপ্ত আর্ট-থিয়েটার যখন পতনোন্মুখ তখন ইহার অভিনয় করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাধা ফিল্ম কোম্পানী এই জনপ্রিয় লেখকের জনপ্রিয় নাটিকা খানিকে ছায়াচিত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মানময়ীতে হাস্যরস প্রচুর আছে। উহার লিপিকুশলতাও সুন্দর। প্রযোজক কিন্তু যেমন উচিত ছিল ঠিক তেমনভাবে উহাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রথম দৃশ্যে কাননবালার গান অত্যন্তই প্রাণহীন। কানন বালার দরিদ্রতা ও পার্শ্ববর্ত্তী আব হাওয়া ফুটাইবার প্রয়োজন স্বীকার করিলেও, উক্ত দৃশ্যে তাহা যে সম্পাদন করিতে পারা যায় নাই, ইহা খুবই সত্য। আমার মনে হয়, যে দৃশ্যে তাহারা বিজ্ঞাপনটী দেখিতেছে সেখান হইতে ছবিটী সুরু করিলে, ছবিটীকে বেশ জমাটী ভাবেই আরম্ভ করান যাইতে পারিত। তাহার পরবর্ত্তী দৃশ্যে কাননবালার দারিদ্র্যের আবহাওয়া ফুটাইলেই চলিত। Continuity এর দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ইহা ত্রুটী দোষযুক্ত। মানস যে কানন বালার মতই গরীব তাহা কথাবার্ত্তা দিয়া ব্যক্ত করা হয়। একথা সত্য যে মানস যে খুব গরীব তাহা কোথাও ছবিতে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। যাহা হউক গরীব মানস যে সামান্য মাহিনার জন্য এতবড় একটা দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে উদ্যত, সে কেমন করিয়া বেতন পাইবার পূর্ব্বেই, গরীবের যাবতীয় দেনা শেষ করিয়া দিবে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কানন বালা নায়িকার ভূমিকায় শিক্ষিতা মহিলাদের ন্যায় কাপড় পরিধান করেন নাই, প্রযোজকের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। প্রথম কয়েক দৃশ্যে কানন বালার অভিনয় তেমন ফুটে নাই তাহার কারণ কানন বালা ও মানস সে পরস্পর পরস্পরকে দেখিবামাত্রই ভাল বাসিয়া ফেলিল, তাহা স্পষ্ট

করিয়া দেখান হয় নাই। পুরুষের ভালবাসা স্বতঃ প্রকাশিত প্রস্রবণ। রমণীর বক্ষ-বদ্ধ প্রেম সর্ব্বদাই শঙ্কাকুল ও আবেগময়ী হইলে দ্বিধা হীন নয়। এই ভাবদ্বয়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া শেষ মিলন ঘটাইলে Continuity বেশ সুন্দর হইত।

অভিনয়ের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, আমরা অবশ্য এই কথাই বলিব যে, রাধা ফিল্ম কোম্পানী অনেক উন্নতি করিলেও এখনও উঁহাদের অভিনয় চলচ্চিত্রে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হয় না। ফটোগ্রাফিতে নানরূপ আধুনিক technique দেখাইবার চেষ্টা থাকিলেও উহা মনোরম হয় নাই। সকলের অপেক্ষা খারাপ হইয়াছে ইহার অস্পষ্ট ছবি। প্রকৃত Back ground ঠিক করিতে পারিলে দৃশ্যগুলি এমন ভাবে মার খাইতনা, এইজন্য আমার মনে হয় সিনেমাটোগ্রাফি অধিক দায়ী। রেকর্ডিংয়ের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, ছবিটী বেশ সুন্দর হইয়াছে—তাহা ঠিক। তবে মাইক্ বসাইবার দোষে দুই এক স্থলে শব্দের হ্রাস ঘটিয়াছে।

সমস্তদিক খতাইয়া দেখিতে গেলে ছবিখানি চলনসই হইয়াছে। দর্শকগণ যাহা চাহেন তাহার খানিকটা ইহাতে পাইবেন এটা ঠিক। কানন বালার অভিনয় শেষের দিকে বেশ সুন্দর হইয়াছে। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় মন্দ নয়। দামোদরের ভূমিকাও অনেকের চিত্তাকর্ষণ করিবে। মানসের চাকরের চিত্রটী খুবই উপভোগ্য ও মনোরম হইয়াছে। যাঁহারা হাস্য রসের ভক্ত তাঁহাদিগকে আমরা ছবিখানি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

রাণী

কাদের নওয়াজ

রাজার ঘরণি তুমি হয়েছ এখন রাণী
রয়েছ প্রাসাদে জানি আজি
অতুল পুলকে মাতি, ভুলোকে তোমার হৃদি
জাগিবে না মোর স্মৃতিরাজি
ভ্রমেও জীবনে কভু পড়িবেনা মনে তব
মধুময় অতীতের স্মৃতি
হাজার বাতির ঝাড়, রংবাতি রোশনাই
ভোলাবে তোমারে মোর প্রীতি
ভুলিও ভুলিও রাণি! চিরতরে ভুলিও আমায়
আমিও আজিকে তাই চাই
আমারে ভুলিয়া তুমি হয়েছ জীবনে সুখী
শুনিলে শান্তি হৃদে পাই
অনুরোধ এই শুধু গহীন নিশীথে যবে
চরাচর সুপ্ত নিঝুম্
শুয়ে বিছানায় তুমি, আলু থালু বেশে যবে
ঘোম্‌টা উতারি যাবে ঘুম
তখন আকাশ থেকে মুক্ত জানালা দিয়ে
করুণ চাহনী তার হানি
একটী উজল তারা ছল্ ছল্ চোখে যদি
চেয়ে থাকে তোমা পানে রাণী
হঠাৎ নিশীথে তব ঘুম ভাঙে যদি সেই
তারকার জ্যোতি চোখে লেগে
ভাবিও তাহারি মত তোমা তরে নিশিদিন
মোর আঁখি-তারা আছে জেগে
যামিনীর শেষে যবে ঢুলে পড়ে রাঙ্গা শশী
হাসি রাশি মিলায় গগনে
তখন জাগিয়া তুমি দেখ যদি সেই চাঁদ,
সেই শেষ বিদায়ের ক্ষণে
তাহার সজল আঁখি, কাতর করুণ দিঠি
দেখিয়া ভাবিও তুমি রাণি!
এম্‌নি সজল চোখে বিদায় হয়েছি আমি
তোমারে কহিয়া শেষ বাণী!
তারপর ভোরে যবে প্রসাধন করি রাণি!
রাণীর বেশেতে আঙিনায়,—
বেড়াবে মনের সুখে, তখন হঠাৎ যদি
প্রভাতের উতল্ হাওয়ায়
ঘোম্‌টা সরিয়া গিয়া দেখা যায় মুখ শশী
তখন ভাসিয়ো তুমি রাণি!
দুষ্টু হাওয়ার সম আমিও দেখেছি তব
ঘোম্‌টা সরায়ে মুখখানি
আজ রাণী মোর দেওয়া আংটী ও ফুলহার
ক্ষতি নাই দাও ফেলি দূরে
অনুরোধ মোর তরে শুধু একতিল্ ঠাঁই
রেখ যেন তব হৃদি-পুরে।

বীমা প্রসঙ্গ

আজকাল অনেক সংবাদ পত্র খুলিলেই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর বিজ্ঞাপন গুলি। অনেকেই কোটী কোটী টাকার কাজ করিতেছে। সব দিক দেখিলে মনে হয় এই মন্দার বাজারে চলিতেছে যা তা এই ইনস্যুরেন্স কোম্পানী গুলিই। এর মধ্যে দু'একটা কোম্পানী ফাঁকি দিবার মতলবেই কাজ আরম্ভ করিয়েছে তাহাদের কথা না-ই ধরিলাম। কিন্তু বড় বড় যে কোম্পানীগুলি আছে—যাহার সহিত বেশী পরিমাণে জনস্বার্থ ও দেশের সুনাম সংশ্লিষ্ট তাহার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিলে মনে দুঃখ হয়। অবশ্য খুব সু-পরিচালিত কোম্পানীরও ভিতরে গলদ আছে একথা বাহিরে রটিতে পারে; আবার খুব কু-পরিচালিত কোম্পানীরও বাহিরে বিশেষ সুনাম থাকা আশ্চর্য্য নয়।

\+ \+ \+

হিন্দুস্থান রবিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ সাল আনন্দ-বাজারে এক সিকি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের ভূমিকায় বলিতেছেন—

ন্যায় বিচার

" সত্য প্রকাশের জন্য তথ্যের সংগ্রহ ও তাহার তুলনার নামই ন্যায় বিচার।

নিম্নের আর্থিক পরিচয় সেই ন্যায় বিচারে সাহায্য করিবে।

চলতি বীমা—৮ কোটি, ৫৮ লক্ষ, ৭১ হাজারের উপর
বীমা তহবিল—১ „ ৫০ „ ৩৬ „ „
মোট সংস্থান—১ „ ৭৩ „
দাবী মিটান হইয়াছে—৯১ লক্ষের „
নূতন বীমা ২‖০ „
বোনাস মেয়াদী বীমা ২৩৲ আজীবন বীমা ২০৲

\+ \+ \+

রবিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৪২ সালের আনন্দবাজারে বাণিজ্য সম্পাদক হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী প্রসঙ্গে লিখিতেছেন'...হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ কি তৎসম্বন্ধে এখানে মোটামুটি উল্লেখ করিতেছি। আমাদের প্রথম অভিযোগ এই যে, হিন্দুস্থানের পলিসি গ্রাহকদের দাবী মিটাইবার জন্য হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গের হাতে যে তহবিল মজুদ রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে খাটান হইতেছে না। এই গলদ যদি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের মজুত তহবিলের একটা বড় অংশ অনাদায়ী থাকিয়া যাইবে এবং ফলে কোম্পানীর পক্ষে ভবিষ্যতে বীমাকারীদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গ আফিসের কার্য্য পরিচালনা এবং নূতন কাজ সংগ্রহের জন্য অযথা ব্যয় বাহুল্য করিতেছেন। সম্ভবতঃ এজন্যই হিন্দুস্থানের পরিচালক-গণকে প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। হিন্দুস্থানের দাদননীতির সঙ্গে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা মনে করিলে আশঙ্কা হয় যে, ভবিষ্যতে হিন্দু-স্থানের পলিসি গ্রাহকগণ নিয়মিতভাবে বোনাস পাওয়া দূরে থাকুক, কোম্পানীর পক্ষে পলিসির টাকা দেওয়াই দুঃসাধ্য হইবে। তৃতীয়তঃ হিন্দুস্থানের ভেলুয়েশন পদ্ধতি দেখিলে মনে হয় যে, উহার পরিচালকবর্গ এই কোম্পানীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যে পরিমাণে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ তাঁহারা তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে লভ্যাংশ দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। উহার ফলে বর্ত্তমানে অনেক লোক এই কোম্পানীতে বীমা করিতে প্রলুব্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা পরিচালকগণ কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদকে শিথিল করিয়া দিতেছেন। চতুর্থতঃ হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গ অত্যধিক নূতন কাজ সংগ্রহের আগ্রহাতিশয্যে এমন সব বীমা গ্রহণ করিতেছেন যে, প্রত্যেক বৎসরের নূতন কাজের একটা মোটা অংশ বাতিল হইয়া গিয়া কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং নূতন কাজ সংগ্রহে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা, এবং পুরাতন কাজ সংরক্ষণের জন্য যত্নশীল হওয়া হিন্দুস্থানের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।'

× × ×

কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর পক্ষে এ ব্যাপারগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠানপন্ন কোম্পানী; আশা করি তাঁহারাও দেখাইতে পারিবেন যে তাঁহারা ভুল পথে চলিতেছেন না—তবে লোকের সন্দেহ নিরাসন হইবে।

রেডিয়ম্

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

রেডিয়ম্ সাদা পাউডারের মত এক রকম ধাতু—অনেকটা নূনের মত দেখতে। এর দাম পৃথিবীর সমস্ত ধাতুর চেয়ে বেশী। এক পাউণ্ড রেডিয়মের দাম চল্লিশ হাজার ভরি সোনার দামের সমান। এর অসম্ভব দামের কারণ এর অভাব। সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র কয়েক চামচ রেডিয়ম্ আছে।

রেডিয়মের শক্তি এত বেশী যে অধিক পরিমাণ রেডিয়ম্ এক স্থানে থাকা বিপজ্জনক। মাত্র এক পাউণ্ড রেডিয়মও যদি এক জায়গায় থাকে তা'হলে এর কাছে যত লোক আসবে সব মারা যাবে। এর কাছে গেলে এমন কি স্পর্শ করলেও কোনও রকম যন্ত্রণা অনুভব করতে হয় না, কিন্তু দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে দেহের চামড়া খ'সে পড়তে থাকে, চোখ অন্ধ হয়ে যায়—আর কিছু দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। এমন কি, অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ রেডিয়ম্ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন, তাঁদেরও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এক ভদ্রলোক তাঁর কোটের পকেটে একটা ছোট টিউবে ক'রে রেডিয়ম্ নিয়ে যাচ্ছিলেন—রেডিয়মের বিষয় বক্তৃতা দিতে। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে তাঁর পকেটের নীচের চামড়া লাল হ'য়ে উঠল আর খ'সে পড়তে লাগল। একটা বিশ্রী ঘায়ের সৃষ্টি হ'ল আর সেটা আরাম করতে লেগেছিল বহুদিন।

অন্ধকারে রেডিয়ম্ আগুনের মত জ্বলে। কিন্তু রেডিয়ম্ যখন ক্রমাগত তাপ ও আলো দেয় এর ওজন একটুও কমে না—এ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। রেডিয়ম্ কয়লার মত আলো ও তাপ দেয়, কিন্তু পরিশেষে কয়লার মত ছাইয়ে পরিণত হয় না। এ দেখে মনে হয় রেডিয়মই যেন জগতে একমাত্র স্থায়ী জিনিষ যা আবিষ্কার করবার জন্য মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে!

জনৈক বৈজ্ঞানিক কিছুদিনের জন্যে একটা পেষ্ট-বোর্ডের বাক্সে কতকগুলি রেডিয়মের টিউব রেখেছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হ'তে তিনি টিউবগুলি নিয়ে বাক্সটা পাশে ফেলে দিলেন। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে পরীক্ষাগারে আলো জ্বালতে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর ফেলে-দেওয়া বাক্স থেকে আলো বেরুচ্ছে। এই বাক্সটা নিশ্চয় রেডিয়মের কিছু আলো নিয়ে থাকবে যার জন্যে ওটা জ্বলছে। রেডিয়মের সংস্পর্শে এলে প্রায় প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই এর প্রভাব দেখা যায়। কোন জিনিষের মধ্যে রেডিয়ম্ যে সব প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যই প্রধান। যেখানে অন্ধকারে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে রেডিয়ম্ লাগিয়ে দেওয়া হয় আলো দেবার জন্যে। ইলেক্‌ট্রিক্ সুইচের উপর অনেক সময় রেডিয়মের পেন্ট লাগিয়ে দেওয়া হয়—সুইচ খুঁজতে হাতড়াতে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক্ shock খাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যে। ঘড়ির উপরও রেডিয়ম্ ব্যবহৃত হয়। পুতুলের চোখ জ্বল জ্বল করবার জন্যেও রেডিয়মের সাহায্য নিতে হয়।

প্রথমটা আশ্চর্য্য ব'লে মনে হবে কি রকম ক'রে রেডিয়মের মত দামী ধাতু ৭।৮ টাকার ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়। এর রহস্য এইযে এই সকল ঘড়িতে রেডিয়ম্ জ্বলে না—জ্বলে দস্তা—এই দস্তার মধ্যে রেডিয়মের একটু রেশমাত্র দিয়ে দেওয়া হয়। আলপিনের ডগার পরিমাণ রেডিয়ম্ হাজার হাজার ঘড়ির দস্তাকে উজ্জ্বল ক'রে দিতে পারে।

রোগ চিকিৎসার দিক দিয়েই রেডিয়ম্ মানব জাতিকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। প্রত্যেক বছর অসংখ্য ক্যান্‌সার রোগী রেডিয়ম্ চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করে। প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই এমন হাসপাতাল আছে যেখানে চিকিৎসার জন্যে রেডিয়ম্ ব্যবহৃত হয়।

রেডিয়মের আবিষ্কার কাহিনী বিচিত্র। ১৮৯৬অব্দে ব্যাকারেল নামক জনৈক ফরাসী এমন কতকগুলি জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন যারা আপনা থেকেই দীপ্তি পায়—উত্তাপের প্রয়োজন হয় না। এই সব জিনিষ অনেকটা ফস্‌ফরাসের মত। তিনি ইউরেনিয়াম্ অক্সাইড-কে—যাকে সচরাচর পিচ্‌ব্লেণ্ড বলা হয়—সূর্যের কিরণে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত ধাতু ফস্‌ফরাসের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর এর প্রভাব কিরকম তা' তিনি পরীক্ষা করলেন। সে দিন বৃষ্টি পড়ছিল—সেজন্য তিনি সেই প্লেট্‌টা কিছুদিন ড্রয়ারে রেখে দিলেন। ডেভেলপ ক'রে তিনি যে ফোটো পেলেন সেটা সূর্য্যের আলোয় ডেভেলপ করা ফোটোর চেয়ে অনেক ভাল হ'ল। এই রকম আকস্মিক ভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন যে পিচ্‌ব্লেণ্ডর মধ্যে ইউরেনিয়াম্ ব'লে একরকম ধাতু আছে যার মধ্যে রেডিয়ম্ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান।

দু'বছর পরে প্রোফেসর্ কুরি ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে পিচ্‌ব্লেণ্ডের শক্তি ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশী। তাঁরা ভাবলেন পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই ইউরেনিয়ম্ ছাড়া অন্য কোন ধাতু আছে যার শক্তি ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশী। মাদাম্ কুরি পিচ্‌ব্লেণ্ডের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই চেষ্টার ফলে এক অদ্ভুত উপাদান পওয়া গেল। সেটা ইউরেনিয়মের মত—কিন্তু ঠিক তা' নয়। তাঁরা এই নতুন উপাদানের নাম দিলেন পোলোনিয়ম্ তাঁদের স্বদেশ পোলাণ্ডের নামানুকরণে। কুরি দম্পতি পিচ্‌ব্লেণ্ডকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন—তা'র অন্যান্য উপাদান পৃথক করবার জন্যে। শেষে তাঁরা আবিষ্কার করলেন এক নতুন ধাতু রেডিয়ম্।

রেডিয়ম্ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য কাজ। প্রথমতঃ পিচ্‌ব্লেণ্ডে খুব দুর্লভ, দ্বিতীয়তঃ ইউরেনিয়ম্ পৃথক করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে রেডিয়ম্ বার করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রোফেসর কুরি বলেন যে এক সের রেডিয়ম্ পেতে হ'লে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মন পিচ্‌ব্লেণ্ড দরকার। পিচ্‌ব্লেণ্ড রেডিয়ম্ থেকে বার করতে হ'লে পাঁচ হাজার বিভিন্ন অবস্থায় পিচ্‌ব্লেণ্ডকে পরিণত করতে হয়—এবং তা করতে সময় লাগে পুরো-পুরি ছ'মাস!

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে রেডিয়ম্ ইঁদুর, গিনি-পিগ ও অন্যান্য জন্তুও মেরে ফেলতে পারে। প্রথমে এই সব জন্তুদের লোম ঝরে পড়ে—তারপর তা'রা অন্ধ হয়ে যায় এবং পরিশেষে তা'দের মৃত্যু হয়।

রেডিয়মের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে এই যে রেডিয়ম্ কখনও নষ্ট হয় না এবং রেডিয়ম্ উৎপাদন সম্পূর্ণ লাভজনক। ষোল শ' বছর ধরে এই ধাতু তাপ ও আলো দিতে পারে, আর তখনও এর শক্তি থাকবে আগের শক্তির প্রায় অর্দ্ধেক; আবার ষোল শ' বছর পরে এর শক্তি হবে আগের শক্তির প্রায় সিকিভাগ। এই রকম ক'রে বিশ হাজার বছর ধরে তাপ ও আলো দেবে—তারপর সাধারণ সিসায় পরিণত হবে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন রেডিয়মের সাহায্যে তাঁরা বিজ্ঞানের কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করবেন। রেডিয়মের সাহায্যে তাঁরা এক জিনিষকে অন্য জিনিষে পরিণত করবেন—এই তাঁদের আশা। তা হলে প্রত্যেক ধাতুই সোনায় রূপান্তরিত হবে আর জগতে একটা নতুন যুগ এসে পড়বে—রেডিয়মের প্রয়োগের সঙ্গে। পৃথিবীতে কোনও জিনিষের ধ্বংস বা শেষ ব'লে কিছু নেই—একটা জিনিষ অন্য জিনিষে রূপান্তরিত হয় মাত্র। বৈজ্ঞানিকের আশা—এই তথ্যের অনুশীলন করতে বিজ্ঞানের কত রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে—এবং শুধু পৃথিবীতে নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অদ্ভুত আলোড়ন উপস্থিত হবে—একটা ওলোট পালটের যুগ এসে পড়বে।

অবান্তর

ব্যবসায় করিবার জন্য বাঙ্গালী মূলধন পায় না আর পাইলেও মূলধন ফিরাইয়া দিবার স্বভাব বাঙ্গালীর নয়। ব্যবসায়ীর জাত নয় বলেই বাঙালী বোধহয় লেন-দেনে তেমন কথা মাফিক কাজ করে না।

× × ×

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আজকাল বোধ হয় বিষয়ান্তরে বিশেষ ব্যাপৃত আছেন—নইলে কতকগুলি সংবাদপত্রে (বিশেষ করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় কোন কোন পত্রে) চা পানের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন বাহির হইতেছে ইহা কি তাঁহার চোখে পড়িতেছে না? এমনও শুনিতে পাই ভারতে ভারতীয় চা'র কাটতি বাড়াইবার জন্য আবার হাটে, মেলায় বাজারে বিনা-মূল্যে তৈরী চা পান করানো হইতেছে। এমনি চা'র প্রোপাগাণ্ডা বহুকাল পূর্বে একবার হইয়াছিল। আচার্য্যদেব কি এখনো চা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব মতেই স্থির আছেন—না মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে এবং অত্যধিক চা পান এ-দেশের পক্ষে সত্যি অপকারীই হয় তবে এসময়ে একবার সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন—কিম্বা পুরোন সেই লেখা বা বক্তৃতাগুলোই আবার তাঁহার প্রিয় সংবাদ পত্র সমূহে ছাপিতে দিয়া দেখিতে পারেন।

+ + +

কে ১৪বৎসর হইতে চা পান করিতে আরম্ভ করিয়া এখন ৪৮বৎসর বয়সে গড়ে ৩০কাপ করিয়া চা নিত্য পান করিতেছেন এবং এই চা পান হেতুই তাঁহার যৌবনশ্রী এত উজ্জ্বল রহিয়াছে যে তাহাকে ৩৪ বৎসরের বেশী বয়স বলিয়া মনে হয় না এমন সংবাদও কাগজে ছাপা হইতেছে। প্রচারের যুগে প্রচারের মহিমা কত দেখুন। আমরাও চা'র ভক্ত বটে, চা খাইলেই দেশ একবারে ডুবিয়া গেল এমনও মনে করি না—৩০কাপ চাও যে কেহ খাইতে পারেন না ইহাও মনে করি না—কিন্তু এই আদর্শে ৩০কাপ চা না হোক ১৫কাপ চা খাইয়াও কেহ কেহ যদি যৌবন-শ্রী বজায় রাখিতে প্রলুব্ধ হন তবে ব্যাপার কি দাঁড়াইবে? ইহা অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য খবর হিসাবে চলিতে পারে বটে কিন্তু 'চা পান ও যৌবন শ্রী' হেডিংয়ে চলিলেই মনে হয় প্রচার বটে!

+ + +

শ্রীমতী লতিকা বসু—ডাঃ সুবোধকুমার বসুর সঙ্গে তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া নাকচ করিবার জন্য আলীপুরের প্রথম সবজজ মিঃ মুখার্জ্জির এজলাসে মামলা আনিয়াছিলেন—জজ বিবাহ অসিদ্ধ সাব্যস্ত করিয়া তাহা নাকচ করিয়াছেন, ডাঃ বসু এই মামলায় কোন জবাব দেন নাই—শ্রীমতী লতিকা দরখাস্তে বলিয়াছেন—'১৯২৪ সালে লণ্ডনের সেণ্ট প্যাংক্রাস রেজিষ্ট্রী অফিসে তাহাদের যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা অবৈধ কারণ, ডাঃ বসুর সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক হিন্দু আইনানুসারে সেই সম্পর্কের নরনারীর মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না।'

রায়দান প্রসঙ্গে সবজজ বলেন—এই মামলা আইন, সমাজবিধি, নৈতিক আদর্শ বা লৌকিক অনুশাসনের বিরোধী নহে, বরং ইহা আইনসম্মত এবং সমাজবিধি ও নৈতিক আদর্শের পরিপোষক। যদি এই বিবাহ বিবাহই না হইয়া থাকে, অথচ যদি কোর্ট উক্ত মর্ম্মে আদেশ না দেন, তবে বাদিনী বিবাদীর রক্ষিতা স্বরূপে বাস করিতে বাধ্য হইবেন এবং এই বিবাহের ফলে কোনও সন্তান জন্মিলে সে জারজ বলিয়া গণ্য হইবে ও সমাজে তাহার কোনও স্থান থাকিবে না। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা কিছুতেই লোকানুশাসন সম্মত নহে। নৈতিক আদর্শের অনুরোধে যথাসম্ভব সত্বর তাঁহাদিগকে এই বিবাহের বন্ধন হইতে

মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। সমাজ রক্ষার জন্য এইরূপ বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া উহা নাকচ করাই আইনের লক্ষ্য। উভয় পক্ষই পূর্ব্বে এই বিবাহকে আইন সম্মত বিবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন—সুতরাং এখন ইহা অসিদ্ধ হইতে পারে না—আইনের এই সকল সূত্র এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নহে, কারণ যদি এই বিবাহ, বিবাহই না হইয়া থাকে তবে কিছুতেই ইহা আইন সম্মত হইতে পারে না এবং এই বিবাহজাত সন্তান বৈধ বিবাহের সন্তান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এই মামলায় দু'পক্ষই ব্রাহ্ম, কিন্তু দীক্ষিত ব্রাহ্ম নহেন। প্রিভি কাউন্সিলে এক মামলার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে কোনও হিন্দু বা শিখ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হইলেও সে হিন্দু বা শিখ থাকে। যদি কোন ব্রাহ্ম হিন্দুর সমস্ত সামাজিক নিয়ম কানুন পরিত্যাগ না করে এবং নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা না করে তবে সে হিন্দুই থাকে। তাঁহারা হিন্দু এবং বিবাহ বিষয়ে দায়ভাগ দ্বারা শাসিত। বাংলা দেশের রীতি এই যে পিতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে এবং মাতৃকুলের তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বংশ তালিকায় দেখা যায় যে বিবাদিনী বাদীর পিতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে সুতরাং বাংলা দেশের প্রথানুসারে এই বিবাহ অসিদ্ধ। কথা হইতে পারে বাদী ও বিবাদিনী ১১ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াছেন সুতরাং এই বিবাহ আইন সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সম্পর্কে বাধিলে কোন দেশেই বিবাহ আইন সিদ্ধ হয় না। ইংলণ্ডের আইনে এবং হিন্দু আইনে এরূপ বিবাহ অবৈধ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডে যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ এবং দীর্ঘ কালের মধ্যে এই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও তাহা বৈধবিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ ও নাকচ করা গেল—বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী দিতেছি।

× × +

শ্রীমতী লতিকা এই মামলায় জয়ী হইলেন, আইন ঘটিত তর্কে বিবাহ নাকচ হইল। কিন্তু বিবাহ-কালে এগার বৎসর পূর্ব্বেও উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক ও শিক্ষিত ছিলেন—সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাপন্ন আত্মীয় স্বজনও বহু ছিলেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই 'প্রেম' এত প্রবল হইয়াছিল যে বিবাহে কোন নিষেধ তাঁহারা মানিতে পারেন নাই। এই সুদীর্ঘ এগার বৎসর তাঁহারা তবে কি ভাবে ঘর করিলেন? এই এগার বৎসর ছেলে পিলে হইলেও দু'চারটা হইতে পারিত—বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের কি গতি হইত। মামলাটিতে ভাবিবার অনেক কথা আছে—এবং উল্লেখ যোগ্য তাই উদ্ধৃত করিলাম। বর্ত্তমান সাহিত্যেও Cousin marriage সম্বন্ধে কোথাও কোথাও উৎসাহ দেখা যায়—কিন্তু হিন্দু আইনে তাহা যে চলিতে পারে না এই মামলার রায়ে তাহাও দেখা যাইতেছে—সুতরাং সাহিত্যে বে-আইনী অসিদ্ধ—প্রেম-প্রলোভন না দেখানোই ভাল নয় কি?

পরপারে

শ্রীচারুপ্রভা বসু

বসে আছি পরপারে তটিনীর কূলে।
বিমল জ্যোছনা স্নাত ধরণীর কোলে॥
মৃদুর সমীর ধীরে ঢেউ সনে খেলে।
থাকি থাকি ভেসে আসে ক্ষীণ কোলাহলে॥
সহসা একি এ হেরি হে বাঞ্ছিত মোর॥
স্বরগ দুয়ার খুলি বাহু প্রসারিয়া।
আলিঙ্গিলে আমা আসি প্রেমেতে বিভোর॥

নিমুগ্ধ তোমার পানে রহিনু চাহিয়া।
ঊর্দ্ধে দোহে বায়ুভরে উঠিনু উড়িয়া॥
অসীম গগন মাঝে শুভ্র জ্যোৎনায়।
উভয়ে মিশায়ে গেনু শান্তি নীলিমায়॥
স্বপন ভাঙ্গিলে দেখি তটিনীর ধারে।
আমি আছি একা বসি, তুমি পরপারে॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্রামের উন্নতি

ভারত সরকার এবার ভারতীয় গ্রামগুলির উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ১ কোটি মুদ্রা ব্যয়ের জন্য দিতেছেন। গ্রামোন্নতির জন্য বাংলা পাইবে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার। যুক্তপ্রদেশ ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার। বিহার ও উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ। পাঞ্জাব ৮ লক্ষ ৫ হাজার। বোম্বাই ৭ লক্ষ। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৫ লক্ষ ৭০ হাজার। ব্রহ্মদেশ ৫ লক্ষ ৪০ হাজার। আসাম ৩ লক্ষ ৪১ হাজার। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৮২ হাজার। আজমীর মাড়োয়ার ১৫ হাজার।

কোথায় কি ভাবে এই গ্রামোন্নতির কার্য্য করা হইবে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই তাহার 'স্কীম' করিয়াছেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হইলেই গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবেন। বিভিন্ন প্রদেশে ঐ ১ কোটি মুদ্রা বর্ত্তমান বর্ষেই (১৯৩৫-৩৬) ব্যয় করা হইবে—ইহা হইতে অনুমান হয় যে গবর্ণমেণ্ট যে শুধুমাত্র একেবারের জন্য এই অর্থ দিলেন তাহা নহে—প্রতি বৎসরই এ জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুরূপ অর্থ ব্যয় করিতে অভিলাষী। গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীও গ্রামোন্নতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কি ভাবে কার্য্যতঃ ইহাকে রূপ দেওয়া যায় সেই কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বহু বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ দেশকর্ম্মীও আছেন। এ কার্য্যে হৈ-চৈ বিশেষ কিছু পড়ে নাই তবে নীরবে কার্য্য যে হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা এই গ্রামোন্নতির মধ্য দিয়া দেশবাসীকে যথাপ্রয়োজন খাদ্য ও স্বাস্থ্যের আবহাওয়া দিতে চাহেন। বিরাটভাবে গ্রামোন্নতির কার্য্য করিতে যাইয়া মহাত্মা দেখিতে পাইতেছেন এ পথে বাধা বিঘ্ন কত। এ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন মহাত্মাকেও হইতে হইতেছে—গবর্ণমেণ্টকেও হইতে হইবে। প্রথমতঃ সভ্যতা এখন সহরমুখী—তাই গ্রাম দিনের দিন হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। পল্লীতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে যাহারা শিক্ষায় দীক্ষায় যাহারা একটু উন্নত হইয়া উঠে তাহারাই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সহরে যায়। নদীমাতৃক দেশে নদীর গতি ঘুরিয়া যাওয়ায় ও অনেক স্থানে নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় বা নদীর ভাঙনে বহু গ্রামের অবস্থা একান্ত শোচনীয় কিম্বা একেবারেই উৎসন্ন গিয়াছে। বাংলার পল্লীর উন্নতি করিতে গেলে এই দিক বিশেষভাবেই দেখিতে হইবে ও এজন্য বিশেষ ব্যাপক 'স্কীমের' প্রয়োজন আছে। বাহিরের সুলভ পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় কুটীর শিল্পগুলি প্রায়ই মৃতপ্রায় এবং অনেক মরিয়া গিয়াছে: ইহা কি উপায়ে রক্ষা করা যাইবে? কৃষিপণ্য যাহা দেশে হয় তাহা দেশের উপযোগী আগে রাখিয়া পরে বাকী যাহা থাকে তাহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। কৃষি-পণ্য যাহা খাইবার নহে—শিল্পরূপে রূপান্তরিত করিতে হয়—যেমন পাট, শণ, তাহা দেশেই যাহাতে রূপান্তরিত শিল্প সম্ভারে পরিণত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা সামান্য দু'চারটা উদাহরণ দিলাম, ইহা হইতেই বোঝা যাইবে গ্রামোন্নতির সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। এ কার্য্য দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট দুয়ের সহযোগিতায় যদি অগ্রসর হইতে পারে তাহাই সব চেয়ে ভাল। গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যে মহাত্মাকে সহযোগী করিয়া নেন ও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে এ কার্য্যের ফল আরও ভাল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। পল্লীর অবস্থা যত খারাপ হইতেছে, দেশের শিল্প বাণিজ্য যত মরণোন্মুখ হইতেছে দেশের লক্ষ্মীশ্রী ততই অন্তর্হিত হইতেছে। এখনও সময় থাকিতে গবর্ণমেণ্ট ও নেতৃস্থানীয় লোকের এদিকে দৃষ্টি দিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে অনেক সুফলের সম্ভাবনা।

সমাজ সংস্কারে শিখ মহিলা

শিখ সমাজ আত্মকলহে, দলাদলিতে অধঃপতিত, অনাচারগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়াছে। শিখ নেতারা এ অবস্থার কোন প্রতিকার করিতে না পারাতে শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরের নেতৃত্বে চল্লিশটী শিখমহিলা প্রায়োপ-বেশনে আত্মোৎসর্গ করিয়া সমাজের এই দুরবস্থার প্রতিকার করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দেশকে ও সমাজকে জানাইয়াছেন—'যতদিন পর্য্যন্ত শিখনেতারা সমাজকে পবিত্র করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত না হন, দলাদলি ভুলিয়া বিভিন্ন দল একতাবদ্ধ না হন ততদিন একটী একটী করিয়া নারীর মৃতদেহ শিখ মন্দিরের অধ্যক্ষদের নিকট উপস্থিত হইবে।' শিখ

মহিলাদের এই অটল প্রতিজ্ঞায় তাঁহাদের সমাজের ভেদ-বিবাদ দূর হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে এই আশাই অনেকে করিতেছেন। আসাম বন্যায় শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর বিখ্যাত হইয়াছেন; বর্ত্তমান সম্বন্ধেও শিখমহিলাগণ সমাজ ও জাতীয় জীবন সংস্কারে নারী কতটা কার্য্য করিতে পারেন তাহাই দেখাইতে যাইতেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় নারীর মহিমায় শিখ সমাজের শুভ বুদ্ধি অবশ্যই জাগ্রৎ হইবে, তাঁহাদের সমাজের গলদও দূর হবে। নারী জাগরণের এ দৃষ্টান্ত বহু সমাজে অনুসৃত হইবে।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

১৯৩১সনের আদম সুমারীর বিবরণে দেখা যায় যে বাংলাদেশে হিন্দুর বৃদ্ধি মুসলমানের চেয়ে অনেক কম। বাংলার হিন্দু নারীর মধ্যে ১৫ হইতে ৪৫ বর্ষ বয়স্কা বিধবা যাহারা সন্তানবতী হইতে পারিত তাহাদের সংখ্যা ১২৬৩২১ জন। বাংলার ১০৫৭২৭৮৭ জন হিন্দু নারীর মধ্যে প্রায় ৮ ভাগের ১ ভাগ সন্তানধারণক্ষম বিধবা। মুসলমানদের মধ্যে ১৫ হইতে ৪৫ বর্ষ বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৮০২৮০৫জন। ১৩৮৫৩৩৪৩ মুসলমান নারীর মধ্যে ১৫ ভাগের ১ ভাগ সন্তানধারণক্ষম নারী বিধবা। সেনসাস সুপারিনটেনডেণ্ট বলিতেছেন এমন সময় আসিবে যখন হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অর্দ্ধেক হইবে। এবার হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দেখা যায়—মোট লোক সংখ্যা—৫১০৮৭৩৩৮ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ২২২১২০৬৯ আর মুসলমান ২৭৮১০১০০ জন ১৮৮১সাল হইতে বাংলায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানের সংখ্যা এইরূপ—

সাল	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান
১৮৮১	১৮৩৯৪৪২৬	১৮০৭১২৯৬	৭২২৮৯
১৮৯১	২০১৭৪৮৩২	১৮৯৭৮৩০০	৮২৩৩৯
১৯০১	২১৯৫১৯৫৫	২০১৫৫৬৭৪	১০৬৫৯৬
১৯১১	২৪২৩৭২৭৮	২০৯৪৮৩৫৭	১২৯৭৪৬
১৯২১	২৫৪৮৬১২৪	২০৮১২৫২৯	১৪০০৬৯
১৯৩১	২৭৮১০১০০	২২২১২০৬৯	১৮৩০৬৭

এই ২০ বৎসর মধ্যে বাংলায় হিন্দু সংখ্যা কতটা কমিয়াছে তাহা প্রত্যেক হিন্দুর বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজ তত্ত্ববিদদের প্রণিধান যোগ্য।

অভাবের তাড়নায়

শিলচরের সংবাদে প্রকাশ—ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া নিমাই নামক একজন মণিপুরী তাহার দুইটী শিশু সন্তান ও স্ত্রীকে হত্যা করায় অতিরিক্ত দায়রা জজ আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায় দান প্রসঙ্গে জজ মন্তব্য করিয়াছেন—এরূপ মামলায় আসামীকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা যায় না। আসামীর বয়স ৫৬ বৎসর। সে জীবন সংগ্রামে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুধার তাড়নায় এমন পৈশাচিক কার্য্য করে। এইরূপ কার্য্যের জন্য প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট ও সমাজ দায়ী। ইহাকে সামাজিক কলঙ্ক বলা যায়। সকল সভ্য দেশেই ওয়ার্ক হাউস, গরীবদের রক্ষক, বেকার সাহায্য সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ নিমাইয়ের মত যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহাদের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই। জনসাধারণের বদান্যতার উপরই তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই তাহা অপ্রচুর এবং যখন সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় তখন সাহায্য পাওয়া যায় না। ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা বা পরিজন হত্যার এমনি ব্যাপার আজ কাল মাঝে মাঝেই দেখা যায়। বিচারক এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

পরলোকে রাজা হৃষিকেশ লাহা

গত ১৬ই মে অপরাহ্ণ ৪-২৫মিনিটের সময় প্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যবসায়ী রাজা হৃষীকেশ লাহা পরলোকে গমন করিয়াছেন।—মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইনি ২৪পরগণা জেলা বোর্ডে প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ২৬ বৎসর কাল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, পোর্ট ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশনে, ই,আই, ই-বি রেলওয়ে টেলিফোন, ট্রাম প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজা এ যুগের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন —তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ দুঃখিত।

৺ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

কাশ্মীর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার পতি রায় বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ৮৩বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। বাংলার বাহিরে যাহারা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ঋষিবর বাবু ছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান।

কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশবিখ্যাত কবিরাজ হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৮৬বৎসর বয়সে গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি প্রথম জীবনে রাজসাহীতে কবিরাজী করেন, শেষজীবনে কলিকাতায় আসেন। ইনি রাজসাহীতে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্তর হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও ৪২০০৲ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। আধুনিক যুগে আয়ুর্ব্বেদ শল্য চিকিৎসার তিনিই প্রবর্ত্তন করেন।



আদি দম্পতি

আদম ও ইভ

(রয়াল একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস)

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা

৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৯ম বর্ষ { আষাঢ় ১৩৪২ } ৩য় সংখ্যা

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

[শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস প্রণীত 'অনাগত সুদিনের লাগি' একটি সম্পূর্ণ গল্প, কবিতায় লেখা। কয়েকটী পৃথক কবিতায় এই বিচিত্র গল্পটি সমাপ্ত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে। গল্পটি romantic এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রগতির উপযুক্ত। বর্ত্তমান কবিতাটি তাহারই ভূমিকা বা পরিচয়—গাথার বিষয়টির একটু আভাস দিতেছে। পরের সংখ্যা হইতে গাথা সুরু হইবে। বর্ত্তমানে যে কয়জন আই-সি-এস লেখক নানা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন শ্রীযুক্ত হালদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার অভিনবে তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন—বর্ত্তমান বিচিত্র সুন্দর গাথাটিতেও তিনি অতুলনীয় কাব্য মাধুর্য্যের সহিত অনাগত সুদিনের যে আলেখ্য ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।]

পরিচয়—

এ গাথার পিছে আছে চেয়ে
সনাতন ডোরে বাঁধা দৃপ্ত এক মনস্বিনী মেয়ে।
স্বল্পভে বিকায়ে দিয়ে দেবতার দান
নিজেরে করেনি অপমান।

দোষ তার, নাহিক সংশয়
চেয়েছিল দয়িতের একাগ্র প্রণয়।
দম্ভ তার,—পুরুষের যাহে অধিকার
নারী হয়ে দাবী করে তার।

একদা বাজিল বুকে তীব্র জ্বালা রূঢ় আঘাতের,
বাহিরিল খুঁজে নিতে সুবিপুল এই জগতের
বিচিত্র সম্ভারভরা সমারোহ মাঝে
পন্থা তার কোথায় বিরাজে।
সনাতন রাস্তা দিল ছেড়ে।
তোমরা বলিবে মাথা নেড়ে—
চিরদিন এই পথে আর সব নারী
চলিয়াছে, মনঃপূত হল না কো তারি।

মনে রেখো, একদা এ ধরণীতে নাহি ছিল পথ,
সনাতন কোনো মতামত।
দূর অতীতের যুগে অজানাকে, এ গ'থার বধূটির মতো
রচে ছিল পন্থা নব, নাহি মানি নিন্দা শত শত—
আজ তাহা হল সনাতন।

গলিবেনা তোমাদের মন ?
চলে যাবে তোমাদের পানে চেয়ে চেয়ে—
বাক্যহারা অভিমানী মেয়ে।

দেরী নাই, আসিবে সে ফিরে
পন্থাহীন প্রান্তরেতে পন্থা চিরে চিরে।
সেই পথে রমণীর প্রাণ
দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙি স্ব-বলে লভিবে পরিত্রাণ
আপন গৌরব পরে রচিবে আপন প্রতিষ্ঠান।

কবি রহে জাগি—
অনাগত সুদিনের লাগি।

ট্রামের জের

—গল্প—

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

[নারী যদি পুরুষকে প্রবঞ্চনা ও লাঞ্ছনা করিবার অভিলাষ করে তবে কি ভাবে তাহা করিতে পারে বর্ত্তমান গল্পটিতে তাহার একটি জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে এ ধরণের মেয়ে আছে কিনা জানিনা—তবে গল্পটি যে ডাঃ উপেন্দ্র বাবু জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন তাহা পাঠক-পাঠিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন]

আফিস ছুটির পর ভিড় ঠেলিয়া নিতাই বাবু কোনরূপে ট্রামে আরোহণ করিলেন। মানুষ ঠেলিয়া উঠা সহজ কসরতের কাজ নয়। কাকে ফেলিয়া কে আগে উঠিবে সে এক বিষম হুড়াহুড়ি। আফিসে আসিবার ও ফিরিবার কালে রোজই এই মহামারী ব্যাপার। বাসেও সেই একই কথা; যান বাহনাদি যতই বাড়িতেছে, মানুষের ভিড়ও ততই বাড়িতেছে। নিতাই বাবুর যে মাহিনা তাতে ঘোড়াগাড়ী বা মোটরে যাওয়া আসা চলে না। ড্যালহাউসী স্কোয়ারে যদিচ শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিলেন বসিবার ঠাঁই মিলিল না, লালবাজার পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াই যাইতে হইল। সেখানে একটি লোক নামিয়া পড়ায় এতক্ষণে বসিবার সুযোগ পাইলেন। ট্রাম সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে থামাইতেই একটী আধুনিকা উহাতে উঠিলেন এবং কোথাও খালি সিট না দেখিয়া ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহই উঠিয়া তাহার বসিবার জায়গা করিয়া দিল না। মেয়েদের জন্য যে পৃথক আসন আছে তাহা মেয়েদের দ্বারাই ভর্ত্তি। নিতাই বাবুর সহিত চক্ষু মিলিতেই তিনি মেয়েটিকে নিজ স্থান ছাড়িয়া দিয়া একান্ত সঙ্কুচিতভাবে পাশেই দাঁড়াইলেন।

মেয়েটী নিতাই বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আড়চোখে উহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। চোখে চোখ মিলিতেই নিতাই বাবু মস্তক নত করিলেন এবং আর ওদিকে তাকাইতে সাহসী হইলেন না। তার মনের কথা আমরা জানি না হয়ত বা ভাবিলেন—আজকালকার মেয়ে সহসা অপদস্থ হইতে আশ্চর্য্য কি?

মেয়েটীর বেঞ্চে আর একটী লোক বসিয়াছিলেন, তিনি বৌবাজারের মোড়ে নামিয়া গেলেন। মেয়েটি তখন নিতাইবাবুকে বলিলেন,

দেখুন মশাই, জায়গাটা খালি হয়েছে, বসে পড়েন না?

নিতাই বাবু—না থাক—আমি দাঁড়িয়েই যাব আপনি ভাল হয়ে বসুন না?

তাও কি হয়—সারাটা রাস্তা দাঁড়িয়েই বা যাবেন কেন? আর আপনি না বসলে অপর কেউ যে বসবে না তাওত নয়?

নিতাইবাবু উত্তরে কিছু বলিলেন না। মুখে একটা সঙ্কোচের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হয়ত ভাবিতেছিলেন 'ওরে বাপরে—কাছে যে ব'সব—যদি ফোঁস করে ওঠে।' কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশ হইতে কে সরিয়া পড়িতে পারে।

মেয়েটী বলিল বসুন না মশাই আজকালকার দিনে এত সঙ্কোচই বা কিসের। না বসলে সত্য সত্যই দুঃখিতা হ'ব।

এরপর আর না বলা চলে না। একান্ত ভালমানুষটীর মত নিতাই বাবু মেয়েটির পাশে উপবেশন করিলেন এবং চুপ চাপ রহিলেন।

গাড়ী খানিকটা চলিতেই মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল—

কতদূর যাবেন

ফড়িয়া পুকুর অবধি

আপনার বাড়ী বুঝি ওর কাছেই—

হ্যাঁ—ঐ রাস্তায়ই বটে

কোথায় কাজ করেন

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডে

তাহলে বেশ দুপয়সা রোজগার আছে

সামান্য ১০০৲টাকা মাইনের চাকুরী, তাতে সংসার চালনই দায়—

যে দিন কাল পড়েছে, মানুষের যে অসীম দুর্দ্দশা ঘটেছে, অধিকাংশ লোকই ত বেকার, সে হিসেবে এক রকম মন্দ কি?

হ্যাঁ, কোন রকমে দিন কাটছে

কটী ছেলে পিলে

নিতাই বাবু ভাবিলেন—ভারি ফ্যাসাদে পড়া গেল ত! তোর বাপু এ সব খবরে কাজ কী? স্ত্রী বর্ত্তমান সুতরাং সেদিক দিয়া আশা নাই। হাতে শাঁখা বা সিঁথেয় সিন্দুর না দেখিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে মেয়েটীর বিবাহ হয় নাই; যদিও উহার বয়স কোন ক্রমেই ২৪।২৫ এর নীচে হইবে না। নিতাই বাবুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েটী আবার বলিল—

তাইত বাড়ীর কথা মনে হতেই সব ভুলে গেলেন যে একেবারে—যা জিজ্ঞেস করলুম তার উত্তর দিলেন না যে বড়—

একটি মাত্র ছেলে

কত বড়টি হয়েছে

এই সবে সতের

আচ্ছা আপনাদের বড় সাহেব কেমন লোক

ভারী কড়া মেজাজের কোনরূপ গোলমালের সূত্র পেলে এড়াবার আর উপায় নেই, একটা একটা না ফ্যাসাদ বাঁধাবেই—

তাহলে প্রাণটা সর্ব্বদাই হাতে করে থাকতে হয়—

তা আর বলতে—

গাড়ী ততক্ষণ ফারিয়াপুকুরের মোড়ে হাজির। নিতাইবাবু বলিলেন—এই যে এসে পড়েছি। যাই তাহ'লে নমস্কার!

নমস্কার—আচ্ছা আসুন তাহ'লে।

গাড়ী হইতে নামিয়া নিতাইবাবু একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। এতক্ষণ একটা বিড়িও টানিতে পারেন নাই—পেট ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মোড়ের উপরেই একটি পান বিড়ির দোকান ছিল সেখানে একটী নারিকেল রশিতে অগ্নি জ্বালান ছিল, পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া উহার সংযোগে তাহা ধরাইলেন এবং দুবার টান দিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

আবার সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর

দেখুন মশাই, বড্ডই ভুল হয়ে গেছে, নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি, এতটা আলাপ পরিচয় হ'ল অথচ আসলেই ভুল—বলুন না নামটি।

আমার নাম নিতাই চরণ ঘোষ—তা আপনিও যে এখানে নামলেন কিছুই বলেন নি ত আগে।

কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছিল। আমি বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে যাব কিনা তাই ওখানেই নেমে পড়লুম। আচ্ছা মশাই একটু জল খাওয়াতে পারেন ভারি তেষ্টা পেয়েছে।

ওরে রামখিলন একগ্লাস জল দিতে পারিস? এই ভদ্রমহিলাটীর ভারি তেষ্টা পেয়েছে।

ভাল জল ত তোলা নেই বাবু, সোডা, লিমনেড যদি খান তা দিতে পারি।

আরে না, না ওসবে আমার দরকার নেই। জলই চাই। কাছেই না আপনার বাড়ী চলুন না সেখানেই।

নিতাই চরণ প্রমাদ গণিলেন। ইহাকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে স্ত্রী হয়ত একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধাইবে কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়া একান্ত সন্ত্রস্ত মনে সেই দিকেই গেলেন। নীচের ঘরের দরজা শুধু ভেজান ছিল একটা ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল। সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্ত্রীলোকটীকে বসাইয়া জলপানের ব্যবস্থায় গেলেন। একে মেয়েলোক, তাতে আসিয়াছে গৃহস্থের বাড়ীতে, শুধু এক গ্লাস জল আর কি করিয়া দেওয়া যায়। কাজেই কিছু মিষ্টি আনিবার জন্য কাজেই ছুটিলেন।

ভদ্রমহিলাটী চারিদিক একবার তাকাইয়া দেখিলেন পরে ভ্রূ দুটী কুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিলেন, পরক্ষণেই মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া ত্বরিতে অন্দরের দিকে গেলেন। সেদিকেও নীচে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে সিঁড়ি দেখিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। এঘর ওঘর করিয়া রাস্তার দিকের

ঘরটায় একটী মহিলাকে দেখিতে পাইলেন। বেশী গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া বলিলেন—

আপনিই বুঝি এই বাড়ীর কর্ত্রী—

কেন, কি চাই আপনার—

এটা নিতাই বাবুর বাড়ী—

সেই বলেই ত মনে হয়—

একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে—

তা বলুন না; কোনদিন দেখেছি বলে ত মনে হয় না। আসছেন কোত্থেকে—

বাস এই সহরেই—

তা চেহারা দেখলেই অনুমান হয়—সহরটা ত আর একটুখানি নয়।

ও সব থাক, কাজের কথাই বলি আমায় আবার অন্যত্র যেতে হবে।

তা বলেই ফেলুন না।

হাঁ৷ বলবার জন্যই ত এসেছি। স্বামীটি আপনার আচ্ছা লোক! বিবাহ করবার আশা দিয়ে আমার ওখানে যাতায়াত করেন। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে অশিক্ষিতা নই, বেকার অবস্থায় পড়েই তার সংস্পর্শে আসি এবং তিনিই অনুগ্রহ দেখিয়ে তখন অভয় ও আশ্রয় দেন। তিনি যে বিবাহিত একথা প্রকাশ করেন না—

থামুন ত আপনি, ইয়ার্কী করবার আর জায়গা পেলেন না—বাড়ীতে কাউকে না দেখে বুঝি বড় সাহস হয়েছে তাই যা তা বলতে আরম্ভ করেছেন। বেড়িয়ে যান ত এখান থেকে, এক্‌খুনি চলে যান নইলে ঘাড় ধাক্কা কি লাথি মেরে বের করে দেব।

বলেন কী, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। বিবাহ পরের কথা আপনার স্বামী একটি পয়সাও ব্যয় করেন না। একি ব্যবহার? আজ কদিন থেকে আবার দেখাও পাই না। তাই বাড়ীতে সন্ধান নিতে এসেছি। এর ফল ভাল হবে না কিন্তু; তাকে বলবেন আমি যে সে নই, আমার নাম শ্রীমতী লজ্জাবতী রায়—আমায় ফাঁকী দেওয়া সহজ কথা নয়; আমি অবিবাহিতা সে কথা যেন তার স্মরণ থাকে।

আপনার শোনাতে হয় তাকে শোনাবেন, এখনও উঠলেন না, এমন বেহায়া মেয়ে মানুষ ত ভূভারতে দেখি নাই। মানুষ শীকার করে বেড়াও কিনা—ইতর বদমায়েস বাজারের বেশ্যা দূরহ মাগী।

এই বলিয়া রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া গৃহিণী সহসা উঠিয়া পড়িলেন। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া শ্রীমতীও উঠিয়া পড়িলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন আর নিশুম্ভনাশিনী মূর্ত্তি ধরতে হবে না আমি আপনিই যাচ্ছি। নিজের স্বামীকে যারা সামলে রাখতে পারে না তাদের আবার রাগের দাপট দেখ না।

এই বলিয়াই তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নীচের ঘরে পৌছার অনতিবিলম্বেই নিতাইবাবু খাবার লইয়া হাজির।

এ আপনার বড় অন্যায় নিতাইবাবু—আমি কুটুম্ব এসেছি নাকি? এ জানলে আসতুম না—শুধু একগ্লাস জল দিন না।

তাও কি কখন হয়? এ আবার খাবার নাকি? যখন পদধূলি দিয়ে ধন্য করেছেন—তখন একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে বই কি?

খাবার রাখিয়া নিতাইবাবু একগ্লাস জল লইয়া আসিলেন।

ভারী বিরক্ত করলুম আপনাকে কোথায় আফিস থেকে এসে একটু বিশ্রাম করবেন, না কেবল ছুটোছুটি, আমাকে মাপ করতে হবে। যান কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে গৃহিণীর সঙ্গে একটিবার দেখা করে আসুন। এই আমি খাচ্ছি, শীগগীর যান,—নইলে খাব না কিন্তু—

কি বিপদেই ফেলতে পারেন আপনারা—। না খেয়ে উঠবেন না যেন—আমি যাব আর আসব।

নিতাইবাবু উপরের দিকে গেলেন।

উপরে উঠিতেই গৃহিনীর রোষকষায়িত রুদ্র আঁখি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। ঝগড়া ঝাটি কচিৎ কখনও না হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু আজিকার এরূপ সম্পূর্ণ নূতন। যখন রাশি রাশি কালো মেঘপুঞ্জীভূত হইয়া চারিদিকে ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করে, গাছের একটী পাতাও নড়ে না। প্রকৃতি একবারে নীরব নিথর, মনে হয় ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে এই বুঝি সব লণ্ড ভণ্ড হইবে

অকস্মাৎ বজ্রকেপে মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে—বিশ্বগ্রাসী প্রচণ্ড ঝটিকার পূর্ব্বেকার যে অবস্থা এ ও যেন তাই।

বলি ব্যাপারখানা কি? বদনচন্দ্রমা দেখে মনে হয় যেন একেবারে প্রলয়ের সূচনা। অকালে ঝটিকার উদয় কেন? একবার কথা ক'য়ে দন্তরুচি কৌমুদী বিকাশ করে অভয় দাও ত?

অভয়ই দিচ্ছি, ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মজাটা আজ ভাল করেই বের কচ্ছি। কি ভয়ানক লোক তুমি আমি আছি নিশ্চিন্ত আর তুমি কচ্ছ এই বেহায়াপনা!

বেহায়াপানা?

কিছুই যেন জানেন না, আকাশ থেকে পড়লেন নাকি?

আহা, ব্যাপার খানা কি খুলেই বল না ছাই?

বলব না আবার, ভাল করেই বলব। তোমার তিনি এসেছিলেন যে,—হাঁড়ী ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন।

সে আবার কী? তোমার কথার কোন অর্থই ত বুঝতে পারছি না।

তা আর কেমন করে পারবে! আপনার শ্রীশ্রীলজ্জাবতী দাসী ৫।৬ মাস হয় যার শ্রীচরণ কমলে দাসখৎ দিয়েছ। তিনি স্বয়ং উদয় হয়েছিলেন।

অবাক্ করলে। লজ্জাবতী দাসী টাসি কাউকে চিনি না ত আমি।

তা আর চিনবে কেন! পুরুষগুলি এমনই বেইমান বটে। বলি আমায় চিনতে পারছ ত?

ভাল আপদে পড়লুম যা'হক্। আফিস থেকে ফিরতে পড়লুম এক ফ্যাসাদে—তা থেকে মুক্ত হতে না হতেই একি অশান্তি—!

এখানে ত অশান্তি বটেই। যাও না তোমার শান্তিময়ীর কাছে। আহা কি লজ্জাবতীর পায়েই আত্মবিক্রয় করেছ!

হেঁয়ালী ছেড়ে ব্যাপারখানা কি স্পষ্ট বল, নইলে আমায় বাড়ী ছাড়তে হবে—

নিতাইয়ের স্ত্রী তখন সাশ্রুনেত্রে আদ্যপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল। নিতাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল,—বুঝিতে পারিল তাহার ট্রামের সহযাত্রীনীটিই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছেন।

একবার ভাবিলেন হয়ত বা কৌতুক করিয়া থাকিবে, কিন্তু কৌতুক কখনও এমন ইতর হইতে পারে না। তিনি তখন অদ্যকার সকল ঘটনা যথাযথভাবে স্ত্রীকে বলিলেন।

বেশ গল্প ফেঁদেছ যা'হক্ মনে হয় চেষ্টা করলে একজন নামজাদা নভেলিষ্ট হতে পার।

গল্প কী? চলনা নীচে, এই মাত্র তাকে খাবার এনে দিয়ে এলাম। আমাকে উপরে না পাঠিয়ে কিছুতেই খেতে রাজী হলেন না।

আহা কি দরদ রে!

আর কথা কাটাকাটি না করিয়া উভয়ে নীচের দিকে গেলেন। যেয়ে দেখিলেন—পাখী উধাও। ডিসের খাবারগুলি কিন্তু দিব্যি শেষ করে গেছেন।

এই দেখলে ত!

ও সব আমার বেশ দেখা আছে। তুমি নিজে নিয়ে না এলে আবার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে? কি যে সর্ব্বনেশে লোক তুমি!

হায়রে কপাল! অবশেষে তুমিও এই কথা ব'লছ।

বলব না, একশ বার বলব, বুড়ো বয়সে এমন ঢলানও ঢলালে। না জানি কতদিন হয় এসব চলছে।

ভালরে ভাল, যা কিছু মাইনে পাই—সব ধরে এনে দিই তোমারি হাতে। আমি যে বলছি আজের আগে ওকে কখন চোখেও দেখি নি, সে কথাটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

আর বিশ্বাস, পুরুষ মানুষকে আর বিশ্বাস! আজ বাদে কাল যাবে নিমতলায়—আর তোমার হ'ল এই কীর্ত্তি।

ভাল বিপদেই পরলুম!

কি হয়েছে এখনি! তোমায় ভাল করেই শিক্ষা দিতে হবে। তুমি যে কটি টাকা এনে দাও তাই যে মাইনের সব তাই বা কে জানে?

তাহলে যাও না বড় সাহেবের কাছে—জেনে এস বিশ্বাস হবে।

যাব না ত কী? ভাবছ এমনই ছাড়ব! এতদিন তোমায় কি বিশ্বাস করেই এসেছি—কী ভায়নক লোক তুমি, এমন বিশ্বাস ঘাতক!

একটা হতচ্ছাড়া মেয়ে মানুষের কথায়, একদিনেই সব বিশ্বাস উবে গেল! সারাজীবন যে দেখলে তার কোন মূল্যই নেই!

হয়েছে, হয়েছে, আর নিজের ব্যাখ্যান বরতে হবে না। আর লুকিয়ে লুকিয়ে জল খাওয়া চলছে না!

তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, যে বুঝেও বুঝবে না তাকে আর কেমন করে বোঝান যায়।

তা ত বলবেই এখন, নইলে দোষ ঢাকবে কি করে? সহজে ছাড়ব তা মনেও করোনা এর একটা হেনেস্তা করবই করব।

সেই ভাল, এখনকার মত ক্ষমা দাও ত।

এর পর বাড়ীতে নিতাই বাবুর যে অবস্থা হ'ইল তা আর বলিয়া কাজ নাই। গৃহে থাকাই কঠিন হইয়া উঠিল। যেখানে তিল মাত্র অশান্তি ছিল না, সেখানে দিনরাত খিটিমিটি, ঝগড়াঝাটি লাগিয়াই রহিল। এইভাবে তাহার দিন গুজরাণ হইতে লাগিল। একান্ত নিরীহ বেচারী, কি আর করিবে?

দিন কতক বাদে বড় সাহেবের খাস কামরায় নিতাই বাবুর ডাক পড়িল। সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি তাহার হাতে দুখানা চিঠি দিলেন ও বলিলেন—পড়ে দেখে এ সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে বলুন।

চিঠি পড়িয়া নিতাই বাবুর ত চক্ষুস্থির। একখানি আসিয়াছে ট্রামে পরিচিতা সেই নব্যা মহিলার নিকট হইতে এবং অপরখানি তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে। উভয় পত্রেরই অবিকল অনুবাদ নিম্নে দিলাম

১ম পত্র

মান্যবর

ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডের ম্যানেজার মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে আপনার প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চরণ ঘোষ মহাশয় নিজেকে অবিবাহিত পরিচয়ে ও আমাকে বিবাহ করিবেন প্রতিশ্রুত দিয়া আজ ৫।৬ মাস যাবৎ আমার গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং আমরা উভয়ে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বস বাস করিতেছিলাম। ঘটনাচক্রে আজ মাত্র ১৫দিন হয় জানিতে পারিয়াছি যে তিনি বিবাহিত। এখন আমার যে কি বিষম অবস্থা তাহা মহাশয় সহজেই বিবেচনা করিতে পারেন। মান, সম্মান, ইজ্জত আমার সবই গেল। আপনি যদি ইহার প্রতিকার বা একটা বিধি ব্যবস্থা না করেন তবে বাধ্য হইয়াই আমাকে মহামান্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আশাকরি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট হইতে ৭ দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইব। মহাশয়ের মূল্যবান সময় নষ্ট করায় ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪　　আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী
৩২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট　　শ্রীলজ্জাবতী রায়
কলিকাতা

২য় পত্র

মাননীয়,

ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডের ম্যানেজার মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

সবিনয়ে নিবেদন এই যে আমি আপনাদের ব্যাঙ্কের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চরণ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী। ব্যাঙ্কে তিনি মাসিক কত টাকা বেতন পান তাহা আমাকে জানাইলে একান্ত বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। কোন বিশেষ কারণে আমায় সন্দেহ হইতেছে যে তিনি সমগ্র বেতন বাটিতে ব্যয় করেন না। আশা করি আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোন ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। ইতি

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪　　আপনার একান্ত অনুগত
২২নং ফরিয়া পুকুর ষ্ট্রীট　　শ্রীনিতাই চরণ ঘোষের স্ত্রী
কলিকাতা

নিতাই বাবু তখন সাহেবকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই অকপটে বলিলেন এবং এ অবস্থায় তার কি যে কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলেন। একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক যে তাহাকে এমন বিপদে ফেলিবে তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। অতিশয় দুষ্ট-চরিত্রা ও নৈতিক শীলতা বর্জ্জিতা না হইলে কেহই এরূপ করিতে পারে না।

দেখুন নিতাই বাবু আপনার সব কথাই মেনে নিলুম কিন্তু এই প্রকৃতির পাজী স্ত্রীলোক যদি কোর্ট যেয়ে উপস্থিত হয় তাতে ফ্যাসাদ ত বহু দাঁড়াতে পারে, অধিকন্তু খরচাও বড় কম হবে না। তার চেয়ে আমার মনে হয় যেমন করে পারেন বিষয়টা মিটিয়ে ফেলুন।

এমনি করে ঠকিয়ে টাকাটা নেবে—আপনি তাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন?

যুক্তিসঙ্গত মনে করি না সত্য, কিন্তু এই ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ালে ব্যাঙ্কের মানহানির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে এবং অবস্থানুসারে এমনও হতে পারে যে, আপনার চাকুরিটি থাকা দায় হবে। সুতরাং অত শত গোলমালে না যেয়ে, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। বলেন ত আমি ডাকিয়ে এনে মিঠেকড়া দুচার কথা বলে, শেষটা ভয় প্রদর্শন করে কাজটা যাতে অল্প খরচে হাসিল হয় তার চেষ্টা দেখি।

নিতাই বাবু আর কি বলিবেন, সাহেবের কথায়ই সম্মতি দিলেন।

৩০০্ টাকায় রফা হইল। লজ্জাবতী রায়ের নিকট হইতে লিখাইয়া লওয়া হইল যে নিতাই বাবুর উপর তাহার আর কোন দাবী দাওয়া নাই।

নিতাই বাবু সাহেবের নিকট হইতে এক মাসের ছুটী লইয়া সেই রাত্রের গাড়ীতেই কাশী রওনা হইলেন। অফিস হইতেই স্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠি দিলেন।

কল্যাণীয়াসু,

এতদসহ বড় সাহেবের চিঠি দৃষ্টে দেখিবে আমি ব্যাঙ্কে মাসিক কত মাহিয়ানা পাই এবং বাড়ীতে তার কত দিই। আমায় অবিশ্বাস করিয়া সাহেবের নিকট যে চিঠি দিয়াছ তাহার আকল সেলামী বাবদ যে টাকা দিতে হইয়াছে তাহার রসীদও এতদসহ পাঠাইলাম। আমার মনের অবস্থা ভাল নহে। অদ্যই কাশীধাম রওনা হইলাম, দেখি বাবা বিশ্বনাথ শ্রীচরণে স্থান দেন কিনা? ইতি

আঃ

শ্রীনিতাই চরণ ঘোষ

গান

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ওগো মোর কল্পনা লো!
এলি আজ কবির প্রাণে,
দিতে কী গানে গানে
আলপোনা লো!!

বাজিয়ে উদাস বেণু,
স্বপনে ডেকে এনু,
ওগো মোর আকুল চাওয়া,
হৃদয় পাপড়ি ছাওয়া
অল্পনা লো!!

এলে কী গোপন রাতে,
এ-হিয়া অঙ্গিনাতে,
দিল যে পাগল করা
পরশে সোহাগ ভরা—
আল্পনা লো!!

জার্ম্মাণ প্রেম

শ্রীউপেন গাঙ্গুলী

চতুর্থ স্মৃতি

দুধারে পপলারশোভিত ধূলিধূসরিত রাস্তা দিয়ে অনির্দ্দিষ্টভাবে চলার মত আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঐরূপ কতক সময় আসে। দিন চলে যাচ্ছে এবং ক্রমেই বয়স বাড়ছে এই রকম একটা বিষাদস্মৃতি ছাড়া আর কিছুই যেন মনে পড়ে না। জীবনের জোয়ার যতক্ষণ বেশ নির্ব্বিবাদে প্রবাহিত হয় ততক্ষণ নদীর কোন ইতর বিশেষ নাই, যেমন ঠিক তেমনই আছে—শুধু দুপাশে তীরের দৃশ্যাবলীরই পরিবর্ত্তন ঘটে। তারপর জীবনে আসে জলপ্রপাতের ভীষণ বর্ষণ। এ সব স্মৃতিতে অতি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে এবং এগুলিকেও ছাড়িয়ে যখন অনেক দূরে যাওয়া যায় এবং অনন্তের বিশাল সমুদ্রের নিকট হতে নিকটতর হতে থাকি, তথা সেই দূর দেশ থেকেও উহার গর্জ্জন ও তুমুল কোলাহল শুনতে পাই; মনে হয় যা কিছু জীবনী-শক্তি এখনও আমাদের মধ্যে আছে এবং যা নাকি আমাদিগকে কেবলি সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার স্বর ও তেজ ঐ জলপ্রপাতগুলি।

স্কুলজীবন সাঙ্গ হয়েছে এবং কলেজজীবনের প্রথমকার আনন্দদিনগুলিও গত হয়েছে এবং জীবনে সুখের অনেক স্বপ্নই অস্তমিত। একটি জিনিষ কিন্তু রয়ে গেছে;—ঈশ্বরে ও মানুষে বিশ্বাস। ছেলেখেলার মন দিয়ে জীবনের যে চিত্র এঁকেছিলাম বাস্তবজীবন তার চেয়ে ঢের স্বতন্ত্র; প্রত্যেক জিনিসের আদর্শই যেন উচ্চতর এবং যা কিছু সব চাইতে দুর্জ্জেয় ও পীড়াদায়ক তা থেকেই পার্থিব সকল ব্যাপারে শ্রীভগবানের চিরজাগ্রত হাতটির উপস্থিতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পেতাম। "ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন তোমার অতি সামান্য ব্যাপারও ঘটা সম্ভব নহে" জীবনের এইটুকু সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞানই তখন সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

গ্রীষ্মাবকাশে আপন ছোট গ্রামখানিতে ফিরে এলাম। হায়রে মিলনের আনন্দ! এ আনন্দ কেন যে হয় কেউই তার কারণ বোঝাতে পারেনি। আবার দেখা হওয়া, আবার তাদের পাওয়া, তাদের মনে করা, ইহাই বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক আনন্দ ও আমোদের গোপন কারণ। যা আমরা প্রথমবার দেখি, শুনি, বা আস্বাদ করি তা হয়ত খুব সুন্দর ও আনন্দদায়ক কিন্তু একান্তই নূতন ও অপ্রত্যাশিত। এতে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে কিন্তু কোন শান্তি দেয় না এবং প্রায়শঃই আমোদের চেয়ে আমোদ পাবার চেষ্টাটাই হয় বড়। যার স্বরগ্রাম সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি বলে মনে করেছি, বহু বৎসর পরে সেই পুরানো গান শুনে, তাকে পুরাতন বন্ধু বলে চেনা; কিম্বা দীর্ঘদিনের পর ড্রেসডেনে ম্যাডোনা দি স্যান্ সিষ্টোর সামনে দাঁড়িয়ে, অসীমের পানে শিশুচক্ষের সেই দৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রাণে যে ভাবধারা জাগিয়েছিল, সেই সব স্মৃতিকে পুনরুদ্দীপ্ত করা; অথবা একটি পুষ্পের গন্ধ বা কোন খাদ্যসামগ্রীর আস্বাদ, যার কথা স্কুলজীবনের পর একদিনও ভাবি নাই, এতে যে কী গভীর আনন্দই দেয়,—আমরা ভাল করে বুঝতে পারি না—বর্ত্তমান ভাবধারার যে চিত্র তার জন্যই বেশী আনন্দ পাচ্ছি, না পূর্ব্বতন স্মৃতির দরুণই অধিক আনন্দ উপভোগ কচ্ছি। সুতরাং অনেককাল পরে নিজ জন্ম সহরে ফিরে এসে প্রাণটি একান্ত অজানিতে স্মৃতিসাগরে বিচরণ করে, এবং নৃত্যশীল বীচিমালা স্বপ্নের মধ্য দিয়া বাল্যজীবনের অতীত তটভূমিতে নিয়ে হাজির করে। দুর্গ চূড়ায় যখন ঘড়ি বেজে উঠে, মনে হয় স্কুলে যাবার সময়ের না জানি কত দেরীই হয়ে গেছে, কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ভয় ভেঙ্গে যায় এবং ভয়ের কারণ যে চিরতরে দূর হয়ে গেছে তা মনে হয়ে আনন্দ উপভোগ করি। একটা কুকুর রাস্তা পার হয়ে যায়,—সেই কুকুরটা যাকে

সর্ব্বদাই এড়িয়ে যেতাম; এখন বুড়ো হয়েছে, আর দাঁত খিঁচুনি নাই। সেই বুড়ো ফেরীআলাটা ওখানে বসে আছে, ওর আপেলগুলি একদিন কি লোভের জিনিষই না ছিল এবং গায় একরাশ ধুলো থাকা সত্বেও আজও মনে হয় ওর স্বাদই পৃথিবীর অন্য সব আপেলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ওখানে একটা বাড়ী ভেঙ্গেছে, এখনে একটা নূতন তৈরী হয়েছে। ঐদিকে যে বাড়ীখানা ছিল সেখানে আমাদের গানের বুড়ো মাষ্টারমশাই থাকতেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ওর জানালার নীচে দাঁড়িয়ে কি আনন্দেই না গানটান শুনতুম। সারাদিন খাটুনীর পর নিরীহ, বুড়ো ভালমানুষটি আপনাআপনি কি আমোদটাই না করত, তখনতখনি কত গানই না বেঁধে ফেলত; একটি বাষ্পীয়জান যেমন হুস্ হুস্ শব্দে গর্জ্জন করতে করতে, যে সব অতিরিক্ত বাষ্প সারাদিন ভিতরে সঞ্চিত করেছিল তা বের করে দেয়, ঠিক সেই মত। আর এইখানে, এই ছায়াশীতল রাস্তায়,—রাস্তাটা তখন কত বড়ই না মনে হত,—একদিন রাত্রিতে যখন দেরী করে বাড়ী ফিরছিলাম, তখন আমাদের প্রতিবেশীর সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে দেখা। এর আগে তার দিকে চাইতে বা তার সঙ্গে কথা কইতে কোন দিনই সাহস করি নাই। স্কুলে কিন্তু সব ছেলেরা মিলে প্রায়ই তার কথা আলোচনা করতুম এবং তাকে "সুন্দরী কিশোরী" বলে ডাকতুম। অনেক দূর হতেও রাস্তা দিয়ে যদি তাকে আসতে দেখতাম—আমার এতই আনন্দ হ'ত যে তার দিকে এগিয়ে যাবার কথা আর মনে থাকত না। আর এই যে ছোট রাস্তাটি, এদিকে যা গির্জ্জার প্রাঙ্গণের দিকে গিয়েছে, একদিন সন্ধ্যায় এইখানে তার সঙ্গে হলো দেখা, আমায় বাহুবন্দী করে নিলে সে; তখন পর্য্যন্ত কিন্তু কেউ কারু সঙ্গে কথা কই নি। সে ব'ললে, আমার সঙ্গে বাড়ী যাবে। আমার বিশ্বাস সারা রাস্তায় তাকে একটি কথাও বলি নাই এবং সেও না। তথাপি আমার এতই সুখবোধ হয়েছিল যে এতদিন পরেও যখনি ঐ কথা ভাবি তখনি মনে হয় আবার যদি সেইদিন ফিরে আসত তাহলে নীরবে কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই সেই "সুন্দরী কিশোরীর" সহিত পুনরায় হেঁটে বাড়ী যেতুম।

যে পর্য্যন্ত তরঙ্গগুলি মাথার উপরে এসে মিলিত না হয় ততক্ষণ একটি স্মৃতির পর আর একটি স্মৃতি জেগে উঠে এবং বুকের ভিতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে এবং মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের এই সব চিন্তা, শ্বাস নিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। মোরগের ডাক শোনামাত্র ভূতের দল যেমন পালায়, স্বপ্নজগতও তেমনি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়।

যখন সেই পুরাতন প্রাসাদের ও নেবু গাছগুলির ধার দিয়ে গেলাম এবং ঘোড়ার উপরে সেই প্রহরীদের দেখলাম এবং সেই উচু সিঁড়ি চক্ষে পড়ল, আমার মনে কত স্মৃতিই না জেগে উঠল। কত পরিবর্ত্তনই এখানে না হয়েছে! অনেক বছর হয় প্রাসাদে যাই নাই। প্রিনসেস্ মারা গিয়েছেন, প্রিন্স ও রাজকার্য্য ত্যাগ করে ইটালীতে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং জ্যেষ্ঠ প্রিন্স—যার সঙ্গে একত্রে বড় হয়ে উঠেছি, সেই এখন রাজপ্রতিনিধি। অভিজাত বংশের যুবকগণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাকে থাকত ঘিরে, সেও তাদের কথোপকথন উপভোগ করতে ভাল বাসত এবং এদের সংসর্গই তার বাল্যখেলাসাথীদের অতি সত্বরে স্নেহচ্যুত করেছে। আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল যাতে আমাদের পূর্ব্বেকার বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হয়েছিল। জীবনে যারা সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মাণ জাতির প্রাণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা অনুভব করে এবং জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্টের অত্যাচারের সহিত পরিচিত হয়, প্রত্যেক যুবকের ন্যায় আমিও তেমনিই বহুদিন পূর্ব্বেই উদারনৈতিক দলের মত গ্রহণ করেছিলাম। অভদ্রোচিত ও কুৎসিৎ বাক্যাবলী যেমন অতি সম্মানী পাদ্রী পরিবারের প্রতি অপ্রযোজ্য এই সব মতও রাজদরবারে তেমনি অশোভন। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি বহুদিন ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠি নাই, অথচ ঐ প্রাসাদেই এমন একজন ছিল, প্রায় প্রতিদিনই যার নাম আমি করতাম এবং যার চিন্তা মনের মধ্যে অনবরতই জেগে থাকত। জীবনে তার সঙ্গে আর কখন যে দেখা হবে না সে বিষয়ে অনেকদিন হয় মনকে সংযত করেছিলুম। মনের মধ্যে তার যে মূর্ত্তি গড়ে উঠেছিল, ঠিক জানতাম তা বাস্তব জগতে থাকতে পারে না এবং ছিলও না। সে ছিল

আমার ভাগ্যদেবী, আমার নিজেরই আর একমূর্ত্তি। নিজের সঙ্গে আলাপ না করে তার সঙ্গেই আমি আলাপ করতুম। যেমন করে যে সে এই অধিকার জন্মাল তা নিজেকেই কোন রকমে বোঝাতে পারছি না, কারণ তাকে ভাল করে জানিই না। অাঁখির দৃষ্টি আকাশের মেঘকে যেমন নানা আকার দেয়, কল্পনা তেমনই এক মোহিনী যাদুবলে আমার শৈশবের স্মৃতির স্বর্গে এই প্রিয়দর্শন, মধুর ছায়ামূর্ত্তি সৃজন করেছে এবং বাস্তবে যা নাকি দু-একটি অস্পষ্ট রেখামাত্র ছিল তাকে একটি পরিপূর্ণ কাল্পনিক চিত্রে রূপান্তরিত করেছে। আমার চিন্তারাশি ইচ্ছানুসারে তার সঙ্গেই কথোপকথন করত। আমার মধ্যে যা কিছু শ্রেয়, ভালোর জন্য যা কিছু চেষ্টা, আমার ভাল দিককার সমস্তই ছিল তার, তাকেই ছিল উৎসর্গীকৃত এবং তার আত্মা থেকেই সব আসত, আমার মঙ্গলময়ী ভাগ্যদেবীর আত্মা থেকেই।

বাটীতে আসার অল্প কয়েকদিন মধ্যেই একদিন প্রাতে একখানি চিঠি পেলাম। চিঠিখানি ইংরেজীতে এবং এসেছিল কাউণ্টেস্ ম্যরিয়ার নিকট হতে—

"প্রিয়বন্ধু, শুনতে পেলাম অল্প কয়েক দিনের জন্য আমাদের মধ্যে এসেছ। দীর্ঘ দিন দেখা শুনা নাই। তোমার যদি অসুবিধা না হয় তবে পুরাতন বন্ধুকে একবার দেখলে সুখী হব। আজ বিকেলে সুইস্ কটেজে আমাকে একাই পাবে।

তোমার অকপট বন্ধু

"ম্যারিয়া"

তখনি তাকে ইংরেজীতে লিখে জানালুম যে বিকেলে যেয়ে তার আজ্ঞাপালন করব।

সুইস কটেজ প্রাসাদেরই একটা পার্শ্ববিশেষ, বাগানের দিকে মুখ এবং প্রাসাদের চত্বর দিয়ে না যেয়েও প্রবেশ করা যেত। আমি বাগানের ভিতর দিয়ে যখন সেই ঘরের দিকে যাই, বেলা তখন ৫টা। হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে আমি নিরস্ত করলুম এবং তার সঙ্গে সাধারণ ভাবে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হলুম। আমার অন্তরে যে দেবী-মূর্ত্তি বিরাজিত, তাকে শান্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম যে এই মহিলাটির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই। আমার অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল। আমার দেবী কিন্তু আমাকে কোনরূপ অভয়ই দিলেন না। অবশেষে প্রাণে সাহস সঞ্চয় করলুম এবং জীবন যে একটা সঙ খেলা ও ছদ্ম অভিনয় মাত্র সে সম্বন্ধে নিজের কাছেই বিড় বিড় করে ছাইভস্ম বললুম এবং যদিও দরজা অর্দ্ধেক খোলাই ছিল, তাতেই যেয়ে ঘা দিলুম।

ঘরের মধ্যে একটী ভদ্রমহিলা ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। একে আমি চিনি না; ইনিও ইংরেজীতেই আমার সহিত কথা কইলেন। কাউণ্টেস তখনই আসবেন বলে তিনি চলে গেলেন এবং আমি একা রইলুম ও চারিদিকে একবার চেয়ে দেখবার সুযোগ পেলুম। গৃহের দেওয়ালগুলি ওক কাঠ দিয়ে তৈয়ারী. এর চারদিকে ছিল জাফরী করা বেড়া এবং তার উপর দিয়ে বেশ চওড়া পাতাআলা বড় একটী আইভী-গাছ বেয়ে উঠেছিল এবং সমস্ত ঘরটা ছেয়ে ফেলেছিল। টেবিল চেয়ারগুলি সবই ওকের এবং তাতে চমৎকার সব খোদাই এর কাজ। মেজেও ছিল কাঠের, নানাবর্ণের কাঠ বসিয়ে তাকে বিচিত্র করা হয়েছিল। প্রাসাদের পুরাতন খেলাঘরে যে সব জিনিস ছিল সেই সব পরিচিত অনেক জিনিসই এখানে দেখলাম। অন্য কতকগুলি জিনিস বিশেষতঃ ছবিগুলি দেখলুম নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার থাকবার ঘরে যে সকল ছবি টাঙ্গান ছিল এ গুলিও ঠিক তাই। পিয়ানোর উপরিভাগে বীটোফেনের, হ্যাণ্ডেলের ও মেণ্ডেলসনের প্রতিমূর্ত্তি ঝুলান ছিল, আমিও ঠিক এই গুলিই সেখানে রেখেছিলাম। ভেনাস্ দি মিলোর মর্ম্মর মূর্ত্তি যা নাকি আমি প্রাচীন যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করতুম, এক কোণে তাও দেখলুম। টেবিলের উপর দান্তে, সেক্সপীয়ার, টলারের ধর্ম্মোপদেশ, থিয়লজিয়া জার্ম্মানিকা, রুকার্টের কবিতাবলী, টেনিসন, বার্ণস, এবং কার্লাইলের "পুরাতন ও বর্ত্তমান" প্রভৃতি পুস্তক রয়েছে ঠিক সেইগুলি যা আমার ঘরেও আছে এবং অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও যা সর্ব্বদা আমার হাতে হাতেই থাকত। আমি এই সব কথা ভাবতে লাগলাম, কিন্তু তখনই চিন্তা দূর করে দিলাম

এবং যখন স্বর্গগত প্রিন্সেসের ছবির সামনে দাঁড়িয়েছি, তখনি দরজা খুলে গেল এবং দুইজন বাহক (যাদের আমি ছোট বেলায় অনেকবার দেখেছি ঠিক তারাই) কাউন্টেস্‌কে কোচে করে ঘরের ভিতর নিয়ে এল।

সে যেন এক স্বপ্ন। বাহকেরা যে পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে না গেল সে পর্য্যন্ত একটা কথাও সে বলল না। মুখখানি ছিল ঠিক সরোবরের ন্যায় স্থির। তখন তার সেই পুরাতন, গভীর ও দুজ্ঞেয় চক্ষু আমার দিকে ফিরাল, প্রতি মুহূর্ত্তে মুখখানি উজ্জ্বল হতে লাগল এবং অবশেষে সমস্ত মুখশ্রীতে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল,—

"আমরা হচ্ছি পুরাতন বন্ধু, আশা করি আমাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি 'আপনি' বলে ব'লতে পারি না এবং জার্ম্মাণ ভাষায়ও যদি 'তুমি' না বলতে পারি ইংরেজীতেই বরং কথাবার্ত্তা কইব; আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছ ত ?"

এরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু একথা বুঝলাম যে এর মধ্যে কোন অভিনয় নাই। এখানে একটি প্রাণ আর একটি প্রাণের জন্য লালায়িত। এখানে এমনি একটা আন্তরিক আপ্যায়ণ ছিল যে দুই বন্ধুতে তাদের ছদ্মবেশ সত্বেও, তাদের কালো মুখোস পরা সত্বেও, দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রই একে আর এক জনকে চিনতে পারে। আগ্রহের সঙ্গে তার বাড়ান হাত ধরলাম এবং বললাম "দেবীকে যখন সম্বোধন করা যায় তখন আর 'তুমি' বলা চলে না।

তথাপি জীবনের বাহ্যিক রীতিনীতির এমনি একটা আশ্চর্য্য প্রভাব যে অতি মনের মতন জনের সঙ্গেও প্রাণের ভাষায় কথা বলা কতই না কঠিন। আমাদের কথোপকথন জমল না এবং আমরা উভয়েই সাময়িক-ভাবে একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। নিঃশব্দতা ভাঙলুম আমিই এবং যা মনে উদয় হচ্ছিল তাকে বলুম,—

"পুরুষেরা যৌবনকাল থেকেই খাঁচায় থাকতে অভ্যস্ত এবং মুক্ত বায়ুতে এসেও তাদের ডানা মেলতে সাহস পায় না এবং সদাই সশঙ্কিত যে উপরের দিকে উড়তে গেলেই না জানি কিসের সংঘাতে আসবে।"

সে বলল, "তা ঠিক, এবং অতি করুণ সত্য এবং এ ছাড়া আর কিছু হতেও পারে না। অনেক সময় সাধ যায়, পাখীরা যেমন বনে বনে উড়ে বেড়ায়, পরস্পর পরিচিত না হয়েও গাছের একই ডালে মিলিত হয় এবং একত্রে গান গায়, আমারাও জীবনযাত্রা তেমনি চালাই। কিন্তু হে বন্ধু, পাখীদের মধ্যেও পেঁচা ও চড়ুই আছে এবং এও একটা সুখের বিষয় যে জীবনযাত্রায় তাদের যেন জানি না এই ভাব দেখিয়েই তাদের পাশ দিয়া চলা ফেরা করতে পারি। যেমন কাব্যে, তেমনি সম্ভবতঃ জীবনেও। প্রকৃত কবি যেমন একটা বাঁধা ছন্দের মধ্যেও যা অতীব সুন্দর ও সত্য তা বলে যেতে পারেন তেমনি মানুষও সামাজিক বিবিধ শৃঙ্খল সত্যেও চিন্তার ও ভাবের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে পারে।

আমি প্লেটোর লাইন কয়টি উদ্ধৃত করলাম,

"অনন্ত বলিয়া যাহা হয়েছিল জ্ঞান
প্রতি যুগে, প্রতি দেশে;
বন্ধনবিহীন ভাবধারা, বদ্ধ যেন
ছন্দ ও অক্ষরের শৃঙ্খলেতে শেষে।"

মধুর ও দুষ্ট হাসি হেসে সে বলল, "হ্যা, আমি কিন্তু একটা সুবিধা ভোগ করি, সে হচ্ছে আমার সঙ্গহীনতা ও কষ্টের ভোগ। যে সকল যুবক যুবতীরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের বা ঘনিষ্ঠতার সুখ হতে বঞ্চিত অথবা তারা বা তাদের আত্মীয় স্বজনেরা যারা কেবলি ভালবাসার জন্য বা লোকে যাকে ভালবাসা বলে তার জন্য ব্যাকুল হয়; অধিকাংশ সময়েই আমি তাদের করুণার চক্ষে দেখি। এই ভাবে তারা অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলে। তাদের অন্তরে যে কী সব সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং উদারহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে আন্তরিক আলাপনে কি যে না জেগে উঠতে পারে তাও যুবতী মেয়েরা জানে না। আর নারীরা যদি যুবকগণের প্রাণের ভিতরকার নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বের দূরবর্ত্তী দর্শিকাও হয়, তবে যুবকেরা বীরোচিত কত সম্পদই না লাভ করতে পারে। কিন্তু তা হবার নয়, কারণ ভাল-বাসা বা লোকে যাকে ভালবাসা বলে এর মধ্যে এসে পড়ে তাই। এই বুক ধড়ফড় করছে, এই আশার লহর বয়ে যাচ্ছে, একখানি সুন্দর মুখ দেখে আনন্দ লাভ, কত রকম মধুর স্বপ্ন, অথবা হয়ত ভেবে চিন্তে বিচক্ষণ

সিদ্ধান্তেই আনা, সংক্ষেপতঃ সমুদ্রের সেই গভীর নিশ্চলতা যা নাকি মানুষের পবিত্র ভালবাসার সত্য স্বরূপ, এতে হয় কেবল তাকেই বিক্ষোভিত করা।"

হঠাৎ সে এইখানে থেমে গেল এবং তার মুখে যাতনার একটা ছায়া দেখা দিল। সে বলল, "আজ আর বেশী কথা কইব না. ডাক্তারের মানা আছে। মেণ্ডেলসনের একটি গান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, সেই দ্বৈত গীতটা। বন্ধুটি বহুদিন আগে তা বেশ বাজাতে পারত; পারত না?

আমি কিছুই বলতে পারলুম না; কারণ সেই মাত্র সে কথা বলা বন্ধ করল ও বরাবরের অভ্যাস মত হাত দুটি একত্র করল, তার হাতে একটি আংটী দেখতে পেলাম। আংটীটী কড়ে আঙ্গুলে পরেছিল। এই আংটীটাই সে আমাকে দিয়েছিল এবং আমি দিয়েছিলাম তাকে। আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষার অতীত। পিয়ানোর সামনে বসে গানটি বাজালুম।

বাজনা শেষ হ'লে তার দিকে ফিরে চাইলুম ও বললুম "একটি কথাও না কয়ে মানুষ যদি বাজনার সাহায্যে নিজেকে এমনি করে ব্যক্ত করতে পারত!"

"সে বলল, আমরা তা পারি, আমিত সবই বুঝতে পারলুম। কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারছি না। দিন দিনই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। উভয়কেই উভয়কে ক্রমে ক্রমে সয়ে নিতে হবে। আর এই হতভাগা চিররুগ্ন, নির্জ্জনবাসী নিশ্চয়ই কতকটা প্রশ্রয়ের আশা করতে পারে। কাল সন্ধ্যায় ঠিক এমনি সময়েই আমাদের দেখা হবে। হবে ত?"

তার হাত ধরলাম, হয়ত ওতে চুমোও খেতাম, কিন্তু আমার হাতখানি সে শক্ত করেই ধরেছিল এবং তাতে চাপ দিয়ে বলল "এই ত সব চেয়ে ভাল, বিদায়"।

আমি যদি হই পুরূরবা

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

মনের সীমায় জাগে অবিচল একটি ফাগুন,
তোমার হেলায় দীপ্ত প্রচণ্ড আগুন
নিভাতে কি পারিবে তাহায়
সকরুণ বেদনা-আভায়?

অয়ি প্রজ্ঞাময়ী!
এস তোমা কানে কানে সঙ্গোপনে দুটো কথা কই।
ক্ষত্রিয় আমার প্রেম তেজদীপ্ত যেন পুরূরবা
সৃষ্টির আদিম উষা তারি রূপে হোলো রাঙাজবা;
মানুষী প্রেমের তরে যত আয়োজন—
তোমাতেই হোলো সমর্পণ।

অয়ি গর্ব্ববতী!
তোমার কুমারী প্রেম মোর কাছে চিরতরে একান্ত অসতী।

যেথা ধূলিম্লান-রুক্ষ-চূর্ণ শীর্ণ মনের সংঘাত
ফরে আসে প্রতিক্ষণে নব করাঘাত;
সেইখানে আমাদের আত্মপরিচয়
মিলনের সেই ত সময়।
তুমি ভুলিও না কভু একমাত্র বিলাসী নায়িকা—
রচ যতো বীর আখ্যায়িকা
তারা হোক সদা পুষ্পমান—;
একবারে ভুলে হও বেদনায় সবার সমান।
সেই বিশ্বময়া প্রেমে একমাত্র মোর অধিকার।
করিলাম তাই অঙ্গীকার—
তুমি রবে একান্ত নিভৃতে
মোর দেহ ভিতে।

দুষ্টুমি

—গল্প—

কুমারী প্রভাবতী বসু

[গল্পের নায়কের সব তাতেই একটু দুষ্টুমি করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। এই ভাবেই এক কনে দেখিতে গিয়া কি ভাবে সে মনের মত জীবন-সঙ্গিনী পাইয়াছিল লেখিকা সরসতার সহিত তাহারই মনোরম বর্ণনা এই গল্পে দিয়াছেন।]

বেলা প্রায়ই আমায় বলিত দাদা, তুমি ভারি দুষ্ট। এই দুষ্ট বদনামটা অবশ্য অমূলক নয়। বি, এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাড়ী আসিয়া বলিলাম আমি গণিতে ফেল করেছি। মা ও বেলা ভাবিয়া অস্থির, এমন সময় বন্ধুর দল আসিয়া হাজির সটান মার কাছে। কেননা তাঁহার ছেলে ফার্ষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাদের একটা খাওয়া পাওনা, মা ও বেলা শুনিয়া কাঁদিবে কি হাসিবে ঠিক করিতে পারিল না—পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় আমি সত্য প্রকাশ করিলাম। বেলা হাসিয়া বলিল দাদা—তুমি ত ভারি দুষ্ট!

নির্ম্মল বাবুকে দেখিয়া আসিয়া বেলার সহিত চুপি চুপি অবশ্য খুব গম্ভীর মেজাজে বলিলাম দ্যেখ্ বেলা, তোর জন্যে যে বর ঠিক করেছি সে চোখে ভাল দেখতে পায় না। বেলা বোধ হয় বিশ্বাস করিল, কেননা তার পর হইতে তার মুখ ভার দেখিয়াছিলাম।

বেলার বাসর ঘরে একদঙ্গল ছেলে মেয়ে মিলে গানের হর্‌রা চালাচ্ছি এমন সময় বেলা হাসিমুখে চুপি চুপি বলিল—দাদা, তুমি ত ভারি মিথ্যাবাদী? আমি বুঝিলাম কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। বলিলাম কেন নির্ম্মল বাবু দেখতে পান্‌না বলেছিলাম তাই? বেলা বলিল হ্যাঁ। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে গান থামিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলাম আমার একটা নিবেদন আছে। সকলে সমস্বরে বলিল নির্ভয়ে বলতে পার।

বেলার বিয়ের আগে আমি তাকে বলেছিলাম যে নির্ম্মল বাবু চোখে ভাল দেখতে পান্‌না। এই কথা নিয়ে বেলা এখন অনুযোগ করছে যে আমার অপবাদ মিথ্যা। আমি আমার স্বপক্ষে এই বলতে চাই যে নির্ম্মল বাবু যদি চোখে ভাল দেখতে পেতেন তা'হলে কখনই চশমা নিতেন না। আর খালি চোখে তিনি ভাল দেখতে পান্ কি না পান তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হোক্। সভাশুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বেলা লজ্জায় মুখ ফিরাইল। পরদিন বেলা আমায় বলিল—দাদা, তুমি কি বলে কাল অত লোকের সামনে আমায় অপমান করলে? তুমি ভারি দুষ্ট কিন্তু।

এম, এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিতেই দেখি বেলা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। ভাবিলাম এখন দিন-কতক বেশ আমোদে কাটাইতে পারিব কেন না পড়া-শুনার বালাই ত নেই। কিন্তু আর এক বিপদে পড়িলাম। মা ধরিলেন পড়া শোনা ত শেষ করলি এখন বে-থা করে সংসারী হ। আমি প্রথমে অমত করিলাম, কিন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন পিতৃপুরুষে একটু জলের ব্যবস্থাও করবিনে? —এই রকম কত কি। বেলা কিন্তু মার উপর গেল। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে প্যান্ প্যান্ করিতে লাগিল—দাদা, বৌদির মুখ দেখাও।

একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলাম কেন ঝগড়া করবার লোক অভাব হয়েছে তাই বুঝি? যদি তাই হয় তা'হলে কাল ঠানদিদের বাড়ী গিয়ে যে বৌদিদের দল আছে তাদের সঙ্গে এক হাত ল'ড়ে আসিস; তাদের যদি হারাতে পারিস তাহলে আবার নতুন বৌদির জন্যে আব্দার করিস্।

কেন ঝগড়া করবার জন্যে বুঝি বৌদির দরকার হয়?

আমি ত তাই ভাবি, শ্বশুর বাড়ী কাজ কর্ম্ম করবি, আর এখানে চুপচাপ খাবি আর ঘুমোস।

সেই জন্যেই ত পেটটা খারাপ করে অর্থাৎ ভাল হজম হয় না। যদি ঝগড়াটা আস্টা করা যায় তাহলে ভাল হজম হবে, কোনও অসুখ করবে না। তোর ইচ্ছেটা বোধ হয় সেই রকম কিছু?

দেখ দাদা, তুমি যা তা বলতে আরম্ভ করেছ। সত্যি দিন দিন তুমি ভারি দুষ্ট হচ্ছ।

বেশ স্বীকার করছি যে তুমি কোন অজ্ঞাত মহতো-দ্দেশে আমার বৌ আনবার অনুরোধ কচ্ছ। ভাল, কিন্তু আমারও ত একটা পছন্দ আছে। আমি পাড়াগেঁয়ে দ্বিতীয় ভাগ পড়া মেয়ে বিয়ে করতে পারব না।

তবু ভাল এতদিন বাদে সুর দিলে। কিন্তু তুমি যে সহরে বিদ্বান মেয়ে চাচ্ছ সে কি তোমায় রোজগার করে খাওয়াবে?

তার রোজগার আমি খেতে চাই না। তবু আমি যেমন এম, এ, বৌটিও যে নিতান্ত মূর্খ হবে, সে হবে না।

তাহলে দেখছি তোমার বৌএর জন্যে বিশ্বকর্ম্মাকে অর্ডার দিতে হয়। নইলে তুমি যেমনটি চাইচ তেমনটী হয়ত মিলতে পারে; কিন্তু আমি, মা ও তুমি এই তিন জনের মনের মত একটা মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে?

তবে তোদের যাকে ইচ্ছে ধরে দে। বলিয়া গম্ভীর মেজাজে রহিলাম। বেলা কিছু না বলিয়া মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল যাক্ দাদা, তোমায় আর কখনও বৌ আনবার জন্যে বিরক্ত করব না।

আমি গোড়া থেকেই বেলাকে রাগাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহাকে রাগিতে দেখিয়া আর হাসি চাপিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে ডাকিলাম রাগ করে চল্লি যে? শোন্! বেলা ফিরিল। আমি বলিলাম বেলা তোরা পছন্দমত মেয়ে ঠিক কর আমার কিছু অমত নেই। ভাবিলাম যদি বিয়েই করতে হয় ত এদের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

পরদিন দুপুরে পান চিবাবতে চিবাইতে একটা মাসিক পত্রিকা খুলিতেছি এমন সময় মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন চন্দনপুরের যতীন বোসের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করেছি। মেয়েটী খুব ভাল; তবে গরীব, পয়সা কড়ি দিতে পারবে না—বাপ নেই কিনা। হঠাৎ মনে পড়িল, চন্দনপুরের যতীন বোস নিখিলের মামা নয়? নিখিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, একই গ্রামে বাড়ী। অমনি মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল। চুপ করিয়া রহিলাম—আমার মৌনভাব দেখিয়া মা একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন। কিরে রমু? চুপ করে রইলি যে? তোর মত নেই নাকি? টাকা ত সকলে দিতে পারে না। আর তুই নিজেই ত পণপ্রথার বিরোধী! মা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে আমি টাকার কথা চিন্তা করিতেছি। আমি বাধা দিয়া বলিলাম না না আমার কিছু অমত নেই। কিন্তু আমার বন্ধুর বাড়ী থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত কোন পাকা কথা দিও না।

কোথায় বন্ধুর বাড়ী যাবি? একথা ত আগে জানাস্‌নি?

একথা আজকের আগে জানতাম না, তা তোমায় কেমন করে জানাব? দু-এক দিনের ভেতর বেরিয়ে যত শীগ্‌গীর পারি ফিরবো।

বেশ তাই হবে বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। বোধ হয় আমার সুমতি দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল।

মিথ্যা কথায় কোন দিনই পেছপা ছিলাম না, সেজন্য বন্ধুর বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে মিথ্যা কথাটা মায়ের সম্মুখে উচ্চারণ করিতে মোটেই বাধিল না।

মাসিক পত্রিকায় আর মন বসিল না, তখনই নিখিলের বাড়ী গেলাম। নিখিলের সহিত অনেকক্ষণ যুক্তি করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

যুক্তিমত নিখিল পরদিনই মামার বাড়ী গেল। বহু-দিন পরে বিধবা মামী তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে সেখানে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধও করিলেন। তিনি বোধ হয় নিখিলের নিকট এ আশাটুকু ও রাখিতেন যে তাদের গ্রামের রমেশের সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহে সাহায্য করিতে পারে।

নিখিলও বিশেষ অমত করিল না বলিল আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে যা'বার ঠিক রয়েছে; তবে তোমরা যখন ধরেছ তখন আর কি করি? কিন্তু আমায় যদি রাখতে চাও তাহ'লে আমার বন্ধুকেও রাখতে হবে।

কেননা তার শরীরটা খারাপ হয়েছে; কিছুদিন আমার সঙ্গে বিদেশে কাটাতে চায়। তা, এ গ্রামটা যে রকম স্বাস্থ্যকর তাতে তার এখানে আসতে বোধ হয় অমত হবে না—বিশেষতঃ যদি আমি বলি।

মামিমা জিজ্ঞাসা করিল—কেন, তার অসুখ হয়েছিল নাকি?

না অসুখ কিছু করেনি, তবে এইবার আমাদের সঙ্গে এম, এ দিয়েছে কিনা, খুব পড়তে হয়েছে; তাই শরীর একটু খারাপ হয়েছে।

বন্ধুটির বাড়ী কোথায়? নাম কি?

বাড়ী শ্যাম বাজারে; নাম শৈলেশ।

কিন্তু কলকাতার ছেলে কি এমন পাড়াগাঁ পছন্দ করবে?

আজকাল কলকাতার অনেক লোক পাড়াগাঁ পছন্দ করেন। তা ছাড়া, এখন এখানে কলকাতার চাইতে অসুবিধা হলেও, আমার অনুরোধ শৈলেশ এড়াতে পারবে না।

যা ভাল বোঝ তাই কর বাবা।

হ্যাঁ, আজই তাকে আসতে লিখে দিই। বলিয়া নিখিল অন্যত্র চলিয়া গেল।

আমাকে চিঠি লিখিবার সময় শৈলেশ মামাত বোনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁ রাণু, তোমার কি কি কার্পেট না সুতো চাই, তার একটা ফর্দ দাও; আর পশমের নমুনাও ঐ সঙ্গে দিও।

রাণু কহিল চাই, অনেক কিছু, কিন্তু দাম ত আজ দিতে পারব না। মা কাল টাকা পাবেন।

তোমাকে টাকার জন্যে ভাবতে হবে না—কি কি চাই তাই ফর্দ করে দাও। রাণু ফর্দ করিয়া দিল।

যথাসময়ে নিখিলের প্রেরিত চিঠি ও ফর্দ পাইয়া পর দিনই যাত্রা করিলাম।

ট্রেনে বসিয়া কত কী চিন্তা করিতেছি, কিন্তু সবই এলোমেলো বোধ হইতেছে। মাঝে মাঝে নিজের কার্য্যকলাপের কথা ভাবিয়া হাসিতেছি। তখন সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন। দুপাশের মাঠগুলা ধুধু করিতেছে। মাঠের শেষে গ্রামের গাছপালা ঠিক ছবির মত দেখাইতেছিল। আমি আনমনে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় চন্দনপুরে পৌঁছিলাম। গাঁয়ের লোকের নিকট যতীন বসুর বাড়ী জানিলাম। যখন যতীন বাবুর বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একটু আগাইয়া দেখি সম্মুখের তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা দিয়া এক নারী মূর্ত্তি গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেছে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরে মূর্ত্তি উঠিলে প্রদীপালোকে দেখিলাম যে মূর্ত্তিটী স্ফুটনোন্মুখ কমল তুল্য এক কুমারীর। বুঝিলাম ইহাকেই মা আমার ভাবী জীবন-সঙ্গিনী স্থির করিয়াছেন। মনে খুব তৃপ্তিও পাইলাম কেননা এমন সুন্দরী কখনও আমার চক্ষে পড়ে নাই। তার বনফুলের ন্যায় এই পাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দরী থাকিতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। সুতরাং এমন রত্ন ধারণ করিতে পারিব ভাবিয়া নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিলাম।

নিখিল বাড়ীতেই ছিল। আমার হাত মুখ ধোয়া হইলে মামীমা ও রাণুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। রাণুর পরিচয় অবশ্য দেওয়ালের পার্শ্ব হইতে হইল। কারণ রাণু কিছুতেই আমার সম্মুখে আসিতে স্বীকৃত হইল না—বুঝিলাম পাড়াগাঁয়ের লোকের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পরদিনই পাড়ায় রাষ্ট্র হইল যে আর একজন এম, এ গ্রামে আসিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে দেখা করিতে আসিলেন, কাহারও সহিত পথে ঘাটে পরিচয় হইল। সকলেই খুব ভদ্রতার সঙ্গে আমার সহিত আলাপ করিলেন। নিখিলের সহিত পরিচয় তাঁদের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। একজন মাষ্টারমশায় তাঁদের স্কুল পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করিলেন। গ্রামের ক্লাব ও থিয়েটার পার্টির নিমন্ত্রণও বাদ পড়িলাম না।

স্কুলে গেলে সমস্ত শিক্ষক মহোদয়গণ মিলিয়া আমাকে লেকচার দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু সকলের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পণই বজায় রহিল। কখনও বক্তৃতা দি নাই কিন্তু সেদিনকার বক্তৃতাটা নাকি খুব ভাল

হইয়াছিল তাই নিখিল নিজেই আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল—হ্যাঁরে, তোর পেটে পেটে এত বিদ্যে!

পথে কতকগুলি ভদ্রলোক আমাদের সহিত আলাপ জমাইলেন। দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা বকাবকি করিয়া গলাটা শুকাইয়া গিয়াছিল, তাই কোন গতিকে পাশ কাটাইয়া জল খাইবার জন্য বাড়ী আসিলাম।

যে ঘরে আমি ও নিখিল থাকিতাম সেটা বাহিরের দিকে, ভিতরে যাইবার দরজাও আছে। আমি ঘরে ঢুকিতেই রাণুর গলা শুনিলাম। সে মামীমাকে বলিতেছে মা, শৈলেশদা আজ স্কুলে খুব ভাল লেকচার দিয়েছে। পেঁচদা, কেষ্টদা এরা বলছিল যে ওরকম বিদ্বান লোক দেখা যায় না।

আমার সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, দেখি আমার উপর ইঁহাদের ধারণা কি!

মামীমা বলিলেন তা ঠিক। নিখিল বলে যে ও রকম ছেলে তাঁদের ক্লাসে আর নেই—বরাবরই ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এত বিদ্যে থাকতে ও যে একটু অহংকার নেই এইটে আশ্চর্য্য!

হ্যাঁ, আর উনি যে বড়লোকের ছেলে তা কিন্তু কেউ ওর কথা শুনে বুঝতে পারে না। ক্লাবে পঁচিশ টাকা দিয়েছেন আর—

রাণু আর কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকিয়া বলিল কি রে। আড়ি পেতে কি শুনছিস? আমি চোখ টিপিয়া চুপ করিতে বলিলাম। নিখিল হাসিল। আমি বলিলাম এক গ্লাস জল দিতে বলত?

নিখিল কিন্তু চ্যাঁচাইয়া উত্তর দিল তোর মুখ নেই? চেয়ে খেতে লজ্জা করে বুঝি? আমি প্রমাদ গণিলাম!

নিখিলের কথায় মামিমা আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে অনুযোগ করিয়া কহিল "দেখ মামিমা, শৈলেশের কাণ্ড। স্কুলে পাঁচশ লোকের সামনে লেকচার দিতে পারে আর বাড়ী এসে জল চাইতে লজ্জা করে।

মামিমা হাসিয়া কহিলেন—সে কি বাবা, তুমিও যা নিখিলও তাই। আমার এখানে লজ্জা করলে চলবে না। পরে রাণুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন রাণু তোর শৈলেশদাকে জল আর পান এনে দে তো।

পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের বয়সী কতকগুলি যুবক আসিয়া আমাকে ও শৈলেশকে ক্লাবে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখি অনেক লোক। সকলে আমাদের গান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। নিখিল গাহিতে জানিত না বটে কিন্তু খুব ভাল প্লে করিত। তাহাকে গাহিতে বলিলে সে স্পষ্টই বলিল যে গান আমার দ্বারা চলিবে না; সে যে প্লে করে সে কথাও গোপন করিল না।

গোটাকতক হিন্দুস্থানী ও বাঙলা গানের পর সকলে ধন্য ধন্য করিয়া বলিল যে তাহারা এমন গান কখনও শোনে নাই। আমিও ভাবিলাম কলিকাতায় ওস্তাদকে যে টাকা খাওয়াইয়াছি তাহার সার্থকতা আজ মিলিল।

পরদিন পাড়ার সবার মুখে আমার গানের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি সকলের ভালবাসাও যেন গাঢ়তর হইল। রিহার্সালে নিখিলও খুব নাম কিনিল।

একদিন দুপুরে কি একখানা নাটক পড়িতেছি, এমন সময় নিখিল ও রাণুর কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। রাণু বলিল নিখিলদা, তোমাদের গান ত পাড়ার সবাই শুনলে, আমাদের একদিন শুনিয়ে দাও না।

আমি ত গাই না, যে গায় তাকে বল।

আমি পারব না, তুমি বল।

শুনবে তুমি আর আমি বলতে যাব? কেন আমার কি দায় পড়েছে? বলতে হয় তুমি বলগে।

যাক্ বাপু, আমি শুনতে চাই না বলিয়া রাণু রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নিখিল হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া বলিল কেমন শুনলি ত? রাণু তোর গান শুনতে চেয়েছে।

আমিও হাসিয়া উত্তর দিলাম বেশ আয়োজন কর সেদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীতেই মজলিস বসিল।

অভ্যাসমত পরদিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিন্তু মাকে চিঠি লিখিবার জন্য তাড়াতাড়ি একাই বাড়ী ফিরিলাম। ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি এমন সময় রাণুর ও তার সমবয়সী একটী মেয়ের কথোপকথন শুনিলাম। মেয়েটী বোধ হয় রাণুর বন্ধু হবে। রাণু

বলিল দেখলি ত সই, কাল শৈলেশদা কেমন গাইলে? অমন গান কখনও শুনেছিস? উত্তর আসিল সত্যিই অমন গান কখনও শুনিনি। "শুধু গান নয়, অমন লেখা পড়াও আমাদের গ্রামের কেউ জানে না। পেঁচদা, কেষ্টদা এরা সবাই সেদিন ওর লেকচার শুনে বলছিল যে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া "দোহাই তোর থাম্—আর শৈলেশদার গুনকীর্ত্তন করতে হবে না। বাবা! আজ দুদিন ধ'রে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর বাইশ ঘণ্টা শৈলেশদার কথা আওড়াচ্ছিস্। কেন বল্ তো? বলি স্বয়ম্বরা হবি নাকি?"

"দূর আমি স্বয়ম্বরা হব কেন, তুই হ।"

আমি একবার হয়েছি, তাই আর উপায় নেই; কাজেই আশা করিনে। তোর হয়নি, তুই হ। যাই কাকিমাকে বলিগে যে তোমার মেয়ের জন্য আর বর খুঁজতে হবে না।

ছি, ছি, কি যে বলিস ভাই তার ঠিক নেই; আর শৈলেশদা শুনলেই বা কি মনে করবেন?

কি আবার মনে করবেন? মনে ভাববেন যে তাঁর জন্যে একজন গোপনে মালা গাঁথছে!

হ্যাঁ, বয়ে চাচ্ছে আমার মালা গাঁথতে; বড়লোকের মেয়েরা গাঁথুক কেননা তারা ওসব বড়লোকের ঘরে যাবার আশা করে।

দেখ, আমি তোর সই। আমার কাছে তোর মনের কথা গোপন করতে পারবি না। মিথ্যে কথা বলে অন্যকে ঠকাতে পারবি কিন্তু আমায় নয়। আজ কদিন থেকে তোর ভাব গতিক দেখে বেশ বুঝেছি যে তুই মজেছিস। ঐ ত সেদিন, আমাদের বাড়ী গিয়ে পাঁচ মিনিট ব'সতে ব'সতে চ'লে এলি—কিনা নিখিলদাদের পান দিতে হবে। কেন কাকিমা কি দিতে পারতেন না? সেদিনও এখানে এসে দেখি তুই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর কি দেখছিস। আমি আস্তে আস্তে তোর পেছনে দাঁড়িয়ে দেখি যে শৈলেশবাবু কি একখানা বই পড়ছেন আর তুই হাঁ করে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে রয়েছিস—আমার আসাটাও টের পেলি নে। এ সব কিসের চিহ্ন বল্ ত?

দেখ, ষাঁড়ের মত চেঁচাসনে। লোকে শুনলে কি ভাববে?

বেশী লোককে শোনাব না, তোর মাকে শুনিয়ে আসি।

তোর পায়ে পড়ি ভাই, বেলেক্কারী করিসনে।

বন্ধুটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমি পানের খুব গোঁড়া ভক্ত। নিখিলের নিকট রাণু বোধ হয় তাহা শুনিয়া থাকিবে। তাই যখন তখন আমার পানটা ঠিকই আসিত। একদিন সন্ধ্যায় নিখিল কতকগুলি পান আনিল। আমি দুটা মুখে দিয়া বলিলাম বেশ পান ত। এমন পান কলকাতার দোকানেও সাজতে পারে না। উত্তর রাণু নিখিলকে দিয়া বলাইল—কেন ভাল লাগে না বলে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?

আমিও উত্তর দিলাম ঠাট্টা নয়, এমন পান কখনও খাইনি, সত্যই এ পানের কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

এবার নিখিল নিজেই উত্তর দিল। বলিল তাহলে ঐ সঙ্গে যে পান সেজেছে তাকেও মনে থাকবে বোধ হয়।

আমি হাসিয়া বলিলাম তা থাকবে বৈকি।

একদিন দুপুরে কোথায় আড্ডা দিতে বাহির হইয়াছিলাম। বেলা বোধ হয় তখন ৩টা, এমন সময় বাড়ী ফিরিয়া—দেখি, আমাদের থাকিবার ঘরটিতে রাণুর সেলাই এর বাক্স—কিন্তু রাণু নাই। বুঝিলাম রাণু সেলাই করিতে করিতে কোথাও উঠিয়া গিয়াছে। আমি একাই আসিয়াছিলাম; সুতরাং এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না বাক্স খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলাম তাহাতে কি কি আছে। দেখিলাম অধিকাংশই টেবিল ক্লথ, কার্পেট ইত্যাদি, কোনটা শেষ হইয়াছে, কোনটা অর্দ্ধ সমাপ্ত। কিন্তু প্রত্যেক কাজটি নিখুঁত। ভারী খুসী হইলাম। তলায় একটা গরদের রুমাল চোখে পড়িল। রুমালটার এক কোণে একটা রেশমের ফুল তোলা—আর তার ভেতর লেখা "রাণু"। রুমালখানি খুব ভাল লাগিল। হাতে করিয়া দেখিতেছি এমন সময় রাণু ঘরে ঢুকিয়াই আমার সামনে পড়িয়া গেল। আমি তাহার দিকে চাহিতেই চোখো চোখি হইয়া গেল—সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া চলিয়া গেল। আমি রুমালখানাকে নড়াচাড়া করিয়া নিজে নিজে—অবশ্য রাণুকে শুনাইয়া

বলিলাম বাঃ বেশ রুমালত। নাঃ, এখানাকে ছাড়ছি না। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পকেটস্থ করিয়া বাহির হইয়া গেলাম। রাণু কিছুই বলিল না। তারপর যে কয়দিন ছিলাম সে কদিনের ভেতর রুমালের কথা আর শুনি নাই—বুঝিলাম রাণুর রুমাল দিতে আপত্তি নাই।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাস, দাবা আড্ডা গান বাজনা, ইত্যাদির মধ্যে কাটিল। দিন কতক বাদে একদিন বাড়ী যাইবার কথা তুলিলাম। মামিমা বুঝাইয়া বলিলেন এইত মোটে সাত আট দিন এসেছো। এরই মধ্যে যাবে কি? আরও দু চার দিন থেকে তারপর যাবে।

নিখিল ও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিল গুরুজনের কথা ঠেলিস নে। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়েই বা করবি কি?

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম আর কত দিন এঁদের গলগ্রহ হয়ে থাকব?

মামিমা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন মামিমা গরীব বলে হয়ত একথা বলতে পারছ। তা বাবা তুমি বড় লোকের ছেলে—হয়ত কষ্ট হচ্ছে, কাজেই থাকবার জন্যে জোর করতে পারিনে।

আমি এই স্নেহের দাবী উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বলিলাম মামিমা ওসব কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না। আমি আরও দিন কতক থাকবো।

মামিমা আনন্দের সহিত হাসিয়া কহিলেন সত্যি বাবা, তোমরা যে কদিন এখানে এসেছ, সেই থেকে কি আমোদে আছি তা বলতে পারি নে। সেই জন্যই আরও দু একদিন তোমাদের রাখতে চাই। মামিমা চলে গেলেন। রাণু সে দিন রাঁধিতে ছিল, কাজেই আমাদের এসব কথা শুনিতে পাইল না।

পরদিন দুপুরে মামিমা পাড়ায় কাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে নিখিল, আমি ও রাণু। নিখিলের একটু মজা করিতে ইচ্ছা গেল, সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রাণুকে ডাকিয়া বলিল রাণু কালত আমরা চলে চ, সমস্ত ঠিক ঠাক করে গুছিয়ে রাখ।

রাণু মৃদুস্বরে উত্তর দিল—সে কি? কাল কোথায় যাবেন? কাল যাওয়া হতেই পারে না।

তা আমি না যাই শৈলেশকে যেতেই হবে।

না, উনিও যাবেন না।

কেন উনি যাবেন না কেন?

তোমরা এক সঙ্গেই যেয়ো।

আমার তাই ইচ্ছে; কিন্তু ও ত থাকতে চাইছে না।

যদি না থাকেন তা হলে ত জোর করে ধরে রাখবার অধিকার নেই। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল কেন ওর কি খুব দরকারী কাজ আছে?

না দরকারী কাজ আর কি? একজামিন দিয়ে এসেছে এখন ত ছুটি।

আর থাকলেও ত যেতে পারবেন না, কেননা কাল মাসের পয়লা, পরশু বৃহস্পতি বার, তরশু মঘা। যেতে গেলে শনিবারের আগে দিন নেই। তুমি যে পাঁজিপুথি দেখে বসে আছ দেখছি। তা তোমরা ওসব মান বটে শৈলেশ ওসব মানে না।

বাড়ীতে না মানুন আমরা দেখতে যাব না। কিন্তু যখন আমাদের এখানে এসে পড়েছেন তখন অদিনে অক্ষ্যানে কিছুতেই ছেড়ে দিত পারিনে।

নিখিল আমার দিকে ফিরিয়া একটু হাসিল, পরে রাণুর দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিল আমাদের এখানে আটকে রেখে কিন্তু তোমার লাভ হবে অতিরিক্ত খাটুনি—সে কথা যেন মনে থাকে। তার চাইতে আমাদের শীগগীর শীগগীর বিদেয় করে দিলে বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতে পারবে।

রাণু ভারী গলায় উত্তর দিল আমোদ করে কাটাই কি কি করে কাটাই তা ত আর তখন দেখতে আসবে না।

বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে নিখিল বলিল আমরা চলে গেলে তোমার দুঃখু হবে?

না আমোদ হবে বলিয়া চলিয়া গেল, বোধ হয় উচ্ছ্বসিত অশ্রু গোপন করিতে।

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল এই যে! মজেছে!

পরদিন দুপুরে শুইয়া আছি, এমন সময় মামিমা ঘরে ঢুকিয়া নিখিলকে বলিলেন বাবা পরশু ত বাড়ী যাচ্ছো। রাণুর বিয়ের কথাটা যেন মনে থাকে।

সে আর বলতে হবে না। রমেশ নিখিলেরই মত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বললেই সে বিনি পয়সায় রাণুকে বিয়ে করতে রাজী হবে। আর রমেশের মায়েও মত আছে শুনলুম।

হ্যাঁ ছেলের মায়ের খুব মত আছে। এখন তুই ধরে ছেলের মত করাতে পারিস ত হয়।

সে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি সমস্ত যোগাড় কর। ওদিককার ভার আমার।

বাড়ী আসিবার দিন সকালে স্থটকেশ গোছাইতেছি এমন সময় রাণুর সেই সইটির গলা শুনিলাম। সইটী বলিলেন—হ্যাঁরে রাণু! তোর শৈলেশদারা আজ চলে যাচ্ছে নয়?

রাণু ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

ওকি কাঁদছিস? তা কেঁদে আর কি করবি বল? কাঁদলে ত আর কিছু উপায় হবে না। তার চাইতে বরং ভগবানকে ডাক। তিনিই তোর মুখ রক্ষে করবেন।

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। × × ×

নিখিলের উদ্যোগে বিবাহের সমস্ত ঠিকঠাক হইল। বিবাহের দিন সাতেক আগে নিখিল পুনরায় রাণুদের বাড়ী গেল। কারণ এখন সে কন্যাকর্ত্তা, তাহাকেই সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে। আর মামিমা তাহার উপর ভার দিয়াই অবসর হইয়াছেন। বিবাহের দিন দুই আগে নিখিলের একখানা পত্র পাইলাম।

ভাই রমেশ,

আজ দুদিন এখানে এসেছি; কিন্তু আগেকার মত আমোদ পাইনা—বোধ হয় তুই নেই বলে। আর একটা আশ্চর্য্য খবর দিচ্ছি, শুনে সুখী হবি কি কষ্ট পাবি জানিনে।

রাণুর ভেতর ভয়ানক একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। এই কদিনে সে যেন খুব কতকটা লম্বা হয়ে গেছে। যতই বিয়ের দিন নিকটে আসছে সে যেন ততই শুকিয়ে যাচ্ছে। আগেকার হাসি আর চপলতা সে যেন কত যুগযুগান্তর হারিয়ে ফেলেছে। দেখলে মনে হয় যেন তার বয়স এই কদিনে তিন চার বছর বেড়ে গেছে কারও সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না। প্রায়ই চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

আমি সে দিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হ্যা রাণু, তুই আর আগেকার মত হাসিস না কেন?

সে একটা ছোট্ট উত্তর দিলে 'হাসি আর পায় না।'

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ বাদে কাল বিয়ে এখন কোথায় আমোদ করে বেড়াবি, তা নয়, দিন-দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছিস। ব্যাপার কি বল দিকিনি?

'আমোদ আর এ জীবনে দরকার নেই যা করেছি তাই ঢের।'

রমেশকে দেখিসনি তাই ও কথা বলছিস। তাকে পেলে আবার হাসির ফোয়ারা ছোটাবি।

সে আর উত্তর দিতে পারিল না, মুখ ঢাকিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। বুঝিলাম আমাদের হাসি তামাসা তার মৃত্যুবাণ।

এই সব চোখের উপর দেখে আমি যে কি করে এতদিন সত্য গোপন করে আছি সে আমি জানি—তুই হলে বোধ হয় পারতিস না; আজ সকালে আর থাকতে না পেয়ে রাণুদের সব কথা খুলে বলেছি; আমার কথা শুনে সে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি—শুধু আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আমি তখন বুঝিয়ে বললাম যে শৈলেশ ও রমেশ একই লোক; তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—আনন্দের বন্যা রোধ করতে না পেরে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। আমি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, খুব ভক্তি যে? সেও হাসি মুখে উত্তর দিলে, হবে না? তুমি যে এখন উদ্ধারকর্ত্তা।

কিন্তু একটা ভয়ানক বিপদ হয়েছে। সে এই কয়-দিনের রুদ্ধ মুখ এমনি বেগে ছুটিয়াছে যে আমি তাল সামাল দিতে পারছি না। এই কয়ঘণ্টার ভেতর সে অন্ততঃ পাঁচশ প্রশ্ন করেছে—আমার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হবার যোগাড়।

এখানকার অন্যান্য খবর ভাল। তুমি আমার ভালবাসা জেনো। কাকিমাকে প্রণাম দিও। ইতি নিখিল

বলা বাহুল্য নির্দ্দিষ্ট দিনে রাহুকে পাইলাম। বাসরে রাহুর সেই বন্ধুটির সহিত পরিচয়। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি শৈলেশ বাবু, আপনি রমেশের যায়গায় কেন? আমিও উত্তর দিলাম আপনিইত আমার পাওনা গণ্ডা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এখন আশ্চর্য্য হলে চলবে কেন? মনে করে দেখুন দেখি স্বয়ম্বরার ব্যবস্থাটা কে করেছিল?

সে কি? তুমি কি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছ নাকি?

আড়ি পেতে শুনতে যাব কেন? আপনারাই আমার সামনে বলেছেন।

আর না আঁটিতে পারিয়া রাহুর দিকে ফিরিয়া আরম্ভ করিলেন "হ্যা সই, এর মধ্যে সব পরিচয় দিলি কি করে? তুই কি মনে মনে কথা বলতে জানিস নাকি? নইলে কথা না কইতে তোর পেটের কথা অপরে জানলে কি করে?

দেখিলাম রাহু ঘোমটার ভিতর হইতে সইএর দিকে কোপাবিষ্ট নয়নে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যায় বেলা হাসিতে হাসিতে বলিল দাদা, এই বুঝি তোমার বন্ধুর বাড়ী যাওয়া?

আমি বুঝিলাম বেলা নিখিলের নিকট সমস্ত শুনিয়াছে তাই আমিও হাসিয়া উত্তর দিলাম ঠিক বন্ধুর বাড়ী নয়, তবে বধূর বাড়ী বটে।

রাহু বলিল তুমি ভারী দুষ্ট কিন্তু!

রাত্রে একথা ওকথার পর রাহুকে বলিলাম রাহু, আমার জন্যে কে গোপনে মালা গেঁথেছিল? রাহু আমার মুখের দিকে চাহিল। আমার হাসি দেখিয়া বুঝিল যে আমি তাহাদের গোপন কথা শুনেছি। তাই সেও হাসিয়া বলিল যাও, তুমি ভারী দুষ্ট; বলিয়া আমার বক্ষে মুখ লুকাইল।

আমিও বুঝিলাম যে আমার দুষ্টামির সার্থকতা এতদিনে মিলিয়াছে।

গান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ওই যেখানে পঞ্চমী চাঁদ যায় বেয়ে তার সোণার তরি
হয়ত সেথায় তোমায় আমায় প্রথম দেখা লো-সুন্দরী!
হয়ত সেদিন আলোছায়ে
জড়িয়েছিল তোমার গায়ে
শাদা মেঘের জংলীছাপা নীল আকাশের নীলাম্বরী!
হয়ত তোমার খোঁপায় ছিল লক্ষ তারার ফুল,—
চাঁপার গালে দোদুল ছিল অপরাজিতার দুল!
হয়ত সেদিন নয়নতারা
ছিল আমার পলকহারা
তোমার চোখে ছিল নবীন অনুরাগের স্বপন ভরি!

পরিবর্ত্তন

—গল্প—

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[ছোট গল্পে স্বল্প কথায় কত বড় ভাব ব্যক্ত করা যায় পরিবর্ত্তন গল্পটি তাহারই নিদর্শন।]

রাত্তির দশটা।

মোটরে করে বেড়িয়ে ফিরছি। পাশে তরুণী স্ত্রী। হুড খোলা, তাই সারা আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তারার চক্‌মক্‌ ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে……অন্ধকারের আঁচলের ওপর হীরের কুঁচি যেন ঝলমলিয়ে উঠছে।

মঞ্জরীর সুগন্ধমাখা হালকা আঁচল বার বার আমার সামনে ফেনিয়ে উঠছে আর আশে পাশের হাওয়াকে করে তুলছে মাতাল। তারার আলোয় দেখলাম তার কপালের ওপর কতকগুলো এলোমেলো চুল হাওয়ার সঙ্গে নাচছে।

সারাদিনের কর্ম্মকোলাহলের পর মঞ্জরীর এই নির্জ্জন সাহচর্য্যে দেহ আমার সতেজ হ'য়ে উঠল, কর্ম্মক্লান্ত মন আমার হারিয়ে ফেলল তার অবসাদের বোঝা।

হঠাৎ দূরে ফুটপাথের ওপর অস্পষ্ট গ্যাসের আলোয় দেখলাম ক'একজন দিনমজুর শ্রেণীর লোক। একজনের হাতে একটা ঢোলক্‌…মহা উৎসাহে সে তাতে আঘাত করে বেতাল বাজিয়ে চলেছে। আর একজন গ্যাসের আলোয় দুলে দুলে কি একটা বহুকালকার পুরানো হিন্দি বই পড়ছে ..বোধ হয় তুলসীদাসের রামায়ণই হবে। বাকী ক'একজন গল্প গুজব করছে, কেউ বা তামাক খাচ্ছে… আবার কেউ কেউ বা তাদের ছেঁড়াখোঁড়া গামছাকে ফুটপাথের ওপর বিছিয়ে শুয়ে কি একটা অবোধ্য হিন্দি গান গাইছে।

তাদের দেখেই মন আমার ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠল। ভাবলাম, কি সঙ্কীর্ণ এদের জীবন, কি অপ্রচুর এদের জ্ঞান! ভাবলাম, এ রকম করে' এরা বেঁচে থাকে কেন, এ রকম করে এদের দেহগুলোকে এরা টেনে নিয়ে বেড়ায় কেন‥ কেন এরা আত্মহত্যা করে এ রকম দুর্ব্বহ জীবনের করে না অবসান?

ক'এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার সুবৃহৎ গাড়ীটা গ্যাসের আলোয় ঝলমল্‌ করে উঠে এগিয়ে গেল আর তারা আমার চোখের সামনে থেকে হ'ল অদৃশ্য। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি ঐ লোকগুলোর স্পর্শে আশেপাশের বায়ুস্তর হয়ে উঠেছে বিষাক্ত, সেখানে নিঃশ্বাস নিতেও তাই বোধ হয় আমার হচ্ছিল ঘৃণা…কুণ্ঠা!

আর এক রাত্তির।

প্রায় দশটা বাজে। আমি আমার সুবৃহৎ গাড়ীটা করে আজও চলেছি। কিন্তু পাশে আমার জীবন-সঙ্গিনীটি নেই। কোর্টের সহায়তায় বিবাহ বিচ্ছেদ করে সে আজ আমারই এক বন্ধুর গলায় পরিয়েছে তার বর-মালা। মনে আমার শান্তি নেই…চিত্তে জ্বলেছে তীব্র আগুন! নিঃসঙ্গতা, নিঃসঙ্গতা আমাকে যেন সব সময়েতেই গ্রাস করতে আসে। নানা পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেদিনের সেই পথেই এসে পড়লাম।

হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ল।...দেখি সেই লোকগুলোই বসে রয়েছে! আজও সেই লোকটা সেই রকম উৎসাহেই বেতালে ঢোলক্‌ বাজাচ্ছে, আর একজন সেই হিন্দি বইটা সুর করে পড়ছে।

আজ কিন্তু কেন জানি না তাদের দেখে মোটেই আমার ঘৃণা হ'ল না। তাদের এই বাধাহীন আনন্দের ওপর সত্যিই হ'তে লাগল ঈর্ষ্যা। ইচ্ছে হতে লাগল আমার সমস্ত মান সম্ভ্রমের সূক্ষ্ম বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে যাই, আর নিজেকে বিলিয়ে দিই তাদের দলের ভেতরে।

মনে পড়ল আমার 'ব্যারিষ্টারীর' বিশাল 'প্র্যাক্‌টিসের কথা, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা। বুঝলাম, আমি আমার পাণ্ডিত্য আমার ঐশ্বর্য্য, আমার যশ নিয়ে সুখী নই… কিন্তু এর সুখী—হ্যা এরা সুখী এদের সঙ্কীর্ণতা নিয়েই, এদের ক্ষুদ্রতা নিয়েই।

ইটালীয় ছোট গল্প

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ,

ইউরোপীয় কথা সাহিত্যে ইটালীয় ভাষার স্থান খুবই উচ্চে। সুপ্রসিদ্ধ কবি দান্তে বর্ত্তমান ইটালীয় ভাষাকে পুরাতন ল্যাটিন ভাষার মতই অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন।

বাংলায় যাহাকে আমরা চতুর্দ্দশপদী কবিতা বলি তাহা ইংরাজী সনেটের অনুকরণ। সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার জন্মদাতা। ছোট গল্পের জন্মদাতা বলিতে গেলেও বলিতে হয় তিনিও একজন ইটালীয় লেখক, নাম বোকাসিয়ো। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু লেখক ছোট গল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত ছোট গল্পে বোকাসিয়োর লিপি কুশলতার ছাপ রহিয়া গিয়াছে। দান্তের ডিভাইন্ কমেডিয়া অনুকরণ করিয়া মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন মহাকাব্য সমূহ রচিত হইয়াছিল, বোকাসিওর প্রথায় ছোট গল্প রচনা করিবার প্রচেষ্টা তেমনি ইটালী এবং ইউরোপের লেখকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

তখন আভিজাত্যের যুগ ছিল। সমাজে স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করাই ছিল সকলের প্রধান কর্ত্তব্য। এই জন্য এই সমস্ত ছোট গল্পে আমরা শক্তিমান লেখকদিগকে সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা দান করিবার ছলে গল্প রচনা করিতে দেখিতে পাই। এই সমস্ত গল্পে আর্ট ও কবিত্ব থাকিলেও তাহা নীতির চাপে নিম্নে পতিত হইয়া যাইত। এইরূপ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইউরোপে ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন ছোট গল্পের আর্ট খানিকটা বদলাইতে থাকে। এখন হইতে ছোট গল্পগুলি নীতিশাস্ত্র বিশেষ হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর আগমনের সহিত বিজ্ঞান ও স্বাধীনতা আসিয়া যখন ইটালীকে জয়যুক্ত করে, তখন ইটালীর লেখকগণের মানস-চক্ষু খুলিয়া যায়। তাঁহারা তখন দেখিতে পান যে ইটালীর বাহিরেও এক বিস্তৃত জগৎ আছে — যাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারে যে মানসিক উন্নতিই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি, পুঁথিগত কতকগুলি ফরমুলা মানব জাতিকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে না। উচ্চে উন্নত, উন্মুক্ত ও অনন্ত বিস্তৃত গগন মণ্ডলের ন্যায়—মানব মস্তিষ্ক এক মহান, চির নূতন ও রহস্যময় আলেখ্য বস্তু, ইহাকে রূপে, ছন্দে, কাব্যে বিকশিত করিতে পারিলেই, মানব জন্মের প্রকৃত সার্থকতা হয়। ডারউইনের evolution theory হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের Neo philosophy, মিলের Rationalism, কান্টের আদর্শবাদ তখন তাঁহাদের উপাস্য বস্তু হইয়া পড়ে। এই সমস্ত ভাবের প্রতিবিম্ব লইয়া বর্ত্তমান ইটালীয় সাহিত্য রচিত হইতেছে। আমরা নিম্নে তাহারই একটু আভাস দিতেছি।

The Servant by Ada Negri, এই গল্পটী সনাতনী ভৃত্যের একখানি জ্বলন্ত নিদর্শন। যাঁহারা রবিবাবুর কথা ও কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন ভৃত্যের মহিমা অবগত আছেন। একটী বালিকা মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে নীত হয়। বাল্যাবধি তাহাকে ভৃত্যের কার্য্যাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কার্য্যে সে এমন দক্ষতা লাভ করে যে, পরে এই গৃহস্থের একমাত্র কন্যা বিবাহিতা হইয়া অন্যত্র গমন করিলে, এই রমণীকে তাহার সঙ্গী অভিভাবিকা হিসাবে প্রেরণ করা হয়। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে গমন করিলে পর উক্ত গৃহস্থের কন্যাটীর সাংঘাতিক পীড়া হয়। পারিবারিক দাসীটি প্রাণপণ

করিয়া তাহার সেবা করে। সে আরোগ্য লাভ করিলে সামান্য মাত্র পীড়ায় দাসী তাহার জীবন-লীলা সমাপ্ত করে। এই গল্পে লেখক পুরাতন যে সব ভৃত্য ঠিক ক্রীতদাস না হইয়াও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণকে সেবা করিতেন তাহারই আলেখ্য দিয়াছেন। ইহার মধ্যে খুব গভীর দীর্ঘশ্বাস রহিয়াছে।

The Promise—Ada Negri, শৈবলিনীকে বিবাহ করিব বলিয়া প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও বয়োবৃদ্ধির সহিত উহা রক্ষা করিতে পারিল না। ভাগ্য-দেবতা উহাদিগকে অন্যরূপে দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ করেন। কোন একটি গ্রাম্য বালক একটী বালিকাকে ভাল বাসিয়াছিল। বালিকাটী এই বালকের ভালবাসার মোহে অত্যন্ত তন্ময় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। হঠাৎ বালকের মনে উচ্চাশার আবির্ভাব হয়। রহস্যময়ী আমেরিকা তাহাকে প্রলুব্ধ করে। বালক প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে সে যদি ঐ গ্রামের বিখ্যাত একটী কারখানা স্বয়ং খরিদ করিতে পারে, তবেই বিবাহ করিবে, নতুবা নয়। তবে বিবাহ করিলেই ঐ বালিকাটিকেই করিবে।

বালিকা তাহাকে কত বুঝাইল, কিন্তু বালকটী তাহা শুনিল না। সে অগাধ সমুদ্র পাড়ি দিল। ক্রমশঃ ২০ বৎসর পরিশ্রম করিবার পর সে লক্ষপতি হইয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসে। প্রৌঢ় অবস্থায় পদার্পণ করিলেও দেশের বিখ্যাত সুন্দরীগণ তাহাকে পতীত্বে বরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। যুবক কিন্তু প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল। অবশেষে তাহার গ্রাম্য প্রিয়াও তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। এতগুলি বৎসরও তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বালিকাটী কাঁদিল—তাহার আত্মীয় স্বজন, সকলেই ইহজগতত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার প্রণয়পাত্রটি বলিল—মনে আছে, কারখানাটী এখনও খরিদ হয় নাই।

Another Man's Clothes. by Ginlio Caprin—এটি প্রেমেরই আখ্যান। ইহা অনেকটা দেবদাসের অনুরূপ। একটী যুবক একটী যুবতীকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য-দেবতা তাহাদের মিলনের অন্তরায় হওয়ায় যুবতীর অন্যত্র বিবাহ হয়। যুবক তাহার কান্তের স্মৃতি চিহ্ন বক্ষ মধ্যে ধারণ করিয়া তাহার জীবন কাটাইয়া দেয়। যৌবন গিয়া প্রৌঢ়ত্বে আসিলেও সেই স্মৃতি অম্লান থাকে।

প্রলয়

শ্রীঅমলেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী

নদীর তীরেতে বসিয়া বালক
বাঁধিয়া সূতাটি কমল-পাতে,
ছাড়িয়া দিয়াছে নদীর স্রোতে
রাখি সূত্যা তার আপন হাতে

কুতুহল ভরে দেখিছে বালক
ভাসিছে পাতাটি স্রোতেরই মুখে ;
পিপীলিকা তায় করে চলাফেরা
মজিয়া আপন সংসার সুখে।

সহসা বালক দিল টান পাতে
পদ্মের পাতা ডুবিল জলে,
পিপীলিকা সব মরিল ডুবিয়া
পাতা ভাসে পুন নদীজলে।

সুদূরে বসিয়া আছে সে বালক,—
পিপীলিকা মোরা জগত পাতে,
টানিলে সূতায় ডুবে যাব মোরা
ভাসিবে ধরা সে স্রোতেরি সাথে।



মাহেশে রথযাত্রা

(বাংলাদেশে শ্রীরামপুর মাহেশের রথই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে একটী বড় মেলা বসে এবং বহু জনসমাগম হয়)





খুকুর হাসি



সাপুড়িয়া

অভ্রপুষ্প

উপন্যাস

শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

—এক—

অমিতা ছেলেমানুষ, আর ওর এই ছেলেমানুষী ভারি সুন্দর মানিয়ে যায় ওকে। সবাই বলে, এই ছেলেমানুষীই ওর চরিত্রকে করে তুলেছে সুন্দরতরো। ওর চঞ্চলতা, ওর ছেলেমানুষী, যা ওর প্রতি ভঙ্গিমাটুকুতে বর্ত্তমান, তা অমিতার গৌরবের বস্তু।

ওকে দেখলে মনে হয় না যে ওর বয়স কুড়ি হ'তে পারে; তাছাড়া অমন নিটোল সুন্দর চেহারা দেখে কেউ মনেও ভাবতে পারে না যে ও এবারই গ্রাজুয়েট হলো।

অমিতা সত্যিই একটি বিস্ময়ের মতো মেয়ে—তা ওকে যেদিক দিয়েই বিচার করতে যান না কেনো! ওর চোখ দুটো এতো কালো যে, তা অনুমান করা যায় না। সত্যিই অমিতার চোখ উপমা দেবার মতো জিনিষ। শুধু তাই? অমিতা উজ্জ্বল, দীপ্তির মতো উজ্জ্বল; অমিতা সুন্দর ফুলের মতো সুন্দর।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্ত্তে অমিতাকে আমরা অন্যরকম দেখতে পাবো। ওর ওপর একটা রীতিমতো পরিবর্ত্তনের তুফান বইছে যেনো। কি বিশ্রিই ওকে লাগছে: সত্যিই এই মুহূর্ত্তে ওর দিকে চোখ পড়লে মায়া হয়। ও এখন উজ্জ্বল হলেও নিষ্প্রভ, সুন্দর হলেও ম্লান। কালোচুল রুক্ষ হয়ে, ওকে কী ভীষণ অস্বাভাবিক লাগছে। ওর নিটোল চোখে যেনো কে ব্যথার কাজল মাখিয়ে দিয়েছে।

এখন অমিতা নিজের ঘরে বসে,—মানে শোবার ঘরে আর কি! ভালো কথা মনে পড়লো; আমি যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম সুরভির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে! দিন রাত পড়ে, লেখে, ঐ নিয়েই আছে। কিন্তু অমিতা ওরকম একেবারেই সইতে পারে না অবিশ্যি বিয়েও যে ওদের বেশীদিন হয়েছে তা-ও নয়।

সুরভি প্রফেসর, একটু কী-রকম স্বভাব।

যাক্…বলছিলাম অমিতারই কথা।

অমিতা এখন ওদেরি শোবার ঘরে। এই একটু আগে, মানে যে কটা মুহূর্ত্তের মরণ এখনো অনুভব করা যাচ্ছে, সেই সময়ে অমিতা কবিতা লিখেছে। কী যে কষ্ট ওর হচ্চে কি বলবে? নয়তো অমিতা খুব কমই কবিতা মেলাতে বসে। এ'রকম অবস্থা ওর কাছে দারুণ অভিশাপের মতো মনে হয়। তবু, তবু ওকে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু আজ আর পারছিলো না যেনো।

অমিতা বিছানায় বসেছিলো, এবার নিজেকে দিলো বিছানায় এলিয়ে। কেনো ওর এতো অবসাদ? আজ আরো বেশী! কিছু ওর যদি ভাল লাগে এই সময়টায়! ও খুসী হতে পারতো যদি পেতো একজন কথা কইবার মতো লোক। তা, ওর মনে হচ্ছিলো, যেনো ছোট ছেলের অদ্ভুত অদ্ভুত বায়নার মতো দুষ্প্রাপ্য।

অমিতা পাশ ফিরলো। বৃথাই একটু তৃপ্তি পাবার জন্যে ও ছটফটিয়ে মরছিলো। অমিতার ইচ্ছে করছিলো, এখুনি হটাৎ মরে যেতে।

এমনি সময়ে ওর খেয়াল হ'লো হয়তো, হয়তো ওর ভালো লাগতে পারে একটু, যদি ও একটা কোনো কাজে নিজেকে লিপ্ত করতে পারে। কী কাজ ও করবে —মনকে নাড়া দিতে লাগলো অমিতা।

কিন্তু আশ্চর্য্য এবার সত্যিই অমিতা একটা কাজ খুঁজে পেলো, পেয়ে ও হলো রীতিমতো খুসী। আর মনে হলো যেনো ও জীবনলাভ করেছে।

অমিতা অর্গ্যানে গিয়ে বসলো, নিতান্ত একটা ছেলে-মানুষী ঢঙে—আর রীড-গুলো এবার সঞ্জীবতা লাভ করলো, অমিতার স্পর্শ পেয়ে। অমিতা গান আরম্ভ করলো।

এমনি সময়ে বাইরের থেকে ভেসে এলো, আসতে পারি ?

অর্গ্যানটা থেমে গেলো একটা বিকট আর্তনাদ করতে করতে।

ঘরে প্রবেশ করলো সুপ্রিয় ; একটু লাজুক গোছের ছেলে, রোগা রীতিমতো ফর্সা; মুখে সর্ব্বদাই একটা যেনো হাসি আর নিজেকে সুন্দর দেখাবার একটা প্রচেষ্টা।

প্রথমে ও-ই হাসিমুখে আরম্ভ করলে; সুপ্রভাত বৌদি।

অমিতা খুসী হলো যেনো এর আসায়, বললে, এসো, সুপ্রভাত।

ওদের কথা আরম্ভ হলো—

বাড়ীতে ভালো লাগছিলো না একা, তাই এলাম। অমিতা যেনো আরো খুসী হ'লো বললে, আমারো ঠিক তাই হয়েছিলো, প্রায় মরে গিয়েছিলাম আর কি !

সুপ্রিয় প্রতিবাদ করতে গেলো, মেয়েরা না হলে এতো নিকটে মিথ্যে…

অমিতা বাধা দিয়ে বললে, তার মানে ? কি মিথ্যে আমি বললাম তোমায় ?

উত্তর এলো, বা রে এই তো মনের আনন্দে বসে ছিলেন অর্গ্যানে আমি কি…

অমিতা হাসলো। সুন্দর একটা হাসি, ঝরণার মতো,—সেতারের একটা বিশিষ্ট ঝঙ্কারের মতো।

তারপর বললে, শুধু মনের আনন্দেই কি মানুষে গান গায় ভাই ?

অমিতাকে যেনো অস্বাভাবিক লাগলো।

সেটুকু সামলাতে গিয়ে সুপ্রিয় রীতিমতো বিব্রত হলো, তবু বলতে পারলো, হয়তো ভুল বলেছি বৌদি, ক্ষমা ! ব'লে সুপ্রিয় অভিনয়ের মতো করে উঠে দাঁড়ালো।

অমিতা এবারো হাসলো, ওর হাত দুটো ধরে বসিয়ে দিয়ে বললে, ক্ষমা করলাম এবারের মতো, তবে আর এরকম নিশ্চয়ই আশা করব না।

সুপ্রিয় সুখী হয়ে বললে নিশ্চয়ই না, বলে যোগ দিলো যে, একটা গান শোনাতে হবে। অমিতার অর্গ্যান আবার জীবন পেলো ; অমিতা গেয়ে উঠলো সুপ্রিয়কে মুগ্ধ, আবিষ্ট করে।

একটু পরে গান থেমে গেলো ; থেমে গেলো নয় যেনো মিলিয়ে গেলো। আর অমিতা মুখ তুললো এবার একমুখ হাসি নিয়ে। তারপর কথা আরম্ভ করলো : এবার কি, অমিতা কিন্তু এখন ছেলেমানুষী দুষ্টুমিতে ভরে গেছে।

সুপ্রিয় কি বলতে না পেরে লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে, এমনি সময় অমিতা আবার প্রশ্ন করলো, কী গো ?

সুপ্রিয় ভয়ানক লজ্জা পাচ্ছে, কী বলবে ও কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

অমিতা আরো এগিয়ে গেলো কথায়। বললে আচ্ছা সত্যি বলতো দুপুর বেলা এলে কেনো ?

সুপ্রিয় তবু কিছু বলতে পারলে, বললে : বা রে ! বললাম তো এমনি এলাম, বাড়ীতে কী আর একা একা ভালো লাগে !

অমিতা ওর মুখের কথা কেড়ে নিলো, বললে এবার ভালো লাগছে তো দুজনে ?

সুপ্রিয়ও দুষ্টুমি করতে ছাড়লো না এবার বললে, লাগছেই তো ভালো !

অমিতা হাসলো খিলখিলিয়ে, বললে তাই নাকি ! আচ্ছা এতো লোক থাকতে হঠাৎ এখানেই যে ভালো লাগলো ?

সুপ্রিয় লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে, তবু বলতে পারলো : আপনি কী বলুন ত, আমি কিন্তু তাহলে আর কোন দিন আসবো না।

অমিতার ছেলে মানুষী চরমে উঠলো, বললো : তা আপনাকে আসবার নিমন্ত্রণ আমি কবে যে করেছিলাম…

সুপ্রিয় অপ্রতিভ হলো রীতিমত, ওর চোখ প্রায় ছলছলিয়ে এসেছিলো।

এর ওপর অমিতা আর অভিনয় করতে পারলো না বললে অদ্ভুত ভঙ্গি করে: আচ্ছা বুঝেছি সব, গ্লাসিমার কাছে যেতে হচ্ছে শীগগিরই, যাক আপাততঃ আর একখানা গান শোনাই।

সুপ্রিয় যেনো বাঁচলো এবার কিন্তু বলতে পারলো না, এ আক্রমণটার হেতু কী?

অমিতা হাসলো, পরের মুহূর্তেই অর্গ্যানে গেলো আঙুল চালাতে! এমনি সময় ঘরে প্রবেশ করলো সুরভি।

সুরভি কথা কইলো: এই যে সুপ্রিয়, কখন এলে?

সুপ্রিয় বলতে পারলো, এই যে, আপনি এত সকালে?

সুপ্রিয়ের অনাবশ্যক লাজুকতা ওরা দুজনেই অনুভব করলো। এবার সুরভি চা করতে বললে! অমিতা গেলো চায়ের জোগাড়ে।

চা-ও শেষ হলো।

এরি ভেতরে সুরভি ঘরের কোণে বসে গেছে, একটা প্রবন্ধেই হয়তো! অমিতা চটলো, বললে, শোন না সিনেমায় যাবে?

সুরভি পড়লো মুস্কিলে! বললে: আমি কী করে যাবো? তুমি বুঝছো না প্রবন্ধ আজ না হলে আর আমি শেষ করতে পারবো না। অমিতা যেন কেড়ে নিল: বললে না হবে না চলো সুপ্রিয়কে আমি কতোক্ষণ বসিয়ে রাখলাম......

সুরভি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে: এইতো হয়েছে, তুমি এক কাজ করো না সুপ্রিয়কে নিয়ে যাওনা সিনেমায়! দেখো লক্ষীটি তুমি ওকেই নিয়ে যাও আমি বরং আসচে হপ্তায় তোমায়......

অমিতা রাজী হলো তাই দিয়ে দিলো মোটর বার করবার হুকুম। সুরভি নিশ্চিন্ত হয়ে কালী বুলিয়ে চললো ধপধপে সাদা কাগজের বুকে।

—দুই—

যে নীল আকাশের নীচে আমরা অমিতাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম তারি নীচে আর একটি দৃশ্য:—

তবে তফাৎ যে এখানে নীল আকাশের রঙীনতা মেলেনা, তার গতিও যেন এ দৃশ্যে রুদ্ধ। এদের দেখলে মনে হয় এরা মরচে পড়ে গেছে।

আমরা এখন যেখানে এলাম সেটা একটা দেশ: তারি সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ছোটঘরখানিতে থাকে ওরা মানে আমি মিলনেন্দু আর বিবেকেশের কথা বলছিলাম। ওরাই দুজনে এই ঘরখানিতে থাকে। মিলন এই মাত্র এলো। ওর সর্ব্ব শরীর এখন ক্লান্তিতে, অবসাদে পঙ্গু, শ্রান্তিতে ও ভেঙে পড়েছে। সেই সকাল আটটায় আজও বেরিয়েছিল—সুন্দর সন্ধ্যাটা আজ যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে তা ওর মনেও নেই।

এমনি কতো দিন, কতো সুন্দর সন্ধ্যা যে ওকে লুকিয়ে চলে যায়! হায় রে! মিলন ভাবলো, কী দুর্ভাগ্য নিয়েই ও জন্ম নিয়ে ছিল এ পৃথিবীতে। এমনি ভাবে যাদের দিন যাপন করতে হয় তাদের কেন জন্ম নো?

এমনি সময় মিলন চোখ খুললো কিসের যেনো সাড়া পেয়ে। এতোক্ষণ, ওর মনে হলো, ও যেনো একটা আবিষ্টতার ভেতর ডুবে ছিলো। এবার মিলন দেখলো সামনে বিবেকেশ, ওরই মতো কর্মক্লান্ত হয়ে এইমাত্র ফিরেছে। বিবেকেশ বসলো, ভাঙ্গা পাখাটা তুলে হাওয়া করতে করতে একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেললে, তারপর বললে, কখন এলে?

উত্তর এলো, এই তো একটু আগে। উত্তর দিয়ে মিলন আবার চোখ বুজলো।

বিবেকেশ প্রশ্ন করলো আবার, আজ কী খেলে?

মিলন উত্তর করলো: না, এখনো হয়ে উঠে নি, এবার খাবো ভাবছি।

দুজনেই চুপ করলো। ঘরে নামলো একটা গভীর নব-বধূর মতো শান্ত নীরবতা। একটু পরে বিবেকেশ উঠলো, জামাটা পরতে পরতে, বললে, একবার ঘুরে আসি, একটা ছেলে পড়াবার কথা হচ্ছে যদি পাই। ও বেরিয়ে গেল; মিলন পাখাটা তুলে নিয়ে অনুভব করলো ওর এখন রীতি মতো খিদে, সারাদিনে আজ একটি বাটি চা ছাড়া ওর পেটে কিছু পড়ে নি; তবু যে কী করে ও বেঁচে

আছে তাই ভেবেও আশ্চর্য্য হচ্ছিলো। এবার মিলন উঠলো। পকেট হাতড়ে বের করলো তিনটে পয়সা, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নেমে এলো রাস্তায়।

—তিন—

বেলা দুপুর। নীল আকাশ উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত। এমনি সময় একখানি মোটর থেকে নামলো সুপ্রিয়, আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের একটি সরু গলির সামনে।

একটু এগিয়ে গিয়েই সেই মেস, রাজপথের ওপর যে কুন্ঠিত করুণায়ের মতো করা পুরাণো বাড়ী কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে পারছে তারি সামনে এসে দাঁড়ালো সুপ্রিয়। একটা মলিন আবহাওয়া, যা সুপ্রিয়ের পক্ষে অসহ্য। তবু ও চীৎকার করলো মিলনের উদ্দেশ্যে।

ঠিক এমনি সময়েই অমিতার শোবার ঘরের ঘড়িটা তিনটে বেজে টিকটিকিয়ে সরছে। অমিতা সার্সি দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো ভারী সুন্দর দিন। এই রকম উজ্জ্বল দিন ওর ভারী লাগে। এমনি দিনে ও ভালো ভালো গান গায়, কবিতা লেখে; এ-রকম একটা দিন পেয়ে ও আজ খুসী হয়ে উঠেছে।

অমিতা এখনি কথা বলছিলো মীরার সঙ্গে, এখন ও ভারী দুঃখ করছে, মীরাকে বলছে আরো দু'চার দিন অন্ততো থেকে যেতে। এমনি সময় মীরাকে যেন একটু উজ্জ্বল দেখলো, মীরা বললে, আপনিও চলুন না অমি'দি'। দুদিন বেড়িয়ে আসাও তো হবে।

অমিতা কী বলতে গেলো, কিন্তু মীরা দুষ্টুমী না করে ছাড়লো না, বললে, তাতো যাবেন না, বিয়ে হলে মেয়েরা যে কী হয়......

তোমার মতো বিশ্বফাজিল হয়, বলে অমিতা দারুণ চটলো। মীরা প্রায় ছলছলিয়ে এলো।

কিন্তু অমিতা এবার খিলখিল করে হেসে উঠেছে। মীরাও না হেসে পারে না।

এবার অমিতা বলে, তাই চলো ভাই। আমিও দিনকতক ঘুরে আসি।...

মীরা খুসী হয়, বলে, সেই ভালো। এমনি করে কথা প্রায় ফুরিয়ে আসছিলো, এমনি সময় অমিতা আবার নতুন কথা পেলো, বললে: শিউলীরা কেমন আছে মীরা?

মীরা বলে: বা রে শিউলীর তো বিয়ে হয়ে গেল সেদিন, জানেন না আপনি?

ও নীলচে চোখে অমিতার দিকে তাকালো।

উত্তর এলো: কৈ না!

বলে অমিতা একটু দুঃখ করে তবু প্রশ্ন করে: কেমন হলো বিয়ে?

মীরাকে ম্লান লাগে বলে, কী আর ভালো হলো। শিউলী তো আর খারাপ মেয়ে নয়!

অমিতাও সায় দেয়, মীরা বলে যায়: কী করে আর ভালো হবে, ওর মা তো আর নেই। বান্ধবীর জন্যে মীরার মন ব্যথিত হয়ে উঠে। অমিতাও অনুভব করে মীরাকে।

এমনি সময় বাইরে থেকে ভেসে আসে: আসতে পারি?

অমিতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: না, দুমিনিট। মীরাকে ব্যস্ত দেখায়, মীরা বলে: কে অমি'দি'?

এমনি সময় পরদা সরে যায়। সুপ্রিয় প্রবেশ করে।

সুপ্রিয় রীতিমতো আশ্চর্য্য হয়ে গেছে মীরাকে দেখে, মীরাও তাই।

তবু ওদের কথা আসে।

মীরা বলে, সুপ্রিয় দা।

: মীরা।

ওদের কথা এসে যায়। অমিতা বেরিয়ে যায় হঠাৎ।

সুপ্রিয় কথা বলে এবার: কবে এসেছো?

: এই যে কালই

: বা রে আমায় খবর দাও নি কেনো?

অমিতা বাইরের ঘরে গিয়ে দেখে সুরভি। অমিতা আশা করেনি এখন ওকে। খুসি হয়ে বলে: একী তুমি।

: হাঁ এই তো এলাম, সুপ্রিয়কে দেখো নি?

: হ্যাঁ, এই তো এলো, দুজনে এলে বুঝি?

ওপরের ঘরে এমনি সময়:—

সুপ্রিয় প্রশ্ন করে: মাসীমা এসেছেন নাকি?

মীরা উত্তর দেয় : না মা তো আসেন নি ; কিন্তু তুমি আমায় লেখোনি কেনো ?

এইতো সেদিন লিখলাম, বলে সুপ্রিয় বসে পড়লো।

খাটের ওপর বসে মীরা আবার কথা আরম্ভ করলো : সে যাক আজ তোমাদের ওখানে যাবো নিশ্চয়ই ! কিন্তু বৌদি চলে গেলেন নাকি ?

মীরা উত্তর না করে বসে গেল, তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছো ! খব পড়ো বুঝি ?

ঠিক এমনি সময় নীচে :—

সুরভির দিকে একটা কিছু বলবার মতো চোখ করে অমিতা তাকায়, সুরভি বলে, কী ?

উত্তর আসে, কথা জিজ্ঞেস করবো একটা ?

কী করো না, সুরভি বলে।

আগে বলে তুমি শুনবে, বলে অমিতা একটু আবদারের সুর টানে।

ওপরে এখন :—

এই, চুপ করলে কেনো, মীরা কথা বলে।

কী বলবো, সব ফুরিয়ে গেল যে, অসহায় উত্তর আসে।

এরকম মীরার ভালো লাগে না ; মীরা বলে, যাই হোক কিছু তো বলতে পারো ?

সুপ্রিয় বুদ্ধি করে একটু দুষ্টুমি করে, বলে : দেখো না আকাশটি কী নীল, ঠিক তোমার চোখের মতো !

যাঃ ও, এইকী কথা নাকি, বলে মীরা চটে।

নীচে—

অমিতা বলে, আমি মীরার সঙ্গে ঢাকা যাব বুঝলে ?

সুরভির বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না তবুও বললে বেশত যাও না।

অমিতা বুঝতে পারলে ওকে, তাই আবার বললে, মিথ্যে নয় সত্যিই যাবো কিন্তু।

সুরভি নিজকে খুশী দেখাতে চেষ্টা করলো. বললে, সে তো ভালোই, এর চেয়ে কী আর ভালো আশাকরতে পারি. তুমি গেলে আমি যে কী খুসীই হবো......

অমিতা বুঝতে না পেরে কিছু বলতে পারলো না।

সুরভি আরো বলে গেলো, উঃ ঈশ্বর জানেন আমার আজ কি সুদিন, তোমার জন্যে আমার যে কি মুস্কিল...

অমিতা লাল হয়ে গেছে, ও কথাই বলতে পারছে না ঐতো অপমান ও সইবে কেনো ? ও কিছু বলতে যাচ্ছিলো ; ওকে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।

ওপরে এখনঃ—

এই !

কী !

সিনেমায় চলো, আজ !

বারে তোমাদের বাড়ী কী করে যাওয়া হয় তাহলে !

কেনো সিনেমার পরে.....

কিন্তু অতো রাত্তিরের সিনেমা থেকে ফিরলে......

নীচেঃ

অমিতার চোখে প্রায় জল এসেছে। এমনি সময় সুরভি চরম করতে বাকী রাখলো না, বললে, কবে যাচ্ছো. আজই নাকি ? কতো প্রবন্ধই যে আমি...

এই-ই যথেষ্ট, এবার ওর কাজলা চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

ওপরে :—

: মী—

: কী—

: বৌদিটা, কী হলো

: কী জানি, বলে সুপ্রিয় দাড়ালো।

মীরা ওর কাছে গিয়ে বললে, উঠলে যে !

সুপ্রিয় বললে, বৌদিকে ডাকি, তুমি যাবে না ?

মীরা ওর হাতটা ধরলে. বললে একটু বোসো না।

সুপ্রিয় যন্ত্রের মতো কথা রাখলো। তারপর হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে মীরাকে অজস্র চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিতে লাগলো।

সুরভিও এখন অমিতাকে বুকে টেনে নিয়েছে।

চার

সুপ্রিয়দের বাড়ী। মিলন এসে দাঁড়ালো চীৎকার করলো সুপ্রিয়ের উদ্দেশ্যে।

দরজা খুললো লীলা, কথা কইলো, কে ? ও, মিলন দা। দাদা যে এখুনি বেরিয়ে গেলো।

মিলন চলবার উপক্রম করছিলো। লীলা ডাকলে বললে, মা ডাকছিলেন একবার আপনাকে।

......আমায়? মিলন জিগ্‌গেস্ করলে।

লীলা ঘাড় নাড়তে ও ফিরলো।

লীলার মা কুটনোয় বসেছেন; সুজাতা চায়ে।

মিনতি দেবী বললেন: এসো বাবা।

সুজাতা আগেই দুষ্টুমি করলো: যাহোক কি ভাগ্য! মিলনদা'র আজ হঠাৎ বোনেদের মনে পড়ে গেছে।

মিলন মলিন হাসলো, বললো: জানিস তো ভাই সব, তবে কেনো দুষ্টুমি করিস আবার।

সুজাতা লজ্জা পায়।

মিনতি দেবী বলেন: ঘরের সব ভালো তো বাবা।

ও সায় দিয়ে বলে: ভালোই, তবু অনুযোগ করে ব'লে, আর মা বাড়ী মানে জানেন তো সবি'। চেষ্টা করি যথা সাধ্য, একটা নিঃশ্বাস ওকে মলিনতর করলো, ও বলে গেলো, কিন্তু তাঁদের সন্তুষ্ট করবার মতো সাধ্য ও নেই, পারিওনা। যখন মা বাবা বলে যান, শুনেছি আমরা তখন ছিলাম কতো বড়ো লোক। কতো বড়ো ছিলো আমাদের সংসার। মিলন একটু থামলো, আবার বলতে আরম্ভ করলো: তারপর যখন দিন দিন বড় হতে চললাম, দেখলাম আত্মীয় আত্মীয়েরা যাচ্ছেন কমে আর...

বিনীতা দেবীর চোখ সজল হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বাধা দেন: আমিও কিন্তু তোমাকে কম দোষ দিই নি মিলন, যে সব আত্মীয়দের কৃপায় তোমাদের যথা-সর্বস্ব গেলো। রাজার ছেলে হয়ে তোমার আজ এই অবস্থা সেই তাদের জন্য তুমি চাকরী—রক্তজল করে চাকরী করো? কী প্রয়োজন তোমার? তুমি কী .....

মিলন মিনতি দেবীকে চুপ করতে দেখে, বলে: না মা! ওরা মানে যাঁরা নেহাৎ রয়েছেন তাঁদের জন্য অন্ততঃ ভিটে সন্ধ্যেও পড়ে। ওছাড়া ওরা সুবিধেও করতে পারেন নি বলেই না পড়ে আছেন.....

সুজাতারা ব্যথা মলিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, মিনতি দেবীর চোখ প্রায় ভিজে উঠে। তাড়াতাড়ি বলেন: ও সব থাক বাবা, আমি তো সবি জানি।

গতানুগতিকে উত্তর তবু আসে, মিলন বলে: হ্যাঁ সুপ্রিয় ও তো সবি জানে, ও আরো বলে যায়, তার জন্যে অবিশ্যি দুঃখও করিনে আমি, তবে পড়াশোনা করা আমায় একটা নেশার মতোই ছিলো তবে পয়সার অভাবে পিপাসী মনকে উপাসী রাখতে হবে, এ কোনোদিন আশা করতাম না।

মিনতি দেবীর চোখে জল দেখে মিলন থেমে যায় অকস্মাৎ। তারপর যেনো একটি অদ্ভুত আবহাওয়ায় ওদের গ্রাস করে।

মিলন এবার সুজাতাদের অবস্থা রীতিমতো অনুভব করে। ওরা অনেকক্ষণ বুঝেছে যে এ আবহাওয়া তৈরী করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়।

মিলন ওদের মুখে হাসি ফোটায়। মিনতি দেবীকে থামিয়ে বলে, এদিকে যে ক্ষিদে পেয়ে গেলো মা।

নতুন একটা আবহাওয়া ওর কথায় জীবন লাভ করে।

চা খেতে খেতে মিলন খাবারের প্রশংসা করে।

লীলা বাধা পাওয়া ঝরণার মতো খুশীতে ছিটকে ওঠে। বলে: সব আজ আমার তৈরী মিলনদা'।

সুজাতাও এর তীব্র প্রতিবাদ করে জানায় যে সেই এ গৌরবের বেশী অধিকারী কেন না......

মিনতি দেবী ওদের থামান, তারপর মিলনকে বলেন: ওদুটিকে নিয়ে আর পারিনে বাবা। দিন রাত লেগে আছে। মিলন হাসে, চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, দিন না বিয়ে দিয়ে দুষ্টুমি বেরিয়ে যাবে'খন।

মিনতি দেবী উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, বলেন: হ্যাঁ বাবা, তোমায় তো বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সুজাতাকে এক-জনরা যে দেখে গেলো......

মিলন স্থায়ী হয়ে ওঠে। সুজাতা অকস্মাৎ কি কাজে ওপরে গেলো।

মিনতি দেবী বলে যান: ছেলেটি ভালোই, ওখানে বিয়ে হলে সুজাতা আমার সুখীই হবে। সুপ্রিয় তোমায় বলেনি কিছু?

মিলন উত্তর করলো, না ওর সঙ্গে কমই দেখা হয়...

লীলা দুষ্টুমি হাসি হাসে বলে, কী করে হবে দাদা তো দিনরাত অমিবৌদি'দের বাড়ী, আবার সেখানে মীরাদি। এসেছে যে...ওযেনো ভেঙেই পড়লো।

মিলন হাসে......

লীলা রাগ করে, তবু বলে : বা বিশ্বাস হলো না বুঝি, —দাদার সঙ্গেই সে বিয়ে হবে আরো বলে যায়, সে বটা চোখ যে দাদার কী ভালোই লাগে......

মিলন ওকে থামাবার জন্যে দুষ্টুমি করে বলে : বেশ দিদির তো হ'ল বলে দাদারো তাই, এবার তোরো......

লীলা দারুণ চটে। কথা বলতে পারে না রাগে লজ্জায়।

মিনতি দেবী হাসি চেয়ে বলেন : যা দিকি এখন, বিয়ে না করিস আইবুড়ো হয়ে চিরকার এমনি জ্বালাস আমাদের ......

লীলার অভিমান হয়, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে : হ্যাঁ জ্বালাব! আমি কী তোমাদের জ্বালাই নাকি, ভারীতো ·· ওর চোখে প্রায় জল আসে। ওকে সকালের শিউলীর চেয়ে সুন্দর দেখায়।

মিলন ওকে শান্ত করে। তারপর বলে যায় একটু আগে আমায় একবার খবর দেবেন মা, আমার আসা সে তো জানেন, ছুটি ত নেইই......

মিলন হঠাৎ মতো ভঙ্গীতে বলে : একটা পড়াবার কথা হচ্ছে, চাকুরীটা যদি মিলে যায়......

মিনতি দেবী চমকে ওঠেন : আবার চাকরী?

মিলন হাসে, বলে : মা খাটুনি আর কতোই বা হবে অবস্থার সচ্ছলতা যা আসে সে তুলনায় তাও তো আমার কম কাম্য নয়।

ও স্লিপারে পা পরালো।

লীলা বললে ক'মাস পরে আসা হবে?

মিনতি দেবীর দিকে তাকিয়ে মিলন হাসে।

মিনতি দেবী বলেন তাওতো আর বিশেষ অন্যায় বলেনি বাবা!

মিলন খুসী হয়ে নীচে নামতে থাকে।

—পাঁচ—

অমিতারা ঢাকা গেলো; এই সত্যটা আজ নিষ্ঠুর শয়তানের মতো বিকটাকারে সুরভিকে ব্যাথা দিতে লাগলো। সুরভি সত্যই ভেবে ব্যাথা পাচ্ছে যে অমিতা ও র অমিতা, এখন এই মুহূর্তে ওর কাছে সুগাঢ় নীল আকাশের মতোই মিথ্যে। এই মুহূর্তে ও ইচ্ছে করলেও অমিতাকে কথা বলতে শুনবে না। অমিতা কেনো গেলো? অমিতার এসরাজটার দিকে ওর দৃষ্টি ওর পড়লো। ওর অসহ্য লাগছে ঘরের আবহাওয়া......

এমনি সময় ঘরে প্রবেশ করলো সুপ্রিয়।

সুরভি ওকে দেখলো, ওকেও মলিন লাগছে। সুরভি কথা বললে না, মাথাটা এলিয়ে দিয়ে আরাম পাবার চেষ্টা করতে লাগিলো।

কতকগুলো মুহূর্ত্ত ধ্বংশ হয়ে গেলে পরে, ও জিজ্ঞেষ করলো : ওরা গেলো?

সুপ্রিয় বিছানাটায় ক্লান্তভাবে দেহটিকে বিস্তার করে দিলে, বললে হ্যাঁ এইতো ফিরছি।

সুরভি আরো কথা কইলে। জিগ্‌গেস করলো : ওদের কোন কষ্ট হয়নি তো? কিছু বললে না?

সুপ্রিয় সুরভিকে নিজের মতো করে অনুভব করতে পারলে, বললো : না কষ্ট আর কেনোই বা হবে, আপনার কী মাথা ধরলো নাকি? চলুন না বেরোনা যাক একটু...

সুপ্রিয়ের কথা ওর যেনো শীতকালের স্নানের পর সার্সির ভেতর দিয়ে আসা শুকনো রোদের মত মিষ্টি লাগলো, সুপ্রিয় বললে : চলো, ঘুরেই আসি।

সুরভি যখন একা বাড়ী ফিরলো তখন রাত্রি এগারোটা, রাস্তার আলোগুলো যথা সাধ্য চেষ্টা করেছে নিবিড় অন্ধকার গুলোকে গ্রাস করতে। এ শান্ততা ওর বেশ লাগলো। কলকাতার সহর যে কোন সময়ে এতো শান্ত হতে পারে তা ওযেন কোনো দিনো দেখেনি। ও বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলো। সার্সীগুলো ভেদ করে রাস্তার আলোর সাথে চাঁদের আলো ওর বিছানাতে লোটাচ্ছে—ও নিশ্বাস ফেললে।

সুরভি এবার নিজেকে এলিয়ে দিলো বিছানায়।

নেই একটু তৃপ্তি একটু শান্তি।

কী বিশ্রি! বিছানাটা যেনো নিশাচরের মতো লাগছে। ওর গরম হতে লাগলো।

...তবু মুহূর্ত্ত গুলো চোখের সামনে মরতে লাগলো।

সুরভি ভাবতে চেষ্টা করলো, অমিতা কি করছে? সে কী ভাবছে না ওর কথা একবারো? মিলনের চোখেজল এলো ভেবে যে ওর এই রাত্তিরে চা খেতে ইচ্ছে করেছে। অমিতা থাকলে, এই রাত্তিরে সে চা করে দিতে পারতো! কী সুন্দর চা করে অমিতা! অমিতা কতো বেশী সুন্দর আরো।

সুরভি রাত্তিরের দিকে তাকালো। আকাশে! কি সুন্দর আকাশ! ওর চোখে পড়লো আজকের চাঁদ সুন্দর!

কী দুর্ভাগ্য ওর!

এখন সুরভি দেখলে টেবলে কথা মতো, রাত্তিরের খাবার ঢাকা। ওর ক্ষিদে হলো না কেনো? ও ভাবতে লাগলো। কী সর্ব্বনাশ, বিকেল থেকে তো ও অন্ন কিছুই খায়নি।

ওর যেনো চীৎকার করতে ইচ্ছে করছিলো।

\+ \+ \+

ঠিক এমনি সময় সুপ্রিয় স্বপ্ন দেখছে, মীরার সঙ্গে কি নিয়ে ওর ভীষণ ঝগড়া লেগেছে যেনো; ওর রাগ আরো বেড়ে যাচ্ছে দেখে, যে অমিতা আর সুরভি দুজনেই এতো ভীষণভাবে হাসছে।

ছয়

মিলন আফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিলো। সে যেনো নীল আকাশের পাখীর মুক্তি পাওয়া।

সেই কোন দুপুরে সে বেরিয়ে ছিলো। ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে আসছে তবু উপায় নেই। আজও হেঁটে যেতে হবে। পারছিলো না তবু···পকেটে হয়তো পাঁচটা পয়সা মিলে যেতে পারে, তবু তা খরচ করবার মতো সাহস ওর জোগালো না।

রাত্তির নটা। বাসগুলো কী জোরেই ছুটছে—তীরের মতো বললেও যেনো বোঝানো যায় না! ওদের ক্লান্তি নেই! মিলনের মনে পড়লো: আজ ওর নিদ্রাটুকুও কপালে হবে না। কিন্তু তা ভেবেও খুসী হলো যে কাল তবু কয়েকটা টাকা মিলতে পারে।

মিলন ঠিক করলো: লেখাটা আজও নিশ্চয়ই শেষ করবে। ও চলার গতি বাড়িয়ে দিলো।

আকাশটা আজ নীল নয়, ভীষণ কালিমা ওকে মলিন করে তুলেছে। সে ভীষণতা আজ মিলকে যেনো তৃপ্তি দিলো: আজ ওর লেখার কি সুবিধেই হবে।

ওর ঠোঁটে যেনো একটা হাসির রেখা ফুটলো: হাসিটা ক্ষীণ হলেও কিন্তু সজীব, তার অর্থ আছে।

হঠাৎ মিলন নিজেকে নিক্ষেপ করলো একটা বাসে। ওর গা ঘেঁসেই থেমে সেটা হাঁপাচ্ছে।

একটি মেয়ে উঠলো। বাসটা ছেড়ে দিলো আবার।

মিলন যেনো কী আবিষ্কার করেছে। মেয়েটিকে ওর চেনা-চেনা লাগলো। মিলন ছুটে গিয়ে বাস্টা ধরলো!

কী সর্ব্বনাশ! আরেকটুকু হলেই বাসএর তলায় গিয়েছিলো আর কি! এমনি সময় চোখ পড়লো মেয়েটির ওপর! ও নিজেই বলে উঠলো: বিশাখাই তো! ও এগিয়ে গেলো।

বিশাখারি পাশে বসে পড়ে ও সারা বাসটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো। একটা মৃদু গুঞ্জন যেনো ওদের কানে এলো।

বিশাখা প্রথমটা চমকিয়ে ছিলো, তারপর খুসী হলো: মিলন।

: হ্যা তাইতো। আপনাদের খবর ভালো নিশ্চয়ই।

বিশাখা খুসী হয়ে বললে: যা হোক মানুষ তুমি, যেতেও কি নেই একবারো?

যাবো ভাবছিলাম, মিলন বললো, হয়তো দু'চার দিনের ভেতর—

বিশাখা শীর্ণ হাসি হাসলো, বললে, কী রকম আছো চাকরী করছো শুনলাম? মিলন ঘাড় নাড়লো, বললো: না করলে কী করে চলতে পারে বলুন। এই চলমান বাসএর মতো গতি না হোক অন্ততো থার্ডক্লাস ছ্যাকড়া গাড়ীর গতিতেও ত চালাতে হবে জীবনটাকে। বিশাখা বাইরের দিকে তাকালো।

মিলন চুপ করলো।

বিশাখা এবার কিছু বলবে ভাবছিলো, মিলনই

জিজ্ঞেস করলো : এতো রাত্তিরে বাস-এ আপনাকে আশা করিনি কিন্তু! বিশাখা হাসলো, বললে, মোটারটা বিগড়ে যাওয়াতে বাসকেই ধন্য করতে হলো,…ও পাতলা একটু হেসে উঠলো যেনো।

…বাসটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। এমনি সময় মিলন উঠে দাঁড়ালো।

বিশাখা যেনো প্রস্তুত ছিলো, ওর দিকে তাকিয়ে বললে : কবে আসছো? মিলন চলবার ভঙ্গী দেখিয়ে বললে :. সময় মতো গিয়ে পড়বো একদিন।

মিলন নেমে গেলো। তার পর চলমান বাসটার দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে চলবে বলে পা চালিয়ে দিলো।

\+ + ×

সাত

ঢাকা সহরের একটি বাড়ী। ওই বাড়ীরই একটা আলোকোজ্জ্বল কক্ষে মীরা একটা সোফায় উপুড় হয়ে শুয়ে। অমিতা বললে, বাইরের বৃষ্টির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে নিয়ে। তুমি ছেলে মানুষ হলেও মীরা তোমার অন্ততো বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে প্রেম জিনিষটা আসলে কী? অমিতা বলে গেলো আরো, দেখো না বাইরে কী সুন্দর বৃষ্টি, ওর স্পর্শ লাগা ঠাণ্ডা বাতাস কী মিষ্টি, একটু আগে দেখেছিলে তো সেই দারুণ কালো মেঘ?—যার থেকে এই সুন্দর বৃষ্টির জন্ম হলো!

অমিতা থামলো না। মীরাও গেছে মুগ্ধ হয়ে।

এদিকে দেখো, অমিতা বলে গেলো, এখন না দেখলে কী তুমি বিশ্বাস করতে পারতে, যে ওই তখনকার ভীষণ কালো মেঘের পেছনে এতো মিষ্টির পরশ লুকিয়ে ছিলো? তাইজন্যে প্রয়োজন হয় বিচারের। ভাবতে হয় তাই এই মানুষকে, যারা ঈশ্বরের নিকট থেকে সব থেকে মূল্যবান প্রাপ্তি পেয়েছে, এই বিচার করবার ক্ষমতাটুকু।

মীরা মুগ্ধ হয়ে গেছে, ওর নীলচে চোখে যেনো গাঢ় ছায়া নেমেছে। কথা বলবার শক্তি যেন নেই। ~~অমিতা দি~~নোর মতো বকে গেলো, কাজেই সে-ই প্রকৃত বড়ো মানুষ সে ঈশ্বরের সে দানের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলতে পারে। না পারলে মনুষ্যত্বের হলো মরণ। কিন্তু জেনো সব থাকা সত্ত্বেও অসহায়ের মতো সহনীয়তাকে ঈশ্বর কখনো ক্ষমা করবেন না। এই দেখো জীবন! ঈশ্বর তো সকলকেই তা দিয়েছেন! মানে যারা বাঁচে আর কি! আরো দেখো সেই জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখবার কী ভীষণ চেষ্টা তোমার চারিদিকে চলছে। তাই এমনি করেইতো জগৎ চলছে। সেই এমিবা যার থেকে অসহায় প্রাণী বোধ হয় নেই সেও কি অদ্ভুত ভাবে ঈশ্বরের দেওয়া জীবনকে রক্ষা করতে সচেষ্ট। আর তুমি, মানুষ তুমি যদি বিচারটুকুর সহায়তা নিয়ে মনুষ্যত্বকে না বাঁচিয়ে রাখতে পারো তাহলে তোমার জীবনে কী লাভ!

অমিতা একবার দম নিলো; মীরার সব ঠিক বুঝতে পারছিলো না অতো তাড়াতাড়ি তবু শুনে গেলো : হ্যাঁ আমি চলছিলাম তোমার জানতে চেষ্টা করা উচিৎ প্রেম কী? আর এই জন্যে তোমার বিচার শক্তিটুকুর সহায়তা গ্রহণ তোমাকে করতে হবে। কেনো বলছিলাম জানো? তারো বিশেষ কারণ যেনো আছে, অন্ততো আমার তাই মনে হলো। আচ্ছা তুমি তোমার বিচার শক্তিতে বিশ্লেষণ করেছো কী কখনো? প্রেম কি?

অমিতা উত্তরের আশায় কিন্তু থামলো না, তেমনি বলে গেলো : তোমরা হয়তো বলতে পারো অনেক কিছু, তা বলো গে আর এ জেনো প্রেম যাই হোক নিজের মূল্য পৃথিবীর ভেতর সব থেকে বেশী। নিজের মানে আমি নিজের মনুষ্যত্বের কথা বলছি। তা কখনো হারিয়ো না। কিছুর দোহাইতেও না।

বেশী ভাগ লোকই জগতে দেখবে কখনই সম্পূর্ণ বিকশিত নয়। তাদের এড়িয়ে চলতে তুমি নিশ্চয়ই পারবে যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে সব সময়ে সচেতন থাকো যে তোমার মূল্য কতো খানি।

এবার সেই আগেকার কথায় ফিরে যাই; আমি প্রেমের কথা বলছিলাম—ধরো প্রেম মানে অন্তরের একটা বিশেষ অনুভূতি যার বিকাশ হয় মনের কোঠায়। যার অনুভূতি মানুষকে পাগল করে দেয়।

বুঝলেতো তুমি আমার কথা।

মীরা ঘাড় নাড়লো, শেখানো পাখীর মতো, অমিতা খুসী হয়ে আরো এগিয়ে চললো : বেশ! সেই প্রেমের কথা মনে করো এবার! ভাবতে পারছো তো? কী শক্ত তা ভাবা আমি তা জানি। সেই প্রেম ঈশ্বর যার বলে একটা জগৎ নয়—লক্ষ লক্ষ জগৎ চালান. তার কথা মনে করা কী ভীষণ! তবু মনে করো! ধরো তুমি একজনকে ভালবাসো। আমায় নয় তোমার মাকে নয়, ধরো একজন পুরুষকে! তুমি কী তার জন্যে জগতের অমঙ্গল আনতে পারো? ধরো সে তোমাকে সব সময়ে চায় কিন্তু তাতে অনেক অমঙ্গল! তুমি কী করো তখন মীরা বলো?

মীরাকে চুপ করতে দেখে অমিতা আবার আরম্ভ করলে : তুমি নিজেকে বড়ো করতো পারো না সেখানে? সার্থকতা কী দেখাতে পারো না প্রেমের? জানো না সেই জোলো ফুলগুলো ভেসে যায় আর তাদের যারা ভালোবাসে সেই মেয়ে-ফুল-গুলো কেমন করে অদ্ভুতভাবে তাদের লাভ করে। দেখোনি? আবার এ-ও তো দেখেছো কতো রাত কতো দিন গুমরে গুমরে হয়তো এক প্রভাতে ফুটলো এক পদ্মফুল। তার হয়তো সার্থকতা হলো দেবতার চরণের তলায়। প্রিয়ের মিলন সে উপ-ভোগ করতে পেলো না। একজন মানুষ তো আত্মতৃপ্তি পেলো? তখন? পদ্মফুল কী অসুখী মনে করবে নিজেকে? মীরা বলো? আত্মউপভোগই কী সব মীরা? কেউ কেউ হয় তো বলবে ওই আত্ম-উপভোগের প্রতিযোগি-তাতেই জগৎ চলছে, কিন্তু মীরা তুমিও কী তাই বলবে? আমি জানি তুমি সুপ্রিয়কে ভালোবাসো মীরা তাই এতো কথা বললাম, কিন্তু মনে রেখো ভালোবাসা অনেক বড়ো জিনিষ তা শুধু স্বামী-স্ত্রীর একটা বিশেষ সম্পর্ক নয়। সে রকম ভালো কী তুমি সুপ্রিয়কে বাসো? তা হলেতো তোমরা দেবতা! যাই হোক নিজেকে কখনো ছোট করো না। নিজের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখো। আমি অবশ্যি ওকে জানি; তবু ভেবে দেখো ওর সত্যি রূপ কী! আশা করি জীবনে তোমরা সুখী হবে! তুমি বুঝতে পারছো তো আমার কথা?

আট

লেক রোড অঞ্চলে বিশাখাদের বাড়ী।

শীতকাল বলে বাগানের ভেতরই সকালবেলার চায়ের টেবিল জমে। আজও জমেছে।

আইভি টোস্টে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছিলো, বিশাখা লিকারটার রং পরীক্ষা করে মুখ তুললো।

বীরাংশু একটা কী যেনো আশা করে তাকালো বিশাখার দিকে, আইভিও।

বিশাখা বললে, কাল মিলনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো যে।

বীরাংশু বললে, কী করে হলো? সে তা হলে এখানেই আছে?

আইভি উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

বিশাখা বলে গেলো, বাস-এ, মিলন তো আমাকে দেখেই উঠলো, ওর কয়েকটা পয়সা খরচ করিয়ে দিলাম অবিশ্যি।

বলে বিশাখা যেনো একটু ঠোঁঠ কাঁপিয়ে মৃদু হাসলো।

আইভি বলে উঠলো, গীতাও যে বলছিলো : বীরাংশু বাধা দিলে, কৈ বলিস নি তো আর কী যে ছেলে, এক-বার কী দেখাও করতে নেই!

বিশাখা এবার বললে, আসবে তো বললে একদিন। তবে ওর একদিন যে কবে সুপ্রভাত হবে তা তো জানা নেই। যেনো বিশাখা একটা নিঃশ্বাসও ফেললো। এমনি করে চায়ের টেবিল ভাঙলো।

আইভি ভারী মেঘের মতো গতিতে ওর নিজের ঘরে এলো। টেস্ট প্রায় কাছাকাছি, কী করে পরীক্ষা দেবে? কিছুই তো ও পড়তে পারেনি। বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ও ভাবলো, আজ যে একটু মন দেবে···তাও অসম্ভব। ওর মনের ভেতর ওকে যে দগ্ধ ব্যথিত মথিত করছে একটা একটা যেনো কী?......

এক তীব্র অনুভূতি জেগে উঠেছে-কয়েকটা দিনের স্মৃতি, তারি ভেতর হারানো কতো সম্পদ। সে যেনো ওর জ্যোৎস্নার রাত গেছে। সেই আকাশে আজ অমানিশা। তারি নিবিড়তার মাঝে ওর বুকের অব্যক্ত বেদনা ছুটে

ফটানি। এ জীবনে ওর কী প্রয়োজন ছিলো? আইভি ভাবলো, ও কী চেয়েছিলো এই জীবন যার বোঝাও বইতে অসমর্থ। এই ব্যথার কালিমায়, অনুজ্জ্বল ঝরে পড়া শেফালির মতো অসহায় জীবন তো ও চায়নি!

আইভি জানালা দিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিলে, দূরে মেঘের নীলিমায় ভাসিয়ে দিলে! ওর মনে হলো ওই নীলিমাপুঞ্জ যেনো ওর পরম আত্মীয় আর ওরা ইচ্ছা করলে আজ আইভিকে শান্তি দিতে পারে!

আইভি মাথা এলিয়ে দিলো—ও যেনো নির্জীবের মতো অনুভব করতে লাগলো নিজেকে।

হটাৎ আইভি যেনো অনুভব করলো যে মিলন এসেছে! ওর মনে হলো সেই, সেই হারিয়ে-যাওয়া দিনটি যেনো ফিরে এসেছে আজ! জ্যোৎস্না! কী সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে আজ! এমনি সময়ে মিলন যেন ডাকলো ইভা!

আইভি মুগ্ধ হয়ে বললে, মিলন দা, আমায় তুমি নাও, সেই তেমনি করে নিবিড় করে ওই বুকের ভেতর নাও!

আইভি অনুভব করলো যেনো: মিলন ওকে চুমো দিলো—কতো বার! তা যেন গোনা যায় না; যতো তারা আকাশে ওদের দেখে লজ্জা পাচ্ছে তারো বেশী বার যেনো মিলন ওকে তৃপ্তি দিলো। ওর চোখ দিয়ে তৃপ্তিতে জল বেরিয়ে এলো, এবার ও বলতে পারলো, মিলনদা তুমি এতো দিন আসো নি কেনো!

আমি যে মরে গিয়েছিলাম! উঃ আজ তুমি আমায় বাঁচিয়েছো, জীবন দান করেছো! সত্যি কী ভালোই তুমি আমায় বাসো! যেমন করে ভোরের তপন কমলকে জীবন দান করে, মুখে হাসি ফোটায় ঠিক তেমনি তুমি আজ আমায় করলে মিলনদা! আর তুমি যেওনা, তুমি আমায় মেরো না আর; আমায় তুমি বাঁচিয়ে রাখো তেমনি করে, যেমন করে ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়ে রেখেছেন!

নয়

এইবার তোদের পালা, সুজাতাটার তো মিটলো, বলে অমিতা সিঁড়িতে পা দিলো।

মীরা পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে চীৎকার করলো: আরবার!

অমিতা হাসলো খিলখিলিয়ে, বললে, মনে মনে তো দারুণ খুশী...

মীরা চিমটি দিয়ে অমিতার মুখ বন্ধ করলো, বললে, এতো বকতেও পারেন, ঘুম পায়নি নাকি?

ওরা ওপরে এলো! সুরভি বেচারা পড়বার ঘরেই একখানা বই বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছে: ওকে না জাগিয়ে এরা শোবার ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিলো।

মেয়েদের পক্ষে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছেড়ে, সুইচ অফ করে ওরা যেনো বাঁচলো।

মীরা বললে: বেশ.বিয়ে হলো কী বলেন?

হাঁা বেশই তো, বলে অমিতা উত্তর করলো।

মীরা এবার বললে: কী ভাবছেন?

অমিতা যেনো প্রস্তুত ছিলো, বললে, বেশ ছেলে ঐ সুপ্রিয়ের বন্ধুটি! কী নামটারে?

মীরা ছাড়লোনা চোখ দুটো রহস্যান্বিত করলো, অবিশ্যি অন্ধকারে তা অমিতার চোখে পড়লোনা; মীরা বললে: যঃ দাদার অন্ন আর রইলো না দেখছি! কী সর্বনাশ সুরভিদা ডুয়েলেও যে জিতবে সে আশাও তো নেই।

অমিতা ওর কথায় বিশেষ কাণ দিলো না, তবু বললে, ভারী যে ইয়ে হয়ে পড়েছ দেখছি!

মীরা বললে: কেনো অতো লোক থাকতে মিলন-বাবুর কথাই বা কেনো এখন?

অমিতা উত্তর করলো না. ঘরে আবছা অন্ধকার।

মীরা উত্তর না পেয়ে ডাকলে: অমি'দি!

অমিতা বললে: তুমি ঘুমাও না মীরা!

মীরা অভিমান করলো যেনো, কিছু বললে না।

এবার অমিতাই কথা কইলে, বললে, মীরা!

ভারী গলায় জবাব এলো: কী!

অমনি অভিমান হলো তো? সব সময়ে কী ফাজলামী ভালো লাগেরে, বলে অমিতা মীরাকে একটা চুমো দিলে: বলে গেলো তারপর, তুই সত্যি বলতো মিলনকে তোর ভালো লাগলো না, ওর কথা শুনে তোর কী একটু অন্ততো সহানুভূতিও আসে না!

আসে অমি'দি', মীরা মুগ্ধ হয়ে বললে,

সত্যি আমারো ভালো লাগলো মিলনবাবুকে। কী সুন্দর কথাগুলো ওর, না বৌ দি, আর সত্যি বেচারা কতো দুঃখুই না পেয়েছে, বলতে বলতে মাসীমারো চোখে তো... এবার অমিতা শোধ নিলো, বললে, দেখিস তোরো চোখে জল না আসে। এখন দেখছি শুধু তোর সুরভিদি'র কোনো সুপ্রিয় বেচারারো অন্ন থাকছে না...মিলি দারুণ চটলো, বললে, ফের! ঐ জন্যেই তো বলিনি আগে, বলুন না কী অন্যায় আমি বললাম, এ আমি সুপ্রিয়দা'র সামনেও বলতে পারি!

অমিতা নীরবে হাসলো।

মীরা চটেছিলো সত্যি। আরো বললে: ভালোকে ভালো বললে বুঝি অন্যায় হয়? বা রে!

অমিতা চরমে গেলো, বললে: তাহলে ভালোই লেগে গেছে একেবারে; এবারে দেখছি. ডুয়েল তোমাতে আমাতেই হবে। মন্দ হবে না কিন্তু! ওর প্রায় কান্না পেয়ে গেছে।

অমিতা চুপ করলো, বললে, এসো আপাততো ঘুমোনো যাক. কিন্তু দিব্যি করে রাখো যে যদি মিলনকে স্বপ্ন দেখো......

মীরা চীৎকার করলো: আবার! অমিতা তখন যেনো কতো কতো ঘুমিয়েছে!

দশ

মিলন ভাবছিলো। আজও সারা সকাল ভাবছিলো নিবিষ্টমনে।

রবিবার। তাই ও ভাবতে পারার স্বাধীনতাটুকু অবিশ্য লাভ করেছে আজ!

তিনজনকে ও এই এখুনি আগেকার মুহূর্ত্তে ওর সামনে দেখছিলো। একজন অমিতা দেবী, যাঁর সঙ্গে সুজাতার বিয়ের দিন আলাপ করে ও মুগ্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় জন মীরা যাকে ও সুপ্রিয়ের বধূ-রূপে শীঘ্রই আশা করে আর তৃতীয় জন হলো আইভি: যে আজ রীতিমতো ব্যথিত করছে ওকে।

ও তুলনা করছিলো ক'জনকে। আর ভাবছিলো ভালোবাসা কি? তার সার্থকতাই কোথায়?

ও ভাবছিলো বন্ধু, সুপ্রিয়ের কথা। ওরা ওদের কতো ভালোবাসে, ওদের বিয়েও হবে দুদিন পরে! ওরা খুব সুখী হবে নিশ্চয়ই! তাহলে এই কী প্রকৃত ভালোবাসার পরিণতি হওয়া উচিত! মিলন ভাবলো, একক্ষেত্রে হয়তো এই প্রয়োজন! কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কী তাই! মিলন নিজের কথাই ভাবলো, মিলন কত দরিদ্র, আইভিরা কতো ধনী! ওরাও যে ওদের ভালোবাসে তা অবিশ্যি সূর্য্যের মতো সত্যি! কিন্তু ওদের বিয়ে কী করে হয়? যদিও হয়, আইভি কী সহ্য করতে পারবে মিলনের এ দারিদ্র্যের নিষ্পেষন? অসম্ভব!

ও কী করবে?

মনে পড়লো আইভি বলছে, যে সে ওকেই চায় তাতেই ওর গভীরতম শান্তি! তবু, মিলন ভাবলো, তা কী করে সম্ভব!

মিলন ওকে ভালোবাসে, ও এখন সেই ভালোবাসে বলেই কী আইভিকে সুখী করতে হবে না? এখন হয়তো ও ভাবছে যে মিলনকে লাভ করলেই ওর পরিপূর্ণতা কিন্তু সত্যিকারের জীবনের পথে কী তাই সম্ভব থাকবে! আইভি হয় তো ভুলই যে করছে না তারই বা কী ঠিক আছে? তা যদি হয়?

মিলন শিউরে উঠলো; নিশ্চয়ই মিলন চেষ্টা করবে ওখানে না যেতে। তাই বোধ হয় ঠিক হবে। কী সমস্যা! ও ভাবছিলো চীৎকার করে ওঠে: ঈশ্বর তুমি আমায় বাঁচাও!

এগার

মেশের সেই পরিচিত কক্ষখানি মিলন আজ ক্লান্ত এ ক'দিন ওকে আরো ঘনিষ্ঠ করে দিলো অমিতা দেবীদের সাথে। সুরভির অসুখ করেছিলো; সুপ্রিয় ছিলোনা কলকাতায়। ও ভাবলো এসব যোগাযোগের মানে কী? ও বুঝলো, অমিতা দেবীদের সংস্পর্শ ও আর কাটাতে পারবে না। এর জন্য অবিশ্যি ও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলো।

মিলন ক্লান্ত! ও ভাবছিলো মুহূর্ত্তগুলোর কী ক্লান্তি নেই?

মিলন যেনো নিজে অনুভব করতে পারছিলো, কী করে প্রতি মুহূর্ত অনুমুহূর্তগুলি অবিরাম চলেছে। মিলন অবাক হয়ে গেলো ভেবে, কী ভয়ানক সংখ্যক মুহূর্তসমষ্টির প্রয়োজন হবে এই পৃথিবীটাকে হত্যা করতে! কী ভীষণ! ও ভাবতেও পারে না। অথচ ঈশ্বর কী করে লক্ষ লক্ষ জগৎ পরিচালনা করেন? কী ভীষণ শক্তি তাঁর যার বলে তিনি এই লক্ষ কোটি গ্রহ-জগতকে নিয়ন্ত্রিত করছেন!

ও এবার যেনো কী বুঝলো, ভাবলো ঈশ্বর তো সেই যাঁর ক্ষুদ্রতম অনুকণা পেয়ে আমরা এতো বড়ো। আর ঈশ্বরের তুলনায় আমরা ছোট হলেও আমরা তো ছোটখাট ঈশ্বর যার সমষ্টি, একীভূত হলে সেই বিরাট ঈশ্বর হয়।

আবার ওর গোলমাল হলো, ও ভাবলো: তাহলে মানুষ বা জানোয়ার এমন কি ক্ষুদ্রতম কিছুর ওপরেও ঈশ্বর তো নির্ভর করেন। যদি এরা কিছু না করে! মানুষ যদি চিন্তা না করে, জগৎ চলে কী করে? ঈশ্বর চলেন কী করে? মানুষ বা অন্যান্যরা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে নিদ্রা যায় ঈশ্বরকেও কী নিদ্রা যেতে হবে?

মিলন এবার চোখ মেললো মাথার যন্ত্রনায়। দেখলো সামনে ইন্দ্রেন্দু! ওকে লজ্জিত দেখাতে লাগলো। ইন্দ্রেন্দু কথা কইলো, বললে: এতো কল্পনা বিলাসী হলে কী বলে মিলন?

মিলন প্রথমটা কিছু বলতে পারলো না তারপর উত্তর করলো: মাথাটা ভীষণ রকম ধরলো যেন ভাই!

ইন্দ্রেন্দু ওর কাছে এলো, বললে, আচ্ছা এরকম করে নিজেকে হত্যা করবার পন্থা অবলম্বন এর কী মানে হয় বলতে পারো মিলন?

মিলন চমকালোনা, চোখ বুজে বললো, হত্যা মানে?

উত্তর এলো হত্যা মানে কী, তুমি তা আমার চেয়ে ঢের ভালো জানো মিলন!

মিলন সপ্রতিভ উত্তর করলো, জানি, কিন্তু...মিলন আর কিছু না বলে হাসলো, ফ্যাকাসে জোলো হাসি। তারপর বললে: হঠাৎ আজ আমাকে নিয়ে পড়লে কেনো —হলো দোষি?

ইন্দ্রেন্দু ব্যথা পেলো। মিলন তা যেনো কতক অনুভব করলো, ভাবলো, সত্যিই ইন্দ্র ওর জন্মে অনুভব করে, ওকে ভালোবাসে।

ঘরটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতায় ঠাসা। এমনি সময় মিলন নিস্তব্ধতাটাকে লজ্জা দিলো। ডাকলে ইন্দ্র!

কী! ইন্দ্রেন্দু কইলো কথা।

কী হয়েছে বলোতো? প্রশ্ন করলো মিলন।

ইন্দ্রেন্দু বললে: সুপ্রিয়ো এসেছিলো আজ সব শুনলাম!

মিলন নিশ্বাস ফেলল বললে, আইভি পর্য্যন্ত!

হ্যাঁ তাই! উত্তর এলো ব্যথামথিত নিঃশ্বাসের সাথে।

মিলন বলে গেলো: তাতে আমি লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করছি নে বন্ধু, বরং আমার ভালোই লাগছে যে তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো এই মুহূর্তে? পারছো না?

হঠাৎ আবার ওর কথা যেনো জরালো হলো, ও বলে গেল: ইন্দ্রেন্দু আমি স্বীকার করছি। আমি আইভিকে ভালোবাসি কিন্তু প্রশ্ন করছি জিগ্গেষ করছি তোমায়। তুমি বলো, বলো আমায় আমি কী করতে পারি এখন? তুমি হলে কী করতে? এবার ও চুপ করলো। ইন্দ্রেন্দু কিন্তু এ নিস্তব্ধতা ভাঙাবার সাহস আর খুঁজে পেলো না!

বার

বাস জোরে ছুটছে। মিলন ভাবছিলো কী দরকার ছিলো অমিতাকে এ সব কথা বলবার। সুপ্রিয়টা রাবিশ! যদি কোন সাধারণ বুদ্ধি ওর থাকে! তাহলে মেয়েদেরকে কী কেউ এসব কথা বলে?

অমিতাও কী ছেলে মানুষ মেয়ে! সুরভির অসুখ, সে সময়েও রক্ষে নেই, বলতে হবে সব। কী আবদার! শেষে কী সেই মাথার যন্ত্রণা নিয়ে সুরভি ও উঠে বসে আর কী? আঃ কী লজ্জাই যে ওর হচ্ছিলো ওই সব বলতে গিয়ে! কী সর্ব্বনাশ! এমন কি মীরাও ওকে ঠাট্টা করতে বাকী রাখলো না।

বাসটা কী ভীষণ জোরে ছুটেছে। মিলন ভাবলে মানুষ এমনি গতিতে চলে যদি তার থাকে চলবার মতো

পর্য্যন্ত পাথেয়, কিন্তু পাথেয়হীন মানুষ গুলোর গতি ঠিক পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়া বাসের মতোই ঝিমিয়ে যায়।

...এবার নামতে হবে। ও সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। ওর চোখ পড়লো বাসের আগেকার দিবটায় ! ও লক্ষ্য করছিল একটি মেয়েকে, এমনি সময়ে সে-ই উঠে দড়ি টানলো। ঠিকই ভেবেছে মিলন :বিশাখাই তো।

বিশাখা বললে : খুব লোক তো ? সেই একদিন আর এলো না ?

মিলন লজ্জা পেলো, বললে আজই তো যাচ্ছিলাম ! এবার মিলন হাসলো বললে : আজও কী মোটর বিগড়ে গেছে নাকি !

বিশাখা চমৎকার হাসলো :বললো, না মোটরে ওঁরা সব চন্দননগর গেলেন কী না...তুমি চলো !

ওরা নেমেছে রাস্তায়।

ওরা চুপা করে এগিয়ে চললো এবার। এমনি সময় বিশাখা বললে, তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা ভয়ানক কথা ছিলো মিলন।

মিলন চমকাল তবু বললে, চলুন বলবেন !

বিশাখা ঘাড় নাড়লো বললে, একা চাই তোমায়।

মিলনের গা যেন গরম হয়ে গেলো, তবুও বললে তাহলে বলুন ?

বিশাখা বললে একটা ট্যাকসি নিলেই ভালো হতো যেনো ......

ওরা ট্যাকসিই নিলো। সীটের দু'কোণে মিলন আর বিশাখা। প্রশ্ন করলে, বলুন কী জিজ্ঞেস করছিলেন বিশাখা দেবী !

নিজের প্রশ্নে ও লজ্জিত অনুভব করলো নিজেকে, বুঝলো প্রশ্নটা বড়ো খাপছাড়া হয়ে গেছে।

বিশাখা স্নিগ্ধ হাসলো বললো :বলছি ভাই, এতো ব্যস্ত হবার দরকার নেই তবে আগে থেকে দুচারটে কথা জিজ্ঞেস করে নেবো ?

মিলনের বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটলো। বিশাখা যেনো ওকে আয়নার ভেতর দেখতে পেলো। বললে, তুমি অতো সঙ্কুচিত হচ্ছো কেনো মিলন ? আমি কখনই চীৎকার করে উঠবো না যে তুমি আমায় চুরী করে নিয়ে পালাচ্ছো।

মিলন লজ্জা পেল বললে : বলুন না, আমি কী তাই বলেছি।

তবু মিলন ঘামতে লাগলো।

এবার বিশাখা আরম্ভ করলো, বললে : দেখো, আমি যা বলছি তা যে একেবারে সত্যি বলেই জানি, তা হয়তো না হতে পারে। তবে এ সন্দেহ...

সন্দেহ ? মিলনকে যেনো কে চাবুক মারলো। ও ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

বিশাখা বললে তুমি ওরকম চুপ করে গেলে কেনো, শুনছো কী বলছি !

মিলন ফ্যাকাশে হাসলো, বললে আপনি বলুন নয়তো কী বলবো ?

বিশাখা আবার আরম্ভ করলো, যা জিজ্ঞেস করছি তার সদুত্তর পেলেই যে খুশী হবো এ ঠিক।

ও চাপা হাসলো। মিলনের অন্তর আত্মা শুকিয়ে উঠলো।

মিলন প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবছিল ও নিশ্চয়ই আইভির কথা শুনেছে ! কিন্তু ব্যাপারটা কী ? কিসের জন্যে এতো ভূমিকা বাঁধা হচ্ছে ?

এবার সত্যই একটা প্রশ্ন এলো, তুমি এখন কোথায় চাকরী কর ?

মিলন চমকালো, ভাবলো, কী মানে এ প্রশ্নের তবু বললে : একথা জিজ্ঞেস যখন করলেন তখন জেনেছেন সবই। তবে যা জেনেছেন তা সত্যি এ আমি বলতে পারি !

বিশাখা বলে গেলো বেশ বুঝলাম সত্যি ! আচ্ছা আমাদের বাড়ী তো যাওয়া বন্ধ করেছো, আচ্ছা ভালো কাজ পেলে এ খবরটা আমাকে না হোক আইভিকেও জানান উচিত তোমার। ওর কথা আটকে গেলো, দম নিয়ে ও বললে আবার তুমি যখন আইভিকে ভালোবাসো ?

কথাটা মিলনের কাছে ব্যঙ্গের মতো শোনালো, তবু ও বললে, বিশাখা দেবী ! বিশাখা মুখ তু হয়ে

বললো জানি, কী উত্তর আসবে, তবে শুনতে চাইনে! এখন জিজ্ঞেস করতে চাই তুমি কী সতিই আইভিকে ভালোবাসো. ওকে বিয়ে করতে তুমি পারো?

মিলন ভাবলো, এই তাহলে ভালবাসার পরিণতি, তাই ই নিশ্চয়! তাই ই-কী? হঠাৎ বলনে বিশাখা দেবী আপনি সব জানেন, ভেবে বলুন আমি কি ওকে বিয়ে করবো? ওকে ভালবাসি আমি ওকে করতে চাই সুখী!

তের

মিলন ভাবছিলো তার সেই কক্ষটিতে বসে। আজ নীল আকাশের নীচে সে কতো সুখী! কী করে যে ওর জীবনের চাকা হঠাৎ আলোর পথে এসে পড়লো, তাই ও ভাবছিলো! ও আইভিকে লাভ করবে, সইতে পারবে কী! ব্যথা মথিত ও বুক ফেটে যাবে না তো, কী করে বেসুরের অভ্যস্ত বীণায় ও সুর টানবে!

মিলনের মনে হলো, এ ঈশ্বরের প্রেরিত দান।

কী দুর্দ্দিনেই না সে পড়েছিলো। সে যেনো অমা-রাত্রির তুফান! সে কী করে শান্ততায় বেজে উঠলো! কী আনন্দ! বার বার মনে হচ্ছিলো ও আইভি লাভ করবে! সেই একদিন আইভি ওকে বলে-ছিল যে সে ওকে চায় নিবিড় করে। আজ তার প্রার্থনা ফলতে চলেছে। কী ভাগ্য ওদের।

ও নিজেকে নীল আকাশের বুকে প্রসারিত করে দিলে। যেনো স্বপ্ন দেখেছে মিলন: আইভি ওর প্রিয়া! কী আনন্দ! কী অফুরন্ত হাসির ঢেউ ওকে গ্রাস করতে আসচে! এতো হাসতে ও পারবে তো? ওরা হাসবে অবিরাম হাসবে, যে স্নিগ্ধ মধুর হাসি শরতের প্রভাত শিউ-লীর সাথে হেসে থাকে!

মিলনের যেনো তন্দ্রা টুটলো ওকে তো অন্ততো একবার সুপ্রিয়ের মার কাছে যেতে হবে! অবিশ্যি সুপ্রিয় খবরটা এতোক্ষণ অমিতা দেবীর বাড়ীতে পর্য্যন্ত জাহির করে ছেড়েছে।

ও উঠলো।

আজ ওর মায়া হলো নিজের দিকে তাকিয়ে কী দুরবস্থাই ওকে গ্রাস করেছিলো। একথা মিলন না ভেবে পারছিলো না।

চৌদ্দ

কিন্তু মিলনের সৌভাগ্য শিখা যে এতো চঞ্চল তা মিলন স্বপ্নেও আশা করিনি! সন্ধ্যা নেমে আসছে।

মিলন নিজের অন্তরটি অনুভব করলো: পুড়ে যাচ্ছে! এই তার জীবন, আর এই জীবন তাকে ভোগ করতে হবেই!

মিলন ভাবছিলো, কী করে সে আজো বেঁচে আছে। মিলন মানে, যে মানুষেরই জন্যে দুর্দ্দিন। কিন্তু যে মানুষের দিন মাত্রেই দুর্দ্দিন তার? তার কী? সেও তার জীবন বাঁচবার জন্যে সকলকার মতো ছেঁড়া অন্তরটা নিয়ে ছুটো ছুটি করে বেড়াবে।

ওর চোখে পড়লো এক আকাশ জ্বলেজ্বলে তারা মিলন লক্ষ্য করলো, আজ অমারাত্রি; ভাবলো, এ অমারাত্রি জীবন লাভ করবে পূর্ণিমার জোৎস্নায় নিশ্চ-য়ই করবে কিন্তু তার জীবন? তার অমারাত্রি! মিলন ভাবলো, একী প্রহেলিকা না স্বপ্ন! যে সত্য ওর জীবনের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতো যা ওকে দীপ্ত উজ্জ্বল করতে পারতো, তা একটা মিথ্যা হয়ে ওকে শ্মশান করে গেল কেনো? কী দুর্ভাগ্য ওর! কী পরিহাস ঈশ্বরের! ওর মনে হলো, ঈশ্বর কী নিষ্ঠুর। ওকী কী, কী করেছে তার। একবার পেলেও জিগ-গেষ করে না, না—না ও ওর নিজের দাবী দিয়ে কৈফিয়ৎ চাইতো যে কেন ভয় সর্ব্বনাশ প্রতি মুহূর্ত্তে সাধিত হচ্ছে! আর ওকে পিষে মারাই যদি প্রয়োজন তবে মাঝে মাঝে এ রসিকতা এ ব্যঙ্গের কী প্রয়োজন?

আজ পনেরো দিন আইভির অসুখ। টি—বি! ওর তীব্র হাসি পেলো। এবার কী? আইভি মরবে! তাতে কী? মরুক! ও হাসবে! একফোটা চোখের জল না ফেলে ওকে চিতার তুলে দিয়ে আগুন জলন্ত আগুন দিয়ে দেবে ওর গায়—হ্যাঁ নিজ হাতে! মিলন উঠে বসলো।

খানিকটা চুপ করে রইল এবার তাকালো আকা-

শেষ দিকে। রাত্রিরের আঁধার ওকে যেনো শান্তির চুমো দিলে। ও হঠাৎ তৃপ্তি অনুভব করলো, অঃ ঈশ্বর যেনো নীল চোখ দিয়ে ও কে করুণা পরিবেষণ করলেন। ওর লজ্জা হলো এতো দুঃখেও ঈশ্বরকে ও যেনো বোঝেনি। এইতো ঈশ্বর নীল চোখে ওকে তৃপ্তি দিলেন! মনে হলো. ঈশ্বর ওকে যেনো প্রাণের মতো ভাল বাসেন।

ও ভাবলো, ওর বীণা যে চিরকাল পূরবীতে বাধা ব্যথাতেই সে জানলো! তবে? সে কী অন্য সুরে বাজে? তাইতো ঈশ্বরের কী দোষ? ও যে পূরবী ভালবাসে। কতোবার ও আইভিকে পূরবী গাইতে বলেছে।

ও উৎকট হেসে উঠল। তাঁর কী দোষ? ঈশ্বরতো করুণাময়।

পনের

সুন্দর সন্ধ্যা।

আইভির মনে হচ্ছিল! এমন সুন্দর সন্ধ্যা সে জীবনে দেখেনি! আজ ওর কেবল এমনিতরো একটি সন্ধ্যা মনে পড়ছে! সে যেন একটা সুস্বপ্ন! সেই সন্ধ্যা সেই মুহূর্ত্ত যেদিন ও মিলনকে পেলো!

আইভির মনে হচ্ছিলো, আজকের সন্ধ্যা তেমনি সুন্দর। তেমনি মনোরম তেমনি মিষ্টি!

আইভির যন্ত্রণা যেনো কম মনে হচ্ছে। ওর মনে হলো, ওকী হালকা হয়ে গেছে যেনো পাখীর মতো! বুঝি নীল আকাশে উড়ে যেতে পারবে এই মুহূর্ত্তে!

কী ভালই যে ওর আজ লাগছিলো! আইভি চোখ মেললো। মিলন বাতাস করছে বসে। কী সুন্দর! মিলন আজ যেনো কতো বেশী সুন্দর! এতো সুন্দর তো ও মিলনকে কখনো দেখেনি।

ও ডাকলো, মিলন দা!

বিশাখা ওষুধ ঢেলে দিয়ে গেলো। মিলন গেলাসটা নিয়ে বললে ইভা! আইভি আবার চোখ তুললো। ওর পাণ্ডুর রোগাক্রান্ত নয়ন! সে যেনো অসহ্য!

মিলন ব্যথা ভরা চোখে তাকিয়ে! দেখছে:প্রতি মুহূর্ত্তে আইভি ঝরা-শিউলির মতো ম্লান হয়ে আসছে, ওরই চোখের সামনে। তবু বললো একটু ঘুমোও আইভি!

ওষুধের গেলাস নামিয়ে আইভি চোখ বুজলো। যেনো গভীর আরাম পেলো। ধীরে ধীরে মিলনের একখানা হাত নিয়ে বললে আমি কী সুখী মিলন দা'।

মিলন বাইরের দিকে তাকালো। সন্ধ্যা নিবিড় হচ্ছে। ওর মনে হলো ওই সন্ধ্যাকে গ্রাস করবার জন্যে অন্ধকারের কী ভীষণ আগ্রহ। যেনো মৃত্যু, জীবনকে গ্রাস করবে। যেনো সত্য মিথ্যাকে হত্যা করবে! ওর মনে পড়ে গেলো:এই অন্ধকারই একদিন এই পৃথিবীর মৃত্যু হবে, তার জীবন শেষ হবে। কী মিথ্যা এই পৃথিবী। ওর চোখের সমানে যেনো পরদা সরে গেলো, মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করছে; সত্য মিথ্যাকে হত্যা করছে! কী ভয়ানক! ঈশ্বর তবে কী! তিনি সত্য মিথ্যাকে হত্যা করেছেন! তিনি মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করেছেন। ঈশ্বরের সেই অপরিসীম শক্তি! তিনি তিনি কি ভুল করতে পারেন কখনো? মিলনের আজ এই মনে হচ্ছিলো।

* * * *

সন্ধ্যা। অমিতার মনটা আজ ভালো ছিলো না। সুপ্রিয়, মীরারা বেড়াতে গেলো এই মাত্র! ও একা! ও ভাবছিলো, আজ আইভিকে দেখতে যায়! কিন্তু এ নিঃসঙ্গতা আজ ওর বেশ লাগছে! ও সত্যিই যেনো এবার তৃপ্তি বোধ করছে! ও সুইচ অফ করে দিলে রাস্তার আলো কী ওকে রেহাই দিবে? ও বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। এমনি সময় ঘরে ঢুকলো মিলন! আইভি সুখী হলো, বলতে যাচ্ছিল কি, এমনি সময় বললো, এ কী বিশ্রী চেহারা করেছ তুমি!

মিলন হাসলো, অদ্ভুত হাসি। উত্তর এলো না কিছু।

অমিতা বললে—মিলন!

মিলন মাটিতে বসে পড়লো।

মিলনের চোখে জল গড়িয়ে পড়লো। অমিতা বিমূঢ়ের মতো চেয়ে উঠে বসলো! অমিতার বুক কেঁপে উঠলো? মিলন কথা বললে এবার, অমি'দি? অমিতা ওর হাত দুটো নিলে, মিলন অমিতার কোলে মাথা এলিয়ে দিলো।

এমনি সময় দরজার পর্দা দুলে উঠলো। অমিতা চমকে দেখলো মীরা আর সুপ্রিয়!

ওরা নিমেষে পর্দা ফেলে দিয়ে; যেনো মিলিয়ে গেলো, অমিতার কানে এলো :তা বলে বৌদিও যে এমনি,তা ভাবিনি কখনো...

অমিতার সামনে যেনো লক্ষ লক্ষ সূর্যের আগুন জ্বলে আবার নিভে গেলো।

ও ভাবলো এর আগে যদি ওর শ্রবণ শক্তিও বিনষ্ট হয়ে যেতো!

মিলনের বুকে তখনো শ্মশানের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

স্বরলিপি

গান

[লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীঅসিত কুমার হালদার রচিত **এই বরষার গানখানি** গাহিলে বুঝিতে পারিবেন কত সুন্দর হইয়াছে।]

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি
বাদর বোলে
বিজলি চমকে মেঘের কোলে।
কে বিরহিণী ব'হে শিরে ধারা
যায় অভিসারে হ'য়ে পথ-হারা
দুরু দুরু দুরু দুরু
হিয়া তার দোলে
শ্রাবণ গরজন
মাদল রোলে॥

গান ও সুর—শ্রীঅসিতকুমার হালদার　　　　স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

II সা সা রা রা | রা মজ্ঞা সা রা I রা -া পা পা | মপা ধপ মজ্ঞা -া I (II)
রি মি ঝি মি | রি মি ঝি মি বা ০ দ র | বো ০ লে ০

{ I মা -া পা পা | ণা পা পা পধা I মা -া পা পা | মপা ধপা মজ্ঞা -া I
বা ০ দ র | বো ০ লে ০ বা ০ দ র | বো ০ লে ০

I না -া র্সা র্সা | র্সা না র্সা -া I নর্সা র্রা ণা ণা | ণা পণা পা -া I
বা ০ দ র | বো ০ লে ০ বা ০ দ র | বো ০ লে ০

I মা -া পা ধা | মপা ধপা মজ্ঞা -া I }
বা ০ দ র | বো ০ লে ০

I মা পা পা -া | ণা ণা পা -া I মা -া পা ধা | মপা ধপা মজ্ঞা -া I
বি জ লী ০ | চ ম কে ০ মে ০ ঘে র | কো ০ লে ০

I না -া না না | না র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্রা না | না র্সা র্সা -া I
কে ০ বি র | হি ০ ণী ০ ব হে শি রে | ধা ০ রা ০

I নর্সা র্রা র্সা ণা | ণা ধণা পা -া I মা পা পা র্রা | র্রা -া র্রা -া I
যা য় অ ভি | সা ০ রে ০ হ য়ে প থ | হা ০ রা ০

I না -া না না | না র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্রা না | না র্সা র্সা -া I
কে ০ বি র | হি ০ ণী ০ ব হে শি রে | ধা ০ রা ০

I নর্সা র্রা র্সা ণা | ণা ধণা পা -া I মা -া পধা পা | মা মজ্ঞা জ্ঞা -া I
যা য় অ ভি | সা ০ রে ০ হ য়ে প থ | হা ০ রা ০

I মা পা পা পা | ধা ধা মা পা I মা পা না না | র্সা না র্সা -া I
ঝু রু ঝু রু | ঝু রু ঝু রু হি য়া তা র | দো ০ লে ০

I নর্সা র্রা র্সা ণা | ণা ধণা পা পা I মা -া পা ধা | মপা ধপা মজ্ঞা -া II
শ্রা ০ ব ণ | গ র জ ন মা ০ দ ল | দো ০ লে ০



বিরহ ও ইন্দিরা এম-এ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বিরহ একখানি বাংলা ছবি। কালী-ফিল্ম ইহার প্রযোজক। বর্ত্তমান যুগে স্বর্গীয় ডি-এল রায়ের এই অপূর্ব্ব হাস্য-নাটিকার সহিত হয়ত অনেকেরই পরিচয় নাই। কিন্তু এককালে বঙ্গ নাট্যশালায় এই নাটকখানি খুব ধুম ধামের সহিত অভিনয় হইত। হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্র লাল বার্দ্ধক্যে যুবতী বিবাহের একখানি হাস্যজনক ব্যঙ্গ চিত্র রচনা করিতে গিয়া একখানি সহানুভূতিপূর্ণ অপূর্ব্ব মানস-আলেখ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ Satire বলিতে যাহা বুঝায়, বিরহে তাহার কিছুই নাই। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে এক যুবতী এক বৃদ্ধের সহধর্ম্মিনী হইলেও তাহাতে তিনি খুবই অনুরক্তা ও পতি পরায়ণা ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর ললিত-লবঙ্গলতার ন্যায় তাহাতে কোনই tragic element নাই। প্রযোজক এই সহজ ও উপভোগ্য অংশটুকু বেশ অনুভব করিয়া চিত্রখানি রচনা করিয়াছেন। সমস্ত ছবিটীতে কোথাও অযথা আক্রমণ, অযথা অসম্ভবতার আবির্ভাব নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রযোজক ভুল করিয়াছেন যে চিত্রের ছাব রঙ্গালয়ের নাটিকা নহে। বিরহের ঘটনাগুলির সন্নিবেশ যেরূপ ছায়াচিত্রোপযোগী হওয়া উচিত ছিল তাহা না হইয়া, উহা অনেকটা থিয়েটারি ঢংএ ঢালা হইয়াছে। এইরূপ হইবার আরও একটা কারণ থাকিতে পারে। ছোট নাটিককে একখান পুরো ছায়া ছবির আকার দিতে যাওয়াও ইহার অন্যতম কারণ।

ছবিখানিতে কোনরূপ tempo বা ছন্দ-বদ্ধ গতি নাই। ইহার গানগুলি উপভোগ্য হইলেও, অত্যন্ত অধিক কথোপকথন সন্নিবেশ করা হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে প্রযোজক কোনরূপ Set রচনা যে প্রয়োজন তাহা মনেই করেন নাই। এইজন্য একই সেট দুইবার দুই ভদ্র লোকের বাটীর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের অনেকটা অকৃতকার্য্যতাই প্রকাশ পাইয়াছে। চরিত্র অঙ্কনেও প্রযোজক যথেষ্ট অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনকড়ি বাবুর পুরাতন ঢংএর অভিনয় চিত্র-জগতে আর খাপ খায় না। তুলসী লাহিড়ীই ছবিখানির মান রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস অত তাড়াতাড়ি না করিয়া কিছু সময় দিয়া ছবিখানি প্রস্তুত করিলে, ছবিখানি জনপ্রিয়ই হইত।

ইন্দিরা এম-এ

ইন্দিরা এম-এ, ইহা একখানি হিন্দি ছবি। ইহার কথোপকথন অতি সহজ হিন্দি ভাষায় লিখিত। ছবিখানি নিউ সিনেমায় চলিতেছে।

ছবিখানি বর্ত্তমান যুগের একখানি জলন্ত আদর্শ। এক ধনী ব্যারিষ্টার দুহিতা বিলাতে থাকিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে এম-এ উপাধি গ্রহনের পর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসে। কন্যাবৎসল পিতা কন্যাকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা দিয়া তাহার শিক্ষাভিমান রক্ষা করেন। বিলাত গমনের পূর্ব্বে কন্যা ইন্দিরার সহিত কিশোর নামক এক ধনী যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। ইন্দিরা বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে সে স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহ প্রস্তাব করে। ইন্দিরা এই বিবাহে রাজী না হওয়ায় মাতার সহিত মনান্তর ঘটে। কন্যার মনোতুষ্টির জন্য পিতা কন্যাকে লইয়া আবাস ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হোটেলে বাস করিতে থাকেন। এই হোটেলে অত্যন্ত আধুনিক ভাব-সম্পন্ন পিয়ারীলাল নামক একজন লেফটেনান্টের সহিত পরিচয় হইয়া, উহা ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। পিতা পুত্রীতে এই বিষয় লইয়া মনান্তর ঘটাতে, ইন্দিরা পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পিয়ারী লালের আশ্রয়ে গিয়া উহার সহিত Civil Marriage এ আবদ্ধ হয়। লম্পট পিয়ারী লাল সুন্দরী পত্নী লাভ

করিয়াও তাহার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিল না। এই অবধি গুণের কাহিনী ইন্দিরার কর্ণগোচর হইলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করিতে উদ্যতা হয়। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইন্দিরাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের গুলিতে আহত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কিশোর ঠিক সেই সময়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে লয়। বিচারে কিশোরের ফাঁসীর হুকুম হয়; এমন সময় ইন্দিরার পিতা বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া তাবৎ রহস্য প্রকাশ করিলে কিশোর মুক্তি লাভ করে। ইন্দিরা গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর মাতার অচলা পতিভক্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। সে পতির সহিত মিলিত হইবার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করে। সেখানে পিয়ারীলাল সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। ইন্দিরা উন্মত্তার ন্যায় হাসপাতালের কক্ষে কক্ষে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পিয়ারীলালের গলার শব্দ পাইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। যাঁহারা প্রগতির ভক্ত তাঁহাদিগকে এই ছবিখানি মনোযোগ সহকারে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ছবির সাজ সজ্জা, tempo ও অভিনয় খুবই সুন্দর। এই চিত্র গ্রহণ প্রথম অংশে আদতেই ভাল নহে; শেষের দিকে কিন্তু খুবই সুন্দর হইয়াছে। রেকর্ডিং খুব ভাল না হইলেও গল্পটী বুঝিতে কোন বাধাই উপস্থিত হয় না। Temple Bell এর পর Imperial Companyর এত বড় ভাল ছবি আর হয় নাই।

ব্যথী

শ্রীশোভেন্দ্র নাথ মজুমদার

ব্যথায় ভরা চোখের জলে
কাঁদতে তোমায় দেখে
সারা নিশি কাটল আমার
ঘুম হারাণ চোখে।
কত দিনের ব্যাকুলতা
কত যে মিলন কথা—
আজকে বুঝি বিফল হ'ল
তোমার প্রাণের দ্বারে।
ব্যথার ক্ষত অবিরত
তোমার তরে হ'য়ে নত
জড়িয়ে আছে মোর পরাণে
ব্যাকুল বেদন ভারে।

গান

চিত্ততোষ রায়

ওগো সখি! প্রিয়তম,
এল না আজিকে, হায়!
জীবন মালিকা মম,
প্রিয় বিনা ঝরে যায়॥
কত নিশি জাগি জাগি,
ফুলমালা গেঁথে রাখি,
ঝরে গেল ফুলদল,
ভরে গেল বেদনায়॥
মিছি ভাবি এলো পিয়া,
মিছি সুখে কাঁপে হিয়া,
আসিবেনা কভু আর,
বলিল নিঠুর বায়॥

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলায় হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকারও অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(২২)

একটা দিন কামপুরে থাকিতেই হইল।

ষ্টেশন মাষ্টার বাঙ্গালী বলিয়াই বাঙ্গালীর উপরে তাঁহার সহানুভূতি আসিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া জোর করিয়া দীনেশ ও সুরমাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

শিবানীকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবানী নড়িল না।

বেশ শান্তমুখেই বলিল, "আপনারা আজ রাতটা ওখানেই থাকুন দিদিমণি, এখানে আর কোথায় থাকবেন—জায়গাই নেই। কাল সকালে আসবেন, আমার সঙ্গে এখানেই দেখা হবে।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাদের সঙ্গে দেশে যাবি তো শিবানী?"

শিবানী অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাব বই কি দিদিমণি, না হলে থাকব কোথায়, আমায় দেখবেই বা কে? যাকে সকলের চোখ হতে লুকিয়ে রাখার জন্যে এখানে—এই পাহাড় ঘেরা জায়গায় অসভ্য আসামীদের মাঝে আসা, সেই যখন চলে গেল, আমার তো আর এখানে থাকার কোন দরকার নেই।"

"লুকিয়ে রাখার জন্যে—"

দীনেশের বিস্ময়োক্তি শুনিয়া শিবানী তাহার পানে তাকাইল, বলিল, এখন "আর কোন কথা গোপন রাখার দরকার নেই দাদাবাবু সেই জন্যেই সব বলব। কিন্তু আজ একটা কথাও বলবার মত শক্তি আমার নেই দাদাবাবু, কাল আমি সব জানাব।"

সে সেই ঘরটার মধ্যে পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে দীনেশ তখনও ঘুমাইতেছিল, সুরমা মাত্র উঠিয়াছেন, সেই সময় একটী লোক একখানি পত্র আনিয়া দীনেশকে খুঁজিতেছিল।

সুরমা লোকটীকে দেখিয়া চিনিলেন, সেও সেই শবযাত্রীর দলে ছিল; তিনি দীনেশকে জাগাইয়া দিলেন।

শিবানীই যে পত্র দিয়া পাঠাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ ছিল না তথাপি দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে পত্র দিয়েছে?"

লোকটা সবিনয়ে উত্তর দিল, "মায়িজী।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরমা বলিলেন "হঠাৎ যে শিবানী পত্র দিয়ে পাঠালে এর মানে তো কিছু বুঝতে পারলুম না দীনেশ—"

দীনেশ চিন্তাপূর্ণ মুখে বলিল, "আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি নে দিদি; পত্র না পড়লে কিছু জানাও যাবে না।"

পত্রখানা সে খুলিয়া ফেলিল।

দীর্ঘ পত্র—বোধ হয় শিবানী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পত্র লিখিয়াছে এবং সকালে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পত্র পড়িতে পড়িতে দীনেশের দুইটী চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছেরে পড় দেখি।"

দীনেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ পত্র সে তোমাকেই লিখেছে দিদি, পড়ছি শোন—।"

সে পত্রখানা পড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণেষু—

দিদিমণি, আপনি আর দাদাবাবু সকাল বেলায় আমায় নিতে আসবেন জানি, সেই জন্য এই রাত্রিতেই আমি পত্রখানা লিখে রাখছি, সকালে কারও হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

আপনারা আমায় দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু কোথায় আমার দেশ, কারা আমার আত্মীয় স্বজন? আমার দেশ নেই, আমার ঘর নেই, আমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। আমি জগতে একা; যখন যেখানে থাকি, সেই আমার নিজের দেশ, গাছতলাও তাই আমার ঘর।

প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার সময় এসেছে, আজ সকল কথাই বলব। আর তো ভয় নেই দিদিমণি, যার জন্যে আমার গোপনতা সে আজ নেই। সে মরেছে, তার হাড় জুড়িয়েছে, আমাকেও সে মুক্তি দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, পাছে তার এতটুকু ক্ষতি হয়, এতটুকু অনিষ্ট হয় সেই ভয়ে তাকে বুকের আড়াল করে নিয়ে আজ কয়টা বছর ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও দুই একমাসের বেশী দিন থাকতে পারি নি,—কেবল আপনার গ্রামেই অনেক দিন টিঁকে ছিলুম। ওখানে কেউ আমাদের সন্ধান পায় নি, হয়তো পেতও না, কিন্তু আমার স্বামীই নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলেন।

সে মরতই,—প্রভেদ এই এমন ভাবে মরণ নয়, ফাঁসিতে ঝুলে মরত—কারণ সে নরহত্যাকারী, সোজা কথায় সে খুনী! আজও তার নামে ওয়ারেণ্ট ঘুরছে; যে তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে যথেষ্ট পুরস্কার পাবে এ কথাও সকলে জানে।

সে মরেছে—সে বেঁচেছে। ঘৃণিত, অপমানিত, জীবনের বোঝা আর সে বয়ে চলতে পারছিল না, সে তাই বেঁচেছে। কি কষ্টেই না গেল সে, সে কষ্ট আর কেউ জানলে না কেউ দেখলে না, দেখলুম একা আমি—নির্জ্জল চোখে তার মাথার পাশে বসে।

তাই ভাবি দিদিমণি, কি কঠিন প্রাণ আমার। আমি স্থির হয়ে বসে দেখছিলুম কি করে সে যায়—কত দীনভাবে কত অসহায় হয়ে।

সে মরতে চায় নি,—সত্যই তার মরার ইচ্ছা এতটুকুও ছিল না। সে চেয়েছিল বেঁচে থাকতে, সব ছেড়েও সে চেয়েছিল পৃথিবীর সব কিছু নিঃশেষে ভোগ করে নিতে, কিন্তু আমি তাকে বলেছিলুম "তুমি এমন ভাবেও কেন বেঁচে থাকতে চাও? তুমি মর—তুমি মুক্তি পাও।"

মাগো,—কি করে তাকে এ কথা বলেছিলুম? সে নিঃশব্দে কেবল আমার পানে চেয়ে রইল—তার দুটি চোক দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ল, আমি মুছিয়েও দিলুম না তো!

কাল সমস্ত রাত সে আমার হাতখানা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিল, অথচ সে একটি কথাও বলে নি। সমস্ত রাত বিনিদ্র আমি তার মাথার কাছে বসে—দেখি কি করে যম তাকে নিয়ে যায়।

কিন্তু দেখতে পেলুম না। আস্তে আস্তে তার হাতখানা নিঃসাড় হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, তার চোখ দুটো একবার মাত্র জলে উঠল, তারপরই একটা পর্দার আড়ালে সব ঢাকা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার বুকে হাত দিলুম, নাকে হাত দিলুম, কই, বুকে তার স্পন্দন কই, নাকে নিঃশ্বাস কই?

সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান একদিন পড়েছিলুম। গুরুজনদের যখন প্রণাম করতুম, তাঁরা আশীর্ব্বাদ করতেন সাবিত্রী সমান হও। ভাবতুম তাঁদের আশীর্ব্বাদ কোনদিনই ব্যর্থ হবে না, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ অমোঘ—অব্যর্থ। এও কি সত্য হতে পারে যে মরাকে বাঁচাতে পারা যায়, তাকে ফিরিয়ে এনে আবার সুখের সংসার গড়তে পারা যায়? একদিন এ গল্প সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলুম, এ বিশ্বাস দেহের প্রতি রক্ত কণিকার সঙ্গে মিশে মিলে গিয়েছিল, আজ জোর করে বলছি ও সব মিছে কথা পুরাণের কোন কথাই সত্য নয়। অনেক দিন হতে এ মিথ্যা সত্যরূপে চলে আসছে, আমারই মত কত মেয়ে প্রতারিত হয়েছে কে সে সব খবর নিয়েছে?

আজ এই হতেই ভগবানে অবিশ্বাস এসেছে, আজ

ভাবি কে আছে—কেউ নাই। মিথ্যে কাকে পূজো করেছি, কাকে ডেকে এসেছি ?

সে মরেছে — সে তো নিস্তার পেয়েছেই আমকেও দিয়ে গেছে মুক্তি। আমি আজ মুক্ত এ যে কি আনন্দ তা আর জানাব কাকে? আমার আজ কোন বন্ধন নেই, আমি যেখানে খুসি সেখানে যেতে পারব, কারও ভাবনা আমায় ভাবতে হবে না, কারও আকর্ষণে আমায় জড়িয়ে থাকতে হবে না।

দিদিমণি, আপনি আর দাদাবাবু আমায় দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু সেখানে কি আর আমার স্থান আছে? আমি জানি সমাজ আমায় স্থান দেবে না, সে আমায় ঘৃণা করে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে, কোনোদিন আপনাদের ঘরের দরজায় দাঁড়ানোর অধিকার আমায় দেবেন কি? আমি একজনের জন্যে সব হারিয়েছি, দিদিমণি, আজ আমার কেউ নেই — কিছু নেই।

আপনি দিদিমণি, আপনিও কি আমার জীবনের সব কথা শুনে আমায় গ্রহণ করতে পারবেন? কেবল আপনি নন, আমার বাপ মা, আত্মীয় স্বজন সবাই আমায় ত্যাগ করেছেন, কেউ আমায় আজ স্থান দেবেন না। আমার জীবনের কাহিনী সব আজ বলছি - আজ কিছু গোপন করব না।

ক্রমশঃ

গান

কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

সখা, পাতার বুকের পরে,
মোরা হাসি ভরা মুখে ফুটি।
ফুলদল মেলি মৃদু বায়
মধু স্বপন হইতে উঠি।
যখন কোয়েল পাপিয়া ডাকে,
ওই গাছের পাতার ফাঁকে,
আমি শিহরিয়া ওগো দেখি,
সুখে ঘাসের বুকে লুটি॥
মোরা মধুর বাতাসে দুলি,
নিজেরি রূপেতে ভুলি,
মুখে অরুণের শোভা মাখি,
এই বসন্ত প্রাতে জুটি॥

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

সখা, তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধ ফোঁটা ছোট তারা
এই চাঁদের আলোর পুঞ্জে
আমি নিজেরে নিজেগো হারা
আমি আধ ফোটা ছোট তারা।
আমি সাঁজের বেলাতে ফুটি,
হেসে মেঘের বুকেতে লুটি,
কভু মেঘেতে নিজেরে ঢাকি
তার কাল ছায়া মুখে মাখি
আমি আধ ফোটা ছোট তারা॥

গান

সরোজ মুখোপাধ্যায়

শূন্য বিফল জীবন মাঝে
তোমার পরশ দিয়ে যাও।
তোমার নীরব চরণ ধ্বনি
হৃদয় পুরে উঠে রণি
কি দিয়ে বরিব—নাহি জানি
বলে দাও—বলে দাও।
ওগো অচিন ওগো সুন্দর
সকল বাঁধন টুটে দাও।

সাহিত্যিকের কন্যাদায়

—গল্প—

শ্রীবিমল সেন

সকাল বেলা কোন প্রকারে এক কাপ চা পান করিয়া, নিজের ঘরে গিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আজ তিনদিন হইল যাবৎ প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গণিয়া কাটাইতেছি। সকাল সন্ধ্যায়, কলেজে, বাড়ীতে, এবং রাত্রে স্বপ্নেও ঐ একই কথা মনে জাগিয়াছে কত আকাশ-কুসুম রচিয়াছি।

আজ সেই দিন।

ব্যাপারটা খুলিয়া বলি। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যিক। খুব কম লোকেই জানে যে, আমার ও রোগও আছে। নিজের অতৃপ্ত অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে মাঝে মাঝে এক আধটা গল্প লিখিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়া দিই। অধিকাংশই ফেরত আসে, না হয়, একেবারে 'লোপাট' হইয়া যায়। কচিৎ কখনও কোন লেখা, কাগজে প্রকাশিত হইলে, আহ্লাদে ফাটিয়া মরি।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, হঠাৎ একদিন উপন্যাসের ভুত স্কন্ধে ভর করিয়া বসে। প্রতিজ্ঞা করি, এখন হইতে ঐ সব বাজে প্রেমের গল্প আর লিখিব না—'নভেল' লিখিতে হইবে। 'প্লট' স্থির করিয়া সেই যে লাগিলাম, তাহা শেষ হইল এই এত দিনে।

বেশ হইয়াছে জিনিষটা! ছোট গল্পগুলি এত ভাল হইত না। নিজের অন্তরের যত দুঃখ দৈন্য, আশা আকাঙ্ক্ষা, সব ঐ উপন্যাস খানিতে ঢালিয়া দিয়াছি। আমার বড় সাধের জিনিষ!

আহা, যদি ওরা ছাপে! লোকে তাহা হইলে বলিবে 'নভেলিষ্ট'। কাহারও সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সময়ে আর হেলা তাচ্ছিল্য করিয়া বলিবে না—ইনি অমুক গল্প টল্প লেখেন।

এ ধরণের 'ইনট্রোডাকৃশানে' আমার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। যেন 'গল্প টল্প' লেখা আর রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া 'দো দো আনা, ছো ছো পয়সা'—করা একই কাজ।

সে দিন উপন্যাস খানি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক-এর দোকানে দিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা তিন দিন সময় চাহিয়াছিলেন—পড়িয়া দেখিবার জন্য। সে তিন দিন পুরা হইয়া গিয়াছে। আজ যাহা হউক একটা কিছু হইয়া যাইবে।

জামা গায়ে দিয়া, মনে মনে দুর্গা এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম স্মরণ করিতে করিতে, জানালা বন্ধ করিতে যাইতেছি, এমনি সময়ে, পাশের বাড়ীর মীরা তাহার ঘরের জানালা হইতে বলিল—বেরচ্ছ?

রাগে জ্বলিয়া উঠে গেলাম। এ সময়েও পেছু ডাকিতে হয়! তাও আবার ঐ মীরার ডাক! এমন অলক্ষুণে মেয়ে আর নাই। যে দিন সকালেই ইহার মুখ দেখিয়াছি, সেই দিনই সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া গিয়াছে।

কালো, কুশ্রী চেহারা। একুশ বাইশ বৎসর বয়স হইল কেহ বিবাহ করিতে চাহে না অথচ, নিজেকে উর্ব্বশী, রম্ভার জুড়িদারই বুঝি ভাবে। তাই মুখে স্নো মাখিয়া, পাতা কাটিয়া কান দুটি ঢাকিয়া সেই কানে বিঘৎ প্রমাণ লম্বা লম্বা দুই দুল পরিয়া যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে নিজে হয়ত ভাবে, লোকটাকে পুড়াইয়া শেষ করিতেছি, আমি কিন্তু পালাইতে পারিলে বাঁচি!

আজ এমনি সময়েই তাহার দর্শন ভাগ্যে ঘটিল! মুখ বিকৃত করিয়া বলিলাম—হ্যাঁ বেরুচ্ছি, দেখে বুঝতে পারনা?

কত বড় স্পর্দ্ধা! খোলাখুলি মুখের উপর বলে কিনা ভালবাসি! ঐ কাল পেত্নী—হিড়িম্বা রাক্ষসীর মত—উঃ, আজকালকার মেয়েগুলা সময়ে সময়ে আমাদের মত ছেলেদেরও লজ্জিত করিয়া তোলে। বি-এ পড়িলে হইবে কি!

\+ + +

'সরস্বতী এজেন্সীর সম্মুখে আসিয়া, পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই সেই মুহূর্ত্ত!

রুমালে কপালের ঘাম মুছিয়া, সিদ্ধিদাতার নাম স্মরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ম্যানেজারের চেয়ার শূন্য পড়িয়া। অন্য দুইজন কর্ম্মচারী কাজ করিতেছিল। কাছে গিয়া বলিলাম—নমস্কার, বিনয় বাবু, সুরেশ বাবু (ম্যানেজার) এখনও আসেন নি নাকি।

বিনয় বাবু আমার আগমন লক্ষ্য করিলেন না। কথাগুলিও বোধ হয় কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

তাই বলিলাম—শুনছেন? সুরেশ বাবু এসেছেন কি?

তিনি এবার মাথা না তুলিয়াই বলিলেন—উঁ উঁ। নিজের বক্তব্য দুইবার বলা সত্ত্বেও, এতক্ষণে 'উঁ' করিলেন। তাই, আবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম।

এবারেও কথাগুলি শুনিলেন কিনা জানি না। অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট?...হ্যাঁ, সেত অনেকগুলো পড়ে আছে। কোনটা চাই?

সে কি কথা। পড়িয়া আছে মানে?

—সুরেশ বাবু কোথা, বলুন না।

আবার শুনাইলেন—উঁ উঁ উঁ?

জ্বালাতন! ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে হইলে তাহার কথা গুলি যে অন্ততঃ একটু মন দিয়া শুনিতে হয়, এ লোকটি তাহা জানেন না দেখিতেছি। তবে, ইনি মন ভোলা, অন্যমনস্ক টাইপের লোক—ইহা জানিতাম বলিয়াই বিরক্তি দমন করিয়া, নিজের কথার পুনরুক্তি করিলাম!

বলিলেন—সুরেশবাবুর আজ আসতে দেরী হবে। কি চাই বলুন না, আমিইত রইচি।

অগত্যা, কি চাই তাহা ইহাকেই বলিলাম।

—ও, তাই বলুন। আচ্ছা দেখছি। নম্বর কত।

—নম্বর ত মনে নেই!

বিনয় বাবু সহসা হাত পা ছুড়িয়া, মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন—মনে নেই! অতগুলো ম্যানাসক্রিপ্টের ভেতর থেকে এখন কি করে খুঁজে বার করি, বলুন দিকি? নামটা মনে আছে? না তাও ভুলে গেছেন? আপনারা সব এত 'আন্‌মাইণ্ডফুল' যে,—

বলিলাম—আলোকের দান।

—আচ্ছা, দাঁড়ান, দেখছি। সুরেশবাবু বলেছিলেন বটে!

বলিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে খাতাখানা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এক টুকরা কাগজ খাতার সহিত আঁটা ছিল।

হাতে দিয়া বলিলেন—এই নিন, নম্বার 'থারটিন্'। ঐ কাগজে সব লেখা আছে, পড়ে দেখুন। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

কাগজখানিতে যাহা লেখা ছিল, তাহা লিখিতে সত্যই লজ্জা বোধ করিতেছি। উপন্যাসখানাতে নাকি গল্প নাই, চরিত্রগুলির একটিও ফোটে নাই...ভাষা অত্যন্ত মামুলি...পরিচ্ছেদগুলি সাজানও ভুল হইয়াছে...পুনরুক্তিতে ভরা...উপন্যাস লেখাত দূরের কথা, আমার নাকি আরও কিছুকাল বাংলা ভাষা শিক্ষা করা উচিত...অসংখ্য বানানের ভুল—গ্রামাটিকাল্ মিস্‌টেক।

আর পড়িতে পারিলাম না।

এত সাধের 'আলোকের দান'—(আলোক আমার উপন্যাসের নায়কের নাম) কত সোনার স্বপ্ন—

খাতাখানা বগলদাবা করিয়া,উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—চললুম ধন্যবাদ!

বিনয় বাবু বলিলেন—সন্ধ্যায় আসবেন সুরেশবাবু বলছিলেন। তারপরই শুধাইলেন—'ইলেকট্রিসিটি' সম্বন্ধে কিছু লিখছেন বুঝি? বেশ হয়েছে বলছিলেন।

এবার আর অন্যমনস্ক টাইপ বলিয়া ক্ষমা করিতে পারিলাম না। লোকটা রসিকতা করিবার আর সময় খুঁজিয়া পাইল না!

—বাধিত হলুম।

বলিয়া ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া আসিলাম।

এত বড় অপমান! বাংলা লিখিতে জানি না? এমন নির্ম্মম আঘাত জীবনে আর কখনও সহি নাই।

হইবে না? কাহার শ্রীমুখ দেখিয়া বাহির হইয়াছিলাম? ও মুখের এমনিই মাহাত্ম্য যে, সিদ্ধিদাতা ত দূরের কথা, তাঁহার মাতা স্বয়ং মা-দুর্গাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কিন্তু, রোখ চাপিয়া গেল। জীবনের এ প্রথম প্রয়াস, ব্যর্থ হইতে দেওয়া উচিত নহে। স্থির করিলাম, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে যত বই-এর দোকান আছে—প্রত্যেকটিতে চেষ্টা করিয়া দেখিব। কোন কোন স্থানে লাগিয়াই যাইবে।

+ + +

বাণী কুটীর। বিরাট দোকান। ম্যানেজারকে নিজের আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে, তিনি আমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইলেন। শেষে ঠোঁট উল্টাইয়া, এমন একটি ভাব ধারণ করিলেন, যেন, আমি আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ লইতে আসিয়াছি।

'এ্যাবাউট্ টার্ণ' করিয়া, বলিয়া গেলেন— এখানে হবে না, মশাই।

পত্রপাঠ বিদায়!

+ + +

শ্রীকান্ত লাইব্রেরী। এখানকার প্রধান পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশকদের মধ্যে একটি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সম্মুখের কর্ম্মচারিটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম।

—কি চাই?

বলিলাম—ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কি কাজ? আমাকেই বলুন না।

—তাঁর সঙ্গেই আমার কাজ আছে। আপনাকে বলে লাভ নেই।

ভদ্রলোক একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিলেন—আপনার নাম কি মশাই? কোত্থেকে আসছেন? ...আমাকে বলতে হয় বলুন না—

দেখিতে দেখিতে আসে-পাশের অন্য চেয়ারটি কর্ম্মচারি —কি হল হে? ব্যাপার কি? বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহ, ভয় এবং উদ্বেগের চিহ্ন।

অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহাদের দোকানে হঠাৎ যেন চোর, ডাকাত আসিয়া পড়িয়াছি।

যাহা হউক, শেষে আসিবার কারণ ব্যক্ত করিবার পর, একজন আমাকে ম্যানেজারের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম—বেরো, বেরো এখান থেকে, হারামজাদা, পাজী ব্যাটা...চাবকে পিঠ লাল করে দেবো...বেরো শীগগীর।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সে কি!

ভয়ে ভয়ে গলা বাড়াইয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে একটি লোককে আঙ্গুল তুলিয়া বাহিরে যাইবার রাস্তা দেখাইতেছেন। লোকটি বোধ হয় চাকর-বাকর কেহ হইবে। ঘরে আরও চারি-পাঁচ জন বসিয়া আছেন। তাঁহাদের দুইজনকে চিনি—নামজাদা সাহিত্যিক।

আমার 'গাইড্' বৃদ্ধ লোকটিকে বলিলেন—এই ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ম্যানেজারের অবস্থা দেখিয়া 'ফিউচার প্রস্পেক্ট' সম্বন্ধে আর কোন আশাই রহিল না।

ম্যানেজার বলিলেন—তবু দাঁড়িয়ে রইলি? বেরুলিনি এখনও? হারাম······

বলিতে বলিতে ঘাড় ধরিয়া চাকরটাকে বাহির করিয়া দিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি চাই আপনার?

আমার আর উৎসাহ ছিল না। তাহার উপর আবার ঘরে বড় বড় সাহিত্যিকেরা বসিয়া।

তবু, ঢোক গিলিয়া কোন প্রকারে বলিলাম—এই··· এসেছিলুম···মানে, ইয়ে, আমি একখানি উপন্যাস লিখেছি।

সাহিত্যিকদের চোখ অমনি আমাকে বেড়িয়া ধরিল।

ম্যানেজার বলিলেন—বেশ ভাল কাজ করেছেন। ···তা এখানে কেন?

—'ম্যানাসক্রিপ্ট' এনেছি···আপনারা যদি পড়ে দেখতে চান।

ভদ্রলোক সাহিত্যিকদেরদিকে ফিরিয়া বলিলেন—ঐ দেখছেন ত? দিনে আটটি-দশটি করে এমনি। এ সব ক্ষুদে সাহিত্যিকেরা পাগল করে তুলেছে মশাই!

বলিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে লিখেছেন? আপনি নিজে?

—হ্যাঁ।

—নাম কি আপনার ?

—নলিনী রায়।

নামটা শুনিয়াই ম্যানেজার মুখখানা এমন বিকৃত করিয়া তুলিলেন যে, সে চন্দ্রানন দেখিয়া আমার চোখ জুড়াইয়া গেল। হাত-পা ছুড়িয়া, প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন—ইঃ, নলিনী রায়।...আপনি পুরুষ, না মেয়েছেলে সে কথা আগে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আমার সম্বন্ধে এ প্রকার সন্দেহ পূর্ব্বে আর কাহাকেও প্রকাশ করিতে দেখি নাই। একি অদ্ভুত কথা

সাহিত্যিকেরা হাসিয়া উঠিলেন।

আমিও শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম—সে ত দেখেই বুঝতে পারছেন।

—মনে করুন, দেখিনি; শুধু শুনে কি করে বুঝব, তাই বলুন। নলিনী মেয়ে ছেলেদের নাম হয় না ?...এই ত, আমার 'ওয়াইফে'রই নাম নলিনী।

বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আজকালকার ছেলেরা ঐ যে এক কী ফ্যাসানই শিখেছে, শুনলে হাড় জ্বলে যায়। সুনীতি রায়, ধরণী দে ..কেন বাবা, মাঝখানের জিনিষটি কি শীকেয় তুলে রেখেছ ? কামড়ায় ? আমি বলছি নলিনী রায় পুরুষ নয়—প্রুফ করুন।

কথা শুনিয়া অঙ্গ শীতল হইয়া গেল।

সাহিত্যিকেরা সকলে সায় দিলেন—নলিনী রায় স্ত্রীলোকের নাম হইতে পারে বৈ কি !

দশচক্রের ফেরে পড়িয়া, ভগবানকে নাকি ভূত হইতে হইয়াছিল। আমাকে ইঁহারা স্ত্রীলোক বানাইয়া ছাড়িলেন। তবু ভাগ্য যে, গরু-গাধা বানান নাই।

'প্রুফ' করিতে পারিলাম না। কিন্তু সারা অন্তর বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। বলিলাম—ম্যানাসক্রিপ্টখানা কি দেখতে চান ?

ম্যানেজার তেমনি বিকৃত মুখেই বলিলেন—কই, আপনার নাম ত আগে কখনও শুনিনি !...প্রথমেই একেবারে উপন্যাস ধরেছেন ?

—না, এ আমার প্রথম লেখা নয়। মাঝে মাঝে মাসিকে ছোট ছোট গল্প লিখে থাকি।

—বটে নাকি ? কোন্ কাগজে লেখেন ?

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, অন্যান্য সকলকে উদ্দেশ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কেউ শুনেছেন মশাই ?

সাহিত্যিকদের ভিতর একজন—যেন আমার ভিক্ষা পাত্রে, কৃপা করিয়া একটি পাই-পয়সা ফেলিয়া দিয়া—বলিলেন—হ্যাঁ, পড়েছি যেন মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার এক গাল হাসিয়া বলিলেন—হেঁ,-হেঁ,-হেঁ, তা' আর পড়বেন না ? আপনার যে আবার ঐ এক পয়সা দু'পয়সা দামের সাপ্তাহিকগুলো পড়ার অভ্যাস আছে।...কই, দেখি আপনার 'ম্যানাসক্রিপ্ট' !

ততক্ষণে সে সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে !

হাতে লইয়া, একটা পাতা উল্টাইয়া পড়িলেন—তবু, আজ এই পাগল-করা চাঁদের আলোয়, একান্তে বসে অস্বীকার করতে পারল না, যে, কি যেন সে চেয়েছিল; কোন স্থানটা যেন তার শূন্যই পড়ে আছে...

এঃ, এ ষ্টাইল-এ আবার উপন্যাস লেখা চলে নাকি ? ...কেন, 'পারল', 'মারল' না করে, 'পারিল', 'মারিল'তে কি দোষটা হত ?...আবার লিখেছেনও ত গুচ্ছের।...না মশাই এখানে এমন সব বই নেওয়া হয় না। যে কাগজে গল্প লিখে থাকেন, সেইখানেই যান।

বলিয়া এতক্ষণে আমাকে রেহাই দিলেন।

সে ঘরের চারিজনের মধ্যে, একজন কখন উঠিয়া গিয়াছিলেন লক্ষ্য করি নাই। ফুটপাথে দেখা হইতে ডাকিলেন—শুনছেন ! যদি কিছু মনে না করেন, তা' হলে আপনাকে একটা উপদেশ দিই। এভাবে কক্ষনো ঘুরে বেড়াবেন না। কি রকম অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে দেখছেন ত ? নতুন লেখককে এতে শুধু লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। তার চেয়ে, যদি কোন নামজাদা সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় থাকে, তা'হলে তাঁকে ধরুন গিয়ে। তাঁর 'থ্রু'তে চেষ্টা করুন। হয়ত হয়ে যেতে পারে।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইয়া নিজের পথ ধরিলাম।

সুরেন্দ্র বুকষ্টল। এখানেও ম্যানেজার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং শুনিয়াই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—ও-ও-ও। আপনিই নলিনী বাবু? নমস্কার……নমস্কার মশাই। এযে আমাদের সৌভাগ্য! আসুন, ভেতরে আসুন।

এতগুলি দোকানে ঘোরাঘুরি করিয়া, মনে মনে পুনঃ পুনঃ শপথ করিয়াছি যে, আর কখনও অন্তত 'নভেল' লিখিব না। কোথাও কেহ এ ভাবে স্বাগত করিয়া লয় নাই। তাই, প্রথমে যেন ঘাবড়াইয়া গেলাম।

আদর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া, ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন——আপনার লেখা কক্ষনো 'মিস' করিনি, মশাই। 'ওয়াণ্ডারফুল' লেখেন। এই ত সেদিন একটা লেখা 'সন্ধ্যাতারা'য় পড়ছিলাম।…… 'সন্ধ্যাতারায়' নয়? ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'লেখা'-তেই বটে—ঠিক। ……দু'মাস আগে? না, না, আপনার ভুল হচ্ছে—এইত সে দিন পড়লুম। ……আপনি বই লিখেছেন, তাও আবার এত দোকান থাকতে আমাদের এখানে এসেছেন, —এতে যে আমি……কি বলব, মশাই …আমি যে…যাক সে আর বলে কাজ নেই। আমরা সাগ্রহে আপনার কাজের ভার নিতে প্রস্তুত আছি।

আহ্লাদে গলিয়া পড়িলাম। কলিকাতা সহরে কি আর সমাজদার 'পাবলিসার' নেই? এইত লাগিয়া গেল!

বলিলাম—'ম্যানাসক্রিপ্ট'-খানা রাখুন তা হলে। পড়ে দেখা…ও আর পড়ে কি দেখব, মশাই? আপনার লেখার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে আচ্ছা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজই আসুন ব্যাপারটা পাকা প্যাক করে ফেলা যাক। …বসুন, চা-টা খান।

বলিয়া হাঁকিলেন—ওরে মেধো, দুকাপ চা নিয়ে আয় চট করে। …পান খান ত? …চারখিলি পানও আনিস …দোক্তা? …দোক্তাও আনিস রে……

এ আবার কোন খেলা? আদর অভ্যর্থনা যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

কারণ বুঝিতে অবশ্য অধিক বিলম্ব হইল না। ভদ্রলোক এত প্রশংসাই করিতে লাগিলেন যে, নিজেও কখনও নিজের হাত তারিফ করি নাই।

'পাকাপাকি'র কথা আরম্ভ হইল। কোন 'টাইপ' ব্যবহার করা উচিৎ, মলাট কি প্রকারের হইবে, কি কাগজ ভাল, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া দুই দিনের ভিতরে প্রেস্-এ দিবার আশ্বাস দিয়া, শেষে কতক গুলি ছাপান 'ফর্ম্ম' এবং প্যাম্‌ফ্লেট সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন এইবার—তাহলে, দয়া করে এ গুলোও একটু দেখুন। …এখানে যারা বই দেন, তাঁদের আমরা একেবারে নিজেদের একজন করে নিতে চাই। সবাই আমাদের দোকানের 'শেয়ার' কিনে থাকেন। …এই দেখুন, রমেশ বাবু পাঁচশো টাকার 'শেয়ার কিনেছেন; সতীশ বাবু সাড়ে তিনশো টাকার। …আপনাকে কত টাকায় দিই বলুন! হেঁ, হেঁ, হেঁ,…সহজে ছাড়ছি না; আমরা আপনার রীতিমত স্থায়ী 'পাবলিসার' হতে চাই। …পড়ে দেখুন।

দস্তুর মত ঝগড়া করিয়া, খাতা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ক্রোধে ঘৃণায়, লাঞ্ছনায় মন বিষাইয়া উঠিল। জীবনে নভেল লেখাত দূরের কথা, আর কলমই ধরিব না কখনও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ইচ্ছা হইতেছিল আলোকের দান খানা ছিঁড়িয়া হেদোর জলে ভাসাইয়া দিই। রাগে জলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ এই মীরা মেয়েটাকে এমন অপমানই করিব যেমন অপমান হয়ত ঐ পাবলিসাররাও আমাকে করিতে পারিবে না। যত নষ্টের মূলই ত ঐ মেয়েটা!

তাই সোজা মীরাদের বাড়ীতে গিয়া বলিলাম—দেখ মীরা যখন কোথাও বের হই তখন অমন করে পেছু ডেকো না। তুমি মান কিনা জানি না, কিন্তু এক এক জন এমন লোক আছে, যাদের মুখ দেখলে……যাক, সে আর আমি বলতে চাই না। তোমাকে হাজার বার বারণ করেছি আজও বলছি। আমার ও 'সুপারষ্টিশানটা' আছে।

মীরা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এইবার চোখে জল আসিবে; ছিঁচ কাঁদুনি আরম্ভ হইবে—সে আমাকে ভালবাসে, আর আমি

তাহাকে এইরূপ ভাবি, আমি নিষ্ঠুর......হৃদয় হীন পাষাণ।

ঘ্যান ঘ্যান করিয়া মাথা খাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া আসিলাম।

রাত্রে, চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু লইয়া, আমার সাধের আলোকের দান জানালা দিয়া, নীচে গলির ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দিলাম। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আওড়াইলাম—সিদ্ধিদাতা গনেশ, সিদ্ধিদাতা গনেশ। এমনি সময়ে মীরার চাপা কণ্ঠস্বর শুনিলাম—ওকি ফেলে দিলে?

উঃ, ঈশ্বর করুন যেন ও মেয়েটার কখনও বিবাহ না হয়! আজ আমাকে সকলে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে উহাকে যেন সকলে সেই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করে! কাল হইতে যেন উহার মুখ আর না দেখি! —অলক্ষণ·····রাক্ষুসি!......

\+ \+ \+

পরদিন সরস্বতী এজেন্সীর সম্মুখ দিয়া হাটিয়া যাইতেছি, এমনি সময়ে ভিতর হইতে ম্যানেজার সুরেশ ডাক দিলেন।

ভিতরে যাইয়া দাঁড়াইতে বলিলেন—কি হল আপনার কালও এলেন না আজও সারাদিন গেল!

—এসে কি হবে আর? আপনার উপদেশ অনুযায়ী, এখন থেকে নূতন করে বাংলা ভাষা শিখব স্থির করেচি।

ভদ্রলোক বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—মানে? ও পাঠ যখন তুলিয়াই দিয়াছি, তখন আজ আর ভাল করিয়া মানে শুনাইয়া দিতে দোষ কি? যে যেমন লোক···

কিন্তু সুরেশবাবু সমস্ত শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তারপর, আমার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

—বিনয়!

বিনয়বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিলেন। দুইবার ডাকিবার পর সাড়া দিলেন—উঁ

—এর আলোকের দানএর ম্যানাসক্রিপ্টের সঙ্গে কোন কাগজ খানা এ্যাটাচ করতে বলেছিলুম?

কিন্তু, অনেক ভাবিয়াও সে কথা বিনয় বাবু মনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

শেষে সুরেশ বাবু হাসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—এইবার বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা......নম্বর থারটিন কাগজ খানা অন্য একটা ম্যানাসক্রিপ্টে লাগাতে বলে ছিলুম আপনার আলোকের দান-এর নম্বর হচ্চে এইট্টিন। বিনয় হয় এইট্টিনকে থারটিন পড়েছে না হয়, ভুল করে অন্য কাগজ খানা এ্যাটাচ করে দিয়েছে। ......আচ্ছা লোক তুমি, যাহোক বাবা! ......যাক আপনার বইখানা আমরা নিতে প্রস্তুত আছি। কাল নিয়ে আসবেন।

হায়রে অদৃষ্টের পরিহাস বুঝি ইহাকেই বলে। এত লাঞ্ছনা এবং মনোবেদনা ভোগ করলাম। বইখানা এতক্ষণ হয়ত ধাপার মাঠে, মাটি চাপা হইয়া পড়িয়াছে। ···এখন এ কী শুনিতেছি! ঈশ্বরের মত রসিকতা করিতে আর বোধহয় কেহ পারে না।

টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। সমস্ত শক্তি এবং উৎসাহ, এ নিষ্ঠুর আঘাতে যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

গলির ভিতর গিয়া, সেই 'ডষ্টবীন্‌'-এর চারিদিকে খোঁজাখুজি করিতেছি। যদি—যদি—

এমনি সময়ে হাসির শব্দ পাইয়া, চাহিয়া দেখি, মীরা তাহার জানালায় দাঁড়াইয়া দন্ত বিকশিত করিতেছে।

যদি ফাঁসির ভয় না থাকিত, তাহা হইলে সেদিন নিশ্চয়ই মেয়েটাকে খুন করিয়া ফেলিতাম।

আবার কিছুক্ষণ হি হি করিয়া, বলিল—শুনে যাও, মা ডাকছেন। জরুরি কাজ।

জ্যেঠাইমা ডাকিতেছেন; তাই যাইতেই হইল। ও বাড়ীতে এই আমার শেষ যাওয়া।

গিয়া দেখি, জ্যাঠাইমা ডাকেন নাই। মিছা কথা বলিতেছে। আবার রাক্ষুসে দাঁত বাহির করিয়া, হাসিয়া বলিল—কেমন জব্দ; আসতে হল ত? আমার সঙ্গে যে পেরে উঠবে না, বুঝবে কবে? রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া বলিলাম—দেখ মীরা, জাননা যে, মানুষ কতটা 'ডিস্‌গাষ্টিং' হতে পারে; তুমি বোঝ না,

তোমাকে কতখানি ঘৃণা করি আমি। তাই সব সময়ে রসিকতা! কিন্তু সব জিনিষেরই যে একটা মাত্রা আছে তা……

সে আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শেষে আচলের ভিতর হইতে কি একটা বস্তু বাহির করিয়া বলিল—এইটি খুঁজছিলে ত? তা হঠাৎ এত রাগ হল কিসে যে, অমন সাধের জিনিষটি 'ডাষ্টবীনে' ফেলে দেওয়া হল? আমি জানি যে, কালই আবার এজন্যে বুক চাপড়ে মরবে। পেট পোরা রাগই হয়েছে সার। আর কিছুত জাননা, আরত কিছুই দেখতে শেখনি! চোখে ঝাপসা দেখিতেছিলাম। আমার 'আলোকের দান' ধাপার মাঠে যায় নাই! মেয়েটা কুড়াইয়া আনাইয়াছে!

শকুনির মত ছোঁ মারিয়া, খাতাখানা কাড়িয়া লইয়া দৌড় মারিলাম।

আমায় টান পড়িল।

হিড়িম্বা রাক্ষসী বলিল—দাঁড়াও। আগে আমার একটা কথা শুনতে হবে।

আজ উহার কোন যে কথা শুনতে আমি প্রস্তুত। আহা, মেয়েটাকে অনেক কটু কথা শুনাইয়াছি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি কথা, বল শীগগীর। মুখ-ভরা হাসি এবং চোখভরা জলে এক অদ্ভুদ চেহারা করিয়া সে বলিল…প্রতিজ্ঞা কর আর কখনও আমাকে অলক্ষুণে রাক্ষুসি বলবে না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করলুম।

বলিয়াই উদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম, 'সরস্বতী এজেন্সী'র দিকে—

বিদগ্ধা

শ্রীলালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধার ঘরের দুয়ার খানি ঠেলে
তুমি এলে?
দাঁড়াও দেখি প্রদীপখানি জেলে,
যদি এলে!
দেখা শুনা নাইকো অনেক দিন,
কী জানি কী চিনতে পারব নাকি?
হয়ত চোখের দীপ্তি হবে ক্ষীণ—
অন্ধকারে দেখবো কেবল ফাঁকি।
সন্ধ্যা দোলে অস্তাচলের কেশে,
নামে ছায়া আলোর পাশে হেসে,
বাতাস যে গায় অস্তাচলের গান,—
মধুর স্বরে ঘুমের ওঠে তান,
এমন সময় ছোট্ট করাঘাতে
আমার দ্বারে একটি দিলে ঘা,
বিদগ্ধা মোর! একলা এত রাতে
আসবে তুমি জানবো কিসে তা?
সন্ধ্যা বেলার দীপ্ত প্রেমের বানে
নিখিল ধরে রঙ মাখানো তুলী,
বিদগ্ধা মোর! আজ সে রঙের টানে
আমরা এসো মিলন তরী খুলি।

ধারা

আভাকণা

কে তুমি একলা চলার দেশে,
আপন ভেবে পথের মাঝে
ধরবে আঙুল এসে?
তুলবে আমায় সাথী কোরে,
বাঁধবে কত প্রীতির ডোরে,
কত আপন ভাববে মোরে
পাওয়ার হাসি হেসে।
একলা চলার দেশে।
জানি বটে মিথ্যা সবই,
সবই নিছক ভুল;
তবু তোমার পান্থ শালায়
কর্ণে দেব দুল।
হোক্না মিছা চল্ব তবু
এই অলীকেই ভেসে!
একলা চলার দেশে।

বিদেশী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ

[বর্ত্তমান কবিতার লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন কৃতী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। সুরেশ্বর শর্ম্মা এই ছদ্ম নামে ইহার বহু কবিতা সাময়িক পত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বহু সাহিত্য সভায় বিদ্বজ্জন সম্মিলনে ইহার ব্রাউনিং, আলডুস্ হাকসলি প্রভৃতির অনুবাদ রচনা পঠিত হইয়াছে। ভাবৈশ্বর্য্যে অতুলনীয় এই সব কবিতার বাংলা রূপ দেওয়া যে কত কঠিন তাহা এ পথে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। সুরেন্দ্র বাবুর কবিতা ও নানা বিচিত্র রচনা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

প্রাচীন

'Walter de la Mareএর "All this is past" হইতে'

বহু পুরাতন অরণ্য ভূমি,
ফুল মঞ্জরী যত
গুল্মলতার পল্লবে যারা
ফোটে ঝরে অবিরত,
কত যে প্রাচীন তাহাদের রূপ
মানবের অগোচর;
কোন্ আদি যুগ হতে এল ভাসি'
গোলাপ-বংশধর।

কত পুরাতনী কল্লোলিনী যে,
ভূধর ঝরণা ধারা,
নীল গগনের তলে তাহাদের
অগম তুষার কারা

কত আসা-যাওয়া ইতিকথা গীতি
উথলে তাদের প্রাণে—
শিশির কণার জ্ঞানগরিমায়
ব্যাসদেব হারি মানে।

মোরা মানবেরা অতীব বৃদ্ধ
মোদের স্বপনাবলি
কোন্ ছায়াঘন নন্দন বনে
গাহে পিক, ভণে অলি।

মোরা উঠি জেগে মৃদু গুঞ্জনে
গাহি দুদিনের গান
মৌন অতীত নিদ্রা নিথর
মালঞ্চ অম্লান।

খেয়া

(Tennyson এর "Crossing the Bar" হইতে)

অস্ত রবি আর সন্ধ্যাতারা,
আর সেই সাথে তব সরল সুস্পষ্ট আবাহন।
তটপরে ঢেউ গুলি নাহি যেন ঢালে অশ্রু ধারা
সিন্ধু যাত্রা করিব যখন।

যাব ভাসি' নিদ্রাতুর স্রোতে,
গহন স্তব্ধতা ভারে শব্দহারা ফেণোচ্ছাস হীন
সে গম্ভীর ক্ষণে যবে,—আসিল যে সুগভীর হ'তে
সে পুন গভীরে হয় লীন।

গোধূলি ও সন্ধ্যাঘণ্টা ধ্বনি,
তারপরে দিগ্বিদিক্ ব্যাপী শুধু গাঢ় অন্ধকার,
নাই বিদায়ের ব্যথা, শান্তিভরা নিস্তব্ধ অবনী
আমি যবে যাব পরপার।

দেশকালাতীত কোন্ লোকে
প্রবাহে ভাসিয়া যাব দূর হ'তে অজানা আড়ালে
আছে আশা, হবে দেখা কাণ্ডারীর সনে—
চোখে চোখে
এ কূলের আগল হারালে।

বীমা প্রসঙ্গ

জীবনবীমার প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা

১৯৩৩ খৃঃঅব্দের সরকারী বীমাপুস্তক হইতে (Insurance Year Book) দেখা যায়, ১৯৩২এ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ২৭ কোটী টাকার উপর জীবনবীমা হইয়াছে। ইহাতে বণ্টন প্রথার (Dividing plan) বীমার অঙ্ক ধরা হয় নাই। এই ২৭ কোটীর মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ১৯ কোটী টাকার কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন—বিদেশীয় কোম্পানীগুলি করিয়াছেন ৮ কোটী টাকার উপর। উক্ত বর্ষের চাঁদা আদায়ী আয় (Premium income) যথাক্রমে দেড় কোটী টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্য সংগ্রহের অঙ্কের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় ভারতীয় কোম্পানীগুলির কার্য্য যে ভাবে প্রসারলাভ করিতেছে—বিদেশীয় কোম্পানীগুলির ভারতীয় কার্য্য সে তুলনায় প্রসার লাভ করিতে করিতে পারিতেছে না। ইহা ভারতীয় কোম্পানী গুলির পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সত্য, ভারতীয় জন সংখ্যার তুলনায় ভারতীয় ব্যবসায়ের প্রসার এখনও গর্ব্ব করিবার মত হইতে দেরী আছে।

ব্যবসার প্রসারের গতির মন্থরতার কারণ অনেক আছে। বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জন সাধারণের অজ্ঞতা তাহার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য একটী কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য বিশেষ প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন। প্রচার কার্য্যে কোম্পানীগুলি আলস্য-পরায়ণ তাহা বলা যায় না। কোম্পানীগুলি সাধারণতঃ খবরের কাগজ, বীমা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা শুধু কোম্পানী গুলির স্বীয় ব্যবসায় আহ্বান করা ছাড়া অন্য কিছু উপকার হয় তাহা স্বীকার করা যায় না,—উহাতে বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে কিছুই শিক্ষা প্রদান দেওয়া হয় না। কাজেই বিজ্ঞাপন দিলেও যাহাকে প্রচার কার্য্য বলে সেরূপ বস্তু বড় দেখা যায় না!

এই সম্পর্কে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে ও কিছু বলা যাইতে পারে। ইংরেজী পত্র সাধারণতঃ যাহারা নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণের পক্ষে জীবনবীমা সম্বন্ধে যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু জানেন। ইংরাজী বীমা মাসিকগুলি সাধারণতঃ বীমাবাদীগণই পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই শ্রেণীর পত্রিকায় বীমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন কোন কার্য্য সাধন করে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না কারণ বীমাবিদগণ দেশীয় কোম্পানীর খবর স্বতঃই রাখিয়া থাকেন। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, যাহারা বিজ্ঞাপিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানেন না বা অতি অল্প জানেন তাঁহাদিগকেই সজাগ করা। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয়, যে অর্থ এই জাতীয় বিজ্ঞাপন দেওয়ায় ব্যয়িত হয় তাহার সম্যক প্রত্যুপার্জ্জন (return) পাওয়া অসম্ভব।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রকৃত অর্থ, যে স্থলে বিজ্ঞাপিত বস্তুর চাহিদা নাই বা সেরূপ বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রেতাগণ অজ্ঞ সে স্থলে সেই বস্তুর চাহিদার সৃষ্টি করা। বিগত এক মাসের মধ্যে কোন বাংলা সাপ্তাহিক সহযোগী বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ বাংলা মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে বীমার প্রচারের সপক্ষে একাধিকবার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ঐ মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। জীবন বীমায় জননীর এবং তাঁহার অপোগণ্ড শিশুদিগের স্বার্থই অধিক। মাতৃজাতিকে জীবনবীমার প্রচার কার্য্যের ক্ষেত্র করিয়া প্রচার কার্য্য প্রসারিত করিলে সুফল ফলিবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গৃহের ব্যয়ভার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহাদের হস্তে—সঞ্চয় সম্বন্ধে, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং সে বিষয়ে জীবন বীমা কতখানি সাহায্য করিতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সচেতন করিতে পারিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অবস্থার, জীবন বীমা ব্যবসায়ের অবস্থার তথা সমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি প্রতি শিক্ষিত ঘরেই স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণীর পত্রিকার কতকগুলিতে জীবনবীমা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ বিভাগের ও সৃষ্টি হইয়াছে। বীমাক্ষেত্রে ইহারা যে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বীমা-ব্যবসায়ীদিগের সহযোগীতা ইহারা অবশ্যই দাবী করিতে পারেন।

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে ধারাবাহিক আলোচনা বাহির হইতেছে সে সম্পর্কে গত সংখ্যায় আমরা একটু উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম হিন্দুস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে

আমাদিগকে তাঁহাদের বলিবার কি আছে জানাইবেন। তাহারা এ পর্য্যন্ত কিছুই জানান নাই—জানাইলে আমরা পত্রস্থ করিতাম। দু'তিন খানা কাগজে আনন্দবাজারের প্রতিবাদ ভাবে কিছু লেখা দেখিয়াছি—তাহা হিন্দুস্থানের নিজস্ব প্রতিবাদ কিনা বুঝিবার উপায় নাই এবং তাহাতে কোন গুরুত্বও দেওয়া যায় না। কারণ সে সব প্রতিবাদে আনন্দবাজারের দফাওয়ারী অভিযোগের বিন্দুমাত্র খণ্ডন নাই। আমরা আশা করিতেছি হিন্দুস্থানের পক্ষ হইতেই আমরা কিছু জানিতে পারিব। হিন্দুস্থানের কর্ণধার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের অর্থনীতিক পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর প্রসারিত—এবং বীমা কোম্পানী পরিচালনায়ও তিনি ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি নিজে যদি আমাদের এ সব সম্বন্ধে কিছু জানান তবে তো খুবই ভাল হয়। আমরা তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম—

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ

১৯২০ সালে কার্য্যারম্ভ করিয়া বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টি কোং লিমিটেড চতুর্দ্দশ বৎসর কার্য্যকাল অতিক্রম করিয়াছে। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালকগণ এক বিরাট কল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে মধ্যবিত্ত পলিসি হোল্ডারগণকে তাঁহারা কলিকাতায় কিম্বা উপকণ্ঠে গৃহনির্ম্মাণের সুযোগ করিয়া দিবেন এবং সে জন্য অনেক জমিও ক্রয় করেন। কিন্তু দেখা গেল যে এরূপ কার্য্যের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন এবং একটি নূতন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর পক্ষে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। অতএব সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু যে জমি খরিদ করা হইয়াছিল তাহাতে লক্ষাধিক টাকা আটকাইয়া যায় যাহা কোনও সুদই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না। ১৯৩৩ সালে বর্ত্তমান পরিচালকগণ উক্ত জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা যোগ্য ভাবে লগ্নী করার ফলে, কোম্পানীর সুদ-অর্জ্জনের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

এই কোম্পানীর বর্ত্তমান পরিচালক মেসার্স এস, সি, মিত্র এণ্ড কোং। ইহারা কোম্পানী পরিচালনা করিবার সমস্ত খরচের জন্য দায়ী। কোম্পানী তাঁহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা বৎসরে খরচ বাবদ দিবেন। ফলে দেখা যাইতেছে যে এখন এই কোম্পানী আয়ের শতকরা ৩৬৲ টাকা মাত্র খরচ করিতেছেন। ১৪ বৎসর বয়সের কোম্পানীর পক্ষে এত অল্প খরচে কাজ করার দৃষ্টান্ত বিরল। ২৬,২৭ বৎসরের কোম্পানীরাই এত অল্প খরচে কাজ করিতে পারেন না। অতএব এদিক দিয়া এই কোম্পানী খুবই মিতব্যায়ী বলিতে হইবে। এবং এই মিতব্যায়ীতার ফলে ভবিষ্যৎ ভ্যালুয়েশানে ইহাদের ভাল বোনাস দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে।

এই কোম্পানীর মৃত্যু হার দেখিয়া মনে হয় যে নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইহারা অত্যন্ত সতর্ক। বেশী কাজের লোভে ইহারা যেমন তেমন জীবন গ্রহণ করেন না। সেরূপ করিলে মৃত্যু-জনিত দাবী অসময়ে বেশী হইয়া কোম্পানীর লাভ-অর্জ্জনের ক্ষমতা দুর্ব্বল করিয়া দেয়। সে দিক দিয়াও এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়াই মনে হয়।

এই কোম্পানীর মোট দায়িত্ব কম। ইহারা বেশী কাজ করেন নাই। ইহাদের মজুত তহবিল সেই দায়িত্বের শতকরা ২৫ ভাগ। অর্থাৎ প্রত্যেক একশত টাকা দেনার জন্য ২৫ টাকা ইহাদের মজুত আছে। এই অনুপাত খুবই উচ্চ। ভারতবর্ষে আর মাত্র ৪।৫টি কোম্পানীর অনুপাত ইহাপেক্ষা বেশী এবং সে সকল কোম্পানী বেঙ্গল ইনসিওরেন্স অপেক্ষা অনেক পুরাতন।

এই কোম্পানীর মজুত তহবিল বেশ নিরাপদে লগ্নী করা আছে বলিয়া মনে হয়। মোট তায়দাদের শতকরা ৭০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ও অনুরূপ নিরাপদভাবে লগ্নী করা আছে। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বলা চলে যে বাংলার এই তরুণ কোম্পানীটি বেশ সুপরিচালিত, ইহার কার্য্যভার অভিজ্ঞ হস্তে ন্যস্ত ও ইহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

অধুনা ইহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। কয়েক বৎসর যাবত ইনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কাজ পরিচালনা করিতেছেন। কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত

সুধীন্দ্রলাল রায়, এম-এ আসিয়া এজেন্সি ম্যানেজার পদে প্রফুল্ল বাবুর সহিত যোগ দিয়াছেন। সুধীন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ কর্ম্মী ও সুপরিচিত বীমাবিদ। ইঁহাদের দুই জনের সহযোগিতায় যে এই কোম্পানী অচিরে বাংলার বীমা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশা পোষণ করি।

ইনসিওরেন্স হেরল্ড

চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা। নিরপেক্ষ বীমা মাসিক সাহিত্যের মধ্যে এই পত্রিকাখানির নাম উল্লেখ যোগ্য। চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা 'salesman' সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে সুবিদিত বীমাবীদগণের বহু সুলিখিত প্রবন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। মিঃ পি, সি, রায় লিখিত The Cry in the Wilderness নামক প্রবন্ধটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—এই প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ আমরা পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত করিয়াছি। বীমা কর্ম্মীদিগের ছবি ও সংক্ষিপ্ত কর্ম্মজীবনী আলোচ্যসংখ্যার বৈশিষ্ট্য—ইহা ভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করায় পত্রিকাখানি জনপ্রিয় হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

বাদলের দিনে

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

নিদাঘের শেষে বরষা আসিল
ভরিল হৃদয় হরষে!
আকাশে উড়িল পিয়াসী চাতক
সজল সমীর পরশে!
ঢাকি নীলতনু ঘনশ্যাম মেঘে,
আকাশ নিয়ত গর্জ্জিছে বেগে,
ঝর ঝর ঝরে বিরাম বিহীন
বাদলের ধারা বরষে!
নিদাঘের শেষে বরষা আসিল
হৃদয় ভরিল হরষে!

হৃদয় আজি যে শাসন মানে না
পাগলের মত ছুটিছে!
জলদের বুকে চপলা যেথায়
চকিত চমকে লুটিছে!
উদ্দাম হ'য়ে ছোটে সেইখানে,
দুকুল ছাপিয়া আকুল আহ্বানে
তটিনী যেথায় ভীম উল্লাসে
প্রলয়ের নাচে ছুটিছে!
পবনের বেগে ঢেউগুলি নাচি
হেলিয়া দুলিয়া ছুটিছে!

দখিন হাওয়া

কুমারী পূর্ণিমা সান্যাল

আজকে আমার মন মেতেছে
দখিন হাওয়াতে।
আধ-ফোটা ঐ কুসুম কলির
চোখের চাওয়াতে।
পরাণ আমার চাইছে কি-যে,
বুঝতে নারি আমি নিজে,
হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে
কি গান গাওয়াতে?
কে দরদী ডাক দিল আজ
দখিন হাওয়াতে?

মেঘ

শ্রীঅজিত কুমার মিত্র

কে গো তুমি কালো মেয়ে,
সহসা এলে হেথা ধেয়ে,
নীল আকাশের আঁচল বেয়ে
চরণ খানি ধীরে ফেলে।
তড়িৎ দিল লিপি লিখি,
আনন্দে নাচে শিখী,
মলয়া অঙ্গে মাখি
আজ আষাঢ়ে কে এলে।

অবান্তর

ভারতের পল্লীসমূহের উন্নতির জন্য মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামী বহু লোক আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—অন্যদিকে ভারত সরকারও এই কার্য্যে এ বৎসরে এক কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। পল্লীর উন্নতি যে আবশ্যক ইহা সরকার ও দেশের নেতারা সকলেই স্বীকার করিয়া এ জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করিতেছেন ইহা সুখের কথা। এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলিতে চাই—সাধারণের স্মরণ থাকিতে পারে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পল্লীর উন্নতির একটা 'স্কীম' ছিল এবং এ জন্য তিনি কাউন্সিলে সরকারকে পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বাহিরে জনসাধারণের কাছে অর্থ চাহিয়াছিলেন। এ জন্য লক্ষাধিক অর্থও উঠিয়াছিল—কিন্তু সেই পল্লী উন্নতি পরিকল্পনায় সংগৃহীত অর্থের গতি কি হইল তাহা জনসাধারণ সম্যক অবগত নহে। সম্ভবতঃ তৎকালীন বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের প্রধানগণের হেপাজতেই এই অর্থ রক্ষিত হইয়াছিল—এই অর্থ বর্ত্তমান সময়ে কাহার নিকট কি ভাবে আছে—এবং ইহা কি ভাবে ব্যয় করা হইবে চারিদিকে পল্লীউন্নতির সোরগোলের মধ্যে এই কথাটি মনে উদিত হইল—তাই প্রশ্নটি করিলাম। আশা করি ট্রাস রক্ষক বা রক্ষকদের নিকট হইতে বাঙ্গালী সাধারণ দেশবন্ধু প্রবর্ত্তিত সেই পল্লী সংস্কার ভাণ্ডারে কি অবশিষ্ট আছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারিবে।

——

বিদেশে ভারতের অবস্থা প্রচারের জন্য ৮ প্যাটেল মহোদয় তাঁহার উইলে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উইলের ট্রাষ্টিরা সুভাষবাবুর কাছে কি ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইবে সে সম্বন্ধে স্কীম চাহিয়াছিলেন। ইহা লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ ও মনান্তর ও নাকি উভয় পক্ষে হইয়াছিল। এমনও রটিয়াছিল ইহা লইয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলা মোকদ্দমাও হইতে পারে। এখন শুনিতেছি গবর্ণমেণ্ট নাকি ইচ্ছা করেন না যে সুভাষবাবুর হাতে এই প্রচার কার্য্যের টাকা দেওয়া হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের অবসান এই ভাবেই হইল।

——

ফিল্ম বহু আশ্চর্য্য চমকপ্রদ জিনিস দেখাইয়া বিশ্বের লোকের চিত্ত হরণ করিতেছে সন্দেহ নাই! সম্প্রতি ফিল্ম একটি অসাধ্য সাধন করিয়াছে—মহাত্মা গান্ধী ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ব্যালেট নৃত্য নাচিতেছেন ফিল্মে ইহাও দেখানো সম্ভব হইয়াছে!

——

'বেশী করে ফল খাও' এই কথাটি প্রচার করবার জন্যও একটা সঙ্ঘ আছে। তাঁরা এ বছরে এই প্রচারের জন্য ২০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করবেন। ফল যাতে বেশী চলে এ তারই জন্য বিজ্ঞাপন করা। ভারতের আম্রাদি ফলও যথাসম্ভব তাজা রাখিয়া পাশ্চাত্যে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা সফল হইলে এ ব্যবসায় হইতে ভারতে কিছু অর্থাগম হইতে পারে।

——

আন্তর্জাতিক বিবাহ ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। গত ২৩ শে জুন সেকেন্দ্রাবাদে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পুত্র ডাঃ এম জয়সূর্য্য এম-ডি বার্লিন, এবং বার্লিনের মিঃ থিয়োডোর ডাজ্জের কন্যা মিস্ ইভা লটস্ ডার্জ্জের শুভ পরিণয় হইয়াছে। ১৮৭২ সালের ৩নং স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে এই বিবাহ হইয়াছে।

——

নর্ত্তকী ও বারনারী একই সংজ্ঞায় পড়ে কিনা ইহা লইয়া দিল্লীতে একটি মামলা চলিতেছে। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি সহর হইতে বেশ্যা দূর করিতেছে—এই লইয়াই মামলার উদ্ভব। এক নারী বলিতেছে সে নর্ত্তকী মাত্র—বেশ্যা নহে।

মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় একটি বেকার যুবক খুব মজা করিয়াছে। সে ফায়ার ব্রিগেড ডাকে, ব্রিগেড তৎক্ষণাৎ আসিয়া কোথায় আগুন লাগিয়াছে জানিতে চাহে—যুবক নিজের পেট দেখাইয়া বলে অনাহারে তথায় আগুন জলিতেছে। মিছামিছি দমকল ডাকায় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বড় বড় সহরের আগুন নিভাইবার জন্য তবু দমকল আছে—কিন্তু মানুষের পেটের আগুন নিভাইবার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না!

প্রকাশ—হেকেন্দ্রাবাদের সমাজ সংস্কারক মিঃ বাজীকৃষ্ণ-রাও ব্রাহ্মণের দুইটি পুত্রের উপনয়ন জামসেদ হলে বহু লোকের সামনে হয়। সোমনাথ রাও প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মোদি নামে এক মুচি তাহাকে সাহায্য করে। ভোজে অনেক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের সঙ্গে মুচি পুরোহিতও যোগদান করে। সমাজ সংস্কারের উচ্চ আদর্শ বটে!

একটি নূতন ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা আরম্ভ হইয়াছে। সঞ্জীবনীর মন্তব্য সহ খবরটি উদ্ধৃত হইল।

বীণাপাণি দেবীর সহিত ১৯৩১সালে বালীগঞ্জের শ্রীকল্যাণ কুমার গাঙ্গলীর বিবাহ হয়। আলিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে বীণাপাণি (বর্তমান বয়স ১৮বৎসর) জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে সে তাহার পিতার গ্রন্থাগারে ইসলাম সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করায় ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাহার ক্রমে প্রগাঢ় আসক্তি ও ভক্তির উদ্রেক হয়! বিশেষতঃ এক ভগবানের পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত সম্বন্ধে সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। হিন্দু ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস দুরীভূত হয় এবং সে গত ১৯৩৩ সালে মৌলালী দরগায় এক ইমামের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ঐ সময়ে তাহার ভগ্নীর স্বামী ও এক উকিল ও অনেক মুসলমান তথায় উপস্থিত ছিল ইমাম তৎপরে এক সার্টিফিকেট লিখিয়া তাহাকে দিয়া বলেন যে সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। পরে সে এক উকীল দিয়া তাহার স্বামীকে জানায় যে সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে তাহার সহিত মুসলমান ধর্ম্ম ও রীতি অনুসারে বাস করিতে অনুরোধ করে। তাহার স্বামী উহার কোন উত্তর দেন নাই। এক্ষণে তাহার হিন্দু স্বামী যিনি তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সহিত বীণাপাণির সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নহে। সে জন্য বীণাপাণি বিবাহ বন্ধন ছেদন করবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করে।

আদালতের প্রশ্নে সে বলে বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর সহিত সুখে বাস করিয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নাই। তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলী বলিয়া উভয়ে একত্র বাস করা অসম্ভব তজ্জন্যই বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে সে চাহে। মামলা মুলতবী আছে।

(শ্রীমতী বীণাপাণি ধর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বামী হইতে পৃথক ভাবে বাস করিতেছেন তাহার স্বামীর সহিত যখন কোনও সম্পর্ক নাই, এতদ্ব্যতীত স্বামী যখন তাহার কাছে আসিবেন না, তাহারা একত্র বাসও করে না, তখন বিবাহ বন্ধন ছেদন করিবার প্রয়োজন কি ছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় বীণাপাণির ভগ্নীপতি হিন্দু হইয়া নিজ শ্যালিকার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে সাহায্যার্থ দরগায় উপস্থিত ছিলেন। আর এক কথা বীণাপাণি আবার শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু হইবেন না ত?) সঞ্জীবনী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কোয়েটা ভূমিকম্প

গত ৩১শে মে রাত্রি ৩-৫ মিনিটের সময় বেলুচিস্থান অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বৃটিশের অন্যতম প্রধান সামরিক ঘাঁটি কোয়েটা সহর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের অবস্থাও তদ্রূপ। হতাহতের সংখ্যা অনুমান অর্দ্ধ লক্ষ। শেষ রাত্রি ৩-৫ মিনিটের সময় অধিবাসীরা সকলেই যখন সুষুপ্ত তখন এই বিরাট ভূকম্পন আরম্ভ হইয়া প্রায় ৫ মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল—ঘুমের ঘোরে উঠিয়া ভাগ্যক্রমে কেহ পলাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে পারিয়াছিল—অধিকাংশ বাহির হইতে পারে নাই—কেহ বা বাহির হইতে হইতেই চাপা পড়িয়াছিল। পাঁচ মিনিটকাল সমভাবে কম্পন থাকিয়া বিরাট কম্পন থামিয়া যায়—তার পরেও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কম্পন মাঝে মাঝে চলিতেছিল। কতস্থানের মৃত্তিকা দ্বিধা হইয়া গিয়া কত লোককে গ্রাস করিয়াছে—ইলেক্‌ট্রিকের তারের সংঘর্ষে কত লোক পুড়িয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝা, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা—ধ্বংসলীলা চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া মানুষ ও তাহার সৃষ্টি চাতুর্য্যকে দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া উপহাস করিতে করিতে যেন কুক্ষিগত করিতে লাগিল। ১৩০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল প্রস্থ স্থানের উপরেই এই ধ্বংসলীলার আক্রমণ বিশেষ অনুভূত হইয়াছিল। বিহার ধ্বংসলীলার নিদারুণ স্মৃতির জ্বালা না শুকাইতেই কোয়েটার উপর বিধাতার এই রোষ কটাক্ষ! একশত বর্ষেরও কিছু অধিক কালের চেষ্টায় কর্দ্দম নিঃস্রাবী এক বিরাট ভূ-খণ্ডকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উদ্যানরাজিশোভিত এই বিরাট সামরিক সহর কোয়েটা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সমর বিভাগের কত অর্থ যে ইহার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। অথচ আজ সামরিক কারণে নয়—দৈব দুর্ব্বিপাকে এই কোয়েটা এমনি হতশ্রী হইল। বহু কাল পূর্ব্বে ইহা স্থাপনের সময় কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ ছিল এ স্থানের কর্দ্দমস্রাবের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির সম্পর্ক আছে। কিন্তু তখন বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন—এ কর্দ্দমস্রাবের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু—এখন বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন—নিকটেই আগ্নেয়গিরি আছে—উহার ধূমও গলিত পদার্থ বাহির হইয়া না গেলে বেলুচিস্থানের ভূকম্পের নিবৃত্তি হইবে না। কোয়েটা সহর পুনর্গঠিত হইবে। কোয়েটার ৫ মাইল দূরে নূতন সহরের পত্তন আরম্ভ হইয়াছে এবং তথায় সরকারী ইমারতাদি উঠিতেছে। কোয়েটার সাহায্যের যত কিছু ব্যবস্থা সব সরকার পক্ষ হইতেই হইতেছে. সৈন্যেরা প্রথমাবস্থায় ধ্বংস স্তূপ সরাইয়া আহতদের উদ্ধার যথাসম্ভব করিয়াছে। তারপর কুলীরা এ কাজ করিতেছে। কংগ্রেস সভাপতি, করাচীর মেয়র, আরো বহু সেবা প্রতিষ্ঠান এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত নাকি কোয়েটা যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সরকারী অনুমতি পান নাই। দেশের লোকে ইহাতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। মনে হয় কোয়েটা সামরিক ঘাঁটি বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এই ভয়াবহ ব্যাপারের পরেও সামরিক নিয়ম অনুসারেই দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের তথায় যাইবার অনুমতি দিতে পারেন নাই। কোয়েটার ভূকম্পের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বড় লাটের ভাণ্ডারে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, ভারত সরকার দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়াছেন। ইংলণ্ড ৫০ হাজার ও অষ্ট্রীয়া ১০ হাজার পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতার মেয়র এক সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াই আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোয়েটার ক্ষতির পরিমাণ কত অধিক তাহার সামান্য কিছু আনুমানিক হিসাব বাহির হইয়াছে—সরকারী গৃহাদি নষ্ট হওয়ায় ৮০ লক্ষের উপর ক্ষতি, রেলওয়েতে ৫০ লক্ষ পরিমাণ, সৈন্য নিবাসের বহু লক্ষ মুদ্রা ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরো অনেক সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে ও সাধারণের কত সম্পত্তি যে নষ্ট হইয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না। প্রায় ২০ হাজার লোক ধ্বংসস্তূপের নীচে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের কতক বাহির করা হইয়াছে, অধিকাংশই বাহির করা সম্ভব হয় নাই—মৃতদেহের গন্ধে সে কার্য্য অসম্ভব হইয়াছে। দুই হাজার পুলিশের মধ্যে মাত্র ২০ জন রক্ষা পাইয়াছে। কোয়েটায় যাহাদের সম্পত্তি ছিল তাহাদের দাবী রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখা হইতেছে। সামরিক বিভাগ তাহাদের সম্পত্তি উদ্ধারের সাহায্য করিবে। বহু সংখ্যক বিমানপোত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কোয়েটায় সাহায্যের জিনিষপত্র লইয়া যাইতেছে। কোয়েটা এই বস্তু তান্ত্রিকতার দিনে আমাদের আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে 'খোদার মা'র দুনিয়ার বার'। ভূমিকম্প কেন হয়—এবং কোথায় কোন সময় হইবার সম্ভাবনা তাহার বিন্দুবিসর্গও এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আমাদের জানা—

ইতে পারে নাই। তবে কোন স্থানে হইয়া গেলে তারপর ইহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিতে দেখা যায় বটে। ভূ-ভার অসহনীয় হইলে মাঝে মাঝে ধরিত্রী একটু পা-ঝাঁকা দিয়া তাহা লাঘবের চেষ্টা করেন শোনা যায়—ইহা কি তাহাই ?

বিলাতের মন্ত্রীসভা

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হইয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনে নহে,—প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করিতেই ঘরোয়া ভাবে রক্ষণশীলদলের প্রধান্যে নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হইল। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট রূপে থাকিবেন। বলডুইন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ভারত সচিব স্যার সামুয়েল হোর বৈদেশিক মন্ত্রী হইলেন। ভারত সচিব হইলেন বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বর্ত্তমানে মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড। ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড আরউইন হইলেন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সমর মন্ত্রী লর্ড হ্যালিফক্স। মন্ত্রীসভার কিঞ্চিৎ অদল-বদলে ভারত শাসনের ধারা যে কিছু অদল বদল হইবে এমন মনে হয় না। তবে মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড বাংলার তথা ভারতের অবস্থা বিশেষ ভাবে জানেন সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যথাসম্ভব ন্যায় বিচার সব ক্ষেত্রেই আশা করা যায়।

শরৎচন্দ্র ও নোবেল প্রাইজ

বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীঘ্রই পাশ্চাত্য ভ্রমণে যাইতেছেন এবং এ ভ্রমণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য নোবেল প্রাইজের তদ্বির করা। শরৎবাবু পাশ্চাত্যে যাইতেছেন—ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যাইবেন এ সংবাদ অবশ্যই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার যোগ্য, কিন্তু তিনি নোবেল প্রাইজের তদ্বিরের জন্যই যাইতেছেন এ সংবাদটা এই সঙ্গে প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত। শরৎবাবু এ সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন — 'আমি নোবেল প্রাইজের তদ্বিরের জন্য বিলাত যাইতেছি, এ কথা বলিলে আমার কুৎসা রটনা করা হয়।' শরৎবাবুর শ্রীকান্ত নাকি অধ্যাপক ডঃ কানাই লাল গাঙ্গুলী জার্ম্মেন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং ঐ ভাষায়ই তাহা নোবেল প্রাইজের বৈঠকে উপস্থিত করা হইবে। তাঁহার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুত দিলীপ কুমার রায় ও তাহা বিশেষ ভাবে দেখিয়া দিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ এইরূপ প্রকাশ।

শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব্ব) যে নোবেল প্রাইজ পাইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অপূর্ব্ব চরিত্র-লীলা আমরা যেমন বুঝি ভাষান্তরিত হইলেও সে ভাব ব্যঞ্জনা বজায় থাকিবে কি ? শরৎ চন্দ্র নিজেও বোধ হয় জার্ম্মেন ভাষায় (কিঞ্চিৎ জানিলেও) অভিজ্ঞ নহেন সুতরাং তাঁহারও অনুবাদ দেখিয়া দিবার উপায় নাই। অথচ তাঁহার নোবেল প্রাইজ পাওয়া নির্ভর করিতেছে ঐ অনুবাদ-সাফল্যের উপরই। অনেকের মত যে-ইংরেজী গীতাঞ্জলীতে রবীন্দ্র নাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন সে অনুবাদ তাঁহার মূল বাংলা হইতে ভাল। সুভাষ বাবু এখন পাশ্চাত্যে আছেন, সুতরাং এ সময়ে শরৎবাবুর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সম্বন্ধে কিছু প্রচার চলিতে পারে আশা করা যায়। শরৎচন্দ্র নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি এবং পাইলে বাংলার মুখ আরো উজ্জ্বল হইবে। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

বাংলার জমিদার

বাংলার জমিদারদের অনেকে বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও ঋণগ্রস্ত ছিলেন—কিন্তু তখন তাহা তাহাদের পক্ষে তেমন মারাত্মক দাঁড়ায় নাই। কিন্তু প্রধানতঃ পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে সত্য অর্থ সঙ্কট যখন আরম্ভ হইল, প্রজারা খাজনা দেওয়া একরকম বন্ধই করিল তখন হইতে শতকরা ৯৮ জন জমিদারের অবস্থাই বিশেষ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই কয় বৎসরের মধ্যে কত জমিদারের সম্পত্তি যে নীলামে উঠিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কোন কোন বড় জমিদার অনেক যোগাড় যন্ত্র করিয়া নিজ সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে দিয়া কোনরূপে মান বাঁচাইয়াছেন—কেহ কেহ তাহা পারেন নাই—তাহাদের বহুকালের সম্পত্তি নীলামে চড়িতেছে। বহুকালের প্রাচীন 'ঘর' যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন বাহিরের লোকের মনেও তাহাতে ক্ষোভ হয়। বাংলার জমিদার সভায় মাঝে মাঝে জমিদারদের নানা বিষয়ে বক্তৃতা শোনা যায়। তাঁহাদের সঙ্ঘটিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। প্রাচীন কোন জমিদার 'ঘর' যাহাতে পড়িয়া না যায় সে সম্বন্ধেও তাহারা একত্রিত হইয়া বিধি ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাবুগিরি বিলাসিতায়, রেস খেলিয়া বা অন্য কোন ব্যসনে মজিয়া মোটা সুদে টাকা ধার করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাহারা পিতৃপুরুষ অর্জ্জিত সম্পত্তি খোয়াইয়া পথে দাঁড়ান তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি বাংলার জমিদার সভা কিছু করিতে পারেন না ?

জমিদার কি করিতে পারেন ?

আজই না হয় অর্থ সঙ্কটে জমিদারেরা বিব্রত—কিন্তু ও বৎসর পূর্ব্বে তো এমন ছিল না—এখনও তাঁহারা সংযত হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ভাজন হইতে পারেন। জমিদারীও একটা ব্যবসায়—এ ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে প্রজাদের সঙ্গে যোগ-সম্পর্ক স্থাপন করা যেমন আবশ্যক নিজের জমিদারীর উন্নতি কল্পেও তেমনি অর্থ নিয়োগ আবশ্যক। যে অর্থ জমিদারীতে নিয়োগ করিয়া প্রজাদের সুখ,স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা যায় এবং জমিদারীরও আয় বৃদ্ধি করা যায় তাহা যদি ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনেই শুধু ব্যয়িত হয় তবে আর প্রজা সাধারণ জমিদারকে সুদৃষ্টিতে দেখিবে কেমন করিয়া ? বাংলায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা সে রকম কলকারখানার কোন কারবার বাঙ্গালীর নিজস্বভাবে নাই বলিলেই হয়। জমিদারদের সমবেত চেষ্টায় টাটার কারখানার মত কারখানা হওয়া অসম্ভব নয়। মোটরের বিলাসিতায় বহু জমিদার অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় একটা মোটর নির্ম্মাণ কারখানা বাংলায় স্থাপিত হইয়া বহু শিক্ষিত বেকারের অন্ন সংস্থানের উপায় করিতে পারে। এমনি আরো বহু শিল্প আছে। যাহা নিজ দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া জমিদার সমাজ মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের ধন্যবাদ ভাজন হইতে পারেন। আজকাল অনেক জমিদারের ছেলেরা শিক্ষিত হইতেছেন তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই সব দিকে দৃষ্টি দিন—দেশের অবস্থাও ফিরিবে—জমিদার সমাজও দেশবাসীর ক্রম বর্দ্ধিত অপ্রীতির হাত এড়াইয়া সত্যিকার বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন।

ভারত ও চীন

জার্ম্মেন ঐতিহাসিক ডাঃ অসওয়াল্ড স্পেংগলার তাঁহার 'আওয়ার অব্ ডিসিসন' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—চীন ও ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কিছু নাই। তাহারা কোন দিন নিজ রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করিয়া স্বাধীন হইতে পারিবে না। চিরকাল তাহাদের কোন শক্তিশালী জাতির দাস হইয়া থাকিতে হইবে ইত্যাদি।—কথাটা শুনিতে কটু শুনাইলেও উভয় জাতিরই বর্ত্তমান দেখিয়া ইহার বেশী কিছু আশা করা যাইতে পারে না, চীনে বহু জাতির ও বহু রাজ্যের স্বার্থ রহিয়াছে তার উপর চীনাদের নিজেদের মধ্যে নানা দল ও মত—জাপান এ অবস্থায় প্রতিবেশী রাজ্যের যতটা সম্ভব হস্তগত করিতেছে। জাপান চীন যদি যথাসম্ভব একত্র হইতে পারে পীতাতঙ্ক জগতের আরো শঙ্কা বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে। ভারতে নানা জাতি-সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় শীঘ্র ভারতের দেখা যাইতেছে না।

পল্লীর উন্নতি

ভারত সরকার পল্লীর উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশে যে টাকা দিবেন তাহাতে পল্লী উন্নতির সূচনা হইতে পারিবে এবং সুপ্রযুক্ত হইলে দেশবাসীর অশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা পল্লীর উন্নতিতে খাদ্যাদির দিকে এবং ছোট-খাট শ্রমশিল্পের দিকে নজর দিয়েছেন ইহা ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হইলে সুফলপ্রসূ হইবে। বাংলা দেশে পল্লী উন্নতি ব্যাপারে আমরা সর্ব্বাগ্রে দেখিতেছি জল-সমস্যা। বাংলার প্রায় সব নদীগর্ভই শুকাইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য গ্রীষ্মে সর্ব্বত্রই হয় জলাভাব —পানীয় জল পর্য্যন্ত মেলে না—আর এদিকে বর্ষা আরম্ভ হইতে না হইতে সব প্লাবিত হইয়া যায়। নদী মাতৃক বাংলাদেশের নদী-সমস্যার একটা গতি না করিতে পারিলে বাংলার স্বাস্থ্য ও শস্য সম্পদ ক্রমশই অধিক বিপন্ন হইতে থাকিবে। এ সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্ট ও জননেতাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতেছি। সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ববিলির রাজা পল্লী উন্নতির জন্য দুই কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। ইহার এক কোটী পল্লীতে পানীয় জলের ব্যবস্থায় ব্যয়িত হইবে—পঞ্চাশ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার এবং পঞ্চাশ লক্ষ পথ ঘাট নির্ম্মাণে ব্যয় হইবে। বাংলায়ও এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং ভারত সরকারের সাহায্যের টাকায় পল্লী উন্নতির কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাশের পর ?

প্রতি বৎসরের মত এবারও বহু ছাত্র ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ফেল করা ছাত্রদের মধ্যে দু'একটি আত্মহত্যা করিয়াছে—কতক আবার পড়িবে, কিন্তু পড়া ছাড়িয়াও দিবে। পাশ করিতে করিতে শেষ ধাপ যাহারা উত্তীর্ণ হইবে—তাহাদের দু'পাঁচ জন ভাল চাকরী পাইবে। কেহ বা উকিল ডাক্তার হইবে। শিক্ষিতা মেয়েদের দু' একজন চাকরী করিবেন। অধিকাংশেরই বিবাহই হইবে পরিণতি। যাহারা পাশ করিয়া চাকরী পাইলেন না বা ওকালতী ইত্যাদি স্বাধীন ব্যবসায়ে ঢুকিলেন তাহাদের শতকরা ৯০ জনের অবস্থাই হইল বেকার—এই পাশ করা বেকার ও ফেল বেকারের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে—এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই সীমা ছড়াইতেছে। দেশে নূতন নূতন কর্ম্ম ক্ষেত্রের সৃষ্টি না হইলে ইহারা করিবে কি ?

নিবেদন

শ্রীচারুপ্রভা বসু

শত দোষে দোষী আমি, তাই কিগো চরণে ঠেলিলে ?
তোমা বিনা কিছু আর, কেহ নাই এ দীনার
অত বোঝ এইটুকু বুঝিতে নারিলে ?
বোঝ নাথ ! অনন্ত জগৎ, বোঝ দেখি সৃষ্টি স্থিতি লয়
কেবলি বুঝিলে নাক আমার হৃদয়।
গড়িয়াছ ভীষণ অশনি, গড়িয়াছ কুসুম কোমল,
সকলি কাজের তরে গড়িয়াছ চরাচরে,
কেবল গড়িয়াছ আমারে বিকল

জগতের সকলি তোমার, তোমাময় জগতের মেলা
আমি কি এতেই পর, বিজনে বাঁধিব ঘর
সকলের হবে তুমি আমিই একলা।
শুনি নাথ তুমি শান্তিময়, তাপিতের চির প্রাণারাম
আমারে যে আশি-বিষ, দংশিতেছে অহর্নিশ,
তুমিত ঘুমায়ে আছ লভিছ আরাম।

পুষ্পপাত্র শততম সংখ্যা

আগামী আশ্বিনে পুষ্পপাত্রের শততম সংখ্যা উপলক্ষ্যে একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে বাংলার অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকা তাঁহাদের বিচিত্র রচনা-সম্ভারে পুষ্পপাত্রকে সজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বহু বিখ্যাত লেখক-লেখিকার গল্প প্রবন্ধ কবিতা এবং তাঁহাদের চিত্র এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। রঙ্গীন ও আরো নানা ছবি থাকিবে, আকারেও অনেক বড় হইবে। এজেন্টগণ এই সংখ্যা কতগুলি করিয়া বেশী চাহেন তাহা শীঘ্র জানাইবেন। দাম সমানই থাকিবে—

কার্য্যাধ্যক্ষ—পুষ্পপাত্র



প্রসাধন-অন্তে

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৯ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৫২ | ৪র্থ সংখ্যা

রজনীগন্ধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাটীর তলে কোথায় থাকে
　　এত রূপ আর গন্ধ,
মুক্তা এ সব কোন্ সিঁদুরের
　　কৌটাতে রয় বন্ধ ?
ধরাতলের এসব তারা
কোন গগনে রয় রে হারা ?
কোন্ কুবেরের ভাণ্ডারে রয়
　　এমন মকরন্দ ?

ধন্য তুমি ধন্য তুমি
　　বর্ষা দিনের সন্ধ্যা !
তোমার ডাকে অমনি ফোটে
　　এই রজনীগন্ধা !
এ সব মরাল প্রাণের কাণে,
দূর প্রণয়ের বার্ত্তা আনে,
সাদা পরীর মিছিল বহে
　　বুক ভরা আনন্দ ।

ব্রত

—গল্প— মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

বেলা নয়টা। ফাল্গুনের উজ্জ্বল রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মাধুরী "দেবদাস" হাতে উপর হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে উঠানে দণ্ডায়মান দিদিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল —দিদি আজ আমার একটা চিঠি আসবেই তা হলেই "দেবদাস" কেমন হয়েছে জানতে পাব—সত্যি দিদি আমি এই দেবদাস বইখানা যে কেন এত ভালবাসি···এর কবে ফিল্ম হবে আমি যে সেই আশাতে দিন গুনছিলাম—

দিদি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—দেখিস্ গিয়ে। বইখানি কি চমৎকার, আমি ও সেদিন পড়ে চোখের জল রাখতে পারিনি। আমার মতে জিনিস যত স্বাভাবিক হয় ততই চিত্তাকর্ষক হয়, "দেবদাস" তাই অত মানুষের ভাল লেগেছে।

মাধুরী আগ্রহ ভরা কণ্ঠে কহিল; তিনি এলেই আগে আমি দেবদাস দেখতেই কলকাতাতে যাব, আমাদের দার্জ্জিলিং এ যেতে ও দেরী আছে।

দিদি হাসিয়া বলিলেন বেশ—যেয়ো।

মাধুরীর মনে পড়িয়া গেল দার্জ্জিলিং এ ফাল্গুনের কি রংএর ডালি, কি ফুলের মেলা আর পাখীর গান, উতলা বাতাসের বনে বনে মর্ম্মর ধ্বনি জাগিয়ে তোলা—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল এবার চিঠিই বা আসছে না কেন? অন্যবারে ত এর আগেই তাগাদা আরম্ভ হয়। ভাবনায় তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এমন সময় তাহার দিদির ছেলে টুনুকে একখানি খাম হাতে করিয়া আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া আগাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি খামখানা তাহার হাত হইতে লইয়া উল্টাইয়া দেখিতেই তাহার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, এত তাহার স্বামীর হস্তাক্ষর নহে, বাড়ীর চাকর হরির হস্তাক্ষর। তার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল, তবে কি তাঁর অসুখ করেছে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে খামখানি হাতে করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর একটা জানালার উপর বসিয়া পড়িল তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিতে ছিল। দার্জ্জিলিং এর মত জায়গা অসুখ বলতে ত কেবল নিউমোনিয়াই বোঝায়—না জানি এই চিঠিতে কি দুঃসংবাদই আছে—ভাবিতেই তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। খাম খানিকে দু তিন বার উল্টাইয়া দেখিল তবু ও খুলিতে সাহস হইল না। নীচে হইতে একটা নিমশাখা আসিয়া জানালাটা স্পর্শ করিয়াছিল তাহারই উপর কোথা হইতে একটা কোকিল আসিয়া ডাকিয়া উঠিল কুহু—। সে বিরক্ত হইয়া কোকিলটাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল তারপর সাহস করিয়া খামখানি খুলিয়া ফেলিয়া পড়িল—।

প্রণাম নিও। মা তোমার দুর্গার কিরে শীঘ্র ঘর করে চলে এসো; বাবু যা তা কাণ্ড করিতেছেন আমি কি করিব; আপনি শীঘ্র চলে এসো আর একথা খবরদার বাবুকে বোলো না তা'লে আমার চাকরী যাবে। আপনি দেরী করবেন না, ভাবনায় আমার ঘুম হয় না।

ইতি সেবক হরি।

অন্য সময় হইলে সে হরির আপনি তুমি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিত কিন্তু আজ তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল— বাবু যা তা কাণ্ড করিতেছেন, কি সে যা তা কাণ্ড। মূর্খ হরি কাকে যা তা কাণ্ড বলছে তাও ত বুঝাও যায় না। তবু ও সন্দেহের কালো মেঘ তাহার মনের উপর জমা হইয়া উঠিতে লাগিল। দু ফোটা অশ্রু আসিয়া

চোখের কোণে জমা হইয়া উঠিল তবু মনের সন্দেহকে সে অন্যায় জ্ঞানে জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য আপন মনেই কহিল তা কি হয়? তিনি যে দেব চরিত্র। দেবতাকে অবিশ্বাস করা যায়, তবু তাঁকে যায় না, বলিয়া চিঠিটা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তবু ও মনের সন্দেহকে সে তাড়াইতে পারিল না। আবার মনের উপরে সন্দেহের কালোমেঘ জমা হইয়া উঠিতে লাগিল। সে নীচে নামিয়া আসিল—

দিদি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাহলেন, কিরে কোন খারাপ সংবাদ আছে?

সে জড়িত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ। তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া কহিল, দিদি আমায় আজই যেতে হবে।

তারপর মাধুরী উপরে আসিয়া আপনার বাক্স বিছানা কাপড় ইত্যাদি গুছাইতে আরম্ভ করিল। সে একটা একটা জিনিষ গুছাইতে লাগিল আর তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু আসিতে লাগিল। সে আঁচলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে সব জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া…সন্ধ্যায় যাত্রা কালে নীরবে দিদির পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া মেয়ে দুটির হাত ধরিয়া দিদির ছেলে টুলুর সহিত মোটরে উঠিয়া বসিল। সারা পথ সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিল, এক সময় বড় মেয়েটির তাহা চোখে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন মা? মাধুরী কহিল, চোখে কয়লা পড়েছে। একসময় ছোট মেয়েটির চোখে পড়িলে সে চোখে আঙুল দিয়া কহিল, মা কানে? মাধুরী একহাতে তাহার হাত ধরিয়া অন্য হাতে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া কহিল; ওই দ্যাখ শেয়াল যাচ্ছে।

পরদিন যখন তাহারা দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে আসিয়া নামিল তখন ফগে দিনের আলো অস্পষ্ট হইয়া আছে। মালপত্র তাহারা মেয়ে কুলীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া বাড়ীর পথে হাঁটা দিল। তাহারা যখন বাড়ীর গেটের ভিতরে আসিয়া পৌছিল তখন হরি বাহিরের ঘর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মা আসলেন? মাধুরী মৃদু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ তুই ভালো আছিস। সে নীরবে শিরঃ সঞ্চালন করিল। ততক্ষণ তাহারা বাড়ীর ড্রইংরুমে আসিয়া পৌছিল।

মাধুরী হরিকে বলিল, হরি তুই কুলিদের বিদেয় করে দে।

হরি কুলিদের বিদায় করিয়া দিয়া চাএর জল উঠাইয়া দিয়া খাবার সাজাইতে বসিল। মাধুরী একখানি পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—হরি ব্যাপার কি বল্ ত।

হরি বলিল—বাবু আজ দুতিনদিন হল টুরে গেছেন আজও ফির্তে পারেন, তারপর একটু বুদ্ধি করিয়া কহিল ব্যাপার এমন কিছুই নয় মা তা আপনি খান্ আমি চালটা ধুয়ে আনি, বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চাল ধুইতে চলিয়া গেল।

মাধুরী মেয়ে দুটিকে খাইতে বসাইয়া দিয়া নিজে শুধু এক পেয়ালা চা লইয়া বসিল। হরি চাল ধুইতে গিয়া বেশ একটু দেরী করিয়াই ফিরিল। মা এর মুখের দিকে চাহিয়া আসিতে তাহার পা সরিতেছিল না তাই ফিরিয়াও যখন দেখিল মা তেমনই বসিয়া আছেন তখন সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িল, ব্যস্ত হইয়া কহিল--যান্ বিশ্রাম করুনগে। কিন্তু মাধুরী আরো শক্ত হইয়া বসিয়া কহিল, কি হয়েছে হরি আগে বল তা না হলে আমার স্বস্তি হবে না।

হরি চালটা চুলার উপর বসাইয়া দিয়াএকটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কি বল্‌বে মা বলতেও মন সরে না, আপনি গেলে প্রায়ই বাবু আমাকে সন্ধ্যার সময় কোন না কোন কাজে পাঠাতেন। নিত্যি এরকম করাতে আমার বড় সন্দেহ হ'ল একদিন আমি না গিয়ে কিছু দূরে লুকিয়ে থেকে একটু পরেই ফিরে এসে চুপ করে দেখি বাবু আর বাবুর একজন বন্ধু বসে আছেন সামনে দুতিন বোতল মদ আর দুজন পাহাড়ী ছুকরী বসে আছে। বাবুরা তাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা

কোরছে। তা ছাড়া বাবুকে মদ খেতে ও বাবুর ঘর থেকে পাহাড়ী ছুকরী বেরুতে দেখেছি। তারপর অনেক ভাবনা চিন্তা করে আপনাকে পত্র লিখেছি। এখন আপনি যখন এসেছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে—বলিয়াই মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া হরির কথা বন্ধ হইয়া গেল। মাধুরীর মুখ ঠিক মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল কোনমতে চরণদুটি শক্ত করিয়া উঠিয়া পড়িল, টলিতে টলিতে শয়নকক্ষে যাইয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। হায় যে স্বামীকে চিরদিন দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে এসেছে এই তার মূর্ত্তি? সে তাহাকে কোনদিন ভ্রমেও অবিশ্বাস করে নাই আর তিনি এমনি করে সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন? এমনি তিনি হীন? সে যদি প্রত্যেক বৎসর ছেড়ে না যেত তা হলে হয়ত তাঁর এ অধঃপতন ঘটত না সেইই এর জন্য দায়ী। জগতের মানুষকে কেন এত বিশ্বাস করেছিল? মানুষকে দেবতা বলে ভাবলে যে দুঃখ পেতে হয় এ কথা সে কেন ভুলে ছিল? তা ছাড়া পুরুষ কোনদিন নারীর প্রেমকেই শুধু কামনা করেছিল? সে যে দেখে কেবল নারীর রূপ যৌবন, তার কাম্যও যে নারীর রূপ যৌবন, যুগে যুগে তাই যেসব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তবু তার এ নেশা কাটে না। সে যে আজ দুটি সন্তানের জননী, তবু সে যদি না যেত হয়ত এ অধঃপতন ঘটত না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরলো সে আর কোথাও যাবে না। সমস্ত রাত্রি তাহার দারুণ অনুশোচনা বেদনার ভিতর দিয়া কাটিল, শ্রাবণের আকাশ যেন তাহার চক্ষু দুটীতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে। হিমের প্রকোপে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলগিরির শীর্ষদেশ শুভ্র হইতেও শুভ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। বনের নিবিড় সবুজ বর্ণেও বিবর্ণতা ধারণ করিয়াছে। উত্তর বায়ু দারুণ মর্ম্মর ধ্বনি জানাইয়া বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। মাধুরী নিজের শীর্ণ শরীরটার প্রতি দৃকপাত করিয়া হইয়া উঠিয়াছিল তবু সে এবার যায় নাই অসহ্য শীতকে প্রাণপণ করিয়া সহ্য করিতেছিল। প্রায় দুসপ্তাহ পরে সে স্নান সারিয়া আসিয়া চিমনীর কাছে বসিল। আপন মনেই বলিল জলটা একটু বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তারপর একটু চীৎকার করিয়া বলিল, হরি এককাপ চা দিয়ে যাওত। হরি একটু পরে এক কাপ চা দিয়ে গেল। চা পান করিয়াও সে কি রকম অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল তাই চিমনীর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল কখন্ যে জ্বর তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

ঘণ্টা দুই পর মাধুরীর স্বামী আসিয়া মাধুরীকে অসময়ে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কপালে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন ও কাহাকে কিছু না বলিয়াই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। ডাক্তার আসিয়া রোগিনীকে দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিয়া গেলেন, এখনকার নিউমোনিয়া সাবধান থাকিবেন।

মাধুরীর স্বামীর মুখ আজ সহসা শুখাইয়া গেল। তিনি প্রাণপণ সতর্ক হইয়াই মাধুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আজ তাহার মনে হইল মাধুরী যদি না বাঁচে শিশুদুটিকে তিনি বাঁচাবেন কি করে? তাঁর যদি আত্ম সংযমে শ্রদ্ধা থাকিত তা হলে ত আজ এমন হত না। আত্মসংযমের অভাব যে এত বড় অনর্থ ঘটতে পারে এ ধারণাও তাঁর ছিল না। মাধুরী যদিও স্থির করিয়াছিল যে সে একথা স্বামীর নিকটে বলিবে না তথাপি একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহা লইয়া উভয়ের ভিতরে একটু বচসাও হইয়াছিল। মাধুরীর স্বামী স্ত্রীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল তোমাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের দোষ ধরে না; স্বামী শয়তান হলেও চোখে ঠুলি দিয়ে তাকে দেবতা ভাবে এতেই ত কোন বাধ থাকেনা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কথাটী বলার পর মাধুরী নীরব হইয়া গিয়াছিল এযে সত্য! পরস্পর যদি পরস্পরের দোষক্রটী না ধরিবে কি করিয়া মানুষ নির্দ্দোষ থাকিবে? আজ তাহার চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি জীবনে অনেক নারীর সংস্পর্শে আসিয়া ছেন কিন্তু এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া কেহ ভালবাসে নাই এমন করে সেবা করে নাই সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া পাশে জাগে নাই। তাহারা দুদণ্ডের জন্য প্রমোদ করিতে আসিয়াছে তাহার পরই চলিয়া গিয়াছে হয়ত জীবনেও আর তাহাকে মনে করে নাই। দু'ফোটা অশ্রু তাঁহার

কপাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল অনুতাপে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল।

আজ দুদিন হইতে মাধুরীর স্বামী তাহার শিয়র ত্যাগ করেন নাই কিন্তু মাধুরীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই যাইতেছিল। যে মমতা তাঁহার আগে জাগে নাই আজ বিদায় কালে সেই মমতায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাঁহার শঙ্কাতুর মন ব্যাকুল নেত্র অহর্নিশ মাধুরীর মুখে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি অনেকক্ষণ মাধুরীর রোগক্লিষ্ট শুষ্ক ফুলের ন্যায় মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কাঁচের মধ্যে দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে ফগে আচ্ছন্ন। ফগ পড়িয়া জমা হইয়া ঘাসের সবুজ বর্ণকেও আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সহসা একটা দমকা বাতাস জোরে বহিয়া ঘর বাড়ী কাঁপাইয়া গেটের আইভি লতার পাতা গুলি ঝরাইয়া দিয়া গেল। মাধুরী সে শব্দে শিহরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। স্বামী তাহার গালের উপর গাল স্পর্শ করিয়া অতি স্নেহ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, কিছু ভয় নেই তুমি ঘুমাও।

মাধুরী মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, মেয়েরা?

স্বামী তেমনি কহিলেন, ওরা ভাল আছে ও ঘরে খেলা কোরছে।

মাধুরী পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল। স্বামীর দুচোখ বহিয়া অশ্রু নামিল। হায় রে মা। তুমি নিজে চলে যাচ্ছ তবু মেয়ে, তোমার এ মেয়েকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে? আজ প্রভাত হইতে মাধুরীর স্বামীর মন মাধুরীর সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিমতী বিষাদের ন্যায় সন্ধ্যা নামিয়া আসিল উত্তর বাতাস আরো প্রবল হইয়া উঠিল। সহসা মাধুরীর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গিয়া সে এক দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল তাহার পর পিপাসার ইঙ্গিত করিল। স্বামী তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিলেন; সে প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া শ্বাস ফেলিল তাহার পর তাহার চোখে মুখে বিদায়ের ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। স্বামী ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন মাধুরী! মাধুরী পূর্ণ দৃষ্টিতে আবার চাহিল তাহার পরই তার চক্ষুর পাতা নিমীলিত হইয়া আসিল। স্বামী চীৎকার করিয়া উঠিলেন হরি, হরি! হরি ছুটিয়া আসিল সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মা'র গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাধুরীর চক্ষু পল্লব, অধরোষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রু চক্ চক্ করিতে লাগিল; জন্মের মত সে চক্ষু দুটি মুদিয়া গেল। স্বামী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাধুরী! আমায় ক্ষমা কর ক্ষমা কর। মাধুরী তখন ক্ষমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। . . .

—:—

যদি

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী

জীবন আকাশে ঝড় দিলে যদি,
নিবারিতে দাও শক্তি।
দুঃখ সায়রে টেনে নিলে যদি,
পার কর দিয়ে ভক্তি।
নিয়ে গেলে যদি শত্রু শিবিরে,
ভেঙ্গে দাও মোর ভয়,

রিক্তই যদি করিলে আমারে
করোনা নিরাশ্রয়।
দিলে যদি মোরে এ হৃদয় খানি
তোমার অরূপ দান'
মৃত্যুর মাঝে ঝরুক অমৃত,
হয় নাকো যেন ম্লান।

প্রতীচীকা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র এম এ

[বর্ত্তমান কবিতার লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন কৃতী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। সুরেশ্বর শর্ম্মা এই ছদ্ম নামে ইহার বহু কবিতা সাময়িক পত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বহু সাহিত্য সভায় বিদ্বজ্জন সম্মিলনে ইহার ব্রাউনিং, আলডুস্ হাকসলি প্রভৃতির অনুবাদ রচনা পঠিত হইয়াছে। ভাবৈশ্বর্য্যে অতুলনীয় এই সব কবিতার বাংলা রূপ দেওয়া যে কত কঠিন তাহা এ পথে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। সুরেন্দ্র বাবুর কবিতা ও নানা বিচিত্র রচনা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।]

গীতিহীনের গান

(Meredith এর Song in Songless হইতে)

চলিতে পথে যখন চোখে পড়ে
বিরাট মাঠ ভরাট উলু খড়ে,
জানে না গান, তবু শুনি সে গায়,
আমার প্রাণে বুঝি সে সুর পায়।

মোর বুকে সে কাঁপায় যেন তার,
অমনি জাগে সুপ্ত হাহাকার ;
শুকো খড় বাতাসে নড়ে জানি,
সে মাঠখানি আমার বীণাপাণি।

সরস্তীরে

(Yeats এর The Lake of Innisfree হইতে)

এখনি চলিনু সেই সরসীর তটে,
বাঁধিব কুটীর খানি তাহারি নিকটে।
পাশে র'বে ছোট ক্ষেত মৌচাক্ তায়
র'ব অলিগুঞ্জরণভরা নিরালায়।

জানি শান্তি পাব সেথা হোক্ যতটুক্,
শান্তি শিশিরের কণা,—আমি কণাভুক্।
উষার গুণ্ঠন হ'তে ঝিল্লীরব পরে
সে শান্তি শিশির সম বিন্দু বিন্দু ঝরে,
কিরণ-বেপথুমতী সেথা নিশীথিনী,
দ্বিপ্রহরে দিবা যেন স্বর্ণকিংকিনী,
সুরঘন কম্প্রপক্ষে মধুবিধূনন
পরিপূর্ণ করে সেথা সায়াহ্ন-গগন।

দিন নাই রাত নাই পাই শুনিবারে
মৃদুল মর্ম্মরে হ্রদ চুমে সিকতারে।
এখনি চলিনু সেথা, পথে ঘাটে ঘরে
সে গুঞ্জন বক্ষে মোর দুরু দুরু করে।

প্রেম-দৃষ্টি

(Rossettia Love Sight হইতে)

তোমারে নয়ন ভরি' প্রিয়া মোর নেহারি কখন ?
যে প্রেমের পরিচয় পেয়েছিনু নিকটে তোমার,
তাহারি পূজার লাগি এ আঁখির দৃষ্টি-চেতনার
আলোকে পূজার বেদী ওই মুখে রচে কি নয়ন ?
অথবা গোধূলি ছায়ে মোরা যবে চুম্বন মগন,
তরলতিমির তলে শুভ্রদীপ্তি জাগে অনিবার
মুখে তব, সেই ক্ষণে অবচনে করে কর কি প্রচার
মর্ম্মবাণী ? হয় দোঁহে আত্মায় আত্মায় দরশন ?

হে প্রেয়সী, আর যদি দেখা নাহি হয় দুজনায়,
এ ধরায় ছায়া তব চিরতরে যদি মুছে যায়,
তোমার চাহনিখানি যদি কোনো বসন্তে না পড়ে,
জীবনে ঘনায়মান্ ঢালুপথে ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত আনি
আশার বিশুষ্কপত্র আর্ত্তরবে উড়াবে কি ঝড়ে,
মরণ অমর পক্ষবিধূননে দিবে হিম হানি ?

রূপান্তরিতা

শ্রীসতী দেবী

(নারীর প্রাণের চিরন্তন আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সতী দেবী রূপান্তরিতায় রূপ দিতে চাহিয়াছেন। এই লেখাটি পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিবে আশা করি।)

দূর অতীতে—কবেকার এক গোধূলিতে কিশোরীর প্রথম পদক্ষেপ হ'লো নতুন পথের চিহ্ন ধরে। সেদিন ছিলো, ফাল্গুনের রক্তরাগে ঝলমল ধরা—অশোক পলাশের লালিমায় ভরা। কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় কাঁপন লাগা—বেলা আর চামেলীর মধুগন্ধ, কোকিলের মাদকতা ভরা সুরের ছন্দ।

অঙ্গনে—আলোর আর আলিম্পনের সমারোহ, নীল চন্দ্রাতপের গায়ে বাঁধা—বন্ধন ক্লিষ্ট কচি পল্লব আর কুসুমিত কিশলয়ের মুমূর্ষু সজ্জা।

পুষ্প-বাসরে উপবিষ্টা কিশোরীর দেহে ভূষণ আভরণ—মুগ্ধ অনুভূতি মগ্ন মন, নূতন আবেষ্টনের অজানা শঙ্কার মৃদু আভাস লাগা। কিশোরীর কল্পনায় শোভন রংএর মোহন লীলা।

মধু ঋতুর মধুর ছন্দ—আকাশ মধুর, বাতাস মধুর—দেহ মন ভরা মধুর অনুভূতিতে।

\+ \+ \+

দিন যায়—। তরুণী কিশোরীর দীপ্তি ম্লান হ'য়ে গেছে। স্বপ্ন বিলাস হ'য়েছে মিথ্যা। চোখের দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে, রক্ত গোধূলির লেখা—চপলতার শিখা। তার কল্পনার সৌন্দর্য্য ও বুঝি ম্লানিমায় গেছে ঢেকে।

তার অতীত দিনে—সেই রাঙা গোধূলির আভায়—কম্পমান প্রদীপ শিখায়, ধূপের গন্ধে—আকাশের আর বাতাসের কানাকানিতে যে সুর বেজে উঠেছিল, যে আশা তাকে ক'রেছিলো বিভ্রান্ত সে আশার হ'য়েছে বুঝি সমাধি। সেদিন তার অন্তরে জেগেছিল আশ্বাস—"আমার জীবন উঠবে, উঠবে ভরে আনন্দে, গর্ব্বে, মাধুর্য্যে, বৈচিত্র্যে। স্নেহে প্রেমে, প্রীতিতে পুষ্ট হ'য়ে অন্তরের শতদল উঠবে বিকশিত হয়ে। সকাল বেলার সোনার আলো লাগবে এসে চক্ষে—সন্ধ্যা বেলায় মিষ্ট বাতাস দোলা দেবে বক্ষে। নিজেকে ক'রব সমর্পণ—আত্ম নিবেদন হবে মাধুর্য্য ভরা। আমার মাঝে জেগে উঠবে পত্নী, প্রিয়া সখীর মিশে যাওয়া কল্যাণী নারীরূপ।

দীর্ঘশ্বাসে বাতাস হয় আকুলিত। বকুল ঝরে ঝর ঝর—আর কোকিলের কলধ্বনি যায় থেমে।

... ...

যৌবনের উন্মেষিত অন্তর পদ্ম ত তার ফুটলো না। রাঙা দল গুলি বেদনায় হ'ল নীল—কঠিন তপ্ত হাতে কে দিল ছিঁড়ে তার দল গুলি ছিন্ন ভিন্ন ক'রে। কিশোরীর কোমলতা—তরুণীর কমনীয়তা আর যুবতীর তীব্র দীপ্তি ভরা মন আজ পাথর গড়া—অলকনন্দার ধারা হ'ল ঊষর মরুর মাঝে নীর-হারা। সাধের চিত্র লিপি আজ ধূলায় ভরা। রামধনুর সপ্ত বর্ণের সমারোহ কৃষ্ণ কালিমায় হ'ল পর্য্যবসিত।

অতীতের সেই কিশোরী ভাবে দৃষ্টি আনত ক'রে "আর কতকাল—কতকাল থাকবো ব'সে! ছন্দহারা রসহীন কাব্য রচনার বৃথা প্রয়াস নিয়ে? আমার অতীত আছে সুদূরাতীত হয়ে,—আমার বর্ত্তমানের রূপ নেই, রস নেই—নাই বৈচিত্র্যের বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। আমার জগতে নিত্য অন্ধকার। আমার গোলাপ, রক্তরাগ হারা—আমার অমৃতের পাত্র খানি ফেনিল হ'য়ে উঠেচে বিষের উচ্ছ্বাসে।

... ...

মায়াময়ী, কুহকিনী আশার গুঞ্জন আবার বুঝি শুনছে সে—। সেই তরুণী গো তরুণ বয়সে যার চোখের জল ফুটে উঠত—বাদল ভাঙা সাঁঝ গগনে শুক তারাটীর মত।

তুলসী তলে প্রণতা বধূর প্রদীপ শিখায় জ্বলে উঠা ললাটের টিপটির মত।

আশার গুঞ্জন গান—আশার স্বপন ছবি, কানের পাশে চোখের কাছে।

"শোন শোন ওগো কিশোরী—। অতীত দিনের গোধূলি সন্ধ্যার সেই চন্দন চেলী-নূপুর পরা চঞ্চলা কিশোরী গো! প্রতীক্ষা কর—অপেক্ষা কর—! তোমার স্বপ্নসাধ হবে পূর্ণ—। কঠিন হতে কঠিনতর বাস্তব দেবেনা গো তোমায় আঘাতের পর আঘাত চিরদিন চিররাত্রি। তোমার হারিয়ে যাওয়া গানের ছন্দ—প্রীতি ভরা প্রাণের লীলা আবার—ওগো আবার আসবে ফিরে। নব প্রভাতের নূতন সূর্য্যের নিরমল আলো, তোমার পথকে ক'রবে আলোকিত। কৃষ্ণা কুহেলিকার জাল হবে ছিন্ন।

সুন্দরের পরশে তুমি হবে সুন্দরতরা—অশিব যাবে দূরে আর সত্য উঠবে ফুটে সোনার লেখনে। মালিন্যের হবে অবসান—কল্যাণী গো—সুষমার ধারা স্নানে।

তোমার অন্তরের নীলপদ্ম,—ওগো তোমার ব্যথার আ-নীল পদ্মটী,—রূপান্তরিত হবে—, প্রেমের রাগে, প্রীতির ধারায়, করুণার স্নিগ্ধ রসে উজ্জীবিত, প্রস্ফুটিত হবে। রক্ত রাগের হোরীখেলায়—নীল কান্ত রূপ যাবে মুছে।

ক্লিষ্টা নারী—আহা—বিধুরা নারী—, চমকে ও'ঠ গো!

"সত্যি—একি সত্যি হবে—! কবে গো—কোন তামসী রাতের অবসানে! আমার হারিয়ে যাওয়া সুর গুলি সব উঠবে বেজে মনের বীণায়! আমার চিত্তের প্রশান্তিতে বিশ্ব রইবে ছাওয়া—।

নিঃশেষে জলা ধূপের মৃদু সুরভির মত, কৃষ্ণা রাতে হাওয়ায় ভাসা রজনীগন্ধার গন্ধের মত—প্রথম উদিত সন্ধ্যা তারার দ্যুতির মত।"

আশা গান গায়, মৃদু সুরের রেশ ছড়িয়ে পড়ে—গার্ব্বতীর কুলুধ্বনিতে, তন্দ্রা ভাঙ্গা গভীর রাতের হঠাৎ বেজে উঠা দূরের বাঁশীর সুরে সুরে, রুদ্ধ কারা দ্বারে আছড়ে পড়া বৃষ্টিধারার মূর্চ্ছনাতে—। সুরের লীলায় দিক্ দিগন্ত ভরিয়ে দিয়ে গায়—

"ওগো যৌবনের সুধা সংবাহিনী সাকি গো! আশা নিয়ে থাকগো—বেঁচে থাক —সেদিনটির প্রতীক্ষায়।

তোমার কালো চোখের অঞ্জন লেখা—তোমার চপল দিঠির উজল শিখা রাখ সঞ্জীবিত। ভবিষ্যতের প্রিয়াগো! তোমার সুপ্ত বীণায় মুখর ক'রে তোল লুপ্ত সুরের সাতটী তারের মধুর মূর্চ্ছনা! কালো কেশের মাঝে পর শ্বেত করবীর গুচ্ছ। অনিন্দ্য তোমার কান্তি ফুটিয়ে তোল অমল শুভ্রতায়।

আসবে রাণী! রূপের রাণীগো! তোমার সুখের দিনটী আবার ফিরে। সেদিন দিকে দিকে বাজবে তোমার আবাহনের গীতি রাগিণী। বরণ মাল্য হাতে নিয়ে আনন্দের মূর্ত্তিখানি। রূপ দেউলের পূজারি গো!

দেবতার রূপ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কে ও গায়—দেব দেবী সব নিরাকার;
নহে কি মানব তার প্রকৃত আকার?
জগতের জীবগণ তারাও কি নয়—
স্বরূপ তাঁহার?—কেন মিছে অভিনয়?
যখন প্রকৃতি সাজে মনোহর সাজে,
আঁকে নাকি মন তার ছবি হৃদি মাঝে?

জাগে নাকি মনে সেই মোহন মুরতি?
পরশে হৃদয় তন্ত্রী উঠে নাকি মাতি?
প্রভাতের সাথে যবে পল্লীবীথি পথে
রক্ত রাগে সদ্য স্নাত মুগ্ধ রবি কর,
ধীরে ধীরে আসে ফিরে পবনের সাথে
নয়ন ভুলান সেকি নয় মনোহর?

ক্ষণিকের তরে সেকি মাতায় না প্রাণ,
মেলে নাকি সেথা তাঁর রূপের সন্ধান?

সম্পাদকের অবিচার

শ্রীবিনয় দত্ত

কাগজ নূতন, সম্পাদকও নূতন। সহকারী সম্পাদকও দুই জন লওয়া হইয়াছে সেই নূতনের দল হইতে। কাগজের নামের মধ্যেও একটু নূতনত্বের ছাপ পড়িল—অর্থের দিক দিয়া এই নামের মূল্য যতটা থাক্ বা না থাক্, কানে নামটি বেশ শোনায় 'নর-নারী'।

কাগজের প্রায় সবটুকুই একরকম নূতন হইলেও উহার ভিতর-বস্তু কিন্তু নূতন হইল না। সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতেই 'নর-নারীর' সাহায্যে সাহিত্যের পরিবেশন চলিতে লাগিল।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—তাহা ছাড়া প্রতি সংখ্যায়ই সচিত্র প্রবন্ধ এবং গল্পও নিয়মিত প্রকাশিত হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে দেশ-বিদেশের সংবাদ, পুস্তক-পরিচয় এবং সম্পাদকীয় মতামত তো আছেই।......

পাঠক ও লেখক-সমাজের দৃষ্টি যাহাতে 'নর-নারীর' উপর ভালভাবে পড়ে তাহার জন্যই প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হইল 'গল্প-প্রতিযোগিতা' ও 'চিত্র-প্রতিযোগিতা'। সাহিত্যিকরা হয়তো ছবির বিচার করিতে পারিবেন না, তাই বিশেষজ্ঞ আনিয়া উহার বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে কিন্তু সম্পাদকের মতামতই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

গল্পের বিচার করিবেন সম্পাদক নিজে, যদিও সঙ্গে থাকিবেন প্রতিষ্ঠাবান্ মহিলা সাহিত্যিক তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিজনপ্রভা এবং সহকারী সম্পাদক-দ্বয়—একথাও প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন-পত্রে জানানো হইল।

\+ \+ \+

নূতন সম্পাদকের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে কাগজ একরকম ইতিমধ্যে বাংলা দেশে নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে।......

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য অসংখ্য গল্প আসিতে লাগিল কিন্তু ছবি আসিল দুই-একখানা।......ছবি ও গল্প পাঠাইবার তারিখ শেষ হইল।

ছবি যাহা আসিল তাহা দিয়া কোন বিচার চলিতে পারে না—তাই আরও একমাস সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইল।......

সময় বাড়াইয়া দিলে কি হইবে, এবারেও দেখা গেল প্রতিযোগিতার জন্য মাত্র চারখানা ছবি আসিয়াছে—ইহার মধ্যে একখানিও পুরস্কার পাইবার যোগ্য নয়, এমন কি সেগুলি দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক পুরস্কার পাইতে পারুক বা না পারুক ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিবার বা নষ্ট করিবার কাহারো কোন অধিকার নাই।

সহকারী ও সহকারিণীর পরামর্শে সম্পাদক মহাশয় 'নর-নারীর' সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঘোষণা করিলেন—

"চিত্র-প্রতিযোগিতার জন্য যে সমস্ত ছবি পেয়েছি, তাদের কোন পুরস্কারই দেওয়া যায় না—বাংলা দেশের যে এমন দুর্দ্দশা হবে, এ-ধারণা ছিল না। তাই বাধ্য হ'য়ে চিত্র-প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল, সে টাকাও গল্প-প্রতিযোগিতার টাকার সঙ্গে যোগ দেওয়া হ'ল—আমরা গল্পের জন্য বাংলার লেখক-লেখিকাদের আবার আহ্বান করছি। গল্প-প্রতিযোগিতার সময় আরও এক মাস বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল—আশা করি আমাদের এ-প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণ সাদরে গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি—গল্প যাঁরা পাঠাবেন, তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে গল্পগুলি ৩০এ আষাঢ়ের মধ্যে পাঠালেই বিশেষ বাধিত হব।"

\+ \+ \+

গল্প জমা দেওয়ার তারিখ শেষ হইল।...সম্পাদক

সহকারীদের বলিলেন—দেখুন, আমায় যেন আর এ গল্প নিয়ে মাথা ঘামাতে না হয়। আপনারা দু'জনে বেশ ভাল ক'রে প'ড়ে সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে গল্পগুলির মধ্য থেকে ৪।৫ টা বেছে রাখবেন, একদিন সবাই মিলে ব'সে কোন্‌গুলো পুরস্কার পেতে পারে তা' স্থির ক'রে ফেলব। হ্যাঁ, আর একটা কথা ব'লে রাখি—প্রত্যেক গল্প ভাল ক'রে পড়বেন আর প্রত্যেকটি গল্পের প্রতি যেন সুবিচার করা হয়। কারো নাম দেখে গল্পের বিচার করবেন না—বাইরে থেকেও যেন কেউ এর বিচার সম্বন্ধে কোন আপত্তি তুলতে না পারে।......

এ-ধরণের অনেক উপদেশ মাঝে মাঝে তিনি দিতেন—সহকারীরাও এ কথা মানিয়া লইতেন কি-না জানি না কিন্তু ধৈর্য্য নিয়া শুনিতেন।

+ + +

আজ রবিবার—গল্প-প্রতিযোগিতার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদক তাঁহার নিজের প্রাসাদের বড় 'হল'-ঘরটিতে সহকারী দুইজন ও সহকারিণী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন। দরজা সবগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল জানালাগুলি খোলা রাখা হইল। পাছে দরজা দিয়া কেহ প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের বিচারের সময় কোনরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে—এই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।......

সহযোগীদের মধ্যে একজন পর পর চারিটি গল্প পাঠ করিলেন এবং তাঁহারা যাঁহাকে প্রথম পুরস্কার দিতে বলিলেন, সম্পাদক মহাশয় সে কথায় কান না দিয়া প্রথম যে গল্পটির নাম করা হইয়াছে, সেইটি বাদ দিয়া অন্য তিনটিকে পুরস্কার দেওয়া স্থির করিলেন। অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়া সহকারীরা বুঝাইলেন যে, কুমারী কনকপ্রভার গল্পই ভাল হইয়াছে এবং তাঁহার গল্পকে প্রথম না করিলে অবিচার করা হইবে।

সম্পাদক ইঁহাদের কোন কথাই মানিলেন না, এমন কি তাঁহার স্ত্রীকেও এ-সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন না। স্ত্রীও নির্ব্বাক হইয়া সব শুনিয়া গেলেন।

একজন সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের স্ত্রী বিজন-প্রভাকে বলিলেন—আপনার কাছে কোন্‌টা ভাল লেগেছে ?

—আমি কি বলব, আপনারা যেটা ভাল বুঝবেন সেটাকেই প্রথম পুরস্কার দেবেন......

সম্পাদক বলিলেন—দেখুন, কনকপ্রভার গল্প পুরস্কার পাবে না, বাকী তিনটির নাম পরের সংখ্যায় 'নর-নারীতে' জানিয়ে দিন তারাই পুরস্কার পাবে।

—দেখুন, আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখা আপনার উচিত ছিল ?

—উচিত-অনুচিত ভেবে দেখেছি, কনকপ্রভার ওটা গল্পই নয়—

—তবে ওটা কি ?

—সে-কথার উত্তর এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।......

সম্পাদক এইবার অপলক দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন—কেন যেন আজ তাঁহার চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু ভাসিয়া উঠিল, সকলের অজ্ঞাতে তাহা তিনি মুছিয়া লইলেন। তারপর কনকপ্রভার গল্পের 'কপিটা' হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। স্ত্রীকে বলিলেন —ওঠ বিজন! এবার আপনারাও যেতে পারেন।

বিজন একবার অপূর্ব্ব দৃষ্টি ফেলিলেন সহকারী সম্পা-দকদ্বয়ের দিকে। তাঁহারা নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া যখন তাঁহারা নামিতে ছিলেন তখন সম্পাদক ও তাঁহার স্ত্রী বিজনপ্রভা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন—

—পাগল যদি কাগজের সম্পাদক হয়, তা' হ'লেই এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে, তা না হ'লে এরূপ হয় না।

—ও-কথা বলছেন কেন, পাগল ও একা নয় সঙ্গে সঙ্গে আমরাও, কারন এটুকু ক্ষমতা আমাদের নেই যে, একটা শ্রেষ্ঠ গল্পকে তার যোগ্যস্থান দিতে পারলুম না—

—আমি আর কিছু ভাবছি না, ভাবছি এরূপ খেয়াল নিয়ে চললে 'নরনারী' বাঁচতে পারবে না—আর বাঁচবেও না—বুঝলেন ?......

সে কথা আমিও মানি।......

\+ \+ \+

স্বামী স্ত্রী কথা চলিতেছে।

—সে যে ম'রে গেছে, এ কথাই একদিন তোমায় বলেছিলাম বিজন, কারণ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার জন্যে তোমার মনে অন্য ভাব জাগতে পারে—এই ভয়ই সেদিন আমার মনে জেগেছিল, যার জন্যে অতবড় মিথ্যেটা তোমায় জানিয়েছিলাম, কিন্তু—

—তুমি কি আমায় এতই ছোট মনে করেছিলে সে-দিন? আর তোমায় যদি সত্যিই কেউ ভালবাসে, তা'হলে আমার মনে হিংসা বা ঘৃণার ভাব জাগবে? কেন জাগবে তার প্রতি ঘৃণা? সে যে তোমায় ভাল-বাসে—আজও ভালবাসে, সে তো আমারই আনন্দ ও গর্ব্বের বস্তু! এ-কথা যদি সে-দিনই শুনতাম, তা'হলে কত না আনন্দ হ'ত আমার মনে!—

বলিতে বলিতে বিজন স্বামীর কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া বসিল। তারপর শান্তভাবেই আবার বলিয়া যাইতে লাগিল—সে-দিন যে তুমি তার ম'রে যাওয়ার কথা মিথ্যে ক'রে ব'লেছিলে, তখন অন্তরে দুঃখ পেয়েছিলাম কিন্তু আজ সত্যিই আনন্দিত হয়েছি—খুশী হয়েছি তার বেঁচে থাকার কথা শুনে—

—আনন্দ ও খুশী ঠিক হবে না বিজন, তার অবস্থা শুনে, তার জীবনের ব্যথাপূর্ণ ইতিহাস শুনে। চিরদিন দুখের ভার ব'য়ে ব'য়ে তার জীবনে অবসাদ এসেছে, প্রতিনিয়ত তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে পূর্ণ শান্তি পাবার জন্যে। এই দেখ আমার কাগজের গল্প-প্রতি-যোগিতায় দিয়েছে সে গল্প। এ যে অন্যের গল্প নয়, এ যে তার নিজেরই ব্যথা-পূর্ণ জীবনের ইতিহাস, তা' আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি! বিজন, এই গল্পের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কথা তার হয়ে আজ আমাকে অনেক কথাই ব'লে দিয়ে গেল—

বিজন স্বামীর হাত হইতে সেই কালো মলাটের খাতা-খানি লইয়া একবার নিজে খুলিয়া দেখিল—গল্পের নাম লেখা রহিয়াছে "গল্প শুধু গল্প নয়" আর লেখিকার নাম কুমারী কনকপ্রভা রায়।

বিজন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, স্বামী সে-কথায় কান না দিয়া বলিল—বিজন, তোমাকে আমার গত জীবনের কত কথাই না বলি নি! আজ যে আমার এই ভাঙা ও নিরুৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমায় পেয়েছি, তার জন্যে আনন্দে ও গর্ব্বে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠছে। যে যায়, সে সত্যিই যায়, বেঁচে থাকলেও তার খোঁজ পাওয়া যায় না কোনখানে, কিন্তু সে যে নির্ম্মমভাবে বিদায় নিয়েছিল সেদিন—

তাঁহার গলা হইতে আর কথা বাহির হইল না।

স্বামী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। স্ত্রী তাহার দুইখানি হাত দিয়া স্বামীর গললগ্ন হইয়া তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্বামীর চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে—আজ তাঁহার চোখে, মুখে—সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে একটি নূতন রূপের মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে দরদীর ব্যথাপূর্ণ প্রতিকৃতি—সে-মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি এত দিন যেন সেই অতলে সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

বিজন এইবার হাতে আঁচলখানি লইয়া স্বামীর চোখ মুছাইতে মুছাইতে নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—বল, আজ আমায় আমাদের সেই বান্ধবীর কথাই বলতে হবে, কোন দুঃখ নেই, কোন সঙ্কোচ নেই—যদি অপ্রিয়ও হয়, তা'হলে তার কথা বলতে হবে, তোমার দু'টি পায় পড়ি—

—বিজন, সে বহু কথা, তার ইতিহাস এতদিনের মধ্যে এ জগতে কারো কাছে ঘটেনি, কেউ পরিচয়ও পায়নি এতটুকু, সে যেমন একটু নূতন, তেমনি অভিনব। গল্প, কাহিনী, রূপকথা—কোন কিছুতেই সে ইতিহাসের এতদিনের মধ্যে জগতের সঙ্গে পরিচয় হয় নি বললে অত্যুক্তি হবে না, আর জানতেও পারবে না।

—জানতে পারব না ব'লেই তোমার কাছে আজ তা' শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।

আবার স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করিলেন, তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেবার আমি এই কলকাতা সহরে থেকেই পড়তাম। বড় সাধ হ'ল গান শিখবার। গান শিখবার

প্রবল ইচ্ছা মনে থাকলেও মনের মতো স্কুল পেলাম না গান শিখবার জন্যে। একদিন পার্কসার্কাসের দিক থেকে 'বাসে' ফিরছিলাম, রাস্তার পাশেই লেখা রয়েছে 'সঙ্গীত-মন্দির'—নেমে পড়লাম সেখানে 'বাস' থেকে।**

সপ্তাহের দুটি দিন ক'রে গান শিখবার জন্যে কি উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই না জাগত মনে—তখন শুধু গানই আমায় পেয়ে বসেছিল। ঠিক মনে নেই, দু'টি কি তিনটি সপ্তাহ পরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এসে সেই স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। তাদের চেহারা একই রকমের—দেহের রং হ'তে আরম্ভ ক'রে মুখ, চোখ, নাক—সবই যেন একই 'ছাঁচে' ঢালা। এদের মধ্যে একটু বিশেষত্বও দেখা গেল, এরা সকলের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র আর তারই জন্যে সকলের একটা দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তু হ'ল এরা। যদি কোন দিন এরা গানের ক্লাশে না আসত, তা'হলে আমাদের মধ্যে অনেকে এদের না-আসবার কারণের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ত। এমনি দু'তিনটি মাস কেটে গেল, শেষে পর পর তিনটি সপ্তাহের মধ্যে তাদের কেউ-ই এল না। একদিন লজ্জা-সরম ত্যাগ ক'রে এক শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

এর ঠিক পরের সপ্তাহে স্কুলে মেয়েটি এল, ছেলেটিকে সঙ্গে দেখা গেল না। সেদিনের গান ও বাজনা শিক্ষা করা হ'য়ে গেলে মেয়েটি নিজেই একখানা গান গাইলে। সেই গান যেন কত দিনের, কত মাসের, কত যুগ-যুগান্তরের রুদ্ধ দুঃখ-বেদনার প্রতীক হ'য়ে সবারই মনকে নাড়া দিলে—গান গাওয়ার মধ্যেই সঙ্গত সব থেমে গেছে, সকলেই মুগ্ধ, কারও বা চোখের কোণে জলের রেখা ভেসে উঠল। তারপর গান-গাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটির দেহও মেঝের পরে এলিয়ে পড়ল। তখন কেন যেন আমার অন্তর-বাহির একটু বেশী ক'রেই নাড়া দিলে—আমিও সম্পূর্ণ মুগ্ধ ও অভিভূত হ'য়ে পড়লাম।......

কিছুক্ষণ পরে প্রধান শিক্ষক বললেন—চলুন মিঃ ঘোস, একখানা ট্যাক্সি ক'রে এঁকে এর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

কোন দ্বিধা না ক'রে সেদিন মেয়েটিকে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলাম। মেয়েটির বৃদ্ধা মা আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন যে, ওর হিসটিরিয়া রোগ খুব অল্পদিনই হয় আরম্ভ হয়েছে।

সে-দিন ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছিল, পথে মেয়েটিকে নানাভাবে কল্পনা করেছিলাম।

তার পরের সপ্তাহে গানের ক্লাশে গেলাম কিন্তু মেয়েটিকে দেখলাম না, ছেলেটি তো এর পূর্ব্বেই আসা বন্ধ করেছিল। তারপর আরও তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল তবুও এল না। সে-দিন কথায় কথায় শিক্ষক মশায়ের কাছে মেয়েটির না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—তাঁরা আর আসবেন না, এসেছিলেন অভিনয় করতে, অভিনয় শেষে তাঁরাও বিদায় নিলেন।

আমি বললাম—ওসব হেঁয়ালি রেখে বলুন না কেন, তাদের না-আসবার কারণ কি?

—কারণ বিশেষ কিছু নয়, তবে বাকী মাইনে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা আর এখানে গান শিখবেন না।

কথাটা শুনে অবধি মনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। সত্যিকারের পরিচয় না হ'লেও পরিচিত হবার জন্য মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। প্রথম প্রথম ভাবতাম—দূর ছাই, এ ভুলতে হবে। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, তবু কেন মনের এ-ধরণের দুর্ব্বলতা হয়—এ-কথা জানবার জন্য বহুদিন নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

ঠিক এক বছর পরে একদিন এক প্রদর্শনীর সভায় মৃজাপুর পার্কে সেই মেয়েটি ও তার মাকে দেখতে পেলাম। দেখেই আমি চিনলাম কিন্তু বৃদ্ধা না-চিনলেও আমাকে প্রতি-নমস্কার জানালেন। মেয়েটির চেহারার আর কোন পরিবর্ত্তন না হলেও বেশ একটু শুকিয়ে গেছে, তা বোঝা গেল।

তারপর পরিচয় হ'লে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদেরই বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম, আমার তখন পিছন হ'তে কি একটা শক্তি আমাকে টেনেছিল।

বৃদ্ধা চলতে চলতে কত কথা বলতে লাগলেন,

তাঁর সংসারের সুখ-দুঃখ, তারপর কি ভাবে তাঁর সংসার চলে আর দিন কেটে যায় ইত্যাদি কথা যেন তাঁর ছুকতে চায় না।

নিজে বৃদ্ধা হ'লেও ভবানীপুরের এক স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ক'রে যা কিছু পান তাই নিয়ে একভাবে দিন চ'লে যায়, ছেলের কথা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন তখনকার মতো।

কন্যার নাম কনকপ্রভা ডাকে সকলে লীনা বলে। সে 'লি-মেমোরিয়ালে' পড়ত, সেখান থেকেই প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছে—ট্রেনিংও পড়বারও ইচ্ছা ছিল কিন্তু বৃদ্ধা নিজে কিছু করতে পারেন না ব'লেই কন্যাকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ী এনেছেন। এই পথ-চলার মধ্যে লীনা কোন কথাই বলেনি, শুধু একবার একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে—আপনিও স্কুলে যান তো?

আমি বলেছিলুম—হ্যাঁ, আমি যাই কিন্তু কতদূর বিদ্যে হবে তা' জানিনে।

লীনা পথে আর কোন কথা বলেনি, আমিও ওকে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি। মুখে কোন কথা না বললেও আমার দুষ্ট চোখ দু'-একবার কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু প্রতিউত্তর পায়নি ওর কাছ থেকে।

সে যাক যে-কথা বলছিলুম,—ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যখন ফিরলাম তখন রাত প্রায় ১০টা।

ঠিক আসবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা ৩.৪ বারই বলেছেন—মাঝে মাঝে আসবে তো বাবা?

—হ্যাঁ, আসব মা।......

সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি পিছন থেকে লীনা ব'লে উঠল — পেছন থেকে ডাকলাম, একটু সময় ব'সে যান।

—আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

—আচ্ছা আসুন গে, নমস্কার। আবার একদিন আসছেন তো?

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, আসব।

সেদিনের ঘটনা আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। আমার মনে লেগে গেল নূতন রংয়ের খেলা অন্তরেও বেজে উঠল নূতন সুর, খেলবে সেও নূতন খেলা, এই তার সুরু, শেষ কোথায় কে জানে?

পথে আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম, লীনা আজকালকার মেয়েদের মতো নয়, সে শান্ত ও সংযত। যাকে যখন যার ভাল লাগে, তখন সে তার সবই সুন্দর দেখে, সুতরাং লীনার কথা আর কিছু না ভাবলেও সে যে খুব ভাল, এটা আমার মন মেনে নিলে।

বাড়ী ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যখন বিছানায় শুতে যাব, তখনও লীনার নানা রূপ আমার ভিতর-বাহির অধিকার ক'রে ব'সে আছে......রাত্রে একবার স্বপ্ন দেখলাম লীনা আমার পায়ের ধারে ব'সে কাঁদছে, স্বপ্নের ঘোরেই চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম—কি লীনা, কি হয়েছে, কাঁদছ কেন ভাই?......

পরদিন হ'তে সেখানে লীনাদের বাড়ী নিয়ম মতো যেতে লাগলাম—সেখানে যাওয়াটা আমার নেশার মতো হ'য়ে দাঁড়াল, জীবনের পট-ভূমিকায় আমি নূতন এক অভিনয় আরম্ভ করলাম। সে অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতার সবটুকু উজাড় ক'রে দিতে হয়েছিল। আর অভিনেত্রীর?—তারও......

একমাস পরের কথা।

সেদিন চা-পান হ'য়ে গেছে, আমি ও কনক ব'সে কথা বলছিলাম।

এখন আমি মিস্ রায় বা মিস্ কনক রায় নাম ছেড়ে দিয়ে 'লীনা' বলে ডাকতে সুরু করেছি আর 'আপনি' থেকে 'তুমি'-র পর্য্যায় নেমেছি। লীনাও মাঝে মাঝে 'তুমি' ব'লে ফেলে বলে—ক্ষমা করবেন ভাই, এটা আমার বদ অভ্যেস।

আমি তখন নিজেই অপ্রস্তুত।

কথায় কথায় বলে—দেখুন ইন্দুদা, আজ-কাল রাস্তায় একাকী মেয়েদের বেরোনোই বিপদ।

—কেন, বিপদ কিসে?

—তবে শুনুন, কয়েক মাস আগে এক শনিবার আমি ফিরছিলাম আমার হস্টেল থেকে বাড়ীর দিকে। পথেই দেখা হ'য়ে গেল এক গ্যাংলোর সঙ্গে। সে আমার পিছু নিল, ট্রামে উঠলাম, সেও ট্রামে উঠল,

সে-ট্রাম শিয়ালদা এসে থামল। আমি নেমে পড়লাম, সেও নেমে পড়ল। কি করি, একটা ফলের দোকানে কিছু ফল কিনবার ভান করলাম, সেও ঠিক পাশের এক ফলের দোকান থেকে ফল কিনবার ভান করতে করতে ফল কিনেই ফেললে। আমার তখন একটু হাসি পেল, আমি সেখান থেকে আবার 'কলেজ ষ্ট্রীটের' দিকে আসব, তাই কতকটা হেঁটেই এগিয়ে এলাম, সেও আমার ঠিক পিছন পিছন চলতে লাগল। মহা বিপদে তো পড়লাম, এ যে কানের কাছে ফিস্-ফিস শোনা যাচ্ছে! কাছেই দু'টি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তাঁদের সামনে ছাতি দিয়ে এ্যাংলোটাকে দু'-চার ঘা ক'সে দিলাম। একটু সময়ের মধ্যে অনেক লোক জড় হ'ল, সকলেই আমার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন, একটি যুবক ব'লে উঠলেন—'আজকাল এই-ই তো চাই, আপনার মতো সব মেয়েরা যখন হ'য়ে উঠবে তখন আর আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য ভাবনা থাকবে না......।' তারপর তিনি আমায় বাড়ী পৌঁছে দিলেন। ঠিক এর পরের শনিবার চারটার সময় হস্টেলের বাইরের গেটে সেই যুবককে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, আমায় নমস্কার জানালে, তারপর সে আমায় বাড়ী এগিয়ে দিলে কিন্তু সেটা আমার ভাল লাগল না। তার পরের সপ্তাহেও শনিবার তাকে গেটে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে আমার মনে ঘৃণা ধরে গেল—ভাবলাম, যে-রক্ষক সে-ই আবার ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়াতে চায়? আশ্চর্য্য পুরুষের অধঃপতন।......তারপর তিন-চার সপ্তাহ বাড়ী আসা বন্ধ করতে হ'ল, শেষে গিয়ে সেই যুবকের হাত থেকে মুক্তি পাই—

—ও-কথা বলছ কেন ভাই, এ কলকাতা সহরে সমস্ত স্থানে এ-ধরণের ঘটনা ঘটছে, আর তারপর সত্যি বলতে কি, আমি এ্যাংলো বা বাঙালী খৃষ্টান গুলো দেখতেই পারি নে—

খৃষ্টানদের যে আপনি দেখতে পারেন না, সে-কথা আপনার কাছে ভাল লাগতে পারে কিন্তু অন্যের কাছেও যে ভাল লাগবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই—

বলতে বলতে ওর মুখখানা যেন মেঘে ঢেকে এল। চোখমুখের চেহারার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখা গেল—অন্তর-বাহির তার একটা অব্যক্ত বেদনায় আচ্ছন্ন হ'ল।

লীনা উঠে দাঁড়িয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—আপনাকে একটা কথা ব'লে দিচ্ছি মিঃ বোস, দোষ-গুণ সব লোকের মধ্যেই হয় তো আছে কিন্তু সেটা নিয়ে অমনি ভাবে আলোচনা করতে যাওয়া উচিত নয়।

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, এমন কি কথা আমি বলেছি যার জন্যে আমাকে অতকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল! তারপর যখন সিঁড়িতে পা দিয়েছি চ'লে আসব বলে পিছন থেকে আমার হাতখানা ধ'রে বুড়ী বললেন—যাচ্ছ কোথায় বাবা? একটু বসে যাও।

তিনি আমার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বসবার ঘরে বসালেন, তাঁর মুখেও বিষাদের ছায়া, চোখ-মুখ ফেটে যেন কান্না বেরোতে চায়।

—বাবা, আমরা যে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোক, তা' জান না বলেই বোধ হয় ও-কথা বলেছ, কনক তোমার কথা শুনে খুব কাঁদছে!

এরপর তিনি তাঁদের সংসারের সম্বন্ধে যা' বললেন, তা এই—কনকের ঠাকুরদা কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ভাল বেসে ফেলেন, আর তাঁকে তাঁর বিবাহ না ক'রে উপায় ছিল না, অথচ তিনি হিন্দু, তার উপর গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ। নানা চিন্তা করে লজ্জা-সরম ত্যাগ ক'রে তিনি তাঁর বাবার কাছে সেই শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিয়ে করার কথা জানালেন কিন্তু উত্তর যা' পেলেন তা' একটুও আশাজনক নয়। তিনি

আবার লিখে পাঠালেন—বাবা, শুদ্ধি ক'রে বিয়ে করলেও আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব, কারণ এঁর বাবা-মায়ের সাহায্যেই আমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি—এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি।……

তাঁর বাবা উত্তর দিলেন—তোমাকে কিছু বলার আমার প্রয়োজন নেই, তবে আমার তিনটি সন্তানের মধ্যে একটি মারা গেছে—এই টুকু আজ বুঝলাম।

তারপর তিনি আর কোন দিকে না চেয়ে সেই মেয়েকে বিবাহ করলেন—নিজের শক্তি ও সাধনার বলে বড় হয়েছিলেন, আর প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন।

\+ + +

সেদিন ফিরতে আমার অনেক রাত হ'য়ে গেল। ঘড়িতে তখন একটা বাজে। কনক তখনও একটা চেয়ারে ব'সে কাঁদছিল, আমি ফিরে আসার সময় ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে এলাম—তার ঠাকুরদার ফটোর সামনে শ্রদ্ধাভরে প্রণামও জানালাম।—

তারপর দিন সকালে কনকদের বাড়ী গেলাম না—বিকেল বেলাও নয়, কিন্তু সন্ধ্যার সময় সে নিজেই আমাদের বাড়ী এসে হাজির হ'ল।

এসে কোন কিছু সম্বোধন না ক'রে বলল—আজকে রাত্রের ট্রেনেই আমরা দেওঘর যাচ্ছি, মা বললেন আপনাকে একবার সেখানে আমাদের দিয়ে আসতে হবে—ট্রেন ছাড়বে আটটার পর—

আমি বললাম—আচ্ছা আমি তার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়ে নেব'খন, তোমরা—

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না।...বলেই রাস্তায় নেমে পড়ল, আমি যে বলতে বললাম সে-দিকে লক্ষ্যও করল না।

\+ + +

ওদের নিয়ে দেওঘরে চলে এলাম।

বেলা প'ড়ে এলেই আমি, কনক ও মা বেরিয়ে পড়তাম যেদিন পাশের কোন গাঁয়ের দিকে রওনা দিতাম সেদিন মা পথ থেকে ফিরে আসতেন—আমরা দুজনেই চলতাম।

আমার স্পষ্ট মনে আছে ঠিক তখন থেকেই কনককে বেশী আপনার ব'লে মনে হ'তে লাগল—এখন আর তার মনে সেই রাগ বা অভিমানের এতটুকু লেশও নেই। ও এখন প্রায়ই হাসতে হাসতে আমার গায়ের উপর এসে টলে পড়ে—এমন সব কথাও বলে ফেলে যে, আমার মনটা দুলে ওঠে ··এ তো স্বাভাবিক

দু'-এক দিন মায়ের সামনেই অসংযত কথা ব'লে ফেলেছে কিন্তু তার জন্য মা কিছু বলেন নি। লীনার প্রতি আমার মনটা যেন নুয়ে পড়ছিল, পথ চলতে চলতে দু'একটা এমন কথাও মাঝে মাঝে বলে ফেলেছে যে, সে কথা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই চলতে পারে।

দেওঘর থেকে একটু দূরেই কুসুমা, সেখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর, আর কালো ছোট পাহাড়গুলো সত্যই মনকে আনন্দ দেয়।

সেদিন দুপুরের দিকেই আমরা রওনা দিলাম—আমি আর লীনা, যাবার সময় লীনা মাকে ব'লে গেল, ফিরতে আমাদের রাত হ'য়ে যাবে মা, তুমি আমাদের জন্য ব'সে থেকো না।—

আমার হাতে একটা হ্যাণ্ড-ক্যামেরা, কাঁধে একটা মোটা চাদর, একখানা রাগ আর লীনার হাতে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার, একটা ওয়াটার ব্যাগ ও একটা এ্যাটাচি-কেশ—পথে চলতে চলতে লীনা একবার বললে--আচ্ছা ভাই, রাম-সীতাও তো ঠিক এমনি ভাবে বনবাসে গিয়েছিল, ঠিক আমাদের মতো সেজে, তবে লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকা উচিত নয় আর কালকার রাম-সীতার সাথে—আর এই যে পোষাক-পরিচ্ছদ, এ গুলোও মিলে গেছে সেকালের সঙ্গে, তবে এটা মডার্ণ যুগ কি-না তাই একটু ওদল-বদল পোষাক করতে হয়েছে, কি বলছ এবার?

আমি কোন জবাব দেই নি, কেবল একটু মুচকি হাসি হাসলাম। পথ চলতে চলতে অনেক স্থানে বসেছি, কোন সময় আমার গায়ের পরে গা'টা এলিয়ে দিয়ে বলছে—ওঃ, টু টায়ার্ড, ভাই। টু টায়ার্ড।

আমার মুখ থেকে কোন কথাই বেরোল না, কেবল ওর কথা শুনে আর ওর ভাব-ভঙ্গিমা দেখেই যেতে লাগলাম।······

কুসুমায় যখন গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হ'তে বেশী দেরী নেই. ছোট ছোট অনেকগুলি পাহাড় দেখলাম, কালো কালো পাহাড়ের স্তূপগুলো বেশ দেখায়—প্রতিটী পাহাড় নিজের আপন সৌন্দর্য্যে মানুষকে মুগ্ধ করে।

একটি-দু'টি ক'রে ছোট ছোট ৪।৫টি পাহাড় পার হ'লাম--তারপর একটা বড় পাহাড়ের কাছে এলাম। সেটা 'পাস্' ক'রে যখন উপরে উঠতে লাগলাম তখন লীনা আমার হাত ধরে চলছে—সূর্য্য ডুবে যায় যায়, আমি বললাম—লীনা, দেখছ সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে ?

—না, আমি তো দেখছি সূর্য্য উদয় হচ্ছে ভাই।—

ব'লেই হাসতে লাগল, সে হাসির মধ্যে দুষ্টুমি ভরা।

চলতে চলতে লীনা বলছে—কি ভাই মৌনী হ'লে না-কি ? তা হ'লে তো আমাকে অঘাটেই প'ড়ে মরতে হবে।

—কেন ?

—আমার এক বন্ধু বলতেন 'কেন কথার উত্তর নেই'।

আমার মনে হ'লো একদিন চা খাবার সময় আমি ঠিক ঐ কথাটিই উচ্চারণ করেছিলাম।

তারপর উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চেয়ে হাসলাম। এরপর সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—ফিকে জ্যোৎস্না সারা পর্ব্বতটি জুড়ে বসেছে সব নিরব, নিস্তব্ধ—কেবল আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। এক একখানা ছোট পাথর খণ্ডের উপর পা পড়ে কোন সময় 'খচ-খচ' শব্দ আবার কোন সময় 'খ-অ-অ-চ' শব্দ বেশ কানে শোনাচ্ছিল।

এবার আমরা পর্ব্বতটির একেবারে চূড়ায় এসে পৌছেছি. বললাম—এবার কিন্তু সন্ধ্যা নেই, একেবারে রাত, তারপর ফিরবার কি করবে ?

—ফিরবার কথা ? তা আজ না-ই বা ফিরলাম ভাই, তোমার বোধ হয় খুব ভয় করছে, না ? আজ এই সুন্দর রাতটা পাহাড়েই কাটানো'ক যাবে—কি বল ?...

আমি নিরুত্তর।

—বল ভাই, চট্-পট্ ব'লে ফেল। ভয় করলে ফিরে চল।

যদিও জন্তু-জানোয়ারের বা দস্যু-তস্করের ভয় ছিল না, তথাপি ভয় আমার হ'চ্ছিল এক মানবীর।

একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচের সুরে বললাম—না, না তেমন কিছু ভয় নেই, তবে রাত্রে তুমি এই পর্ব্বতে থাকবে ?—

—কেন থাকব না ভাই, বল ? আমি তো ঠিক করেই এসেছি যে, রাত এখানেই কাটাব আর সেজন্যেই তো সব সেই ভাবে বন্দোবস্ত করেছি—

এবার হাতের এ্যাটাচি, টিফিন-ক্যারিয়ার আর ওয়াটার-ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে উঠে বলল—যেমনটি খুঁজছিলাম ঠিক তেমনিটিই মিলে গেছে ভাই—

—কি খুজছিলে লীনা ?

—একটি ছোট্ট 'কেভ' ঠিক দু'জনের মতো···

তারপর সব নামিয়ে রেখে সেই 'কেভে'ই আশ্রয় নেওয়া গেল—কেভের যে পাশ খোলা, তার মধ্য থেকে চাঁদের আলো এসে ভিতরটিকে অপূর্ব্ব শ্রীতে রূপান্বিত করেছে :

যখন লীনা টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে কিছু খাবার আমায় দিলে, তখন আমি বললাম—তুমিও কিছু খাবার নিয়ে ব'স না।

কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না ক'রেই সে বললে—তোমায় কি অতটা খাবার একাকে দিয়েছি ? ওতে আমারও ভাগ আছে। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমি 'রাগ' আর চাদরটা পেতে নেই, আর একটু জল নিয়ে নেই। তার পর দু'জনে ব'সে একসঙ্গে খাবখ'ন।

'রাগ' ও চাদরটা পেতে ও ওর এ্যাটাচি থেকে একটা ছোট 'বোকে' আর এক ছড়া গোলাপ ফুলের মালা বের করলে। সেমালা আমার গলায় পরিয়ে দিলে আর বোকেটা নিজের আঁচলে এঁটে নিয়ে বললে—ইন্দুদা, আজকে আমার জন্মদিন, সেই জন্যেই এত আয়োজন, বুঝলে ?

তারপর আমায় ছোট ক'রে একটা প্রণাম ক'রে আমার সঙ্গে খেতে ব'সে গেল।

খেতে খেতে লীনা বললে—প্রতি বৎসর উৎসব দিনে

তারপর আমার হাতখানা তার কোলের উপর নিয়ে বললে যদি আমরা দুজনেই এক ধর্ম্মাবলম্বী হতাম! এত কাছে তবু কত দূরে!

বলতে বলতে ওর গলাটা কেঁপে উঠল।

আমি বললাম—ছিঃ লীনা, অমনি কি করতে আছে? —না, ও ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা, ভাই।

\+　　+　　+

খাওয়ার পর্ব্ব শেষ হ'য়ে গেছে। আমি ব'সে আছি দেখে লীনা বললে,—ও. তুমি বুঝি শুতে পারছনা, আচ্ছা তোমার জন্যে একটা বালিশ নিয়ে আসি।—

ব'লেই 'কেভ' থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে একখানা পাথর খণ্ড এনে হাজির করলে, বললে—এটার' পরে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়। আমি একটু বাইরে বসি।...

\+　　+　　+

রাত তখন বোধ হয় ১২টা, আমার একটু তন্দ্রার মতো এসেছে, তারপর ও এসে হাত দু'টি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলছে—না ভাই, তোমার সঙ্গে খেলব না, তুমি আজকের রাতটা মাটি ক'রে দিচ্ছ, এখনই ঘুমিয়ে পড়ছ? একটা রাত না ঘুমিয়ে পারবে না?

তারপর আমার গলার মালা ছড়া নাড়তে লাগল—আমার মনে হ'তে লাগল এই বুঝি আমার জীবনের চির-মিলন চির-মধুর হ'য়ে ফুটে উঠছে—সাক্ষ্য এই মালা, এই জ্যোৎস্না আর ছোট্ট 'কেভ'।...

ভাবতে ভাবতে আমার চোখ বুজে এল, আমি আমার কপালে কোমল ঠোঁটের পরশ অনুভব করলাম, আমার নিদ্রা যেন কোথায় পালিয়ে গেল...এইবার বুঝলাম আমার জীবনের চলার পথের সঙ্গীনীকে বুকের কাছে পেলাম। ওর বুকখানা আমার বুকের সঙ্গে লেগে গেছে, তারপর মুখখানাও মুখের সঙ্গে। সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, আমিও লীনাকে খুব জোরে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম—অজস্র চুম্বনে ওর ঠোঁট, গাল, কপোল—সমস্তটাই ভ'রে দিলাম। সেই একটি রাত্রির জন্য সে তার সব টুকু উজাড় ক'রে সমর্পণ ক'রে দিলে—এতটুকুও আপনার বলতে রাখেনি নিজের কাছে। তখন সে ভেবেছিল, এই বুঝি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রেষ্ঠ সুখ—সব কিছুই উপভোগ ক'রে নেবে এই একটি রাত্রির মধ্যে।...

সমস্ত রাত জেগে রইলাম এমনিভাবে। সে রজনী যে কত মধুর, কত সুন্দর, কত পবিত্র, তার কথা তোমায় কি বলব বিজন!

এইবার বিজন স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোমার হাত দিয়ে তোমার কোলের কাছে আমায় জড়িয়ে ধর।

—এই তো আমি বিজন, ভয় নেই, তুমি যে আমারই।

স্বামী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বিজন, সেইদিনই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দিন বলতে হবে। ভোর হ'য়ে গেছে—সূর্য্য উঠতে দেরি নেই, আমি বললাম—লীনা, আমার শেষ চুম্বন নাও, তারপর রওনা দেওয়া যাক।

অস্বাভাবিক রকম পরিবর্ত্তন দেখলাম তার যে। গত রাত্রে এত অভিনয় করতে পেরেছিল যে, অসাধারণ রকমের স্ত্রীও তার কাছে হার মেনে যায়, সে কর্কশ স্বরে ব'লে উঠল—না, না, না!

একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে লীনা আবার বললে—আমাদের মিলন-রাত কেটে গেছে, ভুলে যান ইন্দুদা, আমি ব'লে আপনার কাছে কেউ ছিলুম, যদি কেউ থেকে থাকে তার সমাধি হ'য়ে গেছে—তার কবর এই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। বন্ধু, ভাই, আর নয়—যা' হবার হ'য়ে গেছে—বিদায় বন্ধু, বিদায়—তুমি চ'লে যাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

সে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের' পরে, বললে—ইন্দুদা দেওঘরে গিয়ে তুমি চ'লে যেও, নইলে আমি বাঁচতে পারব না—বন্ধু—

কত নভেল-নাটক পড়েছি, কত প্রেমের কাহিনী প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু সেই একটি রাত্রির মিলন আমাদের

জীবনের ইতিহাসে যে যুগান্তর এনে দিয়েছিল, তা' আর কোথাও পাইনি—মরণের শেষ দিনও আমি ভুলব না—লীনাও না বিজন, তোমাকেও বোধ হয় একটি দিন বা একটি রাত তেমন ক'রে পাইনি বা তুমিও আমাকে পাওনি তোমার বুকের কাছে যেমন ক'রে পেয়েছিলাম আমি ও লীনা।

তখন আমি ঝাপ্‌সা দেখছিলাম, বললাম—তাই হোক্, তাই হোক্, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর—

সে-দিনই দেওঘরে পৌঁছে লীনার মায়ের কাছে অন্য একটা জরুরী কাজের কথা ব'লে বিদায় নিলাম—বিদায়-কালে মাও কেঁদেছেন, শুনলাম লীনাও রান্না-ঘরে বসে কাঁদছে। ভয় হ'ল তার কাছে গিয়ে বিদায় নিতে—

+ + +

কলকাতা ফিরে এলাম—সঙ্গে নিয়ে এলাম একটা ব্যথাপূর্ণ স্মৃতি তা আমায় বহুদিন ধ'রে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

তার ঠিক দু'টি বৎসর পরেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল—সংসারে নূতন ভাবে প্রবেশ করলাম। তার মধ্যে কোন আড়ম্বর ছিল না, সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে—তার মধ্যেই শান্তি ফিরে এল। আমার বিয়ের ঠিক আগের মাসেই লীনার মায়ের মৃত্যু-সংবাদ আমাকে আমার এক বন্ধু দিয়েছিল—সে সংবাদে একটু দুঃখিত হয়ে লীনাকে একটা পত্র দিলাম নেপালে তার মামার ঠিকানায় কিন্তু উত্তর পেলাম না। ভাবলাম হয়ত অভিমান করেছে এত দিনের মধ্যে ভুলেও তাঁদের খোঁজ নেই নি। আমি আর একটা পত্র দিলাম সেখানে, কিন্তু সে পত্র আবার আমার কাছেই ফিরে এল।

অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছেও খোঁজ-খবর ক'রে লীনার সংবাদ পাওয়া গেল না। এতদিন পরে এবার আমার কাগজে সে গল্প দিয়েছে—গল্পের বিষয়-বস্তু যা, তা' অতি করুণ, সম্পূর্ণ নূতন—অন্যের কথা বলতে গিয়েই নিজের কথা লিখেছে, দরদ দিয়েই লিখেছে। তার লেখার মধ্যে সে কথা বা ইতিহাস এত সুন্দর হ'য়েছে বিজন যে, তুমিও তা' শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলে—তোমার চোখেও জল জেগেছিল। সেই কুহুমায় খুলেছে এক 'অরফ্যান হাউস' এ কথা খবরের কাগজে পড়েছিলাম, এ গল্পের মধ্যে তার যে আভাস রয়েছে। সেই 'অরফ্যান হাউসই' তার জীবনের আশা ও আনন্দের বস্তু।

বলিতে বলিতে স্বামীর কথা বন্ধ হইয়া গেল, আরও কত কথা বলিবে বলিয়া কিন্তু কোন কথাই বলা হইল না।

* * *

সন্ধ্যার দিকে বিজন সেদিন বলিল—চল, এবা। পুজোয় দেওঘর কাটিয়ে আসি!

—চল আপত্তি কি!

* * *

দেওঘরে আসিয়া অবধি ইন্দুভূষণের মনে কোন শান্তি নাই। এখানে আসিয়া তাঁহার মন যেন আরও বেশী করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও নিজের মনকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না।

সেদিন বিজনকে বলিতেছিলেন—বিজন, এখানে থেকে আমায় নিয়ে চল, নিজেকে আমি শান্ত করতে পারছিনে। মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—

বিজন বলিল—দেখ, তোমাকে তো এত দুর্ব্বল কোন দিনই ভাবি নি, কত লোককে দেখি কত উপদেশ দিয়ে থাকে—আমাকেও তো কত সময় উচ্চ আদর্শের কথা বলেছ—আজ কি নিজেই সেখানে পরাজয় মানবে? তোমার মনে কি এ-কথাটা বড় ক'রে ভাবতে পার না, লীনা তোমার বোন, আপন ছোট বোন। আজ যদি তোমার কোন ছোট সহোদরা থাকত, তা'হলে কি করতে? পূর্ব্বের সব ভুলে গিয়ে আজ লীনাকে তোমার সহোদরা ব'লে মনে কর তোমার সব ভাবনার অবসান হবে—

—বিজন, যে কথাগুলো বলছ সে কথাগুলো শুনতে ভাল আর বলতেও বেশ ইচ্ছে করে; কিন্তু আমার অবস্থায় যদি পড়তে তা হলে ও কথাগুলো বলবার মতো সাহস থাকত না!...

কথা বলিতে বলিতে আজ-কাল ইন্দুভূষণ অন্যমনস্ক

হইয়া পড়েন, একটা কথা বলিতে বলিতে আর একটা কথা উত্তর দিয়া ফেলেন।

এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিজন মাঝে মাঝে ভাবিয়া থাকে যে, এখানে হয়তো আসিয়া ভাল হয় নাই। তাই বলিয়া সে নিরুৎসাহও হইয়া পড়িল না।

× × ×

এই কয়দিনের মধ্যে বিজন কুসুমার 'অরফ্যান্ হাউসের' কথা লোকের মুখে শুনিয়াছে—সকলের মুখেই সেই একই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছে—আর শুনিয়াছে কনকপ্রভার ত্যাগ ও আদর্শের কথা। শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তর আনন্দে ও পুলকে নাচিয়া উঠিল—কনকের কথা শুনিতে শুনিতে বিজনেরও কান্না পাইতেছিল।

কনক সাধারণ মেয়ে নয়, তার মধ্যে যে একটা অসাধারণ শক্তি আছে তার বলেই সে এই আদর্শ রাখিয়া যাইবে—একটা দিক যে তার শূন্য পড়িয়া রহিল সে দিকে তার কোন লক্ষ্য নাই।

শত দ্বন্দ্বের মধ্যেরও তার ঠাকুরদার মরণ-কালের বাণী সে ভোলে নাই। সব দুঃখ, সব বেদনা তার মূক হইয়া গিয়াছে তার সেবার কাছে। ভাবিতে ভাবিতে বিজনেরও বুক কাঁপিয়া উঠিল।

\+ + +

সেদিন বিজন ইন্দুভূষণকে লইয়া কুসুমার দিকে রওনা দিল....

দূর হইতে কুসুমার 'অরফ্যান হাউস' দেখা যাইতেছে। ইন্দুভূষণ দেখিতে লাগিলেন—সবই ঠিক সেই পূর্ব্বের মতো আছে। কেবল হাউসটি নূতন করিয়া তৈরী করা হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল ইন্দুভূষণ বলিয়া উঠিলেন—বিজন, আমায় ধর। আমি ভাবতে পারি নে, আমার পা কাঁপছে। এখানে এসে ভাল করিনি, ফিরে চল, ফিরে চল, হয়ত বন্যায় আমিও ভেসে যাব, এ-সাহস ভাল নয়......

বলিতে বলিতে ছোট্ট একখণ্ড পাথরের উপর ইন্দুভূষণ বসিয়া পড়িলেন। বিজন স্বামীর পার্শ্বেই বসিল, তারপর নিজের হাত দু'টি দিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ঠোঁটে চুম্বন আঁকিয়া দিতে দিতে বলিল—ভয় নেই, তোমারও ভয় নেই, তারও ভয় নেই......

'ভয় নেই' মুখে বলিলেও বিজনের অন্তর সে কথায় পূর্ণ সায় দিল না। আজ তাহার বড় সাধ হইয়াছে লীনাকে দেখিতে—যে এত করিয়া একদিন ভোগ করিয়াছিল, সে কি করিয়া সম্পূর্ণ সংযম ও সেবার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছে?—যে একদিন যৌবনের আনন্দ-সুখের স্পর্শ পাইয়াছে, সে কি করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা-ভার লইয়াছে?

স্বামী-স্ত্রী এইবার উঠিয়া আশ্রমের কাছে গেলেন—তখনও ছোট ছোট মেয়েদের খেলা শেষ হয় নাই। অন্য দুইটি মহিলা মেয়েদের খেলা দেখিতেছিলেন। বিজন ভাবিল হয়তো বা উহারই মধ্যের একজন লীনা হইবে কিন্তু ইন্দুভূষণের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, উহাদের মধ্যে কেহই নয়।

লীনা তাহার ঘরে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া তখন কত কথাই না ভাবিতেছিল। আজ কয়েক দিন হইতে তাহার মনের অবস্থা ভাল নয়—'হাউসেরও' অনেক কাজ তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেই বা কি করিবে? পূর্ব্বে মাঝে মাঝে দু'-একদিন 'হিস্টিরিয়া' রোগ দেখা যাইত, কিন্তু আজ-কাল প্রতিদিন চার-পাঁচবার তো হইয়াই থাকে আর সাত-আটবারও যে না হয় এমন নয়।

গেট-ম্যান আসিয়া লীনাকে সংবাদ দিয়া গেল যে, একটি ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা 'হাউস' দেখিতে আসিয়াছেন।

—এই সন্ধ্যে বেলা 'হাউস' দেখতে এসেছেন?

গেটম্যান উত্তরে বলিল যে, সে কথা তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বহুদূর হইতে তাঁহারা এই 'হাউস'

দেখিতে আসিয়াছেন। আর আজ যদি দেখা না হয় তাহা হইলে আর কোন দিনই দেখা তাঁহাদের হইবে না।

লীনা নিজেই বাহিরে আসিয়া ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাকে ভিতরে লইয়া গেল। একটি মহিলা বলিয়া উঠিলেন অবশ্য লীনাকেই লক্ষ্য করিয়া—দিদিমণি, তুমি বেশী হাঁটা-চলা ক'রো না। আমি এঁদের 'হাউস' দেখিয়ে দিই।—

বিজন লীনাকে বলিল—দেখুন, আপনাদের 'হাউস' দেখতে বহুদূর থেকে এসেছি, হ্যাঁ আপনার নামই তো কনকপ্রভা ?

লীনা বলিল—হ্যাঁ, আমার নামই মিস্ কনকপ্রভা রায়। নমস্কার, নমস্কার।

বিজন প্রতিনমস্কার জানাইল কিন্তু ইন্দুভূষণ নমস্কার জানাইতেও ভুলিয়া গেলেন।

এইবার বিজন বলিল—আপনাকে রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, আপনার কোন অসুখ করেছে না-কি ?

পাশের মহিলা বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ, ওঁর অসুখ।

তারপর লীনা নিজে কথা বলিতে বলিতে 'হাউসের' সমস্তই একটি একটি দেখাইল। ছোট ছোট দরিদ্র ও নিঃসহায়া মেয়েরা কখন কি খায়, কি ভাবে তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া যাইতে লাগিল।

হাউসের যখন সমস্ত দেখান শেষ হইয়াছে। লীনা বিজন ও তাহার স্বামীকে লইয়া নিজের ঘরে আসিল—ঘরে কয়েকখানি ছবি টাঙানো ছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে যিশু ও তাঁহার নীচে দুই খানি ছবি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইন্দুভূষণ ও বিজন চাহিয়া দেখিল—ছবি দুইখানির একখানি ইন্দুভূষণের আর অন্য খানি লীনার নিজের।

বিজন বলিয়া উঠিল—এটা বোধহয় আপনার নিজের ছবি ?

—হ্যাঁ, ওটা আমার নিজের ছবি, আর ওর পাশেই আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছবি—

বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া উঠিল। বিজন ও ইন্দুভূষণের তাহা চক্ষু এড়ায় নাই।

কিছুক্ষণ পরে 'ভিজিটারস্' বইখানা ইন্দুভূষণের দিকে আগাইয়া দিয়া লীনা বলিল—আপনারা আপনাদের অভিমতটুকু এটার ভিতর লিখে রেখে যান! আজকে অসময় এলেন, আর একদিন সময় ক'রে এলে খুব খুশী হব—

ইন্দুভূষণ কোন কথা না বলিয়া লিখিল—

'অরফ্যান-হাউস' দেখিয়া আনন্দে অন্তর ভারী হইয়াছে।

শ্রীইন্দুভূষণ বসু

লীনা হাতে খাতাখানি লইয়া পড়িল, পড়িয়া চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল…

ইন্দুভূষণ বলিলেন—বিজন, আমি তো বলেছিলাম কাজ নেই এসে।…আমি চললাম, তুমি এখানে থাক, কাল লোক পাঠিয়ে দেব, তার সঙ্গে যেও…

তারপর সে সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।…

লীনা যে আজ এই নূতন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে—ইহা তো নিত্যকার ঘটনা!

\+ \+ \+

রাত্রি ১০টায় তাহার জ্ঞান হইল কিন্তু চোখ মেলিতে সাহস করিল না। কপোলে একখানি স্নেহ ও দরদপূর্ণ কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করিয়া সে ভাবিতেছিল, তাহার জীবন আজ সার্থক হইয়াছে—মনে হইতেছিল ইন্দুভূষণই তাহার শিয়রে বসিয়া আজ নিঃসহায়া বান্ধবীর সেবা করিতেছেন—

ভাবিতে ভাবিতে তাহার অন্তর বিদ্রোহ হইয়া উঠিল, চক্ষু বুজিয়াই সে বলিতে লাগিল—আপনি এখান থেকে চ'লে যান, আপনার দু'টি পায় পড়ি। কে আপনাকে এখানে এসে আমার সেবায় বাধা দেবার পরামর্শ দিয়েছিল!—

বিজন বলিল—কি বলছ বোন? আমি তোমার শিয়রে, সে তো অনেকক্ষণ হয় চ'লে গেছে!

—চ'লে গেছে ?

লীনা চক্ষু মেলিয়া একটু লজ্জিত হইল, বলিল—ক্ষমা করবেন দিদি, নিজের মধ্যে পশু-মন বিদ্রোহ হ'য়ে ওঠে কি না!

বলিতে বলিতে আবার চক্ষু বুজিলেন।

\+ + +

শেষ রাত্রে লীনা খুব বেশী করিয়াই ডিলিরিয়াম বকিতেছে।

ডাক্তার ডাকা হইল।

তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গেলেন—অত্যধিক আনন্দে বা দুঃখে এ রোগের উৎপত্তি হয়েছে আর তারই জন্যে আর্টারি কেটে গেছে, বাঁচতে পারে কিন্তু 'ব্রেণ' ঠিক থাকবে না।

'হাউসে'র ভগ্নিরা ও বিজন বলিল—হোক্ ভাই, যে ভাবে হোক আপনি একে বাঁচান—

—বাঁচান কিম্বা না-বাঁচান তো আমার হাত নয়, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি—

× × ×

লীনা একটু সারিয়া উঠিলেও তাহার বাজে কথা বা বেশী কথা বলা একটুও কমিল না।—ডাক্তার সেদিন বলিয়া গেলেন—এর 'ব্রেণ' খারাপ হয়েছে, এখন প্রাণের ভয় তেমন নেই তবে কিছু দিন সময় লাগবে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে।

একটি দিনের পর একটি দিন করিয়া প্রায় দুইটি সপ্তাহ কাটিয়া গেল।...এখন লীনা প্রায় সময়ই সেই পর্ব্বতের 'কেভে'র ভিতর বসিয়া থাকে, কোন সময় শুইয়াও সময় কাটায়, রাত্রে আসিয়া নিজের শয্যায় আশ্রয় লয়। আজকাল কথাও খুব কম বলে—দেখিলে প্রথমে কেহ বলিতে পারে না যে, সে পাগল হইয়াছে।

\+ + +

বিজন কুসুমার 'অরফ্যান-হাউস' হইতে ফিরিয়া গিয়া ইন্দুভূষণকে অন্য কোন কথা বলে নাই—লীনা ভাল হইয়া উঠিয়াছে সেই কথাই জানাইয়া দিয়াছে।—

\+ + +

পূজার ছুটী শেষ হইয়া আসিয়াছে—নানা স্থানের লোক আবার ফিরিয়া নিজ নিজ কার্য্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে।

বিজন ও ইন্দুভূষণও যাওয়ার যোগাড় করিতেছেন।

সেদিন শুক্রবার—বহুলোক কুসুমার দিকে রওনা দিয়াছে।

সকলের মুখেই সেই একই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—সেবা দিয়েই অরফ্যানকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখে গেছেন কনকপ্রভা। সকলের মুখেই মিস্ কনকপ্রভার প্রশংসা।

মৃত্যুর আগের দিন কনকপ্রভার মাথা একটু বেশী খারাপ হইয়াছিল—সেদিন সন্ধ্যায় ইন্দুভূষণের সেই ফটো খানি লইয়া গিয়া কনকপ্রভা 'কেভটি'তে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। 'হাউসের' ভগ্নিরা মাঝে মাঝে চুপ করিয়া আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে, কারণ সে জানিতে পারিলে হয়তো আবার অনর্থ ঘটাইবে।...

ভোরের দিকে তাহাকে মৃত অবস্থায় সেই 'কেভটির' মধ্যে দেখিতে পাওয়া গেল—বুকে দুই হাত দিয়া জড়ান সেই ফটোখানি।——

× × ×

বিজন আজ জোর করিয়া স্বামীকে কুসুমার অরফ্যান হাউসের দিকে লইয়া গেল। নানা কথার মধ্যে ইন্দুভূষণকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেও ইন্দুভূষণ সব বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।...

'অরফ্যান-হাউসের' মধ্যেই কনকপ্রভার কবরের ব্যবস্থা হইতেছিল—সে স্থান লোকে লোকারণ্য। ফুলও আসিয়াছে স্তূপাকারে।

কনকের শব-দেহ একখানা চাদর দিয়া ঢাকা দেওয়া ছিল।

বিজন পাশের এক ভগ্নিকে বলিল—উপরের চাদরটা খুলে একবার আমাদের দেখাতে হবে।

চাদর খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল—কনকপ্রভা যেন এই মাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখখানিও হাসিতে ভরা।...

বিজন দেখিল ইন্দুভূষণ কাঁপিতেছে। সে কাছের আর এক ভগ্নীকে বলিল—কবর দেওয়া কখন হবে?

—যোগাড় ক'রে কবর দিতে আরও দু'ঘণ্টা সময় লাগবে।

—তবে ততক্ষণ তো আমরা অপেক্ষা করতে পারব না।

তারপর নিজের হাতের ফুলের মালা ও তোড়াগাছি স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—এটা ওঁর শবের উপর দাও, আর অপেক্ষা ক'রে কাজ নেই···

কথাগুলি বলিতে বলিতে কনকের গলাটা একটু কাঁপিয়া উঠিল।

ইন্দুভূষণ যন্ত্রচালিতের মতো ফুলের তোড়া ও মালা ফেলিয়া দিল শবের উপর—সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া জলের ধারা নামিল। আর তাহার এক ফোঁটা জল পড়িল কনকের গালের উপর—সেই জল-বিন্দু যেন মুক্তার মতো জ্বলিতে ছিল।

কে একজন বলিয়া উঠিল—মৃত্যুর সময় ভাইয়ের ফটো খানা জড়িয়ে ধ'রে মরেছে, ভাইকে খুব ভাল বাসত আর শ্রদ্ধা করত কি-না!

বিজন ও ইন্দুভূষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিল পাশের ছবিখানি ইন্দুভূষণেরই।

ইন্দুভূষণের সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল—চোখে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন। আজ যেন বন্যার মতো জলের ধারা তাঁহার চোখ দিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার আর সহ্য হইল না, এইবার হাতে রুমালখানি লইয়া একবার ভাল করিয়া চোখ-মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর জোরে বিজনের হাত টানিয়া ধরিয়া 'হাউসে'র গেট হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

\+ + +

দেওঘরে পৌঁছিতে তাঁদের সন্ধ্যা হইয়া গেল।······

বিজন স্বামীকে বলিল—রাত্রে কি খাবে?

—কিছু না বিজন, চল শুইগে, আজকে কিছু খেতে নেই—আজ যে লীনার চির-বিদায়ের দিন—

তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না।······

—:—

যাত্রী

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

থাক্ 'সাকিনা', শুধু রাখ—কি হবে আর ওতে?
রাখতে ধ'রে পারবেনা আর আমায় কোন মতে!
আবার ওকি? ছি-ছি-ছি! কান্না আসে কিসে?
আমার দেহ থাকবে তো গো এই মাটীতেই মিশে!

দিও তুমি ফুলের মালা রোজ প্রভাতে উঠে,—
আমার দেহে তোমার পরশ থাকবে সদাই ফুটে!
মাটীর বুকেই আমায় পাবে সকল কাজের মাঝে,
সন্ধ্যা প্রদীপ দিও তুমি আমার প্রতি সাঁঝে।

আমার হাতে তোমার ত' সুখ হয়নি কোন কালে,—
সেই খেদেতে আমার বুকে তুষের আগুন জ্বলে!
মোছ পানি—আমার পাশে একটু ব'স এসে'
গত দিনের কতই স্মৃতি আসছে মনে ভেসে!

কি রূপ ছিল তোমার 'সাকি' আজ হ'য়েছে কি!
কেমন করে মনের কাছে আজকে জবাব দি?
তোমার দুখের মূলেতে কে—জানিত সব আমি।
সেই বেদনা বইছি আমি আজকে দিবস যামী!

যাক্‌গে মুছে গত স্মৃতি—আমায় ক্ষমা কর,
আজকে 'সাকি' হাসি মুখে মিনতি মোর ধর!
সকল সময় 'খোদায়' তুমি ডেকো মনে মনে,
দরদ কিছু থাকবে না আর তোমার মনের কোণে!

আজকে তোমায় হে মোর প্রিয়া, এই মিনতি করি,—
ব'লতে কথা চোখের কোণে জল যে আসে ভরি!
কঠিন বড় তবু বলি,—কবর পাশে এস,—
জীবন শেষে আমায় তুমি এমনি ভাল বেসো!

অসভ্যদের চিকিৎসা-প্রণালী

শ্রীসুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে মাঝে মাঝে অসভ্য বলিয়া উল্লেখ করি। অসভ্য জাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায়—সত্যানুসন্ধানে নিস্পৃহতা। অথচ এই সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি না থাকিলে মানুষ কোনোদিকেই পূর্ণতা লাভ করে না—ফলে যাহারা সত্যান্বেষী তাহাদের অপেক্ষা যাহারা সত্যান্বেষী নহে তাহারা বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এই সত্যান্বেষণের অভাব অসভ্যদের প্রত্যেকটী আচার ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র এই কারণেই কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদের সমষ্টি মাত্র হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী ঐরূপ অদ্ভুতের কোঠায় পড়িয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদের কয়েকটী চিকিৎসা-প্রণালীর পরিচয় দিব।

অসভ্যদের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলার আগে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি ইহা বলা প্রয়োজন। অসভ্যেরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী কাজেই তাহাদের জীবন-যাত্রায় ভূত-প্রেতের প্রভাবই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে—আর ইহাই স্বাভাবিক। এই সব ভূতপ্রেত তুষ্ট থাকিলেই তাহাদের কোনও বিপদ আপদ ঘটেনা আর ইহারা অসন্তুষ্ট হইলেই মানুষ নানারূপে কষ্ট পায়—ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই ভূত প্রেতদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অসভ্যদের যে ধারণা তাহা আরও আশ্চর্য্যকর। ইহারা (উপাস্য ভূতপ্রেতাদি) মানুষের কোনও উপকার করে না—করিতে পারে না কিন্তু মানুষের সবরকম অনিষ্ট সাধন করিতে ইহারা বেশ পটু। থানবার্গ হটেন্টট্ অসভ্যদের উক্ত ধারণার কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই তাঁহার Pinkerton's Voyages গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। (Vol I I-P. 704). বেচুয়ানা জাতির উপাস্য দেব মুরিমো সর্ব্ববিধ অনিষ্টের জনক—সৌভাগ্যের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই। ভ্রমণকারী স্কুইয়েন ফার্থ বলেন—মধ্য আফ্রিকার 'বোঙ্গোরা' অনিষ্টকারী দেবতা ভিন্ন ইষ্টকারী দেবতা থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাসই করে না। বাংলা দেশের সাঁওতালগণও এইরূপ ধারণা পোষণ করে। তাহাদের এইরূপ ধারণা সম্বন্ধে কোনও কোনও সুধী ব্যক্তি বলেন—অনবরত প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ায় ইহাদের (সাঁওতালদের) মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহাদের অপেক্ষা প্রবল ব্যক্তি মাত্রেই উৎপীড়ক। এই ধারণার পোষক যাহারা তাহারা যে দেবতা তাহাদের অপেক্ষা বলবান্ এই নিমিত্ত দেবতাকে শত্রুভাবে দেখিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। এই সব কারণেই অসভ্যেরা রোগ হইলেই ভাবে—দেবতার কোপ হইয়াছে। সুতরাং রোগীর শুশ্রূষা না করিয়া তাহারা আগে করে দেবতার তুষ্টিবিধানের চেষ্টা অথবা দেবতার কোপদৃষ্টি দূরীকরণের প্রয়াস। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের মধ্যে কুপিত দেবতা বসিয়া থাকেন অতএব তাহাকে দূর করিলেই রোগ-শান্তি হইবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বা পূজা-অর্চ্চনা করিয়া কেহ বা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করে

পূজা অর্চ্চনা দ্বারা 'দেবতাকে' (প্রেতাত্মা-spirit) তুষ্ট করিয়া রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি নিউজিলণ্ড, বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও রোম প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসিগণ মাথা ধরিলে 'টোঙ্গা' দেবের ও পাকস্থলি-পীড়ায় 'টু-টাঙ্গাটা—কিনো'র পূজা করিত। বুকের যাবতীয় পীড়া উপশমের নিমিত্ত লোকে 'মাকো-টিকি'র পূজা দিত। পায়ের রোগ আরাম করিবার জন্য পূজা পাইতেন—টিটি-হাই। কাশাক্রান্ত-ব্যক্তির 'রঙ্গমমী' ও 'টুপারিটাপুর' শরণ লওয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। প্রসবকালীন বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা 'কোরো-কিও'র পূজা করিত। প্রাচীন রোমকগণ জ্বর-শান্তির জন্য জ্বর-দেবীর পূজা দিত।

গালাগালি করিয়া 'দেবতা' তথা রোগের মূলকারণ দূর করিবার ব্যবস্থা নিউজিলণ্ডের একদল অসভ্যের মধ্যে দেখা যাইত। তাহারা বিশ্বাস করিত—'আটুয়া' দেব যাহার উপরে ক্রুদ্ধ হন্ টীকৃটীকি রূপধারণ করিয়া তাহার উদরে প্রবেশ করেন ও ক্রমে ক্রমে তাহার জীবনীশক্তি হরণ করিয়া নেন। এই দেবতাকে তাড়াইবার জন্য তাহারা নানারূপ যাদুবিদ্যার সাহায্য লয় এবং ভীষণভাবে গালাগালি করিতে থাকে। আরবদেশেও নাকি রোগ সরাইবার জন্য ভগবানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা হইত। The origin of civilisation পুস্তকের ২৩৫ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে—এক বৃদ্ধা আরব-রমণী দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল। সে উহা হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য এইরূপে প্রার্থনা করিত—"হে আল্লা! তোমার দাঁতও যেন আমার দাঁতের মত হয়। হে আল্লা! তোমার দাঁতের মাড়ীও যেন আমার দাঁতের মাড়ীর মত ব্যথা করে।" ক্যাম্বোডিয়ার ষ্টীয়েন্ জাতীয় লোকেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হইতে ভূতাপসারণের জন্য রোগীর চতুষ্পার্শ্বে বিষম গালাগালি ও হল্লা করিত। "দেবতা"র প্রতি অসভ্যদের এই মনোভাব হয়ত 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

রোগ তাড়াইবার প্রধান উপায়—মন্ত্রশক্তি। অসভ্যেরা লিখিত কাগজ বা অন্য-কোনও দ্রব্যমাত্রকেই মন্ত্রঃপূত বলিয়া মনে করে। ক্যাট্‌লিন্ সাহেব তাঁহার North American Indians (Vol I I pp 92) পুস্তকে এই ধারণার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন। ক্যাট্‌লীন কয়েকদিন উত্তর আমেরিকার 'মিনাটাররীস' জাতির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে থাকিবার কালে মাঝে মাঝে সময় কাটাইবার জন্য New york Commercial Advertiser পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। ইহা দেখিয়া মিনাটাররীস জাতীয় অসভ্যেরা বড়ই বিস্মিত হইত। অবশেষে বহু চিন্তার পর তাহারা ঠিক করিল—উহা নিশ্চয়ই চক্ষুরোগ প্রতিষেধক মন্ত্রঃপূত কাগজ!

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণ রোগমুক্ত হইবার জন্য পুরোহিত বা যাদুকরের শরণ লয়। যাদুকর একখণ্ড কাঠের উপর প্রার্থনামন্ত্র লিখিয়া কাঠখানি ধৌত করেন পরে সেই কাঠ-ধোয়া জল রোগীকে খাওয়ান হয়—ইহাই তাহাদিগের সর্ব্বরোগ প্রতিষেধক! এ্যাটকিনসন্ বলেন যে উক্তরূপ চিকিৎসা-প্রণালী কিরঘিজ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ম্যাসন্ তাঁহার 'Travels in Beluchistan, Afganistan etc গ্রন্থে আফগানিস্থানে প্রচলিত অনুরূপ রোগাপসারণ-প্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন (Vol. I pp 74, 90, 312; Vol. II-pp, 127, 302). লর্ড এ্যাভবেরী বলেন যে তিনি স্যার এ, ল্যায়াল এর মুখে শুনিয়াছেন ভারতবর্ষের অধিবাসীগণও রোগমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে অনুরূপ চিকিৎসা-প্রণালীর অশ্রায় নিত। তিনি আরও বলেন যে কালীতে মন্ত্র লিখিত হইত সেই কালীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয়েরা ক্রোটন্ অয়েল্ মিশ্রিত করিয়া দিত। এইরূপ করিবার কারণ কি তাহা লর্ড এ্যাভবেরী বা স্যার ল্যায়াল বলেন নাই। (আমাদের দেশের 'জল-পড়া' 'তেল-পড়া' কি ইহারই নতুন সংস্করণ?)

রোগাপসারণের আরেকটী উপায় ভূত চালান দেওয়া। অসভ্যদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাম অন্য একজনকে দেওয়া হয়। ইহার ফলে অসুস্থ-ব্যক্তির নামধারী ব্যক্তির নিকট অসুস্থব্যক্তির রোগ চালান যায়। ইহাতে প্রথোমোক্ত অসুস্থ ব্যক্তি নিরাময় হয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি (যাহার নিকট রোগ চালান দেওয়া হয়) রোগাক্রান্ত হয়। ডি, হেল তাঁহার Steppes of the Caspian sea' গ্রন্থের ২৫৬পৃষ্ঠায় এই প্রথার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর ভারতে বসন্ত রোগ চালান দিয়া রোগীকে বাঁচান হইত। আক্রান্ত ব্যক্তির গাত্র হইতে বসন্তগুটিকার চর্ম্ম লইয়া তাহা একটী ফুলের তোড়ায় বাঁধিয়া পথে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কোনও পথচারী ব্যক্তি ঐ ফুল ছুঁইলেই রোগীর রোগ তাহার নিকট চালান যাইত এবং রোগী রোগমুক্ত হইত। (এস্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিত প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতই রোগমুক্তি হইত কিনা সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান আছি।) ম্যাডাগাস্কারে অসভ্যগণ রোগ চালান দিবার জন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে।

কোন মহিলা রোগীর নিকট গিয়া নাচিতে থাকে এবং অন্য একজন রোগীর পিছনে থাকিয়া শূন্যে দোদুল্যমান লৌহপাত্রের উপরে কুঠার দিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইরূপ করিলে নাকি ঐ ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া 'অগত্র' অর্থাৎ প্রেতাত্মা রোগীকে ছাড়িয়া নর্ত্তকীর উপর ভর করিবে।

ফাদার ডব্রিৎস্‌হফার এ্যাবিপোনীয় (প্যারাগুয়ে) চিকিৎসা প্রণালীর একটী চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। প্যারাগুয়ে এবং ব্রেজিলের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে যদি কোনও অসভ্য দেহের কোনও স্থানে রোগ হওয়ায় ভুগিতে থাকে তাহা হইলে এ্যাবিপোনীয় চিকিৎসক আক্রান্ত স্থান চুষিয়া ও ফুঁ দিয়া রোগ ভাল করে। অনেক সময় আহত স্থান চুষিয়া তাহারা খারাপ রক্ত বাহির করে। (আমাদের দেশের বেদিনীগণ যাহারা বাত ভাল করে দাঁতের পোকা ভাল করে বলিয়া চেঁচায় তাহারা বাত ভাল করিবার সময় বাতক্রান্ত স্থান চুষিয়া বা 'সিঙ্গা দিয়া' কতখানি রক্ত বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে অনেক সময় সাময়িক শান্তি দেয়। ইহাদের পদ্ধতি ফাদার ডব্রিৎস্‌হফার বর্ণিত এ্যাবিপোনিয় চিকিৎসা প্রণালীর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ নহে কি?) ব্যানক্রফট সাহেব মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ঐরূপ চিকিৎসা প্রণালীর কথা বলিয়াছেন। ফাদার বেগার্টের প্রদত্ত বর্ণানুসারে দেখা যায় যে কালিফোর্ণিয়াতেও অনুরূপ চিকিৎসা-প্রণালী বর্ত্তমান রহিয়াছে। হাডসন্ বে'র ইণ্ডিয়ানরাও ঐ উপায়ে রোগ ভাল করিত। ক্র্যান্টজ এস্কিমোদের মধ্যে ও চ্যাপম্যান দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐরূপ প্রণালী দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ল্যাপ-ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও আহত স্থান চুষিয়া এবং ফুঁ দিয়া নিরাময় করিবার পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে।

সর্ব্ববিধ রোগের জন্য একই ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি এ্যাবিপোনিয় ও এস্কিমোদের মধ্যে দেখা যায়। ইহার অপেক্ষাও কৌতুকজনক বিষয়—একের অসুখে অপরের চিকিৎসিত হইবার প্রথা। বাংলাদেশে কুকীদের মধ্যে রোগীর বদলে চিকিৎসকই প্রতিষেধক গ্রহণ করে (Dalton—Des. Ethn. of Bengal p. 46) সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে যে হাস্যকর প্রথা অবলম্বিত হয় তাহা এখানে বলিতেছি। সন্তান প্রসূত হইলে প্রসূতীর বদলে তাহারা সন্তানের পিতাকেই পরিচর্য্যা করিতে থাকে। যখনই একজন রমণী সন্তান প্রসব করে তৎক্ষণাৎ সন্তানের পিতাকে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। পাছে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে এই ভয়ে তাহাকে লেপ কাঁথা যাহা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা দিয়াই ঢাকিয়া রাখা হয়। কয়েকদিনের জন্য তাহাকে উপবাস করিতে হয় এবং গোপনে থাকিতে হয়—এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যেন পিতাই সন্তানকে প্রসব করিল।

এই সকল অদ্ভুত অদ্ভুত উপায়ে চিকিৎসিত হইয়াও অসভ্যেরা মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারে না। 'মরণ' সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি তাহা এখন বিবৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অসভ্যেরা মৃত্যু হইবার প্রধানতঃ তিনটি কারণে বিশ্বাস করে—১। শত্রুকর্ত্তৃক যাদুবিদ্যা প্রয়োগ ২। জল দেবতার রোষ ৩। আরণ্য প্রেতাত্মার 'ভর' হওয়া। ইহারা মৃত্যুকে একটা বিশেষ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে করে। 'মৃত্যু' তাহাদের নিকট স্বাভাবিক নহে—অস্বাভাবিক। তাহাদের কোনও মতেই বিশ্বাস করান যাইবে না যে মানুষ মাত্রেই মরিবে। জরাদেহে পীড়ায় মৃত্যু হইলে ইহারা বলে—যাদু-বিদ্যা প্রয়োগের ফলেই ঐরূপ হইয়াছে। এই ধারণা অষ্ট্রেলীয়গণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কোন উপায়ে মৃত্যু হইতে পারে ইহা তাহারা আদ-পেই বিশ্বাস করে না। বেচুয়ানাগণ, সাইবেরিয়ার 'কাল-মার্ক', কিরঘিজ এবং বাস্‌কিরগণ ও ম্যাডাগাস্কারের 'কাবিব' জাতীয় অসভ্যেরা মৃত্যুর তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করে—১। অনশন ২। আক্রমণ ৩। ইন্দ্রজাল। ভারত-বর্ষের 'আরব' 'কাচারী' এবং 'কোল' জাতীয় অসভ্যেরা উক্ত ধারণার পোষক। পূর্ব্বোক্ত দুইটী কারণ ব্যতীত কেহ যদি নব্বই বছরেও মারা যায়—তাহা হইলে তাহারা ঐ মৃত্যুর মূলে ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব তিলমাত্র সন্দেহ করে না। তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য

অনেকে মৃতব্যক্তির রক্ত লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেয়। এ্যাবিপোনীয়দের মধ্যে যদি কেহ ভীষণ ভাবে আহত হইয়া বা হাড় ভাঙিয়া অথবা অতি বার্দ্ধক্যবশতঃ মরিয়া যায়—তাহা হইলেও তাহার প্রতিবেশীরা উক্ত কারণগুলি অস্বীকার করিয়া যাদুকরের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ওয়ালেস্ আমাজনদিগকে এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী বলিয়া বলিয়াছেন। অন্যান্য অসভ্যজাতির মধ্যেও এই বিশ্বাসই বলবতী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী ব্যতীত বিশেষ বিশেষ স্থানের অসভ্যদের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী

শ্রীসৌরেশ চন্দ্র চৌধুরী

তীর্থ সেরা শ্বশুর বাড়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম,
ফুলের সেরা কমলকলি, ফলের সেরা আম।
খলের সেরা তুল্যমূল্য উই ও ইঁদুর দুই,
গাছের সেরা বটবৃক্ষ, মাছের সেরা রুই।
দুরদৃষ্ট সেরা যেমন বাড়া ভাতে বালি,
আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী।

পেশার সেরা পাণ্ডাগিরি, নেশার সেরা গাঁজা,
নারীর সেরা প্রিয়তমা, নরের সেরা রাজা।
পাওয়ার সেরা অকাপাওয়া, খাওয়ার সেরা 'খাবি,'
যোবার সেরা দত্তধনের স্বত্বে রাখা দাবী।
মেঘের সেরা শনি যেমন, দেবীর সেরা কালী,
আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী।

অরুচিত্তের সেরা যেমন টুক্‌টুকে গাল কাটা,
অকাজ সেরা ঘরের খেয়ে পরের বেগার খাটা।
ঘরের সেরা দখিন্ দ্বারী, বাড়ীর সেরা পাকা,
জলের সেরা অশ্রুবারি, বলের সেরা টাকা।
সুশ্রী সেরা আপন ছেলে, বিশ্রী সেরা তালি,
আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী।

নারী-স্বাধীনতার সেরা বাপের বাড়ির ঝি,
ভোগের সেরা গরম ভাতে উপাদেয় ঘি।
রোগের সেরা গোদের উপর বিষ্ঢালা বিষ্ ফোড়া,
বুদ্ধিদেরা ভাদর মাসে নূতন বাঁশের কোঁড়া।
দানের সেরা প্রিয়ার পায়ে পরাণ দে'য়া ডালি,
আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী।

বাদ্যযন্ত্র মাঝে সেরা বেউর বাঁশের বাঁশী,
বিভীষিকার সেরা যেমন কাটা ঠোঁটে হাসি।
মেলার সেরা কুম্ভমেলা, খেলার সেরা পাশা,
সুখের সেরা ভবিষ্যতের উচ্চতম আশা।
দায়ের সেরা দগ্ধউদর, ঘায়ের সেরা নালি,
আত্মীয় স্বজনের মাঝে সবার সেরা শালী।

দান

—গল্প—　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রীকামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[পুরুষ সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু অপরে নিজ সন্তানের জনক এ আঘাত তাহার কতখানি বাজে পাশ্চাত্যের গল্প সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা তাহারই যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন বর্ত্তমান লেখক বাংলায় তাহারই রূপ দিয়াছেন।]

মশিয়ে লেমেনিয়ারের স্ত্রী মারা গেল শুধু একটি ছোট ছেলে রেখে। সে তার স্ত্রীকে ভালবাস্ত পাগলের মত—তাই সে আর বিয়ে করে নি।

তাদের বিয়ের ইতিহাস খুবই সাধারণ।

এক দরিদ্র প্রতিবেশীর মেয়েকে সে ভালবেসে ফেলে আর তার ফলে তাকে করে বিয়ে। সেও তাকে ভালবাস্ত খুব—অন্তত লেমেনিয়ার তাই ভাবত। খাবার সময় লেমেনিয়ার করত হাজার ভুল—তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে প্লেটের ওপর ঢেলে ফেল্‌ত মদ আর নূতন রাখবার পাত্রে ঢালত জল। তারপর সে হেসে উঠত এক প্রাণ-খোলা হাসি তার ভুল আবিষ্কার করে'। তার হাত ধরে আবেগময় কণ্ঠে সে বলত, জেন্...জেন্... আমার ছোট্ট জেন্।—

দীর্ঘ পাঁচ বছর তাদের কোনও ছেলে মেয়ে হয় নি। তারপর হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করল ভাবী শিশুর আগমনী বার্ত্তাকে। তারা দু'জনেই খুব খুসী হ'ল। সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে একমুহূর্ত্তও বাইরে থাকৃত না, সব সময়েতেই তার সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে রাখত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এক যুবকের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নাম তার ডুরেটুর—সে জিন্‌কে অতি ছোট বেলা থেকে দেখে এসেচে। জিনের জন্যে মাঝে মাঝে সে ফুলের তোড়া কিনে আন্‌তো, কখনও বা তাকে নিয়ে যেত থিয়েটারে।

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এক এক সময় লেমেনিয়ার বল্‌ত, তোমার মত স্ত্রী আর ডুরেটুরের মত বন্ধু পেলে এই পৃথিবীতে যে কেউই সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে।

প্রসবের সময় জিন্ মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেও হ'য়ে পড়ল মৃতের মতই। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুকে পেয়ে সে যেন বেঁচে থাকবার একটা অবলম্বন পেল খুঁজে।

শিশুটিকে সে দেখত আর ভাবত: এ' ত আমারই স্ত্রীর রক্ত-মাংস থেকে পেয়েছে দেহ, তার জীবন থেকেই ত' পেয়েছে এ বক্ষস্পন্দন! শিশুকে প্রাণপণে বুকের ভেতর চেপে ধরে সে করত চুম্বন—সে যেন মেটাতে চাইত তার হৃদয়ের এক অতৃপ্ত ক্ষুধাকে, এক ব্যাকুল বাসনাকে!

এ শিশুটিও শেষে তার প্রাণের সমস্ত ভালবাসাটুকুকে নিঃশেষে পান করে নিল। সে তাকে দোলায় চাপিয়ে সারাদিন দোল্ দিত আর অস্পষ্ট স্বরে তার সঙ্গে অর্থহীন প্রলাপ বকে চল্‌ত। তারপর শিশুটি যখন ঘুমিয়ে পড়ত সে নিঃশব্দে তার মাথায় ওপর ঝরিয়ে দিত নিজের নয়নাশ্রু।

ছেলেটি ক্রমশঃ বড় হয়ে চল্‌ল। পিতা তার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও চোখের আড়াল কর্‌ত না। মশিয়ে ডুরেটুরও তাকে আদর কর্‌ত—খেলনা কিনে এনে দিত। শুধু তাকে দেখতে পার্‌ত না লেমেনিয়রের বৃদ্ধা ঝি। ঐ দুই লোকের বাড়াবাড়ি দেখে সে বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাত।

ক্রমশঃ সে ছেলেটি ন' বছরের হয়ে উঠল। আদর পেয়ে পেয়ে তার স্বভাব হ'য়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল, প্রকৃতি হ'ল তার বদ্‌রাগী। লেখাপড়ার ধার দিয়েও সে চল্‌ত না, যা খুসী তাইই কর্‌ত।

বৃদ্ধা ঝি অতিমাত্রায় চটে উঠত—মাঝে মাঝে তার সহ্যের বাঁধ আস্‌ত ভেঙ্গে। কিন্তু ভয়েই হোক্ কি অন্য কোন কারণেই হোক্ সে বিশেষ কিছু বল্‌ত না।

অত্যাচার অনাচার করায় সেই ছেলেটির রক্তশূন্য-

তার মত হ'ল। ডাক্তার যে সমস্ত পথ্য তাকে দিতে বলেছিল সে সব তার রুচত না।

একদিন খাবার টেবিলেতে পিতাপুত্রে যখন খেতে বসেছে বৃদ্ধা ঝি তখন নিজে হাতে মাংসের জুস তৈরি করে এনে জোর করে ছেলেটিকে চামচের সাহায্যে খাইয়ে দিতে লাগল। সে রেগে জলে উঠল, জুস্ গলায় লেগে যাওয়ায় বিষম খেয়ে কাস্‌তে লাগল, বমি করতে লাগল। চোখমুখ তার হ'য়ে উঠল রক্তবর্ণ, যেন দম আটকিয়ে সে এবার যাবে মরে।

লেমেনিয়ার প্রথমটায় হয়ে পড়েছিল বিহ্বল—যেন কিছুই সে বুঝতে পারছে না—যেন সে দেখচে একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু খানিক বাদেই প্রকৃতিস্থ হ'য়ে সে উঠে দাঁড়াল। রাগে আপাদ-মস্তক তার কাঁপতে লাগল থর-থর করে। এক লাফে ছুটে গিয়ে সে বৃদ্ধার গলাটা চেপে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল, বেরোও বেরোও—বর্ব্বর জানোয়ার কোথাকার।

বৃদ্ধার মুখ চোখও রাগে অপমানে হয়ে উঠল লাল। সেও চেঁচিয়ে বলে চল্‌ল, ওঃ—তুমি এতদূর খারাপ ব্যবহার আমার সঙ্গে করলে। কিন্তু কার জন্যে...ওই অপদার্থটার জন্যে, যে কস্মিনকালেও তোমার নিজের সন্তান নয়। না না ও কখনই তোমার নয়, তুমি ছাড়া এ কথা পাড়ার আর কে না জানে। আর তুমিই বা জান্‌বে না কেন—তোমার কি চোখ নেই? দেখচ না ...দেখ, চোখ মেলে একবার দেখ।

লেমেনিয়ার ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। রাগে তার ইচ্ছে করতে লাগল বৃদ্ধাকে দু'হাতের ভেতর ধরে নিষ্পেষিত করে দেয় আর লুপ্ত করে দেয় তার সত্তাকে। কিন্তু বৃদ্ধা যথেষ্ট বলশালী—যদিও তার বয়েস হয়েচে অনেক। সে লেমেনিয়ারের হাতের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে টেবিলের ওপাশে দাঁড়াল, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করে উঠল, দেখ দেখ—ভাল করে চোখ মেলে দেখ ও তোমার প্রিয় বন্ধুর জীবন্ত প্রতিলিপি কি না।

বৃদ্ধা দরজাটা খুলে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে ফিরে এল। দেখল ছেলেটা এক গাদা কেক্ খেয়ে চাম্‌চে দিয়ে নির্ব্বিবাদে জ্যামের পাত্রটা খালি করে চলেছে।

তার পিতাকে সে দেখতে পেল না।

বৃদ্ধা ছেলেটির হাত-মুখ ধুইয়ে তাকে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল, খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেল্‌ল, এলোমেলো জিনিষপত্র যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিল। সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

তার প্রভুর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সে চাবি লাগাবার ফুটোটার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগল। দেখল, লেমে-নিয়ার বসে কি যেন লিখে চলেচে তন্ময় হয়ে। তার প্রভুর খাবার ঠিক করে, চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

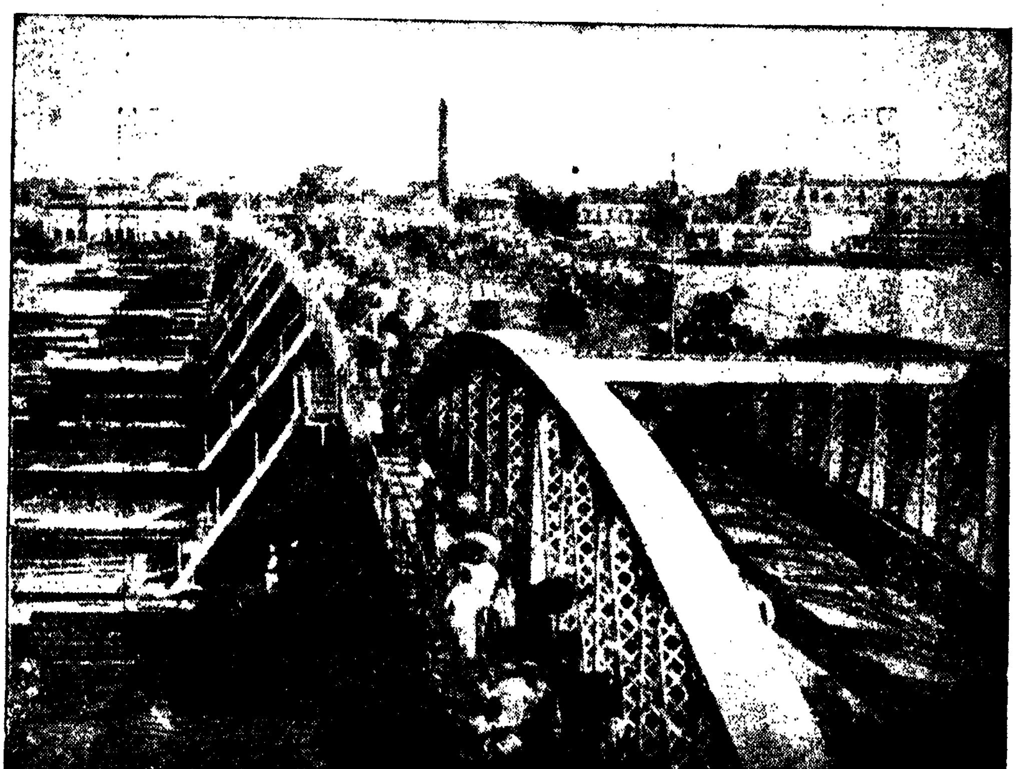
শ্রান্ত হয়ে পড়ায় চেয়ারেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল, আর তার ঘুম ভাঙ্গল পরের দিন সকালে। সে কফি তৈরি করল প্রায় আটটার সময়।

কিন্তু সময় গড়িয়ে চল্‌ল, ঘড়ির কাঁটাটাও প্রায় দশটার ঘরে এসে পড়ল। পেণ্ডুলামটা অস্থির হ'য়ে এদিক—ওদিক্ করতে লাগল। কিন্তু তবুও সে তার প্রভুর পেল না দেখা।

ট্রেতে খাবার ও কফি সাজিয়ে সে লেমেনিয়ারের ঘরের দরজার সামনে এসে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজায় কান দিয়েও সে কোন শব্দ শুন্‌তে পেল না। সে দরজায় টোকা দিল—কিন্তু কোনও উত্তর এল না। সাহসে ভর দিয়ে সে ভেজান দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে চলে এল—তারপর এক ভীতিজনক চীৎকার করে সে চমকে উঠল, হাত থেকে তার সশব্দে প্রাতঃ-ভোজনের 'ট্রে'টা গেল পড়ে।

মশিয়ে লেমেনিয়ারের শরীরটা ওপর থেকে ঝুলচে—গলায় তার একটা শক্ত দড়ির ফাঁস চেপে বসে গিয়েচে, চোখ দু'টো যেন নির্ব্বাক হ'য়ে করে উঠচে আর্ত্তনাদ।

ডাক্তার আবিষ্কার করল যে তার মৃত্যু হয়েচে মাঝ রাতে। মশিয়ে ডুরেট্রের নামে একটা চিঠি টেবিলের উপর পড়েছিল তার ওপর শুধু এই একটা লাইন লেখা ছিল: আমি ছোট ছেলেটিকে তোমার হাতে দিলাম সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই।



হাওড়ার ভাসমান সেতু
(ইহার পরিবর্ত্তে একটী স্থায়ী সেতু নির্ম্মানের ব্যবস্থা হইতেছে)



কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যালয়



মেঘের সৌন্দর্য্য



বর্ষার দিনে কলিকাতার একটী রাজপথ



একজন অকালী শিখ

রাশিয়ান ছোট গল্প

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র

ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত হইলেও রাশিয়ানগণ অনেক অংশেই প্রাচ্য ভাবাপন্ন। তাহাদের আচার ব্যবহার ইউরোপীয়দের অনুকরণে গঠিত হইলেও, প্রাচ্যের সহিতই তাহাদের আত্মার যোগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজার কড়া শাসনে রাশিয়ানগণ প্রতিপালিত হইত। জার (czar) ভগবানের স্থায় সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তাহারা প্রত্যেক মানবকেই ভগবানের অংশ বলিয়া পূজা করিতে জানিত। অজ্ঞতার তিমির অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া যতদিন না পর্য্যন্ত তাহারা জ্ঞানালোক দেখিতে পাইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আত্ম-বিকাশের উন্মেষ ঘটাইতে পারে নাই। রাশিয়ান সাহিত্যের জন্ম প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে অত্যন্ত আধুনিক অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে। অত্যন্ত আধুনিক হইলেও ইহার গতি, উন্মেষ ও বিকাশ খুবই দ্রুত হইয়া ইহা এক মহাসাহিত্যে পরিগণিত হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি ইউরোপীয় সাহিত্যে সনাতনীভাব ধারার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যে নূতন তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয় এবং যাহার ভাব গৌরব আজ সুইডেন নরওয়ে ও জার্ম্মানীর নব-সাহিত্য গৌরবময় ও উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহার মূল কারণই রাশিয়ান সাহিত্যের উৎকট আত্ম তত্ত্ব ও মহামানব পূজা করিবার একান্ত আগ্রহ।

রাশিয়ানগণ ভাবে যে প্রত্যেক মানবই স্বতন্ত্র বস্তু এবং তাহার ইতিহাসই একটি ছোট গল্প। ইতিহাস অনেকটা এই ছোট গল্পের সমষ্টি মাত্র, উহা Serial বিশেষ উহার শেষ নাই। সুতরাং জাতীয় ইতিহাসে কোন প্রকার আর্ট থাকিতে পারে না। ছোট গল্পে যখন সাহিত্যের কলা কুশলতা নিয়োগ করা যায় তখনই উহা অপূর্ব্ব মধুর হইয়া উঠে, এবং তখন উহাকে যে কোন শ্রেণীর আর্টের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমগ্র রাশিয়ান সাহিত্যকে তিন অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়। পুস্কিন, গগোলি, ডস্টোভেস্কি, টুরগেনিভ প্রভৃতি মনিষীগণকে রাশিয়ান Classical period এ ফেলা যাইতে পারে। কেননা তাঁহাদের সাহিত্যে নূতনত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিলেও ইউরোপের Classical influence ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। টলষ্টয়, চিকোভ কুপরীন কে মধ্যযুগে এবং রোমানফ, পিলনিয়াক প্রভৃতিকে বর্ত্তমান যুগে ফেলিতে পারা যায়। লেখকগণের ভাবধারার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য আমরা কয়েকটি গল্পের সারাংশ প্রদান করিতেছি।

Alexander Pushkin—গল্প (Pistol shot)

নারী গর্ভ-জাত ও নারী স্নেহে পরিপুষ্ট পুরুষ তখনই কঠিন প্রকৃতির ও বিশ্ব-বিদ্বেষী হয় যখন সে নারী সংসর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বাস করে। কোন একটি সৈনিক যৌবনে এক রমণীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে গোপনে হৃদয় দান করিয়া ফেলে। রমণী কিন্তু এই সংবাদ জানিত না এবং যথাসময়ে একজন সম্ভ্রান্ত রাজ বংশীয় এক সুদর্শন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহের কথা বার্ত্তা হয়। সৈনিক যুবক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাহার কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া পল্লী বাসে ফিরিয়া সুরা জুয়াখেলায় আত্মসমর্পণ করে। খেয়ালে নিবিষ্ট থাকিয়া তাহার হৃদয় কঠোর ও মমতাহীন হইয়া উঠিতে থাকে। কয়েক বৎসর গত হইবার পর সে একদিন হঠাৎ খবর পায় যে তাহার প্রিয়তমার সহিত সেই সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকটির বিবাহ-দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। সৈনিক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া

পূর্ব্বোক্ত অভিজাতের পল্লীবাসে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন উহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে তাহারা তাহাদের মধুমাস যাপন করিতেছিল। সৈনিক তাহাকে তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে কে প্রথম গুলি করিবে তাহার জন্য 'টস্' করিলে অভিজাতেরই নাম উঠে। অভিজাত একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হইলেও তাহার হাত কাঁপিয়া যাওয়ায় গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তাহার পর সৈনিক অভিজাতকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক উত্তোলন করিলে পূর্ব্বোক্ত রমণী আসিয়া পড়ে। তাহাকে

উভয়েই বলে যে তাহারা খেলা করিতেছে এবং এই বলিয়া সরাইয়া দেওয়া হয়। সৈনিকের কিন্তু ল্যাবণ্যের বিকাশ দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে কাঠিন্যের পরিবর্ত্তে কোমলতা দেখা যায়। সে আর বন্দুকের গুলি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া না ছুড়িয়া উহা এক অয়েল পেটিং এ বিদ্ধ করিয়া স্বেচ্ছাকৃত চির নির্ব্বাসনে চলিয়া যায়। প্রিয়তমার জন্য আত্ম-বলিদানে ইহা একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য।

Nicholas Gogal—গল্প The cloak. ইহা একটী সনাতনী গল্প। কিন্তু ইহার মধ্যে Dynamic form ও যথেষ্ট আত্ম গোপন করিয়া আছে।

রাশিয়ার বিস্তৃত রাজ-সরকারে একজন লোক ছিল —লোকের লেখা কপি করাই তাহার কাজ ছিল এবং এই কাজে সে স্বেচ্ছায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল। কখনও পদোন্নতির কথা উঠিলে যাহাতে তাহা না হয় তাহার জন্যই সে চেষ্টা করিত, তাহার সনাতনী হৃদয় কোনরূপ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার একটী আফিস যাইবার পোষাক ছিল, উহা সে যেদিন কাজে প্রথম ভর্ত্তি হয় সেই হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেছে তাহার সনাতনী হৃদয়, কিন্তু উক্ত পোষাকটী পরিবর্ত্তন করিতে চাহে নাই ও কতকটা তাহার সামর্থ্যেও কুলায় নাই। চল্লিশ বৎসর ক্রমাগত ব্যবহারে উহা অন্তসার শূন্য হইয়া আসিলে শীতকালে উহা ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে। রাজ কর্ম্মচারী এইজন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া একজন দর্জ্জির নিকট উহা মেরামত করিবার জন্য লইয়া যায়। নূতনের বার্ত্তাবহ দর্জ্জি তাহাকে বলে যে এই পোষাক মেরামতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সুতরাং ৪০ টী রুবল খরচা করিয়া একটী নূতন তৈয়ারী করানই উচিত। রাজপুরুষ এই সংবাদে অত্যন্ত ভীত ও মর্ম্মাহত হয়। তারপর শীতের দারুণ অত্যাচারে তাহার মনে পড়ে যে ২০টী রুবল একটী বাক্সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে এবং আর ২০ টী রুবলের জন্য সে তাহার সকল প্রকার খরচ কমাইয়া দিয়া চলিতে লাগিল। সে যখন এইরূপ কষ্ট সহ্য করিত তখন নূতন পোষাকের মোহ তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিত। যাহা হউক, অবশেষে তাহার বক্রী ২০টী রুবোল জমিলে, সে একটী নূতন পোষাক তৈয়ারী করাইয়া লয়। অফিসে এই পোষাক পরিধান করিয়া গেলে, সকলেই এই সনাতনীর ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ পাইয়া রাজপুরুষ পোষাকটী পরিধান করিয়া তথায় যাইবার আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া তাহাতে রাজী হয়। গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসিবার সময়ে দুই একজন গুণ্ডা তাহাকে মারপিট করিয়া পোষাকটী কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া যায়। এই ক্ষতিতে রাজপুরুষ ভাঙ্গিয়া পড়ে। দুই একবার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দারুণ শোকে তাহাকে দেহত্যাগ করিতে হয়। গল্পটী সুন্দর। পুরাতনী কখনই নূতনের অভিযান সহ্য করিতে পারে না এবং পুরাতনী ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে উহা কিম্বদন্তীতে পরিণত হয় এইজন্য লেখক বলিয়াছেন যে রাজপুরুষের আত্মা যেখানে পোষাকটী লুট হইয়াছিল সেইখানে প্রত্যহ রাত্রে পথিকের পোষাক ধরিয়া টানা টানি করিত। সনাতনী লুপ্ত হয় না, উহার প্রেতাত্মা চীৎকার করে। এইজন্যই আমরা পুরাতন গল্পে প্রেতযোনী পড়ো বাড়ীতে বাস করে বলিয়া শুনিতে পাই।

Fedor Dostoievsky—গল্প—The Grand Inquisitor (দি গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটর)

এই গল্পটীকে সুবর্ণমান দিয়া ওজন করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগের সমস্ত ভাবধারার সহিত সনাতনী ভাবধারার বিদ্রোহ সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

মধ্যযুগে স্পেনে পাদ্রীদের ভীষণ অত্যাচারে যখন আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই অত্যন্ত উত্যক্ত তখন মহাপুরুষ খৃষ্টদেব আবার নর-দেহ পরিগ্রহ করিয়া অত্যাচারগ্রস্ত জনমণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হন। খৃষ্টদেবের আবির্ভাবের সহিত জন-সাধারণের অনেক দুঃখ কষ্টের লাঘব ঘটিতে থাকে। অন্ধ তাহার চক্ষু পাইল, ক্ষুধার্ত্ত অন্ন পাইল, বিধবা তাহার স্বামী পাইল এবং পুত্রহীনা জননী তাহার পুত্র পাইল। প্রকাশ্য রাজপথে যখন এই সমস্ত মহালীলা সংঘটিত হইতেছে তখন দেশের

মহামান্য গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটার সদলবলে সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। খৃষ্টদেবের অদ্ভুত দৈব-বল দেখিয়া তিনি ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া তাহার পর তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। রাত্রে কারাগারে তাঁহার সহিত মহা-পাদ্রীর নিম্ন-লিখিত কথোপকথন হয়।

হে দেব এ কি তোমার আচরণ। তুমি না বলিয়াছিলে বশ্যতা স্বীকার অবশ্যই কর্তব্য। তুমি না বলিয়াছিলে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করিবার প্রয়োজন নাই। শয়তান তোমাকে যখন জগতের সাম্রাজ্য দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল, তখন তুমি অম্লান-বদনে তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। তুমি না মানুষকে কর্তব্য-জ্ঞান হীন করিয়া সৃজন করিয়াছিলে। শয়তানই না তাকে কর্তব্য-জ্ঞান ও ভালমন্দ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলে! তুমিই না মানব জাতিকে বলিয়াছিলে তোমরা মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হইবে। তবে আমরা যখন এই সমস্ত মানব-জাতিকে সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান ও আত্ম-তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত রাখিয়া পাথর ভাঙ্গাইয়া তদ্দ্বারা যথেষ্ট মেহনৎ করাইয়া উহাদিগকে ভরণ পোষণ দিতেছি এবং সকল প্রকার প্রলোভন হইতে উহাদিগকে দূরে রাখিয়া উহাদিগের বিদ্রোহী আত্মাকে বশ্যতা পরায়ণ করিয়া তুলিতেছি,' তখন তুমি কেন দেব উহাদের মধ্যে আসিয়া বিদ্রোহ ঘটাইতেছ। ইহাত দেবোচিত নয়—ইহাত আমার মনে হয় শয়তানি-বৃত্তি। দেব কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া কথায় অবসানে মহাপাদ্রীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া উহার মস্তক চুম্বন করিতে থাকেন।

Anton Chekov—গল্প Dushechku.

সাধারণ রমণী ভাবপ্রবণ, তাহার অন্তর নিহিত ভালবাসা ফল্গুনদীর প্রবাহেরই মতন। এক কিশোরী শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া পিতাকে প্রাণ মন দিয়া ভাল বাসিত। কৈশোরে তাহার দিদিমাকে ভালবাসিতে শিখে। তাহার পর জনৈক মালীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে অন্তর দান করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হঠাৎ এই মালীর মৃত্যু হইলে—সে উন্মাদ প্রস্তা না হইয়া এক জন কাঠের ব্যবসায়ীর সহিত প্রণয়-বন্ধী আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাহার মৃত্যু ঘটিলে সে জনৈক যুবা ডাক্তারকে অন্তরদান করে। আলেখ্য-খানি জীবন্ত এবং খুব মধুর।

Rothschild's fiddle. একজন কেবিন নির্ম্মাণকারী তাহার স্ত্রীর সহিত একাদিক্রমে ৫০ বৎসর সহবাস করে। লোকটী নিষ্ঠুর প্রকৃতি ছিল। সে তাহার স্ত্রীকে কিছু মাত্র ভালবাসিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী সর্ব্ব প্রকার গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তাহার গৃহ ধর্ম্ম করিয়া যাইত। এইরূপে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেলে সামান্য জ্বর রোগে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর এই কঠিন হৃদয় পুরুষটীর হৃদয়ে পত্নীর প্রতি প্রেম ফিরিয়া আসে। তাহার একটী 'fiddle' ছিল। উহা তাহার সুখে ও দুঃখে সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত। উক্ত গ্রামে একদল ইহুদি বাস করিত। বিবাহ-বাসরে বাজনা বাজাইবার দরকার হইলে তাহারা এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকটীকে fiddle বাজাইবার জন্য লইয়া যাইত। ইহুদিদলের নেতার নাম ছিল Rothschild. স্ত্রী বিয়োগের পর লোকটী শয্যাগ্রহণ করে। Rothschild তখন উহাকে দুই একবার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া তাড়া খাইয়া পলাইয়া যায়। মৃত্যুর দিন সে আসিলে তাহাকে fiddle দিয়া চির-মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। গল্পটী Psychological. গত Waterloo যুদ্ধে অনেকের ভগ্ন অদৃষ্টের উপর Rothschild এর ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত।

Alexander Kuprin—গল্প—Psyche.

ইহা আর একটি অপূর্ব্ব আলেখ্য। একজন ভাস্কর স্বপ্নে আদর্শ রমণীর আভাস পাইয়া, তাহাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া দিনের পর দিন মেহনৎ করিয়া এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি সৃজন করে। এই মূর্ত্তির মধ্যে অমরতা এবং পূর্ণতার আস্বাদ পাইবা মাত্রই তাহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয় এবং তাহাতেই তাহাকে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিতে হয়। সসীম অসীমের সংস্পর্শে আসিলে তাহার মৃত্যু ঘটে ইহাই ইহার শিক্ষার বিষয়।

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলায় হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকারও অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(২৩)

আমার বাপকে আপনি চেনেন না; দাদাবাবু আমার বাপের নাম জানেন যদিও চোখে তাঁকে দেখেন নি। দাদাবাবুর সঙ্গে আমার ভাইয়ের বেশ জানা শুনা আছে, তাঁরা একসঙ্গে পড়েছিলেন।

আমি কলকাতায় থেকে স্কুলে পড়তুম। সেই সময়ে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, দাদার বন্ধু; সেজন্য প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন।

জাতিতে তিনি সোণার বেণে ছিলেন আর আমরা ছিলুম ব্রাহ্মণ, আমাদের মাঝখানে জাতির এই বিরাট ব্যবধান জেগেছিল।

আমি যখন ম্যাট্রিক একজামিন দিলুম তখন হতে আমার বিয়ের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

পাত্র বর্দ্ধমান অঞ্চলের কোন এক গ্রামের জমিদার। শুনতে পেলুম বয়স অনেক হয়েছে এবং দ্বিতীয় পক্ষ সম্প্রতি গত হয়েছেন। আমায় তৃতীয় পক্ষে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

আমার মা প্রথমে রাজী হন নি, বাপ ভাই অতি সহজেই রাজী হয়েছিলেন। তাঁরা যদিও জানতেন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রথমা স্ত্রীর অনেক কয়টি সন্তান বর্ত্তমান এবং তারা এ বিবাহ যাতে না হয় তার জন্য অনেক চেষ্টাই করছিল তবু আমার বাপও ভাই দেখেছিলেন কেবল ঐশ্বর্য্য এর কাছে আমায় বলিদান দেওয়া এমনি কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

মা যতদিন অসম্মত ছিলেন ততদিন আমি পরম নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু অবশেষে আমার মাও যখন রাজী হলেন তখন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল।

আমায় স্পষ্টই জানাতে হল আমি বিয়ে করবনা, চির-কুমারী হয়ে থাকব।

মা, বাবা এবং দাদা সবাই আমার পরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন; তাঁরা জোর ক'রে বললেন, আমায় বিয়ে করতেই হবে, আমার কোন কথা তাঁরা শুনবেন না।

দিদিমণি আপনারা আমায় অভিশাপ দিন, কারণ সেই রাত্রেই আমি পালিয়েছিলুম।

একা ছিলাম না, আমার সঙ্গে ছিলেন ইনি, যাঁকে আপনারা আমার স্বামী বলে জানতেন।

আপনারা বলবেন এ মহাপাপের কাজ, সমাজ এতে অনুমোদন করবে না। কিন্তু আমি কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে ত পারিনি দিদিমণি,—আমি কেবল তাঁকেই দেখেছিলুম, তাঁকেই ভাল বেসেছিলুম। তখন কোথায় ভেসে গিয়েছিল সংসার, সমাজ, কোথায় ভেসে গিয়েছিল আপনার ভালোমন্দের ভাবনা।

আগে জানিনি, পরে জানতে পারলুম নাকি তিনি খৃশ্চান—কিন্তু তাতেই বা কি? প্রাণের মিলন যেখানে হয় বাইরের বাধা বিপত্তি সেখানে হয় তুচ্ছ—নিতান্তই তুচ্ছ।

তাঁকে ভালোবেসে আমি সর্ব্বস্ব হারালুম, নিজের সত্তা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিলুম।

তিনি আমার আত্মদানের মর্য্যাদা রেখেছিলেন, আমার জন্য তাঁকে হারাতে হল অনেক বেশী—অনেক বেশী। তাঁর ধনী পিতা তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন এবং অসীম সম্পত্তি আর দুই ছেলেকে দিয়েছিলেন, এঁকে একটি পয়সাও দেননি। চিরকাল সুখে যাপন করে দুঃখের

বুকে ঝাপিয়ে পড়ে অতল তলে তলিয়ে গেলেন কেবল আমার জন্য—এই অভাগিনীর জন্য।

এতখানি যাওয়ার ব্যথায় তিনি বিহ্বল হন নি, কোনদিনই মুখ ফুটে তাঁকে একটিবার আক্ষেপ করতে শুনিনি। আমায় ত্যাগ করতে পারলে তাঁর সব আবার তিনি ফিরে পেতেন, কিন্তু তিনি আমায় ত্যাগ করেন নি দিদিমণি, দেখেছেন তাঁকে মাছ ধরতে, মাছ বিক্রয় করতে, কাল্লনাতেও তাঁর মধ্যে যে ছিল তাকে দেখেছিলেন কি?

ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ আমাদের হয় নি। কোন মন্দিরে আমরা যাই নি, কোনও অনুষ্ঠান হয় নি, কোনও পুরোহিত পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে নি, কিন্তু তাই বলে আমি কোনদিন এমনকি আজও মানতে পারিনে আমার বিবাহ হয়নি—তিনি আমার স্বামী ছিলেন না। নীতি-বাগীশ পণ্ডিতেরা মুখ বক্র করবেন, অনেক কথাই বলে যাবেন, কিন্তু আমি জানি এই আমার সত্যিকার বিবাহ। বিবাহে সামাজিক অনুষ্ঠানের দরকার সময় সময় হলেও আমার দরকার হয় নি।

এ সব কথা এখন থাক, যা বলছিলুম তাই বলি।

আমার বাপ তাঁকে খুজছিলেন, আমার ভাই অধীর হয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাঁকে দেখতে পেলে খুন করবেন।

এ সংবাদ পেয়ে আমরা কলকাতা হতে পালালুম, গেলুম দূর মাদ্রাজে—সেখানে কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না।

আমার স্বামী যন্ত্রপাতির কাজ বেশ ভালো জানতেন, —সেখানে একটা কারখানায় তিনি কাজ নিলেন।

গোল মাল বাঁধল এই খানেই।

খৃষ্টানের সংখ্যা বেশী হলেও এখানে হিন্দুরা খৃষ্টান-দের দারুণ ঘৃণা করে। আমাদের ছায়া কেউ কোনদিন মাড়ায়নি, সকালে অনেকে বিধর্ম্মীর মুখও দেখত না।

এই দারুণ ঘৃণা আমার চিরশান্ত স্বামীর বুকে আগুণ জেলে দিলে।

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম আমার স্বামী কারখানার এক জন হিন্দু ব্রাহ্মণ মিস্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করতে তাকে একেবারে খুন করে ফেলেছেন এবং কোথায় যে পালিয়ে-ছেন সে সন্ধান কেউ রাখেনা। পুলিশ এসে তাকে না পেয়ে আমাকেই নির্য্যাতন করতে লাগল।

এদের মধ্যে ছিল কারখানার ম্যানেজার সুন্দরস্বামী আয়াঙ্গার, সে আমায় এ পর্য্যন্ত অনেক প্রলোভন দেখিয়ে-ও জয় করতে পারেনি, অবশেষে আমার স্বামীকে কোন-মতে সরাবার চেষ্টা করছিল।

একদিন গভীর রাত্রে দরজা ভেঙ্গে পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুন্দরস্বামী এদের মধ্যে ছিল।

সে রাত্রের কথা বিশদ ভাবে বলব না মোট এই কথা বলি—আমার স্বামী কাছেই ছিলেন এবং সেই রাত্রে তাঁর হাতের কুঠারে আরও যে তিন জন লোক মারা যায় তাদের মধ্যে সুন্দরস্বামীও ছিল একজন।

সেই রাত্রেই আমরা পালালুম,—ফিরে এলুম আবার এই বাংলায়। মরতে হলে বাংলাতেই মরব এই ছিল আমাদের কথা।

কোন ও উপায় না পেয়ে আমার স্বামী কৃষ্ণনগরে একটী জেলের কাজ করতে লাগলেন এখানে স্বচ্ছন্দে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু এখানেও ছয় মাসের বেশী থাকতে পারলুম না। চারটী নরহত্যা যে করেছে, ফাঁসির দড়ি যার মাথায় ঝুলছে সে কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে কি?

মাত্র দুই বছরের মধ্যে কত দেশ কত গ্রামে যে গেছি তার সংখ্যা নাই। অবশেষে এসেছিলুম আপনাদের গ্রামে।

আমার স্বামী এ সময়ে একেবারে বদলে গেছেন। কথাই আছে অসৎ সঙ্গে মিশলে সর্ব্বনাশ হয়, কথাটা খুবই সত্য। আমার স্বামী মদ খেতে সুরু করেছিলেন, অনেক অনুনয় বিনয়েও তাঁকে আমি সৎপথে ফিরাতে পারলুম না।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতুম মানুষের গঠে ওঠা চরিত্র এমন বিকৃত হয় কেমন করে? চরিত্রবান সেই লোকটিই আমায় একা ফেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে পালিলেও তো গিয়েছিলেন, তিনিই আমায় বলেছিলেন আমার সঙ্গে তাঁর মিলন ধর্ম্মসঙ্গতও নয়, আইনসঙ্গত ও নয়, সেই জন্যই তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। সে

দিনই আমি বুঝতে পারি পুরুষের কাছে না হোক, মেয়েদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত বা আইন সঙ্গত ভাবে বিবাহ করার প্রয়োজন আছে।

তাঁকে ভুল বুঝবেন না দিদিমনি, প্রকৃতিস্থ থাকলেও তাঁর মত লোক আমায় এ কথা বলতে পারতেন না। মদে তাঁকে অতি বিকৃত করে ফেলে ছিল, তাই যার জন্য তিনি সব কিছু ছেড়ে অত খানি দুঃখও বরণ করেছিলেন, তাকেও কাঁদিয়ে চলে যেতে তাঁর বাধে নি।

সংবাদ পেলুম পুলিশ তাঁর সন্ধান পেয়েছে :—

আমি অনেক খুজে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লুম, প্রাণের ভয় দেখিয়ে একদিন অতি গোপনে তাঁকে নিয়ে এলুম এইখানে—এই পাহাড় ঘেরা জায়গায়, এই অসভ্যদের মাঝখানে।

ধনীর দুলাল, দারুণ কষ্টে তাঁর স্বাস্থ্য আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। মানুষের বুকের রক্তে হাত ভিজিয়ে তাঁর মনের সুখশান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি মদ খেয়ে সব অশান্তি, দুঃখ দূর করতে চাইতেন। তিনি ইদানিং খিটখিটে হয়ে পড়েছিল, তাঁর চেহারার অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন হয়েছিল। যারা পাঁচ বছর আগে তাঁকে দেখেছে, তারা আর তাঁকে দেখে চিনতে পারত না। এখানে আসার পরই তিনি ব্যায়রামে পড়েন, সে ব্যায়রাম হতে আর তাঁকে আরাম করতে পারলুম না।

তিনি গেছেন—বড় শান্তি পেয়েছেন।

আজ তিনদিন মাত্র খবর পেয়েছি পুলিশ সন্ধান পেয়েছে তিনি এখানে এসেছেন। আজকালই তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসবে। কিন্তু সে নিদারুণ অপমান তাঁকে সইতে হল না। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিতে তাঁকে জীবন দান করতে হল না। এই তাঁর পরম ভাগ্য, এবং আমারও এ দারুণ শোকে এ পরম সান্ত্বনা।"

আমি পরলোক মানি, দেবতা মানি, জানি পরলোকে তাঁকে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতেই হবে, সত্যই তিনি ইহলোকে মহাপাপ করে গেছেন।

শুনেছি স্ত্রীর পুণ্যে স্বামীর অধিকার আছে। স্বর্গে না যেতে পারুক—পাপ ক্ষয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস একবার করি, একবার করিনে। আমি তবু প্রার্থনা করি—যদি আমার প্রার্থনায় তাঁর পাপ ক্ষয়ে যায়।

দুনিয়ায় আমার আশ্রয়স্থল নাই। তাই আত্মহত্যার কল্পনাও করেছিলুম। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে আমার মরা হবে না। তিনি যে পাপ করে গেছেন, তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে আমাকেই। সমাজ সঙ্গত বিবাহ আমাদের না হোক, তবু আমি তাঁর স্ত্রী, তাঁর পাপ পুণ্যের সমানাংশ ভাগিনী।

আমি আর বাংলায় ফিরব না দিদিমনি, লোকালয়ে আর যাব না, যে স্থানে আরও নির্জ্জন, মানুষের কণ্ঠস্বরও যেখানে পৌঁছায় না, আমি সেখানে চললুম। আমার স্বামীর পতিত আত্মার জন্য আমি সেখানে নিশ্চিন্তভাবে প্রার্থনা করতে পারব।

আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। মনে করুন আমি বড় অভাগিনী,—আমার কেউ নেই। আমার নির্জ্জনতার চিন্তার মাঝে আপনাদের দুই ভাই বোনের কথা আমার মনে পড়বে, আমি প্রণাম জানাব। বিদায়—

শিবাণী

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি এস

[শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস প্রণীত 'অনাগত সুদিনের লাগি' একটী সম্পূর্ণ গল্প, কবিতায় লেখা। কয়েকটী পৃথক কবিতায় এই বিচিত্র গল্পটি সমাপ্ত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে। গল্পটি romantic এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রগতির উপযুক্ত। বর্ত্তমানে যে কয়জন আই-সি-এস লেখক নানা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন শ্রীযুক্ত হালদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার অভিনবে তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন—বর্ত্তমান বিচিত্র সুন্দর গাথাটিতেও তিনি অতুলনীয় কাব্য-মাধুর্য্যের সহিত অনাগত সুদিনের যে আলেখ্য ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।]

এক

দ্বারের কাছে সানাই বাজে, আলোর মালা জ্বলে,
পত্রশ্যাম তোরণ সারি চন্দ্রাতপতলে,
বাতাস আজি গন্ধ-সমাকুল,
রজনী যেন খচিত এলোচুল।

নীরবে হেথা বসিয়া আছে রাঙাবরণ কনে
পুলক-ভয় উছলি উঠে গোপনে মনে মনে।
পরণে তার আশার মতো রঙীন বেনারসী
চরণতলে আঁচলখানি অলসে পড়ে খসি
পলাশ-রাঙা অলক্তকে রাঙানো পদতল
শরমরাগে আধেক-জাগা যেন সে শতদল।

সে যেন এই ধরণীতলে প্রথম মধুমাস,—
তুষারে যেন লেগেছে ছোঁয়া ঊষার রাঙাবাস,
শীতের হাওয়া যায়নি থেমে, ফাগুন এলো বনে,
'কূজনক্ষণ এসেছে কি গো এসেছে এতখনে'—
দ্বিধায় পিক শুধায় মনে মনে।

কাজল-কালো নয়নে তার ভাবীকালের ছায়া,
প্রেয়সী নারী আভাস দেয় কিশোরিকার কায়া।
সন্ধিক্ষণ এলোরে আজি জানা-অজানা মাঝে,
পুরাতনের মিলিত সুরে নব-রাগিণী বাজে
অনিশ্চিত শত স্বপন মাঝে।

সহসা ঐ বাজিল শাঁখ, দীপিয়া উঠে আলো
বাহির দ্বারে বরের রথ ঐ বুঝি দাঁড়ালো।—
দুইটি প্রান্তে উভয় পথে যাত্রা হয়ে সুরু
আজিকে সাঁঝে মিলিল, তাই বক্ষ দুরু দুরু।

ভাবিছে একা বিরলে বসি সরমরাঙা কনে
এনেছে ওকি সোনার কাঠি জাগাতে মম মনে?
হৃদয়বীণে যে-সুর বাঁধা, স্বপনে যার ধ্বনি
হাতের ওর পরশে সেকি উঠিবে রণ রণি?

শ্রুতি ও স্মৃতি বলেছে এ যে বিধান বিধাতার
অপরিচিত এক নিমেষে হইবে আপনার।
ভাবিছে বসে বালা—
ইহারি আরাধনার তরে শিবপূজার মালা?
ইহারি আগমনের লাগি এতদিনের চাওয়া,
এক-নিমেষে এম্‌নি করে পাওয়া?
জিনিয়া-নেওয়া মন্ত্র এ কি বুনেছে মোর মনে?—
ভাবিছে বসে কনে।





পূজারিণী

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ শিল্পী—এস, জি, ঠাকুর সিং

জার্নালিজমের অ, আ, ক, খ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

খবরের কাগজের চাহিদা কেন

আমরা সকলেই কমবেশী নিজের নিজের সুখ দুঃখ নিয়া ব্যস্ত কিন্তু এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে অন্যের সুখ দুঃখের খবরাখবরের জন্য একটা অদম্য কৌতুহল আমাদের মগজের মধ্যে কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছে। মানুষ যখন এতদূর সভ্য হয় নাই তখন এই কৌতুহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইত হাটে বাজারে মুদির দোকানে গল্পগুজবের মধ্য দিয়া।

পল্লীঅঞ্চলের পাড়াবেড়ান ঠানদিদিরাও ছিলেন তাহাদের আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে খুচরাখবরের এক একটা ডিপো বিশেষ। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন একটা জিনিষ সৃষ্টি করিল যাহা দ্বারা সে সমগ্র দুনিয়ার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। মানুষের বহুবিধ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্ট হইল সংবাদপত্র। রেডিওফোন, টেলিভিশান প্রভৃতির উন্নতি করিয়া মানুষ হয়ত কালে এমন ব্যবস্থা করিবে যে স্ব স্ব ঘরে বসিয়া বা বিছানায় শুইয়াই সে সমস্ত জগতের ঘটনা দেখিবে ও শুনিবে। আজকালের সংবাদপত্র তখন লোপ না পাইলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে কিন্তু সেজন্য আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। বর্ত্তমানের সংবাদপত্র আমাদের নাগরিক বা গ্রাম্য জীবনের কি কি অভাব পূরণ করিয়াছে এবং কি কি অভাব পূরণ করিতেছে না আমাদের বরং সেই দিকেই অবহিত হওয়া উচিত। সংবাদপত্র যাহাতে একটা চলতি দুনিয়ার ইতিহাসরূপ ধারণ করিতে পারে প্রত্যেক জার্নালিষ্টের সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে ইতিহাস আর সংবাদপত্রের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য দেখা যায় না। ইতিহাস তাহার বিরাট জঠরে কোন নির্দ্দিষ্ট কাল হইতে রাজরাজারার নাম, যুদ্ধ বিগ্রহ, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের যথাযথ বর্ণনা ও বিশেষ ঘটনা সমূহের সন তারিখ দিনের পর দিন ধারাবাহিক বোঝাই করিয়া চলে। সংবাদপত্রও এই কাজগুলি অল্প বিস্তর করে কিন্তু তাহার অতীত নাই, বর্ত্তমান লইয়াই তাহার কারবার। যাহা দৈনন্দিন বা ক্রতধাবমান কালের পদক্ষেপে প্রতিমুহূর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে মানব যাত্রীর অশ্রান্ত পথযাত্রার বাঁকে বাঁকে অব্যবহিত ভবিষ্যৎ যে নব নব রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাকে তদ্দণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া লোকচক্ষুগোচরভূত করাই সংবাদপত্রের কাজ। একজন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী বলিয়াছেন—ইতিহাস আর সংবাদপত্রে শুধু এই প্রভেদ যে ইতিহাস লাইব্রেরীর সুদৃশ্য আলমারীতে সুসজ্জিতভাবে অবস্থান করিয়া কীটদষ্ট হয় আর খবরের কাগজ বার হাতে ঘুরিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহে ডাষ্টবিনে আশ্রয় লয়। কিন্তু খবরের কাগজের এই ভৌতিক দেহের পরিণাম যাহাই হউক যতক্ষণ সে জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি কম নয়। সংবাদপত্র আমাদের অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। মনুষ্য মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিজকে বহুমুখে চালিত করা, বিকশিত করা। সংবাদপত্র এই বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়। সংবাদপত্রের মত একাধারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ধর্ম্মের গূঢ় তথ্যের ব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও শিল্পকলার আলোচনা, পুরাতত্ত্বের পুনরুদ্ধার, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এত অল্পব্যয়ে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়! কাজেই ইহাই গরীবদের একমাত্র বিশ্বকোষ যাহা ধনীদেরও না হইলে চলে না। সুতরাং এক হিসাবে ধনী দরিদ্রের মিলনক্ষেত্র এই সংবাদপত্র।

মানব জাতির সভ্যতা বিকাশের সহায়করূপে বর্ত্তমানে যতগুলি জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে সংবাদপত্রের আবির্ভাব তাহাদের মধ্যে অন্যতম! এত অল্পসময়ে এরূপ ব্যাপক প্রচার ও আদর মানুষের সৃষ্ট আর কোন জিনিষ লাভ করে নাই।

একমাত্র সংবাদপত্রের জোরেই এখন আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি যে আমরা সভ্য হইয়াছি। সংবাদপত্রের দৌলতে আজ দুনিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে। খবরের কাগজই আমাদিগকে চোখে অংগুল দিয়া দেখাইয়া দেয় অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা কতখানি নিম্নে বা উর্দ্ধে। মানুষের আত্মচেতনা, আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করে সংবাদপত্র, তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিকে দিকে! কানের কাছে অবিরত ধ্বনিত করে মুক্তিমন্ত্রের গুঞ্জরণ। নিয়মিত সংবাদপত্রপাঠে আমাদের মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হয়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে আমরা একটা সহজ অনুপ্রেরণা লাভ করি। সংবাদপত্র সুপরিচালিত হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়। সংবাদপত্রই জনমত গঠন করে আবার এই সংবাদপত্রের মারফতেই সেই জনমত শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়। শাসক শাসিতের পরস্পর বোঝাপড়া ও ভাব আদান প্রদানের একমাত্র সেতু এই সংবাদপত্র কাজেই সংবাদপত্রের উন্নতিই শাসন যন্ত্রের উন্নতির একটা কারণ। একজন বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক বলেন—যুদ্ধক্ষেত্রে বিষবাষ্প যেমন অব্যর্থ অস্ত্র সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনেও সংবাদপত্র বিরুদ্ধাচারির বিপক্ষে তেমনই অব্যর্থ অস্ত্র। অবশ্য এখনও বেশীর ভাগ লোকেই সংবাদপত্র কেনে রোমাঞ্চকর বা কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাগুলি পড়িবার জন্য। কেহ বা কতকগুলি ভাসা ভাসা খবর সংগ্রহ করিয়া সস্তায় লোকসমাজে বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইয়া যায়। কাহারও উদ্দেশ্য নিছক কৌতুহল নিবৃত্তি ও চিত্ত বিনোদন। খেলার মাঠে কোন দল কাহাকে একমিনিট বাকি থাকিতে গোল দিয়া জয়লাভ করিল, এভারেষ্ট ডিঙ্গাইতে গিয়া কে নিখোঁজ হইয়া গেল এরোপ্লেনে চড়িয়া আটলান্টিক পাড়ি দিতে বা উত্তর মেরু অতিক্রম করিতে গিয়া কে সলিল সমাধি লাভ করিল বা বরফের স্তূপে জমিয়া রহিল এই সব চমকপ্রদ কাহিনীই অনেকে উর্দ্ধশ্বাসে পড়িয়া যান এবং অন্যান্য সংবাদগুলির উপর শুধু চোখ বুলাইয়া যান। একটি শিক্ষিত ব্যক্তির কথা জানি তিনি বিদেশী সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোন দেশীয় সংবাদপত্র পড়েন না। মনে করিবেন না তিনি একজন বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ। তাঁহার এই সংবাদপত্র পড়ার ঝোঁক শুধু বায়স্কোপের অভিনেত্রীদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। হলিউডের তারকারা কে কবে কার নামে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনিয়াছে, কাহার সঙ্গে কাহার প্রেমে পড়িবার সম্ভাবনা আছে এই খবরগুলি তাহার কণ্ঠস্থ অথচ ফিডারেল গভর্ণমেন্ট আবার কি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রলোক হাঁ করিয়া থাকেন। যাহাহউক, যে যেই উদ্দেশ্যেই সংবাদপত্র পড়ুক না কেন আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে পাঠকের মনের উপর সংবাদ পত্রের মূল উদ্দেশ্য একটা প্রভাব বিস্তার করে এবং পরে একটা বদ্ধমূল সংস্কার রূপে পাঠকের মনে শিকড় গাড়িয়া বসে। প্রথমে সে সংবাদ পত্র দ্বারা চালিত হয় পরে নিজেই চালায় সংবাদপত্রকে। কাজেই দেখি উত্তর কালে যাহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার এককালে তাহাদিগকে সংবাদপত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। একমাত্র রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্র গঠনই সংবাদ পত্রের কাজ নহে সর্ব্বপ্রকার ধ্বংস এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি উভয়ই সংবাদপত্রের হাতে।

—

চলবে

দেবদাসী, ফ্যানটম অফ্ ক্যালকাটা ও রসিদা

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

দেবদাসীঃ—

ছায়াচিত্রের যখন দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তখন কয়েকটি অবাঙ্গালী ষ্টুডিও কয়েক খানি বাংলা ছবি তুলিয়া যথেষ্ট অক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। কিশোরী ফিল্ম কোম্পানীর বাসবদত্তা অক্ষমতার জলন্ত নিদর্শন। পাওনিয়র কোম্পানী যখন দেবদাসী তুলিতে-ছিলেন তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে প্রবীণ প্রযোজক উহাকে নিশ্চয়ই সাফল্য গর্ব্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ছবিখানি দেখিয়া আমরা যথেষ্টই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

দেবদাসীর ইতিহাস জন প্রবাদে প্রচলিত থাকিলেও বাংলায় দেবদাসীর প্রচলন ছিল কিনা ইহাই প্রথম বিবেচ্য। তাহার পর দেবদাসী আমাদের সমাজে ছিল যুক্তির খাতিরে উহা ধরিয়া লইলেও, যেরূপ আলেখ্য প্রদান করা হইয়াছে উহাতে দেবদাসীর বিশেষত্ব অপেক্ষা মধ্য-যুগের সমাজপতিগণের যে কঠোর শাসন প্রচলিত ছিল তাহারই অনেকটা আলেখ্য প্রদান করা হইয়াছে। গল্প বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমাদিগকে দেব-মন্দির ও আরতি দেখানো হয়। আরতি নৃত্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। উহা প্রাচীনত্বের নকল ও অনেকটা ভগ্নাংশ অনুকরণ মাত্র। তাহার পর দেবদাসী সম্বন্ধে কোনরূপ কিম্বদন্তী গাঁথিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই সামাজিক অত্যাচার দেখাইয়া প্রবীণ প্রযোজক মহাশয় বোধ হয় কতকটা Mass appeal এর সাহায্যে জমাইয়া তুলিবার মতলব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণহীন আবৃত্তি কোন-রূপ প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিল না। একজন পর-পুরুষের সহিত দেবদাসীর পলায়ন অনেকটা সমস্যাপূর্ণ। তাহাকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিল একজন অন্ধ যাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অপরের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। উদ্ধার করিয়া অন্ধ যখন নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিতেছে—তখন বোধ হয় অন্ধ গান করিতেছিল বলিয়াই কেহ দেবদাসীকে দেখিতে পাইল না। গান থামিবামাত্রেই সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চিত্র গ্রহণেও যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আলোকের অল্পতা বেশ অনুভূত হয়। শব্দ গ্রহণ আরও অদ্ভুত। আমাদের মনে হয় Producer এইরূপ চিত্র প্রস্তুত না করিলেই ভাল করিতেন।

ফ্যানটম অফ ক্যালকাটা

ম্যাডান কোম্পানীর শয়তান কেন কাঁদে আরও অদ্ভুত চিত্র। এই ছবিখানি আমাদের মনে হয় যাদুঘরে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয় ছবিখানি একখানি Detective thriller কিন্তু ছবিখানিতে Detective থাকিলেও উহা যে thriller তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। ছবিখানিতে অভিনয় করিয়াছে কতকগুলি ফিরিঙ্গি রমণী। তাহাদের আধো আধো উচ্চারিত বাংলা বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে বিশেষ উপভোগ্য। photography এর কোন বালাই নাই। যেমত ইচ্ছা সেইরূপ Shot গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে Andy Moore Ray এর মেক আপ নেহাৎ মন্দ হয় নাই এবং তাহার অ্যাকটিং ও খুব খারাপ নয়। শব্দ-গ্রহণ সুবিধা মত হয় নাই। ছবিখানি কতকগুলি আজগুবির ভাব গ্রহণ করিয়া এবং প্রসিদ্ধ সন্তরণ বীর প্রফুল্ল ঘোষের নাম দিয়া উহাকে বিক্রয় করিবার প্রয়াস আছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে কেন, নূতন কিছু না দিলে বর্ত্তমান যুগে কিছুই চলিতে পারে না।

রসিদা—ইহা একখানি উর্দ্দু ছবি। যাঁহারা তুর্কি-ই-হুর পার্শি থিয়েটার দেখিয়াছেন তাহাদের এই ছবিটী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। গল্পটী খুবই সাধারণ, এক সতী রমণী তাহার প্রিয়তমের জন্য সকল প্রকার দুঃখ ও যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করে। ছবির গল্প বলিবার কায়দা আছে। আলোক চিত্র বেশ চিত্ত গ্রাহী। শব্দ গ্রহণে ও খুব ভাল। এই ছবিতে অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠা কজ্জন নায়িকার অংশে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গান গুলিই মধুর ও চিত্তস্পর্শী। অন্যান্য চিত্রগুলিও খুব স্বাভাবিক ভাবেই অভিনীত হইয়াছে।

ছায়াছবির ফটোগ্রাফী

শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

ছায়াছবির দুইটী দিক আছে। একটি হইল যন্ত্র-বিজ্ঞানের দিক অন্যটি অভিনয়ের। দুইটিরই সুসামঞ্জস্য না হইলে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি সম্ভব হয় না। কিন্তু যান্ত্রিক দিকটার সাফল্যই আগে প্রয়োজন। কেননা কোন ছবি হয়ত অভিনয় বা বিষয় বস্তুর দিক দিয়া অভিনব হইয়াছে, কিন্তু যদি তাহার শব্দ গ্রহণ বা চিত্র-গ্রহণে দোষ থাকে, তাহা হইলে সমস্তই বৃথা।

এখন এই যান্ত্রিক দিক ও অভিনয় এর দিকএর একটা সুসমন্বয় স্থাপন করিবার ভার একজনের নহে। প্রধানতঃ তাহা পরিচালকের, দ্বিতীয়তঃ তাহা প্রতি বিভাগের শিল্পীগণের। উক্ত কথার অর্থ, হয়তো প্রথমেই ভালো বোঝা যায় না—একটা উদাহরণ দিলে, সোজা হইবে। ধরুন চিত্রশিল্পী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন, হইল তাহা চমৎকার। কিন্তু তিনি যাহা তুলিলেন, তাহা পরিচালকের কথা মতো।

এখন পরিচালক এর নির্ব্বাচন ও সেই অনুসারে শিল্পীর চিত্রগ্রহণ যদি ভালো হইয়া থাকে। তাই শুধু পরিচালকের নয় চিত্র-শিল্পীরও অনেকটা রুচিজ্ঞান থাকার প্রয়োজন। নিখুঁত ছবি তোলাই শুধু ফটোগ্রাফী নহে, যাহাতে ছবি জীবন্ত হইয়া উঠে তাহাও শিল্পের একটা দিক।

শুধু যে পরিচালকের ও চিত্রশিল্পীর তাহা নহে, অভিনেতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হয় এবং যেখানে উক্ত প্রকারের সুসমন্বয় ঘটিয়া থাকে সেখানে ছবি হয়—প্রাণবান।

সাধারণতঃ একটা ছবি তুলিতে হইলে, এই কাজ-গুলিকে এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। পুস্তক নির্ব্বাচন ও ভূমিকালিপি প্রস্তুত [সাধারণতঃ পরিচালক ও অভিনেতারাই কাজ করিয়া থাকেন]

২। সিনারিও রচনা

৩। দৃশ্য-পট ও স্থান নির্ব্বাচন

৪। দৃশ্য-পট সজ্জা ও সাজপোষাক নির্ব্বাচন

৫। সুর যোজনা, সঙ্গীতাদি

৬। চিত্রগ্রহণ (আলোক সম্পাত, ছায়াধর যন্ত্রের নানাপ্রকার কারিকুরি ইত্যাদি)

৭। শব্দগ্রহণ

৮। সম্পাদনা ও ফিনিশ।

এই সব বিভাগগুলিতে বিভাগীয় শিল্পীরা আছেন ও সকলের উপরে পরিচালক। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে পরিচালকের দায়িত্ব কতখানি ও কি পরিমাণ জ্ঞান বা প্রতিভা থাকিলে একজন সুপরিচালক হওয়া যায়।

এখন যান্ত্রিক দিকএর দু'চারটি টুকিটাকির কথা বলিতে চেষ্টা করিব। যান্ত্রিক দিকটায় প্রথমত দুইটি বিভাগ আছে : শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ।

শব্দগ্রহণ বিজ্ঞানের কথা আমি বারান্তরে বলিব।

চিত্রগ্রহণএরও কয়েকটি দিক আছে :

প্রথমতঃ ছায়াধর যন্ত্রের (Camera) সাহায্যে ছবি লওয়া আর দ্বিতীয়তঃ রাসায়নিক উপায়ে তাহাকে 'ফিল্ম' রূপে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত করা। কি করিয়া রাসায়নিক উপায়ে ছবিকে প্রদর্শনযোগ্য করা হয় তাহার মোটামুটি ধারণা সাধারণ লোকএর আছে—অন্ততঃ যাঁহাদের ক্যামেরা আছে তাঁহারা তাহা জানেন। এখন কি করিয়া সুন্দর মনোহারী ছবি লওয়া যায় তাহাই মোটামুটি আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, দৃশ্য, যাহা তুলিতে হইবে, তাহা কিরূপ হইয়াছে বা কোনদিক দিয়া তুলিলে ভাল হয়, চিত্রে কোন জিনিষটাকে প্রাধান্য দিতে হইবে তাহাই বিচার করা হইয়া থাকে। তাহার পর কি ভাবে Panoraming, sequence, continuity, Action, প্রভৃতি সুভাবে

বজায় থাকে তাহারই কথা ভাবিতে হয়। উপরোক্ত জিনিষ গুলির উপর ছবি impressive হইয়া উঠে। এইবার আসে, ছায়াধর যন্ত্রের নানাপ্রকার কারিকুরির কথা।

ধরুন. অভিনেত্রী ফুল তুলিতেছেন, একটা উঁচু গাছে, হাত বাড়াইয়াছেন একটা ফুল তুলিতে; মনটা ঠিকনাই, একটু অন্যমনস্ক এমন সময় দেখিলেন যে, ফুল তুলিতে তিনি একটী সাপএর গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন!—এইটি তুলিতে হইবে।

এখন অভিনেত্রী যতক্ষণ হাত বাড়াইতে যাইতেছেন. সাধারণভাবে, ছবি লওয়া হইতেছে, যে মুহূর্ত্তে তাঁহার হাত ফুলের নিকট গেল, ক্যেমেরা থামানো হইল। অভিনেত্রী ঠিক তেমনিই রহিলেন, এদিকে একটি বিষহীন সাপ, তাঁহার হাতে দেওয়া হইল; এইবার আবার ছবি লওয়া হইল। দেখাইবার সময় মনে হইবে, যে ঠিক ফুল তুলিতে গিয়া, মনে ভুলে, সাপের মুখে হাত। এই সট্এর নাম stopmotion.

আর একটি এইরূপ সট্এর নাম double exposure. পিছনে কোন দৃশ্যএর উপর titling দেখাইবার জন্যই এই সট সাধারণতঃ কাজে লাগে। প্রথমে titling যেমন হয়ত অভিনেতাদের নাম বড় বড় অক্ষরে তুলিয়া লওয়া হইল। পরে অন্ধকার কক্ষে ছায়াধর যন্ত্রের ভিতর ঐ ফিল্মটই পুনরায় প্রথম হইতে জড়ানো হইল। তাহার পর যে কোন দৃশ্য অল্প Exposure দিয়া তুলিয়া লইলেই কাজ চলিবে।

সময়ে ক্যেমেরাচালনার গতি কমাইয়া দেওয়া হয়। যখন কাহাকেও ছুটিতে বা জোরে হাঁটিতে দেখানো হইবে তখনই এইরূপ সটের প্রয়োজন হয়। এখানে অভিনেতাকে প্রকৃতই ছুটিতে বা জোরে চলিতে হয় কিন্তু ক্যেমেরা চলে অর্দ্ধগতিতে। ইহাকে halfspeed বলে। কোনো মোটর দুর্ঘটনা হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল, এইরূপ তোলার পক্ষে, উক্ত সট বিশেষ উপযোগী।

Super speed shot এ ক্যেমেরা জোরে চালাইতে হয়। Superspeed সটএর প্রয়োজন হয় যখন ধরুন কোন ঝড়ের দৃশ্যে বিধ্বস্ত গাছপালা সমুদ্রের বুকে জাহাজডুবি প্রভৃতি তুলিবার সময়। Superspeed এ তুলিলে এগুলি দেখাইবার সময় সাধারণ অপেক্ষা অনেক আস্তে হইতেছে মনে হইবে। মজা এই যে,half speed এর ছবি দেখাইবার সময় জোরে চলিতেছে মনে হইবে।

আর একরকম সটএর নাম fading; ধরুন আস্তে কিছু ফুটিয়া উঠিল বা আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল। এই সটে আস্তে আস্তে Exposure কম হইতে পুরো পর্য্যন্ত বা পুরো হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিতে হয়। ইহাতে ছবি অনেক impressive হইয়া থাকে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং একটু কঠিন হইল reverse motion; এই সটে শেষ হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। একটা মোটরের এ্যাক্সিডেন্ট দেখানো হইবে। এখানে অভিনেতা মোটারে থাকিবেন, ক্যেমেরা উল্টা করিয়া বসান হইবে এবং এ্যাক্সিডেন্টের স্থান হইতে মোটর উল্টা চালাইয়া তোলা হইবে। তাহা হইলেই হইল। ইহা করা কঠিন, কিন্তু প্রকৃত এ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্য অভিনয় করিতে যাওয়া যে আরো কঠিন তাহা ভুলিতে পারা যায় না। Reverse motion আরো অনেক আশ্চর্য্যরকম ঘটনা তোলা হইয়া থাকে। Illusion shot ও অনেক কাজে লাগে। রাস্তায় জল দিতে দিতে একেবারে জলের নল দর্শকদের দিকে আগাইয়া দেওয়া! কি করিয়া তোলা হয়? কিছুই নয় ক্যামেরার সামনে বড়ো কাঁচওয়ালা ফ্রেম থাকে—আর কিছু না।

এমনিভাবে ক্যেমেরার ধাপ্পাবাজীর চোটে দর্শকদের এতো মুগ্ধ করা যায় যে বলা যায় না। এই ক্যামেরার কারিকুরির জন্যই কিং কং তোলা সম্ভব হইয়াছিল। কিং কি, মানুষটি যে কাগজের তাহা কী সত্যই কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু ক্যামেরার মতো মিথ্যাবাদী যে দুর্লভ।

অরণ্যে রোদন

(জীবনবীমা কোম্পানী পরিচালনা)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩) লগ্নী:—জীবনবীমা কোম্পানী পরিচালনে উৎকৃষ্ট জীবন নির্ব্বাচন এবং ব্যয়-হার নিরাপদ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করণের পরবর্ত্তী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ই হইতেছে কোম্পানীর ধনাদির লগ্নি ব্যবস্থা। চাঁদার হার নির্দ্ধারণের সময় এবং নিকাশের (Valuation) সময় যে হারে সুদ গণনা করা যায়, কোম্পানীর ধনাদির লগ্নী প্রভৃতি যাহাতে সেই পরিমাণ সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে অর্জ্জন করিতে পারে তদনুরূপ নিরাপদ কর্জ্জপত্রে Security নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। চক্রবৃদ্ধি সুদ Compound interest সহ আসল Capital প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়, লগ্নীর অবস্থা এইরূপ না হইলে চলিবে না। এই ব্যাপারে আসল দূরের কথা, সুদেরও কোন অংশ লোকসান হয় এরূপ ব্যবস্থা চলিবে না। সে রূপ-অবস্থার উদ্ভব হইলে ইহা মৃত্যুর ন্যায়ই অনিবার্য্য যে বীমার দাবীর দরুণ অর্থ কোম্পানী প্রদান করিতে পারিবেন না সুতরাং যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নিয়োগ বা কর্জ্জপত্রে Security কোম্পানীর ধনাদি লগ্নী করা হয় সে বিষয়ে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সত্য কথা, স্বদেশ প্রেমিকতা, স্বদেশানুরাগ ভাল দেশীয় শিল্পের উন্নতি অতি প্রয়োজনীয় কিন্তু উহাতে যদি সন্দেহের অবকাশ মাত্রও থাকে, বীমাকারীর তহবিল অথবা গচ্ছিত তহবিল Trust Fund কদাপি এইরূপ কর্জ্জপত্রে নিয়োগ করা উচিত নহে। এসকল কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কতকগুলি জীবন-বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ উচ্চসুদ অর্জ্জনের লোভে অভিভূত হইয়া বীমাক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় নিয়মে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং অনুপযুক্ত কর্জ্জপত্রে অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। নূতন কার্য্য সংগ্রহের জন্য কদর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা জনিত অতি উচ্চ ব্যয়-হার এবং অপকৃষ্ট জীবন-নির্ব্বাচন জনিত প্রতিকূল মৃত্যু-হারই এই সকল কোম্পানীকে তজ্জনিত লোকসানকে পোষাইয়া লইবার বৃথা আশায় ঝুঁকিদার (Speculative) কর্জ্জপত্রে অর্থনিয়োগ করিতে বাধ্য করিতেছে।

আমরা অত্যন্ত দুরবস্থার সৃষ্টি করিতেছি। অতিরিক্ত কার্য্য সংগ্রহের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছে, উচ্চ ব্যয় এবং উচ্চ মৃত্যুহার মিলিয়া আমাদিগকে ঝুঁকিদার Speculative কর্জ্জপত্রে অর্থনিয়োগ করিতে প্রলোভিত করিতেছে। তাই আমরা ধ্বংসের গিরিশিখরে আরোহণের জন্য ব্যস্ত।

প্রতিকারের জন্য আমরা আদৌ ব্যস্ত নহি। জীবনবীমা "ব্যবসায়" নহে এবং জীবনবীমা কোম্পানীগুলির নিজেদের মধ্যে কার্য্যসংগ্রহে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রয়োজন নাই তাহা আমরা উপলব্ধি করি না। কোম্পানীগুলি সমবেত চেষ্টায় এই সমাজ সেবা অতি অল্পতর ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

এই আদর্শ লইয়াই ভারতীয় জীবনবীমা অফিস সমূহের সমিতি সংস্থাপিত হয়। লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি উহাতে নিয়োজিত করেন। কিন্তু "সমিতি" অদ্যাবধি চরম উদ্দেশ্য হইতে একই রূপ দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

এই আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়। সে জন্য আইনের সাহায্যে দেশীয় এবং বিদেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির কার্য্য কলাপ নিয়মিত (Regulate) করা ছাড়া উপায় নাই।

বীমা আইন সংশোধনের বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিকে মোটা-মুটি নিম্ন লিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত লোকদিগের হাত হইতে বীমা-কারিদের স্বার্থরক্ষা—

(ক) প্রারম্ভিক সরকারী জমার (initial Govt. deposit) অঙ্ক বেশী করিয়া (ধরুন উহা ১,০০,০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া) ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে তাহাদের জন্ম নিরোধ করা।

(খ) কোম্পানীর পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইনকানুন গঠন,—বিশেষতঃ লগ্নী এবং ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে।

(গ) শুধু নাম ভাড়া দিয়া থাকেন, কোম্পানীর কোন কার্য্যে যোগ দেন না এরূপ ডিরেক্টার দিগের উপর কোম্পানীর লগ্নী এবং ব্যয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরোপ।

২। দেশীয় কোম্পানীগুলিকে অসম unequal প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করা—

(ক) বিদেশীয় কোম্পানীগুলির ভারতবর্ষে কার্য্য-সংগ্রহের ব্যয় সম্পর্কীয় হিসাবপত্র সরকারে দাখিল করিতে বাধ্য করা এবং যাঁহারা অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন তাঁহাদিগকে শাসনে আনা।

(খ) বিদেশীয় কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় ব্যবসায়ের পৃথক নিকাশ করিতে এবং ঐ ব্যবসায়ের দরুণ প্রয়োজনীয় সঞ্চয় ভারতেই ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত রাখিতে বাধ্য করা—যাহাতে ঐ সকল লগ্নীতে ভারত সরকারের বিনানুমোদনে কোম্পানী হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন।

(গ) একীকরণ (amalgamation) বা হস্তান্তর (transfer of business) করায় পরবর্ত্তী কোম্পানীতে পূর্ব্ববর্ত্তী কোম্পানীর বীমাকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিবে এ বিষয়ে ভারত সরকারকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সেরূপ একীকরণ বা হস্তান্তর করিতে না দেওয়া।

৩। বীমা কোম্পানীগুলির কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা করণ—

(ক) বীমার টাকায় উত্তরাধিকার স্বত্ব (Law of succession) সম্বন্ধীয় আইন এবং দাবী প্রদান সম্বন্ধীয় কার্য্যের সংক্ষেপ করণ।

( ) বীমা পত্রের সর্ত্ত সমূহের একটী আদর্শ (standardisation of policy conditions) সংস্থাপন এবং নির্দ্দেশ পত্র প্রভৃতির (assignments) আইন কানুন পরিবর্ত্তিত করণ।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে বীমা আইন সংশোধন করিবার একটী প্রস্তাব হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান লেখক তাঁহার সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা বে সরকারী সদস্য হিসাবে এবিষয়ে সরকারকে হস্তক্ষেপের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার সুপারিশ করিয়া একটী বিল ও শাসন পরিষদে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ডীয় বোর্ড অব ট্রেডের এই জাতীয় বিষয়ে তদন্তের বিবরণী (Report প্রকাশ সাপেক্ষে এই বিলের আলোচনা স্থগিত রাখা হয়)। মনে হইয়াছিল না উক্ত বোর্ডের কার্য্য শেষ হইবে—এই সে দিন উহা শেষ হইয়াছে। সরকার ও মনে হয় এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন,—কি প্রণালীতে এই আইনের সংশোধন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে তদন্ত করিবার বিবরণী (report) দাখিল করিবার জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লেখক পুনরায় তাঁহার মন্তব্য উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

আমার মনে হয় ফলে অবস্থার কোনই উন্নতি হইবে না। অবস্থার গুরুত্ব কেহই উপলব্ধি করিতেছেন না। এ অবস্থাতেও কোম্পানীর উন্নতি বিচার করা হইতেছে নূতন কার্য্য সংগ্রহ এবং প্রচারিত ভাবী স্বত্ব বিশিষ্ট লভ্যাংশের (declared reversionary bonus) হারের উচ্চতা দ্বারা। কোন কোন কোম্পানী উচ্চতর লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছেন এবং তহবিলের ভবিষ্যতের বিপদ-সঙ্কুল অবস্থা এড়াইবার জন্য চাঁদার হার বর্দ্ধিত করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ কি?—শুধু নূতন কার্য্য সংগ্রহের প্রলোভন।

আমাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না মোটেই, আমরা গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি না মোটেই,—চতুর্দ্দিকে জল, জল শুধু জল কিন্তু পান করিবার জল কোথায়, এক বিন্দুও তো নাই।

কিন্তু ভগ্নহৃদয় হইলে আমাদের চলিবে না। কোন এক বিশিষ্ট মহামানবের ভাষায় বলিতে পারি,—ইতিহাস পাঠ করুন, ইহার রক্তরঞ্জিত পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন রক্তরেখা এবং ক্ষতবিক্ষত মনুষ্যদেহের বলিরাজির করুণ দৃশ্য আবার তাহারই পাশে পাইবেন বিজয়ী সংস্কারক-দলের গৌরবময় অভিষ্ট সাধনের মধুময় ইতিহাস।

আমি এরূপ আশা পোষণ করি না, শোষিত এই দেশের মূকজন সাধারণ তাঁহাদের স্বার্থরক্ষায় জাগরূক হইবেন,—এ আশা পোষণ করি না অসহানুভাবী বিদেশী শাসনতন্ত্র সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পদদলিত নিগৃহীত জনসাধারণের উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন,—এরূপ আশা করি না; অর্দ্ধসর্ব্বোপচিকীর্ষু এই ব্যবসায়ের ভারপ্রাপ্ত মহাশয়গণের অন্তরে তাঁহাদের গুরু দায়িত্বের কথা সহজ উদিত হইবে। আমি হিন্দু, তাই আশা রাখি এবং বিশ্বাস করি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সর্ব্বথা কষ্টভোগী মানবজাতির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই রোদন শুনিতে পাইবেন এবং এই ভয়ঙ্কর অবস্থার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করিবেন,—আত্মঘাতী, অস্বধ্বংসকারক এবং ক্ষতিজনক যুদ্ধের অবসান ঘটাইবেন। ঘনঘটাময় অবস্থার মধ্যে এই একমাত্র আশার আলোক। আমরা আশা করি এই অমানিশার ঘোর অন্ধকার কাটিয়া যাইবে —সুপ্রভাতের আশার আলোক গগন ছাইয়া ফেলিবে, যেন নূতন জগতে নব নব অবস্থার সৃষ্টি হইবে।—এই নূতন জগতে বীমাকারক এবং বীমাকারী পরস্পরের সহায়তায়, সৌহৃদ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমবায় সমাজ সেবার (Co-operative Social service) আদর্শ স্থাপন করিবে।

পুষ্পহারা

শ্রীনীরবালা মিত্র

অদেয়ত কিছু মাগো ছিলনাক তোরে
প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা।
সে সব ফেলে কেন চলে গেলি, এততে কি—
মিটিল না আশা।
ননীর পুতলী মোর, নন্দনের পারিজাত ফুল,
এসেছিলি এ জগতে কার শাপে, করে মহাভুল।
এত অল্প আয়ু লয়ে কেন মাগো এসেছিলি ভবে,
কেন লয়ে এসেছিলি, অফুরন্ত গুণরাশি তবে।

কত দিন রহিব মা তোর স্মৃতি লয়ে বুকে করে,
দাবানল সম অগ্নি জ্বলিছে যে বুকের মাঝারে।
নিভিবেনা এ আগুন, জ্বলিবে মা ততদিন ধরে'
যতদিন না শুইব আমি চিরশান্তি চিতার উপরে।
ভুলিতে কি পারি তোরে মাগো তুই কিরে
ভুলিবার ধন
ওরে মোর প্রাণসমা, প্রাণাধিকা,
"তনয়া" রতন॥

স্বরলিপি

গান

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস

কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী!
এল নন্দের নন্দন, নবঘন শ্যাম,
এল যশোদা-নয়ন-মনি নয়নাভিরাম,
প্রেম রাধা-রমণ নব বঙ্কিম ঠাম
চির রাখাল গোকুলে এল গোলক ত্যজি।
কাজল গগনে এল উজল শশী,
মুছাতে বেদনা ব্যথা তিমির হারী।
ওই বিজলী ঝলকে এল ঘন গরজি।
হে বিরাট, তব মঙ্গল আঁখি তলে,
কত পুষ্প ফোটে প্রেম অশ্রু জলে,
অরবিন্দ পদে আর কিছু না চাহি
যেন গোপাল প্রেমে মন রহে মজি॥

+ 0 + 0
সা সা | সা রা সা -া | রা মা মা পা | জ্ঞা -া -া -া | জ্ঞা -া জ্ঞা মা |
(কৃ ষ্ণ) | জী ০ ০ ০ | কৃ ষ্ ণ ০ | জী ০ ০ ০ | কৃ ষ্ ণ ০ |

সা রা -া -া | রা -া রা জ্ঞা | সা -া -া -া | পা্ সা পা্ সা |
জী ০ ০ ০ | কৃ ষ্ ণ ০ | জী ০ ০ ০ | (কৃ ষ্ ণ ০) |

পা্ সা পা্ সা | সা রা রা সা | রা মা মা পা | জ্ঞা -া জ্ঞা -া |
এ ০ ল ০ | ন ০ ন ০ | দে ০ র ০ | ন ০ ন ০ |

জ্ঞা -া জ্ঞা মা | রা -া রা -া | রা -া সরা জ্ঞরা | সা -া সা -া |
দ ০ ন ০ | ন ০ ব ০ | ঘ ০ ন০ ০০ | শ্যা ০ ম ০ |

পা্ সা পা্ সা | সা রা রা সা | রা মা মা পা | জ্ঞা -া জ্ঞা -া |
এ ০ ল ০ | য ০ শো ০ | দা ০ ন ০ | য় ০ ন ০ |

জ্ঞা -া জ্ঞা মা | রা -া রা -া | রা -া সরা জ্ঞরা | সা -া সা -া |
ম ০ নি ০ | ন ০ য় ০ | না ০ ভি০ ০০ | রা ০ ম ০ |

ণা -া ণা -া | ণা -া -া -া | ণা -া ণধা পা | পা ধা ধণা ধা |
প্রে ০ ম ০ | রা ০ ০ ০ | ধা ০ র০ ০ | ম ০ ণ০ ০ |

পা -া মা -া | মা পা মা -া | পা ধা ধা ণা | পা -া পা -া |
ন ০ ব ০ | ব ০ ং ০ | কি ০ ম ০ | ঠা ০ ম ০ |

ণা -া ণা -া | ণা -া -া -া | ণা -া ণধা পা | পা ধা ধণা ধা |
চি ০ র ০ | রা ০ ০ ০ | খা ল গো০ ০ | কু ০ লে০ ০ |

পা -া মা -া | মা পা মা -া | পা ধা ধা ণা | পা -া পা -া |
এ ০ ল ০ | গো ০ ল ০ | ক ০ ভ্য ০ | জি ০ ০ ০ |

কৃষ্ণজী ! কৃষ্ণজী !! কৃষ্ণজী !!! ইত্যাদি

পা -া পা -া | মা পা -া -া | গা -া সা গা | সা গা -া -া |
ভ ০ য় ০ | ত্রা ০ ০ ০ | তা ০ এ ০ | স ০ ০ ০ |

গমা পদা পা -া | জ্ঞা -া -া -া | রা -া -া জ্ঞা | সা -া -া -া |
কা০ ০০ রা ০ | ক্লে ০ ০ ০ | শ ০ ০ না | শি ০ ০ ০ |

ণা -া ণা -া ণা -া -া -া | ধা -া পা -া | মা গা -া -া |
কা ০ জ ০ ল ০ ০ ০ | গ ০ গ ০ | নে ০ ০ ০ |

গমা পদা পা -া | জ্ঞা -া জ্ঞা -া | রা -া জ্ঞা -া | সা -া -া -া |
এ০ ০০ ল ০ | উ ০ জ ০ | ল ০ শ ০ | শী ০ ০ ে |

মা -া পা -া | না র্সা -া -া | র্সা না র্রা র্সা | ণা ধা পা -া |
মু ০ ছা ০ | তে ০ ০ ০ | বে ০ দ ০ | না ০ ০ ০ |

-া পধা পধা পা | মা -া গা -া | সরা গমা গা -া | মা -া -া -া |
০ ব্য০ থা০ ০ | তি ০ মি ০ | র০ ০০ হা ০ | রী ০ ০ ০ |

মা পা ধা ণা | ণা -া ণা -া | ণা -া ণা পা | পা ধা ধণা ধা |
ও ০ ০ ই | বি ০ জ ০ | লী ০ ঝ ০ | ল ০ কে০ ০ |

পা -া মা -া | মা পা পা মা | পা ধা ধা ণা | ণা -া -া -া |
এ ০ ল ০ | ঘ ০ ন ০ | গ ০ র ০ | জি ০ ০ ০ |

\+　　　　　　　০
পধা ধর্সা র্সর্রা -া | ণা -া ণা -া
ই০ ০০ ০০ ০ | বি ০ জ ০ লী ঝলকে ইত্যাদি—

কৃষ্ণজী ! কৃষ্ণজী !! কৃষ্ণজী !!!

\+　　　০　　　+　　　০
মা -া পা -া | ণা -া ণা -া | পা দা পা -া | মপা দা মা পা |
হে ০ বি ০ | রা ০ ট ০ | ত ০ ব ০ | ম০ ০ ০ ন |

জ্ঞা -া মা -া | পা -া ণা -া | পা; -া ণা -া | র্সা -া ণা -া |
গ ০ ল ০ | আঁ ০ ০ ০ | খি ০ ত ০ | লে ০ ০ ০ |

-া ণা ণা -া | ণা -া ণা -া | ধা ণা র্সা ণা | ধা পা -া -া |
০ ক ত ০ | পু ০ ষ্ ০ | প ০ ০ ফো | টে ০ ০ ০ |

গা -া মা -া | পা -া ণা -া | পা -া ণা -া | র্সা -া -া -া |
প্রে ০ ম ০ | অ ০ ০ ০ | শ্র ০ জ ০ | লে ০ ০ ০ |

ণা -া ণা -া | ণা -া ণা -া | ধা ণা র্সা ণা | ধণা ধণা পা -া |
অ ০ র ০ | বি ০ ন্ ০ | দ ০ ০ প | দে০ ০০ ০ ০ |

পধা পধা পা -া | মা -া গা -া | সরা গমা গা -া | মা -া -া -া |
আ০ ০০ র ০ | কি ০ ছু ০ | না০ ০০ চা ০ | হি ০ ০ ০ |

ণা -া ণা -া | ণা -া -া -া | ণা -া ণধা পা | পা ধা ধণা ধা |
যে ০ ন ০ | গো ০ ০ ০ | পা ০ ল০ ০ | প্রে ০ মে০ ০ |

পা -া মা -া | মা পা মা -া | পা ধা ধণা ধা | পা -া -া -া |
ম ০ ন ০ | র ০ ০ ০ | হে ০ ম০ ০ | জি ০ ০ ০ |

কৃষ্ণজী ! কৃষ্ণজী !! কৃষ্ণজী !!!

কলেজের ছাত্রদের মনোভাব

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষের কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া মাসোহারা পাইয়া থাকে। ছাত্র বলিয়া তাহাদিগকে পবিত্র একটা কিছু মনে করা হয়। তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রেও আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন, এমন কি বাড়ীঘর ও জমিজমা বন্ধক দেন এবং গৃহের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজেরা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল এই ছাত্রদের তথাকথিত কোনও নীচ কাজ করিতে হয় না; কাজেই অবকাশ কালে তাহারা গালগল্পে, তাসখেলায় ও থিয়েটার করিয়া অথবা অপরাহ্ণে অধিক মাত্রায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। কিন্তু প্রাচীনকালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভের সময় গরু চরাইত, কাষ্ঠাহরণ করিত এবং কৃষিকার্য্য করিত, —অথবা বিদ্যার্জ্জনের জন্য তাহাদের ধনও অর্জ্জন করিতে হইত।

হোষ্টেলঃ—হোষ্টেলগুলি বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্য্যবেক্ষণাধীনে পরিচালিত, ঐ সকল হোষ্টেল স্বদেশীর বিরুদ্ধতা প্রচারের আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ'এর উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল, কিন্তু যে সময় তিনি আধুনিক বিলাসোপকরণ সমন্বিত প্রাসাদোপম হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতার বে-সরকারী কলেজগুলিকে ১৫ লক্ষ টাকা দেন,—উহা বিশেষ অশুভ মুহূর্ত্ত বলিতে হইবে। এই সকল ছাত্রাবাসে থাকিতে গেলে কোনও ছাত্রই মাসিক ৪৫৲ টাকার কমে ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই আবার এই সীমাও অতিক্রম করিয়া ফেলে। কলিকাতায় আমি কোনও কোনও পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর সহরে এক একটি ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০০ টাকা পর্য্যন্ত, এমন কি ততোধিক।

অপচয়ের অগ্রদূতঃ—পাঞ্জাবের অবস্থা আমি স্বয়ং কয়েকবার দেখিয়াছি; সুতরাং আমি বলিতে পারি যে, পাঞ্জাবী বন্ধুদের ঐ কথা সত্য। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুখে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের দৃশ্যই ভাসিতেছে এবং তাঁহারা এই দেশেও অক্সফোর্ড কেমব্রিজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। টেনিসের জন্য ছাত্রদের ব্লেজার ও ট্রাউজার চাই, ক্রিকেট খেলার জন্য তাহাদের ফ্লানেলের পোষাক চাই। তাহাদের প্রসাধনব্যয়ও বিপুল। বস্তুতঃ যে কোনও ছাত্র এইরূপ ক্ষতিকর আবহাওয়ায় বাস করিলে সে বিদেশী শোষকগণের অগ্রদূত হইয়া উঠে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্যারিসে ছিলাম, তখন তথায় দেখিয়াছি যে, তথায় পোল্যাণ্ডের এবং ফ্রান্সের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশের হাজার হাজার ছাত্র এত অল্প খরচে বাস করে যে, তাহা আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বোধ হইবে। ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান; অথচ তথায় ছাত্রদের অসম্ভব কম খরচে ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহাদের শতকরা ৪০ জনের মাসিক আয় মাত্র ৩ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৪২ টাকা। দারিদ্র্যনিবন্ধন শতকরা ৩৮ জনকে ছাত্রবেতন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তথায় প্রত্যেক ছাত্র গড়পড়তা মাসিক ২ পাউণ্ড ৪ পেন্স, অর্থাৎ মাসিক ৩০৲ টাকায় গ্রাসাচ্ছাদন ও বাড়ীভাড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করে।

বাবুয়ানাঃ—বার্ণার্ড শ' যে বলেন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কেবল বাবুয়ানা শিক্ষা দেয় এবং ক্ষমতা থাকিলে তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ভূমিসাৎ করিতেন তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড যে বলিয়াছেন, "আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশের পক্ষেই হিতকর না হইয়া ক্ষতিকর হয়" তাহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে।

তারপর একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাকা উপার্জ্জন করে? বিশিষ্ট ধনতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কে টি সাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বোম্বাইতে একজন গ্রাজুয়েটর গড়পড়তা আয় কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫৲ টাকার বেশী হইবে না। আমার হিসাবে কলিকাতা ও মাদ্রাজের গ্রাজুয়েটদের মাসিক আয়ও ঐ পরিমাণ। স্পষ্টই বুঝা যায়, পঞ্চনদ মধুও দুগ্ধে পরিপ্লুত, নতুবা কি তথায় এমন অবস্থা হয়?

ইংলণ্ডের ফ্যাসান সম্পর্কে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছিলেন; "এখানে মনুষ্যজীবন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিতব্যয়ী ও আলস্যপরায়ণ, পোষাক বিক্রেতা ও দর্জ্জি এবং ফুলবাবু ও মূর্খ স্ত্রীলোকেরাই এখানে মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রণ করে।"

যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তুত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ খেলো বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক! যে শিক্ষায় লোকে হুকা ও ফড়শীকে অতীত যুগের বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে শিখে সেই শিক্ষাকে ধিক! যদি সিগারেট খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট অর্থাৎ বিড়ীই কেন খাও না? স্বদেশী তামাকের গুড়া স্বদেশী আবরণে মুড়িয়া বিড়ী প্রস্তুত হয়—আর বিদেশী তামাক নানা প্রক্রিয়ায় সোণালী রঙে রঞ্জিত করিয়া বিদেশী খেলো কাগজে মুড়িয়া সিগারেট প্রস্তুত করা হয়; এবং এক বিদেশী সিগারেট বাবদই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। গোন্দিয়ার চারিদিকে আমি কয়েকটি বিড়ীর কারখানা দেখিয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি, মধ্যপ্রদেশের ঐ উষর মরুভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নর-নারী ও বালক বালিকা বিড়ি প্রস্তুত করিয়া দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা উপার্জ্জন করে। এইরূপে এই অন্যতম প্রধান কুটীর শিল্প দ্বারা অর্দ্ধলক্ষ লোক এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই বিড়ি ক্রয় করে কাহারা? উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কৃতী ব্যবহারাজীব বা সংস্কৃতির গর্ব্বে স্ফীত কলেজের ছাত্রেরা নহে—বিড়ি ক্রয় করে কুলী গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর সামান্য লোকেরা। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী সমাজের পর গাছাবিশেষ। যাহারা প্রকৃত ধনোৎপাদক সেই চাষীদের শ্রমার্জ্জিত অর্থে এই শিক্ষিত-শ্রেণী জীবন ধারণ করে। তাহারাই ভারতের অর্থ বিদেশে রপ্তানির হেতু।

সহরের কুঅভ্যাস:—পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা সহরে আসিয়া সঙ্গীদের অনুকরণ করে এবং ব্যয়বহুল অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়। সাধারণ ধোপার ধোলাই কাপড় আর তাহার মনে ধরে না, ড্রাইং ক্লিনিংয়ের ধোলাই কাপড় তার চাই। সাধারণ নাপিতের চুল ছাঁটাই তার পছন্দ হয় না, হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাঁটাই করার অভ্যাস তার জন্মে। সহরের দেশীয় মহল্লায় পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল রেস্তোরা গজাইতেছে, সেখানে অপরাহ্ণের জলযোগ তাহার চাই। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন সন্ধ্যায় তার সিনেমায় যাওয়া চাই-ই,—আর সুবিধা বুঝিয়া তার এই সব ব্যয় বহন করিতে তাহার দরিদ্র পিতামাতাকে যে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হইতেছে, তাহা সে বিস্মৃত হয়। এইরূপে অর্থদানে বাধ্য করিয়া সেই অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাইতেছে এবং এই স্বার্থপরতা নীচতারই এক-রূপ নামান্তর মাত্র। অভিভাবকের নিকট হইতে শিক্ষাব্যয় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু সেই খরচার পরিমাণ একান্ত যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ ন্যূনতম হওয়া উচিত।

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে, তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়টি পাঠ করিলে আশাকরি উপকৃত হইবে:—

'আমি অতিকষ্টে কাল কাটাইতেছি। বাবা, এই দারুণ শীতে রাত্রি থাকিতেই আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয় এবং রাত্রি থাকিতেই আমাকে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া ঊষার আলোক দেখা দিবার পূর্ব্বেই কারখানায় পৌছিতে হয় এবং সেই ভোর হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয়। মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুক্ষণের ছুটি পাই মাত্র; সময় আর কাটে না, কাজেও আমি কোন আনন্দ পাই না। কিন্তু এই

কষ্টের মধ্যেও সুখের আলোক-রেখা দেখিতে পাই; কারণ আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, আমি জগতের জন্য—আমাদের পরিবারের জন্য কিছু কাজ করিতেছি। তারপর আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রথম সপ্তাহের উপার্জ্জনে আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেরূপ আনন্দ এই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে পারে নাই। সে সময় আমি পরিবারের সহায়ক হই এবং একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি হই। আর আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নই।" এণ্ড্রু কার্ণেগী।

সকলেই বলে যে, এই স্বাবলম্বী লোকটী একশত কোটী টাকার উপর দান করিয়াছেন।

সিনেমায় যাহারা যায়, তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বালকদের সিনেমাতে যাইবার খরচা সংগ্রহের কথা সকলেই জানেন। পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই।

সিনেমা দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্য তহবিলের উপরও বিশেষ চাপ পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে রুদ্ধ স্থান আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উপরও জোর দিতে হয় সেজন্য উহারও অত্যন্ত ক্ষতি হয়; ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির এই আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ব্যাপার।

মেঘদূত

শ্রীকনক ভূষণ মুখোপাধ্যায়

মেঘম্লান বাদল দিবসে
পরিপূর্ণ মনের হরষে
রচেছিলে তুমি মেঘদূত—
অপূর্ব্ব অদ্ভুত।
"হে কবি' প্রিয়ার লাগি অভিনব তব দূতীয়ালি—
নিখিলেরে করিলো খেয়ালী।

যেথায় বিমনা প্রিয়া প্রতীক্ষায় রয়েচে চাহিয়া—
আষাঢ়ের নব মায়া চলে সেথা প্রিয়া'-বার্ত্তা নিয়া।
ময়ূরী মেলেছে পাখা, মিলনের মধুর উৎসবে
বঁধুর বুকের নীড়ে তারে আজ ধন্য হ'তে হবে—
একান্ত নীরবে।

কবে সে প্রিয়ারে তব স্মরিয়াছ বাদল সন্ধ্যায়
মনের গোপন কোণে; বার্ত্তা যেন প্রেমে উছলায়—
দেহ সীমানায়।

যেন সে ডাগড় আঁখি কার লাগি রয়েছে জাগিয়া—
সে কি কবি তব মরমিয়া!
বিরহী কুরিছে যেন ওই সুরে ভুলি নাই—প্রিয়া।
মানবের অন্তরের কোণে
অতি সঙ্গোপনে,
মানসীরে প্রাণ দিলে কবি—
সে প্রেম পরশ লভি,
হ'ল প্রিয়া নিখিল গরবী।

আষাঢ়ের অশান্ত ঝর্ঝরে—
আজো মনে পড়ে,
যে তোমারে ভুলাইল! মনোময়ী সে কি মায়াবিনী!
মেদুর বাদল ছন্দে বাজে শুনি তাহারি কিঙ্কিনী—
সুশোভন মোহন মায়ার,
ভুবনে পুরুষ নারী দোলে যেন সে-ই দোলনায়।

মনে পড়ে তোমারে বিরহী,
রহি রহি——

উচ্ছাসিয়া উঠে যেন ভারাক্রান্ত বিপুল আকাশ,
হে প্রেমিক কবি কালি দাস।

অন্তরের অন্তরালে
সুর স্বপ্ন জালে
রহে জাগি চিরন্তনী প্রিয়া
মন-ভোলানিয়া।
কাঁদে শুনি মেঘলোক—
ভুলি নাই-ভুলি নাই-ভুলি নাই প্রিয়া।

কবি হেমেন্দ্রলাল রায়

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রলাল রায় গত ২১শে আষাঢ় শুক্রবার শেষরাত্রে কলিকাতায় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। দেড়মাস কাল টাইফয়েড্ জ্বর ভোগের পর কতকটা আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে হঠাৎ তাঁহার নূতন উপসর্গ উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা বিফল করিয়া ইউরিমিয়ার ফলেই প্রাণ বিয়োগ ঘটে। শনিবার প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই হেমেন্দ্রলালের অকাল-মৃত্যুর সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী তাঁহাদের প্রিয় বন্ধুর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য কবির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। অনেকে শবযাত্রায় যোগদান করিয়া নিমতলার শ্মশানঘাটেও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রলাল পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ফুলকোঁচা গ্রামে ১২৯৫ সালের ফাল্গুন মাসে বৈশ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্রজদুলাল রায় একজন সাহিত্যসেবী ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। পিতার বহুযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলী প্রথম বয়স হইতেই হেমেন্দ্রলালের অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মাইবার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মাতা হরিসুন্দরীর নিকট হইতে তিনি শৈশবেই নানা প্রকার ছড়া শিক্ষা করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে পরে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও লৌকিক ধর্ম্মসাহিত্য ইত্যাদি পাঠ করেন। হেমেন্দ্রলাল সিরাজগঞ্জ বি, এল স্কুলে অধ্যয়ন কালেই কবিতা রচনা সুরু করেন। মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় হেমেন্দ্রলালের প্রথম বিবাহ হয়। পত্নী প্রমোদিনীর বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর ছিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। এই পত্নীকে আশ্রয় করিয়াই হেমেন্দ্রলালের প্রথম যৌবনে কাব্য-প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। তিনি প্রথমে রাজসাহী কলেজে এবং পরে কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। রাজসাহীতে পাঠের সময়েই তাঁহার কবিখ্যাতি বন্ধু মহলে ছড়াইয়া পড়ে। কলেজে পাঠের সময়ে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়াপত্নী শ্রীমতী সুধীরার পানিগ্রহণ করেন। কবি হেমেন্দ্রলালের মধুর স্বভাব বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহাকে যেমন প্রিয় করিয়া ছিল, দাম্পত্য-সম্বন্ধেও তিনি সেরূপ সৌভাগ্যবান ছিলেন। না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রশংসনীয়ই ছিল।

হেমেন্দ্রলালের কর্ম্মজীবন প্রথম হইতেই কলিকাতায় কাটিয়াছে। এইখানে প্রথম তিনি আধুনালুপ্ত দৈনিক



স্বর্গীয় হেমেন্দ্রলাল রায়

সংবাদ পত্র "হিন্দুস্থানে"র সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। সাপ্তাহিক "বাঁশরী" প্রকাশিত হইলে, হেমেন্দ্রলাল গোড়া হইতেই তাহার সহযোগী সম্পাদকের ভারগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম কবিতাপুস্তক "ফুলের ব্যথা" প্রকাশিত হইয়াছিল। দেড় বৎসর পরে হেমেন্দ্রলাল সাপ্তাহিক "মহিলা" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। "মহিলা" বন্ধ হইয়া গেলে, তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু মৌলিক রচনা এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতার অনুবাদ সেই সময়ে প্রায়ই "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইত। গান্ধী-সাহিত্য অনুবাদ ও প্রচারে

তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত "রাষ্ট্র-বাণী" ও "হরিজন" পত্রিকাদ্বয়ের হেমেন্দ্রলালই সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার "ঝড়ের দোলা" উপন্যাস, "পাঁকের ফুল" ও "মায়ামৃগ" গল্পপুস্তক এবং "মায়াকাজল" ও "মণিদীপা" নামক কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার দান, "গল্পের ঝরণা" "গল্পের আল্পনা" "গল্পের মায়াপুরী" ও "পাঁচ-সাগরের ঢেউ" বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। হেমেন্দ্র-লালের লিখিত "আরব্য উপন্যাসে"র শোভন সংস্করণ সাধারণের প্রিয় হইয়াছে তিনি শেষে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রচার বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লেখা বন্ধ ছিল না হেমেন্দ্রলালের ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল রায়, সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ উকিল এবং একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী। উভয়ের ভ্রাতৃভাব আদর্শ স্থানীয় ছিল। হেমেন্দ্রলাল নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পতিবিয়োগ-বিধুরা সাধ্বী পত্নীর এমন কোন অবলম্বন রহিল না যে, যাহাতে তিনি কতকটা শান্তি লাভ করিতে পারেন।

প্রিয়দর্শন হেমেন্দ্রলাল বন্ধুগণের প্রকৃত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাহিত্যসেবীগণের শ্রেষ্ঠতম মিলন-সভা রবি-বাসরের তিনি একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। বিগত ৫ই শ্রাবণ তারিখে, রবি-বাসরের হেমেন্দ্রলাল স্মৃতিসভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী সমবেত হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। এই সভায় সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবীনতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন একটা মর্ম্মস্পর্শী লেখা পাঠাইয়াছিলেন। সভায় যে আন্তরিকতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

হেমেন্দ্রলাল যে কেবল সুপ্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন, তাহাই নহে। তিনি একজন অকৃত্রিম দেশ-সেবক ছিলেন। হেমেন্দ্রলাল বহু বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের একজন উৎযোগী সদস্য ছিলেন, এবং কংগ্রেসের কার্য্যে নানাপ্রকারে আত্ম-নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গত ৯ই শ্রাবণ কলেজস্কোয়ারস্থ মহাবোধি সোসাইটি হলে, এক জনসভায় সুপ্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে হেমেন্দ্রলালের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করা হইয়াছে। এই সভায় বাঙ্গলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী-গণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সৃষ্টির বুকে চলে স্রষ্টার ভৈরব নৃত্য

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে হাওয়া লাগি ফুল ওঠে ক্রন্দি,
ধীরে ধীরে উড়ে যায় স্নিগ্ধ সে অঙ্গের গন্ধ;
সঙ্গীত থেমে যায়—সুর চায় করিবারে বন্দী
রেশ তার মিলাইতে অপনীতে ডুবে যায় ছন্দ।
উৎসব আনন্দ কোলাহল,
পান করি হাহাকার হলাহল,
ডুবে যায় কাঁপি ওঠে তমিস্র পাংশুল রাত্রি,
মরণ উথলি ওঠে—জীবনের দ্বার করি বন্ধ।
আঁধারে হারায়ে যায় উষসী রূপসরল দাত্রী,
বেদনায় কেঁদে মরে অন্তর উৎসে আনন্দ।

সাহারার বুক বেয়ে ধেয়ে আসে সমুদ্র গর্জ্জি,
ধ্বংসের উল্লাসে কেঁপে ওঠে হিমাদ্রী চিত্ত।
ঈশানের কোণ ছেপে ঝঞ্ঝা নেমে আসে তর্জ্জি,
ধরণীর বুকে কাঁদে অসংখ্য জীবনের ভৃত্য।
জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান,—
ভেঙে চুরে হলো কীসে একপ্রাণ,
ধ্বংসের রিক্ততা—সৃষ্টির আনন্দ লঙ্ঘি,
অমৃতের ঝর্ণারে ক'রে দেয় বিষরসে তিক্ত।
কোথায় সে উল্লাস? কোথা হায় জীবনের সঙ্গী,
সৃষ্টির বুকে চলে স্রষ্টার ভৈরব নৃত্য।

হেমেন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মৃত্যুর কালো পর্দ্দার আড়ালে একে একে আমরা সরে যাচ্ছি এইটেই প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে পড়চে। যখন ভূমিষ্ট হয়ে মায়ের কোলে আসি তখন নিতান্তই মার দুলাল হয়েই থাকি। আবার বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে পড়ি সকলের— বিশেষ যাঁরা কার্য্যের দ্বারা যশস্বী হন তাঁদের ত কথাই নেই। শৈশবেই যাঁরা চলে যান তাঁদের খোঁজ কে রাখে? আজ কবি-বন্ধু হেমেন্দ্রের এই অকাল মৃত্যুতে সেই কথাই বার বার মনে আসচে। উপনিষদে আছে:

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

অর্থাৎ: অল্পবুদ্ধির লোকেরা বাইরের কাম্য বস্তুর দিকে যায় আর সেই জন্যেই তারা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জেনে সংসারের অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। আজ বন্ধু চলে গেলেন তাঁর সঙ্গ থেকে আমরা বঞ্চিত হলেম, কিন্তু তাঁর অমৃতত্ব লাভ আজ যে ঘটল তার খবর আমরা কি রাখি? যিনি তাঁর জন্মের পূর্ব্বে যে অমৃতলোকের মধ্যে বিরাজ করতেন আজ আবার সেই খানেই তিনি ফিরে গেলেন মৃত্যুর মধ্যে। কেবল তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রাণ তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের সন্ধান চিরকালের জন্যে রেখে গেলেন আমাদের জন্যে। আমরা পরমাত্মার কাছে তাঁর আত্মার মঙ্গলের দাবী ছাড়া কিছুই করবার ক্ষমতা রাখি না। তাই আজ প্রিয় কবিবন্ধুর মৃত্যুতে কাব্যের সুরে আমরা বলি:

'ফুরিয়ে গেল' 'চুকিয়ে গেল'
এই ধরণীর মাঝে
শুকনো পাতায় ঝরা ফুলে
তাইত লেখা আছে।
তাইত যখন সাঁঝের বেলায়
বন্ধু চলে যায়
প্রাণের পরে কি যেন সুর
করুণ হেন গায়।
মনে যে হয় হারিয়ে গেল
যা' ছিল মোর কাছে।
আজকে যে তাই খবর এল
বন্ধু গেছে দূরে
আসবেনা আর আমার কাছে
আর ত ফিরে ঘুরে
তাই ত বাঁশী বেসুর শোনায়
পাখীর গলার গানে
লাগায় না আর তেমন সে সুখ
বেদনা ভরা প্রাণে
যাবার সময় হ'ল ভেবে
হৃদয় শুধু নাচে ॥

অবান্তর

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি—এ বচনটা প্রবাদ বচনের মত হয়ে গেছে কিন্তু এতে বাঙ্গালীর বিস্মৃতি ঘুচিয়ে সম্বিৎ কিছু আনতে পেরেছে কিনা তা বোঝা যায় না। এখন শুনছি এর উপরও বাঙ্গালী আবার আত্মঘাতীও বটে। আত্মবিস্মৃতের মত আত্মঘাতী কথাটাও বাঙ্গালী সাদরে বরণ করে নেবে কিনা এবং প্রবাদবচনের মত এও বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ উপসর্গ হিসেবে চলতে থাকবে কিনা জানি না। আত্মঘাতী বিশেষণে বিশেষিত হবার অধিকার বাঙ্গালী কতটা লাভ করেছে তা খতিয়ে দেখলে ক্ষতির কারণ কিছু নেই।

—

সত্যানুসন্ধান—সত্যের উপর ঐকান্তিক গভীর নিষ্ঠা ঐতিহাসিকদের একটা মস্ত বড় অলঙ্কার। এ হিসেবে ঐতিহাসিকদের মস্ত বড় সত্যগ্রেহী বলা যেতে পারে। সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য আজ যে ব্যাপারটাকে এক ঐতিহাসিক নস্যাৎ করে দিচ্ছেন সেই কারণেই কিছু দিন পরে অপর এক ঐতিহাসিক সেই ব্যাপারটাকেই পরম সত্য উপাদান বলে গ্রহণ করতে পারেন। সত্যের মহিমাও আবার দেশকাল পাত্র ভেদে এমনি রূপান্তরিত হয়। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে সুদূর অতীতের একখানা কীটদষ্ট কাগজই যে যথেষ্ট প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে সব ক্ষেত্রে তাও মনে হয় না। ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে সমসাময়িক লোকদের সম্বন্ধেই যে সব তথ্য পাওয়া যায় তারই বা কটা ঠিক হয়?

—

কোন মহৎ চরিত্র যা যুগ যুগ থেকে দেশ বিদেশে লোকের শ্রদ্ধা পাচ্ছে এমন কোন চরিত্র সম্বন্ধে যদি কোন মহা ঐতিহাসিকও ব্যক্তিগত কোন ছিদ্রের সন্ধান পেয়ে সত্যের অনুরোধে তা প্রকাশ করতে যান তাকে সব ক্ষেত্রে সমর্থন করা যেতে পারে না। দোষে গুণেই মানুষের জীবন গঠিত—সাধারণ মানুষের মধ্যে দোষ বেশী আর তার উপরের স্তরে মানুষ যত বেশী উঠতে থাকে তার গুণ হয় তত বেশী। সে জায়গায় অসাধারণ কোন মানুষের অতীত জীবনে নোংরা কিছু পেলেও তাকে ফলানো সত্যের অনুরোধেও ঐতিহাসিকের উচিত নয়।

—

সত্য—সত্যই—কিন্তু তারও আবার বিভিন্ন রূপ আছে যথা বিকৃত সত্য, অর্দ্ধ সত্য ইত্যাদি। আজ ফিল্মে আমরা মহাত্মাকে নারীদের হাত ধরে বল নাচ নাচতে দেখে বিস্মিত হচ্ছি—টুক্ টাক্ প্রতিবাদও কচ্ছি কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশের কেউ হয়তো মহাত্মার ইয়ংইণ্ডিয়া প্রভৃতি পড়ে তাঁর মহৎ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েও সত্যের অনুরোধেই ফিল্মের বলনাচ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হবেন। তাই বলছি সত্যেরও নানারূপ আছে এবং সত্যের অনুরোধেও কারো মহৎ জীবনের গ্লানি পেলেও তা না ফলানোই উচিত।

—

বাংলা ব্যবস্থাপক সভার আসছে অধিবেশন কোন মুসলমান সদস্য এই প্রস্তাব আনবেন যে—রায়তী জমির উপর যদি কোন প্রজা মসজিদ নির্ম্মাণ করে তবে সেই জমি থেকে তার জোতস্বত্ব উচ্ছেদ করে তাকে বিতাড়িত করা যাবে না।

এ প্রস্তাব আগেও হয়েছিল এবং গবর্ণমেণ্ট তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হতে পারে? এ আইন করাও যা উচ্ছেদ আইন তুলে দেওয়াও তা। এ আইন হলে প্রত্যেক প্রজার রায়তী জমির উপরই একটি করে মসজিদ বা প্রার্থনাগৃহ ওঠা অসম্ভব নয়। সব জিনিষেরই স্থান কাল পাত্র আছে—ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তা ভুললে চলবে না।

—

সংস্কৃত শাসন তন্ত্রে বাংলা কাউন্সিলে মোস্লেম শক্তি হবে ১২০জন, মোট শক্তির সংখ্যা ২৫০ জন। বর্ণ হিন্দু, অনুন্নত হিন্দু, খৃষ্টান ও ইংরোপীয় ইত্যাদি

সকলে মিলে বাকী ১৩০ টি আসন পাবে। অবস্থা এখন পর্য্যন্ত যে রকম উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ তাতে হিন্দুদের আর সংস্কৃত কাউন্সিলে গিয়ে বিশেষ কিছু করতে হবে না। মুসলমান ভাইদের উপর বক্তৃতা ইত্যাদির সব ভারার্পণ করে সংখ্যা লঘিষ্ঠ অতি অল্প ক'জন নিশ্চিন্ত মনে তন্দ্রা সুখ উপভোগ করতে পারবেন।

—

বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ আবুল কাসেম আগামী কাউন্সিলে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়েছেন—প্রস্তাব তিনটী এই—(১) ইসলামিয়া কলেজ উঠিয়ে দেওয়া হোক। (২) মোসলেম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টারের পদ তুলে দেওয়া হোক। (৩) মোসলেম শিক্ষার সহকারী ইনস্পেক্টরের পদগুলি তুলে দেওয়া হোক।

একজন মুসলমান কাউন্সিলরই এই প্রস্তাবগুলি সাহস করে আনতে পেরেছেন দেখে আমরা একটু বিস্মিত হয়েছি। কি উদ্দেশ্যে তিনি এ প্রস্তাবগুলি এনেছেন তা আলোচনার সময় বিষদভাবে জানতে পারবো আশা কচ্ছি।

—

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের সত্যিকার মুখপাত্র কিনা এ সম্বন্ধে দেশে আবার একটা সন্দেহ জেগেছে। এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাঝে মাঝে এ দেশে জাগে। সার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর জীবন স্মৃতিতে সার রমেশচন্দ্র মিত্রের ১৮৯৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন—এতে তাঁর স্মরণীয় বাণী এই ছিল যে, 'শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের মস্তিষ্ক ও বিবেক বুদ্ধির প্রতিনিধি ও অজ্ঞ জনসাধারণের মুখপাত্র—তাহাদের অধিকার সমূহের স্বাভাবিক রক্ষক। ...সব যুগেই এ সত্য স্বীকৃত হয়েছে যে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের যারা মানসিক পরিশ্রম করে তারাই শাসন করবে—এ সত্য কি এই হতভাগ্য দেশেই অস্বীকৃত হবে?'

কলিকাতার উকিল সভা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুত নরেন্দ্র কুমার বসুকে টাউনহলে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ঐ সভায় ইন্দোর মামলার বিখ্যাত বাঈজী মমতাজ বেগম নৃত্যগীত করেছিল। সহযোগী সঞ্জীবনী এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে লিখ্ছেন 'হাইকোর্টের উকিলেরা প্রকাশ্য সভায় বাঈনাচ করাইয়াছেন ইহাও আমরা কখন শুনি নাই। সেকালের কোন কোন উকিল নিজের বাড়ীতে বা উদ্যানে বাঈ আনিতেন তাহা শুনিয়াছি।' সঞ্জীবনী বলেন হাইকোর্টের ৫০০ শতাধিক উকিলের মধ্যে ৬০জন উকিল এই নাচের প্রতিবাদ করেছিলেন।

—

স্মৃতি সভা জিনিষটা ভাল—মৃত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনও ভাল। কিন্তু এই সব শোক সভায়ও মাঝে মাঝে হাস্য কাব্যের অবতারণা দেখা যায়। অনেকদিন আগে খুব নামজাদা একজন সাহিত্যিকের স্মৃতি সভা সাহিত্য পরিষদে হবার কথা ছিল—সেখানে স্থান না কুলানোতে পরেশনাথের বাগানে আংশিক সভা হয়। সেখানে এক অতি বিখ্যাত দেশনেতা ও সাহিত্যিক বক্তৃতা দিতে উঠে মৃত সাহিত্যিকের একটি অতি বিখ্যাত হাটে মাঠে ঘাটে বাটে গীত গানের একটি চরণের অর্দ্ধেকটা বলেই থেমে গেলেন—সামনের দু'চার জন স্মরণ করিয়ে দেবার পর তিনি প্রথম চরণ কষ্টে সমাপ্ত করেন—মৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রতিভারও যা পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে হাসি সম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তেমনি ধারা ব্যাপার প্রায় সব স্মৃতি সভাতেই দেখা যায়। যারা বাংলা সাহিত্যের কোন ধারই ধারেন না অথচ স্মৃতি সভায় যাদের কিছু না বললেও চলবে না—তারা কিছু বলতে হবে বলেই হাস্যকর উক্তি করতে বাধ্য হন। তেমন বক্তাদের বলি—এমন সভায় বক্তৃতা করতে আসবার আগে কোন সাহিত্যিকের স্মৃতিসভা হলে অন্ততঃ তাঁর দু'একখানা বই (কেনেন তো খুবই ভাল—নইলে লাইব্রেরী থেকে এনেও) পড়ে দেখে আসা উচিত নয় কি?

সাময়িক

শাসন সংস্কারে বাংলা

ইংলণ্ডের, প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের আমলে কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার বাৎসরিক বেতন ছিল ২০০০ পাউণ্ড, সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী হওয়াতে তিনি দুই হাজারের স্থানে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পাইবেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার ঠিক নিম্নস্থ পদের বেতন আমরা দেখিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদের বাংলা দেশে ৪জন একজিকিউটি কাউনসিলর ও ৩ জন মন্ত্রী আছেন ইঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক ৬৪০০০৲ মুদ্রা বেতন পান। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন আর বাংলা দেশের শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদের বেতন প্রায় সমান। ইংলণ্ড ও বাংলা দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা সমান নহে—উভয় কার্য্যের দায়িত্বও তেমনি সমান বলা যায় না—শুনিতেছি নূতন যে শাসন সংস্কার আসিতেছে তাহাতে বাংলায় মন্ত্রী হইবেন আটজন। তাহার শ্রেণী বিভাগ এইরূপ—একজন ইওরোপীয়, একজন অনুন্নত হিন্দু, একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, আর পাঁচ জন মুসলমান। ইওরোপীয় মন্ত্রীর হাতেই আইন ও শাসন শৃঙ্খলার ভার থাকিবে, অপরাপর মন্ত্রীদের হাতে অন্যান্য বিভাগের ভার থাকিবে। প্রত্যেক মন্ত্রীর দুইজন করিয়া সেক্রেটারী থাকিবেন। মন্ত্রীরাও যেমন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন তেমনি প্রত্যেক মন্ত্রীর একজন করিয়া পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতেই গৃহীত হইবেন। অপর একজন করিয়া সেক্রেটারী সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী হইবেন। ইঁহারা হইবেন স্থায়ী সেক্রেটারী। ইঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন না—অপর সেক্রেটারীরা তাহা পারিবেন কারণ তাঁহারা কাউন্সিলেরই সভ্য। নূতন সংস্কারে মন্ত্রীদের বেতন যতদিন নির্দ্দিষ্ট না হয় ততদিন এখনকার ৭ জনের বেতনই ৮জনের মধ্যে বিভক্ত হইবে। এ গুজব সত্য হইলে বাংলার শাসন ভার অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে। তাহার উপর সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী বৈষম্যও সীমা ছাড়াইয়া যাইবে। হিন্দুরা একদিন মন্ত্রীমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ইহা তাহারই প্রতিদান না কি?

—

লাহোর বিক্ষোভ

লাহোর সহিদগঞ্জে গুরুদ্বারের প্রাঙ্গণে এক জীর্ণ মসজিদ ছিল। কে তাহার অধিকারী শিখ না মুসলমান তাহা লইয়া দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পর ১৯৩০ সালে আদালতের সিদ্ধান্তে উহা শিখদের বলিয়া স্থির হয়। উহা অতি জীর্ণ হওয়াতে শিখেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে—সহস্র সহস্র মুসলমান ইহাতে অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সমবেত হয়। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে বহু পুলিশ ও সৈন্য আমদানী করিয়া হাজার হাজার মুসলমানের গতিরোধ করিতে হইয়াছে—তাহারা সৈন্যদের উপরেও ইটপাটকেল ছুড়িয়াছে—সৈন্যেরাও সংযতভাবে গুলি চালাইয়াছে—ইহাতে কিছু মুসলমান হতাহতও হইয়াছে। পরে মুসলমানেরা নেতাদের অনুরোধে এ ভাবের মিছিল বন্ধ করিয়াছে। মুসলমানদের শান্ত করিবার জন্য বৃটিশ সরকার গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে রূপান্তরিত একটি বড় মসজিদ দান করিতে চাহিয়াছিলেন—মুসলমানদের ধীরতার জন্য প্রশংসাও করিয়াছিলেন কিন্তু মুসলমানেরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহে—তাহারা সহিদগঞ্জের শিখাধিকারের ঐ ভাঙ্গা মসজিদই পুনর্গঠিত অবস্থায় চায়। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিয়াছেন নতুবা একটা গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইত।

—

ইটালি ও আবিসিনিয়া

ইটালী ও আবিসিনিয়ার ব্যাপার এত ঘনীভূত হইয়াছে যে, যে কোন সময়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। ইটালী আবিসিনিয়ার নিকট দাবী করিয়াছে—সীমান্ত স্থির করিতে হইবে,—অর্থনৈতিক সুবিধা, ইটালীয় উপনিবেশ হইতে আবিসিনিয়ার মধ্য দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ, আবিসিনিয়ার শাসন বিভাগে ইটালীয় পরামর্শদাতা নিয়োগ—ইত্যাদি। কিন্তু আবিসিনিয়ার সম্রাট তাহাতে রাজী নহেন—তিনি বলেন—ইতিহাসের শিক্ষা এইরূপ যে ঐরূপ সুবিধা গ্রহণ করিয়া বিদেশীগণ শেষে ঐ রাজ্য জয় করিয়া থাকেন। আবিসিনিয়ানেরা জাতি সঙ্ঘ ও বড় বড় সকল রাজ্যের কাছেই আবেদন জানাইয়াছে যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে, যদি তাহা না হয় তবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে যুদ্ধ করিবে। ইটালীর মুসোলিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়াছেন ইটালীর উপনিবেশ বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন তাই আবিসিনিয়া তাহার চাই-ই। মুসোলিনি তিন শতাধিক এরোপ্লেন পাঠাইয়াছেন আবিসিনিয়াকে অন্তরীক্ষ হইতে বিপর্য্যস্ত করার জন্য—এইরূপ প্রকাশ। আর সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র যে কত যাইতেছে তাহার তো সংখ্যাই নাই। কি সৈন্য সংখ্যায় কি আধুনিক যুদ্ধোপকরণে ইটালী সব বিষয়েই আবিসিনিয়ার চেয়ে বড়। কিন্তু বহু বর্ষ পূর্ব্বে ইটালী একবার আবিসিনিয়া গ্রাস করিতে গিয়া হতমান হইয়াছিল। আজিকার ইটালীর তেমন অবস্থা না হওয়াই সম্ভব কিন্তু হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। আবিসিনিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প তাহাতে একটি আবিসিনিয় থাকিতেও যে সে যুদ্ধ ছাড়িবে না ইহাও নিশ্চিত মনে হয়। আবিসিনিয়ার সম্রাট সম্প্রতি বলিয়াছেন—'হে সৈন্যগণ! আজ তোমাদের বীর পিতৃ পুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর; আবালবৃদ্ধ সকলে মিলিত হইয়া—আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ কর। তোমাদের সম্রাট তোমাদের মধ্যে থাকিয়াই সংগ্রাম করিবে এবং প্রয়োজন হইলে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতার জন্য নিজের রক্ত ঢালিতেও ইতস্ততঃ করিবে না।......ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন অপেক্ষা স্বাধীনভাবে মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়। শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যার সমাধান না হইলে যতদিন একজন লোকও জীবিত থাকিবে ততদিন ইথিওপিয়া ভগবানের উদ্দেশে হস্ত প্রসারিত করিয়া সংগ্রামে নিয়োজিত রহিবে।'

ইটালী যুদ্ধে যেরূপ আগ্রহান্বিত ও উড়োজাহাজ ইত্যাদি দ্বারা যেরূপ তাড়াতাড়ি যুদ্ধ জয় করিতে চায় আবিসিনিয়া যদি যুদ্ধ তেমনি দীর্ঘকাল চালাইয়া যাইতে পারে তবে ইটালীর অবস্থা সুবিধাজনক হইবে মনে হয় না। ইটালীর আর্থিক অবস্থা এমন নহে যে দীর্ঘকাল দূরান্তরের এই যুদ্ধের খরচ সহ্য করিতে পারে। তাহার উপর যুদ্ধকালে ইওরোপেও ইটালীয় বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি তেমন কিছু আশাতীত ঘটে তবে আফ্রিকার অধিবাসীরা তথাগত ইওরোপীয়দের সম্পর্কে একেবারে অন্য মত ধারণ করিতে পারে। রুস জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে ইওরোপ এসিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল রুস জাপান যুদ্ধের পর তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আফ্রিকায় তেমন কিছু হইবে কিনা কে জানে? সিনর মুসোলিনী আজ যেমন তাঁহার অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া আবিসিনিয়া গ্রাস করিতে যাইতেছেন রাসিয়ার জারও তৎকালে জাপানের উপর তেমনি বিজয়গর্ব্বে সুনিশ্চিত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—যদি পরিণামও তেমনি হয় তবে হয়তো আফ্রিকানরা ইটালীর বলদৃপ্ত ডিকটেটরকে ভবিষ্যতে একদিন ধন্যবাদই দিবে। কিন্তু এ যুদ্ধে ইংলণ্ডের অনিচ্ছাই প্রকাশ পাইতেছে এবং জাতি সঙ্ঘ যদি এ বিষয়ে সক্রিয় হন তবে যুদ্ধ না-ও হইতে পারে।

তরুণ সাহিত্য ও সুভাষচন্দ্র

বিদেশ হইতে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু একখানি পত্র লিখিয়াছেন—তাহাতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে লিখিয়াছেন—'আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে—অথচ আজকাল দেশের

আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয় তবে তাহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্ত্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার সেইরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাহিত্যের আমি কল্পনা করিতে পারি না।'

সুভাষবাবু যে কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক—বর্ত্তমানের তরুণেরা তরুণ সাহিত্য পড়িতে বেশী আগ্রহ দেখাইবে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য পাঠেরও যে একটা বয়স আছে তাহা তাহাদের বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। অভিভাবকেরা বা শিক্ষকেরাও এ বিষয়ে তরুণদের মতি অনেকটা স্থির করিতে পারেন। যাহাতে মানুষের মত জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে তেমন সাহিত্য সব দেশেই রহিয়াছে—কিন্তু তাহা তরুণদের চিনাইয়াও দিতে হইবে।

শ্রীযুত শরৎ বসুর মুক্তি

মহামান্য বড়লাট ২৫ শে জুলাই কলিকাতায় আসিয়াছেন—২৬ শে জুলাই দ্বিপ্রহরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে কোনরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ না করিয়াই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত বসুর মুক্তির সংবাদ তখনই খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যায় বিঘোষিত হয়—এই আনন্দ সংবাদে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শ্রীযুত বসুর মুক্তিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে এই ভাবিয়া যে এবার বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে হয়তো বা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। দীর্ঘ দিন ঘর সংসার, ব্যবসায় প্রভৃতি ছাড়িয়া থাকাতে সব বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। —শরৎ বাবু সে সব আবার গুছাইয়া নিন।—জনসাধারণও তাঁহাকে একান্তভাবেই নিজেদের মুখপাত্ররূপে চাহে—সত্য নেতার সমস্ত গুণ লইয়া তিনি দেশে ভাস্বর হইয়া উঠুন ইহাই আমরা কামনা করি।

—

পরলোকে মনোরমা দেবী

খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মনোরমা দেবী আর ইহলোকে নাই। ইনি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে চিরকাল পার্শ্বে থাকিয়া রামানন্দ বাবুকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সাহস দিয়াছেন—আজ এ বয়সে—ষাটের কোঠায় পা দিয়া এমন পত্নীকে হরাইয়া রামানন্দ বাবু কত শোক পাইলেন তাহা বলা যায় না। সতী নারী স্বামী ও পুত্রকন্যা রাখিয়া স্বর্গে গেলেন—তাঁহার জন্য শোকাশ্রু ফেলিব না—আমরা রামানন্দ বাবু ও তাঁহার পুত্র কন্যাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

—

পরলোকে নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

পুরুলিয়ার বিখ্যাত দেশকর্ম্মী নিবারণ দাশগুপ্ত মহাশয় আর ইহলোকে নাই। মহাত্মার আদর্শ ও নীতির এমন একজন মর্ম্মগ্রাহী কমই দেখা যায়। আজীবন বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে ইনি জাতিকে সত্য মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্র প্রসাদ

ইউনাইটেড প্রেসের দিল্লী-সিমলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সত্যেন্দ্র প্রসাদের তরুণ বয়সে মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। সত্যেনবাবু সাংবাদিকের কার্য্যে ক্রমেই খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন, ইনি সুসাহিত্যিক শ্রীযুত সরোজ নাথ ঘোষ মহাশয়ের জামাতা। সত্যেন বাবুর স্ত্রী ও স্বজনকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

পরলোকে দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

গত ২১শে জুলাই ভারতীয় সঙ্গীতের আজীবন সাধক দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। ঠাকুর পরিবারের নানাজন যেমন কলাশিল্পের নানা বিভাগে বিখ্যাত হইয়াছেন দীনেন্দ্র নাথও তেমনি সঙ্গীতে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি ৺ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র ও ৺ দীপেন্দ্র নাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইনি শান্তি নিকেতনে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকিতেন—রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সঙ্গীতকে সুরের মোহিনী খেলায় দীনেন্দ্রনাথ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে দীনেন্দ্র নাথ যেমন বিশেষজ্ঞ ছিলেন রবীন্দ্র নাট্যেও অতি স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। দীনেন্দ্র নাথেরও সন্তানাদি নাই—তাঁহার পত্নী ও স্বজনকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান দীনেন্দ্রনাথের আত্মার কল্যাণ করুন।

পরলোকে হেমেন্দ্রলাল রায়

মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে সুকবি হেমেন্দ্র লাল পরপারের যাত্রী হইলেন—আরো ছদিন তাঁহার মধুর সঙ্গ উপভোগ করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম—আরো কিছুদিন বাঁচিলে হয়তো তিনি বঙ্গ ভারতীকে আরো ইচ্ছামত রত্নে সাজাইতে পারিতেন কিন্তু কালের কঠোর বিধানে তাহা সম্ভব হইল না। জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়া হেমেন্দ্রলালকে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—হেমেন্দ্রলাল সাহসী চিত্তে হাসিমুখে তাহা করিয়া গিয়াছেন। কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। যখন যে সংবাদ পত্রে ছিলেন সেইখানেই বহু নূতন লেখককে স্থান দিয়া সাহিত্য সেবায় তাহাদের পথ উন্মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। হেমেন্দ্রলালের সন্তানাদি নাই—তাঁহার শোকবিধুরা পত্নীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ভগবান তাঁহাকে শান্তি দিন ও হেমেন্দ্রলালের আত্মার কল্যাণ করুন।

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ-দিনে ঝরিছে জল বিজলী চমকে দূরে!
বাদল-বধূ গাঁথিছে মালা পুলকে পরাণ-পুরে!
নিবিড়-মেঘ প্রভাত-গানে,
সজল-সুর জাগালো প্রাণে,
নীল-নদীতে কল্লোল জাগে
মন্দ-মধুর-সুরে!

বিরহী-মন জাগিল নব-অগুরু-ধূপের-গন্ধে,
শিথিল-বাহু মেলিয়া দিনু নীলাম্বরের-ছন্দে,
মাতাল-নিশি তোমারে মাগে,
জটিল জটা সে-অনুরাগে,
চকিত-পদে চৌদিকে মোর
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে!

অবুঝ

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ওগো স্রষ্টা—,
সবে বলে তুমি নাকি সব দ্রষ্টা?
দেখিতেছি তবু অধর্ম্মের জয়,
ধার্ম্মিকের হেথা সদা পরাজয়,
মানুষের মাঝে মানুষেরই ক্ষয়,
বলে দাও তবে ওহে দয়াময়,
কি হবে ধরার শেষটা,
ওগো স্রষ্টা॥

জীবগণ যদি তোমারি সৃজন,
হিংসা দ্বেষ তারা করে কি কারণ,
মানুষের মাঝে কোথা নারায়ণ
রক্তারক্তি যবে হয় মহারণ?
তুমি চেয়ে আছ যদি সর্ব্বক্ষণ—
(তবে) মানুষের কোন দোষটা?
ওগো স্রষ্টা॥

গ্রন্থ-পরিচয়

'কাজরী' শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গানের বই। দাম একটাকা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই গ্রন্থে পঞ্চাশটিরও বেশী গান আছে। গানগুলি সবই হিন্দুস্থান, গ্রামোফোন, টুইন রেকর্ডে গীত হইয়াছে—এবং সুরও দিয়াছেন বাংলার খ্যাতনামা সুরশিল্পীরা। জনপ্রিয় গীত রচয়িতা হিসাবে ধীরেন্দ্র বাবুর বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে—ধীরেন্দ্র বাবু সুকবিও বটে—তাঁহার এই কবিত্ব মণ্ডিত গানগুলি যে শুধু শুনিয়াই সুখ তাহা নহে—পড়িয়াও বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। গান যাঁহারা ভালবাসেন 'কাজরী' তাঁহাদের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে বলিয়াই মনে হয়।

—

'আশোয়ারী' শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গানের বই। দাম একটাকা। প্রাপ্তিস্থান ডি এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। এ বই খানিতে আশীটির বেশী গান আছে এবং ইহারও অনেকগুলি গান বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের দ্বারা গ্রামোফোনে গীত হইয়াছে ও সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। ধীরেন বাবুর গানের মধুর কবিত্ব মণ্ডিত পদ গুলি, মধুর শব্দ ঝঙ্কার, ছন্দের লালিত্য—স্বল্প কথায় প্রাণের অন্তস্থলে প্রবেশকারী সাবলীল ভাবপ্রবাহ সহজেই মন অধিকার করে। রেকর্ডেও এই গান গুলি শুনিয়া যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় বই পড়িয়াও তেমনি আনন্দ পাওয়া যায়। সঙ্গীতামোদীদের মধ্যে এই জনপ্রিয় গীতি মঞ্জুষা খানির বিশেষ আদর হইবে মনে হয়।

'বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের কথা' শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রণীত। মূল্য বারোআনা। মহাযুদ্ধের সময় যে সব সাহসী বাঙ্গালী যুবক অ্যাম্বুলেন্সে যোগ দিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন গ্রন্থকার তাঁহার মধ্যে একজন। বই-খানি উপন্যাসের মত চিত্তগ্রাহী। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। বই-খানিতে কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ ছাড়া আর কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল না।

সাহিত্য-সংবাদ" শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্তের নূতন কবিতা গ্রন্থ 'রূপায়তন' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বনের পাখী

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

পথহারা ঐ বনের পাখী
নীল অকাশের তলে,
কি জানি সে বলে;
উদাস-করা করুণ সুরে
গান গেয়ে সে চলে।
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে,
খুঁজে বেড়ায় সে কাহাকে,
কাহার তরে উতল আঁখি
ভরে আসে জলে।
রবির আলো গেল ঢেকে
আকাশ পটে আঁধার এঁকে
তবু কি পথ শেষ হল না,
কিসের নেশায় চলে;
কি জানি সে বলে।

গান

কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

ঐ দূরে ঐ রাখাল ছেলে
গান গেয়ে যায়।
চেনা ঐ মধুর সুরে
কি গান সে গায়॥

মেঠো পথে রাখাল ছেলে
গানের তালে চরণ ফেলে,
তাহারি ঐ সুরের ধ্বনি
নীলাকাশে ঐ যে মিলায়॥

গায় সে গান পরাণ ভরি
কারে যেন স্মরণ করি
মেঠো পথে আঁকি যেন
সুরের আলিপনায়॥



প্রিয় প্রতীক্ষায়

৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৯ম বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪২ | ৫ম সংখ্যা

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই, সি, এস

[শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস প্রণীত 'অনাগত সুদিনের লাগি' একটী সম্পূর্ণ গল্প, কবিতায় লেখা। কয়েকটী পৃথক কবিতায় এই বিচিত্র গল্পটি সমাপ্ত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে। গল্পটি romantic এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রগতির উপযুক্ত। বর্ত্তমানে যে কয়জন আই-সি-এস লেখক নানা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন শ্রীযুক্ত হালদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার অভিনবে তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন—বর্ত্তমান বিচিত্র সুন্দর গাথাটিতেও তিনি অতুলনীয় কাব্য-মাধুর্য্যের সহিত অনাগত সুদিনের যে আলেখ্য ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।]

দুই

এ ধরণী প্রতিদিন
ফেলে শ্বাস বিরাম-বিহীন,
মেঘ-দয়িতের লাগি কত মাস কত আরাধন,
তবে গলে আকাশের মন।

উপবন-বৃতিকার পাশে
পুষ্প সে কি আপনি বিকাশে?
কত নিদাঘের দিনে ক্লান্তকায়ে সলিল-সিঞ্চনে—
দিনে দিনে আশা কোরে চেয়ে থাকা কত আকিঞ্চনে
আনন্দ-বন্দনা গীতি উঠে চুপে চুপে,
একদিন দেখা দেয় কলিকার রূপে।

এ কথা ভাবিছে নববধূ
আমার হৃদয় ভরা অপ্রমেয় সঞ্জীবনী মধু
সুলভে বিকায়ে যাবে ?—অভিলাষ এ নহে বিধির
সুদুর্গম দুর্গ মাঝে স্থান তাই মহার্ঘ নিধির,—
সহজে দিব না ধরা।

বার বার ফিরে যাবে ভগ্ন-আশা বিফল প্রয়াসে
বহুদিবা যামিনীর ব্যর্থতার সকোপ হতাশে,
মুছে যাবে মন হতে অন্য সব কামনার কালো
একমাত্র আমাকেই সত্য কোরে বাসিবে ও ভালো
একমাত্র মোর তরে সাধনায় তপস্যায় রত
অশ্রুজলে রাত্রিদিন মোরি ধ্যান করিবে নিয়ত—
সেই দিন আপনারে দিব বিলাইয়ে
উচ্ছ্বসিত অশ্রুমাঝে হাসি মিলাইয়ে,
সেই দিন ভরি দিব মধু—
ভাবে নববধূ।

কিন্তু যদি সে দিনের নাহি পাই দেখা
চলে যাবো একা।
কূল যদি নাহি পাই, অনিশ্চিতে ভাসাইব ভেলা
তবু না সহিব অবহেলা।
কারো পরে করিব না রোষ
দিব নাকো অদৃষ্টের দোষ।
অর্জ্জিব আপন ভাগ্য চূর্ণ করি বাধা পলে পলে
আপনার সুকৃতির বলে।



সাম্যবাদী

গল্প

শ্রীমতী নন্দরাণী হালদার

[শ্রীমতী নন্দরাণী হালদার নূতন লেখিকা—অন্তত পুষ্পপাত্রে তিনি নূতন লিখিতেছেন। তাঁর এই গল্পটিতে তিনি সাম্যবাদী সত্যহরির যে আলেখ্যটি দিয়াছেন তা সংসারে দুষ্প্রাপ্য নয়—বরঞ্চ অনেক সংসারেই আছে। কিন্তু এভাবে এমনি ছবিকে রূপ দেওয়া খুব বেশী হয় নি—সে দিক দিয়ে সাম্যবাদীর বিশেষ মূল্য আছে মনে হয়। পাঠক-পাঠিকারা গল্পটি পাঠে খুসী হবেন আশা করি।]

সত্যহরি যখন ছয় মাসের ছেলে, তখন একজন বড় জ্যোতির্ষি হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলে সংসারে থাকিবেনা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে', বোধকরি সেই জন্যই ভয় পাইয়া যোগমায়া পুত্রের বিবাহটা একটু তাড়াতাড়িই দিয়া ফেলিলেন। যদি নববধূর টানে ছেলে সংসারবাসী হয়, নতুবা জ্যোতিষের কথা,—কি হয়, কিছুই বলা যায় না।

তিরিশ বছর বয়স অবধি সত্যহরির সন্ন্যাস গ্রহণের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা, পুরাদস্তুর সংসার করিতেই লাগিল। কিন্তু তার সব কাজেই, যখন পরমেশ্বরের দোহাই সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, এবং শুচিতা ও পবিত্রতা যুগপৎ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল,তখন তাহার আতিশয্যে পাড়ার আবালবৃদ্ধ সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া যোগমায়া একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যহরির যে ব্যক্তির সহিত আলাপ হইত, সে ব্যক্তি তাহার সর্ব্বজীবে সমজ্ঞানের ব্যাখা শুনিয়া একেবারে হতবাক হইয়া যাইতেন।

দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিস করিয়া, সকাল সন্ধ্যা গঙ্গা স্নান করিয়া, এবং পরমেশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে সত্যহরির সংসার যাত্রা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু দুইটী সন্তানের পর যখন তৃতীয়টীর সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইবার উপক্রম হইল। অকস্মাৎ সংসারে সত্যহরির অতি বিরাগ জন্মিল, এ সংসার যে কেবল মাত্র মায়ার বন্ধন, এবং এই মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া জীব কেবল দুঃখ ভোগ করিয়াই চলে, ইহা বোধকরি তখনই সে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল এবং এই মায়ার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে জীবের যে আর কোনরূপেই মুক্তি নাই ইহাও সে সকলকে জানাইতে ত্রুটি করিল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই বৈঠকখানা হইতে চেয়ার টেবিল তক্তপোস ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইল, এবং সে স্থানে নানা রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি সজ্জিত হইল। সত্যহরি মাছ মাংস ত্যাগ করিল। খদ্দর গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হইয়া অঙ্গে উঠিল এবং দিবারাত্র ধূপ-ধুনা, স্তব স্তোত্রের শব্দে, বাড়ী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল।

যোগমায়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। তিনি বিধবা মানুষ, সত্যহরিই জ্যেষ্ঠ পুত্র; মধ্যম বিনোদ বিবাহ করিলেও বাহিরের পয়সা ঘরে আনা অপেক্ষা ঘরের পয়সা বাহির করিতে অধিক তৎপর। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভু এখনো নাবালক। স্কুল, ফুটবল ম্যাচ, অনাথ সেবা মন্দির ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ লইয়াই সে বার ঘণ্টার মধ্যে এগার ঘণ্টা বাহিরে থাকে। খাইবার সময় ব্যতীত প্রায়ই বাড়ীতে তার দর্শন মেলেনা। জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম কন্যা শ্বশুরালয়েই থাকে। কনিষ্ঠ কন্যা সুমতি চারিটী সন্তানের জননী। তার উপর কয়েক বৎসর যাবৎ স্বামী-সহ কায় ভুগিতেছে। শ্বশুরবাড়ী কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে, ভাতকাপড়ের তথায় সংস্থান না থাকিলেও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের তথায় অভাব নাই, কয়েক বৎসর যাবত স্বামীর চাকুরী নাই, কাজেই স্বামীপুত্র লইয়া সে পিত্রালয়েই বাস করিতেছে। যোগমায়াকে সকল দিকেই নজর রাখিয়া চলিতে হয়, অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয়।

কয়েকদিন হইল সত্যহরির পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র কালীপদর জ্বর হইয়াছে। প্রথম কয়েকদিন স্নান বন্ধ করিয়া, সাগু বার্লি খাওইয়া রাখা হইল, কিন্তু জ্বর উপশম না

হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। রাত্রে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর উঠিয়াছে এখনও নামে নাই। সকাল বেলা উঠিয়া যোগমায়া চিন্তিত মুখে বৈঠকখানা ঘরের দিকে, অর্থাৎ সত্যহরির পূজার ঘরের দরজায় আসিয়া উঁকি দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে যোগমায়া বৈঠকখানা ঘরে আসিতেন না।

সত্যহরি সবেমাত্র গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। যোগমায়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—সতু; পদর জ্বরটা যে কিছুতেই ছাড়ছেনা বাবা; ডাক্তারের কাছে একবার যা; ছেলেটা কদিন আর ভুগবে?

সত্যহরি মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ভগবান যার কপালে যতটুকু ভোগ লিখেছেন তাকে সেটুকু ভুগতেই হবে মা; তুমি কিছু করতে পারবে না। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া বলিল—এই সংসার একটা মিথ্যা বন্ধন, মিথ্যা মায়া, এর থেকে মনকে মুক্ত করো। আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল; সব মিথ্যা মা সবই মায়ার খেলা একমাত্র তিনিই সত্য তাঁকে চিন্তা করো। সত্যহরি চক্ষু মুদিয়া ঊর্দ্ধে কড়িকাঠের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া ভগবানের নির্দ্দেশ করিল।

যোগমায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা হলে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে পারবিনে? ছেলেটা ওই রকম জ্বরে ভুগবে?

সত্যহরি উদার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—কে কার ছেলে? কে কার বাপ? কিসের এই উদ্বিগ্নতা, কিসের জন্যই বা এই ব্যস্ততা? তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? একবার ভেবে দেখ দেখি মা এ সবই মনের বিকার মাত্র। মনকে বিকার শূন্য, নিরুদ্বেগ কর, প্রশান্ত কর।

যোগমায়া এইবার বিলক্ষণ রাগিয়া বলিলেন,—ঘরে রোগা ছেলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করবে, আমি বিকার শূন্য নিরুদ্বেগ হয়ে প্রশান্ত মনে পরমেশ্বরের চিন্তা করব? বাপের উপযুক্ত কথাই বটে!

সত্যহরি চক্ষু মুদিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—এই তো বললুম মা কে কার ছেলে? কেই বা কার বাপ? সবই মনের বিকার মাত্র। ভগবানে নির্ভর কর তাঁকে চিন্তা করো মা।

যোগমায়া আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। বিনোদ তখন সবেমাত্র চা'পর্ব্ব শেষ করিয়া সার্ট গায়ে দিতেছে; যোগমায়া বলিলেন—ওরে একবার ডাক্তারের কাছে যা পদর জ্বরটা খুব বেড়েছে।

দাদাকে যেতে বলো, আমাকে এখনি একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে। বলিতে বলিতেই সে দরজা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। তাহার নাগাল ধরিতে যাওয়া বৃথা, বুঝিয়া যোগমায়া অগত্যা শম্ভুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে ফুটবল কিনিতে পয়সা দিবার কবুল করিয়া তাহাকেই ডাক্তার খানায় পাঠাইলেন।

২

রবিবার দিন খাওয়া দাওয়া চুকিতে একটু বেলা হইত। বেলা তখন দুইটা। সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বড় বধূ রান্না ঘরের কাজ সারিয়া নিজের ভাত লইয়া খাইতেছেন। সত্যহরি আসিয়া বলিল,—একজন ভিক্ষুক এসে ভাত খেতে চাইছে, তাকে দুটী ভাত দাও দিকিন্।

যোগমায়া রান্না ঘরের রোয়াকে বসিয়া সুপারি কুচাইতে ছিলেন, বলিলেন,—এত বেলায় ভাত কোথায় পাবরে? সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে। ভিকিরিকে কিছু চাল কিম্বা পয়সা টয়সা দে বাবা, এতো বেলায় কি আবার রান্না চড়াতে যাব?

রান্নাঘরে বড় বধূর ভাতের থালার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া সত্যহরি বলিল,—কেন, ওইতো রয়েছে, ওই দাওনা।

যোগমায়া সকাল হইতেই আজ মনে মনে রাগিয়া ছিলেন, একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—ওই ভাত দিয়ে দেবে তো ও নিজে কি উপোস করে থাকবে? না—এই বেলা দুটো পর্য্যন্ত তোদের সকলের পিণ্ডির জোগাড় করে, এখন আবার নিজের জন্যে রান্না চড়াতে যাবে?

সত্যহরি একেবারে নাচিয়া উঠিয়া, তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—নিজের খাওয়াটাই বড়ো হলো। অভুক্ত ভাত চেয়ে ফিরে যাবে; আর তোমরা নিজেরা ঘরে বসে গিলবে? নিজেদের ক্ষিদে তেষ্টায় যে কষ্ট বোধ করো, অন্যের যে ঠিক তাই হয় সেটা বুঝতে পারনা? নিজের সুখ নিজের ভোগটাই জগতে বড়ো নয়। জগতের সকলকেই নিজের সঙ্গে সমান করে দেখতে চেষ্টা কোরো মা, সকলের কষ্ট সকলের দুঃখই নিজের মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—ভগবান সকলের জন্যেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুটীতেই সকলের সমান অধিকার।

যোগমায়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন,—তা বৌমার বাড়াভাত ভিকিরিকে না দিলেই নয়? চাল দিচ্ছি পয়সা দিচ্ছি তাতে হবেনা?

সত্যহরি বলিল,—এই দুপুর বেলা সে এখন কি নিজে রেঁধে খেতে যাবে মা? আচ্ছা না হয় ও ভাত নাই দিলে তোমরা আলাদা দুটী রেঁধেই দাওনা বাপু। তার পর একবার চক্ষু মুদিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—জীবনে সেবার তুল্য কি আর ধর্ম্ম আছে? জীবের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি।

যোগমায়া বাদ প্রতিবাদ না করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—তা যদি তুমি সত্যই আজ বুঝে থাক সতু তা হলে আমি রান্নার সমস্ত জোগাড় করে দিচ্ছি তুমি নিজে রেঁধে পরিতৃপ্ত করে অতিথিকে খাওয়াও দেখি, অন্যের সেবার উপর জুলুম করোনা। ভর্ত্তি পেটে দিবা নিদ্রা সেরে এসে আর একজনের বাড়াভাত টেনে নিয়ে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাতে যেওনা বাবা। নিজে হাতে সব করে সেবা-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাও দেখি।

বড়বধূ এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক ভাবে সব শুনিতেছিলেন। যোগমায়ার দিকে আগাইয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—অত গণ্ডগোলে দরকার কি মা? ওই ভাত ওকে দাও। আমার আজ তত ক্ষিদে নাই। কিছু জল টল খেয়েই কাটিয়ে দিব।

বড় বধূ ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক, যাঁহারা সংসারে সকল রকম অসুবিধা সহ্য করিলেও মুখ ফুটিয়া কিছুর প্রতিবাদ করিতে পারেন না। দুঃখ কষ্টের গুরুভার যখন তাঁহাদের আকণ্ঠ হইয়া ওঠে, তখন তাঁহারা নিজের অদৃষ্টকে অনবরত ধিক্কার দিতে এবং চোখের জল ফেলিতে থাকেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কখনোও প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন না। বড়বধূও ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ। খুব কোমল বা স্নেহপ্রবণ প্রকৃতির না হইলেও তিনি নীরবেই সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেন। সংসারের সব বিষয়েই উদাসীন কোন বিষয়েই তাঁর নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করিতেন না। সংসারের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁর যে নিজস্ব কোন স্বত্তা আছে ইহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না।

যোগমায়া তাহা বুঝিতেন। তাই বড়বধূর কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বেশ যা সুবিধে বোধ কর তাই কর বৌমা আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন নেই। বলিয়া তিনি উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গম্ভীর মুখে আপন শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল সত্যহরি ভিক্ষুকটিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝাইতেছে। ইদানিং বাড়ীর লোকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আর শুনিতে চাহিত না। সকলেই উত্যক্ত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই রবিবারের নিরবচ্ছিন্ন অবসর কাটাইবার জন্য তাহার আধ্যাত্মিক কথা শুনিতে একজন লোক চাই।

সন্ধ্যাবেলা সত্যহরি আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি দিয়া বলিল,—এবেলা কি রান্না হচ্ছে তোমাদের?

বড় বধূ রান্না করিতেছিলেন, মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন,—দেখতেই তো পাচ্ছ।

সত্যহরি বলিল,—আমার জন্যে এবেলা আর লুচি কোরোনা, বুঝেছ?

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবেলা কি তবে পরোটা খাবে?

সত্যহরি একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চোখ বুলাইয়া

হইয়া বলিল,—না, পরোটা খাব না, তোমাদের রান্না ঘরের অপবিত্রতা দেখলে তো এঘর মাড়াতেই ইচ্ছে করে না, তা খাবো কি বলো, রান্না হয়ে গেলে ঘর দোর বেশ করে ধুয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, আমাকে একটু পায়স রেঁধে দিও।

রাত্রে বাড়ীর সকলেই ভাত খাইত। যোগমায়া বিধবা মানুষ তাঁহার জন্য পরোটার ব্যবস্থা, কেবল সত্যহরিকেই লুচি করিয়া দিতে হইত। দুইবেলাই খাইবার পূর্ব্বে আসিয়া সত্যহরি রান্নাঘরে খবরদারী করিয়া যাইত, এবং ব্যঞ্জন পছন্দমত না হইলেই তার সমস্ত অপবিত্র ঠেকিত। তখন আবার তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইত। আজকেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল এবং বড় বধূরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মুখ খানা হাঁড়ি করিয়া তিনি বলিলেন,—পায়স তো রাঁধবো কিন্তু দুধ কোথায়?

সত্যহরি বলিল,—সনাতনকে দুধ আনতে দিয়েছি, এখনি নিয়ে আসবে, হ'সের দুধ; বেশ ঘন করে জ্বাল দিও, দুধ যেন পাতলা থাকে না; বুঝেছ?

বড় বধূ পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন বুঝিয়াছেন। বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শুচিতা বজায় রাখিয়া, সত্যহরি বকের মত সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল।

৩

মাস দুই পরের কথা, বড়বধূ নবজাত কন্যা লইয়া আঁতুড় ঘরে। সুমতি রান্না করিতেছে। যোগমায়া রোয়াকে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন। সত্যহরি একটা মুলতানী গাই এবং তৎসঙ্গে ভোজপুরী পালোয়ানের মত চেহারা এক খোট্টাকে লইয়া বাড়ী ঢুকিল।

যোগমায়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গরু কোথা থেকে আনলিরে?

সত্যহরি বলিল,—কিনে এনেছি মা, ছ'সের করে দুধ দেয়। যত্নে থাকলে আর ভাল খেতে পেলে আরো বেশী দেবে। ভালকরে খেতেটেতে দিও মা, বুঝেছ? গয়লার জোলো দুধ কি আর মুখে দেওয়া যায় আরে ছ্যাঃ! ঘরের গাইয়ের খাঁটি দুধ একবার খেয়ে দেখো।

যোগমায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—ঘরের গাইয়ের খাঁটী দুধতো খাবি, কিন্তু গরুকে এখন রাখি কোথায় বল্‌তো, আর ওর পেছনে খাটবেই বা কে? সংসারের কাজ নিয়েই যে মরবার ফুরসৎ পাই না, সহরে গরু পোষা কি কম ঝঞ্ঝাট না কি? ওর পেছনেই যে এখনি একটা চাকর রাখতে হবে। একটু হাসিয়া বলিলেন,—গরু রাখার খরচায় যে তোর দুধের দাম পুষিয়ে যাবে বাবা।

সত্যহরি বলিল,—তা হোক; কিন্তু এমন খাঁটী দুধ কোথায় পাবে বলতো? আর চাকরই বা রাখতে হবে কেন? তোমরা এতোগুলো মেয়ে মানুষ বাড়ীতে রয়েছে, একটা গরুর কিই বা এমন কাজ, এটুকু আর করতে পারবে না?

যোগমায়া গম্ভীরমুখে বলিলেন—বাড়ীর মেয়েদের তোমার গরুর সেবা করবার ফুরসৎ নেই বাবা। মা, ষষ্ঠীর কৃপায়, তাদের নিজেদের ঝঞ্ঝাট নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত।

সত্যহরি রাগিয়া বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, গরুর জন্যে আমি না হয় একটা চাকরই রাখ্‌ব; তোমাদের অত কথার ধার ধারিনে। খোট্টার দিকে ফিরিয়া বলিল,—ইয়ে রামদীন ইধার আও। বলিয়া সে রাগে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

খোট্টা লোকটি এতক্ষণ বাকবিতণ্ডা শুনিতেছিল, এবং বাঙ্গালা কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও এইটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে গরু লইয়াই মাতা পুত্রে বাক্‌-বিতণ্ডা চলিতেছে, তাই সে একবার যোগমায়ার এবং একবার সত্যহরির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ক্যা হুয়া বাবুজি? আপ লোগ গরু নেই—

সত্যহরি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, তোমলোগ বাৎ মৎবোলো। গরু লকর লিয়েগা। ইধার আও, পয়সা লে যাও।

খোট্টা লোকটী হতভম্ব হইয়া, একবার উভয়ের মুখের পানে তাকাইয়া, আপন প্রাপ্য লইয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া রাগে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, সুমতি রান্না

ফেলিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি সত্যহরির জল খাবারের জন্য কল ছাড়াইতে বসিয়াছিল। ওদিকে রান্নাঘরের রোয়াকে, ভুতো, খেঁদি, নিতাই, কালীপদ, পাঁচু সকলে মিলিয়া ভাত দিবার তাগাদার ঐক্যতান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

মালিকের প্রস্থানে এবং নূতন জায়গায় আসিয়া, গরুটা উঠানে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল. এদিকে অরক্ষিত পাইয়া, সুমতির দুই বৎসরের পুত্র এককড়ি রান্নাঘরে ঢুকিয়া ব্যঞ্জনের মধ্যে একঘটী জলে উপুড় করিয়া দিয়াছে, এবং তাহারই পার্শ্বে একটা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া পরমানন্দে তাহাই চাপড়াইতেছে। খেঁদি চিৎকার করিয়া উঠিল.—দিদিমা, শিগগির এসো, এককড়ি রান্না-ঘরে কি করেছে দেখে যাও।

রাগে দুঃখে যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতেছিল। তিনি উঠিয়া আসিয়া তাহার সমস্তটাই প্রকাশ করিলেন এককড়ির পিঠে।

তাহাকে রান্নাঘর হইতে টানিয়া বাহির করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কন্যাকে বলিলেন,—সুমী, একটু পরে কি আর তোর জল খাবার দিতে গেলে হোতনা? রান্নাঘর ফেলে তোকে কে এখন যেতে বল্লে? জল খাবার তো আমিও দিতে পারি। তারপর উঠানের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—হাঁরে অ—সনাতন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস, সন্ধ্যে হয়ে গেল আলোগুলো জ্বালবিনা? গরুটা যে ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, ওর একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়? না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রকম তামাসা দেখতে হয়? এ বাড়ীর সবাই হয়েছে সমান। বলিয়া এককড়িকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি নিজেই গরু রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

রাত্রে খাইতে বসিয়া সত্যহরি বলিল,—বাড়ীর ছেলে-দের স্বাস্থ্য দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে, তাতো দেখছ না, কিন্তু কেন যে হচ্ছে তা কি খবর রাখ? মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া বলিল,—শুধু খাঁটী জিনিষের অভাবে, বাজারের সব জিনিসই আজকাল ভেজাল কোন জিনিষই খাঁটী নেই। ওসব জিনিস কি কিনতে আছে? বিষ—বিষ ওসব খাওয়া আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—গরুটা সেই জন্যেই নিয়ে এলাম ছেলেপিলে গুলোর স্বাস্থ্যের দিকে তো একটু নজর রাখতে হবে।

প্রয়োজন যে কাহার জন্য যোগমায়া তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন তাই বাদ প্রতিবাদ করিয়া আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না।

সত্যহরি কয়েক গ্রাস খাইয়া লইয়া, কতকটা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল,—জীবনের এই গোনা কটা দিন কাটিয়ে যাওয়া বইতো নয়; সকলে যাতে সুখে শান্তিতে দিন গুলো কাটাতে পারে সেই দিকেই একটু যা নজর রেখে চলি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিল,—তাই বলছি মা যখন মানুষের দিকে চাই তখন শুধু তাঁরই লীলা দেখি মানুষের সেবাতেই তাঁর সেবা, মানুষের তৃপ্তিতেই তাঁর তৃপ্তি। তাই মনে হয়—তোমাদের সেবা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করে গেলেই তাঁর সেবা তাঁর তৃপ্তিসাধন করতে পারবো।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে নিরুত্তরে আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন কোন জবাব দিলেন না।

সত্যহরি খাইতে খাইতে পুনরায় বলিল,—গরুটা ছ'সের করে দুধ দেয় যত্ন পেলে আরও বেশী দেবে। হাঁ, দেখ—বাজারের ওই ছাই ভস্ম ঘি আর কিনোনা মা, ওই দুধ থেকেই মাখন তুলে ঘরে একটু ঘি করে নিও। আচ্ছা, তোমাদের কষ্ট হয় একটা চাকর না হয় রাখবো। কিন্তু চাকরের হাতে কি যত্ন হয়? আরে রাম—বেটারা একের নম্বর ফাঁকিবাজ, টাকা নেবে আর কাজে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা যাকৃগে,—তোমাদের যদি তা'তে সুবিধে হয় না হয় তাই রাখা যাবে, যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন,—অন্য চাকর আর রাখতে হবে না, সনাতনই গরুর কাজ করবে।

সত্যহরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—সনাতন করবে? বেশ,—বেশ, জীবের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—জীবের তৃপ্তি-তেই পরমেশ্বরের তৃপ্তি।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে বলিলেন,—কিন্তু সেজন্য তা'কে আলাদা মাইনে দিতে হবে, টাকা না দিলে সে গরুর সেবা করবে না।

সত্যহরি চটিয়া উঠিয়া খিঁচাইয়া বলিল,—আবার টাকা কিসের জন্যে শুনি? গরু সাক্ষাৎ ভগবতী শাস্ত্রে বলে—গো মাতা, তার সেবা করলে ওর পরকালের কাজ হবে। আবার টাকা চাই। দূর হয়ে যাক্ ও এখনি বাড়ী থেকে।

যোগমায়া বলিলেন, পরকালের ভাবনাটাইতো সকলের বড় নয় বাবা ইহকালের ভাবনাটা ও অনেককে ভাবতে হয়, নইলে যে তাদের চলেনা। সবলেই তো আর তোমার মত পরমেশ্বরে নির্ভর করে দিন কাটিয়ে দিতে পারেনা।

সত্যহরি রাগিয়া বলিল—পাজি নচ্ছার বেঠা, দূর করে দাও ওকে।

যোগমায়া শান্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন—ওকে দূর করলে তো চল্‌বেনা সতু, একদিন চাকর না থাকলে যে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না। বাড়ীর কাজ না হয় আমরা নিজেরাই করে নিলাম, কিন্তু দুবেলা দোকান বাজার কর্‌বার লোকের ব্যবস্থা করে তবে ওকে দূর কোরো।

সত্যহরি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা ওকে না হয়, কিছু দেব গরুর কাজ করতে বোলো।

যোগমায়া আর কোন জবাব দিলেন না। সত্যহরি নতমুখে আহার করিতে লাগিল। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সত্যহরি মুখ তুলিয়া বলিল—হাঁ কি বলছিলাম—দেখ মা এমাসে বিনোদের মাইনের টাকাতেই সংসার চালিয়ে নিতে হবে। আমি যা মাইনে পেয়েছিলাম তা তো গরু কিনতেই ফুরিয়ে গেছে। তা যাকগে সে জন্য আমি ভাবিনে তোমারা তো খাঁটী দুধ খেয়ে বাঁচবে।

যোগমায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন—বলিস্ কি সতু বিনোদের মাইনের টাকায় সংসার চালাব? সে যা মাইনে পায়, তা'তে যে সংসারের দশদিনের খরচাও কুলায়না বাবা, এতো বড় সংসারের খরচা আমি সারামাস চালাই কি করে।

সত্যহরি নির্ব্বিকার ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—জগৎটা যিনি চালাচ্ছেন—সংসারটাও তিনিই চালিয়ে দেবেন মা, জীব যিনি দিয়াছেন আহারও তিনিই দেবেন, না খেয়ে কেউ থাকবে না। তারপর একবার চোখ বুজিয়া বাঁ হাত খানা নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল—এই যে—আমি করছি, আমি বলছি, আমি চালাচ্ছি এই আমিত্ব বোধ—এই অহমিকা ছাড় মা। তিনি যা'কে যে ভাবে চালাচ্ছেন সে সেই ভাবে চলছে। এই আমিত্বের বিকার ত্যাগ কর মা—ত্যাগ কর। দীনবন্ধু—দীনবন্ধু—সত্যহরি গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

যোগমায়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিলেন। সত্যহরিকে কিছু বলিতে যাওয়া বৃথা; পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিবে। তার সন্ন্যাসের উন্নতির সাথে তাল রাখিয়া যোগমায়া খরচা এবং পরিশ্রম আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বিনোদের যৎসামান্য আয়ে এত বড় সংসার চালান যায় না, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধি সংসারের নিত্যকারের রান্না সবই সত্যহরির অপবিত্র ঠেকিত। তার জন্য দুধ দই ছানা মাখন প্রভৃতি এবং নানা রকম ফলের ব্যবস্থা করিতে সংসারে প্রতিমাসেই অভাব অনাটন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এজন্য অনুযোগ করিতে যাওয়া বৃথা। সত্যহরি নিজের সাত্ত্বিক ব্যবস্থা নিজের মাহিনার টাকায় নিজের হাতেই করিত সে জন্যে সে চাকর বা সংসারের অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিত না।

সত্যহরি হাত মুখ ধুইয়া পূজার ঘরে যাইয়া গীতা পাঠ আরম্ভ করিল। প্রত্যহ রাত্রে, আহার করিয়া, আসিয়া শয়নের পূর্ব্বে সে একবার করিয়া গীতা পাঠ করিয়া শুইতে যাইত।

যোগমায়া চিন্তিত মুখে, অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া বোধকরি পুত্রের সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, অথবা এই অভিনব সন্ন্যাসের কথাই, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা, বেলা নয়টা, সত্যহরি খাইতে বসিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিল। যোগমায়া আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, দুধের বাটী টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া

সত্যহরি চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছে। যোগমায়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

সুমতি একপাশে, অপরাধীর মত ছল্ ছল্ চোখে দাঁড়াইয়াছিল, মুখ তুলিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সত্যহরি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—এই জোলো, অখাদ্য দুধ আমাকে খেতে দিয়েছে, ওর কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? বল্লুম, এদুধ খাবনা, তুলে নিয়ে যা, বল্লে, এছাড়া আর দুধ নেই। কেন, ছ'সের দুধ কোথায় যায় শুনি? লজ্জা করেনা ওর এই রকম দুধ আমাকে খেতে দিতে?

যোগমায়া তিক্ত কণ্ঠে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওকে জোলো দুধ দিয়েছিস্ কেন?

সুমতি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, জোলো দুধ আবার কোথায়? আমি কি দুধে জল দেই? যোগমায়া অধিকতর তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন,—দুধে জল দেওয়া হয়না তা আমিও জানি, ওকে রোজ যেমন ক্ষীর করে দেওয়া হয়, সেইটেই করা হয়নি কেন তাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

সুমতি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াই বলিল, ক্ষীর করবো কোথা থেকে? তুমি কাল রোজের দুধে জবাব দিয়েছ। ছেলেদের এবেলার দুধ রাখতে হয়েছে। সকালে দাদাকে ছানা করে দিয়েছি, মাখম তুলেছি আবার ক্ষীর করবার দুধ কোথায় পাঁকে বলো?

যোগমায়া কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছেলেদের জন্যে দুধ রাখতে হবে না, সেই দুধে ক্ষীর করে দাও।

সুমতি রান্না ঘরে চলিয়া গেল। সত্যহরি কিন্তু রাগ করিয়া ভাতের থালা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, অপেক্ষা করিল না। যোগমায়া স্তম্ভিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর রান্নাঘরে যাইয়া সুমতিকে বলিলেন, সনাতনকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, গয়লাকে রোজের দুধ দিতে বলে আসুক। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষন্ন মুখে বলিলেন, ছেলেদের জন্য যেমন গয়লার দুধের ব্যবস্থা আছে, তাই থাক। তুই বাড়ীর দুধের ভরসা করিস্‌নে মা।

সুমতি ভরসা করেও নাই এবং গয়লাকেও বারণ করিতে বলে নাই। যোগমায়াই বাড়ীতে এত দুধ দেখিয়া গয়লার দুধ ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথার আর কোন উল্লেখ না করিয়া সুমতি ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কথায় সম্মতি জানাইল।

যোগমায়া পুনরায় খাইয়া আহ্নিকে বসিলেন। কিন্তু মন শান্ত করিতে পারিলেন না। সত্যহরি যে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছে ইহাই তাঁহার মাতৃ হৃদয়কে অনবরত পীড়া দিতে লাগিল। তিনি কোন রকমে আহ্নিক সারিয়া আসিয়া সুমতির অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা খেঁদিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে তোর বড় মামা কোথায়?

খেঁদি মাতার পরিত্যক্ত বঁটীটা লইয়া পরম মনোযোগের সহিত কুটনার খোসা কুচাইতেছিল, উত্তর দিল 'বড় মামা তো অনেকক্ষণ আপিসে চলে গেছে।'

যোগমায়া রান্নাঘরে মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া খেঁদিকে বলিলেন, আপিসে চলে গেল তা, আমাকে একবার জানাতে নেই? কেন, কি রাজকার্য্য তোমরা করছিলে শুনি?

খেঁদি হতভম্ব হইয়া গেল। হঠাৎ বড় মামার আপিসে যাইবার সংবাদ দিদিমাকেই বা আজ জানাইতে হইবে কেন এবং তা না জানানতেই বা রাগের কি ঘটিল, সে বেচারা তার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, রাগ করে না হয় ভাত খায়নি, কিছু ফল মিষ্টিটিষ্টী, তো খেতে দিতে হয়? আমি না হয় আহ্নিক করতে বসেছিলাম? তোরা কি কর্‌ছিলি? তোরাও কি সবাই আহ্নিক করতে বসেছিলি নাকি?

খেঁদি হঠাৎ আহ্নিক করিবার অভিযোগে আক্রান্ত হইয়া, কোন উত্তর দিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তর দিল রান্না ঘর হইতে সুমতি, বলিল—নিতাইকে দিয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলুম, দাদা বল্লে, কিছু খাবেনা।

যোগমায়া রান্নাঘরে আসিয়া, কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলি তুই? কি বল্লে সে, কিছু খাবে না?

সুমতি কড়ার মধ্যে খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, হুঁ।

যোগমায়া আর কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে আপন মনেই বলিলেন,—তাই হবে, সকালে জল খেয়েছে তাতেই হয়ত পেট ভরে আছে, ক্ষিদে তেমন নেই। বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

৫

সুখে দুঃখে সংসারটা যোগমায়ার একরকম চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কলেরা হইয়া বার ঘণ্টার মধ্যে বড়বধূ যখন সংসারের সকল দায়িত্ব ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, তখন মাতৃহীন দুইটি শিশুপুত্র এবং পাঁচ মাসের কন্যাকে লইয়া যোগমায়া যেন অকূল পাথারে পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য এই সংসার তরণীটি যেন বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। সংসারের চৌদ্দ আনা কাজের ভার ছিল বড়বধূর উপরে, সকল রকম অসুবিধা মাথা পাতিয়া লইয়া, নীরবে সংসারের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এমন নিয়মিতভাবে করিয়া যাইবার লোক সংসারে আর দ্বিতীয় ছিল না। কাজেই সংসারের ষোল আনা ভার আসিয়া পড়িল যোগমায়ার উপর।

পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার সৎউপদেশ অনেকেই যোগমায়াকে দিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছাকে মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি মনে স্থান দিলেন না। পুত্রের প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতার স্বরূপটি এসংসারে তিনি নিজে যতটা জানিতেন, এমন বোধ করি আর কেহ জানিত না। তাই দ্বিতীয় বার পুত্রের বিবাহ দিয়া, আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিতে তিনি চাহিলেন না। কিন্তু এই বয়সে সংসারের কাজ, মাতৃহীন শিশু তিনটির লালন পালন, এবং সত্যহরির পরিচর্য্যা করা তাঁহার সাধ্যে কুলাইয়া উঠিতেছিল না।

কিন্তু দিন কাহারও বোধ করি আটকাইয়া থাকে না, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, সকলেরই এক প্রকার হইয়া যায়। তাই অনাহূতভাবেই সংসারে একটি ঝি মিলিল হরিদাসী। হরিদাসীর বয়স বছর একুশ হইবে। বড় ভাল লোক, বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, বিধবা মানুষ পেটের সংস্থান করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। নিজের ছেলে পিলে নেই, ছোট ছেলে বড় ভালবাসে। দুই একদিনের মধ্যেই মাতৃহীন শিশুদুইটির সকল ভার সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু তাই নয়, রান্না ছাড়া, সংসারের আর সমস্ত কাজের ভারই তাহার উপর যাইয়া পড়িল। কিন্তু সে জন্য তাহাকে কখন ক্লান্ত বা বিরক্ত হইতে দেখা যাইত না। অটুট স্বাস্থ্য, হাসি মুখেই সে পরিশ্রম করিত। যোগমায়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বোধ করি যোগমায়ার অদৃষ্টে নিশ্চিন্ততা শব্দটা লিখেন নাই। তাই সংসারের এই নূতন ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খলায় চলিল না। মাসখানেক যাইতে না যাইতেই তাহার মধ্যেও আবার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাসী প্রত্যুষে উঠিয়াই কাজকর্ম্ম সারিয়া ফেলিত। যোগমায়া উঠিয়া স্নান করিয়া রান্না চাপাইতেন।

সেদিন সকালে উঠিয়া যোগমায়া দেখিলেন, কাজ কর্ম্ম কিছুই তখনো সারা হয় নাই। রান্না ঘরে গত-রাত্রের উচ্ছিষ্ট থালা বাসন তখনও পড়িয়া রহিয়াছে। শয়ন কক্ষে শিশু কন্যা কাঁদিয়া গলা ফাটাইতেছে। হরিদাসীর সাড়া নাই, যোগমায়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন, হরিদাসী এতবেলা অবধি কখনও ঘুমায় না। হয়তো রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, সেই জন্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মনে করিয়া তিনি হরিদাসীর শয়ন কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে হরিদাসীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে শিশুকন্যাকে মল মূত্রে লিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া চীৎকার করিতে দেখিলেন।

যোগমায়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া, হরিদাসীকে ডাকাডাকি করিতে করিতে, সদর দরজা অভিমুখে আসিয়া বাহির হইতে যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি যুগপৎ ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন সত্যহরি বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া অনর্গল ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছে, এবং হরিদাসী ম্লানমুখে বসিয়া তাহার পা টিপিয়া দিতেছে।

যোগমায়া আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। দরজার কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন হরিদাসী; হরিদাসী চমকিত হইয়া পিছন ফিরিল; সত্যহরি ও চোখ

মেলিয়া মাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত এবং বিরক্ত হইল।

যোগমায়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন কাজ কর্ম্ম ফেলে রেখে এখানে তোমার কি হচ্ছে হরিদাসী?

হরিদাসী যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, স্পষ্ট ভাষায় নিজের নিরুপায়তা এবং বিরক্তি জ্ঞাপন করিয়া বলিল আমি কি করবো মা? সকাল বেলা উঠে কাজ করতে যাচ্ছি এমন সময় দাদাবাবু গঙ্গা স্নান করে এসে বল্লে আমার হাত পা কামড়াচ্ছে মাথাটারও বড় যন্ত্রণা হচ্ছে বোধহয় জ্বর হবে। হরিদাসী আমার মাথাটা একটু টিপে দিয়ে যাও তো। তুমি তো তখন ঘুম থেকে ওঠনি মা, যে তোমাকে জানাব। কাজেই কাজ কর্ম্ম ফেলে আমাকে এখানে বসে হাত পা টিপে দিতে হচ্ছে।

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন যাক হাত পা টিপা তো হয়েছে? এবার মেয়েটাকে একটু দেখগে যাও, চেঁচিয়ে যে সেটা গলা ফাটাচ্ছে তাকে একটু দুধ খাওয়াতে তো হয়। বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইতেই পিছন হইতে সত্যহরি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলিল মেয়েটা গলা ফাটচ্ছে তো কি হয়েছে শুনি? তুমি কি সেটাকে একটু দুধ খাওয়াতে পারনা? হরিদাসী একটু ব্রাহ্মণের সেবা করছে দুটো ধর্ম্মকথা শুনছে তো অমনি তাকে ডাকতে ছুটে এসেছ, তোমার বাড়ী চাকরী করতে এসেছে বলে কি ওর ইহকাল পরকাল নেই?

যোগমায়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, না বাবা এই বুড়ো বয়সে কচিছেলে মানুষ করা আর আমার দ্বারা হবে না। ওকে ধর্ম্ম কথা শোনাবার যদি এতই প্রয়োজন থাকে তো তোমার ছেলে পিলে মানুষ করবার আর এক জন লোক নিয়ে এস। বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হইল না। পরন্তু সেটা নিত্য নিয়মিত ভাবেই ঘটিতে লাগিল। রোজই সত্যহরির জ্বরের মত হইতে লাগিল; হয় তো মাথার যন্ত্রণা হয় নয়তো হাত পা ব্যথা করে এবং হরিদাসীকে ডাক পড়ে। রবিবারের দীর্ঘ অবসর হরিদাসীকে ধর্ম্মকথা না শুনাইলে সত্যহরির আর কাটিতে চাহিত না। হরিদাসী কাঁচা লোক নয় সংসারে যে কাহার মন জোগাইয়া চলিতে হয় তাহা সে জানে। এ কয় মাসে সে বেশ বুঝিয়াছিল যে যোগমায়া নামে মাত্র গৃহিণী অর্থনৈতিক ব্যাপার গুলো নির্ভর করে সত্যহরির উপর এবং আর লোকগুলি সংসারে আগাছার দল। কাজেই যোগমায়ার সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাইলে এসংসারে যে তাহাকে টিকিতে হইবে না একথা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

যোগমায়া সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু এই লইয়া বকাবকি করিতেও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল। কিন্তু ক্রমশই যখন সংসারে কাজ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, তখন একেবারে চুপ করিয়া থাকাও আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাই সে দিন রান্না করিতে করিতে যখন দেখিলেন বাটনা বাটা তখনও হয় নাই, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সত্যহরির পূজার ঘরে আসিতে হইল। এবং চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, হরিদাসী, এরকম করলে তো চলবেনা মা, সংসারের কাজকর্ম ফেলে রেখে, রাতদিন যদি তুমি ধর্ম্ম কথাই শুনতে থাক তো, তোমাকে জবাব দিয়ে আমায় অন্য লোক রাখতে হবে।

হরিদাসী লজ্জায় যেন একটুকু হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইযে যাই মা।

যোগমায়া পুত্রের দিকে একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিদাসীকে বলিলেন, হাঁ, বাটনা বেটেদিয়ে এসে তত্ত্বকথা শুনো, আমার যে নইলে রান্না বন্ধ থাকে।

হরিদাসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যোগমায়া গেলেন না। তিনি যেন পুত্রের সহিত আজ একটা বোঝা পড়া করিয়া লইতে চান—বলিলেন, 'কাজ কর্ম্মের সময় তোমার ধর্ম্মকথা আরম্ভ হ'লে আমার কাজ আটকায় সতু, সকাল সন্ধ্যায় তোমার অবসর থাকলেও আমাদের সেটা কাজের সময়। কাজ কর্ম্ম চুকে গেলে, রাত্রে নিরিবিলিতে ওকে তত্ত্বকথা শুনিও বাবা আমি বাধা দিতে আসবো না।

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া আর পুত্রের মুখের উপর

বলা যায় না। সত্যহরি কিন্তু এই স্পষ্টবাদে একেবারে জলিয়া উঠিয়া বলিল, কি এতো কাজ তোমার শুনি?—যে রাতদিন তাই তুমি আমাকে শোনাতে আস?

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—দায়ে পড়ে আসি বাবা বাট্‌না বেটে নাদিলে রান্না হবে না যে।

সত্যহরি বলিল, ওঃ ভারি রান্না চুলোয় যাকগে—আমি খাবোনা কিছু।

যোগমায়া কঠিন স্বরে বলিলেন—তুমি না খেলেই সংসারে রান্না করা বন্ধ থাকবেনা। কাজ কর্ম্ম বা রান্না যে শুধু তোমার জন্যেই হয় তা মনে করবার তো কোন কারণ নাই। সংসারে অন্য লোকও আছে সেটা স্মরণ রেখ।

সত্যহরি খিঁচাইয়া কহিল সংসারে অন্য লোক আছে? যদি তো তাদের কাজ কর্ম্ম তারা করে নিক। এখানে এসে গণ্ডগোল করছ কিসের জন্যে শুনি?

রাগে যোগমায়ার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি যেন জ্বলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া, শান্ত অথচ কঠোর কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন—ঝি রাখা হয়েছে সংসারের কাজের জন্যে তোমার ধর্ম্মোপদেশ শোনাবার জন্যে তো নয় সতু।

সত্যহরি একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ছিঃ তোমাদের এতো ছোট মন? তোমাদের বাড়ী একজন চাকরি করতে এসেছে বলে তার ধর্ম্মকথা শোন্‌বার অধিকার নেই? ঝি বলে এত অবজ্ঞা গরীবকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করোনা বুঝি? তুমি মনিব সে ঝি তুমি বড়—সে ছোট—এই অহঙ্কার মনকে কত যে ছোট কর তা'কি জান? এটা মনে রেখ—এ জগতে সবাই সমান ভগবানের রাজত্বে কেউ ছোট বড় নেই। ঝি চাকর বলে কেউ তোমার দোরে মাথাটা বিক্রী করে আসেনি।

যোগমায়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুত্রের মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—এতে ছোট বড়—গরীব বড় লোকের কথাটা কি হ'ল সে এসেছে পরের বাড়ী চাকরি করতে—তা কাজ করবে না?

সত্যহরি বলিল কাজ করতে এসেছে বলে কি সে একটু বসতে পাবে না? দুটো ধর্ম্মকথা জ্ঞানের কথা শুনতে নেই? মাইনে দাও বলে তার মাথাটা কিনে নিয়েছ নাকি?

যোগমায়ার মুখে আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন—না,—আমি কা'রো মাথা কিনে নিইনি বাবা, কেবল নিজের মাথাটাই তোমাদের পায়ে বিকিয়ে রেখেছি। বলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভগবানের উপর বিন্দুমাত্রও যদি বিশ্বাস থাকে তো এটুকু জেনে রেখ সতু যে—নাস্তিকও তাঁর ক্ষমা পেতে পারে কিন্তু ভণ্ড কখনো পায়না।

সত্যহরি রাগে ফুলিতে লাগিল। যোগমায়া সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

৬

ঘণ্টা দুই তিন পরে সত্যহরি খাইতে বসিলে যোগমায়া একটু তফাতে বসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—আমি পরশু রাত্রের ট্রেনে কাশী যাচ্ছি।

সত্যহরি আজ রাগে মুখখানা হাঁড়ি করিয়াই খাইতে বসিয়াছিল, গম্ভীরমুখে শুধু বলিল, বেশ।

যোগমায়া বলিলেন, ছেলেদের যা ব্যবস্থা করতে হয় তুমি কোরো, আমার আর তা করে যাবার সময় হবে না।

সত্যহরি বলিল, ব্যবস্থা যিনি করবার তিনি করবেন। আমি কোনদিন সংসার বা ছেলেদের ভাবনা ভাবিনি তা'বলে কিছু আটকেতো নেই, আমি সেই একজনের উপর নির্ভর করে দিন কাটিয়ে দেই। তিনি যা করবেন তাই হবে।

যোগমায়ার এত দুঃখেও হাসি পাইল। সত্যহরি কখনো কাহারও জন্য ভাবিত না সত্য, এবং তা বলিয়া তাহার কিছু আটকাইয়াও থাকে না, একথা অতি বড় সত্য। কিন্তু আটকাইয়াও না থাকার মূল যে কোথায়, একথা তার চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই পুত্র যখন নির্ব্বিকার ভাবে ওই উত্তর দিল তখন তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয়টা কোমল হইয়া আসিল,

কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আপন মনকে কঠিন করিলেন। এসংসারে কাহার যে কতটা প্রয়োজন, তাহা তিনি সত্যই আজ পুত্রকে বুঝাইতে চান।

পরদিন দুপুরবেলা সত্য সত্যই কাশী যাইবার আয়োজনে যোগমায়া জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বহুদিনপরে পার্টিসেন দুই বাড়ীর মধ্যেকার দরজা খুলিয়া যোগমায়ার বড়জা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ছোট বৌ, সত্যিই তুই কাশী যাচ্ছিস? যোগমায়া তোরঙ্গ গুছাইতে গুছাইতে গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—হুঁ।

বৃদ্ধা বড়জা পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিলেন, ওমা, এই বয়সেই কাশীবাস করতে যাবি কেন বলতো? যোগমায়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান নিতে কি আর বয়সের বাছ বিচার আছে দিদি? আর বয়েসটাই কি কম হ'ল, ছেলে পুলে উপযুক্ত হয়েছে, তাদের হাতে সংসারের ভার দিয়ে, এবার যদি বিশ্বেশ্বরের চরণে একটু ঠাঁই করে নিতে পারি, তো তার চেয়ে ভাগ্যি আর কি আছে কি বলো?

বড়জা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা বটে তুই যদি কাশীবাস করিস ছোট বৌ, আমাদের সতু কি তা'হলে আর সংসারে থাকবে? ওর ত ওই মতি গতি, রাতদিন পূজো পাঠ আর ঠাকুর দেবতা নিয়েই আছে, কবে বলতে কবে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে, সংসারে আটকে আছে কেবল তোরই জন্যে বইতো নয়। বৌটাও মরে গেল তুই যদি চলে যাস্ তো ওকে আটকাতে আর কে রইল!

যোগমায়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা—সার্থক ছেলে তুই গর্ভে ধরেছিলি ছোটবৌ! কলিযুগে এমন ছেলে আর জন্মায় না দিদি; যেমন ধর্ম্মে মতি, তেমনই দয়ার শরীর, রাতদিন ভগবানের নাম আর পূজোপাঠ নিয়েই আছে। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, সতুর কাছে সবাই সমান। দীন দুঃখী, কানা খোঁড়া সবাইকেই সে আদর করে ডেকে পাশে বসাবে আর ভগবানের নাম শোনাবে। বলে জেঠাইমা, জগতে ছোটবড় বলে কিছু নেই, সবই সেই একজনের বিকাশ মাত্র। তুমি আমি বা এই কাণা খোঁড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই লীলাময়ের লীলার বহিঃপ্রকাশ।

যোগমায়া মুখে কিছু বলিলেন না। কিন্তু মনে মনে বোধ করি, তাঁর সংসারের অদূর ভবিষ্যতের চিত্রখানিই কল্পনা করিতে লাগিলেন। পুত্রকে তিনি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন। সংসারের বার আনা খরচা তার টাকাতেই চলে। তিনি চলিয়া যাইলে সংসারের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা যোগমায়া বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। তথাপি তিনি কেন যে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, একথা আর কেহ না জানিলেও শুধু অন্তর্য্যামী জানিতেন যে পুত্রের এই সর্ব্বজীবে সমদর্শিতার প্রকোপে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রচণ্ড দাপটেই, আজ তিনি সংসার হইতে আস্তানা তুলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।



পাশ্চাত্যে সামরিক শিক্ষা

কুমারী ছায়া দেবী

[কুমারী ছায়া দেবী প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেছেন—তাঁর সামরিক শিক্ষা পাঠেও আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের এদিকে আগ্রহ জাগবে আশা হয়]

কোন একটি জাতিকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে হইলে তাহার নরনারীর দেহের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখিতে হয়। নাগরিকের সুস্থ সবল ও নিরোগ স্বাস্থ্যের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। স্বাস্থ্য সুষমা ও সৌন্দর্য্য প্রচারক। বিনা ব্যায়ামে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যের বিকাশ হয় না। ব্যায়াম শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টতা আনয়ন করে। ব্যায়াম তিন প্রকার লক্ষিত হয়, কুস্তি, সাধারণ ব্যায়াম ও মিলিটারি ব্যায়াম। কুস্তি-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আছে। সাধারণ ব্যায়াম যাহা আমরা প্রত্যহ গৃহে অভ্যাস করি তাহা বর্ত্তমানে অনেকটা পাশ্চাত্য জগত হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছি। ভারতীয় প্রণায়াম পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতের শারীর-চর্য্যার ভিতর অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ। পূর্ব্বে সেই বস্তুর মূল্য ও উপকারিতা হিন্দুনরনারী যথেষ্ট জানিত এবং এখন পর্য্যন্ত যাহারা সঠিকভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণায়ামে যোগ অভ্যাস করেন তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণায়াম পদ্ধতি মূল পদার্থ হইলেও অন্যান্য অনেকগুলি অবশ্যকরণীয় অভ্যাস আছে।

কোন একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্ব অবয়ব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে না। সেইজন্য সর্ব্ব অবয়ব পূর্ণভাবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে বহু প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। পুরুষরা বহুকাল ধরিয়া স্বাস্থ্য বা শরীর চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে নারীজাগরণের দিনে অনেক বালিকা এবং কিশোরীরা পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে ইহা শুভ লক্ষণ। কারণ যাহারা ভবিষ্যতে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার জননী হইবেন তাহাদের মাতৃমূর্ত্তি সুস্থ ও শোভনা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, আশু প্রয়োজন। কোন একটি দুর্ব্বল জাতিকে সবল হইতে হইলে প্রথমে একটি আদর্শ গ্রহণ করিতে হয় নচেৎ কর্ম্মে নিষ্ঠা আসেনা। গ্রীক জাতির সুস্থ ও সবল হইবার একমাত্র কারণ হইল হারকিউলিস্ ও হেলেনা। এই দুটি শুভ্রমূর্ত্তি অবলম্বনে জাতির নর নারীর চিত্ত ললিত কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ পূর্ণ হইল না। গ্রীক জাতি সভ্যতার একতলা পর্য্যন্ত তৈয়ারি করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গৃহ হইল গ্রীকস্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন। এই গৃহ দেখিলেই তাহার সভ্যতার স্তর বুঝিতে পারা যাইবে।

যখন নূতন ভাব ও আশা লইয়া জাতি সাধনা আরম্ভ করিয়াছে তখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে প্রথম হইতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করা। আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চার মূলে মস্ত একটি দোষ বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রক্রিয়া নিত্য অভ্যাস করিয়া যাই কিন্তু আমাদের দেহাভ্যন্তরে কোথায় কোন স্নায়ু বা পেশী অবস্থান করিতেছে সে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ। সেই জন্য প্রথম হইতে আমাদের দেহস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি স্থূল জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। তাহাতে শুভ বই অশুভ হইবে না। এ জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বদিকে সমাজের কল্যাণ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীন দেশের নরনারীকে বালক বালিকাকে কি পদ্ধতিতে চমূ ব্যায়াম (Military Training) শিক্ষা দিতেছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এসব বিষয় পতিত জাতির ভিতর যত গভীর ভাবে আলোচনা হয় ততই শুভকর। ভাব অনুযায়ী দেহের লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। তুমি যেরূপ বিষয় চিন্তা করিবে, সেই প্রকৃতির নরনারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ঘটিবে। তোমার জাতীয় ভাব তোমার সমাজ বিন্যাস, তোমার মানসিক বৃত্তি তদানুযায়ী ফুটাইয়া তুলিবে। যখন দেশমধ্যে, সমাজমধ্যে রাজনীতির ব্যথা জাগিয়া উঠে তখন নরনারীর মানসাকাশে সুস্থ ও সবল হইবার বাসনা জাগে। কোন একটি জাতিকে, তাহার কৃষ্টিকে রক্ষিত করিতে হইলে দেশমধ্যে ক্ষাত্র শক্তির প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। বিনা ক্ষাত্রশক্তিতে জগতের কোন দেশ সুখ সম্পদে বসবাস করিতে পারে না। কৃষ্টির মহিমা ক্ষাত্র শক্তির তেজে মূল্যবান হয়। বিগত যুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাষ্ট্র জীবংসারবৃত্তি লইয়া বসবাস করিতেছে। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারণ প্রত্যেক জাতির স্বভাবধর্ম্ম। এই দুইটি বৃত্তির, ধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে ক্ষাত্রভাব বা ক্ষাত্রধর্ম্ম একান্ত প্রয়োজন। ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে বিপুল চমূসম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে লীগ অফ নেশনের মতে কোন রাষ্ট্রই বিপুল সেনানী রক্ষা করিতে পারিবে না অথচ প্রত্যেক দেশের বিপুল চমূসম্প্রদায় প্রয়োজন কারণ সকলেই ভাবী সমর লইয়া শঙ্কিত ও ব্যস্ত। সকল রাষ্ট্রবিদেরা জানেন যে জাতিকে বলবান করিয়া রাখিতে হইলে যুবকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কারণ তাহারাই হইল জাতির প্রাণ। এই শক্তিকে রাষ্ট্রের কাজে লাগাইবার জন্য তাহারা সতত চেষ্টিত থাকেন। এই যুবশক্তির অপচয় দেশের মহা অকল্যাণকর।

চমূ-শিক্ষা পদ্ধতি দেশের পরম উপকারী বস্তু। এ শিক্ষাতে সকলেই কর্ম্মঠ ও আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে। এই আজ্ঞাধীনত্ব শিক্ষাই হইল দেশের মস্ত গৌরব, পরম উপকারক। স্কুল কলেজে এ বিদ্যা অর্জ্জন হয় না। এই আজ্ঞাধীনত্বই জাতীয় সর্ব্বকর্ম্মে একটা ছন্দ আনাইয়া দেয়, রূপ ফুটাইয়া তুলে, সৌম্যমূর্ত্তির বিকাশ করে। সেই জন্য স্বাধীনদেশ মাত্রেই চমূশিক্ষাপদ্ধতির পক্ষপাতী। ভারসেলিসের সন্ধিতে স্থির হয় যে জার্ম্মাণী তাহার যুবকদিগকে চমূশিক্ষা দিতে পারিবে না। কেবলমাত্র জর্ম্মাণীকে বলা হইয়াছিল, "Educational establishments, the universities, societies of discharged soldiers and generally speaking, asscoiations of every description, whatever be the age of their members, must not occupy themselves with any military matters." প্রথম প্রথম জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রবিদ্‌রা এ চুক্তি প্রতিপালন করিয়াছিল। কিন্তু নাজী সম্প্রদায় ইহাতে মুগ্ধ না লইয়া নিজ মনোমত অস্ত্রবিহীন বিপুল চমূশিক্ষা প্রচলন করিল। আজ সেই নিভৃত নাজীচমূসম্প্রদায়ই জার্ম্মাণ জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে বালকদিগকে কেমন করিয়া চমূশিক্ষা পদ্ধতিতে গঠন করা হইতেছে তাহা একটি শিক্ষা করিবার বিষয়, বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সনে সোশালিষ্ট Jean Jaures বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক ফরাশী দশ বৎসরের বালককে চমূশিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। শুধু চমূ শিক্ষালাভ করা নয় তাহাদের চমূশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তাহার যথেষ্ট হেতুও ছিল। তখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছিল যে শীঘ্রই একটি প্রলয় নাচন নাচিয়া উঠিবে। জার্ম্মানীই ছিল ফরাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভীষিকা। বর্ত্তমানে ফরাসী দেশে বালকদিগকে চমূবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান war office হইতে পরিচালিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হইতেছে চমূ অফিসর। শিক্ষামন্ত্রী বালকদিগের স্বাস্থ্য ও ভর্ত্তি করান সম্বন্ধে দেখাশুনা করেন। ১৬ বৎসর বয়সের সময় বালকদিগকে পদাতিক সৈন্যের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ও মেসিন কামান চালান শিক্ষা পায়। ১৭ বৎসর বয়সের সময় সৈন্যদিগের যাবতীয় বিদ্যা অর্জ্জন করে। অবশ্য যে, যে শ্রেণীতে থাকিবে। এই পদ্ধতিতে ফরাশী সমস্ত বালকেরা অল্প কয় বৎসরের ভিতর চমূবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। একণে প্রত্যেক নাগরিকই নিষ্ক্রিয় সৈনিক।

পোলাণ্ড ও জেকোস্লেভেকিয়া ফরাসীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের স্কুলের নিয়ম পদ্ধতি এমনভাবে তৈয়ারি করিয়াছে যে প্রত্যেক ছেলেটী বিশিষ্ট সৈনিক হইয়া উঠিতেছে। এই সব স্কুলেও অফিসার দ্বারা চমূশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন হইতেছে। Shooting এর উপর ইহারা খুব ঝোঁক দিয়াছে কারণ ইহাতে

সুদক্ষ হইতে হইলে যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য এইসব স্কুলে বাল্যকাল হইতে এই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করাইয়া দিতেছে। স্কুলের দীর্ঘদিন ছুটির সময় সমস্ত মিলিটারী ড্রিলগ্রাউণ্ডে বালকদিগের তাঁবু পড়ে। তথায় তাহারা বড় বড় চমূঅফিসারের নিকট হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানাবিষয় শিক্ষালাভ করে যথাঃ- অস্ত্রবিদ্যা, বোম্‌নিক্ষেপবিদ্যা, বুদ্ধিসম্পন্ন কার্য্য, পাওনিয়র কার্য্য, anti aircraft and anti gas work. ইহা ব্যতীত চমূব্যায়াম নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে।

ইটালিতে বালকদিগকে চমূবিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার সম্পূর্ণ ফ্যাসিষ্টদের উপর ন্যস্ত। ৮বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালককে বিশেষভাবে ব্যায়াম পারদর্শিতালাভ করিতে হইবে। ১০বৎসর বয়সের সময় তাহাদের ফ্যাসিষ্ট চমূবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইবে। গত বৎসর সুইজারল্যাণ্ডে ১৩বৎসরের ২৭১১টি বালক Juveniles rifle সভাতে উপস্থিত হয়েছিল। Divisional Colonel Wille পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। একটি ১৩বৎসরের বালক প্রথম প্রাইজ পাইয়াছিল। সে যে অস্ত্রটী ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নূতন ক্যাডেটস্ রাইফেল নং ৯১ এই প্রণালীতে ইটালীর সমস্ত যুববৃন্দ চমূশিক্ষাতে পারদর্শী হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতির আত্মরক্ষার্থ সমস্ত বিষয় বস্তুর আয়োজন চলিয়াছে। বর্ত্তমান ইটালীর মনোবৃত্তি হইতেছে একশ বৎসর দীনভাবে বাস করার চাইতে একদিন রাজার মতো বাস করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

সমস্ত Anglo Saxon জাতি গুলিও চমূবিদ্যা দেশ মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতেছে। আমেরিকার ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চমূ-কাওয়াজ (Drill) বাধ্যতামূলক। যে সমস্ত ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় termএ অধ্যয়ন করে তাহাদের ইহা (Military drill) অবশ্য করণীয়। অন্যান্য ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা অবশ্য বাধ্যতামূলক নহে কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ছাত্রদিগকে নানাতেজঃপূর্ণ খেলা অভ্যাস করিতে হইবে। শুধু খেলিলে চলিবে না, নানাপ্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হয় এবং ইহার জন্য পরীক্ষা ও প্রদান করে। ক্লাশে উঠিবার সময় এই নম্বর গণণা করা হয়। ছাত্রদের পোষাক দেখিলে আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মেসিন কামান, light and heavy artillery, aeroplanes and Squadron ছাত্ররা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পোলো ও টেনিস্ ও তাহাদের সাথে থাকে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই সামরিক পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে। সমর বিভাগের অফিসর আসিয়া ছাত্রদিগকে অস্ত্র ও কলা কৌশল পরিপূর্ণভাবে বিশদরূপে শিক্ষাদান করে। তা ছাড়া কতকগুলি উচ্চবিদ্যালয় আছে যথায় যুদ্ধের সময়ের ন্যায় আজও বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা ছাত্রদিগকে দান করা হয়। যাহারা নাগরিক ব্যবসাতে যুক্ত আছেন তাহাদের তথায়ও সমর তাঁবু আছে যথায় সকলকে চমূবিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে হয়। আমেরিকান ব্যবসায়ের মালিকগণ এই সমরবিদ্যা শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে ছুটি প্রদান করে, উৎসাহ দেয়। আমেরিকার যদিও ভয়ের কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই তথাপি সেও সমস্ত জাতিকে সমর বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। এত সাবধানী জাতি। প্রেসিডেণ্ট, মিঃ হুভার পুত্রের পিতাদিগকে বলিয়াছিলেন "Years exqerience had so justified this preparatory military training of youth as to make a special item in the government programme." পূর্ব্বে বলিয়াছি যুদ্ধ বাসনা এখন নিবৃত্তি হয় নাই শুধু বিরাম লইতেছে মাত্র।

বোধ হয় জাপান এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী। দ্রুত গতিতে সে সমস্ত জাতিটিকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। জাপানের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সমর পোষাক পরিধান করিতে হইবে এবং সপ্তাহে দুই বার করিয়া রাইফেল ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিতে হয়। এইসব শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। জাপানী শক্তির আজ প্রাধান্য সকলে স্বীকার করিতেছে। ক্ষাত্রশক্তির এত মহিমা! সোভিয়েট রাশিয়াতেও এ বিষয় যথেষ্ট অনুশীলন হইতেছে। তথায় প্রত্যেক নাগরিক shooting অভ্যাস করিতেছে। এমনভাবে শিক্ষিত হইতেছে যে প্রয়োজন হইলেই প্রত্যেকেই

শিক্ষিত সৈনিকরূপে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান তুর্কী এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নাই কারণ সেও স্বাধীন জাতি। চীন ও ভারতবর্ষ এ বিষয় উন্নতিশীল নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এইরূপ জাতি গঠনের তাৎপর্য্য কি, প্রয়োজন কি? সমস্ত জাতির বর্ত্তমান মনঃস্তত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রত্যেক শিক্ষিত স্বাধীন জাতি যুবকদিগকে চমূবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। ইহার সফলতার জন্য প্রত্যেক ষ্টেট যথেষ্ট সাহায্য বা অর্থব্যয় করিতেছে। যে প্রকৃতিরই ষ্টেট্ হউক্ না কেন নিজের আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেকেই সজাগ ও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগামী যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে চঞ্চল ও অস্থির করিয়াছে। পরস্পরের মানসিক অনৈক্য সংসার জীবনের সুখ-শান্তিকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। যেমন একদিকে লিগ অফ নেশন শান্তি প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্র চমূবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে। সৈনিক সৃষ্টি বা গঠন করিলেই অস্ত্র দ্রব্যাদীর যথেষ্ট প্রয়োজন হইবে সেইজন্যে বর্ত্তমানে অস্ত্র ব্যবসায়িদিগের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা হইতেছে। যুদ্ধের সময় যে পদ্ধতিতে সৈনিক সংগ্রহ হইত বর্ত্তমানে যুবসৈনিক গঠনেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন চলিয়াছে। গত যুদ্ধের সময় যে সব দোষ লক্ষিত হইয়াছিল এক্ষনে পূর্ব্ব হইতে সেই সব দোষ ত্রুটি সংশোধন হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন ফরাসী কর্ণেল বলিয়াছিলেন, 'There is a palpable difference between the results obtained by an unrestricted training and those of secret instruction.' এই সুচিন্তিত মন্তব্যটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছে এবং অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী কোন গুপ্তভাব গ্রহণ করে নাই সে স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজি নিজ আত্মরক্ষার্থ নানা পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমস্ত যুবক সম্প্রদায়ের মনটাকে ইস্পাতের ন্যায় গঠন করিতেছে। কোনরূপ কোমলভাব, যাহা জাতির উন্নতির পরিপন্থী, দেশমধ্যে প্রচার করিতে দিতে রাজি নহে।

বর্ত্তমান ভারতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তেজীয়ান বীর্য্যবান জাতি গঠনের প্রয়াসী ছিলেন সেইজন্য তাঁহার ভাবরাশিও দীপ্তিকর। যে সকল ভাব নরনারীর দেহ ও মনকে শ্লথ করিয়া দেয়, মৃদু করিয়া দেয়, অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয় তিনি মোটেই তাহা পছন্দ করিতেন না। যে প্রকৃতিরই ব্যায়াম হউক না কেন চমূশিক্ষাপদ্ধতি ব্যায়ামের নিকট মূল্যহীন। একমাত্র চমূবিদ্যাই জাতীয় দুর্দ্দিনে মূল্যবান হইয়া উঠে। একথা এত স্পষ্ট এ ভাব এত প্রখর, এত দীপ্তিশালী যে ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান ইউরোপের মনোবৃত্তি দেখিয়া একটি ঘটনা মনে পড়িল। এক ভদ্রলোক একটি অন্ধকার ঘরে বাস করিত। রাত্রে আলো জ্বালিবার সময় প্রায়ই দেশলাই হারায় পায়না। তখন সে একটি সুচিন্তিত মতলব করিল, যাহাতে দেশলায়ের অভাববোধ আর না হয়। এই না ভেবে সে একটি বড় কোট তৈরি করাইল এবং সেই কোটের বা জামার চতুর্দ্দিকে একটি করে পকেট তৈরি করাইল অর্থাৎ জামাটির ভিতর বহু পকেট হইল। তখন সে প্রত্যেক পকেটে একটি করিয়া দেশলাই রাখিল। ভারি আনন্দ, আর দেশলায়ের অভাব হবে না আলো জ্বলিবেই। এখন একদিন ভদ্রলোক জামাটি পরে আছে এমন সময় হঠাৎ একটি দেশলাই জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তগুলিও আগুনে জ্বলে উঠল। তখন ভদ্রলোকটি বহু আলোক না সহ্য কর্ত্তে পেরে ছাই হয়ে গেল। ইউরোপেরও না এই অবস্থা শেষে হয়।

জগন্নাথের দান

গল্প

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী

['জগন্নাথের দান' শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর দ্বিতীয় গল্প। নারী ও পুরুষের ভালবাসা অনেক সময় জাতি ও ধর্ম্মের বন্ধন মানিতে চায় না—জগন্নাথধামে জাতি ধর্ম্মের ভেদাভেদ নাই—সেইখানেই তেমন একটি গল্পের সূচনা হইয়া কি ভাবে মধুরেন সমাপয়েৎ হইল পাঠক-পাঠিকারা তাহা দেখিবেন।]

১

"নিন, উঠুন, বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আর শুয়ে থাকে না। এই দুধ টুকু খেয়ে ফেলুন।

সুধীর হাসির ভঙ্গীতে বলিল, না তোমার অত্যাচারে আর সহ্য করা যায় না।

সুধীরের কথা শেষ না হইতেই মাধুরী বলিল, বেশী দিন আর সইতে হবে না।

সুধীর বিস্মিত দৃষ্টি মাধুরীর মুখের উপর তুলিয়া বলিল, তার মানে?

মানে অতি সোজা।

সোজার মাপ কাঠিটা তো সবার কাছেই এক নয়, সুতরাং তোমার সোজাটা আমার কাছে বড়ই জটিল বলে বোধ হচ্ছে।

মাধুরী ঠোটের কোণে ঈষৎ একটু হাসির রেখা টেনে এনে বলিল—তা হ'বে আমার মাপ কাঠিটা ভেঙেই বলছি, মানে আমি দু এক দিনের মধ্যেই কোলকাতা চলে যাচ্ছি।

সুধীর পূর্ব্ববৎ বলিল—হঠাৎ এ খেয়ালের মানে?

হঠাৎ কি?

একটু অপ্রতিভের মত হইয়া সুধীর বলিল, না এই এত শীগগির চ'লে যাবে,—

সুধীরের কথা শেষ না হইতেই মাধুরী বলিল, শীগগিরের মাপকাঠীটাও ত সবার কাছে এক নয়, দেড় মাস আপনার কাছে শীগগির হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেছে, এতদিন কবেই যেতুম, কেবল আপনাকে অসুস্থ ফেলে গেলে মানুষের ন্যায় ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হ'বো কারণ আপনি আমার প্রাণ রক্ষে কোরেছেন অতএব যত বাধাই থাক আপনি ভাল না হ'লে এখান থেকে আমি কোন মতেই যেতে পারি না।

তা সে কারণ তো এখনও আছে, আমি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি নি।

মাধুরী একটু অধীর কণ্ঠে বলিল, না না আর আমাকে নানা ছুতোয় আটকে রেখে অপমানের মাত্রা বাড়াবেন না। ব'লে দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

মাধুরীর কথার ভঙ্গীতে সুধীরের গায়ে যেন বিষের ছুরী বসাইয়া দিল, সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিয়া বলিল, তোমাকে অপমান করবার জন্যই এতদিন নানা ছুতো করে এখানে আটকে রেখেছি, বলিয়া মাধুরীর মুখের উপর হইতে শান্ত কঠোর দৃষ্টি নত করিল একটু স্থির থাকিয়া বলিল, হাঁ একথা বলা তোমার ঠিকই হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে কলিকাল, এখানে কৃতজ্ঞতা ব'লে যে কিছু আছে তা ভুলেই গিয়েছিলুম।

এ শ্লেষ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে মাধুরীর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিল, দেখুন আমাকে আপনারা আর যাই বলুন, এবং আমাকে জুতা মোজা পরা ধেরে মেয়ে ব'সে যতই দোষারোপ করুন আমি যত বড় বজ্জাতিই জানি না কেন, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞা নই। এরি মধ্যেই আপনার দয়া উপকার ভুলে যাওয়াতো দূরে থাক চির জীবনেও ভুলবো কিনা আমার অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু ভুলতে পারলেই বুঝি ভাল হ'তো, এ দারুণ অপমান বুঝি তা হ'লে হ'তে হতো না। কেন, আমি আপনাদের কি ক'রেছি? বলিয়া মাধুরী তাহার উদ্গত অশ্রু সামলাইতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মাধুরীর আজের এই কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটা আশঙ্কায় মনটা তার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

২

কোনও রকমে সমস্ত রাতটা কাটিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই মাধুরীর মনটা ভাল ছিল না। সুধীর তাহাকে অকৃতজ্ঞা ভাবিলেও তাহার কথার পাল্টা জবাব দেওয়াটা যে তাহার উচিত হয়নি, এই অনুতাপে তাহাকে সমস্ত রাত্রি ক্লেশ দিয়াছে। তাই সকালে উঠিয়াই সে সুধীরের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিতেছিল কিন্তু দারুণ লজ্জা এবং দুঃসহ অপমানের ভারে তাহার পা যেন উঠিতেছিল না। এইরূপ কিছুক্ষণ ভাবা চিন্তার পর মাধুরী স্থির করিল, যাক্ যত বড় অকৃতজ্ঞাই কেন উনি ভাবুন না, যত বড় অধর্ম্মই কেন হ'ক না, তথাপি এখানে আর একদিনও অবস্থান করা ঠিক নয়। অতএব এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা পরিসমাপ্তি আজ সে করিবেই। উঃ, সে চিঠির প্রতি অক্ষরগুলি যেন তাহাকে সহস্র অপমানের বিষে দংশন করিতেছে।

সুধীরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাহিতেই সুধীর বলিল, ক্ষমা তোমাকে চাইতে হবেনা মাধুরী, আমি যে নিজের অসুস্থতার জন্য তোমাকে এখানে আটকে রেখেছি, এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো।

আপনি ক্ষমা চাইছেন? আপনাকে আপনার পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন যাতে সম্পূর্ণ ক্ষমা ক'রতে পারেন সেই জন্য আপনার সমস্ত ঋণ, সমস্ত সম্বন্ধ চিরদিনের মত নিঃশেষে ছিন্ন ক'রে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি শিশু বেলা পিতৃহীনা। মাতার কাছেই আমার সমস্ত শিক্ষা, পিতার অভাব হ'লে মা আমার সংসারের অভাবের কথা কাউকে না বলে নিজে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী করে প্রাইভেট পরিয়ে সংসার চালাতেন এবং আমাকেও পড়াতেন, পেটের জ্বালায় অধর্ম্মের পথে না গিয়ে দুঃখিনী মা আমার সংকাজে সৎভাবে জীবন যাপন ক'রতেন। তাইতে কি লোকে খৃষ্টান হ'য়ে যায়? এই অতিরিক্ত খাটুনির জন্যই মার আমার অকালে মৃত্যু হয়েছে। যাক নিজেদের সাফাই আর গাইতে চাইনে। আমার এভাবে চ'লে যাওয়াতে আপনি দুঃখ ক'রবেন না। আমি ক'লকাতা গিয়ে বেশ একলা থাকতে পারব। আপনার উপকার ভুলব না। শ্মশানে সেই দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে সেদিন যদি আপনি রক্ষা না ক'রতেন তবে কি যে হ'তো তা জগবন্ধুই জানেন। মাকে নিয়ে এভাবে একলা পুরীতে আসা ঠিক হয়নি ব'লছেন, কিন্তু না এসেই বা কি করি? মা কোন মতেই আসবেন না, তিনি যেন আত্মহত্যা ক'রতে চাইছেন। আমি মেয়ে হ'য়ে কি করে তা চোখে দেখি বলুন। তাই মার কোন কথা না শুনে গরমের ছুটীতে জোর করে মাকে নিয়ে এলুম। তখন একথা ভাববার অবসর পাইনি যে মার ভাল মন্দ হ'লে এই বিদেশে কে আমাকে সাহায্য ক'রবে। জগবন্ধুর দয়াতেই আপনি আমার সেই দুঃসময় শ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন, আপনার কাছে আমি চিরঋণী কিন্তু কোন দিন কোন বিপদেই যেন আর আপনাকে মনে না করি। এমনি শক্তি যাতে পাই আজ যাবার দিনে আপনি আমাকে সেই অশীর্ব্বাদই করে দিন। বলিয়া কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

এখানে সুধীরের একটু পরিচয় দিতেছি।

সে জমীদারের ছেলে, নিজে সরকারী ডাক্তার, এক বৎসর হয় পুরীধামে বদলী হইয়া আসিয়াছে। এখানে তাহার বাড়ীতে লোক জন আছে, আর রথ উপলক্ষে তাহার পিতার এক বৃদ্ধা মাসিমা আসিয়াছেন; এবং সুধীরের অনুরোধে এখানেই আছেন।

মাস দেড়েক পূর্ব্বে এক সন্ধ্যায় সুধীর সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে স্বর্গ দ্বারের কাছে গিয়া পৌঁছাতেই আষাঢ়ের ঘন ঘটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুধীর বাড়ীতে ফিরিবে এমন সময় শ্মশানের দিকে একটা কলরব শুনিয়া একটু অগ্রসর হইতেই তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতীকে ঘিরে পাঁচ ছয় জন পাণ্ডা বিবাদ বাধাইয়াছে। সুধীর দ্রুত পদে নিকটে গিয়া সদ্য মাতৃহারা যুবতীর ক্রন্দন জড়িত কথার অর্থে বুঝিল এ বিবাদ যুবতীকে লইয়া। সুন্দরীর মাতার মৃত্যু হইলে দাহ কার্য্যের জন্য এই লোকগুলিকে ডাকা হয়। ইহারা যখন জানিল যুবতীর এখানে কোন আত্মীয় স্বজন নাই

তখন যুবতীকে নিয়ে কার বাড়ীতে রাখিবে এবং অধিকার কার বেশী ইত্যাদি নিয়ে তর্ক বিবাদ বাধাইয়াছে।

দুর্ব্বৃত্তদের চেহারা দেখিয়াই তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে সুধীরের বিলম্ব হইল না। সে হঠাৎ উপস্থিত বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া বলিল, তোমরা কি জন্য বিবাদ করিতেছে, এ মেয়েটী আমার আত্মীয়, এর বিপদের সংবাদ পেয়েই আমি এসেছি বলিয়া তাহাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া যুবতীকে বলিল, আপনি ভদ্র লোকের মেয়ে আমিও ভদ্র লোকের ছেলে। অতএব আমাকে অকপটে বিশ্বাস ক'রতে পারেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন; বাড়ীতে আমার এক বৃদ্ধ ঠাকুমা আছেন আপাতত তার কাছে গিয়ে থাকবেন।

যুবতীও অকুলে কুল পাওয়ায় কোন আপত্তি না তুলিয়া সুধীরের সহিত তাহার বাড়ীতে আসিল।

সেই রাত্রেই যুবতীর প্রবল জ্বর হইল প্রায় পনর দিন ভুগিয়া সে সুধীরের সুচিকিৎসায় প্রাণ পাইল, এবং এই দীর্ঘ দিনের অসুস্থতাই দূরের সুধীরকে তার নিকটে আনিয়া দিল; এবং আপনার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া কখন যে সে সুধীরের কাছে তুমিতে পরিণত হইল ইহার খোঁজ সুধীর কিংবা মাধুরী কেহই রাখিল না। মাধুরী সুস্থ হইতে না হইতেই এক সন্ধ্যায় রোগী দেখিয়া আসিয়া সুধীরও প্রবল জ্বরে পড়িল এবং অবস্থা একটু খারাপের দিকেই যাইতে বসিয়াছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং মাধুরীর প্রাণপণ শুশ্রূষাতেই সুধীর এযাত্রা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এখনও তাহার শরীর সম্পূর্ণ সবল হয়নি।

সুধীর এখনও অবিবাহিত। পিতামাতার সহস্র অনুরোধেও সে বিবাহে স্বীকৃত হয়নি। সম্প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে সুধীরের সহস্র আপত্তি উপেক্ষা করিয়া এক জমিদারের কন্যার সহিত পিতা তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। এখন বিবাহে অস্বীকৃত হইলে পিতা অপমানিত হইবেন ভাবিয়া সুধীর অগত্যা পিতাকে জানাইয়াছে কিছুদিন সবুর করুন নূতন কাজে আসিয়াছি এখনি ছুটী পাইব না। অতএব কিছুদিন পরেও বিবাহ হইতে পারে। পিতা সেই কথা শুনিয়া অপাততঃ নিরস্ত আছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সুধীরের অসুখের সময় তাহার পিতা দেখাশুনা করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে সুধীরের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে ফিরে গিয়ে মাধুরীর কথা নানারূপে পল্লবিত করিয়া সুধীরের আত্মীয় স্বজনের নিকট বলিয়াছে এবং মেয়েটীর ঐকান্তিক সেবা যত্ন দেখিয়া সে যে সুধীরকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছে এবং সুধীরও যে ঐ মেয়ে বই কর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট মেয়ে বিবাহ করিবে না। এবিষয়েও তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন অতবড় মেয়ে বিবাহ হয়নি চাল চলন মেম সাহেবের মত অতএব ভাল ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় না; বিশেষ করে একলা মাকে নিয়ে হাওয়া খেতে আসা, অপরিচিত পুরুষের কাছে থেকে এরূপ ঐকান্তিক সেবা করা এসব কি ভাল ঘরের মেয়ের কাজ? এইসব শুনিয়া সুধীরের বড় ভ্রাতৃবধু মাধুরীর নাম করিয়া সুধীরকে অনেক সতর্ক ক'রে এক চিঠি দিয়াছেন। তাহাতে একথাও লেখা ছিল মাধুরী সম্বন্ধে সরকার মহাশয় যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম জুতা মোজা পরা অত বড় ধেরে মেয়ে কখনই হিন্দু ঘরের নয়। ওরা খৃষ্টান ওরা অনেক ছলা কলা বজ্জাতি জানে ওদের অসাধ্য কাজ নেই। তুমি ওর কুহকে ভুলে তোমার মাননীয় পিতাকে অপরের কাছে অপমানিত ক'রো না। পিতার নির্দ্দিষ্ট কন্যা বিবাহ ক'রে জীবনে সুখী হবে ইত্যাদি।

চিঠিখানা সুধীরের অসতর্কতায় উপাধানের নিম্নে ছিল। মাধুরী একদিন বিছানাটা ঝাড়িয়া দিতে যাইয়া খোলা চিঠিতে অপরিচিত অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া পড়িবার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। কে জানিত ঐ পত্রে তাহারই উদ্দেশ্যে বিষবাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

সুধীর একটু সুস্থ হইতেই মাধুরী কলিকাতা যাইবে স্থির করিল। সুধীরও বুঝিল তাহার অসতর্কতার জন্যই এ সর্ব্বনাশ ঘটিল।

মাধুরীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া সুধীর শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বুকের ভিতরটা অসহ্য ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল; অথচ এ ব্যথা যে কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিদায়ের পালাটা যে একদিন শেষ

৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৯ম বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪২ | ৫ম সংখ্যা

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই, সি, এস

[শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস প্রণীত 'অনাগত সুদিনের লাগি' একটী সম্পূর্ণ গল্প, কবিতায় লেখা। কয়েকটী পৃথক কবিতায় এই বিচিত্র গল্পটি সমাপ্ত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে। গল্পটি romantic এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রগতির উপযুক্ত। বর্ত্তমানে যে কয়জন আই-সি-এস লেখক নানা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন শ্রীযুক্ত হালদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার অভিনবে তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন—বর্ত্তমান বিচিত্র সুন্দর গাথাটিতেও তিনি অতুলনীয় কাব্য-মাধুর্য্যের সহিত অনাগত সুদিনের যে আলেখ্য ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।]

দুই

এ ধরণী প্রতিদিন
ফেলে শ্বাস বিরাম-বিহীন,
মেঘ-দয়িতের লাগি কত মাস কত আরাধন,
তবে গলে আকাশের মন।

উপবন-বৃতিকার পাশে
পুষ্প সে কি আপনি বিকাশে ?
কত নিদাঘের দিনে ক্লান্তকায়ে সলিল-সিঞ্চনে—
দিনে দিনে আশা কোরে চেয়ে থাকা কত আকিঞ্চনে
আনন্দ-বন্দনা গীতি উঠে চুপে চুপে,
একদিন দেখা দেয় কলিকার রূপে।

এ কথা ভাবিছে নববধূ
আমার হৃদয় ভরা অপ্রমেয় সঞ্জীবনী মধু
সুলভে বিকায়ে যাবে ?—অভিলাষ এ নহে বিধির
সুদুর্গম দুর্গ মাঝে স্থান তাই মহার্ঘ নিধির,—
সহজে দিব না ধরা।

বার বার ফিরে যাবে ভগ্ন-আশা বিফল প্রয়াসে
বহুদিবা যামিনীর ব্যর্থতার সকোপ হতাশে,
মুছে যাবে মন হতে অন্য সব কামনার কালো
একমাত্র আমাকেই সত্য কোরে বাসিবে ও ভালো
একমাত্র মোর তরে সাধনায় তপস্যায় রত
অশ্রুজলে রাত্রিদিন মোরি ধ্যান করিবে নিয়ত—
সেই দিন আপনারে দিব বিলাইয়ে
উচ্ছ্বসিত অশ্রুমাঝে হাসি মিলাইয়ে,
সেই দিন ভরি দিব মধু—
ভাবে নববধূ।

কিন্তু যদি সে দিনের নাহি পাই দেখা
চলে যাবো একা।
কূল যদি নাহি পাই, অনিশ্চিতে ভাসাইব ভেলা
তবু না সহিব অবহেলা।
কারো পরে করিব না রোষ
দিব নাকো অদৃষ্টের দোষ।
অর্জ্জিব আপন ভাগ্য চূর্ণ করি বাধা পলে পলে
আপনার সুকৃতির বলে।



সাম্যবাদী

গল্প

শ্রীমতী নন্দরাণী হালদার

[শ্রীমতী নন্দরাণী হালদার নূতন লেখিকা—অন্তত পুষ্পপাত্রে তিনি নূতন লিখিতেছেন। তাঁর এই গল্পটিতে তিনি সাম্যবাদী সত্যহরির যে আলেখ্যটি দিয়াছেন তা সংসারে দুষ্প্রাপ্য নয়—বরঞ্চ অনেক সংসারেই আছে। কিন্তু এভাবে এমনি ছবিকে রূপ দেওয়া খুব বেশী হয় নি—সে দিক দিয়ে সাম্যবাদীর বিশেষ মূল্য আছে মনে হয়। পাঠক-পাঠিকারা গল্পটি পাঠে খুসী হবেন আশা করি।]

সত্যহরি যখন ছয় মাসের ছেলে, তখন একজন বড় জ্যোতিষি হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলে সংসারে থাকিবেনা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে', বোধকরি সেই জন্যই ভয় পাইয়া যোগমায়া পুত্রের বিবাহটা একটু তাড়াতাড়িই দিয়া ফেলিলেন। যদি নববধূর টানে ছেলে সংসারবাসী হয়, নতুবা জ্যোতিষের কথা,—কি হয়, কিছুই বলা যায় না।

ত্রিশ বছর বয়স অবধি সত্যহরির সন্ন্যাস গ্রহণের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা, পুরাদস্তুর সংসার করিতেই লাগিল। কিন্তু তার সব কাজেই, যখন পরমেশ্বরের দোহাই সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, এবং শুচিতা ও পবিত্রতা যুগপৎ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল,তখন তাহার আতিশয্যে পাড়ার আবালবৃদ্ধ সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া যোগমায়া একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যহরির যে ব্যক্তির সহিত আলাপ হইত, সে ব্যক্তি তাহার সর্ব্বজীবে সমজ্ঞানের ব্যাখা শুনিয়া একেবারে হতবাক হইয়া যাইতেন।

দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিস করিয়া, সকাল সন্ধ্যা গঙ্গা স্নান করিয়া, এবং পরমেশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে সত্যহরির সংসার যাত্রা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু দুইটী সন্তানের পর যখন তৃতীয়টীর সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইবার উপক্রম হইল। অকস্মাৎ সংসারে সত্যহরির অতি বিরাগ জন্মিল, এ সংসার যে কেবল মাত্র মায়ার বন্ধন, এবং এই মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া জীব কেবল দুঃখ ভোগ করিয়াই চলে, ইহা বোধকরি তখনই সে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল এবং এই মায়ার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে জীবের যে আর কোনরূপেই মুক্তি নাই ইহাও সে সকলকে জানাইতে ত্রুটি করিল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই বৈঠকখানা হইতে চেয়ার টেবিল তক্তপোস ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইল, এবং সে স্থানে নানা রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি সজ্জিত হইল। সত্যহরি মাছ মাংস ত্যাগ করিল। খদ্দর গেরুয়া রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া অঙ্গে উঠিল এবং দিবারাত্র ধূপ-ধুনা, স্তব স্তোত্রের শব্দে, বাড়ী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল।

যোগমায়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। তিনি বিধবা মানুষ, সত্যহরিই জ্যেষ্ঠ পুত্র; মধ্যম বিনোদ বিবাহ করিলেও বাহিরের পয়সা ঘরে আনা অপেক্ষা ঘরের পয়সা বাহির করিতে অধিক তৎপর। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভু এখনো নাবালক। স্কুল, ফুটবল ম্যাচ, অনাথ সেবা মন্দির ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ লইয়াই সে বার ঘণ্টার মধ্যে এগার ঘণ্টা বাহিরে থাকে। খাইবার সময় ব্যতীত প্রায়ই বাড়ীতে তার দর্শন মেলেনা। জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম কন্যা শ্বশুরালয়েই থাকে। কনিষ্ঠ কন্যা সুমতি চারিটী সন্তানের জননী। তার উপর কয়েক বৎসর যাবৎ দুর্ভিক্ষে ভুগিতেছে। শ্বশুরবাড়ী কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে, ভাতকাপড়ের তথায় সংস্থান না থাকিলেও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের তথায় অভাব নাই, কয়েক বৎসর যাবত স্বামীর চাকুরী নাই, কাজেই স্বামীপুত্র লইয়া সে পিত্রালয়েই বাস করিতেছে। যোগমায়াকে সকল দিকেই নজর রাখিয়া চলিতে হয়, অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয়।

কয়েকদিন হইল সত্যহরির পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র কালীপদর জ্বর হইয়াছে। প্রথম কয়েকদিন স্নান বন্ধ করিয়া, সাগু বার্লি খাওইয়া রাখা হইল, কিন্তু জ্বর উপশম না

হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। রাত্রে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর উঠিয়াছে এখনও নামে নাই। সকাল বেলা উঠিয়া যোগমায়া চিন্তিত মুখে বৈঠকখানা ঘরের দিকে, অর্থাৎ সত্যহরির পূজার ঘরের দরজায় আসিয়া উঁকি দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে যোগমায়া বৈঠকখানা ঘরে আসিতেন না।

সত্যহরি সবেমাত্র গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। যোগমায়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—সতু; পদর জ্বরটা যে কিছুতেই ছাড়ছেনা বাবা; ডাক্তারের কাছে একবার যা; ছেলেটা কদিন আর ভুগবে?

সত্যহরি মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত মাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ভগবান যার কপালে যতটুকু ভোগ লিখেছেন তাকে সেটুকু ভুগতেই হবে মা; তুমি কিছু করতে পারবে না। তারপর কয়েক মুহূর্ত চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া বলিল—এই সংসার একটা মিথ্যা বন্ধন, মিথ্যা মায়া, এর থেকে মনকে মুক্ত করো। আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল; সব মিথ্যা মা সবই মায়ার খেলা একমাত্র তিনিই সত্য তাঁকে চিন্তা করো। সত্যহরি চক্ষু মুদিয়া ঊর্দ্ধে কড়িকাঠের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া ভগবানের নির্দ্দেশ করিল।

যোগমায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা হলে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে পারবিনে? ছেলেটা ওই রকম জ্বরে ভুগবে?

সত্যহরি উদার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—কে কার ছেলে? কে কার বাপ? কিসের এই উদ্বিগ্নতা, কিসের জন্যই বা এই ব্যস্ততা? তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? একবার ভেবে দেখ দেখি মা এ সবই মনের বিকার মাত্র। মনকে বিকার শূন্য, নিরুদ্বেগ কর, প্রশান্ত কর।

যোগমায়া এইবার বিলক্ষণ রাগিয়া বলিলেন,—ঘরে রোগা ছেলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করবে, আমি বিকার শূন্য নিরুদ্বেগ হয়ে প্রশান্ত মনে পরমেশ্বরের চিন্তা করব? বাপের উপযুক্ত কথাই বটে!

সত্যহরি চক্ষু মুদিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—এই তো বল্লুম মা কে কার ছেলে? কেই বা কার বাপ? সবই মনের বিকার মাত্র। ভগবানে নির্ভর কর তাঁকে চিন্তা করো মা।

যোগমায়া আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। বিনোদ তখন সবেমাত্র চা'পর্ব্ব শেষ করিয়া সার্ট গায়ে দিতেছে; যোগমায়া বলিলেন—ওরে একবার ডাক্তারের কাছে যা পদর জ্বরটা খুব বেড়েছে।

দাদাকে যেতে বলো, আমাকে এখনি একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে। বলিতে বলিতেই সে দরজা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। তাহার নাগাল ধরিতে যাওয়া বৃথা, বুঝিয়া যোগমায়া অগত্যা শম্ভুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে ফুটবল কিনিতে পয়সা দিবার কবুল করিয়া তাহাকেই ডাক্তার খানায় পাঠাইলেন।

২

রবিবার দিন খাওয়া দাওয়া চুকিতে একটু বেলা হইত। বেলা তখন দুইটা। সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বড় বধূ রান্না ঘরের কাজ সারিয়া নিজের ভাত লইয়া খাইতেছেন। সত্যহরি আসিয়া বলিল,—একজন ভিক্ষুক এসে ভাত খেতে চাইছে, তাকে দুটী ভাত দাও দিকিন্।

যোগমায়া রান্না ঘরের রোয়াকে বসিয়া সুপারি কুচাইতে ছিলেন, বলিলেন,—এত বেলায় ভাত কোথায় পাবরে? সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে। ভিকিরিকে কিছু চাল কিম্বা পয়সা টয়সা দে বাবা, এতো বেলায় কি আবার রান্না চড়াতে যাব?

রান্নাঘরে বড় বধূর ভাতের থালার দিকে আঙুল দেখাইয়া সত্যহরি বলিল,—কেন, ওইতো রয়েছে, ওই দাওনা।

যোগমায়া সকাল হইতেই আজ মনে মনে রাগিয়া ছিলেন, একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—ওই ভাত দিয়ে দেবে তো ও নিজে কি উপোস করে থাকবে? না—এই বেলা দুটো পর্য্যন্ত তোদের সকলের পিণ্ডির জোগাড় করে, এখন আবার নিজের জন্যে রান্না চড়াতে যাবে?

সত্যহরি একেবারে নাচিয়া উঠিয়া, তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—নিজের খাওয়াটাই বড়ো হলো। অভুক্ত ভাত চেয়ে ফিরে যাবে; আর তোমরা নিজেরা ঘরে বসে গিলবে? নিজেদের খিদে তেষ্টায় যে কষ্ট বোধ করো, অন্যের যে ঠিক তাই হয় সেটা বুঝতে পারনা? নিজের সুখ নিজের ভোগটাই জগতে বড়ো নয়। জগতের সকলকেই নিজের সঙ্গে সমান করে দেখতে চেষ্টা কোরো মা, সকলের কষ্ট সকলের দুঃখই নিজের মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—ভগবান সকলের জন্যেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুটীতেই সকলের সমান অধিকার।

যোগমায়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন,—তা বৌমার বাড়াভাত ভিকিরিকে না দিলেই নয়? চাল দিচ্ছি পয়সা দিচ্ছি তাতে হবেনা?

সত্যহরি বলিল,—এই দুপুর বেলা সে এখন কি নিজে রেঁধে খেতে যাবে মা? আচ্ছা না হয় ও ভাত নাই দিলে তোমরা আলাদা দুটী রেঁধেই দাওনা বাপু। তার পর একবার চক্ষু মুদিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—জীবনে সেবার তুল্য কি আর ধর্ম আছে? জীবের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি।

যোগমায়া বাদ প্রতিবাদ না করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—তা যদি তুমি সত্যই আজ বুঝে থাক সতু তা হলে আমি রান্নার সমস্ত জোগাড় করে দিচ্ছি তুমি নিজে রেঁধে পরিতৃপ্ত করে অতিথিকে খাওয়াও দেখি, অন্যের সেবার উপর জুলুম করোনা। ভর্তি পেটে দিবা নিদ্রা সেরে এসে আর একজনের বাড়াভাত টেনে নিয়ে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাতে যেওনা বাবা। নিজে হাতে সব করে সেবা-ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাও দেখি।

বড়বধূ এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক ভাবে সব শুনিতেছিলেন। যোগমায়ার দিকে আগাইয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—অত গণ্ডগোলে দরকার কি মা? ওই ভাত ওকে দাও। আমার আজ তত খিদে নাই। কিছু জল টল খেয়েই কাটিয়ে দিব।

বড় বধূ ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক, যাঁহারা সংসারে সকল রকম অসুবিধা সহ্য করিলেও মুখ ফুটিয়া কিছুর প্রতিবাদ করিতে পারেন না। দুঃখ কষ্টের গুরুভার যখন তাঁহাদের আকণ্ঠ হইয়া ওঠে, তখন তাঁহারা নিজের অদৃষ্টকে অনবরত ধিক্কার দিতে এবং চোখের জল ফেলিতে থাকেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কখনোও প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন না। বড়বধূও ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ। খুব কোমল বা স্নেহপ্রবণ প্রকৃতির না হইলেও তিনি নীরবেই সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেন। সংসারের সব বিষয়েই উদাসীন কোন বিষয়েই তাঁর নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করিতেন না। সংসারের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁর যে নিজস্ব কোন স্বত্তা আছে ইহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না।

যোগমায়া তাহা বুঝিতেন। তাই বড়বধূর কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বেশ যা সুবিধে বোধ কর তাই কর বৌমা আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন নেই। বলিয়া তিনি উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গম্ভীর মুখে আপন শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল সত্যহরি ভিক্ষুকটিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝাইতেছে। ইদানিং বাড়ীর লোকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আর শুনিতে চাহিত না। সকলেই উত্যক্ত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই রবিবারের নিরবচ্ছিন্ন অবসর কাটাইবার জন্য তাহার আধ্যাত্মিক কথা শুনিতে একজন লোক চাই।

সন্ধ্যাবেলা সত্যহরি আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি দিয়া বলিল,—এবেলা কি রান্না হচ্ছে তোমাদের?

বড় বধূ রান্না করিতেছিলেন, মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন,—দেখতেই তো পাচ্ছ।

সত্যহরি বলিল,—আমার জন্যে এবেলা আর লুচি কোরোনা, বুঝেছ?

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবেলা কি তবে পরোটা খাবে?

সত্যহরি একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চোখ বুলাইয়া

হইয়া বলিল,—না, পরোটা খাব না, তোমাদের রান্না ঘরের অপবিত্রতা দেখলে তো এঘর মাড়াতেই ইচ্ছে করে না, তা খাবো কি বলো, রান্না হয়ে গেলে ঘর দোর বেশ করে ধুয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, আমাকে একটু পায়স রেঁধে দিও।

রাত্রে বাড়ীর সকলেই ভাত খাইত। যোগমায়া বিধবা মানুষ তাঁহার জন্য পরোটার ব্যবস্থা, কেবল সত্যহরিকেই লুচি করিয়া দিতে হইত। দুইবেলাই খাইবার পূর্ব্বে আসিয়া সত্যহরি রান্নাঘরে খবরদারী করিয়া যাইত, এবং ব্যঞ্জন পছন্দমত না হইলেই তার সমস্ত অপবিত্র ঠেকিত। তখন আবার তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইত। আজকেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল এবং বড় বধূরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মুখ খানা হাঁড়ি করিয়া তিনি বলিলেন,—পায়স তো রাঁধবো কিন্তু দুধ কোথায়?

সত্যহরি বলিল,—সনাতনকে দুধ আনতে দিয়েছি, এখনি নিয়ে আসবে, ভ'সের দুধ; বেশ ঘন করে জ্বাল দিও, দুধ যেন পাতলা থাকে না; বুঝেছ?

বড় বধূ পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন বুঝিয়াছেন। বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শুচিতা বজায় রাখিয়া, সত্যহরি বকের মত সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল।

৩

মাস দুই পরের কথা, বড়বধূ নবজাত কন্যা লইয়া আঁতুড় ঘরে। সুমতি রান্না করিতেছে। যোগমায়া রোয়াকে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন। সত্যহরি একটা মুলতানী গাই এবং তৎসঙ্গে ভোজপুরী পালোয়ানের মত চেহারা এক খোট্টাকে লইয়া বাড়ী ঢুকিল।

যোগমায়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গরু কোথা থেকে আনলিরে?

সত্যহরি বলিল,—কিনে এনেছি মা, ছ'সের করে দুধ দেয়। যত্নে থাকলে আর ভাল খেতে পেলে আরো বেশী দেবে। ভালকরে খেতেটেতে দিও মা, বুঝেছ? গয়লার জোলো দুধ কি আর মুখে দেওয়া যায় আরে ছ্যাঃ! ঘরের গাইয়ের খাঁটি দুধ একবার খেয়ে দেখো।

যোগমায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—ঘরের গাইয়ের খাঁটী দুধতো খাবি, কিন্তু গরুকে এখন রাখি কোথায় বল্‌তো, আর ওর পেছনে খাটবেই বা কে? সংসারের কাজ নিয়েই যে মরবার ফুরসৎ পাই না, সহরে গরু পোষা কি কম ঝঞ্ঝাট না কি? ওর পেছনেই যে এখনি একটা চাকর রাখতে হবে। একটু হাসিয়া বলিলেন,—গরু রাখার খরচায় যে তোর দুধের দাম পুষিয়ে যাবে বাবা।

সত্যহরি বলিল,—তা হোক; কিন্তু এমন খাঁটী দুধ কোথায় পাবে বলতো? আর চাকরই বা রাখতে হবে কেন? তোমরা এতোগুলো মেয়ে মানুষ বাড়ীতে রয়েছে, একটা গরুর কিই বা এমন কাজ, এটুকু আর করতে পারবে না?

যোগমায়া গম্ভীরমুখে বলিলেন—বাড়ীর মেয়েদের তোমার গরুর সেবা করবার ফুরসৎ নেই বাবা। মা, ষষ্ঠীর কৃপায়, তাদের নিজেদের ঝঞ্ঝাট নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত।

সত্যহরি রাগিয়া বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, গরুর জন্যে আমি না হয় একটা চাকরই রাখ্‌ব; তোমাদের অত কথার ধার ধারিনে। খোট্টার দিকে ফিরিয়া বলিল,—ইয়ে রামদীন ইধার আও। বলিয়া সে রাগে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

খোট্টা লোকটি এতক্ষণ বাকবিতণ্ডা শুনিতেছিল, এবং বাঙ্গালা কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও এইটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে গরু লইয়াই মাতা পুত্রে বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে, তাই সে একবার যোগমায়ার এবং একবার সত্যহরির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ক্যা হুয়া বাবুজি? আপ লোগ গরু নেই—

সত্যহরি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, তোমলোগ বাৎ মৎবোলো। গরু লকর লিয়েগা। ইধার আও, পয়সা লে যাও।

খোট্টা লোকটা হতভম্ব হইয়া, একবার উভয়ের মুখের পানে তাকাইয়া, আপন প্রাপ্য লইয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া রাগে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, সুমতি রান্না

ফেলিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি সত্যহরির জল খাবারের জন্য কল ছাড়াইতে বসিয়াছিল। ওদিকে রান্নাঘরের রোয়াকে, ভুতো, খেঁদি, নিতাই, কালীপদ, পাঁচু সকলে মিলিয়া ভাত দিবার তাগাদার ঐক্যতান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

মালিকের প্রস্থানে এবং নূতন জায়গায় আসিয়া, গরুটা উঠানে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল, এদিকে অরক্ষিত পাইয়া, সুমতির দুই বৎসরের পুত্র এককড়ি রান্নাঘরে ঢুকিয়া ব্যঞ্জনের মধ্যে একঘটী জলে উপুড় করিয়া দিয়াছে, এবং তাহারই পার্শ্বে একটা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া পরমানন্দে তাহাই চাপড়াইতেছে। খেঁদি চিৎকার করিয়া উঠিল,—দিদিমা, শিগগির এসো, এককড়ি রান্না-ঘরে কি করেছে দেখে যাও।

রাগে দুঃখে যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতেছিল। তিনি উঠিয়া আসিয়া তাহার সমস্তটাই প্রকাশ করিলেন এককড়ির পিঠে।

তাহাকে রান্নাঘর হইতে টানিয়া বাহির করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কন্যাকে বলিলেন,—সুমী, একটু পরে কি আর তোর জল খাবার দিতে গেলে হোতনা? রান্নাঘর ফেলে তোকে কে এখন যেতে বল্লে? জল খাবার তো আমিও দিতে পারি। তারপর উঠানের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—হাঁরে অ—সনাতন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস, সন্ধ্যে হয়ে গেল আলোগুলো জ্বালবিনা? গরুটা যে ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, ওর একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়? না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রকম তামাসা দেখতে হয়? এ বাড়ীর সবাই হয়েছে সমান। বলিয়া এককড়িকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি নিজেই গরু রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

রাত্রে খাইতে বসিয়া সত্যহরি বলিল,—বাড়ীর ছেলে-দের স্বাস্থ্য দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে, তাতো দেখছ না, কিন্তু কেন যে হচ্ছে তা কি খবর রাখ? মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া বলিল,—শুধু খাঁটী জিনিষের অভাবে, বাজারের সব জিনিসই আজকাল ভেজাল কোন জিনিষই খাঁটী নেই। ওসব জিনিস কি কিনতে আছে? বিষ—বিষ ওসব খাওয়া আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—গরুটা সেই জন্যেই নিয়ে এলাম ছেলেপিলে গুলোর স্বাস্থ্যের দিকে তো একটু নজর রাখতে হবে।

প্রয়োজন যে কাহার জন্য যোগমায়া তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন তাই বাদ প্রতিবাদ করিয়া আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না।

সত্যহরি কয়েক গ্রাস খাইয়া লইয়া, কতকটা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল,—জীবনের এই গোনা ক'টা দিন কাটিয়ে যাওয়া বইতো নয়; সকলে যাতে সুখে শান্তিতে দিন গুলো কাটাতে পারে সেই দিকেই একটু যা নজর রেখে চলি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিল,—তাই বলছি মা যখন মানুষের দিকে চাই তখন শুধু তাঁরই লীলা দেখি মানুষের সেবাতেই তাঁর সেবা, মানুষের তৃপ্তিতেই তাঁর তৃপ্তি। তাই মনে হয়—তোমাদের সেবা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করে গেলেই তাঁর সেবা তাঁর তৃপ্তিসাধন করতে পারবো।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে নিরুত্তরে আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন কোন জবাব দিলেন না।

সত্যহরি খাইতে খাইতে পুনরায় বলিল,—গরুটা ছ'সের করে দুধ দেয় যত্ন পেলে আরও বেশী দেবে। হাঁ, দেখ—বাজারের ওই ছাই ভস্ম ঘি আর কিনোনা মা, ওই দুধ থেকেই মাখন তুলে ঘরে একটু ঘি করে নিও। আচ্ছা, তোমাদের কষ্ট হয় একটা চাকর না হয় রাখবো। কিন্তু চাকরের হাতে কি যত্ন হয়? আরে রাম—বেটারা একের নম্বর ফাঁকিবাজ, টাকা নেবে আর কাজে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা যাকৃগে,—তোমাদের যদি তা'তে সুবিধে হয় না হয় তাই রাখা যাবে, যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন,—অন্য চাকর আর রাখতে হবে না, সনাতনই গরুর কাজ করবে।

সত্যহরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—সনাতন করবে? বেশ,—বেশ, জীবের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—জীবের তৃপ্তি-তেই পরমেশ্বরের তৃপ্তি।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে বলিলেন,—কিন্তু সেজন্য তা'কে আলাদা মাইনে দিতে হবে, টাকা না দিলে সে গরুর সেবা করবে না।

সত্যহরি চটিয়া উঠিয়া খিঁচাইয়া বলিল,—আবার টাকা কিসের জন্যে শুনি? গরু সাক্ষাৎ ভগবতী শাস্ত্রে বলে—গো মাতা, তার সেবা করলে ওর পরকালের কাজ হবে। আবার টাকা চাই। দূর হয়ে যাক্ ও এখনি বাড়ী থেকে।

যোগমায়া বলিলেন, পরকালের ভাবনাটাইতো সকলের বড় নয় বাবা ইহকালের ভাবনাটা ও অনেককে ভাবতে হয়, নইলে যে তাদের চলেনা। সবলেই তো আর তোমার মত পরমেশ্বরে নির্ভর করে দিন কাটিয়ে দিতে পারেনা।

সত্যহরি রাগিয়া বলিল—পাজি নচ্ছার বেঠা, দূর করে দাও ওকে!

যোগমায়া শান্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন—ওকে দূর করলে তো চল্‌বেনা সতু, একদিন চাকর না থাকলে যে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না। বাড়ীর কাজ না হয় আমরা নিজেরাই করে নিলাম, কিন্তু দুবেলা দোকান বাজার করবার লোকের ব্যবস্থা করে তবে ওকে দূর কোরো।

সত্যহরি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা ওকে না হয়, কিছু দেব গরুর কাজ করতে বোলো।

যোগমায়া আর কোন জবাব দিলেন না। সত্যহরি নতমুখে আহার করিতে লাগিল। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সত্যহরি মুখ তুলিয়া বলিল—হাঁ কি বলছিলাম—দেখ মা এমাসে বিনোদের মাইনের টাকাতেই সংসার চালিয়ে নিতে হবে। আমি যা মাইনে পেয়েছিলাম তা তো গরু কিনতেই ফুরিয়ে গেছে। তা যাকগে সে জন্য আমি ভাবিনে তোমারা তো খাঁটী দুধ খেয়ে বাঁচবে।

যোগমায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন—বলিস্ কি সতু বিনোদের মাইনের টাকায় সংসার চালাব? সে যা মাইনে পায়, তা'তে যে সংসারের দশদিনের খরচাও কুলায়না বাবা, এতো বড় সংসারের খরচা আমি সারামাস চালাই কি করে।

সত্যহরি নির্ব্বিকার ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—জগৎটা যিনি চালাচ্ছেন—সংসারটাও তিনিই চালিয়ে দেবেন মা, জীব যিনি দিয়াছেন আহারও তিনিই দেবেন, না খেয়ে কেউ থাকবে না। তারপর একবার চোখ বুজিয়া বাঁ হাত খানা নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল—এই যে—আমি করছি, আমি বলছি, আমি চালাচ্ছি এই আমিত্ব বোধ—এই অহমিকা ছাড় মা। তিনি যা'কে যে ভাবে চালাচ্ছেন সে সেই ভাবে চলছে। এই আমিত্বের বিকার ত্যাগ কর মা—ত্যাগ কর। দীনবন্ধু—দীনবন্ধু—সত্যহরি গণ্ডুষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

যোগমায়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিলেন। সত্যহরিকে কিছু বলিতে যাওয়া বৃথা; পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিবে। তার সন্ন্যাসের উন্নতির সাথে তাল রাখিয়া যোগমায়া খরচা এবং পরিশ্রম আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বিনোদের যৎসামান্য আয়ে এত বড় সংসার চালান যায় না, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধি সংসারের নিত্যকারের রান্না সবই সত্যহরির অপবিত্র ঠেকিত। তার জন্য দুধ দই ছানা মাখন প্রভৃতি এবং নানা রকম ফলের ব্যবস্থা করিতে সংসারে প্রতিমাসেই অভাব অনাটন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এজন্য অনুযোগ করিতে যাওয়া বৃথা। সত্যহরি নিজের স্বাত্তিক ব্যবস্থা নিজের মাহিনার টাকায় নিজের হাতেই করিত সে জন্যে সে চাকর বা সংসারের অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিত না।

সত্যহরি হাত মুখ ধুইয়া পূজার ঘরে যাইয়া গীতা পাঠ আরম্ভ করিল। প্রত্যহ রাত্রে, আহার করিয়া, আসিয়া শয়নের পূর্ব্বে সে একবার করিয়া গীতা পাঠ করিয়া শুইতে যাইত।

যোগমায়া চিন্তিত মুখে, অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া বোধকরি পুত্রের সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, অথবা এই অভিনব সন্ন্যাসের কথাই, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা, বেলা নয়টা, সত্যহরি খাইতে বসিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিল। যোগমায়া আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, দুধের বাটী টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া

সত্যহরি চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছে। যোগমায়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

সুমতি একপাশে, অপরাধীর মত ছল্ ছল্ চোখে দাঁড়াইয়াছিল, মুখ তুলিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সত্যহরি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—এই জোলো, অখাদ্য দুধ আমাকে খেতে দিয়েছে, ওর কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? বল্লুম, এদুধ খাবনা, তুলে নিয়ে যা, বল্লে, এছাড়া আর দুধ নেই। কেন, ছ'সের দুধ কোথায় যায় শুনি? লজ্জা করেনা ওর এই রকম দুধ আমাকে খেতে দিতে?

যোগমায়া তিক্ত কণ্ঠে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওকে জোলো দুধ দিয়েছিস্ কেন?

সুমতি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, জোলো দুধ আবার কোথায়? আমি কি দুধে জল দেই? যোগমায়া অধিকতর তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন,—দুধে জল দেওয়া হয়না তা আমিও জানি, ওকে রোজ যেমন ক্ষীর করে দেওয়া হয়, সেইটেই করা হয়নি কেন তাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

সুমতি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াই বলিল, ক্ষীর করবো কোথা থেকে? তুমি কাল রোজের দুধে জবাব দিয়েছ। ছেলেদের এবেলার দুধ রাখতে হয়েছে। সকালে দাদাকে ছানা করে দিয়েছি, মাখম তুলেছি আবার ক্ষীর করবার দুধ কোথায় পাঁকে বলো?

যোগমায়া কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছেলেদের জন্যে দুধ রাখতে হবে না, সেই দুধে ক্ষীর করে দাও।

সুমতি রান্না ঘরে চলিয়া গেল। সত্যহরি কিন্তু রাগ করিয়া ভাতের থালা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, অপেক্ষা করিল না। যোগমায়া স্তম্ভিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর রান্নাঘরে যাইয়া সুমতিকে বলিলেন, সনাতনকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, গয়লাকে রোজের দুধ দিতে বলে আসুক। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, ছেলেদের জন্য যেমন গয়লার দুধের ব্যবস্থা আছে, তাই থাক। তুই বাড়ীর দুধের ভরসা করিস্নে মা।

সুমতি ভরসা করেও নাই এবং গয়লাকেও বারণ করিতে বলে নাই। যোগমায়াই বাড়ীতে এত দুধ দেখিয়া গয়লার দুধ ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথার আর কোন উল্লেখ না করিয়া সুমতি ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কথায় সম্মতি জানাইল।

যোগমায়া পুনরায় খাইয়া আহ্নিকে বসিলেন। কিন্তু মন শান্ত করিতে পারিলেন না। সত্যহরি যে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছে ইহাই তাঁহার মাতৃ হৃদয়কে অনবরত পীড়া দিতে লাগিল। তিনি কোন রকমে আহ্নিক সারিয়া আসিয়া সুমতির অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা খেঁদিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে তোর বড় মামা কোথায়?

খেঁদি মাতার পরিত্যক্ত বঁটীটা লইয়া পরম মনোযোগের সহিত কুটনার খোসা কুচাইতেছিল, উত্তর দিল 'বড় মামা তো অনেকক্ষণ আপিসে চলে গেছে।'

যোগমায়া রান্নাঘরে মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া খেঁদিকে বলিলেন, আপিসে চলে গেল তা, আমাকে একবার জানাতে নেই? কেন, কি রাজকার্য্য তোমরা করছিলে শুনি?

খেঁদি হতভম্ভ হইয়া গেল। হঠাৎ বড় মামার আপিসে যাইবার সংবাদ দিদিমাকেই বা আজ জানাইতে হইবে কেন এবং তা না জানানতেই বা রাগের কি ঘটিল, সে বেচারা তার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যোগমায়া পূর্ব্ববৎ শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, রাগ করে না হয় ভাত খায়নি, কিছু ফল মিষ্টিটিষ্টী, তো খেতে দিতে হয়? আমি না হয় আহ্নিক করতে বসেছিলাম? তোরা কি কর্‌ছিলি? তোরাও কি সবাই আহ্নিক করতে বসেছিলি নাকি?

খেঁদি হঠাৎ আহ্নিক করিবার অভিযোগে আক্রান্ত হইয়া, কোন উত্তর দিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তর দিল রান্না ঘর হইতে সুমতি, বলিল—নিতাইকে দিয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলুম, দাদা বল্লে, কিছু খাবেনা।

যোগমায়া রান্নাঘরে আসিয়া, কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলি তুই? কি বল্লে সে, কিছু খাবে না?

সুমতি কড়ার মধ্যে খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, হুঁ।

যোগমায়া আর কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে আপন মনেই বলিলেন,—তাই হবে, সকালে জল খেয়েছে তাতেই হয়ত পেট ভরে আছে, ক্ষিদে তেমন নেই। বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

৫

সুখে দুঃখে সংসারটা যোগমায়ার একরকম চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কলেরা হইয়া বার ঘণ্টার মধ্যে বড়বধূ যখন সংসারের সকল দায়িত্ব ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, তখন মাতৃহীন দুইটি শিশুপুত্র এবং পাঁচ মাসের কন্যাকে লইয়া যোগমায়া যেন অকূল পাথারে পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য এই সংসার তরণীটি যেন বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। সংসারের চৌদ্দ আনা কাজের ভার ছিল বড়বধূর উপরে, সকল রকম অসুবিধা মাথা পাতিয়া লইয়া, নীরবে সংসারের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এমন নিয়মিতভাবে করিয়া যাইবার লোক সংসারে আর দ্বিতীয় ছিল না। কাজেই সংসারের ষোল আনা ভার আসিয়া পড়িল যোগমায়ার উপর।

পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার সৎউপদেশ অনেকেই যোগমায়াকে দিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছাকে মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি মনে স্থান দিলেন না। পুত্রের প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতার স্বরূপটি এসংসারে তিনি নিজে যতটা জানিতেন, এমন বোধ করি আর কেহ জানিত না। তাই দ্বিতীয় বার পুত্রের বিবাহ দিয়া, আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিতে তিনি চাহিলেন না। কিন্তু এই বয়সে সংসারের কাজ, মাতৃহীন শিশু তিনটির লালন পালন, এবং সত্যহরির পরিচর্য্যা করা তাঁহার সাধ্যে কুলাইয়া উঠিতেছিল না।

কিন্তু দিন কাহারও বোধ করি আটকাইয়া থাকে না, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা, সকলেরই এক প্রকার হইয়া যায়। তাই অনাহূতভাবেই সংসারে একটি ঝি মিলিল হরিদাসী। হরিদাসীর বয়স বছর একুশ হইবে। বড় ভাল লোক, বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, বিধবা মানুষ পেটের সংস্থান করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। নিজের ছেলে পিলে নেই, ছোট ছেলে বড় ভালবাসে। দুই একদিনের মধ্যেই মাতৃহীন শিশুদুইটির সকল ভার সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু তাই নয়, রান্না ছাড়া, সংসারের আর সমস্ত কাজের ভারই তাহার উপর যাইয়া পড়িল। কিন্তু সে জন্য তাহাকে কখন ক্লান্ত বা বিরক্ত হইতে দেখা যাইত না। অটুট স্বাস্থ্য, হাসি মুখেই সে পরিশ্রম করিত। যোগমায়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বোধ করি যোগমায়ার অদৃষ্টে নিশ্চিন্ততা শব্দটা লিখেন নাই। তাই সংসারের এই নূতন ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খলায় চলিল না। মাসখানেক যাইতে না যাইতেই তাহার মধ্যেও আবার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাসী প্রত্যূষে উঠিয়াই কাজকর্ম্ম সারিয়া ফেলিত। যোগমায়া উঠিয়া স্নান করিয়া রান্না চাপাইতেন।

সেদিন সকালে উঠিয়া যোগমায়া দেখিলেন, কাজ কর্ম্ম কিছুই তখনো সারা হয় নাই। রান্না ঘরে গত-রাত্রের উচ্ছিষ্ট থালা বাসন তখনও পড়িয়া রহিয়াছে। শয়ন কক্ষে শিশু কন্যা কাঁদিয়া গলা ফাটাইতেছে। হরিদাসীর সাড়া নাই, যোগমায়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন, হরিদাসী এতবেলা অবধি কখনও ঘুমায় না। হয়তো রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, সেই জন্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মনে করিয়া তিনি হরিদাসীর শয়ন কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে হরিদাসীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে শিশুকন্যাকে মল মূত্রে লিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া চীৎকার করিতে দেখিলেন।

যোগমায়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া, হরিদাসীকে ডাকাডাকি করিতে করিতে, সদর দরজা অভিমুখে আসিয়া বাহির হইতে যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি যুগপৎ ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন সত্যহরি বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া অনর্গল ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছে, এবং হরিদাসী ম্লানমুখে বসিয়া তাহার পা টিপিয়া দিতেছে।

যোগমায়া আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। দরজার কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন হরিদাসী; হরিদাসী চমকিত হইয়া পিছন ফিরিল; সত্যহরি ও চোখ

মেয়েকে মাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত এবং বিরক্ত হইল।

যোগমায়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন কাজ কর্ম্ম ফেলে রেখে এখানে তোমার কি হচ্ছে হরিদাসী?

হরিদাসী যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, স্পষ্ট ভাষায় নিজের নিরুপায়তা এবং বিরক্তি জ্ঞাপন করিয়া বলিল আমি কি করবো মা? সকাল বেলা উঠে কাজ করতে যাচ্ছি এমন সময় দাদাবাবু গঙ্গা স্নান করে এসে বল্লে আমার হাত পা কামড়াচ্ছে মাথাটারও বড় যন্ত্রণা হচ্ছে বোধহয় জ্বর হবে। হরিদাসী আমার মাথাটা একটু টিপে দিয়ে যাও তো। তুমি তো তখন ঘুম থেকে ওঠনি মা, যে তোমাকে জানাব। কাজেই কাজ কর্ম্ম ফেলে আমাকে এখানে বসে হাত পা টিপে দিতে হচ্ছে।

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন যাক হাত পা টিপা তো হয়েছে? এবার মেয়েটাকে একটু দেখগে যাও, চেঁচিয়ে যে সেটা গলা ফাটাচ্ছে তাকে একটু দুধ খাওয়াতে তো হয়। বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইতেই পিছন হইতে সত্যহরি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলিল মেয়েটা গলা ফাটচ্ছে তো কি হয়েছে শুনি? তুমি কি সেটাকে একটু দুধ খাওয়াতে পারনা? হরিদাসী একটু ব্রাহ্মণের সেবা করছে দুটো ধর্ম্মকথা শুনছে তো অমনি তাকে ডাকতে ছুটে এসেছ, তোমার বাড়ী চাকরী করতে এসেছে বলে কি ওর ইহকাল পরকাল নেই?

যোগমায়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, না বাবা এই বুড়ো বয়সে কচিছেলে মানুষ করা আর আমার দ্বারা হবে না। ওকে ধর্ম্ম কথা শোনাবার যদি এতই প্রয়োজন থাকে তো তোমার ছেলে পিলে মানুষ করবার আর এক জন লোক নিয়ে এস। বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হইল না। পরন্তু সেটা নিত্য নিয়মিত ভাবেই ঘটিতে লাগিল। রোজই সত্যহরির জ্বরের মত হইতে লাগিল; হয় তো মাথার যন্ত্রণা হয় নয়তো হাত পা ব্যথা করে এবং হরিদাসীকে ডাক পড়ে। রবিবারের দীর্ঘ অবসর হরিদাসীকে ধর্ম্মকথা না শুনাইলে সত্যহরির আর কাটিতে চাহিত না। হরিদাসী কাঁচা লোক নয় সংসারে যে কাহার মন জোগাইয়া চলিতে হয় তাহা সে জানে। এ কয় মাসে সে বেশ বুঝিয়াছিল যে যোগমায়া নামে মাত্র গৃহিণী অর্থনৈতিক ব্যাপার গুলো নির্ভর করে সত্যহরির উপর এবং আর লোকগুলি সংসারে আগাছার দল। কাজেই যোগমায়ার সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাইলে এসংসারে যে তাহাকে টিকিতে হইবে না একথা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

যোগমায়া সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু এই লইয়া বকাবকি করিতেও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল। কিন্তু ক্রমশই যখন সংসারে কাজ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, তখন একেবারে চুপ করিয়া থাকাও আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাই সে দিন রান্না করিতে করিতে যখন দেখিলেন বাটনা বাটা তখনও হয় নাই, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সত্যহরির পূজার ঘরে আসিতে হইল। এবং চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, হরিদাসী, এরকম করলে তো চলবেনা মা, সংসারের কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে, রাতদিন যদি তুমি ধর্ম্ম কথাই শুনতে থাক তো, তোমাকে জবাব দিয়ে আমায় অন্য লোক রাখতে হবে।

হরিদাসী লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইযে যাই মা।

যোগমায়া পুত্রের দিকে একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিদাসীকে বলিলেন, হাঁ, বাটনা বেটেদিয়ে এসে তত্ত্বকথা শুনো, আমার যে নইলে রান্না বন্ধ থাকে।

হরিদাসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যোগমায়া গেলেন না। তিনি যেন পুত্রের সহিত আজ একটা বোঝা পড়া করিয়া লইতে চান—বলিলেন, 'কাজ কর্ম্মের সময় তোমার ধর্ম্মকথা আরম্ভ হ'লে আমার কাজ আটকায় সতু, সকাল সন্ধ্যায় তোমার অবসর থাকলেও আমাদের সেটা কাজের সময়। কাজ কর্ম্ম চুকে গেলে, রাত্রে নিরিবিলিতে ওকে তত্ত্বকথা শুনিও বাবা আমি বাধা দিতে আসবো না।

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া আর পুত্রের মুখের উপর

বলা যায় না। সত্যহরি কিন্তু এই স্পষ্টবাদে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কি এতো কাজ তোমার শুনি ?—যে রাতদিন তাই তুমি আমাকে শোনাতে আস ?

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—দায়ে পড়ে আসি বাবা বাটনা বেটে না দিলে রান্না হবে না যে।

সত্যহরি বলিল, ওঃ ভারি রান্না চুলোয় যাকগে—আমি খাবোনা কিছু।

যোগমায়া কঠিন স্বরে বলিলেন—তুমি না খেলেই সংসারে রান্না করা বন্ধ থাকবেনা। কাজ কর্ম্ম বা রান্না যে শুধু তোমার জন্যেই হয় তা মনে করবার তো কোন কারণ নাই। সংসারে অন্য লোকও আছে সেটা স্মরণ রেখ।

সত্যহরি খিঁচাইয়া কহিল সংসারে অন্য লোক আছে ? যদি তো তাদের কাজ কর্ম্ম তারা করে নিক। এখানে এসে গণ্ডগোল করছ কিসের জন্যে শুনি ?

রাগে যোগমায়ার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি যেন জ্বলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া, শান্ত অথচ কঠোর কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন—ঝি রাখা হয়েছে সংসারের কাজের জন্যে তোমার ধর্ম্মোপদেশ শোনাবার জন্যে তো নয় সতু।

সত্যহরি একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ছিঃ তোমাদের এতো ছোট মন ? তোমাদের বাড়ী একজন চাকরি করতে এসেছে বলে তার ধর্ম্মকথা শোন্‌বার অধিকার নেই ? ঝি বলে এত অবজ্ঞা গরীবকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করোনা বুঝি ? তুমি মনিব সে ঝি তুমি বড়—সে ছোট—এই অহঙ্কার মনকে কত যে ছোট কর তা'কি জান ? এটা মনে রেখ —এ জগতে সবাই সমান ভগবানের রাজত্বে কেউ ছোট বড় নেই। ঝি চাকর বলে কেউ তোমার দোরে মাথাটা বিক্রী করে আসেনি।

যোগমায়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুত্রের মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—এতে ছোট বড়—গরীব বড় লোকের কথাটা কি হ'ল সে এসেছে পরের বাড়ী চাকরি করতে—তা কাজ করবে না ?

সত্যহরি বলিল কাজ করতে এসেছে বলে কি সে একটু বলতে পাবে না ? দুটো ধর্ম্মকথা জ্ঞানের কথা শুনতে নেই ? মাইনে দাও বলে তার মাথাটা কিনে নিয়েছ নাকি ?

যোগমায়ার মুখে আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন—না,—আমি কা'রো মাথা কিনে নিইনি বাবা, কেবল নিজের মাথাটাই তোমাদের পায়ে বিকিয়ে রেখেছি। বলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভগবানের উপর বিন্দুমাত্রও যদি বিশ্বাস থাকে তো এটুকু জেনে রেখ সতু যে—নাস্তিকও তাঁর ক্ষমা পেতে পারে কিন্তু ভণ্ড কখনো পায়না।

সত্যহরি রাগে ফুলিতে লাগিল। যোগমায়া সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

৬

ঘণ্টা দুই তিন পরে সত্যহরি খাইতে বসিলে যোগমায়া একটু তফাতে বসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—আমি পরশু রাত্রের ট্রেনে কাশী যাচ্ছি।

সত্যহরি আজ রাগে মুখখানা হাঁড়ি করিয়াই খাইতে বসিয়াছিল, গম্ভীরমুখে শুধু বলিল, বেশ।

যোগমায়া বলিলেন, ছেলেদের যা ব্যবস্থা করতে হয় তুমি কোরো, আমার আর তা করে যাবার সময় হবে না।

সত্যহরি বলিল, ব্যবস্থা যিনি করবার তিনি করবেন। আমি কোনদিন সংসার বা ছেলেদের ভাবনা ভাবিনি তা'বলে কিছু আটকেতো নেই, আমি সেই একজনের উপর নির্ভর করে দিন কাটিয়ে দেই। তিনি যা করবেন তাই হবে।

যোগমায়ার এত দুঃখেও হাসি পাইল। সত্যহরি কখনো কাহারও জন্য ভাবিত না সত্য, এবং তা বলিয়া তাহার কিছু আটকাইয়াও থাকে না, একথা অতি বড় সত্য। কিন্তু আটকাইয়াও না থাকার মূল যে কোথায়, একথা তার চেয়ে বেশী আর কে জানে ? তাই পুত্র যখন নির্ব্বিকার ভাবে ওই উত্তর দিল তখন তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয়টা কোমল হইয়া আসিল,

কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আপন মনকে কঠিন করিলেন। এসংসারে কাহার যে কতটা প্রয়োজন, তাহা তিনি সত্যই আজ পুত্রকে বুঝাইতে চান।

পরদিন দুপুরবেলা সত্য সত্যই কাশী যাইবার আয়োজনে যোগমায়া জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বহুদিনপরে পার্টিসেন দুই বাড়ীর মধ্যেকার দরজা খুলিয়া যোগমায়ার বড়জা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ছোট বৌ, সত্যিই তুই কাশী যাচ্ছিস? যোগমায়া তোরঙ্গ গুছাইতে গুছাইতে গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—হুঁ।

বৃদ্ধা বড়জা পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিলেন, ওমা, এই বয়সেই কাশীবাস করতে যাবি কেন বলতো? যোগমায়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান নিতে কি আর বয়সের বাছ বিচার আছে দিদি? আর বয়েসটাই কি কম হ'ল, ছেলে পুলে উপযুক্ত হয়েছে, তাদের হাতে সংসারের ভার দিয়ে, এবার যদি বিশ্বেশ্বরের চরণে একটু ঠাঁই করে নিতে পারি, তো তার চেয়ে ভাগ্যি আর কি আছে কি বলো?

বড়জা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা বটে তুই যদি কাশীবাস করিস ছোট বৌ, আমাদের সতু কি তা'হলে আর সংসারে থাকবে? ওর ত ওই মতি গতি, রাতদিন পূজো পাঠ আর ঠাকুর দেবতা নিয়েই আছে, কবে বলতে কবে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে, সংসারে আটকে আছে কেবল তোরই জন্যে বইতো নয়। বৌটাও মরে গেল তুই যদি চলে যাস্ তো ওকে আটকাতে আর কে রইল!

যোগমায়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা—সার্থক ছেলে তুই গর্ভে ধরেছিলি ছোটবৌ! কলিযুগে এমন ছেলে আর জন্মায় না দিদি; যেমন ধর্ম্মে মতি, তেমনই দয়ার শরীর, রাতদিন ভগবানের নাম আর পূজোপাঠ নিয়েই আছে। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, সতুর কাছে সবাই সমান। দীন দুঃখী, কানা খোঁড়া সবাইকেই সে আদর করে ডেকে পাশে বসাবে আর ভগবানের নাম শোনাবে। বলে জেঠাইমা, জগতে ছোটবড় বলে কিছু নেই, সবই সেই একজনের বিকাশ মাত্র। তুমি আমি বা এই কাণা খোঁড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই লীলাময়ের লীলার বহিঃপ্রকাশ।

যোগমায়া মুখে কিছু বলিলেন না। কিন্তু মনে মনে বোধ করি, তাঁর সংসারের অদূর ভবিষ্যতের চিত্রখানিই কল্পনা করিতে লাগিলেন। পুত্রকে তিনি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন। সংসারের বার আনা খরচা তার টাকাতেই চলে। তিনি চলিয়া যাইলে সংসারের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা যোগমায়া বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। তথাপি তিনি কেন যে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, একথা আর কেহ না জানিলেও শুধু অন্তর্য্যামী জানিতেন যে পুত্রের এই সর্ব্বজীবে সমদর্শিতার প্রকোপে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রচণ্ড দাপটেই, আজ তিনি সংসার হইতে আস্তানা তুলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।



পাশ্চাত্যে সামরিক শিক্ষা

কুমারী ছায়া দেবী

[কুমারী ছায়া দেবী প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেছেন—তাঁর সামরিক শিক্ষা পাঠেও আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের এদিকে আগ্রহ জাগবে আশা হয়]

কোন একটি জাতিকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে হইলে তাহার নরনারীর দেহের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখিতে হয়। নাগরিকের সুস্থ সবল ও নিরোগ স্বাস্থ্যের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। স্বাস্থ্য সুষমা ও সৌন্দর্য্য প্রচারক। বিনা ব্যায়ামে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যের বিকাশ হয় না। ব্যায়াম শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টতা আনয়ন করে। ব্যায়াম তিন প্রকার লক্ষিত হয়, কুস্তি, সাধারণ ব্যায়াম ও মিলিটারি ব্যায়াম। কুস্তি-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আছে। সাধারণ ব্যায়াম যাহা আমরা প্রত্যহ গৃহে অভ্যাস করি তাহা বর্ত্তমানে অনেকটা পাশ্চাত্য জগত হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছি। ভারতীয় প্রণায়াম পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতের শারীর-চর্য্যার ভিতর অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ। পূর্ব্বে সেই বস্তুর মূল্য ও উপকারিতা হিন্দুনরনারী যথেষ্ট জানিত এবং এখন পর্য্যন্ত যাহারা সঠিকভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণায়ামে যোগ অভ্যাস করেন তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণায়াম পদ্ধতি মূল পদার্থ হইলেও অন্যান্য অনেকগুলি অবশ্যকরণীয় অভ্যাস আছে।

কোন একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্ব অবয়ব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে না। সেইজন্য সর্ব্ব অবয়ব পূর্ণভাবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে বহু প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। পুরুষরা বহুকাল ধরিয়া স্বাস্থ্য বা শরীর চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে নারীজাগরণের দিনে অনেক বালিকা এবং কিশোরীরা পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে ইহা শুভ লক্ষণ। কারণ যাহারা ভবিষ্যতে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার জননী হইবেন তাহাদের মাতৃমূর্ত্তি সুস্থ ও শোভনা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, আশু প্রয়োজন। কোন একটি দুর্ব্বল জাতিকে সবল হইতে হইলে প্রথমে একটি আদর্শ গ্রহণ করিতে হয় নচেৎ কর্ম্মে নিষ্ঠা আসেনা। গ্রীক জাতির সুস্থ ও সবল হইবার একমাত্র কারণ হইল হারকিউলিস্ ও হেলেনা। এই দুটি শুভ্রমূর্ত্তি অবলম্বনে জাতির নর নারীর চিত্ত ললিত কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ পূর্ণ হইল না। গ্রীক জাতি সভ্যতার একতলা পর্য্যন্ত তৈয়ারি করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গৃহ হইল গ্রীকস্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন। এই গৃহ দেখিলেই তাহার সভ্যতার স্তর বুঝিতে পারা যাইবে।

যখন নূতন ভাব ও আশা লইয়া জাতি সাধনা আরম্ভ করিয়াছে তখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে প্রথম হইতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করা। আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চার মূলে মস্ত একটি দোষ বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রক্রিয়া নিত্য অভ্যাস করিয়া যাই কিন্তু আমাদের দেহাভ্যন্তরে কোথায় কোন স্নায়ু বা পেশী অবস্থান করিতেছে সে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ। সেই জন্য প্রথম হইতে আমাদের দেহস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি স্থূল জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। তাহাতে শুভ বই অশুভ হইবে না। এ জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বদিকে সমাজের কল্যাণ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীন দেশের নরনারীকে বালক বালিকাকে কি পদ্ধতিতে চমূ ব্যায়াম (Military Training) শিক্ষা দিতেছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এসব বিষয় পতিত জাতির ভিতর যত গভীর ভাবে আলোচনা হয় ততই শুভকর। ভাব অনুযায়ী দেহের লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। তুমি যেরূপ বিষয় চিন্তা করিবে, সেই প্রকৃতির নরনারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ঘটিবে। তোমার জাতীয় ভাব তোমার সমাজ বিন্যাস, তোমার মানসিক বৃত্তি তদানুযায়ী ফুটাইয়া তুলিবে। যখন দেশমধ্যে, সমাজমধ্যে রাজনীতির ব্যথা জাগিয়া উঠে তখন নরনারীর মানসাকাশে সুস্থ ও সবল হইবার বাসনা জাগে। কোন একটি জাতিকে, তাহার কৃষ্টিকে রক্ষিত করিতে হইলে দেশমধ্যে ক্ষাত্র শক্তির প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। বিনা ক্ষাত্রশক্তিতে জগতের কোন দেশ সুখ সম্পদে বসবাস করিতে পারে না। কৃষ্টির মহিমা ক্ষাত্র শক্তির তেজে মূল্যবান হয়। বিগত যুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাষ্ট্র জীবাৎসারবৃত্তি লইয়া বসবাস করিতেছে। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারণ প্রত্যেক জাতির স্বভাবধর্ম্ম। এই দুইটি বৃত্তির, ধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে ক্ষাত্রভাব বা ক্ষাত্রধর্ম্ম একান্ত প্রয়োজন। ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে বিপুল চমূসম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে লীগ অফ নেশনের মতে কোন রাষ্ট্রই বিপুল সেনানী রক্ষা করিতে পারিবে না অথচ প্রত্যেক দেশের বিপুল চমূসম্প্রদায় প্রয়োজন কারণ সকলেই ভাবী সমর লইয়া শঙ্কিত ও ব্যস্ত। সকল রাষ্ট্রবিদেরা জানেন যে জাতিকে বলবান করিয়া রাখিতে হইলে যুবকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কারণ তাহারাই হইল জাতির প্রাণ। এই শক্তিকে রাষ্ট্রের কাজে লাগাইবার জন্য তাহারা সতত চেষ্টিত থাকেন। এই যুবশক্তির অপচয় দেশের মহা অকল্যাণকর।

চমূ-শিক্ষা পদ্ধতি দেশের পরম উপকারী বস্তু। এ শিক্ষাতে সকলেই কর্ম্মঠ ও আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে। এই আজ্ঞাধীনত্ব শিক্ষাই হইল দেশের মস্ত গৌরব, পরম উপকারক। স্কুল কলেজে এ বিদ্যা অর্জ্জন হয় না। এই আজ্ঞাধীনত্বই জাতীয় সর্ব্বকর্ম্মে একটা ছন্দ আনাইয়া দেয়, রূপ ফুটাইয়া তুলে, সৌম্যমূর্ত্তির বিকাশ করে। সেই জন্য স্বাধীনদেশ মাত্রেই চমূশিক্ষাপদ্ধতির পক্ষপাতী। ভারসেলিসের সন্ধিতে স্থির হয় যে জার্ম্মাণী তাহার যুবকদিগকে চমূশিক্ষা দিতে পারিবে না। কেবলমাত্র জর্ম্মাণীকে বলা হইয়াছিল, "Educational establishments, the universities, societies of discharged soldiers and generally speaking, asscoiations of every description, whatever be the age of their members, must not occupy themselves with any military matters." প্রথম প্রথম জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রবিদ্‌রা এ চুক্তি প্রতিপালন করিয়াছিল। কিন্তু নাজী সম্প্রদায় ইহাতে মুগ্ধ না লইয়া নিজ মনোমত অস্ত্রবিহীন বিপুল চমূশিক্ষা প্রচলন করিল। আজ সেই নিভৃত নাজীচমূসম্প্রদায়ই জার্ম্মাণ জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে বালকদিগকে কেমন করিয়া চমূশিক্ষা পদ্ধতিতে গঠন করা হইতেছে তাহা একটি শিক্ষা করিবার বিষয়, বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সনে সোস্যালিষ্ট Jean Jaures বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক ফরাসী দশ বৎসরের বালককে চমূশিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। শুধু চমূ শিক্ষালাভ করা নয় তাহাদের চমূশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তাহার যথেষ্ট হেতুও ছিল। তখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছিল যে শীঘ্রই একটি প্রলয় নাচন নাচিয়া উঠিবে। জার্ম্মানীই ছিল ফরাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভীষিকা। বর্ত্তমানে ফরাসী দেশে বালকদিগকে চমূবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান war office হইতে পরিচালিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হইতেছে চমূ অফিসর। শিক্ষামন্ত্রী বালকদিগের স্বাস্থ্য ও ভর্ত্তি করান সম্বন্ধে দেখাশুনা করেন। ১৬ বৎসর বয়সের সময় বালকদিগকে পদাতিক সৈন্যের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ও মেসিন কামান চালান শিক্ষা পায়। ১৭ বৎসর বয়সের সময় সৈন্যদিগের যাবতীয় বিদ্যা অর্জ্জন করে। অবশ্য যে, যে শ্রেণীতে থাকিবে। এই পদ্ধতিতে ফরাসী সমস্ত বালকেরা অল্প কয় বৎসরের ভিতর চমূবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। একণে প্রত্যেক নাগরিকই নিষ্ক্রিয় সৈনিক।

পোলাণ্ড ও জেকোস্লেভেকিয়া ফরাসীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের স্কুলের নিয়ম পদ্ধতি এমনভাবে তৈয়ারি করিয়াছে যে প্রত্যেক ছেলেটী বিশিষ্ট সৈনিক হইয়া উঠিতেছে। এই সব স্কুলেও অফিসার দ্বারা চমূশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন হইতেছে। Shooting এর উপর ইহারা খুব ঝোঁক দিয়াছে কারণ ইহাতে

সুদক্ষ হইতে হইলে যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য এইসব স্কুলে বাল্যকাল হইতে এই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করাইয়া দিতেছে। স্কুলের দীর্ঘদিন ছুটির সময় সমস্ত মিলিটারী ড্রিলগ্রাউণ্ডে বালকদিগের তাঁবু পড়ে। তথায় তাঁহারা বড় বড় চমূঅফিসারের নিকট হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানাবিষয় শিক্ষালাভ করে যথা:- অস্ত্রবিদ্যা, বোম্‌নিক্ষেপবিদ্যা, বুদ্ধিসম্পন্ন কার্য্য, পাওনিয়র কার্য্য, anti aircraft and anti gas work. ইহা ব্যতীত চমূব্যায়াম নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে।

ইটালিতে বালকদিগকে চমূবিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার সম্পূর্ণ ফ্যাসিষ্টদের উপর ন্যস্ত। ৮বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালককে বিশেষভাবে ব্যায়াম পারদর্শিতালাভ করিতে হইবে। ১০বৎসর বয়সের সময় তাহাদের ফ্যাসিষ্ট চমূবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইবে। গত বৎসর সুইজারল্যাণ্ডে ১৩বৎসরের ২৭১১টি বালক Juveniles rifle সভাতে উপস্থিত হয়েছিল। Divisional Colonel Wille পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। একটি ১৩বৎসরের বালক প্রথম প্রাইজ পাইয়াছিল। সে যে অস্ত্রটী ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নূতন ক্যাডেটস্ রাইফেল নং ৯১ এই প্রণালীতে ইটালীর সমস্ত যুববৃন্দ চমূশিক্ষাতে পারদর্শী হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতির আত্মরক্ষার্থ সমস্ত বিষয় বস্তুর আয়োজন চলিয়াছে। বর্ত্তমান ইটালীর মনোবৃত্তি হইতেছে একশ বৎসর দীনভাবে বাস করার চাইতে একদিন রাজার মতো বাস করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

সমস্ত Anglo Saxon জাতি গুলিও চমূবিদ্যা দেশ মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতেছে। আমেরিকার ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চমূ-কাওয়াজ (Drill) বাধ্যতামূলক। যে সমস্ত ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় term এ অধ্যয়ন করে তাহাদের ইহা (Military drill) অবশ্য করণীয়। অন্যান্য ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা অবশ্য বাধ্যতামূলক নহে কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ছাত্রদিগকে নানাতেজঃপূর্ণ খেলা অভ্যাস করিতে হইবে। শুধু খেলিলে চলিবে না, নানাপ্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হয় এবং ইহার জন্য পরীক্ষা ও প্রদান করে। ক্লাশে উঠিবার সময় এই নম্বর গণনা করা হয়। ছাত্রদের পোষাক দেখিলে আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মেসিন কামান, light and heavy artillery, aeroplanes and Squadron ছাত্ররা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পোলো ও টেনিস্ ও তাহাদের সাথে থাকে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই সামরিক পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে। সমর বিভাগের অফিসর আসিয়া ছাত্রদিগকে অস্ত্র ও কলা কৌশল পরিপূর্ণভাবে বিশদরূপে শিক্ষাদান করে। তা ছাড়া কতকগুলি উচ্চবিদ্যালয় আছে যথায় যুদ্ধের সময়ের ন্যায় আজও বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা ছাত্রদিগকে দান করা হয়। যাহারা নাগরিক ব্যবসাতে যুক্ত আছেন তাহাদের তথায়ও সমর তাঁবু আছে যথায় সকলকে চমূবিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে হয়। আমেরিকান ব্যবসায়ের মালিকগণ এই সমরবিদ্যা শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে ছুটি প্রদান করে, উৎসাহ দেয়। আমেরিকার যদিও ভয়ের কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই তথাপি সেও সমস্ত জাতিকে সমর বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। এত সাবধানী জাতি। প্রেসিডেন্ট, মিঃ হুভার পুত্রের পিতাদিগকে বলিয়াছিলেন "Years exqerience had so justified this preparatory military training of youth as to make a special item in the government programme." পূর্ব্বে বলিয়াছি যুদ্ধ বাসনা এখন নিবৃত্তি হয় নাই শুধু বিরাম লইতেছে মাত্র।

বোধ হয় জাপান এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী। দ্রুত গতিতে সে সমস্ত জাতিটিকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। জাপানের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সমর পোষাক পরিধান করিতে হইবে এবং সপ্তাহে দুই বার করিয়া রাইফেল ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিতে হয়। এইসব শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। জাপানী শক্তির আজ প্রাধান্য সকলে স্বীকার করিতেছে। ক্ষাত্রশক্তির এত মহিমা! সোভিয়েট রাশিয়াতেও এ বিষয় যথেষ্ট অনুশীলন হইতেছে। তথায় প্রত্যেক নাগরিক shooting অভ্যাস করিতেছে। এমনভাবে শিক্ষিত হইতেছে যে প্রয়োজন হইলেই প্রত্যেকেই

শিক্ষিত সৈনিকরূপে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান তুর্কী এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নাই কারণ সেও স্বাধীন জাতি। চীন ও ভারতবর্ষ এ বিষয় উন্নতিশীল নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এইরূপ জাতি গঠনের তাৎপর্য্য কি, প্রয়োজন কি? সমস্ত জাতির বর্ত্তমান মনঃস্তত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রত্যেক শিক্ষিত স্বাধীন জাতি যুবকদিগকে চমূবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। ইহার সফলতার জন্য প্রত্যেক ষ্টেট যথেষ্ট সাহায্য বা অর্থব্যয় করিতেছে। যে প্রকৃতিরই ষ্টেট্ হউক্ না কেন নিজের আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেকেই সজাগ ও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগামী যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে চঞ্চল ও অস্থির করিয়াছে। পরস্পরের মানসিক অনৈক্য সংসার জীবনের সুখ-শান্তিকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। যেমন একদিকে লিগ অফ নেশন শান্তি প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্র চমূবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে। সৈনিক সৃষ্টি বা গঠন করিলেই অস্ত্র দ্রব্যাদীর যথেষ্ট প্রয়োজন হইবে সেইজন্যে বর্ত্তমানে অস্ত্র ব্যবসায়িদিগের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা হইতেছে। যুদ্ধের সময় যে পদ্ধতিতে সৈনিক সংগ্রহ হইত বর্ত্তমানে যুব-সৈনিক গঠনেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন চলিয়াছে। গত যুদ্ধের সময় যে সব দোষ লক্ষিত হইয়াছিল এক্ষনে পূর্ব্ব হইতে সেই সব দোষ ত্রুটি সংশোধন হইতেছে; দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন ফরাসী কর্ণেল বলিয়াছিলেন, 'There is a palpable difference between the results obtained by an unrestricted training and those of secret instruction.' এই সুচিন্তিত মন্তব্যটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছে এবং অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী কোন গুপ্তভাব গ্রহণ করে নাই সে স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজি নিজ আত্মরক্ষার্থ নানা পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমস্ত যুবক সম্প্রদায়ের মনটাকে ইস্পাতের ন্যায় গঠন করিতেছে। কোনরূপ কোমলভাব, যাহা জাতির উন্নতির পরিপন্থী, দেশমধ্যে প্রচার করিতে দিতে রাজি নহে।

বর্ত্তমান ভারতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তেজীয়ান বীর্য্যবান জাতি গঠনের প্রয়াসী ছিলেন সেইজন্য তাঁহার ভাবরাশিও দীপ্তিকর। যে সকল ভাব নরনারীর দেহ ও মনকে শ্লথ করিয়া দেয়, মৃদু করিয়া দেয়, অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয় তিনি মোটেই তাহা পছন্দ করিতেন না। যে প্রকৃতিরই ব্যায়াম হউক না কেন চমূশিক্ষাপদ্ধতি ব্যায়ামের নিকট মূল্যহীন। একমাত্র চমূবিদ্যাই জাতীয় দুর্দ্দিনে মূল্যবান হইয়া উঠে। একথা এত স্পষ্ট এ ভাব এত প্রখর, এত দীপ্তিশালী যে ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান ইউরোপের মনোবৃত্তি দেখিয়া একটি ঘটনা মনে পড়িল। এক ভদ্রলোক একটি অন্ধকার ঘরে বাস করিত। রাত্রে আলো জ্বালিবার সময় প্রায়ই দেশলাই হারায় পায়না। তখন সে একটি সুচিন্তিত মতলব করিল, যাহাতে দেশলায়ের অভাববোধ আর না হয়। এই না ভেবে সে একটি বড় কোট তৈরি করাইল এবং সেই কোটের বা জামার চতুর্দ্দিকে একটি করে পকেট তৈরি করাইল অর্থাৎ জামাটির ভিতর বহু পকেট হইল। তখন সে প্রত্যেক পকেটে একটি করিয়া দেশলাই রাখিল। ভারি আনন্দ, আর দেশলায়ের অভাব হবে না আলো জ্বলিবেই। এখন একদিন ভদ্রলোক জামাটি পরে আছে এমন সময় হঠাৎ একটি দেশলাই জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তগুলিও আগুনে জ্বলে উঠল। তখন ভদ্রলোকটি বহু আলোক না সহ্য কর্ত্তে পেরে ছাই হয়ে গেল। ইউরোপেরও না এই অবস্থা শেষে হয়।

জগন্নাথের দান

গল্প

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী

['জগন্নাথের দান' শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর দ্বিতীয় গল্প। নারী ও পুরুষের ভালবাসা অনেক সময় জাতি ও ধর্ম্মের বন্ধন মানিতে চায় না—জগন্নাথধামে জাতি ধর্ম্মের ভেদাভেদ নাই—সেইখানেই তেমন একটি গল্পের সূচনা হইয়া কি ভাবে মধুরেন সমাপয়েৎ হইল পাঠক-পাঠিকারা তাহা দেখিবেন।]

১

"নিন, উঠুন, বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আর শুয়ে থাকে না। এই দুধ টুকু খেয়ে ফেলুন।

সুধীর হাসির ভঙ্গীতে বলিল, না তোমার অত্যাচারে আর সহ্য করা যায় না।

সুধীরের কথা শেষ না হইতেই মাধুরী বলিল, বেশী দিন আর সইতে হবে না।

সুধীর বিস্মিত দৃষ্টি মাধুরীর মুখের উপর তুলিয়া বলিল, তার মানে?

মানে অতি সোজা।

সোজার মাপ কাঠিটা তো সবার কাছেই এক নয়, সুতরাং তোমার সোজাটা আমার কাছে বড়ই জটিল বলে বোধ হচ্ছে।

মাধুরী ঠোঁটের কোণে ঈষৎ একটু হাসির রেখা টেনে এনে বলিল—তা হ'বে আমার মাপ কাঠিটা ভেঙ্গেই বলছি, মানে আমি দু এক দিনের মধ্যেই কোলকাতা চলে যাচ্ছি।

সুধীর পূর্ব্ববৎ বলিল—হঠাৎ এ খেয়ালের মানে?

হঠাৎ কি?

একটু অপ্রতিভের মত হইয়া সুধীর বলিল, না এই এত শীগগির চ'লে যাবে,—

সুধীরের কথা শেষ না হইতেই মাধুরী বলিল, শীগগিরের মাপকাঠিটাও ত সবার কাছে এক নয়, দেড় মাস আপনার কাছে শীগগির হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেছে, এতদিন কবেই যেতুম, কেবল আপনাকে অসুস্থ ফেলে গেলে মানুষের ন্যায় ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হ'বো কারণ আপনি আমার প্রাণ রক্ষে কোরেছেন অতএব যত বাধাই থাক আপনি ভাল না হ'লে এখান থেকে আমি কোন মতেই যেতে পারি না।

তা সে কারণ তো এখনও আছে, আমি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি নি।

মাধুরী একটু অধীর কণ্ঠে বলিল, না না আর আমাকে নানা ছুতোয় আটকে রেখে অপমানের মাত্রা বাড়াবেন না। ব'লে দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

মাধুরীর কথার ভঙ্গীতে সুধীরের গায়ে যেন বিষের ছুরী বসাইয়া দিল, সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিয়া বলিল, তোমাকে অপমান করবার জন্যই এতদিন নানা ছুতো করে এখানে আটকে রেখেছি, বলিয়া মাধুরীর মুখের উপর হইতে শান্ত কঠোর দৃষ্টি নত করিল একটু স্থির থাকিয়া বলিল, হাঁ একথা বলা তোমার ঠিকই হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে কলিকাল, এখানে কৃতজ্ঞতা ব'লে যে কিছু আছে তা ভুলেই গিয়েছিলুম।

এ শ্লেষ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে মাধুরীর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিল, দেখুন আমাকে আপনারা আর যাই বলুন, এবং আমাকে জুতা মোজা পরা ধেরে মেয়ে ব'সে যতই দোষারোপ করুন আমি যত বড় বজ্জাতিই জানি না কেন, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞা নই। এরি মধ্যেই আপনার দয়া উপকার ভুলে যাওয়াতো দূরে থাক চির জীবনেও ভুলবো কিনা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন, কিন্তু ভুলতে পারলেই বুঝি ভাল হ'তো, এ দারুণ অপমান বুঝি তা হ'লে হ'তে হতো না। কেন, আমি আপনাদের কি ক'রেছি? বলিয়া মাধুরী তাহার উদ্গত অশ্রু সামলাইতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মাধুরীর আজের এই কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটা আশংকায় মনটা তার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

২

কলহ করিয়া মাধুরীর মনটা ভাল ছিল না। সুধীর তাহাকে অকৃতজ্ঞা ভাবিলেও তাহার কথার পাল্টা জবাব দেওয়াটা যে তাহার উচিত হয়নি, এই অনুতাপে তাহাকে সমস্ত রাত্রি ক্লেশ দিয়াছে। তাই সকালে উঠিয়াই সে সুধীরের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিতেছিল কিন্তু দারুণ লজ্জা এবং দুঃসহ অপমানের ভারে তাহার পা যেন উঠিতেছিল না। এইরূপ কিছুক্ষণ ভাবা চিন্তার পর মাধুরী স্থির করিল, যাক্ যত বড় অকৃতজ্ঞাই কেন উনি ভাবুন না, যত বড় অধর্ম্মই কেন হ'ক না, তথাপি এখানে আর একদিনও অবস্থান করা ঠিক নয়। অতএব এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা পরিসমাপ্তি আজ সে করিবেই। উঃ, সে চিঠির প্রতি অক্ষরগুলি যেন তাহাকে সহস্র অপমানের বিষে দংশন করিতেছে।

সুধীরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাহিতেই সুধীর বলিল, ক্ষমা তোমাকে চাইতে হবেনা মাধুরী, আমি যে নিজের অসুস্থতার জন্য তোমাকে এখানে আটকে রেখেছি, এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো।

আপনি ক্ষমা চাইছেন? আপনাকে আপনার পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন যাতে সম্পূর্ণ ক্ষমা ক'রতে পারেন সেই জন্য আপনার সমস্ত ঋণ, সমস্ত সম্বন্ধ চিরদিনের মত নিঃশেষে ছিন্ন ক'রে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি শিশু বেলা পিতৃহীনা। মাতার কাছেই আমার সমস্ত শিক্ষা, পিতার অভাব হ'লে মা আমার সংসারের অভাবের কথা কাউকে না বলে নিজে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী করে প্রাইভেট পরিয়ে সংসার চালাতেন এবং আমাকেও পড়াতেন, পেটের জ্বালায় অধর্ম্মের পথে না গিয়ে দুঃখিনী মা আমার সংকাজে সৎভাবে জীবন যাপন ক'রতেন। তাইতে কি লোকে খৃষ্টান হ'য়ে যায়? এই অতিরিক্ত খাটুনির জন্যই মার আমার অকালে মৃত্যু হয়েছে। যাক নিজেদের সাফাই আর গাইতে চাইনে। আমার এভাবে চ'লে যাওয়াতে আপনি দুঃখ ক'রবেন না। আমি ক'লকাতা গিয়ে বেশ একলা থাকতে পারব। আপনার উপকার ভুলব না। শ্মশানে সেই দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে সেদিন যদি আপনি রক্ষা না ক'রতেন তবে কি যে হ'তো তা জগবন্ধুই জানেন। মাকে নিয়ে এভাবে একলা পুরীতে আসা ঠিক হয়নি ব'লছেন, কিন্তু না এসেই বা কি করি? মা কোন মতেই আসবেন না, তিনি যেন আত্মহত্যা ক'রতে চাইছেন। আমি মেয়ে হ'য়ে কি করে তা চোখে দেখি বলুন। তাই মার কোন কথা না শুনে গরমের ছুটীতে জোর করে মাকে নিয়ে এলুম। তখন একথা ভাববার অবসর পাইনি যে মার ভাল মন্দ হ'লে এই বিদেশে কে আমাকে সাহায্য ক'রবে। জগবন্ধুর দয়াতেই আপনি আমার সেই দুঃসময় শ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন, আপনার কাছে আমি চিরঋণী কিন্তু কোন দিন কোন বিপদেই যেন আর আপনাকে মনে না করি। এমনি শক্তি যাতে পাই আজ যাবার দিনে আপনি আমাকে সেই অশীর্ব্বাদই করে দিন। বলিয়া কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

এখানে সুধীরের একটু পরিচয় দিতেছি।

সে জমীদারের ছেলে, নিজে সরকারী ডাক্তার, এক বৎসর হয় পুরীধামে বদলী হইয়া আসিয়াছে। এখানে তাহার বাড়ীতে লোক জন আছে, আর রথ উপলক্ষে তাহার পিতার এক বৃদ্ধা মাসিমা আসিয়াছেন; এবং সুধীরের অনুরোধে এখানেই আছেন।

মাস দেড়েক পূর্ব্বে এক সন্ধ্যায় সুধীর সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে স্বর্গ দ্বারের কাছে গিয়া পৌঁছাতেই আষাঢ়ের ঘন ঘটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুধীর বাড়ীতে ফিরিবে এমন সময় শ্মশানের দিকে একটা কলরব শুনিয়া একটু অগ্রসর হইতেই তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতীকে ঘিরে পাঁচ ছয় জন পাণ্ডা বিবাদ বাধাইয়াছে। সুধীর দ্রুত পদে নিকটে গিয়া সদ্য মাতৃহারা যুবতীর ক্রন্দন জড়িত কথার অর্থে বুঝিল এ বিবাদ যুবতীকে লইয়া। সুন্দরীর মাতার মৃত্যু হইলে দাহ কার্য্যের জন্য এই লোকগুলিকে ডাকা হয়। ইহারা যখন জানিল যুবতীর এখানে কোন আত্মীয় স্বজন নাই

তখন যুবতীকে নিয়ে কার বাড়ীতে রাখিবে এবং অধিকার কার বেশী ইত্যাদি নিয়ে তর্ক বিবাদ বাধাইয়াছে।

দুর্বৃত্তদের চেহারা দেখিয়াই তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে সুধীরের বিলম্ব হইল না। সে হঠাৎ উপস্থিত বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া বলিল, তোমরা কি জন্য বিবাদ করিতেছে, এ মেয়েটী আমার আত্মীয়, এর বিপদের সংবাদ পেয়েই আমি এসেছি বলিয়া তাহাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া যুবতীকে বলিল, আপনি ভদ্র লোকের মেয়ে আমিও ভদ্র লোকের ছেলে। অতএব আমাকে অকপটে বিশ্বাস ক'রতে পারেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন; বাড়ীতে আমার এক বৃদ্ধ ঠাকুমা আছেন আপাতত তার কাছে গিয়ে থাকবেন।

যুবতীও অকুলে কূল পাওয়ায় কোন আপত্তি না তুলিয়া সুধীরের সহিত তাহার বাড়ীতে আসিল।

সেই রাত্রেই যুবতীর প্রবল জ্বর হইল প্রায় পনর দিন ভুগিয়া সে সুধীরের সুচিকিৎসায় প্রাণ পাইল, এবং এই দীর্ঘ দিনের অসুস্থতাই দূরের সুধীরকে তার নিকটে আনিয়া দিল; এবং আপনার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া কখন যে সে সুধীরের কাছে তুমিতে পরিণত হইল ইহার খোঁজ সুধীর কিংবা মাধুরী কেহই রাখিল না। মাধুরী সুস্থ হইতে না হইতেই এক সন্ধ্যায় রোগী দেখিয়া আসিয়া সুধীরও প্রবল জ্বরে পড়িল এবং অবস্থা একটু খারাপের দিকেই যাইতে বসিয়াছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং মাধুরীর প্রাণপণ শুশ্রূষাতেই সুধীর এযাত্রা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এখনও তাহার শরীর সম্পূর্ণ সবল হয়নি।

সুধীর এখনও অবিবাহিত। পিতামাতার সহস্র অনুরোধেও সে বিবাহে স্বীকৃত হয়নি। সম্প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে সুধীরের সহস্র আপত্তি উপেক্ষা করিয়া এক জমিদারের কন্যার সহিত পিতা তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। এখন বিবাহে অস্বীকৃত হইলে পিতা অপমানিত হইবেন ভাবিয়া সুধীর অগত্যা পিতাকে জানাইয়াছে কিছুদিন সবুর করুন নূতন কাজে আসিয়াছি এখনি ছুটী পাইব না। অতএব কিছুদিন পরেও বিবাহ হইতে পারে। পিতা সেই কথা শুনিয়া অপাততঃ নিরস্ত আছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সুধীরের অসুখের সময় তাহার পিতা দেখাশুনা করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে সুধীরের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে ফিরে গিয়ে মাধুরীর কথা নানারূপে পল্লবিত করিয়া সুধীরের আত্মীয় স্বজনের নিকট বলিয়াছে এবং মেয়েটীর ঐকান্তিক সেবা যত্ন দেখিয়া সে যে সুধীরকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছে এবং সুধীরও যে ঐ মেয়ে বই কর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট মেয়ে বিবাহ করিবে না। এবিষয়েও তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন অতবড় মেয়ে বিবাহ হয়নি চাল চলন মেম সাহেবের মত অতএব ভাল ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় না; বিশেষ করে একলা মাকে নিয়ে হাওয়া খেতে আসা, অপরিচিত পুরুষের কাছে থেকে এরূপ ঐকান্তিক সেবা করা এসব কি ভাল ঘরের মেয়ের কাজ? এইসব শুনিয়া সুধীরের বড় ভ্রাতৃবধু মাধুরীর নাম করিয়া সুধীরকে অনেক সতর্ক ক'রে এক চিঠি দিয়াছেন। তাহাতে একথাও লেখা ছিল মাধুরী সম্বন্ধে সরকার মহাশয় যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম জুতা মোজা পরা অত বড় ধেরে মেয়ে কখনই হিন্দু ঘরের নয়। ওরা খৃষ্টান ওরা অনেক ছলা কলা বজ্জাতি জানে ওদের অসাধ্য কাজ নেই। তুমি ওর কুহকে ভুলে তোমার মাননীয় পিতাকে অপরের কাছে অপমানিত ক'রো না। পিতার নির্দ্দিষ্ট কন্যা বিবাহ ক'রে জীবনে সুখী হবে ইত্যাদি।

চিঠিখানা সুধীরের অসতর্কতায় উপাধানের নিম্নে ছিল। মাধুরী একদিন বিছানাটা ঝাড়িয়া দিতে যাইয়া খোলা চিঠিতে অপরিচিত অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া পড়িবার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। কে জানিত ঐ পত্রে তাহারই উদ্দেশ্যে বিষবাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

সুধীর একটু সুস্থ হইতেই মাধুরী কলিকাতা যাইবে স্থির করিল। সুধীরও বুঝিল তাহার অসতর্কতার জন্যই এ সর্ব্বনাশ ঘটিল।

মাধুরীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া সুধীর শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বুকের ভিতরটা অসহ্য ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল; অথচ এ ব্যথা যে কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিদায়ের পালাটা যে একদিন শেষ

কর্‌তেই হবে সেতো তাহার নিশ্চিত রূপেই জানা ছিল। তবু সমস্ত রাত্রি সে ভাল রূপে ঘুমাইতে পারে নাই।

অভ্যাস মত প্রত্যুষেই সুধীরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু গত রাত্রিতে সে ভাল রূপ ঘুমাইতে পারে নাই। দুঃস্বপ্ন দৈত্য দানবের দল সমস্ত রাত্রিব্যাপী ক্রোধে দুঃখে সমাচ্ছন্ন তাহার অসার দেহটাকে লইয়া তীব্র অস্ত্র যোগে কাটা-ছেঁড়া ক'রে গভীর ক্ষত করে দিয়ে গেছে, তাহারই যন্ত্রণায় এখনও তাহার সমস্ত শরীর বিষিয়ে আছে, এবং এ ব্যথার কিঞ্চিৎ উপশম না হইলে সে যে শয্যা হইতে উঠিতে পারিবে না ইহা উঠিবার চেষ্টা না করা সত্বেও সে অনুভব করিতে পারিল।

এই ব্যথার চিন্তা যখন ক্রমশঃ জটিল ও বিস্তির্ণ হইয়া পড়িতেছিল, সহসা—এতবেলা হোল এখনও উঠলিনি, চা টাইবা কখন খাবি? শরীর খারাপ হয়নি ত? ইত্যাদি এতগুলি শব্দ ঠাকুমার কণ্ঠস্বর তাহার মাথার কাছের জানালাটার নিকট আসিয়া থামিতেই মুহূর্ত্তে চিন্তার জটিল সূত্র প্রাণপণে ছিন্ন করে উপাধান হইতে মাথা তুলে জানালার দিকে চাহিল।

গৃহিণী মধ্যাহ্ণের দিবা নিদ্রায় আছেন মনে ক'রে দুষ্ট বালক চুপি চুপি ভাঁড়ার হইতে আমের আচার কুলের আচার চুরি কর্‌তে গিয়া অতর্কিতে ধরা পড়লে অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে আপনার নির্দ্দোষিত প্রমাণের ছাপাই স্বরূপ থতমত খেয়ে যেমন বলে যে তার বিড়াল ছানাটার খোঁজে এসেছে সুধীরও তেমনি থতমত খেয়ে অপরাধীর সুরে বলিল—না ঠাকুমা কোন অসুখ করে নি, এই উঠছি। বলিয়া দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল বেলা তখন আটটা। সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল একটা দুঃসহ বিরাট শূন্যতা অনুভব করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিল না দুঃখ কষ্ট আমার যতই হ'ক যাহাকে গৃহলক্ষ্মী করে ঘরে আনিতে ও নিজের অঙ্ক লক্ষ্মী-রূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি তাহাকে সকলের চোখে শ্রদ্ধনীয় করিয়া সসম্মানে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্টা করিব। না পারি চিরজীবন তাহার স্মৃতি নিয়ে থাক্‌বো তবু অসম্মানের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহাকে অপমান করিবার চেষ্টা আর যেই পারুক সে পারিবেনা।

৪

আজ কদিন থেকেই সুধীরের শরীরটা তেমন ভাল নাই। দোতলার বারান্দায় একখানি চেয়ারের উপর দেহভার বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধ শায়িত ভাবে সমুদ্রের সান্ধ্য শোভা দেখিতেছিল। শরীর তার কৃশ মলিন কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটীতে যেন কিসের মাধুরী মাখান ছিল। একদৃষ্টে দেখিতেছিল, সম্মুখে উচ্ছল নীলাম্বুধি, দূরে—অতিদূরে সীমা হারিয়ে আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিশে গেছে। তখন অস্ত তপন সেই পথে সাগরের বক্ষে নেমে যাচ্ছিল, সায়াহ্নের সেই অবসন্ন সূর্য্যের চুম্বন রাগ রঞ্জিত উর্ম্মিমালা মহোল্লাসে নেচেনেচে ফিরছিল। তাদের চঞ্চল চরণ ভঙ্গের প্রতি রেখায় লক্ষ লক্ষ কমল ফুটে উঠছিল। ছন্দেছন্দে বেজে উঠছিল এক ভাষাহীন উদাত্ত সঙ্গীত। ক্লান্ত সূর্য্য তখন স্নিগ্ধ নীলিমার মাঝে বিলীন হইয়া গিয়াছে। শুধু সাগর যৌবন উন্নত বক্ষের উপর তাহার ক্ষীণ কনকাভা উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

কত নরনারী দলে দলে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে ছিল সুধীর চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল কিছু দিন পূর্ব্বে এমনি এক সন্ধ্যায় যাহাকে সে অতর্কিত ভাবে পেয়েছিল কে জানিত সেই চির চঞ্চল কটাক্ষ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া চিরদিনের মত তাহার বুকের ভিতর তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া এমন করিয়া চলিয়া যাইবে। এমন সময় ঠাকুমা আসিয়া বলিলেন হাঁরে সুধীর দিনকের দিন তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস, বামুনের রান্না খেতে পারিসনি বলে খেতে দিলিনি; আমাকে এত করে রেঁধে মরি অথচ তুই কোন কিছুতেই মুখ দিস্‌নে; আমি ভাই ভাল বুঝিনি তোর বাপ মাকে লিখি কিছু দিনের ছুটী নিয়ে বাড়ী চল।

কেন ভয় কর্‌ছো ঠাকু'মা আমি এখানেই ভাল হবো। আমার তেমন কিছু হয়নি, তবে অত বড় অসুখটা থেকে উঠেছি, তাই খেতে পারিনে তা ছুটি নেওয়ার কথা বলছো চেষ্টা কর্‌ব।

বৃদ্ধা আপন মনেই বলিতে লাগিল, সোমত্ত ছেলে,

বিয়ে না হ'লে কি মন ভাল লাগে; কি যে গো ধরেছিস্ জানিনি ভাই। আহা মাধু মেয়েটি বেশ। সে থাকতে তোর মনটাও ভাল ছিল। কি একটু ভেবে তার পর বলিলেন "হাঁরে সুধীর, সেই যে কোন জমিদারের মেয়ের সঙ্গে যোগিন্ তোর বের কথা ঠিক ক'রে রেখেছে তার কি ক'রবি?

কি জানি ঠাকু'মা, তোমার গরীব নাতি কোন বড় লোকের খোঁজ রাখে না।

ওমা সেকি কথা ও বিয়ে যে তোকে কর্ত্তেই হবে।

কর্ত্তেই হবে কেন?

তোর বাবা যে তাঁদের কথা দিয়েছেন।

বাবা দিয়েছেন আমি তো দেই নি?

বলিস কিরে? তোরা কলিকালের ছেলেরা হলি কি? বাপের মান বংশের মান রাখবি নি? তোর কি ধর্ম্মের ভয় নাই? তুই কি বাপকেও ভয় করিস্‌নে?

সুধীর সবিস্ময়ে বলিল, কি সর্ব্বনাশ বাপকে ভয় করিনে! ভয় বলে ভয় করি, দেখ ঠাকুমা কলেজে থাকতে মড়া কাটবার সময় যখন পাঁচ ছ'জনা মিলে মড়াটার হাত পা ধরে কাড়াকাড়ি করে কাটা সুরু করতুম তখন মনে হতো এখনি ওর হাতখানা দিয়ে প্রতিশোধ স্বরূপ দু'ঘা বসিয়ে দেবে। ভেবে ভয়ে বুকের রক্ত ঠাণ্ডা বরফের মত হয়ে যেত, তোমরা মালা জপা ঠাকুমারা তার কি জান। মরা মানুষকেই যখন এত ভয় করি, তখন জল জ্যান্ত বাপকে ভয় করি না বলতে চাও? বলিয়া হাসিয়া ফেলিল

যা তোর সব তাতেই কেবল ঠাট্টা, আমি কিছু বলতে চাইনে। বলিয়া ঠাকুরমা চলিয়া যাইতেই সুধীর একটু হাসির ভঙ্গীতে বলিল, আহা ঠাকুমা চলে যাচ্ছ কেন। তোমরা সবাই যদি রাগ করে চলে যাও তবে আমি বাঁচি কি করে?

না না দাদা, রাগ কিসের? তোর উপর কি রাগ ক'রতে পারি? তবে শরীরটা তোর বড্ড খারাপ হয়েছে তাই—।

সুধীর ঠাকুমার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, তাই ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে বলছো? আচ্ছা তাই হবে।

৫

আচ্ছা ঠাকুমা এখন তবে কি হবে? কি করে সে মাধুরীর সন্ধান পাব? অথচ আপনি যেমন বোলছেন তাতে তো বেশ বুঝতে পারছি তাকে খুঁজে আন্‌তে না পারলে ঠাকুরপোকে বাঁচানো যাবে না। বিকারের ঘোরে কেবলি, "মাধুরী তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি তোমাকে অপমান করতে পারি না। তুমি ও চিঠির কথা ভুলে যাও ইত্যাদি বলেছেন। দেখুন ঠাকুমা ঠাকুর পো যদি না বাঁচে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। আজ আর আমি কোন কথা লুকোব না। সরকার মশাই পুরী থেকে এসে মাধুরী সম্বন্ধে যে সব কুৎসা বাবা মার কাছে বর্ণনা করেছিলেন, তাই শুনে তাদের আদেশ মত আমি মাধুরী সম্বন্ধে ঠাকুরপোকে অনেক অন্যায় কথা ব'লে চিঠি লিখি। আমার বেশ মনে হচ্ছে সেই চিঠিই মাধুরী দেখে থাকবে। তা থেকেই সর্ব্বনাশ এতদূর গড়িয়েছে। তা ঠাকুমা, সেই তো ক'লকাতা চিকিৎসা ক'রতেই আসতেই হ'লো যদি আর ক'দিন আগে আসা হ'ত, তবে একবার খুঁজে দেখতুম মেয়েটাকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু এখন তো আর সে সময়ও নেই।

কি ব'লব নাতবৌ, আমি সেই থেকে সুধীরকে বাড়ী আসতে ব'লছিলুম, কিন্তু ও কি আমারি কথা শুনে এওতো জোর করে যোগিনকে চিঠি দিতে তবে কোলকাতা নিয়ে আসা হ'ল। মাধুরী যাওয়ার পর থেকেই ওর শরীর মন দুই খারাপ যাচ্ছিল। আহা মাধু আমার রূপে গুণে মেয়ে। পুরীতে ও তো সুধীর খুব অসুখে পড়েছিল, মাধুই সেবা করে বাঁচালে। মনে ক'রলুম, মাধু যখন আমাদের পাল্টা ঘরের মেয়ে তখন মাধুর সঙ্গেই সুধীরের বেটা হ'ক। কিন্তু তোমার শ্বশুরের ভয়ে কিছু বলিনি। মাধুর কাছে তার ঠাকুরদাদার নাম শুনে বুঝলুম আমার মামাশ্বশুরের গোষ্ঠি ওরা। ওর বাপের নাম ছিল সত্যেন্দ্র চাটুয্যে, থাক এখন আর সে সব কথায় দরকার কি?

তবু ঠাকুমা, আমি হাল ছাড়ব না—। আমার দাদা, এখানকার স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর, আমি তাকে বলে দিয়েছি ক'লকাতার মেয়ে স্কুলগুলি দেখতে। মা যখন টিচারী ক'রত, তখন মেয়েও পাশ করে কিছু বসে নেই। সে

নিশ্চয়ই কোন স্কুলে টিচারী করে। আমার মন ব'লছে তাকে পাওয়া যাবে। তাকে না পেলে আমার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত হবে না ঠাকুমা?

সুধীরের অসুখের সংবাদ পেয়ে মা ভ্রাতৃবধূ কলিকাতা আসিয়াছেন। সুধীরের টাইফয়েড হইয়াছে। ধনশালী পিতা যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে পুত্রের চিকিৎসা করাইতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া বৃদ্ধা ঠাকু'মার মনের প্রচ্ছন্ন সন্দেহ প্রকট হইয়া উঠিল। সুধীরের মাও ভ্রাতৃবধূর নিকট মাধুরী সংক্রান্ত সকল বিষয় বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে এখন মাধুরীকে পাইলেই সুধীর ভাল হইবে। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য সম্মানী জমিদার যোগিন বাঁড়ুয্যে মাধুরীর সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

৬

অভিমান ক্ষুব্ধ মনের মাঝে আনন্দের কলরব উঠিয়া হাসির বাতাসে মতের সব মেঘ নিঃশেষ করিয়া দিল। সুধীর হর্ষোৎফুল্ল স্বরে ডাকিল, মাধুরী সত্যই কি তবে তুমি ফিরে এলে? সত্যই কি আমার অন্তরের গোপন আকর্ষণ তোমাকে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে? তাই তাই আবার অভাগার প্রতি দয়া করে ফিরে এলে? না এও আমার রোগ মস্তিষ্কের দুর্বলতা জনিত স্বপ্ন?

মাধুরী অতি কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া বলিল, না এ স্বপ্ন নয় সত্যি।

সত্যই! সত্যই তুমি ফিরে এলে? ফিরে এলে? কে তোমাকে খবর দিলে?

আপনি ভাল হয়ে উঠুন তখন সব শুনবেন।

আমি এখন বেশ ভাল হয়েছি, তুমি কাছে থাকলেই আমি ভাল হবো। বলো তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাবে না।

মাধুরী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, ছেড়ে যাতে না যাই তারই তো ব্যবস্থা হচ্ছে।

একটু চিন্তা করিয়া সুধীর বলিল, কে ব্যবস্থা ক'রছেন?

যার বিয়ের হুল সহ্য ক'রতে না পেরে চলে গিয়েছিলুম।

সুধীর ব্যাকুল আগ্রহে বলিল, বৌদি! বৌদি সে ব্যবস্থা ক'রেছেন?

হাঁ, তিনিই তার ভ্রাতার দ্বারা ক'লকাতার মেয়ে স্কুল গুলিতে অনুসন্ধান ক'রে আমাকে এখানে ডেকেছিলেন। তার মুখে রুগীর অবস্থা শুনে, তার কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রতে পারিনি। চিকিৎসার ভার গ্রহণ ক'রেছি। তা ফল ও মন্দ দেখছিনে বাইশ দিনে অনেকটা সেরে উঠেছেন।

সুধীর হাসিয়া বলিল, না না রোগীর রোগ এখনও ভাল হয়নি। চিকিৎসকের কাছে অনেক দাবী দাওয়া আছে তা কি সে রক্ষা করতে পারবে?

চেষ্টা করা যাবে।

না না, ঐ ছোট্টো একটু কথা শুনে আমি শান্ত হতে পারছিনে, আমি যে তোমার কাছে অনেক পাবার আশা করেছি মাধু, বল তুমি সে সব দিতে পারবে কিনা?

মাধুরীর ইচ্ছা হইল যে বলে ওগো, তোমায় সব দিতেই এসেছি। কিন্তু মুখে বলিল, ছিঃ অসুখ এখনও ভাল হয়নি, এরি মধ্যে এত উতলা হলে শরীর যে আবার খারাপ হবে।

না, তুমি কাছে থাকলেই আমি ভাল থাকব। তুমি আর কখন যেতে পাবে না। যে রাজ রাণী হলে মানাত ভাল, তাকে আর স্কুল মাষ্টারী করে খেতে হবে না।

মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এইবার বৌদি আমাকে রাণী হবার ব্যবস্থাই কোরছেন। কিন্তু আমি বলি, নিজেকে এমন ক'রে অচিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে অপরকে রাণী করবার কি দরকার ছিল?

সুধীর মাধুরীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল কেমন দেখলেতো ফাঁকি দিয়ে আসবার কি ফল?

মাধুরীর দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "কি দেখছিলেন? এই পুরী থেকে আমার নিষেধ সত্ত্বেও যখন চলে এলে, তখনি আমি বোলিনি, যে এ দান আমার মহাপ্রভুর দান, তিনি অবশ্য তোমাকে আমার আমার কাছে

ফিরিয়ে আনবেন। কেমন আবার তো ধরা দিলে, আমার প্রাণের টানে সেই মোহ ফাঁসে।

মাধুরী সুধীরের মুখের উপর তাহার সুকোমল হস্ত খানি চাপা দিয়া মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল, "থামুন থামুন, মশাইয়ের প্রাণের টানেই এসেছি কিনা? অত অহঙ্কার ভাল নয়।

তবে কার টানে এলে গো, আমার ঝগড়ার টানে বুঝি?

না গো মশাই না এসেছি একটা ক্ষুদ্র নির্ব্বোধ প্রাণের টানে।

সুধীর মাধুরীর গালটা সোহাগে টিপিয়া দিয়া বলিল, ঠিকই বলেছো মাধু, আমার প্রাণটা যেমনি ক্ষুদ্র তেমনি নির্ব্বোধ। যে তাকে মোটেই চায় না, এড়িয়ে চলতে পারলেই বেঁচে যায়; তারই পেছনে ছুটে তারই মোহফাঁসে পড়তে গলা বাড়িয়ে দেবার জন্য জীবনের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে বসেছিল।

হয়েছে বক্তিতে ঢের হয়েছে, ওঁরই প্রাণটাকে যেন আমি ক্ষুদ্র নির্ব্বোধ বললুম সুধীর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ে বলিল, কে তবে সে?

মাধুরী একটু জোর দিয়া বলিল, যার ক্ষুদ্র প্রাণে একজন বই দুজনের জন্য বিন্দু মাত্র ও স্থান নেই, বলিয়া সুধীরের মুখের পানে চাহিল।

তাহার উজ্জ্বল নয়ন হইতে প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতি উছলিয়া উঠিয়া সুধীরের অন্তর মন শীতল করিয়া দিল। সে ধন্য হইয়া মাধুরীকে নিবিড় ভাবে বক্ষোনীড়ে আবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় চুম্বনে তাহার গোলাপী গণ্ড রাঙ্গাইয়া তুলিয়া সোহাগ ভরা কণ্ঠে বলিল, জানিগো জানি, তুমি যে আমার জগন্নাথের দান।

দোষ কার!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল বি এ

জলি—পুড়ি তবু ধাই পতঙ্গ সমান
সঁপিবারে প্রাণ!
নহে—নহে তব দোষ নহে লো রূপসি,—
পূর্ণিমায় সিন্ধু যদি উঠে সে উচ্ছ্বসি,'—
আকুল কল্লোলে—
চাঁদিনীরে দূষিব তা ব'লে?
হৃদয় আমার রচে রাঙা মোহজাল,
বসি' চিরকাল!
মর্ম্মযবনিকাতলে অদৃশ্য সে কোন যাদুকর,
বাজাইছে নিশিদিন সর্ব্বনেশে মায়াময় স্বর,
বুঝিতে না পারি,—
আপন দোষের লাগি' নিন্দি তোমা নারী!
না—না বুঝি দোষ নহে,—ক্ষুধিত হৃদয়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে এ ভুবনময়!
নিরুদ্ধ নির্ঝর—
বাহিরিতে চায় ছুটে করি' কলস্বর!
দাবানল সমজ্বলে শ্রান্তিহীন অতৃপ্তকামনা,
আর উন্মাদনা!
কিসে নিভে এ আগুন—কোন সিন্ধুজলে?
চিরপ্রশ্ন মানুষের—কেবা দেয় ব'লে?
শুষ্ক নীতিকথা—
পারে না মিটাতে কভু প্রাণের এ তৃষ্ণাব্যাকুলতা!
কহ নারী! এ হিয়ায় পিয়াসী দুর্ব্বার
দোষ কি আমার?
ওরে কারি নাই সখি, আমিতো সৃজন,—
স্বভাব-ধরম ইহা—দোষী কোনজন?
ভাবি মনে তাই—
মানুষ করিছে ঘৃণা মানুষে বৃথাই!
পতঙ্গের ব্রত মোর—আর তুমি—দীপ্ত হুতাশন!
ক'রেছে সৃজন—
বিশ্বের নিয়ন্তা এই দোঁহে দোঁহা লাগি,'
মর্ত্ত্যজীব, নহি মোরা এ দোষের ভাগী!
তুমি হুতাশন—
লহ অর্ঘ্য জীবন যৌবন!

অভিসার

শ্রীসতী দেবী

[বনশ্রী ধনীর মেয়ে—ভালবাসে সে সাধারণ গৃহস্থের ছেলে রঞ্জনকে—কিন্তু সংসারে এ ধরণের বাল্য প্রণয়ের বাধা অনেক—সর্ব্বজয়ী প্রেমের কাছে অবশেষে বনশ্রী কি ভাবে আত্মাহুতি দিল সতী দেবী তাঁহার সুন্দর ভাষায় এই গল্পে তাহাই ফুটাইয়াছেন।]

পিতামাতার সংসার যখন ঝলমল করচে,—ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে—, ঠিক তেমনি সময় 'বনশ্রী' এল প্রথম ধরার বুকে।

ধনীর দুলালি যেমন করে ওঠে বেড়ে,—আদরে, সোহাগে, অভিমানে, আর বিধাতার দান মনোরম রূপশ্রী নিয়ে, সে উঠ্‌চে বড় হয়ে।

ব্রহ্মপুত্রের সুদূরবিসারি বালুচরের সীমা রেখা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে—, উদার বিশাল নদীতীরের শান্তিময় নীরবতাকে প্রহত করেচে যে জনপদের বহু কোলাহল সেই খানেই বনশ্রী উঠ্‌চে বড় হয়ে।

ধনীর সুরম্য প্রাসাদের পাশে দরিদ্রের ক্ষুদ্র গৃহ,—ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বশ্রীটুকু স্পষ্ট করে দেখাতেই যেন এর প্রতিষ্ঠা। তারি মাঝে রঞ্জনের জন্ম। পিতার গুরু শ্রমের বিনিময়ে আনা সামান্য অর্থ গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পথ। দেহের বিকাশ আর মনের পরিণতির পথে দারিদ্র্য কিন্তু দাঁড়ায়নি বাধা হয়ে—।

ছয়ঋতুর আসা যাওয়া—বার বার ঘটেচে—। রঞ্জন আর বনশ্রীর—উন্মুখ যৌবনের রাঙ্গা নিশার হয়েছে ভোর—। কল্পনার মায়াকানন ভরে উঠচে পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হয়ে—।

(২)

বনশ্রীর কাজল কালো ভ্রূ রেখার নীচে, টানা চোখ দুটিতে ক্ষণে ক্ষণে চলে আলো ছায়ার খেলা। তার দেহের প্রতি রেখা উঠেচে পেলব ভঙ্গিতে ফুটে-অনুপম লাবণ্যের লীলায়িত ছন্দে—।

রঞ্জনের সুগঠিত যৌবনদৃপ্ত মূর্ত্তি—ভাস্করের আদর্শ—। সে রূপ আকর্ষণ করে বনশ্রী অন্তর, কিন্তু,—আভিজাত্যের গর্ব্ব আর শাসন তাকে দেয়না মাথা নোয়াতে। হরিণ চোখের লুকোনো চাওয়ায় রঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকৃতেই সে ভালবাসে। রঞ্জনের চোখে বনশ্রী অস্পৃশ্যের দেবীমূর্ত্তি রঞ্জনের মনের পটে বনশ্রীর দীপ্ত ছবি আঁকা। সন্ধ্যাতারার রূপ যায় ঢেকে—, নীল আকাশের গায়ে শুকতারাকে মুছে ফেলে ফুটে ওঠে বনশ্রীর হাসি, ঈষৎগর্ব্বোদ্ধত মিষ্টি হাসি টুকু—বিজয়িনীর কম্প্রওষ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট হাস্য রেখাদুটী তরুণ মন দুলে ওঠে একই সাথে—। বিনা কথায়,বিনা ছোঁয়ায় দুর্নিবার আকর্ষণে টানচে তাদের নিরন্তর। চোখে যখন চোখ পড়ে বনশ্রীর আয়ত নয়ন আনত হয়,—দুটী কপোল হয় শোণিত রাঙ্গা, রঞ্জনের যেন লাগে বিস্ময়। সে ভাবে—ওযে কোন্ নাম না জানা ভাগ্যবানের বিজয় মালা! ওর প্রাপ্তিও যায় আমার আকাঙ্ক্ষা, নিতান্তই মর্ত্তের মানব হয়ে। যত্ন পুষ্ট বৃথা আশার লতাটী তার চিরদিনই রয়ে যাবে মঞ্জরীহীন। বনশ্রী তাকে টানচে গভীর আকর্ষণে মর্ম্মর প্রাচীরের ভেতর থেকে। মরুভূমির মরিচীকা যেন তৃষ্ণার তৃপ্তির পরিবর্ত্তে তৃষিতকে তুলেচে আকুল উন্মাদ করে বাষ্প-কুহেলীর জালে জড়িয়ে। তার সামনের বাধা, দারিদ্র্যের রিক্ত কঙ্কাল দুই বাহু প্রসারিত করে দিচ্ছে তাদের মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে।

রাত্রি যখন গভীর হয়—ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত জলরাশি মিশে যায় আঁধারের নিকষ কালোয় কালো হয়ে,—আপন কক্ষের আধো আলোয় বনশ্রীর ঘুমন্ত বুকে ওঠে দুলে—না পাওয়াকে পাওয়ার আশায়। প্রতি নিঃশ্বাসের উত্থান পতনে চলে সুখের আর দুঃখের নীরব কানা কানি।

চাঁদের আলোয় নদীর বুকে যখন ভাসে লক্ষ চাঁদের ঝিলিমিলি খেলা,—বাতাসে ভেসে আসে বকুলের মদির সুবাস, ঘাসের বুকে জ্বলে ওঠে মাণিকের মালা—বনশ্রীর আকাঙ্ক্ষা ওঠে উদ্বেল হয়ে,—দুটী বাহুর বন্ধনে,—রঞ্জনের সবল বাহুর নাগপাশে বন্দিনী হতে। মিথ্যা তার কল্পনা আর বৃথা তার আশা। সে অতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সংসারের

প্রতি কর্ম্মে—। মায়ের চিত্ত ওঠে ব্যাকুল হয়ে, মেয়ের সব কিছুতেই অভিমান! তাঁর সহস্র চেষ্টা বিফল করে বনশ্রীর অতৃপ্তি চলে বেড়ে।

(৩)

রঞ্জন যাবে বিদেশে। কর্ত্তব্যের প্রেরণা—বৃদ্ধ পিতার কর্ম্ম শ্রান্ত দিন গুলির দুঃখ ভুলিয়ে দিতে আনন্দে আর আরামে, সংসারের প্রত্যহের প্রয়োজন মেটাতে তার কর্ম্মশক্তিকে নিয়োগ করতে উপার্জ্জনের পথে।

মায়ের অর্দ্ধমলিন অঞ্চল প্রান্ত উঠচে ভিজে। অন্তরের আকুল মাতৃস্নেহ আসন্ন বিচ্ছেদের কাতরতায় উদ্বেল হয়ে উঠেচে। অনুচ্চারিত বেদনাবিধুর শুভকামনা বিধাতার কাছে যাচ্ছে ভেসে, ঠাকুর আমার রঞ্জনের করো কল্যাণ! রঞ্জন ডাকচে মা! অশ্রু প্লাবিত মুখ খানি তুলে উত্তর দেবার বৃথা চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠে বাকশক্তি আনতে গিয়ে, মায়ের ঠোঁট দুটী উঠ্চে কেঁপে।

ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিয়ে রঞ্জন ক'রলে যাত্রা। প্রাসাদের প্রতি বাতায়নে তার ম্লান চঞ্চল চোখ দুটী খুজচে যেন কাকে? ব্যথিত দৃষ্টি আসচে ফিরে—হঠাৎ গেল সরে বাতায়নের নীল আবরণী। ওকে? বনশ্রী! বনশ্রীইত! চোখে চোখে চাওয়া—বিদায় বেলার করুণ চাওয়া—এক পলকে বিশ্বের সৌন্দর্য্য দিল মলিন ক'রে। চলার পথে চ'লতে গিয়ে বনশ্রীর আঁখির ম্লানিমা—বর্ষণশ্রান্ত বনশ্রীর সজল দৃষ্টি রঞ্জনকে ক'রে তুলচে বারে বারেই বিভ্রান্ত।

প্রসাদের উঁচু প্রাচীর আর ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ পরিখা পার হয়ে দুটী মন কবে এসে এক হ'য়ে গেচে। প্রকৃতির শ্যামাঞ্চলের প্রান্ত এসে স্পর্শ ক'রেচে ব্রহ্মপুত্রের জল-রেখাকে।

সকল সমারোহ, সব কোলাহলকে স্তব্ধ করে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েচে—কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত হ'য়ে সবার অগোচরে বনশ্রীর মায়ের শিয়রে। এপারের মায়া তাঁকে ধরে রাখতে হ'ল অসফল। ওপারের পথে আলো না আঁধার কে জানে? তবু তিনি চ'লে গেলেন—রত্ন ভূষণে ভূষিত হ'য়ে প্রথম দিনের প্রথম বধূবেশে। সে দিনের লাজরক্ত প্রথম প্রণয় ভীতা বধূর মুখ খানি আজ গ্লানি বিমুক্তির শুভ্রতায় ভরা। বনশ্রী কাঁদচে—লুটিয়ে পড়ে, আকুল হ'য়ে। নীড়চ্যুত পাখী ঝড়ের রাতে পক্ষিণীর বক্ষচ্যুত হয়ে যেমন করে কাঁদে আর্ত্তস্বরে,—তেমনি করেই বনশ্রী কাঁদচে। সে ক্রন্দন ছড়িয়ে পড়চে চারিদিকে, রজনী গন্ধার পুষ্পদণ্ড প'ড়চে যেন নুয়ে—বাতাস উঠচে ভারী হ'য়ে।

৪

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম, হল শেষ। শোকের ছায়া এসেছে আবছা হয়ে, এমনি সময়ে, বর্ষার এক ধূসর সন্ধ্যায় বনশ্রীর পিতা আনলেন নব গৃহলক্ষ্মী বরণ করে।

ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বুকে ঢল নেমেচে, কালো জলে বৈরাগিণীর গৈরিক বাসের ছোপ লাগিয়ে।

বনশ্রীর চোখে সজল আকাশের সুনীল ছায়া—এসেচে গাঢ় হয়ে,—তার মায়ের ছবি খানিতে লেগেচে ধূসর সন্ধ্যার ঈষৎ কালোর ঘোর। ধনীর গৃহ—শোকের গ্রন্থি অটুট থাকেনা, কারো জন্যেই নয়। যাজ্ঞিকের ধর্ম্মলাভের পথে একদা পত্নী ছিলো নিতান্ত প্রয়োজনীয়;—বিকল্পে স্বর্ণ প্রতিকৃতির ও সাহায্য নিতে হতো। অর্থলাভী বিপত্নীক নিয়ে এলেন ভোগের প্রেরণায়,—বহুদিনের সঙ্গিনী, তাঁর বহু উত্থান পতনের সাক্ষী-সাথিটিকে মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে, আর একটি নারী। অতি বিগত যৌবন পুরুষের পত্নীত্বের মূল্যে, বনশ্রীর বিমাতা পেলেন, সর্ব্বময়ী পদ। অতৃপ্তা নারীর চিত্তজ্বালা রূপান্তরিত হ'ল,—ক্ষমতার অপব্যবহারে, আশ্রিতের প্রতি অত্যাচার আর সপত্নীর স্মৃতি-রেখা বনশ্রীর নির্য্যাতনে। প্রতি জনকে বুঝিয়ে দিতে, তার শক্তির অপ্রমেয়ত্ব—বনশ্রীদের গৃহে বিমাতার মূর্ত্তি বিভীষিকাময়ী। বনশ্রীর ত্রুটী গুলি—বিমাতার মানদণ্ডে হল মাপা—তীব্র তিরস্কার এল তীক্ষ্ণ আঘাত নিয়ে—মর্ম্মভেদি মূক আর্ত্তনাদে বনশ্রী প'ড়ল লুটিয়ে। তার রূপের শ্রী, বিমাতার চোখে জ্বেলে দিয়েচে হিংসার আগুন। সেই আগুনের শিখা দগ্ধ করে দিল আদরিণী, দুলালী মেয়ের অন্তরটাকে। পিতা আজ তার কাছে দুর্লভ দরশন। কার কাছে বনশ্রী চাইবে—একটু সান্ত্বনা, দুটী স্নেহসিক্ত কথা,—একটী পরম শান্তিময় ছায়া শীতল আশ্রয়!

নিশীথের অন্ধকারে অভিমানের তরল বন্যা যায় বয়ে,—সঙ্গোপনে।

দূরে দেখা যায়,—ব্রহ্মপুত্রের বারিরাশি অনন্ত কল-রোলে চলেচে—অজানার উদ্দেশে। আরও দূরে স্পষ্ট হয়ে উঠেচে, বাতায়নের ভিতর দিয়ে শ্মশানের দৃশ্য। দিগন্তের কোলের কাছে আকাশ হ'য়েচে রক্ত আভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে। শ্মশানের অগ্নিশিখা,—কোন্ আর্ত্তের, কোন প্রতীক্ষমানার প্রিয়তমের—কোন্ জননীর বক্ষ-চ্যুত অম্লান কান্তি শিশুর অগ্নিশয্যা,—জ্বলচে ধূ—ধূ—ধূ—। তীরে আগুনের দগ্ধজ্বালা আর জলে অনন্ত শীতলতা—।

আতঙ্কে বনশ্রীর চোখ আসে বন্ধ হ'য়ে। সে ভয়কে দূর করতে রঞ্জনের ছবি ওঠে ভেসে মনের ছায়ালোকে। তার বিদায় বেলায়, ম্লান চকিত চাহনীটুকু ভাবতে গিয়ে; ক্লান্ত বনশ্রী কখন পড়ে ঘুমিয়ে, গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন হয়ে।

\+ \+ \+ \+

রঞ্জন এসেচে—দীর্ঘ দিনের পরে, অবকাশ নিয়ে, পিতামাতার স্নেহনীড়ে—। মা যেন আজ দশভূজা—ব্যগ্রস্নেহে মুছিয়ে দিতে চান, প্রবাস কাতর পুত্রের সব ক্লেশ—এক নিমিষে চান ধুয়ে দিতে তার সকল অসুখের গ্লানি। পিতার গভীর স্নেহ ফুটে উঠেচে বার্দ্ধক্য লাঞ্ছিত—কপালের প্রতি রেখাটীর আকুঞ্চনে।

রঞ্জনের পিপাসিত অন্তর চঞ্চল হয়ে উঠেচে। —বনশ্রীর মুখের পরে ফুটে ওঠা মৃদু হাসির রেখা টুকু দেখতে সে ভারী ভালবাসে—। বনশ্রীর, শাসন ক্লিষ্ট দিন গুলির পীড়া—তাকে কিছু কম করে ব্যথা দেয়নি। তার দৃষ্টির প্রদীপ জ্বেলে, প্রতি বাতায়নে খুঁজে মরচে তাকেই—দূর বিদেশে, যার চিন্তায়, সে উঠত মধুর সুখে কেঁপে, কেঁপে।

বাতায়নের অন্তরালে বনশ্রী—একটু যেন শীর্ণ, একটী বার দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। রঞ্জনকে যেন জানিয়ে গেল তার অভিনন্দন। রঞ্জনের সুখের সাগর, উঠল দুলে গভীর আনন্দে।

কদিন ধরে—রঞ্জনদের ক্ষুদ্র বাড়িটীর রূপসজ্জা হয়েচে সুরু। দিন চার পরে বাড়িখানি মনোরম রূপ নিয়ে উঠল হেসে। বনশ্রী অনুমান করচে,—রঞ্জনের উপার্জ্জিত অর্থের ওপর তার আশৈশবের গৃহখানির যে দাবী আছে তারই অংশ বণ্টিত হল এইরূপ সজ্জায়। সত্যি কারণ কিন্তু রঞ্জনের বিবাহোৎসব।

সেদিন সকালে সূর্য্যের আলো করচে ঝলমল—। কদিনের মেঘ মেদুর আকাশ আজ স্বচ্ছ নীলিমায় নীলিম হয়ে উঠেছে, সে আলো প্রতিফলিত হয়েচে নদীর বুকে। রঞ্জনদের বাড়ি খানি আসন্ন উৎসবের কোলাহল মুখরিত। বনশ্রীর কানেও গিয়ে পৌছেচে তার রেশ। আষাঢ়ের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো বনশ্রীর মুখে। মনের মাঝে উঠেচে আলোড়ন, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র রুদ্ধ আবেগে উঠচে ফুলে ফুলে।

'কোন্ ভাগ্যবতী আসচে উমার মত রূপের দ্যুতি নিয়ে তপস্যার ফল করতে গ্রহণ অঞ্জলি পেতে? বনশ্রীর মনে মনে কল্পনার আবেষ্টনে গড়া এতকালের সঞ্চিত প্রেম হল মিথ্যা। রঞ্জনের আকুল হয়ে খোঁজা দৃষ্টি বুঝি তারই বিভ্রান্তি! সবই হল মিথ্যা তার—স্বপ্ন সৌধ চূর্ণ হল—স্বর্ণদণ্ডের আঘাতে—।

বনশ্রী কাঁদচে আকুল হয়ে। না না রঞ্জনকে সুদূর করে সে পারবেনা বেঁচে থাকতে। রঞ্জনকে সে জানাবে তার নিবেদন—তারই আশ্রয় বনশ্রীর একান্ত নির্ভর। তার পিতার আভিজাত্য হবে ক্ষুণ্ণ—হোক্‌না—জোর করে তার আত্মাকে বঞ্চিত করতে সে চায়না। অভিসারিকার লজ্জা—সে লজ্জা বৃথা—এযে তার জীবন মরণের অভিসার। প্রত্যাখান যদি আসে রঞ্জনের কাছ থেকে—তবে ব্রহ্মপু-ত্রের শীতল জলে তার জীবনের, আকাঙ্ক্ষা পীড়িত জীবনের হবে শেষ।—ভাবতে গিয়ে বনশ্রীর শীর্ণ মুখে ফুটে ওঠে দৃপ্ত জ্যোতি। ভাবনার হল সমাপ্তি।

বিমাতা আজ বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে পড়েচেন—প্রতি দিনের সেই বনশ্রী আজ যেন গভীর ভাবে ভরা—। তাঁর সামনে এলেই বনশ্রী কেমন যেন আতঙ্ক ত্রস্তা হয়ে পড়ত—আজকে কেন এর গতি এত সাবলীল—এত অসঙ্কুচিত। দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে দেখতে গিয়ে বিমাতার মুখ গম্ভীর গাম্ভীর্য্যে উঠল ভরে। সঙ্কীর্ণ চিন্তা নারীমন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে এল—এ বুঝি তাঁকে অগ্রাহ্য করে চলবার প্রথম সূচনা।

অত্যাচারের অস্ত্রখানি আরও সুশাণিত ক'রে তুলতে তিনি করলেন গভীর চিন্তা—হিংসার আগুন জ্বলে উঠল লেলিহান শিখায়।

আসন্ন সন্ধ্যার মুখে সেদিন হঠাৎ এলো দারুণ ঝড় সে দুরন্ত লীলাকে শান্ত করতে—বিদ্যুতের অট্টহাসে, আকাশে হ'ল কালোমেঘের সমারোহ। প্রবল ধারায় বর্ষণ হলো সুরু। তাণ্ডব নৃত্যশীলা বনানীর মূর্ত্তি উঠল শান্ত হয়ে প্রবল ধারাস্নানের ক্লান্তিতে। রঞ্জন বসে দেখছিলো সেই লাস্যলীলা আর বকুল ফুলের সাথে বৃষ্টি ধারার ফুলঝুরি। অন্ধকার হয়ে এল গাঢ় থেকে গাঢ়তর—আঁধারের রূপের মাঝে রঞ্জন গেছে মিশে। তার জীবনের জ্যোৎস্না আজ ম্লান হয়ে আসচে। পিতার আদেশ, মাতার কামনা রঞ্জনের বিবাহ। সুদুর্লভা বনশ্রীর স্মৃতি তাকে ফেলতে হবে মুছে একবারে। দীর্ঘঃশ্বাসে তার দেহ উঠচে কম্পিত হয়ে। তন্ময় রঞ্জনের মনের ঝড় বাইরের ঝঞ্ঝার সঙ্গে করচে কোলাকুলি।

কে এল দ্রুত পদে—ভীতা কিশোরীর জড়তাময় পদধ্বনি ত নয় এ—কালো চুলের রাশি থেকে শিশির বিন্দুর মত জল ঝরচে—সিক্তবাসনা বনশ্রী—। বিজলী ঝলকে রঞ্জন দেখলে বৃষ্টি ধোয়া শ্যামা বনশ্রীর মূর্ত্তি নিয়ে তারি অন্তর-লক্ষ্মী সামনে দাঁড়িয়ে। রঞ্জনের জগত তখন ভারী জোরে উঠচে দুলে—বক্ষতাল দ্রুত হয়ে উঠচে—স্বপ্ন নয়ত!

বিভ্রম কাটিয়ে রঞ্জন শুনচে—রঞ্জন আমায় তুমি নাও। আমার আশ্রয় আমি খুঁজে পেলেম না, আমাদের ব্যবধান ফেল ভেঙ্গে, আমায় স্বীকার করো তোমার জীবনে। বিমুগ্ধ তন্দ্রাগ্রস্থ রঞ্জনের হাত দুখানি কখন এসে মালার মত বেষ্টন করচে বনশ্রীর কণ্ঠ রঞ্জনের মনে নেই। বনশ্রী আবার বল্লে—আমার আসন রেখে গেলেম প্রতিষ্ঠা করে ঝড়ের রাতে সংগোপনে, একে প্রকাশ্যে প্রকাশ করো তুমি। বনশ্রীর গমনোদ্যতা মূর্ত্তি অন্ধকারে গেলো হারিয়ে। মুহূর্ত্ত পরে রঞ্জন ডাকলে—"মা"—দু হাতে বরণ ডালা ধরে মা তখন গুছিয়ে তুলচেন মাঙ্গল্য দ্রব্য—। রঞ্জন বল্লে—ওখানে বিয়ে হবে না মা! এই মাত্র বনশ্রীকেই আমি নিয়েছি বরণ করে। মন্দিরের মঙ্গল আরতির বাজনা তখন উতল বাতাসে আসচে ভেসে।

শরৎ রাণী

রাজিউদ্দিন মুসাআলি

এল—মেঘতরী বেয়ে ঐ শরৎ রাণী
তারে—চিনেছি চিনেছি আমি, জানি গো জানি;
গায়—মুগ্ধ বনানী তারি শত আরতি,
দোলে—আঁচলে "কঙ্কা" ফুলে পেরজাপতি।
সে যে—সবুজ সাড়ীতে তনু রেখেছে ঢাকি;
ওড়ে—ভোমরা হইয়া তারি কাজলা আঁখি,
বনে—শুনি তার রাঙাপা'র নূপুর ধ্বনি
মনে—জাগে সুখ-শিহরণ দিন্ রজনী।
ফোটে—দোয়েলার মুখে তারি বুকের বাণী
আমি—চিনিগো চিনিগো তারে জানি গো জানি।
তার—শিউলি ফুলের রংয়ে চরণ ছোপা—
আর—"হিজলে" ফুলেতে ঢাকা মাথারি খোঁপা;
দুলে—মাথার অলক তার কাশেরী ফুলে,
তারে—দেখি নাচে "ভুঁইচাপা" নদীর কূলে,
কাঁচা—ধান্ ক্ষেতে ওড়ে ঐ "ওড়্না খানি
আজি—তোমারে বরণ করি শরৎ রাণী।

গান

শ্রীঅমিয়কুমার বাগচি

পাগল রে তুই আগল ভেঙে আয়
সময় যে তোর বৃথাই বয়ে যায়
কান্নাভরা বুকের পরে
দরদ ভরা গভীর সুরে
হৃদয় ছেঁচা রক্ত-রাঙা শতদলের ঘায়
মূর্চ্ছা যদি আসেই রে তোর ক্ষতি কিবা তায়।
ফুলের বুকের গোপন মধু লুটে নে এই দিনে
পথ হারানো গান্‌খানি আজ বাজিয়ে নে তোর বীণে
সরম রাঙা প্রথম প্রিয়া
চাইবে দিতে তরুণ হিয়া
রঙীণ আঁচল রাখবে পেতে সোহাগ মধু ঢেলে
বরণ তারে করিস্ রে তুই নয়ন দুটি মেলে।

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরা

(রঘুবংশ, ষষ্ঠ সর্গ)

অনুবাদক—শ্রীভারত কুমার বসু

(বিভিন্ন ছন্দে)

ইন্দুমতীর পানে
নৃপতিদের পিয়াসী মন টানে ;
অঙ্গ জুড়ে ফুট্‌ছে প্রেমের অগ্রদূতীর মত
শৃঙ্গার-ভাব কত !
ঠিক সে যেন তরুবীথির রূপের অরুণিমা
সদ্য-ফোটা পত্র-মাধুরিমা। (১২)

+

এক নৃপতির হস্তধৃত পদ্মনালে
অথির্ পাতায় প'ড়লো ভোমর ওড়ার কালে।
চক্রাকারে বিলুণ্ঠিত পরাগগুলি ;
লীলায় ঘুরায় কমল রাজা, আপন ভুলি'। (১৩)

+

কণ্ঠ হ'তে এলিয়ে-পড়া
নানান্ মণি-রত্নে-গড়া
কেয়ূর-সীমার মাল্যখানি খুলি'
অপর ভূপাল্ ফিরিয়ে আঁখি
বালার পানে দৃষ্টি রাখি'
যথাস্থানে রাখছে আবার তুলি'। (১৪)

+

এক নৃপতি আপন মনে
ঈষৎ নুয়ে ধীর নয়ন
ক'রছে কেবল পদ্ম-আভা
পদাঙ্গুলি সঞ্চালন।

পাখীর অথির্ ঠোঁটের মত
চরণ-নখের চপল ঘায়
হেম-পাদপীঠ বক্ষপটে
আঁকছে কি যে কল্পনায়! (১৫)

+

বাম বাহুটি যত্নে রাখি'
সিংহাসনের অর্দ্ধভাগে
এক নৃপতির অধিকতর
উচ্চ হ'য়ে স্কন্ধ জাগে।
সেই পাশে তার ফিরিয়ে আঁখি
গল্প-কথা সখার সাথে ;—
বিবর্ত্তনে কণ্ঠমালা
লুটিয়ে প'লো পৃষ্ঠপাতে। (১৬)

+

বিলাসিনীদের
কর্ণফুলের
কেতকী-ফুলের পাণ্ডু পাপড়ীগুলি
অন্য ভূপাল্ সযতনে হাতে তুলি
বুকের বধুর
পরশ-মধুর
শ্রোণী-তটতল পেষণ-নিপুণ নখে
ছেঁড়ে আর ছেঁড়ে প্রণয়-পিয়াসী চোখে। (১৭)

+

করতলে এক নৃপতির
ধ্বজ-রেখা চিহ্নিত
রক্তবরণ ঠিক সে যেন
লাল্ শতদল-নিন্দিত।

---

* কাব্যাংশে বর্ণিত নৃপতিদের অঙ্গভঙ্গি ও কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য স্বয়ম্বরা ইন্দুমতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা।—অনুবাদক।

রত্ন-মণির অঙ্গুরীতে
হাতের পাশা সমুজ্জ্বল্,—
ফেল্‌ছে ভূপাল্ অক্ষমালা
ঠিক সে যেন খেলার্ ছল্। (১৮)
+
শিরের শোভা কণক-কিরীটখানি
যথাস্থানেই ছিল, তবু টানি'
এক নৃপতি দেখছে ছলের ভরে
মুকুট যেন শিথিল্ হ'য়ে পড়ে।
সেই মুকুটের রত্ন-আলোর ধারা
উচ্ছলে তার করাঙ্গুলির রন্ধ্রপথে সারা। (১৯)
+
রঘু-তনয় আপন কাছে
আসছে হেরি' রাজকুমারী
ব্যাকুল হ'লো—বরণ-মালা
প'ড়বে কি, না, কণ্ঠে তারি।
কাঁপলো হঠাৎ দক্ষিণ কর্
কেয়ূর্ যেথায় জড়িয়েছিল।
শুভক্ষণের সেই কাঁপনে
সকল্ দ্বিধা বিদায় নিল। (৬৮)
+
অনিন্দিত রূপের তনু
সেই কুমারের মুখ নেহারি'
অন্ত রাজার সাম্‌নে যেতে
ক্ষান্ত হ'লো রাজকুমারী।
ঠিক সে যেন মধুকরী
চায় না অপর বৃক্ষবীথি
সাম্‌নে হেরি' আম্রতরুর
মুঞ্জরিত পত্রপ্রীতি। (৬৯)
+
রঘু-তনয় অজরাজের পানে
ইন্দু-আভা ইন্দুমতীর হৃদয়খানি টানে;—
বাক্-চতুরা সহচরী সুনন্দা তাই কয়
সবিস্তারে রাজকুমারের বংশ-পরিচয়:— (৭০)
+

ইক্ষ্বাকু-রাজ-বংশ মাঝে
অশেষ গুণাধার
প্রখ্যাত এক ছিলেন রাজা
ককুৎস্থ নাম তাঁর।
কোশলভূমির নরেন্দ্ররা
উদার, মহাজ্ঞানী—
সেই হ'তে ল'ন 'কাকুৎস্থ' এই
বংশোপাধিখানি। (৭১)
+
বৃষভবেশী ইন্দ্রদেবের
স্কন্ধে করি' আরোহণ
পিনাক-পাণির ভঙ্গিমাতে
ককুৎস্থরাজ ক'রলো রণ।
ধ্বংস হ'লো লক্ষ দানব
শরের সহি' যন্ত্রনা,—
ঘুচলো গালে অসুর-প্রিয়ার
পত্রলেখার্ আল্‌পনা। (৭২)
+
শিথিল্ হ'লে ইন্দ্র-কেয়ূর
চালিয়ে যেতে ঐরাবতে,
ক'র্‌লো তাতে অঙ্গদাঘাত
ককুৎস্থরাজ পার্শ্ব হতে।
বৃষভ-তনু-ত্যাগের পরে
আপন্ মহান্ মূর্ত্তিধারী
সুরেশ্বরের পার্শ্বে রাজা
অর্দ্ধ আসন নিলেন তাঁরি। (৭৩)
+
সেই ককুৎস্থ-রাজার কুলে
দীপ্ত দীপ সমান
জন্মেছিলেন রাজা দীলিপ
অশেষ কীর্ত্তিমান্।
একোনশত অশ্বমেধের
যজ্ঞ ক'রে এসে
ইন্দ্রপ্রীতির আশায় তিনি
ক্ষান্ত হ'লেন শেষে (৭৪)

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলায় হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকার অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(২৪)

এক বৎসর পরে নরেশকে সঙ্গে লইয়া গোপা আবার ফিরিয়া আসিল।

দীর্ঘ এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, গোপা মামার বাড়ীতে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

মামা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামী তাহাদের বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি বৃন্দাবন যাব মা, আর এ সংসারে থাকব না। তুমি যা হয় নিজেদের উপায় কর নইলে আমার তো যাওয়া হয় না।

বিবর্ণ হইয়া গিয়া গোপা বলিল, আমি কোথায় যাব—মামীমা?

মামীমা বলিলেন, কোথায় আর যাবে মা? যার স্বামী বর্ত্তমান রয়েছে সে কখনও বলতে পারে কোথায় যাব—কি করব? অমন রাজার মত স্বামী যার—

গোপা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছিল। মুখ ফুটিয়া সে বলিতে পারে নাই তাহার স্বামী তাহার নয় অপরের। নারীর জীবনে এ কথা মানিয়া লইবার মত অপমান আর নাই।

এ দেশের মেয়েরা অপর কোন মেয়ের সহিত পরিচিতা হইবার প্রথম সুযোগেই স্বামী ও শ্বশুরালয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজ লইয়া থাকেন। গোপা এমন প্রশ্ন অনেক শুনিয়াছে, কত সময় সে মোটে উত্তর দেয় নাই, কত সময় কত মিথ্যা কথাও বলিতে হইয়াছে।

উপায় নাই,—তাহাকে একটা কোন জবাব দিতেই হইবে যে। সে দুর্ভাগা বটে, সে পরিচয় সকলের কাছে নিজের মুখে সে দিতে পারে না।

রাজার মত স্বামীর পরিচয়ই সকলে পাইয়াছে, কিন্তু সে যে স্বামীর নিকট হইতে কতখানি দূরে পড়িয়া আছে সে সংবাদ তো কেহই জানে না।

সত্য কথাটা মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে বলিতে পারে নাই।

নরেশ মামার বাড়ী আসিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিত। কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, বাড়ী যাবে না দিদি?

দিদি গম্ভীরমুখে উত্তর দিত, যাব বৈকি, চিরকালই কি মামার বাড়ী থাকব? এখানে এসে তোর পড়াশুনা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, একটা বছরই শুধু শুধু নষ্ট হল।

গোপা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিত নরেশ বড় হইয়াছে, মানুষ হইয়াছে; সে নরেশের বিবাহ দিয়া সংসারী হইয়াছে।

কিন্তু সেদিন কি আসিবে?

গোপার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত, সে সামনে দেখিত দারিদ্র্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। তাহার পানে চাহিয়া গোপা শিহরিয়া উঠিত—সে নরেশকে মানুষ করিতে পারিবে কি?

মামীমা বৃন্দাবনে যাইবার যোগাড় করিতে লাগিলেন, গোপাও নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া লইল।

দেশে ফিরিয়া গোপা অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল।

রান্নাঘরটা পড়িবার মত হইয়াছে এই বেলা না সারাইয়া লইলে সামনের বর্ষায় ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। বাড়ীর উঠানে একহাঁটু করিয়া জঙ্গল হইয়াছে, সে গুলি পরিষ্কার না করাইয়া থাকা চলে না।

গোপা সেই জঙ্গলাকীর্ণ উঠানে দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার উপরে একবার সজল চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

নরেশ বিকৃতমুখে বলিল, ইস, কি জঙ্গল হয়েছে দিদি, এই জঙ্গলের মধ্যে থাকব কি করে?

গোপা উত্তর দিল পরিষ্কার করে নিতে হবে, জঙ্গলে বাস করব কেন?

নরেশ বলিল, সামনে বর্ষা যে—

গোপা বলিল, এলোই বা বর্ষা, তারও আগে আমরা দুটি ভাই বোনে এসব পরিষ্কার করে নিতে পারব; পারবি নে?

নরেশ বলিল, পারব।

মহোৎসাহে দুই ভাই বোনে বাড়ী পরিষ্কার কার্যে লাগিয়া গেল।

বৈকালে গোপা যখন ঘাটে গেল তখন সেখানে পাড়ার সব কয়টি মেয়েই একত্র হইয়াছে। গোপাকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—

ওমা, গোপা যে,—এতদিন কোথায় ছিলি বাছা? তাইতো বলি,—পোড়া গাঁয়ের লোক অনেক কথাই বলে, এবার এসে দেখে যাক না তারা,—চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে যাক। লোকে বলে তুই নাকি কলকাতায় কোথায় থেকে বাইজির কাজ করিস, কেউ বলে তুই নাকি কেরেস্তান হয়েছিস। মাগো, এদেশের লোক জ্যান্ত মাছে পোকা পাড়ায়, নইলে—

বাধা দিয়া গোপা শান্তভাবেই বলিল, শুধু বাইজী আর খৃষ্টান,—মুসলমান হওয়ার কথাটা কেউ বলে নি বুঝি?

শান্তভাবে বলিলেও সে কথার মধ্যে যে বক্রতা ছিল তাহা সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিল।

রমা পিসি গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, আর কিছু না হোক—খুব কথা শিখেছিস বাছা কলকাতায়, থেকে, একেবারে অবাক করে দিলি যে। তুই যে আগে একটা কথাও বলতে পারতিস নে গোপা—

গোপা পাশ কাটাইয়া ঘাটে নামিতে নামিতে বলিল, কথা শুনতে শুনতেই কথা বার হয় পিসিমা। গর্ত্তে সাপ নিঝুম মেরেই পড়ে থাকে, তাকে খোঁচা দিলেই না সে ফোঁস করে। হয় তো কোন দিনই কথা বলতে পারতুম না, আজকে কথা বলতে শিখেছি সে কেবল তোমাদেরই অনুগ্রহে।

মুখখানা অত্যন্ত কঠিন করিয়া রমাপিসি উঠিয়া গেলেন, ভট্টাচার্য্য গৃহিণী মুখ কালো করিয়া বলিলেন, দেখিস মা, গায়ে যেন জল দিসনে। এই সবে চান করে উঠলুম কিনা—

তাঁহার এ কথা বলিবার অর্থ গোপা জানে, তথাপি সে নীরবে রহিল। একপাশে নামিয়া স্নান করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইতেছিল, এখানে আসার চেয়ে অন্য কোথাও গেলেই ভালো হইত।

কিন্তু কোথায় সে স্থান, কে দিবে তাহাকে স্থান?

গোপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

আর্দ্র বস্ত্রখানা বারাণ্ডার এককোণ হইতে আর এককোণ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া শুকাইয়া দিতে দিতে নরেশকে ডাকিয়া বলিল, বিনু দা কি স্থরমাদি এখানে আছেন কিনা একবার দেখে আয় তো নরু।

নরেশ কতকগুলি ইট আনিয়া উঠানে যাওয়া আসার পথ প্রস্তুত করিতেছিল, বলিল এই যাচ্ছি দিদি, দশ মিনিট দেরী কর—

গোপা জিজ্ঞাসা করিল, ওকি হচ্ছে ইট দিয়ে?

নরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, বাঃ সামনে বর্ষা আসছে না? এই যে জঙ্গলগুলো তুলেছি, এর মধ্যে জল পড়লে এ উঠানে আর কি পা দেওয়া যাবে? আগে হ'তে ইট দিয়ে পথটা তৈরী করে রাখি, এর পর স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা করা যাবে।

ভবিষ্যতের জন্য তাহার এই সব ব্যবস্থা দেখিয়া গোপা হাসিয়া ফেলিল।

নরেশ লজ্জা পাইয়া হাতের ইট ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আগে বৃষ্টি আসুক তারপর তুমি দেখে নিয়ো আমার কথা সত্যি কিনা।

গোপা তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আগে বর্ষা হোক, বৃষ্টি নামুক, তারপর যা হয়

হবে। এখন তোকে যা বললুম তাই কর, তাই চট করে ওদের বাড়ী একবার যা।

নরেশ বলিল, আমি এখনই যাচ্ছি।

সে দ্রুত চলিয়া গেল।

(২৫)

সুরমা আসিয়া দাঁড়াইতে গোপা ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইয়া সুরমা বলিলেন, দিদিকে ভুলিসনি দেখছি এসেই নরুকে পাঠিয়েছিস কিন্তু এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন গোপা দেখে যে আর চেনা যায় না।

গোপা মুখ টিপিয়া হাসিল।

সুরমা বলিলেন, তারপর—মামার বাড়ী হতে চলে এলি যে হঠাৎ? সেখানে তবু মামা মাথার ওপর ছিলেন দেখা শুনার একজন লোক ছিল, এখানে কি হবে বল দেখি?

গোপা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল সেখানে জায়গা থাকলে কি আর আসতুম—মামীমা বৃন্দাবন যাচ্ছেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর মামা?

গোপা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, একটা কথা আছে না দিদি—অভাগ যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়, আমারও তাই হয়েছে, মামা একবছর না যেতেই মারা গেলেন যে, কাজেই সে ভিটেয় আর জায়গা হল না।

সুরমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গোপা বলিল, দীনু দা কোথায় দিদি, এখানে আছেন কি?

সুরমা বলিলেন, মাধব বাবুর মেয়ের অসুখ হওয়ায় তাঁরা দেওঘরে যাওয়ার সময়ে দীনেশকেও নিয়ে গেছেন। সে ওদের পারিবারিক ডাক্তার কিনা সঙ্গে থাকতে হয়।

গোপা জিজ্ঞাসা করিল, দীনুদা ওদের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন না?

সুরমা বলিলেন, সে ছাড়লে হবে কি, ব্যাপারটা যে শেষে 'কমলি নেহি ছোড়েগা' ব্যাপারের মত হয়ে দাঁড়াল। দীনু ছাড়লেও ওরা ছাড়লেন না, জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন।

গোপা বলিল, আপনি যাননি যে—

সুরমা একটু হাসিয়া তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, না এ ভিটে ছেড়ে আমার আর কোথাও যেতে প্রবৃত্তি হয় না। এই কয়টা দিন আগে আসাম হতে ঘুরে এসেছি, আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে এখন নেই।

গোপা জিজ্ঞাসা করিল, আসাম গিয়েছিলেন কেন?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরমা বলিলেন, সে অনেক কথা গোপা, বলতে গেলে একখানা মহাভারত হয়ে পড়ে—এরপরে শুনিস।

অন্যমনস্কভাবে তিনি কোনদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শিবানীর কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না, আজ কয়দিন তিনি কেবল তাহার কথাই ভাবিতেছিলেন।

সে কোথা হইতে আসিয়াছিল আবার কোথায় চলিয়া গেল, মনের মধ্যে কেবল ছাপটাই রাখিয়া গেল। জীবনে আর কোনদিনই তাহার সহিত দেখা হইবে না, আর কোনদিনই সে সামনে আসিবে না, সে চিরকালের মতই চলিয়া গেছে।

সুরমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন মানুষের এমনও হয়। লোকে তাহার সত্য পরিচয় পাইলে তাহাকে ধিক্কার দিবে, এ দেশের সতী মেয়েরা তাহার নাম মুখেও আনিবে না, কিন্তু সে কি সত্যই অপরাধিনী?

প্রেমের স্পর্শে রাং হয় রূপা, পাপী হয় সাধু।—সত্যকার প্রেমে জাতি ধর্ম্ম, সমাজ কিছুই ভেদাভেদ থাকে না—থাকিলে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জীবন কাহিনী অন্যভাবে বিবৃত হইতে পারিত।

যে মানুষ অভাগিনী শিবানীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিবে, তাহাকে ধিক্কার দিবে, সেই মানুষের অন্তরের সত্যরূপ যদি প্রকাশ করা যাইত, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিত, কিন্তু সেই হইত মানুষের সত্যকার পরিচয়। মানুষের অন্তরের উদগ্র কামনাকে তাহারা বাহিরে একটা আবরণ টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ নাকি শ্রেষ্ঠ জীব, অতিরিক্ত বুদ্ধিমান

তাই তাহার অন্তরের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় না, সত্যকার রূপ দেখা যায় না।

গ্রামের লোক এবার গোপাকে লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইল না, গোপা এবার কেমন করিয়া তাহাদের চোখ এড়াইয়া রহিয়া গেল।

সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—কারণ সে ইহাই চায়। সকলের লক্ষ্যের মধ্যে তাহাদের একজন হইয়া থাকিতে চায় না, সকলের চোখে এড়াইয়া দূরে সরিয়া থাকিতে চায়।

গোপা সুরমার পরামর্শ মত নরেশকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল, নিজে নানারকম শিল্প কাজ লইয়া পড়িল।

সুরমা তাহার শিল্প বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলেন, নরেশের পড়ার ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। দীনেশকে পত্র লেখায় সে জানাইয়াছে যেমন করিয়াই হোক নরেশকে মানুষ করিতে হইবে, গোপার জীবন সব দিক দিয়া ব্যর্থ করা চলিবে না। অন্ততঃ পক্ষে একটা দিকও তাহার সফলতায় ভরিয়া দিতে হইবে। সে শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিতেছে, মাধব বাবু পলাশের বিবাহ জন্য গ্রামে ফিরিতেছেন।

পলাশের বিবাহ—

কাহার সহিত বিবাহ হইবে তাহা দীনেশ জানায় নাই, না জানাইলেও দীনেশের সহিত যে নয় তাহা জানিত কথা।

সুরমার আশা অপরিসীম,—তিনি এক দিন দীনেশের সহিত পলাশের বিবাহ দিবার আশা করিয়াছিলেন।

অথচ তিনি মুখ ফুটিয়া কোনদিন এ প্রস্তাব করেন নাই,—কি জানি যদি মাধববাবু প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু মাধববাবুর মুখ বন্ধ করিবার ক্ষমতা সুরমার আছে। সুরমা এমন কিছু জানেন যাহা প্রকাশ করিলে মাধববাবুর নাম খ্যাতি সব নষ্ট হইয়া যাইবে—সে কথা মাধববাবু জানেন। হয়তো সুরমা মাধববাবুকে রাজি করিতে পারিবেন, কিন্তু পলাশ,—সে কি সম্মত হইবে?

কে সাধ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে চায়, ধনীকন্যা ও শিক্ষিতা পলাশ স্বেচ্ছায় দরিদ্র দীনেশের গৃহে লক্ষ্মী রূপে আসিবে না এ জানা কথা—

এই কথাটা মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিবানীর কথা মনে পড়ে।

শিবানী—সে কিই না করিয়াছে? নিজেকে সব কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সমাজ সংসার হইতে স্বেচ্ছায় নিজেকে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু একদিন তাহার না ছিল কি?

মেয়েরা এমনই করিয়াই ভালো বাসিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লয়, এমন ভাবে আত্ম বিসর্জন করা কেবল মেয়েদের দ্বারাই সম্ভব। পলাশ যদি দীনেশকে সত্যই ভালো বাসিয়া থাকিত সে সব কিছুই ত্যাগ করিয়া আসিত।

কিন্তু দীনেশ তাহাকে ভালোবাসে!

মুখ ফুটিয়া কোনদিন সে ভালোবাসা প্রকাশ না করিলেও তাহার ভাবে বুঝা যায়। পলাশের অসুখ শুনিয়া ব্যগ্রভাবে ছুটিয়াছিল, মান অপমান কিছুই মনে করে নাই। তাহারই দুদিন আগে সে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কিছুতেই সে আর মাধববাবু বাড়ীর যাইবে না।

সে প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারে নাই, সে কেবল পলাশের জন্যই নয় কি?

জার্নালিজমের অ, আ, ক, খ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

খবরের কাগজে, এদেশে ও বিদেশে

আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলির এখনও শৈশবাবস্থা চলিতেছে। এখনও উহারা হাঁটিতে পারে না, হামাগুড়ি দেয় মাত্র। এই দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে পাঠক সংখ্যা নিতান্ত কম। দেশের যাহারা পয়সাওয়ালা একমাত্র খবরের কাগজ কেনাটাকেই তাহারা অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। শুধু মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকেরাই সংবাদপত্র পড়েন কিন্তু তাহাও সকলেই কিনিয়া পড়েন না। একবার কলিকাতার কোন খবরের কাগজের অফিসের দুয়ারে অসম্ভব ভীড় দেখিয়া অদ্ভুত কিছু দেখিবার আশায় অতিকষ্টে ভীড়ের মধ্যে মাথা গুজিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম গোটা পঁচিশেক মাথা অফিসের দেয়ালে টাঙ্গান পত্রিকাখানার উপর ঝুকিয়া আছে অথচ কিয়দ্দূরেই একজন ফেরিওয়ালা দুইপয়সা মূল্যে উক্ত পত্রিকা ছড়া কাটিয়া বিক্রয় করিতেছিল। রেলে ষ্টিমারে ও অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হয়ত আপনি এক-খানা সংবাদপত্র পড়িতেছেন হঠাৎ পেছন হইতে আর একটি মাথা আসিয়া উঁকি মারিল। ভাবটা যেন এই মোকা যখন পাইয়াছি আর অন্য কাজও যখন হাতে নাই দেখিয়াই লই কি আছে—সময়টাত কাটান চাই। কেহ কেহ আবার এমন নির্লজ্জ যে বলিয়াই বসে—"দিন না মশাই একখানা পাতা আমাকে।" এইরূপ অভদ্র আচরণ বড়ই অস্বস্তি জনক। ইউরোপে ধনীদরিদ্র সকলেই খবরের কাগজ কিনিয়া পড়ে, ধার করিয়া পড়িবার মত বেহায়াপনা সে দেশে নাই। এমন কি সে দেশে স্বামী-স্ত্রী বা পিতাপুত্র পর্য্যন্ত একই কাগজের ভরসায় বসিয়া থাকে না। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে আমাদের দেশে খবরের কাগজের কাটতি এত কম একথাটাও ষোল আনা সত্য নয়। আসল কথা, দুনিয়ার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখনও নিজেদের ধাত বদলাইতে পারি নাই। আমাদের মনের গতি কচ্ছপের মতই ধীরে চলিতেছে কাজেই যত কিছু আগ্রহ উদ্যম বেশীর ভাগ সময়ই ডানা গুটাইয়া বসিয়া থাকে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের মাথা পিছু আয় নিতান্তই নগণ্য বটে কিন্তু ইচ্ছা করিলে দুই পয়সা বা এক আনা দামের একখানা খবরের কাগজ কিনিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা এদেশেও যতগুলি আছে তাহার অর্দ্ধেক লোকও যদি খবরের কাগজ ক্রয় করাটাকে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের তালিকায় ফেলিত তবে কাগজগুলির চেহারা ফিরিয়া যাইত।

আমাদের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হয় কোন অখ্যাত গলির ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে, ছাপা হয় ততোধিক অপরিচিত গলির ভাঙ্গা টিনের চালার ছাউনিতে কিন্তু ও দেশের সংবাদপত্রগুলির আকাশচুম্বি বিরাট অট্টালিকাগুলির দিকে তাকাইলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের পরিচালিত কোন কোন সংবাদ পত্রের অফিসে ভাল টেলিফোনের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নাই কিন্তু ও দেশের প্রায় নামকরা কাগজেরই পাঁচ সাতখানা করিয়া এ্যারোপ্লেন পর্য্যন্ত থাকে, দ্রুত সংবাদ বহন ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য।

সংবাদপত্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর—গ্রাহক সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে সংবাদ পত্রখানা দুই পয়সা মূল্যে বিক্রয় হয় সেই আকারের একখানা সাদা কাগজের দামই কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পয়সা বা তাহার চেয়েও বেশী কাজেই বিজ্ঞাপন না পাইলে সংবাদপত্রগুলি টিকিবে কিরূপে? এই বিজ্ঞাপনের জোরেই বিদেশী কাগজগুলির ছাপা, কাগজ ও ছবি এত সুন্দর। কাজেই

সংবাদপত্রের উন্নতি দেখিতে হইলে আমাদের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের এই ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্দ্দশাই যে সংবাদপত্রের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ একথা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না কাজেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই যেমন উচিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার প্রসার বৃদ্ধি করা সেইরূপ সংবাদপত্রগুলিরও কর্ত্তব্য আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির কিরূপে উন্নতি হইতে পারে তাহার নব নব পন্থা নির্দ্দেশ করা। এই প্রকার পরস্পরের সহায়তায় দুইয়েরই অবস্থার উন্নয়ন হইতে পারে। অবশেষে আর একটি গলদের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব। আমাদের সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই কোন রাজনৈতিক দল বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি। কাজেই একমাত্র রাজনৈতিক মতবাদের মুখপত্র হিসাবেই এই গুলিকে জিয়াইয়া রাখা হয়। কিন্তু কেবল একঘেয়ে রাজনৈতিক কচকচি কিছুতেই বেশীর ভাগ লোকের মুখরোচক হইতে পারে না। সংবাদপত্র জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে সংবাদ সংগ্রহের অভিনবত্বের দিকেই নজর দিতে হইবে। এই দিক দিয়া বিদেশী সংবাদপত্রগুলির নিকট অস্মদ্দেশীয় সংবাদপত্র সেবীদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

ভারতীয় সংবাদ পত্রের গোড়ার কথা

সংবাদপত্র বলিয়া একটা কিছুর অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি রোমের ইতিহাসে। রোমে এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি গুলিকে বলা হইত "এ্যাক্টা ডিউর্ণা"। সহরের যে যে অংশে লোক সমাগম বেশী প্রতিদিনকার বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির এক একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই সব স্থানে লিখিয়া রাখা হইত। এই প্রথা রোমে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৯১ সাল হইতে প্রচলিত ছিল। গেজেট বলিতে আমরা সংবাদপত্রকেই বুঝি। এই গেজেট শব্দটাও ইতালীয়, একপ্রকার ইতালীয় মুদ্রাকে বলা হইত গেজেট, ইং ১৫৩৬ সালে ভিনিস সহরে সর্ব্বপ্রথম যে সংবাদপত্র বাহির হয় তাহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক গেজেট। ক্রমে পত্রিকার মূল্যই পত্রিকার নামে রূপান্তরিত হইয়া গেল। প্রকৃত সংবাদপত্র বলিতে এখন যাহা বুঝি আমাদের দেশে তাহার উদ্ভব ইংরেজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। এই সংবাদপত্র ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম বাহির করেন সার রজার এষ্ট্রেঞ্জ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে। ইহার নাম—পাবলিক ইন্টেলিজেন্সার। অবশ্য মোগল রাজত্বকালেও এদেশে একপ্রকার হস্তলিখিত খবরের কাগজ মাঝে মাঝে দেখা যাইত এবং এই জাতীয় খবর লিখিয়া সেইসময়ে আজিম উল্ ওমারহ ও মিরজা আলি বেগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদ পত্রের নাম বেঙ্গল গেজেট। ইহার প্রতিষ্ঠাতা জেম্‌স অগষ্টাস হিকি। ইহা বাহির হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা প্রচার। অশ্লীল বলিয়া কিছুদিন মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট কর্ত্তৃক ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট ইংরেজদের পরিচালনায় ইংরেজীতে সংবাদপত্র বাহির হইতে থাকে। ইং ১৮১৮ সালে দিগদর্শন নামে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহাও শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্ত্তৃক।

১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দই আমাদর ভারতীয় সংবাদ পত্রের তথা বাংলা সংবাদ পত্রের গোড়ার ইতিহাস।

এই সময়ে অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হয় তন্মধ্যে সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদভাস্কর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংবাদপত্র একটা চলতি দুনিয়ার জীবন্ত ইতিহাস। সেকালের এই সংবাদ সমূহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহের দ্বারা আমরা তদানিন্তন সামাজিক ইতিহাসের একটা কাঠামো খাড়া করিতে পারি। কিন্তু পুরাতন সংবাদপত্র ধ্বংসের কবল হইতে চিরদিন রক্ষা করা সহজসাধ্য নাহ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নাম দিয়া এই একশত বৎসর আগেকার সংবাদপত্রগুলি হইতে সংবাদ বাছাই করিয়া পুস্তকাকারে

প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সঙ্কলন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় তখনকার আর এদিনের সংবাদপত্রে কিরূপ আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদিও গবর্ণর জেনারেল মিঃ এ্যাডামস্ ১৮২৩ সালে কতকগুলি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া সংবাদপত্র পরিচালনাকে নিয়মাধীনে আনিয়াছিলেন তথাপি বলিতে হইবে একশত বৎসর আগেকার সংবাদপত্র নির্ভয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিত। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এই আইন সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে যে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সাময়িক ভাবে একটা জরুরী আইন করিয়া ফেলে। ১৮৩৫ সালে লর্ড এলগিনের সময়ে আবার এই আইনটি রদ করা হয়। সুযোগ বুঝিয়া দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রগুলি পুনরায় দ্বিগুণ বেগে মাথা নাড়া দিয়া উঠে। কাজেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন কর্ত্তৃক কেবল মাত্র দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির জন্য পৃথক ভাবে একটি মুখবন্ধ আইন পাশ হয়। ইহার পর হইতেই নানাপ্রকারে আইনের কড়াকড়ি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিংশশতাব্দীর রুষজাপান যুদ্ধের সময়ে পুণা ও কলিকাতার কয়েক খানা সংবাদপত্র, যেমন কেশরী যুগান্তর এমন উত্তেজনা পূর্ণ লেখা বাহির করিতে থাকে যে গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কা হয় দেশের লোক হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে কাজেই ১৯০৮ সালে সংবাদপত্র দমনের জন্য আরও কড়া আইনের প্রয়োজন হয়। এইবার যে প্রেশ এ্যাক্ট পাশ হয় তাহাতে যে কোন সময় প্রেস বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে রাখেন।

কিছুদিন পরে এই আইনটির কিছু সংশোধন হয় বটে কিন্তু পথ প্রদর্শকরূপে এই একটি আইন সংবাদপত্র জগতে একটা বিভীষিক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

বাংলার সংবাদপত্রের গোড়ার কথা বলিতে গেলে যে কয়জন মনীষির নাম সর্ব্বাগ্রে এবং সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিতে হয় তাহাদের নাম—রামগোপাল ঘোষ; হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, এন ঘোষ এবং বিপিন চন্দ্র পাল। সংবাদপত্র জগতে ইহাদের শূন্যস্থান এখনও পূরণ হয় নাই।

চলবে

ক্ষণিকের

উপেন্দ্র গাঙ্গুলি

ক্ষণিকের যদিও জীবন
　　এরি মাঝে কত পরিচয়,
ক্ষণিকের দরশনে হেথা
　　হয়ে যায় চিত্ত বিনিময়।
ক্ষণিকেই লাগে কারে ভাল
　　কেহ রহে চিরদিন পর,
নিকটে যে থেকে যায় দূরে
　　দূর আসে প্রাণের ভিতর।
কোন সুরে সাড়া দেয় প্রাণ
　　কার বাঁশী করে যে ব্যাকুল,

নাহি জানি, বুঝি না কিছুই
　　নিমেষেতে বিশ্ব হয় ভুল।
রঙে প্রাণে ছবিখানি তার
　　মনোহর নবীন সুন্দর
কি আনন্দে নেচে উঠে বুক
　　ধমনীতে রক্ত উষ্ণতর।
ক্ষণিকের যদিও জীবন
　　প্রেম জয়ী মৃত্যুর উপর,
দেহখানি হয় মাত্র নাশ
　　আত্মা চির অজর অমর।

ভারত শিল্পের নবধারা

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

(হ্যাভেল ও অবনীন্দ্র নাথ)

ভারতীয় শিল্পকলার নবযুগ আরম্ভ হয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে। কিন্তু এর মধ্যেই তার গতি এবং উৎকর্ষ দুয়ের বিষয়েই নানারূপ কথা বার্তা আরম্ভ হয়ে গেছে। এরূপ আলোচনা হওয়া মন্দ নয়। কেউ কেউ আজকাল বলছেন যে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা নাকি খেই হারিয়ে ফেলেছেন, সকলেই দিশেহারা হয়ে নিজের নিজের পথ খুজে বেড়াচ্ছেন। এই পথ খোঁজাই যে শিল্পীর কাজ তা বোধহয় তাঁদের জানা নেই। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ কবি ভাসের একটি শ্লোকের তর্জ্জমা করেছিলেন—

'সুলভ জগতে সুকাজ করার লোক
দুর্লভ শুধু তাহা দেখিবার চোখ।'

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকেরা আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রগতির কিছুই খোঁজ রাখেন না, এদিক ওদিক থেকে দুটো কথা শুনে আর মাসিক পত্রিকাতে ছবি দেখে যে রকম অবুঝ ও নির্দ্দয় ভাবে কলম চালাতে থাকেন তাতে যারা যথার্থ কর্ম্মী তাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। এই মাত্র ক বৎসর হল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তুলিকার জিয়ন কাঠি দিয়ে নিদ্রামগ্না ভারতীয় শিল্পকলাকে জাগিয়ে তোলার উদ্যোগ করলেন। তখন তাঁর সহায় ছিলেন একমাত্র একজন বিদেশী শিল্পসেবী, Mr. E. B. Havell। তিনিই সর্ব্বপ্রথম অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে অসাধারণ শিল্পীর ক্ষমতার সন্ধান পান। তার পর অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠিরা যে কত রকম ঝড়ঝাপটা সহ্য করে এই নবীন উদ্যমকে জাগিয়ে রাখেন তা সে সময়কার মাসিক পত্রিকায় পাতার তীব্র সমালোচনাগুলি উল্টে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। তার আগে রবিবর্ম্মা প্রভৃতি অনেক শিল্পীরাই বিদেশীয় চারু শিল্পের ধারা ভারতে চালাতে চেষ্টা করেন। Calcutta Art Studio এবং Art Schoolএ এ বিপুল উদ্যমে দিনকতক অনেকেই এই দিকে মন নিবেশ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ভারতীয় মাটীতে ও ভারতীয় আবহাওয়ায় বিদেশী আর্টের বীজে আর অঙ্কুর জন্মালনা। শেষে দেখা গেল যে তাঁদের সকল চেষ্টাই বৃথা।

অবনীন্দ্র নাথের আগে ভারতীয় শিল্পী ভারতীয় পন্থা অবলম্বন করে আঁকতেন কাংড়ার মোলারাম। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে। তার পর রাজনৈতিক অশান্তির জন্য বিশেষ কোন নামী শিল্পী দেখা যায় না। ইংরাজের রাজত্বেও তখনও ভারতীয় শিল্পের কোন প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা হয় নি। অবনীন্দ্রনাথও ছেলেবয়সে তখনকার প্রথা অনুযায়ী বিদেশী ধরণে ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন ঐ প্রকার এঁকে যাবার পর Havell সাহেব তাঁর মধ্যে একটি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব দেখতে পান এবং নানা প্রকারে তাঁকে উৎসাহ দান করেন তাঁর নূতন ভারতীয় শিল্পধারার পথে। এই ভাবেই আমাদের আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার (Neo Bengal School) গোড়া পত্তন হয়। তার পর অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ঐ নবীন মন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য তাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল বসু, ৺ সুরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী; অসিত কুমার হালদার; সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্র নাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্র নাথ দে ও ভেঙ্কাটাপা। যুক্ত প্রদেশ থেকে শিখতে যান হাকিম খান ও শমীউজ্জমা। এঁরা পরে কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে আঁকা ছেড়ে দেন। কিন্তু অন্য সব ছাত্ররাই ভারতের এক একজন কৃতী শিল্পী হয়ে ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষের জন্য নানা রূপে যত্নবান হন।

নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদার ১৯০৯ সালে অজন্তার ছবির নকল করতে যান। তখন এদেশের লোকের প্রাণে আর এক নূতন উৎসাহের সাড়া পড়ে

গেল। তার আগে দেশে যে অজন্তার মত শিল্পপীঠ আছে সে সংবাদ তখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও খুব কম লোকেই জানতেন। ঐ শিল্পীরা বাংলার মাসিক পত্রিকায় অজন্তার চিত্রের বিষয় লেখেন ও সেই সময় হতেই অজন্তার বিষয় দেশের জনসাধারণ জানতে পারেন। তার পর অবনীন্দ্রনাথের ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠির কাছে শিক্ষালাভ করেছেন অনেকেই এবং তাতে নবীন প্রথাবলম্বী শিল্পী সম্প্রদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলায় যা করলেন তা সমগ্র ভারতের শিল্পের জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করলে। তার আগে বিদেশী শিল্পরসিকদের কাছে ভারতীয় শিল্প বলতে বোঝাত কারুকলা, চারুকলা নয়। অর্থাৎ তারের কাজ, মীনার কাজ; কাপড়ের ওপর ছাপা ও নক্সার কাজ প্রভৃতি। আমাদের দেশের লোকের কিন্তু তখনও চোখ খোলেনি। আমরা সে সময় রবিবর্মা প্রভৃতির ছবিকেই আসল চিত্রকলার নিদর্শন বলে ধরে নিয়েছিলুম। কিন্তু যাঁরা ছিলেন সত্যকার সমঝদার তাঁরা তা মনে করতেন না। তখন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা বা চারুকলা পর্বত কন্দরে নিদ্রিত ছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগোষ্ঠিরাই বাগগুহা; অজন্তা, যোগীমারা গুহা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি শিল্পকাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পর তাঁরা ফিরে এসে স্ব স্ব সৃজনী শক্তি দিয়ে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করে গেছেন।

আজকাল একদল লোক বলছেন যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দ স্বদেশীর হুজুগে মেতে জাতীয়তার ঢেউয়ের সঙ্গে শিল্পচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং নিজের দেশের মহত্ব দেখাবার জন্য তাঁরা classical ও পৌরাণিক ছবিই এঁকে গেছেন, এবং সে ধারা এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। আচ্ছা আমি বলি, যদি তাই হত তা হলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শিল্প কলা ভারতের নানা কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ত কি? না তা সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত? তা ছাড়া হুজুগে মেতে কখন শিল্প কলার চর্চ্চা হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব সাপেক্ষ।

দেশী সাবান, খাদি কাপড় ইত্যাদী স্বদেশী আন্দোলনে জন্মাতে পারে মাত্র। এ ক্ষেত্রেও যে তা হয়নি তা আমরা তখনকার দুএকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে বেশ বুঝতে পারি। যখন হ্যাভেল সাহেব সর্ব্ব প্রথম Calcutta School of Arts এ ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্প শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন তাতে ঐ স্কুলএর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই একযোগে স্কুল পরিত্যাগ করে চলে যান। অবনীন্দ্রনাথ যে জাতীয়তার যুগেই ভারতীয় শিল্পে নবযুগ আনেন সে একটি কাকতালিয়বৎ ব্যাপার (coincidence) মাত্র। যার কারণে হয়ত কারু মনে ঐ রূপ ধারণা হয়েছে। আমরা যদি একটু চোখ খুলে দেখি তা হলেই দেখতে পাব যে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প শিক্ষা করতে এসে কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন নি। তাঁর গড়া শিল্পীরা শুধু এক অজন্তা বা classical ধরণে এবং পৌরাণিক ছবিই এঁকে জাননি। অজন্তার বা classical ধরণে কেউ যে কখনই আঁকেন নি সে কথাও যদিও ঠিক নয়। আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারত যেমন মহাকাব্য, সাহিত্যচর্চ্চার এ গুলি যেমন প্রধান অঙ্গ তেমনি ভারতীয় শিল্প চর্চ্চাতেও অজন্তা বা অন্য পুরাতন ছবির চর্চ্চা না করে কখনো কারোর শিল্প শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখতে গেলে দেশের প্রাচীন শিল্পীদের কাজ জানা আগে দরকার। তাই আমাদের ভারতের প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর শিল্পী জীবন আরম্ভ করবার আগে ঐসব চিত্র গুলির ভাল ভাবে আলোচনা করে থাকেন।

আমরা যদি একটু সূক্ষ্ম বিচার করে দেখি তা হলেই দেখতে পাব যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য গোষ্ঠির মধ্যে এক একজনের সহজ শক্তি বা ব্যক্তিগত ভাব কেমন সহজেই ফুটে উঠেছে তাঁদের কাজের ভিতরে; তার প্রমাণস্বরূপ আমরা প্রথমেই বলব নন্দলালের কথা। তাঁর প্রাণের সুর প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের সহিত এক পর্দ্দায় বাঁধা। তাই তিনি ফুটেছেন decorative ও পৌরাণিক ছবির মধ্যে দিয়েই। নন্দলাল প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন ছবির সহিত যোগ রেখে নিজের পথ খুঁজে নিয়েছেন। তিনি ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর পৌরা-

নিক চিত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে যথা—নটরাজ, সতীর দেহত্যাগ, শিবের বিষপান ইত্যাদি। তারপর বলা যায় অসিত হালদারের কথা। তিনি রামগড়, অজন্তা বাগগুহা প্রভৃতি নন্দলালের সঙ্গে একসঙ্গে চর্চা করলেও নিজেকে প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির ভিতরকার নিত্যরহস্যের মধ্যে দিয়ে। যথা 'নিরুদ্দেশ যাত্রী', 'বর্ষা', 'রহস্যময় ওক্তি' ইত্যাদি। আমাদের যত দূর জানা আছে তিনি প্রথম ছবিই আঁকেন 'মন্দির পথে' 'প্রতীক্ষায়' তখনকার ভারতী পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। তেমনি ক্ষিতীন্দ্র নাথ তাঁর চিত্রে বৈষ্ণব ভাব ও decorative ভাবের মাধুর্য্য বিতরণ করেছেন। তাঁর মত বৈষ্ণবরস সফল ভাবে ফোটাতে আর কেউ পারেন নি। শৈলেন্দ্রনাথের প্রতিভা ফুটেছে কাংড়া পদ্ধতির শিল্পকলা অনুসরণ করে, বিশেষ করে মেঘদূতের চিত্রাবলি এঁকে। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা করে চোখ খুলে দেখা উচিত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সকল প্রকার প্রতিভাই বিদ্যমান ছিল। তাঁর 'মৃত্যুশয্যায় শাজাহান যেমন শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের শেষ সময়ের ছবি প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, তাঁর 'শেষ যাত্রা' যেমন দুর্লভ করুণ রসের সৃষ্টি করেছে, তেমনি 'শিব সিমন্তিনী'তেও উমার মুখে দেবভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে। এই প্রকার সকল গুণ থাকার জন্যই তিনি ভারতীয় শিল্পে নবযুগ আনতে পেরেছিলেন, এবং তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর এক একটিকে এক এক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

আজকাল শিল্পসমাজে যে যা করছেন তার বীজ সর্ব্বপ্রথমে বপন করেন অবনীন্দ্রনাথ। যে বীজ বপন করে গেছেন সেই বৃক্ষ এখন অন্যান্য শিল্পীর যত্নে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও নানা ফলফুলে সুশোভিত হবে। শিল্প কলার প্রত্যেক পূজারীকেই আজীবন কাল ধরে experiment কোরে যেতে হবে। Art মানেই experiment, Art বেঁচে থাকে experiment এর মধ্যে দিয়ে। হয়ত তাঁরা অনেকেই নূতন নূতন পথের সন্ধান পাবেন তা বলেকি তাঁরা ভারতীয় শিল্পে নবযুগ এনেছেন বলে দাবী করতে পারেন? অবনীন্দ্র নাথের শিষ্য গোষ্ঠী এবং তাঁদের অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ অনেকেই এখন ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষের জন্য যত্নবান হয়েছেন, এবং তাঁরা নূতন নূতন পথও পেয়েছেন অনেকেই। তা বলে লক্ষ্ণৌয়ের একজন শিক্ষক বা শান্তিনিকেতনের একজন শিক্ষক বা Bombayর Solomon সাহেব সকলেই যদি শিল্পকলার অধিনায়কতার দাবী করেন সেটা কি ঠিক হবে? অবনীন্দ্রনাথের রোপিত বৃক্ষে যত শাখা বিশাখা বহির হবে তার শিকড়ও তত বেশী দৃঢ় হতে থাকবে। তিনি অমর হয়ে থাকবেন তাঁর শিষ্য উপশিষ্য নাতিশিষ্য এবং এই রূপ শিষ্য পরম্পরায়ের কাজের মধ্যে দিয়ে। বুদ্ধ বুদ্ধই থাকেন, আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যেরা বুদ্ধের কোঠায় বসতে কখনই পারবেন না। এ ক্ষেত্রেও তাই নয় কি?

লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত বিদ্যালয় যখন প্রথম খোলা হয় তখন অনেকেই পণ্ডিত ভাতখাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই সব লোক যাদের গান গাইবার গলা মোটেই নেই তাদের গান শেখানোর ফল কি? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন গান শিখলে বুঝবে গানে কি আছে, নইলে গান আর গলা বাজি একই মনে হবে।' গান বোঝার পক্ষে যেমন শিল্প কলা বোঝবার পক্ষেই ঠিক সেইরূপ। সেই জন্য একটা শিল্প শিক্ষাকে 'ওতে কিছু নেই" বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। আজকাল অনেকেই ধরে নিয়েছেন বাঙলার নবশিল্পকলা অর্দ্ধপথে স্রোত হারাইয়াছে আপনার বিকাশের নূতন নূতন পথ খুঁজিয়া লইতে পারিতেছে না। অনেকে নিজের দেখার শক্তি না থাকায় কতগুলি ভাষার ঝঙ্কারের দ্বারা শিল্পসমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অনেকে হয়ত অবনীন্দ্রনাথের কৌশলটুকু জানতে চেষ্টা করে বসেছেন, অনেকে বা তাঁর শিষ্যেদের পন্থা অনুসরণ বা অনুকরণ করে চলেছেন। সেটা ব্যক্তিগত শিল্পীর শিল্পকলার উন্নতির পথে বাধা হতে পারে কিন্তু দেশের শিল্পকলার পথে অন্তরায় হতে পরে না। ভালমন্দ সবই আছে এ পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভারতীয় নব শিল্পকলার আন্দোলনের মধ্যে তা বলে এখন থেকেই বিলাপ আরম্ভ করে দিলে সেটা নেহাত প্রলাপ বলেই গণ্য হবে। এখন কি ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতি হতে পারে সেই বিষয়ে যদি মাসিক পত্রিকা গুলিতে আলোচনা আরম্ভ

হয় তা হলে সত্যই দেশের শিল্পকলার কিছু উপকার হতে পারে।

আমি লেখক নই, বড় শিল্পীও নই। আমার কথার মূল্য আমি জানি খুবই কম। কাউকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে কোন ছবি দেখে যদি তার শুধু কোথায় দোষ সেইটেই দেখিয়ে দিতে পারেন তা হলেই তিনি হয়ে পড়বেন একজন critic কিন্তু critic আসলে তিনি। যিনি শিল্পকলার ভিতরে কোন রসটুকু আছে সে টুকু দেখিয়ে দিতে পারেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন। যিনি তা পারেন না তিনি রসিক নন এবং তাঁর কোনও অধিকার নেই শিল্পকলার সমালোচনা করবার।

প্রতীক্ষা

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

কত জন পথ চেয়ে
বসিয়া আছে,
আছে মথুরা বৃন্দাবন
সখী সাথী কত জন;
পথ চেয়ে চেয়ে রাধা
নয়ন মোছে
কত জন পথ চেয়ে
বসিয়া আছে।
খুলে ফেল সখী মোর
বাঁধা কবরী।
জল নিতে যাব কি-লো
ভাঙ গাগরী
এ-বলয় এ-হার
জালে জালা অনিবার
কঠিন শিকল সম
অঙ্গে বাজে
আঁচল খুলিয়া রাধা
নয়ন মোছে।

এমনি সাঁজের বেলা
আবির খেলায়।
মেতেছিনু দুঁহু মোরা
কদম তলায়।
কতকাল কেটে গেল
রাতে চাঁদ ঢল ঢল
সাঁজের সলাজ রাগ
পরাণে বাজে।
পথ পানে চেয়ে রাধা
নয়ন মোছে।
বুঝেছি বুঝেছি সখী
চতুরালি তার।
রাধিকার মন চুরি
হোথা অভিসার।
ভুলিতে সে নিরদয়
শপথ করি যে হায়।
তবু হেরি দিবানিশি
হৃদয় মাঝে।
পথ চেয়ে চেয়ে রাধা
নয়ন মোছে।

বীমার কথা

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিউট নামক একটি বীমা সঙ্ঘ কিছুদিন পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া স্বদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির স্বপক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইতেছিল, অধুনা ইহার বিশিষ্ট সদস্যদিগের মধ্যে তীব্র মতান্তর চলিতেছে—কার্য্যকরী সদস্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ নাকি এই সমিতিকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ইহা সত্য হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই—কলিকাতার বীমাক্ষেত্র দলাদলির জন্য ইহার মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে; বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতের মিল না থাকিলেও মনের মিল যে বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না সুতরাং এইরূপ বীমা সঙ্ঘগুলি এই অন্তকলহের অনেক ইন্ধনই প্রদান করে।

—

কলিকাতায় এক যোগে দুইটি বীমা শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠায় কর্ত্তৃপক্ষের বীমাশিক্ষা প্রদান করা অপেক্ষা অন্য প্রকার উদ্দেশ্যের কথা ও বীমাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মনে উদিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দুইটির একযোগে আবির্ভাবের ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতা বা কলহের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ কলহে বহু মানী ব্যক্তির বিশেষ অপমান ঘটায় সুতরাং তাঁহারা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে অধুনা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না।

—

বাংলাদেশে আর একটি বীমাসঙ্ঘ গঠন করিবার আয়োজন চলিতেছে—এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রাথমিক সভাও হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন এই সঙ্ঘটিকে বিশেষরূপে প্রতিনিধিমূলক করিবার আয়োজন করেন—বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তির একত্রে সমাবেশে সঙ্ঘটি যেন নীচ মনোবৃত্তির হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ইনষ্টিউট স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই শুধু আত্মকলহ বা দলাদলির জন্য। যাঁহাদের হাতে পরিচালনের ভার পড়িয়াছিল তাঁহারা দলাদলিতে বিশেষ লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সঙ্ঘটিকে সম্মুখভাগে রাখিয়া নিজেদের প্রচার কার্য্য ক্রমাগত চালাইতেছিলেন।

—

মফঃস্বলে বীমার কাজ করিতে যাইয়া দেখিতে পাই অসাধু দালালগণ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া বীমাপত্র বিক্রয় করিতেছে—অশিক্ষিত পল্লীবাসী চতুর দালালের প্রলোভনে সহজেই ধরা দিতেছে—পরে ভুল বুঝিয়া কোম্পানীর নিকট যখন এই সমস্ত ঘটনা জানাইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করিতেছে—তখন কোম্পানী এই বিষয়ে নিরুত্তর। দালালদিগের কার্য্য কলাপের প্রতি তাঁহারা কি যথোচিত লক্ষ্য রাখেন? অসাধু উপায়ে তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালককে কি বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন; তাহা করিলে বাতিল কাজের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যাইবে এবং বীমাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতারও অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

—

নবগঠিত কোম্পানীগুলির বাতিল কাজের পরিমাণ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। অযোগ্য হস্তে কার্য্য পরিচালনার ভার যে ইহার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—অনেক কোম্পানী লজ্জাবশত উদ্বৃত্তপত্রে বাতিল কাজের পরিমাণ প্রকাশিত করেন না। তারপর সংবাদ পত্রগুলিকে বিজ্ঞাপন দিয়া করায়ত্ত করিয়া নিজেদের জয়গান প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রচার কার্য্য বেশীদিন চলে না—দাবীর টাকা প্রদান করিতে অক্ষমতা বা বিজ্ঞাপনের দাম দিতে বিলম্ব করিলেই প্রকৃত অবস্থা সাধারণের প্রচার হইয়া থাকে। সরকারী একচুয়ারী বার্ষিক বীমাপুস্তকে নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক সতর্কতার বাণী জানাইয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে কে কর্ণপাত করে?

—

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী সম্প্রতি ঢাকায় একটি শাখা আফিস খুলিয়াছেন। এই আফিসের উদ্বোধন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ও ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকা গিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট লোক ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের মত কোম্পানীর কোন শাখা কার্য্যালয় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সহরে ছিল না—এইবার সে অভাব পূরণ হইল ইহা সুখের কথা।

ছায়ার কথা

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

বিদ্রোহী—বিদ্রোহী ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর একখানি মধ্যযুগের বীরত্ব ও আদিরস পূর্ণ আলেখ্য। প্রযোজক ধীরেন বাবু গল্পটীকে খুব ভাল ভাবে চিন্তা করিয়া গ্রথিত করিতে পারেন নাই বলিয়াই ছবি খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে নাই। বিদ্রোহী অর্থে একজন রাজপুত যুবক দেশের রাজার অত্যাচারে দেশকে জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে সে দেশের জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিবে এবং দেশকে অত্যাচার-মুক্ত করিবে। রাজ্যের রাজা ছিলেন বিলাস-পরায়ণ। সুরা ও নারী ছিল তাহার হৃদয়ের একমাত্র কাম্য বস্তু। এই অস্বাভাবিক ইন্ধনে খোরাক যোগাইবার জন্য তাঁহার সেনাপতি প্রজাগণের রক্ত শোষণ করিতেন এবং এই জন্যই দেশে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইত।

গল্পটী যেরূপ দাঁড় হইয়াছিল তাহাতে বিদ্রোহী বীরকে অনেকটা Wallace Berry র Viva Villa এর ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলা উচিত ছিল। প্রযোজক মহাশয় কিন্তু গল্পের Synthesis রক্ষা করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া উহাতে একখানি ভালবাসার আলেখ্য লাগাইয়া আবার একটি Love triangle বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দুই নারীর একটি পুরুষ বা বিদ্রোহী বীরের প্রতি ভালবাসার প্রভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দুইটী ভাবের আদান প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাতে গল্পের অংশ বেশ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ইন্দুবালা-চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর ভাঁড়ামী এবং তাহাদের সঙ্গীত চর্চ্চা বেশ উপভোগ্য হইলেও গল্পের আখ্যান বস্তুর সহিত খাপ খায় নাই। আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে ইন্দুবালার গানগুলি সুগীত এবং সাধারণ দর্শক তাহা উপভোগ করিতে পারে।

চিত্রপটের সাজ সজ্জা ভাল। পোষাক গুলির পরিধান করিবার ঢং ভাল। Make-up নেহাৎ মন্দ হয় নাই। Set গুলি খুবই সুন্দর এবং সকলের উপর ভাল হইয়াছে উহার Location shot. এই ফটোগুলি জয়পুর ও অম্বরে গৃহীত। অম্বরের নূতন ও পুরাতন কেল্লা, অম্বরের প্রসিদ্ধ কালী মূর্ত্তি যাহা বাংলা হইতে মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছিল, ইত্যাদি অনেক বাস্তব দৃশ্য চিত্র ফলকে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ছবিখানির ফটোগ্রাফি খুবই সাবলীল। উহার আলোক তরঙ্গের স্বাভাবিক লীলাতরঙ্গ এবং ভাবের আদান-প্রদানের সহিত বেশই খাপ খায়। যুদ্ধের দৃশ্যটী মনোরম হইয়াছে। বাংলা ছায়াচিত্র জগতে ফটোগ্রাফির যেরূপ উন্নতি হইতেছে, এই ছবির যুদ্ধ-দৃশ্য তাহার একটি জলন্ত নিদর্শন। এতদিন পর্য্যন্ত বাংলার ফটোগ্রাফি ক্ষেত্রে নিউথিয়েটার্শ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিন্তু বিদ্রোহীর আলোক গ্রহণ দেখিয়া বোধ হইল তাঁহাদের সে দাবী আর স্থায়ী রহিল না, কেন না বিদ্রোহীর আলোক-গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই নিউ থিয়েটার্সের Standard কে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই জন্য আমরা আলোক-শিল্পী প্রবোধ দাসকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শব্দ গ্রহণ সুন্দর না হইলেও মন্দ হয় নাই। কয়েক স্থলে শব্দের উচ্চারণের সহিত মুখের গতির সামঞ্জস্য নাই। এই out cf sychronisaticn অবশ্যই দোষের। অন্যান্য দোষ যথা ground noise or metallic sound থাকিলেও খুবই কম এবং বিশেষজ্ঞ দের কাণ ছাড়া তাহা ধরা পড়ে না এই জন্য সাধারণ দর্শকের তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। ছবিটীর tempo বা স্বচ্ছন্দ গতি অত্যন্ত ধীর। Direction ও বহু পুরাতনী কায়দায়, উহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

তবু আমরা ছবিখানিকে পছন্দ করি। সাধারণ শ্রেণীর অপেক্ষা ইহা উন্নত শ্রেণীর। সাধারণ দর্শক ছবি

খানি দেখিলে নিছক আনন্দ পাইবেন একথা জোর করিয়া বলিতে পারি।

চন্দ্রসেনা—প্রভাত ফিল্ম কোম্পানী পুনার চলৎ-চিত্র গ্রহণকারী একটী ব্যবসায়ী দল। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষে সকল কোম্পানীর শীর্ষ দেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান বর্ষে তোলা তাঁহাদের অমৃত-মন্থন এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি। সম্প্রতি তাঁহাদেরই একখানি ছবি চন্দ্রসেনা ভারতলক্ষ্মী হাউসে দেখান হইতেছে। ছবিখানি নিছক পৌরাণিক চিত্র। উহাতে পুরাণের সমস্ত ঘটনাগুলি অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া উহার এক অভিনব বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। আখ্যানবস্তু খুবই সাধারণ। মহি ও অহি পাতাল পুরীর রাজা ছিলেন এবং তাঁহারা সখ্য-সূত্রে মর্ত্তের রাবণ রাজার সহিত আবদ্ধ ছিলেন। রাবণ যখন অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন তখন তিনি এই অধীনস্থ নৃপতিদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। তাহার ফলেই মহি অহি রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যান। মহির স্ত্রীর নাম ছিল চন্দ্রসেনা। সে গন্ধর্ব্ব কন্যা। সে রাম-লক্ষ্মণের ভক্ত ছিল। হনুমান যখন রামের সন্ধানে পাতাল-পুরীতে গমন করেন, তখন এই চন্দ্রসেনা হনুমানকে সাহায্য করে। এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া পাতাল-পুরীর একটী কল্পনা পূর্ণ আলেখ্য এবং তাহার সহিত পাতালবাসী রাক্ষসদের আচার ব্যবহার ও উহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক চাল-চলন অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

সাজ-সজ্জা ও set এর দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে চিত্র-খানিকে নিখুঁত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। আলোক চিত্রগ্রহণও প্রথম দিকে দোষ যুক্ত হইলেও, শেষের দিকে বেশ সুন্দর হইয়াছে। Trick Photography বেশ নির্দ্দোষ। হনুমানের শূন্যে গমন, হাঙ্গরের পিঠে চড়িয়া পাতালপুরী গমন, হনুমানের লাঙ্গুল বৃদ্ধি করণ ইত্যাদি দৃশ্য সাধারণকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিবে।

চরিত্র অঙ্কন খুব সুবিধা জনক না হইলেও যে শিক্ষিতা মহিলাটি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন তাহার অভিনয় বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছে। রজনী নামক আর একটি মহিলাও সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। সুরেশবাবুর রাম আদপেই দৃষ্টি মধুর হয় নাই। ছবিটীর tempo ভাল এবং Direction বেশ উপভোগ্য।

সাধারণ হিন্দু যাঁহারা পুরাণের আলেখ্যগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা অলৌকিক ঘটনার চাক্ষুষ অভিনয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই চিত্রটি দেখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবেন। ইহার ভাষা হিন্দি হইলেও উহা খুবই প্রাঞ্জল সাধারণ বাঙ্গালীর বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

গান

কাদেব নওয়াজ

(তারে) চোখে চোখে রাখি, হৃদে ছবি আঁকি
ভালবাসি নিশিদিন
(তার) কুটিলের আঁখি, তবু দেয় ফাঁকি
তাই আমি উদাসীন।

(কভু) স্বপনের সাথে, দেখি তারে রাতে
প্রভাতে মিলায়ে যায়
(সে যে) আলেয়ার আলো, তবু লাগে ভালো
সদা তারে হৃদি চায়

(কবি) আজো তার পিছে, ঘুরিতেছে মিছে
বাজায়ে প্রাণের বীণ
(সে যে) ধরা নাহি দেয়, স্বপনে মিলায়
রাখিয়া স্মৃতির চিণ



সিদ্ধার্থের আবির্ভাব

প্রতীচীকা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র এম্-এ

[বর্ত্তমান কবিতার লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন কৃতী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। সুরেশ্বর শর্ম্মা এই ছদ্ম নামে ইহার বহু কবিতা সাময়িক পত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বহু সাহিত্য সভায় বিদ্বজ্জন সম্মিলনে ইহার ব্রাউনিং, আলডুস্ হাকসলি প্রভৃতির অনুবাদ রচনা পঠিত হইয়াছে। ভাবৈশ্বর্য্য অতুলনীয় এই সব কবিতার বাংলা রূপ দেওয়া যে কত কঠিন তাহা এ পথে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। সুরেন্দ্র বাবুর কবিতা ও নানা বিচিত্র রচনা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।]

বরণ

(D. G. Rossetti র The Choice হইতে)

কর চিন্তা, কর কাজ, আজ বাদে কাল মৃত্যু হ'বে।
তপ্ত রবি করে তনু প্রসারিয়া সিন্ধু সিকতায়
কহিতেছে—"মানবের যাত্রাপথ যখন ফুরায়,
বহুবর্ষে বহুশ্রমে গিরিশৃঙ্গে পঁহুছায় যবে
তখন সে নিঃসংশয় সত্যের সাক্ষাৎ স্পর্শ লভে,
সত্য ধরা দিবে মোরে,আছে সে আমারি প্রতীক্ষায়"
তুমি কি গো মহত্তর ক্ষেত্রে যারা ফসল ফলায়
তাহাদের চেয়ে, তাই কর্ম্মফল ল'বে সগৌরবে ?

তাহা নয়, এস উর্দ্ধে মোর সাথে, সিন্ধুপ্রক্ষালিত
এই গিরিতট হ'তে দিগন্তে নীলাম্বু যেথা লীন
চেয়ে দেখ; চিন্তা তব সিন্ধুনীরে হ'বে কবলিত
উড়িতে না পারি আর সে অসীমে কূলবন্ধহীন।
আত্মা তব ভরাপালে লঙ্ঘিবে যোজন অগণিত,
তবু সিন্ধু সীমাহারা অনুত্তার্য্য র'বে চিরদিন।

প্রেমান্ধ

(Alfred Austin এর Love's Blindness হইতে)

ভালবাসা করে অন্ধ বুঝেছি এখন।
তুমি যবে দূরে যাও শোভাময়ী ধরা
হারায় মাধুরী তার, সব যেন মরা,
—নাই আলো, নাই আশা, আনন্দ স্পন্দন,
তোমার অভাবে দীপ্তি হারায় তপন,
বসন্ত যৌবন হারা, গ্রীষ্ম শুধু খরা
মনে হয় কুহুরব যেন অশ্রুভরা,
প্রাচুর্য্যের মাঝে শূন্য হেরি ত্রিভুবন।

তুমি যবে কাছে এস, মথিয়া আঁধার
নিশান্তে অরুণালোক আনে তব আঁখি,
প্রতি তরুশাখা পরে গায় যেন পাখী,
স্বর্গে মর্ত্তে ভেদাভেদ থাকেনা ত আর;
নন্দনে উন্নীত হই এ ধরায় থাকি
সকলি মধুর করে মাধুরী তোমার।

লেখক

(Walter de La Mare এর The Scribe হইতে)

পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র সে সরোবর,
তার তীরে বসি সে দিঘীর কালোজলে
লেখনী ডুবায়ে লিখে যদি মোর কর,
—কত বিস্ময় আছে এই ধরাতলে,
বাসনা কেমনে সৃজনে মূরতি ধরে,
—লিখিতে লিখিতে অযুত বর্ষাবলি
পলাবে শব্দবিহীন পক্ষভরে,
শুকাবে সে মসী-সরসীর কজ্জলি,
জীর্ণ লেখনী ভাঙ্গিয়া পঙ্গু হবে।
লিখিবার যাহা ফুরাবে না জানি তবু,
অকথিত বাণী স্মরণে নাহিক রবে,
রব আমি আর তুমিও রহিবে প্রভু।

গিরিশৃঙ্গে

(Rupert Brocke এর The Hill হইতে)

ভূধর শিখরে উঠি পথশ্রান্ত মোরা দুজনায়
লুটায়ে পড়িনু ঘাসে, ফুল্লমনে সে আলো বাতাসে,
চুমিলাম তৃণরাজি। বলেছিলে, "গৌরবে উল্লাসে,
মোদের এ জয়যাত্রা; আছে আলো, আছে মধু বায়,
আছে ধরা, গায় পাখী; তারপর বুড়া হব যবে—"
"মৃত্যু সব ল'বে হরি' মোদের রবেনা কিছু আর।
তবু অপরের প্রেমে জীবন অমর হয়ে রবে।"
কহিনু, "পরাণপ্রিয়, স্বর্গ হেথা দখলে দোঁহার।"
"এ ধরায় শ্রেষ্ঠ মোরা, শিক্ষা তার লভেছি হেথায়
তাইত উদ্‌গাতা মোরা জীবনের, মোরা সত্যকাম,
কুসুম মুকুট শিরে যাব ফিরে আঁধার যেথায়
দুজনে অকুতোভয়ে"—গর্ব্বভরে দোঁহে কহিলাম।
অধরে ফুটিল হাসি নিঃশঙ্ক সত্যের উচ্চারণে।
সহসা ফিরালে মুখ তারপর উদ্বেল ক্রন্দনে।

কালবৈশাখী

(Willam Henry Davies এর Thunderstorms হইতে)

কাল বৈশাখী ধরিছে আমার বুক,
মরে গুমরিয়া বহু বেদনার ভারে,
মুখর প্রলাপে খুলে যায় তার মুখ,
করে ঝরাফুল মূকপাখী,—চিন্তারে।
তবু ডাকি এস ঝঞ্ঝা অশনি ভরা,
ভাবনা নিঝুম মেঘের বাঁধন টুটি,
জানি বাণী তব হবে সুধা নির্ঝরা
গীতে সৌরভে চিন্তা উঠিবে ফুটি'।

পরিহার

(Alice Meynell এর Renouncement হইতে)

তোমারে আনিনা মনে, হই শ্রান্ত তথাপি সবলে
পিছ ঠেলে রাখি তব চিন্তাগুলি, উঁকি মারে যারা
আমার সকল সুখে, নভোনীলে হয় দিশাহারা,
গানের মধুরতম তানে যারা গোপনে উথলে।
শুচিশুভ্র চিন্তাবলি আছে যত মোর অন্তস্তলে
তাদের আড়ালে থাকি সঙ্গোপনে ঢালে দীপ্তিধারা।
আমার ভাবনা যত তোমা লাগি লুপ্ত হোক তারা
সে আঁধারে দিবালোকে আসিতে দিবনা কোনো ছলে

নিদ্রা যবে দিবা'পরে দেয় ফেলি তিমির গুণ্ঠন,
রাত্রি আসি' মুক্তি দেয় দিবসের শ্রান্ত প্রহরীরে,
সকল বন্ধন গ্রন্থি হয় ঢিলা, ইচ্ছাশক্তি মোর
আঁধারে খসিয়া পড়ে বন্ধহারা স্খলিত বসন,
প্রথম স্বপনাবেশে সে আসন্ন নিদ্রার তিমিরে
ছুটে যাই বুকে তব, বাঁধে মোরে ওই বাহুডোর।



স্বরলিপি

গান

ছায়ানট মিশ্র—দাদরা

বামুন, কায়েত, মেথর, মুচি,
মায়ের ছেলে মোরা সবাই।
হোক্‌না কেন যতই নীচ,
মানুষ সবে আমরা ভাই।
জন্মেছি এক মায়ের কোলে,
একই খেলা খেলি সকলে;
শেষের দিনে নীরব বীণে,
একই শ্মশানে সবাই যাই॥
কেউ বা পুরুত পূজি দেবতায়
আশীষ আনে মোদের মাথায়;
কেউবা মায়ের মতন স্নেহে
ময়লা যত করে সাফাই;
মেথর মুচি সবাই শুচি,
অশুচিত কেহই নাই॥

কথা—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

+			o			+			o		
II পা	পা	র্সা |	না	র্সা	-া I	ধা	ধা	ণা |	ধা	পা	-া I
বা	মু	ন |	কা	য়ে	ত	মে	থ	র |	মু	চি	০
ধা	ধা	ণা |	ধা	পা	-া I	রা	রা	গা |	মা	-া	-া I
মা	য়ে	র |	ছে	লে	০	মো	রা	স |	বা	ই	০
গা	গা	রা |	গা	মা	-া I	গা	গা	রা |	সা	-া	-া I
মা	য়ে	র |	ছে	লে	০	মো	রা	স |	বা	ই	০
রা	মা	মা |	মা	গা	-া I	মা	পা	পা |	ন্ধা	-া	পা I
হো	ক্‌	না |	কে	ন	০	য	ত	ই |	নী	০	চ
ধা	ধা	না	র্সা	র্রা	-া I	ধা	ণা	ধা |	পা	-া	-া I
মা	নু	ষ	স	বে	০	আ	ম্‌	রা |	ভা	ই	০

অন্তরা

\+ ০ + ০
II পা -া পা | ধা না -া I র্সা র্রা -া | না র্সা -া I
জ ন্ মে | ছি এ ক্ মা য়ে র | কো লে ০

র্রা -া র্গা | র্মা র্গা -া I র্রা র্গা র্রা | না র্সা -া I
এ ক্ ই | খে লা ০ খে লি স | ক লে ০

পা র্সা র্সা | ন' র্সা র্রা I ধা ধা ণা | ধা পা -া I
শে ষে র | দি নে ০ নী র ব | বী ণে ০

ধা ধা ণা | ধা পা -া I রা রা গা | মা -া -া I
এ ক্ ই শ্ম | শা নে ০ স বা ই | যা ই ০

গা গা রা | গা মা -া I গা গা রা | সা -া -া II
মা য়ে র | ছে লে ০ মো রা স | বা ই ০

২য় অন্তরা

\+ ০ + ০
II পা পা পা | ধা ধা না I র্সা র্রা র্রা | না র্সা -া I
কে উ বা | পু রু ত পূ জি দে | ব তা য়

র্রা র্রা র্গা | র্মা র্গা র্মা I র্রা র্সা -া | না র্সা -া I
আ শী ষ | আ নে ০ মো দে র | মা থা য়

পা র্সা র্সা | ন র্সা র্রা I ধা ধা ণা | ধা পা -া I
কে উ বা | মা য়ে র ম ত ন | স্নে হে ০

ধা ধা ণা | ধা পা -া I রা রা গা | মা -া -া I
ম য় লা | য ত ০ ক য়ে সা | ফা ০ ই

গা গা রা | গা মা -া I গা গা রা | সা -া -া I
মা য়ে র | ছে লে ০ মো রা স | বা ই ০

সা র্সা -া | না র্সা -া I ধা পধা ণা | ধ পা -া I
মে থ র | মু চি ০ স বা ই | শু চি ০

ধা ধা ণা | ধা পা -া I রা রা গা | মা -া -া I
অ শু ০ | চি ত ০ কে হ ই | না ই ০

গা গা রা | গা মা -া I গা গা রা | সা -া -া I
মা য়ে র | ছে লে ০ মো রা স | বা ই ০

ভারতের তীর্থভ্রমণ

[শ্রীরবীন্দ্র নাথ কর সম্প্রতি ভারতবর্ষের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন। তীর্থক্ষেত্রগুলিতে দ্রষ্টব্য বিষয় ভ্রমণকাহিনীর পুস্তকগুলিতে বিশদভাবে আছে। কিন্তু কোন স্থানে গিয়া কোথায় উঠিব ও কত খরচ পড়িবে এসকল খুটি নাটি বিষয় উহাতে থাকে না। এজন্য রবীন্দ্রবাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এগুলি প্রকাশিত করা হইল।]

ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলির বর্ণনা অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় বাহির হইয়াছে; সুতরাং বর্ণনার দিকে আমি যাইব না। ভারতের সকল তীর্থ-ভ্রমণে কত খরচ পড়ে ও পথের বর্ণনা মাত্র দিব; ইহাতে ভবিষ্যতে যাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সুবিধা হইবে।

এই তীর্থ-ভ্রমণের কল্পনা প্রথম দিলেন—শ্রীরামলাল দে। আমরা গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকলে বাহির হইলাম। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া মাদ্রাজের টিকিট কিনিলাম—থার্ড ক্লাস শুধু যাইবার ভাড়া ২১ টাকা ৩ আনা ৬ পাই। সন্ধ্যা ৭টা ৩৪ মিঃ এ মাদ্রাজ মেলে চাপা গেল।

প্রতি একশত মাইলে একদিন করিয়া কোম্পানি যে কোন ষ্টেশনে নামিতে দেয়। মাদ্রাজ পর্য্যন্ত টিকিট করিলে মোট দশ দিন haltage পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর—(২০-২-৫৩)

ভোর ৪টায় গাড়ী ভুবনেশ্বরে পৌছিল। গরুর গাড়ী ভাড়া করা গেল—১৲ ভাড়ায় ধর্ম্মশালা ও তথা হইতে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখাইয়া আনিবে ঠিক হইল। ধর্ম্মশালায় জিনিষপত্র রাখিয়া খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিয়া বেলা ১২টায় ফিরিলাম। বিন্দু সরোবরে স্নান করিয়া, দেব দর্শন করিলাম ও প্রসাদ খাওয়া গেল। প্রসাদের জন্য পাণ্ডাকে লোক প্রতি ।৴০ হিসাবে দিতে হইল।

সাক্ষীগোপাল

মোটর বাস সাক্ষীগোপাল হইয়া পুরী যায়—ভাড়া লোক প্রতি ১৲ টাকা। সাক্ষীগোপাল না গেলে ভাড়া ৸০ মাত্র। সাক্ষীগোপালে দেবদর্শন করিয়া পুরী যাওয়া গেল। সাক্ষীগোপালে বাস প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়ায়।

পুরী—(২১ হইতে ২৩শে)—

পুরীতেও ধর্ম্মশালায় উঠা হইল।

পুরীতে ৩ দিন থাকিয়া তথা হইতে ওয়ালটেয়ার অভিমুখে যাত্রা করা হইল। পুরী হইতে খুরদা অবধি ১৭ মাইল টিকিট করিলাম—কারণ মাদ্রাজ পর্য্যন্ত main lineএ আমাদের টিকিট পূর্ব্বেই রহিয়াছে।

ওয়ালটেয়ার—

পুরী হইতে পুরী ভিজাগাপত্তম প্যাসেঞ্জারে ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় রওয়ানা হইয়া ভোর ৭টা ৫০মিনিটের সময় ওয়ালটেয়ার পৌছিলাম।

ওয়ালটেয়ারের ধর্ম্মশালা ষ্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে। ধর্ম্মশালায় জায়গা না পাওয়ায় উহার পার্শ্বে একটী সুসজ্জিত বাংলায় ঘর ভাড়া করিলাম। ঘরে আসবাব আছে, স্নানের ঘর ও রান্নাঘর সমেত ভাড়া দৈনিক ১৲ হিসাবে।

নৃসিংহ দেব—

ওয়ালটেয়ার হইতে ৭ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর নৃসিংহ মূর্ত্তি। Bus ভাড়া যাতায়াতে লোক প্রতি ৸৶০ ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া লোক প্রতি ৸০ মাত্র। নৃসিংহ মন্দিরে এক আনা দর্শনী দিলে তবে মন্দিরে যাইতে দেয়। খিচুড়ি ভোগ ৴১০ লইল।

গোদাবরী

ওয়ালটেয়ার হইতে সেই দিনই রাত্রে ৬টা ৫০মিঃ সময় রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ১টায় গোদাবরী ষ্টেশনে পৌছিলাম। ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ধর্ম্মশালা ভাল—ইলেকট্রিক পর্য্যন্ত আছে। পরদিন প্রাতে গোদাবরী

নদীতে স্নান ও লিঙ্গ-রাজ দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম।

বেজওয়াদা—

গোদাবরী হইতে ১২টায় রওনা হইয়া ৫ টায় বেজওয়াদায় পৌছিলাম। ষ্টেশনের নীচে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা।

পরদিন ভোরে কৃষ্ণা নদীতে স্নান করিয়া ৮ মাইল দূরে মঙ্গলগিরিতে পাহাড়ের উপরে নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলাম। গাড়ীভাড়া যাতায়াতে লোক প্রতি ৷৷৹; গাড়ীতেই সুবিধা কারণ কৃষ্ণানদী পথে পড়ে। রেলে মঙ্গলগিরির ভাড়া ৷৴৹।

সে দিন রাত্রি ১১-৩৫ মিঃ মাদ্রাজ মেলে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে ৮-৩০মিঃ মাদ্রাজে পৌছিলাম।

মাদ্রাজ—

মাদ্রাজ ষ্টেশনের নিকটে ধর্ম্মশালা—বেশ সুন্দর। রান্নার বন্দোবস্ত নিজে করিয়া লইতে হয়।

মাদ্রাজে একদিন থাকিয়া যাহা কিছু দেখিবার দেখিলাম। ট্রাম, গাড়ী ও রিক্সা পাওয়া যায়—ভাড়া কলিকাতারই মতন।

পরদিন বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে South Indian রেলের এগমোর ষ্টেশনে গেলাম। এখানে মাদ্রাজ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের টিকিট করিলাম—থার্ড ক্লাসের ভাড়া ৬৲৫ মাত্র।

তার পরদিন ভোরে ৬টায় সেতুবন্ধ রামেশ্বরে পৌছিলাম।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর—

আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে চারিদিন ছিলাম। ধর্ম্মশালা অনেকগুলি আছে—বন্দোবস্ত সুন্দর। ধর্ম্মশালায় রান্না করিয়া খাওয়া যাইত। দেবদর্শন দূর হইতে করিতে হয়; পূজা যথেচ্ছা দেওয়া যায়—না দিলেও চাহে না। কেবল মহাদেবের মাথায় গঙ্গাজল দিতে হইলে ২৲ লয়। একদিন ভোর ৪টায় রওয়ানা হইয়া ট্রেনে ধনুষ্কোটি গেলাম—এক ঘণ্টা লাগিল। ষ্টেশন হইতে সঙ্গম ৪ মাইল দূরে—সমুদ্রের ধার দিয়া হাটিয়া গেলাম। সঙ্গমে স্নান করিয়া পুনরায় সেতুবন্ধে ফিরিয়া আসিলাম।

সেতুবন্ধ হইতে মাদুরার টিকিট করিলাম—১৸৵ ভাড়া।

মাদুরা—(৫-৩-৩৫)

ভোর পাঁচটা ৩৫ মিনিটে রামেশ্বর হইতে রওনা হইয়া ১০টা ১০মিনিট নাগাদ মাদুরা পৌছিলাম। ধর্ম্মশালায় ঘর খালি না পাওয়ায়, ধর্ম্মশালায় খবর লইয়া অন্য একটী ঘর ভাড়া করিলাম—দ্বিতলের উপর ঘর, ভাড়া দৈনিক ।৴৹ হিসাবে। মিনাক্ষীর মন্দির প্রভৃতি ও মন্দির মধ্যে বাজার দেখিলাম।

টিনেভেলী—(৬-৩-৩৫)

রাত্রি ২টা ৩৮ টি মিনিটে টিনেভেলী যাওয়া হইল—ভাড়া ১৴৹ লাগিল। মাদুরা হইতে মানিয়াচি হইয়া এই গাড়ী শেন্‌কোট্টা পর্য্যন্ত যায় এবং পথে টিনেভেলি পড়ে। টিনেভেলি একটী জংসন। এখান হইতে ১০টায় বাসে চড়িয়া কুমারিকা অন্তরীপ (৫২ মাইল দূরে) গেলাম। বাস্ ভাড়া লোক প্রতি ২৲ যাতায়াতে পড়ে। পথে তোতাদরি; সেখানে কয়েকটী ঠাকুর আছে। এখানে জিনিষ খুব শস্তা, বড় বেদানা ৫, উৎকৃষ্ট আম দুটি ৫ পয়সা।

কুমারিকা পৌছিতে ৪ঘণ্টা লাগিল। দুপুর ১৷৹ টায় পৌছিলাম। সেখানে মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের হোটেল আছে—প্রতি লোক ৴১০ খাওয়া খরচ লাগিল। ভাত, ডাল, ২।৩টী তরকারী, চাটনি, দধি, পাপর, আলুভাজা দিল; রান্না মন্দ নয়।

এখানে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। ইহার দিনে তিনবার বেশ হয়। সন্ধ্যায় ভোগ খাওয়া যায়; আগে বলিলে ভোগ বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

কুমারিকা যাওয়ার পথে দুই জায়গায় কাষ্টম আছে। চিনি ও সিগারেট নিজে খাইবার মত লইয়া যাইতে দেয়।

পরদিন ভোর ৫টায় আবার বাসে চাপিয়া টিনেভেলি ফিরিলাম। ৯-৩০এর রেলে চাপিয়া ত্রিচিনাপল্লী গেলাম। টিনেভেলি হইতে ত্রিচিনাপল্লীর ভাড়া ৩৸৴৹ মাত্র।

ত্রিচিনাপল্লী—

সন্ধ্যা ৭টায় ত্রিচিনাপল্লী পৌছিলাম। ধর্ম্মশালা তিন মাইল দূরে। গরুর গাড়ী করিয়া ধর্ম্মশালায় গেলাম; ভাড়া ৸৹ লইল।

পরদিন সকালে গরুর গাড়ীতে করিয়া কাবেরী তীরে গেলাম। কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া দেবদর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম, গরু গাড়ী ভাড়া ৷৵০ লাগিল।

পরদিন সকালে ৪টা ২০ মিঃ কুম্ভকোনমের দিকে যাত্রা করিলাম। ত্রিচিনাপল্লী হইতে ভাড়া ১৷৫; ট্রেনে তিন ঘণ্টার পথ। ৭টা ৪১ মিনিটে গাড়ী কুম্ভকোনাম পৌঁছিল।

কুম্ভকোনম্—

পরদিন সকালে ৭টা ৪৯ মিনিটে চিদাম্বরম্ যাত্রা করিলাম; ভাড়া ৷৵০ মাত্র।

চিদাম্বরম্—

১১টা ৫৬ মিনিটে চিদাম্বরমে পৌঁছিলাম।

চিদাম্বরমে ধর্ম্মশালা ৩ মাইল দূরে মাত্র। ৵০ ভাড়ায় গরুর গাড়ী করিয়া ধর্ম্মশালায় গেলাম।

চিদাম্বরম, নটরাজ গোবিন্দ, প্রভৃতি দেবদর্শন করিলাম।

পরদিন চিদাম্বরম্ হইতে রাত্রি ১০টা ৫৪ মিনিটে বাহির হইয়া চিঙ্গলপুট গেলাম—ভাড়া ২৵০ মাত্র।

চিঙ্গলপুট—

ভোর ৩টা ১৪ মিনিটে চিঙ্গলপুট পৌঁছিলাম।

চিঙ্গলপুটের ১০ মাইল দূরে পক্ষীতীর্থ। বাস পাওয়া যায়; ভাড়া যাতায়াতে ৷৷৵০ আনা। ঠিক পক্ষীতীর্থ পাহাড়ের নীচে কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

পক্ষীতীর্থ হইতে ১০ মাইল দূরে মহাবলীপুরম্। ঘোড়ার গাড়ীতে বরাবর যাওয়া যায়—যাতায়াতে ৷৷০ ভাড়া

চিঙ্গলপুটে ফিরিয়া কাঞ্জীভরমের টিকিট করা গেল—ভাড়া ৷৵৫ মাত্র। চিঙ্গলপুর হইতে আর্কোনাম্ লাইনে কাঞ্জিভরম পড়ে।

কাঞ্জিভরম্—

কাঞ্জিভরমে ধর্ম্মশালায় জায়গা না পাওয়ায় পাণ্ডার বাড়ী থাকা গেল। শিব কাঞ্চী প্রভৃতি দেখা গেল।

এখানে দুই দিন ছিলাম। একদিন ভোগ খাওয়া গেল ১৲ দিয়া।

কাঞ্জীভরম হইতে ত্রিপতি বালাজি ইষ্টের টিকিট করা হইল—ভাড়া ১৵৫ মাত্র।

ত্রিপতি বালাজি ইষ্ট

কাঞ্জীভরম হইতে বেলা ১১টায় যাত্রা করিয়া ৪টা ৩৮ মিনিটে পূর্ব্ব ত্রিপতিতে পৌঁছিলাম। ধর্ম্মশালা ষ্টেশন হইতে ৬।৭ মিনিটের রাস্তা; ধর্ম্মশালায় জলের কল আছে। পরদিন ভোর ৫৷৷০টায় পাহাড়ের উপরে বালাজীর মন্দির দেখিবার জন্য যাত্রা করা গেল। ধর্ম্মশালা হইতে এক মাইল দূরে পাহাড়—গরুর গাড়ীতে গেলাম। পাহাড়ের উপর যাইবার পথে ইলেকট্রিক আলো থাকায় অসুবিধা হয় না। পাহাড়ের উপর সাত মাইল পথ; ডুলি যাতায়াতে লোক প্রতি ৫৷৷০ পড়িল। পথ সিঁড়ির মতন, ধাপ আছে—উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। আমাদের দলের মধ্যে আমি, শ্রীমতি বিভাবতী কুণ্ডু, ও তাহার ভগ্নী বিলাসবতী লাহা কেবল ডুলি না লইয়া সমস্ত পথ হাটিয়া পাহাড়ে উঠিলেন। সকাল ৯টায় মন্দিরে পৌঁছিলাম। পাহাড়ের উপর হাটবাজার প্রভৃতি আছে। ব্রাহ্মণের হোটেলও আছে; মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, কিন্তু রান্না ভাল। দুপুর ১২টায় ভোগ পাওয়া যায়—এক আনায় একটি লোকের পেট ভরে।

বেলা ২৷৷০টায় আবার নামিতে আরম্ভ করিয়া বৈকাল ৫৷৷০টায় নীচে নামিলাম। তারপর গরুর গাড়ী করিয়া ধর্ম্মশালা ফেরা গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্রেনে বোম্বে রওনা হইলাম। পরে রেনিগুয়ান্টায় গাড়ী বদল করিয়া মাদ্রাজ বোম্বে মেল ধরিলাম।

ত্রিপতি হইতে বোম্বে সেণ্টার ভাড়া ১৩৲ টাকা।

কল্যাণ

বোম্বে যাত্রার পথে রাত্রি ৪ টা ৪১ মিঃ ষ্টেশনে নামিয়া কল্যাণ ষ্টেশনের জিমায় জিনিষপত্র রাখিলাম। এখান হইতে নাসিকে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়—ভাড়া মেলে ১৷৵০ প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। নাসিক পৌঁছিলাম প্রায় ১০৷৷০টায়।

নাসিক

নাসিকে পৌছিয়া গোদাবরীতে স্নান করিলাম। নাসিক ষ্টেশন হইতে ধর্ম্মশালা ৬ মাইল দূরে; বাস ভাড়া ৶০ আনা ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত। ধর্ম্মশালার কাছেই গোদাবরী নদী ও মন্দির।

এখানে দেবদর্শন করিয়া মোটরে ১৬ মাইল দূরে পাণ্ডবগুহা দেখিতে গেলাম—বাস ভাড়া লোক প্রতি ॥০আনা।

বোম্বাই

নাসিক হইতে বোম্বে গেলাম। বোম্বে ষ্টেশন হইতে হীরাবাগে ধর্ম্মশালা ১॥০ মাইল দূরে, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ॥০ আনা লাগিল। ধর্ম্মশালা বেশ ভাল। বাসন ভাড়া পাওয়া যায়—৮ দিনের জন্ম বাসন প্রত্যেকটি ৫ পয়সা হিসাবে; বিছানার বালিশ চাদর প্রভৃতি প্রত্যেকটি ⁄০ আনা হিসাবে। প্রথমে ৫৲ টাকা জমা দিতে হয়। চলিয়া যাইবার পুর্ব্বে জিনিষপত্র ব্যবহারের ভাড়া কাটিয়া টাকা ফিরৎ দেয়। আট দিন থাকিতে দেয়। ধর্ম্মশালার নীচেই মুদির দোকান আছে—সেখানে সব জিনিষ পাওয়া যায়।

বোম্বেতে ট্রামে যাতায়াত খুব সস্তা; এক আবার টিকিট করিলে তিনবার গাড়ী বদল করা যায়। দ্বিতল ট্রামও আছে।

ডাকুর (Dakur)

বম্বে হইতে সন্ধ্যাবেলায় ডাকুরে যাত্রা করিলাম। বম্বে হইতে ডাকুরের ভাড়া ৫৸ মাত্র। তারপরদিন সকালে বেলা প্রায় ৮টায় ডাকুরে পৌছিলাম। ধর্ম্মশালায় উঠিলাম—প্রায় মাইল খানেক দূরে।

পরদিন ডাকুর হইতে বেলা ১টার ট্রেণে দ্বারকা যাত্রা করিলাম—৭৷৶১০ ভাড়া। তারপর দিন বেলা ২টায় দ্বারকায় পৌছাইলাম।

দ্বারকা

দ্বারকা ষ্টেশন হইতে ২মাইল দূরে মন্দিরের কাছে ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালা সুন্দর এখানেও আলো ও বাসন ব্যবহারের জন্ম পাওয়া যায়—তাহার জন্ম কোন ভাড়া লাগে না। এখানে খাবার জল কিনিতে হয়, এক পয়সায় এক কলসী। স্নানের জন্ম কূপ আছে তাহার জন্ম কিছু খরচ লাগে না।

পরদিন ভোর ৫॥ টায় মোটরে ভেট দ্বারকায় গেলাম। ভেট দ্বারকা একটি দ্বীপের মধ্যে। সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত মোটর ভাড়া লোক প্রতি যাতায়াতে ॥০ মাত্র এবং নৌকা ভাড়া লোক প্রতি।০ আনা। মোটরে না গিয়া ট্রেণেও সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ভেট দ্বারকায় মন্দিরে দেবদর্শন করা গেল। মন্দিরে প্রবেশ কালে ১৶ লোক প্রতি দিতে হয়; টিকিট না করিলে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। সেইদিন ১॥ টায় বাহির হইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমুদ্রতীরে ফিরিয়া আবার মোটরে চাপিলাম। ঘণ্টাদেড়েক পরে বাস দ্বারকায় ফিরিল।

দ্বারকায় ৪ দিন থাকা গেল। তিন রাত্রি দ্বারকায় বাস করিয়া আবার বাহির হওয়া গেল।

দ্বারকা হইতে আবার প্রায় ৮ টায় সুদামাপুরী যাত্রা করিলাম। টিকিট খাম্বালিয়া ষ্টেশনের করিতে হইল—১৷৷৶১০ লাগিল। খাম্বালিয়া ১। টায় পৌছিলাম।

সুদামাপুরী

খাম্বালিয়া হইতে মোটরে বালোয়া গেলাম—মোটর ভাড়া লোকপ্রতি ১৸ আনা। ৭২ মাইল দূরে বন্দরে গেলাম। বন্দর হইতে পোরবন্দর '৶ ভাড়া দিয়া ট্রেণে গেলাম। পোর বন্দর হইতে মোটর বা একায় যাওয়া যায়। একা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া।৶ আনা।

সুদামাপুরী হইতে জামনগর বাসে করিয়া গেলাম—ভাড়া লোকপ্রতি ১৸ আনা। জামনগর সুন্দর সহর। জামনগর হইতে ট্রেন করিয়া ভেরাবল গেলাম ৸৶ ভাড়া দিয়া। ভেরাবল রেল জংসন। ভেরাবল হইতে একটী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হইল—ভাড়া '৶ আনা। ট্রামও আছে এক আনা দিলে প্রভাস পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

প্রভাস

প্রভাসে ধর্ম্মশালায় উঠা গেল। ভেরাবল হইতে প্রভাস ৩ মাইল দূরে। প্রভাস হইতে ভেরাবলে ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিলাম। ভেরাবল হইতে আজমীরের টিকিট

করিলাম ১০৸৵১৫ ভাড়া। ভেরাবল হইতে বেলা ৪॥ টায় ছাড়িলাম।

আজমীর

আজমীর যাইতে রেলেই কাটিল দুইরাত্রি; ভোরে আজমীর পৌঁছিলাম।

আজমীর ষ্টেশনে নামিয়া একেবারে বাসে করিয়া পুষ্কর গেলাম। পুষ্কর ৮ মাইল দূরে যাতায়াতে ভাড়া ।।আনা মাত্র। পুষ্কর হ্রদের ধারেই ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালার বাহিরে মুদির দোকানে সব জিনিষ পাওয়া যায়।

আজমীর ষ্টেশন হইতে বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় রওনা হইয়া রাত্রি ১০টায় জয়পুর পৌঁছিলাম।

জয়পুর

জয়পুরে ধর্ম্মশালা ষ্টেশনের কাছে। ষ্টেশনের সামনে যে ধর্ম্মশালা তাহাতে একটু জলকষ্ট; প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে যেটি সেখানে জল ও পায়খানার অসুবিধা নাই। ধর্ম্মশালার বাহিরে দোকানে পুরী পাওয়া যায়—।৵ সের সের বেশ ভাল।

সকালে গোবিন্দজীর মন্দিরে ভোগ খাওয়া গেল; ভাতের ভোগ নয় আনা ও মিষ্ট ভোগ এক টাকা দুই আনা।

রাত্রি দশটায় জয়পুর হইতে আগ্রা গেলাম, রেল ভাড়া ৩৲ টাকা। পর দিন সকাল সাড়ে নয় টায় আগ্রা পৌঁছিলাম।

আগ্রা

আগ্রা ষ্টেশনের ঠিক সামনে একটী হোটেলে উঠিলাম। প্রতি ঘর দৈনিক ॥ ভাড়া পড়ে; ঘরে আসবাব ও বিছানা আছে, ইলেকট্রিক আলোর জন্য আলাদা কিছু দিতে হয় না। হোটেলে আহারের দর প্রতি বেলা পাঁচ আনা হিসাবে।

মথুরা

মথুরায় নামিয়া একজন পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিলাম। ধর্ম্মশালাও আছে। গোবিন্দজীর ভোগ তিন আনে পড়িল ইহাতে ভাত, লুচি, খিচুরী, পায়েস প্রভৃতি ছিল।

বৃন্দাবন

মথুরা হইতে ছোট রেলে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। আমরা টাঙ্গায় গেলাম—৪ মাইল পথ; ভাড়া যেতে ৸৹ পড়িল। একটি টাঙ্গায় ৪ জন লোক বসিতে পারে। রেলে গেলে ষ্টেশন হইতে এক মাইল যাইতে হয়; এজন্য মথুরা হইতে টাঙ্গা লওয়াই সুবিধা।

বৃন্দাবনে ছোট ছোট ছেলে ভিখারীর উৎপাত বেশী, এজন্য পাই ভাঙ্গাইয়া রাখা ভাল।

বৃন্দাবন হইতে ৬ মাইল দূরে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড ও গিরি গোবর্দ্ধন, টাঙ্গা ভাড়া যাতায়াতে ৪৲ টাকা লাগিল।

ফিরিবার পথে মথুরা ষ্টেশনে না গিয়া, টাঙ্গা করিয়া মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গেলাম। টাঙ্গা ১৶৹ ভাড়া লইল। প্রায় ৪ মাইল পথ। মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট হইতে হাওড়ায় টিকিট করিলাম ৯॥৵১০ ভাড়া লাগিল। পথে break journey ১১ দিন পাওয়া গেল। রাত্রি ১০টার ট্রেনে মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়িয়া পরদিন বেলা ১২॥০ টায় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম।

এলাহাবাদ

এলাহাবাদ ষ্টেশনে রেলের জিম্মায় মালপত্র রাখিয়া সহরে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া ফিরিলাম। পথে একটী হোটেলে আহার সারিয়া লইলাম লোক প্রতি ।৶৹ আনা পড়িল।

সেইদিন বৈকাল ৫ টায় বেনারস যাত্রা করিলাম।

বেনারস

বেনারসে রাত্রি ৯ টায় পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীমনোমোহন পাণ্ডের ধর্ম্মশালা—প্রত্যেক ছোট ঘর ।০ এবং বড় ঘর দৈনিক ॥০ আনায় পাওয়া যায়। টিউব ওয়েলের জল আছে। এখানে মাছ প্রভৃতির আহারে বাধা নাই।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ধর্ম্মশালায় কোন খরচ লাগে না; এটী গোধোলিয় মোড় গির্জ্জার কাছে।

বেনারসে তিন দিন ছিলাম। একদিন রামনগর, দ্বিতীয় দিন সারনাথ ও পরদিন হিন্দু ইউনিভার্সিটি দেখা গেল। রামনগর যাওয়ার নৌকা ভাড়া ॥০ আনা লাগিল।

বেনারস হইতে কলিকাতা ফেরা গেল।

অবান্তর

আর্থিক দুরবস্থায় দেশের সর্ব্বস্তরে —ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আঘাত লাগিয়াছে দেবস্থানের উপরেও তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। ভারতের সব বিখ্যাত দেবস্থান যেখানে লোকে দেবতার প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসে সে সব স্থানের বেশ একটা আয় আছে। দেশব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতায় সে আয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কালীঘাটের কালী মন্দির হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র—ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের হিন্দুরাই এখানে কালীমাতার প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসে এবং যাহার যাহা সাধ্য মানসিক ও প্রণামী প্রদান করে। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তাহাও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। কালিঘাটে এবং অন্যত্রও কালীপূজায় পাঁঠা বলি আবহমানকাল হইতে চলিতেছে। দেশের দুরবস্থার জন্য কালী-মন্দিরের নিত্যকার এই বলিও হ্রাস পাইয়াছে। সম্প্রতি কালীঘাটের কালীপূজায় এই পাঁঠা বলি বন্ধ করিবার জন্য জয়পুর হইতে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি আসিয়াছেন এবং ইনি কালীঘাটে বলি বন্ধ করিবার জন্য অনশন আরম্ভের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

—০—

বাংলা হুজুগের দেশ। এবং এখানে অন্য প্রদেশাগত ব্যক্তি অনেক সময় অনেক রকম হুজুগ করিয়া বেশ নাম করিয়া যায়। পণ্ডিত রামচন্দ্রের এই বুদ্ধ জনোচিত অহিংস অনশন ব্রতে ভীত হইয়া কালীঘাটের মন্দিরের সেবাইতেরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত রামচন্দ্রের উপর কোর্ট হইতে এক ১৪৪ ধারা নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

জয়পুরের এক রামচন্দ্র শর্ম্মা কলিকাতায় আসিয়া ৺কালীঘাটে পশুবলি বন্ধের জন্য সত্যাগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি যাহাতে কালীঘাট কালীমন্দিরের নিকটে (উত্তরে হাজরা রোড, পূর্ব্বে রসা রোড, দক্ষিণে নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট এবং পশ্চিমে আদি গঙ্গা) গিয়া কালী মন্দিরে ছাগগুলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনশন করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রার্থনা করিয়া গত ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার কালী মন্দিরের সেবায়েৎ সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ফণিলাল মুখোপাধ্যায় আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস কে সেনের এজলাসে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে বলা হয় যে, বহু হিন্দু দেবপূজায় ছাগ বলিদান ধর্ম্মসঙ্গত জ্ঞান করেন। ছাগ বলিদানের প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবং ঐ প্রথা একরূপ আইনসম্মত। পণ্ডিতজী কালীঘাটের কালী মন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনশনে মৃত্যুপণ করিয়া কলিকাতা আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই অন্যায় কার্য্যে সাহায্য করিতে জনসাধারণকে প্ররোচনা দিতেছেন। তিনি যদি অনশন সত্যাগ্রহ করেন তবে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া আদেশদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রামচন্দ্র শর্ম্মা যদি অনশন সত্যাগ্রহ করেন, তবে বহু হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। অহিংসা সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা, বহু হিন্দু তাহা সমর্থন করে না। তিনি অনশন সত্যাগ্রহ করিতে গেলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অনুসারে ঐ শর্ম্মার উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী সংবাদ এইরূপ :—

জয়পুর রাজ্যের পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা কালীঘাট কালী-মন্দিরে জীব-বলি বন্ধ করিবার জন্য গত ১৭ই আগষ্ট কলিকাতা আসিয়াছেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি অনশন আরম্ভ করিবেন এবং এই জন্য যদি তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁহার উপর আদালত হইতে যে আদেশ জারী করা

হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি বলেন যে, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তিনি কারাবরণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না এবং কারাগারেও অনশন চলিতে থাকিবে। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার পিতা স্বামী ভুরামলজী জয়পুরের নরসিংহ মন্দিরের অধিপতি। পাণ্ডবগণ যে বিরাট গ্রামে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে তাঁহার বাসস্থান। তিনি বলেন যে ইতিপূর্ব্বে আরও দশ জায়গায় পশু বলি বন্ধ করিবার জন্য অনশন আরম্ভ করিয়া তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। জয়পুরের নরসিংহ মন্দিরে প্রথমতঃ ছাগবলি বন্ধ না করিয়া অন্যান্য স্থানে বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, বড় বড় তীর্থস্থানে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে তাঁহার স্বদেশ জয়পুরে বন্ধ করা উহা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না।

এই সম্পর্কে বাংলার কয়েকজন নেতা নেত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত এই আবেদনও সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল—

নিবেদন

পণ্ডিত রামচন্দ্রশর্ম্মা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রায়োপবেশন করিয়া কালীঘাটে দেবীর উদ্দেশ্যে জীববলি নিবারণ করিবেন, এই তাঁহার লক্ষ্য। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি গৌড়ীয় (বাঙ্গালী) ব্রাহ্মণ; তিনি দেশের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য বহু ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন। অহিংসা, জীবে দয়া এই সকল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। কালীঘাটে বলিদান সম্পর্কে সকল হিন্দু এখনও একমত নহেন। হিন্দুদের মধ্যে এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাহারা বলিদানকে ধর্ম্মের অঙ্গে মনে করেন। যুক্তিদ্বারা এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ। প্রায়োপবেশন দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এ অবস্থায় পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহুমূল্য জীবন এই প্রকারে নষ্ট হইবে ইহার সম্ভাবনায় আমরা বিচলিত হইয়াছি। তাঁহার মত ধার্ম্মিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক এইভাবে আত্মবিনাশ করেন ইহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। পণ্ডিতজীকে প্রায়োপবেশন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে ২৭শে আগষ্ট এলবার্ট হলে এক মহতী সভায় অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার পক্ষ হইতে কোর্টে এক আবেদন করা হইয়াছিল যে জনমত জাগ্রৎ করিবার জন্য তাহাকে নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে অনশন করিতে দেওয়া হউক। কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিত রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন এবং যতই তিনি কোন কালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ থাকুন না কেন তাঁর এ চেষ্টার কোন সার্থকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। বাংলায় নানা দেব দেবীর পূজায় বলির ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থাও আছে—বাংলার ধর্ম্ম বিশ্বাস, বাংলার পূজা অর্চ্চনা বাঙ্গালীই নিয়ন্ত্রিত করিবে এখানে পণ্ডিত রাম চন্দ্রের এ অনধিকার চর্চ্চা কি হেতু! জীবে যদি তিনি অতি দয়াবানই হন তবে কোন কোন মন্দিরের বাহিরেও যে মানুষের মাংসাশী বৃত্তির তৃপ্তি সাধনের জন্য অসংখ্য জীবহত্যা হইতেছে তাহা নিবারণের কোন উপায় করুন না। তাহা যখন নাই এবং অহিংসার এরূপ উদগ্র প্রচেষ্টা সফল হইবার আশা যখন কোন কালেই নাই—তখন বাংলার উপর এভাবে চমক লাগাইবার জন্য আর একটা অনশনের হুজুগ না দেখানোই ভাল। ইনি নাকি আবার বলিতেছেন মাংসাশীর মাংসাহার বন্ধ করিবার জন্য নহে—। দেব মন্দিরের নিষ্ঠুরতা বন্ধ করিবার জন্যই এ আয়োজন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা শাক্ত বঙ্গের উপর কেন—মছরি মাংস যে দেশে চলিত নাই সেইখানে করিলেই হয়। ভিন্নদেশীর এসব খেয়ালে বাঙ্গালী আর প্রশ্রয় দিবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

এই হুজুগের মরশুমে সহযোগী আনন্দবাজার স্বামী বিবেকানন্দের দু একটা বাছা বাছা বাণী বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন—যথা

"ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে
কাপুরুষ দয়ার আধার ধন্য ব্যবহার
মর্ম্মকথা বলি কাকে!"

বিবেকানন্দ

"বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঠা খাবেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল। যদি না-পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু'চার জনের জন্য দেশ শুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি?"

স্বামী বিবেকানন্দ

\+ \+ \+

ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা নগরীর সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়ার পর কলিকাতায় এত উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে ১০।১৫ বছর আগে যারা কলিকাতা দেখিয়াছেন এখনকার কলিকাতার অনেক স্থান দেখিয়া তাহারা বুঝিতেই পারিবেন না। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরের নূতন করিয়া গড়িবার কিরূপ পরিকল্পনা হইয়াছে শুনুন—ষ্টালিন স্থির করিয়াছেন বর্ত্তমান ৩৫০০০০০ লোকের বাস ভূমি ৭০ বর্গমাইল বিস্তৃত মস্কো সহর ২৩০ বর্গমাইল বিস্তৃত করা হইবে এবং তাহাতে ৫০০০০০০ লোক বাস করিতে পারিবে। এই বিরাট সহর নির্ম্মাণ পরিকল্পনার প্রারম্ভিক সব কাজই তিন বছরের মধ্যে শেষ হইবে—তবে সব ঠিক করিয়া লইবার জন্য আরো সাত বছর সময় দেওয়া হইয়াছে।

কথাঞ্জলি

কবি চন্দ্র

স্তবন তোমার কি জানিব মোরা
বিশ্ব তোমার স্তুতিতে ভরা
যেখানেতে যাই সেইখানে শুনি
তব গুণ গান মধুক্ষরা!
দেবের প্রসাদে এসেছিলে দেব
তোমার প্রসাদে দেবতা আসে
জীবন যুদ্ধে পার্থ সারথি
তব স্যন্দনে বসিয়া হাসে!
তোমার দুঃখে ব্যথিত দেবতা
রথের চক্র হানিতে গেলে
তুমি ক্ষমাশীল বারণ করেছ
শান্ত সহাস নয়ন মেলে।
দেবের মুরতি, দেবধর্ম্মা,
দেবভাষা ভাষি দৈবমনা
নর জগতের নরদেহধারী
"দ" কারেই করেছ উপাসনা।
"উষার আলোকে শেষ শ্বাস শেষে"
হলে নিমগ্ন সমাধি স্রোতে
মরণ আসিয়া তাই ফিরে গেল
জীবন শেষের দুয়ার হতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার অনারেবল স্যর দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি, সি আই, ই, সি বি, ই, মহোদয়ের তিরোধানে

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিক্ষার প্রসার

দেশে শিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে একথা মাঝে মাঝে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে আমাদের স্মরণ পথে উদিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা এখনও শতকরা ৯২ জন—হিসাবে দেখা যায় এখন যে ভাবে শিক্ষার প্রসার চলিতেছে তাহাতে প্রতি দশবৎসরে শিক্ষিতের হার শতকরা একটি করিয়া বাড়িতেছে। এইভাবে শিক্ষার প্রসার চলিলে জাপান এখন যেরূপ শিক্ষিত আছে তেমনি শিক্ষিত আমাদের দেশকে করিতে আরও ৯২০ বছর লাগিবে। অশিক্ষিতের সংখ্যা যেখানে অধিক সেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক কি ব্যক্তিগত কোন আন্দোলনই সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান রাশিয়া সব দিকেই বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই সাফল্যের মূল শিক্ষার দিকে রাশিয়ার নজর কিরূপ দেখুন। ১৯২১ সালে রাশিয়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৪ জন—কিন্তু ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা হইয়াছে শতকরা ৯০জন। দশবৎসরে শতকরা ৫৬ জন শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ তাহারা দেশ হইতে নিরক্ষরতার উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহে। দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষাপ্রচার আন্দোলন ব্যাপক করিতে হইবে—প্রতি শিক্ষিত নরনারী অন্ততঃ একজন করিয়া নরনারীকে শিক্ষিত করিবার ব্রত গ্রহণ করুন। শিক্ষার যত বিস্তার হইবে দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যের ক্ষেত্র ততই বিস্তৃত হইতে পারিবে।

—০—

বিজ্ঞানের যুগ

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা কলকব্জা ছাড়া বাস করিতে পারিব না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু আমরা ইহার ফল দেখিতেছি কি? কলকব্জা ও আধুনিক বিজ্ঞানে অল্পসংখ্যক কতকটি লোক লাভবান হইলেও বহুলোক ইহাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। সীমার মধ্যে থাকা পর্য্যন্ত ইহা মানবের বিশেষ উপকারী কিন্তু সীমা ছাড়াইয়া গেলেই ইহা মানবের পক্ষে ধ্বংসকর হইয়া দাঁড়ায়। ইহার প্রমাণ এরোপ্লেন—দেখিতে দেখিতে স্বল্প সময়ে বহু দূরান্তরের পথে যাওয়া যায়—আরো অনেক গুণ আছে, কিন্তু সব গুণ ইহার ঢাকা পড়িয়া যায় যখন আগামী যুদ্ধে ইহা ধ্বংসের পক্ষে কোন অংশ গ্রহণ করিবে তাহা ভাবা যায়। অথচ তিন গুণ তের দোষ হইলেও আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিবার উপায় কাহারো নাই—বরঞ্চ ইহাতে যে যত ওয়াকিবহাল সেই তত বেশী সভ্য।

—০—

লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম

বর্ত্তমানে এদেশে লাইব্রেরী আন্দোলন কিছু কিছু হইতেছে—আরো ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। বরোদা, মহিশূর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর। অশিক্ষা দূর করিতে, নানাগ্রন্থ পাঠের আগ্রহ জাগাইতে, জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করাইতে পাঠাগার বিরাট অংশ গ্রহণ করিতে পারে। বাংলার প্রতি সহরে ২।৫টি পাঠাগারে এবং প্রতিগ্রামে যেখানে কয়জন শিক্ষিত লোকও আছেন তথায় দু'একটি করিয়া পাঠাগার চলা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের সর্ব্বত্র বহু পাঠাগার স্থাপিত হইলে জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাহিদা মত নানা শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে—দেশীয় সাহিত্য সংবাদপত্র প্রভৃতিরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন কলিকাতার পাঠাগার গুলিতে যথাসম্ভব সাহায্য করেন মফঃস্বলের পাঠাগার

গুলিতেও তেমনি ডিষ্ট্রীকট বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটির সাহায্য করা প্রয়োজন—এবং তাহার পরিদর্শনের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

কলিকাতার মিউজিয়ামে প্রাচীন জিনিষাদি দেখিবার জন্য নিত্য প্রচুর লোক সমাগম হয়। ইহারও শিক্ষামূল্য আছে কিন্তু এ ধরণের মিউজিয়াম না করিয়া দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির মিউজিয়াম প্রতি সহরে ও বাণিজ্য স্থানে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইওরোপের প্রতি রাজ্যেরই বিভিন্ন সহরে এইরূপ মিউজিয়াম আছে এবং তাহারা মনে করেন কারণ যে দেশের উন্নতি ও লোকশিক্ষার পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশেও ইহা প্রবর্ত্তনের আন্দোলন চলা একান্ত কর্ত্তব্য।

—•—

দেশের অবস্থা

বর্ষার সময়ে বর্ষা নাই বলিয়া দেশে হাহাকার পড়িয়ে গিয়াছিল—আবার দেখিতে দেখিতে দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান অঞ্চল ভাসিল, উত্তর বঙ্গে, পূর্ব্ব বঙ্গেও বান ডাকিল! প্রকৃতির লীলা—কিন্তু একটুতেই দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যায় বহু জীবন নাশ ও সম্পত্তি নাশ করে কেন! ছোটনাগপুর অঞ্চলের বন জঙ্গল হ্রাস এবং অন্যান্য বিষয়কেও ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন—এসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বন্যা, অধিব্যাধির এসবের মূল কারণের সন্ধান ও তাহা দূর করাই আগে প্রয়োজন—পরে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সাহায্য প্রার্থনাই অবলম্বন হইতে পারে। কিন্তু আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে এমনি বিপদ ক্রমাগত আসিতেছে আর আমরা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও বলিয়া বাহির হইতেছি। সাহায্যের প্রয়োজন যেখানে সেখানে সাহায্য অবশ্যই করিতে হইবে কিন্তু সে প্রয়োজন যাহাতে এত ঘন ঘন ফিবছর দেশে না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থায় দেশের কৃতবিদ্যদের মনোযোগী হইতে হইবে।

—•—

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ

মহাত্মা গান্ধী কখনো কখনো কাউন্সিল গমনের অতি বিরোধী ছিলেন, সম্প্রতি মত দিয়াছেন বর্ত্তমান অবস্থায় কাউন্সিল গমন প্রয়োজনীয়। কংগ্রেস কাউন্সিল গমন সমর্থন করিয়াছেন—অনেকে গিয়াছেন—ও এখন কথা হইতেছে এপক্ষ হইতে মন্ত্রীত্বগ্রহণ করা হইবে কি না। আমাদের অতি সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে কংগ্রেস পক্ষ হইতে পরিলে মন্ত্রীত্ব অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে—এ অবস্থায় ক্ষমতা হাত-ছাড়া করিলেই পস্তাইতে হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসপক্ষ হইতে এ প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে কংগ্রেসপক্ষের কোন মন্ত্রীই বেতন হইতে ৫০০৲ মুদ্রার বেশী নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারিবেন না। মাহিনার বাকী অর্থ দেশোন্নতিকর কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। ইহা করিলে মন্ত্রীরা দেশের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিবেন—এবং সত্য দেশের কাজও কিছু করিতে পারিবেন।

—•—

ইতালী অবিসিনিয়া

বিরোধ প্রায় বাধে বাধে। বহু স্বার্থ লইয়া যেখানে কারবার সেখানে যতটুকু বিলম্ব ঘটিবার প্রয়োজন তাহাই ঘটিতেছে মাত্র। ইতালী এরোপ্লেন দিয়াই আবিসিনিয়াকে নির্ম্মূল করিতে চাহে—সত্য ধর্ম্মযুদ্ধই বটে—একরাজ্যের এরোপ্লেন নাই—তাহার ধ্বংস ক্রীড়ার প্রতিরোধেরও তেমন ব্যবস্থা নাই—সুতরাং সে রাজ্যের নারী, শিশু ধর্ম্ম-মন্দির সব জাহান্নমে যাইবে—সেও খৃষ্টধর্ম্মীরাজ্য! রাজ্য বিস্তার ইওরোপের সকলেরই প্রয়োজন—সুতরাং অন্য মহাদেশে স্বাধীনতা লইয়া কোন রাজ্য বাস করিবে কেন! এসম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সব আলোচনা চলিতেছে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। ইতালী লক্ষ পরিকর তাহার বাহিরে আরো স্থান চাই-ই।

—•—

সাংবাদিক সম্মেলন

কলিকাতা টাউনহলে নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। লীডার সম্পাদক মিঃ চিন্তামনি ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, রামানন্দবাবু উদ্বোধন করিয়া-

ছিলেন, অভ্যর্থনা সমিতির শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু 'স্বাগত' পাঠ করিয়াছিলেন। টাউনহলের প্রাঙ্গণে মোটর সমাবেশ দেখিয়া বোঝা গিয়াছিল যে সভায় নামজাদা লোকের বেশ আগমন হইয়াছে। হলে মঞ্চের উপর এবং নীচে যাহারা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা দশজনও সাংবাদিক কি না সন্দেহ। কলিকাতার নিখিল ভারত সাংবাদিক সভার সভ্যদের মধ্যেও বেশীর ভাগই সাংবাদিক নহেন এ অভিযোগ শুনিতে পাই। যাহা হউক এ ধরণের সাংবাদিক সভায়, প্রেস এ্যাক্ট ও সরকারের কার্য্যের সমালোচনার মত গুরুভার জিনিষ চলিতে পারে কিন্তু এইরূপ অপ্রতিনিধি মূলক সভায় সাংবাদিকদের পেটে অন্ন নাই, পরনে বসন নাই—তাঁহারা নিয়মিত মাহিনা পায় না—কর্ম্মও জোটেনা ইত্যাদি সাংবাদিক সুলভ একান্ত নিজস্ব কথাগুলি মোটেই উদ্ঘটিত না হইলেই ভাল ছিল না কি? আর এ সমস্যা সমাধানেরই বা উপায় কি! আমাদের দেশে—বাংলায় —হয়তো দেশীয় পরিচালিত দু'একখানা সংবাদপত্রের অবস্থা স্বচ্ছল আছে—তা ছাড়া আর যা আছে তাহাদের অবস্থা চলিবার মতও নহে—তবু যে চলিতেছে সে অনেকটা প্রেষ্টিজের খাতিরে। এই অবস্থা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবু বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশে সাংবাদিকবৃত্তি শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ার' করিবার আবশ্যকতা নাই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সভা বুদ্ধিমানের মত আলনেস্কারের দিবা স্বপ্নের প্রস্তাবটা বাতিল করিয়াছেন। মৃণালবাবুর ২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী অতি দীর্ঘ স্বাগতটি গবেষণা মূলক হইলেও পাঠে বড় বেশী সময় লাগাতে শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্য কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াছিল বোধ হয়। সভাপতির অভিভাষণ ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপীও বড় টাইপে ছাপা ছিল—এবং তাহাতেও অনেক কার্য্যকরী উপদেশ ছিল। সাংবাদিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন একথা সাংবাদিকেরা নিত্য সকলকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন এইরূপ সম্মেলনের মধ্য দিয়া যদি তাঁহাদের মধ্যে সেই সঙ্ঘবদ্ধতা জাগে তবে ভাল। এ ধরণের সাংবাদিক সম্মেলনের অন্যরূপ প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু সাংবাদিকদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় যাহা তাহা এরূপ সম্মেলনে আদৌ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তবু উদ্যোক্তারা চেষ্টা করিয়া এইরূপ একটি সম্মেলন করিলেন এজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি।

—•—

পরলোকে বসন্ত দাশগুপ্ত

সংবাদপত্রসেবী বসন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক হারাইল। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। প্রথম কর্ম্মজীবনে ইনি সুরেন্দ্র নাথের বেঙ্গলী পত্রে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে বরাবর কোন না কোন দৈনিক ইংরাজী পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালেও এ্যাডভান্স পত্রের সংবাদ-সম্পাদক ছিলেন। সংবাদ-সম্পাদনে ইহার কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। আমরা তাঁহার পত্নী ও আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পত্নী সন্দর্শনে পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পত্নী কমলা নেহেরু চিকিৎসার্থ ইওরোপে আছেন—তথায় তিনি ভয়ানক অসুস্থ—তাই পণ্ডিত জহরলাল যাহাতে পীড়িতা পত্নীর পাশে থাকিতে পারেন সেইজন্য তাঁহাকে দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মুক্তির পরই এরোপ্লেনে পণ্ডিতজী পত্নীকে দেখিতে যাত্রা করিয়াছেন। পণ্ডিতজী সুস্থ পত্নীসহ ভারতে আগমন করুন ইহাই কামনা করি। এসময়ে পণ্ডিতজীকে মুক্তি দিয়া গবর্ণমেণ্ট সহৃদয়তার কার্য্য করিয়াছেন।

সুরেন্দ্র নাথ

এক কালে—সে বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নহে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুধু বাংলার নহে সমগ্র ভারতেরই মুকুটহীন রাজা রূপে পরিচিত ছিলেন; রাজনীতি ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের এমনি প্রভাব ছিল। ইনি লর্ড কার্জ্জনের মত বড় লাটের নিশ্চিত বিধান বঙ্গভঙ্গকে পুনরায় জোড়া লাগাইতে পারিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের

অন্যতম স্রষ্টা। স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ জাগানো—নিজের দেশকে দেশ বলিয়া চেনা, তাহাকে মায়ের মত পূজা করা—তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য—ব্রত। রাজনীতি ক্ষেত্রে, দেশনীতি ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতায়, লেখায় এই বাণীই দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ প্রচার করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মবোধ জাগাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যে জনমত সুরেন্দ্রনাথকে মুকুটহীন রাজা বানাইয়া রাখিয়াছিল ভাগ্যচক্রে আবার সেই জনমতই শেষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার রাজাসন হইতে অপসৃত করিয়া নির্জ্জনবাসে বাধ্য করিয়াছিল। রাজনীতির সে নিদারুণ পরিহাসের কথা চিরকাল স্মরণীয় রহিবে। শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথ স্বল্প দিনের জন্য যে রাহুগ্রাসযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারই ফলে এই আজীবন-দেশ-সেবকের স্মরণীয় জীবনের উপর এতদিন আমরা তেমন শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি নাই। কিন্তু স্রোত আবার ফিরিতেছে—সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার নানা আয়োজন চলিয়াছে। পঁচিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার ব্রোঞ্জমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে—দেশবাসীর কাছে সে জন্য সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি সভাও হইতেছে। গত ২১শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এলবার্ট হলে এক জনসভা হইয়াছিল—সে সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ। তিনি দেশের যুবকদের এই কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে—'আমাদের লক্ষ্যে—যাহা আমাদের জন্মগত অধিকার—পৌঁছিবার পথে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যাঁহারা ইহার প্রথম বীজ বপন করিয়াছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ ফজলুল হক কতিপয় সঙ্গী সহ ব্যারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের সমাধিস্থলে স্মৃতি তর্পণ করিতে গিয়া অতি যোগ্য কার্য্যই করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের কলিকাতা কর্পোরেশন নামক স্বায়ত্ত শাসনশীল কর্পোরেশন বস্তুটি সুরেন্দ্র-প্রতিভার কি যে অমূল্য দান তাহা ক্রমশঃ কর্পোরেশনের সভ্যেরা কিছু কিছু করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। কর্পোরেশনের মেয়ররূপে মিঃ ফজলুল হক প্রথম সুরেন্দ্রনাথের সমাধিতে স্মৃতি অর্ঘ্য দান করিলেন ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা হইবে কিনা ইহা লইয়া কংগ্রেসী মহলে বিশেষ আলোচনা আন্দোলন ও বিক্ষোভ চলিয়াছে—সুরেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া সে সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। আজ বিশেষ করিয়া বাংলায় এ সমস্যাও জাগিয়াছে যে বাংলার সভ্য মুখপত্ররূপে কি আর দেশের শিক্ষিত সমাজ দাঁড়াইতে পারিবেন না—তাহার বদলে কি আজ নিরক্ষর জনসমাজই শিক্ষিতদের পেছনে রাখিয়া পুরোভাগে থাকিয়া শাসন চক্র টানিবার সাহায্য করিবে? এই জটিল সমস্যা নিজ প্রতিভা দ্বারা আয়ত্তে রাখিবার জন্যও সুরেন্দ্রনাথকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—তৎকালে জনমত নানা কারণে তাহা সমর্থন করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ মাত্র কয় বৎসরের মধ্যে সে দিনের সে উদ্বেলিত জনমত বেঘোরে পড়িয়া আর হালে পানি পাইতেছে না—সুরেন্দ্রনাথের মত প্রতিভা আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে নাই—তাই এ হতাশায় আশাও কিছু মিলিতেছে না—।

শারীরিক শক্তি

দেশের যে কোনরূপ উন্নতি চাহিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ সবল মানবের। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে একথা অনেকেই বলিবেন না। জীবনকে সদাচারে চালিত করিলে, কতকগুলি কুঅভ্যাস হইতে বাল্যকাল হইতেই সাবধান করিয়া দিলে এবং শরীর চর্চ্চা বাঁচিবার এবং জীবনকে উপভোগ করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ইহা বুঝিয়া ইহাকে অভ্যাসে পরিণত করিলে জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি দুই-ই দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পাইবে। শারীরিক শক্তিতে ক্রমশঃ হীন হইতে থাকিলে তাহাদের মানসিক শক্তিও ক্রমশঃ হীনই হইবে এ দিকে দেশে বিশেষ প্রচার চাই—শারীরিক শক্তিতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে দেশের অনেক দুর্দ্দশা কাটিয়া যাইবে।

বাংলার গবর্ণর ও বিপ্লববাদ

সম্প্রতি কাউন্সিলে বাংলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন

বিপ্লববাদ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন ও বিপ্লবী বলিয়া বন্দীদের কার্য্যকরী নাগরিক রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যে 'স্কীমে'র আভাস দিয়াছেন তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে গবর্ণর এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া এমন একটা কার্য্যকরী পন্থা বাহির করিতে চাহিয়াছেন যাহাতে যাঁহারা ওদিকে মতি দিয়াছিল তাহাদেরও মত পরিবর্ত্তিত হয় এবং ভবিষ্যতেও ওদিকে কেহ মতি না না দিয়া শিল্প বাণিজ্যের দিকেই মতি দিতে পারে। গবর্ণমেন্ট বিপ্লববাদের সঙ্গে কোন আপোষ করিতেই রাজী নহেন এবং বিপ্লববাদের উচ্ছেদ চাহেন—বিপ্লবীরা যাহাতে নানা শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া যোগ্য নাগরিকরূপে বসবাস করিতে পারেন সেদিকেও যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত এ স্কীমে তাহারই আভাস আছে। সার জন এণ্ডারসন দেশের বিপ্লববাদ দূর তথা শিল্প বাণিজ্যের অভ্যুত্থানের যে চেষ্টা করিতেছেন আমরা তাহা পূর্ণ সমর্থন করি—দেশের লোক একযোগে এ স্কীম সমর্থন করিলে ফল ভাল হইবে। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় এর চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ দূরদৃষ্টি নিয়াই যে সব বিচার করিবেন সে বিশ্বাসও আমাদের আছে।

সার দেবপ্রসাদ

বহু বর্ষ ধরিয়া বাংলার জাতীয় জীবনের উপর অসাধারণ প্রভাব রাখিয়া যাঁহারা সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ছিলেন তেমনি একজন মানুষ। পরিণত বয়সে তিনি পরপারের যাত্রী হইলেন—তাঁহার মৃত্যুতে দেশ নানা দিক্ দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বাংলার এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নাই যাহার সহিত দেবপ্রসাদের যোগ ছিল না। সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল—মাদক দ্রব্যর প্রচলন যাহাতে কমে এ জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন এবং কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরও ছিলেন। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্য ও বাংলা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইওরোপ ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। নিজের এটর্ণি ব্যবসায়েও তাঁহার বিশেষ সুনাম সুখ্যাতি ছিল এবং আইনজীবি সম্প্রদায়ের তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। বাংলার জীবন হইতে যে সব খ্যাতনামা লোক মহাকালের আহ্বানে সরিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের স্থান পূরণের জন্য তেমন লোকের আর আবির্ভাব হইতেছে কই? আমরা সার দেবপ্রসাদের আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

জাপানের অভিপ্রায়

জাপানী দূত এইচ মৎসুসিমা এসিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনে বহির হইয়াছেন। তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্যই মনে হইল। তিনি বলেন,— রাজনৈতিক কার্যনীতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা—(১)- গুপ্ত আলোচনার নীতি। (২) রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি বা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে লইয়া পরামর্শ ক্রমে কাজ করিবার নীতি (৩) সরকারী ভাবে প্রকাশ্যে কার্য্যকর্ম্মের নীতি।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গুপ্ত নীতির যুগ ছিল। ইহারই ফলে মহাযুদ্ধ বাধে। ইহার ফলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ নীতি বা সম্মেলন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। এ নীতিও ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। জাপান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের নিজেদের মধ্যেই সরাসরি আলোচনা কোন একটি সমস্যার মীমাংসার সব চেয়ে সহজ দ্রুত উপায় বলিয়া মনে করে। ইহার অর্থ যুদ্ধার্থ গুপ্তভাবে অপরের সহিত সন্ধির সমর্থন নহে, কারণ কোন রাষ্ট্রের সহিত যে চুক্তিই হউক না কেন, তাহা আইন সভায় জনপ্রতিনিধিদের মারফৎ জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। পৃথিবীর জনমত যুদ্ধার্থ দল পাকান আর সহ্য করিবে না। সুতরাং জাপান যে পন্থার পক্ষপাতী তাহাতে রাষ্ট্র সঙ্ঘের নীতি

ক্ষুন্ন হইবে না—পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান হইবে।'

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে জাপানী দূত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সবটা আমাদের পূর্ণ বোধগম্য হইল না। তবে সাধারণ বক্তৃতা স্থলে এ নীতি সমাদৃত হইতে পারে। প্রতিবেশী রাজ্য সম্পর্কে এবং যেখানে সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে সেখানে জাপান কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা দেখিয়াই ইহা বিচার্য্য।

মিঃ মাৎসুসিমা এসিয়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন—'এসিয়া এসিয়াবাসীদের জন্য' এই মনোভাব জাপানে প্রবলতর হইতেছে। জাপান প্রাচ্যের জাতি-সমূহের মধ্যে কৃষ্টিগত অধিকতর সহযোগিতা চাহে এবং জাপান ও প্রাচ্যের অন্যান্য জাতির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাপানের পররাষ্ট্র আফিস এসিয়ার দেশসমূহ হইতে জাপানে ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন।

জাপানে ভারতীয় ছাত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন—জাপানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী ও কারখানা সমূহ ভারতীয় ছাত্রদের সাদরে গ্রহণ করে। পররাষ্ট্র বিভাগ ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিতেছেন। অবশ্য জাপান যাইবার পূর্ব্বে ভারতীয় ছাত্রদের উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে, নতুবা তাহাদের হয় তো মহা অসুবিধায় পড়িতে হইবে। জাপানী ধরণে বাস করিলে জাপানের বাস খরচা খুব কম, কিন্তু পাশ্চাত্য ধরণে থাকিলে খুবই ব্যয় সাধ্য।'

জাপান শ্রম-শিল্পে ও বাণিজ্য পণ্য দ্রব্য নির্ম্মাণে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এ অবস্থায় জাপান যাইয়া শিক্ষালাভ করা শীঘ্রই আরো বেশী প্রয়োজন হইতে পারে—জাপান যদি হৃদ্যতার সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের গ্রহণ করে ও ভারতীয়েরা সেখানে শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পায় তবে ক্রমশঃ বহু ভারতীয় ছাত্র সেখানে যাইতে পারে।

'এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য' এ নীতি এখন এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই জোর গলায় বলিতে পারে—হয়তো কার্য্যতঃ-ও এ কথার কতকটা সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে।

প্রেম

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

পার্থিব ঐশ্বর্য্য আর যশ কীর্ত্তি চাহি নাকো প্রিয়া,
প্রেমের সুধায় তব বঞ্চিত হলাম শিহরিয়া।
আকাশে ঘনায়ে এলো গাঢ়তম কৃষ্ণ যবনিকা;
প্রেম প্রতিবিম্ব আমি, প্রণয়ের প্রত্যস্ত বিকাশ,
আমি পৃথিবীর' পরে আকস্মিক একটা উচ্ছ্বাস,
তোমা কেন্দ্রীভূত করি আমি নাচি প্রেমের বর্ত্তিকা।
সিংহের বিক্রম তুমি দেখিয়াছ কভু কোনদিন ?
সিংহরূপী আমি প্রেম, মিলনের আমি চণ্ডীদাস,
আমার বুকের মাঝে শিহরিছে মোর দীর্ঘশ্বাস;
বহু প্রত্যাশিত চাঁদ মেঘাবৃত নিশ্চিহ্ন মলিন।
মোর হৃদয়ের ঢেউ ফণা তুলি আছাড়িয়া মরে,
সমুদ্র সৈকতে তুমি; বসন্ত হিল্লোলি ওঠে রাস,
আকাশের নীল আলো উজলিছে চোখে বারোমাস
প্রেম সরীসৃপ আমি, বিসর্পিল পথ-সরোবরে।

যুদ্ধবিদ্যায় হিন্দু

ডাঃ মুঞ্জে

গিরগাঁও ব্যাক্‌রোডে স্বস্তিক লীগে ডাঃ বি এস মুঞ্জে হিন্দুর সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যত সাধারণভাবেই হউক না কেন, আমার উদ্দেশ্য এমন একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, যেখানে শিক্ষালাভ করিলে ভারতবাসীর বর্ত্তমান দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হইবে এবং তাহারা সমর-ক্ষেত্রে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে ও বিলাতী মনোবৃত্তি বিশিষ্ট না হইয়া বা জাতীয়তা বিসর্জ্জন না দিয়া ব্রিটিশ-সুলভ গুণ সমন্বিত হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ এই সামরিক বিদ্যালয় হিন্দু ধর্ম্মকে তাহার প্রাচীন গৌরবের আসনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির ফলে জাতির জীবন স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, পক্ষান্তরে যুদ্ধ বিগ্রহে জাতির যৌবনশক্তি উদ্দীপিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে বিষয়টি সাম্প্রদায়িক; কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা শিক্ষা এবং জাতীয়তার কথা। ইহাই আজ জাতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন:—সাত কোটী মুসলমান যদি জাতীয় বাহিনীতে এক কোটী সৈন্য সরবরাহ করিতে পারে, তবে হিন্দুরা কত সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিবে?

স্বরাজ লাভ হইলে সাত কোটী মুসলমান স্বদেশ রক্ষায় এক কোটী সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিবে। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত সমর্থকায় পুরুষ সংখ্যা। তাহাদের নারী সংখ্যা তিনকোটী এবং বৃদ্ধ ও বালক-বালিকা সংখ্যা আড়াই কোটী। কিন্তু স্বরাজের আমলে হিন্দুরাও কি ঐ অনুপাতে সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিবে অর্থাৎ ২৩ কোটী হিন্দুর মধ্য হইতে কি তিনকোটী সৈন্য পাওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা জাতিভেদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু জাতিভেদ রহিত করিতে পারেন, এমন কেহ আছেন কি, এমন কি, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও জাতিভেদ দূর করিতে পারেন কি? কঠোর জাতিভেদ শিথিল করিতে জাতিভেদ আমূল দূর করিতে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, জাতিভেদ দূর করিবার একমাত্র উপায় প্রত্যেক জাতিকে সমরবিদ্যা শিক্ষা দান।

ভারতবর্ষে অহিংসাবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারই হিন্দুদের অবসাদ ও জড়তার একমাত্র কারণ। প্রাক্ বৌদ্ধ যুগে হিন্দুরা যে যুদ্ধ প্রিয় জাতি ছিল, বেদে তাহার প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ যুগের পরও হিন্দুদের সমরকুশলতা সর্ব্বাংশে বিলীন হয় নাই; ইতিহাসের দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ পাণিপথের যুদ্ধের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, মারাঠীদের পরাক্রমে শত্রুপক্ষ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অসংখ্য বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতবাসীদের জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিই যুদ্ধ বিগ্রহ করিত, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। স্বদেশ রক্ষার জন্য শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক জাতিই কৃপাণকরে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। ক্রমাগত শান্তি উপভোগে জাতীয় জীবনস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ জাতির মধ্যে যৌবন-শক্তি সঞ্চার করে।

সুতরাং ভারতবর্ষের প্রত্যেক বালককে ব্যায়াম ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিলাতী ভাবাপন্ন না হইয়াও প্রত্যেক ভারতীয় জননীর কর্ত্তব্য ইংরেজ জননীর মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠা এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য বিলাতী ভাবাপন্ন না হইয়াও ইংরাজ নেতৃগনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা।

হিন্দুদের সাহস আছে এবং তাহারা যুদ্ধ করিতেও পারে যুদ্ধ বিদ্যায় ইউরোপীয়ান প্রণালী এবং ইউরোপীয়ানদের ন্যায় নেতৃত্ব অবলম্বন করা কি আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য?"

গ্রন্থ পরিচয়

"প্রাণের পরশ" শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত।

রচয়িত্রী আমার পরম স্নেহের পাত্রী, আমি তাঁহার সকল গ্রন্থই পড়িয়াছি। তিনি যাহা কিছু রচনা করেন তাহার মূলে তাঁহার বঞ্চিত জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা নিহিত। লেখিকার লোক কল্যাণানুরক্তি, তাঁহার ভগবৎভক্তি, তাঁহার উদার সহানুভূতি, সহৃদয় প্রকৃতি, দুঃস্থ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার আন্তরিক বাসনা, সদস্য নির্ব্বিচারে তাঁহার শুভ কামনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের উভয়ের পরিচয় অল্পদিনের হইলেও তিনি তাঁহার পবিত্র চরিত্র, নির্ম্মল স্বভাবের গুণে আমার স্নেহ লুটিয়া লইয়াছেন। তিনি যাহাকিছু রচনা করেন সকলই আমার ভাল লাগে। স্নেহের পক্ষপাত থাকা বিচিত্র নয়, এই জন্য নাটক হিসাবে বর্ত্তমান গ্রন্থখানির বিচার আমি করিব না কেবল তাঁহার উচ্চ হৃদয়, মহৎ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও চিন্তাধারার পরিচয় দিবার নিমিত্ত নিম্নে তাঁহার নাটকীয় উক্তি হইতে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। শাস্তি কি শান্তি নাটকে গিরীশচন্দ্র বলিয়াছেন 'তোমার বউমার আদর্শ দেখাচ্ছ? শিবপূজার যোগ্য নির্ম্মল ধুতুরা, বিলাস-সজ্জিত সংসার

উপবনে সর্ব্বদা ফোটে না।' যিনি ইহার সংশ্রবে আসিবেন তিনিই বুঝিবেন এই সত্তগু কবিকল্পনার অবয়বী ছবি।

—শুধু টাকা থাকলেই মানুষ বড় হয় না। —২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

—সত্যি ভাই মেয়ে মানুষের জীবনে এসব যে কত বড় আঘাত কী ভীষণ দুঃখ সে যারা পেয়েছে তারাই বোঝে। —২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

—পেয়ে হারানোর ব্যথা যে কি তা বলে বোঝানো যায় না ভাই, এ ব্যথা যে পেয়েছে সেই জানে, অন্যের সাধ্য নেই তা বোঝবার।

—২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

—স্বামী পরিত্যক্তা সধবা ও বিধবা, কুমারী অল্প বয়সের এই সব মেয়েদের মধ্যে যারা হয় অর্থের অভাবে, নয় দেখা শোনার লোক অভাবে, নয় নিজের ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনা করবার উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কত সময় কত কষ্টই পায় কত ভুলই করে বসে, এই রকমে দুঃখের উপর আরো দুঃখ টেনে এনে বোঝা ভারী করে ফেলে। কেউ কেউ আত্মহত্যা করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে চিরমুক্তিকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। —২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—জীবন ততক্ষণই প্রার্থনীয় থাকে দিদি যতক্ষণ ব্যর্থতার বেদনায় শরীর মন শ্রান্ত হয়ে না পড়ে। —২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—আমাদের জীবন সংসারের দিক থেকে ব্যর্থ হলেও দেবতার সেবায় লাগাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনটাকে শক্ত করতে হবে, ছেঁড়া তারকে, নিজের না হো'ক পরের প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করে বাঁধতে হ'বে যে ভাই। —২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—যতঃ দুঃখ কষ্টই আমরা পাই, জানি তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে পারলে একদিন এর শেষ হবেই। সুখ শান্তি যাঁর দেওয়া, আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যে দুঃখ অশান্তি ও তাঁরই দেওয়া দিদি। মানুষের মন দুর্ব্বল তাই দুঃখ পেলেই ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

—২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—আর কর্ত্তব্য আমার দেশের সেই সমস্ত বিপন্ন ব্যথিতা বোনদের দুঃস্থ নিরুপায় জীবনের দিকে আন্তরিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা; মমতা ভরা প্রাণে তাদের কাছে ছুটে যাওয়া; যাদের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট হয়েছে, নির্ম্মম ভাগ্যচক্রের নিষ্পেষণে। ভাগ্যদোষে তাদের কারো শান্তি হরণ করেছে মৃত্যু, কারো অত্যাচারী স্বামী বা আত্মীয় স্বজন, কারো লালসা পরায়ণ দুর্ব্বৃত্ত মানব পশু, আর কারো স্থায়নিষ্ঠ সমাজ। —৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

—আমি ঠিকই জানি ভাই রোগ যখন পালাবে তখন একা পালাবে না দেহের মধ্যে থেকে প্রাণটাকে সাথী করে নিয়েই সে বিদায় নেবে।—

—৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—গভীর আঘাতে আর হতাশায় এই অসুখ যে মানুষকে সত্যি খুব তাড়াতাড়ি চেপে ধরতে পারে তা আমাদের দুই বন্ধুর জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গেল। —৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

—থাকার আর উপায় নেই মন অনেকদিন আগেই যেতে প্রস্তুত হয়েছিল, এইবার শরীর তাতে যোগ দিয়েছে। —৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—একদিন চামেলী আপনাকে বলেছিল. আশীর্ব্বাদ করুন দিদি চামেলী আর মাধবীর মত মেয়েদের জন্যে অকালমৃত্যুই অগ্রসর হয়ে আসে, কালপূর্ণ হবার জন্যে যেন আর তাদের অপেক্ষা করতে না হয়।

—৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—বাংলাদেশের বাল বিধবাদের জীবন আনন্দময় নয় অভিশাপ গ্রস্ত বলেই মনে হয়। মরণই তাদের পরম বন্ধু। —৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—আর এই আশ্রমের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বাস কোরে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের মাধুর্য্য যেন জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তাদের মনশ্চক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করে তাদের সব অতৃপ্তির জ্বালা মুছিয়ে দেয়, তাহলেই আমাদের আত্মা পরিতৃপ্তি হবে।

—৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—চামেলী মাধবী এরা জগতে বাস করতে আসেনি কাকাবাবু, শুধু সৌরভ বিলোতে এসেছিল,... —৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—আমাদের বাংলা দেশে দুঃখীমেয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় ভাই বরং খুব বেশী। পূর্ণ স্বাস্থ্য মনের শান্তি আর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য একসঙ্গে ভোগ করতে, এখানকার শতকরা দশজন মেয়ে পায় কি না সন্দেহ। —৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—আজ মনে হচ্ছে প্রেমকে উপেক্ষা করে জীবনকে উপভোগ করা বলে না। —৩য় অঙ্ক. ৩য় দৃশ্য

—জগতে যত মহৎ কাজ হয়, তার মূলে থাকে অকৃত্তিম ভালবাসা।

—৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

—মানুষের দেহের ক্ষুধার চেয়ে প্রাণের ক্ষুধা যে কোনো অংশে ছোট নয়, আর যেমন তেমন করে দুটো খেতে পরতে দিলেই যে ব্যথিতকে যথেষ্ট দেওয়া হয় না, তার প্রাণের বুভুক্ষা অতৃপ্তির বেদনা মুছিয়ে দেওয়া যায় না. দুঃখী হলেও মানুষ মানুষই, তাকে দিতে হয় মানুষের যোগ্য মর্য্যাদা, ভরে প্রাণে দিতে হয়, আন্তরিক স্নেহ সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশ আর দোঁপতে দিতে হয় নিরাশায় ভরা আনন্দহীন জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তোলবার সত্য পথ।

—৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

হৃদয় কোণে বেঁধে বাসা গুপ্ত যে প্রেম ভালবাসা
তৃপ্তিহারা আর্ত্ত জনে কর তা বিতরণ,
প্রাণের পরশ পেয়ে সুখী হবে দুঃখাজন।*

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নার্গিশগুচ্ছ—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত সম্পাদিত একখানি কবিতা-সঞ্চয়ন। মূল্য ২৲ টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যার তুলনায় মূল্য অসম্ভব বেশী। প্রথমেই নজরে পড়ে বইয়ের নামের সঙ্গে ভিতরের কবিতাগুলির কোন যোগাযোগ নাই। সমস্ত কবিতাগুলিতেই অদ্ভুত ও উগ্র তারুণ্যের উন্মাদনাই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্তের কবিতাটি অতি তরুণদের ভালো লাগিবে। শ্রীদিলীপ দাশগুপ্তের কবিতাটী সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে তাঁহার নিকট এই ধরণের কবিতা আমরা আশা করি নাই; এটী না ছাপিলেই বোধ হয় সুরুচিসম্মত হইত। শ্রীবিভূতি চৌধুরীর লেখাটি মন্দ নয়। আর সব চলনসই।

—শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী

পুষ্পপাত্র

শততম সংখ্যা

কামার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় এম-এ

সৃষ্টিকর্ত্তা ! মনে হয় এক ভীমমূর্ত্তি কামার।
নেয়ানের উপর চিম্‌টে দিয়ে ধরা বড় বড় আগুনের তাল।
পড়ছে হাতুড়ির পর হাতুড়ি বেগে। ঠিক্‌রে ঠিকরে পড়ছে
স্ফুলিঙ্গের কণা চারিদিকে। গড়ে উঠ্‌ছে গ্রহের পর গ্রহ,
নক্ষত্রপুঞ্জ সেই অন্ধকার কামারশালায়।

আর তাদের চেয়েও বড়, তাদের চেয়েও কঠিন,
তাদের চেয়েও জ্যোতির্ম্ময় এই মানুষগুলো উঠ্‌ল
গড়ে কত কল্পকল্পান্তের সংঘাতের পর সংঘাতে।
কত অতিকায় সূক্ষ্মতনু জীবপরম্পরার জন্মজন্মান্তর
অতিক্রম করে চলেছে সেই সনাতন হাতুড়ির
বজ্রপ্রহরণ, সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অসীমকে
ফুটিয়ে তোল্‌বার প্রয়াসে।

হাজার হাজার মণ 'পিচব্লেণ্ড' নিঙড়ে
বাহির হ'ল 'রেডিয়ামের' অণু, স্বতঃ নিষ্যান্দনী
বিকীরণ কণিকা। আর সৃষ্টিসিন্ধু মথিত করে উদ্ভূত
হল এই অপূর্ব্ব কৌস্তুভ—মানবক। হাতুড়ির
মুখে ফুট্‌ল কামারের ঔরসপুত্র। স্রষ্টা এবার
দিলেন সৃষ্টির ভার একমাত্র বংশধরের হাতে।

স্থষ্টিধর মানুষ তাই খুলেছে যন্ত্রশালা।
পঞ্চভূতকে নিয়ে চলেছে তার পঞ্চীকরণ। খোদার উপর
করে সে এখন খোদাগিরি। জ্যামিতির যাঁতাকলে
ফোটায় রেখার সৌষ্ঠব, বৃত্তপরিখা, সমকোণ
সমবাহু ক্ষেত্রমণ্ডল। গণিতবিদ্যার সঙ্গে
জড় বিজ্ঞানের গাঁঠ-ছড়া বাঁধে। রসায়নের রন্ধনশালায়
টগ্‌বগ্‌ করছে শ্রীশ্রীসোঽহংস্বামীর
খিচুড়ি ভোগ। ধূমজ্যোতি সলিল মরুতের পঙ্গপাল
পড়ে ধরা তার ফাঁস্‌কলে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তপনের চেয়ে
তপ্ত পথের ধূলিকণা। তাই মানুষ আজ হ'ল গুরুমারা
চেলা। পিতৃদ্রোহী, উদ্দাম, দুর্দ্দান্ত, বেপরোয়া।
ব্যক্তিত্ব হ'ল দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য। বিধির রাজ্যে
আন্‌তে চায় নির্বিচার যথেচ্ছচারিতা। সবই
পারে স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারে। পারে না কেবল
প্রাণ দান করতে। কিন্তু পারে তাকে হত্যা করতে
অবলীলাক্রমে, হাজার রকম মারণ-যন্ত্রে।
পারে তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় স্তাম্ভিত ক'রে
রাখতে। পারে না কেবল পুনরুজ্জীবিত করতে
নষ্ট প্রাণ। মারে যাকে পারে না তাকে বাঁচাতে।

তার কামারশালায় রইল কোণে
প'ড়ে অমৃতের ঘট। সে সুধার বর্ণনা পড়ি কবির
পদাবলীতে। কচিৎ তার নিদর্শন পাই দুএকটি
উদ্‌ভ্রান্তের স্বগতোক্তিতে, আচরণে, আত্মবিসর্জ্জনের
অলৌকিকত্বে। অবাক্‌ হয়ে ভাবি, এই প্রেমটুকু
মানুষ লাগা'ত যদি তার সৃজনলীলায়, তা'হ'লে
এই যন্ত্রতান্ত্রিক সৃষ্টি কী রূপান্তর ধারণ করত।

বাঙালীর পোষাক

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

বাঙালীর পোষাক সমস্যা দেখছি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। কোন্‌টা যে ঠিক বাঙ্গালী পোষাক এটা কেউই জোর করে বলতে পারছেন না।

এ নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক মতামত হচ্ছে, অনেকে অনেক কিছু বলছেন। কত জন কত রকম হরেক ধরণ অদল বদলও এনে ফেলছেন কিন্তু কোনটাই যেন ঠিক মনঃপূত হচ্ছেনা। এ সমস্যা শুধু বাঙালী পুরুষ সমাজেরই নয় মহিলা সমাজেরও বটে।

কিছুদিন ধরে এ প্রসঙ্গের আলোচনা পত্রাদিতে চলছে। তাতে করে একখানি শ্রেষ্ঠ দৈনিকের লেখক শেষ পর্য্যন্ত বলে ফেলেছেন—দূর কর ছাই। ও আপদ রেখে আর কাজ কি? একেবারে চুকিয়ে দিলে হয় না! তা হলেই তো সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান হয়ে যায়। তাঁর এ মন্তব্য বোধ হয় পুরুষ সমাজের চেয়ে অপর সমাজের দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছে।

আমিও বলি—দূর হোক্‌গে ছাই—অত দূরের কথা দুটো সমাজ একসঙ্গে না ধরে একটা সমাজই দেখা যাক। এ সম্বন্ধে অর্থাৎ পোষাক কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের সে কালেও আলোচনা হত। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ প্রমুখ কেহ কেহ এ উদ্দেশ্যে অনেক নিদর্শন দেন।

পোষাক যে কখন কেমন হবে তা ঠিক করে বলা দুরূহ। মানুষ যেমন অভ্যাসের দাস পোষাক তেমনি ফ্যাসনের দাস। তাই থেকে আবার ক্রমশঃ হয়ে পড়ে অশনের বা বসনের শুধু দাস নয়, সেই সঙ্গে বিলাসিতা মাখা ব্যসনের দাসানুদাস। তার পরের পর্ব্ব আর নাই বললাম।

এই ভাবে তাতে নানা অনুকরণ নানা বিদেশী ভাব ধীরে ধীরে এসে পড়ে। সব দেশের সব সমাজের পোষাকেই এই। আমাদের এই যে পোষাক যা আমরা ব্যবহার করি তাই কি আমাদের নিজস্ব, সনাতন? তা নয়। মেয়েদের পোষাকের কথা তো প্রথমেই বাদ দিয়েছি। পুরুষদের যে বর্ত্তমান পোষাক এতে কত রকম ভাবের ছাপ পড়েছে একটু নজর করলেই কি ধরা যায় না? এই যে ভাব বা ছাপ একে অনুকরণ বা ধার ও বলা যেতে পারে।

এমন অনুকরণ করতে গিয়ে সময় বিশেষে কেমন তরো যে হয়ে যায় তার একটা ছোট্ট কথা মনে পড়ছে। চীনেরা অনুকরণে ভারী মজবুত। যেমনটী তাদের দেখান হবে তেমনটীই ঠিক করে দেবে। একজন অতি সুন্দর একটী পোষাক এক চীনে দর্জ্জিকে দিয়ে সেই রকম আর একটী তৈরী করে দিতে বলেন। যখন তিনি তা পেলেন, দেখে খুসী হওয়া দূরে থাক, চোটেই আগুন। প্যারির তৈরী অত মজুরির অমন পোষাক এত সস্তায় চীনেকে দিয়ে করিয়ে নিলেন তাতে অত চটা কেন? কারণ চীনে সর্ব্বনাশ করেছে। অমন দামী পোষাকটাই মাটী করেছে। এক স্থানে মস্ত একটা লম্বা সেলাই! চীনে বল্লে বাঃ ইউ গিভ স্যাম্‌পল আই মেক রাইট। দেখা গেল তাঁর আসল পোষাক একস্থানে জখম হওয়ায় একটু রিপুকর্ম্ম করিয়ে নিইছিলেন—সেটা আর তাঁর মনে ছিলনা। চীনে তা দেখিয়ে বল্লে—আই থট্‌ ফ্যাশন।

কিন্তু এ ব্যাপার যদি ঐ স্থানে না হয়ে ফ্যাসানের দেশে হত তা হলে তার ব্যবস্থাও হয়ত অন্য রকম হোতো। তার একটা গল্প বলি। মেম সাহেব খুব বড় মানুষ। নিত্য নতুন সোসাইটিতে তাঁর যেতে হয়। তাই দিলেন প্যারি নগরীর শ্রেষ্ঠ এক ফ্যাসানালয়ে এক পোষাকের অর্ডার। তাঁরাও তা করে দিলেন। কথিত হয় সেটা নাকি তেমন হয়নি। কিন্তু ফ্যাসনের ব্যবসায়ী তাঁরা তাতে আবার ফ্যাসন মেকার। তাঁরা বল্লেন ঐটেই

সব চেয়ে নতুন ফ্যাসন। আপত্তি হলে আরও বুঝিয়ে দিলেন ফ্যাসন তো তাঁদেরই হাতে! সুতরাং উতরে গেল। আবার তার দেখা দেখি আর ২৫ টাও সে রকম কাটলো। দু চার দিন বাদে পাল্টে দিলেই তো হল। ফ্যাসন আর পাল্টাতে কতক্ষণ?

এমনি করে কত ফ্যাসন যে আসছে কে তার হিসেব রাখছে!

এমনও শোনা যায় এক নাচ সভায় সাড়ীর নানা অংশ থেকে আলো জল জ্বলিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে। বনেদী-য়ানার চূড়ান্ত যাঁরা করেছেন তাঁরাও হকচকিয়ে গেলেন। হীরের কুচি বা তারকা-চূর্ণ কি তাতে মাখানো আছে?— অত্যাশ্চর্য্য অপরূপ, সন্দেহ নেই। সাড়ীর সঙ্গীন পরীক্ষা হল। ফল বিশেষ ফলেনি। সকলের আগ্রহা-তিশয্যে অধিকারিণী প্রকাশ করলেন—এমন কিছুই মাখানো নেই। কুড়ি খানেক জোনাকীর পশ্চাদভাগ মাত্র গাঁথা আছে। পরে কতজন এ ফ্যাসনের ব্যসনের পশ্চাতে ছুটে ছিলেন তা বলতে পারিনে! তবে এ খুব্বের অনুরোধ, কেউ যেন মনে না করেন—এমনতর ছুটতে আমি একটুও ইঙ্গিত করছি।

প্রাচীন চিত্রাদি ও পাঁজি পুথিতে দেখি প্রাচীন যুগে বাঙালীরা পাগড়ী ব্যবহার করতেন। তবে সব সময় নয়, উৎসবাদি ও বিশেষ বিশেষ কারণ উপলক্ষে। অন্তত: 'উৎসবে রাজদ্বারেচ রাষ্ট্রবিপ্লবে'। প্রথম দুইস্থানে প্রথা ও আইনের শাসনে শিরোভূষণ ও তৃতীয় ক্ষেত্রে বোধহয় শিরোরক্ষা। এখন বাঙালী সামাজিক ভাবে হেড্‌লেস্‌নেস্‌—শিরোপরিচ্ছদহীন।

বাঙালীর মোটামুটি সাদাসিধে পোষাক ধুতি ও চাদর। এই ধুতি ও চাদর নিয়ে বাঙালী সর্ব্বত্র গতায়াত করত।

বামুন পণ্ডিতদের দেখলেই আর সকলের মাথা ভক্তিতে নুয়ে আসতো। চাদরের ভেতর দিয়ে দেখা যেত শুভ্র যজ্ঞোপবীত। মাথায় শিখা, খালি পা। চটী জুতা ব্যবহৃত হোতো কিন্তু কদাচিৎ। এখন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে সে ধুতি ও চাদর নেই, সে টিকিরও আদর নেই। বামুন পণ্ডিতেরাও এখন সার্ট, পাঞ্জাবী, কোট গায়ে দেন। জুতোও পরেন। চাদরও এখন কেউ কেউ অবশ্য ব্যবহার করেন—তবে এ কথা নিশ্চয় যে সে সাদাসিধে ভাব আর নেই।—সে পুরানো পোষাকও আর নেই।

শার্ট গায়ে দিয়ে ভদ্রসমাজে চলাফেরা নাকি—যে সমাজের সে জিনিষটা সে সমাজের রীতি নয়। তবে ভারতবর্ষের জন্য রীতি যুগে যুগে সম্ভব হচ্ছে, তাঁরাও তাই শর্ট ও শার্ট চালাচ্ছেন।

শার্ট অবশ্য কিছুদিন, এমন কি সেদিন পর্য্যন্তও খুবই চলেছিল। কেউ কেউ তার সঙ্গে চাদরখানি কুঁচিয়ে গলায় দিয়ে দুই প্রান্ত সামনে ঝুলিয়ে চলা ফেরা করতেন। অফিসে পৌছে সেখানিকে চেয়ারের পিঠে বেশ করে ফাঁস দিয়ে বেঁধে রাখতেন। উড়ুনী বই তো নয়—হাওয়ায় উড়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করত কি না! কেউ বা তাকে পৈতের মত করে পরতেন ও আফিসে এসে তাকে দলা-মোচড়া করে কোথাও গুঁজে রাখতেন। সামনে রাখলে চাদর নিবারণী সভার সভ্যগণ তাকে লুকিয়ে রেখে আমোদ উপভোগ করতে ছাড়ত না। কেউ কেউ আবার চাদর খানিকে কুঁচিয়ে, আবার কেউ বা না কুঁচিয়ে কাঁধে ফেলে হন্ হন্ করে ছুটে চলতেন। অনেকে আবার উপহাস করে শেষোক্ত প্রথাকে বলতেন নাপতে চাদর। আবার চাদর গায়ে জড়িয়েও যে কেউ যেতেন না তা নয়। এই গেল চাদরের সাধারণ ব্যবহার।

তার পর কোট পর্ব্ব। কোট যখন চলল তখন সে খুবই চলল। কোটের সঙ্গে চাদর বহুদিন চলেছে। চাদর নিবারণী যুগে শুধু কোটই চলতে থাকে। চাদর তখন সার্টের সঙ্গেই থেকে যায়।

কোট পর্ব্বে অনেক অদল বদল দেখা গেল। লম্বা ঝুল চোগাগোছ কোট তখন সম্ভ্রান্তের লক্ষণ। আফিসের বড়বাবু বা মুৎসুদ্দিদের এই পোষাক দেখেই ঝাঁ করে চিনে নেওয়া যেত। জিজ্ঞেস করে খুঁজে নেবার বড় দরকার হোতনা। ঐ পোষাক দেখে সেলামটা ও সঙ্গে সঙ্গেই পড়ত। তবে মুৎসুদ্দী বাবুদের, কি হাড়ভাঙা শীত কি নিদারুণ গ্রীষ্ম পায়ে লম্বা মোজা ও মাথায় চাদরের পাগড়ী থাকত। বড়বাবুদেরও প্রায় ঐ রকম। তবে সব আফিসে নয়।

কিন্তু তার আগে এঁদের জন্য সম্ভ্রান্তের পোষাক ছিল পিরান। সেও কোট। নীচের দিকটা অনেকটা আজ-কালকার পাঞ্জাবীর মত। একটু মোটা কাপড়ের। অথচ খানিকটা কোটেরও মত। বাড়ীতে মেরজাই ব্যবহার চলত। মেরজাই ছিল বেশ আরামের জিনিষ। তাতে ফিতে থাকতো। শীতকালে গায়ে দিয়ে বড়ই আরাম উপভোগ করা যেত। নীচের দিকটা অনেকা পিরাণের মত। গেঞ্জি ছিলনা। কিন্তু ফতুয়া জাতীয় একরকম অর্দ্ধ-জামা ছিল। তা গায়ে দিয়ে অনেকে আবার এ বাড়ী ও বাড়ী তো যেতেনই, এ গাঁ থেকে ওগাঁয়ে ও যেতেন।

আর ও যদি পেছিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যায় নবাব সর-কারদের দরবারে যে পোষাক চলত সেইটেই সম্ভ্রান্ত পোষাক বলে গৃহীত হত। সেটা পায়জামা, আচকান বা চাপকান ও তার ওপর চোগা। মাথায় পাগড়ী বা সামলা। পায়ে জুতা। বলা বাহুল্য খড়ম বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আবাহমান কাল থেকে—এখনও লোপ পায়নি। বাড়ীতে সাধারণ ব্যবহারের জন্যে আজও অনেকস্থলে চলে। কিন্তু বাঙ্গালীর সাধারণ পোষাকের মধ্যে আর তাকে স্থান দিতে পারা যায় না।

পায়জামা পাঁৎলুন চোগা চাপকান পাগড়ী বহুদিন ধরে চলেছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম থেকে ২০।২৫ বছর আগে অবধিও এই ছিল দরবার অফিস অদালত স্কুল কলেজের সম্ভ্রান্ত পোষাক। হ্যাট, পাগড়ী ও সামলাকে তাড়িয়েছে, কোট ভেষ্ট, চোগা চাপকানকে ভাগিয়েছে। আর চোগা চাপকানের ওপর চাদর বরাবর নক্সাকরে পাকিয়ে দুমড়ে মুমড়ে নিয়ে নানাভাবে কালো চাপকানের ওপর দিয়ে যাঁ জড়িয়ে থেকে শোভা বৃদ্ধি করত তার স্থান এখন নিয়েছে নেকটাই। সুতরাং হ'ল এখন হ্যাট কোট টাই পেন্টলুন পরা অফিসের সাজ সজ্জা।

পাদুকা জগতে খড়মকে আগেই বাদ দিইছি। নানা রকম 'সু' গেল ও এল। বুটও এখন বাতিল। চটী উড়ে গেছে—স্যাণ্ডেল হয়েছে। কিন্তু পোষাকের ক্ষেত্রে কি আসছে বলা বড়ই শক্ত।

কাছারী, আদালত, হাইকোর্ট ছিল চোগা চাপ-কানের একটা দৃশ্য। অতি সুন্দর সুশ্রী পোষাক। চমৎকার জমকালো। সম্ভ্রান্ততা যেন তার ভিতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। যেমন, যেমনই মোটর গাড়ী হোকনা কেন। —আগে পিছে সওয়ার মাঝখানে প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ী, অশ্বদ্বয়ের ঝকমকে সাজসজ্জা খটমট আওয়াজ, গাড়ীর পশ্চাদ্দেশে খানসামার হাতে আলবোলা, নল—অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আরোহী মহা-শয়ের হস্তে। উৎকৃষ্ট খাম্বিরার মধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পেছনের পাদানিতে তকমা পরা 'এ যানেওয়ালা রোখকে' ইত্যাদি হুঁশিয়ার কারী—সম্ভ্রান্ত-তার একটা অতি বড় নিদর্শন। আমার মনে হয় এমন ভাবে আমাদের রাজা জমিদারগণ যখন যান তখন যেমন মানায়—যেমন শোভা সম্পন্ন জমকালো দেখায়, এমন কোন মোটর গাড়ীতেই মানায় না। তেমনি আমাদের আগেকার পায়জামা পাতলুন চোগা চাপকান পাগড়ীর পোষাক।

১৯০৯ সালে আমাদের তখনকার দেশপুজ্য সুরেন্দ্রনাথ যখন ইম্পিরিয়াল প্রেস কন্‌ফারেন্সে বিলেতে গিয়ে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে তার সভাপতি হন তখন দেশে একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়ে যায়। এতবড় সম্মান বড় একটা কারো অদৃষ্টে হয় না, বিশেষতঃ ইংরেজী যার মাতৃভাষা নয়। সমগ্র বৃটিশ সম্রাজের নানাস্থানের দিগগজ বিশ্ববিখ্যাত সংবাদিকগণ যেখানে উপস্থিত সেখানে আমাদের দেশের সুরেন্দ্রনাথ হলেন সভা-নায়ক।

তখনকার "রিভিউ এণ্ড রিভিউস' সারা পৃথিবীর মধ্যে একখানি বিখ্যাত পত্র আর জগৎবিখ্যাত মিঃ ষ্টেড তার সম্পাদক। অনেকেই জানতেন মিঃ ষ্টেড্ই হবেন সভাপতি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন নির্ব্বাচিত হলেন তখন মহামতি ষ্টেডের কি আনন্দ! তিনি সুরেন্দ্রনাথকে কাঁধে তুলে নৃত্য করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথকে সে দেশে তখন সবাই চায়। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ চিরদিন চোগাচাপকানের পক্ষপাতী, চিরদিনই তিনি তাই ব্যবহার করতেন। বিলাতেও তাই, সম্রাটের নিম-ন্ত্রণ প্রসঙ্গেও তাই। কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট তার পোষা-

কের উল্লেখ করে বলেন যে, এমন সুন্দর একটী পোষাক, এমন সুদৃশ্য সৌখীন সুনিপুণ সুঠাম ছাঁট কাট নমুনা এক অতি উন্নত সভ্যতা ও রুচির যে সম্যক নিদর্শন তা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

এর উপর বোধ হয় কোন কথাই চলে না। আমার তো মনে হয় যে সম্রাট এমন সুন্দর পোষাকের যোগ্য সমাদরপূর্ণ কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু সে পোষাক ও প্রায় গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন আফিসের গেটে ধুতির সঙ্গে ঐ ধরণ চোগা চাপকান বিরাটোদর দ্বারোয়ানজিরই ভাল মানায়। অথবা যাত্রার জুড়ির গান ওয়ালাদের পক্ষে সে পোষাক শোভন হতে পারে। আমরা সেকেলে আমাদের অন্য মত। তবে আমাদের পোষাক হবে কি? ধুতি ছাড়া যায় না। রাখতেই হবে। তার সঙ্গে চাদর তো উঠে গেছে। শার্টও চোলে গেল। কোট গেছে। আছে পাঞ্জাবী। কিন্তু খুঁজে দেখলে স্পষ্টই জানা যাবে, কোনোপুরুষে পাঞ্জাবের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। অগত্যা —যতদিন না অন্য কোন ফ্যাসান-বোধ না হয়, তা হলে ততদিন—ধুতি ও পাঞ্জাবী।

কিছুদিন মিটীংকা পোষাক হয়েছিল খদ্দর ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদর। তা এখন লোপ পাচ্ছে। শীতে হিঃ হিঃ করে খদ্দর গায়ে দিয়ে যখন সব যান তখন ভাবতাম ব্যাপার কি, তখন কি জানতাম যে নীচে মলিদাদি যত কিছু আত্মগোপন করে আছেন। ওপরটা শুধু খদ্দরের খোলস। এখনও তা হলে শীতেও পাঞ্জাবী চলবে—যে যেমনই হোক।

আগেকার র‍্যাপার বালাপোষ শাল দোশালা ক্রমশঃ লুপ্ত। এখন আলোয়ান তার স্থান দখল করেছে। তবুও যা হোক শীতের দায়ে বা দাপটে চাদরের কিছু নিদর্শন রাখতে হচ্ছে।

আর আফিসেও কোট ভেষ্ট প্যাণ্টের স্থানে ক্রমশঃ হচ্ছে শর্ট ও শার্ট। এখন ইকনমির যুগে আরও না কমলেই বাঁচি।

তবে ভয় নেই। ছোট হলেও কতই হবে? আমরা তো সবাই জানি কত কি যে হয়েছিল—
এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।

শরৎ

(গান)

কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

বাদলের ধারা থামিয়া গিয়াছে
আজি প্রভাতের বেলা,
শারদলক্ষ্মী রাশি রাশি সোনা
ছড়াইয়ে করে খেলা।

কাশের গুচ্ছ দুলিয়া উঠিছে আজি এ মধুর প্রাতে
বনরাণী বুঝি নিরালায় বসি শেফালির মালা গাথে;
টলমল করে পুকুরের জল:
ভাসে শালুকের ভেলা।

শ্বেত বলাকারা আমোদে আজিকে
আকাশে উড়িয়া যায়,
তরুপরে বসি পাপিয়ারা ওই
বোধনের গীতি গায়;
চরণধ্বনি শুনি যেন কার
জাগে আনন্দ মেলা।



হরিজন উদ্ধার

শ্রীরসরাজ বর্ম্মা

হাতে কাজ ছিল না, একটু বেলাবেলিই গোলদীঘিতে গিয়া বসিয়াছিলাম। জলের দিকে চাহিতেই, পণ্ডিত মহাশয়ের হাসির গানের একটা লাইন মনে পড়িয়া গেল—"চৌকনা দীঘিকে এরা সবাই বলে গোল।" ভাবনার জিনিষ মিলিল। তাই ত, এমন ভুলও চলিয়া যাইতেছে।

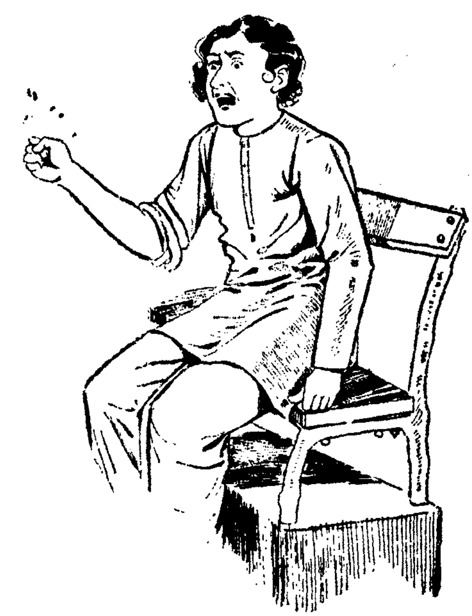
হঠাৎ একটু গোলমাল শুনিয়া পাশে ফিরিয়া দেখি, কয়েকটী মেথরজাতীয় যুবক খানিকটা তফাতে ঘাসের উপর বসিয়া হাসি-তামাসা করিতেছে। দৃষ্টিটা তাহাদের দিকেই নিবদ্ধ রাখিলাম। দেখিলাম, তাহাদের এখনকার বেশভূষার পরিপাটি, বাবুদেরও হারমানাইয়াছে। বার্ণিসকরা জুতা, মিহিধুতি, পাঞ্জাবী কিছুরই অভাব নাই। একজনের গায়ে পাঞ্জাবী না থাকিলেও, রেশমের গেঞ্জীর উপর সরু সোনার হার শোভা পাইতেছে। দুইজনের হাতে হাতঘড়িও রহিয়াছে। সকলের মুখেই সিগারেট। কাছের দোকান হইতে একজন ঠোঙ্গায় করিয়া কতকগুলি চপ ও কাটলেট কিনিয়া আনিল। এক ফেরিওয়ালা পিতলের নললাগান কলসিতে করিয়া গরম চা ফেরি করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া সেইখানে বসান হইল। তারপর একসঙ্গে চপ-কাটলেট ও চা খাওয়া চলিতে লাগিল।

"এই যে রসরাজ দা নমস্কার।"—সামনে ফিরিয়া দেখি, আমাদের হারাধন। দেড় বছর হারাধনের কোন খবর পাই নাই। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছে, কিন্তু মতিগতি স্থির নয়। কংগ্রেসে, মেলায়, সভাসমিতিতে, বন্যার কাযে ভলেন্টিয়ারী করিতে ইহার সমকক্ষ খুব কমই মিলে। যখন যে কাযে লাগে একবারে তন্ময় হইয়া যায়, আহার নিদ্রার কথা মনে থাকে না। কিন্তু কোন একটা কাযে বেশীদিন ধরিয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না। কখন যে কোথায় থাকে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। হারাধন আমাকে একটু শ্রদ্ধা করে। স্বভাব চরিত্র অতি নির্ম্মল বলিয়া আমিও তাহাকে স্নেহ করি।

হাত ধরিয়া হারাধনকে আমার পাশে বসাইলাম। এতদিন কোথায় ছিল, কি কাযে এখন লাগিয়াছে, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"দাদা, এতদিন উড়িষ্যায় কাটিয়ে এলুম। এখন সকলের চেয়ে দেশের যা বড় সমস্যা, তার কাযেই যোগ দিতে চলেচি।"

গোলদীঘির পূর্ব্বধারে নারীরক্ষা সমিতির প্রধান আড্ডার ভাঙ্গাবাড়ীটার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলাম—"বাঙ্গালার নারীনিগ্রহের কথা বলচ তো?" উত্তর করিল, "না দাদা, তা নয়!" তখনই বিহারের দারুণ ভূমিকম্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম—"এখন বিহার সমস্যাই দেশের প্রধান সমস্যা। তোমাদের মত দেশকর্ম্মীরই সেখানে দরকার। তুমি যে যাচ্চ, শুনে খুবই খুসী হলুম।" কথাগুলো শুনিয়া, হারাধন মিনিটখানেক আমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল—"দাদা, ওসব অতি তুচ্ছ সমস্যা। বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা যে 'হরিজন সমস্যা' এও তোমায় মনে করিয়ে দিতে হচ্চে—এতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি।"

দেখিলাম, হারাধন যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মতে অপরে সায় না দিলে, সে তাহা বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহার চরিত্রের এই বিশেষত্বের পরিচয়, অনেকবারই পাইয়াছি। কিন্তু তাহার মতে সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম—"হারাধন, হরিজন-সমস্যা যে বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, তোমার একথা মানতে আমি মোটেই রাজি নই। একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, প্রধান সমস্যা কি!" আমার সব কথা শেষ না হইতেই, উত্তেজিত হারাধন বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল:—


দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—

"দাদা, তোমাদের কাছে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের সমস্যাই এখন বড় মনে হচ্চে, কিন্তু হরিজন সমস্যার কাছে এ কিছুই নয়। দুএক লাখ লোকের আকস্মিক কষ্টের কথা জেনে তোমরা বিচলিত হয়ে পড়ো, কিন্তু বিশালভারতে কোটিকোটি লোক শতশত বছর ধরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য হয়ে নির্য্যাতন ভোগ করচে, সেদিকে তোমরা দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যকই বোধ কর না! তোমরা তাদের পশুর মতই মনে কর, তাদের সঙ্গে সেইরকমই ব্যবহার কর। তারাও যে তোমাদেরই একজন, একথাটা তোমারা মনেও আনতে চাও না। হরিজনদের ওপর দেশের লোকের এতদিনের অন্যায় ব্যবহারেই, অস্পৃশ্যতা পাপের ফলেই, আজ বিহারের এই অবস্থা। পাপের প্রতিফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে। ভগবানের রাজত্বে চিরকাল কখনও অবিচার চলতে পারে না। তোমরা চিরকাল তাদের পশুর মতই মনে করে এসেচো, ফলে তারা এখন পশুর মতই হয়ে গেচে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা সব থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা যেভাবে জীবন যাপন করে, তা পশুর জীবন যাপনেরই মত।

আমার একথা যে একটুও মিথ্যে নয়, তা তুমি এ সহরেরই যে কোন হরিজন বস্তিতে গেলেই বুঝতে পারবে। যেতে যদি ঘৃণাবোধ হয়, তবে নিজের বাড়িতে বসেই হরিজন-বস্তির কাহিনী পড়ে দেখো। সমস্তই তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন তুমি নিজেদের ধিক্কার না দিয়ে থাকতে পারবে না। দাদা, আমি ঠিক করেছি বাকি জীবনটা এই হরিজন-উদ্ধারের চেষ্টাতেই কাটিয়ে দেবো। তোমাদের কারও কোন বাধা"—

হঠাৎ পাশেই একটা গোলমাল উঠিতে হারাধনের কথা মধ্যপথেই থামিয়া গেল। ফিরিয়া দেখি, সেই মেথর ছোকরাদের এক কুল্‌পিবরফওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছে। বরফওয়ালা বলিতেছে



কুল্‌পি বরফওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছে

যে, তাহার বরফের দাম হইয়াছে একটাকা ছয় আনা, আর ছোকরারা বলিতেছে, তাহারা একটাকার একপয়সারও বেশী বরফ খায় নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কাটাকাটির পর বরফওয়ালা একটাকা দুইআনা লইয়াই চলিয়া গেল।

হারাধনকে বলিলাম—"এতক্ষণ তো তুমি এক তরফাই বলে গেলে। আমারও কিছু বলবার থাকতে পারে।" "বল দাদা বল। আমার কিন্তু এখনও সব বলা শেষ হয় নি, তোমার বলা শেষ হয়ে

গেলে, আমার বাকিটা বলবো।"—বলিয়া হারাধন আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম—

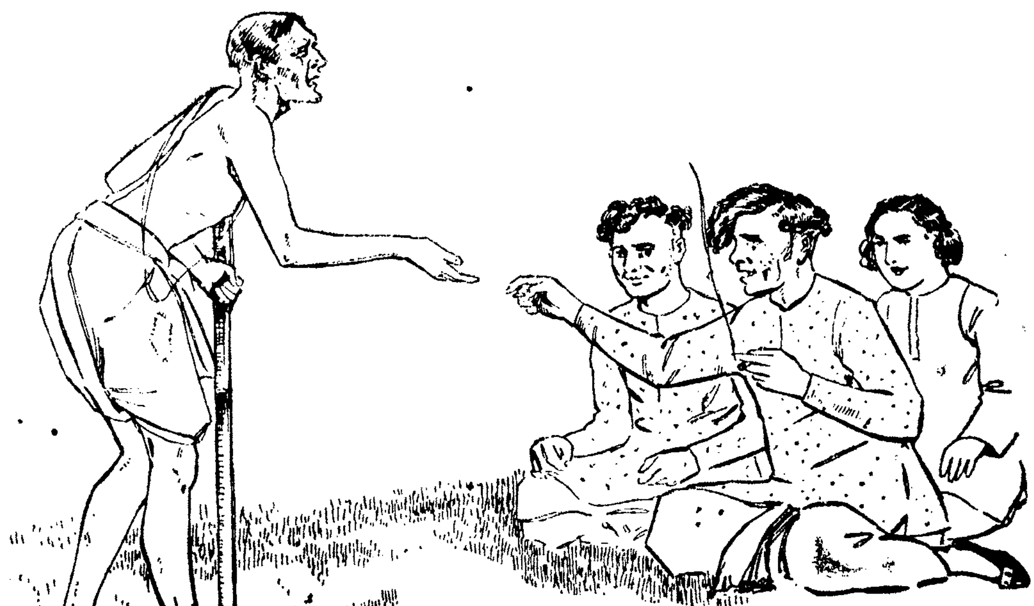
"হারাধন, আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হো'ল—'দারিদ্র্য-সমস্যা'। এই দরিদ্রতা থেকে কি করে যে দেশবাসী নিস্তার পাবে, তা আমি ধারণাতেই আনতে পারি না। জগতে আর কোন সভ্যদেশ ভারতের মত দরিদ্র নয়। অন্য দেশের জনপ্রতি আয়ের তুলনায় এদেশের জনপ্রতি আয় অতি নগণ্য। এ দেশের কোটি কোটি লোকের তুবেলা তুমুটো আহারেরও সংস্থান নেই। তোমরা যাদের হরিজন বল, তারাই যে কেবল দরিদ্র তা নয়। দরিদ্র অধিকাংশ লোকেই। হরিজনরা কেবল নয়, সকল দরিদ্রই সমান কষ্ট ভোগ করে থাকে। 'হরিজনদের ওপর অন্যায়ের পাপেই বিহারে ভূমিকম্পের এই ধ্বংশলীলা, ভগবান পাপের সাজা দিয়েচেন'—তোমাদের এ যুক্তির মত হাস্যাস্পদ যুক্তি আর নেই। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান পাপের জন্যে দেশকে ধ্বংশ করে দিলেন, তিনি পাপকে ধ্বংশ করতে পারলেন না। দরিদ্রের ওপর, তারা যে জাতেরই হোক, যাতে সহানুভূতি জাগে সে জন্যে চেষ্টা করা খুবই ভাল কাজ। সে জন্যে সমাজকে সচেতন করে তুলতে আন্দোলনও দরকার। দরিদ্রনারায়ণের সেবার চেয়ে ভারতবাসীর কাছে আর কোন ধর্ম্মকর্ম্ম বড় নয়।

তুমি কেবল হরিজন বস্তির কথা পড়েচো বা শুনেছো, হয়ত বা তু'এক জায়গায় গিয়ে তাদের তুরবস্থা সচক্ষে দেখে এসেচো। একথা মিথ্যে নয় যে, তাদের প্রায় পশুরই মত জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু এটা হয়ত তুমি জাননা যে, যাদের তোমরা উচ্চবর্ণ বল, তাদের মধ্যেও দরিদ্র বহুলোক এই সহরের বিভিন্ন বস্তিতে হরিজনদের মতই বা তাদের অনেকের চেয়েও নিকৃষ্টভাবে জীবন-যাপন করচে। অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের সন্তান, কোন কারখানায় বা ছাপাখানায় কাজ করে মাসে সামান্য টাকা উপায় করে, অথচ ৫।৬টী তার পোষ্য। নিকৃষ্ট বস্তিতে অতি সামান্য ভাড়ায় একখানি বা তুখানি খোলার ঘর ভাড়া করে থাকে। এক বাড়ীতে নানা জাতের নানা চরিত্রের লোকের বাস। তাদের আচার ব্যবহার, চরিত্র এমন নিকৃষ্ট হয়ে পড়েচে যে, তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না, এরা তোমাদেরই পরিজন। এদের ছেলেপুলেদের তুমি মেথর, ডোমের ছেলেপুলে বলেই মনে করবে। মেথর, মুচি, ডোম প্রভৃতি হরিজনরা স্ত্রীপুরুষে কাজ করে, ছেলেমেয়ে একটু বড় হলেই তারাও কিছু উপায় করতে পারে। সকলের উপায়ে সংসারের অনেকটা সাহায্য হয়। কিন্তু তোমার দরিদ্র পরিজনদের একমাত্র উপায়ের লোক যদি অসুখে পড়ে বা অপারগ হয়, তখন তাদের-অবস্থা যে কি রকম হয়, তা তোমাদের ধারণারও অতীত। এই যে পাশেই হরিজন ছোকরারা অল্প-ক্ষণের মধ্যে ২৲টাকা ২৷৷০ টাকা খরচ করে ফেললে, এরা, এদের বাপ মা, স্ত্রী, ভাইবোন সকলেই কায করে, উপায় করে। এদের একজনের অসুখ হলে, সকলকে উপোস করে কাটাতে হয় না। এদের অবস্থা দরিদ্র ভদ্রসন্তানের চেয়ে ভালই বলতে হবে।

বর্ত্তমানযুগে শুধু হরিজন বলে তারা আর নির্য্যাতীত নয়। নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় দরিদ্র-দের, তা তারা যে জাতেরই হোক। হরিজনদের মধ্যে যারা সর্দ্দারী করে, ব্যবসা করে বা লেখা

পড়া শিখে ভাল কায করে দরিদ্র নাম ঘুচিয়েছে, তারা তোমাদের সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে না। নিজেদের দরিদ্র স্বজাতিদেরও দেখা দরকার বোধ করে না। অফিস আদালত, রেল-ষ্টিমার, স্কুল-কলেজের কৃপায় এখন তোমাতে আর হরিজনে তফাৎ আপনিই দূর হয়ে যাচ্ছে। কম হলেও, এখন হরিজন ব্যবসায়ী, হাকিম, উকিল, বড়কর্ম্মচারী বা শিক্ষক সবই পাবে। দুদিনেই এসব দারিদ্র্য-মুক্ত হরিজন তোমাদের পরিজন হয়ে উঠবে। এখন আসলে কোন জাতি বা শ্রেণী নয়—দরিদ্রেরাই পতিত ও নির্য্যাতিত। তাদেরই উদ্ধার দরকার।"

ঝোঁকের মাথায় অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম। একটু থামিয়া, ফিরিয়া দেখি, পাড়ার খোঁড়া ভট্চাজ্জি আসিয়া মেথর ছোকরাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। বুড়ো মানুষ, চোখেও ভাল দেখিতে পায় না, মেথর বলিয়া বুঝিতে পারিলে বোধ হয় ওদিকে যাইত না। খুচরা পয়সা



"লাও ঠাকুর, এই লাও"

হয়ত কাছে ছিল না, ছোকরাদের মধ্যে একজন—"লাও ঠাকুর, এই লাও" বলিয়া, ভট্চাজ্জির হাতে একটী আনি ফেলিয়া দিল। পয়সা চাহিতে একটি আনি পাইয়া, ঠাকুর অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আগাইয়া গেল।

হারাধনকে বলিলাম—"দেখলে ত। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-সন্তান হরিজনদের কাছে সাহায্য প্রার্থী। ভিক্ষা ছাড়া বুড়োর আর কোন উপায় নেই। বাড়ীতে ব্রাহ্মণী আর এক বিধবা মেয়ে। দুচার ঘর যজমান ছিল, পুরুতগিরীতে একরকম করে চলে যেত। বছর তিনেক আগে গাড়ী চাপা পড়ে

বেচারার পা'টী গেছে খোঁড়া হয়ে, সেই থেকে ওদের কষ্টের আর অন্ত নেই। মেয়ের কম বয়েস, কোথাও কাজে পাঠাতে সাহস করে না। ব্রাহ্মণী পাশের সেকরাদের বাড়ীতে ছুবেলা রেঁধে দিয়ে আসে, তাতে মাসে ছটী করে টাকা পায়। এই ছটী টাকা আর ভিক্ষেয় যা হয়, তাতেই তিনটী প্রাণীর খাওয়াপরা অতি কষ্টে কোনরকমে চালিয়ে নিতে হয়। একখানি খোলার ঘরে বাস করে, ধোপা বাড়িওয়ালা দয়া করে কোন ভাড়া নেয় না। বুড়ো রোজই একবার করে গোলদীঘিতে ভিক্ষে করতে আসে। চোখের সামনেই উপায়ী মেথর ছোকরাদের খেয়ালের মাথায় যে পয়সাটা অপব্যয় করতে দেখলুম, তাতে বুড়োবামনের সপ্তাহের সংসার খরচা সচ্ছন্দে চলে যেতো।”



হারাধন এতক্ষণ একটাও কথা কহে নাই। আর থাকিতে পারিল না। সহানুভূতি সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

“দাদা, তা'হলে এ দারিদ্র্য” সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রিয়া

শ্রীসতী দেবী

বন্ হরিণীর চপল্ গতির,
ছন্দ ভরা প্রিয়া,—
মনে আমার চমক্ লাগায়,
পাগল করে হিয়া,
কাজল চোখের ছায়ায় দেখি,
সজল মেঘের মায়া
বিদ্যুতিকাই আস্‌লো বুঝি,
ধ'রে নারীর কায়া।
দুষ্টু রোষে প্রিয়া যখন
মিষ্টি হ'য়ে ওঠে
বসরা গোলাপ, আনার কলি,
ভূমির পরে লোটে
রাঙা উষায় রঙীন প্রিয়া,
একটু হেসে চায়
আদিম নবের মুগ্ধ মায়ায়
নয়ন ডুবে যায়।

ঘনিয়ে যখন আসে আঁধার
দূরের শালের বনে
বুকের পরে মুখটী রাখি
কয় সে কানে কানে
“হারিয়ে যদিই যাই কোনোদিন
ঐ কালোরই কোলে
আমায় তুমি নিও খুঁজে
দৃষ্টি প্রদীপ জ্বেলে।”
চম্‌কে চেয়ে দেখি ওকি—
প্রিয়া'র চোখে জল?
নীল সায়রের কমল-লতা,
তরঙ্গ উচ্ছল্?
সখি আমার দেবার্চ্চনের,
পুণ্য জলের ঝারি
মরণ মাগি দেখার আগে
তোমার আঁখির বারি।

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস

[শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস প্রণীত 'অনাগত সুদিনের লাগি' একটী সম্পূর্ণ গল্প, কবিতায় লেখা। কয়েকটী পৃথক কবিতায় এই বিচিত্র গল্পটি সমাপ্ত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে। গল্পটি romantic এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রগতির উপযুক্ত। বর্ত্তমানে যে কয়জন আই-সি-এস লেখক নানা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন শ্রীযুক্ত হালদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার অভিনবে তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন—বর্ত্তমান বিচিত্র সুন্দর গাথাটিতেও তিনি অতুলনীয় কাব্য মাধুর্য্যের সহিত অনাগত সুদিনের যে আলেখ্য ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।]

তিন

সন্ধ্যা-রাঙা-বসন প'র তারার মালা গলে
কে তুমি আসি দাঁড়ালে সখি মম আঙিন'-তলে।
তীব্রসুখ মদ্যসম পাত্রভরি প্রিয়া
দিবে কি তুমি ওষ্ঠচুমি, কাঁপিবে মম হিয়া!
তুমি যে ছিলে আমার সাথে কালের সেই আদিম প্রাতে
শতেক যুগ সীমানাপারে এসেছ নিতে ডাকি—
সে কথা আজি পড়িছে মনে কেবলি থাকি থাকি!

বাক্যহারা নীরব তুমি কহিবে নাকি কথা?
কী ফল বলো গোপন করি গভীর নীরবতা?
শব্দহারা সাগর তুমি মৌনবাণী রাতি
তন্ত্রীহীনা নীরব বীণা, দহনদীনা বাতি।
আজিকে তব অবহেলার খেলা—
বিফলে মম কাটিয়ে গেল বেলা
জানি গো জানি নয়ন নীরে একদা তুমি জাগিবে ধীরে
মধুর হবে আলো—
বাসিবে মোরে ভালো।

সাগর বারি উঠিবে ফুলে ফুলে
বাতির শিখা কাঁপিবে দুলে দুলে
জ্যোৎস্না নিশি আকুল কলরোলে,
বাজিবে বীণা পুলক-প্রল্লোলে—
বাসিবে মোরে ভালো,
মধুরতর হবে আকাশ আলো।

বাঙলা ও বাঙালী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন বাঙলা ও নূতন বাঙলা সম্বন্ধে অনেক কথা মাঝে মাঝে মনে ওঠে। পুরাতন বাঙলা মানে, মোগল যুগের বাঙলা নয়। আমি বলচি, এই ইংরাজ আমলেরই বাঙলা—ইহার গোড়ার সময় আর বর্ত্তমান সময়। প্রশ্ন ওঠে, আগের চেয়ে আমাদের উন্নতি হোয়েচে—কি অবনতি হোয়েচে। কেউ বলেন—আমরা উঠিচি, কেউ বলেন—উঠেছিলুম, নেবে যাচ্চি। উঠিচি কি নেবে গেছি —এটা বোঝবার পক্ষে নানাজনে নানাকথা বলে মনে একটা ধাঁধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ধাঁধার সৃষ্টি হওয়ার কোন কথা নাই। যে সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা করা হচ্চে, তখনকার অপেক্ষা নানাদিকে ও নানা-বিষয়ে যে আমাদের উন্নতি হোয়েচে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বহুপূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করলে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে, অধঃপতন যতদূর হতে হয়—হোয়েচে।

ইংরাজ রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বে এবং গোড়ার দিকে আমরা যে খুব নেবে পড়েছিলুম তার আর কোন ভুল নেই। কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক আচার ব্যবহারে, সবদিকেই আমাদের চরম অধঃপতন ঘটেছিল। সেই দুর্দ্দিনে, বাঙালী বিদ্যা হারিয়ে, জ্ঞান হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, এক মহা অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা মিথ্যা আচার-ব্যবহার আর কু-সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছিল। তুললো এসে ইংরাজ। ইংরাজ সেই আঁধারের মাঝে, হাজার বাতির এক চীনাফানুস জ্বালিয়ে দেশের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তার সেই অভিনব ফানুসের জোর আলো দেশের লোকের চোখ একেবারে ঝলসে দিলে। সে আলোতে বাঙালী ইংরাজের যা কিছু দেখতে পেলে, তা অল্প অল্প করে নিতে সুরু করলে। তার জ্ঞান, তার সভ্যতা, তার বিলাস, বাবুগিরি, এমন কি তার পোষাক, আচার ব্যবহার ও চাল-চলন, সবই ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নিতে লাগল। ইংরাজও তার সুবিধাকে স্থায়ী করবার উদ্দেশে অনেক কিছু দিতে লাগলো। দেশে ছাপাখানা ছিল না। একখানা ব্যাকরণ কি একখানা অভিধান পর্য্যন্ত পাবার উপায় ছিল না। যে দেশে প্রচুর ছিল, যুগধর্ম্মে সে দেশের সবই যেতে বসেছিল। ইংরাজ এসে এইসব উদ্ধার করলে। এ বিষয়ে কেরি, মার্সম্যান, হেয়ার প্রভৃতির কাছে বাঙালীর চির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যাহা হোক, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে নূতন পথে বাঙালী সহসা চলতে আরম্ভ করলে, দেখা গেল, সেটাও তার বাঁচবার পথ নয়,—মরবারই পথ,তবে বেশ প্রশস্ত। কাহারো কাছ থেকে বিদ্যা ও জ্ঞান লওয়ায় অবশ্য লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। সে হিসাবে ইংরাজের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই লাভ করিচি। কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই বড় হোয়ে দাঁড়ালো, তার সভ্যতা আর বিলাসে গা ঢেলে দিতে গিয়ে। ফলে বাঙালী তার নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললে, দেশকে সে ভুলে গেল, তার জাতীয় জীবনে ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে লাগলো।

এই অবস্থায় দেশের অনেক মহাত্মা মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হোয়ে, মৃতপ্রায় জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে দেশ-মাতাকে তারা ভুলে বসেছিল, তাঁকে চিনিয়ে দেবার জন্যে উদাত্তস্বরে বঙ্কিম তাঁর 'বন্দে মাতরম' গাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। মৃত্যুর পথেই বাঙালী দিন দিন এগিয়ে যেতে লাগলো। মৃত্যুর পূর্ব্বে যক্ষ্মা রোগীর চেহারার মত বাঙালীর অবস্থা হল— ওপরে চাক-চিক্য, ভেতরে মরণের কাল ছায়া। সহসা বহুকালপরে বিধাতার আশীর্ব্বাদে একটা দমকা হাওয়া দেশের মধ্যে উঠল। এ হাওয়াতে মরণ-পথের যাত্রীদের বাঁচন-পথে এনে ফেললে। বাঙালী বুঝতে পারলে—যে সে বাঙালী, তার দেশ বাঙলা।

কিন্তু একটা বড় দুঃখের কথা। মনে হয়, অন্ধ হোয়ে ছিলুম, সে একরকম ছিল ভাল; দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যা দেখচি তাতে যে আর দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। বাঙালী আজ কোথায়? সে সোনার বাঙলা দেশ কই? যেখানে যেখানে বাঙালীর খোঁজ করি, আজ সেইখানেই দেখি—অ-বাঙালীকে। বাঙালী আজ কোথায় গেল? সে সব বলু, ধোপা, মুচি, ময়রা, মুদী, নাপিত, ছুতার, কামার, কোমর—তারা সব গেল কোথা? সে সব সত্যাচারী, শাস্ত্রদর্শী, সত্যকারের ব্রাহ্মণ; সেই সব জ্ঞানী পণ্ডিতই বা গেলেন কোথা? সেই সব পাঠশালা, সেই সব টোল, সেই সব গুরুমশাই, সেই সব আচার্য্য—এরা সব আজ কোথায়?

বাঙালী যেমন আজ তার জাতীয় জীবনের শ্রেণী থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, বাঙলা দেশও আজ তেমনি যেন লুকিয়ে পড়েচে। আমি বর্ত্তমান বাঙলার বহু স্থানে ঘুরেচি। পল্লী জননীর সে রূপ কোথাও দেখতে পাইনি। তার পরিবর্ত্তে, যে রূপ তাঁর দেখেছি ও দেখচি, এ দেখলে চোখ ফেটে জল পড়ে। দেশের যা কিছু সামান্য সম্পত্তি ছিল, মা তাঁর স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল বিছিয়ে, তাই নিয়েই গাঁয়ে গাঁয়ে বিরাজ করতেন। কিন্তু সে মা আজ কোথায়?

'সেই পল্লী-বাপীতট, সেই বকুলের তল;
সহকার কুঞ্জশিরে ফুল্ল বনলতা দল;
সেই পুষ্প পরিমলে সুবাসিত সমীরণ,
প্রবাল-পল্লবে ঢাকা তরুরাজী অগণন।

সেই বক্র পথ-রেখা, ঘন বাঁশ-বন পাশে;
ভাসা ভাসা শুভ্র মেঘ সুনীল নির্ম্মলাকাশে।
কোকিল কাকলি-মধু, পাপিয়া-মদির-তান;
হরিৎ প্রান্তর-কোলে তটিনীর কল গান।

রাখাল—মুরলীধ্বনি, ধেনুবৎস-পক্ষী রব,
কি মধুর—কি সুন্দর! কোথায় কোথায় সব?

শারদীয়া দুর্গাপূজা, যাত্রা, গীত, অভিনয়;
বারোয়ারী—মহোৎসব, ফাগুন আবিরময়;
গাজন-ভজনগান—কাংস্যধ্বনি, ঢাক-ঢোল,
করতালি, উচ্চহাস্য, তাণ্ডব-আনন্দ-রোল;

পল্লী সে যে মনোহর, অপূর্ব্ব শোভার খনি!
শ্যামাঙ্গিনী এ বঙ্গের হৃদয়ের মধ্যমণি!'

কিন্তু সে পল্লী এখন কোথায়? তা আর নেই। জননী বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হোয়ে, ইংরাজের গড়া নগরীর দিকে অশ্রুভরা চোখে চেয়ে চেয়ে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়েচেন। এই নতুন পরিবর্ত্তনের হাওয়ায় বাঙালীকে তার হারানো জিনিস ফিরে পেতে হবে। তার দেশ-মার কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে হবে। সোণার বাঙলাকে আবার সোণার বাঙলা করতে হবে। অসম্ভব বলে পিছিয়ে এলে চলবে না। জগতে বড় বড় অসম্ভবও মানুষের চেষ্টায় সম্ভব হোয়েচে। আমরাও মানুষ।

বাঙলা দেশ ত্যাগ করে, বাঙলা দেশ উদ্ধার হবে না। দলে-দলে, শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে-হাজারে, আবার আমাদের সাত পুরুষের ভিটেয় ফিরে যেতে হবে। পাশ্চাত্যের মোহে পড়ে যেখানে আমরা ছুটে এসেছি, মোহ কাটিয়ে সেখান থেকে আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। অজানা-কোন অগস্ত্যের মহা-তৃষ্ণায় যা শুকিয়ে গেছে, আবার তাতে জল ঢেলে ভরাতে হবে। ম্যালেরিয়া বলে ভয় পেলে চলবে না, বন-জঙ্গল বলে ঘৃণা করলে হবে না। বাঙলার প্রাণ—বাঙলার পল্লীতে। সেই পল্লীকে সঞ্জীবিত না করলে, পল্লীকুটীরে বাঙালী ফিরে না গেলে, বাঙালীর গত্যন্তর নেই।

ইংরাজ পল্লী তার নষ্ট করে নি। ইংরাজ তার বৈশিষ্ট্য হারায় নি। জগতে বাঙালীর একটা স্থান আছে, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে স্থান, সে বৈশিষ্ট্য, দেশের সে রমণীয় রূপ, জাতির সে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং জ্ঞান, আবার সব বজায় করতে হবে।

পাশ্চাত্যের আদর্শে, প্রাচ্যের বাঙলাকে ডুবিয়ে দিলে চলবে না। যে দেয়—সে দিক। বাঙালী হোয়ে অন্তরে যে বাঙালীকে ঘৃণা করে, বাঙলাকে ঘৃণা করে, হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মের ওপর প্রকাশ্যে পদাঘাত করতেও যার বাধে না, তিনি যত বড়ই বিদ্বান আর জ্ঞানী হোন না কেন, জগৎ-সভায় তাঁর যতই মান আর নাম থাকুক না কেন, পাশ্চাত্যের মোহে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মবলিই দিয়েছেন। হয় ত তাঁর বাক-চাতুরী খুবই; সুবিধামত

অবসরে, মিথ্যা সহানুভূতির দুটো কথা বলে তিনি সরল প্রকৃতি বাঙালীর মন ভেজাতে পটু। কিন্তু বাজে চিড়ে ভেজানোর দরকার, কথায় চিড়ে ভেজে না। মোটের উপর দেশের তিনি কেউ ন'ন। বিদেশেরও তিনি কেউ ন'ন। এমন এক দিন আসছে, যে দিন সত্য মিথ্যার যাচাই হয়ে যাবে, ভেক্ ধরা পড়বে।

আজ বাঙলা মায়ের সু-সন্তানের অভাব নেই। আজ তাঁরা বা'র ছেড়ে ঘরে ফিরে আসুন, নগর ছেড়ে পল্লীতে ঢুকুন। অতীতের বাঙলা—যে বাঙলা জয়দেব-চণ্ডীদাসের, যে বাঙলা চৈতন্যদেবের, যে বাংলা কাশীরাম-কৃত্তিবাসের, যে বাংলা রামপ্রসাদের, যে বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রের, সেই বাঙলাকে আবার সঞ্জীবিত করুন। বিধাতার আশীর্ব্বাদ এসেছে; আসুন, সবলে আমরা মাথা পেতে তা নি। চলুন, দিন থাকতে নিজের নিজের ঘরে সব ফিরে যাই। বাঙালী আমরা ধন্য হই—বাঙলা আমাদের ধন্য হোক

পুষ্পপাত্র

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এ প্রাণের পুষ্পপাত্র হয়নি যে ভরা
তোমার পূজার লাগি অয়ি বঙ্গমাতা;
হয়নি সে আগমনী গান খানি গাঁথা,
আকাশ বাতাস আজি কাঁদে সপ্তস্বরা।
ছন্দহীন যৌবনের কামনা আকুল,
হৃদয় কুসুম তুলি গাঁথে নাই মালা,
স্বপ্নাতুর ছিল বসি সাজায়নি থালা,
নীরবে ঝরিয়া গেছে শিউলি বকুল।
জননীর পূজা আজো রহিয়াছে বাকি,
ঝরিছে শাওন ধারা হৃদয় গগনে;
কুসুম ফোটেনি বনে আজি এ লগনে,
কেমন করিয়া বল জননীরে ডাকি।
অশ্রুজলে সিক্ত দুটি নয়নের পাতা,
পুষ্পপাত্রে স্থাপি তাই ডাকি বঙ্গমাতা।

শততম সংখ্যা

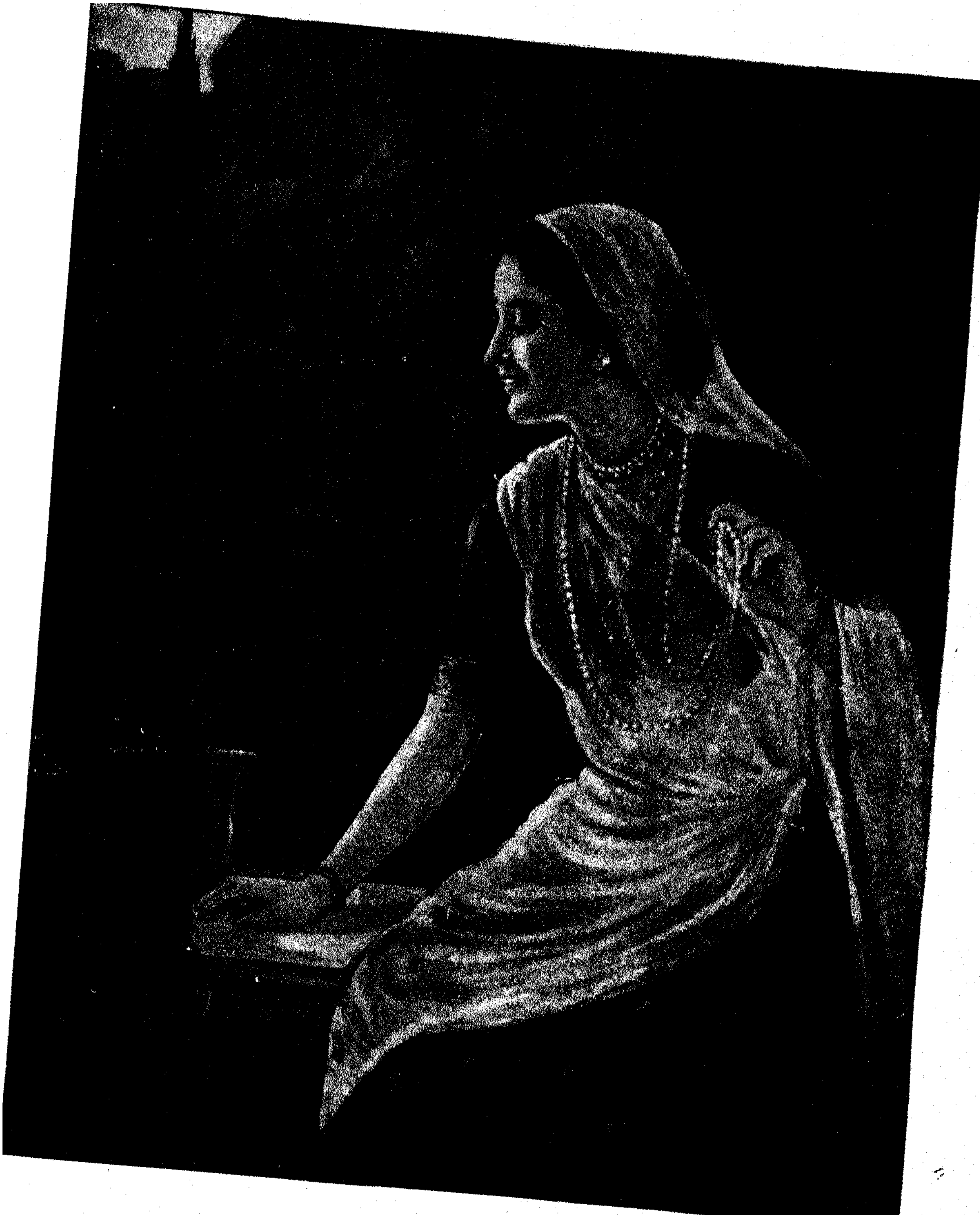
শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত

এক দুই তিন করি' হ'ল একশত—
দিলে দেখা সুসজ্জিতা রূপসীর মত—
এক অবয়বে নব রূপের জোয়ার
অঙ্গে অঙ্গে নিত্য।—আজ হল শতবার।
শতবার শত স্থান হ'তে চিত্ততটে
আঘাত করিতে স্নেহে এসেছে নিকটে;
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু কৌতুক বিলাস—
পরামর্শ কত আর কত পরিহাস
ঘটিয়াছে নিত্য। স্নিগ্ধ রস-স্রোত দিয়া
দুঃখের কণ্টক-জ্বালা নিয়েছ মুছিয়া...
সদালাপী মিত্রসম বিষণ্ণ বন্ধুর
ফুটায়েছ হাসি; ক্লান্তি করিয়াছ দূর!
নির্দ্দেশ করেছ পথ। হে বন্ধু আমার,
দেখা যেন পাই তব শত শত বার।

বলিবার যাহা ছিল

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

যতকথা ছিল বলিবার উজার করিয়া ডালা
দিয়াছি তাহারে তবুও আমার হয়নি কিছুই বলা।
আজি সেই কথা আজি সেই ব্যথা শ্রাবণ বরিষায়
দিবস রজনী আকাশে বাতাসে উড়িয়া যায়।



শিল্পী—[illegible]

সুন্দরী

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস

সুদূরের সন্ধানে

শ্রীঅসিত কুমার হালদার

মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় ক্রমশ এগিয়ে যেতে। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত দেখা হল, প্রাণপাত করে হিমালয় শিখরে উঠবার চেষ্টা করলে সে; আকাশে ওড়া হ'ল বিমান পোতের সৃষ্টি করে। বেতারে সংবাদ, ছবি সবই চালনা করবার চেষ্টা হ'ল এবং সফল ও হ'ল তাতে। কিন্তু মানুষ নিজের জীবনের রহস্যের কথা সে কতটুকু জানলে? নিজের জীবনের ব্যাপার থেকে সে সুদূরেই রয়ে গেল। তার সময় নেই নিজের দিকে তাকাবার। কেবলি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সে করে চলচে সকলের কাজে লাগাবার জন্যে নানা প্রকারের উদ্ভাবনার দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা।

আমাদের দেহটা আছে বলেই তাই তার প্রয়োজন অনেক, তার অভাব ও বাসনা অনেক। এই জড় দেহের চাই আরামে থাকবার মতন আবাস, আবার তাতেও তার নিস্তার নেই চাই আসবাব পত্র অনেক। এই দেহের কথা ভুলে আমরা একদণ্ডও থাকতে পারিনা। তাই আমাদের সুদূরের সন্ধানে দেহের প্রয়োজনের বাইরে ও উর্দ্ধে মনকে নিয়ে যাবার আর সময় নেই। আমরা যে আছি, আমরা যে আসচি অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করচি এবং আমরা যে যাচ্চি অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্চি এই ব্যাপার ত প্রতিনিয়তই দেখচি। কিন্তু সময় হচ্চেনা একদণ্ড দাঁড়িয়ে ভাববার এই আকস্মিক ঘটনাগুলির মধ্যে কি এবং কার লীলা চলচে! এই লীলা যে বিশ্বকর্ম্মার খেয়ালে হচ্চে সে বিষয় সন্দেহ করলেই নিজেকেই সন্দেহ করতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সত্তাকেই অস্বীকার করতে হয়। বাইবেল, কোরাণ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হয় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ করে বিশ্বনিয়ন্তার সত্তার বিষয়। আমরা এক্ষেত্রে জ্ঞানের দিকে দিব্যদর্শন যা হতে পারে তারই বিষয় আলোচনা করবার চেষ্টা করব। অবশ্য কতদূর কৃতকার্য্য হব তা জানিনা।

Einstein, Minkowski, James Jeans, Max Plank, Eddington, Whitehead প্রভৃতি পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা গম্ভীর গবেষণার ফলে বিশ্ব প্রকৃতির তথ্য যা নিরূপণ করচেন, তার সঙ্গে আমাদের দেশের পুরাকালের মুনিঋষিদের আলোচিত বিশ্বসৃষ্টির বিষয় যা উপনিষদ ও বেদ প্রভৃতিতে দেখি তাতে মনে হয় যে, তাঁরা দুটি বিভিন্ন পথ ধরে গেলেও পৌছচ্চেন ঠিক একই জায়গায়। এতকাল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ছিলেন জড়বাদী, এখন হলেন তাঁরা মনোবাদী অর্থাৎ দেখতে শিখলেন মনোময় জগৎকে। "আমি" আমার "মন" আছে বলেই জগৎ আছে। মনের মধ্যে বস্তুর তুলনা চলচে বলেই বড় ছোট, ঠাণ্ডা, গরম, আলো, আঁধার, প্রভৃতি আমরা দেখচি। এখানে মানুষের মন আছে বলেই জগৎ আছে এই তথ্যটিকে তাঁরা মেনে নিয়েচেন। কিন্তু মানুষ যদি একবারো ভাবতে পারে যে মানুষ নেই তবুও জগৎ আছে, সেক্ষেত্রে মানুষের মনটি থাকার অবর্ত্তমানে সেটিকে তুলনা করে বুঝে নেবার মত হয়ত কেউই দুনিয়ায় না থাকলেও জগৎ ত চলবেই! তাহলে দেখা যাচ্চে মানুষ যেমন মনের শক্তির অধিকারী তেমনি মনের গণ্ডিতে এমনই বাঁধা যে তার বাইরে সে দুনিয়ায় কিছুই ভাবতে বা বুঝতে পারেনা। মানুষের অহমিকা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে তার মনের এক বিশেষ শক্তি লাভের দরুণ এত বেড়ে গেছে যে, তার মনের কাছে বিশ্ব সৃষ্টি যতক্ষণ না ধরা পড়চে ততক্ষণ তার অস্তিত্ব অস্তিত্বই নয়। প্রাগঐতিহাসিক যুগের সন্ধান মানুষ যে আজ পাচ্চে এবং জানতে পারচে যে তখন মানুষ ছিলনা অথচ পৃথিবী চলছিল (আজও যেমন চলচে, এবং

পরেও যেমন চলবে) তাহলে সেটাকে মিথ্যা বলে সে উড়িয়ে দেয়না কেন ? মানুষ তার মনের যতদূর ক্ষমতা আছে তার মাপকাঠিতেই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিকে দেখবে তবেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা একথা ভাবলে সর্ব্বশক্তিমানকে খর্ব্ব করা হয়না কি ?

এখন মনটি যে কি তার যদি আলোচনা করি ত তার ভাবনা আরো বেড়ে যাবে। মন থেকেই ভাববার শক্তি মানুষ পেয়েচে। মানুষের এই ভাবনা মানুষের শারীরিক সীমার মধ্যেই অবস্থিত। তার এই মন শরীরের অবর্ত্তমানে থাকেনা। তাই মানুষ পৃথিবীতে আসার কথা ভুলে যায় যা'র চিন্তা নিয়েই সে ব্যস্ত। "জন্ম" "মরণ" দুটি শব্দ সকল ভাষায় আছে কিন্তু তার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম (অর্থাৎ জন্মাবার আগেকার অবস্থার নাম) ভূ:লোকের হাতে দিয়েই বেশ নিশ্চিন্ত আছে—ভাবনা কেবল ভবিষ্যতেরই। মরে গেলে কি হ'বে ? বিষয় আসয় ছেলে-পিলে, সে সকলের ভাবনা ত আছেই, তাছাড়া আরো ভাবনা শেষের সে দিনের এবং ভাবনা ভূত-প্রেতের। মনে আবার ক্রমেঃ প্রশ্ন উঠেচে জন্মান্তরবাদের। জন্মলাভের আগেকার কথা মন কি একদিনও ভাবে ?

যাক্ যদি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের দিক দিয়ে আলোচনা করি ত আমরা দেখব যে তাঁরা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে—এমন কি জীব জন্তুরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেখেছেন জড়কে ও চেতনকে। তারপর আমরা দেখব যে তাঁরা ক্রমশ এই দুটীরও উপরে উঠেচেন এবং মনোবাদের দ্বারা জড়ের মধ্যেই চেতনকে দেখচেন। ক্রমশ অণু, পরমাণু, বিদ্যুতাণু, জ্যোতিরণুর পারে গিয়ে হালে আর 'পানি' পাননি। আবার জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবীক্ষণ সাহায্যে তারকামণ্ডলীর ভিতর যেখানে আমাদের চোখ চলেনা সেখানে দেখেচেন নিহারিকার ভিড় (Nebulae) এবং সেগুলিকে অগ্নিগোলক অনুমানেই যে ক্ষান্ত আছেন তা নয় বুঝেচেন যে এদের এক একটির দূরত্ব এত অধিক যে ৫০লক্ষ বৎসর লাগে তার কিরণ আমাদের পৃথিবীর লোকেদের গোচর হ'তে এবং এক একটি নিহারিকা কোটি কোটি তারকার সমষ্টি বা তার উপাদানে তৈরী। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আজ পর্য্যন্ত উপনীত হতে পারেননি, আর তা পারবেন কিনা বলা যায় না। এখানেও মানুষের বুদ্ধিকে এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হয়েচে। তার তথ্য সে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেনি। দৃষ্টি শক্তিকে মানুষ ক্রমাগত বড়র চেয়ে বড় করে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টির দ্বারা প্রসারিত করে চল্লেও সে দেখবে যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি রহস্য তার বোধের অগম্য। তার আসল কারণ হচ্চে সেখানে মানুষ স্রষ্টা নয় এবং যিনি স্রষ্টা তাঁর আকারও মানুষের মত সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই কথাই পুরাকালে মুনিঋষিরা আমাদের দেশে বহু যুগ পূর্ব্বে বলেগেছেন যে "তিনি সূক্ষ্ম হ'তে ও সূক্ষ্ম স্থূল হ'তেও স্থূল," অর্থাৎ তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না, কেননা আমাদের মত স্থূল অস্তিত্ব তাঁর নয়।

মানুষ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে তাকে সমতল দেখচে, যদিও বুদ্ধি দ্বারা বুঝচে যে পৃথিবী সমতল নয় এবং আকাশটিকে দেখচে গোল—যদিও তার সীমাহীন আকার মানুষের বুদ্ধিরও অগোচর। মানুষ আবার দেখচে ফাঁকা আকাশের মাঝে বিন্দু বিন্দু রবি চন্দ্র তারা, আর তার তুলনায় বিরাট দেখচে তার পায়ের নীচের মাটির গড়া এই ধরিত্রী। তবে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা সে যদিও জানচে যে পৃথিবীর চেয়ে চন্দ্র ছোট এবং সূর্য্য বড়। মানুষের দৃষ্টি কিন্তু মানুষকে কেবলই ঠকাচ্চে। মানুষের চোখের কলকব্জার ক্ষমতারও একটা গণ্ডি আছে। কিন্তু কোনো কিছুর সঠিক বিচার করতে হ'লে দৃষ্টি ছাড়াও চাই তার মন এবং মন থেকে উদ্ভূত বুদ্ধি ও জ্ঞান। মানুষ যতই কেননা জ্ঞান বিজ্ঞানের দৌড় দেখাকনা কেন তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা তার নিকট সুদূর পরাহত। তবে চিন্তা করবার শক্তি মানুষের মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এগিয়ে যায় এবং সত্য সন্ধানের দিকে তাকে নিয়ে চলে। জড়বোধের দ্বারা আর তাকে জড় করে রাখেনা।

মানুষের চোখের কলকব্জার অসম্পূর্ণতার কথা আমরা অনেক রকমে প্রমাণ করে দিতে পারি। একতো যাঁর চল্লিশ পেরিয়েচে তিনিই জানেন। তাছাড়া

যেমন জলের মধ্যে একটি সরল সোজা কাঠি ডোবালে সেটিকে আমাদের দৃষ্টিতে ভাঙ্গা দেখাবে, যদিও আসলে কাঠিটি মোটেই ভাঙ্গা নয় তা আমরা বেশ জানি। বৈজ্ঞানিক তার কারণ দেখাবেন refraction কিন্তু এই শব্দটি বৈজ্ঞানিকের গড়া একটি শব্দ প্রাকৃতিক একটি আশ্চর্য্য লীলাকে বোঝাবার জন্যে তিনি প্রয়োগ করেচেন মাত্র। আসলে কিন্তু দৃষ্টি শক্তিটাই এখানে অচল। যেমন অনেক জলের জন্তু আছে যারা জলের নীচে থেকে জলের উপরকার জিনিষ দেখতে পায় periscope এর মত। মানুষকে তার জন্যে এই বিশেষ একটি যন্ত্র periscope উদ্ভাবনা করতে হয়েচে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে পাখীরাই দূরের জিনিষকে কাছে দেখে এবং বড় দেখে; তাই তারা অত উঁচু আকাশে ওড়ার পর যখন গাছের ডালটিতে এসে বসে তখন সেই ডালটিকে তারা সহজে বেশ বড় আকারে (magnified) দেখতে পায়। মানুষকে তার জন্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করতে হয়েচে। একটি গরুর সামনে লাল রঙ যদি ধরা যায় ত গরুটি যায় ভয় পেয়ে—গরুটি কি ঠিক লাল রঙটিকে লালই দেখে? এ বিষয়টি সামান্য হলেও গবেষণার যোগ্য নয় কি? আমাদের মনে হয় রঙের বোধ মানুষের ঠিক যেরূপ জন্তুদের তা নয়। তাদের চোখের কলকব্জায় কতকগুলি রঙ ধরা পড়ে এবং কতকগুলি ঠিক মানুষের চোখের মত প্রতিফলিত হয়না। মানুষ তার চোখের দর্পণের গঠন অনুযায়ী দুনিয়াটিকে ঠিক যেরূপ দেখে, জীব জন্তুরাও কি ঠিক্ তাই দেখে? তা নয়। একটি টিকটিকি দেয়ালের উপর থেকে যেভাবে সব জিনিষ দেখে, একটি মাছি তার চোখের পর্দায় হাজারটি প্রতিবিম্ব একসঙ্গে পড়ার দরুণ যা দেখে মানুষ তা দেখতে পায় কি?

মানুষের ঘ্রাণশক্তিও অনেক জন্তুর চেয়ে কম। বাঘ হরিণ, কুকুর প্রভৃতি জন্তু অনেক দূর থেকে ঘ্রাণের দ্বারা পথ চিনে চলে এবং আহার্য্য সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু মানুষ এত বড় জাতের প্রাণী হয়েও ঘ্রাণশক্তি তার নেই বল্লেই হয়। জন্তুদের মত মানুষ জলের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে পারেনা। এখানেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমাদের কাণও অল্প দূরের কথা শুনতে পারেনা। তার জন্যে বেতার ও তারের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েচে আবিষ্কার করবার। মানুষ শব্দকে ব্রহ্ম বলেচে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো শব্দই একটা যায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে মিলিয়ে যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন একটি বিরাট সরোবরে ঢিল ফেললে যেমন জলের উপর গোল হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে এবং ক্রমশ সেটি বড় হয়ে দূরে সরে সরে যায়, আর চোখের অগোচরে তার জের চলে সরোবরের শেষ কিনারা পর্য্যন্ত, তেমনি একটি শব্দ কোথাও উঠলেই সেটি ঐভাবেই দূর হতে দূরে সরে সরে যায় এবং অবশেষে আমাদের শ্রবণশক্তির অতীতে গিয়ে ধ্বনিত হ'তে হ'তে চলে বিরাটের কোলে—তার আর শেষ হয় না কখনো। এই একশব্দ বহুশব্দের সমষ্টিতে যায় মিশে এবং তখন তা আমাদের কাছে শোনায় নিস্তব্ধ। মানুষের কাণের শক্তিও এমনি ক্ষুদ্র।

মানুষের শরীরের শ অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় ত কিছুই নয়, তবুও মানু তে কইতে পারে বলেই তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির রেচে নিজেদের মধ্যে এবং জগৎটিকে দেখচে নি র মাপকাঠিতে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনের জোরে যে অসাধ্য সাধন করচে যদিও বন্দুক প্রভৃতি জীবহত্যার যন্ত্রের উদ্ভাবনের দ্বারা কিন্তু গায়ের জোরে সে অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে তুলনায় কিছুই নয়। বিমানপোতে আকাশে ওড়বার বেলায়ও মানুষ দেখেচে যে সেখানেও তার জন্যে একটি গণ্ডি টানা আছে। অতি উর্দ্ধে উঠলেই জলের উপরে পুঁটিমাছটির যা দশা তারও দশা হয় তদ্রূপই।

এমনি ভাবে একে একে সকল বিষয় আমরা চিন্তা করে যদি দেখি ত দেখব যে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় আমরা যা বুঝি বা ভাবি তার তুলনায় বিরাটের মহিমা কত বড় এবং তার আমরা কতটুকুমাত্র বুঝতে বা আয়ত্ত করতে পারি। যে পৃথিবীতে আমরা বেঁচে আছি অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলচি তার আমরা কিছুই জানিনা, তার আদি ও অন্তের কথা আমাদের কাছে একটা speculation মাত্র কি নয়? মায়াবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বেদান্তবাদ প্রভৃতি বাদানুবাদের মধ্যেই পর্য্যবসিত বলে মনে হয় না কি? আমাদের শক্তি নেই যা করে একটা

ছেলের হাত থেকে মারবেলটি কেড়ে নিয়ে অন্য একটি মারবেলকে টিক করে মারি। তার জন্যে আমাদের রীতিমত দরকার হয় তালিম দিয়ে শেখার। আমরা ভূমিষ্ট হই যখন তখন আমরা থাকি একটি প্রাণবান জড় হয়ে। আমাদের শক্তি থাকেনা চলবার, বলবার, ভাববার, তাও ক্রমশ হয় শিখতে এবং ক্রমশ জানতে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে মানুষের জন্মাবার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে তার দেহে মনের সঞ্চার হয়। তাকে তাঁরা descent of mind বলেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ মনোবাদের দ্বারা জগৎকে জানতে পারে যখন তার ভূমিষ্ঠ হবার অনেক পরে ধীরে ধীরে মনের সঞ্চার বা আবির্ভাব হয় তখন। তার এইভাবে সীমা টানা আছে সবেতেই—আর বিশ্বনিয়ন্তার রাজ্যে সীমা নেই কিছুতেই।

আমরা আমাদের মাটির বাসা এই দেহ এবং এই পৃথিবীর মত একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। বিরাট আকাশ যার সীমা নেই তাকে আমরা ভূমা বা অনন্ত আখ্যা দিয়েই নিশ্চিন্ত। এখন ধরা যাক একটি—এবং একটি—অর্থাৎ একটি যা আমরা দেখি বা অনুভব করি এবং অপরটি যা আমাদের অগোচর এবং যা আমরা ধরতে ছুঁতে পারিনা। একটি আমাদের নিকট পূর্ণ এবং অপরটি শূন্য। কিন্তু এই দুটিকে ধারণ করে আছে যে এক তারই কথা প্রাচীন ঋষিরা ব্যাখ্যা করচেন উপনিষদে এবং সেই এক থেকে এই দুয়ে তাঁরা আবির্ভাব কল্পনা করচেন যেন পুরুষ এবং প্রকৃতি দ্বিধা হয়ে এক থেকে দুই আকারে ফুটে বেরিয়েচে। এই জটিল বিষয়-টির বিষয় মানুষের ভাবনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে বিরাটের দিকে সব প্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দেশের ফল-মূলাহারী ঋষিরা বহুযুগ পূর্ব্বে তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মানুষেরা অনন্তের তথ্যের বিষয় গবেষণার কথা দূরে থাকুক পেটের ধান্দায় বনে বনে শিকার খুঁজে বেড়াতেই কেবল জানতেন। যাই হোক এই এক থেকে দুইয়ের অর্থাৎ Positive এবং Negative এর সংযোগে যে বহুর আবির্ভাব সম্ভব হয়েচে তা প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাচ্চি। বৈদ্যুতিক জগতে ত এই পুরুষ ও প্রকৃতির খেলা সহজেই ধরা পড়ে। Negative ও Positive না হলে একটি অপরটির অভাবে অচল ও অস্তিত্বহীন। অণু পরমাণুর ভিতরও বিদ্যুতাণু আছে এবং তারও মধ্যে এই দুই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি Dy-namic এবং অন্যটি Static একটি ঋজুরেখা এবং অন্যটি ঘূর্ণায়মান গোল রেখা, এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শক্তি বিদ্যুতাণুর মধ্যে চলচে। যে শূণ্য নভমণ্ডলকে আমরা ফাঁকা দেখি তার সমস্তটার ভিতর এই বিদ্যুতাণুতে একে-বারে কানায় কানায় পূর্ণ আছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা এখন জানতে পেরেচেন। যদি এই Negative ও Positive এর মধ্যে একটিরই কেবল প্রাদুর্ভাব হত এবং অন্যটি যদি না থাকত তো বিশ্বসৃষ্টির ভিতর মানুষ, জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি কিছুরই উপযোগী এই পৃথিবীটির সম্ভাবনা হ'তনা। তাহলে হয় Positive হয়ে Concrete জড় হয়ে থাকত—আকাশমার্গ হয়ে যেত একবারে ঠাসা, শ্বাসপ্রশ্বাসের বা চলাফেরার উপায় থাকতনা প্রাণীদের পক্ষে। আবার শুধু Negative বা একেবারে Abstract হয়ে থাকলেও কেবলই বায়ু বইতো, দাঁড়িয়ে চলবার বা বাস করবার মত কঠিন মাটির কোল থাকতনা এই পৃথিবী-টির মত। তাই দেখা যাচ্চে যে যেমন শূন্য অর্থাৎ 'নেই' শব্দ চাই তেমনি পূর্ণ অর্থাৎ আছে এই শব্দেরও প্রয়োজন। কেবল 'আছে' জানা থাকলে তার অভাব জানা যায় 'নেই' শব্দটি থাকার দরুণই। আঁধার আছে বলেই আলোকে বুঝি, কেবল আলো কেবল আঁধার থাকলে আমাদের সেবিষয় কোনোই বোধগম্য হ'তনা। এখানেও মানুষের বোধ Comparative এবং এখানেও তাই তার Limi-tation দেখা যায়।

এখন একবার ভাবা যাক মানুষ বা জীবজন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ করে কিনা, মানুষ আবার মানুষ হয়েই ফিরে আসে কিনা, জন্তু জন্তু হয়েই ফিরে আসে কিনা এবিষয় অনেক গবেষণা দেশ বিদেশের বিচিত্র কাহিনীতে বর্ণিত আছে। কিন্তু কেউই আজ পর্য্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। জলে বুদ্বুদ

উঠচে আবার সেই মুহূর্ত্তেই জলে মিলিয়ে যাচ্চে—আবার পরক্ষণেই আবার নতুন একটি বুদ্‌বুদের আবির্ভাব হচ্চে কিন্তু কেউই হলফ করে কি বলতে পারেন যে ঠিক যে বুদ্‌বুদটি জলে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল সেইটিই আবার ভেসে উঠল নূতন হয়ে? মানুষের জীবন ও মরণের অবস্থাও কি ঠিক তাই নয়? কে বলতে পারে প্রতিনিয়ত যারা জন্মাচ্চে তারা আগে ইতিপূর্ব্বেই এসে গিয়েছিল এবং আবার তারা পুনরায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করে মাতৃগর্ভে ফিরে আসচেন। যদি মেনে নেওয়া যায় যে সব প্রথমে কেবলমাত্র এক মনু বা আদম ছিলেন তাহলে ভাবতে হবে তার পরবর্ত্তী মানবেরা যারা জন্মগ্রহণ করলেন তাঁরা এলেন কোথা থেকে? আদ্য মনু বা আদমের কিছু পুরুষ পরে না হয় ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে যারা ইতিপূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছিলেন তাঁরাই আবার মাতৃগর্ভে এসে দেহান্তরে প্রবেশ করলেন। আদিম মানুষদের তাহলে কি দশা হবে?

মানুষেরা কার্য্য ও কারণ এই দুয়ের দ্বারাই সব জিনিষের বিচার করে থাকেন, অতএব তারই জন্যে এই বিপদ ঘটে তাঁদের। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমাদের বুদ্ধির একটা সীমা বা গণ্ডি আছে তাহলে এই সকল বিষয় আমরা কার্য্য ও কারণ পরম্পরায় না বোঝবার চেষ্টা করে আমরা সোজাসুজি কোথায় গিয়ে আমাদের ঠেকুচে সেই কথাই সঠিক জানতে পারব এবং পরমপিতার নিকট মাথা হেঁট করতে শিখব। আমাদের বুদ্ধির সীমাটি আমাদের বুদ্ধির দ্বারাই জানব এবং এরই সাধনা হল মানুষের প্রধান এবং প্রথম সাধনা।

মানুষের দেখার সুখ, ছোঁয়ার সুখ, আঘ্রাণের আনন্দ এইসব ইন্দ্রিয়ভোগ্য রস যা কিছু পায় তাই তারা চায়, তার বাইরে তাদের স্থান নেই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসানুভূতির গণ্ডির বাইরে যে এক অপূর্ব্ব বস্তু আছে এবং তার বিষয় জানবার বা উপলব্ধি করবার যে শক্তি সীমাবদ্ধ সেইকথাই জানতে হবে জ্ঞানের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা, কেবল কতকগুলো জিনিষকে অন্ধের মত বিশ্বাস করে মেনে চল্লেই চলতি মানবধর্ম্ম পালন করা চলতে পারে বটে কিন্তু মানুষের জ্ঞান ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'তে পারে না।

তাই বলি:

যদি চোখের দেখার বাহিরেতে
মন খুঁজে পায় তারে
আপনি বারে বারে
চমক তখন ভাঙবে আমার
জাগব স্বপন পারে।
দুদিন এসে ভুলেছি যা'
চির দিনের কথা,
জাগবে তখন প্রাণের মাঝে
তারি বেদন ব্যথা।
চোখের দেখা মিলিয়ে যাবে
প্রাণের দেখার ধারে
সকল প্রাণের মিলন সুখে
একটি প্রাণের হারে
আলোয় অন্ধকারে—।

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবন নদীর খেয়াঘাটে পারের লাগি এলেম আজি।
ওগো আমার পরাণ প্রিয়! পার করহে পারের মাঝি!
ঘরের আমার নাই ঠিকানা,
পথও আমার নয়কো জানা,
চিরদিনের পথেরি ডাক হিয়ার মাঝে উঠছে বাজি!

পাথেয় মোর নাইকো কিছু, ডাকছে তবু পথের মায়া;
আজিকে এই ক্লান্তক্ষণে সন্ধ্যারাণীর পড়লো ছায়া;
আমার ব্যথার এ-গানখানি,
বন্ধু! তুমি ভুলবে জানি—
তবু আমার যাবার বেলায়—গেলাম রেখে সুরের সাজি!

হিন্দুসভ্যতায় দ্রাবিড়েরদান

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ

ইংরাজী অভিধানে সভ্যতা অর্থে দুইটি প্রতিশব্দ পাই—Civilization ও Culture। এই প্রবন্ধে হিন্দু সভ্যতা অর্থে হিন্দু culture বুঝিব। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্ম সাহিত্য এবং শিক্ষার রীতি ও নীতি, এই সভ্যতার উপাদান। Civilization অর্থে বুঝিব সামাজিকতার ভাব। সভ্যতা সামাজিকতার গুণ বা বৃত্তি।

হিন্দু সভ্যতার কোনও বিশিষ্ট সংজ্ঞা কেহই আজ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। যাঁহারা বেদ ও উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের আচরণ করেন তাঁহাদিগকে আমরা হিন্দু বলিতে পারি, এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের তদানীন্তন যে সভ্যতার সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, তাহাকে অন্য কোনও সংজ্ঞা দিবার হেতু না থাকায়, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিব। যেমন ঋগ্বেদে অধিকারী জাতিকে আর্য্য বা হিন্দু বলিলেও তাঁহারা একই জাতি, অথবা বিভিন্ন জাতির সমন্বয়, কিনা সিদ্ধান্ত করা যায় না, তেমনই দক্ষিণভারতে যে সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সহিত হিন্দুরা সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের আদিম অধিবাসী কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এই মতভেদের সমন্বয় অথবা সমাধান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার যে সংঘাত হইয়াছিল তাহার প্রতি বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতা কতটা ঋণী তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সকলেই জানেন হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন মৌলিকত্ব কিছু থাকুক বা না থাকুক, বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতায় বহু পরদেশী ভাবের সংমিশ্রণ হইয়াছে। শুধু হিন্দুসভ্যতা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষা ও দীক্ষা অনেকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যদি জাতীয়তা ক্ষুন্ন হয় তাহা ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সভ্যতার আদান প্রদানে যে জাতীয়তা ক্ষুন্ন হইবে এমন কোনও কথা নাই। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও ব্যাবিলন ও ইরাণের আদিম সভ্যতার ভিতরে একাধিক যোগসূত্র পাওয়া যায়। য়ুরোপীরা সভ্যতায়ও প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার নিকট অনেকাংশে ঋণী। আজ পর্য্যন্ত জগতে কোনও সভ্যতাই তাহার মৌলিক আভিজাত্য রক্ষা করিতে পারে নাই। সংস্কার বিড়ম্বিত হিন্দুধর্ম্মকেও আজ লোকাচারের পর্য্যায়ে আসিয়া আপনার আভিজাত্যকে বহুপ্রকারে খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুরা ঘরে ও বাহিরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে এক কৃষ্ণকায় আদিম জাতির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অনেকের চক্ষেই হয় ত অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাতের শোণিতস্রোত প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যে আর একটি সংঘর্ষ চলিতেছিল তাহার খবর কয়জন রাখিয়াছিলেন? ইহা হইল একান্ত ঘরের কথা।

বৈদিক হিন্দুরা ছিলেন প্রকৃতির উপাসক। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরুৎ ইত্যাদি—ছিলেন তাঁহাদের উপাস্য দেবতা, এবং তাঁহাদের মন্ত্র ছিল, প্রকৃতি পূজার স্তব। আর্য্যদিগের জয় যাত্রার প্রারম্ভেই কিন্তু আমরা দ্রাবিড়ীয় প্রভাব দেখিতে পাই। মহাভারত, রামায়ণ এবং মনুসংহিতায় অসুর এবং নাগদের বর্ণনা পাই। তাহাদের রীতি নীতি নিম্নতম সভ্যতার পরিচায়ক। প্রত্নতাত্ত্বিক ওল্ডহ্যাম সাহেব বলেন যে ঋগ্বেদে বর্ণিত অসুর এবং সর্প, মহাভারত এবং মনুসংহিতায় বর্ণিত অসুর এবং নাগ, এবং পুরাণে বর্ণিত অসুর এবং দৈত্য আর্য্যদিগের পরিপন্থী অনার্য্য আদিম অধিবাসিদিগকে অভিহিত করে। অসুরেরা যে দ্রাবিড়ীয় একথাও তিনি বলেন।

বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতার আচার ও প্রকারগত বৈষম্য বড় কম নয়। উক্ত বৈষম্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম দ্রাবিড়ের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিতে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কি

সংস্কার, কি লোকাচার, কি গ্রাম্যকথা, কি রাষ্ট্রনীতি এমন কি সমষ্টিগত চিন্তাধারাতেও হিন্দুরা দ্রাবিড়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ফলে দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল, এবং আর্য্যেরা এই সমন্বয় আশ্রয় করিয়া সভ্যতার যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তাহার স্বরূপ মনে রাখা অবহেলার বিষয় নহে।

প্রধানতঃ দুইদিকে হিন্দুধর্ম্ম দ্রাবিড়ের দ্বারায় প্রভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কার বিড়ম্বিত হইয়া লোকাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। বৈদিক হিন্দুগণ প্রকৃতির মধ্যে এককে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন এবং সেই এককেই বহুরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। নিম্নতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া লোক-ধর্ম্ম বস্তু পূজায় পরিণত হইল। দ্রাবিড়ের নিকট হইতে হিন্দুর লোকাচার গত ধর্ম্ম প্রধান নিশানা পাইল।

দ্রাবিড় সভ্যতার দ্বিতীয় নিশানা পাই রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি পরিকল্পনায়। গ্রাম্যসভ্যতা গ্রাম্যশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্য্যকরী হইয়াছে, এবং হিন্দুর শাসনতন্ত্র এই দান স্বীকার করিয়া লওয়ায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

প্রথমে লোকধর্ম্ম ও লোকাচারের কথাই ধরা যাউক। প্রকৃতি পূজার গোড়াকার কথাই হইল শক্তিপূজা। শক্তিপূজার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, লোক ধর্ম্মে আমরা যে শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা করি, সেই প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা আমরা পৃথিবীর বহু আদিম অধিবাসীর ইতিবৃত্তে পাই। অসভ্য বর্ব্বর জাতি যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করিয়া যখন হল স্কন্ধে লইল, তখনই ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তিকে সে মাতৃরূপে বরণ করিয়া লইল। মানুষের ইহাই হইল প্রথম মাতৃপূজা। নবপত্রিকাকে বরণ ইহারই বর্ত্তমানকালীন রূপান্তরমাত্র। উর্ব্বরা ভূমি হইতে শস্য ও ফল উৎপন্ন হইতেছে, হয়ত কোনও বৎসর নিষ্ফলা হইতেছে, মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত এইরূপ কল্যাণ বা অকল্যাণ জড়িত ঘটনাবলির দ্বারা অসভ্য জাতির শিশু-মনে পূজা ও প্রার্থনাদ্বারা মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইল। শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকলস্থানেই যেখানে আদিমসভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে মাতৃপূজার অছিলায় পৃথিবীর সৃষ্টি-করী শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় জাতি এই পূজাকে বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা ভূষিত করে। নিরক্ষর, নিরহঙ্কারী, অসভ্যজাতির পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে পুনঃপুনঃ শস্যভার বহন করিয়া জননী ধরিত্রীর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং যথাবিহিত পূজার দ্বারা সেই নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। ছোটনাগপুরে কোন রমণীরা নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গীতের তালে তালে জানু পাতিয়া বসে এবং মাটিতে বারবার মাথা ঠেকাইতে থাকে, যেন বলিতে চায়, হে মাতা বসুন্ধরা, তুমি আবার উর্ব্বরা হও। কখনও কখনও মাতা বসুন্ধরা অত সহজ-তুষ্টা হন না এবং তাঁহাকে প্রীত করিতে হইলে নররক্ত নিবেদন করিতে হয়। প্রকৃতির সন্তোষকল্পে নরবলির প্রথা ভারতবর্ষের অনেকস্থলেই অনুষ্ঠিত হইত এবং রক্ত-দানের প্রথা আজও আছে।

এই সম্পর্কে একটা কথা বলা যায়। হিন্দু লোকাচারে আমরা মাতৃরূপের দুইটি নিদর্শন পাই। একটী নিদর্শনে মাতা করুণারূপিণী, তিনি শস্যদান করেন, জীবের বংশরক্ষা হয় এবং ফুল, ফল ও দুগ্ধে তাঁহার পরিতুষ্টি হয়। আর এক নিদর্শনে মাতা জিঘাংসাময়ী, এবং তাঁহার নৈবেদ্য নররক্ত। প্রথমরূপে মাতা দেবী, কন্যা, কন্যাকুমারী, সর্ব্বমঙ্গলা—এবং আর এক রূপে মাতার করালরূপ—চামুণ্ডা, কালী বা রক্তদন্তী। মাতার এই দুইরূপ দ্রাবিড়ীয় পরিকল্পনাতেও পাওয়া যায় কিন্তু তৎপূর্ব্বে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ব্বর জাতিরা বিচিত্র অনুষ্ঠান করে, তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুনরুদ্ধারের আর একটি উপায়, ধরিত্রীদেবীকে তাঁহার পতির সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া। এই দেব-দম্পতীর পরিকল্পনায় আদিম জাতি-দিগের শিশু চিত্তের আর একটি বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পতিদেবতাটির রূপ সর্ব্বত্র এক নয়। কিন্তু মানুষের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত যে রূপেই হউক তাঁহার অস্তিত্ব যে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়, দ্রাবিড়ীয় লোক প্রবাদে তাহার অনেকগুলি

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হিন্দু লোকাচারেও তাহার অনুকরণ বড় কম নহে।

আমাদের গ্রামে যে বুড়াবুড়ী পূজা হয় তাহা দ্রাবিড়ীয় দেব-দম্পতী (Divine Pair) প্রবাদের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন ইঁহারা মানুষের আদিম জনক জননী, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আদম ও ইভের মত। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে কোন নৈসর্গিক বিপদ উপস্থিত হইলে অথবা মহামারীর সময় ইঁহাদের পূজা হয়। হিন্দুসভ্যতার আরো একটু উচ্চস্তরে আমরা শীতলা দেবী ও তাঁহার পতি ঘণ্টাকর্ণের দেখা পাই। শীতলামাতা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অন্যপক্ষে, ঘণ্টাকর্ণ, ধর্ম্মের ক্রমবিবর্ত্তনে, শৈবধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইতেছেন। রাজপুতানায় আমরা পাই একলিঙ্গ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গৌরীকে; একলিঙ্গ পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির প্রতীক; তিনি কোথাও ঈশ্বর কোথাও বা শিব; এবং গৌরী অন্নপূর্ণা। দক্ষিণ ভারতবর্ষে আছেন বিষ্ণু এবং তাহার পত্নী ভূমিদেবী, অর্থাৎ পৃথিবী। কল্পনার আরো একটু উচ্চস্তরে আমরা পাই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, নরনারীর যৌনমিলনের, তথা সৃষ্টির রূপক।

আমাদের দেশে গ্রামদেবতার পূজার প্রচলন আছে। মনে হয় এই গ্রামদেবতাকেও আমরা দ্রাবিড়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। অভিজ্ঞ গবেষকদিগের মতে, গ্রামদেবতার পূজায় শুধু দ্রাবিড় ও হিন্দুসভ্যতার মিলন হয় নাই, আরো অনেক বিদেশীয় ভাব বা প্রভাবের দ্বারা উহা আক্রান্ত হইয়াছে। কাজেই গ্রামদেবতার পূজার রূপের কোনও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়না। কোনো কোনো স্থলে বস্তুপূজার ভিতর দিয়া প্রাকৃতিক শক্তির পূজাই হইল গ্রামদেবতার পূজার উপাদান। আবার কোনও কোনও স্থলে গ্রামদেবতার শিবের না হউক শিবের অনুচরদের আরাধনা বা মনস্তুষ্টির উপায় মাত্র। গ্রামে যাঁহারা অকাল মৃত্যুতে বা অপঘাতে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়াছেন কালক্রমে তাহারাও গ্রামদেবতা রূপে সাধারণের উপাস্য হইয়া উঠেন। বংশপরম্পরায় এই পূজা চলিতে থাকিলে গ্রামবাসীরা ক্রমশঃ তাহাদের দেবতার জন্মকথা ভুলিয়া যায়, কিন্তু পূজার আড়ম্বরের ও পুরোহিতের দক্ষিণার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেনা। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও হয়ত মানুষের অকল্যাণ হইতে কল্যাণ সাধনে তৎপর হন। হয়ত এইরূপেই ব্রহ্মদৈত্যের উদ্ভব হয়। মুসলমান ধর্ম্মেও পীর বা ফকিরের পূজা আছে।

অনেক গ্রামদেবতাকেই আমরা দ্রাবিড়ীয় জাতিদের নিকট হইতে ধার করিয়াছি। দ্রাবিড়ীদের এক দেবতা ভৈঁরো। অনেকে বলেন এই ভৈঁরো আমাদের হিন্দুধর্ম্মে আসিয়া হইয়াছেন ভৈরব বা কালভৈরব। কালভৈরবের আকৃতি পরিকল্পনায় দ্রাবিড়ের অনেক কিছু পাই। তাঁহার অষ্টাদশ হস্ত, গলায় নরমুণ্ডমালা, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে সর্পবেষ্টনী, মস্তকে ফণী, একহস্তে কৃপাণ, অন্যহস্তে রক্তভাণ্ড। এই তাণ্ডবরূপ করালরূপিণী কালীর পতির যোগ্য সাজ বটে! ভৈঁরোর সমতুল্য উদাহরণ বানর-দেবতা হনুমান। রামায়ণের যুগ হইতে হনুমান সাধারণের, বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীদের পূজনীয় দেবতা। তাহার অপর নাম মারুতি বা মহাবীর। রামায়ণের হনুমান যে অনার্য্য দেবতাদিগের একটীর অপভ্রংশ এবিষয়ে বর্ত্তমানে আর বিশেষ সন্দেহ নাই। মির্জ্জাপুর ও মধ্যভারতের দ্রাবিড়ীয়দের মধ্যে এই হনুমানের পরিচয় আছে, তবে তাহার বানরত্বের মধ্যে কেবল এক লেজখানি ছাড়া আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। রামায়ণের হনুমান আকৃতিতে বানর হইলেও বীর্য্যে ও শৌর্য্যে 'অতি-বানর।' মানুষের তুলনায় তাহাকে হীন করিবার চেষ্টা নাই; ইহা হইতে মনে হয় যে বলি সুগ্রীবের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামের অনুরক্ত যে দলকে বানর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং লঙ্কায় অনার্য্য সমভিব্যবহারে আর্য্যের যে যুদ্ধাভিযান বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আগাগোড়া কোন একটি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে কিংবা বর্ণনীয় কোন একটা বড় রকমের গলদ আছে। যাহাই হউক নৃতত্ত্ববিদরা হনুমানের সহিত দ্রাবিড়ীয় দেবতার ঐক্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস গঠনে একটি নূতন ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য সভ্যতার ইতিহাস এখনো স্থির সিদ্ধান্ত দেয় নাই। মির্জ্জাপুরে মুইরীরা মহাবীরকে লেজ দিয়া-

পুষ্পপাত্রের লেখিকামণ্ডলী



শ্রীগিরিবালা দেবী



রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী



শ্রীসতী দেবী



শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পুষ্পপাত্রের লেখিকাগণ



শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী



শ্রীপ্রভা দেবী গঙ্গোপাধ্যায়



শ্রীজ্ঞানমোহিনী দেবী



মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

ছেন, ভুঁইয়ারা মহাবীরকে নাম দিয়াছেন "বোরাণ" বা সূর্য্যদেবতা। রামায়ণে হনুমানের সহিত সূর্য্যের দেখা হইয়াছিল বটে কিন্তু সূর্য্যের তাহাতে মানহানি হইয়াছিল। মোট কথা এই যে লোকধর্ম্ম যখন প্রাচীনের সাহায্য লইয়া নূতন দেবদেবী সৃষ্টি করে, তখন সেই নবপ্রবর্ত্তিত পূজাপদ্ধতিতে অথবা দেবতার রূপকল্পনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সামঞ্জস্যে যেমন আশা করা যায় না, তেমন পাওয়াও যায় না। Lyall তাহার Asiatic Studies এ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বহুপূর্ব্বে রাজপুতানার মীণারা শূকর পূজা করিত। পরে তাহারা যখন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল তখন সেই শূকর ফকিরে রূপান্তরিত হইল! তাহারা পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে আসিলে সেই শূকর হইল বিষ্ণুর বরাহ অবতার! অবশ্য প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ ইতিবৃত্ত পুনর্গঠন করা সম্ভব নহে যদিও এই পুনর্গঠনের ভিতর দিয়াই হিন্দুরা আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম অনেকস্থলে রক্ষা করিয়াছে। এই ধর্ম্ম রক্ষায় তাঁহারা শুধু আদিম অধিবাসীদিগের দেবতা গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই এমনকি তাহাদের পুরোহিতদেরও টানিয়া হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই, হিন্দুধর্ম্ম ও কেবলমাত্র লোকাচারের মধ্যে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার অনেকখানিই সহজসাধ্য হইয়া আসে; এবং কেন যে আমরা অবনত অনার্য্যদিগকে হিন্দুধর্ম্মে উন্নতি করিতে পারিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের উচ্চতাকে অনেকখানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছি তাহারও যোগ্য কারণের অনুসন্ধান পাই। শিবপূজা ও কালীপূজার অনেকগুলি অনুষ্ঠান এই অবনতির পরিচায়ক, এইরূপ অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহার জন্য দ্রাবিড়ীয় জাতির সহিত আমাদের সংস্পর্শ অনেকাংশ দায়ী।

বস্তুতঃ, প্রাচীন দ্রাবিড়ীয়দের ভিতরে শিবপূজার যে সমস্ত উপাদান ও উপাচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর। পরে অবিমিশ্র হিন্দুধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের শিবপূজা অতি উচ্চাঙ্গের ভক্তিবাদে পরিণত হয়। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 'নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। শৈবদের দ্রাবিড়ীয় মন্ত্রে প্রেম ও ভক্তির যে আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস পাওয়া যায় তাহা শিবের মহিমায় পরিপূর্ণ এবং মায়া ও কর্ম্মফলের বেষ্টনী হইতে মুক্তিলাভের আনন্দে আনন্দিত। পাশ্চাত্য মনীষীর মতে এই শৈবধর্ম্মকে হিন্দুর ভাগবদ্ গীতা প্রভৃত ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় শৈবধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে। এই পরিবর্ত্তিত শৈব ধর্ম্মকে হিন্দুরা আবার গ্রহণ করিয়াছেন শঙ্কর বাদের ভিতর দিয়া। অপরপক্ষে অব্রাহ্মণ দ্রাবিড়ীয়দের পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের অবাস্তবতা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দ্রাবিড়ের নিকট বিশ্ব বস্তুসম্ভারে সজ্জিত, বস্তুর ভিতর দিয়াই তাহারা দেবতাকে বুঝিতে চায়। কাজেকাজেই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের গোড়াকার কথা শিবপূজা। কিন্তু এই শিবপূজার সাধারণ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে যে শিব ও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল তাহার সহিত আদর্শগত পার্থক্য থাকায় শঙ্করবাদকে দ্রাবিড় বস্তুতন্ত্রতা ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতার মিলনের সোপান বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

দ্রাবিড়ের শাসনতন্ত্র বোধকরি তাহাদের বস্তুতন্ত্রতারই একটা দিক। দেবপূজার রীতিনীতিতে তাহারা হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে ছিল, কিন্তু রাষ্ট্র পরিকল্পনায় তাহারা হিন্দুদের অগ্রগামী ছিল। তাহাদের রাষ্ট্রনীতির মূলকথা ছিল সমষ্টি জীবনের বিকাশ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ব্যষ্টির উপরে, যদিও বিংশশতাব্দীতে এই ভিত্তি টলিয়াছে। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের নবপর্য্যায়ে রাষ্ট্রনীতিবাগীশের দৃষ্টি আবার সমষ্টির অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে। দ্রাবিড়ীয়রা বহুপূর্ব্বেই এই তথ্যটি বুঝিয়াছিল এবং সমষ্টিকে সমাজগঠনের কেন্দ্র করিয়াছিল। বৈদিক হিন্দুদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে কেবল অসভ্য অনার্য্য বর্ব্বরজাতির বাসস্থান ছিল বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বৈদিক হিন্দুসভ্যতার মতই বাহির হইতে ভারতবর্ষের ভিতরে আসিয়া আদিম নেগ্রিটোজাতির সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়াছিল। অবশ্য এ বিষয়ে চরম তথ্য এখনো সংগৃহীত হয় নাই। সে যাহাই হউক ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের যে নিশানা পাওয়া যায় তাহার অনেকখানিই গঠন করিয়াছিল দ্রাবিড়ের সভ্যতা ও তাহার উদ্ভাবনী শক্তি। সভ্যতার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় তাহারা বৌদ্ধভিক্ষুদিগেরও অগ্রদূত ছিল। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিদিগের চরিত্রের ও আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং হিন্দুসভ্যতার নূতন গঠনে তাহারাই সাহায্য করিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রভাব আমরা এখনো পাই হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলসূত্রের ভিতরে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মূলসূত্র কেন্দ্রীয়তা (centralisation) প্রাচ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। তাই আমাদের এখানে গ্রামে স্বায়ত্তশাসন ছিল, এবং গ্রামের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণের সাহচর্য্যের উপর হইয়াছিল। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকারের ভাগ ও বিভাগ কর্ম্মচারীর

তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার—রাষ্ট্রশাসনের যতকিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল তাহার জন্য হিন্দুরা প্রধানতঃ এবং মুখ্যতঃ দ্রাবিড়সভ্যতার নিকট ঋণী। মণ্ডলিক ও পঞ্চগ্রামিকের অস্তিত্বের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধজীবনের পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন মনে করি যে এই প্রবন্ধ পাঠে যদি কাহাও মনে হয় যে হিন্দুসভ্যতা, দ্রাবিড়-সভ্যতার নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র, সে ধারণা ভ্রমাত্মক হইবে। এ প্রবন্ধে আমরা হিন্দুসভ্যতায় দ্রাবিড়ের দান আলোচনা করিলাম. উভয়ের বৈষম্য প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল না। ধর্ম্মে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা হিন্দু লোকাচারকে স্পর্শ করিয়াছে বটে কিন্তু বেদ ও উপনিষদ, শ্রুতি ও স্মৃতি হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই আভিজাত্যের মূল্য নির্দ্ধারণে অতীতের ঐতিহাসিক বা ভবিষ্যতের সত্যদ্রষ্টা সমর্থ হইবেন কিনা জানিনা, কিন্তু আজ জাতীয় অধঃপতনের বাণী কানে শুনিতে শুনিতে সত্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। হিন্দুধর্ম্ম অপরের দান গ্রহণ করিয়াছে বটে এবং করিতেছেও, এমন কি ঋগ্বেদেও তাহার ছায়া পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হইতে সেই সমস্ত দান আপনার করিয়া লইয়াছে। আজ নিজের সত্বাকে ভুলিবার আশঙ্কা হইয়াছে একটা বৃহত্তর শক্তির উন্মাদনায় পড়িয়া। যে শক্তিকে ভারতবর্ষ অস্বীকার করিতে পারে নাই। আমাদের ধ্যান ও ধারণা আমাদের পঞ্চযজ্ঞের আদর্শ সেই শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা তাহা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার হাতে রহিল, যদিও তাহাতে নিশ্চিন্ত হইবার কিছু নাই। রাষ্ট্র শাসনেও ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী আছে সেই বাণী দ্রাবিড় রাষ্ট্রনীতির নির্জীব রূপান্তর মাত্র নহে। হিন্দুর সংসারধর্ম্ম, অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিচিত্র সামঞ্জস্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ, যাহা হিন্দু-ধর্ম্মকে বিশেষরূপ দান করিয়াছে, তাহা হিন্দুরা দ্রাবিড়ের নিকট হইতে পায় নাই। কিন্তু তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। অতি অল্প কথাই এই প্রবন্ধে বলা হইল। হিন্দুত্বের একটা দিক অতি সংক্ষেপে দেখানোই ইহার উদ্দেশ্য। বিশদ আলোচনা যোগ্যতর হস্তের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

তটিনীর প্রেম

শ্রীমতিলাল ধর

[ফরাসীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসিক ও নাট্যকার ভিক্টর হিউগোর" The stream and the ocean কবিতার ছায়া]

গিরিচুড়া হতে তুষার অর্ঘ্য,
বাহিয়া যতন করে,
তটিনী ঢালিছে নীরবে নিত্য
প্রলয় সাগর'পরে।

করালমূর্ত্তি সে সাগর বলে
কাঁপায়ে ধরণীতল,—
মোর কাছে কেন মায়া কাঁদন!
কিবা চা'স হেতা বল...?

—বক্ত ভয়ঙ্কর আমিযে বিশ্বে—,
ভাবিতে পারেনা কেউ
হেলায় গগন ভেদিয়া ওঠে
মোর প্রলয়ের ঢেউ!

ফোঁটাকত তোর শীতলজলে
কিবা প্রয়োজন মোর?
বলিহারি তোর সাহসে আমি!
স্পর্দ্ধাতো বটে তোর!

\+ \+ \+

তটিনীত বলে সাগরে ধীরে—
তোমারে দিবগো তা-ই
হে নিঠুর! তব বিরাট বক্ষে
যে জিনিষ টুকু নাই!!

পুষ্প পাত্র

শ্রীচারুপ্রভা বসু

আমার প্রাণের পুষ্পপাত্র
ভরিয়াছি প্রীতি কুসুমদলে
তোমার চরণে সঁপিব আমার
যাহা কিছু আছে ধরণীতলে।

তুমি যে আমার চির সাধনার
জীবন মরণ তোমারি পায়
অনন্ত মধু ভরা ফুল বঁধু
লও লও তুলি আদরে তায়।

ভাবের অভিব্যক্তি

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী



খাঁটি'ই খাঁটি, আর সব—



নিতাই-গৌর-রাধে—



মিঞাসাহেবের দুশ্চিন্তা



ব্যোম ভোলানাথ—



শিবলোকে—

এক—দুই—তিন

গল্প — শ্রীবিনয় দত্ত

বার্লিন থেকে যখন ধীরে ট্রেনখানি ছাড়ল, তখন প্রত্যেক গাড়ি স্ত্রী-পুরুষে পূর্ণ হ'য়ে গেছে—কোন স্থানে তিল রাখবারও জায়গা নাই। একটা কেবিনে কেবল খুব কম লোক ছিল—এক দিকে এক ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি মহিলা, আর অন্য দিকে দুটি যুবতী, সঙ্গে এক যুবক। যুবতী দুটির মধ্যে একজনের কোলে আবার একটি হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে, তাকে আদর করছিল সেই যুবক আর ছেলের মা, মাঝে মাঝে অন্য যুবতীটিও।

ভদ্র মহিলা গুণলেন—এক—দুই—তিন। হ্যাঁ, এক—দুই—তিন।

তার পর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি তিনি বললেন—এক—দুই—তিন—

এবার যুবতী দুটি 'হিঃ হিঃ' ক'রে হেসে উঠল।

যুবক তো মহিলার দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে খুন—কিন্তু তাদের সেই ছেলেটি যে এতক্ষণ হাসছিল, সে হাসি বন্ধ করেছে। সে এক দৃষ্টে চেয়েছিল ঐ মহিলার দিকে।

ছেলের মা ছেলের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলছে—শুনছ মনি—এক—দুই—তিন—হিঃ হিঃ হিঃ!

অন্য যুবতীও এবার যোগ দিলে—এক—দুই—তিন—হিঃ হিঃ হিঃ!

যুবক কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, আর শব্দ করতে লাগল—হুঃ হুঃ হুঃ! খিঃ খিঃ খিঃ! এমন জীবনে শুনিনি, দেখিনি—এক—দুই—তিন!

এবার কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা চোখ দুটো বুজে আঙুল গুণে বললেন — এক — দুই — তিন! — এ—ক, দু—ই, তি—ন।

যুবক ও যুবতী দুটির হাসি থামে না—এই তিন জনে যেন তিন শত জনের হাসি হাসতে লাগল।

এদিকের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মুখখানা বাঁকা ক'রে বললেন—আপনারা বোধ হয় হাসি থামাবেন, যখন শুনবেন যে, ইনি আমার স্ত্রী। আর এই সবে আমরা যুদ্ধে আমাদের তিন পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ফিরছি। আমি নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছি, ইনি সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ একটি কথাই বলছেন—এক, দুই, তিন। ট্রেন থেকে নেমেই এই ছেলেদের মাকে এক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাব—

ভদ্রলোকের গলা কেঁপে উঠল, তারপর যারা এতক্ষণ এত হাসি ও এত বিদ্রূপ করছিল, তারা সকলে নিশ্চুপ, পাষাণ হ'য়ে গেল।

যুবতী দুটি এসে মহিলার কোলে ছেলেটিকে দিলে, আর নানা প্রবোধ বাক্য শোনাতে লাগল।

সেই রাত্রের ট্রেণ-জার্নি সকলের জেগেই কাটল, সে রাত্রি সকলকে ঘিরে রেখেছিল ব্যথা ও বেদনা দিয়ে। সে কেবিনে যে কোন জনপ্রাণী ছিল, তার পরিচয় তারপর কেউ পেল না।

বিরাট্ মৌনতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁদের সকলকে ঘিরে ফেলেছিল।

[এই ছোটগল্পটির লেখক এক মহিলা, নাম তাঁর মেরী বইল ও-রেলী। এত ছোটগল্প লিখে তিনি যে খ্যাতি, সুনাম ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তা' বোধহয় জগতের ছোট গল্প লিখিয়েদের মধ্যে কেউ লাভ করতে পারেন নি। এই গল্পটির জন্য তিনি জাতীয় গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হ'য়ে রয়েছেন।]

পুষ্পপাত্র

শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

পুষ্পরাশিতে আজিকে তোমার
ভরেছে কাননবীথি,
আজিকে তোমার ওগো কল্যাণী,
জীবন-পুণ্য-তিথি;
আজিকে তোমার বেদীকার তলে,
ভক্তের দল আসে কুতূহলে,
কতো সুরকার, কতো কবি গায়
বন্দনা-জয়-গীতি।

কিন্তু তোমারে দিতে কল্যাণী,
মোর নাহি যে গো কিছু,
আসিয়াছি তাই আঙিনার তলে,
সবাকার পিছু পিছু,
নাহিক সাহস গাহিব কী গান,
কী জানি, যদি বা হয় অপমান,
শুধু লহ ওগো, বুক ভরি আনা,
মধুর মৌন-প্রীতি।

শিবের অসাধ্য

ডাক্তার শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় এম বি



এই কুটীরের ইতিহাস আছে

যুবক সবে ডাক্তারী পাশ করিয়া নিউ ইয়র্ক সহরে প্র্যাক্টিশ করিতে বসিয়াছে। মনে তাহার কত আশা, নূতন উৎসাহ, কত রঙীন স্বপ্ন। এমন সময় তার জ্বর হইল ও একদিন কাসির সঙ্গে এক ঝলক রক্ত উঠিল। ফাঁসির হুকুম পাওয়া আসামীর মতন তার মনের আশা ভরসা সব এক মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে ছুটিল ক্ষয়রোগে বিশেষজ্ঞ এক ডাক্তারের কাছে; তিনি পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—ক্ষয়রোগ। ক্ষয়রোগ—অর্থ মৃত্যু।

যাহা কিছু সম্বল ছিল সব লইয়া যুবক নিউইয়র্কের নিকটে শ্যারানাক্ লেক (Saranac Lake) নামক জায়গায় একটী ছোট কুটির তৈয়ারী করিয়া সেখানে মরণের দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মরণ আসিল না। সে দেখিল, বিশ্রাম করিলে সে ভাল থাকে; পরিশ্রম করিলে জ্বর হয়। ক্রমে তার জ্বর গেল, শরীরে বল ফিরিয়া আসিল। তখন সে একদিন ভয়ে ভয়ে আবার সেই বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়া দেখাইল। তিনি বলিলেন—'আশ্চর্য্য, তুমি মরনি—ভাল আছ! ফুসফুসে রোগের চিহ্ন নাই! কি ওষুধ তুমি খেয়েছিলে—কি করে ভাল হলে বল।'

সে বলিল, কোন ওষুধ আমি খাইনি—শুধু বিশ্রামের ফলে ভাল হয়েছি।

\+ + +

এটী গল্প নয়—সত্য ঘটনা। এই যুবক ডাক্তারের নাম এডোয়ার্ড লিভিংষ্টোন ট্রুডো (Edward Livingstone Trudeau)। যখন সকলে শুনিল, সে ভালো হইয়াছে, তখন দলে দলে যক্ষ্মারোগী তার কাছে যাইতে লাগিল আরোগ্যের আশায়। যে ডাক্তার নিজের ক্ষয়রোগ ভাল করিয়াছে সে নিশ্চয়ই অন্যকেও আরোগ্য করিতে পারে। এইভাবে যেখানে সে কুঁড়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া একলা ছিল সেখানে একটী প্রকাণ্ড স্বাস্থ্য নিবাস গড়িয়া উঠিল। তার যক্ষারোগ তার সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দিল।

আমাদের দেশেও অনেকের ধারণা যক্ষ্মারোগ শিবের অসাধ্য। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যক্ষারোগ ভীষণ বটে কিন্তু যক্ষা হইলে যে মরিতেই হইবে এমন কথা নাই।



রোগী স্যানাটোরিয়ামে ভর্ত্তি হইলে প্রথমে তাকে শোয়াইয়া রাখা হয়

যক্ষ্মা রোগে ফুসফুসের ভিতর ঘা হয়। হাতে বা পায়ে ঘা হইলে আমরা সেই অঙ্গকে বিশ্রাম দিই কারণ নাড়াচাড়া করিলে ঘা সহজে সারে না। ফুসফুসে ঘা হইলেও সেইরকম বিশ্রাম দেওয়া উচিত। কিন্তু ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়া কঠিন কারণ ইহাকে মিনিটে ১৭।১৮

বার করিয়া দিনে রাতে প্রায় ২৫ হাজার বার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করিতে হয়। কাজ করিলে ও দৌড়াইলে ফুসফুসের আরো পরিশ্রম বাড়ে। ফুসফুসের নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রাখা অসম্ভব; কিন্তু রোগী যদি বিশ্রাম লয় তাহা হইলে অন্ততঃ বাড়তি পরিশ্রমের হাত হইতে তাকে রক্ষা করা যায়। দেখা গিয়াছে যে শুইয়া থাকিলে ফুসফুসের কাজ দিবারাত্রে ১৽ হইতে ১৮ হাজার বারের বেশী হয় না। যক্ষারোগে বিশ্রামে যে উপকার হয় তার কারণ ইহাই।

এদেশে যক্ষারোগ যখনি ধরা পড়ে, ডাক্তার হাল ছেড়ে দেন এবং বলেন—চেঞ্জে যাও। রোগী প্রাণের দায়ে ছুটে পুরী, রাঁচি, মধুপুর প্রভৃতি জায়গায়। খোলা হাওয়ায় বেড়ালেই রোগ সারে এই ধারণার ব.শ বেড়ানো হয় অতিরিক্ত এবং এই রকম অতিপরিশ্রমের ফলে রোগ চলে বেড়ে। শেষে পুঁজিও হয় শেষ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগী দেশে ফিরে মরিতে। যক্ষারোগে খোলা পরিষ্কার হাওয়া দরকার একথা সত্য, কিন্তু রুগ্ন ফুসফুসকে যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দেওয়া আরো বেশী দরকার। এই কথাটী ভুল হয় বলিয়াই যক্ষারোগী চেঞ্জে ফল পায় না। মদনপল্লী, ভাওয়ালী প্রভৃতি স্যানাটোরিয়মে গেলে যে উপকার হয় তাহার কারণ সেখানে চলাফেরা বাঁধাধরা।

যতক্ষণ সামান্য জ্বর (যেমন ৯৯০) থাকে রোগীকে বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইবে—এমনকি মলমূত্রত্যাগও টাইফয়েড্ রোগীর মতন শুইয়াই করিতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায় যে এইভাবে শুইয়া থাকিলে জ্বর কমিয়া যায়। জ্বর না থাকিলে তখন রোগীকে অল্পে অল্পে হাঁটিতে ও ক্রমে অন্যান্য কাজ করিতে দেওয়া হয়।

\+ + +

রুগ্ন ফুসফুসকে বিশ্রাম দিবার একটী উপায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। যে ফুসফুসের রোগ সেই দিকের বুকের ভিতর হাওয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে ফুসফুস আর নিশ্বাসের সময় বেলুনের মতন ফুলিয়া উঠিতে পারে না। ফুসফুসের কাজ বন্ধ হইলে ঘ সারিতে দেরী হয় না। ইহাকেই নিউমোথোরাক্স বলে। রোগের প্রথম অবস্থায় যখন কেবল একদিকের ফুসফুসে রোগ থাকে তখন নিউমোথোরাক্স করা সুবিধা।

\+ + +

উন্মুক্ত ধূলিবিহীন বাতাস ফুসফুসকে ভাল রাখিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক। এজন্য রোগীর যতদূর সম্ভব খোলা জায়গায় থাকা উচিত। সহরের বাতাস ধুলায় ভর্ত্তি; এজন্য সহরের বাহিরে যাইতে পারিলে সুবিধা হয়। যাদের পয়সা আছে এবং অনেক দিন বাহিরে থাকিতে পারেন তারা বাঙ্গালার কাছে যে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাইতে পারেন। তবে এমন জায়গায় যাইতে হইবে যেখানে যক্ষারোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তার আছে। শীতকালে কলিকাতার বাতাস ধোঁয়ায় ভর্ত্তি হইয়া থাকে। এসময় রোগী দেশে থাকিতে পারে। যেখানে ম্যালেরিয়া ধরিবার ভয় এমন জায়গায় অবশ্য



যক্ষারোগ নির্ণয়ে এক্সরে একটি প্রধান সহায়

রোগীকে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। যে রোগীর মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে বা পেট খারাপ তার পক্ষে পুরী প্রভৃতির ন্যায় সমুদ্রতীর ভাল নয়। দার্জ্জিলিংএর মত উঁচু পাহাড়ও ভাল নয়।

যার বিদেশে যাওয়া ক্ষমতার বাহিরে তার পক্ষে

সহরেই থাকা ভাল। সহরের মধ্যেও যদি ছাদের উপর চালাঘর করিয়া দেওয়া যায় এবং সেই ঘরে রোগীকে রাখা হয় তাহা হইলে বিদেশে না লইয়া গেলেও চলিবে।

বিশ্রাম, উপযুক্ত বাতাস ও পুষ্টিকর খাবার এই তিনটী যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রধান অস্ত্র।

যক্ষ্মার কোন ঔষধ নাই। কডলিভার অয়েল, হালিবাট অয়েল, অষ্টেলিন প্রভৃতি ভিটামিনযুক্ত জিনিষগুলি দেহের পুষ্টিসাধন করে মাত্র—ক্ষয় রোগের বীজ নষ্ট করিবার ক্ষমতা তাদের নাই। ইহাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ক্যালসিয়াম খাইতে দিলে দেহের এই উপাদানটীর ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেও ক্যালসিয়াম দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

প্রায় বিশ বৎসর আগে থিয়োকল ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং আমরাও ইহা অনেক ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ইহাতে রোগীর অর্থনষ্ট ছাড়া আর কিছু হয় না। কালে সিরাপথিয়োকাল চিকিৎসকদের শ্রদ্ধা হারাইল। সে কালের সিরাপ থিয়োকল সিরোলিন রচি আকারে আবার চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ডাক্তারদের নাম দিয়া যে সব অদ্ভুত প্রবন্ধ ইহারা পত্রিকায় বাহির করিতেছেন, কোন শিক্ষিত ডাক্তার যে সে রকম প্রবন্ধ লিখিতে পারেন ইহা



রোগী ভাল থাকিলে কাজ করিতে দেওয়া হয় এবং কাজের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ানো হয়

অভাব পূর্ণ করে এবং শরীরের একটু উন্নতি হয়। কিন্তু ইহাকেও যক্ষ্মার ঔষধ বলা যায় না। অন্ধ বিশ্বাসের বশে অনেক ডাক্তার ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, কলয়েডেল ক্যাল-সিয়াম প্রভৃতি ইনজেকশন দেন। তাঁরা ভাবেন যে ইহার ফলে ফুসফুসের ভিতর ঘায়ের চারিদিকে একটী প্রাচীরের মতন তৈয়ারী হইবে; কিন্তু সে আশার মূলে কোন সত্য নাই। ক্যালসিয়ামে যক্ষ্মা না সারিলেও রোগীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, এজন্য সাধারণ পুষ্টিকর ঔষধ হিসাবে ইহা আমাদের ধারণার বাহিরে। থিয়োকল কার্বলিক ও ক্রিয়োজোট জাতীয় ঔষধ। কফে দুর্গন্ধ থাকিলে কিম্বা ক্ষয় রোগে পেট খারাপ হইলে থিয়োকল বা ঐরূপ ঔষধ ব্যবহারে কিছু উপকার হয়। রক্ত ওঠা, বেশী জ্বর বা প্রস্রাবে এলবুমিন থাকিলে থিয়োকল প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

আজকাল ওলিও স্যানোক্রাইসিন্ বা সলগানল্ বি ওলিওসাম নামক এক রকম স্বর্ণ ঘটিত ঔষধে কিছু ফল পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই ঔষধ এখনো পরীক্ষাধীন।

মোটের উপর এমন কোন ঔষধ নাই যাহা খাইলে বা ইনজেক্‌সন করিলে যক্ষা আরোগ্য হইবেই। যারা বিজ্ঞাপন দিয়া বলে আমাদের ঔষধ যক্ষারোগে অব্যর্থ তারা জুয়াচোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডাক্তারখানার বোতলের ঔষধ না খাইয়াও যক্ষা ভাল হয়। বিশ্রাম, পথ্য ও খোলা বাতাসই ইহার একমাত্র ঔষধ। অনেক যক্ষারোগী আপনি ভাল হইয়া যায়, আমরা তাদের খবর রাখি না; তারা নিজেরাও অনেক সময় জানে না সে যে জ্বরে ভুগিয়া ভাল হইয়াছিল তাহা যক্ষা। সুস্থ সবল কুলি মোটর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে; শব ব্যবচ্ছেদে দেখা গেল তার ফুসফুসে পুরাতন ক্ষয়রোগের ক্ষতচিহ্ন। এমন প্রায়ই দেখা যায়; সুতরাং যক্ষা যে ভাল হয় তাহা সত্য।

পালন করিতে পারে সে চেষ্টা করা ডাক্তারের প্রধান কর্ত্তব্য।

কেরাণীগিরি কাজ চলিতে পারে। চিত্রাঙ্কন ও সূচীকর্ম্ম, ফটোগ্রাফী ছুতারের কাজ, ইলেকট্রীকের কাজ, মুরগী চাষ প্রভৃতি ভাল। খোলা হাওয়ায় থাকা ভাল এই ধারণার বশে অনেকে কৃষিকর্ম্ম করিতে বলেন, কিন্তু যক্ষারোগীর ভগ্ন দেহ চাষের মতন পরিশ্রমসাধ্য কাজের অনুপযুক্ত।

যক্ষারোগীকে সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে আগে সে যত পরিশ্রম করিত রোগ ভাল হইবার পর আগের মত সে রকম পরিশ্রম করা চলিবে না। যদি কোন দিন জ্বর হয় তখনি কাজ বন্ধ করিয়া বিশ্রাম লইতে হইবে।



রোগী উন্মুক্ত বারান্দায় শুইয়া আছে

জ্বর ছাড়িবার পর স্যানাটোরিয়ামগুলিতে রোগীকে অল্প অল্প হাটিতে দেওয়া হয়। হাঁটার ফলে জ্বর যদি না বাড়ে তাহা হইলে হাঁটার মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। রোগীকে ক্রমে অল্প অল্প কাজ করিতে অভ্যাস করানো দরকার। রোগীর শারীরিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কি কাজ তার পক্ষে উপযুক্ত হইবে তাহা ঠিক করা হয়। যাদের খুব শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় তাদের এমন কাজ শিখাইতে হইবে যাতে বেশী পরিশ্রমের দরকার হইবে না। সে যাতে আবার টাকা রোজগার করিয়া সংসার প্রতি-

এখন এরকম চিররুগ্ন লোককে চাকরি দিবে কে? অথচ কাজ না করিলে তার পরিবারবর্গ খাইবে কি? বিলাতে প্যাপওয়ার্থে যে সব যক্ষারোগী ভাল হইয়াছে তাদের জন্য একটী কলোনী (colony) করা হইয়াছে। এই রকম যক্ষারোগী যাহাতে পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে সেজন্য অনেক দেশের গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করেন। আমাদের এখানে সে রকম কোন ব্যবস্থা নাই। যারা ভাল হইয়াছে তাদের জন্য কলোনী দূরের কথা বাঙ্গালা দেশে যক্ষারোগীর স্যানাটোরিয়ামও একটীও নাই—ইহা আমাদের বিশেষ লজ্জার কথা।



ডাকবাংলা

শ্রীমতী প্রভা গঙ্গোপাধ্যায়

[শ্রীমতী প্রভা গঙ্গোপাধ্যায় পাঠক পাঠিকার নিকট সুপরিচিত। ইঁহার গল্পে অনন্যসাধারণ সহজ সাবলীল একটা ভঙ্গি থাকে। একটি শিক্ষিতা সাহসিকা তরুণীর সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের একটি শিক্ষিত তরুণের ঘটনা বিপর্য্যয়ে ক্ষণিকের মিলন, একরাত্রি একই ডাক বাংলায় বাস পরে কি করিয়া চির মিলনে রূপান্তরিত হইল বর্ত্তমান গল্পটিতে তাহারই উজ্জ্বল আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে।]

যেখানে হয়তো ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল, ভয়কে কিন্তু সেখানে ঠিক দেখা গেলনা। আঁকা বাঁকা ক্রমোচ্চ পাথরের পথ বাহিয়া মোটর খানা পাহাড়ের উপর অক্লেশে উঠিয়া পড়িল ঠিকই, কিন্তু তারপর সমভূমির উপর দিয়া খানিকটা ছুটিয়া গিয়াই সে নিশ্চল হইল। পল্টু জিজ্ঞাসা করিল, কি হোলো দিদি? থাম্লে যে? শান্তি বার কয়েক ষ্টার্ট দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া কহিল, কি জানি ভাই কি হোলো আবার। চল্‌ছেনা তো। পল্টু বলিল, পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে বুঝি?

যাত্রার পূর্ব্বে শান্তি ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করিয়াই পেট্রোল লইয়াছে, ইহার মধ্যে ফুরাইবার কথা নয়। তবুও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তারপর ঢাকনা খুলিয়া কল কব্জা গুলিতে একবার চোখ বুলাইয়া লইল, কিন্তু গোলের উৎসটা যে কোথায় কিছুই বুঝিতে পারিল না। শান্তি এক মুহূর্ত্ত ভাবিল, তারপর বলিল, মোটরটাকে খানিক ঠেলে নিতে পারবি পল্টু? যদি ষ্টার্টটা কোনরকমে হোয়ে যায়—

পল্টু সোৎসাহে লাফাইয়া নামিল। আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিল, খুব পারবো দিদি। জানো আমাদের জিম্‌ন্যাষ্টিক টিচার বোল্‌ছিলেন আমার মাস্‌লের সার্ কাম্ ফারেন্‌সটা—

শান্তি হাসিয়া কহিল, হ্যা, তুই কালে কালে একজন স্যাণ্ডো হবি জানি। এখন ঠ্যাল্ দেখি পেছন থেকে। আমি এ পাশ থেকে ষ্টিয়ারিং কন্‌ট্রোল কোরবো খন।

কোন রকমে যদি ষ্টার্টটা হোয়ে যায়। আর বেশী দূরও নেই, প্রায় মাইল টেক হবে বোধহয়। ঐযে দূরে বাঙলোটা দেখছিস্ ওর ঠিক্ পাশেই 'ফল্'।

খানিকক্ষণ দুই ভাইবোন মিলিয়া ঠেলাঠেলি করিল, কিন্তু মোটরের দুর্বোধ্য কলকব্জা গুলির মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চারের কোন লক্ষণই দেখা গেলনা। শান্তি

হতোত্তম হইয়া দাঁড়াইল। তাপদগ্ধ ক্লান্ত রক্তাভ মুখখানি হইতে অঞ্চল কোণে স্বেদ বিন্দু গুলি মুছিয়া ফেলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু প্রস্তরময় উচ্চ নীচু প্রান্তর। মাঝে মাঝে দুই চারিটা ছোট বড় অনামী গাছ, আর ছোট ছোট সমভূমিতে ফসলের ক্ষেত। পল্টু কহিল, এখন কি কোরবে দিদি? তোমার গাড়ীতো ভাই চল্লোনা।

শান্তি দূরের বাঙ্গলোটার পানে চাহিয়া বলিল, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এখানে কারো সাহায্যের আশায় বসে থাকাও বোকামি ভাই। এমন দেশেও এসে প'ড়েছি! গাড়ীখানা ঐ ঝোপটার পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে 'ফল্' অবধি হেঁটে যাই চল্। ওখানে কাউকে না কাউকে পাবোই, কি বলিস্? অন্ততঃ ঐ ডাকবাঙলোর চৌকিদারটাকে কিছু বকশিশ দিয়ে যদি—চল দেখা যাক্।

খানিকক্ষণ গাড়ী ঠেলিয়াই পল্টুর উৎসাহ নিভিয়া আসিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া কহিল, তাই চল দিদি।

রাস্তার পার্শ্বস্থিত ঝোপের ধারে গাড়ী ঠেলিয়া দুই ভাইবোন অগ্রসর হইল।

দুই

'টাণ্ডা ফল্' এর ঠিক উপরেই ডাকবাঙলো। চারিদিকের দৃশ্যটী অতীব চমৎকার—ঠিক ছবিখানির মত। সামনে খানিকটা উন্মুক্ত সমভূমির উপর দুই চারিটা মাঝারি গোছের বুনো গাছ। এক পাশে চাকরদের থাকিবার শেড।

দুই ভাইবোন বাঙলোর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁচের স্বচ্ছ দরজা জানালা গুলির মধ্য দিয়া ভিতরের যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে কেহ যে বাড়ীটী অধিকার করিয়া আছেন ইহা সুনিশ্চিত।

পল্টু কহিল, কই কাকেওতো দেখতে পাচ্ছিনে দিদি? অথচ দেখ ভেতরে বিছানা পত্তর সবই সাজানো গোছানো আছে। ভূতের বাড়ী নাকি? শান্তি হাসিল। অশরীরি জীবদের বিষয়ে পল্টুর যে একটা মস্ত দৌর্ব্বল্য আছে তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। হাসিয়া বলিল, শুধু ভূত নয়রে পল্টু, সাথে হয়তো পেত্নীও থাকতে পারে। চল দেখি, ঐ শেডের দিকে কেউ আছে কিনা।

কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। সিঁড়ির নীচে নামিতেই দেখিল শেডের দিক হইতে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ তাহার শুভ্র পইতা গাছটী কানের উপর তুলিয়া দিয়া তাহাদের দিকে সসব্যস্তে অগ্রসর হইতেছে।

পাঁড়েজি নিকটে আসিয়া সেলাম জানাইয়া বলিল, আপলোগ মায়ী? শান্তি জানাইল, হামলোগ টাণ্ডাফল দেখনে আয়াথা। রাস্তামে মোটর বিগড় গিয়া। মোটর উধার ছোড়কে চলা আয়া। বাঙ্গলোপর কোই হ্যায়?

হাঁ, সাহেব হ্যায় মায়ীজি—বেড়ানে গিয়া।

তোম্?

হাম্ সাহেবকা রসুইয়া পকাতা হ্যায়।

শান্তি মনে মনে হাসিল। সাহেবের আবার পাচক ব্রাহ্মণ! তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশী সাহেব—বাঙ্গালীও হয়তো হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিল, কেয়া নাম হ্যায় সাহেব কো?

পাঁড়ে বলিল "ম্যাজিষ্টর সাহেব।"

শান্তি বুঝিল নাম জিজ্ঞাসা করা বৃথা। কহিল বাঙ্গালী?

জি হুজুর।

শান্তি একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল যাক্ তবু যে সাহেবটী একজন মাদ্রাজী কিম্বা বিহারী না হইয়া বাঙ্গালী হইয়াছেন এই ঢের। স্বজাতিতো বটে। জিজ্ঞাসা করিল, মেম সাব হ্যায়?

নেহি মায়ীজী।

সাহেবটী কখন ফিরিবেন কে জানে? অতঃপর কি করা যায় শান্তি বোধ হয় তাহাই ভাবিতেছিল। পাঁড়েজি তাহার শ্রান্ত সুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া কহিল, আপলোগ আইয়ে—ভিতরমে বৈঠিয়ে মায়ীজী। সাহেব আবহি আ-যায়েঙ্গে।

শান্তি বুঝিল সাহেব না আসা পর্য্যন্ত তাহার ভৃত্যদের উপর কোনরূপ হুকুম চালানো সুসঙ্গত হইবে না। অতএব অপেক্ষা করাই উচিত।

পাঁড়েজি দরজা খুলিয়া দিলে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। এববার চারিদিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল। একটা বেডরুম, একটা ড্রইংরুম; একপাশে বাথরুম, ল্যাভেটরিও আছে। বাহিরে চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা। বারান্দার নীচেই পাহাড়ের গা সোজা নামিয়া গিয়াছে। তারপর কিছুদূর আঁকিয়া বাঁকিয়া কতকটা সমভাবে পথ চলিয়া আবার ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে। সেইখানেই জলপ্রপাতের দৃশ্য চমৎকার। স্বচ্ছ বারিধারা পাহাড়ের গায় আছাড় খাইতে খাইতে সগর্জ্জনে নীচে নামিতেছে। খানিকটা স্থানে একটি ছোট হ্রদের সৃষ্টি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ের ফাটলের মাঝে অদৃশ্য হইতেছে।

পল্টু মহানন্দে বলিল কি সুন্দর! না দিদি? আমার ইচ্ছে করে এই বাড়ীখানায় থাকি আর রোজ ঐ ফলের জলে নাই।

শান্তি কহিল, আচ্ছা সাহেবকে বোলে তোকে এখানেই রেখে যাবো না হয়।

পল্টু কহিল, তা আমি খুব থাকতে পারি দিদি—যদি তুমিও থাকো। কিন্তু তোমার সাহেবতো এখনো এলনা ভাই? আমার যা তেষ্টা পাচ্ছে! তুমি যদি বলতো ঐ ফল থেকে—

শান্তি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আমার সাহেব কিরে? ফের বল্‌বিতো ঠাস্ কোরে চড় খাবি বোলছি। কথা কইতে শেখনি, অত বড় ছেলে? পল্টু মুখখানা চুণ করিয়া বলিল, আমি তাই বোলেছি বুঝি? তেষ্টা পাচ্ছে তাইতো—

শান্তি বুঝিল, পল্টু ঠিক সে ভাবে কথাটা বলে নাই। হাসিয়া আদর করিয়া কহিল, লক্ষ্মী ভাইটী আমার, ফলে যাসনি পড়ে যাবি। জল ঘরেই আছে দেখে এসেছি। চল্ গড়িয়ে দোবো'খন।

পল্টুকে কাঁচের গ্লাসে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দিয়া শান্তি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল। সাজানো গোছানো মন্দ নয়—সুরুচির পরিচায়ক। ড্রইংরুমে একটা বড় গোল টেবিলের পাশে খানকয়েক নানা আকারের চেয়ার। একপাশে শীতকালে ঘর গরম রাখিবার জন্ত আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থাও আছে। একটা বুক ষ্ট্যাণ্ডের উপর খানকয়েক ইংরাজী ও বাঙ্গালা বাঁধানো বই সাজানো আছে। সোণার জলে নাম লেখা এস্ বাসু। এস্ মানে? সতীশ, সুবোধ, সুধীর সবইতো হইতে পারে। নামটার বিষয়ে কোন গবেষণা নিষ্ফল বুঝিয়া শান্তি একখানা ইংরাজী নভেল লইয়া ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

পাঁড়েজি আসিয়া দুই কাপ গরম চা, দুই প্লেট হালুয়া আর গরম লুচি টেবিলের উপর সাজাইয়া দিয়া গেল। কহিল, টিফিন লে আয়া মায়ীজী।

শান্তি সবিস্ময়ে বলিল, টিফিন লে আনে বোলা? পাঁড়েজি জানাইল, সাহেব বলিয়াছে।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব আয়া হ্যায়?

পাঁড়েজি কহিল, নেহি মায়ীজি, লেকিন সাহেব কা হুকুম হ্যায় কোই অতিত আনেছে—

শান্তি চটিয়া গেল। কে এই বাসু সাহেবটী যে এরূপ অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে চায়? সে বিপদে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থিনী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিবে কেন? শান্তির আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, বাধা দিয়া কহিল, সমঝ গিয়া। টিফিন নেহি মাঙতা—লে যাও।

পাঁড়েজি মুখখানা কাঁচু মাচু করিয়া বলিল, সাহেব গোসা হো যায়েঙ্গে মায়ীজি।

তাহার শঙ্কিত মুখখানা দেখিয়া শান্তি হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অচ্ছা রহনে দেও, পাঁড়ে খুসী হইয়া চলিয়া গেল। পল্টু কহিল, সাহেবটী খুব ভাল লোক, কি বল দিদি? আমরা আসবো জেনে আগে থেকেই হুকুম দিয়ে রেখেছে। আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে!—তোমায়তো বোলিই নি ভয়ে। তোমার কথা বোলতেই যা কোরো!

শান্তি উত্তর দিলনা। পল্টু বলিতে লাগিল, তুমি যেন কেমন এক রকম ভাই! পেয়েও আবার ফেরত দিচ্ছিলে ছঃ। আমাদের ইংরিজির টিচার বলেন, 'এ বার্ড ইন দি হ্যাণ্ড ইজ ওয়ার্থ'—দিদিকে গম্ভীর বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পল্টু সহসা থামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া দিদির মুখের পানে বারকয়েক আড় চোখে চাহিয়া পল্টু আপন মনে মৃদুস্বরে

কহিল, সেদিন হাইজিনে পড়ছিলুম ঠাণ্ডা বাসি জিনিষ খেলে অসুখ কোর্‌তে পারে।

আর অধিকক্ষণ হাসি চাপিয়া রাখা অসম্ভব। শান্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তুই খা-না। আমি কি নিষেধ করেছি তো'কে?

পল্টু তৎক্ষণাৎ হালুয়া সহযোগে একখানা লুচি মুখে দিয়া বলিল, আর তুমি দিদি?

শান্তি বলিল আমিও খাবোখন। তুই যা খাবি খেয়ে নে—চা দুকাপই খাস্‌নে কিন্তু।

পল্টু বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

তিন

সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে লুপ্তপ্রায়। তখনো বাসু সাহেবের দর্শন পাওয়া গেলনা. শান্তি অস্থির মনে নভেলের পাতা উল্টাইতে লাগিল। পল্টু এদিক ওদিক এটা ওটা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা ফোটোর এলবাম আনিয়া হাজির করিল। বলিল, দেখ দিদি কত ছবি আছে এতে। কাবার্ডের ওপোর পেলুম।

শান্তি দেখিতে লাগিল। নানা স্থানের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য। উল্টাইতে উল্টাইতে একটী যুবকের ফোটো বাহির হইল। নীচে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা শ্রী সুদর্শন বসু।

পল্টু বলিল, ভদ্রলোকটী ভারী সুন্দর দেখতেতো। না দিদি?

শান্তি কথা কহিল না। তবে মনে মনে স্বীকার করিল যে যুবকটী সত্যই সুদর্শন। এই সুদর্শন বসুটী কে? ঐ এস্ বসু নয়তো?

বাহিরে মোটর সাইকেলের অবিশ্রান্ত ভট্ ভট্ শব্দ শোনা গেল। এলবাম রাখিয়া দিয়া দুই ভাইবোন বাহিরে চাহিয়া দেখিল। তাহা হইলে সম্ভবতঃ সাহেব এতক্ষণে ফিরিলেন। পরক্ষণেই বারান্দার নীচে সাইকেল রাখিয়া একটী দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ যুবক ড্রইংরুমের দিকে অগ্রসর হইল। শান্তি চিনিল, তিনি মিষ্টার সুদর্শন বসু। সুদর্শন কাচের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, ভেতরে আস্‌তে পারিকি? শান্তি চাহিয়া দেখিয়া বলিল, স্বচ্ছন্দে আপনা-রইতো ঘর।

সুদর্শন ভিতরে ঢুকিয়া দরজার পাশের ব্রাকেটে হ্যাটটা রাখিয়া দিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া হাসি মুখে নমস্কার করিল।

শান্তি প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, আপনার ড্রইংরুমটা আপনার বিনা অনুমতিতেই আমরা ভাইবোনে অনেকক্ষণ জুড়ে বসে আছি।

সুদর্শন কহিল, সে আমার সৌভাগ্য, আর আপনাদের অনুগ্রহ। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, একজনের দুর্ভাগ্য আর একজনের সৌভাগ্যের সূচনা করে। জানেনতো? জগতের এই নিয়মটা আবহমান চলে আস্‌ছে। আপনাদের বেবি অষ্টিন খানা নিশ্চল হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেই আমি বুঝেছিলুম সম্ভবতঃ আজ কোন অতিথি-সেবার সৌভাগ্য আমার ঘটবে।

শান্তি হাসিয়া বলিল, আপনার বুঝবার শক্তি যে অসাধারণ এটা স্বীকার কোরতেই হবে। এখন এই বিপদ থেকে যাতে ত্রাণ পেতে পারি যদি দয়া করে—

সুদর্শন বাধা দিয়া বলিল, নিশ্চয়ই। কিন্তু দয়া কেন? আদেশ করবেন বলুন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে হোচ্ছে—এই পাঁড়ে।

শান্তি হাসিয়া কহিল, সে সব চুকে গেছে। আপনার পাচক ব্রাহ্মণটি সে বিষয়ে অত্যন্ত অবহিতেট!

সুদর্শন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, তাহলে একটু বসুন অনুগ্রহ করে। আমি বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসি।

সুদর্শন একটু পরেই ফিরিয়া আসিল। পাঁড়েজি ইতিমধ্যেই টেবিলের উপর তাহার জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়াছিল। একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সুদর্শন কহিল, তারপর বলুন কি কোরতে হবে? ঐ যাঃ! খেতে আরম্ভ করবার আগে আপনার অনুমতিটা নিতে ভুল হোয়ে গেছে! কিছু মনে করবেননা যেন। মানুষের ভুল পদে পদে।

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, না। আপনি খেয়ে নিন। হ্যা খেতে খেতেই আপনাদের কথা শুনা যাক। তারপর সম্প্রতি কোত্থেকে আসছেন শান্তি দেবী?

শান্তি সবিস্ময়ে বলিল, আপনাকে এখনো আমার নাম বলিনিতো! বোলেছি কি? সুদর্শন হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়ই বলেননি। তবে আমি কতকটা আন্দাজে ধরেছি।

আন্দাজে!

হ্যা আন্দাজে বৈকি। ওঃ- ভালকথা। ঐ দেখুন ফের ভুল হোচ্ছে। এই নিন। এই নাম লেখা ম্যাগাজিন খানা আপনার মোটরে প'ড়ে ছিল। বইখানা আপনার নয় কি?

সুদর্শন তাহার হাফপ্যান্টের পকেট হইতে একখানা ম্যাগাজিন বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ—আমারই। ধন্যবাদ মিষ্টার বাসু।

সুদর্শন কহিল মিষ্টার বাসু নয়, আমার নাম সুদর্শন বাসু।

শান্তি কহিল, কিন্তু আপনার বামুনটি বোল্লে আপনি বাবু নন সাহেব।

সুদর্শন পুনরায় হাসিয়া উঠিল। কহিল, ওদের কাছে তাই বটে। তা বোলে আপনাদের কাছেও কি?—যাক। কোত্থেকে আসছেন বোলুন।

চুনার থেকে।

সুদর্শন সবিস্ময়ে কহিল, চুণার! সেখান থেকে একা একা ড্রাইভ কোরে এখানে এসেছেন? আপনার সাহস যে দুর্জ্জয় একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হোয়ে গেছে শান্তি দেবী।

শান্তি মৃদু হাসিয়া কহিল, একা কেন? পল্টু সঙ্গে ছিলতো।

সুদর্শন পল্টুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া কহিল, তা বটে।

শান্তি হাসিমুখে বলিল, আপনি ওকে সোজা লোক মনে কোরছেন বুঝি? তা নয়। জিমন্যাষ্টিক টিচার তোর মাসলের কথা কি বলেছে বলনারে পল্টু?

পল্টু গম্ভীর হইয়া বলিল, যাও, তুমি ঠাট্টা কোরছো দিদি।

সুদর্শন ও শান্তি হাসিমাখা মুখে দৃষ্টি বিনিময় করিল।

শান্তি কহিল, না ঠাট্টা নয় সুদর্শনবাবু। ও একাই মোটর খানা অনেকদূর ঠেলে এনেছে।

পল্টু উৎসাহিত হইয়া বলিল, হ্যা ভারীতো! তোমার ঐ বাচ্চা অষ্টিনটাকে আমি বোধ হয় টেনেই রাখতে পারি দিদি! আমাদের জিমনাষ্টিক টিচার দুহাতে দুখানা বড় বড় মোটর রাখেন।

সুদর্শন কৃত্রিম বিস্ময়ে কহিল তাইতো! অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! তুমি বড় হোলে পারবে বৈকি ভাই—যদি রীতিমত চেষ্টা কর।

চার

জলযোগ সমাপ্ত হইতে সুদর্শন কহিল, সর্ব্বপ্রথমে আপনার গাড়ীখানা টেনে আনা যাক। কি বলেন?

শান্তি মাথা কাত করিয়া সম্মতি জানাইল।

সুদর্শন কহিল, তাহলে চলুন আমার সাথে। ষ্টীয়ারিং ধরবেন। তারপর পল্টুর পানে চাহিয়া কহিল, বাড়ীটা ততক্ষণ তোমার চার্জ্জেই রইলো খোকা। আমরা এলুম বোলে।

পল্টু আপত্তি জানাইল, আমি পল্টু। ভাল নাম শ্রীকিশোর মিত্র—খোকা নয়। দিদির চেয়ে আমি আট বছরের ছোট।

সুদর্শন কহিল, ওঃ—তাই নাকি! তাহলে—

পল্টু বাধা দিয়া কহিল, আমি এই জ্যৈষ্ঠে বারোতে প'ড়েছি জানেন?

সুদর্শন শান্তির পানে এক চমক হাসিভরা চোখে চাহিয়া কহিল, না, কি কোরে জানবো বল ভাই। তুমি আগে বলনিতো। যাহোক, তুমি একটু বোস পল্টু, আমরা এই এলুম বোলে।

একটা শক্ত মোটা দড়ি সংগ্রহ করিয়া সুদর্শন তাহার সাইকেলের সহিত জড়াইয়া লইল। তারপর টর্চ দিয়া কহিল, আপনি কেরিয়ারের ওপোর উঠে বসুন শান্তি দেবী।

শান্তি ইতস্ততঃ করিতেছিল। একজন স্বল্প পরিচিত যুবকের গা ঘেঁসিয়া কেরিয়ারের উপর বসিতে তাহার মন সরিতেছিল না। সুদর্শন ফিরিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল আপনি শিক্ষিতা। কাজেই বেশী কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা হোতে পারে। কিন্তু বিপদে পড়লে লজ্জা সঙ্কোচের বাঁধনটা একটু কেটে ছেঁটে নিতে হয়, জানেন বোধ হয়? শান্তি লজ্জার হাসি হাসিয়া কেরিয়ারে উঠিয়া বসিল। বলিল, না লজ্জা নয়। চলুন।

সুদর্শন একটুখানি গিয়াই থামিল। মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, আপনার একখানা হাত অনুগ্রহ করে আমার কাঁধের ওপরে রাখুন শান্তি দেবী—নৈলে হঠাৎ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। বুঝতে পারছি তাতে আপনার আরো অধিক সঙ্কোচ হবার কথা। কিন্তু উপায়তো নেই।

শান্তি নীরবে সুদর্শনের আদেশ পালন করিল। প্রথমে সে অল্পগোছে সসঙ্কোচে কোনরকমে হাতখানা রাখিয়াছিল কিন্তু উঁচু নীচু বন্ধুর পথে যখন মোটর সাইক্ল দ্রুতবেগে চলিল, তখন সুদর্শনের উভয় স্কন্ধ দুই হাতে সবলে আঁকড়িয়া ধরা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিলনা। মাঝে মাঝে সুদর্শনের পিঠের সহিত তাহার দেহের এরূপ অবাঞ্ছিত সংস্পর্শ ঘটিয়া যাইতেছিল যে শান্তি শিহরিয়া উঠিতেছিল। সুখের বিষয় সুদর্শন তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলনা। তাহার চোখের সম্মুখে শান্তি কখনও ওরূপে বসিয়া থাকিতে পারিতনা।

যাইতে যাইতে সহসা সুদর্শন কহিল; আপনাকে একটা কথা অনেকক্ষণ থেকেই বোল্‌বো মনে করছি শান্তি দেবী।

শান্তি মৃদুস্বরে কহিল, বলুন।

আপনাকে এর পূর্ব্বেও যেন কোথায় দেখেছি।

শান্তি সবিস্ময়ে কহিল, আমায় দেখেছেন?

সুদর্শন কহিল, হ্যাঁ; দেখেছি নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় তা কিছুতেই মনে পড়ছেনা।

শান্তি নীরবে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু এই বাবু সাহেবটীর সহিত পূর্ব্বে কোথাও তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এরূপ মনে পড়িলনা। হইতেও পারে হয়তো, পথে ঘাটে কতজনের সাথেইতো জীবনে দেখা হয় কে তাহা স্মরণ করিয়া রাখে?

মোটরের কাছে পৌঁছিয়া উভয়ে নামিয়া পড়িল। সুদর্শন মোটরখানা টানিয়া রাস্তায় আনিল। তারপর সাইকেলের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া শান্তিকে বলিল, এইবার আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার মোটরে বসে ষ্টিয়ারীং করুন। আমি আমার সাইক্লে আপনাকে মোটর সমেত টেনে নিয়ে চলি। অবশ্য যদি আপনার অনুমতি হয়। শান্তি তাহার বেবী অষ্টিনে উঠিতে উঠিতে হাসিয়া কহিল, আপনার বিনয় প্রকাশের বহরটা একটু কমিয়ে ফেলুন সুদর্শন বাবু।

সুদর্শন প্রত্যুত্তরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডাক বাঙলোর কাছে আসিয়া শান্তি বলিল, মোটরটা দেখুন না একবার কি হোলো?

সুদর্শন কহিল, আমি ইতিপূর্ব্বেই দেখে রেখেছি—প্রথম আসবার মুখে। রোগ সোজা নয় নেহাৎ।

নিরোগ করবার কি ব্যবস্থা হবে?

আমি নিজেই পারবো। তবে সময় সাপেক্ষ। ঘণ্টা দুই হয়তো লাগতে পারে।

শান্তি সবিস্ময়ে কহিল, দু—ঘ—ণ্টা!

সুদর্শন বলিল, হ্যাঁ তা লাগবে বৈকি। কিছু বেশীও হয়তো লাগতে পারে। কারণ একটা জিনিষ বোধহয় লক্ষ্য করেননি? সামনের একটা চাকার পাম্প কমে যাচ্ছে? লিক্ হোয়েছে নিশ্চয়।

শান্তি চাহিয়া দেখিল, সত্যই তাই। হতাশ হইয়া কহিল, তাহলে? তাহলে আজকে যখন সন্ধ্যে হয়ে গেল তখন কাল সকালে ছাড়া কোন উপায় করা সম্ভব হবেনা বোধহয়। কাজেই আপনাদের শত অসুবিধা সত্বেও যদি আজকের মত আমাকে অতিথি সেবা থেকে বঞ্চিত না করেন তাহলে এ অধম—

শান্তি মৃদু হাসিয়া কহিল, আবার বিনয়?

সুদর্শন সহাস্যে জিভ কামড়াইয়া বলিল, ওঃ-ঠিক। আবার ভুল। তা দেখুন, যার যা স্বভাব তা সহসা ত্যাগ করা বড়ই মুস্কিল। ঐযে ছেলেবেলায় ঈশপের গল্পে না কিসে পড়েছিলুম, যদ্য হি যঃ স্বভাবাৎ না—কি?

শান্তি পুনরায় হাসিল। বলিল, আপনার স্মরণ শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ। ঈসপস্ ফেব্‌ল্ সংস্কৃত বই নয়।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, তা বটে। ধন্যবাদ।

শান্তি পুনরায় চিন্তিতা হইল।

সুদর্শন তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, আপনাদের বাড়ীর সবাই ভাববেন নিশ্চয়ই। অনুমতি করেন যদি শান্তি দেবী তাহলে এক উপায় কোত্তে পারি।

শান্তি জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিল।

সুদর্শন কহিল, আমার সাইকেলে কোরে আপনাদের মিরজাপুরে রেখে আসতে পারি। সেখান থেকে রাত্রির ট্রেনে কিম্বা ট্যাক্সিতে চুণার যেতে পারবেন। ঠিকানাটা রেখে যাবেন, আমি মোটরটা মেরামত করে কাল্‌কে পাঠিয়ে দোবো'খন।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু সাত আট মাইল পথ পুনরায় পিঠের কাছে বসিয়া যাওয়া—ছিঃ। শান্তি সঙ্কুচিতা হইল। বলিল, বাড়ীতে কেউ ভাববেন না। কারণ ফেরবার মুখে আমাদের মিরজাপুরে একটি আত্মীয়ের বাড়ী হল্‌ট্ করবার কথা ছিল।

সুদর্শন কহিল, তাহলে আপনার আত্মীয়ের বাড়ী পৌঁছে দিলেইতো চল্‌তে পারে ?

আবার সেই গা ঘেসিয়া বসা! শান্তি শিহরিয়া কহিল, না, প্রয়োজন নেই। সে প্রোগ্রাম আমি অনেকক্ষণ বদলে ফেলেছি। আপনার আতিথ্যই স্বীকার কোরছি সুদর্শনবাবু। চলুন।

সুদর্শন হাত জোড় করিয়া হাসিয়া কহিল, আমার অশেষ সৌভাগ্য।

পাঁচ

নৈশ আহারের পর ড্রইংরুমে বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিল। সুদর্শন কহিল, যদি ধোঁয়ার গন্ধ আপনার নিতান্ত অসহ্য না হয় শান্তি দেবী তাহলে অনুমতি করুন একটা সিগারেট ধরাই। শান্তি হাসিয়া কহিল, মোটেই না. স্বচ্ছন্দে ধরান। তবে আপনার শিষ্টাচার আর সৌজন্য গুলো ক্রমেই অসহ্য হয়ে পড়ছে সুদর্শনবাবু।

সুদর্শন কহিল, বোলেছিতো স্বভাব। কাজেই ওগুলো নিজগুণে ক্ষমা কোরে নেবেন। তারপর পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে কহিল, ঐ দেখুন, দেশলাই আর সিগারেট কেসটা যে কোথায় রেখেছি—

সিগারেট কেস্ অ্যাশ ট্রে ও দেশালাই টেবিলের উপরই ছিল। শান্তি সেগুলি সুদর্শনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, এইতো সবই রেখেছেন এখানে। আপনার অত্যন্ত ভুলো মন।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, ধন্যবাদ। তারপর একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া কহিল, আমার ভুলো মন বোলছেন, কিন্তু আমার চেয়েও ভুলো মন সংসারে বর্ত্তমান। বিশ্বাস করেন ?

আছে নাকি ?

নিশ্চয়ই আছে। শুনুন বলি তাহলে। আমি হাজারীবাগ থাক্‌তে আমার একটী বন্ধু কোলকাতা থেকে একখানা জরুরী চিঠি দিলেন। আর লিখ্‌লেন যে তারা পরদিনই পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছেন, কাজেই চিঠির জবাবটা তাদের পশ্চিমের ঠিকানায়ই দিতে হবে।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এর আগে হাজারীবাগ ছিলেন বুঝি ?

সুদর্শন কহিল, হ্যাঁ। এইতো সবে আজ তিন দিন হোলো এখানে এসেছি।

তারপর বলুন।

তারপর আমিতো জবাব লিখলুম। লিখে খামে এঁটে ঠিকানা লেখবার বেলা লক্ষ্য হোলো যে বন্ধুবর ঠিকানা কোথাও দেননি। এমনকি পশ্চিমটা যে কোন দেশ ভাগলপুর না মুঙ্গের না অযোধ্যা তাও কিছু লেখেননি। কাজেই কদিন ওয়েট কোরতে হোলো— যদি পশ্চিমের ঠিকানাটা শুদ্ধ আর কোন চিঠি আসে কিন্তু বৃথা! জরুরী চিঠির জরুরী জবাবটা বাক্সেই বন্ধ হোয়ে রইলো।

শান্তি হাসিয়া কহিল, আপনারই বন্ধুতো! বন্ধুত্ব সমানে সমানেই হয়।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, তা বটে। তবে তিনি আমারও কিছু ওপোরে। তাকে দেখে আমার বেশ ভরসা হয় শান্তি

দেবী যে তিনি যখন পারছেন, তখন আমিও যাহোক ভবসাগর পাড়ি দিতে পারবো।

শান্তি হাসিল।

পল্টু এদিকে ওদিকে চঞ্চল ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা বাহিরের বারান্দা হইতে চেঁচাইয়া কহিল, দেখবে এসো দিদি, দেখবে এসো।

সুদর্শন একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, জোছনা উঠেছে। এইসময় ফলটা দেখতে বেশ। দেখবেন চলুন। উভয়ে বাহিরে আসিয়া রেলিং এ ভর দিয়া ফল দেখিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য। চাঁদের আলোয় মনে হইতেছিল যেন গলিত রজতধারা ধাপে ধাপে ঝরিয়া পড়িতেছে একরাশি অন্ধকারের বুকে। সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। সহসা মুখ ফিরাইয়া শান্তি কহিল, এমন মনোহর সৌন্দর্য্য একা একা উপভোগ করা অত্যন্ত স্বার্থপরতা সুদর্শন বাবু। আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

সুদর্শন একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া করুণ সুরে কহিল, তিনিতো নেই শান্তি দেবী।

শান্তি সমব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—আহা। মারা গেছেন বুঝি ?

মারা যাননি।

তবে ?

কোথায় আছেন, কিম্বা মোটেই আছেন কিনা সন্দেহ।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আমি অবিবাহিত।

শান্তি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া কহিল, তাই বলুন। আমারতো ভয় হোয়েছিল, বুঝি বা পেয়ে হারিয়েছেন।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, না পেয়ে হারাইনি। বরং ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ হারিয়েই আছি, এখনো পাইনি।

পল্টু কহিল, আমার কিন্তু ঘুম পেয়েছে দিদি। কোথায় শোবো খোঁজ দেবেতো দাও।

সুদর্শন কহিল বেডরুমে শোওগে যাও ভাই। পাঁড়েকে বোলেছি বিছানা পেতে রাখতে, এতক্ষণ রেখেছে নিশ্চয়। তারপর চাঁদের আলোয় রিষ্টওয়াচটা দেখিয়া কহিল রাতও হোয়েছে অনেক। আপনিও বিশ্রাম করুনগে যান্। দুখানা ছোট খাটে দুটো বিছানা আলাদা করে পাতা আছে বটে, কিন্তু একটাতে তোষক নেই। কাজেই আপনাদের একজনের অসুবিধে হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু উপায় কি বলুন।

শান্তি কহিল, আর আপনি ?

সুদর্শন কহিল আমি এই ড্রইংরুমে ইজিচেয়ারের উপর দিব্য আরামে—

শান্তি কহিল, বলেন কি! আপনাকে এরূপ অসুবিধের মাঝে ফেলে আমরা অন্যায়ভাবে—

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, অসুবিধে বিন্দু মাত্র নয়। আপনি জানেন না আমি ঘোড়ার ওপোর শুয়েও ঘুমুতে পারি।

শান্তি নীরবে ভাবিতে লাগিল।

সুদর্শন কহিল, বিশ্বাস কোচ্ছেন না? কিন্তু যদি কোনদিন এনডিওরেন্স স্লিপিংএর একটা কমপিটিসন হয়, তখন দেখবেন আমি একটা অভূতপূর্ব্ব রেকর্ড রাখতে পারি কিনা। ঘুমের ভেতর কুমীরকে কামড়ালেও আমি টের পাইনে।

ছয়

বেডরুমে ঢুকিয়া শান্তি দেখিল সেগুলি খাট নয়, চওড়া ফিতা পরানো খাটিয়া। মোটা মোটা চটু, সতরঞ্চ ও রাগ তোষকের অভাব পূরণ করিয়াছে। কোন অসুবিধাই নাই। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শান্তি শুইয়া পড়িল। নূতন স্থানে অনভ্যস্ত গৃহে অপরিচিতের মাঝে কেমন যেন সহসা ঘুম আসিল না। শান্তি উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল একপাশে ব্রাকেটের ওপোর খানকয়েক কাপড় জামা প্যান্ট ইত্যাদি গোছানো রহিয়াছে। নিকটে গোটা কয়েক সেল্‌ফ। কোনটায় আয়না চিরুণী প্রভৃতি প্রসাধনের দ্রব্য কোনটায় বা পেন্‌সিল, ফাউন্টেন পেন্, রাইটিং প্যাড প্রভৃতি খুটিনাটি জিনিষ। শান্তি উঠিয়া নিকটে যাইতেই সেই ফটো এলবাম্ খানা নজরে পড়িল।

পুষ্পপাত্রের লেখিকাগণ



কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়



কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়



শ্রীচারুপ্রভা বসু

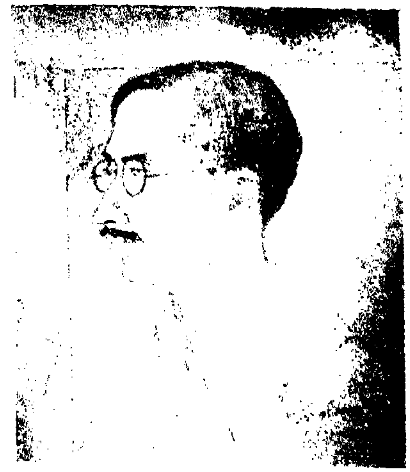


কুমারী পূর্ণিমা সান্যাল

পুষ্পপাত্রের লেখকগণ



শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



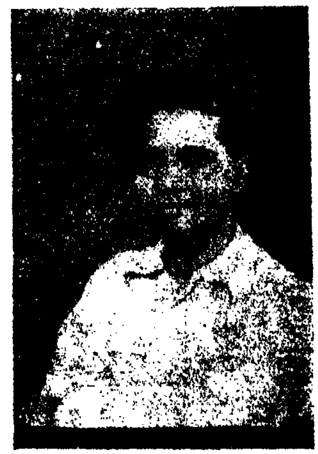
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু



শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়



শ্রীঅসিতকুমার হালদার



শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বৈকালে ফটোগুলি সব দেখা হয় নাই। সেখানা হাতে করিয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। তারপর আলো সমেত টিপয়টা কাছে টানিয়া আনিয়া দেখিতে লাগিল।

সুদর্শনের ছবিখানা সে অনেকক্ষণ প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া দেখিল। পুরুষোচিত চেহারা বটে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তেজ দীপ্ত ললাট, উজ্জ্বল চোখদুটীতে প্রতিভার আলো, সুন্দর মুখখানিতে হাসিটুকু কিন্তু লাগিয়াই আছে।

উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা সে বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাহির হইল একটী সুন্দরী তরুণীর ছবি। সে আর কেহ নয়, সে নিজেই। এই অপরিচিত যুবক তাহার ফটো সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? সুদর্শন বলিয়াছিল সে শান্তিকে পূর্ব্বে দেখিয়াছে, কোথায় দেখিয়াছে তাহা শান্তি এইবার বুঝিতে পারিল। শান্তির মনে পড়িল সে বছর খানেক আগে সখ করিয়া নিজে ষ্টুডিওতে গিয়া এই ফোটো খানা তোলাইয়াছিল। তিন কপি ফোটোর মধ্যে এক কপি তাহার নিকট আছে, এক কপি আছে বৌদির কাছে, আর এক কপি একটী বান্ধবীকে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ দিয়াছে। তবে কি সেই বান্ধবীর সাথেই সুদর্শনের কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা—কিন্তু না, তাহাই বা সম্ভব হয় কিরূপে? বান্ধবী বিবাহিতা আর সুদর্শন অবিবাহিত। তাহা ছাড়া কোন রমণী তাহার প্রণয়াস্পদকে নিজের ছবি ভিন্ন অন্য কোন তরুণীর ছবি উপহার দেয়না। ইহাই স্বাভাবিক। তবে এই ছবি আসিল কোথা হইতে? অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শান্তি স্থির করিল নিশ্চয়ই সুদর্শন সেই ষ্টুডিও হইতে এই অতিরিক্ত কপিখানা সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ভাবে অপরিচিতা যুবতীর ছবি এল্‌বামে সযত্নে সাজাইয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায় এবং অনধিকার চর্চ্চা। শান্তি মনে মনে ঠিক্ করিয়া রাখিল প্রভাতে সুদর্শনকে সে বেশ করিয়া দুকথা শুনাইয়া দিবে।

কি ভাবিয়া শান্তি সুদর্শনের ফটোখানা পুনরায় উল্‌টাইয়া দেখিল। চমৎকার চেহারা। মুখখানিতে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে লোকটার উপর কিছুতেই রাগ করা চলেনা। শান্তি মনে মনে একটু হাসিল। ভদ্রলোকটীর কাছে যদি তাহার ছবি খানা সত্যই এত ভাল লাগিয়া থাকে তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়? যদি তিনি ছবিখানা সংগ্রহ করিয়া সযত্নে এল্‌বামে রাখিবার উপযুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন তাহাতেই বা বাধা দিবার প্রয়োজন কি?

শান্তি বার কয়েক নিজের ও সুদর্শনের ফোটো উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া দেখিল। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া ফাউণ্টেন পেন্‌টা আনিয়া তাহার নিজের ছবির নীচে লিখিল কুমারী শান্তি মিত্র। তারপর সে গুলি যথাস্থানে রাখিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

সাত

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর ড্রইং রুমে ঢুকিয়া সভয়ে দেখিল সুদর্শন তখনও অকাতরে ঘুমাইতেছে। শান্তির রক্তাভ ঠোঁটের কোণে একটু খানি হাসি খেলিয়া গেল। পল্টু ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রলোক কি সত্যি এন্‌ডিওরেন্স কোচ্ছেন নাকি দিদি? পল্টুকে চোখ রাঙাইতে গিয়া শান্তি নিজেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সুদর্শন জাগিয়া চোখ না মেলিয়াই কহিল, এইযে আপনারা উঠেছেন দেখছি। নমস্কার শান্তি দেবী। যদি অনুমতি হয়—

শান্তি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার অনুমতির অপেক্ষায় আপনি এখনো চোখ বুজে আছেন বুঝি?

সুদর্শন চোখ মেলিয়া হাসিয়া কহিল, না তা নয়।

তবে কি?

কি যেন একটা বোলতে যাচ্ছিলুম—মনে পড়ছেনা।

শান্তি পুনরায় হাসিল।

সুদর্শন কহিল, কাল রাত্তিরে আপনাদের অশেষ কষ্টের মাঝে ফেলে রেখেছিলুম—এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ঘুমুতে পারেননি নিশ্চয়ই?

শান্তি কহিল, কেন ঘুমোবোনা? খুব ঘুমিয়েছিতো বরং আপনারই হয়তো—

সুদর্শন বাধা দিয়া কহিল, হ্যা, সেতো দেখতেই পেলেন এই মাত্তর।

ব্রেকফাষ্টের পর সকলে মিলিয়া মোটরের নিকট গমন করিল।

সুদর্শন হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরিয়া যন্ত্রপাতি লইয়া মেসিন মেরামত করিতে বসিল। শান্তি যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্ম অগ্রসর হইল। পলটু নীরবে দেখিতে লাগিল।

সুদর্শন বাধা দিয়া কহিল, আপনি আবার হাত দিচ্ছেন কেন শান্তি দেবী? এ সব নোংরা কাজ আপনার জন্ম নয়।

শান্তি কহিল কেন দোষ কি?

সুদর্শন কহিল, আপনার শাড়ী ব্লাউজ নোংরা হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আপনারা দুজনে ততক্ষণ একটু হাওয়া খেয়ে বেড়ানগে। আমি চটপট এটা সেরে ফেলি।

শান্তির আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে কি অত্যন্ত সাধারণ তরুণীর ন্যায় শুধু সাজিয়া গুজিয়া হাওয়া খাইতেই পারে? বিপদের সময় কোনরূপ সাহায্য করিবারই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিতা হইতে পারেনা? সে দৃঢ়স্বরে বোধহয় একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়াই কহিল, আমার মোটর আপনি একা একা পরিশ্রম কোরে মেরামত কোর্‌বেন আর আমি হাওয়া খেয়ে বেড়াবো সে হয়না সুদর্শনবাবু।

সুদর্শন হাসিমুখে কহিল, বুঝেছি আপনি বিলক্ষণ চটেছেন। চটবার হেতুটা যে কি তাও বুঝেছি এবং বুঝে—সত্যি বোলতে কি—আনন্দ হোচ্ছে। আপনি তাহলে কিছু না কিছু কোর্‌তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কি বলেন?

শান্তি হাসিয়া কহিল, নিশ্চয়ই।

বেশ তাহলে এক কাজ করুন। উঠে বসুন মোটরে। মাঝে মাঝে যখন ষ্টার্ট দেবার প্রয়োজন হবে, আমি বল্লেই দেবেন। কেমন রাজিতো।

মাথা নাড়িয়া শান্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি জানাইয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। বুঝিল, ইহার অধিক কিছু সুদর্শন করিতে দিবেনা।

সুদর্শন পলটুর দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি ইচ্ছেমত বেড়াওগে পলটু ভাই, আর মাঝে মাঝে এসে সুপারভাইজ কোরে যেও। প্রায় ঘন্টাখানেক অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মোটরের পূর্ণ জীবন শক্তি ফিরিয়া আসিল। শান্তির পানে চাহিয়া সুদর্শন কহিল, এবার আপনার ছুটি শান্তি দেবী অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে—কিছু মনে কোরবেন না

শান্তি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে কহিল, বসিয়ে আর রাখলেন কই? এমন শ্রমসাধ্য কাজের ভার দিয়েছিলেন যে বল্‌বার নয়।

সুদর্শন হাসিল। কহিল, অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাতো দেখতেই পাচ্ছি। স্নান টান কোরে—এবার আপনারা একটু সুস্থ হবেন যান্। বেলাও হোলো অনেক। টিউবের লিকটা সেরে আমিও শীগগিরই আপনাদের অনুগমন কোরছি।

শান্তি মোটর হইতে নামিয়া আসিলে সুদর্শন পুনরায় কহিল, বাথরুমে তেল সাবান তোয়ালে সব গোছানো আছে। ইচ্ছা হ'লে ফলেও নাইতে পারেন—যদি ভয় না করে।

পলটু কহিল, হ্যা দিদি আবার নাইবে ঐ ফলএ আমার কিন্তু একটুও ভয় করে না বুঝলেন? আমি সেবার পুরীর সমুদ্রে প্রথম দিনই দাদার সাথে নাইতে নেমেছিলুম, আর দিদিতো প্রথমটায় কিছুতেই—

একজন স্বল্প পরিচিত যুবকের নিকট খেলো হইতে শান্তি মোটেই রাজী ছিল না। সে তো আর সত্যই কুসুম কোমলা ভয়াকুলা হরিণীটি নয় যে ফল্ এ স্নান করিবার মত সাহসটুকু ও তাহার থাকিবে না। সাহস কি শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া না কি? শান্তি বাধা দিয়া কহিল তুই থামতো পলটু। বড্ড বেড়ে উঠেছিস দেখছি ফল এই নাইগে চল। সুদর্শন অত্যধিক নির্বিষ্টমনে কাজ করিতে করিতে বলিল ওকে একটু সাবধানে নাওয়াবেন, নীচে না পড়ে যায়।

ভাইবোন কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে সহসা সুদর্শন ডাকিল, শান্তি দেবী। শান্তি ফিরিয়া চাহিল। সুদর্শন কহিল, অনুগ্রহ ক'রে যদি একটা কথা শুনে যান।

শান্তি নিকটে আসিয়া কহিল, আদেশ করুন।

সুদর্শন কহিল, ওকি, আপনিও আরম্ভ করলেন যে?

শান্তি হাসিয়া বলিল, বিনয় প্রকাশের কথা বোলছেন? সম্ভবতঃ ওটা ছোঁয়াচে রোগ।

সুদর্শন কহিল, বোলছিলুম কি—শাড়ী কেনবার সৌভাগ্যতো জীবনে কোনদিন হয়নি—কাজেই দিতে পারবো না বোলে খুবই দুঃখিত হোচ্ছি। খানকয়েক ধুতি আছে সুটকেসে। ইচ্ছামত বেছে নিয়ে পরবেন। তারপর পকেট হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া কহিল, এই নিন চাবি।

শান্তি সঙ্কুচিতা হইয়া কহিল, আপনার সুটকেশ খুলে ঘাটাঘাটি কোরবো?

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, ক্ষতি কি? আমার এমন কিছু আছে বোলেতো মনে হোচ্ছে না যাতে আপনার মত কারো লোভ হোতে পারে। অমন কিন্তু হোচ্ছেন কেন?—যান।

শান্তি আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া আসিল।

সুটকেস খুলিয়া শান্তি প্রয়োজন মত কাপড় বাহির করিয়া লইল। দেখিল, একপাশে একখানা খামশুদ্ধ চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। খামটি বন্ধ করা হয় নাই বা কোন ঠিকানাও নাই। শান্তি বুঝিল ইহা সেই জরুরী চিঠিখানা—যাহার কথা সুদর্শন কাল বলিতেছিল। একবার কৌতুহল হইল পড়িয়া দেখে জরুরী বিষয়টা কি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইল। একজন বিশ্বাস করিয়া তাহার হাতে চাবি ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস গোপনে ভঙ্গ করাও অত্যন্ত অন্যায়। খামখানা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া শান্তি সুটকেশ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

আট

সুদর্শন তখন টিউবেক্স লিকটার অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ফল্ এর দিক হইতে পলটুর বিপদসূচক চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল গহ্বরের তলদেশে যেখানে অবিশ্রান্ত প্রপাতের জল জমিয়া একটি ছোট খাট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে শান্তি সেখানে কোনরকমে পড়িয়া গিয়া আলুথালু বেশে হাবুডুবু খাইতেছে

সুদর্শন তড়িৎবেগে দুই তিন লাফে নীচে নামিয়া পড়িল। নিকটে যাইতেই মজ্জমানা শান্তি তাহাকে দুই বাহু দিয়া ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁফাইতে লাগিল। মিনিটখানেক পরে একটু সুস্থ হইলে সুদর্শন শান্তস্বরে কহিল, এইবার সোজা হয়ে দাঁড়ান শান্তিদেবী। এখানে বোধ হয় আপনার ডুবজল হবে না।

দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া শান্তি দেখিল, সত্যই তাই। জল তাহার কাঁধ অবধি পৌছিয়াছে। এত লজ্জিতা ও অপ্রস্তুত সে বোধ হয় জীবনেও হয় নাই। ত্রস্তে সুদর্শনকে ছাড়িয়া দিয়া সে দুই পা পিছু হটিল।

সুদর্শন সাবধান করিয়া কহিল বেশী পিছুবেন না কিন্তু। ঐ কাছেই একটা গর্ত আছে। আমি ভেবেছিলুম আপনি তাতেই প'ড়ে গেছেন বুঝি। পলটু এতক্ষণে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়া ভয়ে ভয়ে থামিয়া থামিয়া উপর হইতে ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। লজ্জায়, দুঃখে, ক্রোধে শান্তির সুন্দর মুখখান' এমন অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল যে বলিবার নয়।

সুদর্শন তাহার গম্ভীর রক্তাভ মুখখানার পানে চাহিয়া কহিল, খুবই লজ্জিত হোচ্ছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু লজ্জা পাবার তো কিছুই নেই! অমন হয়। শান্তি কথা কহিল না।

সুদর্শন প্রশ্ন করিল, আপনি সাঁতার জানেন না নিশ্চয়ই?

শান্তি মৃদুস্বরে কহিল, যৎসামান্য—সে না জানারই সামিল।

শিখবেন। জানা ভালো। তারপর একটু থামিয়া কহিল, অন্ধকারে ঢোড়া সাপে কামড়ালেও মানুষ মরে জানেন?

শান্তি সুদর্শনের পানে একবার চাহিয়াই চকিতে চোখ ফিরাইয়া লইল। বলিল, মরে নাকি?

সুদর্শন কহিল, হ্যা আমি দেখেছি, মরে। কিন্তু বিষে নয়—ভয়ে হার্ট ফেল্ কোরে। এই ভেবে যে বুঝি কেউ-টেতে কামড়েছে। আপনার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ।

শান্তি একটু হাসিল। সে তখন নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। কহিল, আপনাকে অনর্থক হয়-

রাণ কোরলুম সুদর্শন বাবু। ভিজে প্রায় নেয়ে উঠেছেন। সুদর্শন কহিল, তাতে কিছুই ক্ষতি হয়নি। একটু পরে নাইতেই আসতুমতো। অনর্থকইবা কেন? চলুন, আপনাকে ওপোরে তুলে দিয়ে আমি কাজে যাই। শান্তি সলজ্জ হাসিয়া কহিল, আমি নিজেই উঠতে পারবোখন—যান্। সুদর্শন হাসিমুখে হাত যোড় করিয়া কহিল, তা পারবেন। আমি একশ বার নতশিরে স্বীকার কোরছি। কিন্তু আমি যখন এসেই পড়েছি, তখন অন্ততঃ কিছু সাহায্য করাটা আমার উচিত। অনুমতি করুন শান্তি দেবী?

শান্তি হাসিয়া কহিল, ওঃ। তাহলে আমি সত্যি ডুবে গিয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজনটী বাড়িয়ে দিলেই আপনি খুসি হতেন দেখছি!

সুদর্শন কহিল, না তা নয়। তবে কি জানেন? আপনার অচেনা পথ। কাছেই গর্ত্ত আছে। হয়তো পা ফসকে সত্যি পড়ে যেতে পারেন তাই।

শান্তি কহিল, চলুন তা হলে। আপনার আদেশই শিরোধার্য্য। সুদর্শন হাসিল। বলিল, আদেশ নয়—বিনীত অনুরোধ।

শান্তির হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া দিয়া সুদর্শন মোটরের কাছে ফিরিয়া গেল।

কাপড় ছাড়িয়া শান্তি চুল আঁচড়াইবার উদ্দেশ্যে আয়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নিকটেই সেল্ফের উপর রাইটিং প্যাডটা পড়িয়া ছিল। কি ভাবিয়া সে সেটা তুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। সহসা আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিল তাহার উপর কালির দাগে ভরা গোলাপী ব্লটিং খানায় ছায়া পড়িয়াছে। আর তাহাতে স্পষ্ট তিনটী অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে বি—বা—হ। কৌতুহল বাড়িয়া গেল। ব্লটিং খানা আর্শির সম্মুখে ভাল করিয়া ধরিয়া শান্তি একটু চেষ্টা করিয়া গোটা কয়েক কথা পড়িয়া ফেলিল, যথা বন্ধু, আপত্তির, বোনটীকে বিবাহ, কেউ আশা, আকৃতি, মনে পড়ে, পশ্চিম, ভালবাসা, আশ্চর্য্য।

শান্তি বুঝিল এ সেই জরুরী চিঠি খানার প্রতিচ্ছায়া—যাহা সে খানিকক্ষণ আগে স্যুটকেসে দেখিয়া আসিয়াছে। কৌতুহল অদম্য হইল। সুদর্শন বাবু কি শীঘ্রই বিবাহ করিতেছেন নাকি? প্যাডটা রাখিয়া দিয়া শান্তি জানালা দিয়া দেখিল, সুদর্শন মোটরে চাকা পরাইতে ব্যস্ত। পল্টু নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।

শান্তি চাবি দিয়া স্যুটকেস্ খুলিয়া ফেলিল। তারপর চিঠিটা লইয়া পড়িল!

হাজারীবাগ

গেষ্ট হাউস্। ৭—১০-৩৪

প্রিয় বন্ধু,

তোমার জরুরী চিঠি পেলুম। তোমার বোনটীকে বিবাহ করবার প্রস্তাবটা চারদিক থেকে বেশ লোভনীয় বোলেই মনে হোচ্ছে, অন্ততঃ আপত্তির কারণ তো কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে। তাকে একবারটী স্বচক্ষে দেখবার এবং তার সাথে আলাপ করবার জন্য নিমন্ত্রণ কোরেছো কিন্তু তার কোন আবশ্যকতা অনুভব কোরছিনে। কারণ তোমার যখন বোন্, তখন শুধু আকৃতি হিসেবে নয় প্রকৃতি হিসেবেও যে কতটা তোমার মতই হবে তা বেশ বুঝতে পারছি। তা ছাড়া শিক্ষা দিক্ষার কথা যা লিখেছ তার বেশী কেউ আশা করেনা। ছেলে বেলায় তোমার বোনটীকে যেন দেখেছিলুম মনে পড়ে। তোমরা পশ্চিম যাচ্ছো—আমিও তো এদিকে টুরে বেরিয়েছি। হয়তো ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের কাছে গিয়েও হাজির হোতে পারি। আশ্চর্য্য কি? ভালবাসা নিও। বৌদিকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। তোমার 'এস'

চিঠিটা পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্যুটকেসটা চট্‌পট্ বন্ধ করিয়া ফেলিয়া শান্তি কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনটা কেমন যেন ভাল লাগিলনা। সুদর্শন যেন তাহার চোখে তখন অনেক খানি ছোট হইয়া গিয়াছে। লোকটা বিবাহের জন্য এত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে যে তাহার ভাবী সঙ্গিনীটিকে একবার চোখে দেখিবার আবশ্যকতাটাও অনুভব করিল না? বন্ধুর যখন বোন, তখন আকৃতি প্রকৃতি বন্ধুর মতই হইবে, কানা খোঁড়া বোবা বা কুৎসিতা হইতে পারে না। কি সুন্দর লজিক! সুদর্শনের শিক্ষা এবং বুদ্ধি বিষয়েও

শান্তির ঘোরতর সন্দেহ হইল। কি ভাবিয়া সে ফটো এলবাম খানা পুনরায় তুলিয়া লইল। সুদর্শনের ও তাহার ছবি দুটি বারকয়েক উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল। এলবামে নিজের ছবি দেখিয়া শান্তির যেন আবার নূতন করিয়া রাগ হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল ছবিখানিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। অপরিচিতা কুমারী নারীর ছায়াচিত্র গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখা কি দুর্নীতির লক্ষণ নয়?

এলবামটা সক্রোধে সেল্‌ফের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শান্তি আয়নার কাছে গিয়া বিকৃতমুখে সজোরে চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

নয়

বৈকালে বিদায়ক্ষণে সুদর্শন কহিল, আপনার যদি আপত্তি না থাকে শান্তি দেবী তাহলে চলুন মিরজাপুর অবধি আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসিগে।

শান্তি কহিল, ধন্যবাদ। কোন প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, গাড়ীটা চালিয়ে দেখা হয়নি। প্রয়োজন হোতেও পারে হয়তো। আবার যদি কোনরূপ বিপদে পড়ে যান্‌—

শান্তি তিক্তস্বরে কহিল, তাহলে আপনার সাহায্য প্রার্থনায় ছুটে আস্‌বোনা নিশ্চয়ই।

সুদর্শন হাসিমুখেই কহিল, আচ্ছা, আসুন তাহলে। নমস্কার! আশা করি নির্বিঘ্নেই পৌঁছুবেন। আবার যদি এদিকে শীগগির বেড়াতে আসেন কোনদিন, তবে বাঙলোয় একবারটী পদধূলি দিতে ভুলবেন না যেন। আমি আর সপ্তাহখানেক হয়তো আছি। তুমিও কিন্তু এসো ভাই পলটু?

পলটু মাথা নাড়িয়া জানাইল আসিবে। শান্তি কথা কহিল না, শুধু দুইহাত দিয়া একবার প্রতি নমস্কারের ভঙ্গি করিয়া তাহার বেবি অষ্টিনে ষ্টার্ট দিল। একটা মোড় ঘুরিবার সময় পিছনে মোটর সাইকেলের শব্দ শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল সুদর্শন দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে।

পলটু কহিল, তুমি যেন কি রকম ভাই দিদি। ভদ্রলোক কত উপকার কোরলেন আর তুমি ওঁকে একবারটী আমাদের বাড়ী যাবার নেমতন্নটাও কোল্লে না।

শান্তি কহিল, উপকার না ছাই কোরেছে।

পলটু কহিল, হু তা এখন বোল্‌বে বৈকি। উনি না থাকলে দেখতুম তুমি কি কোরতে তোমার এই বাচ্চা অষ্টিনটা নিয়ে। আমাদের বাংলার টিচার বলেন, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করেনা সে—

শান্তি রক্তচক্ষে গর্জ্জন করিয়া কহিল, ফের বক্ বক্ কোরবি তো মারবো গালে ঠাস কোরে চড়। পাজি ছেলে!

পলটু দিদির কাছে বহুবার আদর পাইয়াছে, ভর্ৎসনাও পাইয়াছে। কিন্তু এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি সে জীবনে দেখে নাই। তাহার দিদি সহসা এমন হইয়া গেল কেন সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, তুমি আমায় শুধাশুধি বক্‌ছো, দাঁড়াও না বাড়ী গিয়ে দাদাকে সব বোলে দোবো।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, কি বোলবি তুই?

সব।

বোল্‌বি বোলিস্। কিন্তু যদি 'ফল' এ প'ড়ে যাবার কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বল ছেলে তবে তোমার হাড় গুঁড়িয়ে দোবো।

পলটু বিদ্রোহী হইয়া কহিল, বোলবোইতো, বেশ কোরবো।

শান্তি সুর বদলাইয়া মিষ্টস্বরে কহিল, লক্ষ্মী দাদা আমার, যা বল্‌বার আমিই বোল্‌বোখন। তুই যেন বলিস্‌নি কিছু। বুঝলি? আমি এবার কোলকাতা গিয়েই তোকে ভাল এয়ার গান কিনে দোবো দেখিস্।

পলটুর মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, না বোলবোনা। এয়ারগান সত্যি দেবেতো? তুমি কিন্তু বড্ড ভুলে যাও দিদি।

শান্তি ব্রেক কষিতে কষিতে কহিল, না ভুলবোনা। যদি সত্যি ভুলে যাই, তুই মনে করিয়ে দিস্।

পলটু প্রশ্ন করিল, কি থামলে যে?

একটু দাঁড়ানা, সুদর্শন বাবুর সাথে দুটো কথা কয়ে যাই। বাইকে এ পথেই আস্‌ছে।

নেমন্তন্ন কোরবে বুঝি?

শান্তি হাসিয়া কহিল, নেমন্তন্ন না বচু। দেখনা কি করি।

মোটরটা থামিতে দেখিয়া মুহূর্তে মোটর সাইকেল আসিয়া তাহার পাশে থামিল। সুদর্শন কহিল, নমস্কার শান্তি দেবী। আশা করি মোটর পুনরায় অচল হয়নি?

শান্তি সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, গোপনে স্ত্রীলোকের অনুসরণ করাটা বোধহয় সুনীতির পরিচায়ক নয় সুদর্শন বাবু?

সুদর্শনের মুখখানা মুহূর্তের জন্য কালো হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া সে কহিল, তা সত্যি, যদি তার পেছনে কোন সুমতলব না থেকে কুমতলবই লুকিয়ে থাকে।

শান্তি কহিল, মতলব কার সু আর কার কু তাই বা কে সঠিক বোলতে পারে?

কোনরূপ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শান্তি সুদর্শনের পাশ দিয়া সবেগে ড্রাইভ করিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, সুদর্শন সেদিকে বিস্মিত নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সাইকেলটা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল।

দিন তিনেক পরে......

মোড়ের মাথায় সাইক্ল থামাইয়া সুদর্শন কোন পথে যাইবে ভাবিতেছিল, বাম দিক হইতে সবেগে একখানা বেবি অষ্টিন আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। সুদর্শন সবিস্ময়ে দেখিল আরোহী এবং সোফার আর কেহ নয়, শান্তি। একটু মলিন হাসিয়া সে নমস্কার করিল।

শান্তি প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, কোথায় চ'লেছেন সুদর্শন বাবু?

সুদর্শন কহিল, কোন স্থির লক্ষ্য নেই, যেদিকে খেয়াল হয়। আপনি?

শান্তি মোটর হইতে নামিতে নামিতে কহিল, আমি এই আপনারই খোঁজে। দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছি চলুন।

কোথায়?

আমাদের বাড়ী চুনার?

চুনার!

হ্যাঁ যেতে হবে। চলুন।

সুদর্শন বিস্ময়াধিক্যে এক মুহূর্ত শান্তির লজ্জা হাসিমাখা মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। তারপর হাত যোড় করিয়া কহিল, আমায় ক্ষমা কোরবেন শান্তি দেবী।

শান্তি নতমুখে কহিল, আপনি না গেলে আমার দাদা খুব অসন্তুষ্ট হবেন।

সুদর্শন কহিল, তার সাথে আমার পরিচয় নেই। কাজেই তিনি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হবেন বোলতে পারিনে। তবে আপনি যে খুসী হবেন না এটা বেশ জানি। কাজেই—

শান্তি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমিও খুশী হই?

সুদর্শন তাহার মুখের দিকে একবার চকিতে চাহিয়া কহিল, সম্ভব বোলেতো মনে হয়না।

যদি সম্ভব হয়?

তাহলে হয়তো—সুদর্শন একটু হাসিল।

শান্তি একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। একটু ইতস্ততঃ করিল। তারপর মৃদুস্বরে কহিল, আমিও সত্যি খুসি হব সুদর্শনবাবু। চলুন।

সুদর্শন একটু ভাবিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ীতেতো একটা খবর দেওয়া প্রয়োজন শান্তি দেবী, যে আমার ফিরতে রাত হবে।

শান্তি হাসিয়া কহিল, রাত হবে কি? আজকে ফেরাই হবেনা মোটে।

সুদর্শন বলিল, বলেন কি! আমাকে একা পেয়ে যে আপনি রীতিমত অত্যাচার সুরু কোরলেন!

শান্তি হাসিল। অদূরে একখানা এক্কা আসিতেছিল। সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ঐ গাড়োয়ানটাকে যেন চেনা চেনা মনে হোচ্ছে। একদিন পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় ওর গাড়ী দিয়ে আমার মোটরখানা কিছুদূর

টেনে নিতে হোয়েছিল। দেখি, ওকে দিয়ে যদি আপনার বাঙলোয় খবর পাঠাতে পারি।

শান্তি প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছো ফকির?

ফকির গাড়ী থামাইয়া কহিল, টাণ্ডাকো সোয়ারী হ্যায় মায়ীজি! একায় কটী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন।

শান্তি বলিল, একঠো কাম করনে সকোগে ফকির!

ক্যা কাম মায়ী, বোলিয়ে?

গাড়োয়ানের হাতে একটা সিকি দিয়া শান্তি কহিল, টাণ্ডাবা ডাকবাঙলোমে পাঁড়েজি হ্যায়। উনকো বোলনা কি সাহেব চুণার যাতা হ্যায়—কাল সাম্‌মে আয়েগা। সম্‌ঝো?

জি হুজুর।

কেয়া বোলেগা?

গাড়োয়ান কহিল, সাব ঔর মেমসাব্ চুণার যাতা হায় কাল সাম্‌মে বাঙ্‌লো পর আয়েগা।

শান্তির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল একার আরোহীকটী তাহার দিকে ঔৎসুক্যে চাহিয়া আছে। ধমক দিয়া কহিল, মেমসাবকো বাত কোন্ বোলা? বোলো সাব চুণারমে গিয়া—

ফকির সেলাম করিয়া কহিল, যো হুকুম মায়ীজি। তারপর গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

শান্তি কয়েক মিনিট চলন্ত একাটার দিকে চাহিয়া রহিল। সুদর্শনের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও যেন তাহার লজ্জা করিতেছিল। একটা অশিক্ষিত গাড়োয়ানের সামান্য ভ্রমের জন্য তাহাকে এমন বিপদেও পড়িতে হইল।

সুদর্শন তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিল, সত্যি ছেড়ে লোকে মিথ্যে নিয়েই অনর্থক এমন বিব্রত হয়ে পড়ে বটে।

শান্তি লজ্জারুণ মুখখানা ফিরাইয়া কহিল, না তা নয়। চলুন।

সুদর্শন কহিল, আপনি মোটরে আগে আগে চলুন। আমি পশ্চাৎ অনুসরণ কোর্‌ছি।

সাইকেলে যাবেন?

আপনি কি বলেন? আদেশ করলে হেঁটেও যেতে পারি বটে, তবে তাহলে আপনার বেবি অষ্টিনের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবোনাতো।

শান্তি হাসিয়া কহিল, না—তা বোল্‌ছিনে। বোলছি দুজনে নীরবে একা একা না গিয়ে একসাথে মোটরে গেলেই হোতো ভাল। কথা কইতে কইতে যাওয়া যেতো।

সুদর্শন কহিল, আপনার প্রস্তাবটি খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলে চলুন, আগে সাইকেল ষ্টেশনে রেখে আসি।

শান্তি কহিল, চলুন।

সাইকেলখানা ষ্টেশন মাষ্টারের হেফাজাতে রাখিয়া উভয়ে বেবি অষ্টিনে উঠিয়া বসিল। সুদর্শন কহিল, যদি আপনার আপত্তি না থাকে শান্তি দেবী, তবে সোফারের কাজটা আমিই করি।

শান্তি কহিল বেশতো করুন। কিন্তু মাইনে পাবেন না তা বোলে দিচ্ছি।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, পাবোনা? আমারতো মনে হয় আগেই পেয়েছি। আপনি যে ফের হাসিমুখে আমার খোঁজে কষ্ট কোরে এতটা পথ এসেছেন, আমার এ পরম সৌভাগ্য, মাইনের চেয়েও অনেক বেশী দামী।

শান্তি কথা কহিল না।

সুদর্শন পুনরায় কহিল, মোটর বিগড়োলে সেরে নেয়া খুব সোজা। কিন্তু মানুষের মনের কল যদি একবার বিগড়ে অচল অবস্থায় সৃষ্টি করে, তবে তা সেরে নেয়া অসম্ভব, যদি না তা আপনা হোতেই সারে হয়। যাই হোক, যদি সেদিন আপনার কাছে কোন অপরাধ কোরে থাকি শান্তি দেবী তবে ক্ষমা কোরবেন। জানবেন, তা অজান্তেই কোরেছি।

শান্তি কহিল, কই আপনি কিছুই করেননিতো?

কোরিনি? যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু সেদিন আপনার কথাবার্তায় যেন ওরূপ ধারণাই আমার হোয়েছিল।

শান্তি বলিল, সেজন্য আমারই আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

কিছুমাত্র না। আপনি কোন অপরাধ কোরেছেন বোলেই আমার কখন মনে হয়নি, কাজেই ক্ষমার কোন প্রশ্নই এতে নেই।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। শুধু মোটরটা সশব্দে দ্রুতগতিতে চলিতেছিল। শান্তি চাহিয়া দেখিল। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা কুড়ি হইতে ক্রমশঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশে পৌছিল। গাড়ী তখন ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়েছে। শান্তি সভয়ে দেখিল কাঁটা চল্লিশের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।

সুদর্শনের হাত চাপিয়া ভয়াকুলা শান্তি কহিল, কোচ্ছেন কি সুদর্শন বাবু শেষে একটা এক্‌সিডেণ্ট করবেন নাকি?

সুদর্শন এক্‌সিলারেটরের চাপ কমাইয়া দিয়া ব্রেক কষিতে কষিতে হাসিয়া বলিল, আমি জোরে ছুটতেই ভালবাসি শান্তি দেবী। আপনি যে সঙ্গে রয়েছেন তা মনেই ছিল না।

শান্তি কহিল, জোরে ছুটতে আমিও ভালবাসি। তবে আপনার মত এমন বেপরোয়া ভাবে নয়।

সুদর্শন হাসিয়া বলিল, তা বটে। পরশু এই কুড়ি মাইল পথ যেতে আমার মোটে আধঘণ্টা লেগেছিল।

শান্তি সবিস্ময়ে কহিল, আপনি পরশু চুণার গিয়েছিলেন?

সুদর্শন একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, হা—তা গিয়েছিলুম বৈকি।

বেড়াতে?

না বেড়াতে ঠিক নয়।

তবে?

সুদর্শন মৃদু হাসিয়া কহিল, কেমন খেয়াল হোলো।

শান্তি কহিল, আমাদের বাড়ী গেলেন না কেন।

আপনাদের বাড়ী? আপনার ঠিকানাতো জানতুম না শান্তিদেবী। আপনি আস্‌বার সময় সেটা অনুগ্রহ কোরে দিয়ে আস্‌তে ভুলে গেছলেন। শান্তি লজ্জিতা হইল। চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, জানলে যেতেন? সুদর্শন বলিল, হয়তো যেতুম। কিন্তু সে দিনকার যাওয়াটা আজকের মত আনন্দদায়ক হোতো কি?

শান্তি কথা কহিল না। একটু হাসিল মাত্র।

সুদর্শন কহিল দেখুন, আমি মাঝে মাঝে ভাবি হাতের কাছে এমন মস্ত বড় সমস্যা থাকতে লোকে দূরের জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায় কেন।

শান্তি সুদর্শনের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, বুঝলেন না? এই ধরুন কেন, আপনারাইতো এক একটি বিরাট প্রহেলিকা।

শান্তি হাসিয়া বলিল, ওঃ তাই বলুন। আমি ভাবছিলুম না জানি কি!

সুদর্শন বলিল, হাসছেন? কিন্তু সত্য তাই—অন্ততঃ আমাদের কাছেতো বটে। শান্তি পুনরায় হাসিল।

সুদর্শন হাসিমুখে কহিল, যারা এমন অদূরের প্রব্‌লেম ছেড়ে সুদূরের প্রব্‌লেম্ সল্‌ভ কোত্তে যায়, তাদের অবস্থাটা কিরূপ হয় জানেন? সেই কতকটা—

কতকটা কি?

যদি অভয় দেনতো বলি।

শান্তি হাসিয়া কহিল বলুন।

সুদর্শন তাহার মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া হাসিমুখে কহিল, কতকটা সেই জ্যোতিষীটীর মত যিনি আকাশে গ্রহ উপগ্রহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কোরে বেড়াতে বেড়াতে পাতকোর ভেতর প'ড়ে গেছলেন।

শান্তি হাসিমুখে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, আপনি আমাদের পাতকোর সাথে তুলনা কোরছেন এটা কিন্তু অমার্জ্জনীয় অপরাধ সুদর্শন বাবু।

সুদর্শন দুই চোখ কপালে তুলিয়া সহাস্যে কহিল, পাতকোকে কি আপনি সোজা জিনিষ মনে কোরলেন? দেখতে সামান্য হোলেও সে অতলস্পর্শী, পিপাসা মেটাবার ক্ষমতাও তার অসাধারণ। সাহারায় যদি গোটা কয়েক পাতকো থাকতো শান্তিদেবী তাহলে সে মরুভূমি না হোয়ে সমৃদ্ধিশালী নগর হোয়ে প'ড়তো দেখতেন।

শান্তি ও সুদর্শন দুইজনেই হাসিতে লাগিল।

পুষ্পপাত্রের লেখকগণ



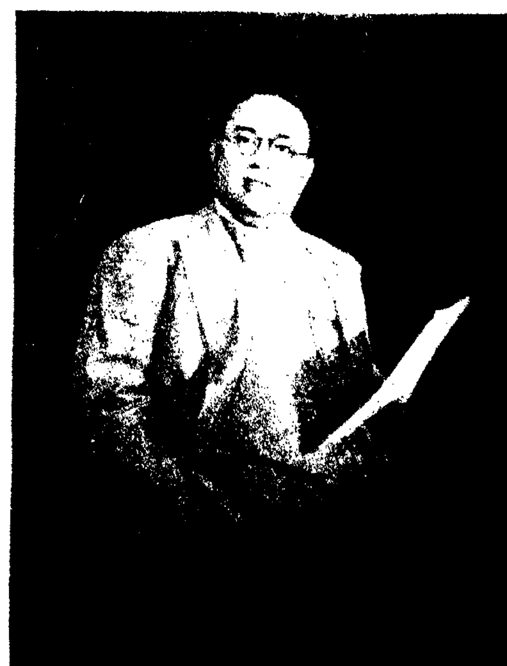
শ্রীঅম্বুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী



শ্রীবিনয় দত্ত



ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী



কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

পুষ্পপাত্রের লেখকগণ



শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী



শ্রীদিলীপকুমার রায় ও উদয়শঙ্কর



শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী



শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত



শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

এগারো

সিঁড়ির কাছে প্রৌঢ়া ঝি দাঁড়াইয়াছিল। শান্তি মোটর হইতে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা বাড়ী আছেন সারদা?

সারদা উত্তরের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, না গো দিদিমণি! ছোড়দাদা বাবুকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন। বোলে গেলেন সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন, ভদ্রলোকটীর যেন যত্নআত্তি করা হয়।

শান্তি হাসিয়া কহিল, দেখলেন সুদর্শন বাবু একবার দাদার আক্কেলটা? আপনি সেদিন আপনার একটী বন্ধুর গল্প কোচ্ছিলেন না? আমার দাদাটিও ঠিক সেই প্রকৃতির।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু এরূপ মানুষই পছন্দ করি শান্তিদেবী। কারণ সাধারণতঃ এদের মনটা সাদাই হয়।

শান্তি কহিল, সে কথা ঠিক। দাদার সাথে আলাপ হোলেই বুঝতে পারবেন।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া শান্তি বলিল, আপনি বসুন সুদর্শনবাবু; আমি চট্ কোরে ভেতোর থেকে আসছি। একা বসিয়ে রাখছি—কিছু মনে কোরবেন না যেন। একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সুদর্শন হাসিয়া কহিল, কিছুনা। আপনি ঘুরেই আসুন। কিন্তু আমাকে দোষারোপ কোরে শেষে আপনিও যে দস্তুর মত শিষ্টাচার সুরু কোরলেন?

শান্তি হাসিয়া কহিল, বোলছিতো ওটা সঙ্গদোষ?

সুদর্শন টেবিলের উপর হইতে ইণ্ডিয়ান উইক্‌লি নোট্‌টা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইতেছিল। পদশব্দে চাহিয়া দেখিল, শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। পশ্চাতে আর একটি সুন্দরী যুবতী।

সুদর্শন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর শান্তির মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল।

শান্তি হাসিমুখে কহিল, আপনার সাথে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলুম সুদর্শনবাবু। ইনি শ্রীমতী পুষ্পরেণু মিত্র। পূর্ব্বে আমার সহপাঠিনী বন্ধু ছিলেন, বছরখানেক হোলো বৌদির পদে প্রমোশন পেয়েছেন।

সুদর্শন নমস্কার করিয়া দুখানি চেয়ার টানিয়া দিয়া কহিল, বসুন বৌদি। আপনার সাথে পরিচিত হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা।

পুষ্পরেণু প্রতি নমস্কার করিয়া চেয়ারে বসিয়া হাসিয়া কহিল, সেটা উভয়তঃ। আপনার কথা আমি ঠাকুরঝির কাছে পূর্ব্বেই শুনেছি সুদর্শন বাবু।

শুনছেন? আমার মত নগণ্য জীবের বিষয়ে গল্প করবার মত যদি কিছু শান্তিদেবী খুঁজে পেয়ে থাকেন, তবেতো বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই সে সব শ্রবণ যোগ্য মনে করেন নি?

কোরবোনা কেন? নিশ্চয়ই কোরেছি। ও বিপদে আপনি সাহায্য না কোরলে—

সুদর্শন বাধা দিয়া কহিল, বিপদ অতি সামান্য, আর সাহায্যও তাই। যেটুকু সবাই কোরতো তার বেশী কিছুই কোরনি তো!

পুষ্পরেণু বলিল, কিন্তু আমি যা শুনেছি তা নিতান্ত সামান্য নয়, বরং বেশ একটু অসামান্য রকমের।

সুদর্শন বলিল, যদি আমার বিষয়ে উনি বেশী কিছু বোলে থাকেন বৌদি তাহলে জানবেন তার উদ্দেশ্য হোচ্ছে শুধু এটুকু প্রমাণ করা যে অতিরঞ্জনটা সত্যি নারীজাতির একটা স্বাভাবিক বৃত্তি।

পুষ্পরেণু হাসিয়া কহিল, তা হোতেও পারে। কিন্তু অন্ততঃ একটা কথা যে শান্তি অতিরঞ্জন করেনি তা বেশ বুঝতে পারছি।

কি কথা?

যে আপনার সাথে কথায় পারবার যো নেই।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, সেটা যদি সত্যিই হয় তাহলে ততক্ষণ সত্যি যতক্ষণ না আপনারা কথা বোলতে সুরু করেন।

শান্তি কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল কেহ লক্ষ্য করে নাই। একখানা ট্রেতে করিয়া সে কাপ কেট্‌লি ও জলখাবারের প্লেট লইয়া ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সেগুলি নামাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া কহিল, আমার বন্ধু বৌদিটীকে কেমন লাগছে সুদর্শনবাবু?

সুদর্শন কহিল, চমৎকার। আপনিতো সেদিন নিজেই বোলছিলেন যে সমানে সমানে না হোলে বন্ধুত্ব হয়না।

পুষ্পরেণু ও শান্তি উভয়েই পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু শান্তি-দেবী আপনি যে এসব নিজেই—কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে শান্তি কহিল, অতিথি সেবা স্বহস্তেইতো কোরতে হয়।

সুদর্শন কহিল, ঠিক। আমার কিন্তু সেদিন এ বিষয়ে বড় ভুল হোয়ে গেছে। আশাকরি আপনারা সবাই মিলে একদিন আমার এই ত্রুটিটা শুধরে নেবার সুযোগ দিয়ে আসবেন।

পুষ্পরেণু কহিল, কিন্তু আপনিতো শীগগিরই চলে যাবেন শুনেছি?

সুদর্শন কহিল, হ্যা আমার প্রোগ্রাম তাই। তবে আপনারা যদি একটু আশা ও উৎসাহ দানে কার্পণ্য না করেন, তাহলে আমি সানন্দেই প্রোগ্রামটা একটু চেঞ্জ করে নোবো'খন। বলুন, কি আদেশ আপনাদের?

পুষ্পরেণু ও শান্তি পরস্পরের পানে চাহিল।

শান্তি কহিল, আচ্ছা দাদা এলে ও বিষয়ে আলোচনা করা যাবে সুদর্শনবাবু এখন একটু জল খেয়ে নিন দেখি। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোষে যে হোষ্টেসের নিন্দে কোরবেন, সেটী হোচ্ছেনা।

সুদর্শন হাসিয়া কহিল. নিন্দে করা আমার স্বভাব নয়। বিশেষতঃ ভোজন ব্যাপারে আমি বেনী নয় খাঁটি কুলীন। অর্থাৎ যাহা পাই তাহাই খাই, এটা খাবো ওটা খাব গোলমাল করিনা।

শান্তি ও পুষ্পরেণু হাসিয়া উঠিল।

সুদর্শন কহিল, কিন্তু আপনারা? একা খেলে পেট ভরে বটে, কিন্তু তেমন তৃপ্তিলাভ হয়না বলেই আমার ধারণা।

শান্তি কহিল, আমারাও খাবো বৈকি। এইতো রয়েছে সব। আপনি অতিথি, আগে আরম্ভ করুন।

তিন জনে গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল।

সহসা পুষ্পরেণুর পানে চাহিয়া সুদর্শন কহিল, একটা কথা বলি যৌদি যদি অপরাধ না নেন।

পুষ্পরেণু কহিল, বলুন।

দেখুন, লজ্জা জিনিষটা নারীজাতির একটা বহুমূল্য অলঙ্কার সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিরিক্ত অলঙ্কার পরবার রেওয়াজটা আধুনিক যুগে আর খাপ খায়না।

তা খায়না বটে। কিন্তু আমি কি লজ্জা কোরছি সুদর্শনবাবু?

সুদর্শন হাসিয়া কহিল, বোধ হয় শান্তিদেবীও আমার সাথে একমত যে আপনি অত্যধিক লজ্জা কোরে থাচ্ছেন।

পুষ্পরেণু আরও লজ্জিতা হইয়া শুধু একটু হাসিল।

জলযোগ শেষ হইলে সারদাকে টেবিলটা পরিষ্কার করিবার আদেশ দিয়া শান্তি দেখিল টেবিলের উপর রক্ষিত সিগারেটের কৌটাটার দিকে সুদর্শন সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছে। সে হাসিয়া বলিল, আপনাকে সিগারেট ধরাবার অনুমতিটা আমরা আগেই দিয়ে রাখছি সুদর্শন বাবু। কাজেই আর চাইবার প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন হাসিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় একটী যুবক একটী বালকের হাত ধরিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল।

সুদর্শন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া সোল্লাসে কহিল, হ্যালো বিণু! তুই এখানে কোত্থেকেরে?

বিনয় সবিস্ময়ে কহিল, আরে সুধা যে! তাই হঠাৎ কোত্থেকে এলি আগে বল দেখি?

সুদর্শন কহিল, আমি আসছি ভাই টাণ্ডা থেকে। আমার এই মহিলা বন্ধুটী অ্যারেষ্ট কোরে নিয়ে এলেন। সুদর্শন শান্তিকে দেখাইয়া দিল।

বিনয় একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, মহিলা বন্ধু! ওযে আমার বোন শান্তি। ওর কথাইতো লিখেছিলুম তোকে। ফোটো দেখেও চিনতে পারিসনি সুধা? হাঃ—হাঃ—হাঃ। বিনয় সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

শান্তি ও সুদর্শন পরস্পরের পানে সবিস্ময়ে চাহিল।

বিনয় প্রশ্ন করিল, সেদিন মোটর ভেঙ্গে শান্তি তোর বাসায়ই ছিল নাকিরে?

সুদর্শন কহিল, হ্যা ভাই।

বিনয় পুনরায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই কহিল, ওঃ—তাই বল। আমিতো

প্রথমটায় অবাক্ হোয়ে গিয়েছিলুম যে এমন সদাশয় সুদর্শন সাহেবটী কে আমার বোনটী একদিনেই যার এতখানি পক্ষপাতী হোয়ে পড়লেন। তোর যে সুদর্শন বোলেও একটা নাম আছে সুধা তাতো ভুলেই গিয়েছিলুম। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

শাস্তি রক্তিম মুখে তিরস্কার সূচক স্বরে ডাকিল, দাদা!

বিনয় সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্বের মতই হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, পুষ্পতো ভেবেই আকুল যে কি উপায় করা যায়। আমি বোল্লুম, দাঁড়াওনা ব্যস্ত হোচ্ছো কেন? শান্ত একদিন গিয়ে সাহেবটীকে নেমন্তন্ন কোরে নিয়ে আসুক। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তবে সুধাকে লিখলেই চল্‌বে যে বোন্‌টী আমার স্বয়ম্বরা হোয়েছেন। কিন্তু তুইযে সেই সাহেব—হাঃ—হাঃ—হাঃ। রেগুলার কমেডি ভাই। হাঃ—হাঃ।

শাস্তি ক্রোধে লজ্জায় আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া ড্রইংরুম হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পুষ্পরেণু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার অনুগমন করিল।

বাহিরে আসিয়া শাস্তি সক্রোধে কহিল, দেখলে বৌদি একবার দাদার আক্কেলটা? পুষ্পরেণু হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তা তুমি যে ভাই ওর বন্ধুটীকেই বরমাল্য প্রদান কোরেছো তা উনি আগে থাকৃতেই কি কোরে জানবেন বল?

শাস্তি রাগিয়া হাসিয়া বৌদির গাল টিপিয়া দিল।

গান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ওই ছায়া পথে যেদিন আমি ফিরব একা,
হয়ত সেদিন তোমায় আমায় হবে দেখা!
সেদিন তোমার অঙ্গে প্রিয়
দুল্‌বে মেঘের উত্তরীয়,—
উজল হয়ে উঠবে চাঁদের তিলক-রেখা!

তোমার চরণপাতে তারার বনে উঠবে ফুটে ফুল,-
আকুল হাওয়া বিনিয়ে দেবে চাঁচর কালো চুল!
জ্যোছনা ধারা পড়বে ঝরে'
মুখের পরে, বুকের পরে
মুখর হ'য়ে উঠবে বুকের কুহুকেকা!

সেদিন রামধনুকের মুকুট তুমি পর্‌বে শিরে,—
গলায় দেবে সাতনরী হার আলোকলতার তার ছিঁড়ে!
হয়ত সে মোর পরম দিনে
আমায় তুমি লবে চিনে,—
চিন্‌বে আমার চোখের জলের রক্তলেখা!

প্রেম

গল্প— শ্রীবাণী রায়

[শ্রীবাণী রায় সুলেখিকা ; বর্ত্তমান গল্পটিতে তিনি প্রেমের যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন তাহা বিচিত্র।]



—শ্রীবাণী রায়

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অমিতা এসেন্সের শিশি খুলছে। পুরাণো, তীব্র গন্ধে তার মনে পড়ে গেল রজতকে, যে এই এসেন্সটা দিয়েছে, এবং যার জন্য সে এই এসেন্সটা ব্যবহার করছে। আশ্চর্য্য নারী চরিত্র ! অমিতা শিশিটা হাতে ধরে ভাবতে লাগলো। নীল আকাশের প্রান্ত থেকে গোধূলীর রক্তরাগটুকু মুছে যাবার বহু পূর্ব্বেই রজনীর তিমির নেমে আসছে যবনিকার মত, দিবালোকের রমণীয়তার আভাসমাত্র মুছে গেল। নীচে অমিতার গাড়ী অপেক্ষা করছে, এখনই চালক তাকে নিয়ে যাবে তার বন্ধু সুলেখার বাড়ী সেখানে তার দেখা হবে অনুপমের সঙ্গে। অনুপম! যার নাম স্মরণ করা মাত্রেই মন তার হয়ে ওঠে আবেশে বিহ্বল, চোখে রঙীন স্বপন নেমে আসে। অথচ একবছর আগেও অনুপম ছিল কোথায় ?

এসেন্সের শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধরেছে অমিতা, বক্র অধরে তার মৃদু হাস্য। সামনের গোল, স্বচ্ছ আয়নায় অমিতার ছায়া পড়েছে। সুন্দরী সে নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, সুসজ্জিত দেহবল্লরী অনেককে আকর্ষণ করেছে ও করবে।

এই পুষ্পসার অনেক দিনের ভোলানো কথা, হারাণো স্মৃতিকে মনে ডেকে আনছে। বসন্তের প্রথম দিনে দার্জ্জিলিংএর রাস্তায় সেই তরুণ তরুণীর প্রথম আলাপ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পূর্ণ করে দীর্ঘ দুইবছর ধরে যে ছিল মনের আশে পাশে, যার কথা ক্ষণকালের জন্যও অমিতা ভুলতে পারতনা, সে আজ গেল কোথায় ? কোথায় গেল তার বৈচিত্র্যময় স্মৃতি ? এখনো হয়ত তার কথা মনে পড়ে অমিতার কিন্তু সে চিন্তা আর তার মনে দোলা দিতে পারে না।

কেন এমন হোল ? অথচ আজ রজতকে যতই উপেক্ষা করুক অমিতা একদিন যে তাকেই সে ভাল বেসেছিল তার কোনই সন্দেহ নেই।

অমিতা চিন্তা করছে :—

ভেবে দেখি একটু কেন এমন হয়। ভুলে তো গেছি তাকে কিন্তু কেন আজ তার দেওয়া সুবাস তাকে এতো মনে করিয়ে দিচ্ছে !

কোণের সোফাটার উপর অমিতা বসলো। নরম কুশানের আরামের মধ্যে নিমজ্জমান হয়ে ভাবতে লাগলো পুরাণো দিনের কথা—যার স্মৃতি মধুর তন্দ্রার মত তার মনের উপর নেমে আসে—সমস্ত চেতনাকে ডুবিয়ে দিয়ে অতীতকে ছায়াছবির মত মনের পটে ডেকে আনে।

সময় কই? পূর্ব্ব প্রেম ভাববার সময় কই? তবু কি জানি কি হয়! ফুলের সুবাসে মনে পড়ে কত কথা ফুলের মতই একদিন যা তার সারা মনকে অচ্ছন্ন করেছিলো! সে সব পুষ্পরাজি গেল কোথায়? তবু মাঝে মাঝে তাদের সুবাস ভেসে আসে দূর অতীতের বক্ষ থেকে।

রজত, হ্যা তাকে তো ভালোবেসেছিলাম। তাকেই কি ভালোবাসা বলে? প্রভাতের সুমধুর আলো ফুটে উঠবার সাথে সাথে যার কথা জেগে উঠতো আমার মনে। রাত্রে নিদ্রালস নয়নের সম্মুখে তার হাস্যময় মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়তো। যার ক্ষণসঙ্গ আমার মনকে অপার আনন্দ দিত, বিরহ কত ব্যথা দিত। মনে পড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কতদিন তারই প্রতীক্ষা করা। বন্ধুমহলে সিনেমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে তার আগমনের কথা ভাবা।

সেই দার্জ্জিলিং এর রাস্তা। গোলাপে আচ্ছন্ন পথের ওপর শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অমিতার হাতে গোলাপ, অমিতার কপোলে গোলাপ। সেই প্রসন্ন, নির্ম্মল আকাশের নীচে যে প্রেমের তরুণ দেবতা তাদের হৃদয় সূত্র একসাথে বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁকে কে অস্বীকার করবে? যুগযুগান্ত ব্যাপ্ত করে চিরন্তনী তরুণ-তরুণীর মন নিয়ে এই যে ক্রীড়া তাকেই কি বাংলা অভিধানে প্রেম বলে?

ঘরের কোণে ঘড়িটায় সাড়ে চারটা বাজলো। ওঃ, পাঁচটায় পৌছাতে হবে। অনুপমকে অমিতা কথা দিয়েছে। কিন্তু সারাঘর যে হাস্নাহানার গন্ধে পুলকিত পাথার বাতাসও এই গন্ধ বহন করে তার চুলে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কেন, সে জানেনা কেন এই হাস্নাহানার গন্ধ তাকে মনে করিয়ে দেয় রজতকে যাকে সে ভুলে গেছে।

মেয়েদের জীবন—অমিতা ভাবছে একটা রঙ্গমঞ্চ। কত অভিনেতা আসে, অভিনয় করে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর তারা চলে যায়, পরে ধূসর কালো বিস্মৃতির যবনিকা। আলোকমালা নিবে যায় কিন্তু কতক্ষণের জন্য? আবার পরের রজনীতেই সেই যবনিকা সরে যায়, আলো জলে ওঠে, অভিনেতা নূতনবেশে আসে। কিন্তু সব জড়িয়ে একটা অভিনয়।

কি বলে অভিনেতা? এক কথা, এক ভঙ্গি, এক প্রেমকাতর জড়জড় ভাব। কি চায় এরা? মনে পড়ে রজতের কথা। এই কলকাতার এক নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে তারা সবাই মিলে গিয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। রজত ছিল তার পাশে পাশে।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য উঠেছে! অমিতার ললাটে মুক্তাহার, তার রুক্ষ এলোচুল বাতাসে উড়ছে। প্রবল পিপাসায় সকলেরই অবস্থা সঙ্গীন। অমিতার ছোট বোন অসিতার দুরন্তপনায় সব জল পড়ে যাওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে। সেজন্য অবশ্য অসিতার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। মুক্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে সে গেয়ে উঠলো

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

সকলেই হেসে উঠেছিল এ কথায় মনে আছে। অমিতার দাদা বলেছিলেন 'হ্যা ফাটি যাওত ছাতিয়া বটে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে।'

অমিতার বন্ধু প্রতিমা বলেছিলো "ওঃ, এক গ্লাস জল চাই শুধু। My heart for a glass of water!"

রজত অমিতার কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে তার কানের কাছে গানের মতো করে বলেছিল, "আমি জল চাইনা অমি,—

"No, no, the utmost share
of my desire shall be
Only to kiss that air
That lately kissed thee"

কি অভিনয়। অমিতার বাঁকা অধরে ছুরীর মত শাণিত হাসি দেখা দিলো। অথচ জল পাওয়া গেলে থেলো ও-ই সকলের চেয়ে বেশী।

তারপর চলে গেলো রজত, এলো অনুপম। হয়তো এও থাকবেনা। আর একজন আসবে এই দৃষ্টি প্রদীপের আরতি জালিয়ে, যুক্তকরে পদপল্লব যাচ্ঞা করে। যতদিন রমণীর আকর্ষণ আছে, তারুণ্য আছে এমন আসবে অনেক। তারপর একদিন শুভলগ্নে লজ্জাবস্ত্রের

নীচে যার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে তাকেই সে দেবে নিজের সমস্ত। এইতো নারীর জীবন, এই প্রেম!

কি ভাবছি আমি, উঠতে হয়। অমিতা আবার ঘড়ির দিকে তাকালো। কিন্তু যাবে কেমন করে? সমস্ত ঘরে যেন রাশি রাশি হাস্নাহানা ফুটে উঠেছে। এই হাস্নাহানা সে ভালোবাসতো বলে রজত তাকে কোন এক বিশেষ দোকান থেকে এই পুষ্পসার এনে দিয়েছিল। এর একবিন্দুতে লক্ষ হেনার মদির সুগন্ধ। সে যাবে কেমন করে? এই হেনা যে দার্জ্জিলিংএর বাগানে রাশি রাশি ফুটে থাকতো—তাদের প্রেমের মত।

অনুপম দেখা দিল বিজয়ী রাজার বেশে। বন্ধুর ভাই সে। সুগঠিত দেহ গ্রীক দেবতার মত সুন্দর—সে যৌবনের প্রতীক্। এসেছিলো সে রাজার মত। সহস্র হৃদয় জয় কোরে তার নিজের ক্ষমতার ওপর বেশী বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কেমন করে তার সেই গর্ব্ব অমিতার কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ভেবে অমিতার মুখে আবার হাসি ভেসে এলো।

রজত এসেছিল ভিখারীর আকুলতা নিয়ে। অমিতার কাকার আফিসের কর্ম্মচারী। বিদ্যা, রূপ থাকলেও এক রৌপ্যের অভাবে অমিতার পাণিপ্রার্থির দলে অচল। তাকে দেখতো অমিতার বাড়ীর লোকেরা একজন পেশাদার সঙ্গী, অমিতার হতাশ স্তাবকদের একজন রূপে।

কিন্তু অমিতা তো তাকে ভালোবেসেছিল। দার্জ্জিলিংএ প্রথম আলাপ হোল তাদের। তারপর প্রথম দর্শনের আকর্ষণ কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশৃঙ্গের নীচে, 'ডেজি' ফুলের পথের আশে পাশে, পাগলাঝোরার উজ্জ্বল ক্রন্দনে, মেঘমুক্ত দিনের অনাবিল রৌদ্রালোকে আর দার্জ্জিলিংএর সেই হঠাৎ ওঠা আশ্চর্য্য জ্যোৎস্নায় প্রেমে পরিণত হোল। কেন হোল? সহসা অমিতার চোখের সম্মুখ থেকে আবরণ সরে গেল। কারণ তখন রজতের চেয়ে ভালো কেউ তার পাশে ছিল না। অষ্টাদশী তরুণীর হাসির রং আর কারো মনকে রাঙিয়ে তোলেনি। দার্জ্জিলিংএর সেই হাস্যমুখর, আনন্দময় দিনগুলি কি ব্যর্থ করা যায়? নারীর চিরন্তন মনোবৃত্তি প্রশংসা পাবার, ভালবাসা পাবার অদম্য ইচ্ছা। নারীর চাই একজন যে তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে, তার গীতোচ্ছাস যার কানে মধু ঢেলে দেবে। তার হাসি তার বিভ্রম সবই তার মনে প্রেমাগ্নি উদ্দীপিত করবে। তাই অমিতার পরিণত নারী মন রজতকে নিয়ে প্রেমের খেলায় মেতেছিল, সে প্রেম নয়।

তারপর কলকাতায় সে শৈলনিবাসের মোহের ঘোর সহজে কেটে গেলো না। তখনও যে অদর্শনরূপ কষ্টি-পাথরে যাচাই করা হয়নি তাদের নবজাত ভালবাসাকে। অমিতার স্তাবক, পাণিপ্রার্থী দলের আনাগোনার ব্যাঘাত ঘটলো না এখানে, কিন্তু গোলাপের বনে যে অমিতার মন হরণ করলো সে তো পাশেই ছিল।

তারপর রজতের হোলো ইচ্ছা দেশভ্রমণের। ছয়মাস পরে যখন সে ফিরে এলো তখন তার প্রিয়ার প্রেমদেউলে নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। মান অভিমান হোলো রজতের পক্ষ থেকে, আর অমিতার পক্ষ থেকে ঔদাসিন্য।

যে মেয়ে এতো সহজে বিচার না করেই প্রেমে পরতে পারে প্রেম যে তার নিত্যসঙ্গী। সাহচর্য্যে সে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

রজতের উপহার এই এসেন্স অনুপমকে প্রীত করবার জন্য ব্যবহার না করার কারণ নেই। বিশেষতঃ যখন অনুপম এই গন্ধকে এতো ভালবাসে। মনে পরে সেদিন 'টেনিস লনে' তার আসনের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে অনুপম বলেছিলো, "তোমার পাশে দাঁড়ালে কোথাথেকে এত হেনার গন্ধ আসে? এই ফুলের গন্ধ আমার বড় ভালো লাগে অমি, মনে পড়ে সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা—'ফুলে ফুলে মধু গন্ধ জাগিল!

জাগিল কী এক ভাব!
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন
রসের আবির্ভাব!
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল।
পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুলদোল!

কিন্তু এই প্রেম যদি মরে যায়! রজতের মত অনুপমও যদি তার কাছে অচেনা হয়ে থাকে ভবিষ্যতে? না না অসম্ভব! এ প্রেম পরিণয়ে পর্য্যবসিত হবে জানে অমিতা। কিন্তু প্রেমের বিষয়ে কি নিশ্চিত কিছু বলা যায়? প্রেম খেয়ালী, তার আসা যাওয়া মানবমনের অগোচর।

কি ভাবছি বাজে কথা। ব্যস্ত হয়ে অমিতা উঠে দাঁড়ালো। ঘড়িতে ছয়টা বেজে গেছে। কি আশ্চর্য্য এতোক্ষণ সময় সে প্রেম বলে একটা অসার দ্রব্যের চিন্তায় কাটালো! অনুপম এতক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছে।

পাখাটা বন্ধ করে অমিতা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো। বোধহয় এসেন্সটা একটু বেশীই পড়ে গেছে, তার অঙ্গ ঘিরে অসংখ্য পুষ্প মুর্চ্ছিত হয়ে আছে যেনো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমিতার আর একবার মনে হোলো—প্রেম ফুলের মত সুন্দর কিন্তু ফুলেরই মত ক্ষণস্থায়ী।

কলের কলিকাতা

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

দেখে শুনে কলির সহর কলের কলিকাতা।
ঘুরে গেছে ভাইরে, আমার গোবর-ভরা মাথা।
(হেথা) মানুষগুলো কলের হাতে
প'ড়ে আছে দিনে রাতে,
আজব সহরখানা জুড়ে আজগুবী কল পাতা॥
(কলের) শক্তি দেখে' অবাক আমার পাড়াগেঁয়ে মন
(হেথা) কলের ভিতর জলের ধারা, টিপতে যতক্ষণ।
বিমল-ভাতি কলের বাতি,
ছড়ায় জ্যোতি তামাম রাতই,
কইব কি আর কলের পাখার শীতলতার কথা!
(হেথা) কলের আখায় আপনা আপনি রান্নাবান্না হয়
নাইক ধোঁয়ায় দম্ভ ধ'রে কান্নাকাটির ভয়।
হোক্‌না উঁচু কোঠাকুঠি
কল-বলে তায় ওঠাউঠি,
মোটামুটি নাই হেথা পা'র হাঁটাহাটির ব্যথা।
এমন বিরাট সহরখানা কলে কলময়।
পথের মাঝে পা বা'ড়াতে প্রাণ করে ভয় ভয়।
হওনা তুমি যতই চতুর,
প'ড়লে কলে হবেই ফতুর,
(হেথা) পথিকগণে পথ ভোলা'তে কতই না কল পাতা
(হেথা) কলের চোখে কানায় দেখে জেনে রেখো ভাই
ফেরের কথা যায়না বলা কা'র কখন তা চাই।
(হেথা) মূল হারিয়ে কলের কানে
কালা মানুষ দিব্যি শোনে,
(কা লে) কলের জীবন তৈরি হ'লেই দম্ভ দেবেন ধাতা
(হেথা) দমুহন্ত কলের কাছে পেয়ে গুরু লাজ
অভিমানে গেছে স'রে লোকের হাতের কাজ।
এই নগরীর জলে স্থলে,
কতই না কাজ হ'চ্ছে কলে,
অন্তরীক্ষে বেতার-যন্ত্র বলিহারি মাথা।
আসল কথা হয়নি বলা এমনি মনের ভুল।
ভরা ভাগীরথী-বুকে জলে-ভাসা পুল।
কাঠামো তা'র কলেই খাড়া
বইছে মাঝে গাঙের ধারা,
আঠ্‌-ঘাটে তা'র কলের নিশান কলে-কলেই গাঁথা।
(হেথা) জীবন-নিরোধ চ'লছে কলে, মরণ-নিরোধ বাকি
সেটাও বোধ হয় দেখব যদি আর কিছুদিন থাকি।
ভাবী চিত্রগুপ্ত গতি
ভেবে আমি আকুল অতি,
আসে যদি কলের হাতে কালের খ'তেন খাতা॥

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

শ্রীভগবানের যে কি ইচ্ছা বুঝা যায়না। আমি যে কখনো রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখিতে বসিব সে কল্পনাকে কোনদিন মনে স্থান দিই নাই।--কিন্তু ভগবদীয় ইচ্ছায় যা কল্পনা করা যায় না তাহাই সর্ব্বাগ্রে বাস্তবে পরিণত হইতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মহাশক্তি জীবকে লইয়া কোন ভাবে যে কোন খেলায় খেলিতেছেন তাহা বোঝা মানবের সাধ্যাতীত। আমিও মহৎবাক্য "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপা তমোহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং" অনুসরণ করতঃ সর্ব্বকার্য্যে শ্রীহরি মাধব ও মহাশক্তিকে স্মরণ করিয়া রাজনৈতিকক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রূপ পর্ব্বত আমি পঙ্গু লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইলাম।

ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে কিছু লিখিতে গেলে শ্রীরামচন্দ্র হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক সমস্ত রাজনৈতিক স্তরের চিত্র মানস পথে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার মধ্যে নিরাশাই যেনো প্রধান ভাবে সর্ব্ব সময়েই মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লিখিতে বসিলে বৈদান্তিক যুগ হইতে দেখা যায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইদিকে স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য ভারতে স্থাপনের জন্য ব্যগ্র। যথাঃ—আর্য্য ও অনার্য্য। এই দুই দ্বন্দ্ব দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দেখিতে পাই। বৈদিক যুগের কথা বিশেষ ভাবে প্রসঙ্গাধীন না আনিলেও কোন ক্ষতি হইবেনা—বলিয়াই বিবেচনা করি। আমার যতদূর মনে হয় শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণের জন্য তেমন উল্লেখকর কোন প্রচেষ্টাই ভারতে হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র ভারতে আবির্ভূত হইয়াই দেখিলেন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্যের ঈর্ষাগ্নিতে এক বিরাট দাবানলের সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। এতোদূর এই অনার্য্য বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে একপক্ষ অপর পক্ষকে 'বানর' বলিতে দ্বিধা করিতেছেনা। তাহার মধ্যে আর একদল যাহারা উৎপীড়ক ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহারা রাক্ষস আখ্যা পাইয়াছে ও তদনুযায়ী আচার ব্যবহারও যে তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তৎকালীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়।

একদিকে উৎপীড়িত অনার্য্যজাতি অন্যদিকে উৎপীড়ক রাক্ষস, তন্মধ্যে আর্য্যজাতি। এই ত্রয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠান্তর মহাভারতের সূচনা-করা যায় কি না সেই উদ্দেশ্যেই অদ্ভুত রামায়ণে আমরা সীতাদেবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে যে আভাস পাই তাহা হইতে আমরা সীতা দেবীকে আর্য্যপুত্রী বলিতে পারিনা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম রাক্ষস দুহিতা সীতার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে পিতৃসত্য পালনার্থ যখন সানুজ ও পত্নীসহ বনবাসে নির্গত হইলেন তখন বানর বা অনার্য্যগণের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইল। ইতিপূর্ব্বে গুহক চণ্ডালের সহিতও তাঁহার মিত্রতার আভাস পাওয়া যায়। বানরদিগকে আমার অনার্য্য কল্পনার এক প্রধানতম প্রমাণ এই যে রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রী জাম্বুবান ভল্লুক জাতীয় বলিয়া রামায়ণে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবান দুহিতা জাম্বুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যদি জাম্বুবানকে ভল্লুক বলিতে হয় তাহা হইলে জাম্ববতীকে পশুযোনী সম্ভূতা বলিতে হইবে। হিন্দুসমাজ কি তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে পশুযোনীতে উপগত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন! যদি না লয়েন তবে এই সমস্যা সমাধানের কি উপায়? এই সমস্যার একমাত্র সম্ভবপর ব্যাখ্যা ইহাই হইতে পারে যেমন মুসোলিনী আজ আমাদের উপর

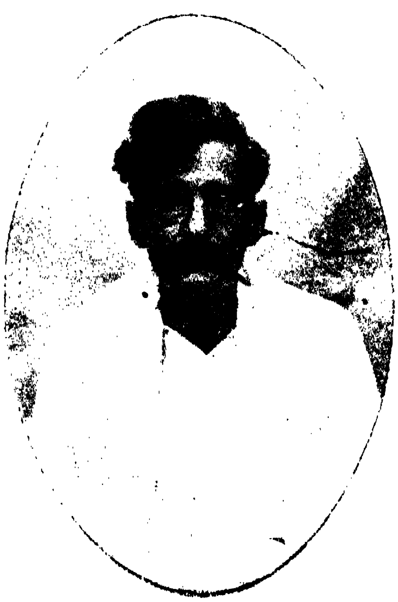
পুষ্পপাত্রের লেখকগণ



শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র



শ্রীজগদীশ গুপ্ত

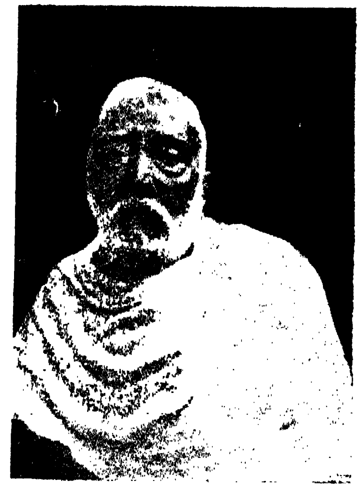


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুষ্পপাত্রের লেখকগণ



শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর



শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়



শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

দাঁড়াইয়া সমগ্র কাল। জাতিকে Nigger বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া সমগ্র কালাজাতি—ইউরোপে তথা প্রাচ্য জগতে দমন করতঃ তাহাদের স্বাধীনতা বিলোপার্থে আস্ফালন করিতেছেন, সম্ভবতঃ আর্য্যগণও এইরূপ মানসিকবৃত্তি লইয়া অনার্য্যদিগকে বানর ভল্লুক ইত্যাদি আখ্যা দিয়া তাহাদিগের দমনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা—যদিও সর্ব্বসময়ে আমরা সে সত্য উপলব্ধি করিবার মত দৃষ্টি সম্পন্ন নহি তথাপি শাস্ত্রে বলে 'আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীভগবান।' তাই বুঝি অনাথের কাতর আহ্বানে 'কালা আদমী' রূপে আর্য্যরাজকুলতিলক দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র ধরায় অবতীর্ণ হইলেন, অমনি উপাসকগণ তাঁহার ধ্যান রচনা করিলেন "কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভং" এবং কবিগণ গাহিয়া উঠিলেন "নবদুর্ব্বাদল শ্যামল।" তিনি আসিয়াই কৃষ্ণ ও শ্বেতসাগর মধ্যে এক সেতুরচনার প্রয়াস পাইলেন। তাই বুঝি গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নির্য্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গজাতি কতখানি অন্তরে ব্যথা পাইতেছে সেই ব্যথা উপলব্ধি করিতেই বুঝি গোলকবিহারী কৃষ্ণকায় লইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবার শ্রীকৃষ্ণ হইয়াই জগতে আবির্ভূত হইলেন। ব্যথাহারী ব্যথা বুঝিতে আর্য্যকুল শ্রেষ্ঠ হইয়াও অনার্য্য জাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র স্বভ্রাতা ভরত শত্রুঘ্নের সাহায্য উপেক্ষা করিয়াও অনার্য্য বানর ও ভল্লুক সহায়েই স্বীয় অবতারত্বের অভিযান ত্রেতায় পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সীতা উদ্ধার প্রভৃতি আখ্যার উল্লেখ না করিলেও এ প্রসঙ্গের কোন অঙ্গহানি হইবে না বলিয়া আমি মনে করি। আমার উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র জীবনীর সমালোচনা করা নহে, আমি চাই শ্রীরামচন্দ্রের যুগের সহিত অধুনা ভারতের যুগের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কি সম্বন্ধ আমার অভিজ্ঞতা মূলে বুঝিতে পারিয়াছি তাহারই তাৎপর্য্য গ্রহণ করা।

শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পুনরায় স্বীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। যদিও ভগবান রামচন্দ্রের যুগের ইতিহাস পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি বাস্তবিকই কামিনী কাঞ্চনে অনাসক্ত ছিলেন। এমন কি তিনি স্বপক্ষে জনমত গঠনের নিমিত্ত স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীকেও গর্ভাবস্থায় বনবাসে দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত জনমত গঠিত হইল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই প্রবল হইল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রক চণ্ডালের মিত্র রাজা শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা শূদ্রক ঋষির মুণ্ডচ্ছেদ পর্য্যন্ত করাইয়া লইলেন। অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ সাধনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রচেষ্টার প্রমাণ স্বরূপ শবরী উপাখ্যানের উল্লেখ এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু শূদ্রকের মুণ্ডচ্ছেদে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণাশ্রমের সংমিশ্রণের বা আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল ইহা বোধহয় কেহও অস্বীকার করিবেন না। ফলে সীতার ন্যায় পত্নী, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা ত্যাগী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও হৃদয়ে ভীষণ নৈরাশ্যের বেদনা লইয়া সরযুতে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। তাই বলিতেছিলাম ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে নৈরাশ্য যেনো সর্ব্বসময়ে প্রধানভাবে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর ভারতে আর্য্য অনার্য্যের দ্বন্দ্ব যে কি পরিমাণ উগ্রভাব ধারণ করিয়াছিল তাহার বিশদ আভাস আমরা পদ্ম পুরাণে শ্রীমনসাদেবী ও চন্দ্রধরের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া কতক পরিমাণে পাই। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে ত্রেতার ন্যায় দ্বাপরেও শ্রীশ্রীভগবানকে পঞ্চ অংশে ভারতের বক্ষে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। যথাঃ—ব্যাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তদাগ্রজ সংকর্ষণ দেব বা বলরাম, অন্যতম অর্জ্জুন ও কর্ণ। অবশ্য যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান তাঁহাদের জন্যই এই কথাটুকু বলিলাম। অন্যের পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মানব, অতি মানব বা মহা মানব বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য এই পঞ্চ অংশে শ্রীভগবান বিভক্ত হইয়া পঞ্চ প্রকারের (ঐশী) কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রবেত্তারা ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষিকে "ব্যাসো নারায়ণো সাক্ষাৎ" বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লইলেন বেদান্তের গূঢ়তথ্যের ভাষ্য আবিষ্কারের কার্য্যভার ও পরে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিসৃত ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণ সঙ্কলন ভার। অবশ্য ইহার দ্বারা আমি একথা বলিতেছিনা যে

আজই আমরা যে সব হিন্দু পুরাতন শাস্ত্র গ্রন্থাদি দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা মূল গ্রন্থ হইতে সাম্প্রদায়িক প্রক্ষিপ্ততার চাপে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই। তথাগত শব্দ শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর হইতে ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু রামায়ণে বুদ্ধদেবকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে তথাগত শব্দ প্রক্ষিপ্ততার চাপে স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণাবতারে ও এ প্রক্ষিপ্ততার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী উদাহরণ দিতেছি। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়া গেলেন

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বসঃ"

এদিকে সাম্প্রদায়িক বিবাদে ইন্দ্র পূজা দূরীকরণার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদের এক আখ্যায়িকার সূচনা করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পর্য্যন্ত ধারণ কল্পনা করিয়া ফেলিলেন। পদ্ম পুরাণে আমরা দেখিতে পাই মনসাদেবীর আহ্বানে কালীদহ সাগরে চন্দ্রধরের তরী ডুবাইবার জন্য ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টির সূচনা করিলেন এবং ইন্দ্রের সেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টিতেই কালীদয় সাগরে চন্দ্রধরের ডিঙ্গী ডুবিয়া গেল। কিন্তু কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে যখন বিবাদ হইল এমন বৃষ্টি সপ্ত দিবারাত্রি হইল যে গোকুলে কেহ গৃহে আপনার প্রাণ ও ধন সম্পত্তি লইয়া থাকা নিরাপদ বিবেচনা করিল না তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলবাসীর ধন সম্পত্তি ও প্রাণ নিরাপদ কল্পে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাপন করতঃ গোকুল রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু এই যে ইন্দ্রকোপানলে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইল তাহাতে কোথাও জলপ্লাবন হইল না, এমন কি ব্রজধামের অনতিদূরবর্ত্তী মথুরাধীপ উগ্রসেন পুত্র কংশ শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশী শক্তির কোন সংবাদই পাইলেন না, এবং যজ্ঞকালে কৃষ্ণ বলরামের নিধনকল্পে চাণুর মুষ্টিক মল্লদ্বয় ও সাধারণ হস্তী ঐ কার্য্যের জন্য সমুচিত শক্তিমান বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অথচ ইহাও কথিত আছে যে কৃষ্ণবলরামের গোকুল অধিষ্ঠানের সংবাদ প্রাপ্তির পর হইতে কৃষ্ণবলরামের মথুরা আগমন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কংশানুচরগণ গোকুলে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের সংবাদাদি আনয়ন করিত। অবস্থাধীন গোবর্দ্ধন ধারণের পরিকল্পনাকে বাস্তব পরিকল্পনা করা যায় কি না তাহা বিবেচনাধীন। অবশ্য এই টুকুর সহিত আমার আলোচ্য বিষয়ের কোন বিশেষ সংশ্রব নাই তবে অধুনা সে সমস্ত পুস্তক আমরা সাধারণতঃ দেখিতে বা পড়িতে পাই তদসমস্ত পাঠে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে—কিন্তু প্রক্ষিপ্ততা যে হিন্দুশাস্ত্রকে আজ পৃথিবীর সর্ব্বজনের সমালোচনার আধার করিয়া তুলিয়াছে তাহা আজ স্বয়ং বেদব্যাসও নির্ণয় করিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে আমি ঘোরতর সন্দীহান। এবং আশাকরি নির্দ্দয় সমালোচকগণ পরাধীন হিন্দুধর্ম্মের উপর অতখানি কঠোরভাবে আদ্যন্ত অনুসরণ না করিয়া সমালোচনায় নিবৃত্ত হইলে যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

যাহা হউক এখন আমার আলোচ্য বিষয়েই আবার আসিতেছি। একদিকে তখন আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষাগ্নি ধূ—ধূ—করিয়া ভারতের বক্ষে জ্বলিতেছিল, অন্যদিকে নারীজাতির উপর যে কি অকথ্য অত্যাচার চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু কর্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডবের আবির্ভাবের ইতিহাস পাঠে যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে। নারীজাতি গো মহিষের ন্যায় যে কোন দরে বিক্রীত হইতেছিল। একাধিক পুরুষ এক নারীতে উপগত হওয়া সমাজ ও ধর্ম্মানুমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। কানীনপুত্র ও ক্ষেত্রজপুত্র তাহাও সমাজ ও ধর্ম্মানুমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল, এতোখানি অধঃপতন যখন সমাজ ধর্ম্মের ও ভারতের ঘটিয়াছিল সেই সর্ব্বনাশের সন্ধিক্ষণে ভগবান চারি অংশে আবির্ভূত হইলেন।—

এক অংশ ক্ষত্রিয় মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাধেয় আখ্যা লইয়া সূতপুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের অবতার কর্ণ—।—তিনি পতিত জাতির ভরসার জন্য ভারতের বক্ষে অভয়বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সুতো বা সুতোপুত্রো বা যো বা

সো বা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মমায়ত্তহি পৌরুষম। তিনি আভিজাত্য গর্ব্বী ভারত ইতর জাতির উপর কতখানি অত্যাচার করিতেছিল তাহা বুঝিবার জন্য ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দুই জন নর নারায়ণ ঋষির দেহরথে আবির্ভূত হইলেন। সঙ্কর্ষণের আকর্ষণে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এ কথা হিন্দু মাত্রেরই জানা আছে, এবং সংকর্ষনের জন্ম-রহস্যও হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। কাজেই এ বিষয়ে উল্লেখ নিষ্প্রোয়জন। নর-নারায়ণ ভারতের বুকে আবির্ভূত হইয়া দেখিলেন অসংখ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভারতবর্ষ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও প্রভুত্ব মানিতে চায় না, একে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্ধ হইয়া লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কখন কে কাহাকে গ্রাস করিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। হিংসা, স্বার্থ ও নারীর সৌন্দর্য্য তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবর্গকে মানবত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বের দিকে সমধিক আকর্ষণ করিতেছিল। আমি কৃষ্ণাবতার আবির্ভাব আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই বলিয়াছি নারী পণ্য রূপে তদানীন্তন ভারতে ব্যবহৃত হইতেছিল। এমন কি যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপ্রাণ রাজাও অক্ষক্রীড়ায় নিজ পত্নীকে পণ স্বরূপ ধরিয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেই পত্নী তখন ঋতুস্নাতা। রাজা যুধিষ্ঠিরের অবিমৃষ্যকারীতার ফলে ভারতের বক্ষে সে কি ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। যখন ভারতের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম জীবনে এরূপ ঘোরতর বিপ্লবের কাল উপস্থিত হইয়াছিল সেই বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে ভগবান চক্রপাণি বাসুদেব ভারতের বক্ষে সেই অভয়-বাণী প্রচার করিলেন—

> "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
> অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সেই বাণী শুনিয়া উৎপীড়ক ভারতের শাসকবর্গ একবার চমকিত হইয়া উঠিলেন। আত্মস্বার্থান্বেষী বর্ণাশ্রম অভিমানী ভারত শ্রীভগবান মুখনিসৃত বাণী "চতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টা গুণকর্ম্মঃ বিভাগশঃ" শুনিয়া ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। অযথা অশাস্ত্রীয় শাস্ত্র ব্যাখ্যায় যাহারা ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া পরিচালিত করিতেছিল তাহারা শ্রীভগবানের মুখে

> "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"

এই বাণী শুনিয়া প্রমাদ গণিল। এক কথায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারত পূর্ণ মানব অথবা পূর্ণ অবতারের আবির্ভাবের সহিত চমকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে যেনো এক মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। সেই মহা আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ গাহিয়া উঠিলেন

> "হরে মুরারে মধুকৈটভারে
> গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে"

উৎপীড়ক শাসকবর্গ কেমন করিয়া এ মহামানবের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন তাহার ষড়যন্ত্র আঁটিতে লাগিলেন। স্বার্থান্বেষীগণ "গোপ" "গোপাল্ল পরিপুষ্ট" ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগে নিজের গাত্রজ্বালা উপশমের ব্যর্থ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতের পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতে ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন যজ্ঞেই যে ইন্ধন প্রয়োজন তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যদিও আমার এই আখ্যায়িকার সহিত এ ঘটনার খুব নিকট সম্পর্ক নাই তথাপি আমি উল্লেখের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না— কি বিচিত্র! নরনারায়ণ বা আদিত্য-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ যিনি রাধেয় নামে বিখ্যাত এ ত্রয়ই জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে পারিলেন না। শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীর গভীর অন্ধকারে ভারতের মহানিশায় পূর্ণচন্দ্ররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের দৃষ্টির অলক্ষ্যে কারাগারে ব্যথিতের বেদন বুঝিতে বুঝি আবির্ভূত হইলেন। আসিবেন না! যিনি জগতে কোটি কোটি প্রাণীর করুণ আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হাহাকার পূর্ণ ধরার দুঃখভার হরণ করিতে আসিয়াছেন, যিনি ভবকারারুদ্ধ জীবের মুক্তিপথ আলোকিত করিতে আসিয়াছেন তিনি কারাক্লেশ প্রাণে প্রাণে

অনুভব না করিলে ভবকারাগারের বন্ধন যন্ত্রণা যেমন করিয়া বুঝিবেন! তাই বুঝি জীবনের প্রথম রাত্রিতে শ্রীভগবান কারাকক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভূভার হরণ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন যাহার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে মায়া-মোহে বদ্ধ হইলে চলিবে কেন? তাই বুঝি মায়াজাল ছেদন করিতে স্বীয় গর্ভধারিণীর প্রকোষ্ঠ হইতে পালিত জননীর প্রকোষ্ঠে লালিত পালিত হইতে জীবনের প্রথম রাত্রিতেই চলিয়া গেলেন।

প্রভু! শশিকলার ন্যায় দিন দিন তুমি তোমার লালিতা মাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হও। আমি কুন্তী গর্ভ সম্ভূত আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের অনুসরণ করি।

ভোজ রাজকন্যা কুমারী কুন্তী সূর্য্যপুত্র বসুসেনের আবির্ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সদ্যজাত শিশুকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া নারায়ণ নামের সার্থকতা রক্ষা করিলেন। তিনি সূতপত্নী রাধার স্নেহের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মাতা কর্ত্তৃক নারায়ণের পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যজাত শিশুর সর্ব্ব আভিজাত্য গর্ব্ব ও নদী গর্ভে সমাহিত হইল। জগতের অলক্ষ্যে জগত পাবন জগতে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় জগতের অলক্ষ্যেই সর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া এক নূতন পরিচয়ে—রাধেয় কর্ণ নামে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।

সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী নারায়ণের অনুসরণে কিয়ৎ ক্ষণের জন্য এখন ক্ষান্ত হইয়া নরদেহধারী নারায়ণের অনুসরণ করি।

সেখানে কুন্তীদেবীর গর্ভে জগতের কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভূমিষ্ঠ হইয়া চিরকুমার পিতামহের বক্ষেই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। ভারতের ভাবী ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন কার্য্যে এই দ্বিধা বিভক্ত নারায়ণ মূর্ত্তিকেই যে মায়ার পাশ ছেদন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে তাই বুঝি জীবনের প্রথম প্রভাতেই ইহারা মহা-মায়ার মায়াপাশ ছেদন করিলেন। এই মায়াপাশ ছেদন হইতেই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক লীলার পর্ব্ব আরম্ভ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনে মায়ার সহিত সংশ্রব ত্যাগ এক প্রধানতম অংশ। নন্দ যশোদাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া ব্রজধাম ত্যাগ হইতে যদুবংশ ধ্বংস পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লীলাই মায়ার সহিত সংশ্রব হীনতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বুঝি গীতায় তিনি বলিয়া গিয়াছেন 'অসক্তোহ্যাচরণ কর্ম্ম-পরমাপ্নোতি পুরুষ।' অর্জ্জুনকেও তিনি সেই মায়ার সংশ্রব ত্যাগের মন্ত্রই দীক্ষা দিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য বধ, পালক পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি মায়াত্যাগেরই বিশদ প্রমাণ। কর্ণের জীবনেও সে প্রমাণের কোন অসদ্ভাব দেখিতে পাইনা। যথা কর্ণ কর্ত্তৃক বৃষকেতুর দেহচ্ছেদন, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও স্বীয় দেহ হইতে কবচকুণ্ডল ছেদন প্রভৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির বিশেষতঃ এই যে তিনি কখনো নিজে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বা তাহার সহকর্ম্মীগণকে—ফলভাগী হইবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া গিয়াছেন 'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—।'

অধুনা ভারতীয় রাজনীতিতে অর্থ লুণ্ঠন ব্যাপার যেমন এক ভীষণ করালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বকার্য্যই নিয়-ন্ত্রিত করে সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিতে স্বার্থের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই বিরাট স্বার্থের জন্য আত্মস্বার্থের বিসর্জ্জন দিতে নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন ও সহকর্ম্মীদিগকে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে উৎসাহিত করিয়াছেন। এমন কি সখা অর্জ্জুনের প্রিয়তম পুত্র অভিমন্যু বধের দিন অর্জ্জুনকে তিনি বহুদূরে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। একবারও অভিমন্যুর সাহায্যার্থে আসিবার অবসর দেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া গিয়াছেন আত্ম স্বার্থে-প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন কখনো কাহারো দ্বারা সম্ভবপর হইবেনা।

এই প্রসঙ্গে ভারতের ইদানীন্তন রাজনৈতিক দেশ প্রাণ, দেশভক্ত মহাত্মাদিগের নিরন্ন-ভারতের কোটি কোটি অর্থলুণ্ঠন নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক দেশ হিতৈষণার অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। এই কোটি কোটি অর্থের একটা হিসাব পর্য্যন্ত দেওয়া এই মহাত্মগণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। কাজেই বড় আক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা হয় "হায়রে সেদিন!"

এক্স রে রহস্য

গল্প

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

ডাক্তার মুখার্জ্জীর মোটরে ষ্টার্ট দিয়াছে এমন সময় তার ছোট মেয়ে মিনি দৌড়ে এসে বললে, একটু দাঁড়াও বাবা, সর্ট ষ্ট্রীট থেকে রমোলা রায় তোমায় টেলিফোনে ডাকছে।

তুই শোন না, কি বলে।

আমায় কিছু বললে না। তোমায় একটিবার ডেকে দিতে বললে।

ডাক্তার মুখার্জ্জি মোটর বন্ধ করতে বলে নামলেন, ও মেয়ের হাত ধরে তার পড়িবার ঘরে ফিরলেন।

টেলিফোনটি তুলে বললেন, কে রমোলা নাকি? হ্যাঁ।

ব্যাপার কি বলত? সোফার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েছিল—আর এক সেকেণ্ড হলেই পেতে না; মিনি দৌড়ে এসে ডাকলে তাই না এলুম। ভাল ত সব?

আপাততঃ ভালই, কোন দিকে বেরুচ্ছেন? আমাএ পাড়ায় আসছেন কি?

কাজ প্রায় সব দিকেই আছে। ঠিক তোমাদের কাছাকাছি কিছু দেখছি না; তবে ভবানীপুরের ওদিকে একবার যেতে হবে।

ফেরবার সময় একবার আমাদের এখানে আসবেন যেন।

কেন ব্যাপার কি?

ব্যাপার ট্যাপার কিছুই নয়। এই মা বললেন আমাদের এদিক দিয়ে হয়ে যেতে।

মিসেস রায় ভাল আছেন ত?

এলেই তা দেখতে পাবেন, ভুলবেন না যেন, নিশ্চয় আসবেন কিন্তু।

আচ্ছা চেষ্টা করব।

চেষ্টা করলে চলবে না, আসতেই হবে। মা বিশেষ করে বলেছেন।

আচ্ছা তাই হবে, চল্লাম তাহলে।

মিঃ মুখার্জ্জি সব দিক ঘুরে ফিরে সর্ট ষ্ট্রীটে যখন মিঃ রায়ের বাড়ী এসে পৌঁছলেন তখন বেলা ১১॥ টা। ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই রমোলার সঙ্গে দেখা।

রমোলা বললে, আসুন ডাক্তার বাবু, বাবা এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

তিনি থাকবেন ঘরে বসে, তাহলেই হয়েছে! হাইকোর্টের পয়সাগুলি তবে কে লুটবে?

এইখানে বলে রাখা ভাল যে মিঃ রায় অর্থাৎ মিঃ এন্, কে, রায় তথা মিঃ নিশীথ কুমার রায় হাইকোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। মাসে অন্ততঃ ৭।৮ হাজার টাকা রোজগার করেন। লোকের মধ্যে নিজে, মিসেস্ রায় ও একমাত্র কন্যা মিস্ রমোলা। রমোলার বয়স মাত্র সতের। দিব্যি টুকটুকে মেয়েটি, সব কাজে চটপটে, বাকপটুও বটে। বেশ গাইতে পারে, বাজাতেও জানে। ছবি আঁকার হাত খুব ভাল, মোটের উপর 'একমপ্লিসড গেরল।'

মিসেস রায় কলিকাতা সমাজে সবিশেষ পরিচিতা। মিঃ ধীরেন সেন সিভিলিয়ানের কন্যা। যখন সেফালি সেন তথা সেলী সেন ছিলেন তখনই ফ্যাসনেবল সমাজের মুকুটমণি। তাহার রূপ ছিল প্রথম শ্রেণীর, গুণ ছিল যথেষ্ট। সকলের সঙ্গে মিশিতে, সকলকে আপ্যায়িত করিতে তাহার অপরিসীম ক্ষমতা। যা অন্যের সহস্র কথায় বা বহু সাধ্য সাধনায়ও হইত না তাহার সেই সুন্দর চোখের একটি মাত্র দৃষ্টিতে বা মিষ্টি একটি মাত্র কথায় হইত। তখনকার সেলী সেন আজ সেফালি রায় হইলেও তাহার কোন গুণে ভাটা পড়ে নাই বরং উত্তরোত্তর অধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। এক এক জন নারী তাদের যৌবন বাঁধিয়া রাখিতে জানে; মিসেস্ রায়ও তাহাদেরই একজন। সতের বছর আগে রমোলা

জন্মিলেও তাহাকে দেখিয়া মনে হইত যেন সাগর মন্থন হইতে সদ্যোত্থিতা উর্বশীর মতই নবযৌবনসম্পন্না।

ডাক্তার মুখার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন—মিসেস্ রায় কোথায়? বাড়ীতে আছেন ত?

এইমাত্র উপরে গেলেন। পিসীমারা, মাসীমারা কেউ কেউ এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে একটু ক্লান্তি বোধ করছিলেন; উপরে বিশ্রাম করছেন।

আমার কথা তাহলে অবসর মত বলো, এখন আর বিরক্তি করে কাজ নেই, আমি আসি।

তাও কি হয়, আপনি উপরে চলুন; আমিই সঙ্গে যাচ্ছি।

পুরু কার্পেট ঢাকা সিঁড়ি বাহিয়া উভয়ে উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির পার্শ্বস্থিত দেয়ালে নানাবিধ হাস্যো-দ্দীপক বিলিয়ার্ড খেলার ছবি টাঙ্গান ছিল। ডাক্তার মুখার্জ্জি একবার চকিতে উহা দেখিয়া লইলেন। মায়ের শোবার ঘরের সামনে যাইয়া রমোলা বলিল,

ডাঃ মুখার্জ্জি সাহেব এসেছেন মা, এই আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে।

সে কি কথা! বেশ মেয়ে ত তুই; নিয়ে আয়না এখানে? আসুন ডাঃ মুখার্জ্জি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

এই যে, নমস্কার মিসেস্ রায়। তা কেমন আছেন? একটু সাজ গোজ দেখছি। বেরুতে হবে নাকি কোথাও?

নমস্কার, কোথাও বেরুতে হবে না। সেজন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই, ভাল হয়ে বসুন না, ইজি চেয়ার খানা এগিয়ে দেত রমোলা।

তোমায় এগিয়ে দিতে হবে না, এই আমি বসছি। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মুখার্জ্জী নিজেই ইজিচেয়ার খানা বিছানার দিকে টানিয়া নিলেন। মিসেস রায় বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। তখন মিঃ মুখার্জ্জী ও মিসেস রায়ের মধ্যে নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিল। অল্পকাল মধ্যেই রমোলা একখানি প্লেটে বহুবিধ খাবার সাজাইয়া আনিল। একজন বয় ছোট একখানি জাপানী টেবিল আনিয়া ডাঃ মুখার্জ্জীর সম্মুখে রাখিল। টেবিলখানির উপরে ফুলকাটা সাদা ধবধবে টেবিলক্লথ।

ডাক্তার মুখার্জ্জী বলিলেন,—

বলত রমোলা, ব্যাপার খানি কি! আজ খাবারের ভারী ঘটা যে।

ব্যাপার কিছুই না—ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন একটু মিষ্টিমুখ করুন।

উঁহু, পিসীমারা, মাসীমারা এসেছিলেন, একটা গোপন আনন্দোৎসবের সন্দেহ হচ্ছে। সকাল বেলায় আমায় আসতে ফোন করেছিলে না? একবার গবেষণা করে দেখতে হবে। ওহরি। এইবার হয়েছে, তোর মার সাধ দেওয়া হ'ল বুঝি! খুব এসে পড়া গিয়েছে। আসলে কিছু হোক আর না হোক এক পেট খেয়ে নেওয়া যাকৃত। এরপর ফেরৎ দাবী করিস না যেন।

কি যে আবোল তাবোল বকছেন। ভালমানুষটির মত খেয়ে নিন্ ত? তারপর কথা কওয়া যাবে।

আচ্ছা আজ আর রসভঙ্গ কচ্ছিনে, সে আর একদিন দেখা যাবে। সামনের জিনিস, কেই বা ছাড়ে! কথাই আছে, লব্ধং নৈব পরিত্যজেত—। মিসেস রায় যে একটী কথাও কইছেন না।

ভারি সুবিধে পেয়েছেন বুঝি। কথাটি বন্ধ করে খান দেখি! আপনাকে খাওয়ান ত এক মহাব্যাপার! কবেই বা খান, বলুন ত?

আজ সবদিনের শোধ নেব। কিছু রেখে যাব তা মনেও ভাববেন না।

ডাক্তার মুখার্জ্জী কথানুযায়ী কাজ করিলেন। মিসেস রায় ও রমোলা অত্যন্ত খুসী হইলেন ও ডাক্তারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

ডাক্তার মুখার্জ্জী একটু চোরা হাসি হাসিলেন। নিশ্চিত জানেন যে মিসেস রায়ের মনের আশা বলিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তাহার নিষেধ সত্ত্বেও কেন যে এই অভিনয়টি হইল তাহার উপযুক্ত কোন হেতুই ভাবিয়া পাইলেন না। পরে রমোলাকে বলিলেন,—

আজ তাহলে উঠি। বেলাও অনেক হয়ে গেছে, আর থাকলে, খরচা বেড়ে যাবে।

তাই নাকি; থাকুন না,—কিছু অতিরিক্ত খরচাই হয়ে যাক্।

না এমন অন্যায় কাজ আমি কিছুতেই করতে পারব না।

মিসেস রায় বলিলেন,—

বলব নাকি আসল কথা—,ওর খেয়ে যাবার সাহস আছে নাকি? মিসেস মুখার্জ্জী লাঠি হাতে বসে আছেন। দেরী হলে আর রক্ষে থাকবে না। কি বলেন ডাঃ মুখার্জ্জী?

ক্ষেপেছেন নাকি! ডাক্তারের আবার সময়ের ঠিক থাকে? যাই বলুন আজকের মত উঠি। শীগগিরই আসব একদিন, তখন কথাবার্ত্তা হবে।

না যেয়ে যখন উপায় নেই, আসুন তাহলে, নমস্কার।

নমস্কার।

ইহার ৫।৭ দিন পরে ডাঃ মুখার্জ্জী পুনরায় মিঃ রায়ের বাটী আসিলেন। ভাগ্যক্রমে মিঃ রায় সেদিন বাড়ীই ছিলেন। ডাঃ মুখার্জ্জী বলিলেন,—

নমস্কার মিঃ রায়, আজ তবুও দেখা পাওয়া গেল ভাল আছেন নিশ্চয়ই।

তা কেটে যাচ্ছে এক রকম, আজ যে বড়ই সকালে দেখছি।

আপনার দেখা পাব বলেই এত সকাল সকাল এসেছি। সেদিন ত দেখা হলো না; আচ্ছা ব্যাপার খানা কি খুলে বলুন ত? আপনাদের এত করে বলে গেলাম কখনই সন্তান সম্ভাবনা নয়, এ হচ্ছে ফ্যাণ্টম্ টিউমার,—মিথ্যা গর্ভ,—তা সত্বেও এ সব করার কিছু তাৎপর্য্য বুঝলুম না—সাথে সাথে আপনিও ক্ষেপলেন নাকি।

দেখুন, আপনারও ত ভুল হতে পারে। পেটটি কি রকম বড় হয়েছে উনি নিজে পেটে নড়াচড়া বুঝছেন, অরুচি হয়েছে, ভোরে বমী হয়। পেটে ত একবার ধরেছেন অনেক লক্ষণই মিলিয়ে পাচ্ছেন—কাজেই—

স্বীকার কচ্ছি সবই ঠিক। কিন্তু ঐ ফ্যাণ্টম টিউমারেরও যে ঐ সবই লক্ষণ। আমি নিশ্চিত জানি আমার ভুল হয় নি। তাইত বড়ই আশ্চর্য্য।

শুধু ওর কথায়ই বিশ্বাস করি নি। জানেন ত সুহৃৎ বোস ডাক্তারকে—নিয়ে গেলুম তার ওখানে। একস রে পরীক্ষা করে তিনি বললেন সন্তান নিশ্চয়ই আছে—কোন সন্দেহই নাই। তাই না এতসব কাণ্ডকারখানা।

আমায় অবাক করলেন। আছে না প্লেটখানা, একবার দেখি।

প্লেটখানা আনা হয় নি, তার ওখানেই আছে।

ভাল ব্যাপার পাকিয়েছেন। চলুন একবার উপরেই যাই। মিসেস রায়কে আর একবার দেখি। এতটা ভুল করব মনে ত হয় না।

আপনি যান না। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

না, তা হচ্ছে না মিঃ রায়। ব্যাপার যেরূপ গুরুতর করে তুলেছেন—আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।

তবে চলুন।

ডাক্তার মুখার্জ্জী মিসেস রায়কে নমস্কার করিতেই তিনি প্রতিনমস্কার জানাইয়া স্বামীকে বলিলেন—

মুখার্জ্জী সাহেবকে কোত্থেকে এই সকালে ধরে আনলে।

ধরে আর আনতে হয় নাই, দয়া করে আপনিই এসেছেন।

বল কী—সাধ্যি সাধনা করে যাকে পাওয়া যায় না তিনি এলেন নিজেই।

এমনি কি আর এসেছেন—একটা মতলব নিয়েই এসেছেন।

তাই নাকি?

এই তোমায় আর একবার দেখবেন বলে। একস্ রে পরীক্ষা ওর বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস হয় নেই।

রোজ রোজ কি দেখাব?

ডাঃ মুখার্জ্জী—তাও কি হয়। আমাকে আস্ত বোকা বানিয়ে রাখলে ত চলবে না। ভুলটা না বুঝতে পারা পর্য্যন্ত মোটেই সোয়াস্তি পাচ্ছি না।

সত্যি নাকি? ঘর থেকে বেরুলে রোগীর কথা আবার মনে থাকে নাকি?

আপনিও তাই বলছেন? বড্ডই ভুল ধারণা আপনাদের। ডাক্তারদের কি মানুষের পর্য্যায়েই ফেলেন না। মানুষের মতই যে তাদের সুখ দুঃখ আছে, পরের দুঃখে সহানুভূতি আছে, কারু রোগ হলে কেবল যে

নিজের স্বার্থই খোঁজে, তা নয়; রোগীর জন্য যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়, ব্যাধি উপশমের জন্য দিন রাত ভাবনা থাকে এমন কি নিদ্রার পর্য্যন্ত ব্যাঘাত হয়—।

থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। এমন ডাক্তারের কথা শুনলে আমাদের চিত্ত স্থির থাকবে না, ভয়ানক উতলা হয়ে উঠবে।

এখন কথা রাখুন না, অনুগ্রহ করে শুয়ে পড়ুন, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি।

না, আপনার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলুম, আপনার সঙ্গে ত পারবারও যো নেই, কি নাছোড়বান্দা। তুমি ত বেশ দাঁড়িয়ে আছ—ওকে বলনা কিছু?

বলে আর কি হবে! তার চেয়ে কাজটা শেষ করে নাও, এদিকে আমার বেরুবার সময় হয়ে এল।

তখন একখানি গাত্রাবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মিসেস রায় শয়ন করিলেন। ডাঃ মুখার্জ্জী প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিলেন। পরে মিঃ রায়কে বলিলেন,—

দেখুন, বড়ই দুঃখিত হলুম যে পূর্ব্বের মত পরিবর্ত্তন করার কোন সুবিধেই হল না। এক্স্‌রেই দেখিয়ে থাকুন আর যাই করে থাকুন, তাদের মতে সায় দিতে পারছি না।

তাইত

যখন একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছেন, তখন দ্বিতীয় আর একজনের পরামর্শ নেওয়া সমীচিন মনে করি। এই গ্রীণ সাহেব আছেন, একবার দেখালে দোষ কী?

আমি আর কাউকে দেখাতে পারব না। এ যেন সঙ সেজেছি, কেবল দেখিয়ে বেড়াতে হবে।

ডাক্তার মুখার্জ্জি যখন এত করে বলছেন, তখন দেখাওই না?

বেশ মানুষ ত তুমি! আর দেখিয়ে কি হবে? ওই জজীর কথা ত জান; সবাই বলে গেলেন পেটে কোন সন্তান নেই, কিন্তু কিছুদিন বাদেই দিব্যি একটি ফুটফুটে ছেলে হল। ওদিক পাড়ার শোভাকে নিয়ে কি না কাণ্ড! ওই সাহেবও ত বলেছিলেন গর্ভ হয় নি, তার পর সেই কালো মেয়েটা হল।—কত আর বলব! ডাক্তারদের সব কথা মানতে গেলে চলে না। আমি ত ছেলে মানুষটি নই যে কিছুই বুঝি নে। আমি নিজে যখন সব লক্ষণ মিলিয়ে পাচ্ছি তখন খামোখা হাঙ্গামা করব কেন?

বেশ কথা, যা ইচ্ছে তাই করুন। আমার যা ভাল মনে হয়েছিল তা বললুম, শোনা না শোনা আপনাদের এক্তার। আচ্ছা নমস্কার, আসি তাহলে।

ডাঃ মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন।

মাস চারেক বাদে একদিন খুব ভোরে ডাক্তার মুখার্জ্জির টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ডাঃ মুখার্জ্জি রিসিভার কাণে দিয়াই রমোলার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। বলিলেন,—

কি খবর রমোলা এতদিন পরে হঠাৎ সারা দিলে যে একটি ভাই হয়েছে নাকি! খাবারের লোভ দেখাও ত চলে আসি।

ভাই হলে কি সে সময়ে আপনার খবর হ'ত না। এদিকে ত এক বছরের উপর হয়ে গেল, মার কিন্তু এখনও বিশ্বাস সন্তানই পেটে আছে। বাবার বিশ্বাস আর রাখতে পারছেন না।

আর একবার এক্স্‌রে করতে বলো না।

সে কথা বলবেন আপনি এসে। সকালের দিকেই একবার অবিশ্যি আসবেন। সেই যে গেলেন আর এতদিনের মধ্যে একবারও এলেন না।

আমি যেয়ে আর কি করব। বরং আর কাউকে ডেকে দেখাতে বল।

আপনি দেখি বড্ডই রেগে আছেন। সত্যিই কি ভেবেছেন যে আপনার উপর মার বিশ্বাস নেই।

তা মনে করা কি খুব অন্যায় হবে।

ভয়ানক ভুল করেছেন আপনি। আসুন ত আগে, তারপর বোঝাপড়া হবে। কখন আসছেন?

আচ্ছা ৮টা, ৮॥ টার মধ্যেই যাচ্ছি।

মিঃ রায় যদিও তাহার বসিবার ঘরে মক্কেল ও কাগজাদি লইয়া বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, ডাক্তার মুখার্জ্জির আগমনের খবর পাইয়াই ত্বরিতে উঠিয়া আসিলেন ও বলিলেন—

নমস্কার ডাঃ মুখার্জ্জি, আর ত দেখাই নাই, একবার খবরটাও ত নিতে হয়।

মনে করে ছিলাম সুখবর যথাসময়ে পাবই। আপনারা কোন কথাই যখন শুনলেন না তখন আর বিরক্ত করা শোভন মনে করি নাই।

সে কথা থাক্। এখন ত ১২ মাসেরও উপরে চলল। ওর ত মেলাই নজীর। অমুকের ১৩ মাস, অমুকের ১॥ বছরে হয়েছে। এখনও মা হ'বার স্বপ্নেই আছেন। আমার ত আর ভরসা হচ্ছে না।

তখন এত করে বললুম আমাকে নাই বা বিশ্বাস করলেন, একজন অভিজ্ঞ কাউকে দেখান। তাও রাজী হলেন না।

যা হয় নাই তার জন্য আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। যত গোল বাধালে সেই সুহৃৎ বোসটা। এখন একটা ব্যবস্থা করুন।

মিসেস্ রায়ের কি মত দেখুন ত?

তাহলে তার কাছেই যাই চলুন।

তখন উভয়ে মিসেস রায়ের নিকট গেলেন।

ডাক্তার মুখার্জ্জিকে দেখিয়া মিসেস রায় বলিলেন— আপনার শাপই বুঝি লাগল।

যদি আপনার ধারণাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারতুম তবে আমার চেয়ে কেউই বেশী সুখী হত না। তখন যদি একটা মিথ্যা প্রবোধ দিতাম তবে আজ কি উপায় হ'ত বলুন ত?

আপনি এখনও তাই ভাবছেন—

বলেছিলুম আর কাউকে ডেকে এ বিষয়ের একটা খতম্ করে দি,—তাত আর রাজী হলেন না?

যা হয় করুন—এ উৎকণ্ঠা আর ভাল লাগছে না।

তাহলে কালই গ্রীণ সাহেবকে আনার ব্যবস্থা করি, মিঃ রায় কি বলেন?

তাই করুন।

পরদিন যথাসময়ে গ্রীণ সাহেব আসিলেন। সমস্ত অবস্থা মনযোগ সহকারে শুনিলেন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত রোগীকে পরীক্ষা করিলেন।

তিনিও ডাক্তার মুখার্জ্জির কথাই সমর্থন করিলেন। সন্তানের নাম গন্ধও নাই—ফ্যান্টম টিউমার। মিসেস রায়ের সকল আশা আজ নির্ম্মূল হইল। সুহৃৎ ডাক্তার ও তাহার একস্‌রের আজ আদ্য শ্রাদ্ধ হইল।

পুষ্পরাণী

কুমারী লতিকা মিত্র

সে যে স্বরগের ফুল
মরতে সে এসেছিল করে মহা ভুল,
সে যে স্বরগের ফুল;
স্নেহ, মায়া, প্রীতিধারা
ক্ষুদ্র হৃদি ছিল ভরা;
সৌরভ না ছড়াইতে ঝরেছে মুকুল
সে যে স্বরগের ফুল॥

করুণা

শ্রীনীরবালা মিত্র

নিভে গেছে মনের দেউটি, চারিদিক ঘোর অন্ধকার,
সর্ব্বসন্তাপহারি চায় দাসী করুণা তোমার।
রুদ্ধশ্বাসে কণ্ঠাগত প্রাণ কোথা ওহে পারের কাণ্ডারি,
জ্ঞানালোক কর বিকশিত তুমি যে গো ভক্তাধীন হরি।
বাসনা অনল প্রভু মিটাইয়া দাও, হৃদয়ের তীব্র হাহাকার,
অমানিশা ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া রেখোনা মোরে আর

বলিদান

গল্প

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

[শুধু বলিদান লইয়াই যে একটি অতি করুণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নরেন্দ্রবাবু গল্পটিতে তাহাই সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দেবীর তৃপ্তির জন্য পশুবলি ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে তিনি কোন মত প্রচার করিয়া গল্পের রসভঙ্গ করেন নাই।]

পূজার আর মাত্র সাতদিন বাকি। সকালে নৌকা করিয়া সোনাগঞ্জের হাট হইতে বলিদানের পাঁঠাগুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়ের দল এতদিন ঠাকুরদালানে ভীড় করিয়া প্রতিমা গড়া দেখিতেছিল, এখন সকলে গোয়ালবাড়িতে আসিয়া জুটিয়াছে। গোয়ালবাড়িরই একটা খালি চালাঘরের ভিতরে পাঁঠাগুলিকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বয়স্কেরা আসিয়া, পাঁঠাগুলির নধর আকৃতি দেখিয়া সরকার মহাশয়ের পছন্দের ও ক্রয়-শক্তির তারিফ করিতেছেন। সাতদিন ভাল করিয়া খাওয়ান হইলে, আসল সময়ে মোট কতটা মাংস পাওয়া যাইবে, তাহার হিসাবও দুএকজন মুখে মুখে কষিয়া ফেলিতেছেন। ছেলেমেয়ের দল ইতিমধ্যেই ঘাস পাতা ও তরকারীর খোসা ইত্যাদি আনিয়া এত রাশিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ছাগশিশুরা তিনদিনেও তাহা শেষ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

জমিদার বাড়ির একমাত্র বংশধর পঞ্চম বর্ষীয় খোকাবাবুরই আনন্দ যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মায়ের কাছ হইতে বারবার তাগাদা আসিতেছে, তবুও নড়িতে চাহে না। কোন ছাগলছানাটা যে সকলের চেয়ে দেখিতে ভাল, তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানচাকর শিবুদাদা যখন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বাচ্ছাটী খুঁটি হইতে খুলিয়া আনিয়া, দড়িশুদ্ধ খোকাবাবুর হাতে দিল, তখন সে আনন্দে একবারে যেন নৃত্য সুরু করিয়া দিল। অন্য ছেলেমেয়েদের তখনই বলিয়া দিল—"এটা আমার ছাগলছানা, একে তোমরা কেউ খাবার দিতে পাবে না।" খোকাবাবু সকলেরই অতি প্রিয়। তাহার কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা খোকাবাবু, আমরা ওটাকে কিচ্ছু খাওয়াবো না। ওটাকে কেবল তুমিই খাওয়াবে।" শিবুদাদা অনেক করিয়া বুঝাইয়া, ছানাটিকে আলাদা আর একদিকে বাঁধিয়া রাখিয়া, খোকাবাবুকে অন্দরে মায়ের নিকট লইয়া গেল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু খাওয়া হয় নাই বলিয়া মা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, খোকা আসিতেই তিনি তাহাকে কোলে লইয়া খাওয়াইতে বসিলেন। খাইতে বসিয়া খোকাবাবু কেবল নিজের ছাগলছানাটার বিবরণ অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল।

(২)

ছাগলছানাটা কয়দিনেই খোকাবাবুকে খুব চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে আর দড়ি বাঁধিয়া রাখার আবশ্যক হয় না। খোকাবাবুর সঙ্গেই সে বিশাল জমিদারবাড়ির সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খোকাবাবু অন্যসব ছেলে মেয়েদের জানাইয়া দিয়াছে যে, সে যেমন ছাগলছানাটাকে ভালবাসে, ছাগলছানাটাও তাকে তেমনি ভালবাসে। ছেলেমেয়েরাও তাহার একথা মানিয়া লইয়াছে।

মহাষষ্ঠীর দিন সকালে খোকাবাবু হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ছেলেরা তাহাকে বলিয়াছে যে, নবমীর দিন তাহার প্রিয় ছাগলছানাকেও বলিদান করা হইবে। তাহার কান্না সহজে থামিতে চায় না। মা অনেক আদর করিয়া তাহাকে বুঝাইলেন যে, ছেলেরা কিছুই জানে না, তাহার ছাগলের গায়ে কেহ হাতও দিবে না।

সন্ধ্যার সময় শিবুদাদা যখন খোকাবাবুকে কোলে লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল, তখন তাহার চক্ষু দুইটী লাল ও বেশ গা গরম হইয়াছে। মা ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে লইলেন। ঘরের ভিতরে যাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিতেই, খোকা বলিয়া উঠিল—"মা তুমি কিচ্ছু জাননা, আমার ছাগলটাকেও ওরা ঘ্যাডাং-ডাং করে কেটে ফেলবে। ওটা মরে যাবে, তাহলে আমার খুব কষ্ট হবে।" মা বুঝিতে পারিলেন, সকালে তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া ভুলাইয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহার পরে আবার ছেলেরা

খোকার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়াছে। তিনি আবার নানা রকম করিয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন যে, তাহার ছাগলটাকে অন্দর মহলে আনিয়া লুকাইয়া রাখিবেন, তাহা হইলে বলিদানের সময় আর কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। মায়ের এই মতলবটা খোকা-বাবুর খুব মনে লাগিল, সে যেন এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিত হইল।

(৩)

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই খোকাবাবুর জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গৃহ চিকিৎসক আসিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—"এ কিছু নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, তিনদিনেই কমে যাবে।" শুনিয়া, পিতামাতা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। ব্যবস্থামত ঔষধ-পত্র চলিতে লাগিল।

পরদিন মহাসপ্তমীর সকালে জ্বর অনেকটা কমিয়া গেল। খোকা মাকে মনে করাইয়া দিল যে, ছাগলছানাকে ভিতরে আনিয়া রাখিতে হইবে। তখন শিবুদাদার ডাক পড়িল। খোকাবাবুর আদেশ মত শিবু ছাগলছানাটাকে আনিয়া ঘরের সম্মুখের দালানে বাঁধিয়া রাখিল। খোকা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। সমস্ত দিন জ্বরটা একভাবে থাকিয়া রাত্রে আবার বৃদ্ধি পাইল।

মহাষ্টমীর দিন সকালে জ্বর পূর্ব্বদিনের মত অতটা কমিল না। ডাক্তারবাবু আসিয়া আবার ঔষধ বদলাইয়া দিয়া গেলেন। খোকা ছাগলছানার দিকে মধ্যে মধ্যে কেবল চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোন কথা আর বলিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া নিয়মিত ঔষধ পড়িল, কিন্তু সন্ধ্যার সময় জ্বরটা অতিরিক্ত বাঁড়িয়া গেল। খোকা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রলাপে কেবল তাহার ছাগলেরই কথা। ডাক্তারবাবু দেখিয়া বলিলেন—"তিন দিনের দিন বৃদ্ধিটা খুবই হোয়েচে। ভাবনা কিছু নেই, কাল সকালেই নরম পড়বে।" পিতা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, মায়ের মনের দুর্ভাবনা কাটিল না।

রাত্রে সুবিধামত গৃহিনী একবার পুরোহিত মহাশয়কে ভিতরে ডাকিয়া আনাইলেন। শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের করুণ আবেদনে কিন্তু পৌরোহিত্য ব্যবসায়ীর মন টলিল না। তিনি বলিদানের উদ্দেশ্যে ক্রীত ছাগশিশুর প্রাণরক্ষা করিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। বরং এরূপ অন্যায় চিন্তাও মনে স্থান দেওয়া জমিদার গৃহিনীর পক্ষে বিশেষ অধর্ম্মজনক হইয়াছে, তাহাই বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন।

মহানবমীর দিন সকালে খোকার জ্বরটা কতক কমিতে দেখা গেল। বোধ হয় ডাক্তারের কথাই ঠিক, সকলে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু খোকার আচ্ছন্ন ভাবটা মায়ের মনের শঙ্কা দূর করিতে পারিল না। তিনি মনে মনে মহামায়ার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

বলিদানের সময় আগাইয়া আসিতে লাগিল। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা মা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন, পাছে কোন দিক দিয়া শব্দ প্রবেশ করিলে খোকা চমকাইয়া উঠে। বাহিরে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার অতি ক্ষীণশব্দ মায়ের কানে প্রবেশ করিতে, তিনি নিজেই যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ঘন ঘন খোকার দিকে চাহিতে লাগিলেন, তাহার কানে শব্দের বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিতেছে কি না। কতটা সময় যে আশঙ্কার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুই জ্ঞান ছিলনা। হঠাৎ যেন খোকা একবার চমকাইয়া উঠিল। মা তাড়াতাড়ি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। খোকার তন্দ্রা টুটিয়া গেল; সে চেঁচাইয়া উঠিল—"মা, আমার ছাগল?" মা তখন বোধ হয় জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছিলেন, অকস্মাৎ উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গেসঙ্গেই ঢাক ঢোলের শব্দ ও একটী নিরীহ ছাগশিশুর করুণ কণ্ঠের শেষ চিৎকারধ্বনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। উত্তেজনাবশে খোকা উঠিয়া বসিয়া চিৎকার করিল—"মা, আমার ছাগলটাকে ওরা কেটে ফেল্লে!" মা তাড়াতাড়ি খোকাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিতে গিয়া দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহির মহলে যখন জগন্মাতার প্রতিমার সম্মুখে অসংখ্য ঢাকঢোলের বাদ্যের সঙ্গে সদ্যনিহত-পশুরক্তেরঞ্জিত জনগণের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি মিশিতেছিল, তখন অন্দর মহল হইতে অকস্মাৎ বুকফাটা ক্রন্দনের শব্দ উঠিয়া সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

পিঞ্জরে

গল্প

৺রাখালচন্দ্র সেন আই-সি-এস

[৺রাখালচন্দ্র সেন আই-সি-এস্ নানা শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার কয়েকটি অপ্রকাশিত গল্প আছে—তাহারই মধ্য একটি প্রকাশিত হইল। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে আলিপুরে এ্যাডিসনাল জজ থাকাকালে রাখালবাবু পরলোক গমন করেন।]

শ্যামনগর পরগণাতে আমাদের চন্দ্রদহ নামে একটী বিল ছিল। শীতকালে সেখানে প্রচুর শিকার মিলিত। পাখী শিকারে বীরত্বের কোন প্রয়োজনই নাই, আর চন্দ্রদহের এমনি গুণ ছিল সেখানে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকারও প্রয়োজন ছিলনা। ভোরের বেলায় ঠিক সময়ে যাইতে পারিলেই হইত, তারপর চোখ বোজা আর গুলিছাড়া। কিন্তু যত গোলমাল ঐ ঠিক সময়ে যাওয়া। আমাদের গ্রাম হইতে বিলটী প্রায় মাইল কুড়ি হইবে। রাস্তা একরূপ নাই বলিলেই চলে। বিল হইতে তিন মাইল দূরে আমাদের একটী তহশীল কাছারী ছিল। আগের সন্ধ্যায় গিয়া সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া যাওয়া ছিল সবচেয়ে আরামজনক পন্থা। শীতকালে প্রায়ই আমার ২।১ জন শিকারলোভী বন্ধু কলিকাতা হইতে আসিতেন। সেবার বড়দিনের ছুটী হয় হয়, এমন সময়ে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন নাগরিক জীবনের পেষণে তাহার পৌরুষ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এবার পাখী মারিয়া লুপ্তশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে চান। যথা সময়ে তাহার আগমন হইল। ২।১ দিন আমাদের বাড়ীতে থাকিবার পর শিকারে যাইবার বন্দোবস্ত হইল। যেখানে আমাদের তহশীল কাছারী সে গ্রামের নাম নাগর। নাম যাহারা রাখিয়াছিল তাহাদের রুচি যেমনই হোক্ গ্রামের নাম শীঘ্র বদ্লানো যায়না। যখন কাছারীতে পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শুক্লাষ্টমীর জ্যোৎস্না শীতের কুয়াশায় ম্লান।

খাবার সঙ্গেই ছিল। দুই বন্ধুতে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া যখন বারান্দায় বসিলাম তখন মনে হইল যেন লোকসমাজ ছাড়িয়া পৃথক জগতে আসিয়াছি। কাছারীতে কোন কর্ম্মচারী তখন ছিলনা। সর্ব্ব নিকটের গ্রাম প্রায় ১মাইল দূরে। থাকিয়া থাকিয়া দু একটী অজানা নৈশ পাখীর ডাক আর দূরাগত শৃগালের কণ্ঠধ্বনি।

বন্ধুর আমার দুইটী ব্যবসা ছিল ব্যারিষ্টারী ও কবিত্ব। প্রথমটী ছিল ধনাগমের ব্যবসা। দ্বিতীয়টী ধনক্ষয়ের। কারণ তাহার কবিতা কখনও বিক্রয় হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন আজি হতে শতবর্ষপরে কেউ হয়ত বুঝবে। খরচের কথা বলিলে বলিতেন যাইহোক, আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বিয়েতে নিজের বই দিলে দেখায়ও ভাল, খরচ ও বাঁচে। বন্ধুর অর্থনীতির সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মত বদ্লায় নাই। যাই হোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অত্যাচার সহ্য করিলাম। যখন আলো নিভাইয়া ঘরে আসিলাম তখন অষ্টমীর চাঁদ অস্ত গেছে। বন্ধুর শিকারে উৎসাহ যতটা ছিল, সকালে উঠিবার অভ্যাসটী তত ছিলনা, উঠিতে দেরীই হইল। তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। শীঘ্রই পরের গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

ছোটগ্রামের পথ। দুপাশে গৃহস্থের বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীটা শুকনা সুপারি পাতায় বেড়া দেওয়া। তখনও রোদ ওঠে নাই। বন্ধু আর আমি বেশ জোর গলাতেই কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় পাশের বাড়ীর বেড়ার পাশ হইতে একটী ছোট ছেলে আসিয়া বলিল, বৌদি আপনাকে ডাকছেন।

কার বৌদি কাকে ডাকে এই অচেনা গ্রামে, তবু অনেকটা না ভাবিয়াই সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম, বন্ধু

পথেই রহিলেন। ঢুকিয়াই বুঝিলাম যে পথ দিয়া ঢুকিয়াছি সেটা অন্দর মহলের পথে। রহস্য ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ছেলেটী আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া গেল তার স্থানে যিনি আসিলেন তাঁহাকে আগে দেখিতে পারি নাই, কারণ আধহাত ঘোমটা দেওয়া ছিল। যে স্থানটীতে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম সেটি কূয়ার কাছে। কাছেই একটি কাগজির গাছ। ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সত্যি গোময়ের লেপা ঝকমক করিতেছে। বাড়ীতে তখনও বেশী কেহ উঠে নাই। কাছে আসিয়াই মেয়েটি ঘোমটা কমাইয়া দিল, তারপর অনুচ্চস্বরে কহিল—আমাকে চিনতে পারেন। এবার আমার সত্যই মনে হইল যে ঘুম আমার ভাঙ্গে নাই, এখনও কাছারিতে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় মেয়েটি নিজেই কহিল, আমি কমলিনী, আপনাদের গ্রামের জানকী বোসের মেয়ে। যৌবনের অনেক বেদনা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি। কিন্তু ইহার প্রভাবে কুমি যে কমলিনী হয় তাহা আমার জানা ছিল না। সেই কুমি যে আমাদের পাঠশালাতে পড়িত, যাহাকে হাতে ধরিয়া কত তাল-পাতা লেখাইয়া দিয়াছি, সে এত বড় হইয়াছে।

যাহরা ছোট ছিল, তাহাদের বড় দেখিলে নিজের বয়সের কথা যত মনে পড়ে এত আর কিছুতেই নয়। যাই হোক ভাবিবার সময় ছিল না, বলিলাম—তোমার এখানে বিয়ে হয়েছে? সে উত্তর দিল-হ্যাঁ, তারপর জিজ্ঞাসা করিল আমার বাপের বাড়ীর কোন খবর জানেন। আমাকে স্বীকার করিতে হইল জানিনা, পথে কমলিনীর সাথে দেখা হইবে জানিলে হয়ত বা জানিয়া আসিতাম। সে আবার বলিল—আজ কতদিন চিঠি পাইনা ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছি মা উত্তর দেননি। আজ ক'দিন থেকে মন যে কেমন কচ্চে কি বলব। ভোর বেলায়, উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার গলা শুনে মনে হল, আমাদের দেশের মানুষের গলা, তারপর বেড়া ফাঁক করে দেখে আমার ছোট দেওরটিকে দিয়ে ডেকে পাঠালাম। তারপর আমার উত্তর দেবার অপেক্ষা না করিয়া বলিল—আমার একটা কথা রাখবেন। ফিরে গিয়ে আমাকে একটা খবর দেবেন তারা কেমন আছেন, কি যে করে মনে কি করে বলব। পাখীগুলো যখন উড়তে থাকে মনে হয় যদি পাখী হতাম তবে একবার গিয়ে দেখে আসতাম। এবার যান, আমার শাশুড়ী এখুনি উঠে পড়বেন। বলিয়াই আবার যে দিক দিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। সে ছোট ছেলেটির আর দেখা পাইলাম না, নিজেই বাহির হইলাম।

বন্ধুর প্রাণ একলা গ্রামের পথে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহির হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে Romance! আমি বলিলাম না মোটেই নয়। বন্ধু হাসিয়া কহিলেন—সেকি অচেনা গ্রামের পথে যুবতীর আহ্বান, এও যদি Romance না হয়—আমি বলিলাম যুবতী কি করে জানলে—বুড়ীদেরও ত দেওর থাকে।

বন্ধু কহিলেন তোমার ভাগ্যে আমি হিংসা কচ্চিনা, কিন্তু এত ছোট ছেলের যদি বুড়ো বৌদি থাকে তবে দুর্ভাগ্য তোমার আর ছেলেটির। আমি উত্তর দিলাম—না তা নয়, ধরেছ ঠিক যুবতীই বটে, তবে প্রেমের আহ্বান নয়। চাই কি বেরুতে দেরী হলে শাশুড়ী ঠাকুরুণের সম্মার্জ্জনীর সাথে সাক্ষাৎ হত হয়ত। শিকার সেদিন জমিলনা, বন্ধু কহিলেন রমণীর নয়নবান না কি পুরুষ গুলিকে অমনি অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। আমি শুধু ভাবিতেছিলাম কি পিঞ্জরের পাখী এরা। মাত্র কুড়ি মাইল দূরে বাপের বাড়ী তবু ঘরের বৌ, কাহাকেও সন্ধান নিতে বলিতে সাহস করে না। শুধু এই রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরের দ্বারে গৃহ-ব্যাকুল মন আঘাত পায়। অথচ শুধু বাপের বাড়ীর দেশের লোক বলিয়া একটি প্রায় অপরিচিত লোককে ডাকিতে ইতঃস্তত করে না। তাহার উপর খানিকটা দাবীও রাখে। ফিরিয়াই একটি পিয়াদা দিয়া তাহার পিত্রালয়ের খবর তাহাকে দিয়াছিলাম। তারপর যত-দিনই কোন গ্রামের পথে গিয়াছি, শুধু মনে হইয়াছে কত কোমল প্রাণ এই সব গৃহ প্রাচীরের ভিতরে অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় ভরিয়া হাস্যমুখে সংসারের কাজ করিতেছে।

হাতের কাজ কিছু কমিলে একদিন জানকী বোসের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাদেরই প্রজা। বাড়ীতে ছিলেন না। গৃহিণী আমার সাথে দেখা করিতে আসিলেন।

আর দেখা করিল তাহার একটি ছেলে কমলিনীরই ২।১ বৎসরের ছোট হইবে।

গৃহিণী বৈবাহিকের বিশেষতঃ বৈবাহিকার অনেক নিন্দা করিলেন, বলিলেন গত পূজাতে আনিতে চাওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কমলিনীকে পাঠান নাই। পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও কমলিনীর ভাই, অর্থাৎ তাহার ছেলে কমলিনীর নিকট চিঠি লিখিয়া দেয় নাই।

কমলিনীর স্বামী রেলে চাকুরী করে। স্ত্রীকে সঙ্গে লইবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু মায়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারে না ইত্যাদি। তারপর আমাকে অনেক মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া আমার পদার্পণে কৃতার্থ হইয়াছেন জানাইয়া বিদায় দিলেন। চলিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় ছেলেটিকে বলিলেন—তোর দাদাবাবুকে প্রণাম কর। ছেলেটি প্রণাম করিল।

তারপর প্রায় একমাস গিয়াছে। বহু সময়ে কমলিনীর সেই ব্যথিত মুখ আমার মনে পড়িত কিন্তু আমি শুধু তাহার কথা ভাবিতাম না। তাহার কথা ভাবিতে গেলে মা ছাড়া অল্পবয়সের যত মেয়ে যেখানে শ্বশুর ঘর করিতেছে তাহাদের কথা মনে পড়িত। কেহ কেহ বলেন এই স্বল্পবয়সে স্বামীর ঘর করিতে করিতে সে ঘর আপন হইয়া যায়। পাকা ডালে কলম বাধেনা। এবং সেইজন্য বেশী বয়সের মেয়েরা পুত্রবধূরূপে সংসারের সকলের সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পারে না, গৃহবিবাদ হয়, একান্নবর্ত্তী সংসার ভাঙ্গে। হইতে পারে একথা সত্য। সমাজতত্ত্ব আমি আলোচনা করি নাই। কিন্তু যখনই ভাবিতাম অবরুদ্ধ অন্তঃপুরে আত্মীয়হীন স্নেহহীন জীবন কমলিনীর মত বয়সের মেয়ের পক্ষে কি দুঃসহ তখনই মনে হইত, হয়ত অন্য উপায় আছে, যাহাতে ঘর ও ভাঙ্গে না, আর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এমন ব্যথায় তিক্ত হইয়া ওঠেনা।

কি যে উপায় ভাবিতে পারি নাই। জানকীবাবুর বাড়ী হইতে প্রায় একমাস হইল আসিয়াছি, একদিন সকালে নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, হঠাৎ একটী ছেলে আসিয়া প্রণাম করিল। বলিলাম—তোমরা ভাল আছ, তোমার দিদি ভাল আছেন।

ছেলেটী কহিল, হ্যাঁ—

আর দু একটী অসংলগ্ন প্রশ্ন ও উত্তর হইল। কিন্তু ছেলেটী কিছুতেই ওঠেনা। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি কোন কাজ আছে আমার সাথে? তবুও কথা কহে না, তারপর পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে বলিল—আজ্ঞে, মা বলছিলেন যে জেলার সাহেবের সাথে আপনার জানা-শুনা আছে, আপনি যদি তাদের বলে আমার একটী চাকরী করে দেন।

হায়রে কোথায় কমলিনী, আর কোথায় তার মা হারাণোর ব্যথা। না জানিয়া এ ছেলেটী আমার কি করিল। সারারাত্রি প্রেমাভিনয়ের পরে প্রত্যূষে যখন বারাঙ্গণা তার প্রাপ্য চায় তখন বোধহয় প্রমত্ত যুবক এমনি ভাবে জাগে। বলিলাম—তোমার মাকে বলো তাদের কারো সাথে আমার আলাপ নাই। আর তা ছাড়া আমি স্বদেশীর দলে। আমি বলিলে তোমার চাকরীর যে টুকু সম্ভাবনা আছে তাও যাবে।

কমলিনীর কথা আর ভাবিতে পারি নাই।



স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

[শ্রীমতী পূর্ণশশীর গল্পের সঙ্গে অনেকেই পরিচিতা। এক শিল্পী তাহার সাধনার সাথীকে হারাইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথীর উপর তাহার নির্মম প্রতিশোধ কি ভাবে লইল বর্ত্তমান গল্পটিতে লেখিকা তাহাই দেখাইয়াছেন।]

সে ছিল ভাস্কর, পাথরের শিল্পী। পাথর কুঁদে তাতে নব নব ভাব-পরিকল্পনা ফুটিয়ে তুলে সে যেসব বিচিত্র সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়ে, সহরের বিলাসী মহলে তা আদৃত হয় বিলক্ষণ। তা ছাড়া বড় লোকদের ফরমাইসী প্রতিমূর্ত্তিও এমন নিপুণ নিখুঁত ভাবে গড়ে দেয় যে, আসলের সঙ্গে সাদৃশ্য তার মিলে যায় একেবারে রেখায় রেখায়।

ব্যবসায়ের খাতিরে হ'লেও একাজে তা'র ক্লান্তি ছিল না এতটুকু। অনেক সময় প্রতিমা গড়ত সে কেবল চিত্ত-বিনোদনের জন্য—অবসর কালের অলস মুহূর্ত্তগুলিকে আনন্দময় করবার জন্য।

এমনি ভাবে তরুণ মনের ভাব-কল্পনা দিয়ে শিল্পী গড়ে তুলেছিল একখানি শ্বেত পাথরের তরুণী নারী-মূর্ত্তি, মূর্ত্তিটী তেমন বড় নয়, ছম্‌কালোও নয়।

নিরাভরণ তা'র দেহ, অবেণী-বদ্ধ চুলের রাশি গোছায় গোছায় এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বুকে পিঠে, বাহুমূলে। মুখখানি মোটের উপর সুশ্রী হ'লেও নিখুঁত বলা চলে না। নাকটী আর একটু টিকলো হলে আরো ভালো দেখাত হয়তো। চোখ দুটী বেশ টানা-টানা হ'লেও তেমন ডাগর নয়। চোখের কোণ যেন একটু বেশী ভাঙা। মানে—খুঁৎ বার করবার তাতে অনেক কিছুই ছিল, তবু ওই যে একটা উদাস আকুল ভাবের অভিব্যক্তি প্রতিমাখানির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মূর্ত্ত হয়ে তা'কে ললিত ছন্দে গাঁথা একটী করুণ ব্যথার কবিতার মত মধুর মর্ম্মস্পর্শী ক'রে তুলেছে, সেই টুকুই ছিল ওর বিশেষত্ব। তারি জন্যে প্রতিমাটী গড়া শেষ না হতেই তার খরিদ্দার জুটে গেল।

কিন্তু শিল্পী এত বেশী রকম অসম্ভব দাম চেয়ে বসে যে, ক্রেতাদের ফিরতে হয় নিরাশ হয়ে। শেষে সহরের এক-জন বিখ্যাত ধনী ও সৌখীন লোক যখন শিল্পীর প্রার্থিত মূল্যই দিতে চাইলেন, তখন সে স্পষ্ট কথায় দৃঢ় ভাবে জানিয়ে দিলে—এ জিনিস সে বিক্রী করতে পারবে না—লক্ষ টাকা দিলেও না!

আশ্চর্য্য! এ কেবল মুখের কথাই নয়, বাস্তবিক পুতুলটী সে বিক্রী করতে পারলে না প্রাণ ধরে। যেন তার জীবনে এই শিল্পই পরম ও চরম অবদান—ঠিক এমনটী গড়তে সে বুঝি আর পারবে না তাই—।

কাঙাল যেমন পথের ধূলোয় দৈবাৎ কুড়িয়ে পাওয়া রত্নকে অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখে দেয় লোক-চক্ষুর অগোচরে, তেমনি করে শিল্পী সেই পাথরের পুতুলটী লুকিয়ে রাখলে ওদের বাগানের এক নিরালা প্রান্তে। যেখানে ঝাউগাছের সারিতে অপরাজিতা আর মাধবীলতা জড়াজড়ি ক'রে ছায়া-নিবিড় কুঞ্জ রচনা করেছিল—তারি মধ্যে একটা উঁচু বেদীর ওপরে—।

তারপর, কাজের ফাঁকে এতটুকু নিভৃত অবকাশ পেলেই শিল্পী ছুটে আসে সেইখানে, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি—যখন সুযোগ ঘটে।

ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলিতে মালা গেঁথে সে দিতে আসে প্রতিমার গলায়, কিন্তু উদ্যত বাহু দু'খানি তার কেঁপে, থম্‌কে নেমে পড়ে—কি জানি কেন যে! এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে প্রতিমার মুখপানে চেয়ে থেকে—মালাগাছি তার পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে শিল্পী ফিরে যায় আবার।

তখন বুকের তলে ফুঁপিয়ে ও তার উদ্যত উতল দীর্ঘশ্বাস, চোখের পাতাও বুঝি ভিজে ওঠে…।

দুপুরের নিঝুম অলস মুহূর্ত্তে শিল্পী চুপটী করে বসে থাকে প্রতিমার পদতলে বেদীতে মাথা রেখে, কতক্ষণ বিহ্বল আঁখি তার চেয়ে চেয়ে পলক ফেলতে ভুলে যায়। সে একাগ্র দৃষ্টির ব্যাকুলতা সেই পাষাণ শরীর নিষ্পলক ব্যথা-ছল-ছল করুণ চোখ দুটীকে যেন আরো মধুর, বিধুর

ক'রে তোলে, ঠোঁট দুখানি যেন কাঁপতে থাকে তার মরমের অকথিত বাণীর গোপন আবেগে।

সেখানে কেউ থাকে না। সেই সজীব ও নির্জীব মূর্ত্তি দুখানির অব্যক্ত মৌন বেদনা সেখানে কেউ দেখে না, কেউ বোঝে না, শুধু নর্গীশের ঝাড়ে থোকো, থোকো ফুল ফুটে অনিমেষ হয়ে থাকে তাদের দরদী নয়ন মেলে। লতাপল্লবের অন্তরালে বুলবুল করুণ সুরে শীষ দিয়ে দিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে।

কত উদাস সাঝে শিল্পী সেখানে এসে একবার উঁকি দিয়েই চকিতে ফিরে যায় বুকভরা অতৃপ্ত পিয়াসা নিয়ে।

কত অতন্দ্র গভীর রজনী তার কাটে সেই বিজন কুঞ্জ বিতানে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, প্রহরের পর প্রহর। শিয়রে জাগে চাঁদ, পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলিপন এঁকে দিয়ে।

নৈশ-সমীরের শিহরণে বাজে বেদনার মৃদু মর্ম্মর রাগিণী। রজনীগন্ধার মদির মধুর সুরভি ওদের নীরবে ঘিরে থাকে—কোন ব্যথিত ভীরু হিয়ার গোপনতম নিবিড় ব্যথার অনুভূতির মত পলকের জন্য সেই নিষ্প্রাণ, মূক পাষাণ প্রতিমার নিশ্চল, নিথর বুকেও যেন উতল হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দন, শুভ্র শীতল পাষাণ অঙ্গেও বুঝি জাগে জীবনের উষ্ণতা!

এমনি ক'রেই কেটে যাচ্ছে দিনের পর রাত— রাতের [illegible] দিন।

একদিন, ওঃ সেদিন প্রভাত হয়েছিল কী কুক্ষণেই গো! শিশির ভেজা ফুলে অঞ্জলি ভরে শিল্পী ধীরে ধীরে আসে তার মানসী প্রতিমার অর্চ্চনা করতে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়,—একি? ওর মুখখানি—কই?— একেবারে গলা থেকে কেটে নিয়ে গিয়েছে নিশ্চিহ্ন করে—ঃ! কে এমন সর্ব্বনাশ করলে গো!—দীর্ঘ দিনের সাধনা তার এ ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে—নির্ম্মম হৃদয়হীনের মত…

হাহাকারে-ফেটে-পড়া বুকখানা দু'হাতে চেপে ধরে শিল্পী আছাড়ে লুটিয়ে পড়ে বেদীর তলে বাণাহত মৃগের মত। উচ্ছসিত অবিরাম অশ্রুধারায় ভিজে যায় শ্রীহীন ভগ্ন প্রতিমার পাদুখানি।

কে গো? সে কেমন নিষ্ঠুর? কঠোর প্রাণে তার এক কণাও করুণা নেই কি?

\+ \+ \+

গভীর নিশুতি রাত, ছমছমে অন্ধকার।

ঝোপে, গাছপালায় কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে। ভগ্ন প্রতিমার পদতলে বসে শিল্পী, স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেছে—আজ নিঃশেষ। চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছে এবার বৈর নির্য্যাতনের তীব্রতর স্পৃহায়। তার হাহাকার ভরা অন্তরে, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়, আগুনের হল্‌কার মত ছুটোছুটি করছিল ভীষণ প্রতিহিংস'বৃত্তি।

প্রতিশোধ! চাই প্রতিশোধ!

এই ভয়ানক হৃদয়হীনতার প্রতিশোধ সে তুলবেই, যেমন করে হোক্‌।

শত্রু কি মিত্র সে যেই হোক্‌ তাকে ও ছাড়বে না, ক্ষমা করবে না, কিছুতেই না! তার গলাতেও অমনি করে অমনি নৃশংস ভাবে……!

অন্ধকার শিউরে উঠে, গাছপালাগুলো সির সির ক'রে সেই রোমাঞ্চকর নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা শুনে।

কত রাত কি জানি,—শিল্পী চুপি চুপি কখন কুঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল—উদভ্রান্ত ভাবে আকাশ পানে তাকিয়ে। আকাশের মিশ মিশে কালো বুকেও যেন জলন্ত আখরে লেখা রয়েছে—

প্রতিহিংসা!—প্রতিশোধ!—ওঃ!

শিল্পী চমকে ওঠে কী এক দারুণ বিভীষিকা দেখে।

কেমন করে কি হ'ল বলা যায় না।

রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল।

রাজপুরুষেরা শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তার স্ত্রীর হত্যাপরাধে। সে ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সুখে সুখী—ব্যথার ব্যথী—সাথী।

ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশ

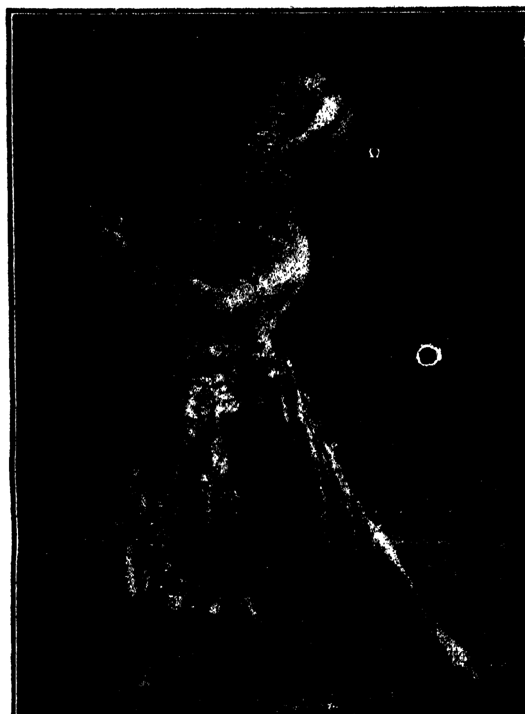
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কোন জাতির জীবনীশক্তি যতদিন থাকে ততদিন তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না। জাতির বিশেষত্ব যে পরিমাণে বজায় থাকে তাহা হইতে একটী জাতির জীবন-শক্তির পরিমাণ করা যায়। জাতীয় নৃত্যকলা ও পরিচ্ছদ জাতির বিশেষত্বের প্রধান অংশ।

ইহা কোনও এক বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যবিদের উক্তি। ইহার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে কি ভাবে নৃত্যকলা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে জাতি সমূহ পরস্পরের মধ্যে কি ভাবে বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য রাখিয়া আসিয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

মানুষ তখনও সৃষ্টি হয় নাই—সভ্যতা তো দূরের কথা—তখন হইতেই পশুপক্ষীর মধ্যে নৃত্যারম্ভ হয় পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ জন্মগ্রহণ করিল—তখনও তার জাতি ধর্ম্ম বিকাশ লাভ করে নাই। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করে—পরিচিতের সহিত অপরিচিতের দেখা হইলে নৃত্য দেখিয়া তাহারা ঠিক করিত কোথায় তাহাদের নিবাস এবং কোন্ সম্প্রদায়ের লোক। মানুষ তখনও অতি অসভ্য, ভূতপ্রেতের উপাসনাও তাহারা তখন শিক্ষা করে নাই; কিন্তু নৃত্য শিখিয়াছে পতি-পত্নীর নির্ব্বাচন প্রয়োজনে। নর নারীকে মুগ্ধ করিয়াছে পত্নীরূপে পাইতে। তারপর ধর্ম্ম বিকাশলাভ করিল, নৃত্য হইল উপাসনার অঙ্গ। মানুষ ভাবিত নৃত্য দেখিয়া যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয়, মানুষের দেবতাই বা হইবে না কেন? দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য নৃত্যের সুরু হইল বীজ-রোপণে, শস্যকর্ত্তনে। নৃত্য হইল অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান। এমন কি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বিবাহ বাসরে জন্মলগ্নে পর্য্যন্ত।

এই তো গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তারপর যখন ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া উপনীত হইলাম, তখন ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। দেবতার সম্মুখে তাঁর প্রীতির জন্য ভক্তিভাবে নৃত্য করা প্রাচীনেরা দোষাবহ মনে করিতেন না। ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে সমানভাবে হইয়াছে যাহার ফলে অদ্যাবধিও প্রাচ্যের দেবমন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের বিশ্বাস, স্বর্গেও



শিবনৃত্যে উদয়শঙ্কর

দেবতারা নৃত্য করেন, তাই গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ দেবতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য নৃত্য করিয়া থাকেন। যাহার পরিকল্পনা হইতে নটরাজ মহাদেবের উদ্ভব।

পতি-পত্নী নির্ব্বাচন ও ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে সে নৃত্য সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে তাহা অর্থকরী কলাবিদ্যায় পরিণত হইল। মানুষ তখন নৃত্যের দ্বারাই উদরান্নের



ভক্তি নৃত্য

ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তখন হইতেই মানুষের রুচি অনুযায়ী নৃত্যে বহু রূপ রস স্থান পাইল, তখন হইতেই নরের স্থান সম্পূর্ণভাবে লইল নারী। নটের পরিবর্ত্তে নটীই পুরুষ সভার চিত্ত-বিনোদনের জন্য লাস্যময় নৃত্য সুরু করিল। বহু প্রাচীনকালেও যে পেশাদার নর্ত্তকী ভারতে ছিল অবশ্য তারও অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমন কি দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এই পেশাদার নর্ত্তকীর উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন মনোভাব বিভিন্ন কলাকুশলী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া নৃত্যকলা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই আমরা বিভিন্ন দেশে বিচিত্র প্রকারের নৃত্য দেখিতে পাই। অধ্যাত্ম সাধনার বিকাশে এবং সভ্যতায় ভারতে নৃত্যের স্থান ছিল উচ্চে। ভারতের সাধকগণ ও রূপকারগণ প্রকৃতির বৈচিত্র্যলীলাকে দেবতার নৃত্যবিলাসরূপেই দেখিয়াছেন ভক্তের দৃষ্টিতেও ভক্তগণ প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যকে দেখিয়াছে প্রকৃতিরূপিনী শ্রীরাধার সহিত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যরূপে। ভাবের অনুপ্রেরণা হইতে উত্তর ভারতের বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ-তাণ্ডব নৃত্যও বসন্তোৎসবে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

নাট্যশাস্ত্র, নাট্যবেদবিবৃতি, নর্ত্তক নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে প্রাচীন ভারতের রূপ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের একটী বিশিষ্ট স্থান ছিল, কারণ পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতের নৃত্য শুধু অর্থহীন দেহভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালনেই পর্য্যবসিত ছিলনা—ভারতীয় নৃত্যে বিচিত্র দেহভঙ্গী, করণ, অঙ্গহার সাহায্যে অপার্থিব অনুভূতিকে ব্যঞ্জনা দিত। নৃত্যের গতিছন্দে মানুষের মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইত। তাহাতে থাকিত আধ্যাত্মিক শক্তি যার প্রভাবে প্রবৃত্তির তেজ হ্রাস পাইত—মনে আসিত



শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

একটী পবিত্র ভাব—যে মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল মানুষ নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদ। ইউরোপীয় শিল্প জড়সৌন্দর্য্যকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তার দেবদেবী পর্য্যন্ত মানবীয়



নৃত্যভঙ্গীতে কুমারী অমলা নন্দী

সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশে পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভারতের শিল্পী তার আত্মার অম্লান মহিমাই উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইতেছেন। একদা সভ্যতায়, শিল্পে, প্রাচীনতায় তত্ত্বান্বেষী জাতি বলিয়া ভারতবাসীর খ্যাতি ছিল। ভারতের শিল্পী সীমার বাহিরে অজানা অনন্ত রহস্যের রূপ উদ্ঘাটন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে তার চিত্রে, ভাস্কর্য্যে; এমন কি নৃত্যপরিকল্পনাতেও তার অন্তরের রস ও রূপ ফুটাইয়া জনসমাজকে রস পরিবেশন করিয়াছে। বিশ্বের ছন্দই গতিমূলক; আবর্ত্ত সৌরজগৎ ছন্দে গ্রথিত, গতিশীল সংসারের প্রত্যেক অণুতেই শক্তির ক্রীড়া চলিয়াছে এই স্থিতি ও গতির যুগ্ম অবস্থাকে শরীরী করিয়া নৃত্যপরিকল্পনায় প্রকাশ করার চেষ্টা এদেশের শিল্পীই করিয়াছে। নটরাজের নৃত্য সূক্ষ্ম জটিল অনুভূতিকে রূপ দিয়া অতীন্দ্রিয় জগতকে সহজবোধ্য করা, সকল কর্ম্মের পশ্চাতে চরম সত্যকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা এই জাতি কেবলমাত্র দর্শনে সাহিত্যেই করে নাই ভাস্কর্য্যে নৃত্যাদি ও অন্যান্য ললিতকলার ব্যঞ্জনাতে রূপায়িত করিয়াছে। ইলোরা, অজন্তা, এলিফান্টা প্রভৃতি গিরিকন্দরে রেখা ও নৃত্যভঙ্গীতে ভাবের ব্যঞ্জনা দেখিয়া প্রতীচ্যের চিন্তাশীল মনীষিগণ শুদ্ধ বিস্মিত হইয়া যান। কিন্তু এ দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রাচ্যের গৌরবময় অতীত সম্পদের কথা আমাদিগকে জানিতে হয়।

প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছিল প্রাণী জগতের বিচিত্র গতিছন্দকে অনুসরণ করিয়া। ভারতীয় নৃত্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য ছিল। নৃত্যকালে দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ-প্রভৃতি বিচিত্র ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হওয়া, হস্ত সঞ্চালন মুদ্রা, গতিমণ্ডল, পার্শ্বচ্ছেদ, লীনম্ স্বস্তিকম্ প্রভৃতি করণ, রেচক, অঙ্গহার দৃষ্টিভঙ্গ, গ্রীবাভঙ্গ প্রভৃতি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় ভারতের নৃত্যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই। এমনকি চরণের ক্ষুদ্র নূপুরনিক্কণে পর্য্যন্তও করণ, মধুর ধ্বনিমাধুর্য্য অপূর্ব্ব রসে নৃত্যকে রূপায়িত করিতে সাহায্য করিয়াছে, যাহা অন্য কোন বিদেশীয় নৃত্যে দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণ ভারতের কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলের কথাকলি নৃত্যের মুদ্রাভঙ্গী কথিতভাষার মতই সুস্পষ্ট। মুদ্রার প্রত্যেকটি ভঙ্গীই অর্থপূর্ণ।



ভারতীয় নৃত্যের হস্তমুদ্রা

মুসলমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কারণ তখন হইতেই বিলাসী নবাব ধনীদের ভোগলালসা তৃপ্তির জন্য নৃত্যে নটীর প্রভাব হইল। নটের স্থান লোপ পাইল। কিন্তু প্রাচীন ধারার সহিত নূতন মিশিয়া কথক নামে উত্তরভারতে নূতন নৃত্যের



নৃত্যভঙ্গীতে সিম্‌কী

সৃষ্টি হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাণ্ডব বা কথক নৃত্য নামেই উত্তর ভারতে কথক নৃত্যের এখনও প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যও শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভার স্পর্শে নূতন রূপ পাইল। যে নৃত্য ছিল অশ্রদ্ধার—সেই নৃত্যকেই এদেশের রূপকারগণ নটীর চরণধূলি হইতে উদ্ধার করিয়া মর্য্যাদা দিয়া সমগ্র জাতির সমক্ষে আনিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। আত্মবিস্মৃত জাতি চেতনা পাইয়া নূতন করিয়া দেশকে চিনিতে শিখিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এ দিকে আজ পড়িয়াছে। আজ আনন্দের বিষয় এই যে নটীর অর্থহীন লাস্যের প্রভাবকে ম্লান করিয়া নটের অর্থপূর্ণ তাণ্ডব নৃত্য জগতের শিক্ষিত সমাজকে বিস্মিত করিয়াছে। তাই আজ উদয়শঙ্করের কণ্ঠে জয়মালা ভূষিত হইয়া তাঁর প্রশংসাধ্বনি বিঘোষিত হইতেছে। তিনি ভারতীয় নৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তক। ভারতীয় নৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তক হিসাবে আমরা আর একজন তরুণ নর্ত্তককেও পাই তিনি শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন। তিনি ভারতের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু শ্রমসহকারে এই নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশেষতঃ মণিপুর অঞ্চলের প্রচলিত রাসনৃত্য—নর্ত্তক রাস, মহারাস, কুঞ্জরাস ও বসন্তরাস এবং জলকেলী নৃত্য খোবক ঈসেই (যাহা মণিপুরের রথ উৎসবের প্রধান নৃত্য); মণিপুরের জাতীয় প্রাচীন নৃত্য লায়হরাওবা (দেবপ্রীতির জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়)। মণিপুরের লুপ্ত প্রাচীন নৃত্য থাংহায়রোয়া অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দীপনা পূর্ণ অসিনৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নাগা পর্ব্বতে গিয়াও তিনি জীবন বিপন্ন করিয়া তথাকার সম্প্রদায়ভুক্ত কবুই, মুংশেপা, মারামুচা, আকোকখোসা, ঠের, পানিংপামাং তানক্ষুণ প্রভৃতি নৃত্য নাগা বস্তীর মধ্যে বাস করিয়া শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। লুপ্তপ্রায় সম্পদকে পুনঃপ্রচলিত করায় এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সুখের কথা এইযে একজন বাঙ্গালী মহিলাও নৃত্যকে সম্ভ্রম মর্য্যাদার সহিত জনসমাজে প্রচলিত করার জন্য খ্যাত হইতেছেন—তিনি শ্রীমতি মেণকা দেবী।

পাশ্চাত্য দেশেও ভারতীয় নৃত্যের প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে,



শূন্যনৃত্যে জনৈক মণিপুরী নৃত্যকার

রাগিণীদেবীর (আমেরিকান মহিলা), নিয়তা নিয়কার নৃত্যধারাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের লুপ্ত সম্পদ আজ ভারতীয় প্রচেষ্টায় জগতের মনে নূতন রহস্যের দ্বার-উদ্‌ঘাটন করিতেছে দেখিয়া সত্যই আনন্দ হইতেছে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে প্রাচীন নৃত্যকলাকে নবরসে নূতনভাবে প্রচারের চেষ্টা বাঙ্গালী নৃত্যবিদ্‌গণই প্রথম আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের রসকলা সভ্যজগতের নিকট আদর্শনীয় হইয়া থাকুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শুধু দেশেই নয় ইউরোপেও তিনি ভারতীয় নৃত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সদলবলে তাহার নৃত্য কলা প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাচ্য-নৃত্য বিশারদ উদয় শঙ্কর—নৃত্যবিদ্ মণিবর্দ্ধন ও নৃত্য কুশলা মেনকাদেবী নূতনভাবে নবরূপ ও রসের সমাবেশে ভারতের প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতিকে নূতন পরিকল্পনায় ও রূপে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যকে আয়ত্ত করার চেষ্টা অনেক বাঙ্গালী যুবকের মধ্যেও যে ভাবে দেখা যাইতেছে, ৎদ্দর্শনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায়। উদয়শঙ্করের ছাত্রী অমলা নন্দীও অনেক স্থানে তাহার নৃত্যকলা দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভারতের রসকলা সভ্য-জগতের নিকট আদর্শনীয় হইয়া থাকুক ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

মানুষ হয়েছে অন্ধ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মানব জীবন দলা পেটা চলে নিত্য,
ওঠে নি সেথায় গরল অথবা বিত্ত,
মানব কেবল কাদা মাখে হেথা,
লভেনা বিমলানন্দ,
সম্মুখে তার স্বর্গ দুয়ার রয়ে গেল চিরবন্ধ।
সুধা কোথা—শুধু উঠে হলাহল,
জ্বলিছে পৃথিবী, হয়নি শীতল
আপনার পথ পায়নি মানব, চক্ষু তাহার অন্ধ,
সম্মুখে তার বাঞ্ছিত দ্বার চিরদিনই রহে বন্ধ।

সান্ধ্য বাতাসে গন্ধ ছড়াতে ফুটেছে রজনী গন্ধা,
পঙ্কিল মন পূত করিবারে নেমেছে অলকানন্দা।
আকাশ দিয়েছে উজ্জ্বল আলো ;—
ধুয়ে মুছে দিতে জীবনের কালো
দেবতা আশীষ বর্ষে,
মূর্খ মানব পারিল না নিতে, জীবনে বরিতে হর্ষে।

গর্জ্জে আকাশ মাথার উপরে,
ধরণী হয়েছে শ্রান্ত,
মাগিছে শরণ দেবতার পদে, দেহ মন অতি ক্লান্ত।
ঝর ঝর ঝরে শ্রাবণের ধারা,
আকাশে আজিকে নাই চাঁদ তারা,
মানব ভুলেছে আপনার পথ, ভুলে গেছে তার কার্য্য,
নিতে সে পারেনি যাহা নিবে বলি
করেছে একদা ধার্য্য।

ভাসিয়া আসিছে স্ফুট বকুলের গন্ধ,
মানব বধির, মানব হয়েছে অন্ধ,
সম্মুখে তার বাঞ্ছিত দ্বার খুলে নাই—আছে বন্ধ।
বাসনা কামনা রহে তারে ঘিরে,
বার বার যায়—বার বার ফিরে,
সৃজন করিছে নির্ম্মলাকাশে ঘন মেঘ,—
আসে বৃষ্টি ;—
মূর্খ মানব নিজেরে ভুলাতে করিছে ভুলের সৃষ্টি।

সুরের নেশা

গল্প

শ্রীগিরিবালা দেবী

[একটি বালিকার বিদ্বেষ ও আসক্তির মধ্য দিয়া কি করিয়া সুরের নেশা জমাট হইয়া উঠিয়াছে সুলেখিকা গিরিবালা দেবী গল্পটিতে তাহাই দেখাইয়াছেন।]

পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে পা দিয়াই খঞ্জনা চকিত বিস্মিত হইল। তাহাদের রন্ধনশালার পশ্চাতে টিনের কুটীরে বেহালার সুরের সহিত স্বর মিলাইয়া কে যেন গান গাহিতেছে।

যেখানে সন্ধ্যায় মিট মিট প্রদীপ জ্বলে, কচ্চিৎ মৃদু বাক্যালাপ বাতাসে ভাসিয়া আসে, সেইখানে যন্ত্রের সহিত সঙ্গীতালাপ, খঞ্জনাকে একটুখানি ভাবাইয়া তুলিল।

অল্পদিন হইল কাহারা যেন খঞ্জনাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার পশ্চাতে গুটি কয়েক টীনের ঘর করিয়া বাস করিতেছিল। কুটীরে দুই তিনটি স্ত্রী পুরুষ ব্যতীত লোক নাই, কলরব নাই, আনন্দ উৎসব বিহীন বাড়ীটির দিকে তাকাইলেই খঞ্জনার চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যাইত।

বিরাগের এক ক্ষুদ্র ইতিহাসও আছে। পাড়ায় নব গৃহ নির্ম্মাণ হইলে, নবাগতারা আগমন করিলে সর্ব্বাগ্রে সে স্থানে খঞ্জনার ছুটিয়া না গেলে চলিত না। চপল স্বভাবের অদম্য কৌতুহলের সহিত অন্য একটি গৌরব বালিকার সুকুমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিত।

ধরিতে গেলে তাহারাই এ অঞ্চলে আদিম নিবাসী। ঢাকুরীয়া লেক সৃষ্টির পূর্ব্বে খঞ্জনার বাবা ভুবনবাবু বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাদের নূতন গৃহ সম্পূর্ণ হইবার পরে লেক হইল। বনাবৃত প্রান্তরের বক্ষ ভেদিয়া ইটের পর ইটের সারিতে অরণ্যের শ্যামল শোভা বিমলিন হইয়া গেল। হোক, তাহাতে খঞ্জনার দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই। কিন্তু তাহারাই যে এখানকার প্রথম এবং অদ্বিতীয় অকৃত্রিম এ তথ্যটুকু সকলের নিকট প্রচার না করিলে চলিবে কেন?

এই মহৎ উদ্দেশ্যে লইয়াই সে একদিন কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহস্বামিনী তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ না করিয়া তাহা হেন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশিনীকে লক্ষ্যের ভিতর না আনিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে রাগ, অপমান খঞ্জনা এখনও ভুলিতে পারে নাই। সেকি এতই সাধারণ, এতই সহজলভ্য। তাহার বাবা, অফিসের বড় বাবু, তাহাদের কি সুন্দর বাড়ী, বাগান। মা বলিয়াছেন সমস্তই খঞ্জনার তাহার আর ভাই নাই। বোন নাই। সেই সর্ব্বস্বের মালিক। তাহাদের কত আসবাব, দাস দাসী। সে সকলেরই আদরের ধন, নয়নের মণি। বাবার খঞ্জনা, মার খঞ্জনি, বাবার বন্ধুদের খুকুমণি, দাসদাসীর দিদি। এমন যে খঞ্জনা, তাহারই মুখের উপর ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ-করা। সেইজন্য খঞ্জনা কুটীর কয়েকটির সহিত কুটীর বাসীদিগকে সুদূরে নির্ব্বাসন কামনা করিত।

তাহার কর্ম্মফলের পরিবর্ত্তে সঙ্গীতের সুললিত ঝঙ্কারে অশান্ত মেয়েটির অন্তরে অসন্তোষের সীমা রহিল না।

খঞ্জনা ত্বরিত পদে সিঁড়ি কয়েকটা অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইল। অনতিপ্রশস্ত রাস্তার উপরের ক্ষুদ্র ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা খোলা। কেওড়া কাঠের চৌকিতে বসিয়া ম্লান দীপালোকে যে গান গাহিতেছিল, তাহাকে ভাল দেখা না গেলেও সে যে তরুণ বয়স্ক সেটা অনুমান করিতে খঞ্জনার বিলম্ব হইল না।

কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে গায়ককে নিরীক্ষণ করিবার খঞ্জনার সময় হইল না। উত্তরের বারান্দায় ম ছায়ান্ধকারে বসিয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিল। মা দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র খঞ্জনা অভিমানে আক্রোশে ফুলিতে লাগিল।

প্রতি দিন মেয়ে বেড়াইয়া ফিরিলে মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করে

আজ তাহার কিছুই না করিয়া এক ভিক্ষুকের গান শুনিয়া তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। মা যেন জন্মে গান শোনেন নাই, এই প্রথম শুনিলেন, এমনি ধারা ভাবখানা। খঞ্জনা প্রকাশ্যে গান গাহে না বটে, গাহিলে উহার চেয়ে ঢের ভাল গাহিতে পারে।

কেবল কি মা, সোহাগী ঝিটার আক্কেল দেখ, কলতলায় বাসনের কাঁড়ি সামনে লইয়া মজা করিয়া গান শুনিতেছে।

খঞ্জনা ঈর্ষা ও বিদ্বেষ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। উচ্চ সুতীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল, সোহাগী।

এ কলকণ্ঠ ধ্বনি সকলেরই পরিচিত, শুধু পরিচিত নহে, সকলেই ইহাকে রীতিমত ভয় করিয়া থাকে।

সোহাগীর গানের নেশা ছুটিয়া গেল। সে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ছুটিতে ছুটিতে সাড়া দিল, আসচি দিদি, তুমি কখন বেড়িয়ে ফিরলে গো কিচ্ছুটি টের পাই নি?

মা চমকিয়া মেয়ের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—বেড়ানো হল খঞ্জনি? এবেলা কোন কোন বাড়ী গিয়েছিলিরে?

মার স্নেহসম্বোধনে মেয়ের চিত্তের জ্বালা বিন্দুমাত্রও কমিল না। খঞ্জনা রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, এতক্ষণে জিজ্ঞেস করতে এলেন। আমি অন্ধকারে রয়েচি, কারুর আলো জেলে দেবার নাম নেই, গান শোনা হচ্ছে। যে ছিরির গান, কেউ আবার এমন গান শোনে? ছাই গান, গাধার গান।

সোহাগী ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে পাশের কুটীর আলোময় হইয়া গেল।

গান শেষ না হইতেই শেষ করিয়া গায়ক উপরের দিকে চাহিল। উতলা পবন তাহার কর্ণমূলে পৌঁছাইয়া দিল—ছাই গান, গাধার গান।

ছেলেটির নাম পুলিন। পুলিন সকৌতুকে দীপ্ত নয়না গর্ব্বিতা বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বাঁকা ঠোঁট দুইটিতে বিদ্রূপের হাসি খেলা করিতে লাগিল।

পিতৃমাতৃহীন পুলিনের সংসারে গৌরবের বস্তু কিছুই ছিল না। থাকিবার ভিতর ছিল তাহার স্বভাবের তেজস্বিতা, স্বাধীনচিন্তা, আর সঙ্গীত বিদ্যার সাফল্য। দিল্লীপ্রবাসগত মাতুলালয়ে থাকিয়া সে লেখা পড়া শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহার খ্যাতি হইয়াছিল সঙ্গীতে। তাহার নূতন ঢং এর খেয়াল টপ্পায় বড় বড় ওস্তাদ বাহবা দিয়াছেন। সভাসমিতিতে তাহার আহ্বান আসিয়াছে। অনেকগুলি সোণারূপার পদকও সে লাভ করিয়াছে। অতি বড় নিন্দুকও পুলিনের গানের নিন্দা করিতে পারে নাই। সেই গান ছাই গর্দ্দভ রাগিণী আখ্যায় পুলিনের তরুণ মন কৌতূহলে উচ্ছসিত হইল।

গায়ক যে গান থামাইয়া খঞ্জনাকে নিরীক্ষণ করিতেছে ইহাও খামখেয়ালী বালিকার সহিল না। দেখিতে হয়, অন্যখান হইতে দেখুকনা কেন? গাহিতে হয় আর কোথায়ো বসিয়া গাহুক না কেন? টিনের চালায় এত সমারোহ কিসের? যে ঐ অসভ্য লোকদের মধ্যে আস্তানা লয়, সেও যে অসভ্য ইতর।

মা'র অমনোযোগ, সোহাগীর অবহেলায় যে হৃদয়ে ক্রোধ বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহাতে অকস্মাৎ দক্ষিণা বাতাসের পরশ লাগিল।

খঞ্জনা তারস্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, সোহাগী, সং দেখচিস নাকি? জানালা গুলো বন্ধ করে দেনা। এতক্ষণ কাণের মাথা খেয়ে এখন আবার চেয়ে দেখা হচ্ছে।

ইহার পর পুলিন ঘরে থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

সোহাগী সরিয়া গিয়া সবিস্ময়ে বলিল, কৈগা দিদি, কারুকে দেখচি না, খালি তক্তপোষটা খাঁখাঁ করচে।

খঞ্জনা সোহাগীর গায়ে চিমটি কাটিয়া চেঁচাইয়া উঠিল তক্তোপোষটা খাঁ খাঁ করচে।

মা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাবা আফিস হইতে ফিরিয়া ডাকিলেন, খঞ্জুমা—

মেয়ের যত রাগ অভিমান মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। খঞ্জনা সোহাগীর প্রতি অত্যাচার, মা'র প্রতি অবিচার করিলেও বাবার উপর অকরুণ ছিল না। ভুবনবাবুকে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত, সকলের সম্বন্ধে সারাদিনের অভিযোগ জমা করিয়া রাখিত।

কর্ম্মান্তে গৃহে ফিরিয়া ভুবনবাবু সমস্তই শুনিতেন।

শুনিয়া প্রতিদিনই খঞ্জনার সপক্ষে রায় দিতেন। এই এক তরফা রায়ের নিমিত্ত খঞ্জনা পিতার প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া থাকিত।

ভুবনবাবুর সাড়া পাইয়া খঞ্জনা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা বাবা মা এত গান ভালবাসে কেন? শোনা মাত্তর হাঁ করে শুনতে থাকে?

নিত্য নৈমিত্তিক অনুযোগের পরিবর্তে এ অভিনব প্রশ্নে ভুবনবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। উত্তরের তারতম্যে প্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনায় তাঁহাকে একটুখানি চিন্তা করিতে হইল।

অধীর খঞ্জনার বিলম্ব সহিল না, সে পুনরায় কহিল, দেখ বাবা, আমি কাল থেকেই গান শিখবো? তোমাকে কালকেই কিন্তু আমার ভাল ওস্তাদ ঠিক ক'রে দিতে হবে। আজে বাজে লোক হলে চলবে না বাপু, খুব ভাল ওস্তাদ?

ভুবনবাবু আশ্বস্ত হইয়া জবাব দিলেন, তাই দেব খঞ্জনা; ভাল কথা; বেশ কথা তুমি গান শিখবে। ভাল ওস্তাদের অভাব নেই। তোমার পিসে মশায় সুকান্তবাবু বড় গাইয়ে, তাঁর কাছে কত গাইয়ে বাজিয়ে আসে যায়। তাঁকে বল্লেই তিনি তোমার ওস্তাদ পাঠিয়ে দেবেন।

খঞ্জনা খুসী হইল। আনন্দের আতিশয্যে তাহার চক্ষে আজ সহজে ঘুম আসিল না। সে গান শিখিয়া কেমন গাহিবে? ঘনবৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া কোকিল যেমন পঞ্চমস্বরে চারিদিকে পুলকের উচ্ছাসের প্লাবন বহাইয়া দেয় খঞ্জনা কি তেমনি গাহিতে পারিবে না? কোকিলের মত না হইলেও ঐ ছেলেটার মত তাহাকে গাহিতেই হইবে; শিখিতেই হইবে। টিনের কুটীরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারিলে তাহার নাম খঞ্জনা নহে।

ভোরের বেলা গানের স্বরে খঞ্জনা জাগিল। পুলিন স্বরের খুটিনাটি গোছ গাছ করিতে করিতে গানের একটি চরণ গাহিয়াই থামিয়া গেল। খঞ্জনা বিছানায় শুইয়া ক্ষুণ্ণ হইল; অসন্তুষ্ট হইল, গাহিতে পারেন বলিয়া ছেলেটার দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। নিজে নিজেই গান ধরিয়া তখুনি থামিয়া যাওয়া ইহাকে কেহ গান বলে নাকি?

খঞ্জনা বিরক্ত হইলেও মনে মনে আশা করিতেছিল পুলিন হয় তো আবার গাহিবে। তাহার মিষ্টি মধুরস্বরে চারিদিক সচকিত হইবে। কিন্তু কেহ গান ধরিল না খঞ্জনা উঠিবার পূর্ব্বে দ্বারে তালা লাগাইয়া ছেলেটা কোথায় যেন বাহির হইয়া গিয়াছিল। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল তবু ফিরিয়া আসিল না।

দশটায় খঞ্জনার স্কুল। খঞ্জনা নীচু ক্লাসে পড়িলেও স্কুল কামাই করে না। কামাই না করিবার একটা কারণও আছে। তাহার সঙ্গী সাথীদের সুচারু সমাবেশ এক স্কুলেই হইয়া থাকে। তেমনটি অন্য কোথাও হইবার সম্ভাবনা নাই। লেখা পড়া শিখিতে না হোক কিন্তু সঙ্গিনী সম্মিলনীতে তাহাকে নিত্যই হাজিরা দিতে হয়।

বেলা প্রায় চারিটার সময় সর্ব্বাঙ্গে কালিধুলা মাখিয়া খঞ্জনা ফিরিয়া আসিল। এইসময় মা'র ভাবনা ও সোহাগীর ভয়ের সময়।

শাড়ী বদলানো হইতে জুতার বোতাম খোলা লইয়া সোহাগীর লাঞ্ছনা, খাবার লইয়া মার সহিত আবদার অনর্থ। মা অনেক চিন্তা করিয়াও মেয়ের অনাসৃষ্টি খেয়াল, বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সন্তোষ সাধনের শত চেষ্টা তাঁহার বার বার বিফল হইয়া যায়। হাঁ, মেয়েটি বিষম আবদেরে এবং চঞ্চল স্বভাবের। রাগিলে রণচণ্ডী, শান্ত থাকিলে স্নিগ্ধ সলিলা, হইবে না কেন? সচ্ছল সংসারের একটি মাত্র মেয়ে যে। বয়সও বেশী নয়, সবে তেরো যাই যাই করিতেছে। অল্প জলেই তরঙ্গ অধিক। গভীর নীরে অশান্ত ঢেউ কেমন মাতামাতি করে না।

মেয়ের পদশব্দে মা সামনে আসিলেন। সোহাগী মসীলিপ্ত বই কয়েক খানি এক হস্তে লইয়া অপর হস্তে জুতা খুলিয়া দিতে লাগিল।

আজ তুচ্ছ ত্রুটী বিচ্যুতিতে মনঃসংযোগ করিবার খঞ্জনার অবকাশ হইল না। খঞ্জনা দ্রুতপদে বাতায়ন সমীপে উপনীত হইল।

মুক্তদ্বার, চৌকীর উপর একগাদা কাগজের মধ্যে পুলিন শুইয়া আছে। কোণের দিকে একটি ষ্টোভ, জলের বাল্তি ও কুঁজা। একখানা কলাইকরা থালার উপর একটি গেলাস।

পশ্চিমের ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে এক অঞ্জলি পড়ন্ত রৌদ্র বালিসে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। রৌদ্রের আভায় ছেলেটির তরুণ মুখখানি মন্দ দেখাইতেছে না।

তন্ন তন্ন করিয়া খঞ্জনার কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করা হইল না, মা খাবার সাজাইয়া আনিলেন। সোহাগী হাতমুখে সাবান দিতে ডাকিলে কি জানি কোন সময় সঙ্গীতের আরম্ভ, তাই বিনা ওজোরে বিনা আপত্তিতে খঞ্জনা বেশভূষা করিয়া, জলযোগ সারিয়া লইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, খঞ্জনি, রামসিং তৈরি হয়ে রয়েচে বেড়াতে যাবি না?

মেয়ে বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখে জবাব দিল, না, রোজ রোজ বেড়াতে ভাল লাগে না। মুলতাদি তিনটে অঙ্ক দিয়েচেন কষতে হবে।

অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি মেয়ের প্রবল অনুরাগে মা আশ্চর্য্য হইলেন।

জানালার সম্মুখে চেয়ার টেবিল টানিয়া লইয়া খঞ্জনা আঁকের খাতায় মনঃনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার চঞ্চল মন ধাবিত হইল, বিশেষ গৃহের বিশেষ ব্যক্তিটির পানে। মাগো, ছেলেটা কি আলসে, কুঁড়ের বাদ্‌শা যেন, গান গাহিতে জানিস যখন, তখন শুধু শুধু বিছানায় না গড়াইয়া দুটো গান গাহিলেই তো বেশ হয়?—

ক্ষণকাল পর বেশ হইল। সন্ধ্যার ম্লানছায়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুলিন তাহার বেহালা লইয়া বসিল। বেহালার করুণ কোমল সুরের সহিত পুলিনের সুধাকণ্ঠ মিশিয়া আকাশে বাতাসে সন্ধ্যার স্তব্ধ নিরালার বুকে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল রচনা করিতে লাগিল।

খঞ্জনা মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন। একখানি গান শেষ হইলে বিরতির সময় খঞ্জনার জ্ঞান হইল। মা কোথায় গেলেন? সোহাগী কি করিতেছে?

মা ও সোহাগীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে মেয়ের বিলম্ব হইল না। মা ভাঁড়ারে ঢুকিয়া আকুল আগ্রহে গান শুনিতেছিলেন। সোহাগী পানের বাটা সামনে লইয়া তাকাইয়া ছিল অপর দিকে।

খঞ্জনা সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, মা, তুমি এখানে কি করচ? আমি ভয়ে সন্ধ্যেবেলা একলা ওপরে রয়েচি। তুমি চুপে চুপে ছাই ছাই গান শুনচো? আমি তো বলেচিই গো, গান শিখবো, কত ভাল গাইবো দেখে নিয়ো।

অপরাধিনী মা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, গান শোনা নয় খঞ্জনি, একটু কাজ ছিল তাই—

খঞ্জনা মাকে অব্যাহতি দিয়া সোহাগীর পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল, পান সাজতে নিয়ে গান শোনা হচ্ছে। আমাকে খালি ঘরে রেখে কেন তুই এখানে রয়েচিস? বড্ড আহ্লাদ হয়েচে না?

সোহাগী কি বলিল তাহা খঞ্জনার শোনা হইল না। সোহাগীকে ছাড়িয়া সে এক দৌড়ে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। তখন কীর্ত্তনের সুর বিনাইয়া বিনাইয়া অমৃত বর্ষণ করিতেছে—

"সখী, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ।"

গান থামিলে ভুবনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। খঞ্জনা কিছু বিমনা বিমর্ষ। মেয়েকে আনন্দ দিতে উৎসাহ দিতে বাবা কহিলেন—সুকান্ত বাবুকে বলেছি খঞ্জুমা, তিনি ওস্তাদ ঠিক করে দেবেন। তুমি গান শিখবে শুনে তিনি ভারী খুসী হয়েচেন। বল্লেন খুকুমণি সুরু করুক তারপর আমি মাঝে মাঝে যেয়ে তাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

খঞ্জনা প্রসন্ন হইয়া কহিল, তিনি তো ভাল ওস্তাদ ঠিক করে দেবেন বাবা! আমি মস্ত বড় ওস্তাদ চাই। শিগ-গীর করে দিতে বলেচতো।

হাঁ, খঞ্জনা, শিগ্‌গিরই দেবেন। ভেতরে এসে তোমায় গান শেখাবে তা ওস্তাদ না হলে চলবে না।

দুইদিন পর বাবা প্রীতি প্রফুল্ল কণ্ঠে ডাকিলেন, খঞ্জুমা, তোমার ওস্তাদ পরশু থেকে তোমায় গান শেখাতে আসবে। তার গান তোমরা নিশ্চয় শুনেচ! আমাদের

পিছনের টীনের ঘর সে ভাড়া নিয়ে রয়েচে। সুকান্ত বাবুরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ছেলেটির নাম পুলিন, চাকরীর চেষ্টায় এখানে এসেচে। বাপ মা, নেই। খুব ভাল ছেলে।

মা নিকটেই ছিলেন তিনি উল্লসিত হইয়া কহিলেন, পুলিনকে আমরা দেখেচি। রোজ সন্ধ্যা বেলা গানও শুনচি। দেখলেই মায়া হয়। ছেলেটি সকালে উঠেই বেরিয়ে যায়, ফেরে দুপুরের পর। সকালের দিকে বোধ হয় কোথায়ো কাজ টাজ করে।

কাজ এখনো পায়নি, তাই খবরের কাগজ বিক্রি করতে বের হয়। ওর মামারা বড় লোক, অনর্থক তাদের অন্ন ধ্বংস না করে পুলিন নিজের পায়ের ওপর নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করচে। এই সব ছেলেরই উন্নতি হয়, এরাই প্রকৃত মানুষ। আমার ক্লাব থেকে ফিরতে দেরী হয় বলে এ অবধি ওর গান শুনি নি। তোমরা তো পুরাণো করে দিয়েচ!

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, পুলিনের গান পুরাণো হয় না গো, মনে হয় জীবন ভোর শুনি। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি অনেকদিন থেকেই এমনি একটি ছেলে খুঁজছিলাম। যাকে এখন থেকে দেখে শুনে রাখবো। গড়ে পিটে উপযুক্ত করে নেব। তার পর সময় হলে সেই হবে আমাদের ছেলে।

মার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত খঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিলনা। দুষ্ট বুদ্ধিতে সে পরিপক্কতা লাভ করিলেও এ বিষয়টি তাহার সুকুমার হৃদয়ে রেখা পাত করিতে পারে নাই। পারিবে কি করিয়া তেরোবছরের ছোট্ট মেয়েটি যে!

মেয়ে ছোট হইলেও তাঁহার জেদ ছোট নয়। সে সবেগে মাথা নাড়িয়া তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলিল, না বাবা, আমি ওর কাছে গান শিখবো না। ও কেন ওদের টিনের ঘরে থাকে? আর মুল্লুকে জায়গা পেল না? ওর চেয়ে বড় ওস্তাদ তুমি আমায় ঠিক করে দাও আমি তার কাছে গান শিখবো।

আশ্চর্য্যের বিষয় বালিকার সরল অন্তরে একবারও উদয় হইল না পুলিন যদি টিনের বাড়িতে না থাকিত না আসিত তাহা হইলে সে পুলিনকে কোথায় দেখিত? তাহার সঙ্গীত প্রভাবে কি রূপেই বা মন্ত্র মুগ্ধ হইত?

খঞ্জনার মাথা নাড়ার অর্থ পিতা মাতার অগোচর ছিল না। মস্তক ছোট হইলেও তাহার সঞ্চালন ছোট নহে।

উভয়ে দুঃখিত হইলেন ক্ষুব্ধ হইলেন। ভদ্রলোককে কথা দিয়া কথার অন্যথায় লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কি?

কয়েক দিন খঞ্জনার ওস্তাদ আসিলেন। নূতন বাদ্য যন্ত্র আসিল, প্রতি সন্ধ্যায় মহা সমারোহের সহিত সারে গা মা চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে মুস্কিল হইল—আর একটা বিষয়ে।

পুলিনের নির্দ্দিষ্ট গানের সময়টিতেই খঞ্জনার ওস্তাদ আসেন। রাস্তার ওপারের স্বরলহরী শ্রবণমূলে প্রবেশ করিবামাত্র খঞ্জনার বেসুরো ভীরুকণ্ঠ, তাল, মান, মাত্রা একেবারে গোলমাল হইয়া যায়। নির্জ্জন কক্ষের অন্ধকার বাতায়ন তলে তাহাকে টানিতে থাকে। কিছুতেই সে মনসংযোগ করিতে পারে না, স্থির হইতে পারে না। তাহার গলায় অমন সুর বাজে না কেন? ওকি সুর? বিধাতা বিরচিত বৃক্ষের শ্যামল সবুজ পত্রাবলী? না, তটিনীর উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ রাশি? ছোট নাই, বড় নাই, ঘাতে প্রতিঘাতে সমতালে প্রবাহিত।

খঞ্জনা কবে উহার মত গাহিতে পারিবে? সুরের মূর্চ্ছনা মীড়ে সকলকে অভিভূত করিবে? পারেনা, বলিয়াই একটা নিস্ফল বিরাগে বিদ্বেষে খঞ্জনার চিত্ত ভরিয়া যায়। নানা ছল ছুতায় তাহাকে বারবার উঠিতে হয়। জানালার পাশে দাঁড়াইতে হয়। ফলে প্রাণ ভরিয়া পুলিনের গান শোনা হয় না। নিজের শিক্ষাও হয় না।

এমনি করিয়া সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইবার পর খঞ্জনা ভুবনবাবুকে ধরিল, বাবা, আমি এ ওস্তাদের কাছে শিখবো না, দাড়িওয়ালা বুড়ো, আমার ভালো লাগে না। আমাকে অন্য ওস্তাদ এনে দাও।

ভুবনবাবু হাসিলেন, পাগল, উনি নামজাদা ওস্তাদ খঞ্জুমা; লোকও ভাল। ব্যাটাছেলের দাড়ি থাকবে না? মানুষ বুড়ো হবে না? আমিও তো দুদিন পরে ওঁর মত হব তখন কি করবে লক্ষ্মী?

তুমি কক্ষনো দাড়িওয়ালা হবে না বাবা, বুড়ো হলেও তুমি যে বাবা, বাবাই থাকবে। আমি কিছুতেই ওর কাছে গান গাইব না। তিন সত্যি ঘরে তোমায় বলে দিলাম।

স্নেহ বিহ্বল পিতা নিরুপায়। প্রবীণ ওস্তাদের পরিবর্ত্তে সুদর্শন নবীন ওস্তাদ আসিলেন। সময় স্থির হইল, প্রতি রবিবারে সকাল হইতে বেলা দশটা অবধি।

ইহাতেও খঞ্জনার মনের খুঁত খুঁত ঘোচে না। নবীন ওস্তাদের সহিত স্তিমিত দীপালোকে তরুণ সুরসাধকের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি তুলনা করিয়া তাহার হৃদয় বিক্ষিপ্ত বিষণ্ণ হইয়া যায়। ইহার আবার গলা, ইহার আবার গান? ভাঙ্গা মোটা সুর, হাঁড়ির ভিতর মুখ লুকাইয়া যেন বাঘ ডাকিতেছে।

পছন্দ না হইলেও খঞ্জনাকে বাদ্য যন্ত্রের সামনে বসিতে হয়, পঞ্চমস্বর সপ্তমে তুলিয়া গলা সাধিতে হয়। দিনের পর দিন যায়।

সেদিন কি পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুলের ছুটি। খঞ্জনা সারা সকালটি পুলিনের কুটীরে আঁখি দুটি পাতিয়া বসিয়াছিল।

এত বেলায় খঞ্জনা সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল, সোহাগী অঞ্চলে বদ্ধ চাবী দিয়া ঘরের তালা খুলিল। চারিদিক ঝাড়া মোছা করিয়া, রাস্তার কল হইতে কুঁজা ভরিয়া আনিল, বাল্‌তিতে জল ধরিয়া রাখিল।

সোহাগী ফিরিয়া আসিলে খঞ্জনা তাহাকে চাপিয়া ধরিল, কেন তুই ওখানে গিয়েছিলি? এত দরদে তোর কিসের দরকার? যাবি কেন?

ইহা সোহাগীর নূতন অভিযান নহে, কিন্তু এত দিন ধরা পড়ে নাই। আজ ধরা পড়িয়া সে মরিয়া হইয়া সত্য কথাই কহিল, সাধে কি গিয়েছিনু দিদি, ভদ্দর লোকের ছেলে, চাকুরী পায় না, কাগজ বেচে। আপনার হাতে ঘর ঝাড় দেয়। জল তোলে, কলের চুলোয় ভাতে ভাত রেঁধে খায়। বড্ড মায়া লাগছিল দিদি; তাই বন্নু, দাদা বাবু, তোমার ঝাড় পাট জলতুলে আমিই দেব। শুনে শুধালে আমার কাজের জন্যে তোমায় ক'টাকা দেব ঝি? লজ্জায় মরে যাই, আমি কইলাম টাকার তরে আসিনি দাদাবাবু? তুমি নিত্যি হরিনাম শোনাও, তারি লোভে এসেছি।

খঞ্জনা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা যেন হল? তোর আঁচলে ওর তালার চাবি থাকে কেন লা?"

সোহাগী ভয়ে ভয়ে কহিল, তালার দুটো চাবি আছে কিনা, দা'বাবুর ঠাঁই থাকে, একটা আমি রেখেচি। আমার ফুরসৎ মতন কাজ সেরে রাখবার তরে।

খঞ্জনা আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। এত বড় অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহার চুলে হাত উঠিল না। পিঠে চাপড় পড়িল না দেখিয়া সোহাগী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কাজে চলিয়া গেল।

খঞ্জনা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, ভাতে ভাত রাঁধিয়া খায়, পথে পথে কাগজ বিক্রি করে, বাবা নাই, মা নাই। তাহার কোমল মর্ম্মস্থলে একটি তীক্ষ্ণধার কাঁটা বিঁধিয়া রহিল।

তাহাদের এত বড় বাড়ী, কত ঘর খালি পড়িয়া আছে। বাবা ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতে দেয় নাই। হইলে এমন লুকাইয়া চুরি করিয়া তাহার গান শুনিতে হইত না। সে দিবারাত্রি গানের সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে পারিত। টিনের বাড়ীর অধিবাসীরা দুয়ার জানালা খুলিয়া তাহাদের গৃহের পানে ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া রহিত।

খঞ্জনার এলো মেলো চিন্তার মধ্যে দিয়া আরো এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

মেঘম্লান সন্ধ্যা, টিপটিপি বৃষ্টি ঝরিতেছে। বাতাস মুখর, সময় উত্তীর্ণ হইল কিন্তু সঙ্গীত ঝঙ্কারে নিস্তব্ধ মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা রোমে রোমে পূর্ণ হইল না। বিফল প্রতীক্ষায় খঞ্জনার সময় কাটিতে চাহে না। অবশেষে সোহাগীর ডাক পড়িল।

সোহাগী বলিল এবার হরিনাম শোনা ফুরালো দিদি, দাদাবাবু ভোরেই মাণিকতলা, না পটোল ডাঙ্গায় চলে যাবে। সেখানে এক বড় লোকের মেয়ের গানের মাষ্টার হবে। তাদের বাড়ীতেই থাকবে, খাবে। বড্ড ভাল মনিষ্যি দিদি, আমায় বল্লে, ঝি তুমি খুব ভাল,

আমার কত গচে, চৌকি বাল্‌তি সব আমি তোমায় দিয়ে গেলাম। আমার আর দরকার নেই।

খঞ্জনা সোহাগীর কতক কথা শুনিল, কতক শুনিল না। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ এক অজানা ব্যথায় খচ খচ্‌ করিতে লাগিল।

সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। খিড়কির দুয়ার খুলিয়া যন্ত্র চালিতের মত পুলিনের কুটীর দ্বারে উপনীত হইল।

পুলিন বাজনাগুলি বাক্সজাত করিতেছিল।

খঞ্জনার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সে চকিত বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিল, কি খঞ্জনা এসেচ? এস, এস, এখানে বোসো।

খঞ্জনা বসিল না। পুলিনের নিকটস্থ হইয়া বলিল আপনি নাকি কা'ল চলে যাবেন?

হাঁ, যেতে হবে। একটা কাজ পেয়েচি, কাগজ বিক্রি নয়, গানের টিউশানি। তোমাদের এদিকটা আমার বেশ লাগছিল, দিব্যি নির্জ্জন, কিন্তু থাকতে পারলাম না।

আপনি আমার বাবার কাছে চলুন। আমাকে গান শেখাবেন, এ পাড়া ছাড়তে হবে না?

পুলিন হাসিয়া কহিল আমি তোমাকে গান শেখাবো খঞ্জনা? আমার ছাই গান, গাধার গান, তোমার ভাল লাগবে কেন? একদিন রেখেই তাড়িয়ে দেবে আর শিখতে চাইবে না?

না, মিছে কথা, আপনার সুন্দর গান। আমি আপনার কাছে চিরকাল গান শিখবো। আপনি যাবেন না, আপনার যাওয়া হবে না। আমি যেতে দেব না। বলিতে বলিতে খঞ্জনা তাহার কোমল কিশলয় তুল্য বাহু বাড়াইয়া পুলিনের ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

মানুষ

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

আমরা মানুষ যাদুকর জাতি জানি গো,
নারায়ণে হেতা নর করে মোরা আনি গো।
সুধার পিয়াসী আমরা চকোর,
এপারে ওপারে বাঁধি প্রেম ডোর,
সুদূরের চাঁদে কর ধরে মোরা টানি গো।

২

কালে রাখি মোরা রঙের রেখায় পাকড়ি
আঁখরেতে রাখি ভাবের সাগর আঁকড়ি।
পাতের ঠোঙায় রাখি সুধা ধরি,
যমুনাকে রাখি ভরিয়া গাগরী,
স্বরগ মরত দেখে করে কানা কানি গো।

এত বড় আর কেহ নাই ভবে কেহ নাই।
মনের মানুষ দেহ থেকে তার দেহ নাই।
হৃদয়ে যাহারা ধরে ভগবান,
কেবা আছে বলী তাদের সমান।
কোথা পাব বল, 'এত বড় সন্ধানী গো।'

৪

মাটী ও সুধায় আমরা হয়েছি গঠিত
বিশ্বরূপের ছল-ছবি মোরা রচিত।
ভান করে ভাই মানুষে চিনিস্‌,
দেবতারে সে যে দেখার জিনিষ'
বলিহারী যায় যে করেছে আমদানী গো।

অপরাজেয়

গল্প

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মহারাজ বিক্রম সিংহের একমাত্র বালক পুত্র বীর সিংহ কঠিন পীড়ায়,আক্রান্ত। কঠোর মৃত্যু এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছে—নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য নিয়ে।

সমস্ত রাজধানী নীরব নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের ভিতরে বাহিরে নিকটে দূরে চতুর্দ্দিকে নরনারী শঙ্কাকুল চিতে অতি সন্তর্পণে চলছে। বিশাল সিংহদ্বারের সম্মুখে বিষণ্ণ বদনে অগণিত প্রজাপুঞ্জ—বালক বৃদ্ধ নর নারী প্রহরের পর প্রহর ধরে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের প্রিয়তম যুবরাজের এতটুকু শুভ সংবাদ শোনবার জন্য। মন্দিরে মন্দিরে দেব দেবীর চরণে ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা করছেন—রক্ষা কর—রক্ষা কর ঠাকুর—রাজ্যের আলো ঐ মঙ্গল দীপশিখাটিকে দীর্ঘায়ু কর।

রাজপথে যান বাহনের শব্দ নেই।—জন কোলাহল মুখরিত রাজপ্রাসাদ নীরবে শ্বেত পর্ব্বত স্তূপের মতন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে—ভাবী অকল্যাণ আশঙ্কায় প্রাসাদের কক্ষটী যেন শঙ্কার দীর্ঘশ্বাসে বাষ্পরুদ্ধ বিষাদক্লিষ্ট। অমাত্য, সভাসদ, শান্ত্রী প্রহরী দাস দাসীগণ জলভারাক্রান্ত নেত্রে আপনাপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করচে আর আকুলকণ্ঠে বলছে—রক্ষা কর —হে সর্ব্বশক্তিমান রক্ষাকর।

প্রাসাদের প্রান্তস্থিত বিশাল কক্ষে চিকিৎসকগণ উষ্ণ মস্তিষ্কে আলোচনায় নিমগ্ন। যুবরাজের শস্ত্র ও শাস্ত্র গুরু উত্তেজিত হৃদয়ে কক্ষের বহির্দ্দেশে পাদচারণ করছেন। যুবরাজের অদর্শনে তাঁর প্রিয় ঘোটকও অস্থির চিত্তে হ্রেষারব করে বারবার প্রভুকে স্মরণ করছে।

আর মহারাজ? কোথায় সেই প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ বিক্রম সিংহ! মহারাজ প্রাসাদের এক নির্জ্জন কক্ষে একাকী বদ্ধ দুয়ারে সজল চক্ষে দেবাদিদেব একলিঙ্গের চরণে প্রার্থনা করেছেন—রক্ষা কর হে সকল রাজার রাজা —হে রাজাধিরাজ হে সর্ব্বমঙ্গলময় রক্ষা কর। রাজার অন্তরের সে কাতরতা, রাজার হৃদয়ের সে আকুলতা কাহারও বুঝি দেখতে নেই—রাজার দুর্ব্বলতা বুঝি রাজার লজ্জা—রাজার অগৌরব! তাই নির্জ্জনে বসে মহারাজ তাঁর হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা নির্ব্বাণ করছেন অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত কোরে।

মহারাণী ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে, পুত্রের শয্যাপার্শ্বে প্রহরের পর প্রহর ধরে বিনিদ্র নয়নে, মৃত্যু দেবতার দ্বার রোধ করে বসে প্রহরা দিচ্ছেন। দরবিগলিত ধারায় তাঁর মুখমণ্ডল সিক্ত। মায়ের সজল বিশাল চক্ষুদুটি বলছে—মা যদি তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারতেন তা হলে মায়ের সে আনন্দ—ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দকে পরাজিত করতে পারত। হায় মৃত্যু! হায় কঠোর করাল তোমার গতিরোধ করতে মাতৃহৃদয়ের মহাশক্তিও পরাজিত।

মহারাণী পুত্রের ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। রাজার কাতরতায় প্রজার অকল্যাণ কিন্তু রাণী—তিনি যে জননী—স্নেহ মমতা কোমলতার যে তিনি প্রতীক। তিনি কি করে মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত রাজ্যের দুলাল নয়নের মণি পুত্রের শ্রান্ত মুখের পানে চেয়ে স্থির থাকবেন। মায়ের চক্ষের অশ্রু সমুদ্র কে রোধ করবে? ভগবান মায়ের অশ্রুবন্যায় শুনেছি তোমারও আসন টলে কিন্তু ঐ মৃত্যুদেবতা কি হৃদয়শূন্য চক্ষুকর্ণহীন তাঁর কাছে কি জীবন মরণ ছেলেখেলা। সন্তানের জন্য মায়ের আকুলতাও কি তাঁকে ব্যাকুল করতে অক্ষম? উঃ কী কঠোর—কি ভয়ঙ্কর রুদ্র দেবতা।

শ্বেত কমল কোরকের মতন যুবরাজ শুভ্র শয্যায় নিস্পন্দ। শয্যাপার্শ্বে জ্ঞানবৃদ্ধ রাজবৈদ্য তাঁর সর্ব্বশিক্ষা সর্ব্ব বুদ্ধি বিচক্ষণতা নিয়ে, দৃঢ় হৃদয়ে বসে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন—যুবরাজের প্রাণবায়ুটুকু স্বাধিকারে রাখতে।

রাত্রি শেষ প্রহর। ধীরে ধীরে যুবরাজ চক্ষু উন্মীলন করে' দেখলেন মহারাণীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত, বৈদ্যরাজ

চিন্তাক্লিষ্ট! যুবরাজের ওষ্ঠ নড়ে উঠল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, মা তুমি কাঁদচ'—? তুমি কি সত্যই মনে করেছ মৃত্যু আমার সন্নিকট?

মহারাণী পুত্রকে প্রবোধ দিবার ভাষা খুঁজে পেলেন না।

আশ্বাসের স্বরে যুবরাজ বললেন, কেঁদনা মা, ভুলে যেও না আমি রাজপুত্র—যুবরাজ। যুবরাজ কখন এমন করে' মরতে পারে না।

মহারাণীর অন্তরের আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হয়ে সারা কক্ষটিকে আলোড়িত করে' তুলল, অশ্রুর উৎস বক্ষ ছাপিয়ে চক্ষের বাঁধ ভেঙে দিল।

দৃঢ়কণ্ঠে যুবরাজ বলে উঠলেন, না না আমি পারব না তা সহ্য করতে—যুবরাজের রোগ ক্লান্ত কণ্ঠ সতেজে চীৎকার করে উঠল, আমি রাজপুত্র—যুবরাজ,'আমি জানি কি করে মৃত্যুর গতিরোধ করতে হয়—আমি যুদ্ধ করব।

ভিষকরাজ ভীত হয়ে উঠলেন। কম্পিত হস্তে যুবরাজের মুখে বোধহয় দিলেন—সূচিকাভরণ।

হঠাৎ উত্তেজনায় যুবরাজ শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবার গভীর নীরবতায় কক্ষ ভরে উঠল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। যুবরাজ নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন "মহারাণী"।

"পুত্র"।

এই মুহূর্ত্তে রাজসৈন্যের মধ্য হতে—দশজন বীর যারা প্রাণ তুচ্ছ করে জয়ের গৌরবে যুদ্ধ করতে পা ব সেই রকম দশজন সৈনিক সেনাপতির সঙ্গে আমার শয্যার চারিপাশে প্রহরায় নিযুক্ত করে দাও। আর প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সহস্র কামান অহোরাত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে স্থাপন করতে আজ্ঞা কর। তাদের বলে দাও এ যুবরাজের আদেশ তার পরেও যদি মৃত্যু আসে—সে আসবে তার নিজের দায়ীত্বে!

রাজপুত্রের আজ্ঞা মুহূর্ত্ত মধ্যে বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হল। নিঃশব্দে দশজন বীর সৈন্যের সঙ্গে সেনাপতি এসে দাঁড়ালেন—যুবরাজের শয্যার চারিধারে। যুবরাজের ম্লান ওষ্ঠ উজ্জল হাস্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। যুবরাজ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ সমগ্র রাজপ্রাসাদ যেন মৃত অজগরের মতন অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কোথাও সাড়া শব্দ নেই, কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই—। একটি জীবনের জন্য সমগ্র রাজপুরী যেন মৃত্যুর দ্বারদেশে যোড়হস্তে শেষ আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

যুবরাজের মুদ্রিত নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হল। সম্মুখে বৃদ্ধ সেনাপতি রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে। রাজকুমার অস্ফুট স্বরে ডাকলেন...সেনাপতি।

'যুবরাজ'। সেনাপতি নিঃশব্দে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে এলেন।

তোমার তরবারি?

সেনাপতি তাঁহার সুদীর্ঘ কোষবদ্ধ তরবারি স্পর্শ করলেন।

দেখি।

ধীরে ধীরে বহুযুদ্ধের গৌরব বহনকারি বিশস্ত তরবারি ম্লান আলোক রশ্মির পরশে ঝকমক করে—উর্দ্ধে উঠে সেনাপতির ললাট স্পর্শ করল।

যুবরাজের পাণ্ডুর গণ্ড গর্ব্বিত হাস্যে উজ্জল হয়ে উঠল। গর্ব্বোৎফুল্ল কণ্ঠে যুবরাজ বললেন, সেনাপতি তুমি এ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বীর, এ রাজ্যের কেন পৃথিবীর মধ্যে তোমাপেক্ষা বীর আর কাহাকে আমি জানি না। যদি মৃত্যু আমাকে নিতে আসে তুমি তাকে হত্যা করবে, আমার আদেশ—কোন দয়া কোন দাক্ষিণ্য তাকে দেখাবে না। পারবে? স্থির ধীর কণ্ঠে—সেনাপতি উত্তর দিলেন, নিশ্চয় পারব যুবরাজ। যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করলেন। দুই বিন্দু অবাধ্য অশ্রু সেনাপতির গণ্ড বয়ে গড়িয়ে পড়ল।

রাজবৈদ্য কুমারের নাড়ী পরীক্ষা করলেন। তাঁর দিকে যুবরাজ তাঁর মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, শুনেছি মৃত্যু এসে স্বর্গে নিয়ে যায়। স্বর্গ কোথায়?—কত দূরে। কারা বাস করে? এখানকার মতন সেখানেও কি রাজা আছে—রাজপুত্র আছে?

বিচক্ষণ বৈদ্যরাজের ললাটের শিরা স্ফীত হয়ে উঠল তিনি ধীরে ধীরে যুবরাজকে শোনাতে লাগলেন—স্বর্গের অপূর্ব্ব কাহিনী।

হঠাৎ যুবরাজ মধ্যপথে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন

আচ্ছা আমার বদলে যদি কেউ মরে আমার ভৃত্য যে আমাকে খুব ভালবাসে যদি তাকে অনেক ধন সম্পদ দেওয়া যায় সে কি মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে না—আমার বদলে ?

ভিষকরাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে যুবরাজের মুখে তাঁর জীবন ব্যাপী সাধনার শেষ অমৃত বিন্দু অর্পণ করে আবার বলতে লাগলেন—স্বর্গের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথা, অপ্সরী কিন্নরীদের রূপের উপাখ্যান। যুবরাজ নীরবে শুনতে শুনতে হঠাৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, আপনি যা বলছেন সবই বুঝতে পারছি কিন্তু—এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যুবরাজের পৌরুষ অপূর্ণ রেখে কেউ কি স্বর্গে যেতে চায় ? স্বর্গের সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও এ অভিযান বড়ই দুঃখের। তবে একটা সান্ত্বনা এইযে স্বর্গেও রাজা এবং রাজপুত্র আছেন। তাঁরা নিশ্চই আমার পদমর্য্যাদা আমার আত্মমর্য্যাদার যোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

যুবরাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় মহারাণীকে শান্তস্বরে বললেন, সম্রাজ্ঞী আমার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পরিচ্ছদ, আমার অজেয় তরবারি, মণিমুক্তা খচিত মুকুট এনে আমাকে পরিয়ে দাও, যদি আমাকে একান্তই স্বর্গে যেতে হয়; তাহলে যুবরাজের মতনই আমাকে সেখানে যেতে হবে।

উত্তেজনায় যুবরাজ অবশ হয়ে পড়লেন। তাঁহার অলস নয়ন যুগল মুদ্রিত হয়ে এল।

আবার নীরবতায় সারা কক্ষ—অসাড় হয়ে পড়ল। আলোর সাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার দূরে সরে যেতে লাগল, ভোরের হাওয়ায় রাজ উদ্যানের পুষ্পগন্ধ ভেসে এসে কক্ষ আমোদিত করে তুলল। রাজপুরোহিত ধীরপদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন—দেবতার নির্ম্মাল্য হাতে করে। নিঃশব্দে যুবরাজের শয্যা পার্শ্বে গিয়ে তাঁর কপোলে নির্ম্মাল্য স্পর্শ করে মঙ্গলময়ের পদে প্রার্থনা করলেন—কুমারের মঙ্গল। পুরোহিতের নির্ম্মল কর স্পর্শে যুবরাজ জাগরিত হলেন, ব্রাহ্মণ শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, কুমার মঙ্গলময় ভগবানকে ডাক—তিনি আশীষ দান করুন।

কিন্তু—যুবরাজের ক্ষীণ কণ্ঠ—অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে বললে, কিন্তু—তাহলে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা কি যদি মৃত্যুর কাছেই তাকে পরাজিত হতে হয়—

পুরোহিত রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ভগবান মঙ্গলময়।

যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করে উপাধানে মুখ আবৃত করলেন। গভীর নিঃশ্বাসে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠে পরক্ষণেই—স্থির হয়ে গেল। ভিষকরাজ চকিত হয়ে রাজপুত্রের মণিবন্ধ ধরে অনুভব করলেন—যুবরাজের জীবনী শক্তি!

দুই বিন্দু অশ্রু—গড়িয়ে পড়ল—ভিষকরাজের বিশুষ্ক গণ্ড সিক্ত করে।—

আগমনী

কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ

নিরমল নভোনীল
 উজলিত আলোকে
ধরণীর হিয়া আজি
 উছলিত পুলকে।
তারি মাঝে শুনি আজি
 চরণের ধ্বনি কার,
কার তরে আজি সবে
 খুলে দিল হৃদিদ্বার?
সমীরণ শিহরণে
 শেফালীর ঝর্ ঝর্

রচিল আসন কার
 বনভূমি মর্ম্মর?
মা এল দুয়ারে আজ
 নব আশা বহিয়া
শরতের শোভা সনে
 হাসিধারা ভরিয়া।
যাঁহার আসার আশা
 ছিনু সবে চাহিয়া গো
তাঁর তরে ফুলদল
 আনিয়াছি বাহি গো।

আধুনিকতা ও সাহিত্য

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

আধুনিক সাহিত্য বলিতে অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন সে সাহিত্যের কাল পঞ্জিকা দেখিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে কি সাহিত্য কি আর্ট ইহার কাল নির্দ্দেশ করা কঠিন। এইরূপ লক্ষিত হয় যে সব কবি বা নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক বহুপূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হয় তো অনেক আধুনিক লেখকের অপেক্ষা অনেক বেশী আধুনিক। আবার যাহারা বর্ত্তমানে লিখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক লেখক আছেন যাঁহারা এ যুগে জন্মিয়াও অতি পুরাতন হইয়া আছেন। ঋষি বাল্মীকি সীতা দেবীর মুখে যে কথা দিয়াছিলেন অর্থাৎ রাবণ যদি তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়াও থাকে তথাপি রামচন্দ্র তাঁহাকে অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—কারণ রামচন্দ্র উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন যে সীতার হৃদয় আত্মা রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহাকে জানে না। রামচন্দ্র সীতার এই উক্তির কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই, এ কথা যিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন তিনিই বলিবেন।

সাহিত্য যুগে যুগে নব পন্থী পুরাতন পন্থী লইয়া বিরোধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই বিরোধের কোন অর্থ নাই। বাল্মীকি যে কথা সীতার মুখে দিয়াছেন তাহা কোন অতি আধুনিকার মুখে দিলে কিছুমাত্র অশোভন হইত না। নবপন্থী বা পুরাতন পন্থী বলিয়া সত্যই কি কিছু আছে? প্রত্যেক যুগে নব নব বার্ত্তা সমস্যা লইয়া ধরণী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন—। কিন্তু সেই কারণে কি মানবের চরিত্রে যে চিরন্তন সত্য তাহা কি পরিবর্ত্তিত হয়? Herbert Spencer বলিয়াছেন That which the best human nature is capable of is within the reach of human nature at large—। মানবের মধ্যে যে মহৎ প্রবৃত্তি বর্ত্তমান তাহা কালের সভ্যতার অগ্রসরে কি একেবারে নির্ব্বাপিত হইতে পারে—? কখনই নহে। যিনি প্রকৃত আর্টিষ্ট তিনি কখনই পাপীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন না—পাপীর প্রতি সহানুভূতিই প্রবল হইয়া দেখা দেয়—মহাকবি Milton Satan এর দুঃখে কাঁদিয়াছেন মহাকবি মাইকেল রাবণের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছেন—ইহাই স্বাভাবিক—

আধুনিক সাহিত্যে একটী মহৎ লক্ষণ প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। সেটী হইতেছে ভ্রান্ত বা পতিতার চরিত্রে উজ্জ্বল রেখা অঙ্কন। ঋষি টলষ্টয় বিভিন্ন type এর মদ্যপায়ীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটী গুণ এতো প্রবল ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে যে উক্ত চরিত্রের মধ্যে তাহাদের লাম্পট্য বা অন্যান্য অনেক দোষ ত্রুটি সেই একটী গুণের প্রাবল্যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কুপ্রিণ তাঁহার জগৎ বিখ্যাত উপন্যাসে Gama the Pit—গণিকার জীবন অঙ্কিত করিয়া তাহাদের জীবনের কষ্ট দুঃখ নৈরাশ্য জলন্ত অক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকও এই কার্য্য করিয়াছেন।

অবশ্য ইহা সত্য যে আজকাল অনেক আধুনিক লেখকের মধ্যে সংযমের অভাব, অনেকের লেখার মধ্যে পাপের চরিত্র অঙ্কণে একেবারে Extreme এ যাইয়া থাকেন আর পুণ্যের চরিত্র আঁকিতে তাহাকে দেবতা গড়িয়া থাকেন। কিন্তু সাহিত্যে যাহাই মুদ্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই কালের বিচারে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে না যাহা থাকিবে তাহা নবপন্থীও নহে পুরাতন পন্থীও নহে—তাহা সত্য সুন্দর সনাতন।

কিন্তু একটী কথা আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন

আছে—আমাদের দেশে শুধু নহে সমস্ত জগতে আজ আর্ট যে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আধুনিক সাহিত্য যে নিম্নগামী এইরূপ আলোচনা প্রায়ই হইতেছে—। ইহার কি কারণ তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। শুধু আধুনিক সাহিত্যকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করিয়া কোন লাভ নাই যে সব তরুণ তরুণী আজ সাহিত্যের মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার পূর্ব্বে আমাদের ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে আধুনিক সাহিত্য যাহাকে বলা হয় তাহার কি দোষ বা কোথায় দোষ—।

অনেক লেখকের লেখা দেখিলে মনে হয় যে সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব—।

লেখা এখনও পাক ধরে নাই, অথচ সে লেখা যে উপায়েই হোক সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র নাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার লিখিতে প্রায়ই অনেক স্থানের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। শরৎচন্দ্রও অনেক কাটাকুটী লেখাতে করেন, দ্বিজেন্দ্র লালকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কতো পরিবর্ত্তন করিতে। কিন্তু আজকালকার অনেক লেখকই সে পরিশ্রম লেখার জন্য করিতে অগ্রসর হ'ন না। এইরূপ লেখা প্রকাশিত করিতে লেখকের কোন কুণ্ঠা কেন হয় না? তাঁহারা সাহিত্যের যে একটী বিরাট দায়ীত্ব বর্ত্তমান তাহা চিন্তা করেন না।

ইহা ব্যতীত আর একটী কারণ আছে যাহাতে সাহিত্যতে প্রকৃত রস সৃষ্টি অপেক্ষা আবর্জ্জনাই বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্য হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে বিশেষ ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার ফলে সাহিত্যে পুস্তক বিক্রয় হইতে অর্থ লাভের একটা competition এর সৃষ্টি হইয়াছে যাহা প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ী সাহিত্যিককে সঙ্ঘবদ্ধ করা অপেক্ষা সাহিত্যিক সমাজে দলাদলি নিন্দাবাদ ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথচ এই বেকার সমস্যার যুগে যাহারা কিছু লিখিতে পারেন তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাকে কিছুতেই নিন্দা করা যায় না।

পুষ্পপাত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সুভাষ চন্দ্রের আধুনিক সাহিত্য ও তরুণ তরুণীদের মনোভাব সম্বন্ধে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সত্যই চিন্তা করিবার বিষয়। যতদিন দেশের এই উদরান্নের জন্য হাহাকার না যাইবে তত দিন লঘু সাহিত্যের প্রসার হইবে। এই অভাবের কারণে প্রত্যেক সাহিত্যিকের সমাজের বা প্রাণ তাহার সহিত পরিচয় হয় না—এবং সাহিত্য হইতে লাভালাভের চিন্তা এই পরিচয়ের অভাবকে কলুষিত করে।

কিন্তু এই লঘু সাহিত্যকে সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন কাহারা? পাঠক সম্প্রদায়—তাঁহাদের দোষ লেখক হইতে কিছু কম নহে—। আধুনিক সাহিত্য সর্ব্বনাশ করিতেছে বা দেশবাসীকে নিম্নস্তরে লইয়া যাইতেছে এইরূপ মতামতের কোন মূল্য থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পাঠক সাহিত্যিক বা লেখকের নিকটে সত্যিকারের উচ্চাদের লেখা না চাহিবেন ততক্ষণ লেখককে নির্জ্জনে বসিয়া, হয় তো অনেক সময়ে অভিমান লইয়া তাঁহার তুলিতে লঘু সাহিত্যের সৃষ্টি করিবেন—তাঁহার সৎ ইচ্ছা থাকিলেও এ বিষয়ে পাঠককে সজাগ হইতে হইবে।

সাহিত্যে নব-পন্থী বা পুরাতন পন্থী বলিয়া কিছু নাই—যাঁহারা সত্যিকারের সাহিত্য-সৃষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের তুলনায় তাঁহারা নব পন্থী—কিন্তু কালের প্রসারে সেই নবপন্থী নামধেয় সাহিত্যিক পুরাতন পন্থীর পর্য্যায়ে চলিয়া যান। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে রবীন্দ্র-নাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল নবপন্থীর শ্রেণীতে ছিলেন—আবার পরবর্ত্তী যুগে শরৎচন্দ্র নব পন্থীর শ্রেণীতে ছিলেন—আজ তাঁহারা সকলেই সাহিত্যের আসরে স্থায়ী নাম লাভ করিয়া সেই পুরাতন পন্থীর শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ স্কুল কলেজের পাঠ্য তালিকার মধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়া শিক্ষক অধ্যাপকদের ছাত্রদিগকে পাঠ করাইতে হইতেছে। কালিদাস, ভবভূতি সেক্সপিয়ার হইতে বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ চন্দ্র, শরৎচন্দ্র সব এক শ্রেণীতেই স্থান পাইলেন—নবপন্থী বা পুরাতন পন্থীর কোন কথা এ স্থলে নাই।

বর্ত্তমানে শুধু আমাদের দেশে নহে, জগতের সর্ব্বত্রই

এইরূপ একটা আলোচনা দৃষ্ট হয় যে আর্ট ক্রমশই নিম্নস্তরে চলিয়াছে, সাহিত্যে উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই লক্ষিত হয়। ইহার কারণ যে কি তাহা পাশ্চাত্য মনীষী Julian Huxley সুন্দর ভাবে দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

The present condition art in general is lamentable. It has risen from two causes—the preoccupation of the ordinary man and woman in practical affairs and the exclusion of the artist from a vital relation with the life of the society in which he lives: and these cn their turn both spring from a single cause—the rise of commercialism and individualism, with establishment of a social-economic system based primarily on the scramble for private profit.

এই ব্যবসাদারী সাহিত্যসেবা আমাদের কোথায় লইয়া চলিয়াছে একবার বিশেষ করিয়া আজ চিন্তার প্রয়োজন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সাহিত্য ও সুচিন্তা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। সাহিত্য উৎকৃষ্ট চিন্তা ও সুন্দর ভাবের স্থায়ী অভিব্যক্তির ভাষা তার দেহ চিন্তা তাহার প্রাণ। সাহিত্য নর নর জীবনের যাহা কিছু ভাল, তাহা অমর করিয়া রাখিবার উপায়। মানবের চিত্ত, এবং মানবের সুখ দুঃখ সাধারণতঃ সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য।

নূতন আলো দিয়া, অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করাই সাহিত্যের কার্য্য। মানুষের মধ্যে এমন একটি প্রবৃত্তি আছে যে সে নিজে যাহা পায়, তাহা অন্যকে না দিয়া ভোগ করিতে পারে না। জ্ঞানী লোক যে জ্ঞান পান তাহা না বিলাইয়া নিজে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারেন না। নিজের ভালো চিন্তা অন্যকে দেওয়াই সাহিত্য। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছি সেই আনন্দ অন্যকে দিবার চেষ্টাই সাহিত্যের প্রেরণা। যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখিতে পাইব জগতে দুই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় এক শ্রেণী তোলে আর এক শ্রেণী চলে। এক শ্রেণী অন্যকে উত্তোলন করে। আর এক শ্রেণী উত্তোলিত হইবার জন্য অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়ে। যাঁহারা সাহিত্যসেবী তাঁহারা নিজের সঙ্গে অন্যকে তুলিবার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বোক্ত কথা হইতে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে আমি যদি সত্যিকারের সাহিত্যিক হই ও আমার চিন্তার কিছু পরিমাণ আনন্দ যদি আপনার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তো অন্ততঃ ঐ অংশটুকুতে আপনাতে আমাতে ভেদজ্ঞান চলিয়া গেল। যে পরিমাণে চিৎ, আমার আনন্দ আপনার হইল, সেই পরিমাণে আপনি ও আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম। সেই পরিমাণে আমরা একই সচ্চিদানন্দের অংশ হইলাম। সুতরাং যদি সাহিত্যকে আমরা অভেদজ্ঞাপক ধর্ম্মশালা বিবেচনা করি তবে কি তাহা ভুল হইবে? কখনই নহে। সাহিত্য সত্যমূলক—সাহিত্য ঈশ্বরপূজা। যে পরিমাণে জ্ঞান ও সত্য লাভ হয় সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করি। কাব্যেই বলুন, ইতিহাসেই বলুন, বিজ্ঞানেই বলুন বা উপন্যাসেই বলুন সেই এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ 'সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি তোমারই মাধুরী তোমারই মহিমা' সুতরাং সাহিত্য আলোচনা জ্ঞানের অনুশীলন, উচ্চভাবে দেখিলে, এক অদৃশ্য সর্ব্বব্যাপী শক্তির চিন্তা ও অনুশীলন।

সাহিত্যসেবী বা ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার যখন বলেন যে তিনি ঘোর নাস্তিক তখন আমরা অনেকে বিস্মিত হই কখনও বা হাস্য করি। বিস্মিত হইবার বা হাস্য করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি ঘোর নাস্তিক হইয়াও এক দিক দিয়া অজ্ঞাতে সেই বিশ্বময়ী শক্তিকে উপাসনা করিতেছেন তাঁহারই পাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি দিতেছেন। যখনই তিনি কোন জ্ঞান লাভ করিতেছেন, তখনই পূর্ণজ্ঞান স্বরূপের অংশকে না চিনিয়াও অর্চ্চনা করিতেছেন।

সুতরাং সাহিত্য বা জ্ঞানচর্চ্চা ভগবানের অর্চ্চনা। যখন আমরা সাহিত্য সেবায় ব্রতী বা জ্ঞান চর্চ্চায় লিপ্ত তখন আমরা সাহিত্যকে বা জ্ঞানকে ঈশ্বরের প্রতিমা বলিয়া পূজা করি। সাহিত্য সেবা সরস্বতীর সেবা। সরস্বতী ঈশ্বরের রূপ মাত্র। অর্থাৎ ভগবানকে যখন জ্ঞান, বিদ্যা ও বাক্‌রূপে ভাবি ও আরাধনা করি তখন তিনি সরস্বতী। সুতরাং সাহিত্য সেবা ভগবানের সেবা।

এই ভগবানের সেবায় যে সব সাহিত্যিক পাটোয়ারী বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া লঘু সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া পাপের মধ্যে পুণ্যের উজ্জ্বল রেখাপাত না করিয়া পাপের সুমোহন চিত্র মন্দিরে আনয়ন করেন, নিজের অর্থাগমের নিমিত্ত, তিনি পূজার মন্দিরে পাপাচরণ করেন—এই সাহিত্যের মন্দিরে পুরাতন পন্থী বা নব পন্থী নাই, আস্তিক বা নাস্তিক নাই, সকলেই বাণীর পূজক এখানে ব্যবসাদারের স্থান নাই

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারই প্রতিমা,
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো
মন্দির যাহার দিগন্ত নীলিমা"

প্রেমিক বিশ্বপ্রেমিকের পীঠস্থান।

পুষ্প পাত্র

শ্রীগিরিজা কুমার বসু

পুষ্প সব দিক দিয়েই সুন্দর—রূপে, সুষমায়, স্পর্শে. সৌরভে। পুষ্প স্বর্গীয়, তার নাম যে পত্রের আদিতে আছে সে পত্র স্নিগ্ধ, শুভ্র শুদ্ধ হবেই।

ত্রিভুবনে পুষ্প না হলে কোনো শুভ কাজই হবেনা কারুর—পরিজাত থেকে ক্ষুদ্র বন কুসুম পর্য্যন্ত সকলেরই আদরের। পুষ্পকে আদর ক'রে বলি ফুল। শুভ্রত্ব, কমনীয়তা, সৌন্দর্য্যের আদর্শ, ফুল। খুব সুন্দর কাউকে দেখলে আমরা বলি "ফুলের মতো সুন্দর"। এক হৃদয়কে অপর হৃদয়ের সঙ্গে সুখে দুঃখে চিরদিনের মতো একান্ত ভাবে যুক্ত করে প্রেম—সেই প্রেমের দেবতা হলেন যিনি তাঁর অস্ত্র হোলো ফুল বাণ। বাণে তাঁর যে ফুল আছে তার শক্তি এত প্রবল যে মহাতপস্বী মহাদেবেরও তাতে পরাজয় হয়েছিল।

ফুলকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসি। কি দেব পূজায়, কি প্রিয়তম প্রিয়তমার জন্যে অনুরাগের কণ্ঠহারে, ফুলের সমান প্রয়োজন। ফুলকে যে সইতে পারেনা, ফুলকে যে অযত্ন করে, ফুলকে দেখে মন যার পবিত্র না হয়, তার মন একেবারে মরুভূমি। তার অন্তরের কোনো জায়গায় একটু শ্যামলতা নেই।

রবীন্দ্র নাথ লিখেছেন:—

ফুলের মালা দোলে গলে
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।

ফুলের মালা যার থাকে গলায়, তার পায়ের ছোঁয়ায় তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠে। তিনি আবার বলেছেন:—

কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্ না গো।

ফুল যখন ফোটে কাঁটার বনে অর্থাৎ অন্যের দ্বারা দেওয়া দুঃখ ও বেদনায় কণ্টকিত বনে, তখন কি আর আমি চুপ করে থাকতে পারি? তখন যে আমাকে জাগতেই হবে, অসহ আনন্দের উন্মাদনায় জাগতে হবে, ফুলের পূত ও কোমল স্পর্শে জাগতে হবে, সকল ব্যথার অবসান হ'ল বলে শান্তির কোলে জাগতে হবে। তিনি আরো বলেছেন:—

'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে।' সত্যি, পুষ্প বাইরে থাকেনা—অন্তরেই থাকে। আমার অন্তরে পুষ্প আছে, তাই বাইরের পুষ্প আমাকে আকর্ষণ করে নইলে করতোনা। আমার অন্তর পুষ্পময় না হলে বহির্জগতের পুষ্পের বন কোনো দাগই রাখতোনা আমার মাঝে।

এমন পুষ্পের নামে যে পত্র ধন্য হয়েছে তার পাত্র হয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে, তার সৌন্দর্য্য সকলকে উপলব্ধি করাচ্ছে, সেই পুষ্পপাত্র আমার প্রিয়, তার চিরায়ু কামনা করি। তার কোটিতম সংখ্যা হোক। যে পুষ্পের সে আধার সেই পুষ্পেরই মতো সে পবিত্রতা, সারল্য শ্রী ও মাধুর্য্য লাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমিও বলি:—

'ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে।'

স্বরলিপি

গান

ওই যে হোথায় চাঁদ ভেসে যায়,
আমার পরাণ সেথা যেতে চায়।
তারার মালার রতন খুলি
পরিব খোঁপায় যতনে তুলি ;
নাহিব রাতে চাঁদের সাথে
রূপালি ধারা ভরা জ্যোছনায়।
খেলিব খেলা মেঘের আড়ালে,
কে পারে ধরিতে হেথা লুকালে ?
খেলিব প্রাতে তপন সাথে
রাঙিয়ে সারা গা অরুণ আভায়।
বিজলী মালা পরিব গলে
হেরিব মুখখানি সাগর জলে,
ঘুমাব সুখে মেঘের বুকে,
চামর ঢুলাবে দখিনা বায়।

কথা—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় স্থর—কাজি নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

II { সা পা পা পা / পা ধা মা -া | পা পধা ণা ধা | পা -া -া -া
ও ই যে হো / থা ০ য় ০ | চাঁ দ ভে সে | যা ০ ০ য়

পা ধা পা পা / গা মা পা দা | মপা মা জ্ঞা রা / [illegible] -া -া সা } II
আ মা র প / রা ০ ০ ণ | সে থা যে তে / চা ০ ০ য় }

অন্তরা

II { পা -া পা ধা | না -া র্সা র্সা | র্সা র্গর্রা র্গা না | র্সা -া -া -া
তা ০ রা র | মা ০ লা র | র ত ন খু | লি ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সা র্সা | র্সা ণা ণা ণা | ধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া }
প রি ব ● | খোঁ ০ পা য় | য ত নে তু | লি ০ ০ ০ }

{ সা পা পা পা | পা ধা মা -া | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা -া }
না ০ হি ব | রা ০ তে ০ | চাঁ ০ দে র | সা ০ থে ০

পা ধা পা পা | গা মা পা ধা | মপা মা জ্ঞা রা | সা -া -া সা II
রূ পা লি ধা | রা ০ ০ ০ | ভ রা জ্যো ছ | না ০ ০ য়

সঞ্চারী

I { মা পা ণা পা | না -া র্সা -া | র্সা পা না না | র্সা র্সা র্সা -া
খে ০ লি ব | খে ০ লা ০ | মে ০ ঘে র | আ ড়া লে ০

পা -া জ্ঞা জ্ঞা | ক্ষা ক্ষা পা -া | জ্ঞা পা -া মা | জ্ঞা রা সা -া }
কে ০ পা রে | ধ রি তে ০ | হো থা ০ লু | কা ০ লে ০

{ সা দা দা দা | দা ণা পা -া | পা দা ণা র্সা | পা -া -া -া }
খে ০ লি ব | প্রা ০ তে ০ | ত প ন সা | থে ০ ০ ০

পা ধা পা -া | গা মা পা দা | মপা মা জ্ঞা রা | সা -া -া সা II
রা ঙি য়ে ০ | সা রা গা ০ | অ রু ণ আ | ভা ০ ০ য়

আভোগ

II { র্রা -া র্সা পা | না -া র্সা -া | র্সা পা না না | র্সা -া র্সা -া |
বি ০ জ লী | মা ০ লা ০ | প ০ রি ব | গ ০ লে ০

র্সা -া র্রা র্সা | ণা -া ণা ণা | ধণা র্সা ণা ণা | ধা -া পা -া }
হে ০ রি ব | মু ০ খা নি | সা ০ গ র | জ ০ লে ০

{ সা পা পা পা | পা ধা মা -া | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা -া }
ঘু ০ মা ব | সু ০ খে ০ | মে ০ ঘে র | বু ০ কে ০

{ মা গা পমা মা | জ্ঞা রা মজ্ঞা জ্ঞা | সরা মা জ্ঞা রা | সা -া -া সা } IIII
চা ম র ০ | দু লা বে ০ | দ ০ খি না | বা ০ ০ য়

হিন্দু মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স

উত্তরবঙ্গে কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা



শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সৈদপুরে হিন্দু মিউচুয়েল জীবন-বীমা কোম্পানীর উত্তর বঙ্গের সংগঠন কার্য্যালয় স্থাপনা করা হইয়াছে। স্বনামধন্য নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ডাঃ শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশেষভাবে রচিত একটি উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সেক্রেটারী মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া একটি পত্র এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ এ, সি, রায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন; উহা সভায় পঠিত হইবার পর শ্রীযুক্ত রায় সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানাইয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তৃতার মধ্যে বলেন, ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভ ভিন্ন সমাজ সেবা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—বর্ত্তমানে কার্য্যপরিচালনে সে আদর্শ অক্ষুন্ন আছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত এবং বিধাতার নিকট কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন। উত্তরবঙ্গের চীফ অর্গানাইজার মিঃ আর, কে সরকার এম, এ, বি কম এবং তাঁহার সহকারীবৃন্দের আদর যত্নে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

মরণ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মরণ, হে মধু মরণ,
অবশেষ-পুর পরিণাম-রূপ,
করি হে তোমায় বরণ।
তোমার স্নিগ্ধ নয়নের তলে
নিখিলের এই মণি-দীপ জ্বলে
পরশ-মাণিক পরশে তোমার
লোহা হয় সব হিরণ,
মহীর হে মধু মরণ।
জীবন-জনক মরণ
সূর্য্য যেমন বিরাট সৃষ্টি
করিয়া রয়েছে ধারণ,
তুমিও তেমনি বিশ্বের প্রাণ
ধরে' আছ রথ-রজ্জু সমান
তব মুখ চেয়ে ছুটিছে সৃষ্টি
চুমিতে তোমার চরণ
সব ভূতপতি মরণ।

মরণ, উজ্জ্বল মরণ,
কালো নহ' তুমি আলোর আকার
ধরণীর কালো-হরণ।
প্রোজ্জ্বল তব ভাস্বর ভাতি
নরের নয়ন হার মেনে যায়
কালো বলে' তাই মানুষ তোমায়
সভয়ে করে গো স্মরণ,
উজ্জ্বল মধুর মরণ।
চির জাগ্রত মরণ
চির সচেতন সত্য ও শিব
সুন্দর নিরাবরণ।
যা' কিছু নিরখি—মন্দিরে তব,
করিছে নিত্য ধূপারতি নব
জগন্নাথের রথ টানিবার
শক্তির উপকরণ—
হে আদি-অন্ত, মরণ।



সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

SHIVA

(The Inconscient Creator)

Sri Aurobindo

A face on the cold dire mountain peaks
  Grand and Still ; its lines white and austere
Match with the unmeasured snowy streaks
  Cutting heaven, implacable and sheer.

Above it a mountain of matted hair,
  Aeon-coiled on that deathless and lone head
In its solitude huge of lifeless air
  Round, above illimitably spread.

A moon-ray on the forehead, blue and pale,
  Stretched after its finger of still light
Illumining emptiness. Stern and male
  Mask of peace indifferent in might !

But out from some Infinite born now came
  Over giant snows and the still face
A quiver and colour of crimson flame,
  Fire-point in immensities of space.

Light-spear-tips revealed the mighty shape,
  Tore the secret-veil of the heart's hold ;
In that diamond heart the fires undrape,
  Living core, a brazier of gold.

This was the closed mute and burning source
  Whence were formed the worlds and their star-dance
Life sprang a self-rapt inconscient Force,
  Love, a blazing seed, from that flame-trance.

6-11-1933.

শিব

(অনুবাদ—শ্রীদিলীপ কুমার রায়)

হিমকান্ত সুগম্ভীর শৈলশৃঙ্গে উদিল আনন
অকম্প…মহিমোজ্জ্বল…তার শুভ্র তপস্বান্ রেখা
অমেয় তুষার-দীপ্তি স্পর্দ্ধি' যেন করিল গগন
বিদ্ধ—দীর্ণ… সুকঠোর ভঙ্গি তার ..ঋজু—জ্যোতির্লেখা

বিনিঃসঙ্গ সে-অমৃত্যু-শেখরের উর্দ্ধে বিস্ফারিয়া
নগরাজ—কল্প-কল্প-ধরি' কুণ্ডলিত জটাধারে…
বেষ্টি' তারে স্পন্দহারা সমীরণ রাজে থমকিয়া—
আপনার মহীয়ান্ মৌনমগ্ন—অসাঙ্গ-বিথারে।

ললাটে পাণ্ডুর চন্দ্রকলা শোভে নিষণ্ণ…নীলাভ—
বিনিশুদ্ধ জ্যোতিরঙ্গুলির সম-সুদূর-বিবাগী—
দীপ্যমান্ করি' শূন্য …বহির্মূর্ত্তি ভায় অমিতাভ,
নিষ্কোমল শান্ত-ছন্দ…অন্তঃশক্তি—নির্লিপ্ত বৈরাগী।

আচম্বিতে যেন কোন্ অনন্ত-উৎসঙ্গে জন্ম লভি'
ঝলকিল রশ্মিরক্তচ্ছটা এক…উল্লঙ্ঘিয়া পলে
অতিকায় হিমপুঞ্জ…উল্লঙ্ঘি' সে-শান্তানন অরবী
চ্ছুরিল অসংখ্য অগ্নি-ঝিকিমিকি—ব্যাপ্ত ব্যোমতলে।

ভল্লাগ্র-স্ফুলিঙ্গভাতি সে মহান্ মূরৎ উদ্ভাসে —
মর্ম্ম-মঞ্জুষার গুহ্য অবগুণ্ঠ করি' একাকার
সে বৈদূর্য্য হৃদিকোষে জ্বলদর্চ্চিরাজি পরকাশে
স্ফুরৎ জীবন্ত গূঢ় অগ্নিলোক—হিরণ্য-আধার।

এই সে-জ্বলন্ত-কুণ্ড—রুদ্ধ বীতধ্বনি—যে ছন্দিল
নামরূপে বৃন্দ বিশ্ব—সান্দ্র তালে তারায় তারায়—
আত্মলীন নিশ্চেতন প্রাণাবেগ সেই কল্লোলিল—
তারই বহ্নি-ধ্যানে দীপ্ত প্রেমাঙ্কুর ঝলস লীলায়।

লেখক লেখিকাদের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশের জন্য আমরা খ্যাতনামা লেখক লেখিকাদের অনেক লেখা পাইয়াছি সেজন্য আমরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু স্থানাভাবে অনেক লেখা এবার দিতে পারিলাম না—আগামী বড় দিনের বিশিষ্ট সংখ্যায় বাহিবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য লেখক লেখিকারা আশাকরি কিছু মনে করিবেন না।

সম্পাদক—পুষ্পপাত্র





৯ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪২ | ৭ম সংখ্যা

ব্রাহ্মণী

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তুমি হচ্ছ, যাকে বলে নিছক্ গদ্য।
তোমারে নিঙ্ড়োলে মেলেনা একফোঁটা কাব্যরস।
আদর করার বালাই তোমার নাই,
করতে গেলে হতে হয় অপ্রস্তুত।
হাঁ, সংসারের কাজ কর্ম্ম কর বটে,
কিন্তু তাও কলের মত।
একটা হোটেলে এর চেয়ে আর কি তফাৎ হ'ত?
সাধ্য কি রাগ করি?
মাইকেল ত বলেই গেছেন,
"—কাকোদর সদা নতশির, কিন্তু" ইত্যাদি
জলের ছিটা দিয়ে কে লগির গুঁতো খেতে চায়?
অভিমান করা বৃথা,
বুঝতে পার না,
অথবা বুঝেও বোঝ না।

যতই করি ঠাট্টা,
কিছুতেই পারিনা চটাতে।
গণ্ডারের পিঠে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে লাভ কি ?
কিন্তু খোদা যখন দেন, ছপ্পড়্‌ ফুঁড়ে দেন।
সেবার হঠাৎ হল অসুখ,
যা আমার কখনো হয় না।
এত সেবা, এত যত্ন, এত আদর !
যেন ডার্ব্বিতে পাওয়া টাকা
এল ডাকে !
অযাচিত অপ্রত্যাশিত অতন্দ্রিত প্রেমপরিচর্য্যা !
সাবিত্রী যমকে ঠকিয়ে হাতের লোহা বজায় রেখেছিলেন।
ঠকিয়ে কী না করা যায় ?
কিন্তু যমের সঙ্গে লড়াই করে স্বামীকে ছিনিয়ে আন্‌তে
পারে কেবল শক্তি-স্বরূপিনী।

আমার হয়েছে পুনর্জন্ম,
শুধু দেহে নয়, অন্তরে !
প্রেমের কবিতা পড়্‌লে এখন হাসি পায়।
তবে সত্যিকথা বলতেকি
ইচ্ছাহয় মাঝে মাঝে, ন'মাসে ছ'মাসে,
আবার যদি অসুখ হয় !
এমনকি একথাও ভেবেছি
অসুখের ভান করলে কেমন হয় ?
কিন্তু কাজ নেই সখের অসুখে।
ঈসপ্‌ সাহেবের গল্প মনে পড়্‌ল,
ঠকিয়ে যদি আদর কুড়োই
তবে সত্যি সত্যি বাঘ যখন আস্‌বে,
তখন মহাডাকেও তোমার দেখা পাব না।

———

স্বরূপ দামোদরের কড়চা

অধ্যাপক শ্রীবিমান বিহারি মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস

স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া কোন প্রাচীন প্রামাণিক পুথি বা ছাপা বই পাওয়া যায় না, অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহুবার ঐ কড়চার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ঐ কড়চা পাওয়া যাইত তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের লীলা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হইত। শ্রীচৈতন্যের আদিম চরিতাখ্যায়ক নবদ্বীপবাসী মুরারি গুপ্ত স্বরূপ দামোদরের কোন পরিচয় দেন নাই। তবে তিনি কয়েক স্থানে, যথা, ৪.১৭,১৮(উৎকলে গৌড়ীয়ভক্তদের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে; ৪, ১৮, ১৩ (জলবিহার প্রসঙ্গে) ৪, ১৯, ২ (ভোজন প্রসঙ্গে); ৪, ২৪, ১, ৭, ৮, ১৩, ২৮ শ্লোকে (ভাবোন্মাদ প্রসঙ্গে) স্বরূপ দামোদরের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বরূপ প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

তিনি যে প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তাহা রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'স্তবাবলী'তে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের তিনি" স্বরূপস্য প্রাণার্বুদ-কমল-নীরাজিত মুখঃ" ও গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর দশম শ্লোকে "স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল সুবলে" বলিয়াছেন। "স্বনিয়মদশকে" রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রার্থনা করিয়াছেন যে শ্রীগুরুদেবে, মন্ত্রে, নামে, শচীগর্ভজপদে, স্বরূপে, শ্রীরূপে, সনাতনে ও বৃন্দাবনের লীলা স্থান সমূহে এবং ব্রজবাসীগণে তাঁহার পরম অনুরাগ থাকুক।

কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে স্বরূপ দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনা যে কবিরাজ গোস্বামী সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহার প্রমাণ নাটকধৃত স্বরূপের শ্রীচৈতন্যস্তব (৮, ১৪,) তিনি নিজ গ্রন্থে (চৈঃ চঃ ২, ১০, ১১৬র পর) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, নাটকের ৮, ১৫তে গোপীনাথ আচার্য্য বলিতেছেন—"অয়ে শ্রুতং ময়া চৈতন্যানন্দশিষ্যঃ পরমবিরক্তো ভগবন্তোঽতিবিদ্বান্ কশ্চিৎ দামোদর স্বরূপং নাম যঃ খলু গুরুণা বহুতরমভ্যর্থিতোঽপি বেদান্তমধীত্যাধ্যাপয়েতি ন চ তচ্চ কৃতবান্ অপিতু"। কবিরাজ ইহার ভাবানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন—

> "চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর, আজ্ঞা দিল তাঁরে।
> বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥
> পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
> কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
>
> (২।১০।১০৩-৪)

কর্ণপূর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে পুরুষোত্তম আচার্য্য নামে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৩। ১৩৮-১৪২।) ১৪৩ শ্লোকে কবি বলিয়াছেন যে ভাগ্যবান পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ও রস-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ দামোদর নামে কথিত হইলেন।১৬।৩১ শ্লোকে কবি বলেন যে মৃত্যু-কালে স্বরূপ দামোদর প্রভুর সহিত যেন একাত্মা হইয়া যান্। স্বরূপের প্রভুর সহিত মন্দিরে গমন, হরিনাম কীর্তন প্রভৃতি কবি ১৮।২১–২২শে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে দামোদরের একটি, পুরুষোত্তম দেবের পাঁচটি ও পুরুষোত্তম আচার্য্যের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দামোদর নামোক্ত শ্লোক বোধ হয় দামোদর পণ্ডিতের ও পুরুষোত্তমদেবের নামোক্ত শ্লোক প্রতাপরুদ্রের পিতার রচনা। পুরুষোত্তম আচার্য্য খুব সম্ভব স্বরূপ দামোদর। তাঁহার শ্লোকটী হইতে তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী থাকার আভাস পাওয়া যায়।

> পুরতঃ স্ফুরতু বিমুক্তি
> শ্চির মিহ রাজ্যং করোতু বৈরাজ্যং।
> পশুপলে বালক পত্তের
> সেবামেবভিবাঞ্ছামি॥

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩। ৬১।৫১৫ পৃঃ)

বলেন যে দামোদরস্বরূপ সঙ্গীতরসময় ছিলেন ও তাঁহার কাজ ছিল কীর্ত্তন করা। তিনি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন ও "প্রভুরেও বলে জলে পড়িতে ধরেন।" তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বলেন

পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রগুরু ও প্রভু তাঁহাকে 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে স্বরূপ দামোদর তাঁহার বন্ধু বলিয়া বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে বলিলেন যে—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাসে গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
(চৈঃ চ ২ ১০। ১০১-২)

নবদ্বীপবাসী মুরারি গুপ্ত কিন্তু নবদ্বীপ লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। কর্ণপুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস ও তাঁহার নবদ্বীপে বাড়ী বলেন নাই। ১৪৩১ শকের মাঘ সংক্রান্তিতে প্রভুর সন্ন্যাস—১৪৩৪ শকের আগে স্বরূপ দামোদরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেকবার স্বরূপ দামোদরের কড়চার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

(১) প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
(১। ১৩। ১৫)

(২) দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারী।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি
১। ১৩। ৪৪

(৩) চৈতন্য লীলা-রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেট॥ ২।২।৭৩

(৪) স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূর দেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সঙ্ক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্র কর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকা ব্যবহার॥
৩।১৪।৬-৯

২।২।৭৩এ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে স্বরূপ তাঁহার ভাণ্ডার রঘুনাথের কণ্ঠে রাখিলেন। ইহা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি কিছু লেখেন নাই, শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন মাত্র, এবং রঘুনাথ তাহা মুখস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর তিনস্থলে স্বরূপের লেখা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি আছে। সেইজন্য আমি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেছি—"এখানে (৩।১৪।৬-৯) কবিরাজ গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের ন্যায় রঘুনাথদাসের কড়চার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, স্বরূপ সংক্ষেপে এবং রঘুনাথ বাহুল্যে কড়চাকারে রচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, স্বরূপ ও রঘুনাথ মহাপ্রভুর লীলাগুলি অল্পবিস্তর কড়চাকারে রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন" (গৌরপদ তরঙ্গিনী, ২য় সংস্করণ ভূমিকা ৬৪ পৃঃ)।

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন নির্ণীত হইল। কিন্তু কি লিখিয়াছিলেন তাহাই বিচার্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে স্বরূপ সংক্ষেপে ও রঘুনাথ বিস্তার করিয়া লীলা লিখিয়াছিলেন। রঘুনাথ স্তবাবলীর শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও বারটী শ্লোক সমন্বিত গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বসমেত বিশটী শ্লোক ছাড়া আর কিছু শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী এই বিশটী শ্লোকের মধ্যে পাঁচটী শ্লোক অন্ত্যলীলায় চতুর্দ্দশ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি অন্ত্যলীলায়

ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রভুর ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। লীলার প্রমাণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও রঘুনাথ দাসগোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বরূপ দামোদর যদি অন্ত্যলীলা লিখিবেন তবে কবিরাজ গোস্বামী তাহার একটী শ্লোকও উদ্ধার করিলেন না কেন? কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোন বাঙ্গালা পয়ার উদ্ধার করেন নাই, কিন্তু স্বরূপ দামোদর যে কড়চা সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ চরিতামৃতের আদি লীলায় ধৃত দশটী শ্লোক। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যলীলাবিষয়ক ২০টী শ্লোককে কবিরাজ গোস্বামী যখন বাহুল্যরূপে বর্ণন বলিয়াছেন, তখন স্বরূপদামোদরের ১০।১১টী তত্ত্বসূচক শ্লোককে "সংক্ষেপে লেখা" বলায় দোষ হয় না। কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে রঘুনাথদাস গোস্বামী লীলা বিষয়ে আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাই নাই। কিন্তু এ তর্ক বিচারসহ নহে, কেননা রঘুনাথ অন্য কিছু লিখিলে তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামী কিছুই উদ্ধৃত করিলেন না কেন? উপরন্তু "ভক্তিরত্নাকরে" প্রদত্ত রঘুনাথের গ্রন্থ তালিকা হইতেও জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য বিষয়ে তিনি আর কিছু লেখেন নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এইযে স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব বিষয়ে ১০।১১টী শ্লোক লিখিলে কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে লীলা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে যখন কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শেষ করেন, তখন শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব এরূপ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে লীলা ও তত্ত্বের ভেদ ভক্তগণের নিকট বিশেষ কিছু ছিল না। ইহা ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে স্বরূপ দামোদরের যে কয়টী শ্লোক কবিরাজ গোস্বামী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা লীলাসূত্রও বটে। "শ্রীচৈতন্য রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত ও রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্ত্তি" এই উক্তি তত্ত্বও লীলাসূত্র দুইই। লীলাসূত্র এইজন্য যে ইহার আলোকে শ্রীচৈতন্যের লীলা উপলব্ধি করা যায়। পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের তিনবাঞ্ছা পরিপূরণার্থ শ্রীরাধাভাবাঢ্য হই শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীচৈতন্যলীলা দুইয়েরই সূত্র করা হইল। তারপর পাঁচটি শ্লোকে নিত্যানন্দের দুইটীতে অদ্বৈতের তত্ত্ব ও একটীতে পাঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বরূপ দামোদর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে এই শ্লোক কয়টী শ্রীচৈতন্যলীলার চাবি কাঠি। ইহার সাহায্য না লইলে শ্রীচৈতন্যলীলা একেবারে বাহিরের বস্তু হইয়া পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকার নবম শ্লোকে বলিয়াছেন যে স্বরূপ দামোদর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে স্বরূপের মত বলিয়া তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত কবিরাজ গোস্বামীর উদ্ধৃত শ্লোকের মিল আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় যে দশটী শ্লোক "তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম" বলিয়া মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল আছে। ঐ দশটী শ্লোক স্বরূপ দামোদরের রচনা কিনা জানিবার জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় চরিতামৃতের ২৩৭ সংখ্যক পুথি (১৬৮০ শকের অনুলিপি) ২৩৮সং (১৭০৮ শকের), ২৪১সং (১১৯৯ বঙ্গাব্দে), ১৬৪৬সং (১১৫২ বঙ্গাব্দের), ১৬৪৭সং ১১৬১ বঙ্গাব্দের পুথি খুলিয়া দেখি যে ঐ সমস্ত পুথিতে উক্ত দশটী শ্লোকের প্রথমে কেবলমাত্র তথাহি লেখা আছে। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত শ্লোকমালা" নামের আটখানি পুথিতেও শ্লোকগুলি কেবলমাত্র তথাহি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তথাহি শব্দের অর্থ কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তথাহি শব্দের পর কোন গ্রন্থের নাম না থাকিলে বুঝা কঠিন কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ডক্টর সুশীলকুমার দে Indian Historical Quarterlyর ১৯৩৩মার্চ্চ সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিগুলিতেও মাত্র তথাহি আছে—শ্রীস্বরূপগোস্বামী কড়চায়াম্ উক্তি নাই। আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটী মুরলী বিলাসের ৩৬ পৃষ্ঠায় ও ভক্তি রত্নাকরের ৭১৯ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য ডক্টর দে অনুমান করেন যে ঐ শ্লোকটী স্বরূপ গোস্বামীর নহে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥

১।৪।৯১-৯২

পুনরায়—"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহো অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥

১।৪।১৩৭-৩৮

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই তত্ত্বটী স্বরূপ দামোদরই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ও সেই আস্বাদনে কিরূপ সুখ এই তিন বস্তুতে লোভ বশতঃ যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই তত্ত্ব কর্ণপূর প্রচার করেন নাই। তাঁহার পিতা শিবানন্দের একটী পদ গৌরপদ তরঙ্গিনীর ১১পৃষ্ঠায় (২য় সংস্করণ) ছাপা হইয়াছে। তাহাতে কৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন একথা আছে, কিন্তু তিনি যে রাধা-ভাব ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেন এরূপ তত্ত্ব নাই। শ্রীচৈতন্যতত্ত্বের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে শিবানন্দের পদটী মূল্যবান বলিয়া বিচারের সুবিধার জন্য নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায় দণ্ডকমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন॥
অধরে মুরলী পূরি ব্রজবধূর মনচুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়নকটাক্ষ বাণে মরমে পশিয়া হানে
সে মারণে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ
বিরহ অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি॥

শিবানন্দের মতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণবিরহ বোধ না করিয়া বরং রাধার বিরহ অনুভব করিতেন।

রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাবনা বুঝিয়া॥

(গৌর পদ তরঙ্গিনী, ১৮০ পৃঃ)

শিবানন্দ গদাধরকে রাধার সহিত তুলনা করিয়াছেন—

"হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহা লাগি খ্যাতি॥
\+ \+ \+
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥

(৩০০ পৃঃ)

অন্যত্র—"হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥ (২১৮ পৃঃ)

শিবানন্দ সেনের পুত্র কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গদাধরকে রাধাই বলিয়াছেন। মুরারি গদাধর প্রসঙ্গে শ্রীরাধার সহিত উপমা দিয়াছেন। গদাধর বিশ্বম্ভরের নিকট শয়ন করিতেন; তাহার উপমা—

যথা কচিন্নিকুঞ্জে রত্ন মন্দিরং কৃষ্ণ সন্নিধৌ।
শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা স্বপিতি প্রেমসংপ্লুতা॥

২।৩।১৭

কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গদাধরকে শ্রীরাধাতত্ত্ব বলিয়াই, সেই স্থানে একটি বিচার উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিচারটীর মধ্যে স্বরূপদামোদর তথা বৃন্দাবনবাসীদের মতের ও গৌড়বাসীদের মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। সেই জন্য গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার ১৪৭-১৫৩ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

"পূর্ব্বে যিনি প্রেমরূপা শ্রীরাধা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিত

স্বরূপ তাঁহাকে ব্রজলক্ষ্মী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা "পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরচন্দ্রের প্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত। ললিতা যখন শ্রীরাধার অনুগতা ছিলেন তখন তিনি অনুরাধা নামে বিখ্যাত ছিলেন। অতএব শ্রীললিতা গদাধর পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে গৌরচন্দ্রোদয়ে (নাটক ৩৫১) যথা—এই ভুসুর গদাধর শ্রীরাধার প্রিয়সখী ললিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, অতএব সেই ভগবানই নিজ শক্তি দ্বারা স্বয়ং রাধিকা ও ললিতা এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন।' "অপরে বলেন ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতা, স্বপ্রকাশ বিভেদ হেতু—এই মতই সমীচীন। অথবা ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ হইয়াছেন। সিদ্ধান্ত—" অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ (১৫৩)।

এই বিচারটীতে দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ কর্ণপূর স্পষ্টতঃ স্বরূপ দামোদরের মত অগ্রাহ্য করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকেই যাঁহারা পরম উপাস্যদেবতা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গৌরাঙ্গ রাধাভাব আস্বাদন করিবার জন্য রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিতেন একথা স্বীকার করা কঠিন। এরূপ স্বীকার করিলে গৌরাঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র হন উদ্দেশ্যই হন না। গৌরাঙ্গ যদি নিজে কৃষ্ণ হন, তবে গদাধরকে রাধা বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু স্বরূপ দামোদর যদি গদাধরকে রাধা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে তিনবাঞ্ছা পরিপূরণের কোন অর্থ হয় না।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বিচারের দ্বিতীয় উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক যদি ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইত তাহা হইলে ১৫৭৬খৃষ্টাব্দে রচিত গণোদ্দেশেই তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত হইলে তাহার বিপরীত মত ৪১ বৎসর বাদে প্রকাশ করার একটা মানে বাহির করা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য বিষয়ক তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয় নাই। তখন যে মত কর্ণপূর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিচার অনেকদিন ধরিয়া গৌড়ের ভক্তমহলে চলিয়াছিল ও সেই বিচারের ফলে কবি ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মত পরিবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বরূপ দামোদরের দশটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কর্ণপূর গণোদ্দেশে ১৩, ১৭, ১৪১ শ্লোক স্বরূপ গোস্বামীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ কয়টীই তত্ত্ব বিষয়ক।

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। জীবিত কালে না হইলেও, মহাপ্রভুর তিরোধানের অতি অল্প কাল পরেই যে স্বরূপ দামোদরের শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উদ্ধৃত স্বরূপের শ্লোকগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বরূপ দামোদর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (Church father)।

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস

চান্দ্র

কথা বলো, কথা বলো, বলো বলো কথা।
অন্তর মন্থিত করে নিদারুণ তব নীরবতা।
এরপর বিচ্ছেদের দিবা অগণন
মৌনতার দীর্ঘ পারাবার!
আমার যাত্রার পথে এসেছে লগন
পাথেয় সঞ্চয় করিবার!

কাল হতে প্রতি রাতি প্রতি দিনমান
তোমার আমার মাঝে বাড়ায়ে তুলিবে ব্যবধান।
তার আগে মাত্র এই রাতি
অন্ধকারে একমাত্র বাতি।
জীবনের এ অঙ্কের এই শেষ পাতা
তাহাতে ভরিয়ে দাও সঞ্জীবনী গাথা।
রয়ো না বিমুখ হয়ে, তোলো আঁখি তোলো
কথা বলো, ওগো কথা বলো।

আমার প্রেমের স্পর্শে ভেবেছিনু জাগাব তোমারে
ভেবেছিনু দেখে যাবো লাজরক্ত অধর কিনারে
ঈষৎ হাসির রেখা।
না পেলাম দেখা
কিশোর-স্বপনে রচা মানসী প্রিয়ার মূর্ত্তিখানি,
আজি শুধু পরাজয় গ্লানি।
নিষ্ফল প্রেমের রাজ্যে অশ্রুজলে হলো অভিষেক
আমার ব্যর্থতা আজি লজ্জা দিল অন্তর আবেগ।

ভালো করে চিনিবার চিনাবার অবকাশ নাহি,—
জীবন স্রোতের মতো তীরবেগে চলিয়াছে বাহি।
শুধু ক্ষণেকের দেখা পথমাঝে তোমায় আমায়,
বলিতে বলিতে কথা স্বল্প আয়ু বেলা যে ফুরায়।—
তথাপি দাঁড়ায়ে আছি, অশ্রু ছলছল,—
কথা বলো, ওগো, কথা বলো।

হে প্রিয়া, তোমার তরে আসিনি ভাঙ্গিয়ে হরধনু
করি নাই লক্ষ্য ভেদ, তপস্যায় বিগলিত-তনু
বর্ষপর বর্ষ যাপি তোমা লাগি অনিমিষ আঁখি
জাগি নাই সাধনার শৈল শিরে নীরবে একাকী।
তাই আজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিবার নাহি অধিকার—
হে মোর সাধন-ধন, প্রিয়া তুমি একান্ত আমার।
তব প্রেম করিনি অর্জ্জন,—
পরম বিশ্বাস ভরে তবু আজ বলে মোর মন
একদিন উত্তরিব তব দ্বারে এসে
বিজয়ীর বেশে।
আজি বিজলীর আলো বাদলের বক্ষ চিরে চিরে,
তুমি আমি মৌন সৌধ শিরে।
সম্মুখে নিবিড় মেঘে সুবিপুল বিরহ ঘনালো—
শুধু বলো এই ছবি লাগিয়াছে ভালো,
ওগো মৌনা, কথা বলো, বলো কথা বলো।

আংটি

গল্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরার আংটির হীরাটা যখন আল্‌গা হইয়া যায় তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিষয়ী, সাবধান।

ক্ষেত্রমোহনের আংটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল। শোকটা সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটা পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়ত হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্টভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুইই আছে—সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখ-ধাঁধানো উগ্র প্রগলভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালীর মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকেনা—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অস্তরাগ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোনো অভাবনীয় কারণে যৌবন টিঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল তাহারই ফলে হয়ত এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়—তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাটগেঁয়ে খালাসীর মত 'পুরুন' ফেলিতেছেন বটে—কিন্তু বাম্ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদ্‌মায়েস। মোসাহেবী করা ছিল তাহার পেশা। বড়লোকের সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অন্ধকারালোকের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁস মাতালের পকেট হইতে মণি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অন্ধকারালোকের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন—এসংসার অতীব বিচিত্র!

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্ব্বাক নীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিলনা।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ীর দোতলার গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রের বাসা। শয়ন ঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরেই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্লমুখে ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রর বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চটপটে বাক্‌পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—সব ঠিক করে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল তক্ত্পাত!

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জলজলে চোখ-ঝলসানো হাসি। তাহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রর এ হাসি

অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল,—কি হল?

চপলার কাছে ক্ষেত্রর কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল—এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে সে ভালবাসিত, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানালার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল,—তোমাকে অ্যাদ্দিন বলিনি। এক নতুন কাপ্তেন পাকড়েছি; বেশ শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফুর্ত্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়ে পুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধরে খেলাচ্ছি।

ছোঁড়ার বয়স বেশী নয়—তেইশ চব্বিশ। কিন্তু হলে কি হবে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কাণ কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হর্দ্দেল ঘুঘু। এই দেখনা, একমাস ধরে তেল দিচ্ছি এখনো একটি সিকি পয়সা বার করতে পারিনি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবেনা নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়ত দরোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু'পয়সা বাঁচাব সে গুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল—কিন্তু মদের গেলাস ছোঁবার আগে কি করে জানো? টাকা কড়ি, মায় হাতের আংটি পর্য্যন্ত দেরাজে বন্ধ করে চাবিটি ঐ শালা দরোয়ানের হাতে দিয়ে বলে—যাও, মৌজ করো! এই বলে তাকে একেবারে বাড়ীর বার করে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চণ্ডাল ব্যাটাচ্ছেলে।

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি?

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করিয়া বলিল, দেখলুম ও শালা পল্লেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘাল করা যাবেনা—একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চড়ে গেছে—আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি। বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চকচকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

চুরি করবে?

হ্যাঁ। ঢের খোশামদ করেছি, আর নয়; এবার একহাত ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেব। টাকাকড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশী রাখেনা—কোথায় রাখে ভগবান জানেন—কিন্তু একটা হীরের আংটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ করে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাঁক করেছি। উঃ! কী হীরেটা মাইরি; চপলা যদি দেখো চোক ঝলসে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কাণাকড়ি কম নয়।—যদি পাঁচশ টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।

কিন্তু যদি ধরা পড়?

সে ভয় নেই। বন্দবোস্ত সব পাকা করে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারটা মধ্যে ব্যাটা বেরুবে—সমস্ত রাত বাড়ী ফিরবে না—'বিমনা ভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল—কোথায় যাবে কিছুতেই বললে না; হয়ত নটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে,—কিন্তু সৌদামিনী ত মেনা মিত্তিরের—; যাক গে, যে চুলোয় খুশী যাক। আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ী থাকবে না। দরোয়ানটাও বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। ব্যাস, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্ত্তারাও বাড়ী থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট্ করে গিয়ে ঢুকব। তারপরেই গুদাম সাবাড়—মাল উদ্ধগাত।—শালা লুট লিয়া—শালা লুট লিয়া—রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, সরে এস—সরে এস, ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে!

চপলা সরিল না, বলিল,—কে?

নরেন চৌধুরী—সরে এস।

কি দরকার? আমাকে ত আর চেনেনা।

'তা বটে!' তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে

উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—ঐ দেখতে পাচ্ছ ফর্সা মতন চেহারা, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি? উনিই নরেন্দ্র চৌধুরী।—হাতের আংটিটা দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।—চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল। পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—হীরেটার দাম কত বললে?

হাজার টাকা। ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—বেশীও হতে পারে।—এবার তোমার ঝুমকো গড়িয়ে দেবই বুঝেছ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—শস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় বলে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল,—হুঁ।

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, চলে গেছে না এখনো আছে?

চপলার ঠোঁটের উপর দিয়া একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না। চপলা বলিল, মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

ফিরে আসছে? ক্ষেত্রের কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল।—তাইত্‌ আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান—। তুমি সরে এসো। কে জানে—

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল, খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল,—চলে গেছে।

যাক, তাহলে বোধহয় এম্‌নি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্ক ভাবে ক্ষেত্রের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে—না?

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—পারে না! টাকার জন্যে মানুষ পারেনা এমন কাজ একটা দেখাও ত দেখি। খুন জখম জাল ফেরেব্বাজ—দুনিয়াটা চলছে ত ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হলে কারুর একদণ্ড চলে? তবে আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙ্‌তে যাচ্ছি তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রাণ করেছে। যেমন করে হোক ওর ঐ আংটি গাপ করবই।

আলস্যভরে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল—যাই—চুল বাঁধি গে।

\+ + +

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখ দিয়া ফড়ে পুকুরের রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ৎ আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। রাস্তার গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড় জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি; গলির দু'ধারে দুটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল পাশের একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবল আছে, সেই টেবলের ডান দিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল—কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগিবে না। তাহার হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়বিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ীর বাহির হইবে?

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশালাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না—কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে,—কিন্তু গলির দুধারে বাড়ী। কে জানে—যদি কেহ দেশালায়ের আলো দেখিতে পায়! ধূমপানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল—এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এই সময় নরেন চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়া গেল। ক্ষেত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর দরজার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার!

সদর দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠ-গোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোষ্টারের মত সাঁটিয়া গেল। নরেন ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্রচক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আংটি আছে কিনা। না—নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নরেনের পরিপাটি সাজসজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এইসব নিশাচার প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল—মাণিক অভিসারে বেরুলেন! কোনো একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, করুক—সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাংটা করিয়া ছাড়িয়া দিক!

কিন্তু এদিকে দরোয়ানটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোট্টাটার আবার কি হইল। ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই ত!

আরো ক্ষণিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল—সওয়া এগারোটা! তাই ত! কি হইল? দরোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই ত! না—তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দরোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল? তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এত মেহনৎ করিয়াছে—সার্কুলার রোডে ময়দা কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে—আর শেষে—

এই সময় খোট্টা দরোয়ান বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠক্‌ঠক্ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দরোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, ক্ষেত্র কাঠ-গোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জ্জন—বাধা বিপত্তির কোনো ভয় নাই। কিন্তু দু'পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই—আর একটু থাক। যদি দরোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে—হয়ত আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দরোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুতপদে যেন নিজের বাড়ীতে যাইতেছে এমন ভাবে দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ক্ষেত্রর পকেটে একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ্চ ছিল সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁ দিকের দরজার উপর ফেলিল।

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র আর একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চ্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল; সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ্চ জ্বালিল।

টর্চ্চের আলো একটা টেবলের উপর গিয়া পড়িল। টেবলের উপর বিশেষ কিছু নাই—কাগজ—চাপা ব্লটিং প্যাড দোয়াত কলম। টেবলের আশে পাশে দু'তিনটা চেয়ার অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। টেবলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ডান ধারের দেরাজগুলা খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারিটি দেরাজ। নরেন উপরের দেরাজে আংটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল—কিন্তু আংটির পরিচিত ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল—আংটি নাই।

আংটি নাই? কোথায় গেল। প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থির নিশ্চয় ছিল, যে এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

তবে কি—?

সে সভয়ে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চ্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল। না—কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়ত আংটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আল্‌পিন পর্য্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ! সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আংটি ত দূরের কথা, একটা পয়সা পর্য্যন্ত নাই।

আলো নিভাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয়-সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু না—নিশ্চয় আছে। হয়ত তাড়াতাড়িতে নরেন ডান দিকের খোলা দেরাজেই আংটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডান দিকের দেরাজগুলো খুলিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাতেই কিছু পাইল না। কতগুলো মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটাকয়েক অশ্লীল বিলাতী উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের ভয়ের মত একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনে হইল, এই শূন্য বাড়ীখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—আর পালাইতে পারিবেনা।

এই সময় দূরের কোনো গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রের কাণে বোমার আওয়াজের মত লাগিল। বারোটা! এতক্ষণ সে এখানে আছে! যদি কেহ আসিয়া পড়ে। নরেনই যদি ফিরিয়া আসে।

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। বাড়ীর বাহির হইয়া ভয়ার্ত্ত চোখে একবার চারিদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরের তালা বন্ধ করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যেদিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতেই পারিল না।

\+ \+ \+

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কি, অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল! তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—নরেন আংটি পরিয়া বাহির হয় নাই ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে। তবে আংটিটা গেল কোথায়?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজায় কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি স্বতন্ত্র—নীচের তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই, প্রতিবেশীকে না জানাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ী ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল ক্ষেত্র কোনো কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন ঘরে ফিরিয়া আসিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে। কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। মুখে চোখে জল দিয়া, আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, আজ ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার হল।—ঘুমুলে নাকি? ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলায় একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

আংটিটা পেলুম না—বুঝলে?—

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল,—জেগে আছো না ঘুমুলে?

চপলার চোখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙ্গুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মত বিছানার উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, —আংটী!—এ আংটি তুমি কোথায় পেলে!—তুমি কোথায় পেলে—

তোমাতে-আমাতে

শ্রীঅমলা দেবী

প্রথম পরিচয় তোমার সাথে,
হয়নি আমার জোছনা রাতে,
হয়নি তমাল তরু তলে,
আকুল পিয়াসে নয়ন জলে!
সেদিন আকাশ ঘননীল বাসে,
সজল সঘন উতলা বাতাসে,
কেশরকীর্ণ ঘন বন মাঝে,
কাঁদিয়া ফেরেনি বিরহ সাজে!
সে দেশ ছিলনা গোকুল ধাম,
তোমার ছিলনা শ্যামল নাম!
শুনিয়া তোমার উতলা বাঁশী,
ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া আসি,
লুটায়ে পড়িনি চরণ তলে!
বলিনি উতলা আকুল স্বরে
'—চরণে ঠেলনা অবলা জেনে
কেহ নাহি মোর তোমা বিনে।'
সেদিন প্রথর দীপ্ত প্রভাতে
হয়েছিল দেখা তোমার সাথে।
পূর্ব্ব রাগের প্রথম সূচনা,
সেদিন আমার নয়নে ছিলনা!

তোমার বচন মরমে আমার,
জাগায়ে তোলেনি বীণাঝঙ্কার!
তোমার তরেতে আকুল পিয়াসে,
জাগিয়া নিশীথে উতলা উছাসে,
তমালে ভাবিয়া কৃষ্ণধন!
ছুটিয়া জড়ায়ে ধরিনি কখন!
আজিও জাগিয়া সারাটী নিশি,
বিরহ শয়নে একলা বসি,
গাঁথিনে সুচারু বিনোদ হার,
পরাব বলিয়া গলেতে তার!
দীর্ঘ রজনী জানিনা হায়,
গভীর ঘুমেতে কাটিয়া যায়!
প্রভাতে যাইব যমুনা মাঝে
গাগরী লইয়া, গোপিনী সাজে,
কোথায় যমুনা? এদেশে নাই!
শুধু ডোবা আর পুকুর ছাই!
প্রেম শুধু যে গো স্বপ্ন বিলাস,
জীবন সংগ্রাম জাগে বার মাস!

নারীজাতি ও তাহার ইতিহাস

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

আধুনিক যুগে যাহারা নারী প্রগতির উপাসক তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের তর্ক ও যুক্তি সমূহকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া কতকটা অনুভূতির সাহায্যে প্রকাশ করিতে চাহেন। আমার বোধ হয় এই জন্যই নারী-জাতির আসল তত্ত্ব এখনও সম্যকরূপে প্রচারিত হইতে পারিতেছে না। নারী নরের সমকক্ষ হইতে পারে না ইহাই আমাদের সংস্কার এবং এই সংস্কারকে ভিত্তি করিয়া নীতি, দর্শন ও সমাজ-তত্ত্ব সমূহ রচিত হইয়াছে। পুরাবৃত্তের মধ্যে অনেক সময়েই আমরা দেখিতে পাই নারী মহিয়সী শক্তি, তাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেবগণকেও চমৎকৃত করিতেছে। আবার কখনও নারীকে চির অন্ধকারময় মোহে আবৃত রাখিবার জন্য কঠিন সামাজিক অনুশাসন গুলি রচিত হইতেছে। এইরূপ পরস্পর দ্বিধা বিভক্ত ভাবধারা অনেক সময়েই আসল-তত্ত্ব আহরণে আমাদিগকে নিবারণ করে। এই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি গুলির দ্বারাই আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে চাহি।

নর ও নারী ভগবানের দুইটী বিভিন্ন সৃষ্টি হইলেও মূলতঃ সৃষ্টিগত কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। ক্রম-বিকাশের ফলে জড়ে যখন চৈতন্যের উদ্রেক হয় তখন Sex গত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। উভয় Sex ই একটী চৈতন্যময় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি চলিতে থাকে। বাইবেল বর্ণিত আদম এবং তাহার দেহোৎপন্ন ইভের ইতিহাসে Biological সত্য কিছু নাই। কিন্তু উহার খানিকটা অনুভূতি। প্রাণী জগতে নিম্নস্তরে চলিয়া গেলে আমরা দেখিতে পাই Sex গত কোন পার্থক্য নাই। সৃষ্টি-তত্ত্বের ইহাই প্রথম পর্য্যায়।

গতির আবির্ভাবের সহিত Variety এর প্রয়োজন হয়। ভ্যারাইটী তখনই সম্ভবপর হয় যখন শ্রম বিভাগে Division of labour সৃষ্ট হয়। সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ও বিভিন্নতা রক্ষার জন্য জনক ও জননীর বিভিন্নতার প্রয়োজন হয় বলিয়াই ক্রমশঃ Mother egg এবং father sperm এর সৃষ্টি হয়। Mother egg অনেকটা ঐশ্বর্য্যময়ী, তাহার গর্ভে সন্তানের জন্য প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকিতে লাগিল। Father sperm শুধু মাত্র Mother egg কে ফলবতী করিয়াই তাহার কার্য্য সমাধা করিতে থাকে। সৃষ্টি-তত্ত্বের ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইতে থাকিলে স্ত্রী-শরীর ও পুরুষ শরীরে কথঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইতে থাকে। Calcium আমাদের অস্থি নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান। পুরুষ নানারূপ শারীরিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাহার অস্থিগুলি সবল ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য প্রচুর Calcium প্রয়োজন হইতে থাকে। নারীকে অপেক্ষাকৃত অল্প শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া তাহার দেহের Calcium গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কম হইতে থাকে। এই জন্যই সমস্ত দেশেই পুরুষ নারীগণ অপেক্ষা শারীরিক বলে হীন ও দেহের উচ্চতায় খর্ব্বাকৃতি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরগণের গতি অবাধ, শৃঙ্খলাহীন ছিল। তাহারা শুধু আত্ম-রক্ষার্থ যুদ্ধ কার্য্য ও হিংস্র জন্তুগণের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার অবসর ব্যতীত অন্য সময় স্বাধীন ভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইত। নারীগণ প্রাকৃতিক আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া এবং সৃষ্টির প্রেরণায় বসন্তকালে পুরুষগণের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া গর্ভবতী হইয়া পড়িত। কিম্বদন্তী হিসাবে আমরা যে বসন্ত-উৎসবের কথা শুনিতে পাই তাহার জন্ম-কাহিনী এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রকৃতি দত্ত প্রেরণা হইতে। ইহার বিশ্বজনীন ভাব দেখাইবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ গ্রীসের Baccahanalian Festival এবং রোমের youth movement উল্লেখ করিতে পারা যায়। তখন সতীত্বের কোনরূপ ভাবধারাই আসিতে পারে নাই এবং মানবের

কল্পনাও তখন ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত না। প্রাকৃতিক আকর্ষণে নারীগণ Mother egg স্বরূপ Father sperm রূপ পুরুষ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদের উর্ব্বরা শক্তি বিকাশ করিয়া লইত মাত্র। সন্তান প্রতিপালনের জন্য নারী জাতিরাই প্রথম জমি পরিষ্কার করিয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করে। তাহারাই প্রথম শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন করিতে আরম্ভ করে কেননা মাতৃত্ব তাহাদের একটি মস্ত বড় বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই জননী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধান-দূর্ব্বা-রূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। অন্নদাত্রী অন্নরূপা মূর্ত্তিও এইরূপ ভাবধারার বাহক মাত্র। গ্রীসের নানা দেবীর ভাবধারা এই অতীত ঐতিহাসিক যুগের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই যুগে সন্তানকে মাতৃ-গোত্র গ্রহণ করিতে হইত এই জন্য Matriarchal age বলা হইয়াছে। রামায়ণ বা মহাভারত যুগে এই মাতৃ-গোষ্ঠির যুগ চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া মনে হয় এবং এই জন্যই আমরা কৌন্তেয়, গাঙ্গেয় প্রভৃতি শব্দগুলি দেখিতে পাই।

পৃথিবী অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত হইয়া আসিলে এবং উচ্ছৃঙ্খল মানব সম্প্রদায় যদৃচ্ছ ভ্রমণে ক্রমশঃ উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িলে নারী জাতি এবং তাহাদের ভূ-সম্পত্তির উপর তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নর এবং নারীর সংঘর্ষ এইসময় হইতেই আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল কলহের পর প্রায় যাবৎ নারী সম্প্রদায়ই শারীরিক বলের অল্পতা হেতু পুরুষগণের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই সংগ্রাম কাহিনী প্রায় সকল জাতির উপকথায় Amazonian গণের ইতিহাস রূপে লিপিবদ্ধ আছে। মেয়েলী রাজ্যে মেয়ে সামন্তগণ পুরুষগণকে ঘৃণা করিত এবং পুরুষ দেখিলে হত্যা করিত ইহা সত্য, কিম্বদন্তী নয়। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান যুগের রমণীগণের সম্পূর্ণ পরাধীনতা।

নর-গণ নারীজাতিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পদানত করিয়া রাখিবার জন্য যাবৎ ভূসম্পত্তি তাহারা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয় এবং কতকগুলি পরিবার বা গোষ্ঠী সৃষ্টি করে। রমণীগণও সাধারণ পণ্যের ন্যায় এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া যায়। এইরূপ সম্পত্তির উৎপত্তির সহিত রমণীজাতির বন্ধন, ও তাহাদের সতীত্বের সৃষ্টি হয়। বংশগত রক্ত বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য নারীজাতির উপর কড়া দৃষ্টি এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিয়মাবলী সৃষ্টি হইতে থাকে। ধর্ম্মের সহিত সমাজ তত্ত্ব সংমিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় রমণীগণকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাচার হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলে সতীত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারে এইজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়। যুগ-যুগান্তরের সংস্কার আসিয়া যখন এই রমণী সমাজকে পঙ্গু ও আত্মবলে বিশ্বাসহীন করিয়া প্রকৃত অবলা জাতিতে পরিণত করে, তখন হইতে তাহারা নিজেরাই আপনাদের সকলপ্রকার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হইতে থাকে।

রমণীগণকে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াই জাতির জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। পরের সম্পত্তি হরণ করিয়া আপন সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করা যেমন প্রত্যেক পুরুষ প্রবরের গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল, সেইরূপ পর স্ত্রীকে হরণ করিয়া বংশবৃদ্ধি করাও প্রধান কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। জগতের ইতিহাসে এইজন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ বা ইলিয়ডের যুদ্ধ বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে একমাত্র রমণী সৌন্দর্য্যই যে যত অনিষ্টের মূল ছিল তাহা নহে, পরের নারী-হরণ করিতে পারিলে তাহাকে দুর্ব্বল করিতে পারা যায় এই ধারণাই অন্যতম কারণ। প্রাচীন আসিরীয়গণ যখনই কোন জাতিকে পরাস্ত করিত, তখনই তাহারা তাহাদের সম্পত্তি হরণের সহিত তাহাদের নারীগণকে আপনাদের অধীন করিয়া লইত। রোম নগরী স্থাপিত হইবা মাত্রই, উক্ত নাগরীর প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রতিবাসী Sabian (সেবিয়ান) রমণীগণকে হরণ করিয়া আপনাদের বংশবৃদ্ধি করিয়াছিল।

গ্রীসের ইতিহাসে রমণীগণকে কোনরূপ বিশেষত্ব প্রদান করা হয় নাই। কেবলমাত্র পেরিক্লিশ যুগে

যখন উন্নতিশীল আবেগের প্রকৃত সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করিতে থাকে তখনই এসপেসিয়া জাতীয় এক শ্রেণীর রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রোমান যুগে রমণী প্রাধান্য গৃহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গথ্ প্রভৃতি রোম বিজয়ী বীরগণ Chivalry যুগে রমণী উপাসনার প্রচলন করেন। এইরূপে মধ্যযুগে রমণীজাতির আত্মজ্ঞানের খানিকটা উন্মেষ হইয়াছিল তাহার ইতিহাস সাহিত্যে বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই রহিয়াছে। আমাদের দেশে কিন্তু নানারূপ বাধা আসায় নারীজাতির অধঃপতন বড়ই দ্রুত সংঘটিত হইয়া যায়। স্বাধীনতা লোপের সহিত আমাদের সমস্ত আত্মসম্মান জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার সহিত অমাদের রমনীগণ গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধা হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে আমাদের রমণীগণ নানারূপ সামাজিক আব-হাওয়ায় আসিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল মূর্খ এবং কুসংস্কার ভাব সম্পন্না হয়।

ইহাই নারীজাতির ক্ষুদ্র ইতিহাস। যাঁহারা প্রগতির উপাসক তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি নারী জাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সমান অধিকার দানের উপর। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ক্রমশঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকায় অধিকাংশ সম্পত্তি রমণীগণের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে। ইউরোপেও নারীর অধিকার ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশে এইরূপ প্রগতির যুগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"বিজলি খেলে আকাশে কেন ?"

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

বিজলি খেলে আকাশে কেন ?
　আমি জানি, আমি জানি।
এ কথাত কোনদিন শুধায়নি কেহ,
(তাই) কহিনিক গোপন এ বাণী।

সদরে রুদ্ররূপে দাসদাসী শাসিয়া,
শান্ত সুবোধ সম অন্দরে আসিয়া
বাবু যবে কাবু হন্ গিন্নির ধমকে,
তখনি আকাশে বিজলি চমকে।

করি কোন ভুল-চুক আপিসের কর্ম্মে,
পচা পৌরুষ যবে খোঁচা খেয়ে মর্ম্মে
ঘরে ফিরে ঘরণীকে অকারণ ধম্‌কায়,
আকাশে তখনি বিজলি চম্‌কায়।

কলেজে লিখিয়ে নাম নলেজের লাগিয়ে
ফাঁকিবাজ ছেলে যবে টাকাকড়ি বাগিয়ে
প্রকৃসি চালিয়ে ক্লাসে শেখে শুধু ফাজিলি,
　তখনি আকাশে চমকে বিজলি।

চুলচেরা বখ্‌রার ঝগড়া ও মামলায়,
ভা'য়ে ভা'য়ে ভজে যবে আমলা ও শামলায়
বুকের শোণিত ঢেলে, হ'য়ে ওঠে ফ্যাকাশে,
　খেলে বিজলি তখনি আকাশে।

বিষপান লালসায় পায়ে ঠেলে সুধাকে,
যবে কেহ মিটাইতে শয়তানী ক্ষুধাকে
দাগা দেয় কারো মনে ভালবাসা-ভানে,
তখনি আকাশে বিজলি হানে।

'ওয়াইফ্' নহেক কভু এ দেশের ভার্য্যা,
তাই নিয়ে থাকা ভাল আছে পথ যার যা।
×　　×　　×
ঘর ছেড়ে পরপথে ছোটে নারী যখনি,
　বিজলি খেলে আকাশে তখনি।

বক্‌শিস

—গল্প— শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

[রেলে ষ্টীমারে পূজার বেজায় ভীড়ের মধ্যেও কি করিয়া দু'টি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর মিলন হইল গল্পটিতে মনোরঞ্জন বাবু তাহাই সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।]

সেবার পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু অশান্ত। অমরা রাজসাহী কলেজের ছাত্র। রাজসাহী হইতেই আসিতেছি এবং উভয়েই যাইব মাদারীপুর। পোড়াদহে গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমাদের যে গাড়ীতে উঠিতে হইবে সেটা আসিতেছে কলিকাতা হইতে। গাড়ী যথাসময়েই আসিল কিন্তু স্থান তিল ধারণম। পূজার সময়ে এমনই হয়। গাড়ী থামিতেই আধবয়সী এক ভদ্রলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিলেন, সবিনয়ে বলিলেন—দয়া করে আমাদের একটু যায়গা করে দিতে হবে বাড়ীতে বড় বিপদ, এ গাড়ীতে না গেলেই নয়, ওর মার ভয়ানক অসুখ—বলিয়াই কিয়দ্দূরে দাঁড়ান একটি তরুণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। সময় ছিলনা, শুধু এক পলকের দেখা তবু এইটুকুতেই বুঝিতে বাকী রহিল না—তরুণী সম্পূর্ণ আধুনিকা, হয়ত কলেজের ছাত্রীই হইবে। হৃদয়ে পরোপকার স্পৃহা জাগিয়া উঠিল (পাঠকপাঠিকা ভুলিবেন না, তখন কলেজে পড়ি)। অশান্তর আগে আমিই আগাইয়া গেলাম। গাড়ীর দরজা একটুখানি ফাঁক হইতেই লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। অশান্ত বাহির হইতে দরজা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া খুলিয়া রাখিল। প্রথমেই তরুণীটিকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম এবং ভদ্রলোককে উঠিতে বলিয়া মনুষ্যব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলাম, একটু যায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখিতে হঠাৎ উচ্চ চীৎকার কানে যাইতেই ফিরিতে হইল। দেখি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদের ভদ্রলোক দরজার পথ রোধ করিয়া বলিতেছেন—হবেনা মশায়, অন্য গাড়ী দেখুন। না হয় পরের গাড়ীতে যাবেন। প্রাণ গেলেও আর এ গাড়ীতে একটি প্রাণীও নয়।—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া একথা বলা হইল সে আর কেহ নয় অশান্ত। অশান্তও দস্তুরমত ক্ষেপিয়া গিয়াছে। ক্ষেপিবার কথাও বটে কারণ একমাত্র ওর দয়াতেই ভদ্রলোক উঠিতে পারিয়াছে আর এখন কিনা ওকেই উঠিতে দিতে চায়না।

অশান্তও চীৎকার করিয়া বলিল—কেমন নিমক-হারাম মশায় আপনি? আমরাই ত আপনাদের জায়গা দিলুম। ঐ ত আমার বন্ধু, সেইত আপনার মেয়েকে গাড়ীতে তুলল। আর আমিই কিনা পড়ে থাকব?

ভদ্রলোক দামলেন না বলিলেন—ঢের বন্ধু দেখেছি মশায়, 'চাচা আপন বাচা' শেষে কি অন্ধকূপ হত্যা হব!

আমি দূর হইতে বলিলাম—সবুর কর অশান্ত আমি আসছি। কিন্তু লোকের ভীড়ে পা বাড়ান কি সম্ভব? আমার সাহায্যের পূর্ব্বেই গাড়ী চলিতে সুরু করিল। অশান্তকে ডাকিয়া বলিলাম—নামতে পারলাম না অশান্ত।

অশান্ত উত্তর দিল—পরোয়া নাই পরের গাড়ীতেই যাচ্ছি কিন্তু এই বেইমান বুড়োটাকে মজা দেখাচ্ছি। বলিয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া ছাতার বাট দ্বারা ভদ্রলোকের বা চোখে একটা গুঁতা মারিয়া বসিল।

"বাবাগো" বলিয়া ভদ্রলোক লোকের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন।

গাড়ী শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল, আমিই কেবল গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ী তখন বেগে চলিতেছে। ইহার পর আর আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নাই। তরুণীটি শুধু একবার তাহার পিতাকে আরক্তমুখে এই কথাটি বলিয়াছিল—ছি! বাবা চক্ষু-লজ্জাটুকুও কি থাকতে নেই—কিন্তু ভদ্রলোক সেই যে চোখে রুমাল গুজিয়া অধোমুখে বসিয়াছিলেন, আর বড় একটা মাথা তুলেন নাই তবে চক্ষুলজ্জা জিনিষটা যে তাহার বাস্তবিকই নাই গোয়ালন্দ গাড়ী থামিতেই তাহার আর একদফা প্রমাণ দিলেন। রাজবাড়ী ট্রেন থামিতেই হু হু করিয়া বন্যার স্রোতের মত কুলির দল

উঠিয়া মালপত্র খুসীমত দখল করিয়া বসিল। ইহারাই কুখ্যাত গোয়ালন্দের কুলি। রাজবাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া অপেক্ষা করে এবং গাড়ীতে উঠিয়া চেহারা দেখাইয়াই বুঝাইয়া দেয়—'এই লভিছু সঙ্গ তব'। গোয়ালন্দ গাড়ী পৌছিতেই কুলির সঙ্গে ভদ্রলোকের বচসা সুরু হইল। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা বড় ট্রাঙ্ক, একটা ছোট সুটকেস ও একটা ঝুড়ি। পূজার মরশুম্ কুলি দর হাকিল পুরা এক টাকার কমে কিছুতেই যাইবে না। ভদ্রলোক রাগে অগ্নিশর্ম্মা, বলিলেন—"বাঁধা রেট দু'আনার বেশী এক পয়সাও দিব না।"

দেরী হইয়া যাইতেছিল কাজেই আমি বলিলাম—যা হয় একটা রফা করুন। তাড়াতাড়ি না করিলে ষ্টীমারেও ভাল যায়গা পাওয়া যাবে না। ভদ্রলোক নির্লজ্জের মত বলিয়া বসিল—সেই ভাল। আসুন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করি। পি, সি রায় ঠিকই বলেছেন—সামান্য কাজেও আমরা পরমুখাপেক্ষি বলেই বাঙালী জাতটা গেল। আসুন বড় ট্রাঙ্কটা আপনার ঘাড়ে তুলে দি, আমি সুটকেসটা নিতে পারব। ভদ্রলোক ট্রাঙ্কটার আংটা ধরিয়া উঠাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার তরুণী কন্যা বাধা দিল।

বলিল—থাম বাবা, তোমার আচরণে আমার মাথা কাটা গেল।—বলিয়াই একটা আধুলি কুলির দিকে ছুড়িয়া দিয়া হুকুম করিল—আভ চল, জল্দি। সৌভাগ্য বশতঃ ষ্টীমারে আসিয়া পা টান করিয়া বসিবার মত যায়গা পাওয়া গেল। এইবার ভদ্রলোক একটু উদারতা দেখাইলেন। ষ্টীমারের দোকানওয়ালাকে তিন পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিলেন। তরুণীটি ঝুড়ি খুলিয়া নানারকম খাবার বাহির করিতেই ভদ্রলোক আমাকে জলযোগে আহ্বান করিলেন। তরুণীটিও এতক্ষণে দুটি ডাগর আঁখি তুলিয়া আমার দিকে চাহিল কাজেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

পরিতোষ সহকারে জলযোগ শেষ করিয়া পূজার সংখ্যা মাসিক ও সাপ্তাহিক গুলি লইয়া বসিলাম। এই-বার প্রচুর অবসর। ভদ্রলোক আমাকে একটু বাঁকা চোখে দেখিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—আপনিও মাসিকপত্রে লিখেন নাকি? টুলুও ত লেখে। এ পূজার সংখ্যাতে ওর কয়েকটা গল্প বেরিয়েছে।

স্মিতমুখে তরুণীর দিকে চাহিলাম। লজ্জায় ওর কাণ দুইটি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প লেখক হিসাবে আমারও কিছু নাম হইয়াছে। এবারকার প্রায় সবগুলি কাগজেই আমার লেখা বাহির হইয়াছে। ইহাদের আমার নিজের কথাটা জানাইয়া দিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না। কাজেই উত্তরে ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলিলাম—হাঁ, আমারও লেখা-টেখার অভ্যাস আছে। এ কাগজগুলিতে আমার লেখা আছে। ভাবিয়াছিলাম ভদ্রলোক আরও উৎসাহিত হইবেন, আমার লেখা দেখিতে চাহিবেন। আর আমি টুলুর ভাল নামটাও জানিয়া লইব, কিন্তু ভদ্রলোক কথার মোড় ফিরাইয়া ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। বিরক্ত হইয়া এক সময় উঠিয়া পড়িলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি—তরুণীটি আমার সবগুলি পত্রিকাই নিজের বিছানায় নিয়া হাজির করিয়াছে আর একখানা খুলিয়া বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িতেছে। আমাকে ফিরিতে দেখিয়াই হাসিয়া তরুণীটি বলিল—আপনার একটা লেখাই পড়ছিলাম। বেশ লিখেন কিন্তু। কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম—কি করে জান্‌লেন কোন্‌টা আমার লেখা? আমার নাম ত আপনাদের বলিনি।

একটি ছোট্ট মেয়ের মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মেয়েটি বলিল—আপনার নামত যুগান্তর চক্রবর্ত্তী, নয় কি?

অবাক হইয়া গেলাম। আমার নাম ও জানিল কিরূপে? ওকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াত মনে হয় না। আমার কোন বন্ধুর বোনটোন হইবে কি? কিন্তু তা হইলেত ওর নামটা আমার অজানা থাকিত না। বিশেষত ওর বাপের মুখেই যখন শুনলাম ও একজন মাসিকপত্রের লেখিকা। প্রকাশ্যে বলিলাম—আমার নাম যুগান্তর চক্রবর্ত্তীই বটে। যেমন করেই হউক আপনি আমায় চেনেন দেখছি এখন অনুগ্রহ করে আপনার নামটা বলুন। শুনলাম আপনার লেখাওত

এবারকার পূজার সংখ্যাতে আছে। মেয়েটি আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—আছেইত কিন্তু আমার নাম বলছিনে। দেখি আপনি নিজেই আবিষ্কার করতে পারেন কি না। যদি পারেন বকশিস পাবেন।

নিরুপায় হইয়া বলিলাম—বক্‌শিসের যখন লোভ দেখালেন তখন চেষ্টা করতেই হবে। কোন্ কাগজে আপনার লেখা আছে দিন একখানা।

তাই হউক বলিয়া পুষ্পপাত্রের একখানা মহিলা সংখ্যা আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। ইহার সমুদয় লেখাগুলি আগেই পড়িয়াছিলাম কিন্তু অতগুলি মেয়ে লেখিকার মধ্য হইতে কেমন করিয়া বাহির করিব কে এই তরুণীটি। হাল ছাড়িয়া তরুণীর সঙ্গে গল্প সুরু করিলাম। কথায় কথায় স্ত্রীস্বাধীনতা সহশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা জমিয়া উঠিল। একসময় মেয়েটি উত্তেজিত হইয়া বলিল—দেখুন, আপনারা যখন বলেন মেয়েদের এটা ভাল নয়, ওটা ভাল নয় তখন আপনারা শুধু নিজেদের দিক দিয়াই দেখেন—আপনারা যে মেয়েদের মালিক এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা আপনাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। মেয়েরা সমানাধিকার দাবী করলে আপনাদের যে ছোট-খাট অনেক অসুবিধা হবে এমন একটা আশঙ্কা আপনাদের মনের কোণে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিকড় গেড়ে বসে আছে যার জন্যে ঘুণাক্ষরেও আপনারা ভাবতে পারেন না যে মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েদেরই মাথা ঘামান উচিত। হঠাৎ জোরে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়া উঠিতেই আলোচনা থামিয়া গেল। চাহিয়া দেখি প্রায় তারপাশার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। তারপাশা ঘাটেই আমাদের ছাড়াছাড়ি। এখানে নামিয়াই আমি মাদারীপুর ষ্টীমারে উঠিব আর ওরা এখানেই থাকিবে। জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে তরুণীটিকে বলিলাম—একটু পরেই যখন ছাড়াছাড়ি আর গোপনে কল কি? আপনাকে আমি জানি—আপনার নাম কুমারী মায়াদেবী। তরুণীর মুখে আমার নাম শুনিয়া আমি যতটা বিস্মিত না হইয়াছিলাম তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হইল মায়াদেবী। অতি ব্যগ্র হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—আর কেন, ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে গেছে বলুন কেমন করে জানলেন আমার নাম। আপনাকে কোথাও দেখিছি বলে ত মনে পড়ে না?

বলিলাম, বারে দেখেননি তবে কেমন করে জানলেন যে আমিই যুগান্তর চক্রবর্ত্তী।

হাসিয়া মায়াদেবী বলিল—ডিটেক্টিভগিরী করেছি। পোড়াদহেই জানতে পারলাম আপনি রাজসাহী কলেজের ছাত্র। তারপর ষ্টীমারে উঠিয়া আপনার মুখেই শুনলাম আপনি গল্প লিখেন। পূজার সংখ্যা মাসিকে যুগান্তর চক্রবর্ত্তীর লেখা দু'তিনটি গল্পেই দেখলাম রাজসাহী কলেজের কথা, হোষ্টেল ও সহরের বর্ণনা আছে কাজেই অনুমান করলাম হয়ত আপনিই যুগান্তর চক্রবর্ত্তী হবেন। এখন বলুন আমার নাম জানলেন কেমন করে।

হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম—আমিও ডিটেক্টিভগিরী করেছি। কিছুক্ষণে পূর্ব্বে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য করেছিলেন পুষ্পপাত্রের মায়াদেবীর একটা লেখতে হুবহু সেই কথাগুলো আছে কাজেই অনুমান করলাম হয়ত আপনিই হবেন মায়াদেবী। আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি। এখন বকশিস চাই। আপনি প্রতিশ্রুত আছেন—সলজ্জহাস্যে মুখখানা উদ্ভাসিত করিয়া মায়া বলিল—বকশিশের কথা চিঠিতে জানাব, দেখবেন যেন প্রত্যাখ্যান করে না বসেন। আচ্ছা ধরুন যদি নিজকেই দিতে চাই, আমার আর কিই বা আছে?

অকারণে মায়ার চোখের কোণে একফোটা জল টল টল করিয়া উঠিল।

ভাগ্যচক্র

গল্প—

শ্রীসতী দেবী

[শিক্ষিতা কুমারী শীলা কি করিয়া বড়লোক ঘরের মোহ ছাড়িয়া সম অবস্থাপন্ন যুবককেই বরণ করিল তাহারই সুন্দর চিত্র সতী দেবী ভাগ্যচক্রে ফুটাইয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা গল্পটি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।]

দাদা। আমি কিন্তু আর কোথাও যাবনা।— সে তোমার হাজার অনুরোধেও নয়। বিরক্ত হইয়াই শীলা এই কথাগুলি বলিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বরুণ বলিল—অত রাগ হ'ল কেন শীলা! কি হ'ল ভাই? কথা না বলিয়া শীলা বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত বরুণ কপালের উপরের চুল গুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে ভাবিল—শীলার এত বিরক্তির কারণ কি? এত ঝাঁঝালো সুরে সে কেন কথা বলিল।

সারাদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর, সন্ধ্যায় ভাইবোন বসিয়া গল্পচ্ছলে নিজেদের কথাই আলোচনা করিতেছিল। বারান্দার প্রান্তে তোলা উনুনে মা পুত্র কন্যার রাত্রের খাবার করিতে ব্যস্ত। একখানা মাদুরে শীলা আর বরুণ বসিয়া। ছোট সংসারটির চারিদিকে অভাবের চিহ্ন পরিস্ফুট। অথচ শীলা আর বরুণের চেহারায় ছাপ লাগেনো ভারী অভিজাত সুলভ। এই দারিদ্র্যের আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের কেমন যেন বেমানান বোধ হয়। এককালে তাহাদের অবস্থা মন্দ ছিলনা। বরুণের পিতাই পড়িয়াছিলেন সংগ্রামের মধ্যে। তাহার পূর্ব্বে আর কেহ বিশেষ অভাবের দুঃখ পায় নাই। পিতা যখন বাঁচিয়াছিলেন,—একমাত্র পুত্রকে যথাসম্ভব উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষ তাঁহার ছিল। এম, এ পরীক্ষার কিছুদিন আগে বরুণ পিতৃহীন হইল। একখানি বইএর দোকান তাঁহার সম্পত্তি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল— এধারে ওধারে যে যাহা পাইবে— প্রেসের দেনা— সব শোধ করিতে হইলে, দোকান খানি ছাড়িতে হয়। অবশেষে দোকান খানি বিক্রয় হইয়া গেল। বরুণের এম, এ পরীক্ষার ফলও খুব ভালো হইল না। বরুণ দুঃখ পাইল সত্য কিন্তু মা ও শীলার জন্য তাহা সহিয়া গেল।

অনেক দিনের চেষ্টার, পর একখানি ইংরাজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদকের পদে সে নিযুক্ত হইল, আশাতীত বেশী মাহিনায়, একশত মুদ্রায় আরম্ভ বোধহয় শেষও। তবু বরুণ খুসী হইল। আপাততঃ গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনার নিরসণ হইল বলিয়া। শীলা ম্যাট্রীক পাশ করিয়াছিল। দাদার আয়ের অঙ্কপাত দেখিয়া কলেজে পড়িতে রাজী হইল না। শোকার্ত্তা মাকে সঙ্গ ও সাহায্য করা ও সে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইল। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

সন্ধ্যাস্নান শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে বরুণ বলিল— শীলা! সকাল বেলায় মনটা খারাপ ক'রে দিয়ে এলি— কি সব ব'লে এখন একটু বল্‌না বোনটী কেন অত রাগ তোর হয়েছিল। আঁচলের কোণ হইতে সুতা বাহির করিতে করিতে শীলা বলিল— কি হবে তোমার শুনে দাদা সে কথা, মনটা একটু খারাপ হবে মাত্র। কথা সামান্যই, তবে সেটুকুও আমি এড়াতে পারি —যদি কোথাও না যাই। তুমি শুধু বল দাদা-আমায় কোথাও যেতে ব'লবেনা। বরুণ বলিল—কি ক'রে সে কথা বলি ভাই! তুই ছেলে মানুষ। দিনরাত এই বাড়ী খানির মধ্যে বন্দিনী হ'য়ে একঘেয়ে জীবনে তোকে অভ্যস্ত হ'তে হ'চ্ছে—তোর কচি মন হয়ত দুঃখিত হ'য়ে ওঠে তাতে। খেলা ধুলো লোকের সঙ্গে মেশবার আনন্দ, কিছুই তুই পাস্‌নে। তাই বাইরে থেকে কেউ ডাকলে আমি যেতে বলি তোকে— তোর যাতে ভালো লাগে। তা ছাড়া কারও নিমন্ত্রণে না যাওটা অভদ্রতা— সেটা তো জানিস। শীলা বলিল— নাই বা মান্‌লে দাদা— অত ভদ্রতার নিয়ম কানুন।

বরুণ হাসিল শীলার কথা শুনিয়া—তারপর আবার মিষ্ট স্নেহের অনুরোধ জানাইয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিল। শীলা বলিল—কাল বিনয় বাবুর বাড়ী গেছলুম জানত? তাঁদের বাড়ীতে ধনী গৃহের আড়ম্বর যথেষ্টই আছে নেই শুধু তাদের মেয়েদের কথা বলবার শিক্ষাটুকু।

নিমন্ত্রিত একটী মেয়ের দামী শাড়ী না থাকা, অন্তত খানচারেক জড়োয়া গহনাও না থাকা অন্যায় এই কথাটাই তারা জানাচ্ছিলেন নিজেদের আলাপের মধ্যে। একটী মেয়েত আমায় বলেই ফেললে—শুধু একজোড়া বালা হাতে দিয়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। তার উত্তরে আমায় বলতে হলো যে বাড়ীতে গহনা কাপড়ের মহার্ঘ্যতার অনুপাতে আপ্যায়নের মাত্রা ঠিক হয়, সে বাড়ীতে না আসাই উচিত। এবার থেকে নেমন্তন্ন করো, কাপড় গহনা গুণে দেখে। বলেই আমি চলে এলুম। এরপর কোনোদিন তোমার বা মায়ের কারো কথা রাখতেই আমি কোথাও যেতে পারবোনা বলে রাখচি। বরুণের মুখে ভারী একটা ম্লানভাব ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল—অর্থহীনের দীনতার কথাই বোধ হয়। শীলা চলিয়া গেল—খাবার দিতে। আধঘণ্টা পরে মা ডাকিলেন বরুণ, খাবে এসো। বরুণ নিরুত্তরে গিয়া বসিল। আহারে বসিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি হয়ত বিস্বাদ লাগিতেছিল। প্রায় কিছু না খাইয়াই সে উঠিয়া গেল। শীলা দাদার দুঃখার্ত্ত মনে কী কথা বড় হইয়া জাগিতেছে বুঝিয়া তাহাকে কোন অনুরোধও করিলনা। নিজের ঘরে গিয়া জুয়েল ল্যাম্পের শিখাটী আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বরুণ কতকগুলি প্রবন্ধের বাণ্ডিল লইয়া বসিল। শীলার কথাগুলিই তাহার মনে হইতেছে বারে বারে। শীলা সর্ব্বদাই সময়োচিত উত্তর দিতে পারে বলিয়া অনেকের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে। আবার মুখরা আখ্যাও দিয়াছে অনেকে। এমন করিয়া দৈন্যকে খোঁচা দিয়া কই কেহত কখনও কিছু বলে নাই। শীলা চলিয়া আসিয়া ভালোই করিয়াছে বোধহয়। আফিসের কাজে কিছুতেই সে মন দিতে পারিলনা। আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

(২)

সপ্তাহ দুই পরে আফিস হইতে আসিয়া বরুণ খুসী মনে শীলার হাতে একটা প্যাকেট তুলিয়া দিল। শীলা বলিল—কি আছে এতে দাদা। বরুণ বলিল খুলেই দেখনা। ক্ষিপ্রহাতে বাণ্ডিলটা খুলিতে একটী যোগিয়া রং-এর চমৎকার সিল্কের শাড়ী আর একটা ভেল্‌ভেটীন কেস বাহির হইল। কোন কথা তলাইয়া বুঝিতে শীলার দেরী হয়না। ঈষৎ ক্লিষ্টকণ্ঠে শীলা বলিল—ছিঃ দাদা! সামান্য ব্যাপারেই তুমি এত বিচলিত হয়েচ আমি জানতুমনা—এই জন্যে বোধহয় তোমায় কিছু না বলাই উচিত। তুচ্ছ দুটো কথার জন্যে এতগুলো টাকা তুমি খরচ করে এলে! শাড়ীখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া শীলা আবার বলিল—তোমার দেওয়া সিল্কের শাড়ী খুব লোভনীয় হলেও—তোমার মনের অধৈর্য্য অবস্থাটা মনে করে একটুও ভাল লাগচেনা দাদা! বরুণ বলিল—ভাবিসনে শীলা। কিছুদিন আগে আমাদের ম্যানেজার আশা দিয়েছিলেন—কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। আমার পরিশ্রমের জন্যে তাঁদের কাগজটার নাকি আশ্চর্য্য উন্নতি হয়েচে! কিন্তু পাকাপাকি কিছু না জানাতে তোকে বলিনি—আজ দেখলুম আমায় দিলেন একশ টাকার ওপর আরও সত্তর টাকা। আনন্দটা খুবই হয়েচে তাই তোর জন্যে নিয়ে এলুম—তোকে কিছু দেবার সামর্থ্য আমার হয়েচে—এইটেই আমার বড় সুখ। তাছাড়া তোর সংসারের টাকায় বেশী কিছু খরচ করিনি। হারটা খুব পছন্দ হল—ছোট্ট কিন্তু ভারী সুন্দর। ওটা নিলামে কেনা—আগে এক জমিদার পত্নীর সম্পত্তি ছিলো ওটা। সব কথা শুনিয়া শীলা শান্ত হইল। হারটা গলায় পরিয়া সে বলিল—দেখেচো দাদা! এটায় একটা নীলা বসান রয়েচে। নীলা নাকি সবাইকার পরতে নেই। কি জানি এটা আমাদের সইবে কিনা? এক কালে এটা যাঁর গলায় দুলেছিলো তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা ত বুঝতে পাচ্ছি—নীলামে উঠে এটা আমার জন্যে এলো বলে। কতখানি দুর্গতি হলে জমিদার পত্নীর গলার হার খানাও নীলামে ওঠে! হারটীর অতীত স্মৃতি ভাবিয়া ভাই বোন দুজনেই দুঃখিত হইয়া উঠিল। তারপর চলিল মাকে জিনিষগুলি দেখাইতে।

শীলার পড়াশুনার স্পৃহা সব অবস্থাতেই অব্যাহত রহিয়াছে। গভীর চিন্তা—নিজের ও দাদার ভবিষ্যত বর্ত্তমান লইয়া, যখন তাহার মন ছাইয়া ফেলে, তখনও সে পড়ে। ভাবনার জাল ছিঁড়িয়া সকল চিন্তা বিলীন হইয়া যায় বইএর মধ্যে। আবার মনের উদ্দেশ্যহীন

অবস্থায় যখন করিবার কিছু থাকে না, জটিল ভাবনা গুলিকে দুহাতে সরাইয়া দিয়া সে পড়িতে বসে। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের অলস আবেশে বারান্দায় বসিয়া, দেওয়ালে ঝুমকোলতার নীল ফুলগুলির সাথে প্রজাপতির চঞ্চল খেলা দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু যখন ক্লান্ত হইয়া ওঠে, তখনও একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়োজিত হয় পুস্তকের মধ্যে। ছোট সংসারের অল্প গৃহকর্ম—অবসর প্রচুর। বাছ বিচার হীন ভাবে সে পড়িয়া যায়। চলমান জগতের সব কিছুতেই তার কৌতুহল জাগে।

বরুণ আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত আফিসের কাজ লইয়া—। শীলা তাহাকে একদিন অনুযোগ জানাইয়া বলিল—দাদা শুনতে পাই, সিনেমায় যেতে তুমি ফ্রি পাশ পেয়ে থাক। লোকের একটু কথার খোঁচায় আমায় খুসী ক'রতে গয়না কাপড় নিয়ে এলে, অথচ একটু সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে তোমার অত আপত্তি কেন ভেবে পাইনে। আজকালত দেখতে পাই এত তোমার কাজের তাড়া—আমার সঙ্গে একটু গল্প ক'রতেও সময় হয় না। রূপোর নেশা বড় অদ্ভুত জিনিষ, সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। বরুণ লজ্জা পাইয়া নোট বুকখানি খুলিয়া কি যেন দেখিয়া শীলাকে বলিল—অত কথা নাই বা শোনালি শীলা—সোজাসুজি বল আজ যেতে চাস সিনেমা দেখতে। বেশ—কোথায় যাবি; ঠিক ক'রে রাখি। ইংরাজী না বাংলা? শীলা বলিল—সে আমি দেখে রাখব—আজকের কাগজ দেখে—গার্ব্বো কিম্বা অ্যানাষ্টেনের কিছু থাকলে যাব, নয়ত 'মহানিশা' দেখতে যাব। বলনা দাদা—ওটা কেমন হ'য়েছে—তুমি সেদিন গেছলে? বরুণ বলিল—মন্দ নয়, তবে অপর্ণা আর একটু মোটা কম হ'লেই ভাল হ'ত যেন। তুই 'মা' বইটার ফিল্ম দেখেছিস্—মোটা সোটা আর বয়স্থা একটি মেয়ে এলেন হেসে দুলে পনের বছরের মনোরমা সেজে। ঠিক কত বয়েস তাঁর জানিনে কিন্তু পনের বছরের অনেক বেশী এটা বুঝতে দেরী হয়না। শীলা খুব হাসিয়া উঠিল। বরুণ আফিসে চলিয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া শীলা ডাকিল, মোহিনী! শীলাদের দাসী শ্রীমতী মোহিনী আসিয়া দাঁড়াইল, বয়স চল্লিশোর্দ্ধে। মুখের একপাশে পানের পুটুলি আঙুলের মাথায় খানিকটা চুন। বোধ করি সবে মাত্র পানটী মুখে ফেলিয়াছিল, উপযুক্ত পরিমাণ চুন দিয়া চর্ব্বন করা হয়। নিকষ কালো বর্ণ, স্থূলাঙ্গিনী। ইহারই নাম মোহিনী। তাহাকে দেখিয়া কেন যেন শীলা হাসিয়া উঠিল। কে রাখিয়াছিল বাছিয়া বাছিয়া মোহিনী ইহার নাম জানিতে তাহার অদম্য ইচ্ছা জাগিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা দেখ মোহিনী! তোর নাম যদি আমি বদলে রাখি 'মনোমোহিনী' তা হ'লে যেমন হয়! মোহিনী ভারী সরল, শীলার চপল ঠাট্টা সে বুঝিলনা। এপাশ হইতে পানগুলি ওপাশে সরাইয়া দিয়া সে বলিল—ক্যানো গো দিদিমণি! নাম বদ্লাবো নি। একেত তোমাদের দোরে খাটতে এসে আমার বাপ মায়ের দেওয়া "মোহনমালা" নামটাই উঠে গেল। ওই নামেই সকলে চেরকাল ডাকতো। শীলার কানে মোহনমালা নামটা আরোও মজার লাগিল, সে জোরে হাসিয়া উঠিল। এইবার মোহিনী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—বল কি কাজ আছে,—একটু গাড়িয়ে নোব দিদিমণি, শীলা হাসিয়া বলিল আজ একটু সকাল ক'রে উনুন ধরিয়ে দিস্ মোহিনী! ওবেলা আমরা বায়স্কোপে যাব। ঠিক তিনটেয় সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। মোহিনী আদেশ শুনিয়া চলিয়া গেল।

দাদার ঘরের এলোমেলো কাপড় চোপড় গুছাইয়া টেবিলখানি পরিচ্ছন্ন করিয়া শীলা ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র একটা বাজিয়াছে। বরুণের বিছানার ঢাকনি কাপড়টা কোঁচকাইয়া রহিয়াছে সেটা ঠিক করিয়া অন্যমনে বাঁধা খোঁপাটাকে খুলিয়া আবার তাহা জড়াইল। তারপর মায়ের ঘরে চলিল। মা নিঃশব্দে সেলাই করিতেছেন। চোখের সামনে দেওয়ালের গায়ে শীলার পিতার পূর্ণাবয়ব ফটো খানি। এককোণে পূজার সরঞ্জাম—চন্দন পিঁড়ি। ঘরখানি ছাইয়া তখনও মৃদু ধূপের গন্ধ বিরাজ করিতেছে শান্ত পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া। শীলার মায়ের শান্ত সৌম্যতা মাখা চেহারা অস্পষ্ট বেদনার রেখাঙ্কিত। দেখিলেই মনে হয় এই মানুষটির উপর দিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। শীলা ডাকিল আস্তে—মা—! মুখ তুলিয়া মা জিজ্ঞাসু

দৃষ্টিতে চাহিলেন। বায়স্কোপ দেখিতে যাইবার কথা বলিলে তিনি সম্মতি দিলেন। মিনিট পনর মায়ের পা দুখানিতে হাত বুলাইয়া শীলা গেল—আজিকায় খবরের কাগজ দেখিতে। রূপবাণীতে গার্কো আর হারবার্ট মার্শাল—পেণ্টেড ভেল চিত্রখানিতে। বইখানি শীলা পড়িয়াছিল। একখানা মনের মত বইএর আর প্রিয় অভিনেত্রীর একত্র সংযোগ ঘটাতে শীলা আনন্দে চোখ বন্ধ করিয়া রহিল। বন্ধ চোখের মধ্যে চলিতে লাগিল—নায়িকা ক্যাট্রিনের ভুমিকায় রহস্যময়ী গার্কোর অভিনয়। ব্যাক্টেরিওলজিষ্ট ওয়াল্টারের নীরব কর্ম্মী জীবনে পত্নী ক্যাট্রিন হইল অবহেলিত—জ্যাক্ টাউনসেণ্ড আসিয়া অধিকার করিল পিপাসিতার হৃদয়। কুহক স্বপ্নের ঘোর লাগা দিন গুলির চিত্রিত আবরণ খসিয়া পড়িল,—বিবাহিত, সন্তানের পিতা জ্যাক, যখন তাহাকে প্রণয়িনী করিয়াই রাখিতে চাহিল। অপমানিতার কলঙ্ক মাখিয়া ক্যাট্রিন ফিরিয়া আসিল—সেই স্বামীরই আশ্রয়ে যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবসরহীন জীবন পত্নীকে উচ্ছল ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই—মনে মনে সে গভীর প্রেমের স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল—বাহিরের উচ্ছল কলরোলে তরঙ্গ তোলে নাই। মৃত্যু আসিয়া মহান স্বামীর মহান প্রেমের স্বাদে ক্যাট্রিনের মন ভরিয়া দিল। ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতে শীলার চোখে জল আসিল। সমস্ত বইখানির করুণ সমাপ্তি চিন্তা করিতে করিতে শীলা ঘুমাইয়া পড়িল কখন—মোহিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানে জাগিয়া, উঠিয়া ভাবিয়া পাইলনা। দুঃখ ক্লান্ত ভাবটা ঘুমের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। গার্কোর কথা ভাবিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া—নিতান্ত বাস্তবের দন্তবিকাশের মত জাগিয়া মোহিনীর মুখ দেখা—শীলা না হাসিয়া পারিলনা। সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে সমস্ত গুছাইয়া হয়ত দেরী হইয়া যাইবে তাড়াতাড়ি শীলা রান্না করিতে গেল।

পরের দিন শীলার ঘুম ভাঙ্গিল দেরী করিয়া। বরুণ তখন স্নানের ঘরে। হাত মুখ ধুইয়া শীলা তাড়াতাড়ি মোহিনীকে বাজারে পাঠাইয়া, তরকারী কুটিতে বসিল। মা পূজা করিতেছেন বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া ধূপ-চন্দনের মৃদু গন্ধ আসিতেছে। রোদের দীপ্তিটুকু সোনালী আভা তখনও একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। সিনেমার কথা ভাবিতে ভাবিতে শীলার হাত চলিতেছে দ্রুত।

বরুণ আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বরুণ বলিল—শীলা! আমার দুটী বন্ধু—সরোজ আর উৎপল কাল ঠাট্টা ক'রে ব'লছিল মাইনে বেড়েছে বরুণ কবে খাওয়াবে আমাদের; আমি বলে ছিলুম—যেদিন খুসী খেয়ো ভাই—। কি করা যায় বলত শীলা! ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শীলা বলিল "তোমার বন্ধু তারা" ? বরুণ বলিল হাঁ বন্ধু বৈকি! তারা দুজনেই খুব ভালবাসে আমায়। একটু চিন্তা করিয়া শীলা বলিল—মাকে একবার বল—কোন রবিবারে খাওয়ালে ভালো হয় বোধহয়। মায়ের ঘরের দরজা খুলিল—পূজায়—করুণ বেদনা ভরা বিধবা জননীর সবটুকুই বুঝি নিবেদিত হইয়াছে। বরুণের মন কিছুতেই চাহিলনা, ঠিক এই মুহূর্ত্তে মাকে সংসারের তুচ্ছ কথা বলিয়া তাঁহার মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে। এখন যেন পার্থিব কথা শুনিবার মত মা নহেন—মুখের ভাবে তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের ভাব। মা আসিয়া বলিলেন বরুণ যাও নাইতে, দেরী হয়ে যাবে। বরুণ স্নানান্তে খাইতে বসিলে শীলা পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল—। বরুণ বলিল আচ্ছা শীলা, তুই কি সত্যিই আর কোথাও যাবিনে ঠিক করেছিস! শীলা হাসিয়া বলিল—আপাততঃ কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। অন্ততঃ বড়লোকদের বাড়ীতে ত নয়ই। —আচ্ছা আমি না হয় গেলুম কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও তাঁরা কি আমাদের বাড়ীতে কখনও আসবেন—গরীবের বাড়ীখানি পবিত্র করতে? উচিত হলেও করবেন না—যেহেতু আমাদের ছোট একতলা বাড়ী—কার্পেট বিছানো কৌচ ক্যাবিনেট কণ্টকিত ড্রইংরুম নেই এখানে। মিহি গলায় তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আমি পারিনে। বর্ষিয়সী মহিলা যখন তরুণীর হাল্কা বেশভূষায় সেজে গর্ব্বিত দৃষ্টি বুলোন চারদিকে তখন তাঁকে How lovely বলে তোষামদ জানাতেও আমি পারিনে,—কিসের জন্যে তাঁরা আসবেন? বেশী লোকজনের সঙ্গে মিশতে আমি

ভাল বাসিনে কোনোদিন—সে তুমি জান দাদা—তুমি আছ মা আছেন। যখন বেশী হাসতে ইচ্ছে হয়, মোহিনীকে নিয়ে একটু জ্বালাতন করে হাসি। সবার ওপর পড়াশুনো নিয়ে আমি ভারী সুখে আছি। বহু লোকের সঙ্গ থেকে আনন্দ সঞ্চয়ের লোভ আমার নেই। কিন্তু ওকি—তুমি ভালো করে খাচ্ছনা কেন, দাদা? বরুণ বলিল, মাছ গুলোত একটু বেছে দিতে পার শুধু কথাইত বলচ। শীলা হাসিয়া মাছ বাছিতে বাছিতে বলিল—তুমি আমার দাদা না হয়ে ছোট্ট ভাইটি হলেই ভালো হত। বরুণ বলিল, তুইত বেজায় বিরক্ত দেখচি বড়লোকদের ওপর। কিন্তু তুই রাগ করিসনে শীলা—ছোট খাট ব্যাপারে নীচতা দেখানো মেয়েদের মাঝে যত সুলভ—আমাদের ছেলেদের মাঝে সেটা ততটা প্রবল নয়। কতকগুলি মেয়ে আছে—যারা সুশিক্ষা পায়নি পেয়েচে কতগুলো টাকা নাড়াচাড়া করবার অধিকার তারাই টাকা আর নিজেদের ব্যবহারের সমতা রেখে চলতে পারেনা। তাই বলে সবাইকার সম্বন্ধেই এক রকম ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। শীলা বরুণের কথায় ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, থাক ওসব আলোচনা। কতগুলো কটুকথা আমার মুখে এসে জমেচে—সে গুলো প্রকাশ না হওয়াই ভালো। তোমার আফিসের সময় হলো—আমিও স্নান করতে যাব। বরুণ উঠিতে শীলা হাত ধুইয়া তাহার কাপড় চোপড়গুলি গুছাইয়া দিতে চলিল।

যাইবার সময় বরুণ বলিল—তা হলে রবিবার ওদের দুজনকে আসতে বলব ত? শীলা বলিল—হাঁ বলো। রবিবারে বরুণের অতিথি বন্ধু দুটি—সেদিন বেশ উপভোগ করিল। পরম যত্নে উৎপল আর সরোজকে শীলা অভ্যর্থনা করিল। উৎপল নীরব হইয়া লক্ষ্য করিল—আড়ম্বরহীন অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা। সরোজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিল শীলার হাতের রান্নার। তাহাদের সবচেয়ে চোখে লাগিল শীলার সহজ ব্যবহার—চমৎকার চেহারাটী। খাওয়া দাওয়ার পর চারিজনে চলতি দুনিয়ার যত দরকারী ও অদরকারী গল্প করিতে লাগিল। শীলাকে সরোজরা ভাবিয়াছিল সহজ সরল মেয়েটী। রান্নাবান্না করিয়া খাওয়াইতে খুব নিপুণা। দু একটী কথা বার্ত্তার পর দেখিল, তাহাদের ধারণা বদলাইয়া যাইতেছে। প্রায় সব বিষয়েই দুই চারিটী কথা শীলা বলিতে পারে। সাহিত্য শিল্প রাজনীতির সম্বন্ধে দু একটী সুচিন্তিত কথায় তাহারা বুঝিল শীলা যথেষ্ট বিদুষীও। বেলাশেষে দুইবন্ধু যখন শীলাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল—দুজনের মুখেই একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহারা চলিয়া গেলে বরুণ বলিল—তুই কেমন চমৎকার কথা বলতে পারিস শীলা—আগেত জানতুমনা, আমার বন্ধু দুটি বেশ খুসী হয়েচে তোকে দেখে। শীলা বলিল—তোমার বন্ধুরা কি বলেচেন না বলেচেন শুনতে চাইনে। আমাদের বাড়ীতে এসেচেন—তাঁদের যতখানি যত্ন করা উচিত করেচি। তার পরে আর কিছু জানতে চাইনে।

সরোজের বাবার মস্ত বড় লোহার কারবার। সরোজের শিক্ষিত প্রাণ—বীম, জয়েষ্ট, রেলিংএর ইঁকি, ফুট মাপিয়া তৃপ্ত হইতে চাহে নাই। বরুণের ম্যানেজার দয়ানন্দ বাবু তাহার পরিচিত, তাহারই আফিসে সে ঢুকিয়াছে জর্ণালিষ্টের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে। তাহার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে একখানা কাগজ বাহির করিবে।

উৎপল কিন্তু বরুণের মতই গ্রাসাচ্ছাদনের দায়ে আসিয়াছিল। বহুকষ্টে এম, এ পাশ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে কেহ না থাকিবার জন্যই হোক আর সাংবাদিকের জীবন ভালবাসিবার জন্যই হোক দয়ানন্দ বাবুর আফিসে সে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। তাহার লেখা কবিতা গুলিও অনেক পত্রিকা সাগ্রহে চাহিয়া লয়। একত্র কর্ম্মসূত্রে যে অল্প বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল—বরুণের সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, শীলার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাহা আরও একটু নিবিড় হইয়া উঠিল।

(৪)

দেড় বৎসর পরের কথা—প্রায় প্রতিদিন সরোজ ও উৎপল আসিয়াছে। উৎপলের প্রতি শীলার প্রীতি নিবিড় আকর্ষণ জাগাইয়াছে। সরোজ তাহা বেশ বোঝে। তাহার মন ঈর্ষায় ভরিয়া যায়। উৎপলের দিকে চাহিয়া শীলা যখন হাসে, অনর্গল বকিয়া যায়

সরোজের মনে প্রশ্ন ওঠে উৎপল কিসে তাহার চেয়ে বড় ? এমন কি জিনিষ তাহার মধ্যে আছে যাহাতে শীলার মনোযোগ তাহার দিকেই যায়। সরোজের সঙ্গে কথা বলিতে, গল্প করিতে শীলা আগ্রহ দেখায় না কেন ?

সরোজের চেহারা সুন্দর—অর্থ আছে। সুসজ্জিত সরোজের গরদের পাঞ্জাবীর বুক পকেটে ইটালিয়ান রুমালের কোণ বাহির করা। নড়িতে চড়িতে ল্যাভেণ্ডারের মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে—খুবই পালিশ করা কথা বার্ত্তা তাহার—যত মেয়ের সঙ্গে তাহার এ পর্য্যন্ত আলাপ হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই তাহাকে পছন্দ করে। এই প্রথম সরোজ দেখিল—এমন মেয়েও আছে যে তাহার প্রতি অমনযোগ দেখাইতে পারে। অর্থহীন উৎপলের সাধারণ পরিচ্ছদ—ধোয়া টুইল সার্ট আর আড়ম্বর হীন-ভাবে ধুতি পরা চেহারা শীলার মনে বিভ্রম জাগাইল কেমন করিয়া ? উৎপলের চেহারা শীলার ভালো লাগে। তাহার পুরুষোচিত মূর্ত্তি—ঈষৎ গাম্ভীর্য্য ভরা ব্যবহার শীলার শ্রদ্ধা আবর্ষণ করে। মন কখন উৎপলের চরণে বিকাইয়া গিয়াছে শীলার চোখে তাহার আভাস পাওয়া গেলেও মুখের কথায় তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নাই। কোনদিন অনুপস্থিত থাকিয়া পরের দিন উৎপল আসিলে শীলার চোখে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া ওঠে। সরোজ নিরুপায় আক্রোশে ভরিয়া যায়, গতদিনের শীলার নির্লিপ্ত ব্যবহার স্মরণ করিয়া। উৎপলই শীলার আনন্দ কেন্দ্র—সে কেহ নয়।

ইতিমধ্যে বরুণের দু'একটি বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়াছিল। বরুণ বিবাহ করিতে রাজী নয়। আর্থিক সচ্ছলতা না হইলে সে বিবাহ করিবে না। তা ছাড়া শীলার বিবাহ না হইলে ত নয়ই। উৎপল আর সরোজ এই দেড় বৎসরে, শীলাদের বাড়ীর প্রত্যেকের বন্ধু হইয়া পড়িয়াছে।

কয়েক দিনের চিন্তার পর সরোজ বরুণকে সোজাসুজি বলিল, বরুণ। আমি শীলাদেবীকে বিয়ে ক'রতে চাই যদি তোমার আপত্তি হবে কি ? তোমার বোন আমাদের বাড়ীতে পড়লে খুব বেশী কষ্ট পাবেন না আশা করি তুমি বুঝতে পার। হঠাৎ সরোজের প্রস্তাব বরুণকে চমকাইয়া দিল। একটু ভাবিয়া সে বলিল—আমি তোমায় কোন কথা ব'লতে পাচ্ছিনা সরোজ—যাকে আর শীলা যথেষ্ট বড় হয়েচে তাকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। সরোজ, বলিল— বেশ তবে আমায় তাঁদের মত নিয়েই জানিয়ো।

বরুণ, সেদিন সন্ধ্যায় শীলা যখন তাহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিল বেশ হাল্কামনে ডার্ব্বির টিকিট কেনা লইয়া ঠাট্টা করিয়া—তখন সরোজের কথা তাহাকে বলিল। কথাটা শুনিয়াই শীলা গম্ভীর হইয়া গেল। তারপর বলিল—দাদা সরোজ বাবুকে কামনা করে—এমন মেয়ের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক আছে। আমার কিন্তু তাঁর ওপর একটুও লোভ নেই। আমি এমন ঘরে যেতে চাইনে—যেখানে আমার মন একটুও সঙ্কুচিত হবে। ধনী দরিদ্রের যে বন্ধন গড়ে উঠবে তাতে অনুকম্পা প্রকাশ পাবে অনেক খানি। আমায় তাঁরা গরীবের কুটীর থেকে নিয়ে গিয়ে রাজরাণী করচেন—এ কথা মনে হবেই। তাদের ধনী জনোচিত আদব কায়দা নির্ব্বিচারে মেনে নিতে আমার বাধবে—তাঁরাও খুশী হবেন না তাতে। সব-কিছু ছাপিয়ে অনুগ্রহের কথাই উঠবে তখন। আমি তা চাইনে। যদি কোনদিন আমাদের মত অবস্থার কেউ আমায় নিতে চান—সেখানে আমার আপত্তি নেই যেতে।

পরের দিন সরোজকে যখন বরুণ জানাইল—শীলার মতামত সরোজ রাগ করিল কিনা জানা গেল না কিন্তু একটা রক্তের উচ্ছাস তাহার মুখখানিকে লাল করিয়া দিল

কয়েকদিন পরে উৎপল আর শীলা গল্প করিতেছে, পাশে বসিয়া বরুণ একখানা মোটা বই লইয়া লাল পেন্সিলের দাগ দিয়া দিয়া কি যেন টুকিয়া লইতেছে।

উৎপলের একখানা কাব্য-গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে শীলার কোলের উপর তাহারই এক কপি। উৎপলের প্রথম উপহার। হঠাৎ শীলা বলিল—আচ্ছা সরোজবাবু ক'দিন থেকে আসচেন না এখানে। আপনি জানেন, কেন ? উৎপল বলিল—সরোজের সঙ্গে আমারও কদিন দেখা হয়নি। অসুখ ক'রেচে কিনা জানতে আফিস থেকে ফোন্ করেছিলুম কিন্তু ও বাড়ীতে না

থাকবার জন্যে ওর ছোট ভাই উত্তর দিয়েছিলো—দাদা বাড়ীতে নেই, ললিত মিত্রের বাড়ী গ্যাচেন।

সেদিন উৎপলের বিদায়কালে, তাহার সযত্ন রোপিত রজনীগন্ধার একটী গুচ্ছ আনিয়া উৎপলকে দিল। এই প্রথম তাহাদের উপহারের আদান প্রদান হইল। ফুল-গুচ্ছটী হাতে দিতে গিয়া শীলার সারাদেহে সলজ্জ শিহরণ জাগিয়া উঠিল। এতদিনের সহজ সাবলীল গতি আজই অনুভব করিল প্রথম—যেন একটু বাধিয়া যাওয়া ভাব। উৎপলের চোখে ফুটিয়া উঠিল ভারী গভীর দৃষ্টির অভিনন্দন।

সে রাত্রে উৎপল আনন্দের আবেগে কবিতায় লিখিয়া রাখিল প্রথম পাওয়া ভীরু উপহারের কথা। তাহার ঘরের বাতাস রজনীগন্ধার গন্ধটুকুতে ভরিয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে উৎপলকে অন্যমনস্ক করিয়া।

আরও কয়েকদিন পরের কথা—বরুণ দিল শীলার হাতে গোলাপী রংএর খাম। প্রজাপতির ছবির নীচে প্রণতি জানান। কাহার বিবাহের চিঠি! চিঠি খুলিতে বাহির হইল—সরোজ কুমার বসুর শুভ পরিণয় আগামী রবিবারে—ব্যারিষ্টার ললিত মিত্রের কন্যা সুতপার সহিত। পড়িয়া শীলা হাসিল—বরুণকে জিজ্ঞাসা করিল—সরোজ বাবু নিজেই তোমায় দিলেন? বরুণ বলিল—না—আমার অফিসের টেবিলে রেখে দেওয়া ছিল ওটা। একটা বক্র হাসিতে শীলার গোলাপী ঠোঁট দুখানির প্রান্তভাগ একটু উঁচু হইয়া উঠিল। তারপর বলিল—গরীব বরুণ দত্তকে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীর উৎসবে মানাবেনা ভেবে—নিজে তোমায় বলেননি। নেহাৎ দিতে হয় তাই দিয়েচেন। বরুণ বলিল—শীলা তুই সব কিছুরই মানে করিস্ বড়। শীলা বলিল—তা একটু করি বোধ হয়।

গরম ভাতের থালায় পাখার বাতাস দিতে দিতে শীলা ভাবিল—বন্ধুত্বকেও স্বীকার করিতে যাহার বাধিয়াছে, সেই চাহিয়াছিল দরিদ্রের মেয়েকে পত্নীরূপে—! চিঠি খানা পাঠানো এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, তুমি ছাড়াও এমন মেয়ে আছে যাহাকে পাইতে দেরি হয় না।

অলস মধ্যাহ্ণ। শীলার আজ কিছু ভালো লাগিতেছেনা। একখানা ক্যানভাসের চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ভাবিতে-ছিল উৎপলের কথা। ভিজা চুলগুলির কয়েকটী গুচ্ছ বুকের পরে ভাঁজ করা হাতের উপর পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি চিন্তাকুল। সে ভাবিতেছে—উৎপলের পরিশ্রম পুষ্ট সবল সুন্দর মূর্ত্তি খানি। তাহার বলা কথাগুলি নূতন মিষ্টতায় কানে বাজিতেছে উৎপলের মুখের ভাবে নৈরাশ্যের কাতরতা সে কোনদিন দেখে নাই। আপনিই আপনার ঐশ্বর্য্যে ভরা। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সদাই প্রস্তুত। শীলার জীবনের আদর্শের সঙ্গে উৎপলের বেশ মিল আছে। সরোজের প্রতি অমনোযোগ দেখানোর মূলে উৎপলের আকর্ষণ ও জড়িত রহিয়াছে অনেকখানি।

মোহিনী কতকগুলি কাপড় জামা রাখিতে আসিয়া-ছিল শীলার দিকে চাহিয়া বলিল—কি গো দিদিমণি—কি ভাবছো! আচ্ছা দিদিমণি! দাদাবাবুর কবে বিয়ে হবে? একটী বেশ চাঁদপানা বউ এলে বেশ হয়। তোমার একটী সাথী হয়—নয়? আমি কিন্তু একগাছা তাগা চাই দিদিমণি! শীলা বলিল—যা এখন বকবক করিস্‌নে—দাদাবাবুকে জিজ্ঞেস করিস্ কবে বিয়ে ক'রে মোহিনী জিভ কাটিয়া বলিল—ছিঃ তা শুধাব ক্যানে দূরের একটী বাড়ী দেখাইয়া মোহিনী বলিল—ঐ হোথায় আমার বোনঝি কাজ করে, কিনা—তাকে দিয়েছে খাসা তাগা ওদের ছেলের বিয়ে হ'ল কিনা, আমি বল্লুম আমি ও পাব দাদাবাবুর বিয়ে হ'লে। শীলা হাসিয়া বলিল—ও তাই তোমার অত তাড়া দাদার বিয়ের। আচ্ছা—বিয়ে যদি হয়—তুমি পাবে তোমার পাওনা। মোহিনী খুসী মনে চলিয়া গেল। শীলার ভাবনাগুলি যেন ছিঁড়িয়া গেল। কিছুতেই আর দানা বাঁধে না।

পাঁচটা বাজিল। বরুণ আসিবে। হয়ত তাহার সাথে উৎপল ও আসিয়া পড়িবে, ক্ষিপ্র হাতে শীলা তাহার সামান্য বেশ ভূষায় অল্প একটু সংস্কার করিয়া লইতেছে এমনি সময় বেশ উত্তেজিত চঞ্চল ভাবে বরুণ আসিল। এই শীলা খুব যে ঠাট্টা ক'রেছিলি—এই দেখ একলাখ টাকা পেয়েছি ডার্বিসুইপে। উঃ শীলা কি মজাই লাগচে, মনে হ'চ্ছে একলাখ টাকায় পৃথিবী কিনে ফেলি। কিন্তু কিনবার পক্ষে এ ভারী কম টাকা তবু এতগুলো টাকা

দিয়ে কি ক'রব ভেবে পাচ্ছিনা। দাঁড়া মাকে ব'লে আসি। বরুণ চলিল মাকে বলিতে।

মেয়ের চোখে জল আসিল। অতীতের কথা মনে করিয়া। তবু ছেলে মেয়ে তাঁহার স্বচ্ছল ভাবে থাকিবে। তাহাদের তরুণ মনের আকাঙ্ক্ষা গুলি যাহা দারিদ্র্যের জন্ত কোনদিন প্রকাশিত না হইলেও চিত্তে জাগিতেছে—সে গুলি মিটাইতে পারিবে ভাবিয়া সুখী হইলেন খুবই। মাকে প্রণাম করিয়া বরুণ ফিরিয়া আসিল শীলার কাছে। সে তখনও গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল—এই তোর শক্ লাগলো নাকি? শীলা বলিল—না ভাবচি—জীবনের যুদ্ধে আমরা দুজন ছিলুম বড় কাছাকাছি। পরস্পরের অবলম্বন হ'য়ে—আজ তুমি অনেক টাকার মালিক—দুজনে সরে যাবনাত দূরে। সুখের দিনে বন্ধু জুট্‌তে দেরী হবে না দাদা। বরুণ কাছে আসিয়া শীলার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, শীলা! তুই আর আমি দু'-জনের মাঝে আর কিছু নেই। দুঃখের আঁধারে যে বোনটী আমার তার স্নেহের আলো জেলে ঘুচিয়ে দিয়েচে সব ব্যথা—সুখের দিনে একমাত্র তারই অধিকার আমার পরে। তুই যে আমার সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য সে কথা আমি ভুলিনারে। আমাদের পৃথিবী ঘুরচে আমাদেরই কেন্দ্র ক'রে।

সে দিন ভাই বোনে কত রঙীন কল্পনা কতবার ভাঙিল আর কতবারই যে গড়িল। গলার হারটী নাড়িতে নাড়িতে শীলা হঠাৎ বলিল—দাদা আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূলে এই নীলাটীও র'য়েচে। একজনদের রিক্ত ক'রে আমাদের কাছে এসেচে ভরিয়ে তুলতে। বরুণএর মনটা কথাটা সংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল না। বলিল—একটা কিছু আছে—মেনে নিতে হয়—হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'ল বলে।

শীলা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল—ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল। যে উৎপলের অপেক্ষায় শীলা অন্তরে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে আজ সে আসিল না। আনন্দের মধ্যে সে ব্যথা নিবিড় হইয়া বাজিতে লাগিল, শীলার মনে।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া শীলার মনের অকারণ অভিমান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যাকুল বাসনার অতৃপ্তি তরল স্রোতে বহিয়া চলিল, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে,—তারার স্তিমিত দীপ্তিতে, অশ্রুরধারায়। নিজের দুর্ব্বলতায় শীলা লজ্জাও অনুভব করিল—নাই বা আসিলেন—হয়ত আজিকার সন্ধ্যা তাঁহার কাটিয়াছে অপর কোন বন্ধুর বাড়ীতে—বান্ধবী হয়ত কেহ আছে। বান্ধবীর কথা শীলা ভাবিতে পারিলনা। পরক্ষণে আবার ভাবিল—বান্ধবী নাও থাকিতে পারে। শ্রান্ত মনে শীলা ঘুমাইয়া পড়িল যখন, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। শীলার আকুল চিন্তা হয়ত তখন, উৎপলের নির্জ্জন ঘরে ক্লান্ত নিদ্রিত উৎপলের বুকে সাড়া জাগাইতেছিল স্বপ্ন হইয়া।

আফিসে বরুণের বন্ধুরা তাহাকে আখ্যা দিয়াছে 'লাকি ডগ' নাম করণ করিয়া। দয়ানন্দ বাবু আজকাল ভারী স্নেহময় ব্যবহার করেন। আগে ছিল অনেকটা প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ। এখন যথেষ্ট হৃদ্য ব্যবহার তাহার পরিবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বরুণ সরল মনে শীলার কাছে সব গল্পই করে। শীলা হাসে আর বলে, একদিন কিন্তু তোমার ম্যানেজারের গৃহিণীটি আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—তোমায় অনেক টাকা তাঁরা দিচ্ছেন। যদিও একশ টাকাতে আরও বিদ্বান কর্ম্মচারী আজকাল পাওয়া যায়। বরুণ ও হাসে, শীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—কি লক্ষ্য করিয়া, তাহা সে বোঝে।

দয়ানন্দ গৃহিণী একদিন হঠাৎ শীলা আর বরুণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শীলা বলিল—দাদা হঠাৎ নেমন্তন্ন করবার কারণ বুঝতে পেরেচো বোধ হয়? বরুণ বলিল—না ভাই, তোমার মত ক্ষুরধার বুদ্ধি কি আমার কখনও ছিল। শীলা বলিল এতদিন তুমি ছিলে সামান্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। আজকে তোমার হঠাৎ পাওয়া টাকার অঙ্কটা হিসেবে তোমার দাম অনেক বাড়িয়ে তুলেচে। বরুণ আর শীলার সম্মিলিত হাস্ত-ধ্বনি অনেক দিনের পর শোনা গেল।

বরুণ বলিল—এবারে শীলা তুই কাপড় পরে'নে। আমি এবার একটা ট্যাক্সি ডাকি। কাপড় ছাড়িয়া শীলা ঘরের বাহির হইতেই মোহিনী বলিল, একগাল

হাসিয়া—দিদিমণি! আমার কথা মনে আছেত? হঠাৎ জুতার শব্দে মোহিনীর কথা শেষ হইল না। বরুণকে দেখিয়া শীলা বলিল, দাদা! মোহিনীকে একটা ভাগা দিয়ো—তোমার বিয়ে হয়ত আজই ঠিক হ'য়ে যাবে। ও বলেছিল তোমার বিয়েতে একটা ভাগা নেবে। বরুণ বলিল—আজকেই বিয়ে ঠিক হবে বললি কেন—দুষ্টু মেয়ে দাদার সঙ্গে খালি ঠাট্টা!

শীলা বলিল চপলভাবে হাসিয়া—কেন বলেচি সে তুমি বুঝেচ,—দয়ানন্দ বাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্নটা তাঁর মেয়েটীকে গছাবার জন্তেই, এ যদি না বুঝে থাক তাহ'লে দাদা আমি বলবো তোমার কিছু বোঝবার শক্তি ভারী কম। • বহুকাল পরে দুই ভাইবোন একসঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিল।

সাদর অভ্যর্থনা পাইয়া, শীলারা ফিরিয়া আসিল দয়ানন্দ গৃহিণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া। উৎপল আসিল না। উৎকণ্ঠা চাপিয়া শীলা হঠাৎ চুপ হইয়া গেল।

কয়েকদিন আরও কাটিল। বরুণ অনেক রকম জিনিষ কিনিয়া তাহাদের বাড়ীখানি বেশ সাজাইয়া ফেলিয়াছে। শীলা যাহা যাহা পছন্দ করে, জামা কাপড় গহণা সবই সে শীলাকে দিয়াছে। কিন্তু শীলার গাম্ভীর্য্য কাটিতেছে না। ক্লান্ত দিন কাটিয়া যায় ধূসর সন্ধ্যা ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। উৎপল আসে না, কি একটা সঙ্কোচ সে অনুভব করে—কিছুতেই বরুণকে উৎপলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরিপূর্ণ আনন্দে আর নিজের নানা কাজে আজকাল বরুণ খুবই ব্যস্ত।

শরতের অপরাহ্নে—আকাশে লঘু মেঘের খেলা চলিতেছে, শীলা রবীন্দ্র নাথের 'রক্ত করবী' পড়িতেছে। পড়িতে ভাল লাগিল না। উঠিয়া, উঠানে নামিয়া, খানিকক্ষণ চঞ্চল হইয়া ঘুরিল। টবে রজনী গন্ধা আর দেওয়ালে বাহিয়া ওঠা ঝুমকো লতাটাকে দোলা দিল। তারপর ঘরে আসিয়া বইএর শেলফে খুঁজিতে লাগিল মন লাগিবার মত একখানা বই। রবার্ট ব্রিজেস্ এর কাব্য-গ্রন্থ খুলিতেই চোখে পড়িল 'Nothing is joy without you' গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শীলা বিছানায় শুইয়া পড়িল। দেওয়ালে একটী মাত্র ছবি, একটী সমুদ্রের দৃশ্য। উত্তাল তরঙ্গায়িত নীল জলের রাশি। ঢেউএর মাথায় নাচিয়া চলিয়াছে শুভ্র পালতোলা ক্ষুদ্র একখানি নৌকা। আরও দূরে দেখা যায় একটা প্রকাণ্ড জাহাজের সম্মুখটুকু। আকাশে ওঠা রাশিকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চাহিয়া চাহিয়া শীলার মন হারাইয়া গেল সেই অনন্তের আভাস লাগা সমুদ্রের ছবিখানির মধ্যে। অব্যক্ত বেদনা মথিত মন তাহার প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

বরুণের ডাকে সে যখন উঠিল তখন তাহার মনের অভিমানের বাষ্পটুকু মিলাইয়া গিয়াছে। নীরব প্রেমের স্নিগ্ধ লিখনখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে—আঁখি দুটী ভরিয়া। সে ভালোবাসে—উৎপলকে, তাহার সকল কামনার কেন্দ্র করিয়া। প্রতিদান পাইবে কিনা অনিশ্চিত! তবু তাহার সেই ভালবাসিয়াই সুখ। বনের মাঝে লোকলোচনের অন্তরালে প্রস্ফুটিত ফুলটির যে সুখ তাহারও তাই। এত বেদনা কেন সে পায়। না—মনকে তাহার সবল করিতেই হইবে। বরুণ বলিল—তোর কি অসুখ ক'রেচে শীলা কদিন থেকেই বড় চুপ চাপ মনে হচ্ছে। আমার শান্তশিষ্ট বোনটী একটা কিছু না হলে অত চুপচাপ থাকে—এ আমি বিশ্বাস করিনা। কি হয়েচে রে? শীলা বলিল—কিছু হয়নিত দাদা। বরুণ বলিল—দেখ শীলা উৎপল আসচে না কেন রে ক'দিন থেকে। আপিসে রোজই দেখা হয় কিন্তু আজকাল কেমন যেন আমায় একটু বেশী দূরে রেখে সে কথা বলে। শীলার মুখ রাঙিয়া উঠিয়াছে—বরুণ লক্ষ্য করিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সহজ স্বরে শীলা বলিল—এখন মনে হচ্চে উৎপলবাবু হয়ত ভেবেচেন—এখন আমরা বড়লোক হয়েচি। তাঁর সঙ্গে ঠিক আগেকার মত ব্যবহার নাও করতে পারি—ঠিক যেমন সঙ্কোচ আমাদের ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁর না আসবার কারণ এই। বরুণ হঠাৎ যেন একটা বড় কিছু বুঝিয়া ফেলিয়াছে এমনি ভাবে একটু তরল কণ্ঠে বলিল, আর আমার বোনটীর গাম্ভীর্য্যের কারণটাও বোধ করি উৎপলের না আসাটা—আমার কিন্তু তাই মনে হ'চ্ছে। শীলা বরুণের কোলের

মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ বুঝি কাঁপিতেছে। দাদার কাছে গভীর লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

পরের দিন বরুণ আসিল, উৎপলকে লইয়া। উৎপলের সামনে আসিতে শীলা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল তবু তাহাকে আসিতে হইল। দাদার মুখের দিকে সে চাহিতে পারিলনা যতক্ষণ মা না আসিলেন। মা আসিয়া বলিলেন উৎপলকে, এতদিন এসোনি কেন বাবা? উৎপল কিছু বলিবার আগেই বরুণ বলিল—উৎপল ভেবেছিল মা, তোমার ছেলেটা অনেকগুলো টাকা পেয়েচে ব'লে, ওর সাথে আর কথা কইবেনা। মা বলিলেন—ওকে তোমরা ডাকলেই পারতে বাবা,—তোমরা তোমাদের নিজেদের নিয়েই রইলে, এতে ও যদি অভিমান ক'রে না আসে, সেটা দোষের হয় না। সবাই হাসিতে লাগিল। ঠাণ্ডা ভাবটা কাটিয়া গেল। আর সেই সাথে শীলার সঙ্কোচ টুকুও অন্তর্হিত হইয়া গেল। মা চলিয়া গেলেন। এ কয়দিন উৎপল ভাবিয়াছিল,—বরুণদের বাড়ীখানি নিশ্চয়ই আড়ম্বরে ভরিয়া উঠিয়াছে। কল্পনায় বসন ভূষণে ভূষিতা শীলার যে মূর্ত্তি সে আঁকিয়াছিল,—তাহারও ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইল। প্লেনপাড়ের হাল্কা শাড়ী আর সেই পরিচিত হাতকাটা ব্লাউস। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যও চোখে পড়িল না। উৎপল একটু স্বস্তি বোধ করিল—না ইহারা বিশেষ বদলায় নাই।

নূতন তাগা পরা হাত দুখানি বাহির করিয়া একমুখ ঘোমটা টানিয়া মোহিনী খাবারের থালা দিয়া গেল।

উৎপলের সামনে, মোহিনীর খাবার দেওয়ার লজ্জা আর গহনা পরার আনন্দ এই দুইয়ের অদ্ভুত পূর্ব্ব প্রকাশ ভঙ্গী দেখিয়া শীলা হাসিয়া উঠিল বেশ জোরে। অতি মৃদুস্বরে বরুণ কহিল—বোনটার দেখচি বেজায় স্ফূর্ত্তি! শীলা বলিল—অমন ক'রলে আমি চলে যাচ্ছি দাদা। আর বলবনা ভাই, বরুণ চুপ করিল। উৎপল বরুণের শেষের কথাটি শুনিতে পাইয়াছিল। আগেকার কথাগুলি শোনে নাই। ওকথার অর্থ বুঝিতে পারিলনা কিন্তু শীলার হাসি, একটু লজ্জা মেশান রাঙা মুখখানি ভারি মিষ্টি, তাহা মনে মনে বুঝিল ভালো করিয়াই।

শীলার গতি ভঙ্গি ভারী মনোরম—কথা বলাও যেন নূতন করিয়া ভালো লাগিতেছে। উৎপল তাহার হারাইয়া যাওয়া ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে আবার। কয়েক দিনের পর অদর্শন ব্যাকুল দুটী চিত্তকে স্নিগ্ধ করিতেই যেন বরুণ স্নান করিতে গেল। শীলাকে বলিল—তোর নূতন কেনা বইগুলো দেখা না। শীলা উৎপলকে,—আমি আসচি।

বইএর সেল্‌ফের কাছে দাঁড়াইয়া শীলা আর উৎপল। একবার উৎপল শীলার দিকে চাহিল,—শীলার চোখও যে তাহার উপরই। পরস্পরের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই তাহারা চক্ষু নত করিল। শীলা বলিল মৃদুকণ্ঠে—আমদের সম্বন্ধে একটা মিথ্যে ধারণা ক'রে আপনি এখানে আসা বন্ধ ক'রেছিলেন, বলুন এ দুঃখ কোথায় রাখি? ঈষৎ হাসিয়া উৎপল বলিল, সব অপরাধের মার্জ্জনা আছে আমার ভুলটাও মার্জ্জনীয়। অমন ধারণা যে ক'রেছিলুম সেটা ভুল এ আমি মেনে নিচ্ছি। তাহার কথা শেষ না হইতেই সরোজ ডাকিল বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া—বরুণ! শীলা বাহির হইয়া বলিল—আসুন সরোজ বাবু! দাদা নাইতে গ্যাচেন। ঘরে ঢুকিয়া উপবিষ্ট উৎপলকে দেখিয়া সরোজের মুখে একটু অপ্রসন্নতার চমক বহিয়া গেল। উৎপল বলিল সরোজ! অনেকদিন পরে দেখলুম। উদাসীন ভাবে সরোজ উত্তর করিল—হাঁ—ব্যস্ত ছিলুম। বলিয়াই ঘরের নূতন আসবাব গুলি সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। উৎপলও একট বই খুলিয়া দেখিতে লাগিল। ভিজা তোয়ালে খানা কাঁধে ফেলিয়া বরুণ আসিয়া সরোজকে দেখিল এবং খুসী হইয়াই বলিল—কতক্ষণ এলে ভাই—কেমন আছো? শুষ্ক কণ্ঠে সরোজ জানাইল—বিয়ের গোলমাল এখনও থামেনি ভাই—বুঝতেই পারো আসা কত মুস্কিল। তুমি কেন যাওনি বরুণ। শীলার মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বরুণ তাড়াতাড়ি বলিল—শীলা কিছু খাবার নিয়ে আয় বা না ভাই সরোজকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দে।

বোনটির মুখের ভাব দেখিয়া পাছে কঠিন কিছু উত্তর সে দিয়া ফেলে, বরুণ ব্যস্ত হইয়া তাই শীলাকে পাঠাইয়া দিল। তার পর বলিল—আমারও ত ব্যস্ততার অবধি ছিল না

সরোজ—শীলার নানা সখের খোরাক জোটাতে ছুটোছুটী করতে হ'য়েচে বড্ড। শরীরটাও তেমন ভালো ছিল না ভাই—স্থবিধে মত একদিন নিশ্চয় যাব। একপ্লেট মিষ্টি আর চা আনিয়া শীলা সরোজের সামনে রাখিল। সরোজ কিছুই খাইতে রাজী হইল না—অবশেষে চা এর পেয়ালাটা তুলিয়া লইল—নিতান্তই বরুণের কথায় চা খাওয়া হইলে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া বলিল—কাল তোমার আর শীলা দেবীর আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন। তাই বলতে আমি এলুম। আরও দুচার জনকে ব'লেচি। অনেক লোকের ভিড়ের মাঝে আমার বন্ধুদের বলতে ইচ্ছে করে না। শীলা আর উৎপল নীরবে বসিয়াছিল। বরুণ বলিল—শীলা সরোজ আমাদের যেতে বলচে—যাবেত? উপেক্ষার স্বরে শীলা বলিল—আমাদের পরম সৌভাগ্য ওঁর নিমন্ত্রণ পাওয়া। কথার তীক্ষ্ণতা টুকু সরোজ বুঝিল। আরক্ত মুখে রুমাল দিয়া জোরে মুছিয়া সরোজ বলিল—চল্লুম তা হ'লে—বলিয়াই—বাহির হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে সরোজের রুমালের ইভনিংডি প্যারীর মিষ্ট গন্ধ টুকু ছড়াইয়া পড়িল।

সরোজ উৎপলকে অবহেলা করিল—ইচ্ছ করিয়াই সকলেই সেটা বুঝিল। শীলার মনে তাহা বাজিল বড় তীব্র ভাবেই। ঐই মানুষটিকে সে যে বড় ভালবাসে তাহাকে অবহেলা করা শীলার নিজেরই অবহেলা মনে হইল। সরোজের প্রতি যে সামান্য একটু প্রীতি তাহার ছিল—এই ঘটনায় তাহা একেবারেই চলিয়া গেল।

বরুণ একগোছা ভায়োলেট কিনিয়াছিল শীলার জন্য—সেইগুলি উৎপলকে দিয়া শীলা বলিল—কী মিষ্টি গন্ধ দেখুন। আপনি ভায়োলেট্ ভাল বাসেন? উৎপল বলিল—হাঁ—এর অতি মৃদু গন্ধটা ভারী ভালো লাগে আমার।

সে রাত্রে উৎপলের কিছুতেই ঘুম আসিল না। ভায়োলেটের মিষ্ট গন্ধ শয্যা ভরিয়া রাখিয়াছে। ফুল গুলি দূরে রাখিতে তাহার মন চাহে নাই। শীলার স্পর্শই যেন সে পাইতেছে ফুলগুলিতে। সঙ্গোপনে যে প্রেম আসিয়াছে ধীর পদ সঞ্চারে—আজ রাত্রে তাহারই আকুলতা টুকু, আনন্দ বেদনার তরঙ্গ তুলিয়া মরিতেছে—উৎপলের অন্তর সমুদ্রের উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া।

সকাল বেলায় বরুণের মোটর আসিল। বরুণকে নূতন গাড়ী দেখিয়া শীলা খুসী হইল। বাড়ীতে জায়গা নাই—রহমত আলীর গ্যারেজে গাড়ী রাখা ঠিক হইল। বরুণ বলিল—গাড়ীটা তোর নামেই নিলুম। অনেক গুলো গাড়ী ট্রায়াল দিয়ে এইটেই আমার পছন্দ হ'ল। শীলা বলিল—বেশ হয়েচে বেশ বেড়ান যাবে—রোজই আমরা যাব কিন্তু বেড়াতে। বরুণ শীলাকে খুসী দেখিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছারে আচ্ছা—এখন সরোজদের বাড়ী যাওয়ার মতটা বদলায়নিত? সত্যি শীলা তোকে নিয়েই আমার যত সমস্যা—ক্ষণে ক্ষণে তোর মত বদলায়—লক্ষ্মি ভাই—ওদের বাড়ীতে যেতে আপত্তিটা আর করিস্নে। লোককে শত্রু করে লাভ কি? যে যাই হোক কেন, আমাদের ব্যবহার সৰ সময়েই ভদ্র হবে এইটেই ভাল নয় কি? শীলা বলিল—যাব দাদা। তোমায় মিনতি করা আমার ভারী খারাপ মনে হয়। তুমি যদি খুসী হও আমার ভালো না লাগলেও আপত্তি করবোনা তাতে।

রূপময়ী শীলা যখন গিয়া, সরোজদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল বরুণের সঙ্গে, বহু কণ্ঠোত্থিত কলগুঞ্জন তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। যেমন করিয়া যবনিকা উঠিতেই ঐকতান বাদন থামিয়া যায়। রক্ত গোলাপের বিগলিত সৌন্দর্য্যে, শীলা সাজিয়া আসিয়াছে। ডালিম ফুলের মত লাল শাড়ীর নিচে, জরী জরান নাগরা জুতা। নরম পায়ের সাদা শোভা দেখা যাইতেছে। হাতে গলায় চুনীর গহনা—গৌর তনুখানি বেড়িয়া যেন রক্ত রাগের ঢেউ উঠিয়াছে। বহুর মাঝে পড়িয়া সরম রাঙা মুখ খানি—আজিকার সমাগতদের ম্লান করিয়া দিল। বরুণের শুভ্র সৌম্য কুমার কান্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সরোজের বোনের কলেজের সহ পাঠিনীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল। একজন বলিল মৃদুস্বরে—এ্যাডোনাইস বুঝি এমনি ছিল দেখতে রে। অপরা বলিল তাহার উত্তরে—তোর বুঝি ভেনাস হতে সাধ জাগচে সীতা। সঙ্গিনীরা হাসিয়া উঠিল। বীণা বলিল—পারিস যদি এ্যাডোনাইস্কে তুই-ই নিয়ে নিস, এখন দয়া করে আমায় উঠতে দে। বীণা সরোজের বোন। উঠিয়া শীলার কাছে গিয়া সে

বলিল। শীলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে সরোজের বধূ বসিয়াছিল, সেইখানে যাইয়া উপহারের বাক্সটা দিল। বধূ যুক্তকরে নমস্কার করিল। প্রতিনমস্কার করিয়া শীলা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল—নানা জনের নানা ভাবের কথা বার্তা। তীব্র আলোক রশ্মিতে শীলার কানের লম্বা বাইজানটীয় দুল জোড়া চিক মিক্ করিতে লাগিল। সরোজের মা আসিয়া উপহার দেখিলেন বেশ খুসির ভাব ফুটিয়া উঠিল তাঁহার মুখে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এত দামী উপহার আর কেহ দেয় নাই। সরোজ ও বীণা যথেষ্ট যত্ন দেখাইল। তাহাদের মাতা নিজেদের ত্রুটীর কথা জানাইয়া বারে বারেই শীলাকে বলিতে লাগিল—কিছু মনে কোরো না মা কিছুই আদর যত্ন ক'রতে পারলুমনা। শীলার বুকের মধ্যে একটা হাসির বন্যা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—আর তাহা চাপিতে গিয়া তাহার মুখের ভাব আরো বিভ্রম জাগাইতে লাগিল তরুণদের চোখে। কতজন ভাবিল—কোন ভাগ্যবানের বাহুপাশে বন্দিনী হইবে এই তন্বী। কাহার কণ্ঠে দুলিবে উর্ব্বশীর বরণমালা খানি।

যাইবার সময় সরোজ মার্জ্জনা চাহিল এবং শীলাদের আগমনে সে যে পরম সুখী হইয়াছে, তাহার এ সৌভাগ্য স্বপ্নাতীত তাহাও জানাইতে ভুলিল না। বরুণকে বলিল—এ সব গোলমাল একেবারে চুকে গেলে নিশ্চয়ই যাব ভাই তোমাদের ওখানে।

গাড়ী চলিতে সুরু করিলে শীলা বলিল—একদিন তোমায় বলেছিলুম দাদা, টাকা যাদু জানে, বিশ্বাস কর বোধ হয়?

বরুণ স্মিতমুখে বলিল—সত্যি শীলা তোর কথাই মেনে নিচ্ছি। এতকালের মধ্যে সরোজ আজকের মত ভদ্রতা কোনদিন দেখায়নি। এমনকি নিতান্ত অবহেলা দেখানো, চিঠি দেওয়া ছাড়া—বিয়েতেও এমন করে সাদর আহ্বান জানায়নি। টাকার যাদুর কথা অস্বীকার করা চলেনা। দুনিয়ায় টাকা ছাড়া প্রতিপত্তি হয়না তাও খানিকটা মানচি। উৎপলকে, সরোজ বলেনি কেন—সেওত সহকর্মী ছিল। উৎপলের কথা ওঠাতে শীলার আনন্দ দীপ্তিটুকু নিভিয়া গেল।

পরের দিন উৎপলের সঙ্গে যখন শীলার দেখা হইল—সে দেখিল একটা করুণ ক্লান্ত ভাব উৎপলকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উৎকণ্ঠিত হইয়া শীলা বলিল—আপনার কি অসুখ করেচে—উৎপল বলিল—না অসুখত কিছু করেনি এমনিই বোধহয়। রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিবার সময় পকেট হইতে ভায়োলেটের শুষ্ক গুচ্ছটী পড়িয়া গেল। শীলা দেখিল—কিছু বলিলনা। উৎপল যেন শীলা না দেখিতে পায় এমনি ব্যস্ত হইয়া সেগুলিকে আবার পকেটে রাখিল। তারপর শীলার দিকে চাহিল—শীলা হাসিয়া ফেলিল—আমি দেখেচি—শুকনো ফুলগুলো অত যত্ন করে রেখেচেন? উৎপল তাহার গোপন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবার লজ্জিত ভাবটা কিছুতেই লুকাইতে পারিলনা। বসিয়া বসিয়া বইএর পাতা উলটাইয়া চলিল। দুজনেরই মনের মধ্যে না-বলা কথার সুধার প্লাবন বহিয়া গেল।

কিছুদিন পরের কথা—। মা বলিলেন—বরুণ! এবারে শীলার বিয়ের চেষ্টা দেখ বাবা। বরুণ বলিল—মা! সে কথা আমিও ভেবেচি। আচ্ছা উৎপলকে তোমার কেমন মনে হয়? একটু ভাবিয়া মা বলিলেন ছেলে হিসাবে উৎপল অপছন্দের নয়। আমার ত খুবই ভালো মনে হয়। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে ব্যবস্থা করে ফেলতে পারো। কিন্তু শীলাকে একবার বুঝতে চেষ্টা করো। বড় হয়েচে—ওর নিজের মতামত জেনেই কাজ করা ভালো।

বরুণ আসিয়া শীলাকে বলিল—ওরে মাতো তোকে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়েচেন বড়। আমি মাকে উৎপলের কথা বল্লাম, তিনি বল্লেন—তোর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তিনি খুসী হবেন।

শীলা লাল হইয়া উঠিল। বরুণের কাছে মনের সকল কথাই সে বলে সঙ্কোচহীন ভাবে তবু উৎপলের সঙ্গেই বিবাহের কথায় সে ভারী লজ্জা অনুভব করিল।

বরুণ বলিল—তা হলে বোনটি। মৌনতাকেই সম্মতির লক্ষণ বলে, ধরে নিতে পারি নিশ্চয়ই! শীলা কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—কি দুষ্টুমিই সুরু করেচো দাদা! আমার মতে কি এসে যায়—মাকে ওত একবার জিজ্ঞাসা

করা দরকার। বরুণ বলিল—আমার মনে হয় সে খুসীই হবে। তুই মনে করিস শীলা আমার চোখটা বন্ধই থাকে কিন্তু বন্ধ চোখের মধ্য দিয়ে আমি সবই দেখতে পাই। শীলা হাসিয়া চলিয়া গেল।

উৎপলের আশার অতীত বস্তু যাহা তাহাকেই সে পাইবে, অসহ্য আনন্দে উৎপল অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার কল্পনায় রাণী শীলা—যে তাহার বহু রজনীর ঘুম হরণ করিয়া লইয়াছে, দিবসের কর্ম্মক্লান্ত মনে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিয়াছে যাহার চিন্তা তাহাকেই সে পাইতে চলিয়াছে—। বরুণের কথার উত্তরে কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—বরুণ! আমি দরিদ্র—আমার ঘরে এসে শীলা কি সুখী হবে ভাই! বরুণ বলিল—শীলা যে সুখী হবে তা আমি জানি। মায়ের ইচ্ছাও তোমায় দেওয়া শীলার সব ভার। আসচে মাসেই তাহ'লে সব ঠিক করে ফেলি।

বিবাহের দিনে বরুণ কুড়ি হাজার টাকার চেক লিখিয়া যৌতুকে দান করিল। সরোজ আসিয়াছিল সস্ত্রীক বিবাহোৎসবে যোগ দিতে উৎপলের ভাগ্যটাকে একবার নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া আর যৌতুকের টাকার অঙ্কপাত দেখিয়া ভাবিতে লাগিল—আর কিছু-দিন অপেক্ষা করিলেই ভালো হইত। ঝোঁকের মাথায় অন্তসারশূন্য ব্যারিষ্টারের মেয়ে বিবাহ করাটা ভুল হইয়াছে। মধুরে মেওয়া পদার্থটার স্বাদ উৎপলই লাভ করিল শেষ কালে।

বাসর ঘরে বধূবেশিনী শীলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া বরুণ বলিল—কালত চলে যাবি শীলা—,আমার কোথায় কি থাকে কিছুইত জানিনে ভাই—এবার থেকে কাপড় জামা কাগজ পত্তরের হিসেব নিজেই রাখতে হবে আমায় দেখিয়ে দিয়ে যাস সব। তুই যে আমায় অকর্ম্মণ্য করে রেখেছিলি শীলা! কেমন করে সব গুছিয়ে রাখব ভাই! বরুণের চোখের জল টলটল করিতে লাগিল। দাদাকে প্রণাম করিতে গিয়া শীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্বর্গ হাতে তুলিয়া দিয়াছে দাদাই…তাহাকে বিদায় দিয়া দাদা বড় দুঃখ পাইবে। শীলা না করিয়া দিলে তাহার যে কিছুই হয়না। আশীষ জানাইয়া অশ্রুসজল চোখে বরুণ চলিয়া গেল বেদনাতুর মনকে শান্ত করিতে।

গভীর রাত্রে বুকের কাছে শীলাকে টানিয়া লইয়া নরম হাত দুখানিতে মৃদু চাপ দিতে দিতে উৎপল ডাকিল—শীলা! আমার শীলা—সত্যিই কি তোমায় পেলুম আমি।

প্রদীপ

শ্রীবিমলা দেবী

জয় করে নিতে পারি সমস্ত সংসার
একাকী নিঃশঙ্ক চিত্ত, দৃপ্ত অধিকার
বিজয় পতাকা মোর তুলিয়া আকাশে
ঘন যশঃ কলধ্বনি ধ্বনিয়া বাতাসে
মুখরিত করি' মোর জীবনের পথ,
একাকী লঙ্ঘিতে পারি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত।
তুচ্ছ করি জীবনের সর্ব্ব বাধা ভয়
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিয়া অশঙ্ক নির্ভয়

শান্ত করি সমুদ্রের অশান্ত গর্জ্জন
জীবন আকাশে রাঙা তরুণ তপন
প্রজ্বলিয়া তুলিবার আছে অধিকার।
শক্তি নাই প্রিয়তম স্বর্গ রচিবার
একাকী জীবনে শুধু। সে যে আনে বাহি
নন্দন বনের আলো, নিত্য অবগাহি
স্নিগ্ধ শান্ত সুধারসে, ব্যাকুল হৃদয়
আনত নয়নে সেথা শুধু চেয়ে রয়

তুলসীর মূলে রাখি আরতির দীপ
তুমি না স্পর্শিলে মোর জ্বলেনা প্রদীপ।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইটুকু সত্যতার স্পর্দ্ধা লইয়া ইহারা দেশ উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। এতদপেক্ষা দস্যুবৃত্তি কি মন্দ? ভারতবাসীকে বুঝিতে হইবে যে ঝুলি লইয়া যাহারা ভারত উদ্ধার কল্পে অর্থ সংগ্রহে ব্যগ্র তাহারা কখনই ভারত উদ্ধারকারী নহে তাহারা আত্মস্বার্থান্বেষী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিতে দেখিতে পাই তিনি মণি হরণের কলঙ্ক স্বীয় স্কন্ধে লইয়াও সেই মহামূল্য মণি মথুরায় উগ্রসেনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিজে দ্বারকায় রাখেন নাই। এমন কি তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার বংশধরগণ পাছে স্বার্থান্বেষী হইয়া ভারতের অনিষ্ট ঘটায়, এই নিমিত্ত তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া নিজের বংশ ধ্বংস করিয়া শেষে নিজেও দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই স্বার্থশূন্য ভাবে সর্ব্বক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করাই যে দেশ সেবার প্রধানতম সোপান বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে বোধহয় কেহ আমাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্ধ স্তাবক আখ্যায় ভূষিত করিবেন না। আর এখনকার দেশনেতারা কি করিতেছেন? যদি কোন দেশভক্ত যুবক এই নেতাদের হস্তাক্ষর তাহাদের "Autograph" বইয়ের পাতায় স্মরনীয় করিয়া রাখিবার জন্য চায়, তাহা হইলে দেশনেতারা অম্লান-বদনে তাহার জন্য টাকা চাহিয়া বসেন এবং তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী সেই টাকা যোগাইতে ভারতবাসার এখনো অর্থাভাব হয় নাই। ইহাতেও লোকে বলে ভারতবাসী এখনো অর্থাভাবে অর্দ্ধ বাসে, অনশনে দিন যাপন করিতেছে। চমৎকার—!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতে বংশানুক্রমিক জাত্যাভিমানের পরিবর্ত্তে কর্ম্মের যোগ্যতানুযায়ী শ্রেণী বিভাগের পক্ষপাতী এবং তিনি নিজেও তাঁহার জীবন সেই আদর্শেই পরিচালিত করিয়াছেন। শৈশব হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত—রামকৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাই গোপ-পোষ্য অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বৈশ্যোচিত জীবন যাপন করিয়াছেন ইহার ভিতরে আমরা ভাবী ভারতের প্রতি আর একটী ইঙ্গিত দেখিতে পাই। তিনি ভারতকে কৃষি এবং গোপালনে ভারতীয় জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার এক ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় ভারতের প্রত্যেক পরিবারকে কৃষিজীবী হইবার উপদেশ ছলেই বলরাম কৃষকের প্রতীক লাঙ্গল অস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত কি কৃষ্ণ-বলরামের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণে জীবন পরিচালনে স্বীকৃত? জনৈক উমেদার গ্রাজুয়েট ১৫৲ টাকা মাহিনায় এক চাকুরীর জন্য আমার নিকট সুপারিশ পত্র চাহিতে আসিলে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম "১৫৲ টাকার মাহিনার চাকুরীর চাইতে তুমি লাঙ্গল ধরনা কেন?" সে ছাত্রটী আমায় যে উত্তর দিয়াছিল তাহা ইদানীন্তন ভারতীয় শিক্ষিত যুবকদিগের প্রণিধান যোগ্য। সে উত্তর দিল—"সার্, এতো টাকা পয়সা খরচ করে কি কাদামাটী ঘেঁটে চাষা হ'তে যাবো?" আমি মনে মনে ভাবিলাম ইহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপামর সাধারণ একই পন্থা অনুসরনে শিক্ষার প্রভাব;—এবং মনে মনে বলিলাম "চমৎকার!"

এখন যদি উপস্থিত শিক্ষিত ভারতের মনোবৃত্তির সহিত রামকৃষ্ণের বাল্য হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত জীবন-যাপনের আদর্শের সমালোচনা করি তবে কি বলিতে ইচ্ছা হইবে না—হায়রে সেদিন! আমি জানিনা উপস্থিত ভারতের শিক্ষিত যুবকগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে যে এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির ও আত্ম-সম্মানের মাপকাঠির এক আদর্শ তাহারা তাহাদের মনোমধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাতে এই যুবক-বৃন্দ শান্তি-পূর্ণ ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবন যাপনের পুনরায় সুযোগ পাইবেন? না, প্রচলিত শিক্ষার ফলে ভারতের বিপ্লব বাদের সমাধান,

হইবে, এইটুকু ভারতীয় মনিষীরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে পারেন।

কৈশোরে রামকৃষ্ণ শিক্ষার্থ গুরুগৃহে গমন করেন। গুরুগৃহ হইতে তাহাদের ক্ষাত্রজীবনের উন্মেষ। তাঁহার ক্ষাত্রজীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি অহেতু শুদ্ধ বীরাখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত বীরত্ব প্রকাশ অপেক্ষা কার্য্য সিদ্ধির জন্যই অধিকতর ব্যগ্র এবং ব্যয়-সাধ্য ও লোক-ক্ষয়কারী পন্থাও যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহার প্রমাণ জরাসন্ধ বধ, কাল-যবন নিপাত, পৌণ্ড্র বাসুদেব নিপাত, রুক্মিণী হরণ ত প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ভীষ্মের নিকট হইতে ন কর্ত্তৃক পঞ্চবাণ হরণ, দ্রোণাচার্য্যের তীরফলকে প্রবাহিত অশ্রুধারাকে সর্প বিভ্রম জন্মাইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্য নিধন ও জয়দ্রথ বধ প্রভৃতি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের নিকট অহেতুক বীরত্ব প্রকাশ অপেক্ষা কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি অধিকতর বরণীয় ছিল। অতএব তাঁহাকে চক্রী আখ্যায় যে ভূষিত করা হইয়াছিল, সেই আখ্যার সার্থকতা তাঁহার সমরনীতি অনুসরণে যে তদ্দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু থাকে না। অবশ্য এ কৌশল তিনি আত্মস্বার্থ সাধনোদ্দেশে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণের অভাব। সর্ব্বদাই তিনি ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন উদ্দেশেই কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই নীতি খণ্ড খণ্ড ভারতের পরিবর্ত্তে মহাভারত প্রতিষ্ঠাকল্পেই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নতুবা হয়তো এতো অল্পকাল মধ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে একচ্ছত্রাধিপতি ভারতসম্রাট করিয়া যাইতে পারিতেন না। সঙ্কল্প সিদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজে পরাভব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহার প্রমাণ অবন্তী অধিপতি দণ্ডী রাজাকে লইয়া পাণ্ডবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাদ—;—এই বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের হস্তেই ত্রিলোক-বিজয় কার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। এবং তাঁহারই কূট কৌশল যে ভারত যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? তিনি একলোষ্ট্রে অধিক পক্ষী নিধনের পন্থা কখনো পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিতেন না। এই নীতি অবলম্বনে ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠাকার্য্যে অগ্রসর না হইয়া কেবল বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভারতের রাজন্য-বর্গকে এক চক্রাধিপতি সার্ব্বভৌম সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহজনক।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজনীতিতে কৌটিল্যের আভাস পরিলক্ষিত হয় না—। যদি ও রাম অবতারে বালি বধ, ইন্দ্রজিৎ বধ, রাবণ বধেও কিছু কৌশলের আভাস পাওয়া যায় কিন্তু তদ্ত্রয়ের মধ্যে বালিবধে কৌশল অপেক্ষা সুগ্রীবের নিকট রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রমাণই প্রকৃষ্টতর। রাবণ ও ইন্দ্রজিত বধে শ্রীরামচন্দ্রের কৌশল অবলম্বন অপেক্ষা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ প্রকটিত হয়। কাজেই ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে কৌটিল্য যে অবলম্বিত হয় নাই সে কথা বলিলে বোধ কেহ আমাকে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তকারী মনে করিবেন না।

অবশ্য পরবর্ত্তী মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যকেও কৌটিল্য আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু চাণক্যের অবলম্বিত কৌটিল্য ও শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বিত কৌটিল্য মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চাণক্য দরিদ্র নিঃসহায় ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন প্রবল রাজশক্তির উপর স্বীয় প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করণোদ্দেশে। অস্ত্র চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করনোদ্দেশে এবং তৎসঙ্গে ভারতবর্ষে স্বীয় ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বিত কৌটিল্যে সেরূপ কোন স্বার্থপরতার আভাস পাওয়া যায় না। তিনি ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও ভারতবাসীর মঙ্গলকল্পে কৌটিল্য অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাছে কেহ তাঁহার চরিত্রে স্বার্থপরতার কলঙ্ক আরোপ করে এই আশঙ্কায় তিনি নিজের জীবদ্দশায় স্বীয় বংশ ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার স্বার্থহীনতার আর কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে? কৃষ্ণানুষ্ঠিত

রাজনীতি হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই? যে মহান স্বার্থের পায়ে আত্মস্বার্থ উৎসর্গ করিয়া সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন মহান কার্য্যে ব্রতী না হইলে সে কার্য্য সিদ্ধ হয়না। তাই তিনি গীতায় বলিয়াছেন

অফলাকাঙ্ক্ষি ভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্য মেবতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥

তিনি গীতায় সর্ব্বদাই সাত্ত্বিক ভাবের গুণগান করিয়াছেন কিন্তু অধুনা ভারত কি কৃষ্ণানুষ্ঠিত রাজনীতির অনুসরণ করিতেছে?

এই যে অসহযোগ সংগ্রাম বাধাইয়া স্কুল কলেজ ছাড়াইয়া ছেলে মেয়েদিগকে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পথে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল তাহাতে ভারতের কতখানি স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সাধিত হইল? এইযে উকীল, মোক্তার ও চাকুরিয়াদিগকে স্ব স্ব ব্যবসা ও কর্ম্ম ছাড়াইয়া তাহাদিগের অনেকের পরিবারে অসচ্ছলতা আনয়ন করা হইল, এই যে সেদিন কুলাঙ্গনা ও শিশুদিগকে রাস্তায় বাহির করিয়া তাহাদের বস্ত্রান্তরালে দেশনেতাগণ স্বীয় ব্যক্তিত্ব আবৃত করিয়া আত্মরক্ষা করতঃ দেশের সমস্ত শ্লীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, তাহাতে দেশের কতখানি মঙ্গল সাধিত হইল? অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলেনা যে অন্তঃপুরচারিণীগণের বহু স্বর্ণালঙ্কার তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া গেল বটে। এই অবস্থা দেখিয়া অনৈক রাজপুরুষ (অবশ্য তাহার নাম বলিলামনা) আমাকে ১৯৩০ ইংরাজিতে বলিয়াছিলেন—'India had the unique guide of her modesty of womanhood, but now I do not know why your politicians thought it wise to pull it down to the streets."

এই নীতি অনুসরণ করতঃ দেশ কতখানি উন্নতির মার্গে ধাবিত হইয়াছে তাহা একটু তথা-কথিত রাজনীতিকগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

এই যে দলে দলে দেশের যুবকগণ ডাক লুণ্ঠন ও দস্যু বৃত্তির অপরাধে ধৃত হইয়া কারাবরণ করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে তাহাতেই বা দেশের অর্থকৃচ্ছতার কতখানি সমাধান হইতেছে? এই যে terrorist সাজিয়া দেশের যুবক যুবতীবৃন্দ ইতস্ততঃ গুলি ছুড়িয়া অসহায় রাজপুরুষগণকে তাহাদের তন্দ্রতার সুযোগে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিহত করিল ও করিবার চেষ্টা করিল, তাহাতেই কি দেশের বৈদেশিক রাজপুরুষগণ এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন? না উহাতে দেশের স্বায়ত্তশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল? ইহার কৈফিয়ৎ কে দিবে?

এই প্রসঙ্গে শিবাজী ও রাজা জয়সিংহের কথোপকথনের একাংশ আমার স্মৃতিপটে উদয় হয়। বঙ্গের সুসন্তান রমেশচন্দ্র দত্তের "মহারাষ্ট্রজীবন প্রভাতের" যে অংশটুকু আমার স্মরণ আছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।—

শিবাজি মহারাষ্ট্রজাতিকে লুণ্ঠন ও অতর্কিত আক্রমণে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, রাজা জয়সিংহ সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া, শিবাজি তাহার সহিত তাহার রুগ্নশয্যায় সাক্ষাৎ করিতে আসিলে রাজা জয়সিংহ বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ, আপনি মহারাষ্ট্রদিগের জাতীয় জীবনের গুরু। মহারাষ্ট্রদিগের নৈতিক-জীবনের গুরু, আপনি মহারাষ্ট্রদিগকে লুণ্ঠন উৎপীড়ন ও চাতুরী শিক্ষা দিবেন না। তাহাতে মহারাষ্ট্রের ভাবী মঙ্গল সাধিত হইবে না। এই শিক্ষার ফলে মারাঠা জাতি ভারতকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিবে এবং উহাই মহারাষ্ট্র জাতির পতনের কারণ হইবে।' তখন শিবাজি উত্তরে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! মারাঠাদিগের এ উপায় ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের আর কি উপায় আছে? তাহাদের অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, দুর্গ নাই, তাহারা কি করিয়া বাদশার প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে?' তখন রাজা জয়সিংহ উত্তর করিয়াছিলেন, 'মহারাজ! পাপ দিয়া পাপ ধ্বংস হয় না। তাহাতে পাপবৃত্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আপনি মহারাষ্ট্র জাতিকে তার জীবন প্রভাতে পাপ শিক্ষা দিবেন না তাহাতে ফল শুভ হইবে না' ইত্যাদি—।

আমিও ভারতের এই রাজনৈতিক অধঃপতনের দিনে রাজনৈতিক রথিদিগকে রাজা জয়সিংহের মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতি একটু মনোযোগী হইয়া চিন্তা করতঃ নিজেদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে

অনুরোধ করি এবং ভারতবাসীকেও তথাকথিত ভারত হিতৈষীদিগকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা কালে সে কথাগুলি চিন্তা করিয়া অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। এবং আশাকরি এই লুণ্ঠন বৃত্তি অনুসরণ ফলে মহারাষ্ট্র-জাতির যে কি পরিণাম ঘটিয়াছিল তাহার পুনরুল্লেখের আর আবশ্যক পড়িবে না।

অবশ্য নিয়ম শৃঙ্খলা এবং নৈতিক জীবন ভাঙিয়া এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সৃষ্টি করা সহজ কার্য্য, কিন্তু তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া শৃঙ্খলার ভিতর আনয়ন করা অতিবড় শক্তিমানের কার্য্য। গৃহ নির্ম্মাণ এক দিবসে হয় না কিন্তু তাহাকে ভাঙিয়া চুরমার এক-দিবসেই করা যায়। এইরূপ দেশ হিতৈষণার নীতি ভারতের পূর্ব্বযুগে ইতিপূর্ব্বে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই, এবং কোন রাজশক্তিও এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব-লীলা নিশ্চিন্ত দ্রষ্টার মত দেখিবার দুর্ব্বলতা ইতিপূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসে কখনো প্রকাশ করে নাই। আজ যে এতো সহস্র বৎসরের শ্রীলতা, সভ্যতা ও সামাজিক বন্ধন এক মুহুর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল ইহার জন্য কে দায়ী—? কে উত্তর দিবে ?—

আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে খণ্ড খণ্ড ভারতের বিলোপ সাধনে মহাভারত প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। অন্যতম উদ্দেশ্য আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণ। কারণ মহাভারত প্রতিষ্ঠার পক্ষে উহা এক বিশিষ্ট অংশ। অন্যথায় আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে বিরোধ সমাধানের অন্য কোন সহজ পন্থা অবলম্বন সম্ভবপর ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র এতদুদ্দেশ্য যথেষ্ট প্রাণপাত করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুগেই প্রথম আর্য্য অনার্য্য মধ্যে (Intermarriage) বিবাহ প্রচলন হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং জাম্বুবানের কন্যা জাম্বুবতীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশে মত প্রচার অপেক্ষা "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়" নীতি অধিকতর অনুসরণ করিতেন। প্রমাণস্বরূপ তৎকর্তৃক সর্ব্বপ্রথম জাম্বুবতীর পানিগ্রহণ। তৎপরে সখা অর্জ্জুনের সহিত নাগকন্যা উলুপীর উদ্বাহ-বন্ধন। ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্বার পানিগ্রহণ। কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক উষার পানিগ্রহণও পর্য্যায়ভুক্ত। অধুনা হিন্দুশাস্ত্রে আমরা যত দেবদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অতি অল্পই বৈদিক :—হিন্দু শাস্ত্রে ঐ সংমিশ্রণের সময় হইতে বহু অনার্য্য-দেবতা স্থান পাইয়াছেন এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বৈদিক দেবতাগণের সহিত সমভাবে পূজিত হইতেছেন। অনার্য্য দেবদেবীগণের মধ্যে মনসার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংমিশ্রণের ফলে শ্রীকৃষ্ণ আর্য্য ও অনার্য্য জাতির যে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে। এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতে শান্তি যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ঐ যুগের ইতিহাস পাঠে পাওয়া যায়।

এইরূপ মোগল যুগেও মহাত্মা আকবর কর্ত্তৃক হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের এক প্রচেষ্টাও ভারতে চলিয়াছিল। কিন্তু অপরিণামদর্শী তৎকালীন ক্ষাত্র রাজাগণের মূর্খতায় মহাত্মা সম্রাট আকবরের সাধু প্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মহাত্মা আকবর হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম বিরোধের সমাধান করিতে গিয়া এক নবধর্ম্ম "সুফি ধর্ম্ম" নামে প্রচলন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদি হইত তবে আজ হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়তো ভারতে ঘটিত না এবং Communal award লইয়াও লণ্ডনের মন্ত্রীসভাকে এতো মাথা ঘামাইতে হইত না। হিন্দু, মুসলমানকে তো আপন করিয়া লইতে পারিলই না উপরোক্ত অপরিণামদর্শিতার ফলে বহুতর হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া মুসলমান সমাজকে শক্তিমান করিয়া তুলিল। এবং ঐরূপ হিন্দুধর্ম্ম হইতে দীক্ষিত মুসলমানগণই হিন্দুগণের উপর অধিকতর উৎপীড়নে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে আমার পরে আরো বিশদভাবে আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

অধুনা আমাদের ভারতীয় রাজনৈতিকগণ কি ভাবে হিন্দু সমাজে সংমিশ্রণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহার একটু আভাস এইখানে দিলে নেহাৎ অপ্রাস-

জিক হইবে না। হরিজন নাম দিয়া হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে স্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করার এক হুজুগ উঠিয়াছে। তাহার ফলে অস্পৃশ্য যত স্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত হোক না হোক হরিজন আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থলুণ্ঠন পুরোদামে চলিয়াছে। এই যে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারের হিসাব পত্র কেহ কাহাকেও দেওয়া যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই সাধারণ অর্থ লুণ্ঠনকারী দিগকে হিসাব পত্র দাখিলে বাধ্য করিতে কি কেহ নাই?

শ্রীকৃষ্ণের যুগে যে আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ কোন অর্থ লুণ্ঠনের কোন আভাস পাওয়া যায় না। সে যুগে এই যুগে সংমিশ্রণ সম্বন্ধে রাজনৈতিক এই প্রভেদ।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে নারীকে কেন্দ্র করিয়া রাজন্যগণ মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল এবং নারীর মূল্য যে পরিমাণ সে উপভোগের উপাদান যোগাইতে পারিত তাহার উপর নির্দ্ধারিত হইত। কথিত আছে ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারীর বৈধব্য নিবারণার্থ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে এক অজের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই পঞ্চপাণ্ডবকে ধর্ম্মপুত্র, ইন্দ্রপুত্র, পবন নন্দন ইত্যাদি বলিয়া শ্লেষ করিতেন। গান্ধারীর পিতা একদিন নাকি যুধিষ্ঠিরকে গান্ধারীর যে অজের সহিত বিবাহ হইয়াছিল এই গোপনীয় সংবাদ বলিয়া দেন এবং যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিদ্রূপ করিলে তাহাকেও অজপুত্র বলেন। এই অপরাধেই নাকি সপুত্র গান্ধাররাজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। ইহার ফলে শকুনী প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া চিরকাল কৌরবগণের ভিতর বাস করিয়াও শেষে কুরুকুল ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নারীর পূজা সম্বন্ধে ভারতে তেমন বাধাবাধি নিয়ম ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ তেমন পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণই ভারতের নৈতিক জীবনে নারীপূজা পদ্ধতি প্রচলন করিয়া যান, এবং নারী যে সম্মানের আধার তাহাও সমাজে প্রচলন করিয়া যান। ইহার প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক জগতেও এক মহান পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। নারীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পরে ভারতে কাপালিক যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন বিশেষ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যে নীতি দোষণীয় বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন অধুনা ভারতের তথাকথিত রাজনৈতিক হিতৈষীগণ তাহাই পুনঃ প্রচলনের এক সুগম পথ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা ভারতবাসীর বিচার্য্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবান্তর হইলেও না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভারতে প্রচলিত সঙ্গীতে বা কবিতাবলীতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে এক ভ্রম ধারণা সৃজিত হইয়া রহিয়াছে। লাম্পট্য সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে গেলে কৃষ্ণ রাধার নাম সংযোগেই সে উদাহরণ সাধারণের মুখরোচক। কিন্তু কয়জন অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐরূপ লাম্পট্যের কতখানি সংস্রব! কৃষ্ণের জীবনী সমালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান পুরুষ বিরল। তিনি কদাপি হাস্য পরিহাস ছলেও পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। যে রমণীকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে শাস্ত্র সঙ্গত ভাবে বিবাহ করিয়াই স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বিলাস বাসনা চরিতার্থের উপাদান স্বরূপ কখনো নারীকে ব্যবহার করেন নাই। যে কৃষ্ণের রাসলীলা বস্ত্র হরণ প্রভৃতির উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে সে কৃষ্ণের সহিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণের কোন সংস্রব নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ ভগবান ব্যাসদেব কাল্পনিক কৃষ্ণ ও রাধা সৃজন করিয়া গিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিতর যে মধুর সম্পর্ক তাহাই গীতায় ব্যাখ্যারূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি কৃষ্ণ চরিত্রের যতটুকু অনুধাবনা করিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ অবতার বা সর্ব্বদিকে পূর্ণ মানব ভারতের ভাগ্যে আর কখনো আসেন নাই। এতবড় চরিত্র বলে বলীয়ান না হইলে কি তাঁহার শ্রীমুখ নিসৃত গীতা কি

ভক্তিভরে পৃথিবীর সমগ্র জাতি পাঠ করিত? তাই বুঝি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ও চাণক্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাওয়া যায় না। যদিও সময় সময় এক এক স্থানে এক এক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু কেহ কোন রাজনৈতিক পন্থা অনুসরণে নব রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া এমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মগধরাজ মহাপদ্মের দুই পুত্র। এক নন্দ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কিংবদন্তী আছে যে চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা শূদ্রকুলোদ্ভবা এবং মহারাজ মহাপদ্মের প্রকৃত পত্নী ছিলেন না। তাই নন্দ চন্দ্রগুপ্তকে হেয়জ্ঞান করিতেন ও রাজ্যে তাহার কোনরূপ অধিকার স্বীকার করিতেন না। চন্দ্রগুপ্ত তাহার রাজ্যে ন্যায্য অধিকার স্থাপন উদ্দেশ্যে নন্দ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত পণ্ডিত চাণক্যের শরণাপন্ন হন। প্রতিহিংসান্ধ চাণক্য ও রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে প্রতিহিংসা মূলে এক নব রাজনীতি অনুসরণ করেন। সেই রাজনীতি ভারতে চাণক্যের রাজনীতি নামে বিখ্যাত হয়। চাণক্যের রাজনীতির মূলভিত্তি,—জগতের সর্ব্ববস্তু বা শক্তিতে অবিশ্বাস। কেবল আত্মশক্তিতে প্রত্যয় এবং আত্মস্বার্থের পরপন্থী যাবতীয় বস্তুর উচ্ছেদ সাধনে তাহারা কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ইহাদের রাজনীতির মূলভিত্তি ধর্ম্ম নহে বা ইহাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনও নহে। চাণক্যের রাজনীতির আর একটী বিশেষত্ব এই যে প্রতিপক্ষের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ ও গুপ্ত ভাবে হত্যার সাহায্যে স্বীয় ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখা। পণ্ডিত চাণক্য শাঠ্য অবলম্বনেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাই তাহার নীতি কথায় "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" উপদেশ স্থান পাইয়াছে। এরূপ কাপট্য পূর্ণ রাজনীতি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চাণক্য পণ্ডিতের পূর্ব্বে আর কাহারো দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সময়ও গুপ্তচরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই কিন্তু সে গুপ্তচর তাহারা নিযুক্ত করিয়াছিলেন নিজের কুৎসা শ্রবণের জন্য এবং গুপ্তচর মুখে কুৎসা শ্রবণান্তর সে কুৎসার কারণ তাহারা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু পণ্ডিত চাণক্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন স্বীয় কুৎসার কণ্ঠরোধের জন্য। অবশ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না যে এই সাংঘাতিক নীতি অনুসরণে পণ্ডিত চাণক্য বা চন্দ্রগুপ্ত সাময়িক মত সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী হয় নাই, তাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি শাঠ্য বা নীচতার দ্বারা কখনো উচ্চ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া কখনো মহান উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না, তাহার প্রমাণ যেমন আধুনিক ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাবলী নিষ্ফলা হইয়াছে। সেইরূপ, মৌর্য্যবংশ যদিও সর্ব্ব প্রকারের কঠোরতা সহকারে রাজ্যের শাসন নীতি পরিচালনা করিয়াছেন, তথাপি শাসনের কেন্দ্রী-ভূতস্থল অন্তসার শূন্য হওয়ায় তাহারা অধিক কাল ভারতে তিষ্ঠিতে পারেন নাই।

সর্ব্ব কঠোরতার মধ্যেও মৌর্য্যবংশের রাজত্ব কালে রাজপুরুষগণ অসৎপথাবলম্বনে রাজস্বপহরণে বিরত ছিলেন না, একথা তৎকালীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়। কাজেই ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে বাহ্যিক কঠোরতার আবরণে যদিও পণ্ডিত চাণক্যের রাজনীতি অনুসরণে মৌর্য্যবংশ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন তথাপি উহার অন্তরতম প্রদেশ অত্যন্ত শিথিল দুর্ব্বল ও বিশ্বাসহীন ভাবে চলিতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি ধর্ম্মজগতে অথবা নৈতিকজগতে সর্ব্বত্রই বিশ্বাস ও সততার উপর ভিত্তি স্থাপন করতঃ সৌধ গড়িয়া তুলিলে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয়।

চোরাবালীর উপর কাগজের অট্টালিকা বাহিরে চাক-চিক্যপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহা অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষণ-স্থায়ী। স্বার্থ, সাধারণের ন্যস্ত বিশ্বাসের অপলাপ ও অসততার ফলে আজ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র অন্তঃ-সার শূন্য হইয়া কেবল দেশহিতৈষণা ও দেশসেবাপুতঃ

মন্ত্রকে যেনো বিদ্রূপ করিতেছে। দেশ কল্যাণের যে পূত প্রতিষ্ঠান, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের সাধনায়, তারক পালিত ও রাসবিহারীর আত্মত্যাগে, দ্বারবঙ্গেশ্বর মহারাজ রামেশ্বর সিংহের ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের দানে, আশুতোষের অসাধারণ মনীষায়, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অশ্বিনীদত্ত, অম্বিকা মজুমদার, মহারাজ সূর্য্যকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল, বালগঙ্গাধর তিলক, দাদাভাই নরোজি, সার ফিরোজ সা মেটা ও লালা লাজপত রায় প্রভৃতি আত্মত্যাগী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গঠিত হইয়াছিল, আজ তাহা স্বেচ্ছাচার, অনাচার, অসদাচারে ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা কি কম দুঃখের কথা ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য যুগের মধ্যে আসিল এক মহানযুগ—যাহাকে ভারত-গৌরব যুগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সে যুগ আসিল কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থের সঙ্গে সঙ্গে।

ত্যাগী হিসাবে আমি রাজকুমার সিদ্ধার্থকে ভারতে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে চাই, কারণ রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বিলাসের উপাদানের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া যিনি জগতের দুঃখে এক মুহূর্ত্ত নিজে অপরূপ সুন্দরী পত্নী ও রাজ সম্পদকে ধূলামুষ্টির ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া কেবল মাত্র ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া বিরলে মানব মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন, তাহার ন্যায় ত্যাগী পুরুষ আর কে ?

বুদ্ধদেব আসিলেন এমন যুগে যখন ভারতে আবার বিলাসিতার উপাদান সংগ্রহের জন্য রাজন্যবর্গ পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ "যজ্ঞার্থে পশবঃ স্রষ্টা" এই বাক্যের দোহাই দিয়া পশুরক্তে ভারত প্লাবিত করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী পুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতের ভাগ্যাকাশে যে কি ঘটিত তাহা ঠিক বলিয়া উঠা যায়না। তৎকালীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ভারতে নারী ও মদ্য মাংসাহার দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাপকাঠী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোধন প্রমোদ উদ্যানে শাক্যসিংহকে নারী পরিবৃত করিয়া সর্ব্বদা আমোদে মত্ত রাখার জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের ভাগ্যাকাশে যথেষ্ট মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। সিন্ধুনদতটে গ্রীক্ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহা হানা দিয়াছিলেন এবং হুন পারসীক ও মঙ্গোলীয়ানরাও যে লোলুপ দৃষ্টিতে ভারতের দিকে তাকাইতেছিলেন না এমন নহে। এইরূপ বিপদের সন্ধিক্ষণে ভগবান বুদ্ধদেব বোধিদ্রুম তলে বোধিসত্ব লাভ করিলেন। মহানির্ব্বাণের প্রচার করিয়া ভারতে পুনরায় শান্তি সংস্থাপনের মন্ত্রপ্রচার করিলেন। তিনিই ভারতে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" নীতি প্রচার করেন। অবশ্য তাঁহার সমসাময়িক মহাবীরও সেই সময় মগধে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

নীরবে

শ্রীকনকলতা ঘোষ

নীরবে হৃদয়বৃন্তে প্রেমপুষ্প ফুটে উঠে
নীরবে দয়িতা প্রাণ দয়িত চরণে লুটে,
নীরবে আকাশে তারা ফুটে উঠে অগণন
নীরবে হাসিয়া উঠে জ্যোছনায় ত্রিভুবন।
নীরবে বাড়িছে ফল নীরবে বহিছে নদী

নীরবে প্রকৃতিরাণী করে বর্ষ নিরবধি,
নীরবে মায়ের বুকে অমৃতের প্রস্রবণ
অবিরাম ঝরে তাহা নাহি জানে কোনজন।
নীরবে যে প্রাণ স্রোত ফল্গুসম বহে যায়
তার সম শান্তিময় কিবা আছে এ ধরায় ?

বক্তা

—গল্প— শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র বি·এ

[বক্তা নিজে সব সময় মুখে যাহা বলে কাজে তাহা না-ও করিতে পারে তাহা তাহার অন্তরের কথা না-ও হইতে পারে। নকুড় বাবু গল্পটিতে এমনি একজন বক্তার পরিচয় দিয়াছেন।]

উমাপদ কথাটা একটু বেশী কয়—কিন্তু বাজে কথা নয়। দেশের কথাটাই তাহার সবচেয়ে লোভনীয় বস্তু। দেশের খবর সে সত্যই রাখে। কারণ; প্রত্যহ খবরের কাগজখানা আগাগোড়া মন দিয়া পাঠ করে। তাছাড়া পড়িয়াছে বি, এ, অবধি—বি, এ, তে ছিল ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে উমাপদর ঝোঁকটা কিছু প্রবল।

আধুনিকতম রাজনৈতিক ঘটনাদির উপর সে যেসব টিকা-টিপ্পনি দেয়, তাহা শুনিবারই মত বটে। সবাই বলে, উমাপদ তুমি যদি কোনও খবরের কাগজের সম্পাদকবিভাগে ঢুকতে পারতে—। উমাপদ একটু হাসে, হাসিয়া বলে; না হে, লেখা-জোখায় কিছু হবে না। বক্তৃতার দ্বারা মানুষগুলোকে উদ্বোধিত করে তুলতে হবে—কারণ দেশের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হল মাত্র ছয় পার্‌সেণ্ট।

তাই উমাপদ বক্তৃতা করে—কথা নয় সে, বক্তৃতাই। সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনেক উমাপদকে ধরিয়াছে, কিন্তু উমাপদ বলে ওসব হামবাগিজম্। আমি পছন্দ করিনে। আসলে উমাপদর ওটা মঞ্চভীতি।

উমাপদ বন্ধুবান্ধবদের নিকট ক্রমেই একটা আতঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। হাজার কাজের কথা হইলেও অবিশ্রান্ত কথা কে শুনিতে চাহে? বক্তার চিন্তার শক্তি অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু শ্রোতার শ্রবণশক্তির ত একটা সীমা আছে! উমাপদকে তাই আজকাল দেখিলেই বন্ধুরা তাড়াতাড়ি গা আড়াল দেয়···উমাপদ আর যেন শ্রোতা খুঁজিয়া পায় না।

ইতিমধ্যে উমাপদর হইল বিবাহ।

এখন আর তাহার শ্রোতার অভাব নাই। শ্রোতা এখন সর্ব্বদাই কাছে কাছে। তাছাড়া, উমাপদর জীবনের একটা উচ্চাভিলাষই ছিল যে, সে স্ত্রীকে এমনিভাবে গড়িয়া তুলিবে—বক্তৃতার অগ্নি-শালায় তাহার পূর্ব্বজীবন ও পূর্ব্বপ্রকৃতিকে পোড়াইয়া গলাইয়া তাহাকে নূতন ছাঁচে ফেলিয়া তাহাতে এমন এক অভিনব রূপ দিবে, যাহা দেশের অপরাপর মেয়েদের সম্মুখে একটা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে।

তাই স্ত্রীর নিকট উমাপদর কথার অন্ত নাই।

স্বামীর কথাগুলি সুষমার মন্দ লাগে না। হাজার হ'ক আধুনিক যুগের মেয়ে সে—দেশটা তাহার নিকট একেবারেই অবোধ্য নয়। এমন দেশভক্ত স্বামীর হাতে পড়িয়া সুষমা আপনাকে মনে মনে সৌভাগ্যবতী বলিয়া ভাবে।

সুষমা সামান্য লেখাপড়া জানে—ইচ্ছা করে, প্রত্যহ একখানা করিয়া বাংলা খবরের কাগজ পড়ে—কিন্তু দরিদ্র সংসারের অফুরন্ত কাজের ভিড়ে সময় করিয়া উঠিতে পারে না।

উমাপদ রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়া তাহাকে মুখে মুখে প্রতিদিনকার সংবাদ শুনায়, তৎসহ নিজের টিকা-টিপ্পনি চালায়—সুষমা ঘুমাইয়া পড়ে না, মন দিয়া শোনে।

সুষমা বলে, হাঁ, তোমার বোঝবার শক্তি আছে বটে!

কিন্তু সুষমা দেখে, স্বামীর বক্তৃতা দিবার শক্তি যতখানি, সেই বক্তৃতাকে জীবনে কাজে খাটাইবার শক্তি তাহার ততখানি নাই। অধিকাংশই বাচনিক। বাহিরে উমাপদর গায়ে খদ্দরের একটা মোটা পাঞ্জাবি ও আরও মোটা একখানা কাপড় থাকিলেও, বাড়ীর ভিতরের চেহারা অন্যবিধ। ঘরের কথা সুষমা যেমন জানে, কে আর তেমন জানিবে?

কিন্তু সুষমা স্বামীর কাছে কোনদিন এসব কথার উত্থাপন করে না।

সুষমার সবুজ, কাঁচা মনের উপর উমাপদর বক্তৃতার যাদুমন্ত্র যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সুষমার পক্ষে

অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং কখন আশায় কখন নৈরাশ্যে, কখন উদ্দীপনায় কখন উদাসীনতায় তাহার তরল প্রাণ; ঢেউয়ের মত, দোল খাইতে থাকে।

একদিন রাত্রে সুষমা সাহস লইয়া স্বামীকে বলিল, একটা কথা তোমায় বলিব, কি বল।

উমাপদ বলিল, কি বল।

সুষমা সসঙ্কোচে বলিল, একটা প্রার্থনা।

কি প্রার্থনা। উমাপদ ব্যগ্রভাবে কহিল।

সুষমা বলিল, একখানা ভারতমাতার ছবি আমায় কিনে এনে দেবে? ঘরে টাঙিয়ে রাখবো?

উমাপদ একটু পিছাইয়া গিয়া বলিল, ভারতমাতা। কেন, রোজই ত তোমায় আমি ভারতমাতার গল্প শোনাচ্চি।— আবার ছবিটবি কেন···ঘরে টাঙান কাজান কেন···

সুষমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তবে থাক।

কণ্ঠস্বরটা উমাপদর বুকে বাজিল। সে পরদিনই একখানা ভারতমাতার ছবি কিনিয়া আনিয়া সুষমাকে দিল।

সুষমা ছবিখানা কিছুক্ষণ হাতে ধরিয়া সহসা মাথা নোয়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল এবং পরে আপনার পুতুলের আলমারির মাথার উপর উহাকে তুলিয়া রাখিল। উমাপদ কি বলিতে যাইতেছিল—থামিয়া গেল।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন উমাপদ লক্ষ্য করিল, ছবিটার গায়ে একটা শুক্‌না ফুলের মালা। উমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, ওমালা কোথাহতে এল।

সুষমা জানাইল, আমি সেদিন পূজার ছলে ঐ মালাটা ভারতমাতার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম।

উমাপদ নিরুত্তর রহিল।

গান্ধীজীর উপবাস। উমাপদ এবং বাড়ীর আর সকলে যথানিয়মে আহারাদি করিল—কিন্তু উমাপদ দেখিল সুষমা শরীর খারাপের ভান করিয়া সারাদিন অনাহারে কাটাইল।

বড় রাস্তার উপর হঠাৎ কোন হৈ হৈ শব্দ উঠিলে সুষমা উৎকর্ণ হইয়া শোনে—স্বদেশভক্তদের মিছিল বাহির হইল কিনা। গলির মধ্যে কেহ বন্দেমাতরম বলিয়া হাঁকিয়া উঠিলে, হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া ঘরের জানালার নিকট গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে, কে ও। জলপ্লাবন বা ভূমিকম্পের সাহায্যকল্পে স্বেচ্ছাসেবকদের দল গান গাহিয়া বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিলে, ছাতে উঠিয়া সুষমা ছাত হইতে কাপড় বা টাকা ফেলিয়া দেয়।

উমাপদ আজকাল রাত্রে আর তেমনভাবে কথা কহে না—সুষমা জিজ্ঞাসা করিলে বলে কদিন শরীরটা তাহার ভাল নাই। শুইলেই উমাপদ ঘুমাইয়া পড়ে।

গলিটার ওপারে সামনের তিন চারখানা বাড়ী পরে একখানা বাড়ীতে সেদিন খানা তল্লাস হইয়া গেল এবং বাড়ীর কর্ত্তার একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। এই বাড়ীটার সঙ্গে উমাপদের বাড়ীর মেয়েদের জানাশোনা ছিল এবং গতিবিধি ছিল। সুষমা অনেকেবারই ঐ বাড়ীতে গিয়াছে এবং সুপ্রকাশকে দেখিয়াছে। এক আধবার তাহার সহিত কথাও কহিয়াছে। সুপ্রকাশের বয়স বেশী নয়। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়া অবিবাহিত জীবন যাপন করিতেছে।

রাত্রে সুষমা উমাপদের পাশে শুইয়া বলিল, শুনেচ সুপ্রকাশবাবুকে আজ ধরে নিয়ে গেচে।

শুনেচি—উমাপদ বলিল।

সুষমা বলিল, রাত্রে হাজতে হয়ত তাঁর কত কষ্ট হচ্চে, কি বল। উমাপদ বলিল, হুঁ। সুষমা বলিল, অথচ দেখ, আমরা দিব্য আরামে কেমন শুয়ে আছি। উমাপদ সেকথার আর উত্তর দিল না। খানিকপরে সুষমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সুপ্রকাশবাবুর মত মানুষ হঠাৎ দেখা যায় না। উমাপদ নড়িয়া উঠিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরদিন রাত্রে দেখা হইতেই সুষমা বলিল, শুনেচ, শুনেচ, সুপ্রকাশবাবুকে আজ ছেড়ে দিয়েচে। আঃ বাঁচা গেল।

উমাপদ বলিল, হাসিয়াই বলিল, মনে হচ্চে তোমাকেই যেন এতক্ষণ হাজতে পুরে রাখা হয়েছিল—তুমিই যেন ছাড়া পেলে।

সুষমা লজ্জা পাইল—কিন্তু মুখ দিয়া আর তার কথা ফুটিল না।

সেদিন সকালে সুষমাকে ঘরে বা রান্নাঘরে কোথাও না দেখিতে পাইয়া উমাপদ ছাতে গেল। ছাত ছাড়া আর কোথায় যাইবে। সুষমা ছাতেই ছিল।

ছাতের এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া সে অনিমেষ লোচনে কি দেখিতেছিল। তাহার দৃষ্টি ধরিয়া দৃষ্টি দিতেই উমাপদ দেখিল—ও ছাতে সুপ্রকাশ আলিসায় হেলান দিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে।

সুষমা—

চম্‌কিয়া উঠিয়া সুষমা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, কি বলছ? বলিয়াই একটু হাসিল। হাসছ আবার? লজ্জা কচ্ছেনা—ভয় কচ্ছে না?

সুষমা সহজভাবেই উত্তর দিল লজ্জা কিসের—ভয় কিসের? গুরুর দিকে চেয়েছিলুম বলে লজ্জা—ভয়?

গুরু—!

হাঁ, গুরু উনি আমার জীবনের গুরুই বল, দেবতাই বল, আর যাই বল তাই। বলিয়া সুষমা পাঠনিরত সুপ্রকাশের দিকে একবার চাহিয়া হঠাৎ কপালে দুইহাত ঠেকাইয়া তাহাকে নমস্কার করিল।

পরদিনই উমাপদ সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল এবং তদবধি বক্তৃতা ছাড়িয়া দিয়া সুষমার মন বুঝিয়া একটু একটু স্বদেশী অবলম্বন করিল।

বন্যা
বা
দেব-রোষ

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

ওরে ও আমার মাঝি!
কোন্ 'গাঙ্' দিয়া ভাসাইলে 'নাও'
তাই যে ভাবি আজি।
সেদিন ও তো হায় এমনি ভর রাতের আঁধার তরে,
কালো কালো জল উঠেছিল ফুঁসে. সোনার বালুধ চরে।
'বিহান' হতেই এমনই ভর বয়ে'লো পুবের বায়
জল ভরা 'দেয়া' তারি সাথে সাথে ছুটে বেড়ায় হায়!
গুরু. গুরু, গুরু, দেয়া ডাকে শুধু, তরাসে যে কাঁপে বুক
'ছেল্যা' কোলে নিয়ে আমি ঘরে বসে তাকাই তোমার মুখ।
আঁধারের সাথে. মরা নদীটাতে ধেয়ে এলো যেই বান
ঘরে ঘরে সব ঘুমানো মানুষের নিমিষেই নিয়ে গেল 'প্রান্'।
তুমিও ভাসলে, আমিও ভাসলাম, আর ভাস্‌ল মোর খোকা
কি পাপ যে করেছি, বিধাতার পায়ে তাই এ'দুখযু' লেখা।
দিন কত পরে, সরে গেল সেই করাল বানের জল.
জানিনা কেম্‌নে, না মরে ফির্ লাম হারায়ে বুকের বল!

কোথায় রহিলে মাঝি!—
খোকাটী বা আমার কোথায় রহিল
তাই যে ভাবি আজি।
সেইদিন হতে, এই এ জগতে 'পাগল' হয়েছে নাম,
'পাগলী' বলে, 'দূর' 'দূর' করে, বিধি হল এমন বাম!
কবে যেন তুমি বলেছিলে মোরে, একটু পড়ে মনে—,
খোকার লাগিয়া 'ভিন গাঁও' খুঁজিয়া আনিবে রূপসী কনে
সেই খোঁজা, খুঁজিতে গিয়াছ কি তোমরা? দুজনে'সজ্জা'করি?
এখানে একাঁয়ে, আমি একা ঘরে কপাল কুটিয়া মরি।
আঁধারে দুচোখ মেলিয়া ধরিয়া পথের পানেই চাই—
আর কি কখনো, হাসিয়া শুধাবেনা? শুধুই ভাবি তাই।
আমার সোনার মাঝি!
আজি এ রাতে দেখা দাও এসে
নতুন করে সাজি।

জার্ণালিজমের অ, আ, ক, খ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

(৪) উপজীবিকা হিসাবে সংবাদপত্র

সেকালের সংবাদপত্রের পেছনে আর যাই থাকুক ব্যবসা বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু আজকাল ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার অবসর কম। বর্ত্তমানে সংবাদ পত্র পরিচালনাও বলিতে গেলে কটন মিল বা লাইফ-ইন্সিওরেন্স কোম্পানী পরিচালনার মতই একটা কিছু। একটা সংবাদপত্রকে দাঁড় করাইতে হইলে এই প্রতি-যোগিতার যুগে মূলধনের দরকার। কাজেই সংবাদপত্র পরিচালকদেরও লক্ষ্য থাকে যাহাতে এই মূলধন হইতে সুদস্বরূপ একটা মোটারকমের অঙ্ক আদায় হয়। সংবাদপত্র সেবাদ্বারা অন্ন সংস্থানের উপায় হইতে পারে এই আভাস পাইয়া আমাদের শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি আজকাল এই দিকে পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল ভালভাবে বি, এ; এম, এ পাশ করিতে পারিলেই ভাল সাংবাদিক হওয়া যায় না। এই কাজে হাত পাকাইতে হইলে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করা আবশ্যক। এই শিক্ষানবিশী কোন সংবাদপত্র অফিসে করিতে পারিলেই ভাল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি কোন রাজ-নৈতিক দল, গোষ্ঠি বা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি কাজেই যে সব মেধাবী ছেলের অতি সহজেই জার্নালিজমে দক্ষতা লাভ করিবার কথা তাহাদের পক্ষে নির্ব্বিবাদে সংবাদপত্র অফিসে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য হইতে পারে। পোনের আনা ক্ষেত্রেই একেবারেই অসম্ভবও হয়। কাজেই সংবাদপত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আবশ্যক। ইউরোপে এই শ্রেণীর বিদ্যায়তন অনেকগুলি আছে। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরাও একটা জার্নালিজম শিক্ষা বিভাগ খুলিবেন বলিয়া জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। এই বিভাগ হইতে যাহারা কৃতকার্য্য হইয়া বাহির হইবেন তাহাদিগকে দস্তুর মত ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয় যখন মাতৃ-ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়া লইতেছে তখন অনুমান করা অন্যায় নয় যে এই সাংবাদিকতা শিক্ষা ও মাতৃ-ভাষাতেই হইবে। মাতৃভাষার প্রতিপত্তি যখন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে তখন মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশেও ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক নয়। আজকাল ইংরেজী শিখিয়াও যখন সরকারী চাকুরী মিলিতেছে না তখন ইংরেজী শিক্ষার মোহ ও লোকের দিন দিন কমিবে বই বাড়িবে না। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচারই বৃদ্ধি পাইবার কথা।

সংবাদপত্র পরিচালনা দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চাহেন তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে মাতৃভাষায় সংবাদপত্র বাহির করা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেবল বি, এ; এম, এ পাশ করিলেই ভাল সাংবাদিক হওয়া যায় না। এই কথার অর্থ এই নয় যে সাংবাদিক হইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিতান্তই অনাবশ্যক। যাহারা সংবাদপত্র সেবাকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেই হইবে কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন বি, এ কি এম, এ ডিগ্রীধারীই যদি মনে করেন যে তাহার পক্ষে সাংবাদিক হইতে বাধা নাই তবে তিনি ভুল করিবেন। সাংবাদিক যেমন সুশিক্ষিত ও মেধাবী হইবেন তেমন তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়াই চাই। যিনি ভাল সাংবাদিক হইবেন সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নিজের দেশকে চিনিতে হইবে। মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক না হইলে তৎপরিচালিত সংবাদপত্রের প্রতি লোকের সহানুভূতি থাকিবে না। পলিসিদ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। বিবেকানন্দের এই

বাক্যটি তাহার মনে যেন সদা জাগ্রত থাকে। সংবাদপত্রসেবা শিক্ষার্থীর সকল দেশের ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। নিজের দেশের ত কথাই নাই ইউরোপের স্বাধীন দেশ সমূহের রাষ্ট্রগঠন প্রণালী সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার। নিজের দেশের রাজকীয় আইনকানুন সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। আর চাই শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও শাসন সংস্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা। কিন্তু এইগুলিও বাহ্যিক গুণ মাত্র, যে কেহ অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করিলেই আয়ত্ব করিতে পারে। ইহাছাড়াও কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহা একান্তই ভিতরের জিনিষ। কি কি আভ্যন্তরিক গুণের অধিকারী হইলে ভাল সাংবাদিক হইতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইউরোপীদের মতামত উদ্ধৃত করিতেছি এইজন্যে যে আমাদের ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই ব্যাপারে বড় উচ্চবাচ্য করেন না।

লণ্ডন টাইমস্‌কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সংবাদপত্র বলা যাইতে পারে। এই বিশ্ববিখ্যাত সংবাদপত্রের প্যারিসস্থ সংবাদদাতা মিঃ এম ডে ব্লোউইজ বলেন,—কবিত্বশক্তির উন্মেষ যেমন স্কুল কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না ভাল সাংবাদিক হওয়াও তেমন একমাত্র শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। সে স্কুলেই হউক সংবাদপত্রের অফিসে শিক্ষানবিশী করিয়াই হউক। জার্নালিজম সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা থাকা চাই। এই জিনিষটাও একটা মস্তবড় আর্ট। সকলেই জানেন আর্ট জিনিষটা কেহ শিখাইতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ নিজস্ব। কাজেই এই নিজস্ব গুণটুকু অল্পাধিক যাহার না থাকিবে তাহার পক্ষে সংবাদপত্রকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে যাওয়া অনুচিত।

ব্রিটিশ উইকলির নামজাদা সম্পাদক ডক্টর ডব্লিউ রবার্টসন নিকলের নিকট কতিপয় যুবক জার্ণালিজম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহে। তিনি বলেন, সে সমস্ত যুবকের খবরের কাগজ বা পত্রিকা পড়ার আগ্রহ খুব বেশী এবং সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহের দিকেই যাহাদের কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা তাহাদেরই শুধু সংবাদপত্রসেবাকে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত এমন অনেক ছেলে আছে স্কুল কলেজে যাহারা কার্যক্ষম বা মেধাবী বলিয়া যাহাদের খুব নাম আছে কিন্তু খবরের কাগজ বা পত্রিকা পাঠে তাহাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। এই প্রকৃতির ছেলেদের জার্নালিজম শিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বিখ্যাত সাংবাদিক ডাব্লিউ ডি ষ্টিড জার্নালিজম সম্বন্ধে যুবকদের উদ্দেশ্যে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—যিনি জার্নালিষ্ট হইবেন তাহার মনে যেন সর্ব্বাগ্রে এই কথাটা জাগে,—আমার এমন বিশেষ কি বলিবার আছে যে আমি লিখিতে যাইতেছি। আমার বক্তব্যের মধ্যে এমন কি নূতনত্ব আছে যাহা হাজার হাজার লোক বাণী বলিয়া গ্রহণ করিবে। আমার এমন কোন কথা আছে কি না যাহা বলিবার জন্য জার্ণালিষ্ট হওয়া নিতান্তই দরকার। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে যিনি জার্নালিষ্ট হইবেন তিনি যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতিশীল হন। চিন্তা ও বাক্যে দরদ মিশান না থাকিলে সংবাদপত্রদ্বারা লোকসেবা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সংবাদপত্রসেবীকে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিতে হয় বটে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাহার কাজ যেন একমাত্র সুতীব্র সমালোচনাতেই পর্য্যবসিত না হয়। সাংবাদিক হিসাবে সাফল্য লাভ করিতে হইলে লিখিবার ষ্টাইল বা ভঙ্গীর দিকে নজর রাখিতে হইবে। সংবাদপত্রে লিখিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। এই ভঙ্গীটুকুতে যিনি বাহাদুরী দেখাইতে না পারিবেন ভাল সাংবাদিক হইবার তাহার আশা নাই। প্যারিসের বিখ্যাত কাগজ ইউনিভার্সের সম্পাদক এম্ ভেনিলট বলেন—সংবাদপত্রের যে কোন একটি লাইন প্রথম দৃষ্টিতেই যদি পাঠকের সম্পূর্ণ বোধগম্য না হয়, একটি লাইন যদি দুইবার পড়িয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তবে সেই সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবার আশা কম। একবার একটি যুবক সংবাদপত্রের লেখক রূপে চাকুরী প্রার্থী হইয়া এই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে। যুবক কতকগুলি সুপারিশপত্র বাহির করিয়া সম্পাদকের টেবিলের উপর রাখিতেই তিনি হাসিয়া জবাব দেন—আমি অন্য কোন সুপারিশপত্র দেখিতে চাহিনা সমগ্র ইউরোপের যে নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক লোক সে যদি ওস্তাদ লেখক হয় তবে বিনা দ্বিধায় আমি তাহাকেই পছন্দ করিব। ভাল সুবোধ ছেলে বলিয়া হাজার সুপারিশপত্র আনিলেও আমার কাছে তাহার মূল্য নাই।

যাহারা সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে চাহেন উপরোক্ত কথাগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। (চলবে)

ছায়া ও কায়া

পায়ের ধুলো

এই বহু বিজ্ঞাপিত ছবিখানি দেখিয়া আমরা মোটেই আনন্দলাভ করিতে পারি নাই। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন—রাধিকানন্দ, জহর গাঙ্গুলী, ডলি দত্ত, সরযূবালা প্রভৃতি। কিন্তু কোন অভিনয়ই জীবন্ত বা প্রাণবান হইয়া উঠে নাই। অভিনয় অর্থে ইঁহারা অভিনয়ই করিয়া গিয়াছেন। এরূপ প্রাণহীন অভিনয়ে, ছবি কখনো মনের উপর ছাপ আঁকিতে পারে না। আখ্যান ভাগে যদি বিষয়-বস্তু থাকে এবং অভিনেতাদের অভিনয় যদি প্রাণবান হয় তাহা হইলে, ছবির সাফল্য অনিবার্য্য। 'One Night of Love' ছবিতে অভিনয় করিয়াই Grace Moore প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "The Private life of Henry VIII" এর পূর্ব্বে কেহ রবার্ট ডোনাটের মতো অভিনেতার প্রতিভার কথা জানিত না। যদি প্রতিভা থাকে এবং যদি তাহার পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, অভিনেতার আন্তরিকতার প্রয়োজন, আর প্রয়োজন ভাল বইএর, ভাল পরিচালক-এর। Ruth Chatertonএর মতো অভিনেত্রী কেবল ভাল বইএ নামিতে না পারিয়া তাঁহার সম্যক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিলেন না। শুধু "হাম বড়া" ভাব পোষণ করিয়া যে সে ছবিতে—নামিয়া গেলেই সুনাম হয় না। তাহাতে দুর্নামই বাড়ে। মনে রাখা উচিত যে ভাল বই-ই, প্রতিভাবান অভিনেতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—'দেবদাসে' না নামিলে, 'যমুনা'—বাঙালী না হইয়াও, এতো শীঘ্র সুনাম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন না। 'উমা'—চণ্ডীদাসে অভিনয় করিয়া—'রামী' নামেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক আলোচ্য বইখানিতে যে শুধু প্রাণহীন অভিনয়ই আমাদের নিরাশ করিয়াছে তাহা নহে—ইহাকে জনপ্রিয়তা প্রদানার্থে কতকগুলি 'প্যাচ' ও সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু আসল জিনিষে দোষ থাকিলে শ্লীল, অশ্লীল কোন 'প্যাচে'ই কিছু হয় না।

এদিকে বইখানি সামাজিক এবং সে হিসাবে, ইহার মূল্যও একটা ছিল কিন্তু তাহা অনুপভোগ্য হইয়াছে। এমন কি স্থান বিশেষে, গল্পের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। গান আছে অনেক কিন্তু তাহা তৃপ্তিকর হয় নাই। শব্দ গ্রহণের দোষ খুব বেশী।

তবে ছবিতে যে একখানি সাঁওতালি নৃত্য আছে তাহা আমাদের বেশ লাগিল।

দিগদারী—(কমিক)অভিনয় করিয়াছেন, তুলসী লাহিড়ী ধীরেন দাশ, কমলা (ঝরিয়া), জ্যোতিষ সিংহ, রঞ্জিত রায় প্রভৃতি। মোটের উপর মন্দ হয় নাই। তবে পূর্ব্ব-বঙ্গীয়দের অপেক্ষা, এখানকার লোকেরাই উপভোগ করিতে পারিবেন বেশী। তুলসীবাবুর পূর্ব্ব বঙ্গীয় কথা বলার ভঙ্গীতে তাঁহারা না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

গুরুচরণ



সাল তামামির হিসাব নিকাশ

সুধাংশুশেখর

গত সালের পূজা হতে বর্ত্তমান সালের পূজা পর্য্যন্ত নাটক এবং চিত্রের ক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

রঙমহল—

পতিব্রতা	৭০	রাত্রি
কাজরী	৬৮	"
বাংলার মেয়ে	৮৮	"
রাবণ	১১	"
পথের সাথী	৪৬	"

নাট্য নিকেতন—

মা	২০০	"
স্বর্ণলঙ্কা	২৬	"
চক্রব্যূহ	৪৫	"
জন্মতিথি	২৪	"
ব্রতচারিণী	৫০	"
খনা	৪০	"

নব নাট্যমন্দির—

অভিমানিনী	১৫	"
সরমা	৪০	"
বিজয়া	১০৩	"

মিনার্ভা—

মারাঠা মোগল	২১	সপ্তাহ
শিবশক্তি	২৭	"
বীর্য্যশুল্কা	৪	" চলিতেছে

রূপমহল—

জহির	৭	"
আত্মাহুতি	৩	" চলিতেছে

চিত্রা—

রূপলেখা	১৪	"
মহুয়া	১০	"
রাজনটী বা বসন্তসেনা	৮	"
দেবদাস	২০	"

রূপবাণী—

তরুণী	৭	"
তুলসীদাস	৬	"
পাতালপুরী	৫	"
মানময়ী গার্লস স্কুল	৯	"
বিদ্রোহী	৬	"

ক্রাউন—

চাঁদ সদাগর	২৭	"
দক্ষযজ্ঞ	২৯	"
বিরহ	৫	"
ফ্যান্টম্ অফ্ ক্যালকাটা (কলিকাতার শয়তান)	২	"

কর্ণওয়ালিশ—

সত্যপথে	১০	"

ছায়া—

মা	৬	"
বাসবদত্তা	৫	"
দেবদাসী	৬	"

উত্তরা—

(পুরাতন ক্রাউন টকি হাউস)

মন্ত্রশক্তি	৫	সপ্তাহ চলিতেছে

চিঠি

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

আপনার চিঠি পাইবার পর হইতেই পুষ্পপাত্রের শততম বার্ষিকী সংখ্যার জন্য কি লেখা দিব তাই ভাবিতে ভাবিতে এতোদিন চলিয়া গেল। অবশেষে দেখি লেখা পাঠাইবার সময় একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে একবার ভাবিলাম আপনাকে লিখিয়া দি যে এবারে আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুষ্পপাত্রের জীবনের এ উৎসবে আর যোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু পরেই মনে হইল ক্ষতি বা কি? উপযুক্ত সজ্জায় সাজিতে না পারিলে কি কেউ পরমাত্মীয়ের বা আপনার জনের আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় না? ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে বলিয়া মনের শুভেচ্ছা ও স্নেহের ভাণ্ডার তো শেষ হইয়া যায় নাই। কাজেই আমার যৎসামান্য ভাষা লইয়াই পুষ্পপাত্রের শততম বার্ষিকী তিথিকে অভিনন্দিত করিতেছি। এ শুভদিন পুষ্পপাত্রের জীবনে অনন্ত হউক ও নামের সার্থকতা রাখিয়াই তাহা সৌন্দর্য্য ও সৌরভপূর্ণ হইয়া দেশের ঘরে ঘরে আনন্দ দান করুক।

প্রথমে ছোট গল্প বা নাটক এমন একটা কিছু লিখিবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গল্প লিখিতে গেলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মানুষের অল্প-সুখ ও দুঃখ সমস্যা-পূর্ণ জীবনের কাহিনী গুলিই চর্ব্বিত করিতে হয়। এতো চেষ্টা করিয়াও তো আজো কোন সাহিত্যে কেউ বড় বেশী নূতনত্ব দিতে পারে নাই। আজো সেই পুরানা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছাড়া আর কোন সাহিত্য জগতে দেখা যায় না। সেই পুরানা রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পারসীক ও ভারতীয় সাহিত্যের উপর ভিত্তি রাখিয়াই নূতনত্বের আবরণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন চরিত্র ভাব ও ধারা দিয়া একটা কিছু খাড়া করিয়া দেওয়া হয়। শুধু সাহিত্য কেন? বিশেষতঃ হিন্দী উর্দ্দু ও বাঙ্গলা গান গুলিও সেই পুরানা দিনের ভাব লইয়াই বাঁচিয়া আছে। অনেকে, এবং আমিও অনেক সময় একটা কিছু লিখিয়া ভাবিয়াছি এই বুঝি বেশ নূতন একটা ভাব সৃষ্টি করিয়া বসিলাম কিন্তু হঠাৎ অতি নির্দ্দয় ভাবেই সত্যটা নিজের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিয়া উঠে "তোমার 'সুধী'র চরিত্রটা যে অনেকটা বালজাকের 'অনরিন' হয়ে গেছে"। তখনি মনে হয়, যাক্, নূতন একটা কিছু যখন লিখিতেই পারি না তখন আর লিখিবই না। তাই ভাবিতেছিলাম কি লিখি।

অবশ্য তা বলিয়া সাহিত্যে আর কিছু লিখিবার নাই, তা বলিতেছি না। সাহিত্য জগত বহু খণ্ডে পূর্ণ এবং তাহা অনন্ত অফুরন্ত, ও পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থার এতোই পরিবর্ত্তন হইতেছে যে তাহাদের এখন আর চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া জীবনে সুখ দুঃখ লইয়া মনস্তত্ব লিখিবার বা পড়িবার অবসর নাই, তা করিতে গেলে জীবন বাঁচাইয়া রাখা দায়। কারণ এখন মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয় রীতিমত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া তবুও মনের ভাবে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ভাবকে মনের অন্তঃপুর হইতে একেবারে বাহির করিয়া আনিয়া মানুষ জগতের দ্রুত গতির সহিত তাহাকে মিশাইয়া নিতে চায়। তাই বর্ত্তমান যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা যেনো আর পূর্ব্বের মত নূতন ভাবে ভাষা ও ভাব প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ হইতে পারিতেছে না। কাজে আমিই বা উপযুক্ত ভাব বা ভাষা কোথায় পাই?

আজ পৃথিবী কবিতা ছাড়িয়া বিজ্ঞান ও রাজনীতি ধরিয়াছে। এই পৃথিবী দ্রুত চলিতে চায়। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ভাব ও ভাষা দ্রুত করিতে হয়। কল্পনা, কবিতা, আকাশ, পাখী, চাঁদের আলো, না দেখিয়া মানুষ দেখে আজকাল বিজ্ঞান, রাজনীতি, জগতের গতি—। নিমীলিত চোখে বসিয়া বসিয়া স্বপ্নের রঙিন ছবি দেখা তাহারা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতেছে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জীবনের সত্য বাস্তব গুলিকে। মানুষ উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া নিজের সমগ্র শক্তি বুদ্ধি দিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। এখন আমি কি লিখি?

সেই জন্য ইহারই ভিতর বিশেষ করিয়া রাজনীতি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নীতি প্রসঙ্গ বর্ত্তমান জগতে বেশী আলোচ্য। আলোচনাও আবশ্যকীয়। কারণ অনেক দিন হইতে সে সমস্যা পৃথিবীকে ছাইয়া বসিয়াছে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশের নর-নারীদেরও রাজনীতি ও সমাজ নীতির সত্যটা খুঁজিয়া লইতে হইবে ও সে সত্যের সন্ধান দিবার জন্য সাহিত্যে সেই প্রসঙ্গের প্রবন্ধ ও গল্প আনাই দরকার।

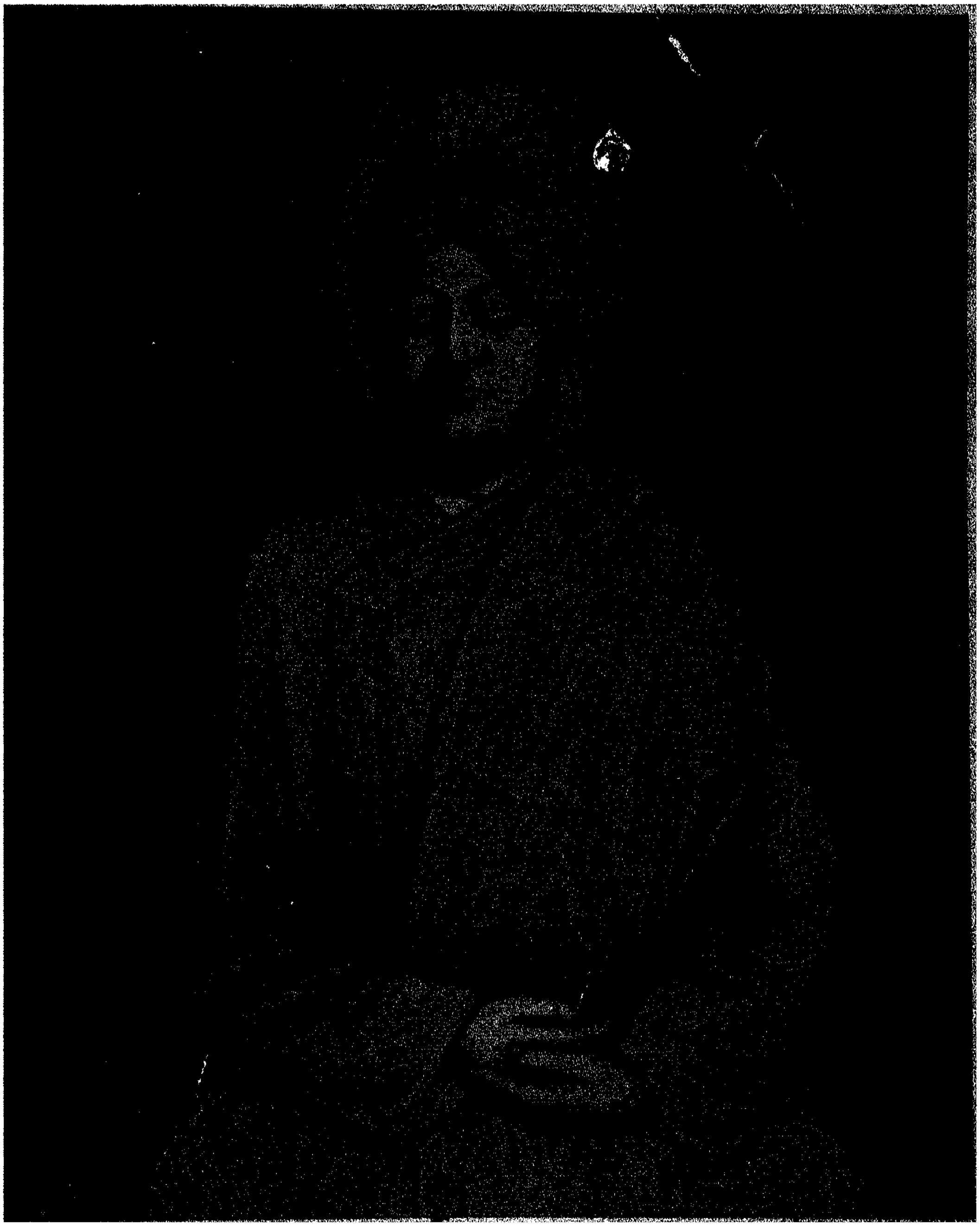
আজ দেশের বড় বড় সহর গুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া গ্রাম গুলির অবস্থা দেখিলে মনে হয় আমরা কোথায় আছি। আমাদের দেশের গ্রামগুলির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় বর্ত্তমান যুগের দ্রুত-গতিশীল ও উন্নতিশীল পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা যেনো এখনো তাহার সৃষ্টির কালগত হইয়া এই বিংশশতাব্দীতে কোন রকমে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া আছে। অথবা তাহার চলিবার গতি এতো ধীর ও ভুল যে মনে হয় এটুকু চলার চাইতে হয়তো বা একেবারে না চলাই ভাল। এ প্রসঙ্গ অত্যন্ত জটিল ও বৃহৎ।

সাহিত্যের ভিতর হাস্যরস প্রসঙ্গ একটা আছে। এই হাস্য রসটাও আজ আমাদের খুব বিশেষ ভাবে দরকার। কারণ প্রত্যেক মানুষের বাস্তব জীবনে শোক দুঃখ ও সমস্যা রূপ সঙ্গীগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া থাকে তবু বাঁচিতে হয়, অথচ শুধু দেহটাকে বাঁচাইয়া রাখিলে চলে না সঙ্গে সঙ্গে মনটারও অনেকখানি খোরাক জুটাইতে হয়। সে খোরাকের পুঁজি নিজের কাছে থাকিলে ভাল না থাকিলে অন্য কোন-খান হইতে ধার করিয়া আনিতে হয় তা না হইলে বাঁচিয়া থাকা কঠিন। সংসারে প্রথমতঃ সকালে উঠিয়াই খবরের কাগজ খুলিলেই চোখে পড়ে, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। তার উপর মানুষের সাংসারিক ও পারিবারিক "উৎপাৎ"গুলিতো আছেই। কাজেই এ জগতে হাসা এবং হাসিতে পারাটাই কঠিন সেই জন্য যে তাহা পারে তার আদর অধিক।

কিন্তু তারই ভিতর যখন নিত্যকার জীবনের মধুর অন্যদিকটাও পাশাপাশি দেখিতে পাই তখন মনে হয় বাস্তবিকই জীবন বিচিত্র। আর এই জীবনের প্রত্যেকটী দিনের ঘটনাগুলি বিশদ করিয়া বলিলে এক একটী গল্প হইয়া যায়। তাই ভাবিতেছিলাম কোন বিষয় লিখি।

সাহিত্য প্রসঙ্গ আজকাল জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে পারিলে পরে আরো লিখিব। আজ সময়ও বেশী নাই তাই এইখানেই শেষ করিলাম

(এই চিঠিখানি গত সংখ্যায় স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।)



স্বামী বিবেকানন্দ

১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩

মৃত্যু
৪ঠা জুলাই ১৯০২

শিল্পী—[illegible]

প্রথম পথপ্রদর্শক

—অরুণকুমার

যখন মিশনারীরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সে দেশের জন সাধারণের মধ্যে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে ভারতবাসীরা সকলে অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় তখন যে মহাপুরুষ তাদের সে ধারণা দূর করে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে জগতের কাছে আমাদের সম্মানী করে গেছেন, তাঁর ঋণ কি আমরা শোধ করেছি? একথাটা চিন্তা করার সময় এসেছে এখন।

শুধুই কি আমাদের সম্মানাস্পদ করে গেলেন তিনি। বর্তমান ভারতীয় জাগরণের মুখপাত্র কি তিনি নন, সেকথাও এখন স্মরণ করবার বিষয়।

১৮৯৩ সালে তাঁরই চেষ্টায় পৃথিবীর লোক জানলো, ভারতে এমন জ্ঞানভাণ্ডার আছে যা সারা পৃথিবীতে নেই। তারি ফলে সে দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না।

এদেশের পদানত দেশবাসীরা জানলো, সকলের মধ্যে সেই একই আত্মা কাজ করছেন। কেউ ছোট নয়। যে জুতা সেলাই করে আর যে রাজ্য শাসন করে, এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু কাজে। শাসক জুতা সেলাই করতে পারে না, তেমনি যে জুতা সেলাই করতে পারে সে শাসন করতে পারে না।

তিনি বলেছেন, "এই বিভাগ থাকবে বলে, তার অর্থ এই নয় যে, শাসক মুচীর মাথায় পা তুলে দেবে। এই অধিকার তারতম্য নির্মূল করতেই হবে। জেলেকে যদি বেদান্ত শেখাও সে বলিবে তুমিও যা আমিও তাই, তুমি না হয় দার্শনিক আমি না হয় মৎসজীবী। কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে সেই একই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই দরকার,—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করবার বিশেষ সুবিধা থাকবে।"

রক্ত মাংসে তৈরী জড় দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু যে কথায় সকলের কল্যাণ হয় তার মৃত্যু নেই—তা অমর।

সেই মহাপুরুষের উদ্দীপনী অমর বাণীতে দেশের লোক জেগে উঠল। ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধ শুরু হল। কবিরা দেশাত্মবোধের কবিতা রচনা শুরু করলেন। দেশের লোক বিদেশে পূজিত হতে লাগল। ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ হল। আর তার শেষ পরিণতি হল স্বাধীনতা লাভে। শুধু তাই নয় আজো তাঁর চিন্তা নানা নেতাদের মুখ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে।

সেই মহাপুরুষ বলেছেন, অতীতের গৌরবজ্জ্বল যুগের চেয়ে ভারত আরো অনেক উন্নত হবে। তারি সূচনা এখন দেখা যাচ্ছে। আগামী ১৯৬৩ সালে সেই মহাপুরুষের শতবার্ষিকী শুরু হবে। তারপর আবার যদি নতুন যুগের শুরু হয় বিস্মিত হবার কিছু নেই। সেই মহাপুরুষের ছবি অপর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

———

স্বরলিপি

[লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীঅসিত কুমার হালদার একাধারে কবি ও শিল্পী। তাঁহার রচিত এই সুন্দর গানখানি ভাবসম্পদে অতুলনীয়। এই সুন্দর গানখানি কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় রেডিওতে গাহিয়াছিলেন; এক্ষণে ইহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।]

কথা—শ্রীঅসিত কুমার হালদার   সুর ও স্বরলিপি—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

যদি চোখের দেখার বাহিরেতে
মন খুঁজে পায় তারে,
আপনি বারে বারে।
চমক্ তখন ভাঙ্‌বে আমার
জাগ্‌ব স্বপন পারে।
দুদিন এসে ভুলেছি যা'
চির দিনের কথা,
জাগ্‌বে তখন প্রাণের মাঝে
তারি বেদন ব্যথা।
চোখের দেখা মিলিয়ে যাবে
প্রাণের দেখার ধারে,
সকল প্রাণের মিলন সুখে
একটি প্রাণের হারে
—আলোয় অন্ধকারে।

আস্থায়ী

II { সা সর্ᐟা -া না | ধা পা -া -া | ক্ষপা ক্ষপধা -া পা | মা -া -া -া I
চো খে র দে | খা র ০ ০ | বা হি ০ রে | তে ০ ০ ০

সা -া মা -া | পা পা া -া | মা -া গা -া | মা পা -া -া I
ম ন খুঁ জে | পা য় ০ ০ | তা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০

গা গা গা মা | গা রা -া -া | গা -া মা -া | -া -া সা সা } I
আ প নি বা | রে ০ ০ ০ | বা ০ রে ০ | ০ ০ য দি

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্রা | র্সা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
চ ০ মক্ ত | খ ০ ন ০ | ভা ঙ্ বে আ | মা ০ র ০

সা সা দা দা | পা -া মা -া | গা -া গা -া | মা পা -া -া I
জা গ্ ব স্ব | প ০ ন ০ | পা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০

গা গা গা মা | গা রা -া -া | গা -া মা -া | -া -া সা সা II
আ প নি বা | রে ০ ০ ০ | বা ০ রে ০ | ০ ০ য দি

অন্তরা

II { মা পা -া ণা | পা না -া -া | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
{ দু দি ন এ | সে ০ ০ ০ | ভু ০ লে ছি | যা ০ ০ ০

র্সা র্সা পা পা | না র্সা -া -া | নর্সা র্রা র্সা -া | -া -া -া -া I
চি ০ র দি | নে ০ ০ র | ক ০ থা ০ | ০ ০ ০ ০

পা পা পা জ্ঞা | জ্ঞা -া -া -া | পা -া পা পা | পা -া -া -া I
জা গ বে ত | খ ০ ন ০ | প্রা ০ ণের মা | ঝে ০ ০ ০

জ্ঞা -া পা পা | মা জ্ঞা রা -া | রজ্ঞা মা সা -া | -া -া -া -া } I
তা ০ রি বে | দ ০ ন ০ | ব্য ০ থা ০ | ০ ০ ০ ০ }

{ সা দা দা দা | দা -া -া -া | পা দা পদণা দা | পা -া -া -া I
{ চো খে র দে | খা ০ ০ ০ | মি লি য়ে যা | বে ০ ০ ০

পা -া পা -া | পা -া ধা ণা | পা ধণা পা -া | -া -া -া -া } I
প্রা ০ ণের দে | খা ০ ০ র | ধা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০ }

{ গা মা পা পা | ধা -া -া না | পা ধা র্সা র্রর্সা | র্সা -া -া -া I
{ স ০ কল্ প্রা | ণে ০ ০ র | মি ০ লন্ সু | খে ০ ০ ০

র্সা র্সা -া দা | পা -া -া দা | মগা দা পা -া | -া -া -া -া } I
এক্ টী ০ প্রা | ণে ০ ০ র | হা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০ }

সা দা দা দা | দা পা দা পা | মা -া গা -া | গা গা মা পা I
আ লো য় অ | ন্ ০ ধ ০ | কা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০

গা গা গা মা | গা রা -া -া | গা -া মা -া | -া -া সা সা IIII
আ প নি বা | রে ০ ০ ০ | বা ০ রে ০ | ০ ০ য দি

বিচিত্র বাসর

(একদৃশ্যের নাটিকা)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল

[আজকাল যুবক যুবতীর আত্মহত্যার একটা হিড়িক লাগিয়াছে—মাঝে মাঝে এমন করুণ মর্ম্মন্তুদ সংবাদে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। সমাজের বাধা নিষেধ অনেক সময় হয়তো প্রকৃত প্রেমের মিলনের ! অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু আত্মহত্যার মানসিক ব্যাধি ছাড়িয়া অন্য উপায়ে তাহার প্রতিকারই বাঞ্ছনীয়। এ নাট্যখানিতেও দু'টি তরুণ তরুণীর আত্মহত্যার কাহিনী সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

[শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্নায় ছবির মত জমিদারদের প্রাসাদটী ঝক্ ঝক্ করিতেছিল—তারই সংলগ্ন সুরম্য বাগানের ভিতর বড় একখানা আয়নার মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল পুকুর।

রাত্রি তখন প্রায় ১টা হইবে সেই নির্জ্জন রাত্রিতে নিরালায় ঘাটে বসিয়া প্রিয়দর্শন যুবক অশোক এক মনে কত কথা ভাবিতেছিল। কত কথা…

ঠিক তেমনি সময়ে জমিদারের তরুণী মেয়ে সুনীলা ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিব্য ছিপ-ছিপে একহারা দেহের গঠন—মুখখানি শরতের শিউলীর মত স্নিগ্ধ, অনুপম]

(সুনীলা কাছে আসিয়া একখানি হাত অশোকের পিঠের উপর রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল) তুমি সত্যি কাল চলে যাচ্ছ অশোক ?

অশোক। হ্যাঁ নীলা কালই চলে যাচ্ছি, নইলে অযথা তোমাকে এতরাত্রে, চিঠি দিয়ে ডেকে আনতুম না—

সুনীলা (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হু—তা তো বুঝেছি—কিন্তু কেন যাচ্ছ অশোক ?

অশোক (তার ম্লান চোখ দুইটী সুনীলার চোখের উপর রাখিয়া) কেন যাচ্ছি ? আশ্চর্য্য প্রশ্ন ! কিন্তু…

সুনীলা। কিন্তু কি ? বল, বল, আজ যে আমি শুনবো বলেই বুক বেঁধে ছুটে এসেছি—বল, কেন এই অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ—

অ। কোন কারণ কি নেই নীলা ?

সু। জানি না, কি কারণে তুমি এমন বিবাগী হয়ে দেশত্যাগী হচ্ছ—কিন্তু আর দুটো দিনও কি…

অ। না—না—অসম্ভব নীলা—আর দু'টো-দিন কেন—দু'ঘণ্টাও আমি আর এখানে টিকতে পারছি নে—দম আটকে আসছে…কিন্তু এমন দিনও আমার ছিল নীলা, যখন আমার সমস্তখানি মনকে এই নগরের জল, বাতাস, মাঠ ছাওয়া চাঁদের আলো এমনি ভাবে মুগ্ধ করেছিল, যে, একে ছাড়বার কল্পনাও আমাকে ব্যথিয়ে তুলতো। কিন্তু সেদিন আমার ফুরিয়ে গেছে, কোন এক নির্ম্মম বিধাতা এসে আমার চোখের সমুখ থেকে যা কিছু সুন্দর, মনোরম সবই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—এখন এই মরুভূমিতে কি নিয়ে থাকবো নীলা,—কে আমার তৃষ্ণার্ত্ত মুখে এক ফোঁটা জল যোগাবে ?

সু। সত্যি কি এই নগরে এমন তোমার কেউ নেই অশোক, যে তোমার…

অ। না, না,—কেউ নেই, কেউ নেই নীলা—আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাবার, এমন কি আমার মর্ম্ম বেদনায় সান্ত্বনা দিবার এ নগরে কেন, এ জগতেই আমার আর এখন কেউ নাই—

সু। (চোখের ভিতর কাতরতা ভরিয়া) কথাটা কি সত্য ?

অ। হ্যাঁ সত্য—

সু। (একটু কি ভাবিয়া) না, অশোক, এ তোমার মিথ্যা কল্পনা—তুমি কবি ভাবুক—ভাবের রাজ্যে আপন ভোলা হয়ে ঘুরে বেড়াও—তাই আপন মনেই কখনো হাস, কখনো কাঁদ—কিন্তু সত্যিকার জগতের সঙ্গে তোমার তেমন পরিচয় নেই, নইলে আজ এমন করে…

অ। (সুনীলার চোখের কোণে জল দেখিয়া) এ কি, অশ্রু কেন— তুমি কাঁদছো নীলা ?

সু। না, কাঁদবো কেন—কিন্তু ভাবছি, কেন তুমি এ সব কথা বলছো—কেন তুমি নিষ্ঠুরের মত অকারণে চলে যাচ্ছ ? (চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিতেই সে আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিল)

অ। অকারণে ! না সু, অকারণে নয়—এ-কারণ এমনি ভীষণ, যে, মানুষ পাগল হয়ে যায়, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জলে ডুবে মরে—কিন্তু আমি যে কি করবো বুঝে উঠতে পারছি নে—কেবল এক অন্তর্ব্যথায় এ বুক খানা

কাঁটায় কাঁটায় ভরে উঠছে—উঃ, কী যে দুঃসহ ব্যথা নয়ে এখনও আমি বেঁচে আছি তা যদি জানতে নীলা, তা, হলে—তা হলে…

সু। …এমন করে আমাদের সেই শপথ ভেঙ্গে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিতকে বিয়ে করবার জন্য সম্মতি দিতুম না—এই তো বলছো অশোক? কিন্তু জান কি, কি কারণে এ কাজ করেছি—কেন, যাকে চিনি না, ভালবাসি না, তাকেই চিরজীবনের সাথী করবার জন্য নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় তোমাকে পর করে দিচ্ছি? সে কি আমার নিজের সুখের জন্য অশোক? না বন্ধু, তা নয়—শুনেছ কি কখনো নিজের সুখের জন্য কেউ তার হৃদপিণ্ডটাকে উপড়ে ফেলে? বিশেষতঃ কোন নারী?

অ। নারীর মনস্তত্ত্বের হদিস পুরুষ আজও পায়নি তাই মূর্খ, অন্ধ পুরুষ নারীর মিথ্যা ভালবাসার মোহে জড়িয়ে যায়—আর নারী জয়ের গৌরবে সেই মোহাবিষ্ট পুরুষের চোখের জল দেখে…

সু। (অকস্মাৎ অশোকের পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে) এই তোমার পায়ে পড়ছি অশোক—আমায় শাস্তি দাও—শাস্তি দাও—যে অবস্থায় পড়ে সেদিন বাবার কথায় সম্মত হয়েছি, সেদিকে তাকিও না, আমি অপরাধী, তাই আজ শাস্তি চাই—দাও,—দাও—ওগো আমার তোমার ইচ্ছেমত শাস্তি দাও—আমি মরে বাঁচি—

অ। শাস্তি! না, নীলা, আমি তোমাক শাস্তি দিতে পারি না—আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি—আমার সমস্ত হৃদয় মন তোমারই হাতে সমর্পণ করে আমি যে রিক্ত নিঃস্ব হয়েছি—শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার কোথায়? কিন্তু…না, না, এই শেষ বিদায়ের ক্ষণে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি নীলা, তুমি সুখে থাক—সুখে থাক—

সু। অশোক!

অ। আজ আর অমন করে ডেকে অযথা আমার যাবার পথ পিচ্ছিল করে দিও না—

সু। কোথায় যাবে তুমি অশোক? (সহসা তার একখানি হাত ধরিল)

অ। কোথায় যাব? জানি নে কোথায় যাব?—কিন্তু তবুও আমাকে যেতেই হবে—নইলে আমার এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস যদি তোমার বিয়ের রাতে…

সু। (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিয়া) উঃ আমি আর এ ব্যথা সইতে পারবো না—আমায় ছেড়ে যেও না অশোক—অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমাদের মিলন সম্ভব হলো না বটে, কিন্তু তাই বলে—ওগো, আমায় ক্ষমা কর—

অ। (বিদ্রূপাত্মক হাস্যের সহিত) ক্ষমা! আশ্চর্য্য মানুষ তোমরা—কিন্তু…না, না, তোমায় আমি অভিশাপ দিতে পারবনা, পারবনা,—কিন্তু নারি! এমনি ছলে কৌশলে শুধু পুরুষের মন প্রাণ হরণ করে নিতেই তোমরা শিখেছ আর কিছু শেখ নি?—জান না, নারীর এমন মির্ম্মমতা পুরুষের প্রাণে কত বেশী বাজে? যাক্, আর তোমাকে আমার কিছু বলবার নেই—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—এখানকার বাতাস আর আমি সহ্য করতে পারছিনে—

সু। (সজল চোখে) অশোক!

অ। না—আর আমায় ডেকো না—ছেড়ে দাও—চির দিনের মত তোমার নিষ্ঠুর চোখের আড়ালে যেতে দাও আমায়—

সু। অশোক! অশোক!

(সুনীলার চোখ দুইটী হইতে দর দর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কিন্তু অশোক তার সমস্ত কাকুতি ব্যর্থ করিয়া জোর করিয়া তার হাত ছিনিয়া চলিয়া যাইতেই সুনীলা সেই ঘাটের উপর আছড়াইয়া পড়িল]

[অশোক বাগানের আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই হঠাৎ মনে পড়িল সুনীলার দেওয়া ভালবাসার দান সেই এমব্রয়ডারী করা সিল্কের রুমাল খানা তাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত—কাজেই সে আবার ফিরিতেছিল। কিন্তু ঘাটের কাছে আসি-তেই সে দেখিল সুনীলা একাকী যেন আপন মনে কি বলিতেছে। কৌতুহলী হইয়া কয়েকটা নার্গিস ফুলগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে নীরবে সুনীলার কথা গুলি শুনিতে লাগিল]

সুনীলা (উঠিয়া বসিয়া আপন মনে) অশোক! আজ আমার অপরাধটাই বড় দেখলে—কিন্তু একটীবার ভাবলে না, যে, কেন সেদিন আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় তোমাকে ছেড়েই বাবার কথায় এই বিয়েতে সম্মত হয়েছিলুম! সে কি তোমার জন্যেই নয় বন্ধু! জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা গায়ের জোরে তুমি হয় তো উড়িয়ে দিতে পার কিন্তু আমি যে এই বাঙ্গলারই নারী—তাই যেদিন শুনলাম তোমার আমার কুষ্ঠি গণনার ফলে দেখা যায় যে আমাদের মিলনে আমার আমার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী—তখনই ভয়ে ও আতঙ্কে আমি শিউরে উঠেছিলুম। তোমায় আমি ভালবাসি বলেই তোমার অমঙ্গলের চিন্তা আমায় বেশী ব্যথিয়ে তুলেছিল, তাই না সেদিন নিজের সুখের কথা চিন্তা না করে—এই হৃদ্‌পিণ্ডটাকেই দূরে ছুড়ে ফেলে একটা অজনা মানুষের সঙ্গে…

কিন্তু অশোক, তুমি আমায় এক ভুল বুঝলে! আমারই জন্য তুমি দেশ ত্যাগী হয়ে…না, না, আর যে ভবতে পারছি নে—ওগো, তোমার এই ব্যথমাখা করুণ স্মৃতি নিয়ে কি করে আমি বাঁচবো?

(সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর কি ভাবিয়া শেষ ধাপে নামিয়া আপন মনে কহিল) তুমি আমার অপরাধকে ক্ষমা করতে পারলে না—আমার সজল চোখের আবেদনকে ব্যর্থ করেই তুমি চলে গেলে—তাই তোমার এই উপেক্ষার প্রতিশোধ লব আমি নিশুতি রাতের এই নির্জ্জন মুহূর্ত্তেই…(ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইল)।

অ। (সহসা অশোক ছুটিয়া গিয়া সুনীলাকে আঁকাড়াইয়া ধরিয়া) একি নীলা, একি করছো?

সু। (অশোকের কাঁধে মাথা রাখিয়া) অশোক!

অ। কেন নীলা—

সু। নীলা হতভাগিনী না হ'ল সে সুখী নিজে, আর না করলো সুখী তোমাকে—তাই এই পুকুরের জলে…

অ। না নীলা, আমার জন্য তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। তোমার সব কথাই আমি শুনেছি—জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথায় তুমি ভীত হয়েই আমাদের জীবনের ভিতর এই বিপর্য্যয় টেনে আনুছো—কিন্তু তুমি কি জান না, যে, সত্যিকার জিনিষ এতে কিছুই নেই—জ্যোতিষ শাস্ত্র তো একটা কুসংস্কার মাত্র। এই মিথ্যা কুসংস্কারের ভয়ে কেন তবে…না নীলা, আর আমরা জীবনের উপর এমন বিপর্য্যয় ঘটুতে দেব না—তার চেয়ে এস, আজ আমাদের শুভ সম্মিলনে ব্যথাহত জীবনকে সার্থক করে তুলি—

সু। (তেমনি কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত চোখে) তাই হোক্ অশোক, তাই হোক্—কিন্তু…

অ। 'কিন্তু কেন? এ কি, কাঁপছ যে—জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা স্মরণ করে শঙ্কিত হচ্ছ? না, না—আর সে ভয় করো না—বরং আমাদের আজকের এই মিলন দ্বারা জগৎকে দেখতে দাও, যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা অর্থহীন। এস, এস নীলা, আজ তোমার বাহুর বাঁধনে এমনি ভাবে আঁকড়ে ধর যেন জগতের কোন বাধা বিপত্তি এসে আমাদের আর পৃথক করে না নেয়—

(সুনীলা দুইটী বাহু দিয়া নিবিড় ভাবে অশোককে জড়াইয়া ধরিলে অশোক তার স্নিগ্ধ মুখখানি আরও কাছে টানিয়া আনিয়া ক্ষণকাল চোখের উপর চোখ রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই পরে ধীরে ধীরে তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট আনিয়া স্থাপন করিল। তারপর তারা পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া মাধবী কুঞ্জের কাছে আসিতেই অশোক পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া খানিকটা চূর্ণ মুখে ঢালিয়া দিতেই সভয়ে সুনীলা কহিল)

সু। এ কি খাচ্ছ অশোক?

অ। (একটু মৃদু হাসিয়া) বিশেষ কিছু নয়, একটু বিষ মাত্র—

সু। (কাঁপিয়া উঠিয়া) বিষ! এ্যাঁ-এ্যাঁ—এ এ কি করলে অশোক, কেন-কেন এ সর্ব্বনাশ করলে—ওগো, কেন আমাকে এইমাত্র সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে আবার তা নিষ্ঠুরের মত কেড়ে নিলে। অশোক! নির্ম্মম অশোক! কেন তুমি…(তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—চোখে তার অশ্রুর প্লাবন)

অ। (সুনীলাকে বুকের ভিতর চাপিয়া) কেন এ কাজ করলুম নীলা, শুনবে? শোন তো বলি—আমি ভেবে দেখলুম, জ্যোতিষ শাস্ত্রকে কুসংস্কার বলে আমরা উড়িয়ে দিলেও, তোমার বাবা, মা তো তা তেমনি কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না—তাই আমি স্থির জানি আমাদের মিলন অসম্ভব। কিন্তু তোমাকে যদি একান্ত আপনার করে না পাই নীলা, তবে এই ব্যথা ভরা দুর্ব্বহ জীবনটাকে কি করে আমি টেনে নিয়ে বেড়াবো—তাই আজ আমি এই পরিপূর্ণ সুখের ভিতর...

সু। (হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই বুকে মুখ লুকাইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল) অশোক! এই যদি তোমার মনের সাধ ছিল, তবে কেন এ অভাগিনীকে মরণের প্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনলে? উঃ, নিষ্ঠুর! হৃদয়হীন পুরুষ! নারীর প্রাণটাকে নিয়ে কেন এই নির্ম্মম খেলা খেললে?

—অশোক। শেষ বিদায়ের ক্ষণে কেন এ তিরস্কার নীলা? আজ আর কিছু বলো না—শুধু তোমার মধুর হাসির ছটায় এই শেষ মুহূর্ত্ত আমার সুষমা মণ্ডিত করে তোল। তোমার যে ভালবাসা এতদিন আমার জীবনকে মধুময় করে রেখেছে, আজ এই শেষ বিদায়ের ক্ষণে তা নিংড়ে আমার ঠোঁটের উপর ঢেলে দাও রাণী—আমি ঐ অমৃত পান করতে করতে পরপারে চলে যাই—

সু। (আঁচলে অশ্রু মুছিয়া অশোকের ঠোঁটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া) তাই যাও প্রিয়তম—এ মর্ত্ত্যধাম তোমার মত প্রকৃত প্রেমিকের উপযুক্ত স্থান নয়—কুসংস্কার এখানে সুখের প্রতিবন্ধক—দুষ্টা নিয়তি এখানে মিলনের অন্তরায়—(ক্ষণকাল পরে হঠাৎ দৌড়াইয়া গিয়া পাশের একটা করবী গাছ হইতে কয়েকটা ফল আনিয়া খাইতেই অশোক তার চোখ তুলিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া কহিল)

অ। এ কি করলে নীলা—এ যে বিষ—না, না, খেয়ো না ঐ ফল—ফেলে দাও, ফেলে দাও—(ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল)

সু। (হাসিয়া) বৃথা চেষ্টা অশোক। (একটু পরে) তুমি নিজে বিষ খেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ টেনে আনলে—আর আমার বেলায়...

অ। তুমি জান না নীলা, কত বেশী আপনার জন তুমি আমার—তাই...

সু। তাই জানি বলেই, আজ তোমার চিরদিনের সাথের সাথী সাজলুম বন্ধু—এ মিলন আমাদের অনন্ত মাঝে চিরন্তনী হয়ে থাকবে—কেউ আর কোন বাধা ঘটাতে পারবে না—কী সুন্দর, কী অপূর্ব্ব এ মিলন, অশোক!

অ। (সভয়ে তাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে) নীলা, নীলা, সত্যই কি তবে আমাদের এতদিনকার অকৃত্রিম ভালবাসার স্বপ্ন সৌধ আজ এই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়লো?

সু (অশোকের কাঁধে মাথা রাখিয়া) অশোক, জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হতে পারে? দেখ, কী আশ্চর্য্য সংঘটন! আজ আমাদের শুভ সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই কী অনর্থ ঘটিয়ে ফেল্লে তুমি—

অ (একটু ভাবিয়া) হু, তাই বটে। (একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু তুমি যে তার ফলাফল আরও একটু বেশী এগিয়ে দিলে নীলা। কিন্তু এখন বুঝছি নিয়তির বিধানকে কেউ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না—শুধু নর কেন, দেবতাও তা পারেন না, তাই না শ্রীকৃষ্ণকে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল ব্যাধের বাণে—

(একটু থামিয়া পরে) তা যাক্, আজ আর অযথা দুঃখ করে আমাদের এই শেষের মধুর মুহূর্ত্তগুলোকে নষ্ট করতে চাই নে নীলা—তাই চল, ঐ কাঁঠালী চাঁপার গাছটার নীচে গিয়ে আমরা আমাদের জীবন নাট্যের যবনিকা টেনে দিই—ওর সঙ্গে যে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়ানো রয়েছে—মনে কি পড়ে না নীলা, যেদিন প্রথম ঐ গাছটার নীচে তুমি তোমার রূপ, যৌবন নিয়ে আমার চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে—সেই দিন থেকেই তুমি হলে আমার সকল সাধনা, আমার কল্পনার পারিজাত, আমার স্বপ্নের স্বর্গ!

আজ আর কোন অভিযোগ করো না—কোন তিরস্কার করো না—যে মুহূর্ত্তটুকু এখনও

হাতে আছে, তাকে আজ আরও মধুর করে তোল— তোমার রূপের মাধুর্য্যে, তোমার ভালবাসায়—। মরণ যদি আজ আমাদের মিলনকে চিরন্তনী করতে ফুটে এসেছে, চল তাকে হাসি দিয়ে, গান দিয়ে বরণ করে নিয়ে ঐ আমাদের প্রথম স্মৃতির পুণ্য স্থানে শেষ স্মৃতিটুকুও রেখে যাই। নীলা, নীলা!

সু। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) কেন প্রিয়তম!

অ। ভাবছ কি? চেয়ে দেখ, কী সুন্দর জ্যোৎস্নায় এই সুন্দর পৃথবী কাণায় কাণায় ভরে গেছে—এ মধুর রাতে যদি আমরা আমাদের ইহ জীবনের স্বপ্ন সৌধ ধরার বুকে স্বেচ্ছায় লুটিয়ে দিয়ে চির মিলন পথের যাত্রী সাজলুম, তবে আবার চোখের কোণে অশ্রু কেন নীলা? চলে যাই সেই দেশে, যে দেশে কোন বাধা এসে মিলন পথের অন্তরায় হয় না—যে-দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্র পঙ্গু—নিয়তি শক্তিহীন—

সু। (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) তাই চল অশোক—যে কাঁঠালী চাঁপায় একদিন তুমি আমার মন প্রাণ হরে নিয়েছিলে, আজ এই রূপালী রাতে তারই গাছের নীচে হবে আমাদের চিরমিলনের ব্যর্থ বাসর!

অ। (দুই হাত দিয়া সুনীলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া) ব্যর্থ নয় নীলা, এ ব্যর্থ নয়—বল, বল, এ বাসর অপূর্ব্ব, বিচিত্র—স্বপ্নে এ ধরা যায় না, কল্পনায় বাঁধা যায় না, এমনি বিচিত্র এ বাসর। কিন্তু আর তো দেরী করা যায় না—সময় যে হয়ে এল—বয়ে যায় নীলা, চল, চল—

সু। (অশোকের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে) তাই চল—

+

(একটু পরে কাঁঠালী চাঁপা গাছের নীচে পৌছাইয়া ঘাসের উপর পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শয়ন করিল—তখন মৃত্যু যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া যে-হাসি তাঁদের মিলিত চারিটী ঠোঁটের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন অনুপম তেমনি অনবদ্য।

অদূরে কোন্ একটা বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া কে যেন ক্লেরিয়োনেটে গান ধরিয়াছিল—

"মিলন-গীতির অন্তরালে অশ্রুবাদল ঝরে—"

নূতন বীমা কোম্পানীর সৃষ্টি ও ইহার ভবিষ্যৎ

শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

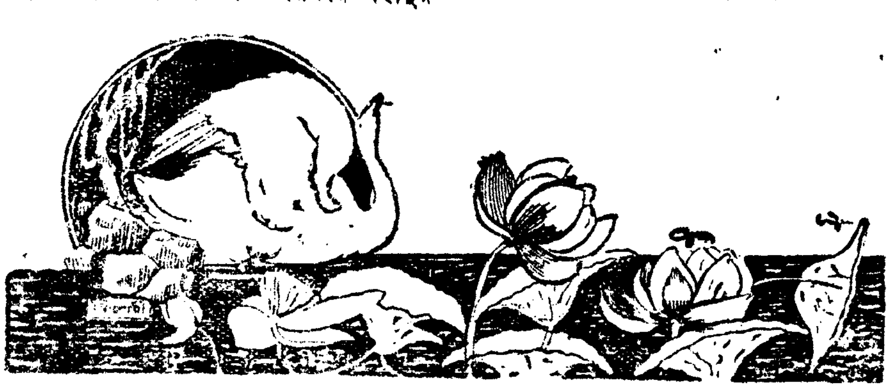
ভারতবর্ষে নূতন বীমা কোম্পানী সৃষ্টি করিবার হুজুক লাগিয়া গিয়াছে অযোগ্য ব্যক্তিগণও টাকা সংগ্রহ করিয়া—এই ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত বীমাবিশেষজ্ঞ মহাশয় বার্ষিক বীমা পুস্তকে বহু স্থলেই নূতন কোম্পানী সৃষ্টি করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। উপযুক্ত মূলধন না লইয়া কার্য্যে নামা এবং নিতান্ত অক্ষম ব্যক্তি কর্ত্তৃক কার্য্য পরিচালিত হওয়াই নূতন কোম্পানীর অসাফল্যের মুখ্যতম কারণ। ভারতবর্ষের পুরাতন বীমা কোম্পানীগণের উদ্বর্ত্ত পত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়—তিরিশ বৎসরের উপর স্থাপিত সামান্য কয়েকটী কোম্পানী ব্যতীত কোনওটী আজ পর্য্যন্ত অংশীদারদিগকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারে নাই। এবং বিশ বৎসরের উপর স্থাপিত কোম্পানীগুলির মধ্যে অধিকাংশই কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া আছে। নূতন কোম্পানী যেগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারা সমস্ত মূলধনই প্রাথমিক ব্যয় ইত্যাদিতে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশগুলিরই পরিচালনার ভার নিতান্ত অযোগ্য হস্তে ন্যস্ত আছে। এইজন্যই ইহাদের বাতিল পলিসির হার ভয়াবহ। নিম্নের অঙ্কগুলি হইতে বোঝা যাইবে নূতন ও পুরাতন কোম্পানীগুলির মধ্যে বাতিল পলিসির অনুপাত কি প্রকার—

কোম্পানীর বয়স	বাতিল পলিশি ও কোম্পানীর সম্পূর্ণ স্থিত পলিশির অনুপাত
৩০ বৎসরের উপর	১·০
২০ হইতে ২৯ বৎসর	৯·০
১০ হইতে ১৯ বৎসর	১৩·৩
৫ হইতে ৯ বৎসর	১৬·৩
৫ বৎসরের নিম্নে	৩৮·৪

নূতন কার্য্য সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াও নূতন কোম্পানীগুলি এই প্রকারে বীমা পত্রগুলি নষ্ট করিতেছে এবং উদ্বর্ত্ত পত্রে বিপুল অঙ্কগুলি স্থিতির কোঠায় ধরিয়া ব্যয়ের হার কম দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। সরকারী একচুয়ারি মহাশয় বলেন জনমত প্রবল হইয়া কোম্পানীগুলিকে এই প্রকার আত্মঘাতী কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে কিন্তু পত্রান্তের আমি লিখিয়াছি যে এই মেরুদণ্ডবিহীন দেশে জনমত সহসা প্রবল হইতে পারে না। এদেশের সংবাদ পত্র ও বীমা পত্রের অধিকাংশই বীমা কোম্পানীগুলির নিকট হইতে মোটা বিজ্ঞাপন গ্রহণ করিয়া বীমা করণেচ্ছু জনসাধারণের প্রতি মমতা বোধ ত্যাগ করিয়াছে কাজেই জনমত গঠন করিবার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে। সরকারী এক-চুরিয়ারি মহাশয় যে সমস্ত নূতন কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় অনুমোদন করিতেছেন না তাহাদিগের কার্য্যাবলী বন্ধ করিবার আদেশ তাহাকে দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের বীমার নূতন আইন সংস্কার করিবার জন্য সরকার বাহাদুর যে প্রচেষ্টা করিতেছেন সেই সম্পর্কে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বিমা সংঘটী একটী বিবৃতি পাঠাইয়াছেন, প্রচলিত আইনের অন্যান্য ত্রুটি দেখাইয়া সংঘটী বলিয়াছেন সরকারী এক-চুয়ারী মহাশয়কে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া হউক যাহা দ্বারা তিনি দুর্ব্বলতম প্রতিষ্ঠানগুলির গতিবিধি সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন এবং পতনশীল কোম্পানীগুলির কার্য্য স্থগিত করিয়া দিতে পারেন।

নূতন কোম্পানীগুলির অধিকাংশই স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ লইয়া পরিচালন পরিষদ গঠন করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তিগণের অধিকাংশই বীমা বিজ্ঞানে অজ্ঞ। কোম্পানীর কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত শক্তি ও ক্ষমতাও অনেকেরই নাই সুতরাং ইহাদিগকে সম্মুখ ভাগে রাখিয়া সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজ চালাইতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার এক বীমা কোম্পানীর স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ লইয়া যেরূপ লজ্জাজনক ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া পরিচালন পরিষদ গঠন করিলেও স্বদেশবাসীকে সহসা প্রতারিত করিবার সুযোগ হইবে না।

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এখানে মাথাপিছু হারে জীবন বীমার পরিমাণ অতিশয় নিম্নতম হইলেও এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে ক্রমাগত নূতন কোম্পানীর সৃষ্টিকে সমর্থন করা যায় না। এদেশ পেট ভরিয়া দুবেলা ভাত খাইবার সংস্থান আগে হউক তারপর বীমা কোম্পানীর অভ্যুদয়ে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।



সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার নমস্কার

পুষ্পপাত্রের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

ইতালী আবিসিনিয়া যুদ্ধ

যে যুদ্ধ এতদিন বাধি বাধি করিয়াও বাধিতেছিল না সেই যুদ্ধ এখন পুরাদস্তুর বাধিয়া গিয়াছে। মহাসমরের ভীষণতা স্মরণ করিয়া যুদ্ধ যাহাতে আর না বাধে সে জন্য প্রতীচ্যের বিভিন্ন ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। এজন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘও স্থাপিত হয়। কিন্তু নানা রকম শান্তিমূলক বক্তৃতা ও ব্যবস্থাদি চলা সত্ত্বেও বহু রাষ্ট্র সমরোপকরণ অসম্ভব বাড়াইয়া চলে। এ যুদ্ধ সম্ভারের বৃদ্ধি চলিতেছে এত অসম্ভব ভাবে যে নানা ট্যাক্সের চাপে লোকজন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অথচ উপায় নাই—পাশের এক রাজ্য যদি সৈন্য সংখ্যা, যুদ্ধ-জাহাজ, এরোপ্লেন ও নানা মানব ধ্বংসী রসায়নিক দ্রব্য বাড়াইয়াই চলে তবে অপর রাজ্যগুলিরও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য ঐ সব জিনিষ বাড়াইয়াই চলিতে হয়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থাও ঐরূপ। এশিয়ার জাপান রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভ্য ছিল, চীন দুর্ব্বল এবং পাশ্চাত্যের বহুরাজ্যের নানা স্বার্থ সেথায় জড়িত—তাই জাপান চীনে রাজ্য বিস্তার করিতে গিয়া যখন দেখিল রাষ্ট্র সঙ্ঘ তাহার এ পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায় তখন সে রাষ্ট্র সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জার্ম্মেণী দেখিল রাষ্ট্র সঙ্ঘে থাকিয়া তাহার মহাযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি অপনোদনের কোনই উপায় নাই তখন সেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিল। আমেরিকা তো এসব ইউরোপীয় হট্টগোলের মধ্যে থাকাই বেশী পছন্দ করে না—তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশেষ নাই। কিছুদিন আগেও যে সোভিয়েট রাশিয়া একঘরে ভাবে ছিল সে আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং ইউরোপীয় রাজনীতির সর্ব্বত্র বেশ আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। রুস পররাষ্ট্র সচিব লিভিনটভ নিজ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বর্দ্ধনে একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ।

ইংরেজ, ইতালী ও ফরাসী রাষ্ট্রসঙ্ঘে এতকাল বেশ মিলিতভাবে কাজ করিতেছিলেন—কারণ মহাযুদ্ধের সময়ও ইহারা মিত্র শক্তি ছিলেন এবং তারপরও এতদিন কেহ কাহারও স্বার্থে বিশেষ আঘাত করেন নাই। আবিসিনিয়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য। ইতালী তাহার রাজ্য বিস্তার করিতে চাহে। ইউরোপে তাহা সম্ভব নয় তাই ঔপনিবেশিক বিস্তারই একমাত্র পন্থা। এদিকে আবিসিনিয়াকে গ্রাস করিতে পারিলেই তাহার নানাদিক দিয়া সুবিধা। কিন্তু আবিসিনিয়া একদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য অপরদিকে আবিসিনিয়া শুধু মাত্র ইতালীই গ্রাস করিলে ইংরেজ ও ফরাসীর নানা অসুবিধা। কারণ আবিসিনিয়ার সংলগ্ন ও পার্শ্বস্থ ভূভাগে ইতালীর যেমন অধিকার আছে তেমনি ইংরেজও ফরাসীরও আছে। আবিসিনিয়ার মধ্যেও এই তিন শক্তিরই বাণিজ্যিক এবং আরো বহু স্বার্থ আছে। সম্প্রতি জাপানও তথায় বেশ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে—আমেরিকান কোম্পানীরও খনি প্রভৃতিতে ইজারা বন্দোবস্ত আছে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ইংরেজ ও ফরাসী যুদ্ধ বাধিবার আগেও নানাভাবে ইতালীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখনও যুদ্ধ বাধিবার পরেও নানাভাবে একটা মিটমাটের চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু এই যুদ্ধে ইতালীর সর্ব্বাধ্যক্ষ মুসোলিনী যেন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নামিয়াছেন। ইতালীর উপর অন্যান্য শক্তিবর্গ এখন অর্থনৈতিক চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও মুসোলিনী খুব বেশী বিচলিত নহেন। আবিসিনিয়া রাজ্যটি প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন সম্পদশালী আবার বিদেশীদের পক্ষে তেমনি দুরাধিগম্য। আবিসিনিয়ার আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্র তেমন উন্নত ধরণের কিছু নাই—এরোপ্লেন দু'চার খানা আছে—বিষাক্ত বাষ্পের প্রয়োগ কৌশলও তাহারা জানে না। মুসোলিনী এ সব দিয়া আবিসিনিয়াকে যতটা সম্ভব বিপদগ্রস্ত করিলেও পথ ঘাট হীন পার্ব্বত্য প্রদেশে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি আশা করেন তাঁহার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইথিওপীয়ান সম্রাটও তাহার জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত—রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফতে ও নানা উপায়ে তিনি শান্তি রক্ষার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হয় নাই। ইথিওপীয়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রণরঙ্গে মাতিয়াছে—ইথিওপীয়ানদের স্বদেশ রক্ষার জন্য এই সর্ব্বস্বপণ বীরত্বে জগৎ যেমন বিস্মিত হইতেছে তেমনি একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা রাসগুগসা ইতালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ইতালীর পক্ষে যোগ দিয়াছে। ইনি আবার বর্ত্তমান সম্রাটের কন্যা-জামাতা ছিলেন। সম্রাটের কন্যা এখন মৃতা। ইতালী আরও হাবসী সর্দ্দারদের নাকি এই উপায়ে স্বপক্ষে টানিবার চেষ্টা করিতেছে।

এ যুদ্ধের সংবাদ বিশেষ কিছু পাইবার উপায় নাই—কারণ আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ পাঠাইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। তবু নানা সংবাদপত্র যতটুকু ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন তাহার মারফৎই কলিকাতায়

সকাল সন্ধ্যায় যুদ্ধসংবাদ বাহির হইতেছে। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে ইহা বিশেষ ভাবেই দেখা যাইতেছে যে আধুনিক মারণ বিজ্ঞানে যাহারা পারদর্শী হইতে পারে নাই তাহারাই অসভ্য এবং বর্ত্তমান যুগের সভ্যতায় তাহাদের স্বাধীনতা লইয়া টিকিয়া থাকাও সম্ভব নহে।

—০—

যুদ্ধ ও ভারতীয় বাজার

যুদ্ধ লাগিল কোথায় আবিসিনিয়ায় আর যুদ্ধের খবর রাষ্ট্র হওয়া মাত্র ভারতে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের দ্রব্যাদির দামতো অসম্ভব চড়িয়াই গেল তা ছাড়াও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্যও কিছু কিছু চড়িয়াছে। অথচ এ সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য কোন ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়া উচিত নহে। যাহাতে কোন দ্রব্যের অসঙ্গত মূল্যবৃদ্ধি না পায় সে দিকে গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পরলোকে আনন্দচন্দ্র রায়

ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল খ্যাতনামা জননায়ক আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় গত ২৬ শে অক্টোবর ৯২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার কাচুরগাঁ গ্রামে ১২৫১ সালের ৭ ই শ্রাবণ আনন্দচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে ঢাকা পোগোজ স্কুলে পড়িয়া পরে ইনি উনিশ বৎসর বয়সে ওকালতি পাশ করিয়া ঢাকায় ওকালতি আরম্ভ করেন। মফঃস্বল কোর্টে আনন্দচন্দ্র যে রূপ পসার প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এরূপ খুব কম উকিলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্বদেশী যুগের অনেক মামলাও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তাহার পক্ষে ছিলেন ঢাকার নবাব সাহেব আর তাহার বিপক্ষে ছিলেন এই আনন্দচন্দ্র। স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশ চন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আনন্দবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আনন্দচন্দ্র একবার খুনি মামলায় জড়িত হইয়া এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে হাইকোর্ট তাঁহাকে সসম্মানে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করিলে পূর্ব্ব বঙ্গ কংগ্রেস সংস্রব ত্যাগে বাধ্য হইবে একথাও দৃঢ়ভাবে তিনি কংগ্রেসকে জানাইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে ঢাকায় যে প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল আনন্দচন্দ্র তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় ওকালতি আরম্ভ করিয়া ১৯০৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা মিউনিসিপালিটির প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান ও বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার পর বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন, তাঁহার বহু দান ধ্যানও ছিল। তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যক্তি ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে পূর্ব্ববঙ্গের একটা গৌরবস্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়িল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি—ও তাঁহার পুত্র ধীরেন্দ্রবাবু ও শোকার্ত্ত পরিজনদের সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে ঈশান চন্দ্র ঘোষ

হেয়ারস্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ২৮শে অক্টোবর ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকের যাত্রী হইয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার কোন গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু নিজ চেষ্টাতেই ঈশানচন্দ্র ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন ও ১৯১৬ সালে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছুদিন তিনি শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের কার্য্যও করিয়াছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন—তাঁহার বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক নানা স্কুলে পড়ানো হয়। তিনি মূল পালি হইতে বৌদ্ধ জাতকের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহা বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। তিনি বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায় বুদ্ধিও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল এবং তিনি বহু খ্যাতনামা কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। ঈশানচন্দ্র নিজগ্রামে পুষ্করিণী খনন, স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু শোক দুঃখ পাইয়াও অবিচলিত ভাবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই কর্ম্মীপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ঈশানচন্দ্রের প্রথম পুত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গবাসীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ। আমরা তাঁহাদের এই শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

খ্যাতনামা চক্ষুরোগ চিকিৎসক যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় গত বিজয়া দশমীর দিন ৫৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছিলেন। কর্পোরেশনের খ্যাতনামা কাউন্সিলার ছিলেন। চক্ষুরোগের চিকিৎসায়ই তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৮০ সালে নদীয়া জেলার তালবেড়িয়াগ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা নাটোর রাজের ম্যানেজার ছিলেন—নাটোর ও রাজসাহীতে তাঁহার স্কুল ও কলেজশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল। আমরা সাধারণ কর্ম্মী ও বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানাইতেছি।



৯ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ | ৮ম সংখ্যা

ঘরের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুঃখ আমার অনেক আছে
সে কথা ত সবাই জানে,
আনন্দের ভাগ্ পায়নাত কেউ
সেটা আমার জমছে প্রাণে।
জমছে আমায় করছে ধনী,
জমছে রে নীল কান্তমনি,
দীনবন্ধু দাদার দধি
কম্‌ছেনাক মোটেই দানে।

\+ + +

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ আমি
জানি আমার মূল্য নাহি,
দুঃখী এমন অনেক আছে,
সুখী আমার তুল্য নাহি।
আমার যখন নয়ন ঝরে,
চণ্ডী মুছান নিজের করে,
সিংহ গায়ে কেশর বুলায়
গরুড় কি কয় কানে কানে।

এই ভাঙ্গে ঘর, প্রাচীর পড়ে
যায় গৃহ-পাই মায়ের স্নেহ,
আমার বেড়া যে হাত বাঁধে
নাগাল তাহার পায়না কেহ।
অভাব এবং ঘোর বিপাকে,
উপায় এমন হয়েই থাকে,
কত দিবস আমার লাগি
দেবতা বোঝা বহেই আনে।

× × ×

অর্থ নাহি সামর্থ্য নাই,
নাই বাহুবল ভয়টা বা কি?
মধুসূদন এবং তাঁহার
সুদর্শনের কাছেই থাকি।
তোমরা সবাই জেনেই রাখ,
ফুল ত আমার বিকায় নাক,
ছড়িয়ে দিই তা দিকে দিকে
মায়ের রাঙা চরণ পানে।

নিন্দিত

গল্প— শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

[একটি বড় লোকের ছেলের খেয়ালী-জীবনের অদ্ভুত করুণ কাহিনী লেখক মনুজবাবু এই গল্পটিতে বাস্তব রূপ দিয়াছেন। গল্পটি ঠিক সাধারণ শ্রেণীর নয়—একটু বৈচিত্র্য আছে। পাঠক-পাঠিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।]

বনস্পতি যে ধনীর সন্তান এ কথাটা সর্ব্বাগ্রে বলে রাখা দরকার! তবে সাধারণত গল্পের নায়ক হতে হলে তার সঙ্গে যা হওয়া দরকার, অর্থাৎ ধনীর এক মাত্র ছেলে; (যেমন বিষ বৃক্ষের নগেন্দ্র, দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বর) সে তা ছিল না! শত্রুর মুখেই হোক বা পাঠক পাঠিকা এবং লেখকের মুখেই পবিত্র ভস্ম লেপন করবার অধিকার নিয়ে তার ওপরে এবং নীচে আরো গুটি চারেক ভাই ছিল··

কাজেই বনস্পতি আদর্শ বড় লোকের ছেলে নয়...

কিন্তু তথাপি তার চাল চলন বড় লোকের একমাত্র ছেলেকেত ছাপিয়ে যেতই, অধিকন্তু ঐতিহাসিক রাজা রাজড়ার ছেলেকে সে হার মানাতেও চেষ্টার কসুর করেনি।

বনস্পতির বাবা রায় বাহাদুর নরেন্দ্র প্রসাদ রায় মহাশয় লক্ষ্ণৌএর একজন অতি খ্যাতনামা ব্যবহার-জীবি! পৈতৃক নামে রাজত্বের গন্ধ পেয়েই বোধ হয় তাঁর ছেলেরা রাজোচিত জাঁকজমকে থাকতে ভালবাসত! লক্ষ্ণৌ এ তাদের মোটর কখানি যখন বহুমূল্য পোষাক পরিহিত চালকের দ্বারা সহরের টঙ্গাওয়ালাকে সক্রোধ গর্জ্জনে শাসিত করে পথে পথে ঘুরত, অথবা দুষ্প্রাপ্য Borzoi কুকুরগুলি মেঘ গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠে তাদের বিরাট দেহ নিয়ে বাগানে ছুটোছুটি করে পথে ভিড় জমিয়ে দিত; কিম্বা অর্কিড ঝোলানো পাথরের থাম ঘেরা বারাণ্ডায় সন্ধ্যার পর সুনীল বৈদ্যুতিক ঝাড় জলে উঠে বাগানের 'মসিয় আ বিদে' গোলাপ ফুলের উপর ছড়িয়ে পড়ত—এবং ঠিক তার পেছনের ঘর থেকে নরেন্দ্র রায়ের কিশোরী কন্যার সঙ্গীতশিক্ষক ওস্তাদ কুদ্রুত উল্লা খাঁ সাহেবের গিটকিরি ধ্বনি ভেসে আসত,—তখন অনেক পথচারী তাদের রাজ আখ্যায় ভূষিত করেছে এ সংবাদও পাওয়া গেছে।

কাজেই বনস্পতি যখন আট বছরের ছেলে, তখন তাদের আশ্রয়স্থ এক দরিদ্র আত্মীয়কে কি একটা কারণে সে নাগরা খুলে ঘা কতক বসিয়ে দিতেও আত্মীয়টিকে সযত্নে জুতোটা ঝেড়ে মুছে বনস্পতির পায়ে পরিয়ে দিতে বলতে হত "আর না বনবাবু জুতোটা তাহলে ছিঁড়ে যাবে—"

চলে যাবার সময় আত্মীয়টির মুখ থেকে গুটি কয়েক অস্ফুট স্বর বেরিয়ে আসত "ছি ছি—"

বনস্পতির যখন বার বছর বয়স তখনকার সমস্ত কীর্ত্তি কলাপ উল্লেখ না করে শুধু এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে, যে সে লক্ষ্ণৌ সহরে বিয়ে বাড়ী দেখলেই বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে অনিমন্ত্রিত হলেও ঢুকে যেত। গৃহস্বামী অতগুলি অপরিচিত কিশোরকে পাতা অধিকার করে নিতে দেখে, বিস্ময়ান্বিত হয়ে প্রথমে চুপি চুপি ক্রমশঃ উচ্চকণ্ঠেই তাদের পরিচয় আলোচনা করে কোনো সন্ধান না পেয়ে যখন ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করতেন—

"—তোমরা কেহে ছোকরা—?"

বনস্পতি খেতে খেতে গম্ভীর গলায় উত্তর দিত—"আমরা রবাহুত—"

গৃহস্বামী ওই টুকু ছেলের স্পর্দ্ধায় রাগে দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তাদের হয়ত তুলে দেবার বন্দোবস্ত করছেন, তখন নিমন্ত্রিত কোনো না কোনো ভদ্রলোক তাঁর কাণে কাণে বলে দিত"—রায় বাহাদুর নরেন্দ্র রায়ের ছেলে—এই রকম দুষ্টামী করে বেড়ায়—"

তৎক্ষণাৎ রাগত জল হইতই, এমনি কি গৃহকর্ত্তা থেকে অন্দর মহলের দাসী অবধি চাপা হাসিতে ফেটে পড়ত! কি দুষ্ট ছেলে বাবা...

\+ \+ \+

বনস্পতির যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রায়বাহাদুর তাঁর কর্ম্ম জগত থেকে বিদায় নিয়ে সটান কলকাতায়

ফিরে এলেন। আর তার মত হোমরা চোমরা লোক যে অবশ্যই বালীগঞ্জে একটি মর্ম্মর শোভিত সৌধ নির্ম্মাণ করাবেন সেটা বলাই বাহুল্য। অগত্যা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলো রায়মহাশয়ের ছেলে মেয়েরা পুরোদমেই সুরু করে দেয়। দেখতে দেখতে বনস্পতির বড় ভাই ওপরের হল ঘরে ঘন ঘন টি পার্টি আরম্ভ করে দিলেন…মেজ ভাই নীচে বিলিয়ার্ড ঘরে রাত্রি হলেই সঘন আনন্দরোল তুলতে আরম্ভ করলেন, এবং বনস্পতির দুই বোন প্রত্যহই তেতলার ঘরে পিয়ানো বাজিয়ে মিউজিক কনফারেন্স্ আরম্ভ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আসতে আরম্ভ করলেন…জষ্টিশ গণনাথ রক্ষিতের ছোট ছেলে রক্তিম রক্ষিত, সার অতুল সাহার বিদুষী কন্যা সাহানা সাহা, মেজর ডি, বি, বসাকের পুত্রবধূ বঙ্কিতা বসাক ইত্যাদি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বনস্পতি এইবার একটু ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল! আভিজাত্যের সকল রকম হাল চালে অভ্যস্ত থাকলেও তার এগুলো কেমন ভাল লাগছিল না! কারণ সে তার ভায়েদের মত যখন যেমন দরকার তেমন হয়ে নিতে পারত না। সে মখমলের গদ্দিতে হেলান দিয়ে সোনার কারুকার্য্য খচিত লক্ষ্ণৌই আলবোলার একশো হাত লম্বা জরিমোড়া নল বিচিত্র কৌশলে আসরের মাঝখানে গুটিয়ে নিয়ে বসতে জানত, কিন্তু পার্লামেন্টারী চেয়ারে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে উর্দ্ধমুখে সিগারেট খেতে সে কিছুতেই পারত না। সঙ্গীত জগতের সেরা বুলবুল পিয়ারে বাবুর সুর তরঙ্গে দোলায়িত হয়ে সোমের মাথায় সে "কেয়াবাৎ বেশক"…প্রভৃতি ঠিক কায়দা করে বলতে পারত…কিন্তু ছেলেখেলার যন্ত্র পিয়ানোয় বিঠোফোনের একটা কিম্ভুৎ কিমাকার অনুকরণে কাঠ হয়ে বসে শোনবার পর হল্-শুদ্ধ লোকের সঙ্গে খট্ খট্ করে করতালি দেওয়া তার দ্বারা হয়ে উঠত না। সে মনে প্রাণে যে জিনিষটা না অনুভব করত তাতে বিজ্ঞতা দেখানোকে অত্যন্ত ঘৃণা কোরত…বায়স্কোপ দেখে আর খবরের কাগজের ঘটনা মুখস্থ করে যারা লোক সমাজে মানুষ হতে চায় তাদের বনস্পতি অত্যন্ত ঘৃণা কোরত, তাদের মুরুব্বি-আনা ভাবের কথা শুনলে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ অবধি ঘৃণায় কুঁচকে যেত। এইত সেদিন ওরা সবাই এক সঙ্গে নিউ এম্পায়'রে গিয়ে একটা মেলোড্রামা দেখে এলো…তাতে আসবাবের কথায় চিপেনডেলের নামটা শিখে এসে তার বড়দা স্বচ্ছন্দে ইঞ্জিনিয়ার অনিত্য হোমের ছেলের সঙ্গে জোর তর্ক জুড়ে দিলে। 'আমি ফার্ণিচারের কি জানি? লক্ষ্ণৌএর বাড়ীতে আমাদের ড্রইংরুমের প্রত্যেকটি আসবাব চিপেনডেলের তৈরী,—শুনেছেন? থমাস্ চিপেনডেলের নাম শুনেছেন?…'

অনিত্য হোমের ছেলে এই জাতীয় তর্ক নিত্য করে থাকে, কাজেই বিলাতের অত বড় শিল্পীর নাম জানা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর এইসব আত্মম্ভরিতা থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও সে ভাল রকমই জানত, তাই কণ্ঠে শ্লেষের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে সে উত্তর দেয়—'আজ্ঞে হ্যাঁ নাম শুনেছি…তার নাকি পাঁচ হাজার টাকার কম একটা চেয়ার নেই; আমরা মশায় আদার ব্যাপারী ল্যাজারস কোম্পানীর দোকান থেকেই খাট আলমারী গুলো করিয়ে নেওয়া গেছে…।'

বনস্পতির কানে দুজনের কথাই প্রবেশ করেছিল, কারণ সে তখন পাশের ঘরে পড়ছিল! আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কি করে এতবড় মিথ্যাটাকে তার দাদা উচ্চারণ করলে আর মিথ্যাটাকে ধরিয়ে দিয়ে কি জঘন্য উত্তরই না ওই ছেলেটি দিলে! অপদার্থ—দুটোই অপদার্থ—বনস্পতির শরীর রাগে রী রী করে উঠল! আসবাবের কি দেখেনি তারা কি ছার ল্যাজারস আর চিপেনডেল—তার মাতুলালয়ের খাটের ছত্রির ঝালর দেখলে বা পায়ার উড়ন্ত পরীটা দেখলে যে ওই অনিত্য হোমের ছেলে মূর্চ্ছা যাবে এ কথাটা তার দাদা ভুলে গিয়ে, সে মস্ত আধুনিক হতে গেল—তাও কি না ওই বায়স্কোপে শোনা ধার করা পরের কথা থেকে? ধিক—শত ধিক!

বনস্পতি কিছুতেই ওই নকল এবং মিথ্যার ঝুড়ি মাথায় করে এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে পারছিল না—তারা ওর সঙ্গে কি কথাই বা কইবে, ওই হ্যাট কোট-ধারী অপদার্থের দলকে ওযে কাণ ধরে শেখাতে পারে

—এক পেগ রম খেয়ে কিম্বা ডজন খানেক বিলিতি মদের নাম মুখস্থ করে চাল মারলে, সমকক্ষ হওয়া যায় না। পাঁচ টাকা গেলাসের জাফরাণী সরবৎ যে খেয়েছে তার সমকক্ষ হবে ওই সব মনোহারী দোকানের পানীয় যারা খায়? এ সরবৎ টাকা ফেল্লেই মেলে না! বনিয়াদী বংশের লোক ছাড়া তৈরীই করতে জানে না। হরেক রকমের পানীয় এবং পান যার একটি দোনা খেতে গেলে এক মোহর দরকার তো খেতেও যার বাকী নেই, সে এই সব হোটেলের টিফিন খেকো চুনোপুটির সঙ্গে কি আলোচনা করবে, আর কি তর্ক করবে? কাজেই—বনস্পতির সাথে কলকাতার ফেরঙ্গ বড় মানুষি ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয় তার সাথে যে অতি মাত্রায় গেরস্থ —অর্থাৎ গরীব ছেলের আলাপ হয়েছিল সেই কণ্টক বসুও খাঁ করে একদিন বলে বসল—হ্যাঁ সেদিন দেখলুম জষ্টিস টি, পি, ঘোষের মেয়েরা পেশোয়াজ পরে এসেছে—আশ্চর্য্য এটা তারা বোঝে না ওতে পা খানা কি কদর্য্য দেখায়—আমার বোন অবশ্য—'

বনস্পতি বিস্মিত হয়ে বল্লে—,পেশোয়াজের সঙ্গে পায়ের কি সম্পর্ক?'

কণ্টক পায়জামার সাথে পেশোয়াজ পরা একটি বাঙ্গালীর মেয়েকে দেখে এবং লোকের মুখে পেশোয়াজ পরে এসেছে শুনে পায়জামাকেই পেশোয়াজ ভেবেছিল, তাই কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে কণ্টক বল্লে—'কেন পায়েইত পরে ওটা! আমার বোনও একবার বায়না ধরেছিল পেশোয়াজ পরবে! বুঝলেন বনবাবু বহুকষ্টে তাকে থামাই—এখন অবশ্য তার মস্ত ঘরে বিয়ে হয়েছে; পেশোয়াজ টেওয়াজ যে দু একটা পায়নি এমন নয়, তবে সে আর পরতেও চায় না—'

বনস্পতি হাস্য সংবরণ করতে পারলে না—দেখুন কণ্টকবাবু, কিছু মনে করবেন না! আপনাদের মানে ক্যালকেসিয়ানদের একটা স্বভাব দেখছি যে জিনিস তারা চোখেও দেখেন নি বা ভাগ্যক্রমে একবার হয়ত কোথাও দেখেছে···তাই নিয়ে Boasting করা একটা রোগ—'

কণ্টক রীতিমত বিপদগ্রস্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—মানে? আপনি কি বলতে চান আমি কিছুই দেখিনি —যা দেখেছেন সব আপনি একলাই দেখেছেন? দেখুন আমিও তা হলে একটা কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনার মত বড় লোক আমাদের বংশেই ঢের আছে আর বন্ধু বান্ধবও ঢের আছে—'

বনস্পতি এবার ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারলে না রাগে লাল হয়ে সে কটমট করে কণ্টকের মুখের পানে চেয়ে উত্তর দিল—'দেখুন আপনারই দু একজন বন্ধুর মুখে শুনলুম, আপনার ভগ্নিপতি কোন চটকলে মেসিন সাফ্ করা কুলি—একবার কলে আঙ্গুল থেতলে যেতে সে নাকি লোকসমাজে বলেছিল লাটসায়েবের ছেলের সঙ্গে হকি খেলতে গিয়ে আঙ্গুলটা ওই রকম হয়েছে! সে দেবে পেশোয়াজ?'

কণ্টক উত্তেজিতভাবে বললে—'আপনি কি সাহসে আমার—'

'চুপ' বনস্পতি চেঁচালে—,তোমার বাপ একজামিনারের পায়ে ধরে ধরে গ্রাজুয়েটের গাউনটা ভাড়া করে তোমায় পরিয়েছিল···তারই দেমাকে তুমি বড় লোকের ছেলে দেখলেই মেশবার চেষ্টা কর! আত্মীয় রাজাই হোক উজিরই হোক—ওই দু আনার চটি পরে এখানে রাজা উজির মারতে এসো না—যাও! গেট আউট—দুষ্টি ক্রিচার—'

বনস্পতি অকস্মাৎ অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়িয়ে উঠল! কণ্টক বসু তাই দেখে বেত্রাহত কুকুরের মত পলায়ন করলে! বনস্পতি অনুভব করতে লাগল সে অত্যন্ত ছোট লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছিল অতি ছোটর সাথে নীচের সঙ্গে বর্ব্বরের সঙ্গে—

বনস্পতি ঘৃণায় লোকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কওয়াই কম করে দেয়।

+ +

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেছে।

বনস্পতি ইতিমধ্যে তার স্বভাব অনুযায়ী অনেক কাণ্ড শেষ করে দমদম এরোড্রোমে আকাশ যান চালনা শিখছিল! গাড়োয়ানী বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়ে বনস্পতির যা শিক্ষা হোলো দার্শনিকরা তাকেই নাকি জীবনের চরম শিক্ষা বলে থাকেন! চরমত বটেই, কেননা বিগত

জীবনের সঙ্গে এই অধ্যায়টা সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত, কাজেই সেইখান থেকে বনস্পতির জীবনের অধ্যায় গেল সম্পূর্ণরূপে বদলে ! অর্থাৎ এতকাল পরে সে একজন সঙ্গী পেয়েছিল। নিঃসঙ্গ বাস তাকে অবশ্য ভাই বোনদের দৌলতে করতে হয়নি···একথা আগেকার চিত্র থেকে বুঝে নেওয়া যায়। ভ্রাতৃবন্ধুদের সঙ্গে সে যে একেবারেই বাক্যালাপ করতনা তা নয়। বরং ও যখন রসাত্মক কথায় হল্ মশগুল করে রাখত তাতে মোটেই বোঝবার উপায় ছিলনা যে বনস্পতি ওদের ঘৃণা করে। এমন কি যখন অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরোয়া কুৎসা বেশ সভ্য কলেবরে যখন আসরে স্থান গ্রহণ করত তা থেকেও যে বনস্পতি সরে থাকতে পেরেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই বনস্পতির দাদা আর রক্তিম রঞ্জিতের বোনকে লিচি পার্কে রাত্রিকালে দেখে এসে ডাক্তার ঘোষালের জাঁদরেল পরিবার ঘরে ঘরে কি বলে বেড়িয়েছেন, তাও বনস্পতির কান এড়ায়নি···অথবা তার বোনেরাও যখন গল্প করেছে—ডায়োশেশন কলেজের ছাত্রী তাদের বন্ধুরা একটা নাটকের রিহার্সাল দেবার সময় গল্পের নায়ক অশোক প্রামাণিক, প্রতিমা গাঙ্গুলিকে গ্রীণরুমে সত্যি নায়িকার ভাবেই চুম্বন করতে যায় আর তাই দেখতে পেয়ে অশোকের সঙ্গে লুসির মনান্তর হয়ে নিশ্চিত বিয়েটা গেল, তখনও বনস্পতি সকৌতুহলে শুনে গেছে, টিপ্পনি কেটেছে,···এবং অশোক বা লুসির সঙ্গে দেখা হলে সাদর অভ্যর্থনাও করেছে! সিভ্যলরী ? না বনস্পতি সিভ্যলরীর ধার ধারেনা...বনস্পতি ওদের প্রতি যে নিদারুণ ঘৃণা মনের ভেতর পোষণ কোরত—পাছে তাই ধরা পড়ে যায় সেই জন্তেই ওর এত বন্ধুত্বের ঢং··· কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বন্ধু ওর একজনও ছিল না। জন প্রাণীও নয়···নিত্য একজন না একজন ওর সঙ্গ নিত কিন্তু তবু ওর নিত্য সঙ্গী বলে কেউ ছিল না···হ্যাঁ বনস্পতি হতে দেয় নি, কাউকে হতে দেয় নি; বনস্পতি বুঝেছিল এই সব বড় লোকের কন্দর্পের বাচ্চারা প্রতিদিন যদি ওর ঘাড়ে ভর করে থাকে তা হলে ও তাদের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। পারা যায় না—তা যদি পারা যেত তা হলে এত করে কুসঙ্গ করতে বোধ হয় মানা করা হত না। এবং সেই জন্যেই বনস্পতির নিত্য সঙ্গী কেউই ছিল না—

অবশেষে নিঃসঙ্গীর জীবনে কেমন করে একজন আধিপত্য বিস্তার করলে তার বিশদ বিবরণ দেবার অবসর নেই কিন্তু ছোট্টর ভেতর বলা যেতে পারে যে বনস্পতি অবশেষে সঙ্গী পেয়ে গেল। আর ঠিক সেই থান থেকে বনস্পতির জীবনে নেমে এল এক রহস্যময় অধ্যায়! বনস্পতি উল্লসিত হয়ে দেখতে পেল যে তার সঙ্গী শক্তিমান—তার কথা না শুনতে পেলে তার কাছে ছুটে যেতে হয়; এবং সে না এলে তাকে ডেকে আনিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে হয়। প্রতিদিন তাকে চাইই—তার পরামর্শ না নিলে বনস্পতির তৃপ্তি হয় না—তার হাস্য পরিহাস রাগ অভিমান সমস্তই বনস্পতির কাছে নিতান্ত দরকারী। কারণ বনস্পতি দেখতে পেল তার সঙ্গী কেবল মাত্র তারই সঙ্গী এবং সেই জন্যেই তাকে তার ভাল লাগে—অবশেষে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল বনস্পতির সঙ্গীটি পুরুষ নয়। স্ত্রীলোক—কাজেই সঙ্গিনী এবং যুবক পুরুষের সঙ্গিনী হতে হলে যা যা হওয়া উচিত—সুন্দরী আর তরুণীও ও বটে—

ব্যাপারটা খুবই সহজ, আশ্চর্য্য হবার মত কিছুই নেই। বরং এতকাল ও যে কেন কাউকেই সুচক্ষে দেখলে না সেইটাই সমস্যার বিষয়—এতদিন পরে বনস্পতির তবু ভাল লাগবার মত লোক পাওয়া গেছে শুনে অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে—যাক্ বোনোটা তাহলে বিবেকানন্দ হল না—

ঘটনাটা এইভাবে এগিয়ে ছিল! দমদম এরোড্রোমে বনস্পতি মিষ্টার ষ্টেপলটনের কাছে দাঁড়িয়ে প্লেনের যন্ত্র পরীক্ষা করছে এমন সময়ে সেখানে একটি বাঙ্গালী মহিলা প্রবেশ করে বল্লেন তাঁর মেয়েকে একটু প্লেনে চড়াতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানি-ব্যাগেও হাত দিলেন।

সাহেব এবং বনস্পতি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন মহিলাটির অদূরে একটি সুবেশ এবং সুরূপা কিশোরী অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে আকাশযান গুলিকে নিরীক্ষণ করছে... সাহেবের আদেশে একটি ছোট 'মথ' বার করে মেয়েটিকে

চাপিয়ে হাট দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল, কিছুতেই একলা চড়তে পারবে না—তার মাকেও চড়তে হবে! প্রৌঢ়া মুস্কিলে পড়ে বনস্পতির দিকে চাইতে বনস্পতি একটু হাসলে "আচ্ছা—ওঁর ভয় ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছি—"

বনস্পতিকে সহাস্য মুখে তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটির অনেক সাহস বাড়লো—

ঘর্ঘর শব্দে আকাশ যান ব্যোম দেশে উঠে পড়তেই মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠায় বনস্পতি তাকে নিজের কাছে ধরে রেখে অভয় দিয়েছিল—এরপর প্লেন থেকে নেমে মেয়েটির কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে এবং ভাষাতে বনস্পতি যেন একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল—এবং পাঁজিতে যেমন লেখা থাকে এরপর কি হবে তারপর কি হবে, ঠিক সেই রকম পাঁজি মিলিয়ে মিলিয়ে, মেয়েটি অতঃপর প্রতি সপ্তাহে একদিন প্লেন চড়তে আসত, আর বনস্পতি প্রতিবারই তার সঙ্গে অভয় দিতে কাছে থাকত—এমনি উড্ডীয়মান রথে বেড়াতে বেড়াতে বনস্পতি হটাৎ আবিষ্কার করলে, যে আগে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হত আর আজকাল রোজই দেখা হচ্ছে—

জ্যোৎস্না দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে এরোপ্লেনের ঘরের ভেতর থেকে চেঁচায় "বনবাবু শীগগির একটা কিছু ফেলে দিন, মা ছাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—"

রথ ততক্ষণে জ্যোৎস্নার বাড়ীর ছাদ অতিক্রম করে ঢাকুরিয়া হ্রদের মাঝখানে উড়ে এসেছে। বনস্পতি হেঁট হয়ে দেখে বল্লে "দূর! মা কি মনে করবেন, ঠিক বুঝবেন এ আমার কাজ—ওই দেখনা তিনি এখনো এরোপ্লেনের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন—"

জ্যোৎস্না অভিমান করে "ফেলা হলনা ত, আচ্ছা আচ্ছা কাল থেকে যদি আর এখানে আসিত কি বলেছি—কক্ষনো আসবো না, কক্ষনো না—"

বনস্পতি তাকে নিজের খুব কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বল্লে—"আচ্ছা গো অভিমানিনী, আর রাগ করতে হবে না···কাল একটা কাগজের জ্যাকেট ঠিক ফেলে দোব—তাতে থাকবে তোমার নাম, কেমন তাহলে হবেত?—"

জ্যোৎস্না তার তন্বু লতাটি বনস্পতির দেহের সঙ্গে সংলগ্ন করে ঘাড় বেঁকিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দুষ্টু হাসি হাসে—"ঠিক?—ঠিকত?—"

বনস্পতি নিশ্চিন্ত হয়।

নিশ্চিত হয় এই জন্যে যে তার সঙ্গিনী কেবল মাত্র তারই সঙ্গিনী—যেটা পাওয়া যায় না বলে বনস্পতি এতদিন একলাই ছিল। আর আজ যাও পেয়েছে সেটা কেবল মাত্র পাওয়া নয়—পাবার পরও পাওয়া শেষ হয় না। মানে সকল ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, ওরা প্রেমে পড়েছিল। বনস্পতির নিশ্চিন্ত হবার এইটেই সর্ব্বপ্রধান কারণ—

বনস্পতির মা ছিলেন না—বোনেদের কাছে তার সব কথা অবাধে চলত; ভায়েরাও অবশ্য তাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন।—তবে বনস্পতির বান্ধবী সম্বন্ধে বোনেরাও বিশেষ পাত্তা পায়নি—শুধু বনস্পতিকে একটু অনু যাগ শুনতে হয়েছিল॥—"ঢের ঢের লোক দেখলুম—তোমার বান্ধবীকে কি আমারা খেয়ে ফেলতুম? একদিন কোন্ আনলে এখানে—"

স্পষ্টবক্তা বনস্পতি তৎসঙ্গেই জবাব দিয়েছিল"—সে এখানে আসবার অনুপযুক্ত—"

অনেকেই এ কথায় নিজেদের অপমানিত বোধ করেছিল, আর সেইদিন থেকে জ্যোৎস্নার কথায় ইতর ইঙ্গিতের সূচনা আরম্ভ হল! যেমন নিয়মে ক্রমশঃ পল্লবিত হতে হতে মহীরুহ হয়, ঠিক তদনুযায়ী গতিতে বনস্পতি এবং জ্যোৎস্নার কথা বালীগঞ্জ মহল্লায় আর একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল

বনস্পতির অহঙ্কার তাতে বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নি! তা না হোক—পৃথিবীতে কেউ কারো অহঙ্কারের জন্য ব্যস্ত হয় না—তবে ঈশ্বরের একটি নাকি অমোঘ বিধান আছে যে যারা সত্যি ভালবাসবে, তাদের দুনিয়ার লোকের কাম্য ভালবাসা নামক অসৎ কাজটার জন্যে কাঁদতেই হবে। পঞ্জিকার লেখার মত এইবার বনস্পতির ললাটে কুগ্রহের উদয় হল। অতঃপর তারা ভালবাসায় ও যখন নিমগ্ন, অসহনীয় প্রেমে ও যখন ব্যাকুল তখন জ্যোৎস্নার মা হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে জ্যোৎস্নার

সঙ্গীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে হবে; যেহেতু তার মেয়েত আর গেরস্তর মেয়ে নয় যে বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবে এতে টাকা চাই ইত্যাদি—

বনস্পতির সেদিনকার অবস্থা সত্যই বড় শোচনীয় হয়েছিল—দুঃখকে সে কোনো দিন স্বীকার করেনি—ঔদ্ধত্যের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করতে ফেলত। কিন্তু ও ত জানত না প্রেমের নদী ফল্গুধারার মত লুকোনো পথে ছুটে গিয়ে চোরা বালির মত মনকে ভঙ্গুর করে রাখে; কঠিন স্পর্শে এত সহজে ভেঙ্গে যায় যাতে তাকে দুর্ব্বল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বনস্পতি সে দিন এমনি করেই ভেঙ্গে পড়ল—এবং সেই দিন থেকে তার মনের অবস্থা খারাপই রয়ে গেল। জ্যোৎস্নার কাতর মুখের পানে চেয়ে যন্ত্রণা কাতর স্বরে বনস্পতি সেইদিন বলেছিল"—একটি বার—একটি বার আমায় কেন জানাও নি জ্যোৎস্না। তাহলে

তার কথা শেষ হতে না দিয়ে পাগলিনীর মত বালিকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছটফট করে বলেছিল "—জানতুম না, ঘুনাক্ষরে জানতুম না বন! আজ প্রথম শুনলুম—উঃ বন বন

বনস্পতি দুই হাতে তার প্রিয়ার মুখটা তুলে বহুক্ষণ ধরে দেখতে থাকে—দর বিগলিত ধারায় দুজনের মুখই ভেসে যাচ্ছিল—অবশেষে বনস্পতি কথা কইলে"—না জ্যোৎস্না তা হবেনা—আমি তোমায় বিয়ে করব; ব্রাহ্ম হয়ে, ক্রিষ্টান হয়ে মুসলমান হয়ে যেমন করে হয় তাই কোরব—তোমায় আমরা বাড়ী নিয়ে যাব গৃহলক্ষ্মী কোরব—"

জ্যোৎস্না তীরে বেঁধা পাখীর মত ছটফট করে বনস্পতির কোলে মুখ লুকায়"—মা কি ছেড়ে দেবে? তার যে টাকা চাই—টাকা। অনেক টাকা রোজগার করাবে আমাকে দিয়ে—"

অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতার মত স্থির হয়ে জ্যোৎস্না পড়ে রইল—তার কান্না শুকিয়ে গেল; পুতুলের মত নিথর ভাবে মেঝের ওপরে শুয়ে জ্যোৎস্না বনস্পতির রোরুদ্যমান মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল—

বনস্পতি তার ওই রকম দশা দেখে উন্মত্ত হল—"জ্যোৎস্না—আমার সব টাকা তোমার মাকে দোব—আর জোড় হাতে তার কাছে তোমায় ভিক্ষে চেয়ে নোব—ভিক্ষা চাইলে দেবে জ্যোৎস্না?—ভিক্ষা—তোমায় ভিক্ষা চাইব—"

জ্যোৎস্না উঠে বসল, তারপর আরক্ত মুখটা আঁচল দিয়ে বেশ করে মুছে অত্যন্ত নীরস এবং তীক্ষ্ণস্বরে বল্লে।—ছিঃ! তোমার মত লোক আমার মায়ের কাছে ভিক্ষা চাইবে—আর আমি সেই অপমান তোমায় হতে দোব! না বন তুমি যাও; আমার মা আর তুমি কি এক বস্তু? ছিঃ—"

+ + +

গল্পটার এইখানে শেষ হওয়া উচিত! তাহলে চিরাচরিত প্রেমের চিরাচরিত পরিসমাপ্তি ঘটত আদর্শ অনুযায়ী? কিন্তু তাত হল না!

বনস্পতির বাবা মারা যাবার বছর পাঁচেকের মধ্যে তাদের সম্পত্তি ঘরোয়া মামলা মকর্দ্দমায় কর্পূরের মত উপে গিয়েছিল। তার অন্যান্য ভায়েরা অশ্রু পথের ফকির হয় নি, তবে বনস্পতির একরোখা স্বভাবের জন্যেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক বনস্পতির আর একটি পয়সা ও সম্বল ছিল না—অথবা পয়সা উপার্জ্জন করবার কোনো উপায় ছিল না! পরের অনুগ্রহের ভিখারী হলে এতদিনে সে কি কুড়ি টাকারও একটা চাকরি যোগাড় করতে পারত না? নিশ্চয়ই পারত—কিন্তু বড়লোক আত্মীয়—বা বন্ধুর দল যখন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে গাঁজা খোরের মত ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে চাইত তখনি ওর রক্ত মাথায় চড়ে যেত! মানে কৃপার ভিখারী বনস্পতি হতে পাল্লে না! তবু যদি সে একলা হত তা হলেও অনেকটা ভরসার কথা ছিল। বনস্পতিও যে অবশেষে একটি অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করবে তা কে জানত? গোঁড়া হিন্দুমতে গণ্ডকী শিলা সামনে রেখে বনস্পতি বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করবার সময় জ্যোৎস্নাকে মনে পড়েছিল কিনা জানা যায় নি। তবে বিয়ের পর বনস্পতির দিনগুলো যে মধুর ভাবে কেটেছিল তা বেশ বোঝা গিয়েছিল। কারণ রুক্ষ চোখের কোণে যে হাসির ঝর্ণা নেমে এসেছিল তা

দেখে মনের খবর পেতে মোটেই কষ্ট হয় না। তার ওপর আড়িপাতা যাদের স্বভাব তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে বনস্পতি তার স্ত্রী মণিকে যথেষ্ট আদর করে থাকে এবং মনিও তার প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেনা—ভালই সুখেরই কথা—

কিন্তু সে সুখ নিতান্তই ক্ষণিকের। তার কপালে সুখত কোনো কালেই স্থায়ী হয় নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার অভ্যাস—পেটের ভাবনা কেমন তাকে জানতে হবে বলে সে ভাবে নি—তাহলে বোধ হয় সে মণিকে গ্রহণ করতে সাহস করত না। ইদানীং অনাহার অর্দ্ধাহারেই তাদের দিন কাটছিল। স্বামী স্ত্রীতে শেষ কালে একটা খোলার বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল—অথচ পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলেই বনস্পতি মুখটা সবেগে ঘুরিয়ে নিত। তাতে অন্ততঃ দু তিন দিন তার ঘাড়ে ব্যথা থাকত—কারণ সেই সবলকায় বনস্পতির জায়গায় অতি কৃশকায় একটি যুবককেই দেখা যেত—আর তার ওরকম জোর করে ঘাড় ফেরালে ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক—

কলতলা থেকে একটা আধ ময়লা ভিজে কাপড়ে এক কলসী জল এনে মণি বনস্পতির সামনে দাঁড়িয়ে বললে"—ছি ছি এখানে মানুষ থাকতে পারে—কলতলায় স্নান করছি—ওঘরের সেই হতভাগা ইল্লত ছেলেটা ঠায় উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল?—তুমি এর একটা বিহিত কর।"

বনস্পতি মাথা তুললে না। নীরবে সেটে দাওয়াটার খুটিতে ঠেসান দিয়ে বসে রইল। এমন দিনও গেছে, যখন পথচারিণীর অপমান দেখলে বনস্পতি চাবুক আনতে হুকুম দিত—মণি তার কিছুই জানে না। মণি দেখেছে দুর্ব্বল ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দা বনস্পতিকে, মণি দেখছে বস্তি নিবাসী উপার্জ্জন অক্ষম তার অপদার্থ স্বামী বনস্পতিকে আর মণি দেখছে স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষায় অসমর্থ কাপুরুষ বনস্পতিকে—

কোনো উত্তর না পেয়ে মণি হেঁট হয়ে দেখলে শীর্ণকায় বনস্পতির চোখের কালিমা যেন আরও একটু ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল, তার ঠেলে বেরোন গালের হাড় গুলো যেন আর একটু ঠেলে বেরিয়ে এল

মণি ভিজে কাপড ছেড়ে এসে সাদরে বনস্পতির কণ্ঠে তার দুই হাত মেলে দিয়ে বল্লে"—আজ তোমায় এত ভাবিত দেখছি কেন? ওই ছেলেটার জন্যে? না গো না তোমায় কিছু করতে হবে না—আমি ক্ষেন্তির মাকে বলে ও ছোঁড়াকে শাসিত করাব—জানত কি রকম দজ্জাল, এইবার ওঠো—কলের আবার জল চলে যাবে। আবার চোখ ছল ছল করে দুষ্টু কোথাকার—"স্বামীকে উৎফুল্ল করতে সকাল বেলাতেই মণি একটা চুম্বন খরচ করে ফেল্লে—

বনস্পতি আস্তে আস্তে তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে"—না মণি সে কথা নয়—ভাবছি তুমি না থাকলে এতদিন কি নিয়ে থাকতুম—অথচ তোমায় কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পাল্লুম না—মণি—আর মণি—"

আলিঙ্গন বদ্ধাবস্থায় বহুক্ষণ তাদের কেটে যায়। অনাহার ক্লিষ্ট, দারিদ্র্যের তরবারি আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহ এই দুইটি নরনারী তাদের যন্ত্রণা কি এমনি করেই ভুলে থাকবে? বোধ হয় না।

ঈশ্বর কি এতই বোকা? তা হলে যে বনস্পতি সম্পত্তিশালী থেকে যেত। মাস দুই পরেই দুর্দ্দশার চরম মূর্ত্তি আত্ম প্রকাশ করলে। আর ঠিক তারই সঙ্গে মণি একদিন শয্যা গ্রহণ করলে। এইবার বনস্পতি চক্ষে অন্ধকার দেখলে—তার আঁধার ঘরের আলো—তার নিরাশ বুকের আশা—তার মণি না খেতে পেয়েই শুল।—বনস্পতি ধুকতে ধুকতে অন্ধকার উঠানে পায়চারি করতে করতে শুনলে মণি ক্ষীণস্বরে ডাকছে—

বনস্পতি ছুটে এল"—কি মণি কি?—"

মণি কাতর স্বরে গেঙিয়ে উঠলো "দেখ ক্ষেন্তিরা আজ ওই বড় বাড়ীতে নেমন্তন্ন গেল—বলছিলুম;" মণি সলজ্জে উচ্চারণ করলে"—বলছিলু সেই ছেলে বেলা যেমন দুষ্টুমী করতে তেমনি করলে হয় না—বড় খিদে পাচ্ছে, বড্ড খিদে—যাওনা ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি—"

বনস্পতি বাঁখারির জানালার ফাঁকদিয়ে চেয়ে দেখলে দূরে বড় বাড়ীটায় অনেক আলো জ্বলছে, বহু কণ্ঠের কলরবও ভেসে আসছে—কাদের বাড়ী কে জানে?

ওরা এদিকে নবাগত--পাড়ার কারো পরিচয়ই জানে না, বড়লোক নিশ্চয়—এবং খুব দীয়তাং ভুজ্যতাং চলছে; বনস্পতি চোখ ফিরিয়ে দেখলে দুই চোখে সর্ব্বগ্রাসী লোলুপতা ভরে মণি বার বার সেই আলোক সজ্জিত বাড়ীটার দিকে তাকাচ্ছে—ক্ষুধা! তিন দিন ওদের পেটে একটা দানা পড়েনি—তাই সর্ব্বধ্বংসী ক্ষুধানল জ্বলে উঠেছে—অসহ্য, অসহ্য এই যাতনা—

বনস্পতি বড় বাড়ী অভিমুখে চলে গেল!

তার মলিন বেশ এবং রুক্ষ আকৃতি দেখেও কেউ বাধা দেয়নি—বনস্পতি ভেতরে ঢুকে দেখলে শ্রাদ্ধ বাড়ী! একদিকে প্রকাণ্ড বেদী তার ওপর আতপ চাল ছড়ানো টুকরো টুকরো ফুল,—কুশাসনের ছেঁড়া কুশ, একটা খুরিতে একটু ঘি হোমের ছাই—দেখলে বোঝা যায় শ্রাদ্ধাদি চুকে গেছে—

বনস্পতি অনুমান করে নিল—এখন তাহলে ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে—

বনস্পতি পৈতা গাছাটা জামার কলারের ভেতর থেকে অল্প বার করে নিঃশব্দে পংক্তিতে বসে পড়ল—বেশী করে নিতে হবে। মণিকে বাঁচাতে হবে—আহা কি কষ্ট পাচ্ছে বেচারী! না এইবার ওকে বাপের বাড়ী রেখে আসতেই হবে—তবুত তারা দু মুঠো খেতে দেবে—তার আদরের মণি—আহা; বনস্পতির চোখের পাতা ভিজে যায়।

লুচি এসে পড়ল! পরিবেশক টপাটপ সুধীরের পাতে লুচি ফেলতে ফেলতে হাঁক ছাড়লে"—বাপ—বেদানা বালার মায়ের শ্রাদ্ধে যে খাটুনি হল—তা নিজের মায়ের শ্রাদ্ধে হয় নি—নাও নাও ঠাকুর আরম্ভ করে দাও—কইরে—ছানার ডালনাটা নিয়ে আয় না—"

বনস্পতি লুচি ভেঙে মুখে তুলতে যাচ্ছিল হঠাৎ পরিবেশকের কথায় তার হাত থেকে উদ্যত আহার খসে পড়ল—বেদানাবালা! তার মায়ের শ্রাদ্ধ?

বনস্পতি ঋজু হয়ে বসল—তাইত ছাদে ও সব কারা—ওরাত ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়! তবে—? সেই অন্নই তাকে খেতে হবে? মণিকে খাওয়াতে হবে! শুদ্ধা—নরেন্দ্র রায়ের কুলবধূ খাবে—আর সে এনে দেবে, বনস্পতি—লক্ষ্ণৌএর নোটোরিয়াস বনস্পতি?

সকলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল"—কি হয়েছে ঠাকুর! কি হয়েছে উঠে পরলেন কেন?—"

বনস্পতি ঠক ঠক করে কাঁপছিল—অত্যন্ত ভয়াতুরের মত সে চাইছিল—যেন তার জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে—যেন সে এক্ষুণি মরে যাবে; শুধনো মুখ না তুলে কোনো রকমে বনস্পতি এই কটা শব্দ উচ্চারণ করলে—"বড্ড অসুখ করছে—"

তার অবস্থা দেখে সকলেরই তাই মনে হল। এক জন বল্লে"—তবে যান—শুয়ে পড়েন গে—"

তারপর সকলেই আবার স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল

\+ \+ \+

বনস্পতি ফিরে আসতে মণি আনন্দে বিছানায় উঠে বসল"—এনেছ—দাও দাও—শীগগির দাও! এঁ্যা ওকি শুয়ে পড়লে কেন—ওগো! খাবার কই!—"

বনস্পতি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল"—আনিনি মণি—পারলুম না—"

"—আনোনি?"—মণি ক্ষেপে উঠলো—"তুমি খাবার আনলে না—তুমি কি? তিন দিন স্ত্রীকে খেতে না দিয়ে রেখেছ—আর ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা হল?—হ্যাঁগা তোমার গলায় দড়ি জোটে না—গঙ্গায় ডুবে মরতে পারনা? ছি ছি এত অপদার্থ তুমি, তোমার শতবার ছি, লক্ষবার ছি—"

মলিন শয্যায় লুটিয়ে পড়ে মণি কাঁদতে লাগল। আর বনস্পতি একটি কথাই ভাবছিল; খাবার ভাবনা নয়। জ্যোৎস্নার সেই কথাটা"—আমার মা আর তুমি কি এক বস্তু—ছিঃ আমার জন্যে তুমি ভিক্ষে করবে? ছিঃ—"

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস

পাঁচ

বারিধি গর্জন।   বারিধি গর্জন।
        আমার মন ছায় পুলক শঙ্কায়!
এ কি অবর্ণন্   জলধি মন্থন
        দিবস-রাত্রির মিলিত ডঙ্কায়

অযুত টঙ্কৃত   ধনুর ঝঙ্কার
        অযুত সর্পের ফণার কুঞ্চন।
সুনীল অম্বুর   ধ্বনি সে ওঙ্কার,
        গোপন মন্ত্রের জপন-গুঞ্জন।

টলিছে রক্তিম   কিরণ সূর্য্যের
        তরল বহ্নির যেন আলিম্পন।
ঢেউয়ের গর্জন   ধ্বনি সে তূর্য্যের
        বাণী ও বর্ণের যেন আলিঙ্গন।

এ কোন্ উন্মাদ   প্রণয়-নিষ্ফল
        ফেনিল দংষ্ট্রায় করিছে গর্জন।
উদাসী অম্বর   দাঁড়ায়ে নিশ্চল
        শুনে প্রেমার্থীর দারুণ তর্জন।

আমার বক্ষের   ধ্বনি সে সিন্ধুর
        প্রণয়-নিষ্ফল আমারো অন্তর।
বিরহে বন্ধুর   পরাণ ভঙ্গুর
        নয়নে অশ্রুর ধারা নিরন্তর।

*   *   *

বারিধি গর্জন।   বারিধি গর্জন।
        লাগিল কম্পন তারকা চন্দ্রে

দোদুল সিন্ধুর　　　　প্রলয় নর্ত্তন
　　সলিল-মন্থন জলদ মন্দ্রে।

বিপুল ঝঞ্ঝায়　　　　পরাণ চমকায়।
　　করিল অম্বর নয়ন বর্ষণ।
গভীর বজ্রের　　　　ভীষণ ডঙ্কায়
　　ধ্বনিল সিন্ধুর মিলন-তর্জ্জন।

আকুল কম্পন　　　　বিপুল শীৎকার
　　বারিধি-অম্বর মিলন-উন্মাদ
আজিকে শেষ তার　　　　ক্রূর প্রতীক্ষার
　　গগন-সিন্ধুর তাই এ জয়নাদ।

আমার বক্ষেও　　　　ধ্বনিছে গুঞ্জন
　　সকল বন্ধন টুটিবে ঝঞ্ঝায়
প্রিয়ার চক্ষের　　　　নব-নীলাঞ্জন
　　এমনি একদিন ঝরিবে বন্যায়।

এমনি একদিন　　　　বহু আকাঙ্ক্ষায়
　　মোদের মর্ম্মের খুলিবে বন্ধন
সকল দ্বন্দ্বের　　　　শেষ মীমাংসায়
　　লভিব কান্তার স্বতঃ আলিঙ্গন!*

আরবী হজ্‌য্ ছন্দ *



"অদ্ভুত রামায়ণ"-এর কবি জগৎরাম

ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম-এ, ডি-লিট

বাঙ্গালীর নিকট রামায়ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সর্ব্বাগ্রে যাঁহার নাম মনে পড়ে, তিনি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধবনিতার চির পরিচিত কবিকুলরবি মহাকবি কৃত্তিবাস। সাধারণ বাঙ্গালী বাল্মীকির ধার বড় একটা ধারে না, বাল্মীকিকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করে, আদি কবির গৌরবের আসন প্রদান করে, কিন্তু তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গতার দাবী করে না। বাঙ্গালী যাঁহাকে সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে স্মরণ করে, বাঙ্গালীর বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাঁহার নিত্য যাতায়াত, তিনি বাংলার ও বাঙ্গালীর মরমী কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসকে বাদ দিয়া রামায়ণ হইতে পারে এ ধারণা বাঙ্গালী জনসাধারণের নাই। তাই আজিও অসংখ্য পল্লীকবি তাঁহাদের স্বরচিত রামায়ণের পালায় কৃত্তিবাসের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গৌরবের আসনখানি তাঁহাকেই ছাড়িয়া দেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন কৃত্তিবাসই বঙ্গের একমাত্র রামায়ণ রচক নহেন। কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক বাঙ্গালী কবি সুমধুর রামচরিত্র কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই ভাবে, ভাষায় ও বিষয় বিন্যাসে কৃত্তিবাসের প্রভাব অণুমাত্রও অতিক্রম করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে যবনিকা অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি সাগরে যে কত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন কে তাহার হিসাব রাখে ?

পরবর্ত্তী রামায়ণ রচকগণের মধ্যে যে দুই চারি জন কবি কৃত্তিবাসের প্রভাব হইতে কথঞ্চিত মুক্তি লাভ করিয়া স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অদ্ভুদ অষ্টকাণ্ড রামায়ণ প্রণেতা কবি জগৎরাম রায় ও তৎপুত্র রাম প্রসাদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য।

প্রায় দুইশত বৎসরাধিক পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভুলুই গ্রামে বন্দ্যঘাটী গোত্রীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণ বংশে কবি জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চকোট অধিপতি রাজা রঘুনাথের অধিকার মধ্যে কবির নিবাস ছিল। এই ভূস্বামীর কল্যাণ কামনা করিয়া গ্রন্থশেষে কবি লিখিয়াছেন :

"দেশ অধিপ শ্রীরঘুনাথ নারায়ণে।
সবংশ সহিত তাঁরে রাখিও চরণে॥"

কবির পিতার নাম ছিল রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। কবিরা পঞ্চভ্রাতা ছিলেন, যথা—জিতরাম, জগৎরাম, মাধব, রাধাকান্ত, রামকান্ত ও রাম গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতারামের আদেশেই কবি জগৎরাম "অদ্ভুত রামায়ণ" রচনায় প্রবৃত্ত হন। ভণিতার বহুস্থলেই তিনি এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন :

জ্যেষ্ঠের আদেশ হইল "অদ্ভুত" ভঙ্গিতে।
সীতারাম গুপ্ত লীলা পয়ারে বর্ণিতে॥
+ + + +
জিতরাম জ্যেষ্ঠের আদেশে জগৎরাম।
অদ্ভুদ পুরাণ রচে ভাবি ঘনশ্যাম॥

কবি জগৎরামের তিনটী পুত্র,—

শ্রীরাম প্রসাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণে
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাম নারায়ণ তিনে॥

কবি জ্যেষ্ঠপুত্র রাম প্রসাদ বাস্তবিকই সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সহযোগিতা না পাইলে জগৎরাম তদীয় বিরাট মহাকাব্য সম্পূর্ণ করিতে পারি-

তেন কি না বলা কঠিন। কেবলমাত্র রামায়ণ রচনায় নহে, কবি কৃষ্ণ প্রসাদ তদীয় কবি পিতা জগৎরামের অন্যতম কাব্য "দুর্গাপঞ্চ রাত্রি" রচনায়ও প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি স্বয়ং "কৃষ্ণলীলা-মৃত" নামে একখানি নাতিবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করেন। এরূপ সমতুল্য প্রতিভাশালী কবি পিতা ও কবি পুত্রের পরিচয় কেবল মাত্র বঙ্গ সাহিত্যে নহে, বিশ্ব সাহিত্যেও অতি অল্পই লাভ করা যায়।

১৭১২ শকাব্দে কবি জগৎরাম তদীয় মহাকাব্য শেষ করেন :

"সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশযুক্ত তাতে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
উনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগৎরাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রাম ধ্বনি কর পাপ তাপ হৌক শীর্ণ।"

কবি জগৎরামের এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য হয়ত জীর্ণ পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া চির দিনের জন্য লোক চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া যাইত; অথবা বড় জোর কবির জন্মভূমি বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার দামোদরের তীরবর্ত্তী কালিকাপুর নিবাসী কাশী বিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া বিশেষ সৎকার্য্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী জন সাধারণের সহিত কবির পরিচয় ও যোগ সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রকাশক মহাশয় এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে (সাধারণতঃ এক একটি কাণ্ডের উপসংহারে) স্বীয় ভণিতাও সংযুক্ত করিয়াছেন,. যথা—

যথা,—

"বাঁকুড়া জেলায় বসতি কালিকাপুরে"
উত্তর প্রবাহ খরতর দামোদরে॥
শ্রী কাশী বিলাস দ্বিজ করিয়া যতন।
প্রকাশ করিলা এই নব্য রামায়ণ॥
শ্রীরাম চরণে মম এই নিবেদন।
পাঠক শ্রোতারে হরি দাও শ্রীচরণ॥"

অন্যত্র,

" শ্রী কাশী বিলাস, হইয়া উল্লাস,
প্রকাশে এ কাব্যসার।

প্রাচীন কবির রচনার সহিত নব্য প্রকাশকের এইরূপ ভণিতা না দিলেই—আমাদের মতে—শোভন হইত। ইহা দ্বারা কাব্যের পাঠ বিকৃতি ও কাব্য মধ্যে বিষয়ান্তর প্রক্ষেপের যথেষ্ট অবকাশ ঘটে।

কাব্য রচনার প্রারম্ভে কবি জগৎরাম রায় প্রাচীন কবিগণের চিরাচরিত বিনয় প্রকাশের ও দৈন্য জ্ঞাপনের প্রথা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,

" ব্যাকরণ অধ্যয়ন মোর কভু নাই।
অদোষ অমরকোষ নাহি পড়ি ভাই॥
অষ্টাদশ পুরাণ সাহিত্য অলঙ্কার।
ছন্দ শাস্ত্র নাহি মোর নাহিক সঞ্চার॥
মূর্খ হৈয়া অতি দর্পে কৈল অঙ্গীকার।
শ্রেষ্ঠ জেষ্ঠ জিতরাম বাক্য কৈল সার॥"

" দেশ অনুরূপে ভাষা আছে নানামত।
ছন্দ অনুবন্ধে দোষ আছে শত শত॥
ভাষা ছন্দ দোষে অতি রোষ না করিও।
দোষ হৈলে মহতেতে গুণ ভাবে সেও॥"

কবির অধ্যয়ন লব্ধ জ্ঞান কতদূর ছিল তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার কাব্যে প্রাদেশিক শব্দ, ছন্দঃভঙ্গ প্রভৃতি দোষ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা মূর্খের মত আদৌ নহে। প্রাচীন কাব্য লেখকগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ছন্দ-বৈচিত্র্য কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; —অলঙ্কার শাস্ত্রও যে তাঁহার অনধীত ছিল না কাব্যমধ্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

জগৎরামের রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তদীয় কাব্যের আশ্রয়স্থল সংস্কৃত "অদ্ভুত রামায়ণ" সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র কলেবর রামায়ণ-খানিকে মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিপূরক (Supplement) বলা যায়। ইহাও মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা মাত্র ২৭টী সর্গে বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে রামসীতার জন্মহেতু (বিশেষ করিয়া ব্রহ্মরক্ষ

পানে মন্দোদরীগর্ভে সীতার জন্ম কথা) অম্বরীষের উপাখ্যান, বিবাহার্থী নারদ ও পর্ব্বতমুনির দুরবস্থা এবং সীতাদেবী কর্তৃক কালীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ পুষ্করদ্বীপবাসী সহস্রস্কন্ধ রাবণের নিধন প্রভৃতি মূল রামায়ণ বহির্ভূত কয়েকটী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। ভরদ্বাজ মুনির প্রশ্নে বাল্মীকির উত্তরদান প্রসঙ্গে ইহার অবতরণিকা। ইহার আখ্যান ভাগ এতই সংক্ষিপ্ত ও খাপছাড়া যে রামচন্দ্রাদির বনগমনের কারণটী পর্য্যন্ত উহ্য রাখা হইয়াছে :—

"অথ সীতা লক্ষ্মণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা।
জগাম বিপিনং রামো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥"

যে রচনা মাধুর্য্য বাল্মীকি রামায়ণকে উৎকৃষ্ট কাব্য হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থানে উন্নীত করিয়াছে, বাল্মীকির নামে প্রচলিত এই অদ্ভুত রামায়ণের মধ্যে তাহার কিছু মাত্র পরিচয় নাই। সর্ব্বদিক্ দিয়া বিচার করিলে এই গ্রন্থখানিকে কিছুতেই বাল্মীকির রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী যুগে শক্তি সম্প্রদায়ভুক্ত কোন পণ্ডিত বিষ্ণুর উপর শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সীতা কর্তৃক কালীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ দাশনন অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বৃত্তান্ত পরিকল্পিত হইয়াছে।

কবি জগৎরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরাম রায় সম্ভবতঃ উপাখ্যান ভাগের এই নূতনত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া জনসাধারণের অবগতির জন্য স্বীয় কবিভ্রাতাকে ইহার বঙ্গানুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জগৎরাম যদি কেবল মাত্র অদ্ভুত রামায়ণে বর্ণিত আখ্যান কয়টীর বঙ্গানুবাদ করিতেন বা তদবলম্বনে পালা লিখিতেন, তবে উহা কখনই সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইত না। অতি সুবিবেচনার সহিতই তিনি অদ্ভুত রামায়ণের আখ্যায়িকাকে মূল রামায়ণের অঙ্গীভূত করিয়া বিষয় বস্তুর ঐক্য এবং বাক্যের সুসঙ্গতি ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কবিজনোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্যতম পরিচয়। ইহার ফলে তৎপ্রণীত রামায়ণে কাণ্ডের সংখ্যা একটী অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের মধ্যে পুষ্করকাণ্ড নামক একটী নূতন অধ্যায়ে তিনি সীতা কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পুষ্কর কাণ্ডের আখ্যায়িকাটী সংক্ষিপ্তাকারে এইরূপ :

"রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দেশ বিদেশ হইতে মুনি ঋষিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। এই ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে অগস্ত্যমুনিও উপস্থিত ছিলেন। অগস্ত্য একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক, সুতরাং তাঁহার মতামতকে ভূয়োদর্শীর অভিজ্ঞতা হিসাবে সকলেই মান্য করিত। অগস্ত্য একদিন শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"রাবণে সবংশে নাশি হরিলে ভূভার।
অনাথের নাথ পরব্রহ্ম অবতার॥
রাবণ অধিক বলী নাহি ত্রিভুবনে।
বাহুবলে অবহেলে বধিলে আপনে॥
এইমতে নানা রামে প্রশংসেন ঋষি।
তাহা শুনি জানকীর মুখে মন্দ হাসি।"

সীতার এই হাসি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রসংসাবাদ শুনিয়া জানকীর মুখে উপেক্ষার হাসি ফুটিয়া উঠিল কেন? সর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইলেন অগস্ত্যমুনি। তিনি সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"শ্রীরামে প্রশংসা করি সব ঋষি মেলি।
এ কথায় হাস্য কেন করিলে মৈথিলী॥
সত্য কথা বল সীতা হাস্যের কারণ।
নতুবা উঠিবে অগ্নি নহে নিবারণ॥"

তখন সীতা বলিলেন, আমার বাল্যকালে আমার পিতৃভবনে এক মহাতেজস্বী ঋষি আসিয়াছিলেন। আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমার নিকট দেশ বিদেশের কাহিনী বর্ণনা করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, পুষ্করদ্বীপে সহস্রস্কন্ধ বিশিষ্ট এক রাবণ বাস করে, লঙ্কাধিপতি দশানন তাহার অনুজ। সহস্রস্কন্ধ রাবণ দশানন অপেক্ষা সাতগুণ বলশালী।

"লঙ্কার রাবণ অতি বলবান নয়।
তাহারে রাঘব রণে করিলেন জয়॥

ইহার বিনাশে সবে প্রভুরে বাখান।
এ নিমিত্ত হাস্যচিত্তে শুন মুনিগণ॥"

অগস্ত্য দেখিলেন তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য মাত্র। পুষ্করদ্বীপ বা সহস্রস্কন্ধ রাবণের নামও তিনি শ্রবণ করেন নাই। সভামধ্যে লজ্জায় তিনি অধোবদন হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের পৌরুষাভিমান আহত হইল। তিনি সভামধ্যে দর্প করিয়া বলিলেন যে সহস্রস্কন্ধ রাবণকে সংহার করিয়া তিনি তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিবেন। তখনই সৈন্য সজ্জার জন্য তিনি আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের চতুরঙ্গ বাহিনী পুষ্করদ্বীপে গিয়া হানা দিল। কৌতুহলী হইয়া মুনিঋষিগণ ও দেবগণ এই যুদ্ধ দর্শনে আগমন করিলেন। সীতাদেবী স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের সহগামিনী হইলেন। লঙ্কা বিজয়ী কপি সৈন্য, মহাবীর, লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রথম যুদ্ধেই সহস্রস্কন্ধের সমরে পরাজিত ও ভূপতিত হইলেন। নিদারুণ সংগ্রামের পর স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রেরও সেই গতি হইল। দেবতা ও ঋষিগণ প্রমাদ গণিলেন। ঋষিরা সীতাকে তীব্রবাক্যে নিন্দা করিতে লাগিলেন। সীতার চপলতার জন্যই এই প্রমাদ সংঘটন। তখন সীতার

"অতিশয় কোপস্ফূর্তি　　তেয়াগিয়া নিজমূর্তি
দীর্ঘ জঙ্ঘা হইল মহাকালী
হইল বিকটাকায়া　　ঘোররূপা খরস্বরা
কোটরাক্ষী ভীমা মুণ্ডমালী॥
অস্থির কিঙ্কিনী যুতা　　চতুর্ভুজা হৈল সীতা
লহ লহ করয়ে রসনা।
দলিত অঞ্জন আভা　　শব শিশু কর্ণে শোভা
ক্ষুধাতুরা বিকৃতা আননা॥"

কুসুমকোমলা জানকী এইরূপ ভয়ঙ্করী মহাকালী মূর্তিধারণ করতঃ রক্তবীজ বধ সংগ্রামের ন্যায় মহাযুদ্ধে সহস্রস্কন্ধ রাবণকে নিধন করিলেন। রাবণ নিহত হইল। কিন্তু মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যের আর নিবৃত্তি নাই।

বিরাট শরীর হৈলা পরম ব্রহ্মাণী।
পদভরে পাতালস্থ হইছে মেদিনী॥
নাসার নিঃশ্বাস যেন অনিল প্রবল।
নাসারন্ধ্রে যাবে বুঝি এ মহীমণ্ডল॥
প্রলয় উদয় হৈল কাঁপে চরাচর।
উলটে অবনী ক্ষোভে এ সপ্তসাগর॥"

তখন দেবতাগণের প্রার্থনা অনুসারে স্বয়ং মহাকাল আসিয়া মহাকালীর পদতলে বক্ষ পাতিয়া দিলেন। শিববক্ষে পদ পড়িতে শক্তি লজ্জাবশে তাণ্ডবনৃত্য সংবরণ করিয়া স্থির হইলেন। দেবগণ ও স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র কালিকারূপিনী জানকীর অনেক স্তবস্তুতি করিলে তিনি পুনরায় সীতার মূর্তি ধারণ করিলেন।

"হেন মহাবল নাই সকল সংসারে।
ধন্য ধন্য ধরাসুতা বধিলা এ বীরে॥"

এইরূপে মহাশক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল। মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে যে রটন্তিকালিকা পূজার বিধান আছে, অনেকের মতে উহা সীতারই "অসীতা" মূর্তি।

কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ অন্যান্য কাণ্ডের ঘটনা বর্ণনে সাধারণতঃ মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের অনুসরণ করিলেও মধ্যে মধ্যে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আদিকাণ্ডটী প্রধানতঃ অদ্ভুত রামায়ণের ঘটনাবলী লইয়া বিরচিত।

অন্যান্য কাণ্ডগুলির মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতার নিকট রামের বারমাস বর্ণনা, বন গমনের পূর্ব্বে কৈকেয়ীকে তত্ত্বকথা জ্ঞাপন, অরণ্যকাণ্ডে দুর্গাকর্ত্তৃক সীতার রূপ ধরিয়া রামকে বিড়ম্বনা ও শ্রীরামের দুর্গাস্তুতি; লঙ্কাকাণ্ডে—রাবণ ও মন্দোদরী কর্ত্তৃক সীতাকে দোলায় বহন করিয়া রামের নিকট গমন, রামের অভিচার যজ্ঞ ও রাবণ কর্ত্তৃক রামকে বরপ্রদান, এবং পুষ্কর কাণ্ড ও উত্তরা কাণ্ডের সন্ধিস্থলে ভাগবতের অনুকরণে শ্রীরামের রাসলীলা বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অভিনব। কি মূল রামায়ণ কি অদ্ভুত রামায়ণ অথবা অধ্যাত্ম রামায়ণ ইহার কোথাও এই সকল প্রসঙ্গ নাই। কোন পুরাণ হইতে কবি যে এই সকল উপাদান আহরণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ গ্রন্থ মধ্যে নাই। তবে এগুলি যে জগৎরাম বা রামপ্রসাদের স্ব-কল্পনা প্রসূত নহে গ্রন্থমধ্যেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামায়ণ গায়ক বা কথকগণের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া কবি স্বীয় কাব্য মধ্যে এই প্রসঙ্গগুলিকে স্থান দান করিয়াছেন। বিষয়ের নূতনত্ব হিসাবে

যে ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কবির রচনার উপর প্রাচীনতর কবি জয়দেব ও মুকুন্দরাম প্রভৃতির প্রভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। জয়দেবের অনুকরণে কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ কয়েকটী সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় মিশ্রিত স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর সরলতা উহার মধ্যে না থাকিলেও উহা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

"জলদ গাত্র, কমল নেত্র, শুভ চরিত্র রাঘবং।
স্মরণ মাত্র, দুরিত পাত্র, তরতি তাপ লাঘবং॥
পরমোদার, সফল সার, নির্ব্বিকার সুরবরং।
নমামি সূর্য্যবংশ সিন্ধু ইন্দু রাম সুন্দরং॥"

অথবা,—

"বৈশাখে প্রচণ্ড ভানু, কিরণে কম্পিত তনু
রেণু হবে কৃশানু সমান।
এ কোমল সুচরণে তাথে যেতে যেতে বনে
রাজকন্যা হারাবে পরাণ॥
আচ্ছন্ন হইবে দৃষ্টি ঘোরতর শিলাবৃষ্টি
সৃষ্টি ভরি ঝঞ্ঝাবাত বহে।
পুষ্প যদি লাগে গায়, তবে তোর প্রাণ যায়
এত পীড়া সে জনে কি সহে॥"

কিম্বা রামের প্রতি সীতার উক্তি—

শুন প্রাণপতি কি বল ভারতী
মোরে তেজি কতি যাবে।
ও মুখ না দেখি ছার ঘরে থাকি
জানকী প্রাণ কি রবে॥

বাহির হইতে গৃহেতে আসিতে
যে দিন অবধি হয়।
অভাগী জানকী যেমত চাতকী
পথ পানে চেয়ে রয়॥"

—প্রভৃতি রচনা পড়িলে স্বতঃই কবি কঙ্কণ ও বৈষ্ণব কবিগণের কথা মনো মধ্যে উদিত হয়।

কবি জগৎ রামের রামায়ণে একদিকে যেরূপ মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বহির্ভূত বহু নব নব বিষয়ের অবতারণা আছে অন্যদিকে সেইরূপ কৃত্তিবাস বর্ণিত তরণী সেন বধ, শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি সুপরিচিত আখ্যানাবলী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগৎরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ গ্রন্থ রচনায় পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বস্তুতঃ এই কাব্যের রচয়িতা হিসাবে তাঁহার দাবী তদীয় পিতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। লঙ্কাকাণ্ডের সেতুবন্ধনের পরবর্ত্তী অংশ হইতে সমগ্র লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডের প্রারম্ভ হইতে লব কুশের যুদ্ধ ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলন পর্য্যন্ত অংশ রামপ্রসাদের রচিত ও তাঁহার ভনিতা-যুক্ত। পুষ্কর কাণ্ডকে প্রাধান্য প্রদান জন্য ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বর্ষীয়ান কবি জগৎরাম লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু সাধারণের তাহাতে তৃপ্তি হইবে না বিবেচনা করিয়া উহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার জন্য পরে তিনি যোগ্য পুত্র রামপ্রসাদকে আদেশ করেন। রামপ্রসাদ পিতৃ আজ্ঞা অতি দক্ষতার সহিত পালন করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তি তদীয় পিতা অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিম্নস্তরের নহে। স্বীয় রচনার মুখবন্ধ স্বরূপ রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন ঃ—

"শুন শুন সভাজন বালকের নিবেদন
বিবরণ বলি যোড়হাতে
পিতা জগদ্রাম মোরে রাম লীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যৈমতে॥
সীতারাম লীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রী অদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত আধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম॥"

জগৎরামের রামায়ণের ন্যায় একখানি বৃহৎ কাব্যের সামান্য দুইচারিটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির কবিত্ব প্রতিভার সমালোচনা করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। এই কাব্যে দোষও আছে গুণও আছে,—কিন্তু দোষ এরূপ গুরুতর নহে যাহাতে পাঠকের রসভঙ্গ হয়। কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ,—শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের গৌরব স্পর্দ্ধা না করিতে পারেন,—কিন্তু বাংলার কাব্য সাহিত্যে তাঁহাদের এই অবদানখানি অবহেলার বস্তু নহে। যিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে ভালবাসেন, তাঁহার নিকট এই রামায়ণখানি নিশ্চয়ই সমাদরের বস্তু হইবে।

—০—

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলায় হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকার অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(২৬)

সেদিন গোপার বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় সুরমার সহিত মহিমের দেখা হইল। বাগানের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সে নিজেই দা দড়ি প্রভৃতি লইয়া বেড়া সারাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মেয়েটি এবং ছেলেটিও তাহাকে সাহায্য করিতেছিল কম নয়।

সুরমাকে দেখিয়া মহিম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল বড়বউ? প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে বিকৃত এতটুকু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সুরমা দাঁড়াইলেন, বলিলেন, গোপাকে দেখতে গেছলুম। অনেকদিন আর তোমায় দেখিনি ঠাকুর পো, ওদিককার পথই আর মাড়াও না। সব ভালো তো?

মহিম উত্তর দিল, ভালো আর কোথায়, ছেলেপুলে থাকলেই জ্বালা, বিব্রত হতে তো বড় কম নয়।

সুরমা বলিলেন, তা হলেও আমাদের বাড়ী যাওয়া চলতো ঠাকুরপো।

মহিম বলিল, আমার কি আর যাওয়ার যো আছে বউদি। এই তো সেদিন যাওয়ার কথা ভাবছিলুম, এমন সময় জামাইটার সব কথা শুনিতে পেয়ে মন একেবারে গেল খারাপ হয়ে, আর কোথাও বেরুনোর প্রবৃত্তি হল না।

উদ্বিগ্ন হইয়া সুরমা বলিলেন, জামাইয়ের আবার কি খবর পেলে?

মহিম একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, খবর বলে খবর,—জবর খবর, শুনলুম তার নাকি অনেক আগে বিয়ে হয়েছে, এখনও তিনটে ছেলে মেয়ে বর্ত্তমান।

সুরমা শিহরিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ, বিশেষ করে খোঁজ খবর না নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার এমন সর্ব্বনাশও করলে ঠাকুর পো।

অন্ধকার পূর্ণ মুখে মহিম বলিল, খোঁজ খবর নেওয়া না নেওয়া আর কি। ওদের বাড়ী কি এখানে—সে সেই ধারধাড়া গোবিন্দপুর সেখানে কে যাবে খোঁজ খবর আনতে? শুনেছি বর্দ্ধমান ষ্টেশানে নেমে নাকি পনের ক্রোশ রাস্তা, মাঝে মাঝে নদী পারও আছে। ছেলেটাকে দেখলুম, অক্ষয় এখানে এলো কাজ করতে তার মুখে সব শুনে পাত্রটীকে আর হাতছাড়া করলুমনা বিয়ে দিয়ে ফেললুম।

গম্ভীর মুখে সুরমা বলিলেন, তারই মুখে সব শুনে বিয়ে দিয়েছ তো? এখন বল যদি সে কোন নীচ জাতের ছেলে হয়, যেমন কামার তাঁতি কুমোর—তাহলে তো তোমার জাতটা গেল ঠাকুর পো?

বিস্ফারিত চোখে মহিম বলিল, আমায় অত বোকা ঠাউরো না বউদি, আর যা বল মহিম শর্ম্মাকে কেউ অত হালকা বলতে পারবে না। আমি দেখেছি জামাই তিন সন্ধ্যে আহ্নিক করে, খেতে বসে রীতিমত ব্রহ্মণ্য দেবকে অন্ন নিবেদন করে দেয়, আমি এই সব দেখেই তো বুঝেছি, যে জোচ্চোর হোক, বাটপার হোক, বামনের ছেলে বটে।

সুরমা মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, যাক জাত তোমার যায় নি এই ভালো, তার স্ত্রী আর তিনটী ছেলে মেয়ে আছে শুনেছ তাতেই বা কি? তুমি তো নেহাৎ শিশুটীর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও নি দেখে শুনেই দিয়েছ, জামাইটী বয়েসে তোমার চেয়ে দু চার বছরের বড় হবে বই ছোট নয়। এতে এমন আর কিই বা ক্ষতি হয়েছে ঠাকুরপো?

মহিম উত্তেজিত হইয়া বলিল, সে জন্যে ক্ষতি না হোক, অন্য দিক দিয়ে যে মস্ত বড় গোলমাল হয়ে গেল বউদি, সেটা তো খতিয়ে দেখছো না। জামাই তো

চলে গেছে আজ তিনমাস, পত্রদিয়ে খবর পেলুম তার নাকি ভয়ানক ব্যারাম বাঁচার আশা নেই। মরবে জেনে তাড়াতাড়ি উইল করেছে, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তার ছেলের নামে দিয়েছে। বোঝ ব্যাপার, এই মেয়ের ভার আমায় আজীবনকাল বইতে হবে।

সুরমা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, সে জন্যে তোমার নিজেরই লজ্জা পাওয়া উচিত।

মহিম জোর করিয়া বলিল, কিসের জন্যে? মেয়ে এসে জন্মেছে কেন, কে কে ওকে চেয়েছিলে? অপরাধ আমার না ওর বউদি, ও ছেলে হয়ে জন্মালো না কেন? জন্মালই যদি মরে গেল না কেন—তা হলে তো আমার সকল আপদ যেতো। তোমায় বলব কি বউদি, কতবার ব্যারাম হল, একটা ফোঁটা ঔষধ পর্য্যন্ত দিলুম না, তবু কেমন গড়িয়ে গড়িয়ে বেঁচে উঠলো। একটা কথা আছে না—মাস কলাইয়ে পোকা লাগেনা কথাটা কিন্তু ঠিক। এই দেখ না, ছেলেটা ভুগে ভুগে সারা হয়ে গেল, বাঁচবে কিনা জানি নে। সাতপুরুষের দৃষ্টি রয়েছে কিনা ওর ওপর, জল পিণ্ডি পাবে বলে তারা কে হাঁ করে ওর পানে তাকিয়ে রয়েছে, সেই জন্যেই ওর দেহ কিছুতেই সারছে না। ননী ডাক্তারের ওষুধ হার খেয়ে গেল, কিছুতেই ওকে ভালো করতে পারলুম না।

সুরমা বলিলেন, ননী ডাক্তারের হোমিওপ্যাথি ওষুধ এতটুকু করে না খাইয়ে এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাক না কেন?

মহিম অবহেলার ভাবে বলিল, রেখে দাও তোমার এলোপ্যাথিক ডাক্তার, খাওয়াবে তো কতকগুলো কুইনাইন, আর জ্বরের সময় কতকটা ফিভার মিকচার। এসব অসুখ ও ওষুধে সারে না বউদি, এ যদি সারবার হয় ওই ননী ডাক্তারের হাতের হোমিওপ্যাথিতেই সারবে।

সুরমা বলিলেন, যার যাতে বিশ্বাস ভাই, ওতে কারও কথা বলা চলে না তো। যাতে তাতে ছোট ছেলেটা সেরে উঠলেই বাঁচি, সত্যি যা চেহারা হয়েছে—

মেয়ের হৃষ্টপুষ্ট চেহারার পানে তাকাইয়া মহিম দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল, আর এর চেহারা দেখ একবার, খোদার নামে দেগে দেওয়া খাসি, দিন দিন গায়ে চর্ব্বি লাগছে দেখ।

সুরমা নিঃশব্দে মেয়েটীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মেয়েটী বড় সঙ্কুচিতভাবে একপাশে জড় সড় ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। নিজের পুষ্ট দেহটাকে ছেঁড়া কাপড়খানা দিয়া ঢাকিয়া সে রাখিতে চায়। নিজের পুষ্টতা তাহার নিজেরই কাছে লজ্জার হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই সীতার মত সেও বুঝি নতনেত্র ধরণীর উপর রাখিয়া বারবার বলিতেছিল—ধরণী তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি।

পিতা নির্ব্বিবাদে সমস্ত দোষ মেয়ের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন। জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকাটাই মস্ত বড় অপরাধ, কিন্তু যে তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছে, সে নিজেকে সে জন্য মোটেই দায়ী করে না, এই বড় মজার কথা।

কিন্তু তাহাতে যে গোড়ার দিকে টান পড়ে। কেন সে বিবাহ করিল, কেন সে সন্তানকে পৃথিবীতে আনিল, এতটা বিচার করিয়া খুঁটাইয়া দেখিবার শক্তিটাই বা এ দেশের কয়টী পিতার আছে, তাহারা জানে, চিরাচরিত নিয়মানুসারে বিবাহ করিতেই হয়, ইহাই সংসারে মনুষের একমাত্র ধর্ম্ম। ভরণ পোষণ করিতে পারুক বা নাই পারুক, সন্তান চাই নচেৎ বংশরক্ষা হয় না—পিতৃ পুরুষের মুখে জল পড়ে না। নিজেদের সকল অপরাধ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তাহারা রামায়ণ মহাভারতের অনেক কাহিনী মুখস্থ রাখিয়া রাখে। জরৎকারু মুনির মত লোকেও তো এই বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আত্ম প্রবঞ্চনার এমন সহজ উপায় আর নাই, এ দেশের লোকের সাধারণ জ্ঞানও ঠিক ওই পর্য্যন্ত পৌঁছায়।

একবিন্দু জলাশায় পিতৃপুরুষগণ গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া আছেন কিনা কে জানে? তবু তো এ দেশের লোক সেই কথার উপরও বিশ্বাস রাখে এবং তাহারই জন্য কত না কাজ করিয়া যায়।

সুরমা মেয়েটীর মলিন মুখ ও সজল দুটি চোখের

পানে তাকাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র, মহিমের দিকে তাকাইবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত তাঁহার হইল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, এক কাজ করনা কেন ঠাকুরপো, ওকে নিয়ে একবার সেখানে যাও না,—মনে হয়, নিয়ে গেলে কাজ হতো।

মাথা নাড়িয়া মহিম বলিল, ক্ষেপেছ বউ দি, এক কেঁড়ে টাকা বার করে ওকে নিয়ে যাই—আবার আনি, সব কিছুই একটা মেয়ের জন্যে খরচ করে বসি—তবু লাভ তাতে এতটুকু নেই। আর সেখানে আসতে গেলেই যে আট দশটা দিন নষ্ট করা, একবেলা বাড়ী না থাকলেই সব যায়— আট দশ দিন কি বড় মুখের কথা? বলব কি বউ দি, এই পুকুরটা বাগানের মধ্যে রয়েছে, গাঁয়ের ছোট বড় সবারই দৃষ্টি এই পুকুরটার পরে,—একটি বেলা যদি না থাকি অমনি সব বেড়া টপকে—ভেঙে ছিপ নিয়ে বসবে। যাই বল বউদি, দেখতে পুকুর এতটুকুটী বটে, মাছ এত আছে যে বলতে পারিনে। যদি একটিবার ছিপ নিয়ে বসো প্রতি টোপে মাছ উঠবে। এই দেখছোনা বেড়ার দুর্গতি, সব ভেঙে চুরে কাল রাত্রে জাল ফেলে মাছ ধরেছে,—ক'মন যে ধরল তা কেই বা জানে। আজ বিয়ের দিন,—সগন সার বাজার, কত টাকা যে লুটবে তার কি ঠিক আছে। লুটবি লোট তাই বলে এই গরীবের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া এ কি সইতে পারবে?

একটা বুক ফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহিম হুঙ্কার দিল —ওরে, দড়িটা ভাল করে ধর, গেরো পড়ছে না যে—

আর দাঁড়াইবার সময় সুরমার ছিলনা, বলিলেন, আজ চললুম ঠাকুরপো, পারো তো সময় করে একদিন দেখা করো।

তিনি চলিয়া গেলেন।

(২৭)

দীনেশ একদিন বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল, সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুইযে এলি, মাধব বাবুরা এসেছেন নাকি?

দীনেশ উত্তর দিল, কলকাতা পর্য্যন্ত এসেছেন, কাল পরশু এখানে আসবেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ে কবে?

দীনেশ বলিল, সামনের দশই—

তাহার মুখ চোখ আগেকার মতই উজ্জল—প্রফুল্ল, সে যে পলাশকে কোনদিন পাওয়ার আশা করিয়াছিল, আজ সেই পলাশ চিরদিনের মত পর হইতে চলিয়াছে—এ জন্য সে যে কষ্ট পাইয়াছে, সে ভাব তাহার মধ্যে মোটেই ফুটে নাই।

নরেন ডাকিতে আসিয়াছিল, গোপার কয়দিন জ্বর দীনেশকে একবার যাইতে হইবে।

সুরমা বলিলেন, সত্যি তোকে সে কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি দীনু, গোপাকে একবার দেখতে যেতে হবে। মাগো, কি মেয়ে বাপু, প্রায়ই জ্বর হয় অথচ তার কোনও চিকিৎসা নেই। কাল এসেছিল,—বিশ্রী চেহারা দেখে গায়ে হাত দিতে দেখলুম বেশ জ্বর—গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

দীনেশ বলিল, একটা কথা মনে পড়ল দিদি। তোমরা জানো না, প্রভাকর বিয়ে করে একটুও সুখী হতে পারে নি। বেচারা এখন অস্থিমজ্জা দিয়ে বুঝতে পারছে মেম সাহেবকে বিয়ে করে কি রকম জব্দ হতে হয়।

সুরমা বলিলেন, বেশীর ভাগই তো এই রকম ব্যাপার শোনা যায়, কদাচিৎ যদি এক আধটা উতরে যায়। এ রকম হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্য নয় দীনু—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশের লোক, ভিন্ন মনের ভাবধারা, এ কখনও চট করে এক হয়ে মিশতে পারে? কোনদিন তাদের জানাশোনা ছিল না, দু-দণ্ডের দেখায় তারা অমনভাবে আপন হতে পারে কখনও? আমি আগে হতেই জানি ও হচ্ছে কেবল চোখের নেশা,—সত্যিকার জিনিস ওর মধ্যে এতটুকু নেই।

দীনেশ একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু বিশ্বাস কর দিদি, প্রভাকর সত্যিই মেমটাকে ভালবাসে।

সুরমা বলিলেন, কিন্তু মেমসাহেব যে এ দেশের মেয়ের মতই অনন্যগতি হয়ে তাকে ভালবাসবে না, এ জানা কথা। সে দেশের জল হাওয়া আলাদা, স্বামীর প্রেমে তারা নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেবে না।

দীনেশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, অনেক সময় সেই রকমই দেখা যায় বটে। কিন্তু যদি সেক্ষণ আসে যদি প্রভাকর এসে গোপার দরজায় দাঁড়ায়—

সুরমা জোর করিয়া বলিলেন, তাকে আসতেই হবে তুই দেখে নিস দীনু, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।

বিশ্রামান্তে গোপাকে দেখিতে যাইবার জন্য দীনেশ উঠিল।

গোপা ঘরের ভিতর বিছানায় চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল দীনেশ প্রবেশ করিতে তাকাইল।

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দীনেশ শিহরিয়া উঠিল। ইস, একি চেহারা হয়েছে গোপা, দেখে যে চেনা যাচ্ছে না।

অতি কষ্টে গোপা উঠিতে যাইতেছিল, দীনেশ বাধা দিল, বলিল, থাক, থাক, তোমায় উঠতে হবে না গোপা—আমি তোমার পাশে ওই বিছানাটায় বসলে দোষ হবে না—তাতে মহাভারত ও অশুদ্ধ হবে না।

বলিতে বলিতে সে বিছানার ধারে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, নরেন কোথায় গোপা?

শ্রান্তভাবে গোপা বলিল, তাকে আবার পেটের ভাবনাও যে ভাবতে হচ্ছে দীনেশ দা। কোথায় কি আছে যোগাড় করতে হবে, যা হোক দুটো ফুটিয়ে নিয়ে খেতে হবে তো,—সে তাই বোধ হয় খাওয়ার চেষ্টায় গেছে। আবার আমায় খাওয়ানোর যোগাড় ও তো তাকেই করতে হবে।

ব্যথিত কণ্ঠে দীনেশ বলিল, কিন্তু আমার দিদিকে এতটুকু জানালেও তো হতো, তুমি আজও যে আমাদের এতটা পর ভাব, আমি তা জানতুম না।

গোপা স্থির দৃষ্টি দীনেশের মুখের উপর রাখিয়া বলিল পর ভাবিনে দীনেশ দা, কিন্তু—

দীনেশ বলিল, তবু সঙ্কোচ জাগে—কেমন? আচ্ছা থাক সে কথা পরে হবে এখন। দেখি তোমার হাতখানা—

হাত দেখিয়া দীনেশ বলিল আমি গিয়ে এখনি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিয়মমত করে খাওয়া চাই,—বুঝলে?

গোপা শান্ত হাসিয়া বলিল, ওষুধ খেয়েই বা কি হবে দীনেশ দা—

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া দীনেশ বলিল, কি হবে মানে? তুমি কি বলতে চাও রোগে ভুগে জীর্ণ হয়ে মরাটাই মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় কাম্য জিনিষ—মরাটাই মনুষ্যত্ব?

গোপা উত্তর দিল, না হতে পারে, কিন্তু যারা আমার মত—,তাদের কাছে শুধু ব্যারামে কেন,—একটা সুচ বিঁধে মরাটাও কাম্য হতে পারে, গলায় দড়ি দিয়ে বা বিষ খেয়ে মরাও কাম্য হতে পারে। মরণকে যে কোন রকমে পেতেই হবে কিনা তারই জন্যে যা কিছু সাহায্য করবে সবই কাম্য।

দীনেশ চুপ করিয়া রহিল—

খানিকক্ষণ পরে বলিল, কিন্তু তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারলুম না গোপা—মানুষকে সব রকমে আমি এত ছোট করতে পারিনে। মানুষের সম্বন্ধে আদর্শ আমার খুব উঁচু; অত ছোট মন নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই ঝকমারী।

গোপা বলিল, ঝকমারী সে কি আর একবার হাজার বার—লক্ষবার ঝকমারী। মানুষ কেন জন্মায়, কেন বেঁচে থাকে আমি তাই ভেবে ঠিক পাইনে দিনেশদা।

দীনেশ অত্যন্ত ম্লান করুণ নেত্রে গোপার পানে তাকাইয়া রহিল।

নিজেকে নিষ্পেষিত করিয়া মারা—এ মরণে সার্থকতা নেই,—কিন্তু একথা বুঝাইয়া বলিলেও গোপা কানে লইবেনা।

মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, প্রভাকরের খবর পেয়েছি গোপা,—

গোপা হাসিল, বলিল, সে কথা শুনবার দরকার আর তো আমার নেই দীনেশ দা—

দীনেশ বলিল, তোমার দরকার না থাকলেও শুনবার ইচ্ছা সবারই থাকে গোপা তাই বলবার প্রলোভন আমি সামলাতে পারছিনে। হ্যাঁ, প্রভাকর জিততে পারে নি সে হেরেছে—ঠকেছে।

গোপা বলিল, তার ঠকায় বা জেতায় আর আমার

কিছু আসে যায় না দীনেশ দা, আমার কাছে তার দাম আজ এক কানা কড়িও নয় তার কথা তোমায় আর বেশী করে বলতে হবে না।

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, অথচ একদিন তারই মূল্য ছিল না, জীবনের বিনিময়েও একদিন পাওয়ার আশা করেছিলুম। কিন্তু সে দিন আজ অতীতের কোলে মিশেছে দীনেশ দা, আজ আমি যে জায়গায় এসেছি এখানে তার প্রবেশাধিকার আর কোন দিনই হবে না। একদিন দুঃখ পেয়েছিলুম, কিন্তু আজ সে ক্ষতি—ক্ষতি বলেই মনে হয় না। আজ মনে হয় সমুদ্রের যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে মাত্র একটা ঢেউয়ের অপেক্ষা মাত্র, সেই ঢেউটা আমায় তলিয়ে দেবে তার বুকের মাঝে। তাই না বলছি—মরণ,—সে তো আসবেই, তাকে তাই রাজার মত অভ্যর্থনা না করে চুপে চুপে পেতে চাই। জাঁক জমকে তাকে বরণ করার শক্তি আমার অনেক আগে নিঃশেষ হয়ে গেছে দীনেশ দা, আজ তাকে আনব আমার খিড়কির পথে নিঃশব্দে—চুপি চুপি।

দীনেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

গোপা বলিল নিজের কথাই তো পাঁচ কাহন; তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞাসা করলুম না দীনেশ দা। তোমার বিয়ের কি হল নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছ কবে?

বিয়ে—আমার—?

দীনেশ যেন আকাশ হইতে পড়িল—আমার বিয়ের কথা এর মধ্যে এখানে এসে পৌঁচেছে? বাঃ, এযে দেখছি বাতাসের আগে খবর ভেসে আসে।

গোপা একটু হাসিয়া বলিল, খবর হয় তো আসত না নেহাৎ তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক নিয়েই লোকে আমার কানে বেশ করে এ কথাটা তুলে দিয়েছে, নইলে হয় তো দিত না।

সে হাসিতে লাগিল, যদিও সে হাসিতে মোটেই জোর ছিল না,—জোর করিয়াই সে হাসি টানিয়া আনা হইয়াছে।

দীনেশ বলিল, বুঝেছি, কিন্তু কোথায় আমার বিয়ে যে নেমন্তন্ন করব। এখানকার লোকে আন্দাজে অনেক কথাই বলে। কোনদিন শুনবে মুসোলিনী তোমাদের রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিল,—শুনবে ডি ভ্যালেরা এসে পথ দিয়ে ঘুরে গেল, শুনবে—আমানুল্লা তোমার ঘরে বসে চা খেয়ে গেল। লোকে এই যে কথাটা বলছে এটা তারা অনেককাল ধরেই বলে আসছে। ওসব কথা এত কাল যেমন হেসে উড়িয়ে দিয়েছ, আজও তেমনি করে উড়িয়ে দাও। আলসের কল্পনা কোন কাজে আসে না, কেবল চর্চ্চাই চলে।

গোপা বলিতে গেল, কিন্তু শুনলুম যে পলাশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে—

দীনেশ হাসিয়া উঠিল, ক্ষেপেছ গোপা বড়লোকের সঙ্গে গরীবের কোনদিন মিল হয় দেখেছ? তেলে আর জলে যেমন মিশ খায় না, দুটোই দুটোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে তেমনি বড়লোক আর গরীবও নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। সত্যি একে বাধ্য-তাই বলে কারণ হয় তো ওদের মেলার ইচ্ছে থাকে তবু পারে না, শেষ পর্য্যন্ত যতখানি পর্য্যন্ত আগেও ছিল ততখানিই শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায়। ওসব কথা ছেড়ে দাও গোপা, মাঝখানে যে প্রাচীর রয়েছে তাকে ভেঙ্গে ফেলা আজও সম্ভব হয় নি। হয় তো কোনদিন আসবে সেদিন, ততদিন আমাদের কি হবে—কোথায় থাকব কে জানে।

সে উঠিল—

আমি এখনি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়মমত খেয়ো। নিজের দিকে চেয়ো—আমি আবার ওবেলা আসব এখন।

সে বাহির হইল। ক্রমশঃ

ইষ্টেথেস্‌কোপ

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ছেলেবেলায় মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন সৈনিকের বন্দুক না থাকাও যেমন, ছাত্রের পেন্‌সিল না থাকাও তেমনি। তখন যদি আর একটি পাদপূরণ করিতেন তবে উপমাটি হইত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। 'বন্দুকহীন সৈন্য পেন্‌সিলহীন ছাত্র ও ইষ্টেথেস্‌কোপশূন্য ডাক্তার।'

ইষ্টেথেস্‌কোপ এদেশে তখন সবেমাত্র আমদানী হইতেছিল সুতরাং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় মাষ্টার মহাশয়কে অজ্ঞানতার অপবাদ দিতে পারি না।

ডাক্তারের কথা মনে করা মাত্রই সর্ব্বাগ্রে তাহার নিত্যসাথী পরমবন্ধু ইষ্টেথেস্‌কোপটির রূপই চোখের সামনে আইসে। বন্দুক যেমন সৈন্যের পরিচায়ক, পেন্‌সিল যেমন ছাত্রের, তিলক যেমন বৈরাগীর, সিঁথীর সিঁদুর যেমন সধবার, বেত যেমন মাষ্টারের, টিকী যেমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের, দাড়ী যেমন মুসলমানের, ভুঁরি যেমন পেটুকের, লাঙ্গুল যেমন বানরের, শামলা যেমন উকিলের, হ্যাট্‌ যেমন সাহেবের, লালপাগড়ি যেমন পুলিসের, চূড়া যেমন মন্দিরের, গম্বুজ যেমন মসজিদের, সাড়ী যেমন নারীর, এজলাস যেমন হাকিমের, গেরুয়া যেমন সন্ন্যাসীর, প্রাসাদ যেমন ধনীর, কুটীর যেমন দরিদ্রের, তাঁত যেমন তাঁতীর, লাঙ্গল যেমন চাষীর, ফল যেমন বৃক্ষের, শুভ্র কেশ যেমন বৃদ্ধের, আর ছাই কতই বা বলিব—ইষ্টেথেস্‌কোপও তেমনি ডাক্তারের পরিচায়ক।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি দ্বাপরে কালার মোহন বাঁশীর পর এমন মধুর সৃষ্টি আর হয় নাই। কালার শ্রীমুখ বঞ্চিত হইয়া বাঁশীর রন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং উহারই অন্বেষণে হাতড়াইতে হাতড়াইতে দুইদিক বর্দ্ধিত হইয়া এই নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। কালার বাঁশীর রবে গোপনারীর বক্ষ স্পন্দিত হইত, হৃদয় উচাটন হইত, ইষ্টেথেস্‌কোপ যোগে কলিযুগের নারীর বক্ষ স্পন্দিত হয় কিনা তাহা তাহারাই বলিতে পারেন।

এই কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে হৃদয়ের কত নিভৃত তত্ত্বই না জানা যায়, কত গোপন ভাষা ও রহস্যই না প্রকাশিত হয়! সামান্য অতি সাধারণ একখানা কাষ্ঠখণ্ড,—আপনা আপনি কিছুই নহে, কিন্তু যেই প্রাণযুক্ত দুইটি জীবে পরস্পর যোগাযোগ হইল অমনি যে কত—ভাষামুখর শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকিল তাহার শেষ নাই। রাখাল-রাজের বেণু দিয়া প্রাচ্যদেশ জগৎকে একদিন মত্ত করিয়াছিলেন, আজ হে প্রতিচ্য এই কাষ্ঠখণ্ড দিয়া তুমি জগতে পুনরায় নবযুগের সূচনা করিলে।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক যুগের কথা আলোচনা করিব এবং ইহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিব।

অতি প্রচীনকালে আয়ুর্ব্বেদে বায়ুপিত্ত কফের সাম্যতা ও বৈষম্য অনুসারে ব্যাধিনির্ণয় হইত এবং কোমল পানি পীড়নেই এ সম্বন্ধে মীমাংসা হইত—বিধায় বক্ষপীড়নের প্রয়োজন হইত না। সে সব সত্যযুগের কাল কিনা!

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকগণ শব্দের তারতম্য অনুসারে দেহের ভিতরে জল কিংবা বায়ু আছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। বুকে অঙ্গুলীদ্বারা ঠোকর মারিয়া উহার পরীক্ষা করিতেন। চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত ও সর্ব্বথা অগ্রগণ্য ভিয়েনা নগরীতে ডাক্তার অয়েনব্রুগার ইদানীং সর্ব্বপ্রথম বুকের উপর এই ঠোকাঠুকির কাজ আরম্ভ করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার করভিসার্ট এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরীক্ষা করায় এই ঠোকাঠুকি প্রচলিত হইয়া উঠিল। অনাবৃতবক্ষে মাত্র অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিয়া শব্দ উৎপাদন করা হইত। এই পদ্ধতিকে মুখ্য ঠোকাঠুকি বলা যাইতে পারে। পরে ডাক্তার পাইয়রী গৌণভাবে উহার প্রচলন করেন। ইহাতে বুকের উপর এক হাতের আঙুল রাখিয়া অন্য হাতের আঙুল দ্বারা আঘাত করা হয় অথবা বক্ষের উপর কোন ধাতব জিনিস

রাখিয়া কোন কঠিন জিনিস দ্বারা শব্দ উৎপন্ন করা হয়। বর্ত্তমানে ডাক্তারদের এই গৌণভাবেই বেশীরভাগ কাজ করিতে দেখা যায়। বক্ষের উপর করপল্লব বিছাইয়া অঙ্গুলীর আঘাতে যে সুর বাহির হয় তাহারই তারতম্য ভেদে বক্ষাভ্যন্তরের গুপ্ত কাহিনী ব্যক্ত হয়।

ইহার অব্যবহিত পরেই ডাক্তারগণ বিশেষতঃ ফরাসী ডাক্তারগণ বুকে ও পিঠে কান লাগাইয়া শব্দ শুনিতে আরম্ভ করেন।

খুব বেশী দিনের কথা নহে, মাত্র ১১৫।১১৬ বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৮১৯ সনে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ডাক্তার লেনেক ইষ্টেথেস্‌কোপের সূচনা করেন। তিনি মনে করিলেন বক্ষের উপর কাণ লাগাইয়া শোনার চেয়ে যদি কোন কঠিন পদার্থের সহযোগে ঐ শব্দ শোনা যায় তবে উহা আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাইবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক দিস্তা কাগজ গোল করিয়া পাকাইয়া তিনি আদি ইষ্টেথেস্‌কোপ সৃষ্টি করিলেন। উহার একদিক বক্ষে অন্যদিক কর্ণে সংলগ্ন থাকিত। ইহার পর সৃষ্টি করিলেন কাঠের নল, দৈর্ঘ্যে বার ইঞ্চি ও উহার ঠিক মধ্য দিয়া থাকিত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র। বক্ষেরদিকের অংশটা ছিল মোচাকার। ইহা দ্বারা—হৃৎপিণ্ড ও গলার ভিতরের শব্দ পরীক্ষা করা হইত। এই সময়ে ইহা দুইখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং অংশ দুইটি পেচ দ্বারা আটকান থাকিত। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া পরীক্ষারকালে মোচাকার অংশটি খুলিয়া লওয়া হইত। দুইখণ্ডে বিভক্ত থাকিলেও উহা বিশেষ ভারী এবং সর্ব্বদা ব্যবহারে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। বর্ত্তমান কালের ক্ষীণপ্রাণ ও হৃতশক্তি ডাক্তারদের নিকট (যদিও সকলেই নহেন) উহা ভীমের গদার তুল্য।

পাইয়রী উহার দৈর্ঘ্য কমাইয়া ৭ ইঞ্চি করিলেন এবং খুব হালকাও করিলেন। বক্ষমুখী অংশ আরও ছড়ান হইল ও কর্ণমুখী অংশ চেপটা হইল। লেনেক এই সময়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। সুস্থ ও পীড়িত উভয় অবস্থায় বক্ষ পরীক্ষা করিয়া, বিভিন্ন শব্দের পরিবর্ত্তন আলোচনায় এবং মৃতদেহ পরীক্ষা দ্বারা ঐ সমস্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাহার প্রসিদ্ধ 'এইত দি অস্কালটেসন্' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং ইহার ব্যবহারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সকলের সমক্ষে প্রচার করেন। তিনি মনে করিতেন গৌনপরীক্ষা, মুখ্য পরীক্ষা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহা সত্য নহে। যন্ত্র সহযোগে শোনার চেয়ে কান লাগাইয়া শোনায় শব্দ যে ভালরূপে ধ্বনিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ তবে ইষ্টেথেস্‌কোপ দ্বারা পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সুবিধা আছে।

(১) কোন একটি স্থান বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা যায় এবং অপর স্থানের সহিত মিলাইয়া দেখার সুবিধা হয়।

(২) বক্ষের সমস্ত অংশে সহজ ভাবে দেওয়া যায়—।

(৩) রোগী বেশী রুগ্ন হইলে, বা স্ত্রীজাতি হইলে বক্ষের সমস্ত স্থানে কর্ণযোজনা সম্ভব নহে অথচ ইষ্টেথেস্‌কোপ দ্বারা উহা সুবিধা মতন সম্পন্ন করা যায়।

ইষ্টেথেস্‌কোপের দ্বারা কোন কোন স্থান পরীক্ষিত হইতে পারে? আপনারা বলিবেন—সে কথা সকলেই জানেন সুতরাং জানা কথার পুনরাবৃত্তি দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। হয়ত কাহারও জানা নাও থাকিতে পারে এবং জানা কথাও পুনর্ব্বার শুনিলে যখন উপকার ভিন্ন অপকার নাই তখন আর একবার উল্লেখ করিব। শব্দই হচ্ছে ইষ্টেথেস্‌কোপের আহার, শব্দেই ইহার অস্তিত্ব শব্দেই ইহার পুষ্টি এবং শব্দই ইহার প্রাণ। যে স্থানেই শব্দের প্রকাশ, সেখানেই ইহার আদর। হৃৎপিণ্ড আকুঞ্চনের দরুণ একটা দপ্‌ দপ্‌ শব্দ হয়, এই শব্দের স্বাভাবিক একটা সুর আছে। উহার উচ্চতা ও খাদ এবং নানাবিধ বিকৃতি অনুসারে শব্দ বিভিন্নভাবে কর্ণে ধ্বনিত হয় এবং বিবিধ উপসর্গের সহিত এই ধ্বনির তারতম্য মিলাইয়া রোগনির্ণয় করা হয়। এইরূপে ইষ্টেথেসকোপ সহায়তায় হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুসের উহাদের আবরণঝিল্লীর, খাদ্য নালীরও পাকস্থলী প্রভৃতির ব্যাধিনির্ণয়ে সহায়তা করে। যন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞানই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয়। কোন স্থানে শব্দের আধিক্য, স্বল্পতা বা অভাব, কোথায় উহার বিকৃতি বা রূপান্তর; এই সকলের সহায়তায় এবং অন্যান্য লক্ষণের

সহযোগে ব্যাধিনির্ণয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আইসা যায়। ইহার দ্বারা সর্ব্বরোগ নির্ণয় করা যায় না বা সর্ব্বস্থানে ইহার ব্যবহার চলে না। শুনিতে পাই কোন কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তার মস্তকেও ইষ্টেথেসকোপ লাগাইতেন এবং এখনও কেহ কেহ লাগাইয়া থাকেন কিন্তু উহা যে একটা বৃহৎ ফাঁকি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতেই হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রীড়ার গোলযোগ হইতে পারে সুতরাং এই দুইটি যন্ত্রের পরীক্ষায়ই ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। ধাত্রীবিদ্যা চিকিৎসকদের ইহা একটা প্রধান সহায়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যতিরেকেও ভ্রূণ সম্বন্ধে এই যন্ত্র সহযোগে অনেক বিষয় জানা যায়। পেটে বাস্তবিকই সন্তান আছে কিনা অথবা উহা গুল্ম মাত্র, সন্তান জীবিত কি মৃত এইরূপ অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়। আজকাল রক্তের চাপ পরীক্ষার কালেও ইহার সাহায্য ব্যতীত সঠিক সংবাদ জানা যায় না। কাঠের নলের উদ্ভব পর্য্যন্তই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহারও ক্রমে উন্নতি হইয়াছে। কানের দিকের অংশকে ভাঙ্গিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়া পকেটে লইয়া যাওয়ার সুবিধা করা হইয়াছে। কাঠের নলের পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়াম, নিকেল, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্বারাও উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। মানুষ সর্ব্বদাই সুবিধার অন্বেষণ করে, চিরকালই আয়াসের পশ্চাতে ছোটে। তাই এই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পরীক্ষা করিতে রোগীর উপরে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয় বিধায় ইহার পরবর্ত্তী উন্নতি মধ্যপ্রদেশে রবারের নলসংযোগ। তৎপর উহা এক কর্ণে ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কর্ণমুখী অংশ দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া আজকালকার 'বিন্ অরাল ইষ্টেথেস-কোপ এর উদ্ভব হইয়াছে। কর্ণমুখী বাহু দুইটি সময় সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সময় সময় একটি বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই বাহু দুটি আবার প্রসারিত না থাকিয়া উভয়ে আলিঙ্গিত অবস্থায় ডাক্তারের পকেটে শয়নলাভের সুবিধা পাইয়া থাকে। বক্ষমুখী অংশটীর আজ কাল নানা আকার হইয়াছে। ত্রেত্রিশকোটী দেবতার মত ইহারও তেত্রিশ কোটী রূপ। সাধক শ্রীভগবানকে যখন যে ভাবে বন্দনা করেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুও সেই আকার গ্রহণ করিয়া ভক্তের সমীপাগত হন। তাই কোনটির মুখ গোল, কোনটি ধুতুরামুখী, কোনটি বা চেপটা। কোনটির মুখে আবার দ্বিতীয় একটি লম্বা নল লাগান থাকে। শব্দ শোনার উন্নতি হউক আর না হউক, রবারের নলটি দীর্ঘ থাকিলে অথবা বক্ষমুখ হইতে আর একটি দ্বিতীয় নল থাকিলে অন্ততঃ এই উপকার দেখা যায়, যে একটু ফাঁকে থাকিয়াই রোগীর পরীক্ষা চলে এবং সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে অনেকটা বাঁচাওয়া হওয়া যায় এবং স্ত্রীজাতির পরীক্ষার সময়ে মর্য্যাদারক্ষণে সমর্থ হয়। সময় সময় ইহা ফ্যাসন সাপেক্ষও বটে। কোন কোন বক্ষমুখের বিশিষ্টতা আছে। ছোট শব্দকে বড় করিবার ক্ষমতা থাকায়,—যাহারা কানে খাট তাহাদের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—একি ভগবানের উপাসনায় কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বৌদ্ধ কেহ খ্রীষ্টান, কেহবা মুসলমান। এইরূপ একই শব্দ শ্রবণোদ্দেশে কত না আকারের যন্ত্রের সৃজন।

কেবল যে আকারেই ভিন্ন তাহা নহে। ডাক্তারদের স্বভাবানুযায়ী ইহারা নানা স্থানে বাস করেন। যে সব ডাক্তারেরা মোটর বা গাড়ী যোগে চলাচল করেন তাহাদের অনেকেই ইহাকে মালার ন্যায় গলায় ঝুলাইয়া রাখেন, বক্ষসংলগ্ন না থাকিলে বোধ হয় সোয়াস্তি পান না। কেহ কেহ সম্মুখস্থিত ব্যাগ বা বাক্সের উপরে রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কেহ বা গাড়ীর আসনে, নিজের পাশেই চক্ষে চক্ষে রাখেন। কেহ বা গাড়ীর পাশে পেরেক পুতিয়া উহাতে ঝুলাইয়া রাখেন। গাড়ীর ছাতের নীচে যে জাল টাঙ্গান থাকে অনেকে তাহার ভিতরে রাখেন এবং দৃষ্টি ঊর্দ্ধে রাখিয়া উহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ তাহাদের ঢাকনীদার বাক্সটির উপরে উহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। বুক পরীক্ষার সময় তত দরকার না হইলেও ঔষধ দিবার সময় নাড়াচাড়া করিয়া সুখ উপভোগ করেন। কেহ বা উহাকে হস্তে লইয়াই ঘোরাফিরা করেন। কেহ কেহ উহাকে অতি যত্নে ভিতরকার বুকপকেটে রাখেন, উহার অর্দ্ধেকটা যাহাতে পকেটের বাহিরে ঝোলে ও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়

সে সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ সতর্কতা লন। কেহ আবার অতি সংগোপনে উহাকে ডানদিকের বাহিরের পকেটে লুকাইয়া রাখেন। গৃহস্থের কুলবধূ যেমন জানালার ভিতর দিয়া অতি সন্তর্পণে বাহিরে উঁকি দেন, সময় সময় ইহার কর্ণমুখী বাহু দুটির অগ্রভাগ বা বক্ষমুখী অংশটুকুর শিরোদেশ সেইমত উঁকি দেয়। কেহ বা কনুইয়ের উপর, কেহ বা কাঁধের উপর ঝুলাইয়া রাখেন। আবার কাহাকেও টুপীর সহিতও সংলগ্ন রাখিতে দেখি। আজকালকার নব্য কবিরাজদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষতঃ যাহারা ডাক্তারী পড়িয়া কবিরাজ হইয়াছেন তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও জামা ব্যবহারের অভ্যাস আদৌ না থাকায় অকস্মাৎ উহা কচ্ছসংলগ্ন—হইয়া পড়ে। যাহারা ঝাড়ফুঁক্ দেয়, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে—তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও ইহা লইয়া বিব্রত হইতে দেখিয়াছি। আবার কাহাকেও ইহাকে ব্যাগে ভরিয়া, যে ভাবে ঝুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলাফেরা করিতে দেখি তাহাতে অন্য একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—যাহার অধিকারীগণ নাকি নরের মধ্যে প্রকৃতই সুন্দর!

ষ্টেথেস্কোপটি বড়ই সমদর্শী। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, সুন্দর কুৎসিত, সৎ অসৎ, শত্রু মিত্র, মোটা সরু, লম্বা খাটো, পুরুষ নারী, বালক বৃদ্ধ, সুস্থ পীড়িত, জীবিত মৃত কাহারাও মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না, সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন দেন।

মানুষের হাতে পড়িয়া, মানুষের ন্যায় সময় সময় ইহারও ছুঁৎমার্গ দেখা যায়। কোন সংক্রামক রোগীকে স্পর্শ করিয়া অবগাহান না করিয়া বা পচননিবারক আরকে ধৌত না হইয়া, ইনি অধিকাংশ সময়েই প্রভুর পকেটে ফিরিয়া যান না।

যে নারীবক্ষ সতত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে ইহা তাহার সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। যে নারী একান্ত পর্দ্দানসীন, পর্দ্দার অন্তরাল দিয়া ঢুকিয়া তাহার বক্ষের গোপন ভাষাও জানিয়া আইসে। সুতরাং ইহার ক্ষমতা বড় যেমন তেমন নহে।

কে সুস্থ, কে পীড়িত, কাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ বা একবারেই নিবিয়া গিয়াছে তাহা ইহার মত আর কে বলিতে পারে?

ইহার মত সত্যগ্রাহী খুব কম জিনিসই আছে। কে মিথ্যা ব্যাধির ভান করিয়া আসিয়াছে, কাহার মিথ্যা সার্টিফিকেটের জন্য ডাক্তারকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা—কে মৃত্যুর ভান করিয়া পড়িয়া আছে তাহা ইহার মত বিশ্লেষণ করিতে আর কে পারে? সুতরাং ইহা দুর্জ্জনের একান্ত ভীতিব্যঞ্জক।

জীবের মঙ্গলতরে ইনি সদাই সচেষ্ট। পশুচিকিৎসকের হস্তে ইনি পশুপক্ষীরও মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। কার্য্যে লাগিবার জন্য ইনি সদাই প্রস্তুত। আলস্য নাই, ওজর নাই, অক্লান্তকর্ম্মী। তবে সকলকে ইনি সমান ফল প্রদান করেন না। পাষাণ প্রতিমা যেমন প্রাণহীন কিন্তু সাধকের ঐকান্তিক সাধনা বলে তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এই ষ্টেথেসকোপের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। যে ইহার সাধনা করিয়াছে মাত্র তাহার নিকটই ইহার গুপ্তরহস্য প্রকটিত হয়, মাত্র সেই জানিতে পারে ইহার কোন ধ্বনিতে কোন সুর—কোন ঝঙ্কারে কি ভাষা। কিছু বেশী করিয়াও বলেন না—কিছু কম করিয়াও শোনান না। ফটোগ্রাফীতে যেমন অবিকল চিত্র উঠে—ইহার যোগে তেমনি সঠিক সত্য অবস্থা মাত্র আত্ম-প্রকাশ করে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহার পেটের কথা কখনও বাহির হয় না। ইহার নল বাহিয়া কত গোপন কাহিনীই না ডাক্তারের কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছে। কত রোগাতুরের করুণ ক্রন্দন, কত ব্যথিতের ব্যথাভরা উক্তি, কত ভগ্নহৃদয়ের হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, কত প্রেমিকের প্রেমনির্য্যাস, কত ভালবাসার আত্মনিবেদন ও প্রত্যাখান, কত কুলাঙ্গারের পাপকাহিনী, কত পতিতার অনুশোচনা, কত পাপীর আর্ত্তনাদ, কত মহাত্মার আত্মত্যাগ, কত সাধুর আনন্দোচ্ছাস, মানবহৃদয়ের কত নিভৃত কথাই না নিত্য চিকিৎসকের কর্ণগোচর হইতেছে; কিন্তু এ জগতে তাহা কে জানিতে পারে, কে তাহার সন্ধান রাখে?

এই ষ্টেথেসকোপ ডাক্তার ও জন সাধারণের মধ্যে একটি সেতুস্বরূপ উভয়ের দূরত্ব দূর করিতে, উভয়কে

উভয়ের সন্নিকটে আনিতে ইহার মত আর কে আছে? ইহার সহায়তায় কত পর আপনার হইয়াছে, কত বন্ধুত্বার সূত্রপাত হইয়াছে, কত স্নেহ বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে।

ইহার সহযোগে কত জীবন রক্ষা পাইতেছে এবং গৃহে গৃহে রোগমুক্তির জন্য কত আনন্দোৎসব চলিতেছে।

ইহা যখন একসুরে কথা কহে তখন ডাক্তারদের মিলনে কত সহায়তা করে আবার যখন ভিন্নসুরে আলাপন করে তখন কত বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এইরূপে কতবন্ধু বিচ্ছিন্ন হইতেছে।

এই ষ্টেথেস্কোপর সহায়তায় ডাক্তার তাহার জীবনকে গড়িয়া তোলে, কত পীড়িতের রোগ নিবারণ করিয়া পরমোল্লাসের সৃষ্টি করে, এই দুঃখের ধরায় স্বর্গের সুষমা বহাইয়া দেয়। কিন্তু আবার ইহারই যোগে এমন অনেক বন্ধনের সৃষ্টি হয় যাহা তাহাকে ক্রমেই নিম্নগামী করে। নিত্য মিথ্যা, নিত্য পাপ, নিত্য ব্যভিচার। আমরা সে নরকের বর্ণনায় অগ্রসর হইব না।

হে ষ্টেথেসকোপ, তুমি যাহার নিকট থাক—তাহার প্রতি যেন প্রসন্ন থাকিও; তাহাকে তোমার একনিষ্ঠ সেবক করিও। নীচের দিকে না নামাইয়া উপরের দিকে উঠাইও। তাহার দ্বারা দশের ও দেশের উপকার সাধন করাইয়া, তাহাকে দেবতা গড়িও। তুমি যাহার সহায় সে যেন দেবতার মতই নির্ম্মল, পবিত্র ও সুন্দর হয়। তোমাকে শত শত নমস্কার।

নোগুচির কবিতা

জগদ্বিখ্যাত জাপানী কবি নোগুচি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। সুকবি শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয় এই জাপানী কবির কাব্য রসাস্বাদনের সুযোগ আমাদের দিয়াছেন।

বৌদ্ধ পুরোহিত

(নোগুচির 'The Pilgrimage' হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র

সমরসঘন অপরিবর্ত্তনীয়,
একাকীত্বই পূজার আসনখানি।
আছে কি কোথাও হেন শোভা রমণীয়?
অলোক-পন্থী, অজানার সন্ধানী,
অতি মন্থর স্বচ্ছন্দানুগতি,
সত্যসন্ধ, স্থাণু সম অবিচল,
শান্ত দান্ত উপরত কী মূরতি।
বিধি নিষেধের নাই কোন অর্গল,
আছে শুধু তাঁর রহস্য-সরণীতে
প্রশ্ন বিহীন মৌন পর্য্যটন
নৈঃশব্দ্যের তাৎপর্য্যটি বুঝে নিতে।
নিয়তির ধ্যান আত্মনিরীক্ষণ,
—এই তাঁর পূজা। বিশ্ব-চেতনা বুঝি
অজ্ঞাতবাসা তাঁহারি ছদ্মনামে,
ধ্যানে নিমগন, বসে রয় চোখ বুজি,
ওঠে উদ্‌ভাসি' শুধু তাঁর প্রাণারামে।
শুভ্র বর্চ্চি বহ্নিশিখার পারা
শুধু নীরবতা আত্মিক উপাসনা,
যাগ যজ্ঞাদি বহিরাবরণ হারা,
নিষ্পন্দিত শান্তির এ সাধনা।

ওহানা ও আমি

(নোগুচির 'From the Eastern Sea' হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

চাঁদ ধীরে ধীরে ওঠে ভাসি নীলিমায়।
অপলক চোখে ওহানা চাঁদের পানে
চেয়ে আছে শুধু, আমি সেই জোছনায়
হেরি তার মুখ নিষ্পন্দ-নয়ানে।

মোদের মিলন এঁকেছে ঘাসের পরে
ছায়ালোক মাখা যুগলের আলিপনা,
একটি কথাও মোদের মৌনাধরে
নিথর পুলকে ফুটিতে যে পরিলনা।

মোদের প্রণয় মন্থর সমীরণে
ধীরে ধীরে যেন পরিমলঘন হয়,
ফুর ফুরে তার চূর্ণ-অলক সনে
স্বপন-পুলকে আমি যে বেপথুময়।

নিঃশ্বাসে তার জোছনার ঢেউ দোলে।
মোর হাতখানি বুকে লয়ে কয় বালা,
—'একি ধুক্ ধুক্ বুকে উদ্বেল তোলে!'
চুমিনি কি আমি সে অধর সুধাঢালা ?

মরণ মধুর হ'ত সেই খনে জানি।
জানিনা কখন চাঁদ ডুবে গেল ধীরে,
তারার কিরণে হেরি তার মুখখানি,
মধু স্মৃতি লয়ে যাই দোঁহে ঘরে ফিরে।

চুম্বন

(নোগুচির 'From the Eastern Sea' হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র

চেরি-তরু তল সৌরভে ভরপূর,
জোছনার প্রেম মৌনে হয়েছে লীন,
বুকে মাথা রাখি' র'ব শুধু বাণীহীন।
হে পরাণ বঁধু, মিনতি রাখ বধূর,
—চেয়ো নাক চুমা, স্বপনে বিভোর রব,
অটুট মৌনে দুজনায় কথা ক'ব।

যুক্ত অধরে মুক্ত যে মুখরতা,
আবরণ লেশ নাহি হায় চুম্বনে,
মরম বারতা থাক্ আজি ধ্যানরতা,
ভুজবন্ধনে রব আমি অবচনে।
বল দেখি মোরে ভালবাসা মধুময়
হয় নাকি যবে হিয়া বাণী-হারা হয় ?

অচিরে এখনি ডুবিবে ইন্দুরেখা,
অযুত তারকা ফুটিবে আঁধার ভরি',
গাঢ় পরশনে ফুটিবে অলখ-লেখা
পুলকাঙ্কুরে কিরণে কিরণে ঝরি।
ঝরণার কূলে বুকে নিয়ো বোলো—ঘুমা,
অধরে অধর রাখি' মাগিও না চুমা।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবুদ্ধদেব অহিংসা পরমোধর্ম্ম বাণী প্রচার করিয়া গেলেও তাহা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয় নাই। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী শৈব বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার তাহাকে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে আজীবন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সে যুক্তির প্রধানতম অন্তরায় এই যে, ইতিহাসে দেখা যায় তিনি মৃগয়া প্রিয় ছিলেন। জৈন ধর্ম্ম কখনই মৃগয়া সমর্থন করেনা, কাজেই মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী শৈব ছিলেন এই যুক্তির দুর্গঃ দৃঢ়তর হয়। এবং সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহার সেনাপতি পরে এসিয়ার সম্রাট সেলুকসের কন্যা হেলেনের পাণিগ্রহন কালীন জৈনধর্ম্ম যাজক ভদ্রবাহু কর্ত্তৃক জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণও সম্ভবতঃ মন্ত্রী চাণক্যের ইঙ্গিতানুসারে গ্রীস্ ও ভারতের মধ্যে এক অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের, সৌহার্দ্দ স্থাপনের সেতু নির্ম্মাণ কল্পেই হইয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালেই যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রীতি নীতি ভারতের সভ্যতা ও রীতি নীতি মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল একথা বলিলে বোধ হয় কেহ আমাকে অতিশয়োক্তি দোষে দোষী করিবেন না।

এই সময় হইতে পাশ্চাত্য জগতের ভারতের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক্ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পর তদীয় পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতে রাজনৈতিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু তদীয় পুত্র অশোকের রাজত্বকালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

অশোক তাঁহার জীবনারম্ভে চণ্ডাশোক নামে খ্যাত ছিলেন। অশোকের রাজত্বের পূর্ব্বার্দ্ধে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, পারিবারিক বিগ্রহ প্রভৃতি অনেক অশান্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। মহারাজা অশোক তাঁহার রাজত্ব কালে দণ্ডনীতি অনুসরণে শাসন করিতে গিয়া ভারতকে যেরূপ রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়াছিলেন তদনুরূপ রক্তস্রোত প্রবাহের ইতিহাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে আর পাওয়া যায়না। কলিঙ্গের যুদ্ধকালে একদিন রাত্রে তিনি রক্তস্রোত দর্শনে ও হতাহতের আর্ত্তনাদ শ্রবণে এতোই বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার পারিষদ পরিচারকবর্গ ভয়ে ভীত হইয়া রাজ শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অশোকের এই অস্থিরতা হইতে তাহার রাজ নীতি পরিবর্ত্তনের এই সূচনা।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তারা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোক পর্য্যন্ত সকলকেই "ম্যাজাই" (Magi) অর্থাৎ প্রাচীন পারসীক যাজক মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মাবলম্বী অথবা জেন্দাভেস্তা (Zend Avesta) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ যুক্তি আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেখা যায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব চাণক্য, কাত্যায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ করিয়া গিয়াছেন। সেই যুগে পারসীক ধর্ম্মাবলম্বীর মন্ত্রীত্ব যে ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিবেন এ যুক্তি আমার মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ দেখা যাইতেছে যে তখনো ব্রাহ্মণ্য যুগ প্রবলভাবে ভারতে প্রচলিত ছিল। এই উক্তির প্রমাণ পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহার আলোচনা কালে লিখিব। কাজেই

ইহারা যে হিন্দু শৈব ছিলেন তাহাই অধিকতর যুক্তি-যুক্ত বলিয়া আমার মনে হয়।

যাহা হউক আমি যে আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছি তাহার সহিত এ প্রসঙ্গের খুব নিকট সম্পর্ক নাই। তবু সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বিত বিষয় লিখিতে গেলে ঐ যুগে মৌর্য বংশে আচরিত পূর্ব্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই এতটুকু লিখিলাম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিতেছি না যে ঐ যুগেও অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেব কর্ত্তৃক অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারের পর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞের অন্তর্দ্ধান ভয়ে যে তাহারা কিছু কিছু সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্গে ভারত হইতে তাহাদের প্রাধান্য লোপ ভয়েও তাহারা অনেকটা চঞ্চল হইয়া শ্রীবুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে কিসে ভারত হইতে নিষ্কাসিত করা যায় তাহার বিশদ উপায় উদ্ভাবনে পরম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের ভীষণ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল, ঐ যুগে ঐ ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত না হওয়ায়। আমরা জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা না হইলে, কোন ধর্ম্মই পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মও রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত না হওয়ায় সম্রাট অশোকের সময় পর্য্যন্ত ঐরূপ জগতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আমরা জগতের রাজনীতি আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে ধর্ম্মপ্রচারের নামে এ জগতে যত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ততো বুঝি আর কিছুতে হয় নাই। এমন কি, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর এসব সাম্প্রদায়িকতা লইয়া যথেষ্ট মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। প্রমাণ স্বরূপ একটী উদাহরণ দিতেছি। চালুক্য সম্রাট রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় এইরূপ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে হইয়া যে ভীষণ বিপ্লবের অবতারণা করিয়াছিল তাহার বিষয় বিশদভাবে পরে আলোচনা করিব। এখন সম্রাট অশোক প্রসঙ্গে যাহা লিখিতেছিলাম তাহাতেই পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।

কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোকের চিত্তে এমন চাঞ্চল্য আনিয়াছিল যে তিনি কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। যখন অশান্তচিত্তে অশান্ত হৃদয়ে তিনি ইতস্ততঃ শান্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া ঘুরিতেছিলেন তখন শ্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক উপগুপ্তের শরণাপন্ন হন। উপগুপ্তের উপদেশ শ্রবণে সম্রাট অশোকের হৃদয়ে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন হইতে সম্রাট বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হন। তৎকর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর ঐ ধর্ম্ম জগত-মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা যাহারা ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছেন সকলেই অবগত আছেন কাজেই তাহার নাম উল্লেখ অনাবশ্যক।

সম্রাট অশোকের ভারতবাসীর মধ্যে সত্য ও সততা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রচারের একটি চুম্বক ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'Thus said His Majesty, 'Fathers & mothers must be obeyed, similarly respect for living creatures must be enforced. Truth must be spoken, These are the virtues of the Law of Duty (or Piety, Dharma) which must be practised. Similarly the teacher must be reverenced by the pupil and proper courtesy must be shown to relations. This is the ancient standard of duty (or Piety) leads to length of days & according to this men must act.' ইহার ভাবার্থ এই সম্রাট ঘোষণা করিতেছেন "পিতামাতার আদেশ সর্ব্বদা পালনীয়। জীবজগতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। মানব সত্যবাদী হইবে এবং নিজের শিক্ষক ও গুরুর প্রতিও শিষ্য বা ছাত্র ঐরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকারী হইবে। আত্মীয় স্বজনের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হইবে।" যাহাকে সমগ্র পৃথিবী মহান সম্রাট বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, তাহাকে অবশ্য, কেহ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, এমন কথা বলার স্পর্দ্ধা আশা করি কেহ প্রকাশ করিবেন না।

একবার তৎ প্রচারিত উপদেশের সহিত, Non-Co-operation যুগ প্রারম্ভে আমাদের ভারতের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের প্রচারিত বাণীর সহিত তুলনা করা

যাক। অপ্রিয় সত্য (তিক্ত ভেষজ) হইলেও এখন নিঃসঙ্কোচে সেই তিক্ত ভেষজ প্রয়োগের সময় আসিয়াছে। এই ভুঁইফোড় রাজনৈতিকগণ যেরূপে ভারতকে পরিচালিত করিতেছেন তাহাতে অদূরেই ভারতের রাজনৈতিক না হইলেও সাংসারিক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ Conference ক্ষেত্রে সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া প্রচার করিলেন—" হে ভারতের তরুণ, তোমরা পিতা মাতা বা গুরুজন, বা শিক্ষকের বাণতে বর্ণিত করিওনা। এখন স্কুল কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে "(গুণ্ডামীতে)?" অবতীর্ণ হও।" (মানসম্মানের গণ্ডী উঠাইয়া দাও। মান্যমানতার গণ্ডীও উঠাইয়া দাও। এই সব আপদ জাহান্নমে যাউক। কেবল দেশ উদ্ধারের দোহাই দিয়া অর্থ লুণ্ঠনের কার্য্যে ব্যাপৃত হও)। অথচ মুখে বলা হইল নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন। এই সব রাজনৈতিক ধুরন্ধরদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি তাহারা লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি যে নিরুপদ্রবের দোহাই দিয়া ভারতের ঘরে ঘরে ভীষণ উপদ্রবের সূচনা করিয়া দেন নাই? দেশে শান্তি ও নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারে আঘাত করিয়া তাহারা এমন এক বিশৃঙ্খলার দাবানল দেশ মধ্যে জ্বালাইয়া দিয়াছেন যে তাহার লেলিহান শিখা কোথায় গিয়া নির্ব্বাপিত হইবে অথবা কিযে দগ্ধ করিবে তাহা এই সব ধুরন্ধরেরা নিজেরাই হয়তো বলিতে পারিবেন না। ইহাই কি তাহাদের রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক? না ইহাই তাহাদের দেশ হিতৈষণা ব্রত? দেশের সামাজিক জীবন উশৃঙ্খল করিয়া দিয়া অর্থলুণ্ঠনই কি দেশ হিতৈষণার চরম উৎকর্ষ? ইহাই আমি মহাত্মাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। এবং ভারতবাসীকে এই সব মহাত্মাদিগের বাণী শুনিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে আর পদক্ষেপ করা উচিত কিনা—তাহা একবার বিবেচনা করিতে সাহুনয় অনুরোধ করি।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে ধর্ম্ম প্রচারের নামে বহু রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সম্রাট অশোকের অন্তরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এমনি বিস্তার করিয়াছিল যে তাহার ফলে অর্দ্ধজগত জুড়িয়া বিনা রক্তপাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়া গেল।

সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণান্তর উহা কিরূপভাবে অনুসৃত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আমি ইতিহাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'Asoke goes on to explain that true conquest consists in the conquest of men's hearts by the Law of Duty or Piety, and to relate that he had already won such real victories not only in his own dominions, but in Kingdoms six hundred leagues away, including the realm of the Great King Antiocleos, and the dominions of the four kings in severally named Ptolemy; Antigonos Magas, and Alexander; who dwell beyond (or 'to the north of') that Anticleos; and likewise to the south, in the kingdoms of the Cholas and the Pandavas as far as the Tamraparni river.'—ইত্যাদি।

সম্রাট অশোক যে রাজকার্য্য পরিচালনে বহুল শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা তৎকালীন ইতিহাস পাঠে পাই। তিনি যে রাজনীতি অনুসরণে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত অংশটুকু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'If a king is energetic......his subjects will be equally energetic...when in court, he shall never cause his petitioners to wait at the door —He shall, therefore, personally attend to the business of Gods, of heretics, of Brahmans learned in the Vedas, of earth, of sacred places, of minors, the aged, the afflicted, and the helpless, and of women; all this in order, or according to the urgency or pressure of such kinds of business,

All urgent calls he shall hear at once, and never put off; for when postponed they will prove too hard or even impossible to

accomplish···Of a king the religious vow is his readiness for action ; satisfactory discharge of duties in his performance of sacrifice, equal attention to all is as the offer of fees and ablution towards consecration.

In the happiness of his subjects lies his happiness ; in their welfare his welfare; whatever pleases himself he shall consider as not good, but whatever considers his subjects he shall consider as good .

Hence the king shall ever be active and discharge his duties ; the roof of wealth is activity, and of evil its reverse ."

সম্রাট অশোকের অনুসৃত রাজকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে রাজনীতি হইতে আমাদের রাজপুরুষগণের কিছু ভাবিবার বা বুঝিবার কি নাই ? এইযে ভারতের শাসক সম্প্রদায়গণের নিকট কোন কিছু আবেদন কেহ করিলে তাহা লাল ফিতায় বাঁধা হইয়া বিশেষ মন্তব্য (Report) লিখিবার জন্ম গড়াইতে গড়াইতে ক্ষেত্রবিশেষে গ্রাম্য চৌকিদারের হস্তে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে এবং সে গ্রাম্য চৌকীদারের বিশেষ মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া রাজকার্য্য সাধারণতঃ পরিচালিত হইতেছে তাহাতে কতখানি সুফল ফলিতেছে তাহা একবার তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

কেবল ভারতের রাজপুরুষগণকেই এই দোষে দোষী করি কেন ? আমাদের দেশের স্বাধীন নৃপতিগণ ও জমিদারগণও কি এই পর্য্যায়ের বহির্ভূত ? আমরাও কি নায়েব গোমস্তা ও কর্ম্মচারীদের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজের নিজের কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া সহরে বাসা বাঁধিয়া স্বীয় জমিদারী বা রাজ্য হইতে সংগৃহীত অর্থ সহরে ব্যয় করিয়া আমাদের স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছিনা ? এইরূপ পুরুষানুক্রমে ব্যবহার অনুসরণের ফলে আমাদের স্ব স্ব প্রজার সহিত আমাদের কি এক বৈদেশিক সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায় নাই ? এবং স্বার্থপর কর্ম্মচারীদিগের শোষণে ও আমাদের স্ব স্ব রাজ্য ও জমিদারী হইতে আমদানী কৃত অর্থ রপ্তানীতে কি আমাদের প্রজাপুঞ্জ ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে না ? এবং আমাদের আচরণেই আমাদের উপস্থিত অর্থকৃচ্ছ্রতা ভীষণ ভাবে উপলব্ধির প্রধানতম কারণ হইয়া উঠে নাই কি ? এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের বা জমিদারবর্গের কি স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া পুনরায় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বাসা বাঁধিবার ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা জাগিবে বলিয়া কি আশা রাখিতে পারি ? তাহা হইলে বোধ হয় ২০।২৫ বছরের মধ্যেই রাজা জমিদারদিগের মুখে তাহাদের স্বচ্ছলতার লুপ্ত হাসি পুনরায় ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে ইহারা একটু দয়া করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ? যাক্ অতীত যুগের সে বিষাদকাহিনী তুলিয়া কোন ফল নাই।

সম্রাট অশোকের সময় শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যাচর্য্যা, কারুকার্য্যে কিরূপ ভারত উন্নত হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ ঐতিহাসিকগণই রাখিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সম্রাট অশোকের তিরোধানের পর মৌর্য্যবংশ আর অধিক দিন ভারতে রাজত্ব করেন নাই। সম্রাট অশোকের পৌত্রই মৌর্য্যবংশের শেষ সম্রাট।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্ম হইলেও ভারতে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ভারত হইতে এইরূপ উচ্ছেদের আর এক কারণ ঘটিয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে ও জাপানে যে বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, এবং অদ্যাপিও চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশে বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন। ঐ যুগে চীন দেশ হইতে গমনাগমনের পথ আসামের ভিতর দিয়া ছিল বলিয়া জানা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন দেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দেশে তন্ত্র শাস্ত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। আজিও তন্ত্রশাস্ত্রে চীনাচার বলিয়া একটী তন্ত্র রহিয়াছে। অনেকের মতে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব অধুনা যাহা হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় তাহা নাকি চীনদেশ হইতে গৃহীত

এই কথার সত্যতা বশিষ্ঠের তারা সাধনার উপাখ্যান হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়।

কথিত আছে বশিষ্ঠদেব তারা মন্ত্র উপাসনার্থে কামরূপে তারামন্ত্র সাধনা করেন। কিন্তু তারাদেবীর সাক্ষাৎ হয়না। তখন নাকি বশিষ্ঠদেব তারাদেবীকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন, তখন নাকি এক দৈববাণী হয়, "বশিষ্ঠ, তুমি আমার সাধনার পদ্ধতি অবগত নহ, যাও চীনদেশে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন যে ভাবে আমার উপাসনা করিতেছেন সেইভাবে উপাসনা করিলে তুমি আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে ও আমার দর্শন লাভ করিবে।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ তারামন্ত্র সিদ্ধির জন্য চীনদেশে গমন করেন ও তিনি নাকি চীনাচার তন্ত্র ভারতে আনয়ন করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে হ্রাং হ্রীং হ্রুং ইত্যাদি মন্ত্র আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রের শাসন পদ্ধতি বড় রহস্যময় ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেহ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা ব্যভিচার অনুষ্ঠানেরই সম্ভাবনা অধিক। বোধহয় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে বৌদ্ধ কাপালিকগণের উল্লেখ দেখিতে পাই, এবং অনেক বৌদ্ধ বিহারও যে কাপালিকদিগের গুপ্ত ব্যভিচার স্থলে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাই তাহা তন্ত্রশাস্ত্রের বিকৃত ভাব অনুসরণের মূলেই হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। এই সব পুরাতন উল্লেখ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে তৎকালীন বৌদ্ধ কাপালিকগণ যে তন্ত্রশাস্ত্রের বহির্মুখী ব্যাখ্যা অনুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিতেছিলেন এবং অন্তর্মুখী ব্যাখ্যা যাহা প্রকৃত ব্যাখ্যা তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অনুষ্ঠিত নিয়োগ, উচাটন, মারণ ইত্যাদি উল্লেখেই প্রমাণিত হইতেছে।

যদিও বুদ্ধদেব অহিংসা পরমোধর্ম্ম, জীবহিংসা, ব্যভিচার প্রভৃতি নিবারণ কল্পে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—কিন্তু ঠিক বলিতে পারিনা ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধাগকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার মানসে এই বৌদ্ধ কাপালিক প্রসঙ্গ ভারতের ইতিবৃত্ত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন কিনা, কিম্বা, বৌদ্ধ কাপালিকগণ শ্রী বুদ্ধদেবের সে নির্ম্মল ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া পুনরায় বিলাস ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সহিত ভীষণ দ্বন্দ্ব ও তৎকালে শঙ্করাচার্য্যের ভগন্দর ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার উপাখ্যান ঐ শ্রেণীভুক্ত কিনা তাহাও ঠিক বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটী আখ্যায়িকার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, উৎকলে যে মূর্ত্তিত্রয় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম বলিয়া খ্যাত তাহা নাকি বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও মণ্ডল মূর্ত্তিত্রয়। এই তথ্য নাকি তিনি জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন তাম্রলিপি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং চট্টলের কবি নবীন চন্দ্র সেন তাহার 'অমিতাভে' এই প্রসঙ্গের আভাস দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার উল্লেখও আছে। যদি ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ঘাটিত তথ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে উৎকল খণ্ড ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা প্রসূত বলিতে হইবে। এবং যদি আষাঢ়ের রথযাত্রাকে শ্রীবুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুমোদিত রথযাত্রা বলা যায় তবে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ ভারতে সাধিত হইয়াছিল একথা কেমন করিয়া বলা যায়? ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে যে বড় সদয় দৃষ্টিতে দেখিতেন না তাহার উল্লেখ আমি বহুবার করিয়াছি, কাজেই এই বৌদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের যুগের সত্যধর্ম্ম উদ্ঘাটন বড় সহজসাধ্য নহে। জানিনা শ্রীভগবান যদি কোনদিন এ যুগে সত্যধর্ম্ম প্রকাশের কোন সুগম পন্থা স্বয়ং আবিষ্কার করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদ সাধনকল্পে আবার ব্রাহ্মণগণ ভারতের আকাশে যুদ্ধের মেঘ সাজাইয়া ফেলিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের পৌত্র বৃহদ্রথ তদীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র অথবা পুষ্পমিত্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচণায়ই নিহত হন এবং বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি পুষ্পমিত্র সঙ্ঘ মৌর্য্য বংশের শূন্য সিংহাসন অধিকার করেন। পুষ্পমিত্র অর্থে পুষ্প, সূর্য্যউপাসক মিত্র শব্দে অর্থ সূর্য্য। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ইহাকে ইরাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই পুষ্পমিত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ভারতে বহু বৌদ্ধের প্রাণহনন কার্য্য করাইয়াছেন, তাহার উল্লেখও ইতিহাসে পাওয়া

যায়। কারণ এ যুগ সম্বন্ধে সত্য তথ্য সংগ্রহের উপায় সুদূর পরাহত।

পুষ্পমিত্র সঙ্ঘ হইতে ভারতে সঙ্ঘ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসদুপায়ে কখনো সৎকার্য্য সাধিত হয় না। পুষ্পসঙ্ঘ স্বীয় প্রভুকে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে হত্যা করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেও তদীয় বংশধরগণ ভারতে ১১২ বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

আমি আমার রাজনৈতিক প্রসঙ্গের প্রথম ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সমালোচনা যতই করা যায় ততই নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। এখানেও সেই নৈরাশ্যেরই পুনরবতারণার প্রমাণ পাই। ভারতের নবম অবতার শ্রীবুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্ব লাভ করা স্বত্বেও এবং পাটলিপুত্রের সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক সেই ধর্ম্ম বহুল অর্থ ব্যয়ে ও শ্রমসহকারে প্রচারিত হইলেও ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্থান হইল না। ভারতের কি দুর্ভাগ্য! ধর্ম্ম ও রাজপরিবর্ত্তনে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ সর্ব্বদা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া রহিল এবং সেই অবকাশে বিদেশীয়গণ ভারতের দ্বারে তুর্য্যধ্বনি করিবার সুযোগ পাইল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝি কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

'একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি পার হ'য়ে সিন্ধুনদী আসিতে কি পারিত—?'

সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজিত হইলেও পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে কলিঙ্গ পুনরায় খরবেলার নেতৃত্বে বলবান হইয়া উঠিয়া স্বীয় স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে পুনরায় আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব অধিপতি মিনানডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের ইতিহাস পাওয়া যায় কিন্তু মিনানডর পুষ্পমিত্রের হস্তে পরাজিত হন ও ভারত ত্যাগে বাধ্য হন। পুষ্পমিত্রের ও তদীয় বংশধরগণের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণই রাজত্ব করিতেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ভারত হইতে বিলাসিতা বিদূরিত করণের প্রচেষ্টা হইয়া থাকিলেও সঙ্ঘ-বংশধরগণ যে পুনরায় বিলাসী ও মদ্যপায়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন ইহার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত আছে যে সঙ্ঘ বংশের শেষ রাজা দেবভূতি অথবা দেবভূমি তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তদবধি বসুদেব ও তদীয় বংশধরগণ সঙ্ঘ বংশের সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন এবং সর্ব্বসমেত চারি পুরুষ মিলিয়া ৪৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

এই যুগে মারামারি কাটাকাটি যথেষ্ট পরিমাণে চলিলেও রাজনৈতিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসদুপায়ে কখনো মহান কার্য্য সাধিত হয় না। এস্থলেও তাহাই প্রমাণিত হইল। পুষ্পমিত্র স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। সিংহাসন গ্রহণের এক শতাব্দী পর ঐ বিশ্বাসঘাতকতার পুনরভিনয়েই তাহার বংশধরগণও সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

কাজেই সঙ্ঘবংশের ইতিহাস অনুসরণে আমরা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি যে, যে দরে ক্রয় হইল সে দরেই বিক্রয় হইয়া গেল, কাজেই ইহাকে প্রকৃতির সাম্যতা জনিত শোধ ভিন্ন আর কি বলিব?

বসুদেবের বংশধরগণ কন্বংশ নামে ভারতে খ্যাত ছিলেন। তাহাদের রাজত্ব তেমন শান্তিপূর্ণ ছিল না সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া ছিল। সর্ব্বশেষ কন্ববংশীয় শেষ রাজা অন্ধ্রুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সঙ্ঘবংশের রাজত্বকালে অন্ধ্রগণ পুনরায় স্বীয় স্বাধীনতা ভারতে স্থাপন করেন।

অন্ধ্রগণ ভারতে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। ইহাদের রাজত্ব আরব উপসাগর হইতে বঙ্গোপসাগরের কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহারা হিন্দু-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জাতিভেদ স্বীকার করিতেন। ইহাদের রাজধানী 'তেলিঙ্গনা' নামে

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের রাজত্বকালে প্রচলিত ভাষাকে তেলেগু ভাষা বলে। ইহাদের রাজত্বকালের সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। দেখা যায় ইহাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাটাধিপতি শক সত্রাপ রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত।

কোন কোন ঐতিহাসিক অন্ধ্রগণ কর্ত্তৃক পাটলিপুত্রের সিংহাসনও অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন কিন্তু সে সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। পূর্ব্বে যে শক সত্রাপদের কথা লিখিত হইয়াছে তাহারা বিদেশী, ইহারা চৈনিক তুরস্কবাসী বলিয়াই ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়

সম্রাট অশোকের অন্তর্দ্ধানের পর ভারতে উপর্য্যুপরি কয়েকটী বৈদেশিক আক্রমণের ইতিহাস পাওয়া যায়। যথা :—Bactrians, Parthians, Syrians, এবং উহাদের ভিতর Bactrian রাজা Demetrios ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা ভারতের নানাস্থানে আক্রমণ করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন এবং তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। তক্ষশীলার ইতিহাস অনুসরণে দেখা যায় যে তথায় এন্টিএ্যালকিডাস নামক জনৈক গ্রীক্‌রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি হেলিওডোরাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রীক্‌রাজদূতরূপে বেজনগরের রাজার নিকট প্রেরণ করেন। এই হেলিওডোরাস কর্ত্তৃক ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে একটী প্রস্তর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি নিজেকে বিষ্ণুউপাসক বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার অনুবর্ত্তী ও গ্রীকরাজগণের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই স্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই গ্রীক সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ইহা বোধহয় নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে এবং সম্ভবতঃ এই গ্রীকগণ ভারতবাসীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন।

পার্থিয়ানগণ সম্বন্ধে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে পার্থিয়ান শব্দ পারশিয়ান শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু তাহারা অধিককাল ভারতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাহাদের উপাধি অনুসরণে ভারতের শকরাজাগণ সত্রাপ উপাধি গ্রহণে ভূষিত হইতে থাকেন এমন কি এই উপাধি ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভিতরে এতোই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে যে সত্রাপ উপাধি গ্রহণে তাহাদের প্রীতি পরিলক্ষিত হইত।

ভারতে আর এক বৈদেশিক জাতি রাজ্য বিস্তার করে আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়, ইহারা ইউয়েচী নামে খ্যাত। ইহারা পশ্চিম চীনদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবী মরুভূমি অতিক্রম করণান্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া শিরদরিয়া নদীর তীরবর্ত্তী শকদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেইখানে বসবাস করিতে থাকে। শকরা এই বিজেতাদিগকে তাহাদিগের বাসভূমি ছাড়িয়া দিয়া ভারতের প্রান্তসীমায় নূতন আবাসভূমি সন্ধান করিতে লাগিল। ইহারা কিছুদিন পরে উসা (Wesun) নামক আর এক ভ্রাম্যমান গৃহহীন জাতি ইউয়েচী দিগকে শকবিজিত বাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে তাহারা অক্সাস উপত্যকায় আবার গৃহস্থাপন করিয়া নদীর উত্তরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে এবং দক্ষিণে ব্যাকিট্রয়া রাজ্যের উপরও আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে।

এই যুগে রাজনৈতিক ইতিহাসে তেমন কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও পরবর্ত্তী যুগে হয়তো এই যুগে যাহারা ভারতে আসিয়া ভারতবাসীরূপে এইদেশে বসবাস করিতে লাগিলেন হয়তো তাহাদের সহিত পরবর্ত্তী যুগে সম্বন্ধ নির্ণয়ের আবশ্যকতা পড়িবে এই কথা ভাবিয়া এই যুগের মোটামুটী ইতিহাসের একটু উল্লেখ করিয়া গেলাম মাত্র।

এই ইউয়েচীদল ক্রমশঃ তাহাদিগের নব অধিকৃত বাসস্থানে চিরবসতি করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে তাহারা তাহাদিগের জাতীয় আচার ব্যবহার ত্যাগ করে এবং ব্যাকট্রিয়া রাজ্য ক্রমে অনেকখানি অধিকার করিয়া লয়। তাহারা এই সময়ে ৫ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার এক শতাব্দী পরে ইউয়েচীগণ তাহাদিগের জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলির উপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া ফেলিল এবং কুজুলা-কারা-ক্যাডফাইসিস নামীয় এক ব্যক্তিকে তাহাদিগের দলপতিরূপে বরণ করিল। এই দলপতি ইউয়েচী দিগের

রাজা হইয়া ক্যাডফাণসিস প্রথম নাম লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃতি করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এমনকি তিনি সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গান্ধার ও তক্ষশীলা জয় করিয়া কাবুল ও তক্ষশীলার বিশাল রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা গণ্ডফারনিসের সিংহাসন অধিকার করেন।

এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তৃতি কার্য্যে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতে ভারতীয় গ্রীক শক ও ভারতীয় পার্থিয়ান রাজ্যের পরিবর্ত্তে কুষাণ অথবা ভারতীয় সিদিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

তাঁহার অশীতি বৎসর বয়সে মৃত্যুর পর ২য় ক্যাডফাণসিস নাম নিয়া তাহার পুত্র কুষান সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিও বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কুষাণ রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। কিন্তু চৈনিক তুর্কিস্থানে চীন সম্রাট বাহিনী কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহার ভারতীয় রাজ্য বিস্তার কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহার সঠিক প্রমাণ তৎকর্ত্তৃক বহুল মুদ্রা প্রচলন ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এতো অধিক মুদ্রা তাহার সময়ে প্রচলিত হইয়াছে যে যাহাতে বুঝা যায় তাহার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এবং দেখা যায় ভাগিরথী উপত্যকায় বেনারস ও দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ৭০,০০০ সৈন্য বাহিনী লইয়া চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগের পরে তাহার মৃত্যু হয় এব্য তাহার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত ইতিহাসে কোন রাজার সঠিক বিবরণী পাওয়া যায়না।—তাহার মৃত্যুর পর তাহার অধীনস্থ বিভাগীয় শাসন কর্ত্তাগণ স্বাধান হইয়া কিছুদিন রাজত্ব করে তার পরেই আমরা কুষাণ-কুল-তিলক কনিষ্কের দেখা পাই। কনিষ্ক ক্যাডফাণসিসের পুত্র ছিলেন না। তিনি ভাজক নামীয় ইউয়েচীদিগের ক্ষুদ্রতর একটী শাখার অন্তর্ভুক্ত জনৈক সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কি ভাবে বা কি প্রকারে ক্যাডফাণসিস হইতে কনিষ্ক এই বিশাল কুষাণ রাজ্যের অধিশ্বর হন, তাহার কোন সঠিক উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়না তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে ক্যাডফাণসিস ও কানষ্কের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল ও ঐ যুগকেই ইউয়েচী রাজত্বের তমসাবৃত যুগ ধরা যাইতে পারে।

কনিষ্কের নাম নূতন করিয়া জন সাধারণের কাছে উত্থাপিত না করিলেও চলে। কারণ তাহার নাম সর্ব্বজন সুবিদিত। তবে আমার আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কিছু উল্লেখ না করিলে আখ্যায়িকা সংশ্রবহীন হইয়া পড়িবে।

কনিষ্ককে গান্ধার রাজ বলিয়াই ইতিহাসে বর্ণিত করা হইয়াছে। তাঁহার ভারতীয় রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুর বা আধুনিক পেশোয়ার, তিনি নানাবিধ উল্লেখযোগ্য বহু সৌধাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য সজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এবং কখনো কোন অভিযানে ব্যর্থ মনোরথ হন নাই। তিনি কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও চীনের খোটান, ইয়ার খন্দ, খাসগড় প্রভৃতি জয় করেন। এবং তিনি দুর্গম পামীর পার্ব্বতাবলীর মধ্যদিয়া সেনাবাহিনী চালিত করিয়া চৈনিক তুর্কীস্থানের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদাধিপদিগকে পরাজিত করিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষ দ্বিতীয় ক্যাডফার্ণসিসের চৈনিক তুর্কীস্থানে পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ইতিহাসে কথিত আছে নরশোণিতপাত দর্শনে ও হতাহতের চীৎকার শ্রবণে কণিষ্কের হৃদয় সম্রাট অশোকের ন্যায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি অস্থিরচিত্ত স্থির করণ মানসে নানা ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মযাজক দিগের মুখে ধর্ম্মনীতি শ্রবণ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্তে লুপ্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অবশেষে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে তাহার চিত্তের লুপ্ত শান্তি ফিরিয়া পান ও তাহার সময়ে পুনরায় ভারতে লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবশ্য এস্থানে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। মগধে সম্রাট অশোককে উপগুপ্ত যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মে 'মহাযনের' পন্থা অনুসরণে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবেই মহাজ্ঞান পন্থা অনুসরণে তীব্বতে দাক্ষিণাত্যে

ও অন্যান্যস্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। স্থান, কাল, পাত্র, ভেদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সোপান নির্নীত হইত। সম্রাট কণিষ্ককে বৌদ্ধধর্ম্মের 'হীনায়ন' পন্থা অনুসরণে দীক্ষিত করা হয়। সম্রাট অশোকের সময় যেমন স্তুপ, বিহার, শিলাস্তম্ভ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ সম্রাট কণিষ্কের সময়ও কাশ্মীরে বৌদ্ধস্তুপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এখানে কয়েকটী কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভগবান বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব লাভের পর যখন এইধর্ম্ম প্রচার করেন তখন ঐ ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিলনা। কেবল উপদেশের ছলে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ "গাথায়ও" পাওয়া যায়। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে কোনরূপ রূপ পরিকল্পনা ছিলনা, তাহার তখন বুদ্ধদেবের উদ্দেশে আসন স্থাপন এবং পাদুকা বা পদাঙ্ক চিহ্নস্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম উপাসনা চলিত। এইস্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা উল্লেখ না করিলে সত্যের ভীষণ অপলাপ হইবে।

হিন্দুগণের গয়ায় গিয়া বিষ্ণু পদচিহ্নে পিণ্ড দিয়া নিজের আত্মীয় স্বজন বা পিতৃলোকের মুক্তি দানের বিশ্বাস আজিও চলিয়া আসিতেছে, সেই বিষ্ণুপদচিহ্ন বৌদ্ধগণ স্থাপিত বুদ্ধপদচিহ্ন বলিয়া আমার ধারণা হয়, কারণ মহানির্ব্বাণের বাণী ভারতবাসীর নিকট শ্রীবুদ্ধদেবই ঘোষণা করিয়া যান তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাণ মুক্তির পরিকল্পনা হিন্দুশাস্ত্রে ছিল কিনা সন্দেহ। কে বলিতে পারে যেভাবে ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, সগুন হিন্দুর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা-বলিয়া উৎকলখণ্ড লিখিয়া হিন্দুধর্ম্মে–বিগ্রহত্রয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তৎপন্থা অনুসরণে হয়তো গয়ামাহাত্ম্য লিখিয়া বুদ্ধপদচিহ্নকে বিষ্ণুপাদপদ্ম আখ্যা দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার এক প্রচেষ্টাও ভারতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মের হস্তে যে কত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে তাহার কিছু আভাস পুষ্পমিত্র সঙ্গের রাজত্ব বর্ণনা কালে কতক করিয়াছি। ধর্ম্মে মূর্ত্তি কল্পনা বৈদান্তিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ গয়াক্ষেত্রে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম কেনো যে পদচিহ্ন পরিকল্পনা করিল তাহার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। পদচিহ্ন পরিকল্পনায় উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকৃত। বুদ্ধগয়ার অতি সন্নিকটেই এই বিষ্ণুপাদ পদচিহ্ন। অতএব আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা অন্তবপর বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে স্থান কাল, পাত্র ভেদে যথা, মিশর, গ্রীস, পারস্য, তিব্বত, প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার সময়ে ক্রমে বুদ্ধদেবের রূপ কল্পনা বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করে, প্রমাণ স্বরূপ আজিও সারনাথে একটী বুদ্ধ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে যাহাকে গ্রীক অথবা রোমান দিগের অনুকরণে ভূষিত করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্রাট অশোকের সময় রূপ কল্পনার মাত্র উন্মেষ, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি সম্রাট কণিষ্কের সময় হইয়াছিল, এবং নানারূপের বুদ্ধ মূর্ত্তিতে বৌদ্ধ জগত সজ্জিত করা হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্রাট কণিষ্কের সময়েই প্রথম ভারতে বৈদেশিক রীতি নীতি সভ্যতা ও স্থাপত্য শিল্পেও বৈদেশিক প্রভাব প্রবেশ লাভ করে বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়।

সম্রাট কণিষ্কের সময় প্রধান বৌদ্ধ যাজক ও সাহিত্যিকগণের উদ্ভব হইয়াছিল দেখা যায়। ইহারা নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ ও বসুমিত্র নামে খ্যাত। ইহাদের ভিতর অশ্বঘোষ প্রধানতম, কারন তিনি একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও ধর্ম্ম মীমাংসাকার ছিলেন। এই সময়ে ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা চরক সম্রাট কণিষ্কের চিকিৎসক রূপে তাহার রাজসভায় ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়। সম্রাট কনিষ্কের যুগে ভারতের সাহিত্য, রাজনীতি ও চিকিৎসা শাস্ত্রে এক বিশদ পরিবর্ত্তনের যুগ বলা যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্রাট কণিষ্কের সময় বৈদেশিক প্রভাব অনেকটা ভারতের বহুল ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সম্রাট কণিষ্কের রাজনীতিতে প্রচণ্ড রাজ্য বিস্তৃতি পিপাসার সমাধি মহানির্ব্বাণের শান্তি ক্রমতলে হইয়াছে দেখিতে পাই। কনিষ্কের উপাখ্যানের পরিসমাপ্তির

সহিত ম্যাসিডন অধিপতি সেকেন্দর সাহার উপাখ্যানের একটি সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। গ্রীক সম্রাট ভারতের এক দার্শনিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দার্শনিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'সম্রাট ভারত বিজয়ের পর আপনি কি করিবেন?' সেকেন্দর শা নানারাজ্য জয়ের কথা বলেন। সর্ব্বশেষে দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিলেন 'জয়ের পর আপনি কি করিবেন?' সম্রাট বিভ্রান্তভাবে তাকাইয়া উত্তর করিলেন 'একটী বিরাট ভোজ দিব।' তখন দার্শনিক হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন 'আজই সে ভোজ দাওনা কেন!'

কে বলিতে পারে ভারতের দার্শনিকের মনস্তত্ত্বের প্রভাব সম্রাট কনিষ্কের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা। ভারত তাহার আদর্শ শান্তি ত্যাগের পন্থা অনুসরণেই খুঁজিয়া লইয়াছে। কিন্তু অধুনা ভারত যে পথে ধাবিত হইয়াছে তাহা কি ত্যাগের পথ? না ভোগের দারুণ পিপাসা জলাশয় ত্যাগ করিয়া ভোগের মরুভূমি মধ্যস্থ মরীচিকার দিকে ধাবমান হইয়াছে ইহা একটু ভারতবাসীর চিন্তা করিয়া দেখা উচিত!

সম্রাট কনিষ্কের দুই পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ বশিষ্ক ও কনিষ্ঠ হুবিষ্ক। উভয় পুত্রই পিতার ন্যায় যোদ্ধা ছিলেন এবং আরো দেখা যায় সম্রাট কনিষ্কের জীবদ্দশায় তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে তাহার উভয় পুত্রই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কাজেই বশিষ্ক ও হুবিষ্ক যে পিতার শিক্ষাকৌশলে রাজকার্য্য পরিচালনে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন সে বিষয়ে ইতিহাসেও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। কনিষ্ক ও তদীয় পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ স্নেহ প্রীতি ও বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায় সেরূপ আভাস ভারতের রাজগণের পিতাপুত্রের মধ্যে সর্ব্বস্থানে বড় লক্ষিত হয় না। পুরাতন যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনায় দেখিতে পাই যে পিতাপুত্রের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি, বিশ্বাস ও সৌহার্দ্দের পরিবর্ত্তে ভীতি, ত্রাস ও আস্থাহীনতার প্রমাণই অধিক। এ প্রমাণ রামায়ণের যুগ হইতে সমান ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। যথা:—শ্রীরামচন্দ্রের তদীয় পুত্রদ্বয় লব কুশের সহিত যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুনের মস্তক তদীয় পুত্র বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক মণিপুরে ছেদিত হইল। কর্ণ কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিলেও তদীয় পুত্র বৃষকেতু পাণ্ডব পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

অপরাধ স্বীকার

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তখন আমার বয়স সতেরো বছর।
তুমি আমার থেকে দশবৎসর বড়,
অর্থাৎ সাতাশ।
আমি অর্দ্ধস্ফুট পুরুষ,
তুমি পূর্ণবিকশিত নারী।
আমার দেহটা যৌবনে সদ্য পদার্পণ করলেও
মনটা ছিল নবোদ্‌ঘাটিত কলেজের রহস্যলোকে।
লাইব্রেরী লেবরেটারী খেলার মাঠ,
আর সেই কলমুখর হোষ্টেল্,
যেখানে গল্প হুড়োহুড়ি গান্‌বাজ্‌না,
আর ফিরিওয়ালার চপকাটলেটের রাজভোগ।
সিনেমার তখনো জন্ম হয়নি।

গ্রীষ্মের ছুটি এল।
গেলাম দেশে, লেখাপড়া বন্ধুবান্ধব
ফুটবল্ ক্রিকেট দু মাসের জন্য রইল ধামাচাপা।
তুমি এসেছিলে পিত্রালয়ে
আমাদের পল্লীকুটীরের অদূরেই তোমার বাড়ী।
এমনি আর একবার এসেছিলে তুমি।
তখন আমি সাত তুমি সতেরো।
তুমি ছিলে আমাদের এজ্‌মালি রাঙাদিদি।
সকলেরই সমান ভাগ,
তবে প্রত্যেকেই ভাবতাম আমার ভাগে একটু বেশী
ভাগাভাগি নিয়ে হ'ত লড়াই
প্রতিদ্বন্দ্বিতা; আবার হত সন্ধি শান্তি,
তোমার শাসনে,মাধুরীতে আর রাজনৈতিক চাতুর্য্যে

আর সকলের মত আমিও জুগিয়েছি ফুলফল
পাখীর ডিম, নিজের হাতে ছিপেধরা মাছ।
কিন্তু একটি কাজ ছিল শুধু আমার,
—পোষ্ট আফিসে তোমার চিঠি ফেলে আসা।
বড় বিশ্বাসের চাকুরী,
আর কাউকে দেওনি এ ভার।
কেউ জানত না,
চুপিচুপি এ কর্ত্তব্যটি সাধন করতে বলেছিলে
শুধু আমাকে বেছে নিয়ে।
তোমার বিশ্বাসের গৌরবে আমি ছিলাম রঙের
গোলাম,
ওরা এক ফোঁটা, আমি বিশ ফোঁটা।
এবার যখন দশবছর পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে,
তুমিও অবাক্ আমিও অবাক্!
বল্লে, সতু তুই এতবড় হয়েছিস্,
গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে যে।
হঠাৎ চিন্‌তেই পারিনি,
ঘোমটা টেনে সরে যাচ্ছিলুম!
আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম খুব উৎসাহে,
কিন্তু কী যে বলব, কথা জুটলনা
হঠাৎ এল সঙ্কোচ।

বাড়ী ফিলে এলুম।
সেই দশবৎসর আগে
দেখেছিলেম যে রাঙাদিদিকে,
তার কথাই কেবল মনে পড়ে,
আর ছুটে যেতে ইচ্ছা হয় ওদের বাড়ী।
কিন্তু বাধা কিসের, এত লজ্জা কেন?
গেলুম তবু লজ্জার মাথা খেয়ে,
পুকুরের একটা বড় মাছ,
বাগানের গোটা কতক আম,
আর কিছু তরিতরকারি নিয়ে।
রাঙাদিদি খুসী হয়ে বল্লেন,
—তুই আজ আমাদের এখানে খাবি।
আম্‌তা আম্‌তা করে ফিরে এলুম,
মনে মনে কিন্তু ভারী খুসী।

রাঙাদিদির হাতের রান্না খেয়ে,
তাঁর আদর যত্ন ঠাট্টা উপভোগ ক'রে
লজ্জা গেল কেটে।
আর, ছেলেবেলাকার সেই মরা গাঙটায়
এল যেন একটা প্লাবনের ধারা।
রোজই ওবাড়ী যাই
সেই ভরাগাঙে উজানে সাঁতার কেটে।
পুরাণো কথা হয়,
সেই নিত্যকার ফুল ফল পাখার ডিম
আর ডাকে চিঠি ফেলার স্মৃতি ফিরে আসে।

সেদিন রাঙাদি' বল্লেন,—আজ যাবার পথে
এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে যাস্,
খুলে পড়িস্ না কিন্তু।
পোষ্ট আফিসটা মাঝ রাস্তায় পড়ে
আমাদের বাড়ীর পথে।
একটা কথা শুনেছিলুম,
—'কানারে, নৌকো ডুবোস্‌নি।
কানা বলে, ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস্।'
ওই যে রাঙাদি বল্লেন
খুলে পড়িস্ নি,
সেই নিষেধটা হ'ল আমার কাল।
ডাক্‌ঘরে না গিয়ে সটাং গেলুম বাড়ী,
ঘরে দিলুম খিল্
চিঠিখানা পড়লুম জলদিয়ে খুলে।
তা'তে ছিল অনেক কথা,
সেই সব কথায় কাজ নাই।
আর ছিল গুটি কয়েক লাইন,
এই অনুগত বিশ্বাসী ভৃত্য সম্বন্ধে।
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে
আদিম মানব সন্তানের হয়েছিল স্বর্গচ্যুতি।
আমার কি হ'ল জানি না,
তবে যেখানে ছিলাম, সেখানে থেকে পৌছলাম
অন্যরাজ্যে।
স্বর্গ কি নরক কে বল্‌তে পারে?

চলতিপথে

গল্প— শ্রীঅমলেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

ওমা, দেখে যাও, বাবা কেমন করছে।

মিনতি জান্‌লার শিক ধরে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মেয়ের দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টি ফেলে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে দূরের সেই উদাস অন্ধকারে। নিরবতার মাঝে নিজকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়ে সে হয়ত সুষুপ্ত অতীতের বুকে কোনো স্মৃতির অনুসন্ধান করছিল—যা তাকে আজ দিতে পারে এতোটুকু সান্ত্বনা, শুধু একটু সহানুভূতি।

জীবনে কোনোদিন সে সুখের মুখ দেখেনি। শৈশবে বাপ-মা হারিয়ে আশ্রয় পায় মামার বাড়ীতে। সেখানে অতিকষ্টে একরকম ক'রে দিন তার কেটে গেছে। মামা ভালো লোক ছিলেন। মিনতি তাই পার হ'তে পেরেছিল প্রৌঢ় শিবনাথের হাত ধ'রে। সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে, শিবনাথের প্রথম পক্ষের সন্তানাদি ছিল না। থাকলে মিনতি কি করত—তা সেই জানে। নেই যখন—সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তবু সুখী হওয়া তার কপালে ঘটে উঠলো না। বিধাতার বিধানই অন্যরকম। হয়ত যা সে চেয়েছিল—তা পায়নি মনের আশা মনেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। যা হোক্ লীনা যেবার জন্মাল, ঠিক তার তিন বছর পরেই শিবনাথ একদিন জ্বর নিয়ে হাজির। ভগবানের কি অভিশাপ ছিল—সেই যে সে পড়েছে, বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেনি। বছরের পর বছর কেটে চলেছে। এ পাঁচ বছর যে মিনতি কি ক'রে চালিয়েছে,—একে দরিদ্রের সংসার, তার ওপর আবার এই। প্রথম প্রথম গায়ের যা এক আধখানা গহনা ছিল—বিক্রী হ'য়ে গেল, ঘরের আসবাবপত্রও কিছু কিছু ঘর ছাড়লো। শেষে উপায়ান্তর না দেখে, স্বামীর সেবার ফাঁকে যেটুকু সময় পেত—সুতাকাটা, জামাসেলাই প্রভৃতি কাজ ক'রে কাটিয়ে দিত। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, জন্ম হয়েছে কাজ করবার জন্য, সে শুধু কাজ ক'রেই যাবে। পাশের বাড়ীর মতির মার সাহায্যে ওসব জিনিষ বিক্রী ক'রে সংসার চলে—না চলার মতো। ডাক্তার দেখাবার পয়সা পাবে কোথায়? কাযেই স্বামীর রোগ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কি রোগে ভুগছে—সঠিক উত্তর তার নেই। মিনতি নিজের শরীরও ভেঙে পড়েছে। কিন্তু মেয়েমানুষের শরীর যেহেতু—ভালো থাকলে ভালো, মন্দ থাকলে মন্দ; খোঁজখবর নেয়া ঠিক শোভা পায় না। আর বাঁচবেই বা ক'দিন! তারও ডাক প্রায় এগিয়ে আস্‌ছে—এক লীনার জন্য যা একটু ভাবনা। সে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনিই হয়ত শেষকালে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন.—এতো মাথাব্যথারই বা দরকার কি?

ও মা চলো—

লীনার আর্তস্বরে এবার মিনতির চমক ভাঙলো। ভীত হয়ে প্রশ্ন করলে—কেন, হয়েছে কি?

বাবা যেন কেমন করছে। লীনা কেঁদে ফেল্‌লে।

তুই যা। আমি আসছি। মিনতি পাশের ঘরে প্রবেশ করলো। দড়ির ওপর থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে বাইরে এসে দেখলে—লীনা তবু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্‌লে—নে চল।

এরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যেই ঘটে। ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ নেই।

শিবনাথ বমি করে হাঁফাচ্ছিল ভীষণভাবে। মিনতি আস্তে আস্তে এগিয়ে গায়ে মুখে যেখানে যেখানে বমি ভরেছিল, সযত্নে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর স্বামীকে ওপাশে সরিয়ে বিছানার চাদর টেনে তুলে কলতলায় চলে গেল। মায়ের নির্দ্দেশ মতো লীনা শিবনাথের শিয়রে বসে বাতাস দিতে লাগলো।

উঃ। একটু জল দাও ত!

আমি দিচ্ছি বাবা। লীনা তক্তাপোষ হ'তে নেমে

পড়লো। তাড়াতাড়ি ক'রে মেটে কলসী থেকে জল গড়িয়ে নেবার উপক্রম করতে হঠাৎ হাতের কাচের গ্লাসটি ফস্কে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ভেঙে চুরমার।

কি হ'লো? বল্‌তে বল্‌তে মিনতি ঘরে ঢুকে যে কাণ্ড দেখলো, সর্ব্বাঙ্গ তার জ্বলে গেল। ঠাস্ ক'রে মেয়ের গালে এক চড় কসিয়ে দিলে বললে—যতোই বয়েস বাড়ছে, দিন দিন ততোই ধিরিঙ্গী হয়ে উঠছেন।

লীনা কেমন একরকম হ'য়ে গেছল। উত্তর দেবার ক্ষমতা মুখে যোগাল না। উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করতে যেতেই মিনতি চেঁচিয়ে বললে—ও কি হয়েছে হতভাগা মেয়ে? পা কেটে যে রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে।

শিবনাথ আর সহ্য করতে পারলে না। বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—ছেলেমানুষ ও। ওকি ওসব কাজ পারে? তুমি ছিলে কোথায়?

কলতলায়।

ঐ কলতলাতেই সারাদিন থেকো, আর অবসর সময়ে মেয়েটাকে গুতিয়ে গুতিয়ে একশেষ কোরো। এই তো হয়েছে তোমার কাজ।

মিনতির চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে কোলের ওপর পড়লো। আঁচলে মুছে লীনার পা টা টেনে নিলে। বার কয়েক চেষ্টা করবার পর কাচের টুকুরা বের হয়ে এল। ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেশ করে কাটা যায়গায় বেঁধে দিয়ে বল্‌লে—যা শুয়ে থাক এখন।

নিরুত্তরে লীনা উঠে গেল।

একটা ভাঙা বাটীতে স্বামীকে জল খাইয়ে মিনতি খুঁটে খুঁটে কাঁচের টুকরা গুলো কাপড়ে তুলে নিলে। বারান্দার ওধারে সেগুলি ফেলে এসে ঘরটা ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করলো। তারপর স্বামীর কাছে গিয়ে বল্‌লে—মাথাটা একটু টিপে দোব?

শিবনাথ চুপ করে থাকল। আরেকবার জিজ্ঞেস করতে বল্‌লে—দরকার কি? দাঁতে ঠোঁট চেপে মিনতি দাঁড়িয়ে রইলো।

(২)

দুদিন হোল, শিবনাথের অবস্থা খুবই খারাপ গেছে সেজন্য মিনতি কোনো কাজ করতে পারে নি। ঘরে সামান্য যা সংগ্রহ ছিল, তাতে লীনার চলেছে। সে এক রকম উপবাসেই কাটিয়েছে। কাল রাত্রি থাকতে উঠে কিছু সূতা কেটেছিল, আজ সকালে মতির মার সাহায্যে সেগুলি বাজারে পাঠিয়ে দিলে। বাজার থেকে ফিরে এসে মতির মা দুটো পয়সা দিতে তাই দিয়ে মুড়ি কিনিয়ে আনলো।

দুপুর বেলায় মেয়ের সাম্‌নে মুড়ি ও একটু গুড় রেখে মিনতি বললে—বেলা অনেক হ'য়ে গেছে, খেয়ে নে শীগগীর ক'রে।

থালায় হাত দিয়েই লীনা হাত টেনে নিলে। বললে—আমি খাব না।

খাবিনে কেন?

তুমি খেয়েছ?

হুঁ।

মুখ তবে অতো শুক্‌নো কেন?

বক্ বক্ করিসনে বলছি। খাবি তো খা, নইলে সব সব ফেলে দোব।

দাওগে ফেলে, খাব না আমি। লীনা উঠে পড়লো।

মিনতি তার হাত ধরে বসিয়ে বললে—নে, রাগ করতে হবেনা, এই খাচ্ছি।

আগে খাও।

নাঃ, তুই আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারলি!

এক মুঠো তুলে দিতে দিতে মিনতি বললে—আমি ম'রে গেলে তোর কষ্ট হবে না?

লীনা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে মিনতি একটু হেসে বললে—বলনা?

হু।

হু কি?

কষ্ট হবে।

গম্ভীর হ'য়ে মিনতি বললে—কষ্ট হবে না, ছাই। তোরা বাপে-মেয়েতে মিলে মিশে মনের সুখে থাকবি আমার কথা হয়ত তোদের মনেই পড়বে না।

ফের যদি ও কথা বলবে আমি উঠে যাব কিন্তু, হ্যাঁ।

মিনতি হাসি চাপতে যাচ্ছিলো। ওঘর হতে শোনা গেল—গল্প করলেই সারাদিন চলবে নাকি?

এক মুহূর্ত্তে তাঁর মুখ ম্লান হ'য়ে এল। যেতে যেতে মেয়েকে বললে—বারান্দায় মুখ হাত ধোবার জল রইলো, বুঝলি?

লীনা ঘাড় নাড়লো।

ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে স্বামীর পায়ের কাছে ব'সে মিনতি মৃদুস্বরে বললে—আমায় ডাকছিলে না? শেষের দিকে গলার স্বরটা বার দুয়েক কাঁপলো।

চোখ বন্ধ ক'রে শিবনাথ প'ড়েছিল। সেইভাবে থেকেই চেঁচিয়ে বললে—না, ডাকব কেন? গল্প করগে যাও।

মাথা হেঁট ক'রে মিনতি বললে—লীনাকে খাবার দিতে দেরী হ'য়ে গেছিল।

স্ত্রীর এতো নরম স্বর শিবনাথ আর কোনোদিন শোনে নাই। সে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো—মিনতির মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। শিবনাথ অপ্রস্তুত হোল—না, কঠিনভাবে বলাটা মোটেই উচিত হয়নি। এবারে গলা যতটা সম্ভব শান্ত করা যেতে পারে, শান্ত ক'রে বললে—খাওয়া হয়েছে তোমার!

হ্যা।

কখোন্ খেলে?

এইতো সবে খেয়ে এলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে শিবনাথ বললে—এসেছে কে?

কই? কেউ ত না!

তবে গল্প করছিলে কার সঙ্গে?

লীনার সাথে।

আচ্ছা যাও, বিশ্রাম করগে। শিবনাথ চোখ বুজলো।

সামান্য কয়টা নীরস কথা মাত্র। একটি গরম নিঃশ্বাস ফেলে মিনতি নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল।

এক বছর পরে।

গতরাত্রে শিবনাথ যায়-যায় হ'য়েছিল। কান্নাকাটিও পড়ে গেছল খুবই। পাড়া প্রতিবেশী যে না এসে জুটেছিল—তা নয়। মানুষের নিয়মই তাই। বাঁচা থাকতে দেখবার লোক পাওয়া ভার, কিন্তু যেই মরবার সময় উপস্থিত হ'ল অমনি এসে জুটে গেছে অনেক। মিনতি সমস্ত রাত্রি কেঁদেছিল, যেমন আরো আরো মেয়ে কাঁদে স্বামীর প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কায়। ভোরে যখন অবস্থা একটু ভালোর দিকে এল, প্রকাণ্ড একখানা পাথর যেন নেমে গেল তার বুক থেকে। তবু শান্তি ব'লে যে জিনিষটা পাওয়া যায় জগতে—সেটা তার ভাগ্যে কোনক্রমেই ঘটে উঠলো না। কেন যে কেঁদেছিল—সকাল বেলায় ভেবে ভেবে এ প্রশ্নের উত্তর সে কিছুতেই ঠিক করতে পারলো না। লজ্জাও একটু করতে লাগলো এখন—ঐ অতোগুলো লোকের সামনে চীৎকার ক'রে কান্না! যাক্‌গে, ভাবনার মাথা খাই।

বিরক্ত হ'য়ে সে উঠে পড়লো। খানিকখন ধ'রে টুকটাক্ যা কাজ ছিল তাড়াতাড়ি সেরে নিলে। সেরে নিয়ে উত্তরের ঘরে গেল। দেখলে—লীনা তখনো ঘুমিয়ে আছে—গালের ওপর চোখের জলের দু'একটী আবছা দাগ। আস্তে ধাক্কা দিতেই সে জাগলো। উঠে ব'সে বল্‌লে—কি?

কি আবার? কতোক্ষণ শুয়ে থাক্‌বি? মুখ ধুয়ে ঐ ওখানে খাবার রইলো—চটপট্ ক'রে খেয়েনে, রাত্তিরে তো কিছুই খাসনি।

চোখ কচলিয়ে লীনা বল্‌লে—বাবা কেমন আছে?

ভাল। মিনতি বেরিয়ে গেল।

বিকাল—

শিবনথ মুখ খিঁচিয়ে উগ্রস্বরে বল্‌লে—কই, হোল?

বারন্দা হতে মিনতি উত্তর দিলে—এইযে হোল বলে।

নাঃ। তোমাকে নিয়ে ঘর করাই মুস্কিল।

মিনতির ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে-ও চেঁচিয়ে বল্‌লে—বিয়ে করেছিলে কেন?

বিয়ে করেছিলাম, তোমার বাপের ভাগ্যি।

বাবা ত আর সেধে দ্যায়নি?

নাঃ। সেধে দ্যাননি? আমি গিয়ে তার পায়ে ধরে সেধে ছিলাম যে তোমাকে আমার চাই—ই। নইলে এ জীবন ব্যর্থে যাবে।

মিনতি চুপ ক'রে গেল। দসবার তার কিছুই নেই। একেতেই সে মেয়ে—তারপর দরিদ্রের ঘরে জন্ম। কি

বল্‌তে কি হবে—শেষে এইত জীবন, এরপরেও যদি দুর্ভোগ ঘটে—

কি গো। চুপ করলে যে বড় ? মুখে আর কথা যোগায় না ? যোগাবেই বা কি করে! সে—সুযোগ কি বাপ রেখেছে!

বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে মিনতি বললে—বাপ তুলনা বলছি।

ইস, খুবযে তেজ বেড়েছে। সেরে উঠি আগে দুদিনের জুতোয়ই ও তেজ কোথায় যাবে, ঠিক নেই—তার আবার এতো গর্ব্ব!

বুক চাপড়ে মিনতির কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কি হবে?

শিবনাথ বল্‌তে লাগলো—ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, ওসব বুজরুকি আমার কাছে খাটবে না। নিজের পেট ভরানোর সময় চুপে চুপে বেশ আছে, আর এদিকে একজন খেল কি না খেল, বাঁচলে কিনা বাঁচলো—তার কোনো খোঁজ খবর নেয়া নেই। এ বজ্জাতি শিখলে কোত্থেকে? বাপ চামারই শিখিয়েছে বোধ হয়। যেমন বাপ, তেমনি বেটী—দুই-ই সমান। রাতদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। শুধুইকি বিয়ে হচ্ছিলো না। মা ঠিকই বলেছিলেন। ও মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসাও যা, দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পোষাও তাই। মার বারণ না শুনে বড় ঠ'কে গেছি। এখন বুঝছি হাড়ে হাড়ে—কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়।

একটু থেমে বল্‌লে—দেখো, ওতে বিষ টিষ মিশিয়ে দিয়ো না যেন। মেয়ে মানুষ কিনা, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের জাতই—

স্বামীর বার্লি প্রস্তুত করতে করতে মিনতি ভাবছিল—এই তার জীবন! না আছে এতে উৎসাহ, না আছে আনন্দ। কলের মতো কেবল কাজ ক'রেই চলেছে। প্রশংসা ত' দূরের কথা, একটু সহানুভূতি দেবারও লোক নেই। তার ওপর অল্প ত্রুটিতেই সময়ে অসময়ে লাঞ্ছনা, গঞ্জনার একশেষ। অশান্তির পর অশান্তি। অবিশ্রাম সঙ্গীহীন একটানা পথে কে কতোক্ষণে চল্‌তে পারে? কিন্তু উপায়হীন—তাকে চল্‌তে হবে, এই পথ ধরেই জীবনের শেষ সীমায় পৌছতে হবে। আপত্তি করবার তার কিছুই নেই,—এ যেন মহাব্রত—এ যেন তার প্রধান কর্ত্তব্য। ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি নারী হ'যে সে জন্মেছে—নারীত্বেই তাকে চরম সার্থকতা টেনে আন্‌তে হবে। ভিন্ন পথ কোথায়—কতোদূরে,—সে সন্ধান দেবার শক্তি হয়ত কারো নেই!

গান

কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

বল বল প্রভু আমারে বল
আছে আর কতদুর,
কোথা তুমি আজ নিয়ে যাবে মোরে
কোন সে সুরপুর?
রৌদ্র কিরণ ঝলসিছে গায়,
মায়া মরীচিকা পথ যে ভুলায়;

দুর্গম পথ, অসীম যাত্রী,
হয়েছি যে তৃষাতুর।
এপথে ওপথে চলেছি কোথায়,
পথের শেষ যে দেখা নাহি যায়;
তবু আছ তুমি—সেই সে আশায়
হৃদয় যে পরিপুর।



বুদ্ধের জন্ম

[শ্রীযুক্ত অনীলকুমার দে মহাশয়ের সৌজন্যে]

গোপন কথা

শ্রীসৌরেশ চন্দ্র চৌধুরী

শয়নগত হ'তে না হ'তেই নয়ন যে নিমীলিত। শুন্‌ছো।

উঁ।

অবিরাম ব'কে যাচ্ছি। ভোট আদায়ের সময়ও লোকে এত বকেনা। তার জবাবে কিনা উঁ।

কি ক'র্‌বো ?

ঘুমোবার আগে স্বামী-স্ত্রীতে যা করে—গল্প-সল্প কথা বার্তা। সেই কথাটা ব'ল্‌লেনা ?

কি কথা ?

ব্যাঙের মাথা।

কি ব্যাঙ ?

কোলা ব্যাঙ।

কি কোলা ?

লেজ ঝোলা।

ব্যাঙের লেজ থাকে নাকি ?

নোতুন বউ শুতে না শুতে ঘুমোয় নাকি ?

ঘুমোয়—যদি হয় ছোট।

ব্যাঙের ও লেজ থাকে—ছোট বেলায় যখন ব্যাঙাচি ......আর এটুখানি কাছপানে স'রেই এস না। বাঘ নই যে গিলে দোবো গপ্‌ করে।

কানের কাছে মুখ না এনেও কথা কওয়া চলে...... মাগো মা......ভারি দুষ্টু তুমি।

ব'ল্‌বো ব'ল্‌লে কেন ? না ব'ল্‌লে সহজে ছাড়্‌বো তোমাকে।

উঁহু। হু! বল্‌ছি বল্‌ছি·····লাগেনা বুঝি···অমন-ধারা চুল ধরে টান্‌লে ? মাফ কর বাপু! অতখানি বেহায়া হ'তে পার্‌বোনা।

ব'ল্‌বেনা ; দেখাচ্ছি মজা···

মেয়ে মানুষের লজ্জা করেনা বুঝি ? সোজাসুজি বলা চলে সে কথা ?

বেশত! কাজ কি বলায়। সারা রাত এমন জ্বালাতন ক'র্‌বো...কি ক'রে ঘুমোও দেখছি।

এ কেলেঙ্কারী কাহিনীর নায়িকা যে ধনি সে তোমার খু-উ-উ-ব চেনা। আমি বলি আর তুমি ফাঁস ক'রে দাও···তা হ'চ্ছেনা।

তোমার গা ছুঁয়ে দিব্য ক'রছি, কাকেও ব'লবোনা। তোমাদের মত ইয়ে জানি গো জানি। শপথে সুপটু··· আজ রাতে যদি দেহ রাখি, কা'ল সাঁজেই টোপর মাথায় দিয়ে আবার দাঁড়াবে ছাল্‌না তলায়। ভোমরার জাতি তোমরা—জান্‌তে কিছু বাকি নাই।

আমি ?

বউ বেঁচে থা'কতে সব্বাই ঐ এক কথাই বলে। চোখ ছলছল কেন ? সত্যিইত মরিনি। কথায় কথায় চোখে যার জল আসে, এমন ছিচ কাঁদুনে মানুষ নিয়ে ঘরকরা দায়। দিন দিন তুমি ছেলে মানুষেরও বাড়া হ'চ্ছ।...কথাটা শোন।

চাইনা শুন্‌তে তোমার কথা।

কক্ষনো শোননি তুমি এমন আজব কথা। আর শতেক জনম ভাবলেও খুঁজে পাবেনা তার মানে। নিছক প্রেমের ঘটনা...নায়িকা হ'চ্ছেন তোমার এত চেনা যে...। ভূমিকা শুনেই হাসি ধরেনা দেখছি! এত ছলা কলাও জানো তুমি। বল্‌ছি কিন্তু খুব হুঁসিয়ার।

হুঁসিয়ার।

আর কাকেও ব'লোনা, আমার দিব্যি।

কাকেও ব'লবেনা—তোমার দিব্যি।

প্রথম যেদিন এ ঘটনা ধরা পড়ে সেদিন...। যখনি ভাবি এ কথা, আমার আমিত্ব হারিয়ে চলে যাই আমি দূরে সুদূরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে ভেবে দেখেছি, মানুষের এ প্রবৃত্তি কেন জাগে, কেমন ক'রে জাগে ? যতই ভাবি, সমস্যা ততই জটিল হ'য়ে ওঠে। এখন শোন। হ'য়েছে কি...না বাপু! মরম যায় যাক্‌, সরম ছাড়তে পার্‌বোনা। খোলাখুলি ব'লবো কেমন ক'রে সে-কেলেঙ্কারী-কথা। মাথা খাও আমার, কোত্থাও প্রকাশ ক'রোনা। তা হ'লে কোনদিন আর কোনো কথা ব'লবোনা।

বার বার ব'লছিত! কাকেও বল্‌বোনা···তোমার দিব্যি।

শোন তবে...স'রে এস···আরো···আরো কাছে··· আ-মি-তো-মা-কে-ভা-ল-বা-সি।

পাহাড়ে স্মৃতি

গল্প

এম, ছোনাওর আলী

পাহাড়......মাটির মা।

মায়ের কোলে......মায়ের সংসার।

অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী রাগ রঞ্জিত মেঘরাশি... যেন কোন সুদূর বিরহীর কলিজা নিংরানো তাজা খুনের সায়র...আর তার সোনালী স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করেছে...মায়ের বুকে।

Provincial Exhibition বলে ৩টার সময় সমস্ত অফিসগুলো ছুটি হয়ে গিয়েছিলো, মেসের প্রায় সকল মেম্বারই সমাগত, তরুণ অশান্তদের সে কি উদ্দাম গতি... সোজা কথায় যাকে বলে Rioting at home.

শিলংএর মত উষর স্থানেও 'বয়'টী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়ে পড়েছে,—ফরমাসের ওপর ফরমাস, কে কার আগে বেরুবে,...একজিবিশনে যেতে হ'বে কিনা।...ঠিক যেন 'All Quiet in the Western Front' এর একটী দৃশ্য।

ডিসেম্বরের রাত ১০টা...আকাশের কোলে এতটুকু চাঁদ। সাদা মেঘের তোয়ালে জড়িয়ে আকাশ মাতা ওকে যেন কোলে করে দাঁড়িয়েছিল।...আর তার আশ পাশ হ'তে পেঁজা তুলোর মত শিশির পড়ে জোছনার সঙ্গে মিশে এক ঘোলাটে রং ধরেছে

\+ \+ \+

Central Room এর ইনমেটদের একটা মজলিশ বসেছে। এরকম ছোটখাট রোজই বসে...তবে আজ একটু যেন জাঁকালো। প্রসঙ্গটী প্রথম একজিবিশন এর আলোচনা থেকেই সুরু হ'য়ে সেই মামুলি, একঘেয়ে 'প্রেম ও ভালবাসায়' পৌঁচেছে... যা ছোকরা বাবুদের কাম্য।

মতি লেপ মুড়ে ইজি চেয়ারে বসেছিল...হাতে এমাসের পুষ্পপাত্র বইখানা টেবিলে আছড়ে বললে... আচ্ছা ভাই যতই চেঁচামেচি করে ভালবাসার আর নারীর প্রেমের দোহাই দাও না কেন...একটা কথা বুঝিয়ে না দিলে কিন্তু ছাড়ছিনে। বলত,—নারীর প্রেম ও ভাল বাসার সার্থকতা কোথায়—? নারীর স্বরূপ যখন চিনতেই পারলাম না...তখন তাকে বিশ্বাস করব কি দিয়ে—আর বিশ্বাস করতে না পারলে ভালবাসবই বা কি করে?

মণির তুখোর ছেলে।...বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখশ্রী, তার ওপর তার সরল উদার স্বভাব সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। একটু অভিমানের স্বরে বললে, ভুল বন্ধু, নারীকে বুঝতে চেষ্টা করোনা, নারী মায়া, মরীচিকা...প্রহেলিকা বুঝবার জন্য বিশ্বাস করবার জন্য নারী নয়...ভালবাসার জন্য...শুধু ভালবাসার জন্য।

পাশের দু'এক জন মণিরের পিঠ চাপড়ে বললে— Bravo মণির।

মতিও প্রস্তুত ছিল, মুখ ঘুরিয়ে বললে, আরে ছ্যাঃ! রেখে দাও তোমার এমন monotonous ভালবাসা, অন্ধের মত ভালবাসতে হবেই বললে হল কি না?...তা এক কাজ করনা মণির...সেই একজিবিশন এ যে পাহাড়ী মেয়েটী দেখে সবাই ঘুরে পড়েছিলে,...তাকেই না হয় জীবন সঙ্গিনী করে নাও না কেন! বেড়ে হবে কিন্তু। নারী যখন কেবল ভালবাসবার জন্যে...তখন যাকে ভাল লাগে তাকেই ভালবাসলে পার। তারা যেমন বেহায়া ...তুমিও তেমন—কাজেই মিলবে ভাল।

মণিরের সদাহাস্য প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যেন একটু ছায়া পড়ল...। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য...তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে—ছিঃ, মতি নারীজাতি মাতৃজাতি, তাদের প্রতি কুৎসিৎ ইঙ্গিত তোমার মত শিক্ষিত ছেলের মুখে... কাপুরুষতার লক্ষণ, মানুষ মাত্রেই দোষের আধার।...আর সে দোষ হাতে কলমে বুঝিয়ে সংশোধন করাই মানুষের ধর্ম্ম। তা না করে যে এম্নি অম্লান বদনে মানুষ হয়ে

তাদের মাথায় কলঙ্ক চাপাতে চায়, তাকে আমি মানুষ নামের অভিশাপ বলে মনে করি। ছিঃ তুমি আবার শিক্ষিত বলে বড়াই করে থাক...এ শিক্ষার গুণ কি?

করিম সাহেব এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন কথাটা বেয়াড়া ভাবে যাইতেছে দেখে বলে উঠলেন, আরে থামহে ছোকরার দল।...এ বুড়োর দু' একটা কথা শোনো, যুগ যুগান্তর সাধনায় যার মীমাংসা হয়নি···তা তোমাদের ঐ কচি মাথায় কুলোবে কেন? শোন একটা গল্প বলি···এতেই তোমাদের নিজ নিজ পথ বেছে নিও।

সকলেই করিম সাহেবের দিকে তাকাল···বাহিরে তখন পাহাড়ী মায়ের জ্যেষ্ঠ ছেলে—দমকা হাওয়া—... শীতের আলথাল্লা জড়িয়ে সরল পাতার সাথে ঝিনি ঝিনি খেলছিল।

+ + +

করিম সাহেব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।...পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়া ঝরা ফুলের মরাগন্ধের মত দুটী ব্যথিত হৃদয়ের করুণ কাহিনী। সে সভ্যতা ও জ্ঞান গরিমার বাহাদুরী নিয়ে আজকাল তোমার যা চিরন্তন সত্য. যা খাঁটী ও নিছক তার বুকে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হও না—সে যুগ আর এযুগ সম্পূর্ণ আলাদা। হয়ত তোমরা রোমান্স বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর্বে, তবুও ইহা এত সত্য যে আমারা যেখানে বসে আছি...তার দু'দশ হাত এদিক সেদিকেই ঘটেছিল। গল্পের স্থান কাল বা পাত্র না হয় নাই বললাম, তবে তোমাদের কচি মনে খুঁৎখুৎ কর্ব্বে বলে একটা কিছু ধরে নেওয়া গেল—।

গরীবের মেয়ে নানসী, যেন ধরণীর বুকে ফোটা এক ফোটা ফুল···উদ্দাম কালো কেশ দামের মধ্যে সুন্দর মুখখানি, আর তার ওপর বড় বড় চোখ দুটী যেন কালো মেঘের ফাঁকে শরতের পূর্ণচন্দ্র। তার বাপ প্রেসে কি একটা কাজ করত, বেতন যা পেত তা দিয়ে সংসার কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ত; কাজে কাজেই অভাব অনটন লেগেই থাকত। ভাই বোনে তারা ৩৪টী ছিল, কেমন করে যে তারা মানুষ হয় বাপের কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিলো না। তার দোষের মধ্যে ছিলো পিপে পিপে মদ উজার করা আর গুণের মধ্যে ছিল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম।—একেত অভাব অনটন তার ওপর অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মদ্যপান, শরীর কতদিন সইবে, হঠাৎ একদিন তাদের সকলকে অকূলে ভাসায়ে সে চোখ বুজল।

স্বামীর মৃত্যুতে এতগুলো অপোগণ্ড শিশু নিয়ে নানসীর মা প্রথমটা একটু মুসড়ে পড়ল···পড়বারই কথা। স্বামী যা উপার্জ্জন করেছে তা থেকে একখানা বাড়ী ও সামান্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেনি। নানসী তখন Pine mountএ ক্লাস নাইন এ ও জর্জ্জ হাইস্কুল এ ক্লাস এইট'এ পড়ে। আর দুটী নিতান্ত শিশু। কিন্তু তাই বলে তাদের মা বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাল না, কষ্ট সহিষ্ণু জাতি তারা...পরের মুখ চেয়ে থাকে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানে...বাড়ীখানা মাসিক ৪০৲ টাকা ভাড়া দিয়ে সে একটী সামান্য কুটীরে ছেলে মেয়ে নিয়ে উঠল...আর তাতেই তাদের দুঃখের সংসার চলতে লাগল টানাটানি করে। এম্নি করে দিন যায়···

অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে সাফির। শিলং বেড়াতে এসে কেরাণী জীবন বেছে নিল। সবেমাত্র কলেজ হ'তে বেড়িয়েছে, যৌবনের প্রারম্ভ......ফাগুনের কল্পনায় ধরণী তখন সুষমাময়···মনের কোণে জেগে উঠত স্বপনের সুখের রেশ...বুকের কোণে কত কুসুমই না ফুটত কত রংএ ধরে ধরে, আর ফাগুনের সাথে বিশ্বও তখন দুলত দোদুল দুল॥ করিম সহেব এই বলে একটু থামলেন। তারপর কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। পুনরায় আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন।···ওয়ার্ডলেকে একদিন বেড়াতে গিয়ে নানসীর সঙ্গে তার দেখা, সঙ্গে ভাই জর্জ্জ,···সাফীর জর্জ্জকে চিনত, জজ্জ স্কুল টিম্'এর আর সাফীর টাউন্ ক্লাবের খেলোয়াড়—দু'জনের পরিচয় স্বাভাবিক, অনেক কথাবার্ত্তার পর, জর্জ্জ তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। সাফীরের যদিও ইচ্ছে ছিলনা—তবুও নানসীর নীরব মিনতি তাকে যেতে বাধ্য করল।

এমনি করেই তাদের পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল ......চুম্বক রাজ্যে Negative আর Positive···আ

ভালবাসার রাজ্যে পুরুষ আর নারী। দু'জনেই দু'জনকে আপন ভুলে ভালবাসল।

বেশ কিছুদিন গেল, হঠাৎ একখানা চিঠি সাফীরের বাপের হাতে পড়ল তার ছেলের কেলেঙ্কারী নিয়ে।... তাঁর ছেলে বিয়ে করে খৃষ্টান—হয়েছে ইত্যাদি— —। আর এ তারই এক বন্ধুর বাহাদুরী। মা ত কেঁদে কেটে—অস্থির...সাতরাজার ধন এক মাণিক, ছেলের মুখ দেখেই সব...যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে...চাকরীর দরকার কি?

...হাজার হোক মায়ের প্রাণ—।

তার পরের দিনই সাফীর অফিসে এক টেলিগ্রাম পেল Mother in death bed come sharp.

দশ দিনের ছুটী নিয়ে, অফিস থেকে এসে ঘরে পা দিতেই, নানসী ধরে ফেললে। কি এক অজানা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার বুকখানা কেঁপে উঠল, তোমার মুখখানা এত শুকনো কেন কোন অসুক করলে নাকি? সাফির পকেট হ'তে টেলিখানা বের ক'রে তার হাতে দিল বিদায় কালীন সেই করুণ কহিনী তোমাদের কাছে না হয় খুলে নাই বললাম...তবে একটুকু জেনো, সাফীর বাড়ী গেলো ...তার তরুণ হৃদয়ের সবগুলো শক্তি উজার ক'রে ...মুমুর্ষ মাতার আকুল আহ্বান তাকে ব্যথিত ক'রে তুলেছিলো।

বাড়ীতে পৌছে অন্দর মহলে পা দিতেই মা তাকে বুকে তুলে নিলেন, চেখের কোণে দু'ফোটা জল নিয়ে।

এম্নি করেই মাকে ভুলতে হয় বাবা...কাজ নেই আর চাকরী ক'রে...আমার বুকের ধন বুকেই থাক।

হায়রে:স্নেহ আর মায়া, কেবল বেঁধে রাখতেই চায়, কার বুক কোথায় ভেঙ্গে ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছে সে তা দেখে না।

সাফিরের মুখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়ল...তবে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না। বললে, তা কেমন আছ আম্মা এখন...কি ব্যামো হয়েছিল।

এই এখন একটু ভাল বাবা, তা...আমার সেই সর্ব্বনেশে 'কলিক্ পেন' আর কি।

বাড়ীতে ২।৪ দিন থেকেই সে বুঝতে পারলে যে তাকে বেঁধে রাখবার আয়োজন চলছে, টেলিগ্রাফ্ তা ছাড়া যেদিন তার হাতে পরল একখানা তার অফিস থেকে "Resignation Accepted"...তখন দিনের আলোর মত তার কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠল। তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

তার খানা হাতে নিয়ে মার কাছে গিয়ে অভিমানের স্বরে বললে, একি কাণ্ড কারখানা আম্মা!...আমি বুঝতে পারছিনে।

মা হেসে বললেন, তিনি বলছিলেন তোমায় আর চাকরী করতে দেবেন না...আর দরকারই কি বাবা, যা আছে তাতেই তোমার কোন অভাব হবে না। আর আমরাই বা তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকি...এক ছেলে—বলেই হন্ হন্ করে বেড়িয়ে গেলেন।

সাফীরের মনে হতে লাগল, পৃথিবী যেন টলছে, তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

বিদায় কালীন নানসীর জলভরা চোখের সেই মিনতি—রোজ রোজ এক একখানা চিঠি লিখে...। সাফীর আজও ভোলেনি। কিন্তু আজ ক'দিন গেছে ইতিমধ্যে নানসী সাফীরের কোন পত্র পায়নি..., এক অজানা বিপদাশঙ্কায় তার কোমল বুকখানা কাঁপছিল।

হায়রে অন্ধ ভালবাসা...ফুলের কুঁড়িতে এক ফোঁটা প্রাভাতিক শিশির......আর নারীর বুকে এক ফোঁটা প্রেম।

সাফীরের বিয়ে...ইংরিজিতে ছাপান একখানা করে কার্ড আমরাও পেয়েছি, তার পিতার লেখা ২৫ শে ফেব্রুয়ারী আমার ছেলে সাফীরের বিবাহ...এলে সুখী হব।

সেদিন সোমবার।...নানসীর ভাই স্কুল হতে ফিরে একখানা কার্ড তার দিদির হাতে দিল...ইহা তার সহ-পাঠি বন্ধু হোসেন তার বাবার টেবিল হতে কুড়িয়ে পেয়েছে।

এক সেকেণ্ড! দু সেকেণ্ড!! তিন সেকেণ্ড!!!

দিদির কোনো সাড়া না পেয়ে জর্জ্জ বলে উঠল—"কি বল দিদি...এমন বেইমান" তারপর মুখের দিকে তাকা-তেই একি!...মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!! চোখের পাতা পড়ছেনা!!! "দিদি." বলে হাত দিয়ে ঠেলে দিতেই নানসী এলিয়ে পড়ল।

তারপর মা আসল! বোন আসল!! আত্মীয় কুটুম্ব এসে বাড়ী ভরে গেল!!! ডাক্তার ডেকে আনা হলো বললেন..."হার্টফেল।"

করিম সাহেব এই বলে থামলেন......

তখনও সকলেই তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে...

বাহিরে তখন বিরহতপ্ত আকাশের চোখের জল দু'এক ফোঁটা করে ঝরছিল।

পাশের ৫নং রুমে তখন একটী ছোকরা হার্ম্মনিয়ামে গাইছিল...

"ভুলি কেমনে আজও যে মনে
বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজও সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি সকলি ফাঁকা"

ফিরে এস

গল্প

শ্রীশোভারাণী বসু

বৃষ্টির মধ্য দিয়ে মীর্ণা ক্লাবে এলো, মীনা, রথীন সব "আনন্দে চীৎকার করে উঠল, আরে মীর্ণাদি তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে এলে? মৃদু হেসে ও উত্তর দিলে কি করব বল ভাই না এসে থাকতে পারলাম না, তোমরা বোধ হয় ভাবনি যে আমি আসব, সমস্বরে সব বলিয়া উঠিলাম, মোটেই নয় এস এস বোস। বিজন বলিল, আজ আর তাস ফাস ভাল লাগেনা তার চেয়ে একটু গল্প হোক। গল্প! নাঃ তার চেয়ে এস মীর্ণা একটু ক্যারম খেলি, অনীতা বলিল, বিদেশে আমাদের এই একটী মাত্র ক্লাব, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিচারে মেম্বার হ'তে পারে, সন্ধ্যার পর সকলেরি আমাদের ক্লাবে আসা চাই। আমি বলিলাম না না বিজনে যা বলেছে তাই হোক এস মীর্ণা বাজে কাল্পনিক গল্প নয় বাস্তব জীবনের গল্প হোক। লীলা হেসে বললে বাস্তব জীবনের! তবে নীরেন তুমিই বল। আমরা প্রায় সকলেই বলিলাম, বাস্তব জীবনের এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি যে আজ তা বলব। মীর্ণা এতক্ষণ চুপ করে ছিল এইবার কথা বললে—আমি একটা বাস্তব জীবনের ঘটনা জানি আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় কাজে লাগবে। কানন বললে শীগগীর করে বল তবে এতক্ষণ চুপ করে ছিলি কেন? ও হেসে বলতে আরম্ভ করলে।

সে প্রায় বছর তিন আগেকার কথা, জয়শ্রী রায়কে তোমরা বোধ হয় কেউ কেউ চেন এবং দেখেছ? হ্যাঁ আমি একবার মাত্র কাশীতে দেখেছিলাম বজরায় করে এসেছিল অত্যন্ত রোগা। অনীতা বললে হাঁ তখন সে অসুখে ভুগছে নৌকায় বেড়ালে অর্থাৎ গঙ্গার হাওয়ায় রোগ সারতে পারে বলে ডাক্তারের উপদেশ মত ও বজরা করে বেড়াত. যাকগে শোন জয়শ্রী বেশ বড় জমিদারের একমাত্র মেয়ে ছিল, ওর বাবা একজন পশার প্রতিপত্তি-শালী ব্যারিষ্টার ছিল। জয়শ্রী ছেলে বেলায় বার দুই বিলেত গেছল। একে বড়লোকের মেয়ে তায় বিলেত গেছল এই সব কারণে ও অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল, ওকে পাবার জন্য ওদের বাড়ীতে সিভিলিয়ন ব্যারিষ্টার ডাক্তার আরও ছোটবড় অনেকের ভিড় হত, তারমধ্যে প্রশান্ত ছিল অন্যতম। তার পয়সা কড়ি তেমন কিছু ছিলনা অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ওর বাবা গবর্ণমেণ্টের কোন অফিসে কাজ করত মাহিনা মাত্র ১৫০৲ টাকা অতএব প্রাশান্তর বামন হয়ে চাঁদে হাত এই রকম হয়ে ছিল। প্রশান্ত ছিল একজন চিত্র শিল্পী। মীনা প্রশ্ন করলে কি করে জয়শ্রীর সঙ্গে প্রশান্তর পরিচয় হয়? মৃদু হেসে মীর্ণা বললে এইখানে মানে গিরিডিতে উশ্রীপ্রপাত দেখতে গিয়ে, ও ছবি এঁকে যাচ্ছে। জয়শ্রী পাশে এসে দাঁড়াল, এতক্ষণ ও একটা পাথরের ওপর বসে জলপ্রপাত দেখছিল; হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল, সে তখন একমনে ছবি এঁকে যাচ্ছে, দেখি কি ছবি আঁকছেন? ওর গলার স্বরে চমকে প্রশান্ত মুখতুলে ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, জয়শ্রীর লজ্জার লেশ মাত্র ছিল না ও আবার জিজ্ঞেস করলে, দেখি কি ছবি আঁকছেন। এর আগে ও কখন কোন মেয়ের সঙ্গে কথা কয়নি আর কারুর সঙ্গে পরিচয় ও ছিল না, ও ওর অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবি-খানা দেখালে—ছাই ছবি হয়েছে, কি বিশ্রী হয়েছে ও নিজের অভিমত ব্যক্ত করলে। প্রশান্ত অপ্রতিভ হল। সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললে—এখনও শেষ হয়নি। ওর কথা শেষ হবার আগেই ও আসছি বলে চলে গেল। ও একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, একটু পরে জয়শ্রী আর একটী মেয়ের হাত ধরে এলো, সে ওর মামাতো বোন। উষাও এসে বললে আচ্ছা আপনি আরও ছবি এঁকেছেন? হাঁ অনেক। ও বললে, কিন্তু আপনার ছবি দেখেতো মনে হয় না যে আপনি এর আগে অনেক এঁকেছেন। প্রশান্ত বিরক্ত হল এবং বিরক্ত ভাবেই বললে না হয়ত কি হবে—যান এখন বিরক্ত করবেন না। ওর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল।

বললে যাবো মানে? কার সঙ্গে কথা কইছেন জানেন? প্রশান্ত হেসে ফেললে, বললে—না কি করে জানব। ওর হাসি দেখে ও আরও জ্বলে উঠল, উষা ওর হাতে ধরে বললে চলে আয় জয়া কি করছিস। ও হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বললে সুজিত রায়কে চেনেন? আমি তার মেয়ে—মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে শেখেন নি? অসভ্য কোথাকার।

প্রশান্ত অবাক হয়ে গেছল। কলকাতায় থাকে বটে কিন্তু একবার স্বনাম ধন্য ব্যারিষ্টার সুজিত রায়ের মেয়ে জয়শ্রী রায়কে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।

কিন্তু এই ঔদ্ধত্য গর্ব্বিতা মেয়েকে জয়শ্রী রায় জেনেও ও গর্ব্বিত ভাবে বললে সুজিত রায়ের মেয়েত কি হবে! আপনার লজ্জা ক'রলনা গায়ে পড়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে। সেদিন এই পর্য্যন্ত তারপর আর দেখা নেই—কারণ তার পরদিনই প্রশান্ত ক'লকাতায় চলে গেল, উষা মাঝে মাঝে জয়শ্রীকে হেসে বলত—কিরকম ছেলে দেখেছিস্ যাকে বলে একেবারে অভদ্র। ও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলত গরীবের ছেলে পাঁচটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কখনত মেশেনি অভদ্র হবেনাত আর কি হবে।

তারপর ওরাও ক'লকাতায় চলে এলো, এলফিনষ্টোনে জয়শ্রী, উষা, আরও ক'জনে গেছল, ওরা সিট আগে থেকে রিজার্ভ করে রেখেছিল। জয়শ্রী একটা ধারে বসেছিল, সবে "লাইট" নিভেছে সেইসময় প্রশান্ত ওর এক বড়লোক বন্ধু অজিত গুপ্তর সঙ্গে এসে বসল। প্রশান্ত ঠিক জয়শ্রীর পাশে বসেছিল, ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতেই ওপাশে সিটের দিকে দেখতেই প্রশান্ত ওকে নমস্কার করলে, ও গর্ব্বিত হাসি হেসে বললে—এইযে আপনাকে যে এমন জায়গায় দেখতে পাব তা জানতাম না। ও মৃদুহেসে বললে কেন? আপনাদের মত লোককে এসব জায়গায় দেখতে পাওয়া একটা বিস্ময়ের কথা নয়; আপনিই বলুন না? উষা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ওর কথাটায় প্রশান্ত ব্যথা পেলে, জবাব মুখের কাছে এসেছিল কিন্তু কথা কাটাকাটি করতে ওর ইচ্ছে করল না বলে চুপ করে গেল।

অজিত গুপ্ত উঠে গেছল এসে জয়শ্রীকে দেখে গুড-নাইট বলে করমর্দ্দন করলে ও গল্প জমিয়ে তুললে, আর ওদিকে ওর বন্ধুরা ঈর্ষায় ফুলতে লাগল। প্রশান্ত নিজের সিট্‌টা ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর সিট্‌টায় গিয়ে বসলো, বুঝল ওর মত লোকের স্থান ওদের মত বড়-লোকের পাশে নয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যাবার সময় জয়শ্রী ওর জন্মতিথির জন্যে নিমন্ত্রণ করে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে ওর নাম লেখা একখানা কার্ড দিলে। এই ভাবে ওদের আলাপ জমে উঠল। প্রশান্ত ক্রমে জয়শ্রীর মা সতীদেবীর সুনজরে পড়ে গেছল ওর অবস্থা তিনি জেনে নিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল জয়ার সঙ্গে ওর বিয়ে হোক, একটী মাত্র মেয়ে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, প্রশান্ত গরীবের ছেলে হলেই বা সব বিষয়ইত ও পাবে, তিনি কথা প্রসঙ্গে জেনে নিয়েছিলেন জয়শ্রীকে বিয়ে করতে ওর কিছু আপত্তি আছে কিনা ও সলজ্জ হাসির সঙ্গে জানালে ওর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। সুজিত রায়ও ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি করলে না, কিন্তু আপত্তি করলে যে বিয়ে করবে সেই।

সে দিন প্রশান্ত ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতেই আহত ফণিনীর মত ও গর্জ্জে উঠল, কি বললে প্রশান্ত! তোমার সাহসত কম নয় বামন হয়ে চাঁদে হাত! খাবার সংস্থান নেই বাপ অফিসের কেরাণী, তোমার মুখে বিয়ের কথা বলতে বাধল না? কিন্তু অত শুনেও ও নির্লজ্জের মত অনেক কাকুতি মিনতি করলে কিন্তু জয়শ্রী তাকে অপমান করে বাড়ী থেকে বার করে দিলে। ওর বাবা ওকে বললেন কাজটা ভাল করলেনা মা ভারি অন্যায় হল, হলেই বা গরীব—ভদ্র সন্তানকে অপমান করা তোমার উচিত হয়নি। যাক যা হয়ে গেছে, কিন্তু মা আমিও এককালে ওর চেয়ে দরিদ্র ছিলাম, পয়সার গর্ব্ব কখন কোরনা। ওর মন কত যে কত উঁচু ছিল, তা তুমি জানতে পারনি মা।

ও মুখ নীচু করে চলে গেল। মা সতীদেবী মেয়েকে বকে প্রশান্তর জন্য চোখের জল ফেল্লেন। যে মুহূর্ত্তে প্রশান্ত মিঃ রায়ের বাড়ী হতে চলে গেল সেই মুহূর্ত্তে জয়শ্রীর জীবনের অনেক কিছু বদলে গেল, আগেকার মত সে গর্ব্বিত ভাব আর নেই।

প্রশান্ত ওদের বাড়ী ছেড়ে যাবার পরদিন অজিত গুপ্ত বললে, মিস রায় আজ একটা গান হোক। অন্যদিন এ প্রস্তাবটা প্রশান্তই করতো, ও নিরুৎসাহ ভাবে পিয়ানোর সামনে বসলো, প্রশান্ত ওর মন ভেঙে দিয়ে গেছে, অবশ্য সে দোষ তার নয়, ও যে প্রশান্তকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত সে চলে যাবার পর পিতা মাতার কাছে মৃদু তিরস্কৃত হবার পর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিল, ও তাকে কায়মনবাক্যে ভালবেসেছে, আজ ওর হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী একসাথে বিষাদের ঝঙ্কার তুললে, কেবল নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য চিরজীবন যে বিষাক্ত হয়ে উঠবে কে জানত; "পিয়ানোর" ঢাকা খুলে ও বাজাতে লাগল, রীডের ওপর চাঁপার কলির মত আঙুল গুলো যেন নৃত্য করতে লাগল, আর অজিত চারু দেবেশ আরও সকলে মুগ্ধ হয়ে ওর "পিয়ানো" শুনতে লাগল, একটু বাজাবার পর ও গান ধরলে, রবীন্দ্রনাথের একটা পুরানো গান—

এস এস ফিরে এস
বঁধু হে ফিরে এস
আমার ক্ষুধিত তৃষিত চিত নাথ হে
ফিরে এস"

ও মন প্রাণ মিশিয়ে গাইতে লাগল, ওর চেখে জল এসে গেল তবু ও গেয়ে চলল—

"আমার চির বাঞ্ছিত এস
আমার চির সঞ্চিত এস
ওহে চঞ্চল হে চিরন্তন
ভুজ বন্ধনে ফিরে এস।।"

ও বার বার গাইতে লাগল, নিজেকে ও যেন ভুলে গেল, প্রায় পনেরো মিনিট গানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে ও থামল, সকলে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছল। প্রথমে কথা কইলে সতীশ, বললে, চমৎকার আরও কতদিন'ত আপনার গান শুনেছি মিস রায় কিন্তু এত সুন্দর এত চমৎকার আমি কোনদিন শুনিনি। ওর আজ এসব স্তুতিবাদ ভাল লাগছিলনা ও যেন এ সবের মধ্য থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে, ওর বুক যেন জ্বলে যাচ্ছিল প্রশান্তকে যে ও এত ভালবাস'ত ও তা জানত না।

যে কোন ওজুহাতে বিদায় নিতে পারলে ও যেন বেঁচে যায়। সতীশ ওর মুখ লক্ষ্য করে বললে আপনার কি শরীর অসুস্থ? ও বললে, "হাঁ"—সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল, ও ম্লান মুখে বললে আজ আমায় মাপ করবেন আমি অসুস্থ বোধ করছি. সে দিন ওদের কাছথেকে বিদায় নিয়ে ও মুক্তির নিশ্বাস ফেললে।

পূর্ণিমার রাত্রি, জয়শ্রী নিজের বিছানায় পড়ে ছটফট্ করছিল, প্রশান্তকে মনে করে ওর চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু ঝরছিল আর মাত্র এক সপ্তাহ পর ওর সঙ্গে অজিত গুপ্তের বিয়ে।

এমনি এক পূর্ণিমায় প্রশান্ত ওকে প্রণয় নিবেদন করে ওর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, তখন ও ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিল, ওই চাঁপা গাছের তলায় ও তখন দাঁড়িয়েছিল, সেদিনকার জ্যোৎস্না কত সুন্দর ছিল, আজও সেই জ্যোৎস্না, তবু কেন ওর কাছে এত ম্লান দেখাচ্ছে। কে জানত প্রশান্তর জন্য ওর হৃদয়ে এত মধু সঞ্চিত ছিল, সে চলে যেতে সে মধু বিষাক্ত হয়ে গেছে; আনন্দ আজ ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাগান থেকে হাস্নাহানার গন্ধে চারিদিক আকুল করে তুললে, প্রশান্ত ওর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে। ও অস্ফুট স্বরে বললে "ফিরে এস প্রশান্ত ফিরে এস আমার ভুল হয়েছে।" ও বালিশে মুখ গুজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ ও উৎকর্ণ হয়ে উঠলো. আজ তিন চার দিন হলো পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে, তারই মত একটি মেয়ে আছে, সে অর্গ্যান বাজিয়ে গাইছে। নিস্তব্ধ রাত্রি বোধ হয় বারোটা, এত রাত্রে গান গাইছে! ও একটু আশ্চর্য্য হলো, গানের প্রত্যেক কলি ও স্পষ্ট ভাবে শুনতে পেলে মেয়েটী গাইছে—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে

ওর চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা ঝরতে লাগল, ও উৎকর্ণ ভাবে জানালার কাছে গিয়ে শুনতে লাগল—

"মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারে বার
সে জন ফিরেনা আর যে গেছে চলে—
ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে"

জানালা দিয়ে গায়িকাকে দেখা গেল, পাশে একটি যুবক বোধ হয় ওর স্বামী। মেয়েটী গান থামিয়ে হেসে হেসে তাকে কি বলতে লাগল তার মুখে আনন্দের জ্যোতি, সুখের হাসি।

জয়শ্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানালার ধার থেকে সরে এলো। নিজের গর্ব্বিত বাক্যের জন্য—ও আজ তারই বিষে জ্বলে যাচ্ছে, ওঃ যদি প্রশান্তকে মত দিত, তাহলে আজ ও ওই মেয়েটির মত সুখী হত।

মা বাপকে বলেছিল ও বিয়ে করবে না কিন্তু মার চোখের জলের জন্যে ওকে অনিচ্ছা সত্বেও মত দিতে হয়েছে, আগে অজিতগুপ্তকেও চিঠি লিখেছিল, ও বিয়ে করবেনা বিয়ে যেন ভেঙ্গে দেয়, অজিত সে চিঠি সতী দেবীকে দেখিয়ে বলেছিল, আপনি যা বলেন আমি তাই করব অর্থাৎ আপনি যদি বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বলেন ত দেব আর না বলেন ত দেবনা।

যাক জয়শ্রীর প্রবল আপত্তি থাকা সত্বেও এক সপ্তাহ পরে ওর সঙ্গে সিভিলিয়ন মিঃ অজিতগুপ্তের শুভ বা অশুভ পরিণয় হয়ে গেল। জয়শ্রীর বিয়ের ছয়মাস পরে ওর বাবা সুজিত রায় হার্টফেল হয়ে মারা গেলেন, মা সতী দেবী হিন্দুর পরম কাম্য কাশী ধামে চলে গেলেন।

জয়শ্রী শ্বশুর বাড়ীতে রইল, বিয়ের কিছুদিন পর অজিত জানলে জয়শ্রী ওকে ভালবাসেনা, বাসে ওর বন্ধু প্রশান্ত সেনকে, এইজন্য অজিত মাঝে মাঝে ওকে তীব্র বিদ্রূপ করত জয়শ্রীও সব সময়ে সহ্য করতে না পেরে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিত ফলে বাড়ীতে অশান্তি।

যখন অজিত ওকে কোন গান গাইতে বলত তখন ও বেশীর ভাগ সময়েই শুধু সেই দুঃখের গান 'এস এস ফিরে এস' গানটাই গাইত, ও মন দিয়ে গানটা শুনত, তারপর ওকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে অস্থির করে তুলত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় অজিত বাড়ী নেই কোন বন্ধুর বাড়ী ডিনারের নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে জয়শ্রী ছাদের ওপর একখানা সতরঞ্চি পেতে সেতারটা নিয়ে একমনে গাইছে

এস, এস ফিরে এস,
বঁধু হে ফিরে এস

আর ওর অজ্ঞাতে চোখের জলে ওর গাল ভেসে যাচ্ছে। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াল অজিতগুপ্ত। ও তখন জানতে পারেনি, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়শ্রী বললে প্রশান্ত ফিরে এস আমায় ক্ষমা করে যাও, অজিতগুপ্ত একটা হুঙ্কার দিয়ে ওর পিঠে একটা লাথি বসিয়ে দিয়ে যা নয় তাই বলে যেতে লাগল, জয়শ্রী একটা কথাও বললে না অজিত সেই দিনই ওকে তার বাড়ী থেকে বার করে দিল।

ব্যাপারটা একটু নাটকীয় ধরণের সেদিন ওদের বাড়ীতে হয়ে গেছল। জয়শ্রী ওর নিজের বালিগঞ্জের বাড়ীতে চলে এলো, এবং তার পরদিন সব খবরের কাগজে দেখা গেল, স্বনাম খ্যাত ব্যারিষ্টার সুজিতরায়ের কন্যা মিসেস জয়শ্রী গুপ্তা সিভিলিয়ন অজিতগুপ্তের সঙ্গে ডাইভোর্সের মামলা এনেছে। ডাইভোর্স হয়েও গেল। এতটা হোতনা যদিনা সেদিন অজিতগুপ্ত লালপানি বেশী উদরস্থ করে না আসতেন।

এর পর জয়শ্রী কঠিন রোগে পড়ল, উষা শ্বশুর বাড়ী থেকে এসে প্রাণপণ যত্নে ওকে আরোগ্য করে তুললে, হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সুজিতরায় ভবিষ্যতে এই রকম বোধ হয় হবে জেনে সতীদেবীর প্রবল আপত্তি জেনে জয়শ্রীর সঙ্গে অজিতের সিভিলম্যারেজ করে বিয়ে দিয়েছিল, জয়শ্রী সুস্থ হলে পর উষা ওর স্বামীকে নিয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে বজরায় উঠল, কাশী, এলাহাবাদ আরও নানাস্থানে ঘুরে ও সামান্য ভাল হলো বটে, কিন্তু তার চেয়ে ওর অসুখে মারা গেলেই বোধহয় ছিল ভাল, শেষে ও পাগল হয়ে গেল। তার একটু ইতিহাস আছে, গঙ্গার হাওয়ায় সামান্য স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে মধুপুরে এলো। সঙ্গে ওর পিসিমা, উষা আর উষার স্বামী বারীন্দ্র, বাংলোটার নাম কাকলী। সেদিন জয়শ্রী উষা আর বারীন্দ্র হলে বসে গল্প করছে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে প্রত্যেক ঘরে সন্ধ্যা দেবার জন্য উষা উঠে পড়ল, পিসিমা পাশের বাড়ী

বেড়াতে গেছেন, বারীন উঠে এসে বাগানে দাঁড়াল, জয়শ্রী ঘরের কোণ থেকে সেতারটা তুলে নিয়ে ঝঙ্কার তুললে, তারপর গান ধরলে, 'সুখনিশি পোহায়েছে'। বাহিরে বারীন্দ্র নিবিষ্ট চিত্তে গান শুনতে লাগল আর তার অলক্ষ্যে বাহিরে দাঁড়িয়ে আর একটী লোক মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল, তখনও গেয়ে চলেছে—

কোথায় পরাণ বঁধু
এস ফিরে এস গো।
আমার কুটীরে পথ ভুলে
প্রেম কুসুম হার বিফলে শুকায়ে যায়
পরহে পরহে পরহে গলে ॥

লোকটীর চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়ে গেল, সে আর কেউ নয় প্রশান্ত।

এমন সময় দ্রুতপদে উষা বাগান পেরিয়ে একেবারে প্রশান্তর কাছে এসে উপস্থিত। জানালা দিয়ে উষা ওকে দেখতে পেয়েছিল, বারীন্দ্র বিস্মিত হয়ে ওর পিছনে পিছনে আসতে লাগল, উষা প্রশান্তের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে প্রশান্ত দা এসো জয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সে এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, চলে এসো প্রশান্তদা। ও চমকে গেল, তারপর ধীরে ধীরে বললে এখন নয় উষা আর মাস দুই পরে আসবো, তুমি জয়াকে আমার ভালবাসা দিও, ও আর উত্তরের অপেক্ষা না করে একরকম প্রায় ছুটে চলে গেল, উষা বারীন্দ্র ফিরে এলো ওরা কেহই জয়শ্রীকে বলতে পারলেনা যে প্রশান্ত এসেছিল।

তারপর এলো সেই ভীষণ দিন মহালয়া, চাকর তখন ঘরে আলো দিয়ে যায়নি জয়শ্রী বসে বসেছিল, উষা বারণ্ডায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ জয়শ্রী চীৎকার করে উঠল, প্রশান্ত ফিরে এসেছ চলে যেওনা, ক্ষমা করে যাও আঃ আমায় ক্ষমা কর প্রশান্ত। উষা ছুটে ঘরে ঢুকলো, সে ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে, ও বিস্মিত হয়ে গেল এগিয়ে এসে জয়শ্রী পিছনে দাঁড়াল, তখন সে বলছে প্রশান্ত ক্ষমা—মুখের কথা শেষ হবার আগেই ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। উষা, পিসিমা পিসিমা বলে চীৎকার করে ডেকে উঠলো, তিনি ছুটে এলেন, ঝি চাকর সব ছুটে এলো, বারীন্দ্র বাড়ী ছিলনা খানিকপরে বেড়িয়ে ফিরে এলো তখনও ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে, বারীন্দ্র ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ীতে এক ডাক্তার সপরিবারে ভাড়া এসেছিলেন, তাকে ডেকে নিয়ে এলো, ডাক্তার আসবার প্রায় পনেরো মিনিট পরে জয়শ্রীর জ্ঞান হলো, শান্ত উদাস অথচ শূন্য চাহনি, ডাক্তার চলে গেলো। তখন আর কোন কথা ও বলতে পারলে না। উষা রাত্রে ওর পাশে শুয়ে ভাবছে, ওর আর প্রশান্তর কথা। আর বড় জোর প্রশান্তর আসতে দেড়মাস আছে, কিন্তু জয়শ্রী আজ কার সঙ্গে কথা বললে, প্রশান্ত প্রশান্ত বলে চীৎকার করে উঠলো ওর চোখে ঘুম নেই ও অপলক দৃষ্টিতে জয়শ্রীর মুখের দিকে দেখতে লাগল, চাঁদের আলো মুখে পড়ে, তার রোগ পাণ্ডুর শুভ্র মুখখানিকে অপূর্ব্ব করে তুলেছিল, বিষাদ মাখা মুখ। কি পাপ করেছিল যে এজন্মে ওর জীবন এত বিষাদময় করলে ভগবান, অস্ফুট স্বরে উষা বললে, হঠাৎ জয়শ্রী বিছানা থেকে উঠে বসল তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে উঠে গেল, খানিক্ষণ চুপকরে দাঁড়িয়ে থাবার পর ও মৃদুস্বরে গাইতে লাগল—

মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে

ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি, উষা ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারীনকে ডেকে নিয়ে এলো। বারীনও ভয় পেয়ে গেল। বার বার গেয়ে ও থামল।

তারপর যা কথা বলতে লাগল সব তাতে প্রশান্তর নাম আর অসংলগ্ন কথা। বারীন্দ্র উষাকে চুপি চুপি বললে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ও শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, সমস্ত রাত পিসিমা উষা আর বারীন্দ্র জেগে রাত কাটালে।

এরপর জয়শ্রী আরও এক বছর বেঁচে ছিল, সে কোন উপদ্রব করত না শুধু সেতার নিয়ে বাগানে বসে রবীন্দ্রনাথের ফিরে এস গানটা বেশীর ভাগ সময়েই গাইত। উষা মাঝে মাঝে সেতারটা লুকিয়ে ফেলত, তার ধারণা ছিল সেতারটাই যত নষ্টের গোড়া তাই ও মাঝে মাঝে লুকিয়ে ফেলত। সেই সময় জয়শ্রী বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ত। মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, জয়শ্রী পাগল হয়ে গিয়ে সেতারটাকে তেমনি ভালবাসত। সতীদেবী

মেয়ে পাগল হয়ে গেছে শুনে, কাশী থেকে একবার এসে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সফল-কাম হ'ননি, ওকে ট্রেনে কিছুতেই উঠান গেলনা মধুপুরেই ওরা থেকে গেল, উষা ওকে ছেড়ে যেতে পারেনি, মারা যাবার সময়ও, ওর মুখে সেই এককথা "ফিরে এস প্রশান্ত ফিরে এস" শেষ নিশ্বাস যখন ফেলেছে তখন অস্ফুট স্বরে বলেছে "ফিরে এস"।

জয়শ্রী মারা যাবার দুদিন পর, ওরা দুজন—উষা আর বারীন্দ্র বাগানে সন্ধ্যার সময় দু'খানা চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিল, জয়শ্রীর কথাই তারা বলছিল। সন্ধ্যার আঁধারে প্রশান্ত এসে দাঁড়াল, তার মুখে আনন্দের জ্যোতি; এসেই বললে, উষা তোমায় বলেছিলাম, মাস দুই পরে আমি আসবো, আজ আমি লক্ষপতি হয়ে ফিরে এসেছি, জয়শ্রী কোথায়! একদিন সে আমায় দরিদ্র বলে ঘৃণা করেছিল, আজ লক্ষপতি হয়ে আমি বোধহয় তার ঘৃণার পাত্র হবনা, আমি বোধহয় তাকে পেতে পারি! উষা জয়শ্রী কোথায়?

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে, ও উষার দিকে সাগ্রহে তাকাল, বারীন্দ্র, উষার চোখে জল, উষা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, প্রশান্ত বিস্মিত হল, একটা অজানা আশঙ্কায় ওর হৃদয়ে বার বার আঘাত করতে লাগল। বারীন্দ্র রুদ্ধস্বরে বললে, সে নেই প্রশান্ত বাবু আজ দুদিন হলো সে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। প্রশান্ত স্তম্ভিত হল, ওর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গেল ওঃ জয়া। উষা কাঁদতে কাঁদতে বললে সে কেবল এই কথাই বলত প্রশান্ত দা, ফিরে এস প্রশান্ত ফিরে এস, শেষ নিশ্বাস ফেলেছে আপনার নাম করতে করতে। ও আর কোন কথা উষাকে জিজ্ঞাসা করলেনা, শুধু আপনার মনে বললে, জয়া জয়া তবে কার জন্য এসব করলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে যেমন ও এসেছিল, তেমনি ভাবে রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, বারীন উষা চিত্রার্পিতের মত বসে রইল, মাথার উপর লক্ষ লক্ষ তারা তাদের উজ্জ্বল হাসিতে পৃথিবী মৃদু আলোকিত করে তুলেছিল, তখন চারিদিকে নিবিড় নীরবতা, আর অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার।

মীর্ণা থামল, আমাদের ক্লাব ঘর নিস্তব্ধ, প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিজন কথা বললে জয়শ্রী তোমার কে হতো মীর্ণা? কেউ নয়, তবে আমি বারীন্দ্রের বোন। আমি মধুপুরে কাবলীতে গেছলাম কিন্তু থাকতে পারিনি, আমি জয়শ্রীকে অতি আবছায়া ভাবে দেখেছিলাম, চাঁদের আলো উঠলেই আমার মনে হতো বারান্দার উপর বসে জয়শ্রী সেতার বাজিয়ে তার অভিশপ্ত জীবনের গান গাইছে, আমি সে স্বর সহ্য করতে না পেরে কলকাতায় পালিয়ে এলাম; ভাবতাম তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী—ও থামল, ঘড়িতে টং টং করে এগারটা বাজল। আমরা চমকে উঠে পরলাম। আমার কানের কাছে তখন জয়শ্রীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে "ফিরে এস" বাহিরে এসে দেখলাম, মেঘ কেটে গেছে শুভ্র জ্যোৎস্নার হাসি রাস্তাঘাট প্লাবিত করে দিয়েছে, আমার কানের কাছে তখন জয়শ্রীর সেতার ঝঙ্কার দিচ্ছে 'এস এস ফিরে এস—"

মহিলা মজলিস

ভারতীয় নারীর আদর্শ

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী (এরাণ্ডেল)

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাকে অনেকবার ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছে। বিদেশে নারীসমাজের নানাপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। পশ্চিমের নারী স্বাধীনতা কামনা করিয়াছে এবং অনেক পরিমাণে তাহা লাভ করিতেও সমর্থ হইয়াছে। সেখানে নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার চাহে; সেইজন্য কি শিক্ষায়, কি ব্যবসায়ে—সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করিতেছে, অথচ গৃহকর্ম্মেও সে উদাসীন নহে—তথাপি পশ্চিমের নারী সুখী নহে। যতই সে অগ্রসর হইতেছে, ততই যেন সে সুখ হারাইতেছে। ভারতবর্ষে নারী বাল্য-বিবাহ, অকাল মাতৃত্ব, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের কবলগ্রস্ত বটে এবং তাহার দুর্দ্দশার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সে পশ্চিমের নারীর মত এতটা অসুখী নহে তাহার শত লাঞ্ছনা ও দুর্দশার মধ্যেও সে শান্তি ও পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায়, কারণ পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা তাহার আদর্শ নহে। পুরুষের অপেক্ষা উন্নততর পদ সে কামনা করে, কারণ সে মাতা—পরিবার ও সমাজের সে অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুঃখের বিষয় পশ্চিমের সভ্যতার অনুকরণে আমাদের নারীর মধ্যে অনেক পরিমাণে কৃত্রিমতা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অন্তরের সেই মহান আদর্শের স্থলে বাহিরের চাকচিক্যের উপাসনায় সে এখন তন্ময়। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এই নেশা আরও বাড়াইয়া দিতেছে। সস্তা ডিগ্রীর মোহে আমাদের মেয়েরা তাহাদের স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছে। কিন্তু এই শিক্ষা তাহাদের পক্ষ আদৌ উপযোগী নহে; কারণ ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ অনুসারে নিজেকে গঠিত করিতে ইহা আদৌ সাহায্য করে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চরিত্র-গঠনের পক্ষে অনুপযোগী, কারণ তাহাতে ধর্ম্ম শিক্ষা নাই। হিন্দু নারী এই সকল বিদ্যালয়ে তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; তাহার ফলে আমাদের নারীদের মধ্যে ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের নারীত্বের আদর্শ হইতে আমরা কত দূরে চলিয়া যাইতেছি! ভারতীয় নারীর দয়া ও মমতা চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের নারী কেবল নরনারীর দুঃখ কষ্টেই যে ব্যথিতা হয়, তাহা নহে, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষীর জন্যও তাহার মনে করুণা জাগে। আজ এই আদর্শ কোথায়? বিদেশের মোহ আমাদের এতই অন্ধ করিতেছে যে, নির্ব্বিচারে আমরা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া পশ্চিমের আদর্শে তাহার সংস্কার করিতে চাই; কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, পশ্চিমের রীতিনীতি তাহাদের দেশেও সব সময় সুফলপ্রদ হইয়াছে কিনা। আমাদের দেশে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতার উপর—ইহার পরিবর্ত্তে পশ্চিমের অনুকরণে আমরা চাহি পাত্রপাত্রীর নির্ব্বাচনের ভার তাহাদেরই হস্তে দিতে। পশ্চিমের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার সংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, এই আদর্শ ভাল কি না এবং আমাদের দেশে তাহা কল্যাণপ্রদ হইবে কিনা। বস্তুতঃ অনুকরণে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। আমাদের নারী চিরদিন সৌন্দর্য্যের উপাসিকা। এই সৌন্দর্য্যবোধ তাহার পূজার্চ্চনায়, শিল্প-সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত ভাবে এই সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশিত হয় ও জীবনকে শান্তিময় করে। আমরা বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে সুন্দরের উপাসনা ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ভারতীয় নারীকে জ্ঞাপন করা যে, আমাদের সনাতন আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ভারতীয় আদর্শে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মনে-প্রাণে ভারতীয় হইতে হইবে। তবেই আমরা বিশ্ব-সংসারে আদৃতা হইব এবং আমাদের এই আদর্শ অন্যান্য দেশের নারীও গ্রহণযোগ্য মনে করিবে। ইহাই হইবে বিশ্বনারী-সমাজে ভারতীয় নারীর দান।

(পাটনায় মহিলা সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভারতীয় মহিলা সভার কথা

মহিলাদের উন্নতি একটা পৃথক্ জিনিষ নহে। ইহা সমস্ত জগতের জাতীয় জীবনে স্ত্রীলোকের স্থান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। স্ত্রীলোকের স্থান কখনও পুরুষ হইতে পৃথক্ নহে। ইহা জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। মহিলাগণ তাহাদের কষ্টের মুহূর্ত্তে যাহাই মনে করিয়া থাকুন না কেন, ভারতবর্ষে অন্ততঃ পক্ষে আমরা কখনও নূতন কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই আন্দোলন চালাইতে পারি না। এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন পুরুষের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা দেশের মুক্তির জন্য, ইহার উন্নতির জন্য, আইন প্রণয়ন করিব, আদর্শ স্থাপন করিব। ভোটদান, শিক্ষা, উত্তরাধিকারিত্বের

অসমর্থতা এবং স্ত্রীলোকের বৃহত্তর জীবনের সাধনার সমস্ত বিষয়ই আমাদের পাইতে হইবে। শিক্ষা নিজস্ব জিনিষ, ইহা কোন পাঠ্য তালিকার উপর নির্ভর করে না। ইহা প্রত্যেকের আত্মনিহিত শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির পরিস্ফুরণ। আমি বিশেষ কোন সংস্কারের পক্ষপাতী নহি। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের উপযোগী সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

নারী প্রগতি

ডাঃ মালিনী সুখ্‌ঠঙ্কর

ভারতীয় নারীরা এইবার তাহাদের যুগসঞ্চিত বৈরাগ্য যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রপ্রগতির পদক্ষেপ গুণিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। শিক্ষার প্রসার ব্যতীত তাহাদের এই নব জাগ্রত রাষ্ট্র-বোধকে সঞ্জীবিত রাখা যাইবে না। বর্ত্তমানে ভারতীয় নারীদের শতকরা ৩ জন মাত্র কথঞ্চিৎ লেখাপড়া জানে, সুতরাং শিক্ষার প্রসারের জন্য আমাদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে বহুদূরে পিছাইয়া থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া নরনারীর শিক্ষার মধ্যে একটা প্রভেদ থাকাই উচিত। বালিকাদের জন্য বিরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে এই সম্মেলন হইতে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; কারণ তাহার উপরেই নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় নারীর ভবিষ্যপ্রগতি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধেও যাহাতে ভারতীয় নারী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করাও আশু প্রয়োজন হইয়াছে।

সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এক নারী জাতি ব্যতীত যাহারই হস্তে যখন ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেই তাহার অপব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু যখন নারীদের কোনও অধিকার প্রদান করার কথা হইয়াছে, তখনই একদল লোক এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছে যে, নারীরা সেই অধিকারের অপব্যবহার করিবে। ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিলে চলিবে না; সাম্যের অধিকার আমাদিগকে অর্জ্জন করিতেই হইবে এবং প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়াই তাহা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত দেশাই ব্যবস্থাপক সভার নারী প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় নারীদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। এই বিল যাহাতে গৃহীত না হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যদি আমরা ধীরে ধীরে আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারি, তাহা হইলে এইরূপ অবিচার আমাদের ভাগ্যে জুটিবেই।

(বেরার নারীসম্মেলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

আবিসিনিয়ার নারী-বাহিনী

আবিসিনিয়ার সকল বয়সের পুরুষ যেমন রণরঙ্গে মাতিয়াছে, তেমনই সেখানকার নারীদের মধ্যেও উদ্দীপনার অন্ত নাই। রাজমহিষী মেনেন প্রয়োজন হইলে নিজেই রণক্ষেত্রে গমন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও রাজকুমারী সহায় সেবিকারূপে আহতদিগের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন,—শ্রীমতী ওয়েজারো আবিবাথ চারকোজি নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা যুদ্ধে যাইবার জন্য এক নারী-বাহিনীকে প্রস্তুত করিতেছেন। পুরুষদিগের ন্যায় খাকি প্যান্ট, লাল টুপি পরিহিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই নারী-বাহিনী আদ্দিস আববায় সম্রাটকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছিল। দস্তুরমত সামরিক কায়দায় এই বাহিনী যখন সহরের রাস্তা দিয়া কুচকাওয়াজ করিতে করিতে যাইতেছিল, তখন সহরে বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সম্রাট এই নারী-বাহিনীকে সমরক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। অনুমতি লাভ করিয়া শ্রীমতি চারকোজী আপনাকে অত্যন্ত ধন্য মনে করিয়া গর্ব্বোস্ফীত হইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "আমাদের স্বামী, সন্তান, ভ্রাতা পিতা আমাদিগকে যদি শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য মরণ-পণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে সিংহ বিক্রম জাগিবে। সেই অমিত বিক্রমের নিকট প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে।"

শ্রীমতী চারকোজীর নারী-বাহিনীর নামকরণ হইয়াছে "ব্যাটালিয়ন অফ ডেথ" অর্থাৎ মরণপণবাহিনী। এই বাহিনী শিঘ্রই সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। ইহাদের রণক্ষেত্রে উপস্থিত যে হাবসী সৈন্যদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশে পল্লীশিক্ষা বিস্তারের উপায়

শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী

আজকাল দেশে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সকলেই অল্প বিস্তর আলোচনা করিতেছেন। বাংলা দেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে শিক্ষার হার কিছু বেশী হইলেও পাশ্চাত্য দেশ সমূহের তুলনায় কিছুই নহে। বংলাদেশে শিক্ষার আগ্রহ প্রবল হইয়াছে বটে কিন্তু নানাকারণে বিশেষতঃ অর্থাভাবে ইহা আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছেনা।

বাংলা দেশের প্রায় ৫ কোটী নর-নারীর মধ্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ নারী। দেশের এই অর্দ্ধাংশ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিলে কখনই দেশ বা জাতির প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারেনা। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। ঐ শিক্ষার স্থান প্রধানতঃ পল্লীগ্রাম। সহরে পাঠশালা স্কুল প্রভৃতির অভাব নাই, অভাব পল্লীতে। কোন কোন স্থলে ৬।৭ টী গ্রমের জন্য ১টি মাত্র বালক বা বালিকা পাঠশালা দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

বাংলার প্রায় ৯৯ হাজার গ্রামের মধ্যে বালকদের প্রাথমিক স্কুল প্রায় ৪৪ হাজার ও বালিকার ১৮ হাজার। ঐ সব স্কুলে বালক পড়ে সাড়ে ১৭ লক্ষ ও বালিকারা পড়ে ৫ লক্ষ। বালকদের কিয়দংশের পড়া কিছুদূর অগ্রসর হয় কিন্তু বালিকাদের অধিকাংশের পড়া ২।৩ বৎসরের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্য রকমে কমিয়া যায়। যেমন শিশুশ্রেণীতে বালিকা পড়ে ৫ লক্ষ, ২য় শ্রেণীতে ৫০ হাজার ও ৪র্থ শ্রেণীতে ২ হাজার মাত্র। উচ্চ বিদ্যালয়ে কয়েক শত মাত্র থাকে। কাজেই এদেশের শিক্ষার হার যে শোচনীয় হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক বাস করে পল্লীতে। মুষ্টিমেয় সহরবাসী লইয়া দেশ নহে। পল্লী শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত জাতির অভ্যুদয়ের অন্য উপায় নাই। কাজেই পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ও কিছু পরিবর্ত্তন করা উচিত। সকল প্রকার বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী কুটীর শিল্পাদি শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা উচিত। প্রাথমিক উচ্চ বা মধ্য যে বিদ্যালয়ই হোক তথায় পড়িয়া যেন ছাত্র-ছাত্রীরা উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপনের কথা মনে হইলেই শিক্ষয়িত্রীর অভাবের কথা মনে হয়। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার মাতৃজাতির হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত ইহাই বিজ্ঞ শিক্ষা বিদ্‌গণের অভিমত। সহানুভূতি ও স্নেহ মমতা দিয়া ধৈর্য্য সহকারে পড়ান পুরুষদের পক্ষে ততটা সম্ভব নয় যতটা স্বাভাবিক স্নেহময়ী মাতৃজাতির দ্বারা সম্ভব। শিশুদের মধ্যে ও তাহাদের মায়েদের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির ভাব জাগাইতে একমাত্র তাঁহারাই সক্ষম। শিশুর পায়ে ভর দিয়াই জাতি দাঁড়ায়। সেই জন্য উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিশুশিক্ষা দান জাতিগঠনের একটী অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

শিশু শিক্ষাকার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইলে বহু শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই শিক্ষয়িত্রী কোথায়? এদেশের আঠার হাজার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১২।১৩ শত ট্রেনিং পাশ শিক্ষয়িত্রী আছে। আর সমগ্র বাংলা দেশে ইউরোপীয়ান স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সহ মোট শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা ৬৫০০ মাত্র। ছেলেদের স্কুলে ও যখন মেয়েদের দ্বারাই শিক্ষাদান প্রশস্ত তখন বহু শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। মেয়েদের সম্মানজনক উপার্জ্জনের পথ মাত্র ঐ একটীই আছে। বর্ত্তমান অর্থাভাব ও বেকার সমস্যা প্রভৃতির জন্য বহু মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা প্রভৃতি সহরে আগমন করিতেছেন, সহর ব্যতীত অন্যত্র ঐ ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই। কলিকাতায় শিক্ষালাভ করা বহু ব্যয়সাধ্য। এখানকার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিয়া, বৈদ্যুতিক আলো, কলের জল প্রভৃতির সুবিধা ভোগ করিয়া ২।৪ বৎসর অন্তে যখন তাঁহারা ট্রেনিং পাশ করিয়া বাহির হন তখন আর তাঁহাদের পল্লীর সেই কাঁচা ঘর, কুয়া বা পুকুরের জল, তেলের বাতি প্রভৃতিতে মন উঠেনা। সেই জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীগণ—পল্লীগ্রামে যাইতে রাজী হননা। যাহারা ও বা দায়ে ঠেকিয়া যান তাঁহারাও সহরে কাজের সুযোগ পাইবামাত্র চলিয়া আসেন। যে কাজ অন্তরের সহিত গ্রহণ করা না যায় তাহা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

হয়না। আর সহরের বিলাস ব্যসনে অভ্যস্থা শিক্ষয়িত্রীর আদর্শ তরল মতি বালিকাগণের চিত্তকে ঐ দিকে আকৃষ্ট করে। তাহা পল্লীর বা দীনদরিদ্র জাতি গঠনের পক্ষে অনুকূল নহে।

এইজন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের বিদ্যালয় ও ট্রেণিং স্কুল সমূহ পল্লীগ্রাম স্থাপন করিয়া মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। ঐ সব বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগিতা ও প্রাণবান কর্ম্মীর অভাব হেতু পল্লীগ্রামে যদি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব না হয় তবে সহরেই সাধারণ ভাবে রাখিয়া অল্প সময়ে ও অল্পব্যয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। পল্লীগ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, সুবিধা অসুবিধা বিষয় আলোচনা করিয়া যাহাতে তাহাদের মনে পল্লীপ্রীতি জাগরিত হয় ও তথায় শিক্ষাদানের আগ্রহ জন্মে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। তবেই তাঁহারা পল্লীগ্রামে গিয়া এ গঠনমূলক কার্য্যের সহায় হইতে পারিবেন। তাঁহাদের বিলাসব্যসনের অভ্যাস না থাকায় অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া পল্লীর সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধার মধ্যে নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাদের শিক্ষার গুণে পল্লী বালিকাদের অল্পকালব্যাপী শিক্ষার সময়টুকুতেই শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে সুমাতা সুগৃহিণী করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই কার্য্য দ্বারা দেশের মহা উপকার সাধিত হইবে।

সাধারণতঃ বাল বিধবা মেয়েদের লইয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। কুমারী ও সধবা মেয়েদের জীবনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহাদের ঘর সংসারের কাজের ও শিশু পালনের নানা কর্ত্তব্য আছে কিন্তু হিন্দু বিধবাদের সেসব কিছুই নাই। জীবনের সকল আশা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা দুঃখময় জীবন যাপন করেন। মেয়েদের আইনানুসারে ধনাধিকার না থাকায় ইহারা সমাজ ও আত্মীয় সজনের গলগ্রহ স্বরূপা, কর্ম্ম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অকর্ম্মণ্য নামে অভিহিতা, আত্মীয় স্বজনদের সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাদের মনোরঞ্জনে অসমর্থ। পূর্ব্বে যখন যৌথ পরিবারের বন্ধন সুদৃঢ় ছিল, তখন সংসারে ইহাদের বিশিষ্ট স্থান ছিল ইহাদের সম্মান ও ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে সংসারের সকলের কল্যাণ সাধন করিতেন। আজ বন্ধন শিথিল ও সকলেই নিজ নিজ পুত্র কলত্রের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত। আবার বেকার সমস্যার দরুণ অর্থাভাবে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই পরিবারস্থা বিধবাগণের উপযুক্ত ভরণ পোষণ করিতে পারেন না। সেইজন্য সমাজের ভারস্বরূপা অবজ্ঞাতা ঐ মেয়েদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে একদিকে যেমন তাঁহারা স্বাবলম্বিনী হইয়া নিজের জীবিকার্জ্জন ও প্রয়োজন হইলে সংসারের অভাব মোচন করিতে পারিবেন, আবার কর্ম্মহীন জীবনে কর্ম্ম পাইয়া নিজেদের দুঃখ বেদনা ভুলিয়া যাইবেন অপর দিকে তেমনি অল্পব্যয়ে দেশ ও স্থায়ী শিক্ষয়িত্রী পাইলে, বিশেষ করিয়া দরিদ্র পল্লীর ভাগ্যে শিক্ষয়িত্রী জুটিবে।

এই সব কারণে দেশে বহু অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এই বিষয়ে চিন্তাশীল সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্র মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বার্ষিক ৪৮ হাজার টাকা আয়ের যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন সেই টাকার কিয়দংশ দ্বারা যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় বা ঐ প্রকার প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য দ্বারা বহু সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা হয় তবে সত্যসত্যই ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করাতে দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

স্নিগ্ধ বনানীর বিহঙ্গিনী আমি

শ্রীচারুপ্রভা বসু

স্নিগ্ধ বনানীর বিহঙ্গিনী আমি,
মুক্ত আকাশ বাসি যে ভাল।
সোনার খাঁচায় রহিতে না পারি,
ভালবাসি সদা চাঁদের আলো।
বেজে উঠে যবে প্রলয় বিষাণ
ঢাকে সারা ধরা নিকষ কালো,
সে ঝড়ের সাথে নাচিয়ে বেড়াই
হৃদয়ে জ্বালিয়া প্রেমের আলো।
চলে মেঘ-তরী তুলি নীল পাল
চপলা চমকে আকাশে হাসি;
বিমুগ্ধ নয়নে চাহি তার পানে
আপনা ভুলিয়া আকাশে ভাসি।

ছায়ার কথা

শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্ক ভাগ্যচক্র:—লেখক—পণ্ডিত সুদর্শন (ইনি পূর্ব্বে অনেক হিন্দী সিনারিও রচনা করিয়াছেন)।

গল্পাংশঃ—ছোট ভাই শ্যামলাল ভুল বুঝিয়া একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র দিলীপকে গোপনে সরাইয়া ফেলিল। সেই ছেলে কুড়াইয়া পাইল অন্ধগায়ক সুরদাস। কেহ লইতে আসিল না দেখিয়া, সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া সে মানুষ করিতে লাগিল ছেলেটিকে। নাম দিল—দীপক। এদিকে শ্যামলাল নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া দীপককে ফিরাই-বার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিল।

কুড়ি বৎসর পরে। দীপক এখন বিখ্যাত রেডিও গায়ক—পড়িল মীরার প্রেমে। ধনীকন্যা মীরার মার ইচ্ছা মীরার বিবাহ হয় তাঁহার মনোনীত পাত্র মিঃ রায়এর সঙ্গে। কিন্তু মীরা ও দীপক মোটারে পলাইল।

দীপককে হারাইয়া এদিকে সুরদাস উন্মত্ত। যে দীপকের জন্য সে থিয়েটারে অভিনয় করিত, তাহা সে ছাড়িয়া দিল। থিয়েটার বন্ধ হয় দেখিয়া ম্যানেজার সুরদাসের বাড়ী গিয়া বলিল যে, সে সুরদাসেরই জীবন-কথা অবলম্বনে একটি নাটক লিখিয়াছে; সেই নাটক যদি দেশে দেশে অভিনয় করিয়া বেড়ানো হয় ও সুরদাস যদি তাহাতে প্রাণ দিতে পারে, তাহা দেখিলে কি দীপক ফিরিয়া আসিবে না? উন্মত্ত সুরদাস যেন শান্ত হইল। বলিল, তাই।

এদিকে মোটারে দীপক ও মীরা চলিয়াছে—পিছনে গোয়েন্দারা। ঘটিল মোটার দুর্ঘটনা।...দীপক সুস্থ হইল বটে কিন্তু তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। মীরাকেও আর সে চিনিতে পারিল না।

কিন্তু সুরদাস? তাহার বুকফাটা ক্রন্দন, তাহার অন্তরগলানো চোখের জলের কি কোন মূল্য মিলিল না?

\+ \+ \+

গল্পাংশ সুন্দর—আর আনন্দের কথা বইখানিতে গল্পের পরিস্ফুটনও হইয়াছে সুন্দর। অভিনয় ত বই-খানির সম্পদ বলিলেই হয়। প্রত্যেক অভিনয়টিই প্রায় ভাল ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্ধগায়ক কৃষ্ণবাবু, সঙ্গীতে আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি বিস্মিত করিয়াছেন অভিনয়ে। তিনি যে এক-জন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। শ্যামলালের ভূমিকায় দেখা দিয়াছেন—বিশ্বনাথ। তাঁহার মুখে আমরা বেশী কথা শুনি নাই কিন্তু তাঁহার ভাবপূর্ণ অভিনয় আমাদের সুন্দর লাগিয়াছে। মিঃ রায়ের ভূমিকায় দুর্গাদাস বাবুর type অভিনয়টুকু আমরা উপভোগ করিয়াছি। দেব-বালার মীরার মা, অমর মল্লিকের ম্যানেজার, নিভাননীর পরিচিরমা আমাদের বেশ লাগিয়াছে এমনকি পুস্তক বিক্রেতা ডিটেকটিভদ্বয় ও কুগায়ক (অহি সান্ন্যাল) ও এক কথায় চমৎকার! ছেলের দীপক, পরিচারিকা ও শ্যামলালের ভ্রাতা মন্দ হয় নাই এবং পাহাড়ী সান্ন্যালের দীপকের ভূমিকায় গানগুলিও বেশ! দীপকের অভিনয়ও মোটের উপর ভালোই! মীরার ভূমিকায় উমাশশীর অভিনয় উপভোগ্য, গানও মন্দ না: কিন্তু আমাদের মনে হয় এখন হইতে তাঁহার slimming practice করা উচিত। বইখানি সেটগুলিতে আধুনিকতার ও বিদেশী ছাপের অভাব নাই, এমনকি মীরার গান গুলিতে পর্য্যন্ত তাহার ছায়া পরিলক্ষিত হয়। বই একটু দীর্ঘ তবে নিজেরই গুণে তাহা দুঃসহ মনে হয় না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইতালী আবিসিনীয় সমর

আবিসিনিয়ার রণাঙ্গণের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমাবস্থায় যেমন দ্রুত গতিতে ইতালী আবিসিনিয়ার প্রদেশের পর প্রদেশ একরকম বিনা বাধায়ই দখল করিয়া যাইতেছিল এখন আবার তেমনি দ্রুত গতিতে সে সব স্থান হইতে হটিয়া যাইতেছে খবর আসিতেছে। ইতালী আবিসিনিয় যুদ্ধের বিস্তৃত খবর পাওয়া দুষ্কর—যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যেও কতটা সত্য তাহা বোঝা যায় না। তবু এই সব খবর হইতেই যতটুকু বোঝা যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিত ইতালী তাহার আকাশ-যান, বোমা ও মারাত্মক গ্যাস প্রভৃতি লইয়া যত সহজে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমরসজ্জাহীন বর্ব্বর আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিতে গিয়াছিলেন তত সহজে তাহারা তাহা পারিতেছেন না—বরঞ্চ অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে ইতিপূর্ব্বেকার ইতালী অবিসিনিয়ার যুদ্ধে অবিসিনিয়ার হাতে ইতালীর যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল বর্ত্তমান সমরেও তদ্রূপ লাঞ্ছনারই পুনরভিনয় হইতে পারে। তারপর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতালীর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও ইতালীতে মহা বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ইতালী পেট্রল, তৈল, খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধের বিবিধ উপকরণ যদি নানাদেশ হইতে না পায় তবে অদূর ভবিষ্যতেই তাহার মহা সঙ্কট উপস্থিত হইবে। ইতালীর এবং আমদানী রপ্তানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন রাজ্যই করিবেন না ইতালীর প্রতি এই শাস্তি ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য ইতালীর পক্ষেও যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরের দু'একটি রাজ্য নাই তাহা নহে—কিন্তু তাহাতে ইতালীর কতটা কি সুবিধা হইতে পারে বোঝা যাইতেছে না। ইতালী এ সঙ্কট হইতে পার পাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহা বলা যায় না। একদিকে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের খরচ যোগানো অন্যদিকে রাষ্ট্র সঙ্ঘের শাসন হইতে ঘর ও বাহির সামলে চলা ইতালীর পক্ষে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে—ইহার পরিণতি কি হইবে তাহা দেখিবার জন্য সকল দেশের রাজনৈতিকেরাই উদগ্রীব আছেন।

যুদ্ধ ও স্বদেশ প্রেম

সহস্র অসুবিধার মধ্যে ইতালীর ও আবিসিনিয়ার সৈন্যগণ যে ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়িতেছে ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে তাহাতে দু'পক্ষের সৈন্যদেরই প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু ইতালীয়েরা গিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পরের রাজ্য ও স্বাধীনতা অপহরণ করিতে আর আবিসিনিয়ানরা বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত না হইয়াও তাহার প্রতাপের কাছে করযোড়ে বশ্যতা স্বীকার না করিয়া প্রাণ দিয়াও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়িতেছে—এজন্য জগতের সহানুভূতি আবিসিনিয়াই আকর্ষণ করিতেছে।

ইথিওপিয়ার পুরুষ, নারী, দলপতি, সম্রাট সম্রাজ্ঞী সকলেই এইরূপ স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। ইথিওপীয়ান প্রত্যেক সৈন্যের মুখেই এই কথা—'আমরা সিংহ এবং সিংহেরই সন্তান সব আমরা শত্রু দেখে ভয় পাই না—সে শত্রু এরোপ্লেন বা ট্যাঙ্ক যাই নিয়ে আসুক না কেন। আমরা জয়ী হয়েই ফিরবো—না হয় আমাদের মাংস শকুনে খাবে।'

সৈন্যদের মুখে এই স্বদেশ প্রেমের কথা শুনিয়া সম্রাট বলেন—'সম্রাট যুদ্ধ চাহেন না কিন্তু ইতালীয়েরাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছে। নিওমোনিয়া বা জ্বরে একদিন আমাদের সকলকেই মরিতে হইবে—কিন্তু তার চেয়ে দেশের জন্য মরাই শত গুণে ভাল। ইতালীয়েরা তোমাদের মেশিনগান দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করিবে—তাদের মেশিনগান আছে—কিন্তু আমাদের পক্ষে ভগবান আছেন। ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের পিতৃভূমি রক্ষার জন্য

আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া নিজের শোণিত দিব।'

ইতালী যাহাদের অসভ্য বর্ব্বর আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে সেই আবিসিনিয়ার স্বদেশ প্রেম দেখিয়া জগত মুগ্ধ হইতেছে।

—•—

পরলোকে মনোমোহন পাঁড়ে

মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় আর ইহজগতে নাই। ইনি সাহিত্যিক ৺ বীরেশ্বর পাঁড়ের পুত্র ছিলেন। মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারের সত্বাধিকারী ছিলেন, ইনি—মনোমোহন থিয়েটার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গ্রহণ করিলে ইনি থিয়েটারের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করেন। থিয়েটারের মালিকরূপে এত পয়সা বাংলার আর কেহই উপার্জ্জন করিতে পরেন নাই। কবিরাজ যামিনী ভূষণ ইহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন—যামিনী ভূষণের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্মৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ভবনের প্রায় সম্পূর্ণ ভারই ইনি গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার দান অতুলনীয়। কাশীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ইনি নিজ পিতার নামে বিরাট ধর্ম্মশালা প্রায় দুইলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাহা পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহার আরো বহু দান আছে। এমন কর্ম্মী দানশীল লোকের মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার স্বজনদের সমবেদনা জানাইতেছি।

দেশের অবস্থা

এবার পূর্ব্ববঙ্গে শস্যাদি ভাল হইবার খবর পওয়া যাইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ—বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের যে খবর পাইতেছি তাহা অতি ভয়াবহ। বন্যার সময় তাহারা শস্যাদি বপন করিতে পারিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার পর মোটেই বৃষ্টি না হওয়াতে ক্ষেত সব জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কৃষাণ ও গৃহস্থেরা সম্বৎসর যে খরচা করিয়া আসিয়াছিল উৎপন্ন শস্য হইতে তাহা পাইবে এবং তার উপর লাভও কিছু পাইবে আশা করিয়াছিল কিন্তু এখন দেখিতেছে যে তাহাদের পেটের খোরাক ও গরুর খোরাকই জুটিবে না। ক্ষেতে শস্য, পেটে অন্ন না থাকিলে দেশে চুরী রাহাজানী বৃদ্ধি পাইবে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে কত লোকজন মরিবে। দেশে জলকষ্টেরও সূচনা দেখা গিয়াছে। আমরা দেশের অবস্থা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি।

হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ

ডাঃ আম্বেদকর সম্প্রতি হিন্দুদের ভয় দেখাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার হরিজন দলবল সহ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। ডাঃ আম্বেদকরের এই ঘোষণায় সব ধর্ম্মের উপরেই যেন একটা বোমা পড়িয়াছে। হিন্দু সমাজপতিরা তাঁহাকে দলে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন—আর সকলেই তাঁহাকে দলে পাইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। ডাঃ আম্বেদকর হিন্দু ধর্ম্মে হরিজন ভাবে থাকিয়া কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিতে পারিয়াছেন—অন্য ধর্ম্মে গেলে আর সে সুবিধা পাইবেন কি? বর্ত্তমান যুগে নিজ নিজ ক্ষমতায় অধিকার অর্জ্জন করাই ভাল—তাহাতে পথে বাধা বড় কেহ সৃষ্টি করেনা—কিন্তু কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য কোন ভাবে কোন সুবিধা আদায় করিতে গেলে সে সম্প্রদায় তাহা পাইলেও তাহাদের খাটো হইয়া থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলার পাঠ্য

কলিকাতার কোন কোন মুসলিম সমিতি নাকি বাংলা দেশের মুসলমানদের জন্য উর্দ্দু ভাষা পাঠ্য করিতে চাহেন। মুসলমান হইলেও বাংলার মুসলমান বাঙ্গালীই—তাহারা বাংলা ভাষাই শিখিবে। এবং বাংলা দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলাতেই কথা কহিয়া থাকে—উর্দ্দু কেহ সখের খাতিরে শিখিতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে মুসলমানদের জন্য উর্দ্দু চালাইয়া মুসলমান সমাজ কি লাভবান্ হইবেন আমরা বুঝিতে পারি না।

বাদ্য সমস্যা

মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজান লইয়া হিন্দু মুসলমানে এতাবৎ বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে—কি কুক্ষণেই রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কেহ কেহ এই সমস্যা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদের এ্যাড-

ভোকেট মিঃ জাফর আহমেদ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন—'মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোয় আমার সমধর্ম্মীরা আপত্তি করেন তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতায় আমি লজ্জিত হই—নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহারা হিন্দুদের তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দিবেন না। ইসলাম ধর্ম্ম অমুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা করিতে বা তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে উপদেশ দেয় নাই। হজরত মহম্মদ যখন প্রার্থনা করিতেন তখন তাঁহাকে প্রায়ই ঠাট্টা করা হইত, গালি দেওয়া হইত, পীড়ন করা হইত কিন্তু তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করিয়া পীড়নকারীদের ক্ষমা করিবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন। হজরত আলি প্রার্থনা কালে এত নিবিষ্টচিত্ত হইতেন যে তাঁহার অপর কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকিত না। আমাদের মধ্যে যাহারা নামাজের সময় বাদ্যে আপত্তি করেন তাঁহাদের প্রার্থনায় এমন ভাবে নিবিষ্ট হওয়া উচিত যে বাহিরের বিষয় ভুলিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের আচরণে ইসলামের ক্ষতি করিতেছেন কারণ ইসলাম ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়।'

বিলাতের নির্ব্বাচন

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে। এবারেও রক্ষণশীল দলই বেশীর ভাগ আসন পাইয়াছেন। শ্রমিকদলের অবস্থা এবারও আশাপ্রদ নহে। ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বহু ভোটাধিক্যে শ্রমিক সঙ্ঘের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, অথচ এই ম্যাকডোনাল্ডই ছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বেও শ্রমিক দলের একচ্ছত্রাধিপ। রক্ষণশীলদলের কেহ আসন ছাড়িয়া দিয়াও নাকি ম্যাকডোনাল্ডকে পার্লামেন্টে নেওয়ার চেষ্টা হইতেছে—কিন্তু শোনা যাইতেছে তাহাতেও সুবিধার আশা কম—এখন একমাত্র লর্ড করিয়া দিয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে মন্ত্রী সভায় লওয়া যাইতে পারে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বাহিরের অনেকে অনেক রকম হেতু ধার্য্য করিতেছেন—ম্যাকডোনাল্ড নিজে কি ভাবেন এ সম্বন্ধে তাহা হয়তো কোন দিন তাঁহার স্মৃতি কথা হইতে জানা যাইতে পারে।

ভোটে নারী

বিলাতী পার্লামেন্টে এবার ৬৭জন নারী নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন অথচ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মাত্র ৭জন কিন্তু ভোটারের সংখ্যা নারীই অধিক। নারীই অধিক সংখ্যক ভোটার অথচ নির্ব্বাচনে নারী খুব কম জয়ী হন ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। এ অবস্থা আরো কত কাল চলিবে?

রাজবন্দীদের কৃষি শিল্প শিক্ষা

সরকার হইতে রাজবন্দীদের কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া বাংলার লাট কিছুদিন পূর্ব্বে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দমদমের নিকট এই উদ্দেশ্যে ৫০০ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে এবং তথায় রাজবন্দীদের থাকিবার জন্য ঘর বাড়ীও তৈরী হইতেছে—শিল্প শিক্ষার জন্যও কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করা হইতেছে প্রকাশ। এইরূপ কার্য্যে রাজবন্দীদের নিয়োগ করিয়া এবং পরে ইহার সুবিধা সুযোগ আরো ব্যাপক ভাবে দেশের ইচ্ছুক যুবকদের দিতে পারিলে সুবিধাই হইবে মনে হয়।

ভারতের সামরিক বিদ্যালয়

নাসিকে সামরিক শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ডাঃ মুঞ্জে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য বহু অর্থ তিনি উঠাইয়াছেন আরো অর্থের প্রয়োজন। একার্য্যে গবর্ণমেন্টেরও যে সহানুভূতি আছে তাহা প্রধান সেনাপতি সার ফিলিপ চেটউডের পত্রে জানা যায়। তিনি এ কার্য্যের জন্য ডাঃ মুঞ্জেকে একশত টাকা সাহায্য দিয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে সামরিক শিক্ষালয় বিস্তৃত হয় তেমন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে সামরিক শিক্ষা যে অতি আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন—বাংলায়ও এরূপ শিক্ষালয় স্থাপনের চেষ্টা কর্ত্তব্য। তবে ইহা ষ্টেটের সাহায্যেই হওয়া উচিত।

কংগ্রেসের প্রভুত্ব

কংগ্রেসের প্রভুত্ব কোন দল লইবে ইহা লইয়া বাংলায় তো কথাই নাই অন্যান্য প্রদেশেও এখন রেশারেশি চলিতেছে—প্রভুত্ব লইয়া রেশারেশি যত প্রবল হইতেছে কংগ্রেসের কার্য্যপন্থাও ততই ধামাচাপা পড়িতেছে। এখন অনেকের মুখেই ইহাদের ঝগড়ার কথা শুনি—কে ভাল কে মন্দ ইহা লইয়া আলোচনা শুনি—কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্য কোন দল কতটা আগাইয়া দিতেছেন বা ব্যক্তিবিশেষেই বা ইহার জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন সে কথা কাহারও মুখে বড় শুনি না। বাস্তবিক প্রাধান্যলাভের এ উত্তেজনার মধ্যে সত্যকাজের কথা কাহারও বিশেষ মনে থাকিবার কথাও নয়—এরূপ অবস্থা আর কতদিন চলিবে?

—০—

কাঁকড়া বিছার কামড়ের ঔষধ

কাঁকড়া বিছার কামড় বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক, অথচ ইহার সত্যি ঔষধ যে কি তাহাও বলা দুষ্কর। সম্প্রতি অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম-এস-নারয়ণ মহাত্মা গান্ধীকে ইহার এই ঔষধ বলিয়াছেন যে লবণ জল দুইচোখে দিলে ইহার যাতনার উপশম হয়। লবণ জলে এভাবে মিশাইতে হয় যে তাহাতে আর বেশী লবণ দিলে গলিয়া যায় না। ঐ ভাবে একদিন রাখিয়া পর দিন সেই জল শিশিতে রাখিতে হইবে। তিনবার এই ঔষধ চোখে দিলেই যন্ত্রণা যাইবে। কাঁকড়া বিছার উপদ্রব যেখানে বেশী সেখানে সকলেই ইহা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে পারেন।

—০—

পরলোকে কালীমোহন বসু

দুদিন আগেও যিনি হাসি মুখে কাছে আসিয়াছেন, হাসি আনন্দে নানা কাজের কথায় গল্পে গুজবে যে টুকু সময় কাছে থাকিতেন মনের সব ভার দূর করিয়া মনকে হাল্কা করিয়া দিয়া যাইতেন সেই প্রিয়দর্শন প্রৌঢ় সুহৃদ সম্মিলনী সম্পাদক কালীমোহন বসু আর ইহলোকে আর নাই। গত লক্ষ্মীপূর্ণিমা রাত্রে নাটার সময় দুরন্ত বেরিবেরিতে আক্রান্ত হইয়া কালীমোহন বাবু পর পারেরযাত্রী হইয়াছেন। বেরিবেরিতে অনেকস্থানেই বহু সংসার বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে—কালীমোহন বাবুর সংসারেও তাহার একটী নিদারুণ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পঁচিশ দিন আগে তাঁহার ১৬বৎসরের মেয়েটি ঐ রোগেই মারা যায়। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলকুমারকেও ঐ রোগের আক্রমণে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাহার পরেই কালীমোহন বাবুর মৃত্যু হয় এবং কালীমোহন বাবুর মৃত্যুর পাঁচদিন পরেই তাঁহার পত্নীও ঐ রোগেই পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মল তখনো হাসপাতালেই শয্যাশায়ী পিতামাতার মৃত্যু সংবাদও জানিতেন না। দু'টি শিশুপুত্র মাত্র বাড়ীতে ছিল। একটা সংসারের উপর দিয়া কালচক্রের এমন নির্ম্মম পেষণ খুব কমই দেখা যায়। মৃত্যুকালে কালীমোহন বাবুর বয়স হইয়াছিল ৫৮ বৎসর ক'মাস। সম্মিলনীর জন্য তিনি উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিতেন। কাগজের যাবতীয় প্রুফ দেখা, লেখা সাজান হইতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ পর্য্যন্ত সবই তাঁহাকে করিতে হইত। বাজে কথায় বা বাজে আড্ডায় সময় নষ্ট করিতে তাঁহাকে বড় দেখা যাইত না। তাঁহার উপস্থিতি সব সময় সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রীতিপদ হইত। এই সম্মিলনীই ছিল তাঁহার সংসার পোষণের উপায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলকুমার সম্প্রতি হাসপাতাল হইতে ফিরিয়াছেন এবং অনেকটা সুস্থ—সম্মিলনী তাহারই পরিচালনায় আবার রীতিমত বাহির হইতেছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমরা সদা হাস্যময় নির্ম্মল শুদ্ধ অন্তঃকরণ বন্ধু কালীমোহনবাবু ও তাঁহার পত্নীর আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি—ও তাহার স্বজনদের এই মহাশোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

—০—

গ্রন্থ-পরিচয়

'প্রসন্নরাঘব নাটক' কবি জয়দেব প্রণীত প্রসন্নরাঘব নাটকের সংস্কৃত হইতে শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ ২।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। প্রসিদ্ধ জীবনচরিতকার শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ মহাশয় প্রকাশকের নিবেদনে বলিতেছেন—'কবি জয়দেব প্রণীত 'প্রসন্নরাঘব নাটক' এর কোন বঙ্গানুবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

'অতি সুললিত যাঁর বচন বিলাসে
অনুপম মধুরস অবিরত ঝরে'—

সেই মহাদেব-সুত সুমিত্রা-গর্ভজাত কৌণ্ডিন্য জয়দেব প্রণীত শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিকী কীর্ত্তিকাহিনী-সম্বলিত এই নাটকখানির বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিবে এই আশায় উহা প্রকাশিত হইল।'

সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ বাংলায় হইলেও এখনো বহু বাকী আছে—এই অনুবাদ কার্য্য যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। গ্রন্থকার প্রাচীন—অনুবাদও যথাসম্ভব মূলানুযায়ী বাংলারই করা হইয়াছে। যাহারা সংস্কৃত গ্রন্থের রসাস্বাদনে ইচ্ছুক অথচ মূল সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠে সুখী হইবেন—যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারাও দেখিতে পারেন এ অনুবাদ কেমন সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল—রসগ্রাহী পাঠক পাঠিকাদের নিকট প্রসন্ন রাঘবের সমাদর হইবে আশা করি।

আর্য্যশক্তি শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক টাকা। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের পরিচয়ে বলিতেছেন 'এই সুললিত কবিতা গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় লইয়া ১৬টি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের ষড় দর্শনের তাৎপর্য্যবিদ্ এবং ইতিহাসজ্ঞ নহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না।...বর্ত্তমানের জড়বাদ যান্ত্রিক সভ্যতা ও ভোগমূলক কূটনীতি, যাহা রাজনীতিক্ষেত্রে মনুষ্যত্বে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছে কবিতার মধ্যে গ্রন্থকার তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।' বসু মহাশয় গ্রন্থের পরিচয়ে যাহা বলিয়াছেন আমরা সে বিষয়ে একমত। যে সব ভাবধারাকে তিনি গালি দিয়াছেন তাহাকে এড়াইয়া চলিবার উপায়ও হয়তো আজকালের দিনে নাই—তাই গ্রন্থকারকে কেহ সেকেলে বলিতে পারেন। যাহা হউক গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

—০—

রাতের ফুল (উপন্যাস)—শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী প্রণীত। দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে কর্তৃক ৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—একটাকা মাত্র। মহিলা লেখিকাদিগের মধ্যে শ্রীমতী পূর্ণশশী সুপরিচিতা—তাঁহার লেখার সঙ্গে অল্প বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে। আমরা এ-উপন্যাসখানি পাঠ করিলাম—এই উপন্যাসের ভিতর দিয়া যে সমস্ত যুবক-যুবতীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ ঘটিয়াছে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জগতের পূর্ব্বপরিচয় থাকিলেও ইহাদের যেন নূতন ভাবে পাঠক পাঠিকার কাছে পরিচয় করা হইয়াছে। আজ-কালকার উপন্যাস পড়িতে পড়িতে মনে হয়—ইহা আধুনিকতার একঘেয়ে প্রেম রসে আপ্লুত, তাহাতে না থাকে ভাবিবার কিছু, না থাকে সমাজ-সংসারের কোন কাজের কথা। যে সাহিত্য সমাজকে, জাতিকে বা দেশকে কিছু নূতন ভাবে দিতে পারে না, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়। একথা বলিতে যাইবার আর কিছু কারণ নাই, বলিলাম শুধু এই ভাবিয়া যে, শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী আমাদের এই ভাবনা এই উপন্যাসে কতকটা দূর করিয়াছেন। যে যুবক তাহার প্রেম পাত্র শূন্য করিয়া সেই পথে-কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে প্রেম দিয়াছিল, তাহা চিরস্থায়ী হয় নাই, হইতে পারে না। হিন্দুর বিবাহ বা মিলন যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যই সনাতন—সেই সত্যই খাঁটি—লেখিকা বোধ হয় সেই ভাবকেই কেন্দ্র করিয়া এইটুকু প্রমাণ করিয়াছেন।—সেজন্য হিন্দুর আদর্শ ঠিক রাখিয়াছেন।

বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এ নয়, তবে মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয় উপন্যাসখানি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানের কথোপকথন থিয়েটারি ঢংএ বলা হইয়াছে—লেখিকা যেন স্মরণ রাখেন যে, ও জিনিস আজকাল আর আদর পায় না। যতটা সাধারণ ভাবে আমরা কথায় বলিয়া থাকি. তাহার বেশী ভণিতা করিতে যাওয়াই লেখক লেখিকার দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করে।

উপন্যাসের প্রচ্ছদপট. বাঁধাই এবং ছাপা খুব সুন্দর হইয়াছে—বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া সত্যই মনে তৃপ্তি পাইলাম। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম—কোন স্থানে এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে একটি বানান ভুল বা কোন রকম মুদ্রাকর প্রমাদ পরিলক্ষিত হইল না—এই জন্য আমরা এই উপন্যাসের প্রকাশককে ধন্যবাদ দান করি।

পুস্তকের কাগজ বাঁধাই—সমস্তই বিলেতী ধরণের, সে তুলনায় মূল্য কমই বলিতে হইবে। আমরা এই উপন্যাসের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকন্দর্প দত্ত রায়

স্বপনে

শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস

কোন্ সুদূরের স্বর্গ হইতে এলে তুমি আজ গোপনে
চির জীবনের গভীর আঁধার ঘুচালে এ মধু-লগনে।
পরাণমুক্ত চামেলীর সুধা মোর বাতায়ন পথে,
আনিছে বহিয়া দখিনা মলয় উষার কাকলী সাথে।

বনবীথি পথে, মিলনের রথে কাহার মূরতি রাজে
অসীম যে আজি সীমার বাঁধনে ভুবন ভুলান সাজে।
জলদের পাশে বিজলীর আলো শিহরণ লাগে নয়নে,
সুপ্ত মানসে নবীন চেতনা শ্যামল সাহারা স্বপনে।



৯ম বর্ষ | পৌষ, ১৩৪২ | ৯ম সংখ্যা

অর্ঘ্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(Swinburn এর The Oblation হইতে)

মোর কাছে তুমি চাহিওনা কিছু আর,
যাহা কিছু ছিল দিয়াছি যে নিঃশেষে,
আরো যদি কিছু থাকিত, প্রাণের প্রাণ,
ও চরণ তলে দিতাম যে উপহার !
দিতাম প্রেরণা আরো বেশী ভালবেসে,
আকাশে তোমারে উড়াত আমার গান।

যা কিছু আমার উজাড়িয়া পারি দিতে
আর একটু স্বাদ পরশ আভাস পেলে,
চিন্তনে নিঃশ্বাসে তব বেঁচে র'ব ;
উড়িবে যখন পারি যেন বুকে নিতে
পাখ্‌নার হাওয়া, দৈবাতে যদি মেলে
একটু পরশ—হাতে হাত লেগে তব।

আর কিছু নাই, সবটুকু ভালবাসা
দিয়াছি যে ঢালি,' আছে বেশী যার পুঁজি
সে করুক্ দান সঞ্চিত প্রেমভার,
আছে যার ডানা উড়িতে সে করে আশা,
আমি র'ব পড়ি ও চরণে মাথা গুঁজি,
শুধু প্রেমে তব মোর পথ বাঁচিবার।

যুথিকার প্রতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(Alice Meynellএর 'To a Daisy' হইতে)

যত ক্ষুদ্র হও নাক, তবু জানি তুমি শক্তিধর
এ বিশ্বে সবারি মত আপনার রহস্য লুকাতে,
তিমির নিচোল খানি দাওনা কখনো ঘুচাতে।
সূচিভেদ্য অন্ধকারে আপনারে যদি রক্ষা কর,
কেমনে বাখানি বল শোভা তব ওগো মনোহর?
উথলে রহস্যসিন্ধু সে অলঙ্ঘ্য তামিস্রা পশ্চাতে,
তোমার ও নিখিলের গহন অতলস্পর্শতাতে
লভিব কি দিব্যচক্ষু? চেয়ে আছি ভবিষ্যের' পর
নবোদ্ভিন্ন দলে যবে থরে থরে উঠিবে প্রস্ফুটি'
আমার ও বিশ্বমাঝে শতধা পড়িবে যবে লুটি,'
অন্তঃসলিলার ধারা তখন করিব আমি পান,
কবির নিকটে বসি পড়িব রচনাবলি তার।
বল দেখি হে যূথিকা, পার্শ্বে বসি' বিশ্ববিধাতার
কিবা অপরূপ তব নেহারিবে এ মুগ্ধ নয়ান?

স্বপনিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(Walter de la mare এর The Spirit of air হইতে)

প্রবাল মুকুতা মরকত নীলা চুনি
সাগর অতলে থরে থরে আছে শুনি।
পবনের পরী মেঘ পুষ্পক' পরে
ধরার মাধুরী তনু-ঘনিমায় ধরে।
কেমনে বুঝাব স্মৃতি তার কত মধু।
রত্নাবলী সে, মেঘশিবিকার বধূ।
স্বপনে তাহার বিভোর রয়েছি আমি,
শুনিতেছি প্রেম গুঞ্জন দিবা যামী।"
গিরি তটতলে ঝরণার কলধারা;
প্রতিধ্বনিরে করিছে আত্মহারা;
শিশির বিন্দু চরণ প্রান্তে তার
ঝলকিছে ঘাসে খসে-পড়া উষাহার;
ঘন কেশভার কূলবন্ধন হীন
প্রবাহিনী সম তিমির-সাগরে লীন।

প্রার্থনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(Coleridge এর 'Oh let me be in loving nice"
হইতে)

প্রেম পরিচর্য্যা মোর হোক্ মনোহর,
অনবদ্য পারিপাট্যে নিখুঁৎ সুন্দর!
হারবার ধন নয় যে আমার প্রিয়া
তবু তারে হারাবার ত্রাসে মোর হিয়া
শঙ্কাকুল হয়ে মোর মুগ্ধা প্রেয়সীরে
করে যেন মুগ্ধতর। সে সতী সাধ্বীরে
এত ভালবাসি আমি, আরো সত্যবান্
হব আমি তার লাগি। হবে দীপ্তিমান্
এ অনন্যমনা প্রেম বয়োবৃদ্ধি সনে,
নিষ্ঠা নয় অচলতা—অভ্যাস-বন্ধনে।

জার্ণালিজমের অ, আ, ক, খ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকের দায়িত্ব

সংবাদপত্র চালাইতে হইলে বা সংবাদপত্র অফিসে কাজ করিতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। সংবাদ-পত্র অফিসে সমস্ত রাত্রি কাজ চলে এবং এই সমস্ত রাত্রি কাজ চলে বলিয়াই প্রতিদিন সকালে আমাদের চায়ের টেবিলে গরম গরম চায়ের সঙ্গে গরম গরম খবরও পরি-বেশিত হইতে পারে। সংবাদপত্রের কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—সম্পাদকীয় বিভাগ, মুদ্রাকর বিভাগ ও প্রকাশক বিভাগ। সম্পাদকীয় বিভাগ আবার কতক-গুলি অংশে বিভক্ত। এই বিভাগগুলি একজন উপযুক্ত লোকের হাতে থাকে। এই ব্যক্তিগণ তাহাদের কাজের জন্য মূল সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকেন. যেমন ধরা যাউক নিউজ এডিটর (News Editor)। সঠিক সংবাদ সংগ্রহের ভার তাহার হাতে। কিন্তু এক ব্যক্তির পক্ষে এই এই কাজ করা সম্ভব নহে কাজেই তিনি নিজের ইচ্ছামু-রূপ রিপোর্টার নিযুক্ত করেন কিন্তু এই সব সংবাদের ভুলচুকের জন্য সম্পাদকের নিকট তাহাকে জবাবদিহি থাকিতে হয়। সংবাদ সংগ্রহের জন্য রিপোর্টার ছাড়া বড় বড় নিউজ এজেন্সিও আছে। এই সংবাদ বড় আশ্চর্য্য-ভাবে অতি দ্রুত প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে সংবাদ প্রেরিত হয় তাহার নাম Tape machine ইহা চলে বিদ্যুতের সাহায্যে।

যেখান হইতে সংবাদ প্রেরিত হয় সেখানে থাকে টাইপরাইটারের মত একটা মেসিন। অপারেটর ক্রমাগত চাবি টিপিতে থাকে আর সংবাদ অফিসে ফিতার মত কাগজে সংবাদ মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। এইগুলি একত্রিত করিয়া কোন যায়গায় কাটছাট করিয়া কোন যায়গায় বা একটু রং চড়াইয়া সংবাদরূপে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা বড় বড় ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র অফিসেই আছে। আমাদের বাংলা সংবাদপত্রের খবরগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজীর নকল। কারণ প্রেস টেলিগ্রাম ও টেপনিউজ ইংরেজীতেই প্রেরিত হয়। যাহা হউক সংবাদ যে ভাবেই সংগৃহীত হউক এইগুলি আনুপূর্ব্বিক দেখিয়া দিবার ভার সম্পাদকের, তিনি যদি এই কাজ যথাযথ পালন না করেন তবে যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি বিপদে পড়িতে পারেন।

সম্পাদককে কোন বিপুল সেনাদলের সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। যুদ্ধের জয় পরাজয় যেমন নির্ভর করে সেনাপতির সৈন্যপরিচালনা নৈপুণ্যের উপর তেমনই পত্রিকার উন্নতি বা অবনতিও নির্ভর করে সম্পাদকের দায়িত্বজ্ঞানের উপর। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বাক্যের জন্য আইনতঃ সম্পাদক দায়ী কাজেই তাহাকে যে কত হুসিয়ার হইয়া চলিতে হয় সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দৈনিক পত্রের সম্পাদককে অতি অল্পসময়ে অতি বেশী কাজ করিতে হয়। ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে কেমন করিয়া দিনের পর দিন এত বড় এক একটা সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া পড়ে। সম্পাদকের শ্যেন দৃষ্টির একটু এদিক ওদিক হইলে, তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে একটু শৈথিল্য হইলে পত্রিকার সর্ব্বনাশ অবধারিত। কাজেই সম্পাদকের নিকট প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অমূল্য।

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তিনি বলিতে পারেন না পরক্ষণে কি সংবাদ আসিয়া পড়িবে। হয়ত কোন টেলিগ্রাম বহন করিয়া আনিল গভর্ণমেণ্টের কোন নূতন আইন প্রবর্ত্তনের কথা, বাজেট সম্বন্ধে কোন জরুরী খবর বা কোন প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু সংবাদ। সেই মুহূর্ত্তে সম্পাদককে ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিতে হইবে এবং তাহার এই মন্তব্যের উপরই নির্ভর করিবে পত্রিকার ভবিষ্যৎ। কারণ একবার সম্পাদক যাহা বলিবেন তাহার আর নড়চড় করিবার উপায় নাই।

কারণ তাহা না হইলে সেই পত্রিকার উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিবে না। কাজেই সম্পাদকের থাকিতে হইবে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, মতের দৃঢ়তা এবং সর্ব্বোপরি সেই মতকে অতি দ্রুত ভাষায় রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা। এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও সম্পাদক দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পান না। তিনি যতই কেন না পাকা লোক হউন ভুলভ্রান্তি হয়ত কিছু না কিছু হইবেই কারণ মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। প্রুফগুলি প্রেসে দিয়াই হয়ত তিনি ভাবিতে বসেন এইখানে এই যুক্তিটা ঠিক হয় নাই, ঐখানে ঐ বাক্যটা না ব্যবহার করিলেই ছিল ভাল ইত্যাদি, কিন্তু তখন আর সময় নাই কাজেই তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

নিছক সংবাদ ছাড়া সংবাদপত্রে সমসাময়িক ঘটনার, আলোচনাজাতীয় কতকগুলি নিবন্ধ থাকে। এইগুলিকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল সম্পাদক নিজেই এইগুলি লেখেন আবার অনেকস্থলে এইজন্য যোগ্যতানুসারে একাধিক লোক নিযুক্ত থাকে। কিন্তু যেই লিখুক মূল সম্পাদকই এইগুলির মতামতের জন্য দায়ী এবং তাহার নির্দ্দেশ অনুসারেই এইগুলি লেখা হয়। সম্পাদকের কাজেই সব কিছু সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রাজনীতি, খেলাধূলা, সাহিত্য, শিল্প, নাট্যশাস্ত্র ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের খুটিনাটী তাহার নখাগ্রে থাকা উচিত তাহা না হইলে সম্পাদকীয় কার্য্যে তিনি কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সর্ব্বাগ্রে তাহাকে দেখিতে হইবে তাহার লিখিবার ভঙ্গী ভাষা যেন ব্যঙ্গরসাত্মক বা কটূক্তিপূর্ণ না হয়। আবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ লেখা হইলেই যে সকলের নিকট সমান আদর লাভ করিবে তাহারও কোন মানে নাই। অহেতুক উত্তেজনাপূর্ণ লেখা বেশীদিন লোকে পছন্দ করে না। যুক্তির গভীরতা থাকিলে ধীর ও শান্তভাবপূর্ণ লেখাই লোকের মনের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। শুধু চটকদার লেখা দ্বারা লোককে বেশীদিন ভুলান যায় না। কোন সম্পাদকের লেখায় দেখা যায় একই প্রকার কতকগুলি শব্দ বা প্রবাদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এইপ্রকার বাক্য বিশেষের প্রতি (সে ঋষি মুখনিসৃতই হউক বা মহাত্মার মুখ হইতেই শুনা) ঝোঁক থাকা সম্পাদকের উচিত নয়। একই কথার পুনঃ প্রয়োগে পাঠক বিরক্ত হয়। আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। এই উপদেশটী ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেটের সম্পাদক মিঃ জে, এ স্পেণ্ডারের তিনি বলেন—'যে কোন বিষয়েই লিখিতে যাও তোমার সমস্ত ভাব, সমস্ত যুক্তি একইবারে নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিও না। কতকটা আরেক বারের জন্য রাখিয়া দিও। একই বিষয়কে নানাদিক দিয়া আলোচনা করা চলে। সুচতুর সম্পাদক বিষয়টাকে প্রয়োজনমত এক একবার এক একদিক দিয়া ধরেন কাজেই পাঠকের নিকট ইহা প্রতিবারই চিরনূতন রূপ নিয়া আত্মপ্রকাশ করে। দৈনিক কাগজের সম্পাদক যাহাকে প্রতিদিনই ভুরি ভুরি লিখিতে হইবে তাহার পক্ষে এই উপদেশটির নিশ্চয় মূল্য আছে।

(চলবে)



দিদি ও বেলা

(গল্প)

শ্রীবিনয় দত্ত

সংসারের বেচা-কেনা শেষ ক'রে মা শেষ-শয্যা নিলেন। পাড়ার যাঁরা তাঁকে শেষ-দেখা দেখতে আসতে লাগলেন তাঁদের সবাইর কাছে মায়ের সেই একই কথা— আমার আর মরবার জন্য কোন দুঃখই হয় না, তবে যদি আমার বেণুকে কারো হাতে দিয়ে যেতে পারতুম, তা হ'লে আমার এ মরণ সার্থক হ'ত।...

মায়ের সে-ডাক না কি ভগবান শুনেছিলেন, তাই মরবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার হাত ধরে দিয়ে গেলেন দিদির হাতে।...

মা সেবার বহু তীর্থস্থান ঘুরে এসে উপস্থিত হ'লেন পুরী, সেখানেই এই দিদির সঙ্গে মায়ের পরিচয়—তারপর তিনি আমার মাকে 'মা' ব'লে ডাকেন।...

দিদির সঙ্গে মায়ের সেই প্রথম দেখা ও পরিচয়, আর মৃত্যুর সময় শেষ-দেখা। মা'র অসুখের সংবাদ পেয়ে দিদি ছুটে এসেছেন তাঁকে দেখতে।...মা কেবল যেন দিদিকে দেখার জন্যেই বেঁচে ছিলেন—দিদি তো একেবারে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে মায়ের বুকের পরে পড়লেন। মা'র বেশী কথা বলার শক্তি ছিল না—আস্তে আস্তে আমার হাতখানা ধ'রে দিদির হাতের পরে দিলেন। প্রথমে কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু চেষ্টা ক'রেও কথা বলতে পারলেন না। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন—আর তাঁর সেই বোজা-চোখ দু'টো দিয়ে দু'টি জলের ধারা বেয়ে পড়ল—এর পর আরও। সেই জল যেন মৌনভাষায় দিদিকে আর আমাকে অনেক কথা জানিয়ে দিয়ে গেল।...কারও মুখে কোন কথা নেই— সব মৌন নির্ব্বাক, প্রকৃতিও যেন মূক হ'য়ে গেছে।... কতক্ষণ কেটে গেল বলতে পারিনে।...এবার ক্ষীণ ও অর্দ্ধস্ফুট শব্দ মায়ের গলা থেকে বেরিয়ে এল—আমি চললাম মণি, বেণুকে তোর হাতে দিয়ে গেলাম। তুই আমার হ'য়ে ওকে মানুষ করিস, সে ভার তোর উপর রইল, মা।...

আধভাঙ্গা, আধস্পষ্ট স্বর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'ল— জগতের মায়ার সম্পর্কেও সব শেষ হ'য়ে গেল।

এমনি ক'রে একদিন মায়ের সমস্ত মায়া শেষ হয়েছিল এই জগতের কাছ থেকে।...তারপর বাল্য ও কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দিয়েছি।

এর মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে আমার আমিত্বটুকু নিয়ে বেঁচে আছি—আজও বেঁচে আছি—মানুষ হ'য়েই বেঁচে আছি, কিন্তু এই মানুষ হ'বার মূলে দিদির দান সব চেয়ে বেশী।...তারপর জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের কতই না পরিবর্ত্তন হয়—দিদিকে শুধু মায়ের স্থানে দেখতে পেলাম। মনে হ'তে লাগল—দিদি আমার মায়ের আর একটি মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তি মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য দিয়ে ভরা। সেই জন্যই দিদিকে অনেক দিন বলেছি—দিদি, তুমি মায়ের স্থান অধিকার করেছ, সত্যি তোমায় মা ব'লে মাঝে-মাঝে ডাকতে ইচ্ছে ক'রে, তোমায় 'মা' ব'লে ডাকব ?

—ছিঃ ভাই, আমি দিদি, চিরদিন দিদিই থাকব, মা'র স্থান অধিকার করবার ক্ষমতা আমার কোথায় ? আর মায়ের গুণ পাওয়া তো আমার পক্ষে সোজা নয় রে বেণু !

দিদির পরিচয় নিয়ে নানা জনে নানা কথা বললেও আমি কোনদিন সে কথায় কান দেই নি। তা ব'লে দিদিকে কোন দিন পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেও পারিনি, যদিও আজ এত বৎসর ধ'রে দিদির কাছে আছি।

কোন দিন হয়ত দিদিকে তাঁর পূর্ব্ব পরিচয় জিজ্ঞাসা করব মনে ক'রে দিদির কাছে গিয়াছি, কিন্তু নিজের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা তা বলতে দেয়নি, অবশ্য সে আমারই দীনতা।

সংসারে প্রজাদের কাছ থেকে যে টাকা-পয়সা আদায় হ'ত তার হিসাব-নিকাশ সরকারের কাছ থেকে দিদিই নিতেন। কোনদিন আমার প্রয়োজনের জিনিস আমাকে চাইতে হয়নি, জামা-জুতো?—সে তো সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের যা হ'লে চলত তাই-ই যথেষ্ট, আর তার চেয়ে বেশীর প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু, দিদি তা শুনতেন না।

কোনদিন যদি বলতাম—দিদি, সরকার মশায়কে বারণ ক'রে দিতে পার না যে, এত দামী জুতো কিনে পয়সাগুলো কেন নষ্ট করে, আর জামাই বা এত দাম দিয়ে কিনে লাভ কি?

—আর বাজে কাজে বকিসনে বেণু, ওগুলো সরকার মশায় এনে দেয়নি, আমি নিজে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি, যদি অপসন্দ হয় রাস্তায় ফেলে দে, তাতে যদি মায়া হয়, বল্ আমি ঠাকুরকে ব'লে দি, উনুন ধরাতে নিয়ে যাবে...

আমি নির্ব্বাক হ'য়ে জোর ক'রে হেসে জামাটা গায়ে দিয়ে জুতোটা পায়ে ভ'রে বেরিয়ে যাচ্ছি, হয়ত দিদি বলতেন—বলি বেণু তুই কি ভাই আমাকে এমনি করেই জ্বালাবি?

—কেন কি হয়েছে, দিদি?

—কি আর হবে! এখন আবার বেরোচ্ছিস, দু'দণ্ড কি ঘরে থাকতে নেই?—

আমি হয়ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌তাম—না, না, বেরোচ্ছিনে দিদি, বাইরের ঘরে একখানা বই ফেলে এসেছি, তাই নিয়ে আসছি।

সেদিন দিদির ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়্‌ছিলুম, দিদি এসে বললেন—বেণু, কাগজ পড়া হয়ে গেলে আমায় ডাকিস, একটা কথা বলব।

—আচ্ছা ডাকব'খন।

এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চারদিক মৌন নিস্তব্ধতায় ঘিরে এসেছে, আমি দিদিকে ডাকলাম, বললাম—কি দিদি, কি বলবে?

—বেণু, এখন বড় হয়েছিস, এখন তোর বিষয়-আসয় বুঝে নে, এবার আমায় বিদায় দে ভাই—

—কেন দিদি, তোমায় কেউ কি কিছু বলেছে?

—না, নূতন ক'রে কে কি আর বলবে?

দিদি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেণু, আমাদের সংসারটা ভগবানের অভিশাপ পেয়েছিল, তা নইলে আমার ভাগ্য আজ এমন হত না, আজ লোকালয় থেকে মুখ লুকোবার জন্য নিন্দামন্দে জড়িত হয়ে এভাবে পড়ে থাকতে হ'ত না!

আমি দিদিকে বল্‌লাম—দিদি, তোমার দু'টি পায় পড়ি, ও সব কথা তোমার শুনতে চাইনে, তুমি যতদিন এখানে আছ, আমিও ততদিন এখানে আছি। আর এ সব বিষয়-আশয় বুঝিনে, বুঝতে চাইনে। হ্যাঁ আর এক কথা তোমায় ব'লে রাখি, আর যদি কখনো আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বল তা হ'লে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি—

ব'লেই দিদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, ভয় হ'ল—দিদি তাঁর জীবনের অজ্ঞাত রহস্য আমায় বলে ফেলেন—ভয় হ'ল—সেই রহস্যের কথা শুনে দিদির প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি একটুকু কমে যায়। যে ইতিহাস অজ্ঞাত তা' চিরদিন অজ্ঞাতই থাকুক!...

এরই কয়েক দিন পরে আমরা কলিকাতার বাড়ীতে উঠে এলাম, গ্রামের বাড়ীতে থাকলে কেবল একটি চাকর আর সরকার মশায়। কলিকাতায় উঠে আসবার আর কোন কারণ ছিল না, আমিই জোর ক'রে এ ব্যবস্থা করেছিলাম। দিদিও প্রথমে আসতে রাজী হন নি, কিন্তু যখন আমি বললাম—দেখ দিদি, কেবল পাশ ক'রে বাড়ী ব'সে থাকলে তো কোন কাজ হবে না, একটা কাজের সুবিধেও তো দেখা উচিত—আমাদের যে জমিদারী তার দিকে কেবল চেয়ে থাকলে আজ চললেও কাল আর চলবে না।

দিদি প্রথমে বললেন—বেশ, তুই একটা ভাল হোটেল গিয়েই থাক না।

—না, দিদি, ও সব আমি আর শুনতে চাইনে, কলেজে যখন পড়েছি, তখন ঐ 'হস্‌টেলে' থেকে থেকে আমার আয়ুর অর্দ্ধেক কমে গেছে, এখন আবার চাকরির

জন্য বাকীটা খুইয়ে দেব, এতে কখন তুমি মত দেবে না নিশ্চয়।

তারপর দিদিকে আরও বেশ করুণার স্বরে বললাম—হ্যাঁ, দেখ দিদি, তুমি নিজে এত কাছে থেকেও আমাকে সময় মত নাওয়াতে খাওয়াতে পার না, তারপর 'হস্‌টেলে' থাকলে আমার কি না খেয়ে জীবনটা শেষ হবে!

এবার দিদি মত দিলেন, আমিও কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—এখন তো গ্রামের নানা লোকের নানা ইতর আলোচনা শুনতে হবে না, যদিও কেবল দিদিকে কেন্দ্র ক'রে।

কলিকাতা আসার কয়েক মাস পরে বহুকষ্টে সেক্রেটারীয়েটে একটা ছোট মতো চাকরি জুটিয়েছি—মাইনে ৮০৲ টাকা হ'লেও সম্মান বেশ পাওয়া যায়, তৃপ্তিও লাভ করা যায় প্রচুর। প্রথম মাসের সব টাকাটাই এনে দিদির হাতে দিলাম। দিদি বললেন—তুই আশ্চর্য্য ক'রে দিলি বেণু, একটা পয়সাও কি তোর বাজে খরচ হয় না?

—দিদি, বাজে খরচের মধ্যে দেখি আফিসে 'টিফিন' খাওয়া, সেটা ছাড়তে পারলে বাজে খরচের হাত থেকে একেবারেই বাঁচা যাবে—

—হয়েচে হয়েচে, অত কথা বলিস্ নে বেণু!

পরদিন থেকে দিদি আমার জন্য খাবার যেন একটু বেশী ক'রেই চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন—কোথায় খাওয়ার মাত্রাটা কমিয়ে দেব, তা নয় দিদি তার পথটা রোধ ক'রে আমকে ছোটখাট পেটুক বানিয়ে ছাড়বেন।

দিদিকে এসে বললাম—দিদি, তোমার দু'টি পায় পড়ি, অতগুলো খাবার আমার জন্য পাঠিও না ওর চার ভাগের এক ভাগ পাঠালেই চলবে, আর সত্যি বলতে কি যে দিনকাল পড়েছে, তাতে যদি আমরা একটু সামলে খরচ না করি তা হ'লে চলবে কেন?

দিদি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—কি?—এত বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস বেণু?—তা তো আমি জানি ভাই, এবার আমার বিদায়ের পালা—

আমি মুখখানা খুব গম্ভীর ও চোখ ছলছল ক'রে বললাম—দিদি, তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি তোমাকে লক্ষ্য করে কিছুই বলিনি—

—দেখ বেণু, এখানে বসে ও-ভাবে চেঁচাসনে বলছি. এখান থেকে চলে যা—

মনে মনে ভাবলাম, বাঁচা গেল! আস্তে দিদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

দিদির রাগ জল হয়ে গেছে, তা আমার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হ'লনা। ঐ যে আমাকে চ'লে যেতে আদেশ করেছেন, ঐ শাসনটুকুই আমার খুব ভাল লাগে—আর ঐটুকুর ভিতর দিয়ে আমি দিদির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পাই—সে-রূপ স্বর্গের পবিত্র অমলতা দিয়ে ঘেরা;—সে-রূপে মলিনতা নেই, আবিলতা নেই, আছে তার দেহ-স্বর্গীয় মণি-জালে ঢাকা।— —

একদিন সদর গেটে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে—আমি বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম রাস্তার একেবারে পাশেই আমাদের বৈঠকখানা, জানালার পাশ দিয়ে একবার উঁকি মারতেই ড্রাইভারের চোখে চোখ পড়ল, সে জিজ্ঞেস করলে—এ বাড়ীটা কি বিনোদ বাবুর?—

আমি গাড়ীর মধ্যে একটি মহিলাকে দেখলাম—বয়স ৩০এর বেশী নয় বলেই মনে হ'ল।

আমি খুব তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে বললাম—হ্যাঁ, আমিই বিনোদবাবু।

তারপর মহিলাটির চোখে আমার চোখ মিলিল, হাতটি জোড় করে কপালে লাগিয়ে তিনি আমাকে নমস্কার জানালেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন—আপনার এখানে কি মণিমালা দেবী আছেন?

—হ্যাঁ, দিদি তো এখানেই।

আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম—আসুন, ভেতরে চলুন।

—আপনি তাঁকে একটু সংবাদ দিন, আমি তার ছোট বোন, নাম বেলা দেবী।

—আপনি অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে চলুন, দিদি এ-খানেই আছেন, আর আমি তাঁর ছোট ভাই—

—মনে কিছু করবেন না, তাঁকে প্রথমে আমার কথা বলুন না।

মনটা যেন একটু খট্‌কা লাগল—কি করি, বাধ্য হ'য়ে ভিতরে গিয়ে দিদিকে বললাম—দিদি, তোমার ছোট বোন বেলা দেবী এসেছেন, চল, গাড়ী থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে আসি।

দিদি যেন একেবারে জ্বলে উঠলেন—কি! সে এখানে এসেছে!—দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব না! তিন কুল ডুবিয়েছে, আবার এখান!—দেখ বেণু, আমার দরজার ওখান থেকে তাকে চলে যেতে বল!—ওর মুখ দেখলেও পাপ হয়!......

—দিদি বল না, কি হয়েছে? তিনি কি এমন অন্যায় কাজ করেছেন যার জন্যে—

—তোর বাজে কথা বলতে হবে না বেণু! তাকে বিদেয় দিয়ে আয়, তারপর যখন বলবার বলব।

...বাইরে গিয়ে বললাম—দেখুন, দিদি তো আপনার উপর খুব চটেছেন, ...তা হোক আপনি ভেতরে চলুন, আমি হাতে পায়ে ধ'রে দিদির রাগ কমাব—

বেলা দেবী শুধু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন, তারপর ড্রাইভারকে বললেন—হাওড়া ষ্টেশন।

ড্রাইভার মটরে ষ্টার্ট দিলে, বেলা দেবী আর একবার আমায় দিকে চেয়ে বললেন—ক্ষমা করবেন, নমস্কার, দিদিকে প্রণাম—

এর মধ্যে মটর কতকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে, আমার মুখে কথা ফুটল না, তাঁকে কি যে বলব বুঝেই পেলাম না।

অনেক দূরে মটরটাকে থামতে দেখলাম—ভাবলাম হয়ত তিনি ফিরছেন আবার কিন্তু সে আমার দেখতেই ভুল হয়েছিল—মটর আর ফিরল না।

এখন আর কিছুই দেখা যায় না।

দিদিকে এসে বললাম—দিদি, বেলা দেবীর মুখও দেখলে না, এমন তিনি কি পাপ করেছেন?

দিদি আমার চোখে চোখে চেয়ে কি ভাবলেন জানি নে। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজে ব্যাগটা খুলে কালো একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি আমার কোলের পরে ফেলে দিয়ে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—। এই চিঠি গুলোর মধ্যেই সব পাবি, আর খবরের কাগজে বেলা দেবীর কথা পড়েছিস না! না পড়লেও শুনেছিস বোধ হয়! সে তো হ'ল অনেক বছর আগের কথা।

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠল, সেই বেলা দেবী? সেই বেলা দেবী, আজও যাঁকে কেউ নিন্দা করে আবার কেউ কেউ যাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে থাকে?—

বেলা দেবীর লেখা চিঠিগুলো সমস্ত পড়লাম! তিনি প্রত্যেকখানি চিঠিতে দিদির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন—প্রায় চিঠির মধ্যে ঐ একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

একটা চিঠিতে লেখা আছে—দিদি তোমার কাছে অর্থ চাই নে, চাই তোমার কাছে ক্ষমা। আমি যে সুধীর বাবুকে ভালবাসতাম, সে তো জানা কথা—তাঁর সঙ্গে কোন বাইরের দেবতা সাক্ষ্য ক'রে আমার বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু আমাদের যে বিবাহ হয়েছিল, তার সাক্ষ্য সেই আমাদের অন্তর-দেবতা। আমাদের মিলনের মালা-চন্দন কোনদিন শুকোবে না বা মুছে যাবে না, তা চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে আছে, অমর হ'য়ে আছে!—আজ তিনি নেই কিন্তু তিনিই আমার সব, তিনিই আমার জীবন সঙ্গী...

তোমরা যত মামলা মোকর্দ্দমা করেছ সমস্তই তোমাদের নিষ্ফল হ'য়ে গেছে। আমি যাঁকে প্রথমে ভালবেসেছিলাম, তাঁকেই জীবনের চলার পথের সাথী ক'রেছিলাম। আমার ভাগ্যে সইল না, তাই তিনি আমায় ছেড়ে সকল নালিশের বাইরে চলে গেছেন।

"মা বাবা, আত্মীয় স্বজন—সকলেই তাঁকে নাস্তা-নাবুদ তাঁকে হায়রান করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেউ-ই কিছু তাঁর করতে পারেন নি। কেন পারেন নি জান দিদি? তাঁর ও আমার মধ্যের প্রেম ছিল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ অর্থের জন্য পথে দাঁড়াতেও প্রস্তুত

আছি কিন্তু এ-কথাটি ঠিক জেনো—কোন কিছুর বিনিময়ে তাঁকে তো কারো কাছে ছোট করতে পারব না।

তোমার কাছে এ চিঠি লেখা-লেখির প্রয়োজন ছিল না—মৃত্যুর দিনও তিনি ব'লে গেছেন—'বেলা, মণিদি আমায় চিনতেন, তাঁর সাথে অন্ততঃ সম্বন্ধ বোধ হয় ছিন্ন করতে হবে না।...যদি কোন অন্যায় ক'রে থাকি বা থাক, তা হ'লে শুধু মণিদির কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেও, কাকেও দোষ দিও না।'

দিদি, তুমি কখনো মনে ক'র না—তোমাদের কারও কোন সাহায্য আমার মনে কোন শান্তি এনে দেবে—তুমি মাঝে মাঝে যে অর্থ-সাহায্য পাঠাও তা গ্রহণ করি পেটের ক্ষুধার জন্য।...

শুধু ওঁর মরণ কালের কথাগুলো ভুলিনি। তাই এ কথা ভেবে ভেবে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—সত্যই দিদি আমি কোন অপরাধ করি নি তুমি তো জানো সুধীরবাবু আমাকে কত ভালবাসতেন, আর তোমাকে তিনি কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন, যখন বুঝলাম আমাদের বিবাহে বাধা অন্তরায় উপস্থিত হবে, তখনই চ'লে এলাম, তুমি তখন ঘুমিয়েছিলে—তখন প্রণাম ক'রে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে নেমে পড়লাম। আমার অবস্থায় যদি কেউ কোন দিন পড়ে তা হ'লে আমার অবস্থা বুঝতে পারবে, তা না হ'লে নয়, দিদি।

দিদি, তুমি ক্ষমা ক'রো, পরের মাস থেকে আর টাকা পাঠাবার প্রয়োজন নেই—আমি নিজে একটা জীবিকার উপায় ঠিক করেছি। প্রণাম নাও—ইতি

তোমার
অভাগিনী বোন
বেলা

আর একখানা পত্রের সবটা পড়লাম, সেখানার এক স্থানে লেখা আছে—

......দিদি, তুমি হয়ত ভাবছ, আমার জন্য আমাদের বংশ-মর্য্যাদা, সম্মান ইত্যাদি সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে, সবই রসাতলে গেছে কিন্তু আমাদের জীবনের মূল্যও কি কিছু নেই? সে কি শুধু বই লেখা বুলি মেনে নেবে।— তুমি তো বোঝ, জগতে এসে অবধি সুধীরবাবু কি দুঃখ-বেদনার আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন, তাঁর অন্তরে কোন দিন কোন রকমের মোহ ছিল না, তবে তাঁর অন্তরে মায়া ছিল, মমতা, সেই জন্যই আমি পরাজিত হয়েছিলাম।—

সে দিন শুধু ভেবেছিলাম—যারা আমাকে চায় না, চায় বাবা-মায়ের টাকা, তাদের কাছেও আমাকে দেওয়ার জন্য তোমরা কম চেষ্টা করনি, সাফল্যের এতটুকু আশা পাওনি তবু নিরাশ হওনি কিন্তু আমি সেদিন ওঁর পায়ে মাথা রেখে নিজেকে সমর্পণ করলাম, ওঁর চোখ দুটো জলভারে ভারী হয়ে উঠল। বললেন—'বেলা, ভাই, তা হয় না,— তোমাকে পাওয়া দুরাশা, হয়ত অনর্থ ঘটবে—আমার সংসারের পরিচয় হয়ত প্রতিকার হবে না—হয়ত আমার পরিচয়ে তোমার মধ্যে ঘৃণার সাপ ফণা ক'রে উঠবে...' আমি বললাম—'ও-কথা শুনতে চাইনে, তুমি মানুষ, তোমার মধ্যে বিবেক জাগ্রত আছে, করুণা আছে, দয়া আছে আর সর্ব্বোপরি আমাকে মুগ্ধ করেছে তোমার বাক্যহীনতা...'

তোমারা হয়ত জান দিদি সুধীরবাবুর জন্ম কোথায়, তা সত্ত্বেও তোমায় বলি, তিনি নিঃসঙ্কোচে বললেন—হাসিমুখেই বললেন—'বেলা, তোমার বাবা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ভাল ছেলে জেনেই আর আজও তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গের কিছুই করিনি—তাঁরা হয়ত ঠিক জেনেছেন যে, আমি—আমার আমার পিতা কে তা আজও আমার কাছে অজ্ঞাত—হয়ত চির-অজ্ঞাত রয়ে যাবে...'

তারপর তিনি অজ্ঞান হ'লেন আমি তাঁর মাথাটা কোলে ক'রে খুব আস্তে ওঁর মাথায়, কপোলে, মুখে, ঠোঁটে, চোখে চুম্বন এঁকে দিলাম তিনি যে নিঃসহায়... ঠিক সেই রাত্রেই ছোট একখানা পত্র রেখে বিদায় নিয়েছিলাম...

চিঠি পড়তে পড়তে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল—কাপড়ের কোচাটা তুলেই চোখ মুছলাম, হয়ত দিদি তাই লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তিনি বললেন—বোস, স্নান করতে যা এখন ক'টা বাসন বেয়ান আছে—

—দিদি, শোন।

—না, এখন আমার কোন কথা শুনে কাজ নেই, আজকে অফিস নেই ব'লে খাওয়া-দাওয়া নেই না কি!

তারপর দিদি আমার হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দিলেন ডাষ্টবিনে। আমি বললাম—দিদি, বেলা দেবী হয়ত কোন অন্যায় করতে পারেন কিন্তু চিঠিগুলো কি অপরাধ করেছে বুঝলাম না—

—তা বুঝে কাজ নেই, আর সত্যি এ-চিঠি সাহিত্য ছাড়া কোন কাজে লাগবে না, সাহিত্যের খোরাক যারা জোগায় তাঁরা জোগাক গে আমার দ্বারা তা হবে না···

আমাকে দিদি আর কোন কথা বলতে দিলেন না—কেবল গামছা আর কাপড়টা আমার কাছে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, কেবল মনে হ'ল তাঁর চোখের কোণে বোধ হয় দুই ফোটা জল জেগেছিল···

সেই নির্জ্জন ঘরে বসে কেবল বেলার ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলাম—কোথায় বেলা? আর কোথায় সুধীর?—

সে অনেক বৎসর পূর্ব্বেই ইতিহাস। বেলা ও সুধীরের কথা দিয়ে বাংলার বিভিন্ন ধরণের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় তাঁদের কার্য্যের নিন্দা ও প্রশংসা চলেছিল, তারপর মকদ্দমা একদিকে সুধীর অন্যদিকে বেলার মা-বাবা সকলেই। মকদ্দমা শেষ হবার মধ্যেই সুধীরের আয়ু শেষ হ'ল।—তারপর সব নিশ্চুপ। আজও স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশার আলোচনা-কালে সুধীর ও বেলার উদাহরণ দেওয়া হ'য়ে থাকে। —আমার কেবল এইটেই মনে হ'তে লাগল—কি অপরাধ বেলার? সে যদি সত্যিই বাবা-মা সবাইকে অগ্রাহ্য ক'রে সুধীরকেই উপযুক্ত বন্ধু মনে করে থাকে তা হ'লে তার কি অপরাধ! বেলার বাবা তাকে পথে-কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, মানুষ ক'রে চোখ ফুটিয়েছিলেন—তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে যাওয়া বা ভালবাসা অন্যায় হয়েছে কিন্তু যৌবন সে কথা শোনে কি।··· নাঃ, সুধীর নিষ্পাপ, বেলা নিষ্পাপ—সুধীর ও বেলা এ-যুগে এ-সমাজের আদর্শ, তাদের কেন্দ্র করেই যেন সমাজের সত্যকারের ক্লেদ দূর করবার চেষ্টা চলে।...

সে দিন সকালের দিকে একখানা খামের চিঠি পেলাম, চিঠির উপরের ঠিকানা দেখে বেলার হাতের লেখা চিঠির কথা মনে পড়ল...চিঠি খুললাম। খুলে দেখি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সে দিন আপনার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করে এসেছি সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করবেন।

আপনি আমায় সম্পর্কে ভাই হন, ছোট কি বড় জানিনে, তবে আপনাকে দাদা বলেই ডাকলাম, অন্যায় হলে ক্ষমা করবেন। দিদিকে বলবেন, আমাকে অপমান ক'রে তার বেগ সহ্য করবার শক্তি দিদির নেই জানি কিন্তু দূরে বসে আমি সে অপমান সহ্য করতে পারি বা জানি।

আপনাদের

চির অভাগিনী

বেলা

আমি উত্তর দিলাম—

বেলাদি, আপনার পত্র পেলাম, আমি তো আপনার কাছ থেকে কোন রূঢ় ব্যবহার পাইনি!

আপনাদের ব্যথাপূর্ণ জীবনের কথা জেনে দুঃখিত হয়েছি—সে দুঃখের জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু নেই ভাই, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—দুঃখ সইবার সবটুকু ক্ষমতাই আপনাকে ভগবান দেবেন।

ইতি

আপনাদের

শ্রীবিনোদ রায়

একদিন দিদিকে বললাম—দিদি, আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে একটু বেরিয়ে এলে ভাল হত।

—বেশত। কোথায় যেতে চাস?

—দেওঘর কিম্বা পুরী।

—না, পুরী গিয়ে কাজ নেই, দেওঘরই বেরিয়ে আয়।···

পুরী না যেতে দেওয়ার কারণ বুঝতে পারলুম।...

দেওঘরের নাম বলে দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে হাজির হ'লাম পুরী।

কেন যেন জানিনে, বেলাদির জন্য আমার মনটা কেমন একটু চঞ্চল হয়েছিল—কেবলই সেই হতে মাঝে মাঝে ভেবেছি—হয়ত কত শত শত বেলা ও সুধীরের চরিত্র আমাদের মধ্যে রয়েচে কে তার খবর রাখে! কোথায় তাদের সংসার, কোথায় তাদের সুখ!—সংসার চেনে টাকা, সংসার চেনে বংশ—আর সর্ব্বোপরি সংসার জানে পুত্র-কন্যার বিয়ে একটা ছিনিমিনি খেলা বই আর কিছুই নয়।

পুরীর অন্দরবালী পল্লীর একটি ছোট্ট ঘরে বাস করে বেলা—সেই অভাগিনী বেলা। সেখানে এক পূর্ব্ব দেশীয়া বৃদ্ধার কাছে বেলার সংবাদ নিলাম, অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গের মহিলা না হলে বোধ হয় এতটা প্রাণখুলে কথা বলতেন না—তাঁর কথায় যা বুঝলাম, তাতে আমার মনে হয়, বেলা সত্যই আদর্শ নারী, হিন্দুর আদর্শ, মুসলমান খৃষ্টান—সকলেরই তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মাথা নত হয়।

বেলাদি সেলাই ছাঁট-কাট ও গান শিখিয়ে যে দু-চার টাকা পান তাই দিয়েই তাঁর সংসার চলে—হয়ত এ-করে বহু অর্থই উপার্জ্জন করতে পারতেন কিন্তু হিন্দু গৃহস্থেরা অনেকে এঁকে কোন কাজই দেয়না, তবে দুই এক জন গৃহস্থের করুণার জন্যই দু-পয়সা আয় ক'রে সংসার চালাচ্ছেন———যেদিন কিছু আয় না করতে পারেন সেদিন উপবাস করেই কাটিয়ে দেন।

সকালের দিকে গিয়ে বেলাদির দেখা পেলাম না ব'লে বৃদ্ধাকে বলে এলাম—কালকে এমনি সময় আসব, যদি তাঁর অন্য কাজ না থাকে তা হ'লে আমার জন্য যেন তিনি অপেক্ষা করেন, আমার নামটা ভুলে জাননি তো?

——তোমার নাম তো বেণু।

——কি ক'রে জানলেন?

——কেন, তুমিই তো বললে, তোমার নাম বিনোদ রায়, বিনোদকে বিনু বা বেণু ছাড়া কি ডাকবে লোকে?

——ধন্যবাদ, বুড়িমা, প্রণাম।

বুড়ি আমার হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পথে ফিরতে ফিরতে অনেক কথাই বেলা দেবীর বিষয়ে ভাবছিলাম—কি অপরাধ এ যুবতীর? সাধারণ অতি সাধারণ কথা—তিনি তাঁর নিজের মনের মত মানুষকে স্বামী রূপে বরণ ক'রেছিলেন, আর অন্য কিছুর দিকে তিনি দৃষ্টি দেননি শুধু দেখেছিলেন তাঁর স্বামীর অন্তর, শুধু দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে জাগ্রত বিবেকের কর্ম্ম-প্রেরণার তেজ, আর দেখেছিলেন, নারীর প্রতি সুধীরবাবুর অসাধারণ শ্রদ্ধা।

বেলা দেবী আমাকে তাঁর জীবনের অনেক খুঁটি-নাটি বললেন। কোন সময় কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো ছল ছল হ'য়ে উঠেছে, কোন সময় বা দুঃখের মধ্যে প্রতিহিংসার ছবি—আবার কোন সময় তাঁর মধ্যে সমাজকে শাসন করবার একটা ছবিও ভেসে উঠেছিল।

যখন বিদায় নিয়ে আসব তখন তিনি বললেন—দেখুন বিনোদদা, একটা জিনিষের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেই।

তারপর ঘরের টাঙানো ছবিগুলো দেখিয়ে দিয়ে এক এক ক'রে পরিচয় দিতে লাগলেন—

—এই ছবিখানা আমার আর সুধীরবাবুর, যখন তাঁর ও আমার মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হয়, তখন এই ছবিখানি তোলা হয়েছিল। তারপর একখানা ছবির কাছে গিয়ে বললেন—এই ছবিখানা, আমি যেদিন বাবা-মা, দিদি—সবাইকে ছেড়ে সুধীরবাবুকে নিয়ে চলে যাই, সেই দিনের।

তারপর আর একখানার কাছে গিয়ে বললেন—এই ছবিখানা, যখন আমাকে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে হ'ল অবশ্য সুধীরবাবু আসামী আর অন্য পক্ষে বাবা। কি, কথা বলছেন না যে বিনোদদা?

আমি শুধু আর একবার মনে করলাম এই নারীর দুঃখের কথা। কত বড় দুঃখকে ইনি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছেন ঐ জোর করা হাসির পিছনে। নিজের দুঃখ পর্ব্বত সমান হয়েছে কিন্তু এই দুঃখকে তিনি ঢেকে রেখে—

ছেন একটা আবরণ দিয়ে—নিজে ছাড়া কাউকে জানতে দেন না, দেন নি, আর জীবনের অবশিষ্ট দিনেও জানতে দেবেন না।

এতক্ষণ বেলা দেবী মৃদু হাসি হেসেই ছবির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাচ্ছিলেন কিন্তু এবার খুব করুণ ভাবেই বল্লেন—দাদা, এই ছবিটা আমি সর্বদা ঢেকে রাখি, তা' না হ'লে ভয় হয়, যেন বুক ভেঙ্গে যেতে চায়—কেবল আকুল হ'য়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। যিনি সকলের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার জন্য হাসিমুখে বরণ ক'রে মৃত্যুর শেষদিনও আমাকে অভয় দিয়ে চ'লে গেছেন, তাঁর জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।

বলতে বলতে বেলাদির গলাটা ভারী হ'য়ে উঠল। তারপর আবার বললেন—সমস্ত ভাবনা চিন্তায় তাঁর শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল। ডাক্তার যখন সোজা জবাব দিলেন, তখন আমি সব অন্ধকার দেখতে লাগলাম—দেখতে লাগলাম চারিদিকে শূন্য হাহাকার-ময় প্রান্তর। ডাক্তারবাবুকে বললাম, যদি কোন রকমে চেষ্টা ক'রে বাঁচাতে পারেন তো দেখুন। ডাক্তারবাবু বললেন, এর শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই, কি করব, অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়, মা।

—এবার আমি—আমি বললাম, ডাক্তারবাবু, আমার শরীর থেকে রক্ত দিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।

—তারপর তাও দেওয়া হ'ল কিন্তু কোন কিছু ফল হ'ল না—যাঁর ওপারের ডাক এসেছিল, তাকে কোন কিছু দিয়েই আটকিয়ে রাখা গেল না।

বেলা দেবী তাঁর পাঁজরের এক জায়গা আমায় দেখিয়ে বললেন—দেখুন দাদা, এই দেখুন সেই ক্ষত, সেই ক্ষত এখনও নূতন ক'রে রেখে দিয়েছি—আমরণ এ ক্ষত আমি এমনি ক'রে রেখে দেব, এ আমার জীবনের একটা ব্যথা ও করুণার স্মৃতি।

এবার বেলাদেবী সেই ছবির পেছন থেকে বের ক'রে নিয়ে এলেন একখণ্ড কাগজ, তার উপর লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে খুব ছোট ছোট অক্ষরে—

'তুমি তোমার দেহ নিয়ে বিদায় নিয়েছ বটে, তোমার স্মৃতি আমার এখানে অমর হয়ে আছে, পরপারে গিয়ে আমাদের আবার মিলন হবে—, আবার আমরা সেখানে নূতন ক'রে সংসার পাতাব।'

—দাদা, আমার সেই ক্ষতস্থানের রক্ত নিয়ে তাঁকে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দু'বার চিঠি পাঠাই, সে চিঠি রেখে দেই ঐ ছবিখানির পেছনে তাঁর উদ্দেশে—

বলতে বলতে বেলাদির গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

আমি বললাম—বেলাদি, ছিঃ, আপনার মধ্যে যে এতটা দুর্বলতা আছে তা কিন্তু আমি ভাবিনি, আপনাকে শান্ত হ'তে বলি—ধৈর্য্য ধরতে বলি।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলাম এইবার বেলাদির, একেবারে অট্টহাস্যে হেসে উঠে বললেন—দাদা, এতগুলো কথা আপনি বিশ্বাস করছেন?

তারপর আরও বোধহয় কিছু কথা বলবে ব'লে হাসতে চেষ্টা করলেন কিন্তু সে হাসির পরিবর্ত্তে বেরিয়ে এল অজস্র ক্রন্দনের বন্যা, তাতে আমিও ভেসে গেলাম।...

আমি একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলুম না।

কলকাতার বাড়ী চলে এসেছি—আবার সেই নিয়মবাঁধা রুটিনানুযায়ী চলতে সুরু করেছি। সেই আফিস, সেই দিদির বকুনী ও শাসন।...

এখন থেকে দিদির অজ্ঞাতে বেলাদিকে প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলুম, তারজন্যে তিনি কোন দিন আমার অনুগ্রহ বা দয়া স্বীকার করেন নি। অবশ্য আমার মনের দিক থেকে নানা অভিযোগ জাগ্রত—যাঁকে আমি সাহায্য করছি, তাঁর দিক থেকে একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও কি রীতি বিরুদ্ধ?

বেলা দেবীর কাছে একটা পত্র দিলাম একটু শান্ত কটাক্ষ করেই কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে উত্তর পেলাম, তা এই—

'দাদা, আপনার প্রেরিত টাকা প্রতি মাসেই পেয়ে থাকি, তবে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি—আপনার এটা মনে করা ভুল যে, মানুষ অনুগ্রহ পেলেই

তাকে সম্পূর্ণ নত হয়ে থাকতে হবে তার মনুষ্যত্বটুকুও বিসর্জন দিয়ে...আপনি আমাকে সাহায্য করে হয়ত আপনার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য করে যাচ্ছেন কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা না করা আমার কর্ত্তব্যের পর্য্যায়ে পড়ে, আপনার মধ্যে পড়ে না। ...নমস্কার—ইতি

বেলা

—বেণু, আগে আগে আমার কাছে প্রতি মাসের সব মাইনের টাকা এনে দিতি, এখন—

দিদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—এটা ঠিক জেনে রেখো দিদি, একটা পয়সাও অপব্যয় হয় না।

—মাইনে তো তুই ৮০৲ টাকা করে পাস, আর তিন-চার মাস ধরে দেখছি কোন মাসে ৩০৲ কোন মাসে ২০৲ এনে দিচ্ছিস—এর মানে কি?

—আমার হাত খরচও তো আছে দিদি, সব টাকার হিসেব দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে খরচ হয়ে যা থাকবে, তাই তোমায় দিয়ে দেব—

—তুই কি আমায় ভিক্ষে দিস, তোর ও-ভিক্ষের দিকে আর কেউ চেয়ে থাকলেও আমি নেই ঠিক জানিস, আর একথা সব সময় মনেও রাখিস!

—তোমার কাছে কি আমাকে প্রত্যেকটি টাকার হিসেব দিতে হবে না কি?—

—আলবাত্! দিলে ঠিক তাই, তা নাহলে মোটেই চাইনে, ঐ তোর টাকা নে—ও টাকায় আমার এ-কাল কিম্বা পরকাল উদ্ধার হবে না।

দিদি একথাগুলো বলে রুমালে বাঁধা টাকাগুলো ফেলে হন্ হন্ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন।

আমি শুধু ভাবলাম—দিদিও দেখছি জগতের লোকের মতো সন্দিগ্ধমনা!

উপর থেকে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন—আমার চোখে ধুলো দিলে নিজের চোখে ধুলো পড়বে...আজকে দিদির কথা কাজে না লাগলেও একদিন লাগবে...

বাইরে পিয়নের গলায় আওয়াজ পেলাম—বাবু, 'টেলিগ্রাম'।

মনটা কেমন যেন করে উঠল। হয়ত কারও অমঙ্গল সংবাদ! আমার মনে হল—কেউই বা আছে আমার আপনজন যে, অমঙ্গল সংবাদ পাব?—

Bela seriously ill, Come sharp

Doctor.

বেলা পীড়িতা।

ভগবান, তাঁকে নিরাময় কর।

রুমালের টাকা কটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে একটা জামা ও এক জোড়া জুতো নিয়ে নেমে পড়লাম! যাবার সময় চাকরকে বলে গেলাম—আমি পুরী যাচ্ছি, দিদি যদি বেশী রাগ করেন তো এই 'টেলিগ্রাম' দেখাবি? বুঝিলি?

চাকর বললে—আজ্ঞে বাবু।

পুরী এসে হাজির হয়েছি, বেলাদির ঘরে প্রবেশ করতেই পাশে তাঁর একজন নার্শ দেখতে পেলাম।

আমি ঢুকতেই নার্শ বললে—হোপ্‌লেস, কোন আশা নেই। আপনিই কি বিনোদবাবু?

—হ্যাঁ, এখন কি ওঁর জ্ঞান আছে?

—না, এখন তো সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

কাছে গিয়ে বসলাম—হাতে বেলাদির একখানা রক্ত-মাখা কাগজ, আমি ছাড়াতে চাইলুম কিন্তু পারলুম না।

নার্শ বললে—এই তিন দিন থেকে ঐ কাগজখানা হাতে একই অবস্থায় দেখছি। প্রথম দিন কেবল বলেছেন এখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাব—কত খুশী হবেন এখানা পেয়ে।

চোখে ঝাপসা দেখছিলাম—পাশের সেই বড় ছবিখানার পর্দা কে যেন সরিয়ে ফেলেছে, আমি ভাল হ'য়ে বেলাদির পাশে বসলাম। এবার তিনি বড় ছবিখানার দিকে পাশ ফিরে শুলেন—একবার চোখ মেলে সেখানার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বুজতে লাগলেন—সেই বোজা-চোখের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল দু'ফোটা অশ্রু!

তারপর?

শেষ।—

শ্মশানে অনেক যুবক এসেছিল—সকলের মুখেই শুধু

বেলাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কেবল আমি তখন বলতে পারি নি তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাও।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে বেলাদির ঘরে এলাম. ভাবলাম—ওর সমস্ত স্মৃতি আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।

তাঁর প্রত্যেকটি জিনিস বেলাদিকে আমাদের কাছে অমর ক'রে রাখবে।

সবচেয়ে বড় লোভ হ'ল ছবিগুলোর প্রতি—এক এক সময়ের এক একটা ছবি ব্যাথা ও করুণার ইতিহাস—তার মধ্যে বড় ছবিখানাই মনকে বেশী ব্যথা দেয়।

শ্মশানে থাকতে ওর একখানা ফটো তোলা হয়েছিল, সেখানাও সেই বড়খানার কাছে টাঙিয়ে দেখলাম, কেমন দেখায়!—

এ সময় আমি যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাচ্ছিলাম। বাড়ী ফিরবার সময় বেলাদির প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে এলাম।

আমার পড়ার ঘরে সবগুলো ছবি টানিয়ে রেখেছি দুপুরে দিদিও বেলাদির মৃত্যু-সংবাদ শুনেছেন, খোঁজ নিয়ে জানলাম দিদি কাঁদেন নি।

আমি তখন আমার বাইরের ঘরের দরজা সব বন্ধ করে খবরের কাগজে বেলাদির মৃত্যু-সংবাদটা দেবার জন্য লিখতে বসেছি।...

দরজায় মৃদুমন্দ শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর দিদির গম্ভীর কণ্ঠস্বর—বেণু, ঘরে আছিস?

—হ্যাঁ, আছি দিদি, এসো।

দিদি ঘরে এসে সোফার এক পাশে নির্জীবের মত আমার কাছে বসলেন, কম্পিত কণ্ঠে বললেন—বেলাকে জ্ঞান অবস্থায় ফিরে পেয়েছিলি, বেণু?

—না!

—কিছু বলেও যেতে পারে নি?

—না!

তখন কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছিল দিদিকে বেলাদির মৃত্যু-সময়ের বর্ণনাটা দেই, বার বার চেষ্টা করেও কিছু বলা হ'ল না।

দিদির নাক চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম—খুব লাল হয়েছে, দেখে মনে হল—এই মাত্র দিদি খুব করে কেঁদে এসেছেন।

বাইরে আবার পিয়নের কণ্ঠস্বর—বাবু ফেরত ৫০৲ মানি অর্ডার, বেলা দেবীর নামে।

দিদি একবার আমার দিকে আর একবার বেলাদির ও সুধীর বাবুর ফটোর দিকে চাইলেন—আর তাঁর চোখের কোণ বেয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা, সে-ধারা থামতে চায়না, কিছু মানতেও চায় না।

আমি চারদিকে অন্ধকার দেখলুম, তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের উপর মাথা রাখতে দিদি আস্তে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।



প্রতীক্ষা

গল্প

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এস

কোথা হইতে এতটুকু একটা ক্ষুদ্র জীব টীয়া একটা উড়িয়া আসিয়া নিতীনদের সংসারে মস্ত এক বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিল।...

পঁয়ষট্টি টাকার কোঠা হইতে একবারে সহসা আশীর প্রসাদে উঠার সংবাদটা নিতীন যেদিন বহন করিয়া আনিয়া সরমার নিকট নাচিতে শুধু বাকী রাখিতেছিলেন, সেইদিন সেই সময়েই টীয়াটার আবির্ভাব!

অবশ্যই টীয়াটাকে ধরিতে নিতীনকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ যখন সে আসিয়াই উঠানের কোণের একটা চারাগাছে বসিবার পর ক্রমশঃ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখনই সরমার ইঙ্গিতে নিতীন একখানা মোটা কাপড় চাপা দিয়া তাহাকে ধরিতে পারিয়াছিলেন।...

নিতীনের সংসারটী ক্ষুদ্র হইলেও এবং মোক্ষদা আসিয়া দুইবেলা বাটনাবাটা, জলতোলা, ও বাসনমাজা সারিয়া দিলেও, অনেক কাজ কিন্তু করিবার থাকে বেচারী সরমার। তাই স্ত্রী সরমা যখন দেখিলেন টীয়াটাকে স্বামী ধৃত করায়, তাহার থাকিয়া যাইবার লক্ষণই দেখা যাইতেছে, তখন মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ধরেছ, ভালই করেছ কিন্তু ও পাপ আমি ঘরে রাখবনা। একে তো সংসারের কাজে অবধি নেই, তায় আবার পাখীর তা করে কে?

উত্তরে নিতীন বলিয়াছিলেন,—ধরতে ইসারা কোরেছিলে, তাই ধরেছি। এখন্ রাখতে হয় রাখ, বিদেয় কোরতে হয় কর, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মাহিনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টীয়াটার আগমনীকে, লক্ষ্মীর দেওয়া দান বোলেই নিতীন মনে করিতেছিলেন।...

কিন্তু...বৎসর আষ্টেকের পুত্র মনটু যখন পরদিন প্রভাতে দেখিল যে,—পাশের বাটী হইতে তাহার নিজের যোগাড় করিয়া আনা খাঁচা সত্ত্বেও, মাতাপিতা ষড়যন্ত্র করিয়া টীয়াটীকে ঝি মোক্ষদার মারফৎ বিদায় করিতে বসিয়াছেন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মোক্ষদার ধার করিয়া আনা খাঁচাটীকে এমনই সে লুকাইয়া ফেলিল যে মোক্ষদাকে শেষে দেবতার নামে পর্য্যন্ত শপথ করিতে হয় যে সে কস্মিন্ কালে টীয়াটাকে স্পর্শ করিবেনা,—অতএব লইয়াও যাইবে না। তাহার শপথে, ভাগ্যে বালক মনটু বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাই রক্ষা, নচেৎ মোক্ষদা তো হতাশই হইয়া পড়িয়াছিল,—বুঝি বাড়ীওয়ালীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনা পিঞ্জরটীর দ্বিগুণ দাম 'গুণোগার' দিতে হয় তাহাকে! মাতার নিকট ভৎর্সনা মারপিট খাইয়া জব্দ থাকিলেও, পিতা যতক্ষণ বাটী থাকেন, ততক্ষণ তাহাকে পায় কে?

ইহার পর সরমার বিস্তর অনুরোধেও, মোক্ষদা পাখীটীকে সত্যই স্পর্শ পর্য্যন্তও করে নাই।... কিন্তু, ফলে সবচেয়ে মুস্কিল গিয়া বাধিল, নিতীনের; যেহেতু তিনিই উহাকে ধরিয়াছেন, উপরন্তু কোনও অনির্দ্দিষ্ট মালিকও আসিল না তাহার সন্ধানে,—এমনকি পথে পথে হাতে লেখা দুই চারিটা হারাণ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও। অবশেষে মন্টুকে ডাকিয়া, পখীটার কলরবের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া একদিন তিনি বলিলেন,—

দেখ তুই যদি পাখীটার মত খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দু'বেলা ভাল পড়া কোরে দিতে পারিস, তবেই ওটাকে রাখব, নয়ত আকাশের দিকে ওকে উড়িয়ে দেবো।

মনটু পাখীটীর দিকে তাকাইয়া সভয়ে উত্তর করে,—

না, বাবা, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া কোরে দেবো রোজ—তুমি পড়া নিও!

মনটুর পড়ার চীৎকারে, পাখীটাও কত কী বলে! সে জিজ্ঞাসা করে পিতাকে,—বাবা, ওবি কি বলে?

উত্তর হয়,—পড়ে। শুভ-সংবাদের দিনে আসিয়া অবধিই পাখীটা সকলকে আনন্দদান করিতে থাকিলেও তাহার তদারকের সমস্ত ভার গিয়া পড়িল নিতীনেরই উপর।

প্রথম প্রথম খাবার দিতে গেলে পাখীটা নিতীনের হাতে ঠোকরাইয়া দিত। দিনকতক বাদে যখন সে হিতকারী বন্ধুকে চিনিল, তখন হইতে ঠোকরাণ বন্ধ করিয়া, খাঁচার এককোণে গিয়া সে লুকাইত।

মন্টু মধ্যে মধ্যে পিতাকে বলে,—বাবা পাখীটা ধরনা একবারটী। আমি একটু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

নিতীন কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাকে ধরিতে ভয় পাইতেন।

দুই চারদিন ভাবিবার পর বশ মানাইবার একটা উপায় ঠিক করিলেন, মোটা কাপড়ের টুকরা দিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আনিতে হইবে, দেখাই যাক না কেন, সে কি করে। কিন্তু, কার্য্যতঃ ঐরূপ করিতে গেলে, সে পিঞ্জরের এ মোড় হইতে ও মোড় পর্য্যন্ত ছুটাছুটিই করিতে থাকে। নিতীনের রাগ হয়, ইহাকে এত আদর যত্ন করা হইতেছে, যখন তিনি যাহা খান, তাহারই অংশ তাহাকে দেওয়া হয়, রাত্রে শীত করে বলিয়া স্বহস্তে নির্ম্মিত চটের তৈয়ারী একটা ঢাকনি তাহার পিঞ্জরের উপর দেওয়া হয়, তবুও সে কী-না তাঁহাকে দেখিয়া পালায়? বেটা কী নিমকহারাম!

দুই একদিনের চেষ্টায়, নিতীন তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে লাগিলেন। Balzac এর একটা গল্প পড়িয়াছিলেন নিতীন, সেটা একদিন সহসা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হয়। নিতীন ভাবেন, কোথায় কোন্ মরুভূমিতে কে একজন পথভ্রান্ত সৈনিক যখন একটা ব্যাঘ্রকে পোষ মানাইয়াছিলেন তাহার গলায় মাথায় হাত বুলাইয়া বুলাইয়া এবং সেই হাত বুলানর আরাম পাইয়া ব্যাঘ্রটী আরামে বিড়ালের মত ঘড় ঘড় করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত তখন তিনি কিনা, দুর্দ্দান্ত ঠোঁট ওয়ালা হইলেও সামান্য একটা পাখীকে পোষ মানাইতে পারিবেন না?

দুই একদিনের চেষ্টায় দেখা গেল পাখীটার ধরফড়ানি' ভাব যেন কমিয়া আসিয়াছে, ক্রমশঃ সে চুপ করিয়া থাকিতে শিখিয়াছে। তাহার সপ্তাহ খানিক বাদে দেখা যায় হাত বুলাইয়া লইবার জন্য সে আপনিই গলাটা উঁচু করিয়া ধরে। খানিকক্ষণ হাত বুলাইবার পর সে আরামে চক্ষু বোজে। পোষ মানিতে দেখিয়া নিতীনের মনে বেশ আনন্দ লাগে।

আর, মন্টু? চপলতাবশতঃ সে তাহাকে পিতার কোলের বাহিরে দেখিলেই, তাহার লেজ ধরিয়া টানে। কামড়াইয়া দিবে, সরমার নিকট হইতে এই ভয় পাওয়া অবধি সে তাহার ঠোঁটটার নিকটে অঙ্গুলী লইয়া যাইতে সাহস করে না বটে কিন্তু মন্টুর নির্ম্মম ব্যবহারে পিতা বলেন ছিঃ তোমার পাখী তুমি কিনা ওরই পেছনে অমন কোরে লাগ ওর বুঝি কষ্ট হয় না?

মনটু দেখে সত্যই পিতার ক্রোড়ে শায়িত শান্ত পাখীটা তাহাকে দেখিলেই ছটফট করিয়া উঠে। সেও আর তাহাকে খোঁচা দেওয়া বন্ধ করিল। এবং পিতার কোলে থাকা অবস্থায় তাহার মাথায় সেও কচি আঙ্গুল বুলাইতে লাগিল।

আগে আফিসের ফেরৎ নিতীন বাহির হইয়া যাইতেন,—বন্ধুদের মজলিসে বা কোনও আড্ডায়। এখন পাখীকে বশ মানাইতে গিয়া, নিতীন আপন অজ্ঞাতসারে ঘর-বশ হইয়া পড়িয়াছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মনটুর ও বেশ লেখাপড়া হয়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সরমাও পাখীটার প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

শুভদিনে আগমন করিয়া চারিদিকে শুভ-চিহ্ন করায় সরমা পাখীটার নামকরণ করিয়াছিলেন,—শুভী অপভ্রংশে শুবি।

নিতীনের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সরমা আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন না, মধ্যে মধ্যে বলিয়া বসেন,—বুড়ো বয়সে, এক খেলা হয়েছে বেশ তোমার। মনটুর বাবা বোলে মানায় এখন তোমাকে। দুই-একদিন বলার পর, একদিন নিতীন সহসা ভাবিয়া চিন্তিয়া জবাব দিলেন,—এতদিন মনটুর বাবা বলে অন্য একজনকে মানাত বুঝি? জবাব শুনিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া সেই অবধি সরমা সে প্রসঙ্গ আর উঠান না।

সরমা ভাবেন,—মন্টু হওয়ার পর হইতে স্বামীর কোলে আদৃত কোনও সন্তান উপহার দিতে তিনি পারেন নাই কাজেই স্বামী বোধ হয়, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছেন।

একদিন সত্য সত্যই নারী-হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়,—তিনি নিতীনকে বলিয়া বসেন,—ছেলেপুলে ত আর হল না; এখন সুবিকে নিয়েই কোলজোড়া কোরে থাক।

নিতীন হাসিয়া বলেন,—না হয়েছে, ভালই হয়েছে। যে দুর্ভিক্ষের বাজার,—ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না একটা সন্তানের চেয়ে যে সুবির খরচা ঢের কম তা কি আর বোল্‌তে হবে? সরমার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠে।

নিতীনকে দেখিলে ইদানীং সুবি যেন ক্ষেপিয়া উঠে,—ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। তিনি যেদিকে থাকেন; সেইদিকে আসিয়া খাঁচার মধ্য হইতে সে ঠোঁট বাহির করিতে থাকে। নিতীন মনে করেন,—আহা! মানুষের মত কথা যদি বলিতে পারিত সে, তাহা হইলে, সে নিশ্চই তাঁহাকে কাছে আসিবার জন্য ডাকিত! নিতীন সুবির নিকটে গিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন।

দিনের আলোক ফুরাইবার আগেই নিতীন আফিস হইতে ফিরিবার চেষ্টা করেন। জলযোগের সময়, সুবির বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, বিচিত্র সুর, মানবের কথা অনুকরণ চেষ্টায় আনন্দকর 'কপচানি' এবং তাহাকে দেখিয়া উল্লসিত হওয়ার কালে তাহার মুখের অস্বাভাবিক দীপ্তি কী সুন্দর! কী মধুর!—নিতীনের প্রাণে সেসব যেন সঙ্গীতের তরঙ্গ লীলা সৃষ্টি করে!

আহা সুবিটা দিবারাত্র খাঁচায় থাকে, নিতীনের মতন তো সে স্বাধীনতা পায় না। উহাকে একটু একটু স্বাধীনতা দিলে হয় না? নিতীন ভাবিতে থাকেন—কিরূপে দেওয়া যায়?...

একবার মনে হয়,—দাঁড়ে রাখিলে মন্দ হয় না বোধ হয়। কিন্তু, সহসা মনে পড়ে, নিরাশ্রয় হওয়ার দরুণ, যদি কোনও বিড়াল তাহার উপর উৎপাত করিয়া বসে! রাত্রে পিঞ্জরের ভিতর সে নিরাপদ থাকুক যেমন মানুষে শয়ন করে নির্ব্বিঘ্নে দরজায় অর্গল লাগাইয়া, আর দিনের বেলায় উপভোগ করুক পিঞ্জরের বাধাবিহীন উদার দিনের আলো আর বাতাস—।

এই সমস্যাটী নিতীনের মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে একদিন সহসা সরমা সংবাদ দিলেন,—শুনছ গা, তোমার সুবি আজ দুপুরবেলা, খাঁচার দরজাটা ঠোঁট দিয়ে খুলে, দরজা মাথা দিয়ে ঠেলছিলো, এমন সময়ে আমার নজর পড়ে যায়। আমি গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে তারই ওপর দড়ি দিয়ে বেঁধে দিই! আমার মনে হয়, দড়ি কাট্‌তে ওর কতক্ষণই বা লাগবে!...কোন্‌দিন পালাবে ও দেখে নিও।

সরমা পরামর্শ দিলেন, তাহার ডানা দুইটা, ছাটিয়া দিতে। যদি কখনও খাঁচার বাহির হয়, তাহা হইলে সে যাহাতে উড়িতে না পারে। নিতীন ভাবিলেন,—ডানা কাটিয়া দিলে, যদি খাঁচা হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া সে উড়িতে না পারে, তাহা হইলে সে একেবারে প্রকাণ্ড হুলো বিড়ালের গর্ভে চলিয়া যাইবে!...বাবারে সেও কী সম্ভব?...আত্মরক্ষার পথ বন্ধ করা।

সে সময়ে দেশে ডোমিনিয়ান্‌ স্ট্যাটাস ডোমিনিয়ান স্ট্যাটস বলিয়া কাগজ ওয়ালারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন—নেতৃবৃন্দেরাও। নিতীন স্থির করিলেন,—সুবিকেও ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত শাসন দিতে হইবে। তাহার পায়ে কড়া লাগাইয়া, কড়ার ভিতর পিতলের শিকল গলাইয়া শিকলের অপর দিক সংযুক্ত করা হইবে; খাঁচার দরজার প্রান্তে। দরজাটা খোলা থাকিবে দিনের বেলায় তাহার অবাধ গতি বিধির জন্য, উদার আলোবাতাস গ্রহণ জন্য। আর রাত্রে খাঁচার ভিতর তাহাকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিরাপদে রক্ষা করা হইবে। তাহার পর, যতই সে যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে, ক্রমশঃ ততই তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে,—তখন সে ইচ্ছামত খাঁচায় থাকিতেও পারিবে আবার বাহিরে গিয়া বেড়াইয়া ঘরে ফিরিতেও পারিবে।

যেমন ভাবা, তেমনই কাজ!…সুবি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও খুসী,—সে ইচ্ছামত বাহিরে আসা, আবার ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি পাইলে, খাঁচার ভিতর গিয়া আশ্রয় লয়। বাহিরে যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণ সে মনের আনন্দে খাঁচার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গান গায় এবং কথা বলিবার চেষ্টা করে।

নিতীন মনটুকে যেমন ঘণ্টা দুই রোজ পড়ান, তেমনই সুবির পিছু ও অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রত্যহ ব্যয়িত হয়,—শিষ, 'রাধাকৃষ্ণ' 'সীতারাম' বুলি শিখাইবার জন্য।

মাস খানেক বাদে দেখা গেল,—মানবের ভাষা অপেক্ষা শিষ দেওয়াটা অবিকল সে নিতীনের মতন করিয়া শিখিয়াছে। দূর হইতে সুবির শিষ শুনিলে নিতীনের মনে এক অপরূপ আনন্দ হইত,—হ্যাঁ, সুবি তাঁহার প্রতীক বটে!…সুবিটা বোধহয় বুদ্ধিমান্‌ও।

মনটু আর তার বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে নিতীনের অসাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া ডালপালা সুবির গায়ে গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে বিরক্ত করিত। কয়েকদিন ধরা পড়িয়া সরমার নিকট তাহারা ভর্ৎসনাও খাইয়াছে। কিন্তু বালক তাহারা,—তাহারা কী সহজে ছাড়ে? শেষকালে, দেখা গেল, সুবি নিজেই আত্মরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে দৃশ্যও আবার ভারি মনোরম!… প্রথম প্রথম ছেলেদের দেওয়া কচি ডালপালা সে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিত—কিন্তু তাহাতেও যখন তাহারা অনবরত ঐরূপ খেলা দেখিতে চাহিল তখন সুবি মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া বসিল।

মনটুর মতন ছোট ছেলেদের নিকটে থাকিতে দেখিলেই, সুবি কামড়াইতে যাইতেছে এইরূপ ভঙ্গীতে গলা বাড়াইয়া গাল ফুলাইয়া ফোঁ ফোঁ শব্দে তাহাদিগকে তাড়া করিত। ফলে,—সত্যই ছেলেরা ভয় পাইয়া তাহার নিকটে যাওয়া বন্ধ করিল। নিতীন দুই একদিন তাহাকে ঐরূপ ভয় দেখাইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। ছেলেরা, সুবির ফোঁ ফোঁ শব্দ আর ভঙ্গী দর্শনে হাসিয়া উঠিত বটে কিন্তু শেষকালে সত্যই তাহারা ভয় পাইয়া দূরে থাকিত। নিতীন বলিতেন,—সাবাস সুবি! আর ছেলেদেরকে বলিতেন, খবরদার ওকে তোরা রাগাসনি, দেখছিস্ তো, সত্যি, সত্যি কোন্‌দিন কামড়ে দেবে তোদের।

ইদানীং তাহার রাগটা এমনই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সরমাকে নিকটে থাকিতে দেখিলেও সে ঐরূপ করিত। নিতীন একদিন সরমাকে বলিলেন,—তুমি ওর কিছু কর না যেমন মোটে তেমনি তোমারও সঙ্গে ও রঙ্গ জুড়েছে। ঠিক বোঝে,—কে কাকে ভালবাসে! সরমা রাগ করিয়া বলিলেন,—নাও, বাপু। তোমার ভালবাসার পাখিটিকে তুমি খাঁচায় পোরগে, কোন্ দিন কামড়ে টামড়ে দেবে। নিতীন বলেন,—ভাল কোরে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, ওকী সত্য সত্যি কামড়াবে বোলে ওই রকম কোরছে তোমায়।

নিতীন মনে মনে বলেন,—সুবি আসল জহুরিই বটে! নিতীনের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়, যখন তিনি দেখেন, তাহার উপদেশ মত, মনটু যেদিন হইতে সুবিকে বিরক্ত করা ছাড়িয়া দিয়া আদর করিতে শিখিয়াছে বা ভালমন্দ খাবারের ভাগ দিতে অভ্যাস করিয়াছে, সেইদিন হইতেই—মনটুকেও ঐরূপ ভয়-দেখানও সে বন্ধ করিয়াছে।

একটী বৎসর পরে।

একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিতীন শুনিলেন,—সুবির খাঁচার দরজা খুলিয়া দিয়া, তাহাকে বাহিরে আনাইয়া মিষ্টান্নের অংশ মনটু দিতেছিল…এমন সময়ে কখন তাহার পা হইতে আংটা খুলিয়া যায়!… ঐরূপ অবস্থাতেও সে খাঁচার উপর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে…কিন্তু সহসা মনটুর দৃষ্টি, সুবির পায়ে পড়ায় সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং যেমনই একটা টুল আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া তাহাকে ধরিতে ছুটে; অমনই সুবি নিজেকে দেখে, সম্পূর্ণ স্বাধীন! সম্মুখে প্রশস্ত যায়গা,—তাহার উড়িবার……সে উড়িয়া রান্নাঘরের চালে গিয়া বসে।

ঠিক এমনই সময় নিতীন আসিয়া পৌঁছেন,—মনটু আঙুল দিয়া সুবির স্বাধীনতা স্পৃহা দেখায়……চালে বসিয়া সুবি মনের আনন্দে অনর্গল বকৃতেছিল। এমন সময় নিতীনের 'আয়, আয়,' রবের গলা পাইয়া তাঁহার

দিকে সে ফিরে। আহা! সত্যইত, নিতীনের কাছে আসিবার জন্য সে সেই দিক পানে উড়িতে চেষ্টাও করিল। এমন সময়ে, কোথা হইতে কতক গুলা যম-সদৃশ কাক আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঠোক্‌রাইতে চেষ্টা পাইল। সে বেচারা আত্মরক্ষার্থে ইতস্ততঃ উড়িয়া শেষকালে এক নারিকেল গাছে বসিল। সেখানেও কাকেরা তাহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। এইবার সে নিতীনদের বাটীর উপরে চক্রাকারে কয়েক বার উড়িল কাকেরা তখনও পিছু লাগিয়া। উড়িতে উড়িতে কোথায় যে সে চলিয়া গেল, তাহার নাগালই পাওয়া গেল না। ক্রমশঃ মহাকাল সন্ধ্যা আসিয়া দুটী প্রাণের মধ্যে চির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল। তবু নিতীনের আশা হয় যখন তিনি তাহাকে অত ভালবাসেন, তখন সে আসি-বেই। তিনি লণ্ঠন লইয়া পল্লীর বুকে বুকে অনুসন্ধান করিলেন,—গলার রব ছাড়িয়া দিয়া যদি আওয়াজ শুনিয়া আসে সে……কিন্তু বৃথা।…পরদিন প্রভাতে অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। আফিসে যাইবার সময় নিতীনের চক্ষু ফাটিয়া সত্যই জল আসিল।

আফিসের যে ঘরটীতে তিনি বসিয়া কাজ করেন, তাহার পার্শ্বে জানালা, জানালার নীচে বাগান—বাগানের মধ্যে অদূরে ঝাউগাছ। ঝাউগাছে কতগুলি টিয়া লাফালাফি করে। এতদিন তাহার ঐটুকু জানা ছিল না। সুখির যে স্বর রহিয়া রহিয়া তাঁহার কানে বাজিতে ছিল, তাহার প্রতীক্ ওই ঝাউগাছে দেখিয়া, তাঁহার যেন সেদিন চমক লাগিল। টীয়াদের সেই কলরব কী সুন্দর! হাতের কলম ফেলিয়া নিতীন তাহাদিগের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াই থাকেন!……মনের বেদনার মধ্যেও কে যেন মৃদু স্বরে আশ্বাস দেয়,—সে আসিবে সে যাইবে কোথায়?…নিতীনের শিখান শিষ তাঁহার কানে গভীর ভাবে বাজিয়া উঠে, ছেলেদের দুষ্টামী দেখিলে মনে পড়িয়া যায়,—তাহার সেই বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে ফোঁ ফোঁ শব্দে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ। সে কী নিতীনকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারে?

দিনের পর দিন যায়, তবু সে আসে না। নিশ্চয়ই কোনও শকুনি বা চিল তাহাকে উদরসাৎ করিয়াছে। কিন্তু অত সন্ধানেও তো কোথাও পাওয়া গেলনা। তবে সে গেল কোথায়?

একএক বার মনে হয়,—হয়ত সে টিয়ার ঝাঁকে মিশিয়া পড়িয়াছে। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে, সে কী আসিবে?

মনটুর হাত ধরিয়া সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীর আশে পাশে পুষ্করিণীর ধারে, গাছের তলায় তলায় নিতীন ভ্রমণের অছিলায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার মনে আশা হয়, সুখির পায়ে ওই যে পিতলের কড়াটি আছে সেটী যেদিন বন্য টিয়ার ঝাঁক দেখিয়া ফেলিবে সেই দিন নিশ্চয়ই তাহারা তাহাকে দূর করিয়া দিবে তখন তাঁহাকে হেথা সেথা দেখিলে নিশ্চয়ই আসিবে, আসিয়া হয়ত হাতে মাথায় ঘাড়ে গিয়া বসিবে। কিন্তু দুই মাস কাটিয়া যায় সে ত আসে না। তবে? তাহাকে কেহ ধরিয়াছে কী?

তবু মনে আশা জাগে ছাড়া পাইলে সে তাঁহার নিকট ফিরিবেই ফিরিবে। কিন্তু কবে, কে বলিবে নিতীনকে?……

আগুন

গল্প

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হাঁ আগুন···আগুন, আগুন।...রক্তের মত লাল আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে, অনবরত জ্বলছে··· নেই বিরাম, নেই বিশ্রাম সেই জ্বলার। কে জ্বালিয়েছে কেন জ্বালিয়েছে জানি না, তবে জ্বলছে..লাল আগুন প্রদীপ্ত আগুন জ্বলছে অহরহ। রক্তের নীল শিরায় শিরায়, দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই আগুনের তরল স্রোত ছুটছে। দেহে জ্বলছে আগুন, বুকে জ্বলছে আগুন, মাথায় জ্বলছে আগুন···সারাবিশ্বময় নৃত্য করছে আগুনের লোল-জিহ্বা। না না, সে আগুনে জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই...শুধু একটা অদ্ভুত অনুভূতি আছে·· ···আর আছে তার মদির নেশা।

আমি আগুনকে ভালবাসি।

এখন আমার আপনার বলতে আছে এই আগুন, সারা বিশ্বময় সারা আকাশে বাতাসে যা ভরা রয়েছে।

তাকে দেখতে ছিল ঠিক আগুনের মত।—যেন একটা চঞ্চল প্রদীপ্ত শিখা······ চোখ ঝলসান জ্যোতি যার দিকে বেশীক্ষণ চাইলে মাথা ঝিম্‌ঝিমিয়ে উঠ্‌ত, দেহের অঙ্গ প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে আস্‌ত শিথিল······ শরীর সমস্ত শক্তি সমস্ত অনুভূতি এসে জড় হত চোখের দুয়ারে। চোখের পাতা ফেল্‌বার শক্তিও থাকৃতনা ......সমস্ত শক্তি সে যেন আমার দেহ থেকে টেনে নিত তার দুই আয়ত আঁখির উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে। তার সামনে আমি একেবারে পঙ্গু হ'য়ে যেতাম, আর ভুলে যেতাম নিজের সত্তাকে। যেন স্বপ্ন······হাঁ, সে ছিল আমার কাছে ঠিক একটা স্বপ্নের নেশা।

একটা জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত...একটা চঞ্চল আগুনের শিখার মত ছিল তার সৌন্দর্য্য। আগুনের লাল শিখাটির মতই সে ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত। বিদ্যুৎ হাঁ অনেকটা বিদ্যুতের মতই। তাকে যেন আমি ধরতে ছুঁতে পারতাম না, অথচ সে ধরা দিত আমার দুই বাহু পাশের মাঝে। তার দেহের আগুনের ভেতরও ছিল না কোনও দাহিকা শক্তি কোনও জ্বালা যন্ত্রণা। আমার দুই বিশাল বাহু পাশের মাঝে সে যেন ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু সেই জ্বালা যন্ত্রণাহীন রূপ তার পড়ত উপচে, উথলে।

সে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকৃত···হ্যাঁ, আমার বাহু-পাশের ভেতর এলিয়ে পরে সে আমার দিকে চেয়ে থাকৃতে তার দুই আয়ত আঁখি দিয়ে। আমি মুগ্ধ হ'য়ে পড়তাম, দেহের সমস্ত শক্তি আস্‌ত নিবে...বিহ্বলের মত শুধু তার দিকে চেয়ে থাকৃতাম। সে হেসে উঠত; বলত অমন করে চেয়ে আছ কেন তুমি?

হাসি···হাসিও ছিল তার অস্ত্রের ঝন ঝনানির মত। ইস্পাতের তীক্ষ্ণ অসি যেন পরস্পরকে চুম্বন করে' হেসে উঠত; তার হাসির ভেতর দিয়ে।

বলতাম—এম্‌নিই...তোমাকে দেখছি...আমার খুব ভাল লাগে এম্‌নি করে, তোমাকে দেখতে।

আবার জেগে উঠত অস্ত্রের সেই ঝন্ ঝনানি। সত্যিই একটু শিউরে উঠতাম...ভাবতাম, কেমন করে বেঁধে রাখব এই উজ্জ্বল নীল শিখাটিকে···গতি যার বিদ্যুতের মত চঞ্চল, হাসি যার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঝন ঝনানির মত।

একটা পাৎলা কাঁচের গেলাস...তার ভেতর যেন কানায় কানায় পূর্ণ মদির লাল সুরা...উচ্ছল সুরা। সত্যিই তার দেহের পাৎলা শুভ্র ত্বকের ভেতর দিয়ে যৌবনের মদির লাল সুরা উঠত জ্বলে। কাণায় কাণায় তা পূর্ণ। আমার বাহুপাশ থেকে মাঝে মাঝে সে এঁকে-বেঁকে পালিয়ে যেত,...তার দেহের লাল সুরা আগুনের মত জ্বলন্ত জীবন্ত সুরা উঠত টলমল্ করে, পড়ত উপচে।

কিন্তু কে জানত যে কোন্ একটা অদৃশ্য হস্তের নিষ্ঠুর আঘাতে সেই ক্ষীণ সুরা পাত্র যাবে চুর্‌মার্ হ'য়ে আর সেই গলিত জ্বলন্ত সুরা, আগুনের মত যা লাল, পড়বে

সারা বিশ্ব ময় ছড়িয়ে—আকাশ বাতাসকে দেবে জালিয়ে———আবার দেহ-মনও বাদ যাবে না তার স্পর্শ থেকে—চোখের সাম্‌নে সমস্তই দেখতে হ'বে লাল, আগুনের মত লাল।

তার একটা বড় সাধের লাল শাড়ি ছিল। তার ত্বকের মতই তা ছিল পাৎলা। তার চঞ্চল তনুটিকে সেই রক্তমাখা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে, সিঁথিতে লাল সিঁদুরের সরু একটা দাগ কেটে, কপালের ওপর একটি ছোট্ট গোল সিঁদুরের টিপ পরে, আর দু' পায়ে লাল আল্‌তা মেখে সে যখন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াত তখন মনে হ'ত আমার সাম্‌নে বুঝি আগুন জল্‌ছে দাউ দাউ করে! পৃথিবীর সমস্ত ম্লান আলো এসে বুঝি তার দেহটিকে চুম্বন কর্‌ছে তার তনুর ওপর পড়ছে লুটিয়ে।

বলতাম: মিতা···সুন্দর লাগছে তোমায় দেখতে।

তার কপোল হ'য়ে উঠত আরও লাল, আরও উজ্জ্বল। তার কপোলের ওপর আমার ঠোঁট আসত নেবে। অনুভব করতাম একটা কি রকম অপ্রকাশ্য তাপ···একটা কি রকম নেশা! বারে বারে তারে ধরে করতাম চুম্বন, নিবৃত্ত কর্‌তে চাইতাম সেই নেশাকে তার তনুর সমস্ত ঔজ্জ্বল্যটুকুকে নিঙরে নিয়ে! কিন্তু সুরা দিয়ে সুরার নেশা তৃপ্ত করতে যাবার মতই তা হ'ত নিষ্ফল।

অফিস থেকে একদিন ফিরে দেখি ঘরের দুয়ার আমার রুদ্ধ। তার সেই স্মিত মুখ দুয়ারের পাশে সেদিন আমি দেখতে পেলাম না। পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেতর থেকে ক্ষীণ স্বর এল: খুলছি।

দরজা খুল্‌ল। দেখলাম তাকে···তার সেই দীপ্ত এসেছে ম্লান হ'য়ে, জ্যোতি এসেছে নিবে।

আকুল হ'য়ে উঠলাম। বললাম: কি হয়েছে মিতা... অমন করছ কেন?

সে বল্‌ল: এম্‌নিই···শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।

তাকে কোলে তুলে নিলাম। অবলীলাক্রমে তাকে শোবার ঘরে এনে নরম বিছানার ওপর শুইয়ে দিলাম। তার মুখে একটু ম্লান হাসি উঠল জেগে···বেলা-শেষের পড়ন্ত রৌদ্রের মত। বলল: ব্যস্ত হয়ো না মিতা··· নিশ্চই আমি সেরে উঠব।

কিন্তু মিথ্যে...সমস্তই মিথ্যে। ডাক্তারের সমবেত শক্তি, ওষুধের গুণাবলি, আমার আকুলতা, আর তার আশ্বাসবাণী···সমস্তই মিথ্যে।

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে!

সমস্তই ঠিক রইল···রইল না শুধু তার দীপ্তি। সোনার মত তার দেহ প্রতিমাটিকে সেই লাল কাপড়টা দিয়ে জড়িয়ে দিলাম। ফুল কিনে আন্‌লাম···সমস্তই গোলাপ, রক্তের মত লাল যাদের রঙ। তার দেহের ওপর সেই সমস্ত ফুল দিলাম বিছিয়ে।

শ্মশানের একপাশে...সেই ছোট্ট নদীটির একপাশে চিতা সাজান হ'ল। অতি যত্নে, অতি ধীরে ধীরে তার তনুটিকে কোলে করে' চিতার ওপর তুলে দিলাম। তার রক্ত অধরের ওপর একবার...শেষবার আমার চুম্বন দিলাম এঁকে।...

আগুন জলে উঠল। লাল আগুন···রক্তের মত লাল আগুন তার তনুটিকে ঘিরে নৃত্য সুরু করে দিল। সে আবার তার লুপ্ত দীপ্তি ফিরে পেল আগুনের পরশে।

আগুনের দীর্ঘ নীল শিখা আকাশের বুকে, হাওয়ার ভেতর নৃত্য করতে লাগল। তাদের ভেতর আমি দেখতে পেলাম যেন সেও নাচছে···সে যেন ফিরে পেয়েছে তার লুপ্ত গতি, লুপ্ত চাপল্য, লুপ্ত ঔজ্জ্বল্য।

পলক-হীন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আগুনের প্রদীপ্ত নীল শিখাগুলো পরিশ্রান্ত হ'য়ে, হ'য়ে এল নিস্তেজ। সেগুলো ক্রমশঃ শ্মশানের ধূসর ছাইএর কোলে পড়ল সুপ্ত হ'য়ে।

পশ্চিম আকাশের দিকে চাইলাম। আগুন, আগুন··· সেখানেও লেগেছে আগুন। দিনের চিতা সেখানেও উঠেছে জলে—মেঘের বুকে, আকাশের বুকে সেই আগুন পড়েছে ছড়িয়ে রক্তের মত লাল যার রঙ—চোখে ঝলসান যার দীপ্তি! ছোট্ট নদীটির বুকে এসে পড়েছে সেই জলন্ত ছায়া...সেখানেও যেন জলে উঠেছে আগুন।

আগুন, আগুন···আকাশে লেগেছে আগুন, জলেতে লেগেছে আগুন, আমার দেহ মনে চোখেও জলেছে আগুন—রক্তের মত লাল যার রঙ আর বিদ্যুতের মত চপল যার গতি।

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রী সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস্

ছয়

বিদায় বিধুর হিয়া মন্থিত
　　　　দারুণ দীরঘশ্বাস ছাওয়া
প্রেমিক-নয়ন জল-গ্রন্থিত
　　　　রঙীন বসন্তের হাওয়া।
এই চেস্‌নাট্‌ চাইভের শ্যাম শোভায়
　　　　এই উইলোর নয়ন-জল ঝরা—
বন-ডেজীর সিতাঞ্চল হিন্দোলায়
　　　　পপী কেশর রোমাঞ্চন ভরা—
নবীন-বসন্তের লক্ষ্য গো
　　　　শুধু বন বনান্তর ধাওয়া,
কোন্ উন্মাদন তার মন্ত্রে গো
　　　　কোন্ মন-কেমন করা হাওয়া!
আজ ধন্য সার্থক সূর্য্য হায়,
　　　　আজ পুণ্য চক্ষের দিঠি
এলো দিন-দিনান্তের আকাঙ্ক্ষায়
　　　　তার-মুগ্ধ সুন্দর চিঠি।

——

'For men may come and men may go' হল।

সাত

[চিঠি]

বলি ও বন্ধু প্রিয়
হবে কি মার্জনীয়
আমার এই লিপির লেখা
　　　　যদি আজ তোমায় ডাকে?

যেথা এই বাংলা দেশে
চাঁপাবন দাঁড়ায় ঘেঁসে
তটিনীর জল দেখা যায়
　　　　তৃণশ্যাম পথের বাঁকে।
আছে যে বন্ধুপাখী
সে আজি থাকি থাকি
উঠিছে ডাকি ডাকি,—
　　　　ও কিসের খবর পেলে?
কালো ঐ দীঘির জলে
আলোকের মাণিক ঝলে
রূপালি মাছের সারি
　　　　সাঁতারে ডানা মেলে।
উদাসী তালের গাছে
বাতাসের বেদন বাজে
কী কথা সজনে ফুলের
　　　　কাণেতে কয় মধুপে?
সবুজের প্রাণের বেদন
করিতে ফুল নিবেদন
একথা মনের দ্বারে
　　　　ঘুরে যায় চুপে চুপে।
ওগো ও বন্ধু মম
জীবনে এই প্রথম
সবুজের এই আবাহন
　　　　এল আজ পাখীর ডাকে
তুমি ত অনেক দূরে
বসিয়ে তুষার পুরে,
একথা লিপির রূপে
　　　　পাঠানু তাই তোমাকে।

—

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্রগুপ্ত পিতা মহাপদ্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নন্দ বংশের উচ্ছেদ সাধনের কারণ হইয়া উঠিলেন। পিতা বিন্দুসারের অন্যায় আচরণে অশোক ক্ষিপ্ত হইয়া চণ্ডাশোকে পরিণত হইলেন। অন্ততঃ এরূপ ইতিহাস এক-শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং অশোকের হস্তে তদীয় জেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম এবং তদীয় ৯৮ জন ভ্রাতার নিধন কল্পনা পর্য্যন্ত কোন কোন ঐতিহাসিক করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য অন্য শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ এই পরিকল্পনা অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণান্তর ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক, অশোককে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার মানসেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃতি পূর্ব্বযুগেও যেমন চলিয়াছিল সেই রূপ পরবর্ত্তী যুগেও যে না চলিয়াছিল তাহা নহে। তদুপরি ভারতের ইতিহাসে পিতৃদোহিতার আখ্যানও বড় অল্প নহে। এবং তাহার ফলে ভারতের বহুতর সর্ব্বনাশ সাধিত যে ঐতিহাসিক যুগেও হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবশ্য বঙ্গের সিংহবাহু, বিজয় সিংহের আখ্যানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক যুগ বাদ দিলেও ভারতের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনেও দেখা যায় যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনেক স্থানে এক ভীতি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব বিদ্যমান। যদিও পণ্ডিত চাণক্য তাঁহার রাজনীতিতে পিতাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যথা :—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ"।

কিন্তু ভারতের জীবনে কি এই উপদেশ সর্ব্বথা গৃহীত হইয়াছে? যদি হইত, তাহা হইলে বোধহয় ভারতের অনেক সাংসারিক জীবন দুঃখময় না হইয়া সুখময় হইত। এবং পুত্রেরাও হয়তো কুসঙ্গীর পরিবর্ত্তে পিতৃসঙ্গ লাভে যথেষ্ট পশুত্বের দিকে অগ্রসর না হইয়া মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইত।

এই প্রসঙ্গে শিবাজি ও পুতলাবাঈর মধ্যে পুত্র শম্ভুজি প্রসঙ্গে কথোপকথনের এক অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবাজি পুতলা বাঈকে বলিতেছেন; রাণী আমার ঔরসজাত পুত্র শম্ভা এমন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইয়া গেল কেন? পুতলা বাঈ উত্তর দিলেন, মহারাজ, আপনি যে শিক্ষা জিজিমাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া দাদাজি কুণ্ডদেবের (বা কানাই দেব) নিকট পাইয়াছিলেন সে শিক্ষা তো আপনি শম্ভাকে দিলেন না। আপনি তাহাকে পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পেশোয়ার আশ্রয়েই শিক্ষিত করিয়াছেন। এই কথোপকথনের ভিতর ভারতের পিতামাতাগণের চিন্তা করিবার কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পুত্রকন্যাকে পিতৃ মাতৃ আদর্শে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে পিতামাতাকেও যথেষ্ট সংযমী হইতে হইবে। এবং পুত্রকে "example is better than precept" নীতি অনুসারে শিক্ষিত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া পুত্রকে বাল্যে বা কৈশোরের উন্মেষেই পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বোর্ডিং এ প্রেরণ পূর্ব্বক শিক্ষাদানের যে পাশ্চাত্য বিধানের এক নব পদ্ধতি ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে তথাকথিত শিক্ষিত যুবক বৃন্দের মনোবৃত্তি কোনদিকে ধাবিত হইতেছে তাহা আশাকরি ভারতের গৃহে গৃহে অনুভূত হইতেছে।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে আগাছার ন্যায় উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা জীবনে কখনো পিতা দেখেন নাই, মাতা দেখেন নাই, ভগিনী দেখেন

নাই, কন্যা দেখেন নাই, গুরুজন কাহাকেও দেখেন নাই, কেবল দেখিয়াছেন যৌন সম্পর্ক। তাহারা ফতোয়া পাইয়াছেন সেক্স সাইকোলজি। আর এক শ্রেণীর কবির উদ্ভব ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে হইয়াছে, তাহারা নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্যের ছাপ তাহাদের কবিত্বে না দিলে যেনো তাহাদের কবিত্বের সৌন্দর্য্য আর পরিস্ফুট হয়না। ইহাদের এই আবর্জ্জনাময় সাহিত্য পাঠে দেশীয় যুবক যুবতী বৃন্দের মনো বৃত্তি যে কোন দিকে ধাবিত হইতেছে তাহার প্রমাণ লেকরোডে লেকের চারিদিকের স্থান গুলিতে সন্ধ্যা হইতে নিশাকাল পর্য্যন্ত একটু অভিনিবেশ সহকারে ভ্রমন করিলেই দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন। ভারত কোনদিনই প্যারী বা ক্যালি ফোনিয়ার আদর্শে স্বীয় উন্নতির পথ খুজিয়া লয় নাই। আমি আমার আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, যখনই ভারতের মনোবৃত্তি যৌন আকর্ষণে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে তখনই সে রাজত্বের পতন ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব।

উপস্থিত আমার বক্তব্য এইযে এই সব আবর্জ্জনাময় সাহিত্য বালক বালিকা দিগের সম্মুখে না ধরিয়া যদি সুসাহিত্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ভারতীয় অভিভাবকগণ পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষিত করিতেন তাহা হইলে বোধহয় আমাদের দৈনন্দিন সামজিক জীবন-যাপন সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইয়া যাইত। এবং পিতা মাতা যদি আদর্শ পিতামাতা রূপে পুত্র কন্যাকে লালন পালন করতঃ তাহাদের জীবন গঠন করিয়া তুলিতেন তাহা হইলে সত্য সত্যই তাহারা—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

বাণীর সার্থকতা করিতেন।

ভারতের বনীয়াদ গঠনকার্য্যে পুত্র কন্যার শিক্ষা বিষয়ে অতখানি ঔদাসিন্য প্রকাশ করিলে জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পরেনা। জাতীয় সৌধ বালক বালিকার মনোবৃত্তির উপরেই গঠিত হইবে। আর আমাদের ধুরন্ধর রাজনৈতিকগণ প্রচার করিলেন পিতা মাতার বাণী অবহেলা করিয়া দেশ উদ্ধারের কাজে লাগিয়া যাও। ইহারা রাজনৈতিক নামে ভূষিত হইতে পারেন কিনা, তাহা সাধারণের বিচার্য্য।

কনিষ্কের রাজনীতির মধ্যে পিতাপুত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ আস্থা ও সৌহার্দ্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠিত রাজনীতি। কনিষ্কের জীবদ্দশাতেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বশিষ্কের মৃত্যু হয়। সম্রাট কানিষ্কের স্বর্গারোহণের পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র হবিষ্ক পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার ন্যায় শক্তিমান সম্রাট ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐসময়ে মুদ্রাদিতে রাজ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করার রীতি ভারতে প্রচলিত হয় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাও ইঙ্গিত করেন যে সম্রাট কনিষ্কের সময় বুদ্ধদেবকে ভারতের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মে দশাবতারের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য এসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত প্রমাণাদি আমি এখনও পাই নাই।

কনিষ্কের রাজত্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমন্বয়ের এক চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান হইলেও হিন্দুদেবদেবীর পূজা করিতেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবশ্য এ প্রচেষ্টা তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধ তিরোধান কল্পে করিয়াছিলেন। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তন্নিবন্ধনেই বোধহয় তাঁহার রাজত্ব কালে ভারত বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। এবং সম্রাট কনিষ্কের এই প্রচেষ্টা মূলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক দেবদেবী যে হিন্দুধর্ম্মে স্থান পাইয়াছেন তাহাও অনুমান করা যায়। এসম্বন্ধে আমরা সম্রাট কনিষ্কের রাজনীতি অনেকটা সম্রাট আকবরের রাজনীতির সহিত ঐক্য দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের আর্য্য অনার্য্য মিলনের ন্যায় সম্রাট কনিষ্কও ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের সংমিশ্রণের এক সাধু প্রচেষ্টা তাহার রাজনীতি মধ্যে লক্ষিত হয় এবং তাহার সেই মহান প্রচেষ্টা মূলে শক, ইউয়েচী, ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক্ প্রভৃতি জাতি হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া যায়। এবং তাহাদের বহু শাখা উপশাখাও আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়া

পরিচিত। সেই যুগে সম্রাট কনিষ্কের এই সংমিশ্রণ প্রচেষ্টা রাজনৈতিক হিসাবে প্রভূত দূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কে বলিবে ভবিতব্য কোনদিন হিন্দু মুসলমানের এইরূপ সংমিশ্রণ করিয়া ভারতে মহা ভারত প্রতিষ্ঠার সূচনা করিবে কিনা। একজাতি অন্য জাতিকে সাম্প্রদায়িক ভ্রাতা হিসাবে বক্ষে টানিয়া লবে কিনা তাহা একমাত্র শ্রীভগবান জানেন।

হুবিষ্ক কুষান বংশের শেষ শক্তিমান সম্রাট। তাঁহার পর কুষান বংশের রাজ্য বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। কুষান রাজ্যস্থিত "স্যাসয়ান" নামক এক জাতি সিন্ধুনদ তট পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। ওদিকে দাক্ষিণাত্যে চের, চোল, পাণ্ড্যগণ শক্তিশালী হইয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র ও স্বীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট হুবিষ্কের পর কুষান বংশে বাসুদেব নামক এক রাজার আবির্ভাব দেখা যায়। ইহারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করেন কিন্তু ইঁহাদের রাজত্বকালের মুদ্রায় মহাদেবের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, কাজেই অবিসম্বাদিত ভাবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ইহারা পরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ করেন যে শেষ কুষান রাজগণ সকলেই বাসুদেব উপাধি গ্রহণান্তর রাজ্য শাসন করিতেন। কুষান রাজ্য অবসানের প্রাক্কালে কাবুল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। কাবুলে বসবাস কালে কুষানগণ পারসীক ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। এবং হুনগণ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাবুল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তীস্থান সমূহেই রাজত্ব করিতেন। কুষাণগণ পারস্যে আরব আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাবুলেই ছিলেন।

কুষাণগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে গুপ্ত সম্রাটগণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে যে ঐতিহাসিক যুগ আসিয়াছিল তাহাকে পুনরায় এক বিপ্লব যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ মধ্যবর্ত্তীযুগের ইতিহাস অনুসরণ করা একরূপ অসম্ভব। ঐতিহাসিকগণও ইহাকে (Transitional period) হাতবদলের যুগ বলিয়া গিয়াছেন।

ঐ সন্ধিক্ষণে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ও পতন হইয়া গিয়াছে। ভারতের ইতিবৃত্ত অনুসরণে ক্রমেই এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হয় যে একজন বলবান সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত না হইলে এইরূপ বিপ্লবই ভারতে চলিতে থাকিবে এবং তাহার ফলে ভারত হইতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি তিরোহিত হইবে। হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ধারণাই দৃঢ়ীভূত হয়—।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজার আবির্ভাব দেখা যায়। ইনি ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, কুমার দেবী নাম্নী এক লিচ্ছবী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি লিচ্ছবীগণ কর্ত্তৃক গৃহজামাতা রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন কিনা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। ইতিহাস অনুসরণে আমার মনে হইতেছে যে লিচ্ছবীগণ মগধে ইতিহাস প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে করদ রাজা রূপে বসবাস করিতে ছিলেন। এবং সম্ভবতঃ তাহারা মৌর্য্য বংশের অবসানে এবং মগধ রাজ শক্তির পতনে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পূর্ব্বযুগে দৌহিত্রকে মাতামহ স্বীয় উত্তরাধিকারী স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় যথা, কাশীরাজ সুতা অম্বা, অম্বালিকা অম্বিকাকে শাল্যরাজ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলে কাশীরাজ ঐ কন্যাদের গর্ভজাত পুত্রকে তাহার উত্তরাধিকারী স্বরূপ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই শাল্বরাজ একবার ঐ সর্ত্তে কাশীরাজ পুত্রী গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এই অজ্ঞাত নামা চন্দ্রগুপ্ত ঐ সর্ত্তে লিচ্ছবী রাজ কর্ত্তৃক গৃহ জামাতা স্বরূপ গৃহীত হইয়াছিলেন এবং ইতিহাসে ইহাও স্পষ্ট দেখা যায় যে লিচ্ছবীদিগের সাহায্যে তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমার এই সিদ্ধান্তের সাপক্ষে আর একটি প্রমাণ আছে। এই চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কদাপি তাহার পিতার নামে পরিচিত হইতেন না। ঐতিহাসিকের ভাষায় তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"His son and successor was always careful to describe himself as being the son of the daughter of the Lichhais" তিনি লিচ্ছবীদিগের সাহায্যে

অযোধ্যা মগধ ও গঙ্গানদীর উপকূল অনুসরণে প্রয়াগ অথবা এলাহাবাদ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

ইহার পর তদীয় পুত্র অথবা লিচ্ছবী রাজ পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। ইনি ৪০।৫০ বৎসরের রাজত্ব করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইনি সর্ব্বপ্রধান শিক্ষিত ও পারদর্শী রাজা বলিয়া খ্যাত। তিনি ভারতে এক ছত্রাধিপতি রাজা হইবার সঙ্কল্প করিয়া সে সঙ্কল্প যথেষ্ট কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত নিজের শাসনাধীনে আনেন ও এমন কি দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চির পল্লব রাজকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়া সুদূর মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি এতোদূর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ও তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া নিজ পরাক্রমের প্রমাণ চিরতরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখিয়া যান। তাহার ব্যক্তিগত বহু গুণাবলী ছিল। তিনি সুশিক্ষ বীণা বাদক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং অনেক পুস্তকাবলী সংকলিত করিয়াছেন। তিনি যদিও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাহার মৃত্যুর সঠিক সময় ইতিহাসে পাওয়া যায় না তবে তিনি যে অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত সুবিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাহা শাসন করিয়া যান উহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

ইহার পুত্র বিক্রমাদিত্য নামে তদীয় পরিত্যক্ত সিংহাসনে উপবেশন করেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে উজ্জয়িনীতে আর এক বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। তাঁহাকে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য অথবা শাকারি বিক্রমাদিত্য আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু Vincent smith সাহেব যাহা বলেন তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—

"The popular legends concerning 'Raja Bikkram' probably have been coloured by indistinct memories of Chandragupta whose principal military achievement was the conquest of Malowa, Gujrat, Sawrarthra or Kattiawar countries which have been ruled for several centuries by foreign Saka chiefs. These chiefs who had been tributary to the Kushans called themselves Satraps or great Sattraps."

কাজেই দেখা যাইতেছে যে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈত রহিয়া গিয়াছে। কাজেই কাহার সভায় যে নবরত্ন পণ্ডিতগণ ছিলেন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একটু দুষ্কর। উভয় বিক্রমাদিত্যই শকগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন কাজেই উভয়ে শাকারি। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৮০ খৃষ্টাব্দের শেষে শক সত্রপ উজ্জয়িনী পতি রুদ্রসিংহকে নিহত করেন এবং তৎকর্ত্তৃক অন্যান্য শকগণও বিজিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। যশোধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিও মুলতানের নিকটবর্ত্তী কারোরের সমর প্রাঙ্গণে ৫৩০ খৃষ্টাব্দে হুন অধিনায়ক মিহির কুলকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এবং এই জয় হইতেই নাকি যশোধর্ম্ম শাকারি নামে খ্যাত হন। এই মতদ্বৈতের সমাধান বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে যাহা হউক আমি এই দুইজনার ইতিহাসই যথা সম্ভব অনুসরণে যত্নবান হইব। এবং উভয়েরই রাজত্ব কালের আলোচনা পূর্ব্বক আরব্ধ আখ্যানের যে যে উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি তাহাই সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখিতে পাই তিনি বীরত্বাভিমানী নরপতি ছিলেন এবং তিনি বীরত্ব ব্যঞ্জক আড়ম্বর পূর্ণ উপাধিতে ভূষিত হইতে উদগ্রীব ছিলেন। এমনকি তিনি তাহার রাজত্বকালের প্রচলিত মুদ্রায় সিংহের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতেছেন এই রূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন। কাজেই ইনি যে পাণ্ডিত্য ও বিবিধ শাস্ত্র চর্চ্চা অনুরাগী ছিলেন তাহা মনে হয়না। নবরত্নের অবস্থান যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের সভাতেই অধিকতর যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া-

ছিলেন। তাঁহার বিবৃতি হইতে ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালের রীতি নীতি, রাজকার্য্য পরিচালনের ও রাজনীতি অনুসরণের যে আভাস পাই তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

ফা হিয়ান চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ৬ বৎসর বসবাস করিয়াছেন এবং সেই সময় গুপ্ত রাজ্যের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা হইতে আজিকার ইতিহাসকারগণের ঐ সময় কার ঐতিহাসিক তথ্যগুলি গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তিনি শুধু ধর্ম্মের দৃষ্টি লইয়াই সমস্ত বিবরণ গুলি লিখিয়াছেন এবং ইতিহাসের রাজনীতির অংশটা একেবারেই উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় মগধ অথবা দক্ষিণ বিহার অত্যন্ত বিশাল ও সুবিস্তৃত ছিল। নাগরিকগণ ধনী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। নগরমধ্যে বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়, রাজপথের স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার, এবং সহরের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীতে সুন্দর সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল। পাটলিপুত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এবং দুইটী বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব দেখা যায় তথায় ৬।৮ শত সন্ন্যাসী বাস করিতেন ও তাঁহারা এতো অধিক শিক্ষিত ছিলেন যে বহুদূর দেশবাসী ছাত্রগণ তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতেন। সে সময়ে অশোক নির্ম্মিত কারুশিল্পখচিত রাজ প্রাসাদও বর্ত্তমান ছিল।

সেই সময়ে রাজ্য শাসন প্রণালী অতিশয় সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। পথিকগণ অনায়াসে নিরাপদে পথ পর্য্যটন করিত। অপরাধিগণ কেবল মাত্র অর্থ দণ্ডেই নিষ্কৃতি পাইত। কঠোরতম শাস্তি মধ্যে দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু ছিলনা। রাজস্ব কর প্রজাদিগের উপভোগ্য ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী ধার্য্য হইত। যাহাকে land revenue বলে। রাজকর্ম্মচারীও রক্ষীগণ নিয়ম মত বেতন প্রাপ্ত হইত। রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল এবং দেশবাসী ও শান্তিপ্রিয় ছিল। লুণ্ঠন চৌর্য্যবৃত্তি বা অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের দৃষ্টান্ত দেশে খুব বিরল ছিল। তন্নিবন্ধন দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনও খুব কঠোর ছিল না। প্রাণদণ্ড কুত্রাপিও হইত না সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানে রাজশক্তি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এবং বৈদেশিক তীর্থযাত্রীগণ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে দেশ পর্য্যটন ও দেশের তথ্য-সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত জীবিকা নির্ব্বাহের রীতি প্রচলিত ছিল। কেহ পশুবধ করিত না। মৎস্য. মাংস পলাণ্ডু, রসুন খাদ্য রূপে ব্যবহার করিত না। বরাহ ও কুক্কুট গৃহ পালিত পশু মধ্যে স্থান পাইত না। কোন কসাই বিপনি বা শৌণ্ডিকালয় রাজ্য মধ্যে দৃষ্ট হইত না। যাহারা এতদন্যথায় খাদ্য বা জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থানুসরণ করিত তাহারা চণ্ডাল নামে খ্যাত ছিল। চণ্ডালগণ অতি অশুচি ও অস্পৃশ্য রূপে তৎকালীন সমাজ কর্ত্তৃক আচরিত হইত। ঐ চণ্ডালগণ নগর মধ্যে বা সাধারণ হাট বাজারে প্রবেশকালীন দুই খানি কাষ্ঠ বাজাইয়া তাহাদের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিত যাহাতে অন্য কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র না হয়।

অস্পৃশ্য সম্বন্ধে এই রীতির ক্ষীণ অবশেষ অদ্যিও দাক্ষিণাত্যে ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে দৃষ্ট হয়।

অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে ফা-হিয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে মৎস্য, মাংস ও মদ্য ব্যবহারের রীতি স্পৃশ্যগণ মধ্যে অপ্রচলনের কথা যে লিখিয়াছেন তাহা নাকি তাহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রীতি সম্ভূত। তাহারা কারণ নির্দ্দেশ করেন এই যে, ব্রাহ্মণগণ তখনও যজ্ঞে পশু হনন করিতেন ও তান্ত্রিকগণ ও তখন ভারতে ছিলেন কাজেই মৎস্য মাংস ও মদ্য ভারতে একেবারেই বিলুপ্ত হইবে কেমন করিয়া? এইশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের যুক্তি আমার একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়না। তবে সাধারণতঃ দেশ যে মদ্য, মাংসপ্রিয় ছিল না তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। দেশের আচার রীতি নীতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও রাজ্য শাসন ও তৎকালীন প্রচলিত রাজনীতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। তখন নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি যে ফা-হিয়ানের বর্ণিত তৎকালীন শাসন ও রাজনীতি বিবরণ সর্ব্বসম্মত। যদি

তাহা সত্য হয় তবে এক শ্রেণীর বৈদেশিক সমালোচক-বর্গ যে ভারতের হিন্দু রাজত্বকে শ্লেষ করিয়া 'অসভ্য বর্ব্বরোচিত রাজ্য শাসন' আখ্যা দিয়া থাকেন তাহাদের ঐরূপ ভারতীয় রাজ্য শাসন সম্বন্ধে ধারণা'র ভিত্তি কোথায়? দুই একজন খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারী রক্ত পিপাসু শাসকের ইতিহাস প্রত্যেক দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। তখন আর অধুনা পরাধীন হিন্দু রাজত্বের উপর এ ঈর্ষা'র কটাক্ষ কেন? যদি সমালোচনা করিতে হয় তবে সে সমালোচনা পক্ষপাত শূন্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা সমালোচনার মূল্য কিছুই থাকেনা। তাহা ছিদ্রা-ন্বেষণ ও কুৎসা রটনার নামান্তর মাত্র হইয়া পড়ে।

আর এক শ্রেণীর রাজনৈতিক পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় যাহারা সন্দেহ করেন ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসন পাইলে সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিতে পারিবে কিনা। অবশ্য এই শ্রেণীর রাজনৈতিকগণ যে আমাদের উপস্থিত রাজ-নীতি ক্ষেত্রে, খেয়ালী, স্বার্থান্বেষী ও লুণ্ঠনপরায়ন, তথা কথিত রাজনৈতিকদিগের যদৃচ্ছা ডিগবাজি দেখিয়া এই উক্তি করেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে ভারতবাসী যে সকলেই ঐরূপ মনোবৃত্তির অনুমোদক তেমন সিদ্ধান্তে তাহারা কি করিয়া উপনীত হইলেন? হয়তো তাহাদের নাম এখন এই ডিগবাজির যুগে কেহ গলাবাজি করিয়া উচ্চে তুলিয়া ধরে নাই, কিন্তু এতোবড় বিস্তীর্ণ ভারতের মধ্যে কোথায় কোন ক্ষেত্রে কে যে বসিয়া নীরবে সাধনা করিতেছে তাহার সন্ধান কে দিতে পারে? প্রত্যেক যুগমানব বা যুগাবতারের আগমনের পূর্ব্বে অসুর বা তৎভাবাপন্নের উৎপাত যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। এখনো স্বেচ্ছাচার অনাচার অসত্যাচার, কদাচার ভারতের বক্ষে অসুরের তাণ্ডব লীলার অবতারণা করিয়া তুলিয়াছে। যুগে যুগে শ্রীভগবান সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতিগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত আসিয়াছেন। এবারেও ঠিক সময় মত তিনি আবির্ভূত হইবেন এ বিশ্বাস হিন্দু মুসলমান সকলেরই আছে। ভারতবাসী খৃষ্টীয় ভ্রাতৃগণও যে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন না তাহা নহে। অবশ্য তিনি আসিবেন এবং অসুর বিনাশ করিবেন। তবে আর বৃথা কুট-কাটব্য কেন নিরীহ ভারতবাসীর উপরে বৈদেশিক সমালোচকগণ প্রয়োগ করেন? তাহারা যদি ভারতকে সে সুবিধা সুযোগ (স্বায়ত্ত শাসন) প্রদানে সম্মত হন, তবে ভারতের ক্ষেত্রে যুগমানবের অবশ্যই আবির্ভাব হইবে। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন সমা-গত! আর অধিক দিন জুয়াচুরী, ধাপ্পাবাজী, লাম্পট্য দেশহিতৈষণার নামে ভারতে চলিবেনা। সৎ ও সত্য নারায়ণ জাগরিত হইয়াছেন। অসুরগণ সাবধান! ভারতের (Rasputin) রাসপুটীন! তুমিও সাবধান ভারতেও (Grand Duke) গ্র্যাণ্ড ডিউকেরও আবির্ভাব হইয়াছে আর বেশীদিন তোমার ভেল্কিবাজী আর ইন্দ্র-জাল চলিবেনা।—

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা লিখিলাম। যেমন ঐতিহাসিকগণ যশো ধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উভয়ের উপা-খ্যান সংমিশ্রণ সন্দেহ করিয়াছেন, তখন যদিও উভয় বিক্রমাদিত্যের মধ্যে প্রায় শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি উভয়ের সমালোচনায় যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় পাইয়াছি তাহা একত্রে লেখা বিধেয়।

শক ও হুনগণ বিজয় সম্বন্ধে আমি এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি কাজেই সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে যাহা যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পাওয়া যায়, সে সবই আমি এই আখ্যায়িকায় আলোচনা করিব।

যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য কেবল একজন যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী নৃপতিও ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্যের নাম বিস্তীর্ণভাবে হিন্দুগণের মধ্যে পরি-চিত। যেমন অশোক বুদ্ধগণ মধ্যে ও হারুণ অল রসীদ মুসলীম সমাজে বা মহম্মদীয়গণ মধ্যে। তাহার রাজ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি, ও পণ্ডিতগণ সম্মিলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ভারতে নবরত্ন নামে বিখ্যাত। মোগল ইতিহাসে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এইরূপ নবরত্নের আবির্ভাব

দেখিতে পাই। তাঁহাদের বিষয় সম্রাট আকবরের রাজত্ব-কালের আলোচনা প্রসঙ্গে করিব।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচ জনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাস, বররুচি ও জ্যোতিষিরূপে বরাহ মিহির ও আর্য্যভট্ট এবং চিকিৎসকরূপে ধন্বন্তরী ছিলেন। পদ্ম-পুরাণে চন্দ্রধরের চিকিৎসক এক ধন্বন্তরীর উল্লেখ পাই। তিনিও চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা ভারতের বিশেষ চিকিৎসকগণ সকলেই ঠিক ধন্বন্তরী উপাধি গ্রহণ করিতেন কিনা। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পত্নীর নাম ভানুমতী ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় যে রাজা বিক্রমাদিত্য অষ্টসাধন সিদ্ধ ছিলেন। আরো জানা যায় যে কবি কালিদাস কেবল কবিই ছিলেন না, যুদ্ধকালে তিনি সেনানায়কত্বও করিতেন। কবি কালিদাস ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মধ্যে আকৃতির এমন সাদৃশ্য ছিল যে সময় সময় তিনি শত্রুদিগকে বিক্রমাদিত্যের বেশে সজ্জিত হইয়া প্রতারিত করিতেন। উভয়ের পরিচয় তিলক দিয়া হইত। একজন বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ, করিতেন, অন্যজন দীর্ঘ। কে বলিতে পারে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ও কালিদাসের আকৃতির সাদৃশ্য হইতে আজিও পাশ্চত্য জগতে সম্রাট রাজন্যবর্গের বা বিশিষ্ট রাজপুরুষদিগের "Double system আসিয়াছে কিনা। প্রাচীন গ্রন্থে ইহাও পাওয়া যায় যে পণ্ডিত কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য সে সব আখ্যায়িকার সহিত আমার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ কোন সংশ্রব নাই।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি ভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেন বা কোন রাজনীতি অনুসরণ করিতেন তাহার স্বরূপ বর্ণনা প্রমাণ উপযোগী কোন গ্রন্থাদি আমার হস্তগত হয় নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারিলাম না। ঐতিহাসিক সত্য যেটুকু উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছি তাহাই মাত্র উল্লেখ করিলাম। উজ্জায়িনীনাথ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমার আরব্ধ বিষয়ের সম্পর্কে লিখিবার কিছু নাই কাজেই পুনরায় গুপ্তবংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

২য় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনাধিরোহণ করেন, এবং সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ রাজত্ব ভোগ করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালের কোন সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়না। কিন্তু তাহার রাজ্যের শেষ ভাগে দেখা যায় পুষ্যমিত্রের একদল ইরাণী গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, এবং কুমারগুপ্ত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেও ভারতের চিরচঞ্চলা রাজলক্ষ্মী বুঝি গুপ্তদিগের ভাগ্যাকাশে আর অধিকদিন অচঞ্চল রহিলেন না।

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র স্কন্দগুপ্তের রাজ্যলাভের পরেই কয়েকদল দুর্দ্ধান্ত ক্ষমতাশালী হুন নামক ভ্রাম্যমান জাতি মধ্য এসিয়া হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া এই সুবিশাল সুগঠিত রাজ্যের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এবং ইহার কিছুদিন পরেই হিন্দুদিগের গুপ্তসাম্রাজ্য চিরতরে ভারতের ধূলায় বিলীন হইয়া যায়। তবে ইতিহাসে দেখা যায় গুপ্তবংশ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। স্কন্দগুপ্তের পরে সামান্য মাত্র ভূমি লইয়া কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত গুপ্তগণ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। তবে স্কন্দগুপ্তই যে গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রমশালী সম্রাট ইহা সুনিশ্চিত। ইনি তাঁহার পিতামহের ন্যায় বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমি আমার প্রবন্ধারম্ভে একবার বলিয়াছি যে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। মধ্যেও এই কথার পুনরুক্তি করিয়াছি; এখানে আবার তাহারই পুনরুল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। বিধাতার কি ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছিনা। ভারতের ভাগ্যাকাশে যেই জ্যোতিষ্ক গ্রহের ন্যায় উদিত হইয়াছে সেই কালের আবর্ত্তনে পড়িয়া ধূমকেতুর ন্যায় কোন মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আমার এ মন্তব্য যে কেবল হিন্দুদিগের প্রতি প্রযোজ্য তাহা নহে। ভারতের সংশ্রবে যখন মুসলমানগণ আসিয়াছেন তাঁহাদেরও ভাগ্যে এই দশাই ঘটিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটী নাম উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। যথা, শেরসা, মহাত্মা আকবর, সাজাহান প্রভৃতি। বৃটীশ যুগেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখিনা। যথা গ্লাডষ্টোন, ডিসরেলী প্রভৃতি মনস্বীগণের সমকক্ষ মনস্বী আর ইংলণ্ডে জন্মাইতেছেন না। তাই বলিতেছিলাম ভারতের ভাগ্যে নৈরাশ্যই মূর্ত্তিমান। জানিনা শ্রীভগবান কি উদ্দেশে ভারতের ভাগ্যাকাশে এরূপ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন। ভারতবাসীকে শান্তিতে বসবাস করিতে দেওয়া মহাকালের আর ইচ্ছা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর একবার ভারতবর্ষে অনাবিল শান্তি আসিল, এবং সেই শান্তি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এক ধারাবাহিক রূপে চলিয়া ভারতবাসীকে একবার স্বচ্ছন্দতার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ যেনো শ্রীভগবান দিয়াছিলেন। তৎপরেই আসিল বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের যুগ। তাহাতে সমগ্র ভারতসাগর বাত্যাবিক্ষুব্ধ না হইলেও বঙ্গোপসাগরের উপর যথেষ্ট ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সেই ঝড়ের বেগ থামিতে না থামিতে আসিল ১৯২০ ইংরাজির অসহযোগ আন্দোলনের যুগ অথবা ভারতের মহাবিপ্লবের যুগ। তাহাতে ভারতের রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, সকলেই একসঙ্গে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। ভারতের আশা ভরসার স্থল যুবকবৃন্দ রাজনৈতিকদিগের কৃপায় অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া আবর্জ্জনা রূপে পরিণত হইল। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন এক মাত্র শ্রীভগবান জানেন কোন শক্তিশালী যাদুকরের যাদুদণ্ড সঞ্চালনে পুনরায় আসিবে কিনা। অথবা এ বিপ্লব ভারতবাসীকে মহানিশার ঘন তমসায় নিমজ্জিত করিবে। ভারতবাসী এমন বিপন্ন বুঝি ধনে, প্রাণে, সামাজিক জীবনে, নৈতিক জীবনে সর্ব্বদিকে আর কখনো হয় নাই। ভারতের ইতিহাসে আর এমন হাহাকারের যুগ কখনো ভারতের ভাগ্যে আসিয়াছে বলিয়া খুঁজিয়া পাই নাই। এখন উচ্চৈস্বরে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বলিতে ইচ্ছা হয় "পরমেশ্বর আর কত শাস্তি আর কত শাস্তি আর কত সয়? ভারতের ভোগদশার কি অন্ত নাই?"

দু'টি কথা

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তোমারে কহিব আমি দু'টি কথা অতি সঙ্গোপনে,
মৃদু মধু স্বরে—
দেবে কী উত্তর তার? অভিমানে যাবে অকারণে
দৃপ্ত পদ ভরে?
নহে কী হেলায়ে গ্রীবা—তুলি দুটি রোষ দীপ্ত আঁখি
হাসি ক্রুর হাসি,
চলে যাবে ঘৃণাভরে? এ হৃদয় মেঘে দেবে ঢাকি
অয়ি সর্ব্বনাশী!
নূপুরের তালে তালে রেখে যাবে প্রলয়ের ঝড়,
দেখিবেনা চাহি?
কাড়িয়া লইবে তুমি আমার একান্ত অবসর?
আমি যাবো বাহি
আমারি তরণীখানি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে—
বিপদ সঙ্কুল,

তোমার সে বাঙ্ময় কুটিল চাহনিশত কাজে
জানাইবে ভুল?
নহে কী মধুর হেসে ভালবেসে হানিয়া নয়ন
কম্প্রমান করে
টানিয়া লইবে মোরে ওগো প্রিয়া পাতিবে শয়ন
তব বক্ষপরে?
স্ফুরিত অধর পরে যদি ভুলে আঁকিয়া চুম্বন
ধীরে টেনে লই—
প্রদীপ নিভায়ে দিতে জাগিবে কী আনন্দ কম্পন?
লজ্জাময়ী অয়ি!
তোমার বুকের পরে রাখি মুখ আঁখি দু'টি মেলি
রূপের শিখায়,
আমার গোপনবাণী, জ্বালাইবে প্রেমের দীপালী
অমর লিখায়?

প্রগতির গতি

গল্প

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য কী একটা তুচ্ছ কারণে বিয়ের দিনই যখন মণিকার সঙ্গে নিখিলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন নিখিল মনে মনে ঠিক্ ক'রে ফেল্লে—বিয়ে আর এ জীবনে নয়, ভালবাসার পালাও এবার শেষ। মনে তার আঘাত লেগেছিল খুবই; অবশ্য সেটা যে মোটেই অস্বাভাবিক তা নয়? কেননা আজ চার বছর ধরে সে মণিকার সঙ্গে অবাধে মিলে মিশে আস্‌ছে, মণিকা জানে নিখিল তার স্বামী,—নিখিলও জানে মণিকা তার স্ত্রী। উভয়ের জীবন যে একই পথে ভবিষ্যতে প্রবাহিত হবে এ কথার আভাষ তার অবিভাবকদের কাছেই পেয়েছিল। তাই নিখিল ও মণিকা দু'জনেই পরস্পরে গভীর ভালবাসার বাঁধনে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিল।

এতদিনকার প্রগাঢ় ভালবাসার এই পরিণতি!……

মনের ব্যথাকে চাপবার চেষ্টায় নিখিল শিলং বেড়াতে চ'লে গেল। কিন্তু বান্ধবহীন অবস্থায় সেই প্রবাসে তার মন হাঁফিয়ে উঠতে থাকে!……সকাল সন্ধ্যায় পাহাড়ের বুকে বেড়ানো ও মধ্যাহ্নে বিশ্রামের সময়ে মণিকার লেখা পত্রগুলি অনেকবার ক'রে প'ড়ে সে নিজের বিরহীমনকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা কর্‌তে থাকে!

কিন্তু হয়তো তার এ হতাশার প্রয়োজন হ'তোনা;—যদি সে মা-বাপের অবাধ্য হ'য়ে মণিকাকে বিয়ে ক'রতো!… যাক্—নিষ্ঠুর ভবিতব্য!!……

মাসখানেক শিলং কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এসে নিখিল পুরাদমে চাকুরীতে যোগ দিলে। বন্ধু টীপনী কাট্‌লে—"বিরহের আগুনে কুরেমীটাকে নিখিল এবার একেবারে পুড়িয়ে মেরেছে"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মণিকার সুন্দর মুখখানি তার সকল চিন্তা ও সকল কাজের মাঝে উজ্জল হ'য়ে ফুটে ওঠে বলেই সে পরিশ্রমের মাঝে নিজেকে সর্ব্বদাই ডুবিয়ে রাখতে চায়!……

মাসদু'য়েক কেটে গেল। ইতিমধ্যে একদিন কে এক নির্মলের সঙ্গে মণিকার বিয়ে হ'য়ে গেল। সেদিন নিখিলের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল!—যাক্!—এতদিনে মণিকা তার একেবারে পর হ'য়ে গেল! আদর্শ-বাদীরা বলেন—তার স্মৃতি পর্য্যন্ত এখন পাপ!… বন্ধুরা বলে—নিখিল বাপ-মার খুব অনুগত; নইলে মণিকার সঙ্গে তার এতদিনের Love কিনা এককথায় শেষ ক'রে দিলে!" শুনে নিখিল একটু করুণ হাসি হাসে।

……মাস আষ্টেক পরে হঠাৎ সকলে শুন্‌তে পেলে—নিখিলের বিয়ে।……আবার নিখিলের বিয়ে! বন্ধুরা বিদ্রূপ ক'রে উঠল—"ছিঃ! ছিঃ! নিখিলের কি মন ব'লে কোন পদার্থই নেই? এত শিগগির মণিকাকে কেমন ক'রে ভুললে সে?"

মণিকাকে নিখিল একটুও ভোলেনি; মণিকার স্মৃতি তার সারা বুকখানি ভ'রে আছে। কিন্তু তার দোষ কি গুণ জানিনা, মা বাপের সে বড় অনুগত। তাই মা যখন তার হাত দু'খানা ধরে কেঁদে বল্লেন—"বংশের একমাত্র ছেলে তুই—তোর বিয়ে না করা কখনও সাজে? বাপ পিতামহের বংশরক্ষা করা কি তোর কর্ত্তব্য নয়? আমার কথা রাখ নিখিল,—বিয়ে কর্!" মায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে নিখিল বিয়েতে সম্মতি দিলে!

ফুলশয্যার রাত্রে নববধু রমলা যখন নিখিলের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, তখনই নিখিল বুঝতে পার্‌লে মনকে চোখ ঠেরে কোন কাজই করা উচিত নয়। তার প্রাণে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল—এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হবে মণিকা। আজ কিনা সেই মণিকার স্থানে অনধিকার প্রবেশ কর্‌লে এই রমলা! বাপ মা'র ওপর প্রচণ্ড অভিমান ও রমলার ওপর ভীষণ বিরক্তিতে তার মনটা ভ'রে উঠল।

অবশ্য রমলা যে দেখতে কুশ্রী তা নয়; বরং রমলার গায়ের রংটা মণিকার চেয়ে একটু উজ্জল বেশী। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? নিখিলের কাছে মণিকার মত সুন্দরী মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই! হয়তো জগতের চিরন্তন ধারাই এই!

নিখিলের মনে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হ'য়েছে. রমলার বুঝতে একটুও দেরী হয়নি। সে জানতো তার মত সুন্দরী ও যৌবনশ্রী মণ্ডিত মেয়েকে যে কোন তরুণ সাদরে গ্রহণ কর্বে। কিন্তু নিখিলের এই বিমনা ভাব দেখে সে বুঝলে,—এর মূলে রহস্য আছে।
তার পাতলা ঠোঁঠ দুটো টিপে সে একটু হাসলে। রমলার বয়স ষোল বছর কিন্তু তার ধারণা, বয়সের অনুপাতে সে একটু বেশী বোঝে।

দখিনের খোলা জানলাটা দিয়ে হু হু ক'রে বাতাস আসছিল। সেই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিখিল শুধু অতীতের কথাই ভাবছিল। রমলা তার পাশটীতে গিয়ে দাঁড়াল—বল্লে—"দেখুন, আমি ঘরে থাকাতে আপনার কি কোন অসুবিধা হ'চ্ছে?"

এই প্রশ্নে নিখিল নিজেকে বিব্রত বোধ কল্লে। বল্লে —"না না, অসুবিধা কেন হবে?"

তারা দু'জনে পালঙ্কের ওপর গিয়ে বসল। কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নাই। আজ যেন তাদের কথার উৎস শুকিয়ে গিয়েছে! দু'জনেই নিজের মনকে নিয়ে ব্যস্ত। নিখিল ভাবে—কেন মিছামিছি রমলাকে বিয়ে কল্লাম—আমিত মণিকাকে এখনও ভুলতে পারিনি! রমলা ভাবে,—সুনীলদার কথা কেন এখনও বার বার মনে জাগছে? আমি আরতো তাকে পাবনা!

নিখিল করলে সারারাত্রি মণিকার ধ্যান,—আর রমলা ভাবলে—সুনীলদার মুখের হাসি কী মিষ্টি! ফুলশয্যার রাত —বিবাহিতের জীবনে আরাধ্য ধন!—এমন রাত্রি দু'জনেরই গভীর হতাশার মধ্যে সাঙ্গ হ'ল! সাম্‌নে শীতল জল —অথচ দু'জনেই তৃষ্ণায় কাতর!

মাস দুয়েক পরে।

নিখিল মণিকাকে সর্ব্বতোভাবে ভুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয়না; সক্ষম হ'তো যদি রমলা তাকে ভালবাসার অমিয় ধারায় স্নান করাতে পারত!—যদি স্ত্রীর সকল অধিকারের দাবী নিয়ে সে স্বামীর পাশটীতে গিয়ে দাঁড়াত!

রমলার অন্তরে ভয়ানক দুর্ব্বলতা। স্বামীকে সে ভালবাসতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। তার ধারণা ছিল পুর্ব্ব-প্রেমিক সুনীলের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে স্বামীকে ভালবাসতে যাওয়া ভালবাসার ভান বা বেসাতি মাত্র। তার মন কাদার ডেলা নয়, যে যখন যে ছাঁচে তাকে ফেলবে; তখন সেই প্রতিকৃতি ফুটে উঠবে। সে প্রগতি সম্পন্না নারী—এ ছিল তার গর্ব্ব!

হাজারীবাগে রমলার বাপের বাড়ী। সেখানে সে এক নিঃস্ব তরুণ সুনীলকে ভালবেসেছিল; বাড়ীতে মা বাপকে সে জানিয়েওছিল যে সুনীলকে ছাড়া আর দ্বিতীয়-ব্যক্তিকে সে বিয়ে করতে পারবেনা। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি; কারন সুনীল ছিল গরীব। কোন্ বাপ-মা গরীবের হাতে মেয়েকে দিতে চান? তাই রমলার বিয়ে হ'ল অবস্থাপন্ন ঘরে নিখিলের সঙ্গে।

মনের স্বাধীন ইচ্ছায় আঘাত পেয়ে রমলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—স্থির করল—বিদ্রোহ ক'রবে। দুজনেরই যখন মনের এই অবস্থা, তখন হঠাৎ নিখিল একখানা মণিকার চিঠি পেলে। চিঠিখানা মণিকা তার শ্বশুর বাড়ী থেকে লিখেছে।—

"নিখিলদা!

কেমন আছ? শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করেছ; বেশ ভালই করেছ। তার নামটি আমাকে জানাবে? কেমন সে দেখতে? আমার মতো হবে কি? রঙ, খুব ফরসা ত? ফরসা না হলে আমার বাপু তাকে একটুও ভাল লাগবেনা। 'তোমার স্ত্রী' হবার যোগ্যতা তার আছেত? একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ক'রে গেলাম রাগ ক'রোনা যেন!—না না, আমার প্রশ্নের বাণ সহ্য করা তোমার ত' অভ্যাস আছে।

আচ্ছা নিখিলদা! একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি আমাকে এখনও সেই আগেকার মত ভালবাস? না— নতুন বৌ পেয়ে আমাকে মন থেকে একেবারে চির বিসর্জ্জন দিয়েছ?

আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর,—আমি এখনও তোমাকে ভুলিনি—ভুলতে পারিনি,—ইহজীবনে পারব কিনা তাও জানিনা! কিন্তু আমি এখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হইনি; আমার স্বামীর আমি প্রাণ দিয়ে সেবা করি।

তোমায় ভালবেসে যদি কিছু পাপ ক'রে থাকি, স্বামী সেবা ক'রে সেটুকু মুছে ফেলি।

তোমার খুটিনাটি সকল সংবাদ আমাকে দেবে। ভালবাসা নিও ইতি—তোমার "মণি"

উত্তরে নিখিল লিখল—

আমার মণি! আমি তোমাকে ভুলিনি, কিন্তু ভুলতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছি—নিয়তই ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রছি—বল দাও ভগবান! আমায় শক্তি দাও! আমি যেন 'মণি'কে ভুলতে পারি—আমার স্ত্রী রমলাকে ভালবাসতে পারি! মণি! আমায় নিষ্ঠুর ভেবনা আমার অন্তর বাহির আজ তোমায় আকুল হ'য়ে চাইছে। কিন্তু এ চাওয়ার যে শেষ ক'রতে হবে মণি! মনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে দলে পিষে চূর্ণ ক'রে কর্ত্তব্যের পথে মানুষকে যে চ'লতেই হবে! জিজ্ঞাসা ক'রেছ আমার স্ত্রী দেখতে কেমন? সবাই বলে—'খুব ভাল'। কিন্তু আমার চোখে—থাক সে কথা! মণি, আমি রমলাকে খুব ভালবাসবো, কেননা তাকে বিয়ে করেছি; তুমিও আমারই মত তোমার স্বামীকে ভালবেসে সুখী করো।...

ভাল আছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও! ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

"নিখিল"

এ চিঠির উত্তর নিখিল দিন চারেক পরে পেলে। মণিকা লিখেছে—

নিখিলদা! তোমার চিঠি পেয়েছি; কিন্তু না পেলেই হয়তো ভাল ছিল। আমি যে তোমাকে ভালবাসি এবং আজও তোমায় পত্র লিখি, আমার স্বামী তা টের পেয়েছে। আমার ওপর উৎপীড়নের তার আর অন্ত নেই। আমি কিন্তু এজন্যে মনে কোন দুঃখ করিনা। কারণ—কোন্ স্বামী এমন উদার-হৃদয় আছে যে তার স্ত্রী অপর একজনকে মনে মনে ভালবাসে জেনেও সে স্ত্রীকে সুখে রাখবে? আর এমন অন্যায় প্রত্যাশাই বা আমি ক'রব কেন? ভালই হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো আমি তোমাকে ভুলে আমার স্বামীকে ভালবাসতে পারতাম, কিন্তু আমার প্রতি স্বামীর এই রূঢ়-ব্যবহার সে পথে কাঁটা দিয়েছে। যতোই আমি কঠিন আঘাত পাচ্ছি—ততোই তোমার মূর্ত্তি আমার সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠছে।

কাল ছোড়দির চিঠি পেয়েছি; লিখেছে—বাবার অসুখ। শিগগিরই আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গেও দেখা হবেই,—অনেক কথা আছে। ইতি—

মণিকা

চিঠিখানা পড়ে নিখিল চিন্তায় ডুবে গেল। মণিকা আসছে—আবার তার সামনে মণিকা আসছে! অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, সে তার হৃদয়ের বৃত্তিগুলো সংযমের মধ্যে টেনে আনছিল,—রমলাকে ভালবাসতে আন্তরিক চেষ্টা ক'রছিল,—কিন্তু এইবার তার সকল চেষ্টা সকল সাধনা,—ব্যর্থ হয়ে যাবে! মণিকার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে কিছুতেই স্থির রাখতে পারবেনা! নিখিল ভাবনায় আকুল হয়ে উঠল!

নিখিলকে এত ভাবতে হ'তোনা, যদি মণিকাদের বাড়ী—তাদের বাড়ী থেকে একটু তফাতে হ'তো। মণিকাদের বাড়ী, নিখিলদের বাড়ীর ঠিক পাশেই।...

\+ \+ \+

রবিবার।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নিখিলের কখনো ছিলনা; কিন্তু সেদিন দুপুরে কোন কাজ না থাকায় সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ললাটে কার কোমল অথচ শীতল করস্পর্শ পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলে শিয়রে মণিকা;—তার কপালে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

মণিকার হাতখানা সাগ্রহে নিজের কপালের ওপর চেপে ধরে নিখিল জিজ্ঞাসা করলে—কখন এলে মণি?

—এই আসছি। কিন্তু তোমার ঘুম তো ভারী সজাগ; আমার ইচ্ছে ছিল তোমার কপালে, মাথায় পায়ে, একটু হাত বুলিয়ে তোমায় ভাল করে ঘুম পাড়াই।

—তোমার কাছ থেকে এই মধুর আদরটুকু ভোগ করবার অধিকার আর ত আমার নেই মণি! কেন মিছামিছি দু'জনেই মনে ব্যথা পাই?

অভিমানভরে হাতখানা টেনে নিয়ে মণিকা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলো—তোমার ঐ এক কথা নিখিলদা! অধিকার—আর অনধিকার! তোমায় সেবা কর্বার—ভালবাসবার অধিকার আমার চিরকাল থাকবেই। সে তুমি যতোই বলো! মন্ত্রের বাঁধন কি প্রাণের বাঁধনের চেয়েও বড়ো?—বলো?—আমাকে বুঝিয়ে দাও! তোমারও বিয়ে হয়েছে—আমারও বিয়ে হয়েছে; মন্ত্রপাঠেরও কোন ত্রুটি ঘটেনি। তবে কেন তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারনি—আমি আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি? বলতে পার আমাকে?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিখিল বললে—রমলাকে আমি স্ত্রীর অধিকার দিতে পারিনি সত্যি কথা, আর এও সত্যি, যে তোমার স্থানে অপর কাউকে কল্পনা ক'রতেও আমার বুকটা হাহাকার ক'রে ওঠে। কিন্তু মণি, সংসারে কর্ত্তব্যটাই যে সবচেয়ে বড়! তাই কর্ত্তব্যের মুখ চেয়েই আমি তোমাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রছি, কর্ত্তব্যের জন্যেই আমি আমার স্ত্রী রমলাকে ভালবাসতে না পেরে অনুতপ্ত হচ্ছি,—কর্ত্তব্যের জন্যেই আমি তোমায় বলছি—তুমি আমায় ভুলে যাও, স্বামীকে ভালবাস; আমার ওপর থেকে তোমার সকল অধিকারের দাবী ফিরিয়ে নাও!...

স্থির দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে তাকিয়ে মণিকা বল্লে—নিখিলদা!—তুমি—তুমি আমায় এই কথা ব'লতে পারছ? তোমায় আমি ভুলে যাব—তুমি সহ্য ক'রতে পার্ব্বে?

মণিকার হাত দু'টো চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিখিল বল্লে—আমি অনেক কষ্টে নিজেকে বেঁধে রেখেছি, তুমি আমায় এমন ক'রে আঘাত দিয়ে সে বাঁধন খুলে দিও না মণি!—আমি পাগল হ'য়ে যাব!

মণিকা আজ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে; বল্লে—আমি আমার স্বামীদেবতার অত্যাচার সয়ে সারাজীবন জ্বলতে থাকব, আর তুমি আমাকে ভুলে রমলাকে নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাবে তা হবেনা! বিষ যখন দু'জনেই খেয়েছি তার ফলভোগ করব দু'জনেই। চার বছর আগে তুমি আমায় কি ব'লেছিলে মনে নেই—'মণি, আজ থেকে আমি তোমার—আমার ওপর ভালবাসার সকল অধিকার তোমার!...' সে কথা তুমি হয়ত ভুলতে পার, কিন্তু আমি পারিনি তোমার ওপর আমার অধিকারের দাবী চিরকাল অটুট থাকবে! ব'লতে ব'লতে সে নিখিলের বুকের ওপর ঝাপিয়ে প'ড়ে নিখিলের ওষ্ঠে একটা প্রগাঢ় চুম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—এই আমার চিরদিনের দাবী ও অধিকার! তারপর মহীয়সী নারীর মতোই গর্ব্বভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...

অন্তরাল থেকে রমলা সবই দেখেছিল ও শুনেছিল। মণিকা চলে যেতেই সে বিদ্রূপের হাসিতে মুখটাকে ভরিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে নিখিলকে বল্লে—তোমার চা খাবার সময় হ'য়েছে ঝন্টুকে চা আনতে বলব?

নিখিল রমলার মুখের দিকে যেন চোখ তুলে চাইতে পারছিলনা। নতদৃষ্টিতে একটু কম্পিত সুরে বললে—ব'লবে কি? রমলা বল্লে—কি ব'লবে বল।

রমলার ডানহাত খানা দু'হাতে চেপে ধরে নিখিল বল্লে—আমার সকল কথা শুনে আমাকে বিচার ক'রো—পারত ক্ষমা করো। আমি তোমার ক্ষমারও অযোগ্য রমলা! পাশের বাড়ীর এই মণিকাকে আমি বড় ভাল বাসতাম—বাসতাম কি—এখনও বাসি; কিন্তু কর্ত্তব্য-চ্যুত হ'য়ে এ ভাবে চলতে আর আমি পারছিনে! তোমাকে বিয়ে ক'রেছি অথচ তোমাকে ভালবাসতে পারিনে—এযে আমার কী আফশোষ, তা তোমায় ব'লে বোঝাতে পারবনা! আমি মণিকে ভুলতে প্রাণপণে চেষ্টা করছি—তুমি আমার সে চেষ্টায় যোগ দাও! আমায় সাহায্য কর রমলা!

নিখিলের হাতের মধ্যে থেকে হাতখানা মুক্ত ক'রে নিয়ে মুখটা বিকৃতি ক'রে রমলা ব'ললে—আমি তোমায় কি সাহায্য ক'রব? আর তুমি মণিকাকে ভুলতে চেষ্টাই বা ক'রছ কেন? আমি কি তোমার ভালবাসা ভিক্ষা করেছি কোন দিন?

বাধা দিয়া নিখিল ব'ললে—না—না, এতে তুমি ভিক্ষার কথা তুলছ কেন রমলা? তোমার প্রতি আমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই? তুমি আমায় আমার কর্ত্তব্য-পালন ক'রতে দাও রমলা, নইলে এতটুকু শান্তি আমি কখনও পাবনা!

রমলা বললে—কেন পাবেনা? সে তোমায় ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাস, তবু কেন শান্তি পাবেনা তুমি? না—না, তার কাছ থেকে তোমার ভালবাসা ফিরিয়ে নিতে হবেনা—আমি তোমার অনুগ্রহ চাইনা! রমলা ঘর থেকে চলে গেল।...

নিখিল ভাবলে—রমলার এই উক্তির কারণ হচ্ছে তার ওপর বিষম অভিমান। কিন্তু এ ভুল তার ভেঙ্গে গেল পরের দিনই—যখন হাজারীবাগ থেকে একখানা চিঠি তার হাতে এসে প'ড়ল। শিরোনামায় রমলার নাম লেখা ছিল; চিঠিখানা পিওনের হাত থেকে নিয়ে কোন কিছু না ভেবেই সে খামখানা ছিড়ে প'ড়তে লাগল—

আমার রমু!

পরশু তোমার চিঠি পেয়েছি। পেয়ে কী আনন্দই যে হ'লো, তা আর কি ব'লব? কবে এখানে আসবে? কতকাল তোমাকে দেখিনি বলত? পুরা দু'টি মাস!... আমার জন্যে তোমার একটুও মন কেমন করেনা? বিয়ের আগে আমায় কি বলেছিলে?—'হোকনা বিয়ে—আমি চিরদিনই তোমার।' এখন কি সব ভুলে গেলে নাকি? তোমার স্বামীর কাছে কোন একটা ছুতো ক'রে শিগির এখানে চলে এস। শুধু চিঠি প'ড়ে এখন আর মন ভ'রে উঠেছেনা, তোমায় দেখবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠেছি; তুমি এস—তুমি এস!...

একান্ত তোমারই

সুনীল।

চিঠি পড়ে নিখিল স্তম্ভিত হয়ে গেল। শেষে রমলাও অবিশ্বাসিনী? নিজের চোখে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিলনা। আবার পড়লে চিঠিখানি—আরও দু'বার।

কর্ত্তব্যের প্রেরণায় নিখিল তার মনটাকে রমলার দিকে ফিরিয়ে আনছিল, কিন্তু এই চিঠি খানা পড়ে সে ভীষণ কঠিন হ'য়ে উঠল। কর্ত্তব্যের হাজার আহ্বান আর নিখিলের চিত্তকে রমলার দিকে ফেরাতে পারলোনা। এমনই মানুষের দুর্ব্বলতা!

চিঠিখানা রমলার হাতে দিতেই সে বলে উঠল—চিঠি কে খুলেছে?

গম্ভীর গলায় নিখিল বললে—"আমি"।

রমলা বল্লে—আমার চিঠি তুমি খুললে কেন? অন্যায় হয়েছে বলে নিখিল সেখান থেকে চলে গেল।

পরের দিন সকাল হতেই নিখিল দেখলে—রমলার জিনিষ পত্র সব বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ হয়েছে। সে বাপের বাড়ী যাবে। নিখিলের মুখে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল।—বাবা, এত টান সুনীলের ওপর। চিঠি পাবামাত্রই রওনা হ'তে হবে? ইচ্ছে হ'ল রমলার হাজারিবাগ যাওয়া এখনই একটা রূঢ় আদেশে বন্ধ করে দেয়—কিন্তু তার প্রবৃত্তি হ'লনা।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিখিল তার ঘরে বসে একখানা বই প'ড়ছিল। হঠাৎ শাড়ীর খস্ খস শব্দ শুনে, চোখ তুলে দেখল—সুসজ্জিতা রমলা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

রমলা একটু হেসে বল্লে হাজারিবাগ যাচ্ছি, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

নিখিল বল্লে—কিন্তু কোন দরকার ছিলনা এ লৌকিকতার; আচ্ছা যাও,—তোমার গাড়ীর সময় হ'য়ে এসেছে।—হাসতে হাসতে রমলা চলে গেল।

নিখিল ছিল ভারী নরম প্রকৃতির। মণিকাকে ভালবাসা অন্যায় জেনে সে নিজের চিত্তবৃত্তিকে সংযমের পথে টেনে এনে রমলাকে ভালবাসতে চেষ্টা ক'রেছিল। কালে হয়তো তার এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটতো। কিন্তু তা হ'লোনা অকস্মাৎ রমলা তাকে দিলে এই কঠিন আঘাত।

রমলাকে বিদায় দিয়েই নিখিল ছুটলো মণিকাদের বাড়ী। তাকে দেখে মণিকার মা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন—বল্লেন আর আমার কাছে আসিসনা নিখিল? নিখিল হেসে বল্লে—এইত এসেছি কাকিমা। আচ্ছা তোমার সঙ্গে গল্প পরে কর্ব্ব এখন।' মণি কোথায় বলতো? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

মণিকার মা বল্লেন সে ছাদের ওপর বেড়াচ্ছে বোধ হয়।

নিখিল বরাবর ছাদের উঠে গেল। এ বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার।

ছাদের আলসের ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মণিকা সূর্য্যাস্ত দেখছিল। নিখিল পেছন থেকে এসে দু'হাতে তার চোখ টিপে ধরলে।

মণিকা একটুও ছাড়াবার চেষ্টা না ক'রে বল্লে—"কে ?—ছোড়দি ? খুনু ?—রমার মা ? না, এ হাতটা যে নিখিলদার মত বোধ হ'চ্ছে ! তবে কি নিখিলদা নাকি ? পরম আগ্রহে মণিকা নিখিলের কাছে নিজেকে সঁপে দিলে ।

নিখিল মণিকার চোখ থেকে হাতদুটো সরিয়ে নিতেই মণিকা বল্লে—"কি ভাগ্যি আমার, যে আমার খোঁজে আজ তুমি সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছ" । নির্ম্মল হাসিতে তার মুখখানি ভরে উঠলো ।

নিখিল একটু হেসে মণিকার মুখখানা দু'হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে তার কষিত-কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল ললাটে একটা স্নেহের চুম্বন এঁকে দিলে । বল্লে—"তোমার আমার মিলনে আর কোন বাধা নেই, মণি । রমলা আপনা থেকেই আমায় মুক্তি দিয়ে দূরে সরে গেছে !" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণিকা তার দিকে চাইতেই নিখিল সমস্ত ঘটনাটা খুলে বল্লে ।

মণিকা জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, রমলার উপর তোমার খুব রাগ হ'চ্ছে ?"

নিখিল বললে—"প্রথমটায় হ'য়েছিল, কিন্তু এখন আর একটুও নেই । সুনীলকে সে ভালবাসে, তাই আমাকে সে চায়না,—তুমি আমাকে ভালবাস তাই নির্ম্মলকে চাওনা; আমি তোমাকে ভালবাসি তাই রমলাকে চাইনা—এত' জগতের চিরন্তন নিয়ম !"

মণিকা দুষ্টু হাসি হেসে তার সুডৌল হাতদু'খানি দিয়ে নিখিলের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে—"তবে যে আমাকে খুব কর্ত্তব্যজ্ঞান শেখাতে আসতে ? এখন ? ...এখন আর ব'লবেনা ত' মণি, আমাকে ভুলে যাও বাব্বাঃ ! ম'শায়ের তখন কী ভীষণ কর্ত্তব্যজ্ঞান !"

নিখিল একথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মণিকার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল । এ মিলনে তাদের মন্ত্রপাঠ নেই,—প্রজাপতি ঋষি সাক্ষী নেই—শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনিও নেই । তবু উভয়ের আনন্দের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলনা, মনের তৃপ্তিরও কিছু অভাব হলনা ।

আকাশে তখন কলঙ্কী চাঁদ হেসে উঠেছে ।...

এক সপ্তাহ পরে নিখিল একখানা রমলার চিঠি পেলে । রমলা লিখেছে—

নিখিল বাবু !

হাজারিবাগে এসে আমি আমার ঈপ্সিত সুনীলকে পেয়েছি । মন্ত্রপাঠ করে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছিল বটে, কিন্তু স্বামীর আসনে কোন দিনই আমি আপনাকে বসাতে পারিনি । আর আমি জানি আপনিও আমাকে চাননা । সুতরাং দুজনেই এ বিড়ম্বনা ভোগ করার চেয়ে যে যার মনের মানুষকে নিয়ে সুখে থাকাই শ্রেয়ঃ । দিল্লীতে সুনীল চাকুরী পেয়েছে আজ রাত্রের ট্রেনেই আমি তার সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছি, নতুন করে ঘর-সংসার পাতব ব'লে । আমার বাপ-মা হয়ত আমার অনেক খোঁজ কর্ব্বেন,—আমার অনুরোধ আপনি তাঁদের জানাবেননা যে আমি দিল্লীতে আছি । আপনাদের পথ থেকে চ'লে আসাতে আপনারা আমাকে ধন্যবাদ দেবেন আশা করি । আপনাদের ভালবাসা জয়যুক্ত হোক্ । আপনিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমরা পরস্পরের প্রেমের মর্য্যাদা বুঝতে পারি !—দুটো মন্ত্রের বাঁধনের চেয়েও প্রাণের বাঁধন যে কতো বড় তা যেন আমরা সমাজকে দেখাতে পারি । ইতি—

শ্রী রমলা দেবী

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলার হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকার অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(২৮)

পাণ্ডুর চাঁদখানা আস্তে আস্তে পশ্চিমের কোলে মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার মলিন আলো এখনও পৃথিবীর গায়ে জাগিয়া রহিয়াছে।

কোথায় একটা নাম না জানা পাখী অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল,—

দীনেশ বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া সামনের পানে তাকাইয়াছিল, কি ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে।

সুরমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন আজ একাদশীর উপবাস তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া দিয়াছে।

নিকটে ঘসঘস শব্দ হইতে দীনেশ মুখ ফিরাইল।

শুভ্র বসনাবৃতা একটী নারীমূর্ত্তি বারাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া।

মনে হয় মৃত জ্যোৎস্না যেন সজীব মূর্ত্তিতে চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

দীনেশ খানিক নিস্তব্ধ ভাবে তাকাইয়া রহিল, নারী-মূর্ত্তি ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল কে—?

আমি—

কণ্ঠস্বর যেন বড় পরিচিত।

দীনেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে? উত্তর হইল, আমি পলাশ—

পলাশ—?

দীনেশ একেবারে নিশ্চল—নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

পলাশ অগ্রসর হইয়া আসিল—

শুষ্ককণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ, আমি পলাশ।

দীনেশ যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না এযে একেবারেই অসম্ভব।

আজ পলাশের বিবাহের রাত্রি।

দীনেশ ভাবিতেছিল সন্ধ্যালগ্নে বিবাহ হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ পলাশ অজিতের পার্শ্বে—।

সেই পলাশ কলিকাতায় নাই, সে এখানে একেবারে তাহারই বাড়ীতে?

দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল, আমি জানতুম আজ তোমার বিয়ে, নিমন্ত্রণের পত্র কাল পেয়েছি।

পলাশ প্রশ্ন করিল, পেয়েছ—কিন্তু যাওনি তো?

দীনেশ একটু হাসিল,—সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, এই চেয়ারখানায় বসো পলাশ, আমি দিদিকে ডাকি। বুঝেছি এমন কোনও কাণ্ড ঘটেছে যাতে তুমি চলে এসেছ, তোমার খাওয়া দাওয়াও আজ হয় নি। দিদিকে ডাকি, আগে কিছু খেয়ে নাও তারপর কথাবার্ত্তা হবে এখন।

সে অগ্রসর হইতেছিল, পলাশ বাধা দিল, বলিল, খাওয়ার জন্যে ভাবতে হবে না। আমরা মেয়েরা একদিন না খেয়েও কাটাতে পারি, তোমারও এটা অজানা নেই। আগে বল তুমি কলকাতায় যাওনি কেন?

দীনেশ বলিল, যাইনি প্রবৃত্তি হয়নি তাই। কিন্তু তোমাকেও প্রশ্ন করবার আছে পলাশ তুমি একাই চলে এসেছ?

পলাশ উত্তর দিল, হ্যাঁ—আর কেউ জানে না।

দীনেশ শক্ত ভাবেই বলিল কেন?

পলাশ স্থিরকণ্ঠে বলিল, কারণ আমি অজিত বাবুকে বিয়ে করব না।

দীনেশ মুহূর্ত্ত মাত্র নীরবে থাকিয়া বলিল, তার জন্যে এরকম ভাবে না পালিয়ে তোমার বাবাকে বললেই মনে হয় খুব ভাল হতো। তিনি কখনই

তোমার অমতে তোমার বিয়ে দিতেন না এ জানা কথা। এ ঠিক নভেলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যা মানুষের বাস্তব জীবনে মোটেই মানায় না অর্থাৎ খাপ খায় না। এ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করিনে তা জানো পলাশ।

পলাশ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, কিন্তু মানুষকে অনেক সময় নভেলই গড়ে তুলতে হয় জীবনটাকে, উপায় যখন থাকেনা তখন যে কোন পথ নিতেই হয়, ভাল মন্দ বাছতে গেলে চলে না। পালানো ছাড়া আর উপায় ছিলনা,—অর্থাৎ আমি চাই যা কিছু কলঙ্ক, তা আমারই হউক, আমার বাবাকে যেন দাগী হয়ে না থাকতে হয়। আরও সোজা করে বলি শোন—ঘণ্টা তিনেক আগেও আমি ভাবতে পারিনি আমি যা করছি এটা, ভালো কি মন্দ, কারণ তখন মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিল।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল,—

চাঁদ পশ্চিমে ডুবিলেও আকাশ তখনও উজ্জ্বল ছিল। নাম না জানা পক্ষীটার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, মনে হয় সে এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে, ভোরের আগে সে আর জাগিবে না।

খানিক পরে পলাশই কথা বলিল, দিদি কোন ঘরে শুয়েছেন বল দেখি?

দীনেশ হাত দিয়া ঘরখানি দেখাইয়া দিল।

পলাশ বলিল, আমি আজ ওই ঘরেই শুচ্ছি গিয়ে, তুমি আর কোথাও শোও গিয়ে। দিদিকে জাগিয়ে দরকার নেই একাদশীর উপোষ করে ঘুমিয়ে পড়ছেন জাগানো উচিত হবে না।

হত বুদ্ধি প্রায় দিনেশ বলিল কিছু খাবে না?

চলতে চলতে মুখ ফিরাইয়া পলাশ বলিল, এত রাতে কিছুর দরকার নেই।

ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা লণ্ঠন টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ স্তিমিত প্রায় আলোকে ঘরের সবই অস্পষ্ট হইলেও মোটামুটি দেখা যাইতেছিল।

ঘরের একপাশে আর একটা বিছানা পাতা ছিল, সেটা দীনেশের।

পলাশ সেদিকে না গিয়া দিদির পাশে আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল।

তাহারই ঘণ্টাখানেক পরে দীনেশ বাহির হইতে দরজাটা টানিয়া বন্ধ করার সময় দেখিল দিদির পাশে পলাশ বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া দিদির অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা কল্পনা করিয়া দীনেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২৯

মাধব বাবু নিজে যখন আসিয়া দীনেশের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইলেন তখন পলাশ কিছুতেই বাহির হইতে পারিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিনও গ্রামের বুকে ছড়াইয়া আসিতেছে।—মানুষ সামনে পড়িলে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করা ছাড়া চেনা যায় না। জ্যোৎস্না যদিও আছে তবু মাধব বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁহার গ্রামের লোক তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে না। সেই জন্যই তিনি প্রায়াগত সন্ধ্যা মুহূর্ত্তে ট্রেন হইতে একা নামিয়াছেন, ষ্টেশন হইতে এতটা পথ পদব্রজে আসিয়াছেন। গ্রামের সব নিস্তব্ধ বলিয়াই কেহ জানিতে ও পারে নাই তাহাদের জমিদার আসিয়াছেন।

মেয়ের বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি ঠিকই জানেন পলাশ আর কোথাও যায় নাই, এই গ্রামে দিনেশের কাছে আশ্রয় লইতেই আসিয়াছে। তিনি বেশই জানিতেন তাঁহার কন্যার দ্বারা তাঁহার সম্ভ্রম হানি হইবে না। বিবাহ করিবে না সঙ্কল্প করিয়া সে পলাইতে পারে তবু সে তাঁহারই কন্যা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তাহার যথেষ্ট সেই জন্যই তাহার এখানে পালাইয়া আসা রাষ্ট্র হইবে না, দীনেশ বা সুরমা ও তাহার কথা প্রকাশ করিবে না।

সুরমা তুলসীতলার প্রদীপ দেখাইয়া প্রণাম করিতেছিলেন, মাথায় তুলিয়াই সামনে প্রদীপের মৃদু আলোতে মাধব বাবুকে দেখিতে পাইলেন।

মাধব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রণামটা কার পায়ে পৌছিল সুরমা?

সুরমা উত্তর দিলেন, আপনারই পায়ে চৌধুরী মশাই

কোন দিন যে এটা পৌছে দিতে হবে তা ভাবি নি, আজ কিন্তু সত্যিই তাই হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মাধব বাবু বলিলেন, আমি কিন্তু তোমার ঘৃণাই প্রার্থনা করি সুরমা, তোমার আত্মিয়তাকে, আমি সত্যিই আজ মনে প্রাণে বড় ভয় করছি।

সুরমা জিজ্ঞাস করিলেন, তার মানে—

মাধব বাবু বলিলেন, একটা দিন ছিল সেদিন আমি একা আমিই ছিলুম, সেদিন পেছন পানে চাইবার দরকার হয়নি, পাশের দিকে চাইবার দরকার হয়নি, সামনে ছিল শুধু ভবিষ্যৎ কেবল তার পানে চেয়েই ছুটে ছিলাম। আজ কিন্তু সেদিন নেই। সুরমা আজ আমায় সামনে পিছে পাশে সব দিকের পানে চেয়ে চলতে হয়। ভবিষ্যৎ আমার ফুরিয়ে গেছে তাই চোখ পড়ছে এখন পেছন পানে,—যে কয়টা দিন বাঁচি সেদিন কয়টা তাকে নিয়েই বাঁচতে চাই।

মানুষটার অন্তরের কতকটা স্থান ব্যাপিয়া, যে কি ব্যথা জাগিতেছিল তাহা সুরমা সহজেই বুঝতে পারিলেন।

মুখখানা একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখা গেল না। জ্যোৎস্নার আলো পাশের গাছের প্রাতার আড়াল ভাঙ্গিয়া এপারে আসিয়া তখনও পৌছায় নাই, তুলসী তলায় ম্লান আলো সে মুখের উপর প্রতিফলিত হইতে পারে নাই।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, পলাশকে ডেকে দেব? সে এখানে অনেক রাত্রে এসেছে চৌধুরী মশাই, আমার এখানেই আছে।

"পলাশ—"

পিতার বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল; শুধু একটু হাসির রেখা তাঁহার মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল,—

বলিলেন, হ্যাঁ তার সন্ধানেই আসা বটে, তবে দেখা করা উদ্দেশ্য ঠিক নয়। মনটা মানছিলনা। ভেবেছিলুম কোথায় গেল খোজটা নেওয়া দরকার। যদিও আন্দাজে বুঝেছিলুম এখানেই এসেছে, আর এখানে বেশই আছে, তবু মন মানলেনা সুরমা—সেই জন্যেই আসা।

প্রদীপের শিখাটা মৃদু বাতাসে কাঁপিতেছিল, মাধব বাবু কতক্ষণ তাহারই পানে তাকাইয়া রহিলেন। সুরমা ও একটী কথা বলিতে পারিলেন না,—।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধববাবু বলিলেন, কাল রাত্রে বাড়ীতে খোজ করে যখন তাকে পাওয়া গেলনা তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানো সুরমা? ভেবেছিলুম—যদি ওর মা থাকতো তবে আমায় এতটা কষ্ট এতটা দুর্ভাবনা সইতে হতো না, অর্দ্ধেক ভাগ সেও নিত। সমস্ত রাত ঘুম আসেনি, ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়িয়েছি।

সুরমা ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, বসবেন চলুন চৌধুরী মশাই,—সমস্ত দিনটাও তো আপনার বড় কম উৎকণ্ঠায় কাটেনি।

মাধব বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন, না, বসবনা, আমি এখান হতেই চলে যাব সুরমা, এর পরেই নটায় যে ট্রেনখানা আছে ওইখানায় আজই ফিরব কলকাতায়। উৎকণ্ঠিত সুরমা বলিলেন, তাই কি হয় চৌধুরী মশাই না খেয়ে আপনার যাওয়া হতে পারে না। আমি পলাশকে ডাকি, তার সঙ্গে ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বলুন, আমি চট্ করে আপনার খাওয়ার যোগার করে দেই।

তিনি পা বাড়াইতেই মাধব বাবু বাধা দিলেন, না না, তার সঙ্গে দেখা করবার কোন দরকার নাই দরকার আমার তোমার কাছে, তোমার সঙ্গে কথা বলে এমনই নিঃশব্দে আমি চলে যেতে চাই।'

সুরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, মাধব বাবু বাধা দিলেন,—

"কাল আমার অবস্থা কি রকম হয়েছিল জানো? আমি যখন শুনলুম পলাশকে পাওয়া যাচ্ছেনা, তখন খানিক পাগলের মত ছুটোছুটি করলুম। বাড়ী ভরা লোক, আত্মীয় আত্মীয়া—অজিত পর্য্যন্ত এসে পড়েছে। আমি কাউকে একটী কথা বলতে পারলুম না। পলাশের বিছানার উপর যে পত্রখানা পড়েছিল, সেখানা তুলে নিয়ে পড়ে অজিতকে ডাকলুম, তাকে পড়তে দিলুম। সে পড়ে খানিক আমার পানে তাকিয়ে রইল, তারপর একটু হেসে বার হয়ে গেল। জানো সুরমা, সে হাসি কি রকম, তুমি তা কখনও ধারণায় আনতেও পারবে

শিল্পকলা



শ্রীহাসিরাশি দেবী অঙ্কিত

শ্রীঅনিল কুমার দে মহাশয়ের সৌজন্যে

না। মনুষ্যের সর্বস্ব যখন নষ্ট হয়ে যায়, সে তখন তেমনি করেই হাসে,—ও হাসি নয় বুক ফাটা কান্নারই রূপান্তর। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার বাড়ী হয়ে গেল শ্মশানের মত—কেউ কোথাও রইলনা, চাকর বাকরেরা কে কোথায় ঘুমিয়ে রইল, সেই শ্মশানে একলা আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কাল সারারাত বুঝলে সুরমা—কাল সারারাত আমার যা করে কেটেছে তা বলে বুঝান যাবেনা, বুঝাতে পারবনা।

সুরমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—

বুঝাবার আগেই আমি বুঝেছি চৌধুরী মশাই।

মাধব বাবু বলিলেন, আজ সকালের আলো পৃথিবীর গায়ে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমার মেয়ে বিয়ের রাতে পালিয়ে গেছে। আমার মেয়ে, সে শিক্ষিতা, সে চিরদিন আমার কথা শুনে এসেছে, সে আমার সেই মেয়ে,—সে তার বাপকে কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়ে চলে গেছে। তবু বলছি সে গেছে যাক্ সে সুখী হোক তার বাপের আশীর্ব্বাদ সে পাক।

সুরমা বলিলেন, আপনি তাকে নিয়ে যান চৌধুরী মশাই।

মাধব বাবু হাসিলেন—পাগল ওকে আমি নিয়ে যাব কোথায়—রাখব কোথায় ও নিজের ঘর চিনে চলে এসেছে—আমার মনে এই সান্ত্বনাটুকুই চিরকালের জন্যে থাক। তুমি ওকে কেবল একদিনের জন্যেই নয় সুরমা, চিরকালের মতই জায়গা দিয়ো, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি।

ধীরে ধীরে তিনি ফিরিলেন।

মুহূর্ত্ত মাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া সুরমা ডাকিলেন, চৌধুরী মশাই—

আহ্বানটা ঠিক আর্ত্তনাদের মতই শুনাইল।—মাধব বাবু ফিরিলেন—।

তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া সুরমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আমি তাকে নিজের ঘরেই স্থান দিলুম, কিন্তু জমীদারের মেয়ে সে, তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদার সঙ্গে রাখতে তো পারব না।

মাধববাবু মাথা দুলাইয়া বলিলেন, ভুল করছো সুরমা, সেতো মর্য্যাদা নিতেও আসেনি। সে পালিয়ে এসেছে শুধু এইটুকুর জন্যে তাকে ক্ষমা করতে না পারলেও একথা জোর করে বলব সে আমার মেয়ে, তার বংশগৌরব আছে, নিজের মর্য্যাদা বোধ তার নিজেরই আছে সে সেটুকু নিজে বাঁচাবে। তোমার ঘরে এসে যদি সে সংসারের কাজ করে তাতে তার সে মর্য্যাদার হানি হবেনা সুরমা।

যেমন নিঃশব্দে তিনি আসিয়াছিলেন, তেমনই নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জ্যোৎস্নার আলো গাছ ডিঙ্গাইয়া উঠানের খানিকটা জায়গা আলোকিত করিয়া দিয়াছে।

সুরমা স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া নিষ্পলকে দরজাটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। যে মানুষটী আজ নিঃশব্দে সর্ব্বস্ব এখানে বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত হতভাগার মতই চলিয়া গেলেন, তাঁহারই কথা ভাবিয়া সুরমার অশ্রুজল কিছুতেই চাপা রহিলনা, চোখ ছাপাইয়া নিতান্ত হঠাৎই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

(৩০)

গোপা চিরকালের মতই কাশী চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি গোপা?

গোপা নরেশের একখানা কাপড় ভাঁজ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, জনারণ্যে একেবারে মিশে যেতে চাই দিদি, এমন করে সকলের মাঝখানে সকলের চোখের সামনে থাকতে পারা যাচ্ছেনা।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাইবলে একেবারে কাশী? কলকাতায় গেলেই হতো।

গোপা মাথা নাড়িল,—না দিদি, কলকাতায় নয়। দৈত্র গিন্নি নরেশকে নিয়ে যেতে চান, ওর সব ভার তিনি নিয়েছেন। তিনি চিরকালের মত কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, অনেক ভেবে নরেশকে দিতে রাজি হয়েছি, ওরতো ভালো হবে। তারপর হঠাৎই একসময় দেখলুম—নরেশকে এমনভাবে হারিয়ে আমি এখানে বেঁচে থাকতে পারবনা, সেই জন্যেই যেতে হচ্ছে।

সুরমা বলিলেন, এখানকার ব্যবস্থা কি হবে?

গোপা হাসিল, বলিল, এখানকার ব্যবস্থা অর্থাৎ এই ভাঙ্গা ঘরখানা,—তা থাকুনা সমতল হয়ে দিদি।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরমা বলিলেন, আমারও একবার কাশী যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে গোপা, দেখি দীনুকে বলে—যদি সে রাজি হয় তাহলে তোদের সঙ্গেই চলে যাব।

গোপা মাথা নাড়িয়া বলিল, তোমার যাওয়া এখন অসম্ভব দিদি. এই সেদিন মাত্র দীনেশদার বিয়ে দিলে, বৌদি সংসারের কি-ইবা বোঝে, কি-ইবা জানে। অন্তত পক্ষে বছর খানেক থেকে ওকে মানুষ করে দিলে তবে তোমার ছুটি।

সুরমা হাসিলেন, বলিলেন, মানুষ কাউকে আজকাল আর করতে হয় না গোপা, আজকালকার দিনে মেয়েরা মানুষ হয়েই আসে, কাউকে কিছু শিখাবার দরকার হয় না। পলাশকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েই যেতে পারব, তার জন্যে ভাবনা নেই।

সুরমা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।—

সে দিন দীনেশ বাড়ী ফিরিল অনেক দেরিতে—।

সুরমাকে ডাকিয়া বলিল, আজ মহিমকে কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম দিদি।

সুরমা অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন, তার আবার কি হল?

দীনেশ বলিল, অনেকদিন হতেই ভুগছিল, অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে হঠাৎ.—বাঁচবার আশা নেই বলেই মনে হয়। বাঁচতে সে চায়, মরতে চায়না কারণ দুটো ছেলে মেয়ে রয়েছে, তাদের সে ছাড়া আর কেউ নেই। বলে, কলেজে দিলেই সে ভালো হবে, এখানে থাকলে মারা যাবে। ভেবে দেখলুম লিভার অ্যাবশেষ, তখন কলেজে পাঠানোই ভালো। তবু মনে হয়—ওই স্বাস্থ্যে অপারেশান সে সইতে পারবেনা, হয়তো অপারেশানের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে।

সুরমা অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন।

সত্যই মহিম বড় অভাগা। একটুকু সামান্য একটু জিনিস লইয়া সে আপনার স্বত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া করিয়া লোকের সহানুভূতি পাইতে চির বাঞ্চিত হইয়াছে। আজ তাহার এত বড় ব্যারাম হয়তো চিরকালের মতই সে গ্রামের বুক ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তথাপি কেহ তাহার নাম একটীবার করিলনা, তাহার কথা ভাবিয়া কেহ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ফেলিলনা।

তাহার দুইটী সন্তান আছে, মা হারা সেই দুইটী সন্তানের জন্যই সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিজের জন্য সে গ্রামশুদ্ধ লোকের অভিশাপ কুড়াইয়াছে মাত্র, তাহার সন্তানদের জন্য রাখিতে চায় অর্থ, সম্পত্তি।

এই প্রথমই হয়তো সে বুঝিয়াছে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সে কুড়াইয়াছে সে সবই অনর্থক, উহার মধ্যে সত্য এতটুকু নাই। আজ সে জানিয়াছে সবই পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া কে কোনও মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইতে হয়, তাই জীবনটার জন্য তাহার আকুলি ব্যাকুলী, তাই সে বাঁচিতে চায়।

সুরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জোর করিয়া সে চিন্তা মন হইতে সরাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমি যে দুচার দিনের মধ্যে কাশী যাব ভাবছি দীনেশ। কবে তোকে বলেছিলুম, কিছুতেই যেতে দিসনি, এবার তো দেখবার শুনবার লোক হচ্ছে—গোপা যাচ্ছে, ওর ভরসায় আমায় যেতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবিনে। আর পলাশ ও রইল তোকে রেখে গিয়ে ভাবনা ও আমায় করতে হবে না—খেতে পাচ্ছিস কি না। কে তোকে দেখাশোনা করছে এইসব ভেবে।

দীনেশ বলিল, হ্যাঁ, শুনলুম গোপা এবার সত্যিই চিরকালের মত চলে যাচ্ছে, ঘর খানা বিক্রী করে দিলে, মাত্র একশো টাকায়। অনেক বুঝালুম, সে কিছুতেই শুনলে না।

সুরমা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, বিক্রী করে দিলে কেন?

দীনেশ বলিল, মানে সে আর এখানে ফিরবে না, প্রভাকরের ওপর সে এবার এই রকমে প্রতিশোধ নিতে চায়।

প্রভাকরের ওপর—

সুরমা দীনেশের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দীনেশ বলিল, সত্যিই তাই। আজ কয়দিন আগে প্রভাকরের এক পত্র পাওয়া গেছে। আমার শ্বশুর

খুন!



শিল্পী শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ গোস্বামী

[চিত্রগ্রহণের কৌশলে ফটোচিত্রে যুগল কাটামুণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে]

অর্থাৎ মাধব বাবু জমিদারি বিক্রী করে দিচ্ছেন, একথাটা বোধহয় জানো দিদি,—সেই জমিদারি কিনছে প্রভাকর সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এখন কেবল সে এলে পরে রেজেষ্ট্রীটা হয়ে যায়। প্রভাকর আসছে, জমিদারী কিনবে, সেই জন্যে—সে আসার আর জমিদারি কিনবার আগেই গোপা চলে যেতে চায়, এখানকার সঙ্গে সে সকল সম্পর্ক তুলে দিতে চায়।

সুরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সত্যি দীনু, এই মুহূর্তে আমি তাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারছিনে। এতখানি দৃঢ়তা সত্যি যে দিন মেয়েদের মধ্যে জাগবে সেই দিনই পুরুষেরা জানবে মেয়েরা কি, কত সহজে তারা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতেও পারে। নিজের ব্যক্তিত্ব রাখতে এ সব মেয়েরা স্বামী পুত্রকেও ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু গোপা তো এ সব কথা কিছুই বললে না দীনু আমাকেও সে লুকিয়ে গেল?

দীনেশ হাসিল, বলিল, সে লুকিয়েছে তাতে তার দোষ নেই দিদি কারণ সে জানে তুমি ও এই সব সাধারণ মেয়েদের দল ছাড়া নও। সে চায় সব মেয়েদের কাছ হতে এড়িয়ে যেতে, যেন কেউই তার নাগাল না পায়। তার মন, বিষিয়ে আছে বলেই সে বাইরের কথা আর সইতে পারবে না, সে নিজেকে তাই সকল হতে আড়াল দিয়ে রাখতে চায়।

সুরমা বলিলেন, বুঝলুম, কিন্তু আমায় যেতে দিবি তো তার সঙ্গে?

দীনেশ বলিল, যেয়ো দিদি, আমি আপত্তি করব না কারণ গোপা তোমার সঙ্গে থাকবে, আমি নিজের চেয়েও ওকে বেশী বিশ্বাস করি।

অতি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল, এক গ্লাস জল দিয়ো তো ঝি,—

ঝি আসিল না, জল আনিল পলাশ। সে আজ এ গৃহের বধূ—।

একাকী

রমা দেবী

সুপ্ত রাতে মুক্ত আকাশ পানে
তারা-হাসা জ্যোৎস্না ভাসা গাঙে
পলকহারা চোখে চেয়ে থাকি;
এমন রাতে, ওগো প্রাণের প্রিয়,
তোমারও কি নিদ্রাহারা আঁখি?

গুপ্তভাবে সুপ্ত আশা জাগে
আমার তনু তোমার অনুরাগে
প্রস্ফুটিত, আনন্দ বিহ্বল;
এমন রাতে, ওগো প্রাণের প্রিয়
তোমারও কি আঁখি ছলছল?

দীপ্ত ধরা তৃপ্ত করা আজ,
নিশার শেষে শিশির ভেজা সাজ,
সন্ধানী সে বলেছে সন্ধান—
এমন রাতে খুঁজলে পেতে পারি
হিয়ার মাঝে তোমার রচা গান।

স্বরলিপি

বাণী— শ্রীগুরুচরণ মুখোপাধ্যায়　　　　সুর— শ্রীসত্যেন চক্রবর্ত্তী (অন্ধগায়ক)

স্বরলিপি— সুনীল মুখোপাধ্যায়

সুর—মিশ্র দেশ, তাল দাদরা

তোমার চোখের বাদল ধারা
　আমার বুকে ঝরে।
তোমার ব্যথার চিতায় মম
　পরাণ পুড়ে মরে।
তোমার ব্যথার শাওন ধারা,
জাগায় কাঁদন বাঁধনহারা,
　কাঁদায় অঝোর ধারে।
তোমার কালো নয়ন তলে
　যতেক মনো ব্যথা,
তোমার বীণার নীরব তারে
　মৌন যত কথা
সবি মম পরাণ পুটে,
লক্ষ ধারায় রয়গো ফুটে,
　তোমার ব্যথা ভরে
　আমার বুকে ঝরে।

```
  +               0                 +                  0
I সা   রা   মা | পা   ধা   -া | I ধণা   পর্সা   ণা | ধা   পা   পা | I
  তো   মা   আর | চো   খে   র  |   বাআ   দোও    ল  | ধা   রা   ০  |

  +                 0                 +                 0
পমা   মপা   ধণা | ধা   পা   পা | I মপা   ধপা   মা | গা   রা   রা | I
অ'০   ম'০   আর  | বু   কে   ০  |   ঝ০    ০ ০   রে | ০    ০    ০  |

  +               0                 +               0
রা   মা   মা | রা   মা   সা | I রা   ধা   ধা | ধা   ধা   ধা | I
তো   মা   ০র | ব্য  থা   ০র |   চি   তা   য় | ম    ম    ০  |

  +               0                 +                 0
ধা   ধা   র্সা | ণা   ধা   ণা | I পধা   ণধা   পা | পা   পা   পা | I
প    রা   ন   | পু   ড়ে  ০  |   মরে   ০০    ০  | ০    ০    ০  |

  +               0                 +                    0
পা   ধা   ধা | রা   রা   রা | I র্রা   র্সর্রা   র্জ্ঞা | র্রা   র্সা   র্সা | I
তো   মা   র  | ব্য  থা   র  |   শা    ও০      ০ন   | ধা    রা    ০   |
```

\+ ০ + ০
রা সরা গমা | গা মা মা I গমা পধা ণা | ধা পা পা I
আ গা০ ০য় | কাঁ দ ন | বা০ ধ০ ন | হা রা ০ |

\+ ০ ০ +
সা ণা ণা | ধা পা পা I মপা ধণা রপা | মগা রসা রা II
কাঁ দা য় | অ ঝো ০র | ধা০ ০০ রে০ | ০০ ০০ ০

\+ ০ + ০
পা পা পা | রা রা ধা | র্া র্া র্া | র্া র্া র্া I
তো মা ০র | কা লো ০ | ন য় ন | ভ লে ০ |

\+ ০ + ০
র্া স্র্া জ্ঞ্া | র্া স্া র্া I ণা স্া স্া | স্া স্া স্া I
য তে০ ০ক | ঘ ন ০ | ব্য থা ০ | ০ ০ ০ |

\+ ০ + ০
স্র্া স্া সা | ধা ণা ণা I ধসা না না | ধা পা পা I
তো০ মা র | বী না র | নী র ০। | তা রে ০

\+ ০ + ০
র্া না না | ধা ধা না I ধা পা পা | পা পা পা I
যৌ ০ ন | য ত ০ | ক থা ০ | ০ ০ ০

\+ ০ + ০
মপা মা মা | র্া জ্ঞ্া জ্ঞ্া I রমা জ্ঞ্া জ্ঞ্া | র্া স্া স্া I
স০ বি ০ | ম ম ০ | প০ রা ন | পু টে ০ |

\+ ০ + ০
রা মা মা | পা পা মা I পা স্া না | না পা পা I
ল ০ ক্ষ | ধা রা য় | র ০য় গো | ফু টে ০ |

\+ ০ + ০
না না না | না না স্া I স্া ন্র্া রসা | পধা পমা পা I
তো মা র | ব্য থা ০ | ভ রে০ ০০ | ০০ ০০ ০ |

\+ ০ + ০
পমা মপা ধণা | ধা পা পা I মপা ধপা মা | গা রা রা IIII
আ০ মা০ ০র | বু কে ০ | স্ব০ ০০ রে | ০ ০ ০ |

সুরবাহা কর্তৃক ২০শে নভেম্বর রেডিওতে গীত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার জীবন সংগ্রাম

শ্রীসুবিমল দত্ত

আফ্রিকার শেষ স্বাধীন সাম্রাজ্য আবিসিনিয়ার গৌরব-সূর্য্য বুঝি অস্তমিত প্রায়। সিনর মুসোলিনির নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্নে তরুণ ইতালি মাতিয়াছে। উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আবিসিনিয়া তাহার চাই-ই।

আবিসিনিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ বহু পুরাতন। চাঁদ সুলতানার অধীনে মোগলবাহিনীর বিপক্ষে হাবসীরা যুদ্ধ করিয়াছিল; এবং পরে হাবসী মালিক অম্বরের নেতৃত্বে নিজামশাহী রাজ্য পুনঃ স্থাপিত করিতে তারাই চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো দাক্ষিণাত্যের জাঞ্জিরার রাজা সিদি বা হাবসী জাতীয়। হাবসীদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে ভারতবাসীর আগ্রহ তাই এত বেশী।

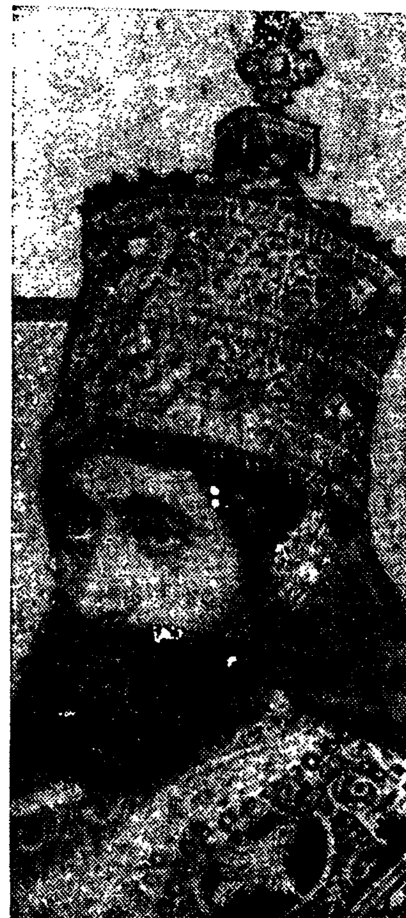
আবিসিনিয়া আফ্রিকায় উত্তরে পর্ব্বতসঙ্কুল দেশ। ইহার আয়তন বাঙালাদেশের প্রায় পাঁচ গুণ; কিন্তু লোক সংখ্যা এক কোটির কম।

আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট হাইলে সেলাসি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বয়স এখন ৪৪ বৎসর। সেলাসি বিধিনিয়ন্ত্রিত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবিসিনিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্য ও আধুনিক রণোপকরণ খুব কম। অধিকাংশ সৈন্যই অশিক্ষিত এবং কামান ও বন্দুকগুলি পুরাতন। আধুনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম—এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি তাঁহার নাই বলিলেই হয়।

ইতালির সুবিধা ও অসুবিধা

ইতালীর বিপুল রণসম্ভার—কলের কামান, ট্যাঙ্ক, বিষাক্ত গ্যাস, বিস্ফোরক বোমা, বিমান বহর—এই সমস্তের নিকট আধুনিক রণবিজ্ঞানে অশিক্ষিত মারাত্মক মারণাস্ত্রহীন হাবসীগণ কতদিন নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে কে জানে?

তবে একথা সত্য যে, হাবসীরা দুর্দ্ধর্ষ বীরের জাতি; সহজে তাহারা আত্মবিক্রয় করিবে না। এবিষয়ে আবিসিনিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এবং নৈসর্গিক অবস্থা তাহাদের সহায়। আবিসিনিয়া একটি উচ্চ মালভূমি। উত্তরদিকের তিগ্রে প্রদেশই সবচেয়ে অধিক পর্ব্বত-সঙ্কুল। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০ ফুট, মধ্যে



সম্রাট হাইলে সেলাসি

মধ্যে আছে অতিশয় খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী। ইহাছাড়া স্থানে স্থানে বহু গভীর গহ্বরও বিদ্যমান। আবিসিনিয়ার উত্তর-অঞ্চলের নৈসর্গিক অবস্থাও অনেকটা এইরূপ। পূর্ব্বদিকেও প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর বিরাজিত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আবিসিনিয়া

কত দুর্ভেদ্য; প্রকৃতপক্ষে ইহা যেন একটা পার্ব্বত্য দুর্গ বিশেষ। দেশটির এইরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি তাহার ইতিহাস ও অধিবাসিগণের চরিত্রকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। মরুভূমির কর্কশ আবহাওয়া এবং দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের বজ্রকঠোর দৃঢ়তা একত্র মিলিত হইয়া হাবসীগণকে অতি দুর্দ্ধর্ষ এক রণদুর্ম্মদ জাতিতে পরিণত করিয়াছে। তাই তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বার বার তাহারা অমিত বিক্রমে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে।



আবিসিনিয়ার সম্রাজ্ঞী

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হাবসীরা তাহাদের বিখ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলেকের নেতৃত্বে বিরাট ইতালীয় অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। বীরের জাতি হাবসীরা যুদ্ধকে ভয় করে না; সম্মুখ যুদ্ধে তাহারা অন্য কাহারও অপেক্ষা হীন নয়। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের রীতিনীতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

লোহিতসাগরের তীরে সূর্য্যের তাপ যত প্রখর, এমন প্রখর আর কোথাও নয়। ছায়াতেও সেখানে সূর্য্যের তাপ ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পৌঁছায়। এই প্রখর সূর্য্যের তাপের সঙ্গে আছে জলের অভাব। টাট্‌কা জল নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। ৩৫০ মাইল দূরবর্ত্তী মিসর দেশ থেকে টাটকা জল সরবরাহ করা। যে সব কূপগুলি তাড়াতাড়িতে খনন করা হইয়াছে তাদের জল আদৌ সুপেয় নয়। এমনি একটা জলহীন মরুভূমির দেশ হইতে ইতালীর সেনাবাহিনী আরম্ভ করেছে আবিসিনিয়ায় অভিযান।

এই সব প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সহজেই বুঝিবেন, ইতালীর পক্ষে আবিসিনিয়া জয় কত কত কঠিন। এরিত্রিয়ায় দিনের বেলা কাজ করা একরকম অসম্ভব। মাথার উপর আফ্রিকার সূর্য্য অগ্নি বর্ষণ করিতেছে রাত্রে গ্যাসের আলো জ্বেলে কাজ করে শ্রমিকেরা। জাহাজ থেকে সৈন্য আর গোলাবারুদ নামায় ডাঙ্গায়। সৈনিকেরা খালি গায়ে খড়ের মাদুরে ঘুমায়। রাত্রি শেষ হয়, সূর্য্য ওঠে। কার সাধ্য সেই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে কাজ করে? দিগ্‌দিগন্ত বালুকায় অন্ধকার ক'রে সেই বিশাল মরুর দেশে যখন প্রবল ঝটিকা বইতে আরম্ভ করে, তখন প্রাণ 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে থাকে। শস্য-শ্যামলা ইতালী থেকে এসেছে সহস্র সহস্র ফ্যাসিষ্ট তরুণ; তাদের স্বদেশ কত সুন্দর! আফ্রিকায় নির্ব্বাসিত ফ্যাসিষ্ট-সেনারা মরুভূমির সীমাহীন ধূসরতার দিকে চেয়ে থাকে আর তাদের চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

আবিসিনিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য আরও আছে ম্যালেরিয়া, সর্দ্দি-গর্ম্মি, আমাশয়, এবং কলেরা। এই মরুভূমির দেশে ম্যালেরিয়া অথবা আমাশা একবার ধরিলে আর রক্ষা নেই।

ইতালীর সেনাবাহিনী হাবসী সৈন্যদলের অপেক্ষা অনেক বেশী সুসজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু পাহাড়ে জায়গায় উড়োজাহাজ আর ট্যাঙ্ক করিবে কি? সমতল ক্ষেত্রে যেখানে শত্রু-সৈন্য এক জায়গায় সমবেত হয় সেখানে উড়োজাহাজ আর ট্যাঙ্ক ফলপ্রদ। হাবসীরা সামনাসামনি লড়াই করিবে না। পাহাড়ের বনজঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তারা গুলী ছুড়বে। সেই গুলী লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে না। ইতালীর সৈন্যেরা সাবধান হবার আগেই শিলাবৃষ্টির মত তাদের উপর গুলীবৃষ্টি আরম্ভ হবে। পাহাড়ের গুহা থেকে, পাথরের আড়াল থেকে, লতাগুল্মের ভিতর থেকে, গাছের পিছন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে গরম গরম সীসা। ইতালীর সেনাবাহিনী শত্রুর



আবিসিনিয়ার মুসলমান সৈন্যগণ ইটালীয় সোমালীল্যাণ্ড সীমান্তে ওগাডেন রক্ষায় অগ্রসর হইতেছে।

কেশরীর সৌজন্যে

সন্ধান পাওয়ার পূর্ব্বেই হাবসীরা অদৃশ্য হ'য়ে যাবে নিবিড় বনের অন্তরালে।

শত্রুর পাহাড়েদেশে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর অভিযান দুর্ঘটনায় পরিণত হ'য়েছে—ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই। ১৯২১ সালে স্প্যানিয়ার্ডেরা একটি মাত্র যুদ্ধে রীফসর্দ্দার আবদুল করীমের হাতে ২০,০০০ সৈন্য হারিয়েছিল। মরক্কো আবিসিনিয়ার মতই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ।

যুদ্ধের বাহ্যিক কারণ

ইতালীর সহিত যুদ্ধের কারণ (১৯৩১) সালের ৫ই ডিসেম্বর ওয়ালওয়ালের দুর্ঘটনা। এইস্থানে ইতালী ও আবিসিনিয়া উভয় পক্ষের কতকগুলি লোক হতাহত হয়। আবিসিনীয় সরকার ঘোষণা করিলেন যে ইতালীয়েরা তাঁহাদের রাজ্যের খানিকটা অধিকার করিয়া দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯২৮ সনের শান্তি ও সখ্যমূলক চুক্তি অনুসারে এই ব্যাপার সালিশীতে দিতে সম্মত আছেন। ইতালী কিন্তু বলিল, 'না, তাহা হইবে না; আবিসিনিয় সৈন্যদের অনাচারের জন্য সরকারের ক্ষতিপূরণ করা চাই-ই'। পরবর্ত্তী ১৪ই ডিসেম্বর আবিসিনিয়ার সালিশী প্রস্তাব সে প্রত্যাখান করিল। ইতালী আরও বলিতে লাগিল যে ইতালীয় সোমালীল্যাণ্ড সীমান্তে আবিসিনিয়েরা বরাবর এইরূপ অনাচার করিয়া আসিতেছে, উদ্দেশ্য—ইহা যে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের অধীন নয় তাহাই প্রতিপন্ন করা। ইতালীর এইরূপ অসম্ভব কথা আবিসিনিয়া সরকার বরদাস্ত করিতে পারিলেন না এবং ইতালীর উপর এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, বয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহাদের ওগাডেন সীমান্ত হইতে আবিসিনিয়ার মধ্যে সে ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে। আবিসিনিয়া-সরকার উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৪ই ডিসেম্বর এই বিষম অবস্থার দিকে রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং ৩রা জানুয়ারী ইহার চুক্তি-পত্রের একাদশ দফার উল্লেখ করিয়া সীমান্তে শান্তিরক্ষার অনুরোধ জানাইলেন।

ওয়াল-ওয়াল,—আবিসিনিয়া কি ইতালী কোন রাষ্ট্রের অধীন এবং এখানকার ৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৪) সংঘর্ষের জন্য দায়ী কে—এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অবিসিনিয়া সরকার নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিবেন।

যাহা হউক, রাষ্ট্রসংঘ পরিষদ আবিসিনিয়ার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গত জানুয়ারী মাসে তাহার প্রস্তাব কার্য্যতালিকাভুক্ত করিল কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে।

ইহার পর ২৯এ জানুয়ারী ওয়াল-ওয়ালের সন্নিকট আফদাবে উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যের আবার সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া পাঁচজন ইতালীয় সৈন্য আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল। ইতালী ইতিমধ্যেই তাহার সোমালিল্যাণ্ড সীমানা অতিক্রম করিয়া আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে অনেকটা দূর অন্যায়ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষের সংবাদে তাহার পক্ষে পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রচুর সৈন্যসমাবেশের একটি 'সঙ্গত' কারণ জুটিয়া গেল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বআফ্রিকায় প্রথম সৈন্যদল প্রেরিত হইল। ইহার চার দিন পরে সেনাপতি দেল বোনো পূর্ব্বআফিকার ইতালীয় সৈন্যের অধিনায়ক ও সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি সোমালিল্যাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। ইতালী কিন্তু প্রচার করিল যে, আবিসিনিয়া সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ, রাজধানী আদ্দিস আববায় বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং পার্লামেণ্টে সম্রাটের ইতালীর বিরুদ্ধে বক্তৃতাই তাহাকে এতাদৃশ আয়োজন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

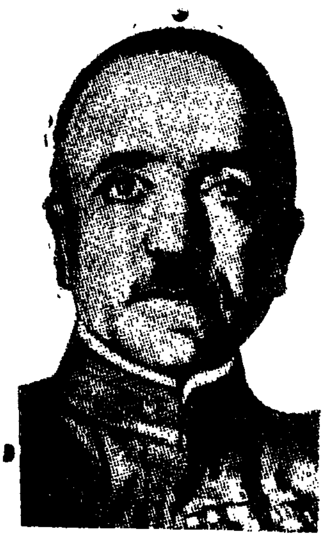
যুদ্ধারম্ভ

৩রা অক্টোবর ইতালীর সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল দেল বোনো আনুষ্ঠানিকভাবে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

জেনারেল দেল বোনো সৈন্যদলকে মারেব নদী পার হইবার হুকুম দিলেন। মারেব নদী আবিসিনিয়া ও এরিত্রিয়ার সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত। প্রত্যূষে ইতালীর সৈন্যবহিনী ঐ নদী পার হয়। সে এক দেখিবার মত দৃশ্য বাহিনীর পুরোভাগে ছিল এরিত্রিয়ার অশ্ব সৈন্যদল, তাহাদের পিছনে ছিল পদাতিক বাহিনী, সঙ্গে দ্রুতগামী

লঘু ট্যাঙ্ক ও অসংখ্য মেশিনগান ও ছোট কামান। তারপর ছিল কামান ও সাজসরঞ্জামবাহী লরীর সারি। সঙ্গে সঙ্গে উপরে উড়োজাহাজ উড়িতেছিল, যাহাতে হাবসীরা গুপ্তস্থান হইতে অতর্কিত আক্রমণ করিতে না পারে।

ইটালীর বোমাবর্ষী উড়োজাহাজগুলি আদোয়ার উপর বোমাবর্ষণ করিতে ছিল। সে বোমা বর্ষণের ফলে



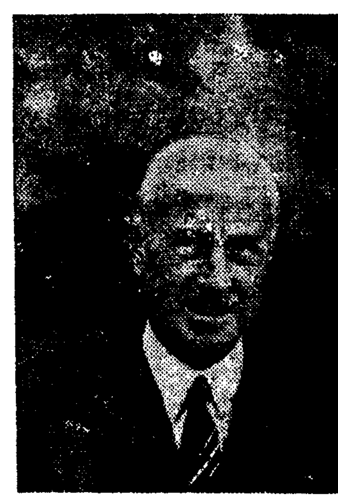
মার্শাল বদোগ্লিও

আদোয়ার নিরপরাধ নরনারী এবং শিশুরা নিহত হইল। এদিকে আদোয়ার উত্তরে হাবসীবাহিনীর সহিত ইটালী সেনাদলের সম্মুখ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইটালীর সেনাদল ট্যাঙ্কের আড়ালে থাকিয়া হাবসীদের বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যের উত্তর দিতে অগ্রসর হইল তাহাদের মধ্যে অনেক হতাহত হইল। হাবসী গোলন্দাজেরাও প্রচণ্ড বিক্রমে ইটালীয় সেনাদলের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। দেড় দিন এইভাবে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ চলিল। ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে ইটালীয় সেনাদল আদোয়ার উত্তরস্থ উচ্চভূমি অধিকার করিল এবং সমস্ত রাত্রি তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিল। প্রত্যুষে ইটালীর সেনাধ্যক্ষ আদেশ দিলেন অগ্রসর হও। ইটালীর বাহিনী অগ্রসর হইল আকাশ হইতে বোমা বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মেশিন কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া হাবসী বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে উদ্যত হইল। আধুনিক সমরোপকরণের সম্মুখে হাবসীদের সেকালের কামান বন্দুকে অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিলনা। আদোয়ার পুণ্যভূমি ৪০ বৎসর পরে স্বাধীনতাসেবীদের শোণিত অর্ঘ্যে আবার সিক্ত হইল।

তাইগ্রে প্রদেশের অধিপতি স্বদেশ-প্রেমিক হাবসী সামন্ত রাস সেয়ুম হাবসীদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সম্রাটকে সংবাদ দিলেন—"ইটালীর আক্রমণে তাঁহার সেনাদল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইটালীয়ানেরা আদোয়ার উত্তরে ব্যূহ রচনা করিয়া প্রবল বেগে গুলীবর্ষণ করিতেছে। ইটালীর সৈন্যদল কামান, উড়োজাহাজ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীন আদোয়া-দুর্গের প্রধান ঘাঁটি রায়াব পাহাড় অধিকার করিয়াছে। তীব্র গোলাবর্ষণের মধ্যে আর টিকিতে পারা যাইতেছে না। আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দানে প্রস্তুত। কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন।"

সম্রাট হেল সেলাসী সৈন্যদলকে জানাইলেন—"বুদ্ধিকৌশলে প্রয়োগ কর। একে একে শত্রুর সম্মুখীন হও। একস্থানে সমবেত হইও না। লুকাইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ কর এবং গরিলা যুদ্ধ কর।"

রাস সেয়ুম প্রকৃতপক্ষে এই গুপ্তনীতি অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে এক ডিভিসন



স্যার স্যামুয়েল হোর

মাত্র সেনা ইটালীকে আদোয়ার সম্মুখে বাধা দিয়াছিল, অপর ১২ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল—আদোয়ার পশ্চিমদিকে গরিলা যুদ্ধ চালাইবার জন্য। এই গরিলা

যোদ্ধাদের বিক্রমে ইটালীয় বাহিনীকে কম বিপন্ন হইতে হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে হাবসীদের গরিলা-যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বনের জন্য ইটালীর আদোয়া অধিকার করিতে বিলম্ব ঘটে। ইটালীয় সেনাধ্যক্ষ তাঁহাদের যুদ্ধকৌশল পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন এবং আদোয়া আকসাম রাস্তা দিয়া আদোয়াকে পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া আক্রমণ চালান। ইটালীয় সেনাদল মারেব নদী পার হইবার পর হইতেই হাবসী সেনারা গুপ্ত আক্রমণ চালাইতে থাকে। তাঁহারা পথের মাঝে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া লতাপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। ইটালীয়ানদের পাঁচটি ট্যাঙ্ক ঐ গর্ত্তের ভিতর পতিত হয়। ট্যাঙ্কগুলি হাবসীরা দখল করে। আদোয়ার সম্মুখস্থ সংগ্রামে উভয়পক্ষেরই বহুলোক হতাহত হয়। ইটালীয় একখানা বিমানপোত হাবসীদের গুলী-বৃষ্টির ফলে ধ্বংস হয়। হাবসীদের সব চেয়ে অধিক ক্ষতি হয় বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ফলে।

৬ই অক্টোবর আদোয়ার পতন সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। রাত্রি ৮ঘটিকার পর রোম সহরে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। ট্রামগাড়ীতে কাগজ আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং গৃহ প্রাচীর গাত্রে ঐ সংবাদ লিখিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত নগরী উন্মত্তের মত জয়ধ্বনি করিতে এবং পতাকা উড়াইতে থাকে। মশাল জ্বালিয়া শোভাযাত্রা করিয়া জনতা মুসোলিনীর আবাস স্থানে গমন করে। মুসোলিনী জনতার সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইটালীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল দ্য-স-বোনার নিকট বেতারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন—"আদোয়া পুনর্জ্জয়ে ইটালীয়দের হৃদয় জয়গর্ব্বে পূর্ণ হইয়াছে।"

আদোয়ার পতন হইয়াছে—যে আদোয়ার ক্ষেত্রে শোণিত সিক্ত করিয়া ৭০ হাজার হাবসী সেনা সম্রাট মেনেলেকের অধীনে একদিন আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, ইটালীয় সেনাদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল, যে আদোয়ার রণাঙ্গনে মেনেলেকের পত্নী স্বহস্তে কৃপাণ ধারণ করিয়া আবিসিনিয়ার সেনাদিগকে স্বদেশরক্ষার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন, আজ সেই আদোয়ার পতন ঘটিয়াছে। হাবসীরা আদোয়ার অধিকার হারাইয়াছে, তাহাদের তীর্থক্ষেত্র আকসামও আপাততঃ তাহাদের অধিকারচ্যুত হইয়াছে। এখন আদিগ্রাৎ, আদোয়া ও আকসাম জুড়িয়া ইটালীয়রা সত্তর মাইল দীর্ঘ এক ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

আবিসিনীয়দের গরিলা-যুদ্ধের জন্য ইতালীয়গণের অগ্রগতি সম্প্রতি ব্যাহত হইতেছে। ওগাদেন সমরক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন গরিলা যুদ্ধ চলিতেছে। প্রকাশ, হাবসীরা উয়াল-উয়াল অধিকার করিয়াছে। দেব্রাসিনায় হাবসী সৈন্যদল কয়েকটি মেশিন গানের সাহায্যে একটি সমগ্র ইতালীয় বাহিনীর গতিরোধ করে।

ইতালির অভিযানে ইংলণ্ডের আতঙ্ক

ইতালির এই অভিযানে ইংরেজের এবং ফরাসীরও আঁতে ঘা লাগিবার সম্ভাবনা খুব আছে।

সুদানের তুলা আছে বলিয়া ইংরাজ কার্পাস-বস্ত্র শিল্পে আজিও সমৃদ্ধ। নীল-নদের জলে সুদানের চাষ-বাসের কাজ চলে। নীল নদের উৎপত্তি আবিসিনিয়ার টানা হ্রদ হইতে। নীল নদের প্রবাহ উৎপত্তি-মুখে কেহ আটক করিয়া না ফেলে, সে দিকে ইংরেজের দৃষ্টি বরাবরই তীক্ষ্ণ। তাহারা এ বিপদ সম্বন্ধে সদা জাগ্রত। আবিসিনিয়া ইতালির অধিকারভুক্ত হইলে সুদান ও মিশরের জল সেচ ব্যবস্থার জন্য ইংরেজকে ইতালির মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

মিশর ইংরেজের তাঁবে আছে বলিয়া, সুয়েজখালের চাবি-কাঠি অনেকটা ইংরাজের হাতে। চুক্তি অনুসারে ৩৩ বৎসর পরে, ১৯৬৮ সালে সুয়েজ খাল মিশরের সম্পত্তি হইবে। তখন অবশ্যই আবার একটা নূতন বন্দোবস্ত হইবে এবং ইংরেজ ও ফরাসী আফ্রিকার মত, সুয়েজের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। আবিসিনিয়াতে প্রভুত্ব কায়েম করিতে পারিলে, ইতালি, নীল নদের জল আটক করিয়াই হউক, বা মিশরের সহিত ভাব করিয়াই হউক, সুয়েজ খালের কর্ত্তৃত্বে ভাগ বসাইতে চেষ্টা করিবে। কোন নূতন শক্তিকে এখানে নাক গুঁজিতে দিতে ইংরেজ ও ফরাসী সমান নারাজ।

অন্য দিকে অসংখ্য পাহাড়-পর্ব্বত সঙ্কুল হইলেও



ইতালীয়গণ বিজিত মাকালে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে

কেশ্বীর সৌজন্যে

আবিসিনিয়া খনিজ সম্পদে লোভনীয়। আবার এসব খনিজ সম্পদ এখনও অক্ষত। ইংরেজ ও ফরাসীর লোলুপ দৃষ্টি যে এই অক্ষত সম্পদের উপর রহিয়াছে তাহা না বলিলেও চলে; কোম্পানী গঠন করিয়া, পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা বলিয়া, বা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া এই সম্পদে ভাগ বসান যাইতে পারে। ইতালির অধিকৃত আবিসিনিয়ায় তেমন কিছু চলিবে না।

বর্ত্তমানে রাষ্ট্রসংঘ বলিতে—ইংরাজ ও ফরাসী। এতদিন রাষ্ট্রসংঘ নির্ব্বিকার ছিল; এখন তাহার টনক নড়িল। ইতালির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ কেহই চাহে না—অথচ আবিসিনিয়া গ্রাস করিতে তাকে দেওয়া হইবে না। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব ও তদানীন্তন ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ফরাসী মন্ত্রী লাভালের সঙ্গে এক গুপ্ত মন্ত্রণা করেন। লিগ অফ নেশনকে না জানাইয়া তাহারা ইতালীর হাতে আবিসিনিয়া সমর্পন করিতেছিলেন। গুপ্ত মন্ত্রণা ফাঁক হওয়ায় সব ব্যর্থ হইল; হোর মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ

জেনেভার ৯ই অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, 'রাষ্ট্রসংঘ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে ইতালী—যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত হাওয়ায় "শাস্তিমূলক বিধান" কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রসংঘ-এসেম্বলীর অনুমোদন আবশ্যক। এসেম্বলী অনুমোদন করিলে 'শাস্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা বিধিমত প্রয়োগ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামঞ্জস্য বিধায়ক কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে ইতালির বিরুদ্ধে আর্থিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী উক্ত প্রস্তাব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি বলেন যে, তাঁহার দেশ বর্ত্তমানে ঋণগ্রস্ত এবং কাহাকেও ধারে মাল জোগাইতে পারে না, সুতরাং শাস্তিমূলক বিধানের প্রতি তাঁহাদের কোন ঔৎসুক্য নাই। কিন্তু তিনি এই বিষয় নিজ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবেন। অষ্ট্রীয়ার প্রতিনিধি ও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

সভাপতি ঘোষণা করেন যে রেডক্রস, অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শাস্তিমূলক বিধানের আমলে পড়িবে না। ডি' ভ্যালেরা বলেন—তিনি আশা করেন যে, ধর্ম্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কেও এই নীতি প্রযুক্ত হইবে। রাষ্ট্র সংঘের যে সকল সদস্য বিধান প্রয়োগে যোগ দেন নাই, লিটাভিনফ তাহাদের সম্পর্কেও আলোচনার দাবী করেন।

ইতালীর বিরুদ্ধে লিগ দণ্ডবিধান আইন চালু করিতেছে। মুসোলিনী কিন্তু তাহার পরোয়া করেন না। ইতালি সমরায়োজনের জন্য পুরা দশ মাস কাল সময় পাইয়াছে। আজিকার দৃঢ়তার পরিচয় যদি গত ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দিত, তাহা হইলে এই অনর্থ উপস্থিত হইত না। গত জুলাই ও আগষ্ট দুই মাসে ইতালী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ছয়গুণ মাল আমদানী করিয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ইতিমধ্যে ৪,০০০ হাজার উড়ো-জাহাজের পেট্রল এরিত্রিয়াতে পৌঁছিয়া দিয়াছে। রুমানিয়া হইতে ছয় মাসে ইতালি বাৎসরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেট্রল জাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া হইতে অস্ত্র শস্ত্র, বুলগেরিয়া হইতে ময়দা ও বেলজিয়েম হইতে লোহা সংগ্রহ করিয়াছে।

আর্থিক লেন দেন বন্ধ করার অর্থ হইবে এই যে, যে সব দেশ লিগ মেম্বর সে সব দেশ হইতে ইতালি টাকা ধার পাইবে না। ইতালিকে আরও গোলাবারুদ ও অপর সাজ সরঞ্জাম কিনিতে হইবে। টাকা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? লিগ মেম্বরগণ কর্ত্তৃক ইতালীর পণ্য বর্জ্জনের অর্থ এই হইবে যে, ইতালির শতকরা ৭০ ভাগ পণ্য অবিক্রীত থাকিবে। কাঁচা মাল সরবরাহ করা বন্ধ করিলেঃ এক—ইতালির কলকারখানা অচল হইবে; দুই—অভিযানকারী সৈন্যদলের জন্য রসদ সংগ্রহে গোল উপস্থিত হইবে।

আদ্দিস আবাবা ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদ প্রকাশ, দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী সেনাপতি রাস দেস্তা তার করিয়া জানাইছেন যে, ইটালীয় বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষণের ফলে সুইডিস রেড ক্রশ এম্বুল্যান্সের সমগ্র সদস্য ৯জন সুইডিস ও ২৩জন হাবসী মারা গিয়াছে।

উক্ত এম্বুল্যান্স মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে পৌছিয়াছিল। দোলো হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে তাহাদের উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের উপর ইটালীয়গণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার বোমা বর্ষিত হওয়ায় উহার কি প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য স্থানীয় রেড ক্রশ প্রতিনিধিগণ রাজপ্রাসাদে গমন



সিনর মুসোলিনি

করেন। এখানকার চিকিৎসক মহলে ইটালীর কার্য্যে বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে। বৃটিশ প্রতিনিধিগণ বৃটিশ এম্বুল্যান্সের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উক্ত এম্বুল্যান্স এক্ষণে দেসি হইতে উত্তর বাহিনী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধি জেনেভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাজধানী আদ্দিস আববাতেই আছেন।

আদ্দিস আববা, ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সুইডিস রেডক্রশদলের উপর ইতালীর বোমাবর্ষণের ফলে আহত সুইডিস চিকিৎসক ডাঃ লুণ্ডষ্ট্রম মারা গিয়াছেন। তাঁহার চোয়াল উড়িয়া গিয়াছিল এবং সুমালি শিবিরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার সময়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রধান সুইডিস চিকিৎসক ডাঃ হাইল্যাণ্ডার আদ্দিস আববায় আছেন এবং তিনি এখনও আঘাতের ফলে ভুগিতেছেন।

রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ওয়ালটার কলিন্স দক্ষিণ রণক্ষেত্র হইতে সুইডিস চিকিৎসক ডাঃ এরিক স্মিথের সহিত বিমানপোতযোগে এখানে আসিয়াছেন। ডাঃ হাইল্যাণ্ডার তীব্র বিক্ষোভের সহিত বলেন যে "ইটালী সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক রেডক্রশের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া বোমাবর্ষী ইটালীয় পোতগুলি এম্বুলেন্সের চারিদিকে মেসিন গানের গুলীবৃষ্টি করিতেছিল। বোমাবর্ষণের দিন প্রাতে আমি অস্ত্রোপচার কক্ষে ছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ আমাদের উপর ভীষণভাবে বোমা ও মেশিনগানের গুলীবৃষ্টি আরম্ভ হয়। যেটুকু সময় পাইয়াছিলাম তাহাতে আমি দেখিতে পাইলাম যে, দুই সারিতে তিনটি করিয়া বিমানপোত লম্বালম্বিভাবে এম্বুলেন্সের উপর গুলী ও বোমাবর্ষণ করিতেছে; তার পরেই আঘাত লাগিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। যখন আবার চোখ খুলিলাম তখন হত্যাকাণ্ডের যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমাদের চারিদিকে বহু লোক মরিয়া পড়িয়া আছে, কেহ কেহ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে; চারিদিকে আহতগণের অস্ফুট আর্ত্তস্বর আর জলন্ত শিবিরগুলির পুড়িয়া যাওয়ার শব্দ। কত বোমা বর্ষিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা অসম্ভব, তবে দুই শতের অধিক নিশ্চয়ই এবং মেশিনগান হইতে হাজার হাজার বুলেট আমাদের উপর ছোঁড়া হইয়াছিল। একটি শিবিরে ৪২৫টি বুলেটের ছিদ্র দেখা যায়। ডাঃ লুণ্ডষ্ট্রমের মৃত্যু সংবাদ প্রাতে জানা যায়, তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত থাকেন, আমাকে এখন আহতগণের চিকিৎসা করিতে হইবে। আর একজন সহকারী চিকিৎসক ডাঃ লুণ্ডগ্রেন অল্প আহত হন। তিনি রোগীদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। যে সকল সুইডিস ও হাবসী শুশ্রূষাকারী আহত হন নাই, তাঁহারা অতি প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করেন। বোমা হইতে নির্গত ধূম ও গোলোযোগের ফলে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক হয়। আমাদের প্রায় সমস্ত ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম ধ্বংস হইয়া যায় এবং আহতদিগের চিকিৎসার জন্য হাতুড়ে ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হয়।



লাভাল

সুইডেনের রেডক্রসের উপর বোমাবর্ষণের ফলে ইতালী আজ সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছে। তাহার উপর ইংরাজ চাহেনা যে আবিসিনিয়া ইতালীর কবলে যায়। কে জানে এই সামান্য যুদ্ধ গত মহাযুদ্ধের ন্যায় বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে কি না।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল

বাঙ্গলাদেশে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয় করার পর হইতে ফুটবল খেলা ও দেখা বাঙ্গালীর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রিকেট খেলা কিন্তু এদেশে তেমন জমে নাই।



জে, রাইডার (ক্যাপ্টেন্)

বিলাতে সাহেবদের মধ্যে একটা কথা আছে যে ক্রিকেট খেলার মধ্যে ভবিষ্যৎ দেশনেতা গড়িয়া উঠে; একথা সত্য। ক্রিকেট খেলায় তৎপরতা, ধৈর্য্য, সংযম ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন এবং এই গুণগুলি জীবনে উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। ক্রিকেটে কাপ্তেনের নির্দ্দেশ অনুসারে সকলে সমবেত ভাবে না খেলিলে জয়ের আশা দুরাশা। জাতির জীবনেও সেইরূপ। যে জাতির উপযুক্ত নেতা নাই ও দেশবাসী নিয়মানুবর্ত্তী নয় সে জাতির উন্নতি অসম্ভব।

ক্রিকেট খেলা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইলেও ইহা যে একটি শিক্ষাপ্রদ খেলা এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটদল জগৎজয়ী। সেই অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়রা ভারতে আসিয়াছে, এবং ইহার ফলে যাঁরা কখনো ক্রিকেট খেলা দেখেন না, তাদেরও আগ্রহ হইয়াছে খেলা দেখিতে।

বোম্বাইতে সমগ্র ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলা হইয়াছে; তাহাতে অষ্ট্রেলিয়া দল নয় উইকেটে বিজয়লাভ করে।

বোম্বাইয়ের পর এলাহাবাদ ও ইন্দোরে অষ্ট্রেলিয়ার দল কিন্তু হার হইতে রক্ষা পাইয়াছে কেবল সময় উত্তীর্ণ হওয়ায়।

ইন্দোরের খেলায় মেজর সি কে নাইডু খুব ভাল খেলিয়াছিলেন এবং বল করেও পাঁচ উইকেট্ লইয়াছিলেন। এখানে অষ্ট্রেলিয়াকে কোন রকমে সময় কাটাইয়া 'ড্র' করিতে হইয়াছিল।

এলাহাবাদে দুইদলে উভয় পক্ষের এক এক ইনিংস হয়। ইউ-পি—১৩৭ ও অষ্ট্রেলিয়া—৮৯। ভিজিয়ানা গ্রামের



ওয়েণ্ডেল বিল

মহারাজ কুমার সর্ব্বোচ্চ রাণ ৪০ করিয়াছেন; ইহার মধ্যে ৬টি ছিল বাউণ্ডারী।

কলিকাতায় অষ্ট্রেলিয়ার দল

(১) অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম খেলা হয় বেঙ্গল ও আসামের সম্মিলিত দলের সঙ্গে। এই সম্মিলিত দলে



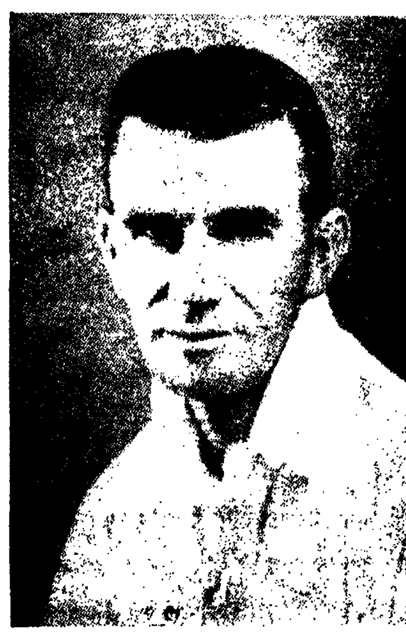
ব্রায়ান্ট

বাংলার বিখ্যাত খেলোয়াড় এস্, ব্যানার্জ্জী, জে, ব্যানার্জ্জী, ও কমল ভট্টাচার্য্য আর সাহেবদের মধ্যে হোসি, লংফিল্ড, ভেণ্ডারকটআরাটুন্ প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম ইনিংসে বেঙ্গল ও আসাম করে ১৩৬ রাণ, আর অষ্ট্রেলিয়া করে ৩০৮ রাণ। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৪ রাণ ক'রে বেঙ্গল ও আসাম কোনও প্রকারে এক ইনিংসের পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। ১৮৪ রাণ হওয়ার অন্যতম কারণ সেদিন অষ্ট্রেলিয়ার খারাপ ফিল্ডিং; ভাল হলে রাণ সংখ্যা ১৮৪ চেয়ে কম হ'ত। এই খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলের ম্যাকার্টনি ৮৫ রাণ করেছিলেন। বেঙ্গল ও আসাম পক্ষে প্রথম ইনিংসে কমল ভটাচার্য্যের ৪৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে আরাটুনের ৫৬ ও লংফিল্ডের ৩৩ রাণ উল্লেখ যোগ্য।

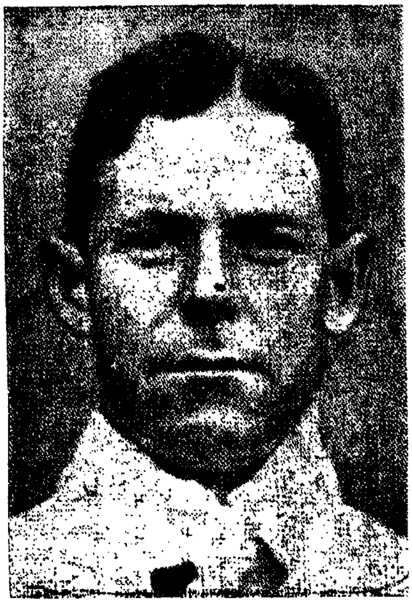
নিখিল ভারতীয় টীমের সঙ্গে খেলা

১৯৩৫ সালের শেষ দিন, নিখিল ভারতীয় টীমের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার দলের ক্যাপটেন্ রাইডার টসে জিতেও তাঁর দলকে ব্যাট করতে না দিয়ে ফিল্ড করতে দিলেন, কারণ আগের দিনে বিকাল ও রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় খেলার পিচ ভিজে নরম হ'য়ে গিয়েছিল। নরম মাটিতে ক্রিকেট খেলা ভাল হয় না, বলের গতি ঠিক থাকে না, কাজেই ব্যাট যারা করে, তাদের আউট খুব সহজে হয়।

প্রথম ভারতীয় দলের ক্যাপটেন্ সি, কে নাইডু। ব্যাট করতে আসিলেন ওয়াজির আলি ও মুস্তাক আলি। ম্যাকার্টনি ও অক্সেনহামের বল ভিজা মাটিতে ভয়াবহ হয়ে উঠল। ওয়াজির খুব সাবধানে খেলে নিজস্ব ২০ রাণ করলেন মোট রাণ সংখ্যা হ'ল ৩০ এই সময়েই মাকার্টনির বলে ওয়াজির আউট হলেন। মাত্র ৪৮ রাণে ভারতীয় দলের সকলেই আউট হ'য়ে গেলেন। এত কম রাণে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের আর কোন টীম আউট হয়নি। অষ্ট্রেলিয়ার দল এর পর ব্যাট করতে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁরাও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। পিচ তখন যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্বেও মাত্র ৯৯ রাণে তাঁরা সকলেই আউট হয়ে গেলেন। নিসার একলাই আউট করেন ৬জনকে।



টি লেদার



মোরিসবি

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসেও সুবিধা করিতে পারেনি মাত্র ১১৭ রাণেই সকলে আউট হ'লেন। খেলা আরম্ভ হবার একটু পরেই অমরনাথ আহত হন। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই তিনি আবার খেলতে নামেন। তিনি নিজস্ব ৩৯ রাণ করেন।

তারপর অষ্ট্রেলিয়া দল ব্যাট ক'রে—২জন আউট হয়ে ৮০ রাণ করে ৮ উইকেটে জয়লাভ করলেন। চারদিনের খেলা শেষ হ'য়ে গেল মাত্র ২ দিনে।

লাহোরে ভারতীয়দের জয়লাভ

লাহোরে তৃতীয় ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় দল ৬৮ রাণে জয় লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান দলকে ভারতীয় দল এই প্রথম হারাইল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস খেলার পর অষ্ট্রেলিয়ানদের জয়লাভ করিতে ২৮৫ রাণের দরকার ছিল। কিন্তু বাকা জিলানি ও নিসারের সুন্দর বোলিং অষ্ট্রেলিয়ানদলের রাণসংখ্যা ২১৬র অধিক করিতে দেয় নাই। তৃতীয় টেষ্ট খেলায় সুন্দর খেলিয়া বাঙ্গালীর মান রাখিয়াছেন গুটে ব্যানার্জ্জী। ২য় ইনিংসে ক্যাপটেন ওয়াজির আলি ও গুটে ব্যানার্জীর ব্যাটীং সাফল্য ভারতীয় দলের জয় লাভ করার প্রধান কারণ। পরাজিত দলের ক্যাপটেন রাইডারের ২য় ইনিংসয়ের ৭০ রাণ উল্লেখযোগ্য ২য় ইনিংস খেলায় অষ্ট্রেলিয়ানদলের ফিল্ডিং ভাল হয় নাই সেজন্যও ভারতীয়দলের রাণ সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাহার উপর তাহারা অনেক গুলা ক্যাচ ফেলিয়া দেন। যদিও শেষে তাহারা দেড়দিন সময় পাইয়া ছিলেন, তাহারা আকাঙ্খিত ২৮৫ রাণ করিতে পারেন নাই। বাকা জিলানি ১৬ রাণে ৪ উইকেট লইয়া ছিলেন এবং নিসার ৮০ রাণে ৪ উইকেট পান।

পাতিয়ালার খেলা

১৪ই জানুয়ারি পাতিয়ালায় অষ্ট্রেলিয়ান দলের তিন দিনের খেলা অদ্য আরম্ভ হয়। মহারাজা নিজে অষ্ট্রেলিয়ান দলের ক্যাপটেন হইয়াছিলেন। ভারতীয় দলের ক্যাপটেন হন পাতিয়ালার যুবরাজ। পিতা পুত্র দুই প্রতিযোগী দলের নেতা হইয়া সুন্দর খেলোয়াড় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। দল দুইটীর খেলোয়াড়দিগের নাম নীচে দেওয়া হইল।



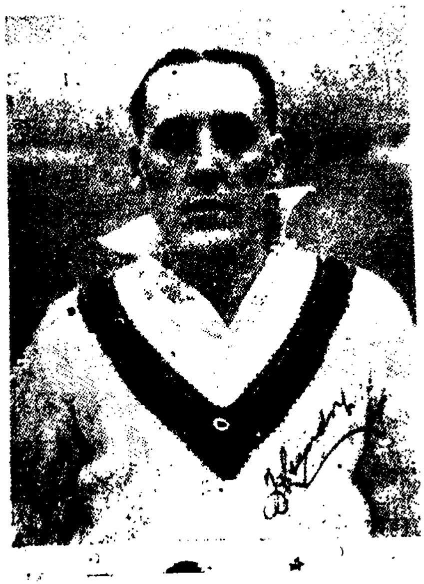
এইচ. আয়রন মঙ্গার

অষ্ট্রেলিয়ান দল :—পাতিয়ালার মহারাজা (ক্যাপটেন) রাইডার, ম্যাক্‌কার্টনি, ন্যাগেল, মেদার, এফ,ট্যারান্ট,এল ট্যারান্ট, ওয়েণ্ডেল বিল, আলেকজাণ্ডার মরিসবি ও লাভ।



মায়ার

পাতিয়ালার যুবরাজ দল :—পাতিয়ালার যুবরাজ (ক্যাপটেন), আলিরাজপুরের মহারাজ কুমার, মহম্মদ



হেন্‌ড্রি

নিসার, ওয়াজির আলি, অমর সিং, মেহেরমজা, অমরনাথ, মহম্মদ সৈয়দ, লালসিং, বাকা জিলানি ও আমির ইলাহি।

পাতিয়ালা দলের ওয়াজীর আলির সুন্দর খেলা হয়। ১৬৫ মিনিট খেলিয়া তাঁহার রাণ সংখ্যা শতাধিক হয়। চা খাওয়ার পর ওয়াজীর আলি ১৩২ রাণ করিয়া কট আউট হন।

পাতিয়ালা ও অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্রীকেট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। নিম্ন লিখিত রাণ করা হইয়াছে।—



ম্যাক্‌কার্টেনি

পাতিয়ালা—৩২৫ রাণ ও ২ উইকেটে ৭৭ রাণ। অষ্ট্রেলিয়ানদল মোট ৪৮৪ রাণ করেন তম্মধ্যে ওয়েণ্ডেলবিল ১১৮ রাণ করার পর আহত হইয়া অবসৃত হন, মরিসবি ১৪৫, রাইডার ৭৮ এবং আমীর এলাহী ১৬৪ রাণ দিয়া ৬ উইকেট লইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ান দল ভারতে আসিয়া অবধি ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক রাণ করিয়াছেন।

* ব্লকগুলি দৈনিক কেশরী হইতে প্রাপ্ত।

একাডেমী অব্ ফাইন আর্টসের তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী

শ্রীমুকুল

গত দুই বৎসরের ন্যায় এবারেও মহাসমারোহে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের তৃতীয় বার্ষিক্ চিত্রকলা প্রদর্শনী সুসম্পন্ন হইয়া গেল। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাজা মহারাজাই এই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের এই দেশে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্প কলার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নহে। প্রদর্শনীতে দাঁড়াইয়া এই কথাই বরাবর মনে হইতেছিল কোথায় সেই উন্নত মনা বাঙলার যুবক যুবতীরা—এই যে শিল্পীদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা—ইহার ভিতর কি তাহাদের দেখিবার শুনিবার বুঝিবার কিছুই নাই, সমস্ত কি নিরর্থক? নিশ্চয়ই না—আসল কথা ইহা তাহাদের আলস্য এবং জন্মগত শিল্প সৃষ্টির প্রতি উদাসীনতা। আমি জানি অনেকে আছেন ছুটির দিনে পাড়ায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরর্থক আড্ডা দিয়া কাটাইবে, অথচ ভুল করিয়াও কোনও শিল্প প্রদর্শনীতে যাইবে না—বলিবে, হ্যা চার আনা খরচ করিয়া ছবি দেখিতে যাইব পাগল পাইয়াছ নাকি? যেন কত মিতব্যয়ী। অথচ সন্ধ্যায় সিনেমায় যাওয়া চাই যে কোনও বই হোক না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। ইহার কারণ অনেক আছে—ছোট বেলা হইতেই আমরা কোনওরূপে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার শিক্ষা পাই না। অভিবাবকগণের সহিত হয়ত ভুবনেশ্বর যাই ঠাকুর দেখি প্রসাদ খাই অথচ মন্দিরের সৌন্দর্য্য গঠন নৈপুণ্য কিছুই বুঝিবার চেষ্টা করিনা বা অভিভাবকগণও সে দিকে কোনও চেষ্টা করেন না। আমি নিজে শুনিয়াছি চিড়িয়াখানায় এক ভদ্রলোক জেব্রার নাম না জানায় উহা তাহার ছেলের নিকট বিলাতি ঘোড়া নামে বুঝাইলেন। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ছোট বেলা হইতেই আমরা ফুল ছিড়িতে শিখি অথচ ফুল ভালবাসিতে শিখি না। এই ভাবেই আমরা আমাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলি। স্কুলে ড্রইং ক্লাস মানে মনে করি ফাঁকি—স্কুলের দেওয়ালে থাকে নীরস Chart, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার রঙিন দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে। জন সাধারণ original ছবি এবং ছাপা ছবির মধ্যে যে কি আকশ পাতাল তফাৎ তাহা মোটেই বোঝেনা প্রায়ই বুঝিবার চেষ্টাই করে না। ফলে এই দাঁড়ায় তাহাদিগের মধ্যে যখন কেহ বড় হয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করে তখন ঘর সাজান হয় College Square এর রেলিং হইতে সস্ পেন্টিং আনিয়া অথবা সস্তা দামের ক্যালেণ্ডার বেশী দাম দিয়া বাঁধাইয়া অথবা মাসিক পত্রিকার ছবি দিয়া এইত আমাদের শিল্প জ্ঞান। প্রকৃতির যে সব সৌন্দর্য্য সহজে মানবের চোখে পড়ে না শিল্পী সেই গুলি ধরে মানবের চোখের সামনে আরও সুন্দর করিয়া—দুঃখ এই সে হয় ত বুঝিতে চেষ্টা করে না এবং শুধুই সেই জন্য বোঝে না। উপরিউক্ত কারণ সমূহ হইতেই যাহাতে জন সাধারণের শিল্প কলার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে সে জন্য একাডেমী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, শ্রীযুত অতুল বসু এবং তাঁহার ছাত্রগণ এই কারণে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ। একাডেমীর প্রদর্শনীটী সর্ব্ব ভারতীয় বলা চলিতে পারে। শিল্পী নিভৃতে নির্জ্জনে বসিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে সেই সমস্ত জিনিষ হইতে সাধারণ লোকে এমনি চোখে যাহার ভিতর কোন কিছুই দেখিতে পায় না, Capt. Fosbery র Mountain Pool অথবা Evening Light, Kashmir, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সেন এ, আর

সি, এ, অঙ্কিত ব্রহ্ম দেশীয় চিত্র গুলি, শ্রীযুক্ত অতুল বসু অঙ্কিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দুইটী, Mr. Lane এর Morning Sunlight, Ootcamund Mr. Condon এর কাশ্মীরের দৃশ্যগুলি এবং শ্রীযুক্ত যতীশ সিংহের টাইগার হিল্ ইত্যাদি ছবিগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে কি অতুলনীয় শোভাসৃষ্টি করিয়াছে তাহা না দেখিলে বুঝান অসম্ভব। মানবের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিক দিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সদ্য ইটালী প্রত্যাগত শিল্পী ক্ষিতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী তাহার Italian girl এবং Spanish girl অঙ্কনের দিক দিয়া।

শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকারের প্রতিকৃতি যদিও জীবন্ত হইয়াছে, তবুও তাহার সেই We are three এবং নেপালী মেয়ের কথা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই, কোমল, গোলাপী আভা যুক্ত গাল, সেই ছোট্ট চকচকে চক্ষুদুটীতে অপরিসীম সরলতা, মুখে অফুরন্ত হাসি এবং তাহার ভিতরে আছে পাহাড়িয়া সুলভ কঠোরতা—সেকি ভোলা যায়? তাঁহার আলেখ্য খানা মন্দ হয় নাই।

G. S. Haldanker এর Cosy Corner খানা হইয়াছে একটী অনবদ্য সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। ঘরের কোণে খাটীয়ার উপর বসিয়া আছে এবং বৃদ্ধ—জীবনের চলার পথে তাহার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। চক্ষু তাহার অৰ্দ্ধ নিমীলিত চিন্তায় বিভোর। জীবনে অনেক কিছু সে দেখিয়াছে শুনিয়াছে, আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, দুঃখ সহিয়াছে সে আজ যেন তাহার সেই সব অভিজ্ঞতার বোঝা কাঁধে নিয়ে পারের ডাক শুনবার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে ঘরের এবং নিভৃত কোণায়। টেকনিকের দিক দিয়াও ছবি খানি হইয়াছে সার্থক।

V. A. Molir Our Venerable Priest ছবি খানি হইয়াছে বেশ ভাল, কিন্তু তিনি তাহার ছবির সহিত তাহার পশ্চাদপটের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই ছবিখানা অনেকটা পোষ্টার শ্রেণীর হইয়াছে শ্রীযুক্ত ভবেশ সান্ন্যালের ছবিগুলি ভালই হইয়াছে তবে আমরা এবৎসর তাহার নিকট হইতে ভাস্কর্য্যের দিক হইতে নূতন কিছু আশা করিয়াছিলাম। এই সব ছাড়া ইউরোপীয় প্রথায় অঙ্কিত অনেক ভাল ছবির সমাবেশ হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত অবনী সেন এবং শ্রীযুক্ত সরষী রায়ের Sketch গুলি বেশ ভাল হইয়াছিল।

কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে অনেক বাজে ছবি এবার প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল। এ দিকে তাঁহাদের কঠোর দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি। ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত চিত্র বিভাগে এবার অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীর কোন ছবি নেই যথা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র নাথ, গগনেন্দ্র নাথ, অসিত কুমার, ক্ষিতীন্দ্র নাথ মজুমদার, নন্দলাল বসু, দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী বীরেশ্বর সেন, কিরণ ধর, মুকুল দে ইত্যাদি। যাহারা এই বিভাগ অলংকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য, শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, প্রমোদ কুমার, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু পদ রায় চৌধুরী ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের মতে ও মেয়ে ছবিখানা প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভাইসরের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। ছবিখানা বাস্তবিকই সরল, অনাড়ম্বর সুন্দর। তাঁহার নূতন পদ্ধতিতে আঁকা অনেক গুলি চিত্র ছিল তাহার ভিতরে যশোদা, মা, চিন্তা, বেশ বিন্যাস, রামলীলা ইত্যাদি চিত্রগুলি ভাব প্রকাশের দিক দিয়া অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। যামিনী বাবুর শিল্প বাংলার নিজস্ব বস্তু কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই চারজন ছাড়া, জনসাধারণ এখনও তাঁহার চিত্রের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। চক্ষুর খোরাক হিসাবে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চিত্রগুলি হইয়াছে চমৎকার।

ধর্ম্মতত্বের দিক হইতে শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমারের অগ্নয়ে স্বাহা ছবি খানা হইয়াছে সুন্দর। তাঁহার অন্ধ ভিখারীর চিত্র খানা হইয়াছে মন মুগ্ধকর। দিনের শেষে বনপথের অন্তরালে ভিখারী চলিয়াছে তাহার গৃহাভিমুখে, নয়নে তাহার দৃষ্টি নাই অথচ পথ তাহার পরিচিত। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুক পড়িয়াছে তাহার অঙ্গের গাছে

পাতার ফাঁকে ফাঁকে মধুর। কিন্তু তাহার নটরাজ উদয় শঙ্করকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

উকিল ভ্রাতৃত্রয়ের ছবিগুলি মন্দহয় নাই। শ্রীচৈতন্য দেব ইত্যাদির চিত্র গুলিও উল্লেখ যোগ্য।

ভাস্কর্য্য সংগ্রহও এবার তেমন কিছু উল্লেখ যোগ্য হয় নাই তবে Mr. K. C. Roy এর London Royal Academyতে প্রদর্শিত শকুন্তলা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, ইহা ছাড়া তাহার Dreamland Sir, William Jones translating Sakuntala, Sir,P.C.Mitterএর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি বেশ চমৎকার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পি মল্লিকের বন্ধুর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি বাস্তবিকই উচ্চপ্রশংসা পাইবার যোগ্য। ইহাছাড়া Richard Grabe A,R.A নির্ম্মিত A Girl and Macow, Debiprasad Narayan Raoর রিলিফ Temptation of Budha ইত্যাদি মূর্ত্তি গুলি প্রশংসনীয়। সুধীর রঞ্জন খাস্তগীরের, শীত, জল পান ইত্যাদি মূর্ত্তিগুলি হইয়াছে চমৎকার। যাঁহারা খাঁটি শিল্পী তাহাদের নিকট হইতে আগামী বৎসর আরও নূতন সুন্দর কিছু আশা করি।

আমারে চেন নাই প্রিয়

হোস্‌নে আরা বেগম

আমার হৃদয় মাঝে যেই আমি কাঁদি নিশি দিন
তাহারে ভুলাবে তুমি ক্ষুদ্র ওই কথার মালায়?
যে রুদ্র মোর মাঝে জাগিতেছে সদা ক্ষমাহীন
ভেবেছ তাহারে তুমি অপমান করিবে হেলায়?

ভুল সখা, ভুল তাহা, বুঝ নাই আমার হৃদয়
ধরণীর অভিশাপে ভুল করি বরিয়াছ প্রিয়।
কালকূট বিষ সদা, অমৃত সে কখনো কি হয়?
মরণেরে স্মরে কেবা? হয় কি সে কভু বরণীয়?

আকাশের নীল বুকে দেখিয়াছ বিজলীর খেলা?
শ্মশানের চিতা' পরে হেরিয়াছ আগুনের শিখা?
মরণের মাঝে তুমি হেরেছ কি জীবনের মেলা?
সেই খানে পাবে সখা মোর সত্য পরিচয় লিখা।

আজি মোর হৃদি মাঝে জাগে যেই অশান্ত ক্রন্দন।
সে শুধুই আজি মোর পুনরায় জাগার বেদন।



৯ম বর্ষ } মাঘ, ১৩৪২ { বিশেষ সংখ্যা

বৃন্দাবন

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

গিয়েছিলেম বৃন্দাবনে।
বন্ধুরা জিগ্‌গেস করলে, কী দেখে এলে ?
বল্লুম বাঁদর, ভিখারী, বোষ্টম, বোষ্টমী।
আর ষোড়শ সহস্র গোপিনীদের দেখে এলুম
এক পয়সার ছোলাভাজা ছড়িয়ে।
ওরা হেসেই আকুল কি বুঝবে ওরা ?
কৃষ্ণবিরহে গোপিনীরা হলেন পাথর,
দিলেন যমুনায় ঝাঁপ্।
পীরিতি অজর অমর, মরণ হল না, হলেন কচ্ছপ,
—যে শিলা জলে ভাসে।
দেহ ধারণ করলে দেহের ক্ষুধা মিটাতেই হয়.
ছোলা ভাজার লোভে তাই ভেসে উঠ্‌তে হ'ল।
আমার দর্শন হয়ে গেল,
ঠাট্টার ছলে আসল কথাটা চাপা দিলুম।

আমার চোখে ভাস্‌ছে সেই চিরন্তন বৃন্দাবন।
চির-নবীনের দেশ, বুড়োরা সেথায় কক্ষে পায়না।
তরুণ তরুণীরা ভুজবন্ধে বাঁধা, আর গাছে গাছে ডাকছে কোকিল।
বুড়ো? সে ত লাঠির ডগায় কাক-তাড়ানো পোড়া হাঁড়ি,
কিম্বা একটা ছেঁড়া জামা, ভিতরটা যার শূন্য।
ভিতর যদি ফাঁকা হয়,
—আঁস্তাকুড়ে ফেলা হাঁড়িও যা,
আর কলাই-করা ডেক্‌চি ও তাই।
বাখারি-টাঙ্গানো ছেঁড়া জামা
আর স্যুট্-পরা কাঠের পুতুল
বিলাতী দর্জ্জির দোকানে,—তফাৎ কোথায়?
ওই পোড়া হাঁড়িতে যদি অন্নপূর্ণার আশীর্ব্বাদ থাকে,
তা'হ'লে একটা অন্নসত্র খোলা যায় ওই হাঁড়ি দিয়ে;
ওই ছেঁড়া জামার তলে থাকে যদি প্রেতাত্মা,
সে হাত তালি দিয়ে গেয়ে উঠ্‌বে,
ছেঁড়া-ন্যাকড়ার টানা পোড়েনে শুন্‌বে তন্তুবায়ের গুণ্‌গুনানি।
ঢেউ মরে, থাকে তার নিত্যবহমান্ প্রবাহ।
কোকিল বংশপরম্পরায় মরে, তার কুহুধ্বনি অমর।
মরত্তের পরতে পরতে অফুরন্ত যৌবন।
দেখলুম মদন মোহন বঙ্কবিহারী রাধারমণ গোবিন্দজির মন্দির;
নিকুঞ্জবন, সোনার তালগাছ, 'রাধেশ্যাম' মণ্ডলী।
শ্মশান। শবকঙ্কালের স্তূপ
পাথর হয়ে ধরেছে অভ্রভেদী মন্দিরের চূড়া।
ফাঁকে ফাঁকে ডাক্‌ছে ঝিঁঝিঁ পোকা
"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে?"
শ্রান্ত হয়ে ফির্‌লাম পাণ্ডার ঘরে।
ছাদে মাদুর বিছিয়ে শুলাম।
বল্লুম, ঠাকুর, বাসনার পিণ্ড এই হৃদ্-পিণ্ডটাকে কর ভস্মসাৎ
এ উদ্বেল হোক প্রশমিত,
নিথরের উপর পড়ুক্ শাশ্বতের অনাবিল জ্যোৎস্না।
একটা মুমূর্ষু পশুর বুকে প্রাণ রয়েছে বন্দী,
তাই আমি আত্মবিস্মৃত।

কানে এল বংশীধ্বনি,
ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ যার সুরে সুরে গাঁথা।
সেই জ্যোৎস্না যামিনী, শারদোৎফুল্ল মল্লিকা।
খস্‌ল জড়ের বন্ধন, আত্মার এই শতচ্ছিন্ন আবরণ।
চোখ গেল, ফুটল দৃষ্টি ; দেহ গেল, জাগল স্পর্শানুভূতি।
সেই যমুনা, সেই কদম্বমূল, সেই অম্লান যৌবন, সেই
অনাবিল প্রেম।
আর পাথর চাপা প্রাণ রক্তমাংসের মুখে চানা চিবোয় না।
চিরন্তন ব্রজনারী চলেছে ব্রজেশ্বরের অভিসারে।
ঝর্‌ছে দল, ফুট্‌ছে ফুল,
মর্‌ছে দেহে, বাঁচছে প্রেমে।

ফিরলাম দেশে।
বাঁদর ভিখারী বোষ্টম বোষ্টমী
আর মন্দিরের পর মন্দির,
শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি,
রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী বিদেশী কত কবি,
তীর্থযাত্রী নরনারী, পাণ্ডা পুরুৎ
সব মিলে হল আমার বৃন্দাবন
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে চলেছি তেপান্তরের মাঠে,
যুগ থেকে যুগান্তরে,
পথ আর ফুরায় না,
দেহভার নাই, পথশ্রান্তিও তাই নাই।
চোখে জাগে যমুনার তীর, নিকুঞ্জ বন
কত চেনা মুখ, কত অচেনা রূপসী।
যা কুশ্রী, মনে হয় চির-সুন্দরের অপূর্ণতার বেদনা,
যা কলুষ, ভাবি আলোকের জন্য আঁধারের কান্না,
সব সত্য, সব শিব সব সুন্দর।

অমৃত-স্মৃতি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ-এস-এস,
এফ-আর-ই-এস্



শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, রসরাজ অমৃতলাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের শৈশবাবধি তিনি দেশবাসীকে যে আনন্দ দিয়াছেন তাহার কতটুকু আমরা মনে রাখিব এবং সেই বা কতদিন? "দেহ পট সঙ্গে নট সকলি হারায়।"

সাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান, সমাজের উন্নতিকল্পে, ভণ্ড সমাজ-সংস্কারক, ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিক প্রভৃতির পৃষ্ঠে কশাঘাত করত প্রহসনের আকারে লিখিত। যে সকল সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে উহা রচিত, যে সকল অনাচার, কপটতা ও ভণ্ডামী উহার লক্ষ্যস্থল, সে সকল ঘটনার কথা, অনাচারের কথা, লোকে বিস্মৃত হইতেছে বা হইবে, এবং সমসাময়িক সমাজে নাট্যকার অমৃতলাল যে অপূর্ব্ব যশঃ উপভোগ করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট তিনি তাহার কতটুকু পাইবেন?

জগৎ যাঁহাদিগকে বড়লোক বলে, যাঁহাদের জীবনচরিত আদর্শ বলিয়া অলোচনার যোগ্য মনে করে, তাঁহাকে তাঁহাদের শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত করিতেও অনেকে হয়ত কুণ্ঠাবোধ করিবে। তিনি মহাত্মা ছিলেন না, দেবতা ছিলেন না। কিন্তু তিনি মানুষ ছিলেন, দোষে গুণে মিশ্রিত মানুষ। দেবতাকে আমরা ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, পূজা করি, মানুষকে আমরা ভালবাসি। অমৃতলালকে সেইজন্য সকলে ভালবাসিত। সে ভালবাসা মৌখিক নহে, আন্তরিক।

কারণ তিনি বিশেষ ভাবে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তাঁহার কি এক মোহিনী শক্তি ছিল, যাহা এক মুহূর্ত্তে পরকে আপন, অপরিচিতকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে পারিত। কোনও মজলিসে বা প্রীতিসম্মেলনে, রসরাজ অমৃতলাল উপস্থিত হইলে যেন আনন্দের উৎস উন্মুক্ত হইত। অনেক প্রসিদ্ধ লেখককে দেখিয়াছি, ইংরাজ কবি অলিভার গোল্ডস্মিথের ন্যায়
'Wrote like an angel but talked like poor Poll'

বাক্‌চাতুর্য্য সকলের থাকে না। অমৃতলাল যেমন লিখিতে পটু ছিলেন, তেমনই বলিতে পটু ছিলেন, এবং (যাহা আমাদের দেশে ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে) সেই স্বতঃউৎসারিত অফুরন্ত হাস্য রসের অবতারণায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

আমার অনেক সময় মনে হয়, হয়ত অমৃতলাল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অভিনেতা আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নাট্যকার দেখিতে পাইব, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুরসিক মজলিসি লোক আর দেখিতে পাইব না। তাঁহার জীবনচরিত লিখিত না হইলে

আক্ষেপ নাই, তাঁহার অনেক রচনা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের দ্বারা উপেক্ষিত হইলেও ক্ষোভ নাই, কিন্তু যদি আমরা কেহ রসরাজ অমৃতলালের সরস বাণীগুলি, সভায় সম্মিলনীতে স্বতঃউৎসারিত রহস্যপূর্ণ উক্তিগুলি সঙ্কলন করিতে পারিতাম!

শুনিয়াছি 'অমৃত চক্র' রসরাজের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? এখনও এমন অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহাদের নিকট হইতে হয়ত এই সকল অমৃত-বাণী সঙ্কলন করা অসম্ভব নহে।

আমি জীবনে কয়েকবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভের পর। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নাম আমার সুপরিচিত ছিল। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশিত হইবামাত্র আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে আসিত এবং সম্পূর্ণ রসগ্রহণের সামর্থ্য জন্মিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া যথাসম্ভব রসাস্বাদন করিতাম। তাঁহার চিত্রগুলি জীবন্ত এবং কতকগুলি কোন কোন জীবিত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়া অনুমিত হইত। কে তাঁহার লক্ষ্যস্থানীয় তাহা লইয়া অনেকেই জল্পনা কল্পনা করিতেন, আমি বাল্যকাল হইতেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাইতাম। "বাবু" "কালাপানি" "একাকার" প্রভৃতি প্রহসনগুলি বাল্যকাল হইতেই আমার পরিচিত।

রঙ্গমঞ্চেও অমৃতলালকে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছি। শেষ দেখিয়াছিলাম 'খাসদখলে' নিতাই এর ভূমিকায়। 'ব্যাপিকা বিদায়ের' প্রথম অভিনয় রজনীতে তাঁহাকে কবিতায় লিখিত একটি সূচনার আবৃত্তি করিতে দেখিয়াছিলাম মাত্র। ছায়াচিত্রে কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় তাঁহার মৃত্যুদৃশ্যও ভুলিবার নহে।

রঙ্গমঞ্চের বাহিরে তাঁহাকে দেখি,—আমার কৈশোরে। অমৃতলাল আমাদের পরিবারকে বহুদিনাবধি জানিতেন। আমার পিতামহ "বেঙ্গলী"-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পূজ্যপাদ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে তিনি তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভারত-মাতা" নামক একটী ক্ষুদ্র স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক অভিনীত হইত। উহার একস্থানে ভারতমাতা তাঁহার সুপ্ত আলস্যপরায়ণ সন্তানগণকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তাঁহার স্বর্গগত ভক্ত



শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

সন্তানগণের উদ্দেশে বিলাপ করত কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন "কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথায় রামমোহন, কোথায় রামগোপাল?" উহা অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল, পরে উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে অমৃতলাল ঐ গ্রন্থেরই আদর্শে "নবজীবন" নামক একটী "মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা" রচনা করেন, উহাতেও পিতামহদেবের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবকগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :—

"বঙ্গে বিদ্যাসাগর, হরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রামমোহন, মনোমোহন, রামগোপাল, নবগোপাল, রাজেন্দ্রলাল আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, উমেশচন্দ্র আছে, রমেশচন্দ্র আছে, আনন্দমোহন আছে, সুরেন্দ্রনাথ আছে।" ইত্যাদি—

পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে পিতামহদেবের মধ্যমাগ্রজ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকটে অমৃতলাল (তখন যুবক) মধ্যে মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ লইতে



শ্রীনাথ ঘোষ

যাইতেন। কিন্তু শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। আমার জ্যেষ্ঠতাত পূজনীয় চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ১নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে প্রায়ই অমৃতলাল (তখন সিকদার বাগান ষ্ট্রীটেই থাকিতেন) চা'য়ের আড্ডায় যোগদান করিতেন এবং আমার মনে পড়ে বন্ধুগণের উচ্চহাস্যে গৃহখানি কিরূপ মুখরিত—প্রতিধ্বনিত হইত। আমরা দূর হইতেই দেখিতাম, নিকটে যাইয়া আলাপ করিবার সাহস হইত না।

যখন আমি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে ব্যাপৃত, উপকরণ সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে যাইতে হইত। অমৃতলালকে প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার বলিয়া জানিতাম, তিনি যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি সংগ্রহে যত্নশীল তাহা জানিতাম না। যেদিন কোনও বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির অমূল্য সংগ্রহ আছে সেদিন বিস্মিত হইয়াছিলাম।

একদিন সাহস করিয়া কম্বুলিয়াটোলায় তাঁহার রাম চন্দ্র মৈত্রের লেনস্থিত বাসায় দেখা করিলাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় স্নেহালিঙ্গন দিলেন।

বলিলাম, হেমচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছি, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার যদি কোন স্মৃতিকথা বলেন শুনিয়া যাইব। আর যদি তাঁহার নিকট কোন সেকালের সংবাদপত্রাদি থাকে তাহা দেখিতে চাহি।

তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিলেন যে যখন তাঁহার চক্ষুঃপীড়ায় তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্রাদি সেরদরে হকারকে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে যে তিনি কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথার ভাবেই বুঝিতে পারিলাম।



হেমচন্দ্রের ভ্রাতা—পূর্ণচন্দ্র

হেমচন্দ্রের স্মৃতি-কথা সংগ্রহ করিতে গিয়াছি শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন "দেখ

শুনিলাম একজন লেখক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনচরিত লিখিতেছেন, অথচ তিনি একবার আমার নিকট আসা প্রয়োজন মনে করিলেন না। অথচ গিরিশচন্দ্রের জীবনের কত ঘটনার সহিত আমি পরিচিত বা বিজড়িত।"



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য পড়িয়া তিনি স্বদেশ প্রেম শিক্ষা করেন। তিনি বলেন, বাল্যকালে বাঁখারি ঘুরাইয়া "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়া তিনি বীরত্বের অভিনয় করিতেন। হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" প্রভৃতি কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং ৺কাশীধামে অবস্থানকালে হেমচন্দ্রের সহোদর ৺ ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই অমৃতলালকে "ভারত সঙ্গীত" আবৃত্তি করিতে বলিতেন। পূর্ণচন্দ্র বলিতেন অমৃতলালের "ভারত সঙ্গীত" আবৃত্তি তাঁহার যেমন ভাল লাগে, স্বয়ং হেমচন্দ্রের আবৃত্তিও তেমন লাগেনা।

অমৃতলাল বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এখন শিক্ষিত বাঙ্গালার উপর যে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সেকালে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। তাঁহার কবিতাবলীর এত আদর ছিল যে কোনও নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই হেমচন্দ্রের কোন কবিতা আবৃত্তি করিয়া রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে শুনাইতেন। কখনও কাহাকেও বিধবা নারী সাজাইয়া আবৃত্তি করিতেন

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে।"

কখনও বা হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' আবৃত্তি করিয়া বলিতেন

"ভয়ে ভয়ে গাহি কি গাহিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"

হেমচন্দ্রের কবিতায় আছে, 'ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর" কিন্তু অমৃতলাল উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া গাহিতেন 'ভয়ে ভয়ে গাহি' ইত্যাদি, কারণ 'লিখির' সহিত 'শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কারের' সামঞ্জস্য করা যায় না। হেমচন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থায় কাশীতে একবার অমৃতলাল কবিবরকে এই পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র শুনিয়া বলিয়াছিলেন বেশ করিয়াছ। যখন ওসব লিখি তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল? অমৃতলাল বলিয়াছিলেন, 'আপনার কেন, ওরূপস্থলে মিল্‌টনেরও মাথা ঠিক থাকিত না।'

ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসী কবিতাগুলির স্থায় হেমচন্দ্রেরও প্রণয়গীতি অতি অল্প সংখ্যকই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি সেকালে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল। অমৃতলাল হতাশের আক্ষেপ শীর্ষক কবিতাটির একটী অনুকৃতি-কৌতুক (Parody) লিখিয়াছিলেন :—

(১)

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠর মাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয়রে॥
আহার পাবার নয়, তবু কেন ক্ষুধা হয়,
জলে যে জঠরানল কেমনে নেবাইরে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে॥

———

(২)

ওই হাঁড়ি ওইখানে, এইস্থানে একমনে
কত খাব মনে মনে কতদিন করেছি।
কতবার পিসীমার হাতনাড়া হেরেছি॥
সে পিসী নাহিক আর, হেঁসেল যে অন্ধকার,
কি আশ্বাসে পাত পেড়ে বসে আমি রয়েছি॥

(৩)

অন্তিম যখন তাঁর, বলিতেন বার বার,
ভাতের ভাবনা তোর কোনদিন হবে না।
ওরে দুষ্ট সূপকার, কি করিলি অভাগার।
কার ঝোল কারে দিলি আমার যে চলে না॥ ইত্যাদি

অমৃতলাল বলিলেন এদেশে এরূপ অনুকৃতি-কৌতুক লিখিলে অনেকে মনে করেন প্রসিদ্ধ কবিকে ব্যঙ্গ করা হইতেছে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইতেছে। এই সকল প্রকৃত রসানভিজ্ঞ পাঠকগণ স্মরণ রাখেন না যে প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিরই অনুকৃতি-কৌতুক হইয়া থাকে।

হেমচন্দ্রের প্রতি অমৃতলালের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের সময় অমৃতলাল রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন—তাঁহার চক্ষুতে অস্ত্র করা হইয়াছিল। কবির মৃত্যু সংবাদ তাঁহার নিকট গোপন করা হইয়াছিল কিন্তু ঘটনার তিন চারিদিন পরে কোন বন্ধু অসতর্ক মুহূর্ত্তে সংবাদটী প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অন্ধাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের 'সৎকার' সম্বন্ধে একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করিয়া একজনকে লিখিয়া লইতে বলেন।

বল হরি হরিবোল হরি হরি বোল।
ধীরে ধীরে তোল শব কোরো নাক গোল
শোয়ায়ে দড়ির খাটে
নে চল শ্মশান ঘাটে,
খেলো ঠাটে ভেলো কাঠে সাজাইয়া চুলি।
মুখ অগ্নি করো জ্বেলে ভিক্ষা করা ঝুলি॥

এ নয় সে হেম যেই শামলা মাথায়।
হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায়॥



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যায় বৈঠকে যাঁর,
বন্ধুরা দিতেন বার,
প্রভাতে পাতিতে হাত আসিত অনাথ
বাড়ীতে পড়িত কত হাভাতের পাত॥
সে হেম অনেক দিন মরিয়াছে আজ,
পূজেছিল বঙ্গ যারে বলে কবিরাজ॥
শিহরি যাহার গীতে,
ঘুম ভেঙে আচম্বিতে,
শুনেছিনু কলরব বাঙালী টোলায়।
'জাগরে ভারতবাসী' বঙ্গবাসী গায়॥
মানবের কণ্ঠে গান জন্ম দেববরে।
শুনেছিল সেই গান অবশ্য অপরে॥
বুঝি বা জাপানে কেউ
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ;
'অসভ্য' জাপানী তাই আজি বজ্রপাণি।
পাশ্চাত্য জগৎ মত্ত মহিমা বাখানি॥

মধুদত্ত মৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে
বঙ্কিম বসালে যারে দর্পে সিংহাসনে ॥
চক্ষু অর্থ নষ্ট ক'রে
সে হেম গেছে গো ম'রে
দুর্ভাগ্য দশায় ক'রে গ্রহদোষে ভর।
রেখেছিল দেহখানা এ কয় বছর ॥
বিধিরে বুঝায়ে বুঝি আজি সরস্বতী
পুত্রের প্রেতত্ব নাশি করালেন গতি ॥
চুপি চুপি চল ভাই
খাটে তুলে ঘাটে যাই,
মরা মড়া পোড়াইতে কাজ নাই গোল।
মনে মনে কাঁদ বল ধীরে হরি বোল ॥

কথনই তাঁহার সহিত সাহিত্য বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুবিধা হইতে পারে জিজ্ঞাসা করায় অমৃতলাল বলিলেন যে থিয়েটারের তিনদিন বাদ দিয়া সপ্তাহের বাকি চারিদিন সন্ধ্যায় তিনি শ্যামবাজার আংলো ভার্ণাকুলার স্কুলের গৃহে বসিয়া থাকেন, সেখানে কথাবার্ত্তা কহিবার বেশ সুবিধা।

আমি কয়েকদিন সন্ধ্যার সময় স্কুলগৃহে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তখনও বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মিত হয় নাই। ভিতরে একটি দালানে তিনি বসিয়া গড়গড়ায় তামাকু-সেবন করিতেন, ছোট ছোট ছেলেরা আশে পাশে খেলা করিত। তিনি বোধ হয় তখন বিদ্যালয়ের সম্পাদক বা অধ্যক্ষসভার প্রধান সভ্য, ছেলেরা অসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে আসিত, শিশুসুলভ আবদার করিত, তিনি বাড়ীর ছেলেদের ন্যায় তাহাদিগের খবরাখবর লইতেন, তাঁহার ও তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিলনা। এই ভাবটি আমার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে জগবন্ধু মোদক এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়টিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অমৃতলাল স্বয়ং এবং ৺ভূপেন্দ্র নাথ বসু, ৺ডাক্তার রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রভৃতি উহার ছাত্র ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়টীর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া উহাকে স্থায়ীভাবে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে তখন চেষ্টিত ছিলেন। শৈশবের পাঠশালার প্রতি এরূপ মমতা আর কাহারও দেখি নাই। তিনি প্রাণ দিয়া বিদ্যালয়টিকে ভালবাসিতেন এবং উহার উন্নতিকল্পে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আমার কোনও জীবনী গ্রন্থে সত্যের অনুরোধে কোনও প্রসিদ্ধ দেশসেবকের কোনও অপ্রশংসনীয় কার্য্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলাম। অমৃতলাল উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, জীবনচরিতে এইরূপ নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা চাই। আমি বলিলাম আপনি সামাজিক নাটক



রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

প্রহসনাদিতে অনেকের ভণ্ডামীর প্রতি নির্ম্মম কশাঘাত করিয়াছেন, অনেকের মুদ্রাদোষের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া রহস্য করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও প্রতি আপনার কোন বিদ্বেষ ভাব আছে বোধ হয় না। এদেশে কিন্তু অনেকেই এরূপ চিত্র দেখিলে মনে করেন উহা বিদ্বেষ-

প্রস্তুত। বিদেশে বড় বড় রাজনীতিক বা সাহিত্যিকের কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র বাহির হয়, কিন্তু এদেশে ঐরূপ বাহির হইলে রসগ্রহণ করা দূরে থাকুক লোকে আদালতে মানহানির নালিশ করিতে ছুটে। অমৃতলাল বলিলেন, "কোনও ব্যক্তির প্রতি আমার ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নাই, তাহাদের মুদ্রাদোষ বা অন্যায় আচরণ বা ভণ্ডামিই আমার বিদ্রূপবাণের লক্ষ্য।" আমার বাল্যকালে ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর হিন্দুমতে বিলাত যাত্রার এক আন্দোলন করিয়াছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ৺মহারাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর আমার এক মাতৃস্বসাকে বিবাহ করেন এবং রাজা বিয়নকৃষ্ণকে আমি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম। একদিন দেখিলাম বাড়ীতে খুব হাসাহাসি হইতেছে, অমৃতলাল নাকি রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কালাপানি প্রহসনে খুব বিদ্রূপ করিয়াছেন। বইখানি পড়িলাম। কালাপানিতে অবশ্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ বা ন্যায়রত্ন মহাশয় কাহারও নাম ছিল না। কিন্তু হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা আন্দোলনের নেতা যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ ইহাও কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের ইংরাজী কথাগুলি পড়িয়া কত যে হাসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অমৃতলালের নিকট উহার উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, ঐ মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আশ্চর্য্য রসাস্বাদন শক্তি ছিল। রহস্যনাট্যে কাহারও মুদ্রাদোষ বা খেয়াল বা অন্য কোনও দোষ বড় করিয়া দেখাইলে রসানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের মানের হানিকর বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এরূপ ব্যক্তি ছিলেন না। আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যসেবী পূজনীয় মহামহোপাধ্যায়গণের ইংরাজী ভাষাজ্ঞানহীনতা আমি মোটেই দূষণীয় মনে করি না, এবং প্রতীচ্য পণ্ডিত গণ অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিলেও তাহা দোষের নহে। আমি নির্দ্দোষ হাস্যরসের অবতারণার জন্যই পণ্ডিতের মুখে অবিশুদ্ধ ইংরাজী উক্তি দিয়াছিলাম—বিদ্বেষবশতঃ নহে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন আমি বুঝি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অপরের অপেক্ষা কম শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যেদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং কালাপানির অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া আমাকে অভিনন্দিত করিলেন, সেই দিন বুঝিতে পারিলাম তাঁহার রসাস্বাদনশক্তি কত অধিক এবং তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ।

অমৃতলাল ন্যায়রত্ন মহাশয় সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিলেন। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে একদিন অমৃতলাল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন ন্যায়-



মহামহোপাধ্যায় মহেশ ন্যায়রত্ন

রত্ন মহাশয় লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে রাজপথে বহির্গত হইতেছেন। কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন তিনি জ্বরে ভুগিতেছেন, পথ্য পান নাই, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই অবস্থায় বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া অমৃতলাল বিস্মিত হইলেন এবং বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। ন্যায়রত্ন বলিলেন কলিকাতা হইতে এক ভদ্র লোক তাঁহাকে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে কতকগুলি কাঁসা পিতলের বাসন ক্রয় করিয়া পাঠাইতে বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আলাপ বেশী দিনের নহে, তথাপি তাঁহাকেই এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজে পছন্দ করিয়া সুবিধাদরে জিনিষ গুলি ক্রয় করিয়া দিবেন, সুতরাং অন্য কাহারও দ্বারা ক্রয় করাইলে সে বিশ্বাসের অবমাননা করা হইবে। বাটীতে বাসনওয়ালা ডাকাইয়া কিনিলে হয়ত মূল্য বেশী পড়িবে। অমৃতলাল বলিলেন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ

কর্তব্যজ্ঞান দেখিয়া আমি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়াছিলাম।

একদিন জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাটকাবলির কথা উঠে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী প্রভৃতি নাটক এককালে খুব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইত। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটক অভিনয়ের অনুমতি আনিতে গেলে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যেরূপ উদারতার সহিত অনুমতি দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। পঠদ্দশাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। অমৃতলাল বলেন যখন তাহার বয়স তেরো বৎসর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক একদিন গাড়ীর জন্য কলেজের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেন, তিনি একদৃষ্টে তাঁহার অপরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন তখন তেরো বছরের বালক ছিলাম তাই রক্ষা, তেরো বৎসরের কিশোরী হইলে কি করিতাম বলিতে পারি না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রপ্রবীণ দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (সেণ্ট্রাল রেভিনিউজ) হন। ইনি স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুরূপা দেবীর স্বামী), স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার, স্যার ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র, স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহপাঠী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। যদিও পারদর্শিতার জন্য ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং গণিত ও বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ইনি তিনবার এলিয়ট প্রাইজ পাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ও অধিকার ছিল এবং উভয় ভাষাতেই অনেকগুলি কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া তিনি কাব্যানন্দ উপাধি পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কৃষিবীমা সম্বন্ধে একটী ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতবর্ষীয় রাজস্ববিভাগে নিযুক্তথাকাকালে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কয়েক বৎসর মহীশূর রাজ্যে রাজস্ব সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে মহারাজ কর্ত্তৃক রাজমন্ত্রপ্রবীণ উপাধিতে ভূষিত হন। এরূপ সম্মান আর কোন বাঙ্গালী পান নাই। মহীশূরে অবস্থানকালে জ্ঞানশরণ অনেক সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন—কেবল রাজস্ব বিভাগে নহে, অন্যান্য বিভাগেও। সেখানে একটী নাট্য সভারও প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি বাঙ্গালা নাটক 'লক্ষ্মীরাণী' স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া উক্ত সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

দেওয়ান বাহাদুরের স্বজাতিপ্রেম অতি গভীর ছিল এবং বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর যাহাতে সুনাম ও গৌরব বর্দ্ধন হয় তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। মহীশূরাধিপতির জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙ্গালোরে কয়দিন ব্যাপিয়া মহাউৎসব হয়। বিভিন্নক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রতিভায় ও মনীষায় কত বড় তাহা দেখাইবার জন্য মহীশূর অবস্থানকালে দেওয়ান বাহাদুর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রভৃতি মনীষিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। একদিন আমাকে জ্ঞানশরণ বলিলেন যে 'দেখুন, আমার ইচ্ছা হয় একবার মহীশূরবাসীকে অভিনয়জগতে বাঙ্গালী কত বড় তাহা দেখাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বিচারপতি প্রভৃতিকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছি, এবার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে লইয়া যাইতে চাহি। এমন অভিনেতা আবশ্যক যিনি সেক্ষপীয়র বা অন্য কোন ইংরাজী নাট্যকারের নাটকের কিয়দংশ অভিনয় করিয়া দেখাইয়া আসিতে পারেন। বাঙ্গালা ত তাহারা বুঝিবে না। এখন বোধ হয় অমৃতলালই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা?' আমি বলিলাম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমার সহিত অমৃতলালের কিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় আছে জানিয়া তিনি আমাকে এই বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে বলিলেন।

আমি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কি কি অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কেবল একটী সর্ত্ত রাখিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর কামরাতে তাঁহার একটী ভৃত্য গড়গড়া লইয়া যাইবে। গড়গড়া ভিন্ন তাঁহার এক দণ্ডও চলিবে না।

ইহার পর দেওয়ান বাহাদুর অমৃতলালের সহিত আলাপ করিতে অভিলাষী হইলেন। এক রবিবারের বৈকালে (৫।১২।২০) তিনি আমার বাটীতে আসিলেন। চা ও জলযোগ করিয়া আমরা উভয়ে শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্ণ্যাকুলার বিদ্যালয়ের ভাঙ্গাবাড়ীতে অমৃতলালের নিকট গেলাম। সেখানে উভয়ে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমৃতলালের সাহিত্যজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি যে কিরূপ অসামান্য, সে দিন তাহার পরিচয় পাইলাম। জ্ঞানশরণবাবু সেক্সপীয়র, কালিদাস, বাল্মীকি হইতে অনর্গল শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন, অমৃতলালও তাঁহার সহিত সমানভাবে আবৃত্তি সহকারে সাহিত্যালোচনা করিতেছেন। রাত্রি ৮ টার সময় আমরা উঠিলাম। জ্ঞানশরণবাবু পথে আসিতে আসিতে বলিলেন, ইনি বাঙ্গালীর গৌরব বটে, বিদেশে গেলে অভিনয়জগতে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে।

কিন্তু কি কারণে জানি না, অমৃতলালের অসুস্থতা বশতঃ হউক কিম্বা ব্যাঙ্গালোর ড্রামাটিক এসোশিয়েশনের অর্থাভাব বশতঃ কার্য্যসূচী সংক্ষেপ করিবার জন্যই হউক, অমৃতলালের যাওয়া ঘটে নাই।

এই আলাপের পর জ্ঞানশরণ তাঁহার গ্রন্থাবলী একসেট অমৃতলালকে আমার হাত দিয়া উপহার পাঠাইয়া দেন। আমাকে দেওয়ান বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে তাঁহার "লক্ষ্মীরাণী" নাটকখানি ব্যাঙ্গালোরে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা বাঙ্গালার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। উহা বর্ত্তমান আকারে বা পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনীত হইবার যোগ্য কিনা তাহা অমৃতলালকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যদি উহা স্বয়ং পরিবর্ত্তন করিয়া দেন বা কিরূপ পরিবর্ত্তন করিলে উহা এখন অভিনয়োপযোগী হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। অমৃতলাল বইখানি পড়িয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'দেখ, লেখক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তিধারী। তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে। তিনি যে নাটক লিখিয়াছেন, তাহা সাহিত্যের একটি সম্পদ। উহাতে সংশোধন করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী অভিনয়দর্শকগণ সকল সময়ে ভাল জিনিষের রসাস্বাদন করিতে পারে না। অনেক সুলিখিত নাটকের অভিনয় সাফল্য লাভ করে না। আবার দেখ না, একটা কোন সাময়িক হুযুগ বা আন্দোলন লইয়া লিখিত একটা যা' তা' বইএর অভিনও দর্শকগণের অভিনন্দনসূচক করতালি লাভ করে। এখন হয়ত খদ্দর আর চরকার গোটাকত গান দিয়া একটা যা' তা' নাটক লিখিলে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। সুতরাং অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য দেওয়ান বাহাদুরের বহির সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে আমি পরামর্শ দিই না, অভিনীত না হইলেও উহার মূল্য থাকিবে।'

কয়েক বৎসর পরে (১৪।৯।১৯২৪) 'অশ্রুকণা'র কবি গিরীন্দ্র মোহিনী দত্তের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার সাহিত্যানুরাগী পুত্র প্রকাশচন্দ্র তাঁহার সেবকরাম বৈদ্য ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বহু সাহিত্যিক ও বন্ধুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। অমৃতলাল এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং কৈশোরে তাঁহার 'বৌদিদি' দত্তবধূ গিরীন্দ্র মোহিনীর সহিত কিরূপ কবিতা যুদ্ধ করিতেন তাহা বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা ছিল হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের পরিশিষ্টে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকজন জীবিত কবির অভিমত প্রকাশিত করি এবং কবি গিরীন্দ্র মোহিনীকেও হেমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলাম। গিরীন্দ্র মোহিনীর সঙ্গে যখন শেষবার দেখা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিছু লিখিয়া দিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশচন্দ্র আমাকে গিরীন্দ্র মোহিনীর "হেমচন্দ্র অস্তাচলে" শীর্ষক একটী কবিতা পাঠাইয়া দিয়া বলেন উহাই তাঁহার জননীর শেষ রচনা। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বলেন "মন্মথকে কিছু লিখিয়া পাঠাইব বলিয়াছি, লিখিতেই হইবে" এবং এই কবিতাটি লিখিয়া পুত্রকে অনুরোধ করেন যেন আমাকে প্রেরণ করা হয়। আমি কবিতাটী ১৩৩১ সালের ফাল্গুনের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে 'গিরীন্দ্র মোহিনীর শেষ রচনা' নামে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত করি। কবিতাটী অমৃতলালের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল এবং কৈশোরে যেমন তিনি গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন, জীবনের



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সন্ধ্যাতেও সেইরূপ পরলোকগত কবির কবিতার উত্তর দিয়াছিলেন—ঐ মাসেরই মাসিক বসুমতীতে। 'অমৃতলাল আস্তাবোলে' শীর্ষক কবিতায়। উহার শেষ ক'টী অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

লোকান্তরে গেছ তুমি দত্ত-কুলবধূ।
কবিতা-তরঙ্গে বঙ্গে ঢেলে কত মধু॥
প্রভাতে 'মানসী' পত্রে,
পড়িলাম কয় ছত্রে,
'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' অন্তিম রচনা।
চোখে কেন এল জল বল সুবচনা॥

কোথা সে কিশোরকাল অগ্রজ-বনিতা।
চোখে চোখে দেখা নাই অতি পরিচিতা॥
তুমিও লিখেছ পদ্য,
আমিও শুনেছি চোদ্দ,
দেবরে বধুতে রঙ্গ কথার কৌশলে।
আজ তুমি স্বর্গে গেলে আমি আস্তাবোলে॥

পয়ারে পয়ারে হ'ত বিবাদে আলাপ।
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গে তাই পাঠাই প্রলাপ॥

অতীতের স্মৃতি স্মরি,
ব্যথায় নয়নে ঝরি,
উত্তর লিখেছে পোড়ে পত্র 'অস্তাচলে'।
সে কালের সে অমৃত শুয়ে আস্তাবোলে॥

সে কালের অনেক সংবাদ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইত। আমার পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবিদিগের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সুললিত ইংরাজী অনুবাদ করেন। সেগুলি Deathless Ditties নামে আমি পুস্তকাকারে ছাপাইবার সময় একটী সেকালের সুপরিচিত গানের রচয়িতার নাম কিছুতেই জানিতে পারি নাই। পিতৃদেবও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গানটীর প্রথম পংক্তি—"যুবক যুবতি জাগ, যামিনী যে যায়।" অবশেষে অমৃতলালের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বলিয়া দেন উহার রচয়িতা নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের জ্ঞান যে তাঁহার অসামান্য ছিল, তাহা বলিলে ঠিক হইবে না, বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহাদের লইয়া, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য লিখিত বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য যে তাঁহাকে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার বলিয়া অমৃতলালকে "জগত্তারিণী পদক" প্রদান করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন আমার পুণ্যস্মৃতি পিতামহ-দেব (৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত তারিখে তাঁহার জন্মের শততম সাম্বৎসরিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে সাময়িক পত্র সমূহে তৎসম্বন্ধে সময়োচিত সন্দর্ভাদি প্রকাশিত হয়। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবীন সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়কে একটি প্রস্তাব লিখিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন তাহার শরীর অসুস্থ এবং একটি রচনা লিখিতে তিনি ব্যাপৃত আছেন, অমৃতলালকে প্রবন্ধটি লিখিতে বলিলে ভাল হয়। অমৃতলালের শারীরিক অবস্থা এবং সেই অবস্থাতেও তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন দেখিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আমি সাহস করিলাম না। উভয়েই পিতামহদেবের সমান অনুরাগী ও প্রতিভামুগ্ধ জানিয়া দেবেন্দ্র বাবুকেই লিখিতে অনুরোধ করিলাম। ১৩৩৬সালের আষাঢ়ের 'মাসিক বসুমতী'তে দেবেন্দ্রনাথের "দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র" প্রকাশিত হইল। জানিতাম না, সেই সংখ্যাতেই অমৃতলালের মহাপ্রয়াণের সংবাদ বিঘোষিত হইবে।

রিক্তা

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের বেলা রঙীন পরশ আনলো প্রাণে
নতুন আলো
উদাসী ঐ লাগলো হাওয়া হঠাৎ বড়ই
লাগল ভালো।
না ফোটা মোর কুঁড়ির বুকে
ফুটে ওঠার মধুর সুখে
লাগল চোখে সোনার স্বপন বক্ষে পুলক
ছুলিয়ে গেল।

একটি দিনের ফুটে থাকা, নেওয়া দেওয়া,
হাসি খেলা;
আমার বুকে একটি দিনের অসীম সুখের
ছোট্ট মেলা।
দিনের শেষে সব ফুরালো,
ছাইল নীরব নিবিড় কালো,
রিক্তা আমি ধুলোর মাঝে লুটিয়ে পড়ি
সাঁঝের বেলা।

অগ্রযাত্রী

গল্প

শ্রী ভাতকিরণ বসু বি-এ

লাহোর এক্সপ্রেস আস্‌ছে, এই ষ্টেশনে থাম্‌বে মোটে এক্‌মিনিট। ভট্‌চায্যিমশায় অস্থির হয়ে পড়লেন, ঐ একমিনিট সময়ের মধ্যে এত 'মালপত্তর' সমেত এবং ছোট ছেলেমেয়ে ও গৃহিনীকে নিয়ে—ভিড়-নেই-এমন-একটা-গাড়ী দেখে ওঠা যে কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে, তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না। আগের ষ্টেশন ছাড়বার ঘন্টাও প'ড়ে গেছে, সিগনাল এখনো ডাউন হয়নি বটে, কিন্তু হ'তেও দেরী নেই, হঠাৎ খটাক্‌ ক'রে প'ড়ে গেলেই হল! মাষ্টারবাবুকে একবার ব'লে এলে হ'ত, গার্ডসাহেবকে যেন একটু ব'লে ক'য়ে একমিনিটের জায়গায় তিনমিনিট,—মানে উঠে পড়লেই, যেন সিটি দেয়। যাবার জন্যে একটা পা বাড়িয়েছেন, ডাউন-সিগ্‌নাল কাৎ হয়ে পড়ল,—গাড়ী এসে গেল।

গাড়ী এসে গেল, ওগো তুমি সাবধানে স'রে দাঁড়াও, ঝড়ের মতন আস্‌বে—অ গদাই তুলে দিস্‌ বাবা ঠিকমত ন—

লাইনের চেয়েও প্ল্যাটফর্ম নীচে, মেয়েছেলেদের নিয়ে লোকে ওঠে কি ক'রে, নাবা বরঞ্চ কোন রকমে যায়, নেবেওছিলেন একদিন, কিন্তু আজ শরীর যেন তাঁর কেমন করতে লাগল—ধোঁয়া দেখা গেল···এঞ্জিন—আস্‌ছে আস্‌ছে আস্‌ছে,—এসে গেল,—প্রকাণ্ড চাকা-গুলো তলা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঘড়াক্‌ ঘড়াক্‌ ঘড়াক শব্দ করতে করতে হঠাৎ থাম্‌ল। এরপর মাত্র এক্‌-মিনিট—

ছুটোছুটি করবার সময় নেই, এক্‌মিনিটের কয়েক সেকেণ্ড হয়ে গেল—সামনের দরজাটা ঠেলে খুলতেই—আরে কাঁহা আইবা, আরে হাঁ—বনারসসে আড়া হোকে আতা—আরে ই ক্যা—আওয়াজ চলল আর চাকর-বাকরেরা ট্রাঙ্ক বিছানা ইত্যাদি জোর করে ঢোকাতে লাগল।

ভট্‌চায্যিমশায় চীৎকার করতে লাগলেন, ওগো ওঠো গো ওঠো—ছেড়ে দিলে ব'লে, ওঠোনা—ওরে হরে ওঠ, গদাইরে—

ছেলেমেয়েরা উঠেছে, গৃহিণী গঙ্গাজলের ঘটি কোথায় জিগেস্‌ করতেই ভট্‌চায্যিমশায় ঠেঁচাতে লাগলেন,—থাক্‌ গঙ্গাজল এখন ওঠো গো ওঠো —

ওঠো গো ওঠো আওয়াজ মিলাতে না মিলাতে ভেস্‌ ঘস্‌ ধ্বনি করে ট্রেন ছেড়ে দিল, দেখতে না দেখতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে খোলামাঠে এসে পড়ল, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক্‌ এসে ঢুকল কামরায়।

গৃহিণী বল্‌লেন—অ মতি ওরে উনি উঠেছেন?

মতি বললে—না মা, বাবা উঠতে পারেনি। ঘটিটা তুলতে যেতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে যে!

মতির মার মাথায় যেন ভাবনার আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, বল্লেন, কি সর্ব্বোনাশ, 'ওমা' কি হবে? যদি চলন্ত গাড়ীতে উঠতে গিয়ে বুড়োমানুষ, একটা কাণ্ড ঘটে যায়, না উঠলেই বা কিসে আস্‌বেন, ওমা কি হবে গো!

গাড়ীর বিচিত্র শব্দের মধ্যে তখনো বাজছিল—ওঠো গো ওঠো ওঠো গো ওঠো—ওগো উঠে পড়ো—ওঠো গো ওঠো—

ট্রেন তখন বাঁকের মুখে, গাড়ী কাৎ হয়ে পড়েছে,—ষ্টেশন কোথায় দূরে মিলিয়ে গেছে, সামনে রাস্তাঘাটা দিয়ে দুটি বাঙালী পুরুষ মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে, ওরা হয়ত চেঞ্জে এসেছে,—চাষা মাঠে ঘাড়নীচু ক'রে কাজ করছে, গাড়ীর দিকে তার দৃকপাত নেই, মাটিরঘরের দাওয়ায় বসে কারা সব কি কথা কইছে,—ওদের যেন কোনো ভাবনা নেই।

দূরে নদীর মতন একটা কি সাদা, জায়গাটা যেন খুব উজ্জ্বল, নদী থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে

ওখানে,—আরো ওধারে একটা পাহাড়ের মতন অস্পষ্ট কি ঢেউ খেলানো—কোথাকার গাড়ী কোথায় যাচ্ছে, মতির মার কিছুই ধারণা নেই, কলকাতা সোজা যাবে কিনা তাও জানা নেই—উনি কোথায় রইলেন প'ড়ে—

তার মনে হল, না নামলেই হত দিদির ওখানে জোর ক'রে,—উনি কিছুতে রাজী হননি, বলেছিলেন, ওসব হ্যাঙ্গাম কোরনা পারবনা, অত,—এই বয়সে ওঠানামা করা পোষাবেনা,—কিন্তু সবেতেইত অম্‌নি বলেন ভয় পেয়ে যান—এক টিকিটে নাবা যাবে, একদিন থাকাও যাবে, ব'লেই না এত! নইলে কি খরচ ক'রে কখনো এখানে আসা হত? কিন্তু এমন যে অঘটন ঘটবে, কে জানে বাপু!

চাকরগুলো যদি উঠে থাকে তবুও ভালো। তারাই দেখে শুনে নাবিয়ে নেবে। হাওড়া পার হ'য়ে ত আর গাড়ী যাবেনা! আর এগাড়ী যদি ওদিকেই না যায়, যদি কোথাও চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে একলা মেয়ে-মানুষ কি করবে; তাই না ভাবনা! সোমও মেয়ে রয়েছে সঙ্গে, কেউ যদি ভুলিয়ে ভুলপথে নিয়ে যায়!

মতিরমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হিন্দুস্থানী মুসলমান উড়িয়া তারা কেউ জায়গা দেয়নি, শুধু মিট্‌মিট্‌ ক'রে দেখছিল, দাঁড়িয়ে উঠল একটি বাঙালীর ছেলে—কাছে এগিয়ে এসে বল্লে,—মা আপনি বসুন—ওদিকে জায়গা রয়েছে,—

মতির মা ফিরে দেখলে—নিতান্ত অল্প বয়স ছেলে-টির—তার বড়ছেলে সৌরীনের বয়সী। কথা কইলে ততদোষ হয়না, মনে ক'রে সে বল্লে, কিন্তু বাবা আমাদের বড় বিপদ। কর্ত্তা গাড়ীতে উঠতে পারেননি। ছেলেটি বল্লে,—তাতে কি হয়েছে? আমরা আপনাকে পৌঁছে দোব। আর পরের ষ্টেশনে ওঁকে ফোন করে দেবার ব্যবস্থা করব। কোথায় থাকেন মা আপনি কলকাতায়?

বাদুড়বাগানে বাবা। রামকিষণ দাসের লেন।

বেশত আমরা আপনাকে বাড়ীতে দিয়ে আসব, কোনো ভাবনা নেই। আপনি অনর্থক চিন্তিত হচ্ছেন। এসো খুকি, তুমিও এসো—ব'লে সে মতিকেও ডাক দিলে।

সকলে বসেছে, ছেলেটি নিজেও বসবার জায়গা ক'রে নিলে। একটি ছেলে কে সে জিগেস করলে, খোকা, তোমার নাম কি বলোত? খোকা বললে,—আমার নাম চা'রনম্বর। বাবা আমায় চারনম্বর বলে, দাদাকে বলে তিননম্বর। আমার ছোট ভাই হল পাঁচনম্বর। বাবা বলে, অত নাম রাখতে পারবনা, নম্বর ধরে ডাক্‌ব।

মতিকে জিগেস করলে তোমার নাম।

আমার নাম মতি।

মতি কখনো মেয়েমানুষের নাম হয়? ভালো নাম কি?

কুমারী অশ্রুমতী দেবী।

অশ্রুমতী থেকে হয়েছে মতি?

হ্যাঁ। আপনার নাম কি বলুন! আমাদের নাম ত জেনে ছিলেন!

আমার নাম ললিত।

ললিত কখনো পুরুষমানুষের নাম হয়? ভালো নাম কি?

ভালো নাম? ভালো নাম ধরো সুললিত।

শুধু ললিত নয়, আবার সুললিত! কি আমার আহ্লাদরে! আদর ধরছেনা!

সুললিত দেখলে, মেয়েটি বেশ অসর্ভ্যণ তবে মুখের 'কাট্‌'টি ভালো, ও মুখে ফাজলামিও মানায় ভালো।

আসানসোল এসে গেল। সুললিত নাবতে যাচ্ছে ষ্টেশনমাষ্টারকে ফোন করার কথা বলতে, এমন সময় রেলের কর্ম্মচারী একজন এসে প্রশ্ন করলে—মতি, মতির মা কেউ আছে এগাড়ীতে। মতি সাড়া দিলে—হ্যাঁ আছি। কেন?

তোমাদের বাবা ফোন করে বলেছেন, এখানে তোমাদের নাবিয়ে নিতে, উনি পরের গাড়ীতে এসে নিয়ে যাবেন ফের।

সুললিত বললে, কি দরকার নাববার? কতক্ষণ কষ্ট ক'রে বসে থাকবেন? আমি ত বলছি আপনাদের পৌঁছে দোব।

মতির মা ও ঘাড় নেড়ে জানালেন, নাববার দরকার নেই। উনি যখন ভালই আছেন, ধীরে সুস্থে আসুননা পরে। এত মাল পত্তর নিয়ে কোথায় আবার নাবা, কি দরকার অত ঝঞ্ঝাটের!

নাবা আর হলনা। সুললিত খাবার কিনে সকলকে খাওয়ালে। চা খাওয়ালে। পান কিনে দিলে।

মতি বল্লে—আমরা পান খাইনা, আপনার বৌকে দেবেন।

সুললিত কথা শুনে একটু চট্‌ল। তবু হেসে বল্লে, বৌ নেই।

চোখ কপালে তুলে মতি বল্লে, ওমা এত বুড়ো, বৌ নেই এখনো?

সুললিত বল্লে—তুমি যে এত বুড়ি, তোমার বর নেই কেন?

তার বেলায় মতি ঠিক, বল্লে, ভারী অসভ্য ছেলে!

মোট কথা মতির যা না বয়স তার চেয়ে ঢের বেশী পাকা কথা কয়। খবর নিয়ে সুললিত জান্‌লে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সব সহরে এসেছে। ভয়টা ভেঙেছে, কিন্তু সভ্যতা শেখা হয়নি। কিন্তু তাতে আলাপ জমতে বাধা হলনা।

বাড়ীতে সুললিত ভয়ানক রাশভারী লোক। তার ছোট বোনেরা তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে সাহস করেনা, তাই এই অচেনা মেয়েটার স্পর্দ্ধার কথা তার নতুন ধরণের লাগ্‌তে লাগল। যাকে বাড়ী শুদ্ধ লোক যমের মতন ভয় করে, গাঁট্টা এবং কীল ঘুঁসি ভায়েদের আর চাকরদের ওপর যে অজস্র বর্ষণ করে, তাকে একটা অকালপক্ক মেয়ে যা-নয়-তাই বলে যেতে লাগল এতে তার আমোদ বোধ হল।

বর্দ্ধমানে এল এক টেলিগ্রাম। ভট্টাচার্য্যিমশায় পরের ট্রেনে পিছনে পিছনে আসছেন, হুকুম হয়েছে নাববার। তাঁর হয়ত ধারণা হয়েছে, কে তাঁর গৃহিণীকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, স্ত্রীর যে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার বয়স গেছে, একথা তিনি জানেনও না বিশ্বাসও করেন না।

তবু মতির মা নাবলনা। বল্লে—ওর যেমন কথা!

মতি বল্লে বেশ মজা হচ্ছে, বাবা এর পরের গাড়ীতে রাগ করতে করতে আসছে। ধরতে পাচ্ছেনা আমাদের! আমরা আগে গিয়ে বাড়ীতে বসে থাকব! কেমনসা মজা!

হাওড়া ষ্টেশনে সুললিত একটা ট্যাক্সি করলে, ভট্টাচার্য্যি মশায় থাকলে অবশ্য থার্ডক্লাস গাড়ী হত। ট্রামের বাসের ঝন্‌ঝন্ খট্‌খট্ আওয়াজে, ঠেলাগাড়ী রিক্সর ভিড় মতির অনেকদিন পরে ভালই লাগল। বিদেশে গিয়ে মন যে হুহু করত, কলকাতার জন্যে। এমন জায়গা লোকে কি সুখে ছেড়ে যায়!

বাড়ীতে এসে তার তৃপ্তি হল। এখন আর মা মনসাকে নমস্কার করে শুতে হবে না, সাপ কোথায় কলকাতায়? সেখানে দুদিন সাপ বেরিয়েছিল—মাগো, মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর কি জলের কষ্ট! কোয়া থেকে জল তুলে দিতে চায়না চাকর গুলো, কি হায়রানি, আর এখানে কল খুললেই জল। কারুর খোসামোদ নেই। তারওপর ইলেক্‌ট্রিক আলো, ভূতের ভয়ত করেইনা। সেখানে সে একলা শুতে পারত? মার যতক্ষণ হবে ততক্ষণ রান্নাঘরে বসে অপেক্ষা করত, অন্য ভাইবোনদের তখন আর্দ্ধেক রাত! ওদের কি ভাববার ক্ষমতা আছে? ওরা কি জানে ঐ বাড়ীতে কত লোক মরছে হাওয়া খেতে এসে?

সুললিত আলাপের জেরটা চুকে যেতে দিলেনা। একদিন মতি আর তার ভাইবোনদের নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেল তার বাড়ী।

মতির কথাবার্ত্তা শুনে নমিতা ত থ'। সে গিয়ে তার বড় বোন্‌কে বল্লে,—অ দিদিভাই ঐ মেয়েটা দাদার কথার চোট্‌পাট্ জবাব দিচ্ছে, যে ঘরে ঢুক্‌তে আমার সাহস করিনা সেই দাদার ঘরে ঢুকে সব জিনিষপত্র ঘাঁট্‌ছে, দাদার সা—ম্‌নে।

নমিতার বোন সুখলতাও অবাক্ হয়ে গেল ব্যাপার দেখে।

শুধু তাই নয় মতি যখন এঘরে এল তখন এরা সব বল্লে—হ্যা ভাই, দাদাকে দেখে তোমার একটুও ভয় করেনা? আমরা ত ভয়ে মরি!

মতি বল্লে—তোমরা ভয় কেন করো। হাঁ ঘরে

গেছে ওকে আমার ভয় করতে। ঐত পুটুকে ছেলে, গলা টিপলে দুধ বেরোয়—

কথাটা সুললিত ও শুন্‌তে পেরেছিল, কিন্তু কিছু বল্‌লে না, আশ্চর্য্য। বল্‌লে দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি মজা, একটা কড়া দেখে বর ক'রে দোব, আমাদের বুধন্ চাকর আছে—

মতি বল্‌লে—মা'গো মা কি অসভ্য ছেলে।

কিন্তু এরকম সহজ স্বচ্ছন্দভাব মতির বেশীদিন রইলনা। ক্রমশঃ সে জানতে পারলে সুললিত এটর্নিসিপ পড়ছে, আর এ সমস্ত বাড়ীখানাই তার। বাইরের বৈঠকখানা থেকে সুরু করে সিঁড়ির ধারে-ধারে -বারান্দায়—দোতলার হলে যে সমস্ত সুদৃশ্য জিনিষ সব সে সাজানো দেখেছে তার নামও জানেনা, দামও জানেনা, তবে সস্তা যে নয় এ বোধ তার আছে কারণ আর কোন বাড়ীতে এত আসবাব পত্র সে দেখেনি।

ওপরে যেঘরে সুললিত শোয়, সে ঘরে ড্রেসিংটেবল, মিরার্ড আলমারি, ও বেলজিয়ান আয়নায় তার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হ'তে দেখে সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে, তার চেহারা এত সুন্দর, একথা ভাঙা চুলবাঁধা-আর্শিতে প্রকাশ পায়না। রাইটিং ডেস্কেরউপর শোবার হাতঘড়িটা চিক্‌চিক করছে, সেটাও নিশ্চয় খুবই দামী! ফাউণ্টেন-পেনটার রামধনুরং তাকে মুগ্ধ করে। হীরের একটা আংটি, কি তার 'জেল্লা'!

উগ্র মধুর গন্ধ ছড়িয়ে সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে সুললিত ঘরে ঢোকে, সাদা পায়জামা আর আলখাল্লার মতন কি একটা পরে' পায়ে রেশমি চপ্পল, ও নাকি শোবার ঘরে ছাড়া কোথাও চলেনা। নিজের ফরসা জামাকাপড়ও মতির নিজেরই কাছেই মলিন ঠেকে, এদের বাড়ীর মতন কাপড় কাচা তাদের ধোপাও পারেনা। পারবে কোথা থেকে, এদের মতন কি দাম পায়?

সার্শি খুলে সবুজ পর্দ্দা সরিয়ে দিতেই বারন্দার ফুলেল হাওয়ায় ঘরে ঢোকে, নীল বাল্বের আলোয় কস্তুরী ধূপের ধোঁয়া মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুললিত জিগেস করে, মতি যে বড় গম্ভীর! ব্যাপার কি? মতি কথা কয়না, সলজ্জ হাসি হাসে। আগেকার মতন বলেনা, গম্ভীর আবার কোথায় দেখলেন, আপনার মতন বড়র্ বড়র্ করতে হবে নাকি দিনরাত! আপনি নাহয় মাথার ক্রু আলগা করে বসে আছেন, সকলের ত'তানয়!

অর্থাৎ ক্রমশঃ মতি ভালো ক'রে বুঝতে পারে সুললিতরা কত বড় লোক, আর তারা কত গরীব। সুললিতের মিষ্টি ব্যবহার তার কাছে দয়া করার মতন লাগে, সে দয়া নিতেও মন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠে।

থার্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টে যেদিন সুললিতকে সঙ্গী পেয়েছিল, সেদিন তাকে তাদেরই সমশ্রেণী মনে করেছিল বলে সহজেই মিশে যেতে পেরেছিল। আজ তার বাবার দেনা যতই বাড়ছে আর এদের যতই প্রাচুর্য্য দেখছে ততই মনে হচ্ছে যেন, এদের সঙ্গে ব্যবধানটাও বেড়ে যাচ্ছে।

মাঝে একটা কাণ্ড ঘটল। মতির মা সুললিতকে মতির যোগ্যপাত্র স্থির ক'রে ভট্‌চার্য্যিমশায়কে বল্‌লে, যাওনা কথাটা গিয়ে পাড়ো।

ভট্‌চার্য্যিমশায় বললেন—আমিত পাগল হইনি। তুমি যদি এখন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে থাকো। বল্‌তে গেলে, আমাকে মেরে তাড়াবে তারা। ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাওনি।

মতির মা জানালে যে সুললিতেরও নিশ্চয় মতিকে মনে ধরেছে নইলে এতবার নিয়ে যেতনা। আর বড়লোক, তা কি হয়েছে? বড়লোকের সঙ্গে কি গরীব লোকের বিয়ে হচ্ছেনা? আমার বাবারাও তো বড়লোক ছিল! তোমার সঙ্গে দিলে কেন? এখনই না হয় প'ড়ে গেছে!

নিরুপায় ভাবে ভট্টাচার্য্যি মশায় জানালেন গণপণ মিলবে কিনা দেখতে হবে ত? বামুনদের আবার কত হ্যাঙ্গাম জানো ত? কোন্ শ্রেণীর, কি ঘর, আগে খোঁজ নেওয়া যাক্—ব'লে ত অনর্থক কিছু সময় নিয়ে, মনে করলেন রেহাই পেলেন।

মতির মার তবু সইলনা, সেত' ঘটকি পাঠিয়ে দিলে একদিন।

ঘটকি রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে ফিরে এসে বল্‌লে—কোথায়

পাঠিয়েছিলেন মা না জেনেশুনে? তোমাদের কি লাজ-লজ্জা কিছু নেই? সম্বন্ধের কথা শুনে তারা ত মায়ে ব্যাটায় খুব হাসলে, শেষে পাত্তর বল্‌লে, আমায় বিয়ে করার সখটা কার? মতির? সেই পাঠিয়েছে? আমি বললুম কি ঘেন্না মা, সে পাঠাবে কেন? তার বাপ। বলে কি, ফলার খেয়ে খেয়ে বাপের বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। মুরগীর ঠ্যাং খেতে বোল। শেষটা নরম করে বল্‌লে, গরীব বলে যে করবনা তা নয় আমরা তিনটে পাশওয়ালা গানবাজনা জানা মেয়ে চাই। ও মেয়ে চল্‌বেনা।

মতি সবই শুনলে। রাগে দুঃখে তার চোখে জল বেরিয়ে এল। তাকে এতই তারা সস্তা ভাবে!

এরপর মতির মার আহার নিদ্রা গেল, মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে, মরীচিকার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেছিল।

তারই বিশেষ পীড়াপীড়িতে পূজোর পরেই মতির বিয়ে হয়ে গেল, ভদ্রাসনখানি বাঁধা পড়ল, কিন্তু পাত্র হল ভালই। বয়স একটু হয়েছে, আগের পক্ষের স্ত্রীর গুটি পাঁচেক ছেলে মেয়ে ছিল বর্ত্তমানে তারা নেই। একলার ঘরে গিন্নী হয়ে মতি এল, বিস্তীর্ণ জমিদারী, খাওয়া পরার অভাব জীবনে কখনো হবেনা। বাংলাদেশের মেয়েদের এর চেয়ে বেশী কাম্য আর কি থাকতে পারে!

কিন্তু বছর না ঘুরতেই তার স্বামী অসুখে পড়ল। ডাক্তার বল্‌লেন, হাওয়া বদ্‌লানো ছাড়া ওষুধ নেই।

ডালটনগঞ্জে একজন দূরসম্পর্কের দেওর ছিল, সেই সেখানে বাড়ী ঠিক ক'রে দিলে। লোকজন নিয়ে রুগ্ন স্বামীকে মতি সেখানে এনে ফেললে। কোয়েল নদীর হাওয়া, পালামৌর মেঘের মতন পাহাড়ের মালা, দূরবন-ছায়া, দিনপনেরো ভালই লাগ্‌ল।

তাদের বাড়ীর কাছাকাছি একটা বাড়ীতে একদিন সে সুললিতকে দেখতে পেলে; দেখেই সে ঘোমটা টেনে দিলে। সেই দিনই বিকেলে কি খেয়াল হল, সেই বাড়ীতে মতি গেল, যদি মেয়েরা কেউ থাকে।

ছিল একটি মেয়ে, সেই নাকি সুললিতের স্ত্রী, শোভা তার নাম। মতির বিয়ের মাসখানেক পরেই তার বিয়ে হয়েছে।

মতি বল্‌লে, তোমার কর্ত্তাকে আমার নামটা জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, চিনতে পারে কিনা।

শোভা হেসে বল্‌লে, কেন? বিয়ের আগে আপনি বুঝি তার বান্ধবী ছিলেন?

না সে সব কিছু না। তবু আছে মানে। তুমি জিগেস করো না, বোল, ট্রেনে যে মতির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, অশ্রুমতী, তাকে চেনে কিনা।

করব—ব'লে শোভা হাস্‌ল। বেশ হাসিটি। মিষ্টি।

পরদিনই দুপুর বেলা মতি তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। খবর পেয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে দরজাটি ভেজিয়ে শোভা বল্‌লে; দুপুর বেলা আপনি ঘুমোন না?

না। তুমি জিগেস্ করেছিলে?

ঘাড় নেড়ে শোভা জানালে—হ্যাঁ।

কি বল্‌লে?

বল্‌লেন—কে মতি, চিন্‌তে পারছিনা।

বল্‌লেনা কেন, ট্রেনে যার সঙ্গে আলাপ?

বললুম। বল্‌লেন ট্রেনে কত মতির সঙ্গে আলাপ হয়, অত মনে রাখ্‌তে গেলে চলে না।

বলেছিলে অশ্রুমতী?

বলেছিলুম। তবুও মনে করতে পারলেন না।

মতি উঠল। শোভা বল্‌লে, ওকি? উঠলেন যে। বসুন।

মতি বস্‌ল না। চেঁচিয়ে ব'লে গেল—যাতে ঘর থেকে সুললিত শুনতে পায়, বড় লোক হ'লে কি এতই অহঙ্কার হয়!

স্বামীর রোগ কিছু কম পড়েছে। কিন্তু সারলনা। আবার তারা দেশে ফিরে এসেছে।

গাছপালার জঙ্গল,—বাগানের মধ্যে দোতলা বাড়ী, খোলা ছাতে ছোট পাঁচিলের ওপর ভর দিয়ে মতি উদাস মনে কি ভাবছিল। নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় শুধু বনের মধ্যে

থেকে কোন পাখীর কুক্কক কুক্কক আওয়াজ ছাড়া একটি শব্দ ছিলনা। দক্ষিণে দিঘির জল একটুও কাঁপছেনা, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। হাওয়া বন্ধ। মতির মনে পড়ল, ঝর্ণার মতন তার হাসি উচ্ছলিত ছিল, বিনা-দোষে তা বন্ধ হয়ে গেল।

তার স্বামী বাঁচলনা, একদিন মারা গিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গেল তাকে।

তার ধারণা স্বামীকে সে নিবিড় ভাবে ভালোবাসতে পারত যদি সে তার প্রথম স্ত্রী হত। বয়সের জন্যেও আট্‌কাতনা, শুধু যদি প্রথম হত। একজনের সঙ্গে ভালো-বাসার অভিনয়, প্রেমের কথা, সোহাগের লীলা যখন শেষ হয়ে গেছে, পাঁচটি সন্তান যখন হয়েছে, গেছে—তখন সে এসেছে। নিজস্ব ব'লে একান্ত বলে, ভাববে সে কি করে? সুললিতের সম্বন্ধেও তার কোন ভালো অনুভূতি নেই, শুধু রাগ আছে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা হয়ত বল্‌বেন, রাগ থাক্‌লেই অনুরাগ থাকে—মতি তার তীব্র প্রতিবাদ করবে। কাগজপত্রে বাঙালীর মেয়েকে যেমন করে আঁকা হয় তাদের সংস্কার তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাঙালীর ছেলের ভূতের ভয় নেই, একথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলেও জন্মগত ভূতের ভয়ের সংস্কার যাবে কোথায়?

মতি তার বাবার সাহায্যে সমস্ত জমি জমা সম্পত্তি বিক্রী ক'রে মোটা টাকা নিয়ে কলকাতায় এল।

কিছুটাকায় বাড়ী কিনে বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবার তার প্রবৃত্তি হল। তার বাবা মা ভাইবোনেরা তার কাছে এসেই উঠল। কিছু টাকা লাভজনক কারবারে খাটাবার জন্য তার একজন আইনজীবীর দরকার ব'লে কাগজে সে বিজ্ঞাপন দিলে। তার বাবার সঙ্গে সশরীরে দেখা করবার বিজ্ঞপ্তিও ছিল।

দ্বিতীয় দিনে যে কজন বাইরে হাজির হল তাদের নামের মধ্যে একটা নাম দেখল, সুললিত ভট্টাচার্য্য। দরজার পর্দা ফাক ক'রে দেখে নিজে সত্যি, সেই সুললিতই এসেছে। দেখবার সময় তার সমস্ত মুখটা সুললিত দেখতে পেল।

বিবেচনা করবার সময় নেবার কথা ব'লে পাঠিয়ে সকলকে সে আজকের মত যেতে অনুরোধ জানালে। সকলে চলে গেল। শুধু সুললিত উঠলনা।

মতির হুকুমে চাকর গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি এখনো বসে আছেন কেন?

সুললিত বল্‌লে—তোমার মাঠাকৃরুণকে বল সুললিত বাবু এসেছেন।

চাকর ফিরে এসে মতির সুরেরই অনুকরণ ক'রে বল্‌লে, মা বল্‌লেন, কে সুললিত, আমি চিনিনা।

সুললিত বল্‌লে, আর একবার যাও, বলো যার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।

এবার পর্দার ওধার থেকে মতি নিজেই জবাব দিলে,—ট্রেনেত কত লোকের সঙ্গেই আলাপ হয়, অত মনে রাখতে গেলে চলে না!

অন্য কেউ হলে উঠে পড়ত। সুললিত নেহাৎ আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করে, চক্ষুলজ্জা বলে পদার্থটার বেশী সম্মান দিলেও ব্যবসা চলেনা। কণ্ঠস্বর নরম ক'রে বল্‌লে—আপনি মিছে আমার ওপর রাগ করছেন।

মতি ঝাঁজালো সুরে বল্‌লে—জগন্নাথ, ওকে বলে দে এটা ভদ্রলোকের বাড়ী,—থিয়েটার করবার জায়গা নয়,-দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তুই ওপরে আয়।

এরপর আর বসা চলেনা।

ওপরের বারান্দা থেকে মতি দেখলে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম রুমালে মুছতে মুছতে সুললিত মোড়ের দিকে চলেছে হয়ত ট্রাম ধরবার জন্য।

ধরম্‌তলা—কলেজ ষ্ট্রীট খালি গাড়ী—ব'লে বাস চলেছে তার রংচংএ বিজ্ঞাপনগুলো গাটা খানিকটা ঝক্‌মক্ ক'রেই বাড়ীর আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে। জগুবাজারের কোলাহল দূর থেকে কানে এসে লাগছে।

সুললিত মোড় বেঁকে চলে গেল শ্রান্ত পদে ঘাড়টি হেঁট করে।

খানিকটা দুঃখ খানিকটা তৃপ্তি নিয়ে অশ্রুমতী ঘরে ঢুকল।

বহুদিন ধরে যে কাঁটাটা মনের মধ্যে খচখচ করছিল, আজ যেন সেটা উঠল। আজ খুসি মনে বায়স্কোপ দেখতে যাবার জন্য সে বড় গাড়ীটা বার করতে বলে গরদের থান পরতে গেল।

ভারতে যাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল

গত ২০শে জানুয়ারী ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দুইবার ভারতে আসিয়াছিলেন, ভারতসম্রাটরূপে ভারতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল এবং তাঁহার সময়েই বঙ্গচ্ছেদ রহিত হয় এই সকল কারণে পঞ্চম জর্জ্জের নাম ভারতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজেন্দ্রার পুত্রদের মধ্যে এক মাত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জই জীবিত ছিলেন।



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

লণ্ডনের মার্লবরো হাউসে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে সম্রাটের জন্ম হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার জর্জ্জ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরলোকগত ডিউক অব ক্লারেন্সকে নাবিকের কাজ শিক্ষার জন্য বৃটানিয়া জাহাজে প্রেরণ করা হয়—উভয় ভ্রাতার চেহারার যেরূপ সাদৃশ্যের অভাব ছিল, উভয়ের মেজাজও ছিল বিভিন্ন রকমের। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন দুর্ব্বলস্বাস্থ্য ও চিন্তাশীল, যুবরাজ জর্জ্জ খুব সবল স্বাস্থ্য না হইলেও অতিমাত্রায় তেজস্বী, উৎসাহী ও দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। ইহারা উভয়ে পৃথক পৃথক কক্ষে শয়ন করিলেও উভয়কেই সাধারণ নাবিকজীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হইতে হইয়াছিল। রাজপুত্রদ্বয়কে ভোর ৬টায় জাহাজের ডেকে কাজে লাগিতে হইত এবং সমস্ত দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও খাটাইতে হইত কম নহে। নাবিকজীবন যাত্রার খুটিনাটি প্রত্যেকটী কল কৌশল, নৌকাচালনা, পাল খাটান জাহাজের দড়িদড়া ঠিকমত রাখা ও নাবিকের প্রত্যেকটি কাজে অভ্যস্ত হইতে হইয়াছিল। অনুমান দুই বৎসর কাল ইহারা বৃটানিয়া জাহাজে শিক্ষানবীশ ছিলেন—এই দুই বৎসর কাল বৃটানিয়া জাহাজখানি ডার্টনদীতে অবস্থান করিয়াছিল।

বৃটানিয়া জাহাজের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর বহিঃসমুদ্রে নাবিক জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং সমগ্র জগৎ, বিশেষ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ জন্য ইহাদিগকে "বাচাণ্ডে" জাহাজে প্রেরণ করা হয়। যুবরাজ পঞ্চম জর্জ্জ ছিলেন এই সময় ১৪ বৎসর বয়স্ক একটী বালক মাত্র। অদম্য উৎসাহশীল, দুঃসাহসিক বালক হিসাবে সমবয়স্ক বালকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি লাভ হইয়াছিল। ইহারা প্রথমে ওয়েষ্টইণ্ডিজ গমন



অষ্টম এডোয়ার্ড

করেন, তথা হইতে ফিজি, ইয়োকোহামা, হংকং, সিঙ্গাপুর হইয়া সুয়েজ খালের পথে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ভাবে ২৬ বৎসর বয়সেই জগতের অধিকাংশ দেশ,



ডিউক অব গ্লষ্টার

অধিকাংশ জাতি, জগতের বিভিন্ন স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের প্রায় কোন রাজকুমারেরই এত অল্প বয়সে এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। বাল্যকাল হইতেই একজন নৌ সেনানায়ক রূপে খ্যাতি অর্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লইয়াই ইনি শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৮৮২ সালের শেষের দিকে উভয় ভ্রাতা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। যুবরাজ জর্জ্জ নৌ-বাহিনীতে অবস্থান করেন এবং ক্যানাডা জাহাজে সাব লেপ্টন্যান্ট পদে উন্নীত হন; এই সময় ইহার বয়স ১৯ বৎসর মাত্র। একবৎসর পরেই তিনি লেপ্টন্যান্টের পদ প্রাপ্ত হন, ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'থাস' নামক জাহাজের অধ্যক্ষ হন। এই সময় ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরলোকগত হওয়ায় ইঁনিই ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ দুইবার ভারত পরিদর্শন করিয়াছিলেন একবার যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে ১৯০৫-৬ সালে এবং আর একবার সম্রাটরূপে ১৯১১-১২ সালে। প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে আসিয়া তিনি কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯০৫-৬ সালে তাঁহার পরিদর্শনের সময় বঙ্গভঙ্গ জনিত রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছিল।

১৯০৫ সালে ৯ই নবেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলস-রূপে সম্রাট পত্নী সমভিব্যাহারে বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। বোম্বাই হইতে তিনি ইন্দোর, উদয়পুর, জয়পুর ও বিকানীর পরিদর্শন করেন। লাহোরে কপূর্রতলা, নাভা, পাতিয়ালা ও ঝিন্দের নৃপতিগণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তাহার পর সম্রাট খাইবার পাস পরিদর্শন করেন; তথায় বিরাট সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

তৎপর তিনি দিল্লী, রাওয়ালপিণ্ডি, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।



অষ্টম এডওয়ার্ড



বেতারে সম্রাটের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন

প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে আসিয়া তিনি কলিকাতায় ১০ দিন ছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড দেহত্যাগ করিলে ইনি সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন। যথাসময়ে ক্যাণ্টরবারীর আর্চবিশপ দ্বারা ইঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই সময় ইনি এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পরের বৎসর ইনি মহিষীসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দিল্লীতে ইঁহার অভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই সময় ইনি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে লর্ড কার্জনকৃত বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হয় এবং বিভক্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ যুক্ত হইয়া বঙ্গ প্রেসিডেন্সী গঠিত হয় ও কলিকাতার পরিবর্ত্তে দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর ইনি নেপাল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু গুরুতর রাজকার্য্যের অনুরোধে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের মধ্যে ভারতের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইতে ইনিই প্রথম এদেশে আগমন করেন।

ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, লর্ডস ও কমন্স সভায় বিরোধ তীব্রতর হইয়াছে। মন্ত্রি-সভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তিন শত নূতন 'পিয়ার' সৃষ্টি করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সংবাদের সুফল ফলিল। অল্প দিনের মধ্যেই রাজার মধ্যবর্ত্তিতায় লর্ডস ও কমন্সের মনোমালিন্য দূর হইল।

এদিকে আবার আয়র্ল্যাণ্ডে অন্তর্ব্বিপ্লব দেখা দিল। দক্ষিণ ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠিল। আর বিলম্ব করা উচিত নহে মনে করিয়া তিনি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন করার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না।

এই সময় সহসা মহাযুদ্ধের বিষাণ বাজিয়া উঠিল। যাহাতে এই যুদ্ধ নিবারিত হয়, যাহাতে অন্ততঃ শান্তির আলোচনার জন্য কতকটা সময় পাওয়া যায় তাহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানাইয়া রাজা পঞ্চম জর্জ্জ জার ও কাইজারকে সমরসজ্জা স্থগিত রাখিতে লিখিলেন।

কিন্তু তাঁহার শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

যুদ্ধের চার বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে মিত্রপক্ষের সামরিক শক্তি ও নাগরিক জীবনের শান্তি রক্ষার জন্য তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি অনেক সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সমর ক্ষেত্রে সৈন্যদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহবাণী শুনাইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেই একবার তিনি নিহত সৈনিকদের কবরে যাইতেন জনৈক সেনাপতি এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—জীবিত থাকিয়া যাঁহারা সমরক্ষেত্রে যুঝিতেছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া যেমন আমার কর্ত্তব্য যাঁহারা সংগ্রাম-শেষে চিরনিদ্রামগ্ন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও তেমন কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ বিরতির পর ইংলণ্ডের সম্মুখে আইরিশ সমস্যা আবার প্রকট হইল। আয়র্ল্যাণ্ডের ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লব-শিখা যাহাতে দ্রুত নির্ব্বাপিত হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি মন্ত্রীদের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করেন।

আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্ব্বিপ্লবের সমাধানস্বরূপ বেলফাষ্টে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইল। তিনি স্বয়ং গিয়া সেই পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্ব্বিপ্লবের মধ্যে যাইয়া নিজেকে বিপন্ন না করিবার জন্য মন্ত্রিগণ ও বাহিরে অনেকে পত্রযোগে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি যাইবেনই, সঙ্গে যাইবেন রাণী মেরী।

বেলফাষ্ট পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে মন্ত্রীবর্গ যে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে সিন ফিনদের বিরুদ্ধে যে সব হুমকী ছিল ছিল তিনি তাহা একেবারে বাদ দেন। তৎপরিবর্ত্তে সকল আইরিশম্যানকে সম্বোধন করিয়া তিনি সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—ক্ষমা কর, ভুলে যাও।

তাঁহার রাজত্বকালে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক এই তিন দলের মন্ত্রিবর্গের সহিত তিনি সমান সম্প্রীতির সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার আচরণ অকপট, উদার ও পক্ষপাতশূন্য ছিল। তিনটি রাজনৈতিক দলের কেহই বলিতে পারিতেন না যে, দল বিশেষের উপর তাঁহার অধিকতর সম্প্রীতি আছে। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে একদল শ্রমিক বাকিংহাম প্রসাদের সম্মুখ ভাগ পরিবর্ত্তনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কাজ সমাপ্ত হইলে সম্রাট প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এক বিরাট ভোজে শ্রমিকদিগকে আপ্যায়িত করেন।

১৯৩১ সালে যখন জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখ দেয় তখন রাজপরিবারের সকলে স্বেচ্ছায় তাহাদের রাজকীয় বৃত্তি কমাইয়া দিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নানা নৈতিক আলোড়নের মধ্যে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধতা ও শান্তির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাহিরের শত সহস্র রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যেও তিনি আজীবন একটী আদর্শ পরিবার গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন; সেই কার্য্যে রাণী মেরীও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। গৃহের অনাবিল জীবনের মধ্যে তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন। পারিবারিক জীবনের এই আদর্শবোধ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল; ইহা সমগ্র ইংরেজ সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) প্রিন্স এলবার্ট এডোয়ার্ড (প্রিন্স অব ওয়েলস), ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন তারিখে রিচমণ্ডের হোয়াইট লজে জন্মগ্রহণ করেন; (২)প্রিন্স এলবার্ট ফ্রেডারিক জর্জ্জের (ডিউক অব ইয়র্ক) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর স্যাণ্ড্রিঙ্গহামে জন্ম হয়, (৩) প্রিন্স ভিক্টোরিয়া আলেকজান্দ্রিয়া এলিস মেরীর (প্রথমা রাজকুমারী) ১৮৯৭ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে জন্ম হয়; (৪) প্রিন্স হেনরী উইলিয়ম ফ্রেডারিক এলবার্ট (ডিউক অব গ্লষ্টার) ১৯০০ সালের ৩১শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন; (৫) প্রিন্স জর্জ্জ এডোয়ার্ড আলেকজাণ্ডার এডমাণ্ড (ডিউক অব কেণ্ট) ১৯০২ সালের ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন; এবং (৬) প্রিন্স জন চার্লস ফ্রান্সিসের ১৯০৫ সালের ১২ই জুলাই জন্ম হয়। ১৯১৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী কনিষ্ঠ রাজপুত্রের মৃত্যু হয়।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কিছুদিন হইল সর্দ্দিরোগে আক্রান্ত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা ব্রোঙ্কাইটিসে পরিণত হয় এবং তাঁহার হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়। প্রথমেই অবস্থা গুরুতর বলিয়া অনুমিত হয়। বিলাতের প্রধানতম চিকিৎসকদিগকে ডাকা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাটের যেরূপ চিকিৎসা হওয়া উচিত তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই।

গ্রীণ-উইচের ঘড়ির রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় অর্থাৎ কলিকাতার ঘড়ির শেষরাত্রি ৫টা ৪৯ মিনিটের সময় রাজার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে রাজার শয্যা পার্শ্বে রাজমহিষী, যুবরাজ, ডিউক অব ইয়র্ক এবং তাঁহার পত্নী, রাজার কন্যা ও জামাতা এবং রাজ পরিবারের অন্যান্য পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে রাজার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক দিন হইল ভঙ্গ হয়। ১৯২৮ সালে তাঁহার একবার ব্রোঙ্কাইটেল ক্যাটার হয় এবং তাহাতে তিনি অনেকদিন ভোগেন। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পঞ্চম জর্জ্জ ১৯১০ সালের ৬ই মে তারিখ রাজা হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্প্রতি তাঁহার রাজত্বের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র মহোৎসব হয়।

নূতন সম্রাট

ইংলণ্ডের নূতন রাজা ভারতের নূতন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রিচমণ্ডে "হোয়াইট লজ" ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। নৌ-বিদ্যার শিক্ষার্থী-রূপে তিনি ১৯০৭ সালে ওসবোর্ণ এবং ১৯০৮ সালে ডার্টমুর শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি হন। তাঁহার পিতামহ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পঞ্চম জর্জ্জরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে ১৯১১ সালে তাঁহার প্রিন্স অব ওয়েলস নাম ঘোষিত হয়। ১৯১৩ সালে তিনি অক্সফোর্ডের ম্যাগ্‌ডালেন কলেজে ভর্ত্তি হন। মহাযুদ্ধ বাধিলে তিনি গ্রেনেডিয়ার গার্ড দলভুক্ত হন এবং স্যার জন ফ্রেঞ্চ-এর এড-ডি-কং নিযুক্ত হন। তিনি ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অনেকবার কাজ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি মিশরে "মেডিটেরানিয়ান এক্স-পিডিশনারী ফোর্স" এ সৈন্যাধ্যক্ষ হন এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯১৮ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ইটালির সমরক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকেন। মহাযুদ্ধের অবশিষ্ট সময় তিনি কানাডিয়ান কোরএর সহিত যুক্ত থাকেন। ১৯১৯ সালে অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও কানাডা পরিভ্রমণ করেন এবং সরকারীভাবে ওয়াশিং-টনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯২০ সালে তিনি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইয়া অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। ১৯২১ সালে তিনি ভারত পরিদর্শন করেন; সেই সময় কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয় জনসাধারণ তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন বর্জ্জন করেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করার পর তিনি ভারত ত্যাগ করেন। ভারতে আসিবার পথে তিনি মাল্টায় নামিয়া মাল্টার প্রথম পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করিয়া-ছিলেন। ভারত হইতে তিনি সিংহল, সিঙ্গাপুর ও হংকং হইয়া জাপানে যান। অতঃপর ১৯২৫ সালে অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। কেপ টাউন হইতে তিনি সেণ্ট হেলেনা হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যান এবং ফিরিবার সময় আর্জ্জেন-টাইনের রাজধানী বুয়েনোস এয়রা-এ বৃটিশ প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচন করেন। তিনি ১৯২৭ সালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইনের সহিত কানাডায় গিয়া উক্ত উপনিবেশ স্থাপনের ৬০তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইংলণ্ডেও অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে বহু জনহিতকর কার্য্য ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বেকার সমস্যা ও শ্রমিকগণের বাসস্থান সম্পর্কে তিনি বহু অনুসন্ধানকার্য্য করেন ও অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেন। যুবরাজ থাকার সময় তাঁহার আড়ম্বরহীন বেশভূষা ও সরল আচরণে তিনি জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি অতিশয় ক্রীড়াপ্রিয়। তিনি ভ্রমণের জন্য অধিকাংশ স্থলেই বিমান-পোত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার এই বিমান-প্রীতির ফলে ইংলণ্ডে জনসাধারণের মধ্যে অসামরিক বিমান বিদ্যা ও বিমান চালনা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছে। অষ্টম এডওয়ার্ড এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

অনুপমা আর নিরুপমা. অনেক দিন থেকেই পরস্পরকে ওরা ভালবাসত। মনে মনে যদিও তবু বাইরে তা অভিব্যক্ত হ'ত—অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে, বেরিয়ে আসত নানা ভাব ভঙ্গি ও ইঙ্গিতে মনের ভাব, তবে মুখ ফুটে কেউ কাউকে জানাতে ওরা পারত কি না জানি না কিন্তু অন্যে জানত একদিন ওদের বিবাহ হবেই এবং তা নিয়ে কলেজে ছাত্র মহলে কমনরুমে প্রায়ই একটা আলোচনা হাসি ঠাট্টা হ'তে শোনা যেত।

ছুটির পর রোজই ওরা বাড়ী ফিরত না সরাসরি, যেত কোন পার্কে, সেখানে একঘণ্টা ধরে বিচিত্র বিষয়ের গল্প আলোচনা হ'ত। সেটা আজ-কাল এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার মধ্যে এবং বিচিত্রতা আর নেই আলাপ-আলোচনার ভেতর, তা শুধু প্রেমের বিষয়ে পর্য্যবসিত হয়েছে। প্রেম-তত্ত্বের আলাপই এখন শোনা যায়, খুব গভীর ভাবে বড় বড় কথা নিয়ে জমায় ওরা আলাপ. ওদের জগৎ এখন পৃথক হয়ে গেছে, সমস্ত বাস্তব জগতের নানান সমস্যা এখন ওদের অনুভূতির বাইরে। নিজেদের নিয়ে যেন একটা বিরাট জগৎ ওরা রচনা করেছে, যার ভেতর নেই বাইরের কোলাহল দ্বন্দ্ব শুধু অপরিসীম আনন্দই সেখানে বিরাজ করছে। সেখানে শুধু পরস্পরকে ওরা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে। এ গভীরতা ওরাও লক্ষ্য করেছে সম্প্রতি। নিরুপমকে কোন বন্ধুই এখন আর ছুটীর পর ধরে রাখতে পারে না তাদের বন্ধুত্বের দাবী দাওয়া নিয়ে, এমনকি সিনেমার অমন আকর্ষণ তাও ওরা ভুলেছে প্রাণের আকর্ষণে, যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের ভেতর ওই আলোচনাকে কেন্দ্র করে মুখোমুখী দুজনে কিছুক্ষণ পাওয়া দুজনের নিবিড়তর সান্নিধ্য। সে আলোচনার সময় সীমা দিয়ে বাঁধা নয়, ওরা হারিয়ে ফেলে নিজেদের এমন কি বাড়ীর কথা পর্য্যন্ত ওদের দুজনকার মাঝে ধুয়ে মুছে যায়। ভাবের আদান প্রদান তাদের ছিল যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি মৌলিকতাপূর্ণ।

ওরই ভেতর দিয়ে ওরা দুজনকে জানতে উৎসুক ছিল। মনের গোপন ভাবটী বুঝতে চাইত এবং তার পেছনে হয়ত ছিল ভাবী জীবনের একটী মধুময় ছবির আদর্শ। আজও চলছিল এমনি আলোচনা। এই ভাব ও সময়টী যেন ওদের জীবনকে নিত্য নতুন রূপ দিয়েছিল সত্যিকার, তাই দুজনের অন্তরের নিগূঢ় পরিচয় যতই দিনের পর দিন পেয়ে আসছে ততই যেন দুজনকে উন্মুখ করে তুলছে পরস্পরের প্রতি। আর তাই হয়ত জেগে উঠছে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুজনের মধ্যে খুব কাছে পাওয়ার জন্য দু'জনকে। তা যতই ব্যক্ত হয়ে পড়ছে বাইরে ততই যেন অস্পষ্টতার রহস্য বেড়ে যাচ্ছে. ওদের মুগ্ধ হৃদয় সভ্যতা ও সংযমের দৃঢ়তর আবরণ কিছুতেই সরাতে পারছে না যেন, যদিও তা দিনের পর দিন সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতরই হয়ে আসছে তবুও তা সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়নি আজও, শ্লীলতা বোধই হয় ত বা ওদের খুব বেশী তাই কুণ্ঠায় ঘিরে রেখেছে দু'জনকার কণ্ঠ। অনুপমা ভাবে নারী আমি কেন আগে আত্মপ্রকাশ করব? নিরুপম ও সব ভাবত না বলবার জন্য প্রত্যেক দিনই আসে উন্মুখ হয়ে কিন্তু বলবার ক্ষণটীতে খেই হারিয়ে যায়। তার বুকের ভাষা হ'য়ে ওঠে অসম্ভব চঞ্চল, খোঁজে একটী সুযোগ কিন্তু আলোচনার ফাঁকে সময় আর হ'য়ে ওঠে না। অধীর ব্যাকুল মন নিয়ে সে প্রতিদিনই ফিরে যায় পরের দিন বলবার আশা নিয়ে, রাত্রিটা কোন মতে দেয় কাটিয়ে কাল নিশ্চয়ই অনুপমাকে জানাবেই কোন ফাঁকে।

এমনি করে প্রতিদিন ওর উদগ্রীব মন অধীরতা নিয়ে যেত কিন্তু অনুপমা বলবার মত কোন ফাঁক ত দিতই না বরং দিনের পর দিন ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে এমন

নব কথা বলত যাতে করে রোজই খানিকটা আগ্রহ উগ্র হয়ে উঠত, উৎসাহ দিত বাড়িয়ে। অনুপমার সঙ্গ ত্যাগ করার পরই তাই প্রত্যহ নিরুপমের হৃদয়ে ওকে নিবিড় করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত আর সেই সঙ্গে একটা তীব্র বেদনা ও যেন ঠিক সেই সময় ওর মনকে দোলা দিয়ে যেত, ওকে হারানোর ভয় না পাওয়ার সম্ভাবনা ব্যাকুল করে তুলত। কি জানি কেন, ওর মনের পাশে দুটো বিরুদ্ধভাব পাশাপাশি রোজ জেগে ওঠে। নিরুপম সত্যই আজ অনেকখানি নিরাশা নিয়ে ফিরে এসেছে তাই নিজের পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজে ভাবছে কত কী বিচিত্র কথা, অনুকি সত্যই দূরে সরে যেতে চায়? এত আলগাভাব ওর বেশ ভাল লাগে না আর, অপেক্ষা আর কতদিন করবে? দুনিয়ায় ভালবাসার মত এমন বিশ্রী জিনিষ নেই, মানুষ কেনই বা ভালবাসে? কি লাভই বা হয় এমন করে এক চিন্তায় সর্ব্বদা মসগুল থেকে? না আরও যাবেনা কোন দিন আপনা থেকে। অনুর ঐ দৃঢ় কঠিন আবরণ দেওয়া দেহ মন আর সেই সময়ের ব্যবহার ওর মনে আজ ভয়ানক ধাক্কা দিয়েছে। অনু ওর চোখের আড়াল হলেই মন ব্যথায় ভরে যায় তা কি সে সত্যই বোঝে না?

মনে মনে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হৃদয়া প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে, পড়ায় মন বসে না, ওর ভাল লাগেনা কোন কিছু। বুকের ভেতর ঠেলে ওঠে কত কথা, বলবার জন্যে কি অধীরতা। ওর এখনকার ভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের একটা লাইনের মতন। 'ক্ষণিক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে মরি ভয়ে ভয়ে পাবকি পাবনা।' সত্যিই আকুল অন্তরের অধীরতাকে আর কোন যুক্তি দিয়ে থামিয়ে রাখা হ'য়ে উঠেছে ওর অসাধ্য।

অনুপমার অন্তরেও যে কোন তুফান ওঠেনি তা নয়, প্রতি নিয়ত ওর হৃদয়েও প্রতিঘাত করছিল একটা ভীষণতর তরঙ্গ ওর অচঞ্চল হৃদয় বেলাভূমে, কিন্তু ও ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির, সহিষ্ণু তাই বাইরে প্রকাশ পায়নি ভেতরের সে বিক্ষোভ। ও জানত মনে প্রাণে যে এ মিলন হবেই, ওর চিন্তায় শয়নে স্বপনে জাগত একটা আকাঙ্ক্ষা অতি মনোরম দৃশ্য পট ধরত ওর সামনে কিন্তু সে খবর ও নিরুপমকে দিত না। ওর সামনে থাকত স্থির অচঞ্চল।

নিরুপমের কঠোর প্রতিজ্ঞা ভীষণ সংকল্প টলে যায়, পরের দিন ক্লাসে ঢুকেই অনুপমার মুখের দিকে চেয়ে। ভীষ্মের পণ আর থাকে না, অন্যদিনের মতন আবার যথা নিয়মে যায়। আজ ওদের আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল—বিবাহ কাকে বলে? অনুপমাই রোজ বিষয় নির্ব্বাচন করত আজও ওই-ই এই বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করে—নিরুপম বলে, "বিবাহ তাকেই বলে, যেখানে দুটি নরনারীর হৃদয় একটীতে প্রকৃত ভাবে পরিণত হয় সেই খানেই বিবাহ সার্থকতা লাভ করে, আর আমাদের সমাজে যে জোর করে ধরে বেঁধে একটী নর আর একটী নারীকে গেঁথে দেওয়া হয় এর ভেতরই ব্যর্থতা ফুটে ওঠে। কতকগুলো মন্ত্র পড়া হলেই যদি মনের মিল হত তা হলে বিবাহেও দাম্পত্য মিলনের মধ্যে এত গরমিল থাকত না, তাদের অনিচ্ছায় যে মিলন অন্যে ঘটিয়ে দেয় গাটছড়া বেঁধে দিয়ে তাকে প্রকৃত বিবাহ কোন মতেই বলা যায় না অনু! সে হয় দু'জনের পক্ষেই শৃঙ্খলা, প্রকৃত প্রেম তার থেকে জন্মায় না কিন্তু তাই বলে আমি এমন কথা বলি না যে, ওগুলোর নেই একেবারেই কোন প্রয়োজন। ওগুলো মাত্র বাইরের অনুষ্ঠান, ওর উপকারিতা অস্বীকার করি না। শুধু বলতে চাই যে প্রণালীতে আমাদের সমাজে বিবাহ হয় ওই প্রণালী বদলানো উচিৎ, ওগুলোর দরকার আগে নয় পরে, আগে হচ্ছে অন্তরের যা কিছু তারই আবেদন।

অনুপমা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে পরে প্রশ্ন করে, তোমার মতে তাহলে কোন্ বিবাহ শ্রেষ্ঠ? আমরা যেমন পরস্পর মেলা মেশা করি অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে অনেকের সঙ্গে এমনি দুটী নর-নারী মিশবে এর থেকে আসবে ক্রমশঃ পরস্পরকে চেনবার সুযোগ এবং খুঁজতে থাকবে তারা দু'জনের অন্তরে দু'জনের যা প্রার্থিত বস্তু, যদি তা পায় তাতে এমন জিনিষ যা তাদের জীবনকে সুখী করার সার্থকতা এনে দেবে তবেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবে কেমন এই না?"

নিরুপম বলে—"কিন্তু কেমন করে বুঝবে অনু

যে ভাবী জীবন সুখকর হবে একে নিয়েই? আর সবাই যে ঠিক বুঝবে বা বুঝতে দেবে তেমনও ত জোর করে বলা যায় না। এমন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই যে, সুন্দর ব্যবহার পরস্পরকে দিয়ে যায় বিবাহের পূর্ব্বে ভেতরে সত্যিকার কিছু নাই ধরা পড়ে তা বিয়ের পরে তখন জীবন হয়ে ওঠে কী ভয়ানক ভাবত? এই দিক্ দিয়ে এরকম বিবাহের অপকারিতা খুব আছে আর তা আজ বহু জায়গায়ই দেখা যাচ্ছে।

অনুপমা হাসে—এই ত আপনিই বললেন নিজে যে, এই রকম বিবাহই সুখকর এবং প্রকৃত মিলন এই স্বেচ্ছা-বিবাহই।

—হ্যাঁ তা আমি অস্বীকার করছি না তবে ক্ষেত্র বিশেষে ও লোক বিশেষে এই বিবাহই হিতকর। অদূরদর্শী নর-নারীর জন্যে এ বিবাহ নয়। প্রেম একদিন দুদিনে জন্মাবার বস্তু নয়, দর্শনে স্পর্শনে যে প্রেমের জন্ম হয় তার স্থায়ীত্ব খুব অল্প দিন, দেওয়াই হোক আর পাওয়াই হোক ও গিলে খাওয়ার বস্তু নয় যে একদিনের পরিচয়ে তা হয়ে যাবে—দেওয়া বা পাওয়া। ও নিছক হৃদয়ের বস্তু ওর ও জন্ম বৃদ্ধি বিকাশ পরিণতি প্রভৃতি রূপান্তর আছে। সে গুলো হতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় ততখানি ধৈর্য্য অনেকের থাকে না তদ্দিন অপেক্ষা করবার, তাই রাতারাতি অঙ্কুর ও গাছ তৈরী করে যারা সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের সে আশা সফল হয় না।

অনুপমা বলে—আমারও ঐ মত, অতি ধীরে ধীরে যা অন্তরে জন্মলাভ করে তাকে দু'দিনে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বৃথা। দু'দিনে যারা ভালবাসে তাদের মধ্যে ফাঁকিই শুধু থাকে, সে হয়ত রূপজ নয় ত কামজ মোহ মাত্র। দুদিনে উঠে দ্রুতভাবে উল্কা খণ্ডের মত আসে আবার মিলিয়ে যায়। তার ঠাঁই অন্তরে নয় কিনা তাই হৃদয়ের কোন আবেদন তাতে থাকে না।

নিরুপম বিস্ময় চকিত নেত্রে অনুপমার লালিমা রঞ্জিত স্থির গম্ভীর মুখের পানে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। ওর অন্তরের নিহিত গোপন কথাটা ব্যক্ত করবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ওর চাঞ্চল্য বাড়ছিল, তাই কোন মতে জোর করে কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—আর যদি কেউ শয়নে স্বপ্নে চিন্তায় সকল সময় একজনকে ভাবে তাকে পেতে যায় সমগ্র অন্তর দিয়ে তবে চাওয়া তার মিথ্যা কি সত্য এবং তার ভেতর সত্যিকার প্রেম জন্ম নিয়েছে বলে মনে হয় কিনা বল ত? ওর মুখ চোখে ফুটে ওঠে একটা সৌন্দর্য্য, দীপ্তি একটা। অনুপমা কিছুকাল অপলক চোখে চেয়ে থাকে তারপর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, হ্যাঁ তখনই তাদের প্রকৃত বিবাহ হয়। আর এ চাওয়াই পাওয়ায় সার্থকতা আনে।

নিরুপম ওর হাত দুটী ধরে মিনতির সুরে বলে—তবে আমার এ চাওয়াও মিথ্যা হবে না অনুপমা?

অনুপমা বলে, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা গুলো কি আপনার মধ্যে বিকশিত হয়েছে? আমার ইচ্ছাশক্তি কি আপনার মধ্যে দিয়ে বইছে? আমার চিন্তা সত্যই কি আপনার সহচর হয়ে উঠেছে, সব কিছুর মাঝে আনন্দ স্ফূর্ত্তি সব ছাপিয়ে আপনার চিন্তা-কেন্দ্রে আমিই বেশী হয়ে উঠি?

—হয় কিনা তাকি তুমিই জাননা? নিরুপমের মুখ আরক্ত কপালে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিল।

—তবে আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে। আমার অন্তরেও অনেক দিন থেকে এর প্রতিবিম্ব পড়ছে। তুমি আমার সমস্ত মনই অধিকার করে আছ আজ তা বলতে আমার ও বাধা নেই। আমি তাই এতদিন অপেক্ষা করছিলুম। আমি ঠিক জানতুম যে আমাদের পরস্পরকে পাওয়ার অধিকার জন্মেছে, তাই নিয়ত দূরে সরে যাচ্ছিলুম তোমায় পরীক্ষা করবার জন্য। আমার স্থির বিশ্বাস যে দূর যখনই নিকট হয় তখনই বুঝতে হবে যে, অন্তরে প্রেমের জন্ম হয়েছে। কারণ দূরত্ব, নৈকট্য হচ্ছে মনের জিনিষ একান্ত ভাবেই, নয় কি? তুমি দেখনি কি আমায় তোমার চারি দিকে?

কেমন করে তা বলব অনু! বলবার মত ভাষা নেই আমার, শুধু অনুভব কর তুমি তোমার অন্তর দিয়ে আর আমাকে অনুভব করতে দাও সমগ্র মন প্রাণ দিয়ে। ও অনুপমকে ব্যগ্রভাবে আলিঙ্গন দিতেই বোধ হয় দুহাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু অনুপমা একটু



চিত্রাভিনেত্রী কানন বালা

তফাতে সরে গিয়ে বলে, 'আজ ও এর সময় আসেনি এখোনো বাইরের অনুষ্ঠান বাকী।

নিরুপম মুহূর্ত্তে সংযত করে নেয় নিজেকে তারপর বলে, তাইহোক্ কিন্তু তুমি কিছু মনে করনা অনু! আর আমি তোমায় ছুঁয়ে দেখতে পাইনা, পাই আমার অন্তরের মণি কোঠায় তাই তোমার বাইরের রূপ—

বাধা দিয়ে অনুপমা বলে, সে আমি জানি দুরত্ব যেদিন দূর হয়েছে সেই দিনই আমরা উভয়ের হয়ে গেছি, তাই আমার মধ্যে আজও চাঞ্চল্য নেই, আমার পাওয়াই সার্থক হয়েছে বলতে হবে। ওর মুখে উঠে জয়ের আনন্দ।

নিরুপম বলে, তোমার সার্থকতা আমাকে ও সার্থকতা দেবে অনু! এই গভীর ভাব নিয়েই আজ থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হোক্।

"রাধানাথ"

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

প্রাণেশ আমার! ভুলিয়াছ মোরে
সেই ত' ভালো,
সেই বালিকারে, কেনই বা মনে,
রাখিবে বলো?
আমার পরাণে, যে সুখ দিয়েছ,
স্মৃতিটি তার,
আজিও করে যে, করুণ আমার,
বেদনা ভার!
তুমি নাকি শুনি, গোলকের পতি,
সবার রাজা,
গোলক পতিরে, তোমার রাধিকা,
করেনি পূজা!
রাধিকা পূজেছে, রাখাল রাজারে,
জীবন ভরে,
রাধার যা কিছু, সঁপেছিলো তাঁরি
চরণোপরে।
ভালবেসেছিল, যাহারে অভাগী,
সে শুধু তুমি,
স্বরগের সুখ, পেয়েছিল বটে,
তোমারে চুমি;
বাঁশরীর রবে, হ'ত বটে মন,
উতলা মোর,
জানিনি ত' তুমি, নিলাজ, নিঠুর,
হৃদয় চোর!
(তবু) তোমারেই চাই, প্রভু নারায়ণে,
চাহিনা আমি,
গোপ, বালিকার 'গোপালক' শুধু,
জীবন স্বামী;
গোকুলে যাহারে, 'প্রিয়া' বলেছিলে,
সে কি গো বঁধু,
সেই সুখাবেশ, এ জনমে আর,
ভুলিবে কভু?
শত কায মাঝে, রাধার সে প্রেম,
ভুলেছ তুমি,
রাধিকা কেমনে, ভুলিবে তোমারে,
হৃদয় স্বামী?
ভুলাতে চাহিনা, হৃদয় বেদনা,
যতেক মোর,
সে যে গো তোমার, প্রেমের কেতন,
প্রীতির ডোর!
হৃদয় পুড়িয়া, হ'য়ে যাবে ছাই,
তাতে' কি ক্ষতি,
রাধার জীবনে, 'রাধানাথ' বিনা,
নাহিক—গতি!

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় আরো বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে সে সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি যেমন চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পও অতিশয় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য এই গুপ্তযুগ সম্পূর্ণ হিন্দুর গৌরব ও আদর্শ যুগ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অন্যান্য উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি শিল্পও সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় সুবিখ্যাত অজন্তা গুহার উৎপত্তি। মৌর্য্য ও কুষাণ যুগের স্থাপত্যে ও শিল্পকলায় যে গ্রীক ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা গুপ্তযুগে পাওয়া যায়না। গুপ্ত স্থাপত্যে গ্রীক বা বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায়না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হিন্দু স্থাপত্য ৮ম শতাব্দীতে চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল কিন্তু কাহারো মতে গুপ্ত যুগই হিন্দুদিগের চরম উন্নতির যুগ।

এইখানে হূনদিগের সহিত পরবর্ত্তী ভারতের হিন্দু ইতিহাসের সংশ্রব আছে বলিয়া তাহার কিয়দংশের উল্লেখ এইখানে করিতেছি।

হূণগণ মধ্য এশিয়া হইতে উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়া দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পথে পূর্ব্বে শক ও ইউয়েচীগণও আসিয়াছিল। যদিও হিন্দুগণ সমস্ত বিদেশীয় আক্রমণ-কারীদিগকে হূণ বলিতেন, তবুও ঐতিহাসিক মতে হূণ বলিতে এক জাতিই বুঝায়। ইহারা গুর্জ্জর ও অন্যান্য কতগুলি জাতি মিলিয়া সংগঠিত ছিল। বহু পূর্ব্বে ওক্সাস উপত্যকায় যাহারা বসবাস করিতেছিল তাহাদিগকে শ্বেতহূণ, (white Hun) অথবা Ephthalites বলা হইত। এই হূণগণ ক্রমশঃ সাসানিয়ার রাজা ফিরোজকে নিহত করিয়া পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য ও কাবুল অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের গুপ্তসাম্রাজ্যের উপর প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু অধিকদিন কেহ তাহাদিগের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহাদিগের অধিনায়ক তোড়ামন পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালোয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মিহিরকুল রাজা হইয়া পঞ্জাব অন্তর্গত সাকালা অথবা শিয়ালকোটে তাহাদের ভারতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় ভারতবর্ষে হূণ রাজত্ব মাত্র পারস্য হইতে পূর্ব্বে খোসান পর্য্যন্ত ৪০টী প্রদেশ লইয়া সম্পূর্ণ ছিল। এই রাজ্যের প্রথম রাজধানী হিরাটের নিকবর্ত্তী বামীন নামক স্থানে ও দ্বিতীয় রাজধানী বালখ নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এই হূণগণও অধিকদিন ভারতে তিষ্ঠিতে পারে নাই। কারণ মালোয়া রাজ্যের অন্য রাজা যশোধর্ম্ম কান কোন ঐতিহাসিক ইহাকে দশপুরের বর্ত্তমান মান্দাসোরের রাজা বলিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের গুপ্তরাজের সাহায্যে মিহিরকুলকে বিতাড়িত করেন। এই আখ্যায়িকা আমি যশোধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি, এইখানে হূণদিগের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার পুনরুল্লেখ করিলাম। মিহিরকুল পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করিয়া কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তার কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওক্সাসবাসী হূণগণ তুর্কীগণ দ্বারা বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বৈদেশিক আক্রমণগুলি বহু ঐতিহাসিকগণ উপেক্ষা করিয়া যান কিন্তু এই আক্রমণগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতির ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ

নাই। গুপ্তদিগের রাজ্য ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হইয়া নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়া নূতন রাজনীতিতে পরিচালিত হইতে লাগিল। এবং হুণদিগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস ও কিম্বদন্তী নষ্ট হইয়া গেল। এই বিদেশীয়গণ কি ভাবে ক্রমে হিন্দু হইয়া রাজপুত জাতির উদ্ভব করিল তাহা পরে আলোচিত হইবে।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়াছিল সেই সময় এক দল বিদেশী সম্ভবতঃ ইরাণী মৈত্রকের অধিনায়কত্বে পরাক্রামশালী হইয়া পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই মৈত্রকগণ সেই রাষ্ট্রের বলভী নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বংশ পরম্পরায় ৮ম শতাব্দীতে আরবগণ কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বহু বৌদ্ধ জ্ঞানী মনিষীগণ এই রাজধানীতে বাস করিতেন এবং সপ্তম শতাব্দীতে বিহারের নালন্দার স্থায়ই বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই বলভী রাজ বংশ ধ্বংসের পর তাহাদিগের রাজ্য অনহিনওয়ারা অথবা পাটনদিগের কবলগত হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা আহমেদাবাদ নামে খ্যাত হয়।

এই সময়ে ভারতে বহুতর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

গুর্জ্জরগণ যাহারা হুণদিগের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন তাহারা দক্ষিণ রাজপুতানায় ভরোচ এবং ভীলমানে রাজ্য স্থাপন করেন।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য বংশভূত একজন দলপতি দক্ষিণ রাজাপুতনার গুর্জ্জরদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাটাপিতে (অধুনা বোম্বাই প্রদেশ অন্তর্গত বিজাপুর জেলার বাদামি নগর) আসিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশেষ উন্নত ও ক্ষমতাশালী হইয়া দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

এই ষষ্ঠশতাব্দী ভারতের পুনরায় তমসাচ্ছন্ন যুগ। তখনকার যুগের ঐতিহাসিক ধারা ধারাবাহিকরূপে কোথাও পাওয়া যায়না। সেইজন্য মনে হয় এই সময়ে অনেক উপদ্রব ও অশান্তি ভারতের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরে যখন সপ্তম শতাব্দীর আখ্যায়িকা আরম্ভ করা যায় তখন দেখা যায় ভারতে পুনঃ শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ের ইতিহাস, আখ্যায়িকা অথবা বিবরণী সমস্ত আমরা বিশদ ভাবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-উয়েনসাংএর ভ্রমণ কাহিনী হইতে, এবং ঐ পরিব্রাজকের বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত তাহার জীবনী হইতে, চীন ইতিহাস এবং মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে বান কর্ত্তৃক লিখিত ইতিহাস হইতে বিশেষভাবে পাই। আরো মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের বহু মুদ্রালিপি ইত্যাদি হইতে পাই। এরূপ বিশদ ও সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ হিন্দুদিগের মৌর্য্যযুগ ভিন্ন আর কোন যুগে পাওয়া যায়না। কনৌজরাজ হর্ষের যোগ্য ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী হস্তে উত্তর ভারতের ভীষণ অরাজকতা একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি সম্রাট অশোকের স্থায় ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাহার সুচিন্তিত রাজনীতির বিবরণ তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরগণ দ্বারা এভাবে লিখিত হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে মনে হয় মহারাজা হর্ষকে যেনো আমরা জীবন্ত দেখিতে পাইতেছি।

ইতিহাসের ধারা বিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ শতাব্দীর অবসানে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিল পুনরায় ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ। অবশ্য সেই যুগের সূচনা তেমন প্রীতিকর না হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাহার চিত্র যথেষ্ট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যে যুগের ইতিহাস আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব সে যুগের উদ্ভবস্থল স্থানেশ্বর। অবশ্য থানেশ্বর ভারতের তেমন সুখকর স্মৃতি বহন করিয়া আজ ভারতের বক্ষে অতীতের সাক্ষ্য দিতে অবস্থান করিতেছেনা। এই থানেশ্বর কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরাঙ্গণের এক অংশে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটেই সে পানিপথ। যাহার নাম কবি অতি আক্ষেপের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন —

"হায় পাণিপথ স্মৃতি পটে আজ কেন আর হোস্‌রে উদয়।" ইত্যাদি।

এই স্থানেশ্বর ও পানিপথ ভারতের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের সহিত যে কতখানি সংশ্লিষ্ট তাহা আমি ক্রমেই ইতিহাস ও রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। এখন স্থানেশ্বরকে ভারতের মহাশ্মশান না বলিয়া আমি ইহাকে এখন এক সমৃদ্ধ ও উদীয়মান হিন্দুর রাজত্বের রাজধানী রূপেই উল্লেখ করিব।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থানেশ্বর রাজ্যের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মৌখরী বংশের ইতিহাস একটু আলোচনা করা আবশ্যক কারণ থানেশ্বর রাজবংশের ইতিহাসের সহিত মৌখরী বংশ ও বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্কের ইতিহাস বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই ইতিহাসের এই অংশটুকু আলোচনা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিল।

যে প্রদেশ বর্ত্তমানে আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ নামে খ্যাত সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া মৌখরীগণ একটী প্রবল রাজ্য গঠিত করিয়া তোলে। যশোধর্ম্মের তিরোধানের পর হূণদমনের ভার মৌখরীগণের উপরেই পড়ে এবং অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের এই কর্ত্তব্য উত্তম রূপেই পালন করিয়াছিল। মৌখরী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ঈশান বর্ম্মন আর্য্যাবর্ত্তের বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গুপ্তরাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে এক স্বাধীন ও প্রবল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এই রাজাগণ প্রথমে পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রবল মৌখরী রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই আশা ফলবতী হয় নাই। শীঘ্রই বঙ্গদেশে এক বীর পুরুষের আবির্ভাব হওয়ায় বঙ্গদেশ এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যে পরিণত হইল। এই বীরের নাম শশাঙ্ক। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণ-সুবর্ণে। শশাঙ্কের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু নিশ্চিত রূপে জানা যায়না। কিন্তু তিনি শীঘ্রই প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত জয় করিয়া ফেলিলেন। পশ্চিম দিকে বিজয় যাত্রা করিয়া তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় কান্যকুব্জের মৌখরী রাজগণকে পরাজিত করিলেন। ঐতিহাসিক যুগে বাঙ্গালী এই প্রথম আর্য্যাবর্ত্তে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল।

যদিও গুপ্ত বংশের বিষয় আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি তথাপি তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইয়া পড়িল কারণ পরে বর্ণিত হইতেছে।

গুপ্ত রাজবংশের তৃতীয় কুমার গুপ্তের সহিত ঈশান বর্ম্মনের ভীষণ সংঘর্ষ হয়। বুধগুপ্তের মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্তরাজগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও মৌখরীগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা হূন সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দামোদর গুপ্ত মৌখরীদিগের বিশাল হস্তী বাহিনী বিচ্ছিন্ন করিতে গিয়া নিহত হন। দামোদরের পুত্র মহাসেন গুপ্ত মৌখরীদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী দেশজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। মৌখরীগণ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত দোয়ার এবং অযোধ্যা হইতে মগধ পর্য্যন্ত ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

এই বংশের শেষ প্রসিদ্ধ রাজা গ্রহবর্ম্মন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপন ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মালবের একজন রাজা কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী করা হয়।

প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কি কি নব সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল ও রামায়ণ মহাভারতের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার কোন আলোচনা করা হয় নাই। সাহিত্য, প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যে দেশের রাজনীতির সহিত ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত আছে তাহা বলিলে কেহ বোধহয় আমাকে অতিশয়োক্তিদোষে দোষী করিবেননা। রাজনীতি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লিখিতে গেলে তখনকার সাহিত্য যাহা তদানীন্তন মানব ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে

তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এই যুগের মনস্তত্বের উপর নির্ভর করিয়া ঐ যুগের মনস্তত্বের রাজনৈতিক হিসাবে বিচারের পন্থা অনুসরণ করা আমার বিবেচনায় ভ্রমাত্মক পন্থা। বিবেচনা করিতে হইলে ইতিহাস সাহিত্য, কিম্বদন্তী, সামাজিক রীতিনীতি ও তৎকালীন সমস্ত পারিপার্শিক ঘটনার ভিতর দিয়া রাজনৈতিককে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক সমালোচনা অনেকটা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইতে পারে। তাই আমি সমগ্র বিষয়ের আলোচনা করতঃ আমার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতা লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে কেহ আমাকে দোষী করিলে আমার প্রতি অন্যায় বিচার করা হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ, মহাভারত অদ্য আমরা যাহা পাঠ করিতেছি তাহা ঠিক যাহা প্রণয়ন কালে ছিল তাহা নহে। ইহা অনেক পরিবর্ত্তিত পারবর্দ্ধিত যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে। এবং সাম্প্রদায়িক প্রক্ষিপ্ততার চাপে ইহার মতামত পরিবর্ত্তনেরও চেষ্টা চলিয়াছে কাজেই রামায়ণ মহাভারতের দোহাই দিয়া অধুনা পূর্ব্ব যুগের ইতিহাস সামাজিক রীতি নীতি রাজনৈতিক পন্থা অনুসরণ তেমন নিরাপদ হইবেনা।

গুপ্ত যুগের ইতিহাসে দেখা যায় রামায়ণ মহাভারত সেই যুগে নতুন রূপে সঙ্কলনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। পৌরাণিক ও স্মৃতিসাহিত্য ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সঙ্গীত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রভৃতি চারু শিল্পের উৎকর্ষ সেই যুগকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি অধুনা দীল্লিতে কুতব মিনারের সন্নিকটে যে লৌহস্তম্ভ, পৃথ্বীরাজ স্তম্ভ বলিয়া সাধারণের খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ের প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তম্ভ যাহা আজিও গুপ্তযুগের ধাতুশিল্পের চরম উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে।

আমি পূর্ব্বেই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক দিগের মধ্যে মতদ্বৈতের কথা লিখিয়াছি। আজি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পারে বসিয়া সেই মতদ্বৈততার কারণ একীকরণের অথবা প্রত্যেক ঘটনা ঠিক সময়ে অনুসরণের চেষ্টা আমার উন্মাদ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই হইবেনা। কাজেই আমি ঐ সন্দিগ্ধ পন্থা পরিহার পূর্ব্বক এই দুই যুগের ইতিহাসের আলোচনা একত্র করিয়াছি এবং এখনো করিতে বাধ্য।

আমি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের উল্লেখ করিয়াছি কাজেই ঐ সময়ে যে যে সাহিত্যের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় সেই সেই সাহিত্যের আলোচনা এই সময়ে করা আবশ্যক। ঐ প্রসঙ্গে ভাষাও কিরূপ ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহারও আলোচনা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

সম্রাট অশোকের যুগে অথবা জৈন অথবা বৌদ্ধদের যুগে আমরা ঐ সময়ের শিলাস্তম্ভে ও সাহিত্যে যে সমস্ত ভাষায় ব্যবহার দেখিতে পাই তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রচলিত পালি ভাষায় লিখিত। এবং সম্ভবতঃ ঐ গুলি সাধারণের বোধযোগ্য করিবার মানসে ঐ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অন্ধ্র রাজগণের রাজত্ব কালে আমরা যে সমস্ত সাহিত্যাদি প্রাপ্ত হইতেছি সেই সমস্ত সাহিত্যে যে ভাষা দেখিতে পাই তাহা সংস্কৃত নহে। প্রাকৃত ভাষা। তাই বলিয়া আমি একথা বলিতেছিনা যে ঐ যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত না। যদি ঐ যুগে ভারতের তেমনি দুর্ভাগ্য হইত তাহা হইলে আজি ভারতে আর সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত না। ভাষানুসরণে আমরা যে ভাষার ইতিবৃত্ত পাই তাহাতে দেখা যায় কুষাণ যুগে সর্ব্ব প্রথম ভারতে ব্যাকরণানুসরণে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। কুষাণ যুগে যেমন একবার ভারতে সর্ব্বজাতি, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বভাষা এবং সর্ব্বপ্রকারের রাজনীতি একত্র করণের যুগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মোগল কুল তিলক মহাত্মা আকবরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনরূপ উল্লেখ আমরা ইতিহাসে পাই না। কুষাণ যুগের অবসানে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দু যুগের অভ্যুত্থান হয় এবং ঐ যুগের মহা উৎকর্ষতা গুপ্ত যুগেই হয়। তন্নিবন্ধন ঐ যুগে ভারতের হিন্দু রাজত্বের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির যুগ পরিলক্ষিত হয়। কবি কালিদাসের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্য ও নাটক সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন ঐ সম্বন্ধে বোধহয় এইটুকুই লিখিলে যথেষ্ট হইবে। যেমন কোহিনূর ভারতের রাজ-

মুকুটে বিশ্ব বিখ্যাত মণি তেমনি ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে কবি কালিদাসের রচনাও বিশ্ববিখ্যাত। কাজেই তাঁহার রচনাবলীর ফর্দ্দ আমার ন্যায় নগণ্য লেখকের দিতে যাওয়া প্রগল্‌ভতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিনা কারণ তার সমস্ত গুলি বিশ্ববিখ্যাত এবং তাহার প্রায় সমস্তই বিশ্বের ভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে।

গুপ্তযুগে সাহিত্যের চরম উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতেছি। কবি হরিসেন ও বীরসেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও তাহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়া যে কাব্যরচনা করিয়াছেন তাহা প্রতিভায় ও মাধুর্য্যে কবি কালিদাসেরই সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। সুবিখ্যাত মৃচ্ছকটিক নাটকের গ্রন্থকার শূদ্রক ও মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতা বিশাখা দত্ত ঐ যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

উপচার

(রবিদাসের দোহা অবলম্বনে)

শ্রীহরিপ্রসাদ রায়

দুগ্ধে তোমারে যাই পূজিবারে করিয়াছে এটো বৎসে তারে,
পুষ্পে ছুঁয়েছে অগ্রে ভ্রমর, কি দিয়ে বা পুজি শুধাই কারে?
বারি? তাতে দেখি মৎস্য ঘুরিছে, চন্দনে আছে সর্প বেড়ি'
সব-ই অশুদ্ধ—সকলি স্পৃষ্ট—নয়ন মেলিয়া যেদিকে হেরি।
নৈবেদ্য ও ধূপ দীপ ছাড়া কি আছে এমন শুদ্ধ ভবে?
কি দিয়ে তোমায় পূজিবে এ দাস? কি দিলে হে প্রভু তুষ্ট হবে?
"প্রেম ভক্তিতে পূজা করো তাঁরে এই উপচার সদাই শুচি,"
কহে রবিদাস—"এতে পাবে তাঁরে মনের ধন্ধ যাইবে ঘুচি।

মরুর পথে

উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাঁহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্তমান হিন্দুসমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলার হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই দেখাইতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাসখানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকার অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্তমানে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

(৩১)

নতুন জমিদার প্রভাকর যে দিন আসিয়া পৌঁছাইবে তাহার আগের দিনই বৈকালে গোপা সুরমার সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আসিতে তখনও দেরী ছিল।

সঙ্গে চলিয়াছে দিনেশ, পলাশ একদিন আগে কলিকাতায় পিতার নিকট গিয়াছে।

মাধব বাবু সমস্ত জমিদারি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, দেশে মুখ দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহার আর হয় নাই; তাঁহার বংশ মর্য্যাদায় আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল।

কলিকাতাতে ও তিনি আর থাকিবেন না। কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। সমস্ত অর্থ পলাশের নামে দিয়া মাধব বাবু দেশ ভ্রমণে যাইতেছেন, যে দেশ ভাল লাগিবে চিরকালের জন্য সেখানেই থাকিয়া যাইবেন, পরিচিতদের মধ্যে আর থাকিবেন না এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। পিতার অটুট্ সঙ্কল্পের কথা পলাশ জানিত, সে গোপনে কাঁদিতেছিল তবু সাহস করিয়া পিতার কাছে যাইতে পারে নাই। কাল দিনেশ পলাশকে একা পাঠাইয়া দিয়াছে, পলাশের সহিত নিজে যায় নাই। আজ সে গিয়া দিদিদের হাওড়ায় ট্রেনে তুলিয়া দিয়া পলাশকে লইয়া চলিয়া আসিবে।

গোপা অন্যমনস্ক ভাবে পিছনে ফেলিয়া আসা গ্রামের পানে তাকাইয়াছিল, সুরমাও একটি কথা বলেন নাই।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরমা ডাকিলেন; গোপা—

গোপা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল, তাহার দুইটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ব্যথিত কণ্ঠে সুরমা বলিলেন, চিরকালের মত দেশ ছেড়ে যেতে মনে খুবই কষ্ট লাগছে, কিন্তু না গেলেও তো চললো গোপা। বাড়ীখানা থাকলে ও এরপর ভবিষ্যতে কোনদিন না কোনদিন ফিরে আসা যেত অন্ততঃপক্ষে একটা দিন এসে দেখে যেতে পারতে।

গোপার চোখের জলে নিমিষে শুকাইয়া উঠিল. যেটুকু কাতর কমনীয়তা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিমিষে সরিয়া গেল।

সে বলিল, না দিদি, যত দিন মাধব বাবু জমিদার ছিলেন তাঁর জমিদারীতে বাস করতে পেরেছিলুম, যিনি জমিদার হতে আসছেন তাঁর প্রজা রূপে বাস করতে পারব না।

সুরমা বলিলেন, প্রভাকর নাকি জমিদারি কিনেছে, শুনলুম।

গোপা উত্তর দিল, হ্যাঁ তিনিই।

একমুহূর্ত্ত নিরব থাকিয়া সে বলিল, আজই তাঁর একখানা পত্র পেয়েছি, তাতে তিনি জানিয়েছেন আমি যেন কোথাও না যাই, তাঁর আসার সময়টা পর্য্যন্ত যেন এখানে এই গ্রামেই থাকি। কিন্তু তাই কি হতে পারে দিদি? আজ কয়টা বছর আগে একদিন—যেদিন গিয়েছিলুম এতটুকু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় সেদিনের সে অপমান আজও তো এ মন হতে মিলায়নি দিদি।

সুরমা বলিতে গেলেন, আমি সব জানি, তবু সে যখন বলেছে যখন তোমার কাছে নীচু হয়ে অনুরোধ করছে—

বাধা দিয়া গোপা বলিল, কিন্তু তার বলার জন্যেই যে আমায় এখানে থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যতার মধ্যে তো আমি নই দিদি। বিয়ের বন্ধনের কথা বলবে, তিনি

তো সে বাঁধন ছিঁড়েই ফেলেছেন, আমাকেও যা খুসি করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিনে ছিলুম নিতান্ত অসহায়, উপায় না পেয়ে তাঁকেই আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিলুম, আজ নরেশের মাঝে উপায় পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি। জেনেছি, ওকে মানুষ করে তুলতে ওকে সংসারী করতেই আমার জন্ম, আমার বাঁচার উদ্দেশ্য ও তাই। এই উদ্দেশ্য না থাকলে যে দিন অত বড় অপমানটা সয়েছিলুম সেদিন মরতে পারতুম দিদি, কারণ সেদিন হতেই জীবনে ধিক্কার জেগে উঠেছে।

সুরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি শুনেছি, গোপা কেবল তোমার জন্যে সে এখানকার এই জমিদারি কিনেছে নচেৎ বাংলাদেশে অন্য জমিদারি কিনতে ও পারত।

গোপা ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসিল, বলিল, অর্থাৎ আমায় আরও অপমানের ইচ্ছা। আমার স্ত্রীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছে, বাকি আছে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাটুকু সেটুকু ও পায়ে দলবার ইচ্ছা। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝেছি বলেই পালাচ্ছি দিদি, সে গৌরবটা পাওয়ার অধিকারী হতে আমি ওকে দেব না কিছুতেই দেব না।

সুরমা বলিলেন, আমিও তা দিতে বলিনে গোপা। তুমি যদি পার তোমার যদি শক্তি থাকে, তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব তুমি নিশ্চয়ই বাঁচাবে। যে স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখতে জানে না, মানুষের মর্য্যাদা রাখতে জানে না, নিজের খেয়ালে পথ চলে তার পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

দীনেশ বলিলে, খেয়ালী হতে পারে, কিন্তু খেয়াল দূর করে মানুষটাকে খাঁটি করে নেওয়া কি তোমাদেরই কাজ নয় গোপা? আমাকেও সে পত্র লিখেছে জানিয়েছে মেম চলে গেছে, আর গোপার সঙ্গে অশিষ্ট আচরণ করার ফলে সে সত্যিই বড় বেশী রকম অনুতপ্ত হয়েছে।

গোপা হঠাৎ হাত দুখানা যোড় করিয়া বলিল, থাম দীনেশ দা, আজ তার হয়ে তুমি ওকালতী করতে এসো না,—ভারি অসহ্য মনে হয়। সেদিনকার কথা তোমার ও মনে আছে তো। আজ যদি সেই তাঁরই আদেশ মেনে চলি সেটাতে নিশ্চয়ই পতিব্রতার উজ্জল আদর্শই থাকবে। আজ যদি তিনি আবার আর একটা ঠিক বিপরীত আদেশ করেন, সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কতখানি সহজ হবে সেটা একবার ভাবছ?

দীনেশ উত্তর দিবার আগেই ট্রেন আসিয়া পড়িল।

সুরমা ট্রেনে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, মনুষ্যত্বকে উঁচু আসন দেওয়া যদি মত হয় গোপা ঠিকই করেছে। প্রভাকর বুঝবে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যেও সত্যিকার সাহস শক্তি একটু আছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক দীনে, কলকাতায় পৌঁছে একবার মেডিকেল কলেজে বেচারী মহিম ঠাকুরপোকে একবার দেখে যেতে হবে কথা রইল।

দীনেশ উত্তর দিল, দেখা যাক।

সে পুরুষদের কামরায় উঠিয়া বসিল।

(৩২)

গোপা ও সুরমাকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলিয়া দিয়া দীনেশ কলিকাতায় ফিরিল।

মেডিকেল কলেজে মহিম রহিয়াছে তাহাকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। সন্ধ্যার দিকে কলেজষ্ট্রীটে ফিরিয়া পলাশকে লইয়া সে রাত্রের ট্রেনে বাড়ী ফিরিবে।

সে নিজে মহিমকে লইয়া আসে নাই, পরিচিত এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়া পাঠাইয়াছিল। তাঁহারই নিকট হইতেই বেড নম্বর জানিয়া লইয়া সে বেলগাছিয়া হস্পিটালে উপস্থিত হইল।

একটা খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছে মহিম। একজন নার্শ তাহার কাছে বসিয়া, দুই এক জন ডাক্তারও বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাঁহাদের মুখে চোখে উৎকণ্ঠার ভাব দেখিয়াই দীনেশ বুঝিল ব্যাপারটা কি?

নার্শ পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। একজন ডাক্তার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি সাতটা পর্য্যন্ত এখানেই থাকবেন মিষ্টার, যদি কোন রকম বেভাব বুঝতে পারেন তখনই খবর দেবেন, আউটডোরেই আমি থাকবো ততক্ষণ।

ফিরিতেই দীনেশকে দেখিতে পাইলেন।

শান্ত কণ্ঠে দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখছেন রোগীকে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, আপনারই আত্মীয় বোধ হয়,—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে—একে বাঁচানো আমাদের দ্বারা সম্ভব হলনা। সকালে অপারেশনের সময় হতে সেই যে সেনস লেস হয়ে পড়েছেন, এখনও সেন্স ফেরে নি, তাছাড়া পালসের অবস্থাও মোটে ভালো নয়, হার্টও এলোমেলো চলছে যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারেন।

দীনেশ নির্নিমিষে রোগীর পানে তাকাইয়া রহিল। বেচারা মহিম!

বাঁচিবার জন্য তাহার কি প্রাণপণ ব্যগ্রতা—ছেলে মেয়ের জন্য তাহার কি প্রাণপণ ঝোঁকা। সব ব্যর্থ করিয়া মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহাকে কিছুতেই নদীর এপারে আর রাখা চলিবে না।

কি বলিবার জন্য নার্স মুখ ফিরাইল—

তাহার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল।—

দীনেশ স্থির নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, মুখখানা যেন বড় চেনা। যদি ও চুলগুলা ছোট করিয়া ছাঁটা, পরনে শুভ্র থান,—তবু মনে হয় এ মুখ অপরিচিত নয়।

দীনেশ ডাকিল—করুণা—

মেয়েটী মুখ তুলিল।—

তখন সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। শুষ্ক একটু হাসির রেখা তাহার শুষ্ক মুখের উপর জাগিয়া উঠিল, সে নত হইয়া দীনেশের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—

"হ্যা, আমিই বটে, দাদা।"

দীনেশের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, অনেক লোক অনেক কথাই বলেছে কিন্তু আমি একটাও বিশ্বাস করি নি। সত্যি আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঠিক এমনই ভাবে তোমায় কোথাও দেখতে পাব। আমার বিশ্বাস সত্যি হতে দেখে সত্যি আমার আনন্দ রাখবার জয়গা নেই করুণা।

করুণা একটু হাসিল,—

কিন্তু কতখানি বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে যে এখানে এসে পৌচেছি তাতো জানেন না দাদা, তবু ভগবানকে ধন্যবাদ দেই শেষ পর্যন্ত এখানেও আসতে পেরেছি। কোথায় ভেসে যেতুম, দাঁড়ানোর জয়গাটুকুও পেতুম না, নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখেই ভগবান এখানে নিয়ে এলেন।

দুইহাত সে কপালে ঠেকাইল।

কেউ আশ্রয় দিতে পারলেনা দাদা, হিন্দুকে হিন্দু আশ্রয় দেয়নি, এ দুঃখ মরলেও যাবেনা। যেখানেই গেছি আমার কলঙ্ক ভাসতে ভাসতে আগে গিয়ে পৌচেছে, আমায় সকলেই সোজাপথ দেখিয়ে দিয়েছে। অবশেষে—তোমায় বলতে কিরকম বাধে দাদা—

দীনেশ একটু হাসিয়া বলিল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছ?

করুণা বলিল, হ্যা বাধ্য হয়ে তাই করতে হল।

দীনেশ গম্ভীর হইয়া বলিল কিন্তু ওইখানেই যে ভুল করলে করুণা, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তুমি যে শক্তি পেয়েছ ভাবছ সেটা ভুল, কারণ ও শক্তি তোমার মধ্যেই ছিল, আচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। তুমি যেখানে অর্থাৎ যে ধর্ম্মেই থাকতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতেই। আজ তুমি কোন ধর্ম্ম নিয়েছ তা আমি জানতে চাই নে আমি শুধু মনে করব তুমি হিন্দু নও। জাত হারিয়ে কেউ কোনদিন বিশেষ শক্তি পায় নি করুণা, ওটা শুধু অবিশ্বাসই নিয়ে আসে তাই বলছি ও ধারণা ভুল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া করুনা বলিল, কিন্তু আর তো উপায় নেই দাদা—।

দীনেশ বলিল, আছে বইকি, ধর্ম্ম মানুষের মনের জিনিষ, বাইরের তো নয়, কাজেই ছেড়েছি বললেই ছাড়া যায় না। ফিরাবার পথও ঢের আছে, শুধু ফেরার প্রবৃত্তি নিয়েই কথা। যাক, ধর্ম্ম যাই হোক, মানুষ হিসেবে যখন আমরা সবাই এক তখন আর কথা বলা চলবে না, করুণা। বুঝলুম তুমি পূর্ণ্যের কাজ করছ। চমৎকার কাজ এটা, রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া সেবা করা যে যতটা পুণ্যের কাজ আর মনে শান্তি আনে তা বলতে পারিনে। কিন্তু বিধাতার কি মর্জ্জি দেখছ করুণা যে তোমায় দুর্গতির চরম সীমায় নিয়ে

এসেছিল, যাঁর জের তুমি আজও সইছ আজ তারই সেবা শুশ্রূষার ভার তোমার উপর পড়েছে।

করুণা আবার কপালে হাত দুখানা রাখিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এ ও ভগবানের দয়া, প্রথমদিন যখন এরই সেবা করতে এলুম তখন মনটায় একটা ধাক্কা লেগেছিল, আমি দিনরাত প্রার্থনা করতে লাগলুম আমি যেন বিচলিত না হই, আমি যেন কর্ত্তব্যে অবিচল থাকতে পারি। তোমাদের আশীর্ব্বাদে সত্যি চিত্ত জয় করতে পেরেছি দাদা আমি আমার ওই পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে পেরেছি।

শয্যায় শায়িত মহিম অত্যন্ত অস্থির ভাবে ছট ফট করিতেছিল।

দীনেশ তাহার পানে তাকাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শেষ অবস্থা ওদের খবর দাও করুণা। ডাক্তারকে খবর পাঠাইয়া করুণা মহিমের মুখে একটু জল দিল।

একটা নিঃশ্বাস টা নিয়া লইয়া মহিম ডাকিল বৌদি, আমার ছেলে মেয়ে দুটো —

করুণা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া করুণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, তাদের জন্যে ভাবনা নেই, আমরা তাদের দেখাশোনার ভার নিচ্ছি।

করুণা—

মৃত্যু মলিন চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শেষ প্রদীপ যেন শেষবার জ্বলিয়া উঠিল।

হাতখানা তাহার মাথার উপর রাখিয়া করুণা বলিল, হ্যা তোমার ছেলে মেয়েকে মানুষ করবার তাদের বাঁচাবার ভার আমি নিচ্ছি।

আঃ— •

বড় শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহিম স্তব্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তারেরা আসিলেন, পরীক্ষা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

নিঃশব্দে মহিমের প্রাণ দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মাস খানেক পরে সুরমার পত্রের উত্তরে দীনেশ পত্র লিখিতেছিল।

অনেক কথা লিখিয়া শেষে সে লিখিল—আশ্চর্য্য শোন দিদি, করুণা এখন বেলগাছিয়া কলেজে নার্সের কাজ করছে। মহিমকে আমি সেখানে দেখেছিলুম, মহিমের সেবা সে প্রাণপণে করছে, চিরশত্রু মহিমকে বাঁচাতে সে চেষ্টা করছে কিন্তু পারলে না। আশ্চর্য্য শোন, সেই চিরশত্রু মহিমেরই দুইটি ছেলে মেয়ের জন্য সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বাস করেছে। মনে করোনা দেশের লোক সহজে এটা মেনে নিয়েছে। এরা অনেক চেষ্টা করেছে এখনও করছে যাতে করুণাকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু করুণা আজ সে করুণা নেই যে একদিন এদেরই মুখের কথা হতে আমাদের কেবল মাত্র বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গিয়েছিল আমাদের আশ্রয় ছেড়ে আর কেউ তাকে আশ্রয় দেয়নি অবশেষে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করতেও বাধ্য হ'য়েছে।

আজ কাউকে বাঁচাবার জন্য তার ভাবনার দরকার নেই, আজ সে নিজেই নিজের তাই কেউ তাকে গ্রামের বার করে দিতে পারলে না, পারবেওনা।

হ্যাঁ, প্রভাকর এখানে এসেছিল, তার স্ত্রী বিলেতে চলে গেছে আজও তাকে তার মাসিক বৃত্তি পাঠাতে হচ্ছে তাকে বেশী দিন দিতে হবে না কেননা ওর স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পত্র দিয়েছে।

সে এসেছিল গোপার সন্ধানে, তাকে বললুম গোপা তার জন্যেই চলে গেছে, গোপাকে সে আর পাবে না। সে সেই দিনই চলে গেছে। ওখানে গেল কিনা জানিও।

দীনেশ

এর পরেই গোপার একখানা পত্র আসিয়াছিল, সে সামান্য দুইচারিটি কথা লিখিয়াছে।

প্রভাকরের কথায় সে লিখিয়াছে—

তিনি এখানে এসেছিলেন, আমি তাঁকে বিদায় দিয়েছি বলেছি তিনি যেন তাঁর সেই স্ত্রীকেই ফিরিয়ে আনেন, আমার আশা ছেড়ে দিন। আমার জীবনে উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি, আর কোনদিকে চাইবার সময় নেই।

নেশা

গল্প

শ্রীঅমলেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী

খোল। দরজা খোল শীগগীর। কই খোল বলচি এখনো। কোনো সাড়াশব্দ নাই। আবার ধাক্কা।

এবারে দরজা খুলিল—শব্দ করিয়া নয়, আস্তে। স্বামীকে দেখিয়া সরলা সভয়ে দ্রুত পিছাইয়া গেল তিন-হাত। মণিলাল রাত দুটোয় বাড়ী ফিরিয়াছে। সারা-গায়ে কাদামাখা, হাতে মুখে রক্তের দাগ। বিকট মুখ ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সামনের উঁচু কালো দাঁতটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। কী বীভৎস চেহারা!

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া মণিলাল উত্তেজিতস্বরে কহিল—এতোদিন চুরি বাটপাড়ি করেই চল্‌তো। আজ কি করেচি শুনবে? শুন্‌বে আজ কি করেচি? খুন। গলিতে একা পেয়ে একটি জল-জ্যান্ত মানুষের বুকে দিয়েছি ছোরা বসিয়ে। পেয়েচি কতো জানো? দশ গণ্ডা পয়সা। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

সমস্ত ঘর খানা বিকট হাসিতে ভরিয়া গেল। সরলা শিহরিয়া উঠিল। মণিলাল কাপড়ের মধ্য হইতে একখানা ধারালো ছোরা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল,—এই নাও। বেশ করে ধুয়ে ফেল। একটুও যেন রক্ত না থাকে, বুঝলে?

এতোক্ষণে সরলা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছিলনা। অস্ফুটস্বরে কহিল,—কি করেচ?

থাক, থাক, ও-সব সদুপদেশে কাজ নেই, বুঝলে বাছাধন? যেমন আছ, তেমনটি থাকো। তার ওপর আর বাড়াবাড়ি কোরো না লক্ষ্মীটি। মেরে তাহলে হাড় গুড়িয়ে দেবো। ভালো কথা, দেরী নয়—আমি এখনই দোকানে যাচ্ছি—জেগে থেকো। যদি এসে দেখি, এবারেও ঘুমিয়ে পড়েচো, তবে—কি একটি ইংগিত করিতে গিয়া মণিলাল সহসা থামিয়া পড়িল। চকিতে ঘুরিয়া খিল খুলিবার উপক্রম করিতেই সরলা বাধা দিয়া বলিল,—গা ধুয়ে যাও।

না, না—সময় নেই। মধুকে বলে রেখেছি—সে পেছনের দোর দিয়ে চুপ করে গলিয়ে দেবে। আড়াইটের পর—আড়াইটের পর আর সে জেগে থাকবে না, আমাকে দৌড়ে যেতে হবে। কথা মত ঠিক থেকো।

মণিলাল ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

সরলা একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল স্বামীর পানে। হ্যাঁ, হাজার অপরাধ করিলেও সে স্বামী। দ্বিধা লজ্জার ধার না ধারিয়া পৃথিবীতে সে একটি মানুষের ওপর নির্ভর করিতে পারে—সে ঐ মণিলাল, নিজের বলিয়া কিছু পরিচয় দিবার স্থান থাকে তো—সে—ও ঐ মণিলালের গৃহ। লাঞ্ছনা পাক, প্রহার সহ্য করুক, মরিয়াও যদি যায়—বলিবার নাই। নারী সে—প্রথমেই মুখ তার বন্ধ করিয়াছে কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধ সমাজ। দ্বিতীয়—অন্ধসমাজ বিশ্বাসী বাপ-মা' তৃতীয়—দায় উদ্ধার করিয়া অধিকারের দাবীতে স্বামী। সে যেন পণ্য, এক হাত হইতে অন্য হাতে শুধু স্থানান্তরিত, শুধু বিক্রীত হইতেই এ সংসারে আসিয়াছে। নিজের সত্ত্ব সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রাণ তার আছে কিনা কে জানে? দেহই অস্তিত্ব এবং এই দেহ নিয়াই যতো গণ্ডোগোল।

কিছু দূর গিয়া মণিলাল আবার ফিরিয়া আসিল। কহিল, নাঃ তুমি যা বলেছিলে, নেহাৎ মিথ্যা নয়—গাটা ধুয়েই যাই। লক্ষ্মী মেয়ের মতো একবার সাবানটি নিয়ে এসো। যাও—দেরী করোনা; কী, উঠলে না যে। লাথি খাবার ইচ্ছে যদি না থাকে তো যা বলচি। ভালোয় ভালোয় কর।

সরলা উঠিল। স্বামীকে সৎপথে আনিবার আশা দুরাশা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ও ভুগিতে হইবে এই জঘন্য কাজের সংস্পর্শে আসিতে হইবে আজীবন।

একজনের পাপে কেন যে অন্যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ত নেই—এই খানেই এর সমাধি।

সাবান দিয়া সরলা কহিল,—খেয়ে যাবেনা?

খেয়ে যাবো, না, তোমার পিণ্ডি চটকাবো?

আমার পিণ্ডিত' রাতদিনই চটকাচ্ছো।

মুখ সামলে কথা ক'য়ো বলচি। খেয়াল থাকেনা কা'কে কি বলো? না, কিছু কইনে ব'লে একেবারেই মাথায় চ'ড়ে ব'সেছ?

সরলা চুপ করিল। মণিলাল পা ধুইতে চলিয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া সরলা শেষকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাত তিনটেয় দরজায় গোটা দুই তিন লাথি পড়িতে তাহারই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া তাড়াতাড়ি খিল খুলিয়া দিতে মণিলাল প্রবেশ করিল একটা বোতল নিয়া। স্ত্রীকে সজোরে ঘুষি মারিয়া কহিল,—এতো সকালেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি নবাবজাদী, আমার কথাটা গেরাহ্যিই হয় না? এবার মজা বোঝ বাছাধন।

সরলা পড়িয়া যাওয়ায় মাথায় তার আঘাত লাগিয়াছিল। দু'হাতে সে যায়গাটা চাপিয়া ধরিয়া সে কোনরকমে উঠিয়া বসিল। তারপর আস্তে-আস্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মণিলাল আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে বোতলের ছিপি খুলিয়া এক নিঃশ্বাসে বাকীটা নিঃশেষ করিয়া দিয়া জড়িতকণ্ঠে কি যেন বিড়্-বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিল।

২

স্ত্রীর হাতখানা নিজের হাতে নিয়া মণিলাল দুঃখিতস্বরে কহিল,—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। কা'ল তোমার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেচি, নয়?

সরলার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে কথা কহিল না।

মণিলাল বলিতে লাগিল,—একদিন তো ভালো ছিলাম সরলা! আফিসে খেটেখুটে শ্রান্ত হ'য়ে যখন ঘরে ফিরতাম, তোমার হাসিতে, তোমার সেবায় আমার সকল ক্লান্তি দূরে চলে যেতো, জীবন ভ'রে উঠতো নির্মল আনন্দে। সেদিন কতো সহজ, সরল ছিল এই জীবনের পথ! কতো সুখ ছিল ঘরে বাইরে! তারপর একদিন উঃ! কি কুক্ষণেই যে মদ খেতে আরম্ভ করলাম! তুমি কতো উপদেশ দিলে, কতো অনুনয়,—কি জানি কেন, তবু সুমতি হোল না। ধীরে ধীরে অজ্ঞাতেই নিজকে ডুবিয়ে দিলাম। কেন যে দিয়েছিলাম, তা-ও ভাবিনি। আজ আমি এ অবস্থায় প'ড়ে বুঝতে পারচি, কি করেচি এতোদিন। কি ক'রে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি! কিন্তু, সেরে ওঠবার পথ আর নেই সরলা, সে এখন অনেক দূর! সেদিন যা ধরেছিলাম, তার জের যে এখনো কাটাতে পারিনি! আমার চাকরী গেল। পেটের দায়ে নয়, নেশার দায়ে চুরি করতে লাগলাম। কাল খুন করেচি। আর নয়, তুমি আমাকে বাঁচাও সরলা। এ ঘৃণিত পথ থেকে বাঁচাও—তোমার স্বামীকে আবার পবিত্র ক'রে নাও—।

স্বামীর মুখে হাত-চাপা দিয়া সরলা কহিল—ছিঃ, কী যে বলো!

ঠিকই বলচি সরলা। এর মধ্যে গোপন রাখবার কিছুই নেই। অন্ধপথে আমি যাত্রা করেচি, এ পথ থেকে জীবনে হয়ত' আর ফিরতে পারবো না, যদি তুমি সাহায্য না কর। যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে না আনো তোমার সতীত্বের সোনার স্পর্শে। আজ আমি মাতাল। নিষিদ্ধ ঘৃণিত স্থানে আমার যাতায়াত—আমি চরিত্রহীন। আমি লোকের ঘৃণার পাত্র। মানবতার দিক থেকেও সমাজে আমার কোনো দাবি দাওয়া নেই। কারো সঙ্গে বড় ক'রে কথা কইতেও সাহস পাইনে। সব সময় সতর্ক হয়ে থাকতে হয়—পাছে কেউ সন্দেহ করে বসে, পুলিশে সংবাদ দ্যায়। কিন্তু কি হবে, নেশার জ্বালায় প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হ'য়ে ওঠে,—উঃ, বড় যন্ত্রণায় বেরিয়ে পড়ি। পেটের জ্বালা কতো তুচ্ছ এর কাছে! না খেয়েও চার পাঁচ দিন থাকা যায়। কিন্তু সময়মতো নেশার জিনিষ না পেলে এক দণ্ডও টিকে থাকা অসম্ভব; ভেতর থেকে পুড়িয়ে প্রাণ ছারখার করে দ্যায়—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে। পয়সা নেই, চুরি করতে রাস্তায় বের হয়ে যাই—সাবধানে টিপে টিপে পা ফেলে, চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি—হঠাৎ কেউ শব্দ শুনতে পায়, হঠাৎ কেউ দেখে

ফেলে; গাছের পাতা নড়লে চমকে উঠি—ঐ বুঝি বা কে এল! জোরে বাতাস বইলে মনে হয়, কেউ বুঝি অলক্ষ্যে আমার অনুসরণ করচে—অজানা আশঙ্কায় প্রাণ কেঁপে ওঠে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না, তন্দ্রাচ্ছন্ন-ভাবে স্বপ্ন দেখি—খুনের তদন্তে ঐ হয়ত পুলিস এল—ধরে আমাকে নিয়ে গেল—বিচারে হুকুম হোল—ফাঁসির—

তন্দ্রা ঘুচে যায়। চীৎকার ক'রে কেঁদে বিছানার ওপর লাফিয়ে দাঁড়াই। ছুটাছুটি করে দরজা খুলে পালাবার চেষ্টা করি। তুমি বাধা দাও। কোনোদিন তোমার কথা শুনি কোনোদিন হয়ত তোমাকে মেরে ঠেলে দিয়ে বের হ'য়ে যাই। আমাকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না সরলা। কিন্তু তুমি—তুমি কি করে বিশ্বাস করো? কী ক'রে এক বিছানায় আমার পাশাপাশি শোও? স্ত্রীলোক হ'য়ে কেমন ক'রে ঐ তুচ্ছ শক্তি নিয়ে মাতাল অবস্থায় আমাকে বাধা দিতে এসো? ভয় করে না তোমার? আর সকলের মতো হয়ত তোমাকে একদিন খুন ক'রে ফেলতে পারি, জানো, জানো সরলা?

উত্তেজিতভাবে মণিলাল স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল। সরলা শিহরিয়া উঠিল। তার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেছে, বুকের স্পন্দন যেন সহসা থামিয়া গেল।

মণিলালের চমক ভাঙিতেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ডাকিল—সরলা, সরলা!

নাঃ। কোনো সাড়া নাই। গা, হাত-পা ভালো করিয়া দেখিল, দেহের কোথাও উত্তাপ নাই, সবই যেন অসাড় নিস্পন্দ,—চোখের পাতা বুজিয়া গেছে। নাক দিয়া নিঃশ্বাসও পড়িতেছে না—সরলা তো মরিয়া যায় নাই? মণিলাল এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

খানিকখন বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া শেষে নাড়ী টিপিল। ধৈর্য্যের সহিত বার দুয়েক পরীক্ষা করিতেই সে আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল—নাঃ, এখনো প্রাণ আছে. মরিয়া যায় নাই তবে!

ঘরে মেটে কলসীতে জল ছিল। স্ত্রীর মাথায় জল ঢালিয়া বাতাস করিতে লাগিল।—যদি বাঁচে,—হে ভগবান, বাঁচাও। আমি মদ ছেড়ে দেবো। এজন্মে আর শুঁড়ীর বাড়ীর পথ মাড়াবো না। এই স্ত্রীর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করচি,—হে ভগবান, বাঁচাও ওকে। আর্ত্তকণ্ঠে মণিলাল শপথ করিল।

যাহোক, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সরলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কি যেন সে বলিতে গেল। কিন্তু স্বামীর নিষেধে পারিল না। মণিলাল কহিতেছিল—উঠোনা এখুনি, মাথা ঘুরে বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছিলে। আরো কিছুক্ষণ থাকো, শরীরটে সবল হ'য়ে উঠুক, তারপর যা যা ঘটেছিল—সব শুনবে।

রাত্রি দুটোর সময় মণিলাল নিঃশব্দে বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিল—সরলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। শীঘ্র যে জাগিবে, তার কোনো সম্ভাবনা নাই। সে আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়া জানলা খুলিল—বাহিরে জমাট অন্ধকার। পথে জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—সব নিস্তব্ধ। বস্তীর ওপাশে একটা কেরোসিনের বাতি তন্দ্রাজড়িত চোখে ঝিমাইতেছে,—তার ওদিকে, খোলাঘরগুলো ডিঙিয়ে, দূরের ঘুমন্ত পাষাণপুরীর মতো অট্টালিকা ছাড়িয়ে আরো বহুদূরে, মনে হয়, একটা কুকুর কাঁদিতেছে,—থাকিয়া থাকিয়া বাতাসে তাহার ক্ষীণ অস্পষ্টস্বর ভাসিয়া আসে। সম্মুখের আবছা ঝাউগাছটার পিছন দিয়া নিশাচর পক্ষী একটা ডানা ঝাপটিয়া উড়িয়া গেল। নাঃ, আর দেরী নয়, সে-ও নিশাচর। এই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকেও কাজ শেষ করিতে হইবে। দেরী হইলে অনেক বাধা ঘটিতে পারে। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মণিলাল মনে মনে। আবৃত্তি করিল—শুভস্য শীঘ্রং।

দরজার কাছে আসিয়া সে একবার স্ত্রীর শান্ত অমলিন মুখের পানে চাহিল। তারপর খিল খুলিয়া চুপিচুপি অন্ধকারে নামিয়া পড়িল।

৩

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে পৃথিবীর বুকে। সহরের শেষ প্রান্তে। লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গেছে অনেকখন।

সরলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। পাশের ঘর হইতে আসিয়া মণিলাল বিরক্ত ভাবে কহিল—সেই

থেকে কান্না আরম্ভ হয়েছে, এপর্য্যন্ত থামেনি। গলা টিপে ধরবো নাকি ?

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সরলা কহিল,—তা আর বাকী রেখেছো কী ?

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া মণিলাল বলিল, আজ ক'দিন থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখছি,—তোমার মুখ অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেচে। বুঝলে ? যদি বাঁচতে চাও বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। সব কাজেই বাধা দিতে এসো, আমাকে শিক্ষা দিতে চাও, কেমন ? সকলেরই ধৈর্য্যের একটা বাঁধ আছে, বুঝলে ? সেটা ডিঙিয়ে গেলেই যতো অনর্থ ঘটে। আমি নেহাৎ ভালোমানুষ ; তাই তোমার অত্যাচারের আবদার এতদিন সহ্য ক'রে এসেচি। অন্য হ'লে লাথিমেরে রাস্তায় বের ক'রে দিতো। কিগো, কথা বলচো না যে ! অভিমান হয়েচে, না, বোবা হয়েচ' ? ও-সব চালাকী আমার কাছে খাটছে না বাছাধন।.........হ্যাঁ, তোমরা হ'লে মেয়েমানুষ, তোমাদের ধাতই আলাদা। যেখানে একটু নাই পেলে, অমনি মাথায় চ'ড়ে বসবে। যেন একেবারে কর্ত্তা হ'য়ে বসেচ।......

সরলা মরিয়া হইয়া উত্তর দিল,—মাতালের মতো যা তা বকচ কেন, শুনি ? মাতলামির আর যায়গা পেলে না—?

• বেশি বকবক ক'রোনা। আমার রাগ তো জানো না, রাগলে একবার, কথা কওয়া তো অনেক দূর—চোখটি পর্য্যন্ত খুলতে হোত না, বুঝলে যাদু ? তোমাকে শর্ষের ফুল দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম।

সহসা স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া মণিলাল সুর নামাইয়া চুপিচুপি কহিল, রাগ হোল বুঝি ?

মদের বিশ্রী গন্ধ নাকে যাইতে সরলা ক্ষোভে দুঃখে স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—আহ্লাদ দ্যাখাতে হবে না, স'রে যাও এখান থেকে।

মণিলাল টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। সরলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নভাবে তক্তাপোষ হইতে নামিয়া দেখিল—অসহায় শিশুর মতো মণিলাল হাত-পা ছুঁড়িতেছে। বেড়া ধরিয়া বার দুয়েক উঠিবার চেষ্টা করিল। পারিল না। সরলা অতিকষ্টে স্বামীকে উঠাইয়া টানিতে টানিতে কোনো রকমে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল,—শুয়ে পড়।

মণিলাল ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল—তুমি শোবে কোথায় ?

আমি ? যেখানেই শুইনা কেন, তোমার কী ?

আমার কিছুই না। তুমি ম'রে গেলেও আমার দুঃখ নেই। এক বিছানায় শোবে না তাহ'লে ?

না।

ঘৃণা হয় ? চোখ বড়-বড় করিয়া মণিলাল সহর্ষে কহিল,—দ্যাখো, তোমার মতলবটা আর গোপন রইলনা, এবারে আমার কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। বিষটিষ খাইয়ে মারবার বন্দোবস্ত করোনি ত' ? কিগো মুখে কথা সরচে না যে। সত্যি কথা জানতে পেরেচি কিনা, জবাব দেবার ক্ষমতা কোথায় ? বুঝলে সখি, মেয়েমানুষ পেটে কথা ধরে রাখতে পারে না, পেট তাদের ফুলে ওঠে—তোমার কথা যে বেরিয়ে পড়বে এতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই,—হেঁ, হেঁ হেঁঃ !—

সরলা বিরক্তিভাবে উঠিয়া যাইতেছিল। মণিলাল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিল,—সোনামাণিক, উঠে যাচ্ছ যে ? ঘুম পেয়েচে, না, মতলব সিদ্ধি করবার উপায় খুঁজছ। তাইতো বলি, এতো তাড়াতাড়ি কেন ! এ হতভাগাকে যদি পৃথিবী থেকে নিতান্তই বিদায় দিতে চাও, তবে আর দুটো দিন সবুর করাই কি সঙ্গত নয় ? এতোকালের মায়ার বাঁধন—

স'রে যাও। নির্লজ্জের মতো বিরক্ত করোনা বলছি।

কি আমি নির্লজ্জ, আর তুমি হ'লে আমার লজ্জাবতী লতা ! আস্পর্দ্ধা দ্যাখো না ছুঁড়ীর ! বলতে লজ্জা করলো না ?

এমন কি রেখেছো যে লজ্জা করবে, স্বামী হ'য়ে তার মাথা অনেকদিন আগেই খেয়ে থুয়েছে—তা জানো ? রাতদিন জঘন্য ব্যবহার, কুৎসিত ভাষায় গালাগাল !

যতো বড় মুখ নয়, তত' বড় কথা ! পথের মাগী ছিলি, কুড়িয়ে এনেছি—তাই অতো আস্কারা পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বসেছিস—

কী, আমি পথের—?

রাগে-দুঃখে-অপমানে সরলা কাঁদিয়া ফেলিল।

মণিলাল বলিতে লাগিল,—পথের নয়ত' কী? নইলে প্রতিদিন আমি যখন ঘরে ঢুকি, ছায়াই পাওয়া যায় না হারামজাদীর। সেদিন সন্ধ্যে হ'তেই পা টিপে গিয়ে দেখি—বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে কার সাথে যেন হেসে হেসে ফিস্‌ফিস ক'রে কী বলচে! একদিন দু'দিন হ'লে না হয়, সহ্য করা যায়। রোজ রোজই যদি এরকম চলে, ক'জন স্বামী তা সহ্য করতে পারে? আমি নেহাৎ ভালমানুষ, কোনমতে তাই মুখ বুজে সহ্য ক'রে এসেছি, মনকেও বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতাম যে—সরলা আমার সে সরলা নয়! আজ দেখচি, ঘরে এতকাল সাপ পুষেছি। তলে তলে ষড়যন্ত্রও চলছে। বিষ খাইয়ে পথের কাঁটাকে পথ থেকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে দু'জনে মনের সুখে ভেসে পড়ি, কেমন? আচ্ছা মেয়েলোক! স্বামী ব'লে প্রাণে একটু মমতাও জাগেনা? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। তুই ডাইনী—তোকে ভালবেসে আমি অন্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলাম, দু'চোখে আজ তাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

থামিয়া কহিল,—এতে কান্না আসে কিসের, শুনি? দোষও করব, আবার কেঁদেও জিতবো। একি মগের মুল্লুক পেয়েচো?

সরলা উঠিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল। মণিলাল রাত বারোটা পর্য্যন্ত আবোল তাবোল বকিতে বকিতে শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রাবণ মাস। ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়া শেষরাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বাতাসের প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ধূলাবালির মতো বৃষ্টিকণা কোথায় যে উড়িয়া যাইতেছিল তাহার আর সন্ধান নাই।

আগো। সরলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ স্বামীর প্রহারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্ত্রীর ডান পায়ের ওপর সজোরে লাথি মারিয়া মণিলাল কহিল,—প্রাণে যদি বাঁচতে চাসতো ওঠ বলচি এখনো।

সরলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভীত ত্রস্ত দৃষ্টি মেলিয়া প্রশ্ন করিল,—কেন?

বাইরে যেতে হবে।

বাইরে যেতে হবে? কি বকচো পাগলের মতো? বাইরে যেতে হবে কেন?

না কোথাও যেতে হবে না, শুয়ে পড়। বলিয়া মণিলাল ফিরিয়া আসিয়া আবার নিজের যায়গায় শুইয়া পড়িল। সরলা তাহার পানে শুধু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল সে যখন পুনরায় শোবার উদ্যোগ করিতেছে, মণিলাল হটাৎ বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—কি উঠলিনে তবু? ওঠ শীগগীর।

যেতে হবে কোথায়? এই দুর্য্যোগের ভেতর কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

যমের বাড়ী।

যমের বাড়ী কেন?

তোকে দিয়ে আমার নেশা যোগাতে হবে। বুঝলি এবার? মণিলাল স্ত্রীর হাত ধরিয়া জোরে টান দিতেই সরলা উপুড় হইয়া গিয়া তাহার পায়ের ওপর পড়িল। কাঁদিয়া কহিল, স্বামী হ'য়ে নিজের স্ত্রীকে ঘরের বার করবে। তোমার এতোটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? এতোদূর অধঃপতন হয়েছে নেশা ক'রে?

কাণ্ডজ্ঞান আছে কি না আছে, সে-শিক্ষা তোর কাছে নিতে আসিনি হারামজাদী। ভলো চাস্‌তো আমার সঙ্গে চ'লে আয়। কই, উঠলিনে তবু? ইস্ পা জড়িয়ে ধরা হচ্ছে আবার! সঙ দ্যাখোনা ছুঁড়ীর! মায়াকান্না! তোর ও-মায়াকান্নায় মন গলবেনা, তা জানিস্!

তোমার প্রাণে কি এতোটুকু দয়ামায়া নেই?

না, নেই। বাঁচবার ইচ্ছে থাকেতো এখনো যা বলচি, তাই কর, নইলে এই খানেই শেষ ক'রে থুয়ে যাবো। কী যাবি? না,না?

স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া সরলা কঠিন স্বরে কহিল,—না, যাবোনা।

যাবিনে? তোকে যেতেই হবে। এই দেখেচিস্ তো? বলিয়া মণিলাল তার হাতের ধারালো চকচকে ছোরাখানা উঁচু করিয়া ধরিল।

সরলা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মুখ শাদা হইয়া গেছে। কোনোরকমে অস্পষ্ট-স্বরে কহিল,—শেষটা আমাকে হত্যা করবে?

করবো বৈকি। পৈশাচিক হাসি হাসিয়া মণিলাল কহিল,—আমার কথা না শুন্‌লে হত্যা করবো নিশ্চয়। তুইতো তুচ্ছ একটা পথের মেয়ে, যদি তোর মতো সর্ব্বনাশীকে মেরে ফেল্‌তে না পারি —

বাধা দিয়া সরলা কাতরভাবে কহিল,—মেরেই যদি ফেলবে এভাবে, তবে ঘরে এনেছিলে কেন?

ঘরে এনেছিলাম তোকে পুতুলের মতো আলমারিতে সজিয়ে রাখতে, নয়রে? তুই স্বামীর নেশার দিকে তাকাবিনে, যত্নআত্তি করবিনে—তোকে এমনি এমনি পুষবে কেরে? আমি আমি ইস্, বড় দায় ঠেকেচে আমার!

তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি স্বামী,—শেষ সময় অন্তত-পক্ষে একটা কথা আমার রাখো। মারবেইতো, এরকম নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলো না। বিষ খাইয়ে না হয় একেবারে শেষ ক'রে দাও।

মরবি। যেভাবে সেভাবে মরলেই হোল। তার আবার এতো পছন্দ কেনরে তোর? আর তুই মনে করলেইতো বাঁচতে পারিস!

আগাইয়া আসিয়া মণিলাল স্ত্রীর হাত ধরিয়া কহিল—কিরে, যাবি?

না। স্বামীর হাত ছাড়াইয়া নিয়া সরলা সক্রোধে মটীতে পা ঠুকিয়া কহিল,—বেরোও—বেরোও ঘর থেকে. আমার সুমুখ থেকে দূর হ'য়ে যাও এই মুহূর্ত্তে! সারা জীবনটাতো জ্বালিয়ে খেলে! যতোই কিছু না বলচি, ততোই মাতলামির মাত্রা দিন-দিন বেড়ে চলেছে—

কি বল্‌লি মাগী? উন্মত্তের ন্যায় মণিলাল স্ত্রীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কৌশলে স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া সরলা ছুটিয়া ঘর হইতে বহির হইয়া গেল।

ভাঙা দরজার পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মণিলাল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ঘরের কোণে পুরাণো বোতলে খানিকটা মদ ছিল। চক্-চক্ করিয়া সবটুকু সে নিঃশেষ করিল। তারপর ছোরা হাতে সেই দুর্য্যোগের ভিতর রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

—বিকট বিরহে—

(প্যারডি)

(মূল—মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে—)

শ্রীসৌরেশ চন্দ্র চৌধুরী

পিয়ন আসিয়া দিয়ে গেছে চিঠি
প্রিয়তম তুমি আসিবে।
হবে এ-হিয়া শান্ত যবে আসি পাশে
দন্ত বিকাশি হাসিবে।
দরশ-পরশ-পিয়াসী প্রাণ ত
চিঠির হরফে না হয় ক্ষান্ত,
কবে তুমি আসি পরাণ কান্ত
মনের ধ্বান্ত নাশিবে?

তব মর্ম্ম-মুকুরে প'ড়েছে রূপসী রূপেয়ার প্রিয়ছায়া,
হেথা, ত্যজিতে ব'সেছি আমি হা—হুতাশে
বিফল কায়ার মায়া;—
প্রাণ-মণ দেহ সবই উপবাসী
বুকে নাই বল মুখে নাই হাসি,
কবে তুমি আসি হুকাহাতে বসি'
প্রাণান্ত কাশি কাশিবে?

গ্রন্থ পরিচয়

যক্ষ্মা চিকিৎসা শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত,. প্রকাশক পুস্তকালয়, রাঁচি। মূল্য পাঁচসিকা। গ্রন্থকার নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, এবং যক্ষ্মারোগে ভুগিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 'এই পুস্তকে আমার দীর্ঘ ১২বৎসর রোগ ভোগের ফলাফল, নিজের ও অপরাপর অভিজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসার ফলাফল সহ হাসপাতাল," স্যানাটোরিয়ম, এ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও গৃহের চিকিৎসা সহ সাধু ও ফকিরের অদ্ভুত চিকিৎসা ও দৈব ঔষধের কাহিনী এবং অপরাপর সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।' স্বয়ং ভুক্তভোগী দ্বারা লিখিত হওয়াতে ১৩০ পৃষ্ঠার এই বইখানি যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যবহুল জ্ঞাতব্য গ্রন্থ হইয়াছে। বইখানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং রোগী তাহাদের রোগারম্ভে হাসপাতালে, স্যানাটোরিয়মে বাস লইয়া কিরূপ মুস্কিলে পড়েন এবং কি ভাবে চিকিৎসিত হইতে হয় তাহাও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থে, কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে এই তথ্যবহুল গ্রন্থখানি এ-রোগী মাত্রেই এবং এ-রোগীর হিতেচ্ছু যাঁহারা তাঁহারা ক্রয় করিয়া পাঠ করিলে গ্রন্থকারের শুভ ইচ্ছা সফল হইবে।

—০—

আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ, স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে ও জরা নিবারণে আর্য্য ঋষিদের উপদেশ বাণী। কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায় কবিশেখর এম-এস-সি প্রণীত। ১২৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ধন্বন্তরী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত—মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'দেশবাসী এখন বলবীর্য্যহীন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। ছাত্র সমাজে দৈহিক ও নৈতিক অবনতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এই সময়ে প্রাচীন ও বহুদর্শী আর্য্যঋষিদের উপদেশবাণীর কথা তাহাদের নিকট শুনাইলে কিছু শুভফল হইলেও হইতে পারে, এই আশায় পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম।' ১০২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি স্বাস্থ্য তত্ত্বের বিবিধ কথায়, শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেবা কি ভাবে করিতে হয়, কোন ঋতুতে কি খাওয়া বিধেয় ইত্যাদি বিষয় আয়ুর্ব্বেদের দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য কি অমূল্য সম্পদ তাহা যাহারা বোঝেন এবং স্বাস্থ্য রক্ষণে যাহাদের স্পৃহা আছে তাহারা এই উপদেশের বইখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে পারেন। এ উপদেশগুলি যথাসম্ভব পালন করিলে স্বাস্থ্য লইয়া ভাবিতে অনেক কম হইবে একথা বলা যায়।

—০—

'বিপদের বেড়াজাল' শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর বি-এ প্রণীত। প্রকাশক এম-সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দাম আট আনা, শিশু-উপন্যাস। এই বইখানিতে পরপর কতকগুলি বিপদ আসিয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার চমকপ্রদ বৃত্তান্ত আছে। অথচ বিপদের প্রথম সূচনা একখানা পুরোণো ছবির মধ্যে অত অসংখ্য অর্থই বা আসিল কি করিয়া এবং তাহার জন্য ক্রমাগত বিপদই বা আসিতে লাগিল কি করিয়া তাহার কোন সুসঙ্গত কারণ নাই। এ্যাডভেঞ্চার লইয়া শিশু উপন্যাস লিখিতে গেলেই যে এমনি আচম্কা বিপদের আমদানি ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সৃষ্টি করিতে হইবে গ্রন্থকারকে তেমন দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই আমরা বলি। ধীরেন্দ্র বাবুর এই সিরিজের প্রথম বই মৃত্যুর পশ্চাতে পড়িয়া আমরা যতটুকু খুসী হইয়াছিলাম এ 'বেড়াজালে' পড়িয়া তেমন খুসী হইতে পারি নাই। তবে যাহাদের জন্য রচিত সেই শিশুরা হয়তো সাময়িক একটু আনন্দ পাইতে পারে। গ্রন্থের সাজ সজ্জা ভাল।

—০—

'মানময়ী গার্লস কলেজ' সুশীল-রায় প্রণীত, ১৫, কলেজ স্কোয়ারে, জে-সি-ব্যানার্জ্জিতে প্রাপ্তব্য, দাম আট আনা। নাট্যকার নাকি তিন কাপ চা ও এক পাকেট সিগারেট ফুঁকিয়া মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাট্যখানি লিখিয়াছেন, প্রকাশক এইরূপ জানাইয়াছেন, স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মানময়ীর উপসংহার বহু আরম্ভ হইয়াছে। এ গার্লস কলেজের প্রথম দিকটা তবু একরূপ হইয়াছে কিন্তু অর্দ্ধপথেই সে গতিটুকুও থামিয়া গিয়াছে—তারপর যাহা আছে তাহা অলিখিত হইলেও ক্ষতি ছিলনা। গ্রন্থকার বা প্রকাশক অত তাড়া না করিয়া একটু ধীরে আস্তে বই খানি লিখিলেই পারিতেন—আর 'অরিজিনল'ই তো ভাল—উপসংহার কেন?

স্বরলিপি

ভৈরবী—কাফা

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগো কিশোরী মেয়ে
জাগো কিশোরী মেয়ে!
আমি এসেছি আজি
সখি তোমারে চেয়ে!
তোল আনন খানি
কও না-বলা বাণী
চাও নয়ন মেলি
ওগো কিশোরী মেয়ে!
গাঁথ বকুল মালা
এলো তরুণ ফাগুন
এলো মনের বনে
এলো জ্বালাতে আগুন;
ভোলো অতীত স্মৃতি
গাও নবীন গীতি
পর মিলন-রাখী
ওগো কিশোরী মেয়ে!

আস্থায়ী

+ 0 + 0
(সা ঋ) II ণা সা জ্ঞা মা | পা -া পা পমা I পা ণা দা পা | মা -া মা মা I
জা গো কি শো রী মে | য়ে ০ জা গে০ কি শো রী মে | য়ে ০ আ মি

জ্ঞা দা পা মা | জ্ঞা রজ্ঞা মজ্ঞা মা I রা জ্ঞা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
এ সে ছি আ | জি ০০ স০ খি তো মা রে চে | য়ে ০ -০ ০

অন্তরা ও আভোগ

(দা পা) II জ্ঞা মা দা ণা | র্সা -া র্সা র্সা I পা দা ণা র্সর্ঋা | র্সা -া র্সা র্সা I
তো ম আ ন ন খা | নি ০ ক ও না ব লা ধা ০ | গী ০ চা ও
ভো ল অ তী ত স্মৃ | তি ০ গা ও ন বী ন গী ০ | তি ০ প র

ণা র্ঋা র্সা ণদা | পা -া ক্ষা মা I রা জ্ঞমা মজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
ন য় ন মে ০ | নি ০ ও গো কি শো০ রী০ মে | য়ে ০ ০ ০
মি ল ন স্না ০ | খী ০ ও গো কি শো০ রী০ মে | য়ে ০ ০ ০

সঞ্চারী

(সা সা) প্া দ্া ণা সা | রা -া রা রা I রা রা রসা রা | জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I
গাঁ থ ব কু ল মা | লা ০ এ লো ত রু ণ ০ ফা | গুন্ ০ এ লো

জ্ঞা মা মপা মপা | জ্ঞা -া ঋা সা I ণা সা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I
ম নে র০ ব ০ | নে ০ এ লো জ্বা লা তে আ | গু ন ০ ০



বৃহদ্বঙ্গে বাঙ্গালার সংস্কৃতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বাঙলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাভাষার আলোচনার জন্য বাঙ্গালীর কোনরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। লোকে তখন বাঙ্গালা-সাহিত্যই পড়িতে চাহিত না। ইংরেজী সাহিত্যও সামান্য কয়জন শিখিয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষ পাদে সাহিত্যিক আলোচনার জন্য যখন কলিকাতায় Asiatic Society of Bengal প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে ১৭৮৪ সালের কথা। তারপর ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়ম' কলেজ স্থাপিত হইল। সেখানে পণ্ডিতও নিযুক্ত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালা বই লিখিলেন। সেগুলি ছাপাও হইল। শ্রীরামপুরের পাদরীরাও বাঙলা বই ছাপিলেন। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় বেদান্তের বাঙলা তর্জ্জমা ছাপিলেন। পর বৎসর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য চারখানি Steeleograph দিয়া 'অন্নদামঙ্গল' ছাপিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হইয়া গেল। ১৮১৭ সালে Calcutta School Book Society স্থাপিত হইল। ইহাদের উদ্যোগে অনেক পুস্তকের প্রচারও হইল। ১৮১৮ সালে হরচন্দ্র রায় Bengal Gazette ছাপিলেন। পাদরীরা 'সমাচারদর্পণ' ছাপিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চন্দ্রিকা' বাহির করিলেন, সংস্কৃত বই ছাপিলেন, সংস্কৃত বইএর বাঙলা তর্জ্জমা করিলেন। এই রকম করিয়া বাঙলার বেশ প্রচার হইতে লাগিল। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'য় ধর্ম্মান্দোলন চলিতে লাগিল। এই সময় ডিরোজিওর খুব নাম। ইংরেজী পড়ার ছাত্রও অনেক। ছাত্রদের লইয়া ইংরেজীতে সাহিত্যালোচনার জন্য মাণিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ীতে এক সভা করিলেন। নাম দিলেন Academic Association; স্থাপনাব্দ ১৮২৮খৃঃ। তারপর Epistolary Association হইল। যেমন হওয়া তেমনি মরা। ১৮৩৮ সালে Society for the Acquisition of General Knowledge খোলা হয়।

১৮৪০ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি 'সামাজিক সভা' নামে একটী সভা স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে Vernacular Literature Societyর প্রতিষ্ঠা। এই সোসাইটী হইতে ৩৮২ খানি বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটী শেষে স্কুল বুক সোসাইটীর সহিত মিশিয়া যায়। ১৮৫১ সালে 'বীটন সোসাইটীর' জন্ম। ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা হয় ইহার পর আর কোন সাহিত্যিক সভার কথা জানা যায় না। ১৮৭২ সালে বাঙলাদেশের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর জন বীমস বাঙলাদেশে একটি সাহিত্যিক সভা বা Academy of Literatureএর যে বিশেষ প্রয়োজন তদ্বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমবাবু তাহা ১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বঙ্গভাষায় হিতসাধনের জন্য সভা প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করেন। বীমস বলেন "...বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালীর মিলিত সভা স্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক, যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার পরমোপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না, এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক। ইউরোপীয় একাডেমীতে প্রায় ৫০জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এদেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক অতএব বঙ্গ একাডেমীর শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা

রাজধানী, অতএব আদি সভ্য কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০জন সভ্যের তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্যগণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।"

জন বীমসের লেখাটী ১৮৭২ সালের Bengal Christian Herald পত্রে ইংরাজীতেও বাহির হইয়াছিল। ঐ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে Indian Daily News তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিল। ১২ই আগষ্ট তারিখের Hindu Patriot এ বীমস সাহেব 'একাডেমী অফ লিটারেচার' সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করেন।

ইহার পর ১২৮৫বঙ্গাব্দে বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক নিবন্ধে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। অতঃপর ১২৮৭ সালের ২৮শে ফাল্গুন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ঢাকা জয়দেবপুরে কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের সাহায্যে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম হয় 'সাহিত্য সমালোচনী সভা'। ইহার একটি অধ্যক্ষ-কমিটীও স্থাপিত হয়। এই কমিটির সভ্য ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

ইহার পর ১৮৮১ সালে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সাহিত্য-সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ১৮৯১ সালে Good Will নামক পত্রের এক সংখ্যায় তিনি পুনরায় এ বিষয়ের আন্দোলন করেন। কিন্তু তাহাতেও সুপ্ত বাঙ্গালী জাতির নিদ্রা-ভঙ্গ হয় নাই।

জন বীমসের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য ১৮৯৩ সালের ২৩শে জুলাই রবিবার কলিকাতায় ২।১ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণের ভবনে এক সভার অধিবেশন হয়। ফলে Bengal Academy of Literature এর জন্ম। এই সভার দ্বাবিংশ অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ও এই মর্ম্মে এক পত্র দিয়াছিলেন। তদনুসারে ইংরেজী নামের সহিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' নাম রাখা হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় এসিয়াটিক সোসাইটী ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন। এই সাহিত্য-পরিষৎ দেশে সাহিত্য সেবার আন্দোলন করিয়া ভারতের সমস্ত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে'র সৃষ্টি। এই সাহিত্য-সম্মেলন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা অনুস্যূত করিয়া দেয় তাহারই ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে'র সৃষ্ট হইয়াছে।

এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন একটু মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতি বৎসরই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন নিয়মিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকল দিক্ দিয়াই এই সম্মেলনের সার্থকতা আছে। এখন প্রবাসে কেন, নিজ বাসভূমেও বাঙালী নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে; বাঙালীর সংস্কৃতিতে, বাঙালীর শিক্ষায়, বাঙালীর দীক্ষায়—সব এই আজ সমস্যা, এমন কি অন্নসংস্থানেও বাঙালী আজ শোচনীয়ভাবে নিষ্পেষিত। বৃহদ্বঙ্গে এই সমস্যার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীকারের চিন্তা ও উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয়, প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনই তাহা সম্ভব। ইহা শুধু সাহিত্য সম্মেলন নহে, বৃহদ্বঙ্গে বাঙালীর বহুবিধ সমস্যা-সমাধানের একটী আলোচনাক্ষেত্র। বাঙালার সংস্কৃতি-রক্ষাই বৃহদ্বঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই সংস্কৃতি অন্ধ শ্রদ্ধার দিক দিয়া রক্ষণীয় নহে, সংস্কারের দিক দিয়া তাহাকে বলশালী করিয়া তুলিতে হইবে। বৃহদ্বঙ্গে বাঙালীকে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্মুখীন হইতে হয়; সুতরাং তাহাকে প্রথমতঃ অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই প্রতিকূল অবস্থাই তাহাকে উদার করিয়া তুলিতে পারিবে, বঙ্গ-জননী তাঁহার প্রবাসী সন্তানের এই গৌরবেই গরীয়সী হইয়া উঠিবেন। আমাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে একমাত্র প্রবাসী বাঙালীরাই পৌরোহিত্য করিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগে প্রাদেশিকতার-দ্বন্দ্বে ভারত আচ্ছন্ন। প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে সমাজ ও বর্ণ বিদ্বেষ-বহ্নির শোচনীয় পরিণতি, কিন্তু এক্ষণে প্রাদেশিক বিদ্বেষের যে বহ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে তাহাতে কোন প্রদেশেরই মঙ্গল নাই।

প্রবাসী বাঙালীর এখন এক বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্কটের প্রতীকার একমাত্র তাঁহাদেরই উপরে নির্ভর করে। ঔদার্য ও সহিষ্ণুতাই তাঁহাদিগকে এখন রক্ষা করিবে। যে গুণে বাঙ্গালী বৃহদ্‌বঙ্গে গৌরবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যাহার জন্য বঙ্গজননী তাঁহার প্রবাসী সন্তানগণের কৃতিত্বে গৌরবান্বিতা, সেই গুণেই বাঙ্গালী এই সঙ্কট হইতে কালে উত্তীর্ণ হইবে।

একতা ও দৃঢ়তায় পরস্পর কাজ করিতে হইবে। এই সম্মেলন গৌণভাবে ইহার সহায়তা করে বা করিতে পারিবে; দিল্লী, কাশী, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই বাঙালীর সংখ্যা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার উপযোগী এবং এই সকল স্থানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। সরকারী চাকুরীর ভাগবাঁটোয়ারায়ও বাঙালীর ক্ষোভ বাড়িতেছে; কিন্তু স্বদেশের অবস্থা চিন্তা করিলে তাঁহাদের সে ক্ষোভের কারণ থাকিবে না। বাঙলা দেশেও চাকরীর ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন এক-চেটিয়া স্বত্ব নাই, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বাঙালী হিন্দুর অবস্থা আজ আপনাদের অপেক্ষাও শোচনীয়। সুতরাং যাঁহারা উচ্চ বৃত্তির আশা করেন তাঁহাদের যোগ্যতা সত্ত্বেও অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হইতে হয়। তবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রভৃতি ক্ষেত্র এখনও যোগ্য ব্যক্তির জন্য অবারিত, প্রবাসী বাঙালী সেই ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশের পশ্চাতে নহেন। চাকুরীর যখন এই অবস্থা, সমস্ত বাঙলা এমন কি সারা ভারত জুড়িয়াই এখন বেকার-সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা না হয় পরাধীন জাতি—কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন জাতিদের মধ্যেও অন্নসমস্যা বড় কম নয়। সেখানেও বেকারদের মিছিল ভাঙিয়া দিতে পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়। বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করিলে স্বতঃই আমার মনে একটা কথা জাগিয়া ওঠে,—বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কি এদেশে বেকারসমস্যা ছিল না? হয়তো ছিল, কিন্তু ইতিহাস ইহাতে আদৌ সায় দেয় না, এই তীব্র বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান যুগেরই সৃষ্টি। ফলতঃ কলকারখানার সৃষ্টি হইতে ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, আর তাহা হইতেই বেকার-সমস্যা। অনেকে বলেন—ব্যবহারিক শিক্ষা দরকার, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীও এই জন্য দোষী নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে যে এই সমস্যার সমাধান হইবে এমন মনে হয় না। তাহা যদি হইত, ইউরোপ ও আমেরিকায় এত হট্টগোল হইত না। আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা-প্রণালীই আমাদিগকে বেকার করিয়া তুলিয়াছে, ইহা পশ্চিমেরই সৃষ্টি। বিলাসিতায় আমরা আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া যে শুধু বেকার হইয়াছি তাহা নহে, বাঙালী আজ নিঃস্ব কাঙালী সাজিয়াছে। অবশ্য আমি কাহাকেও প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি না। আর তাহা যদি সম্ভব হইত বরং ভালই হইত। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—The world is too much with us, কিন্তু বাঙালী তাহাও নয়,—ভোগের কিছুই পায় নাই। অথচ ভোগের মোহে আত্মশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানের আর একটি উদ্দেশ্য—প্রবাসে পরস্পরের সঙ্গে বৎসরে অন্ততঃ একটীবার মিলন ও ভাবের আদানপ্রদান। এই দিক্ দিয়া এই সম্মেলনের বিশেষ সার্থকতা আছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—আমাদের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া থাকে। ভারতের নানা অংশ হইতে আজ প্রতিনিধিবৃন্দ যে সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা এই সম্মেলনের সার্থকতা সম্পাদনে সাহায্য করিবে।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য প্রবাসী বাঙালীরা যাহা করিয়াছেন তাহাতে গৌরব বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নিরুদ্যম হইয়া পড়িলে চলিবে না। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সংস্কৃতি ও ইতিবৃত্তের ধারা বাঙলায় প্রকাশ করিতে প্রবাসী বাঙালীর যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে। ইহাতে প্রাদেশিক প্রীতি বৃদ্ধিরও সহায়তা হইবে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাও সমৃদ্ধ হইবে।

প্রবাসী বাঙালী-সমাজ সুদূর অতীতে ও বর্ত্তমান বৃটিশ আমলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতিতে কি কি দান করিয়াছেন এবং সেই সেই দানে দেশ কতটুকু লাভবান হইয়াছে অথবা দেশ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমাদের ভবিবার বিষয়। অতীতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বাঙালীকে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। সুমাত্রা, যাভা, শ্যাম, ইণ্ডো-চীন প্রভৃতি বৃহত্তর ভারত তথা বৃহত্তর বঙ্গের যে পরিচয় বহন করিতেছে তাহা সুপ্রাচীনকালেও বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনের সাক্ষ্য দিবে।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের দীপালোকে সমস্ত এশিয়াখণ্ড যাঁহারা উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বাঙালী ছিলেন। আজ তিব্বত, শ্যাম, বর্ম্মা, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বৌদ্ধ ভিক্ষু শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙালী ছিলেন। দীপঙ্কর আজিও তিব্বতে দেবতা রূপে পূজিত হইতেছেন। মুসলমান রাজত্বের সময়েও বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যগণ বৃন্দাবনে বাঙালারই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ অভ্যুদয়ে ভারতে যে নবযুগের সূচনা হয় নব্য বাঙালী সেই নবযুগের ঋত্বিকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং বাঙালার সাহচর্যে ও সহায়তায়ই সমগ্র ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। বাঙালী শতাধিক বর্ষকাল সমগ্র ভারতে শিক্ষাদান ও যুগোচিত জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচারেও বাঙালী কার্পণ্য করে নাই। নানা দেশীয় রাজ্যের সংস্কার ও যুগোপযোগী সংগঠনে বাঙালী নানা দেশীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠার সহিত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

সুতরাং প্রবাসী বাঙালী সমাজের দ্বারা যে বাঙলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। বাঙলার বাহিরে অর্থোপার্জ্জনের ও আহরণের চেষ্টায় বাঙালীর অন্নসমস্যার জটিলতা যে কিয়ৎপরিমাণে অথবা কিছু দিনের জন্য নিরাকৃত হইয়াছে, অভিশপ্ত দুর্গত বাঙ্গালীর নিকট ইহা আশার বাণী সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রাদেশিক সমস্যা যতই তীব্র হউক, প্রবাসী বাঙ্গালী আজও সগৌরবে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

ভৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীকে হয়তো নানা কারণে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। এক্ষনে বাঙ্গালীর পক্ষে ঘরে ও বাহিরে কোথাও মর্য্যাদা বা অর্থাগমের সুবিধা নাই সত্য, কিন্তু গঠন মূলক কার্যে বাঙ্গালী-প্রতিভার যে দরকার তাহা এখন সকল প্রদেশ স্বীকার করে; নব নব আলোকে বাঙ্গালী আপনার প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিয়া পাইবে। গতানুগতিক ছন্দে কালক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। অন্ন-সমস্যার এই জটিলতায় বাঙ্গালী স্বীয় উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

বাঙ্গালার সহিত অন্যান্য প্রদেশের যোগসূত্র স্থাপনে প্রবাসী বাঙালীর স্থান সকলের উপরে। বাঙলার সংস্কৃতির প্রভাব সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেই সংস্কৃতিধারার প্রসারেই বাঙালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। মিথ্যা দম্ভ কোন জাতিকে জয়ী করিতে পারেনা, আপনাদের মধ্যে কোন মহত্ব না থাকিলে কালের ক্রোড়ে আমাদের কোন স্থায়ী আসন থাকিবে না। বাঙলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভারতের নানা জাতির ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কথা লিপিবদ্ধ করিলে এদিকে যেমন আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সহিত আমাদের প্রীতির সম্বন্ধও সুদৃঢ় হইবে।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাঙালী ভাব-প্রবণ জাতি। শিক্ষার অজুহাতে বাঙালী যে পথে চলিয়াছে তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ হানি হইবে। এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, জীবন যাত্রার প্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ফলপ্রদ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন যাত্রার সংস্কার চাই—চাই নূতন শিক্ষা। শিক্ষা ও ভৃত্তি একসঙ্গে আর চলবেনা। বিদেশী আদর্শ ও বিদেশী সরকারের আওতায় বাড়িবার যে চেষ্টা শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাহার সংস্কার একান্ত বিধেয়। অধুনা যে শিক্ষা প্রদত্ত

হইতেছে-তাহা নিতান্তই প্রয়োজন. কিন্তু তাহাতে কাজ হইবেনা। আজও শিক্ষা জনসাধারণকে স্পর্শ করে নাই, যদি করিত তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর শিক্ষক, সাংবাদিক এবং লেখক বৃহত্তর জগতের সহিত নানা যোগসূত্রে পল্লীকে আনিবার কাজ পাইত। শিক্ষা-সংস্কারের মূল সূত্র খুজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সম্প্রতি শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে নানা কথা উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্টে পক্ষ হইতেও একটা খসড়া প্রচারিত হইয়াছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আমাদের দেশের শতকরা লিখনপঠনক্ষম জন সংখ্যার কথা ভাবিলে, এই শিক্ষা যে, পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা বলা যাইতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছুতেই পর্য্যাপ্ত নহে। বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীও লোভনীয় নহে সুতরাং ইহার যথাবিধি সংস্কার করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। যাহারা বর্ত্তমান অন্ন সমস্যা বা বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিতে চান, তাঁহারা কিছুতেই বিষয়টি তলাইয়া দেখেন নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা ত্রুটিপূর্ণ এইরূপ মত অনেকেই পোষণ করেন, যেহেতু ইহাতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবেনা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বেকার সমস্যার সমাধান নহে। দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সংস্কৃতির প্রসারই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। অবশ্য শিক্ষাধারায় বর্ত্তমান কালোপযোগী সংস্কার বিধেয়। অন্যান্য স্বাধীন ও ধনশালী দেশেও বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী নিশ্চয়ই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উন্নত। তথাপি সেই সকল দেশে এমন কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অন্ন সমস্যা তথা বেকার সমস্যা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহাই হউক, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির নানা দিক্ দিয়া সংস্কারের প্রয়োজন আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সর্বাগ্রে দেখা যায়, দেশের শিক্ষা সমাধানের জন্য ত্রিবিধ শিক্ষার প্রয়োজন—(১) সাহিত্য (২) বিজ্ঞান ও (৩) বৃত্তিমূলক বা কার্যকরী শিক্ষা। নানা কারণে এখনও আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের দিক্ দিয়াও অনেক কথা বলা যায়। মোটের উপর শুধু প্রথমোক্ত শিক্ষানীতিই মুখ্যভাবে এই দেশে গৃহীত হইয়াছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রণালী অর্থ ও সুযোগের অভাবে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করিলেই যে অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে তাহা বলা যায় না। আমেরিকা ও ইউরোপের উদাহরণ দেখিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমাদের বাঙলা দেশেরই অনেক যুবক বিদেশ হইতে বৃত্তিমূলক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করিয়া এই দেশে আসিয়া শোচনীয়ভাবে অন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। আসল কথা, এই সমস্যার সমাধানে ধনী ও দরিদ্র, ধনিক ও শ্রমিক—প্রত্যেকেরই যোগাযোগ চাই। যাহাদের টাকা আছে অর্থপ্রদ শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাহা নিয়োগ না করিলে ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যর্থ হইবে কারণ ব্যবহারিক শিক্ষাই অর্থ আনিবে না। যাহারা ব্যবহারিক শিক্ষা করিবে তাহাদের কাজ চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে শুধু প্রধানতঃ সাহিত্য জ্ঞানচর্চ্চামূলক শিক্ষার দিকে দলে দলে যুবকদল অগ্রসর হইতেছে, ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এই স্রোত থাকিবে না। শুধু সত্যই জ্ঞানচর্চ্চা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। সুতরাং আজ যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ক্ষুন্ন হইয়া গেল বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি তখন যাহাদের জন্য আদর্শ ক্ষুন্ন হইল, তাহারাই বিভিন্ন কর্ম্মশক্তি বিকাশক কেন্দ্রে কার্য করিয়া যশস্বী হইবে। অন্নসমস্যার সমাধানও অনেকাংশে হইবে। তাই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধনিক দলের সম্মিলিত চেষ্টা চাই। বিশ্ববিদ্যালয় ইহার মধ্যবর্ত্তী পথে দাঁড়াইতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীরও সংস্কার আবশ্যক। সম্প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতি (The Bengal Education League) এই সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছেন. আমার মনে হয় তাহা সমীচীন।

বাঙ্গালীর একত্ববোধের প্রধান অবলম্বন এই বাঙ্গালা ভাষা, অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন এই বাঙ্গলা ভাষার ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইতেছে, যদি কথাটা সত্য হয়, তাহা

হইলে কি প্রত্যেক বাঙ্গলা ভাষাভাষীর ভাষা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত নয়? ইহাই যে আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে ভাবনার বিষয়—বর্ত্তমান অপরিপুষ্ট অবস্থা নয়, কারণ অপরিপুষ্ট ভাষা কালে পরিপুষ্ট হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাবনার বিষয় হইতেছে আভ্যন্তরীণ বহুবিধ বাধা ও দ্বন্দ্ব। এই সকল দ্বন্দ্বকে ঠেলিয়া দিয়া ভাষা বড় হইতে পারিতেছে না, পক্ষান্তরে ভিতরে ভিতরে হীনবল ও আত্মপ্রত্যয়বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে। যে সকল আভ্যন্তরীণ বাধা ও দ্বন্দ্ব অধুনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সে গুলি হইতেছে—(১) প্রাদেশিকতা—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ, (২) সাধু ভাষা ও কথিত ভাষায় অমূলক দ্বন্দ্ব; (৩) হিন্দি, ইংরেজি ভাষার চাপ এবং (৪) মুসলমানদের দাবী। এইগুলির প্রতীকার করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষার উপযোগিতা বিশেষ বিশেষ প্রদেশের মধ্যে যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সকল প্রদেশের সহিত যোগ রাখিয়া যদি ভাষাকে চলিতে হয় তাহা হইলে একটি আদর্শের প্রয়োজন। ভাষার এই আদর্শ সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। আদর্শ অনুসারে ভাষা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এমনি করিয়া ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে আমাদের তদনুরূপ করিতে হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অন্তরায় বিদূরিত হওয়া কালসাপেক্ষ। জাতি যদি তন্দ্রাভূত না হইয়া জাগ্রৎ ও সতর্ক হয় তাহা হইলে এই উভয় দ্বন্দ্ব অবিলম্বে মিটিয়া যাইবে।

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, ভারতের জন্য রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন, আর সেই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযোগিতা যখন একমাত্র হিন্দিরই রহিয়াছে তখন তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবে না কেন? ইহা পক্ষপাতশূন্য বিচার নয়। ভারতের যদি কোন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে বঙ্গভাষার সহিত হিন্দির তুলনা করিতে হইবে। আমি বাঙ্গালী বলিয়া একথা বলিতেছি না যে বাঙলার দাবী হিন্দী অপেক্ষা বেশী। আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি, ভারতীয় বহু ভাষার সহিত আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে হিন্দীর সাহায্যে সারা ভারতে অনায়াসে পর্যটন করা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দীতে আরবী, ফারসী শব্দসম্ভার-ভঙ্গী এত বেশী এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের কথ্য ভাষার ভঙ্গী এত বহুমুখী যে উত্তর ভারতের ভাষার সহিত ইহার যোগসূত্রের অবকাশ বঙ্গভাষা অপেক্ষা বহু অংশে অল্প। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তুলু, তেলুগু, কন্নড় ও দখিণী ভাষায় বাঙলার বাক্‌ছন্দ, শব্দযোজনভঙ্গী ও শব্দাবলী হিন্দী অপেক্ষা বহুগুণে উপযোগী। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বাঙ্গলা বুঝিবে না, কিন্তু বুঝাইবার উপক্রম করিলে বাঙ্গলা যত সহজে বুঝিবে হিন্দী তত সহজে নয়।

সম্প্রতি বঙ্গাক্ষরকে বর্জ্জন করিয়া তাহার স্থানে রোমান লিপি প্রবর্ত্তনের একটা প্রস্তাবও হইয়াছিল। সব জগতে এক লিপি বিস্তারের পক্ষে অবশ্য রোমান লিপির উপযোগিতা যে সকল লিপির চেয়ে বেশী তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। ইহাতে সুবিধা সকলের হইবে যদি জগৎ শুদ্ধ লোক একই বর্ণমালা অনুসরণ করে। জগতের বিভিন্ন বিভিন্ন জাতিও যদি এক জাতি হইয়া যায়—একই রকম পরিচ্ছদ পরে, একই রকম খায়, একই ভাবে চলাফেরা করে তাহা হইলে আরও সুবিধা হইতে পারে। গণ্ডীর প্রসার যত বাড়ান যায় সুবিধা তাহাতে তত বেশী সন্দেহ নাই। নীতি যত উদার হয় ততই সুফল প্রদান করে। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বাতন্ত্র্য বলিয়া একটা কিছু আছে যাহা দেশ বা জাতি নিতান্ত নাচার না হইলে ছাড়িতে চায় না। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরম বিরোধী মেটার্নিকও বলিয়াছিলেন Liberalism has erased nationality from its catechism, অর্থাৎ তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের যত ক্ষতি করিয়াছেন তথাকথিত Liberalism তাহার অধিক করিয়াছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যে কুঠারাঘাত করিয়া ঔদার্য্য বৃদ্ধি পাওয়াই কি বাঞ্ছনীয়? End না করিয়া কি mend করা ভাল নয়? টাইপো-পদ্ধতির জন্য বঙ্গাক্ষরের

তো কিছু সংস্কার হইয়াছে, সর্ব্বাজনীনতার জন্য না হয় আর একটু ভাল করিয়াই হউক।

বাঙ্গলা ভাষা দিন দিন সমৃদ্ধতর হইতে চলিয়াছে। অধুনা বঙ্গভাষা ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার অভাব অভিযোগ এখনও অনেক। বাঙলায় সকলের পরিবার উপযোগী একখানি ইতিহাস, ভূগোল বিজ্ঞান আজও রচিত হইল না। গবেষণাকারীদের গবেষণাকার্য্যে সাহায্য করিতে পারে নজীরের এমন কোন গ্রন্থ বাঙলায় নাই। প্রাদেশিক শব্দ প্রয়োগের অভিধান, ঐতিহাসিক কোষ, বিজ্ঞানসম্মত মহাকোষ Encyclopaedia বাঙলাভাষায় পাওয়া যায় না। শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বসু কিছু অগ্রসর হইয়াছেন। এখন সকলে মিলিয়া বাঙলাদেশের জন্য এই সমস্ত বিষয়ে অথবা এইরূপ দেশহিতকর বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া কিছু কাজ করুন ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে উনচল্লিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে একখানি কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একের চেষ্টায় এ কার্য সম্ভবপর নহে. সমবেত প্রযত্নের প্রয়োজন।

অধুনা বাঙ্গলা চলিত ভাষায় অনেক কথার বানান লইয়া বড়ই গোলযোগ। চলিত ভাষায় নানা লেখক নানা রীতিতে বানান করেন। বাঙ্গলা শব্দ বিশেষতঃ চলিত ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের বানান-পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া বানান নিয়ন্ত্রিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইসব বানান লইয়া গ্রন্থরচয়িতা, সাধারণ পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই পদে পদে সংশয়ে পড়িতে হয় সুখের বিষয় ও আশার কথা সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

অনেকদিন ধরিয়াই বাঙলাভাষায় পরিভাষা সঙ্কলনের চেষ্টা চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ অনেকগুলি পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। 'প্রকৃতি' নামক বৈজ্ঞানিক পত্রেও অনেক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষৎ' হইতেও অনেকগুলি পরিভাষার সঙ্কলন হইয়াছে। পূর্ব্বে সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য সংহিতা প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও অনেক বিষয়ের পরিভাষা বাহির হইয়াছিল। তবে সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সঙ্কলনকার্য্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই অনেকাংশে সফলকাম হইতে পারিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিভাষা-সমিতি বাঙ্গলা বানানের নিয়মাবলীও গঠন করিতেছেন।

মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রাদিতে দেশের শিক্ষিত লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিবে, কর্ম্মস্পৃহা বাড়িবে, ইহা বাঞ্ছনীয়। মাসিকপত্রের গল্প ও কবিতা, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে, ভালই হইয়াছে। যেদিক দিয়া দেশের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়াই দেশকে জাগাইয়া তোলা সাহিত্যিকের কর্ম্ম। কিন্তু না জানিয়া দেশ যদি তন্দ্রাভিভূত, নিদ্রিত, ভোগমত্ত বা ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহা সাহিত্যের সুলক্ষণ নহে। আজ বিশ্বের কর্ম্মময় জীবনের সাড়া কি আমাদের জাগাইয়া তুলিবে না? বিশ্বের চারিদিকে নিত্য নতুন উপকরণের সৃষ্টি, সেদিকে কি আমাদের দৃষ্টি পড়িবে না? অভিনব উপাদানসম্ভারের সহিত যোগ রাখিয়া এখন চাই আমাদের নূতন সাহিত্য। এই নূতন সাহিত্য আপাততঃ অনুবাদের মধ্য দিয়া বিশ্বের মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিতে থাকুক। আমাদের সাহিত্য একবার এই অনুবাদের সাহায্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার তাহাকে নূতন করিয়া পড়িতে হইবে। বাঙালা সাহিত্য ক্রমে মৌলিক গবেষণামঞ্জুষায় পরিণত হউক

আমরা চাই নূতন সংস্কৃতি। কিন্তু সেই সংস্কৃতির যোগ রাখিতে হইবে পুরাতন সনাতন ভারতের সংস্কৃতির সহিত। সংস্কৃতিই ছিল ভারতের অন্তরের বস্তু। অক্ষর পরিচয়ে সাহিত্য জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না এদেশে বিদ্যা কোন দিন academic ব্যাপার বলিয়াও গৃহীত হয় নাই। দর্শনও কোনদিন বুদ্ধির পরিচয়জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীদের প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্ম ও দর্শন এদেশে কোন কালে পৃথকবস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম্মের গোড়ার কথা হইয়াছে সর্ব্বত্র

সর্ব্বদা সব বস্তুর মধ্যে একটী অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু অখণ্ড পূর্ণের প্রকাশ মাত্র। সর্ব্ববিদ্যাই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টিশিল্পকলাও ধর্ম্মের বাহন হইয়াছে। ধর্ম্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণী ধর্ম্ম। তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটে নাই। তাই প্রাচীন যুগে এ দেশে ধর্ম্ম ভিন্ন কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প সৃষ্টি হয় নাই। এই ভারতবর্ষে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি ভারতের এই সংস্কৃতি আমরা বহন করিয়া চলিয়াছি। সকল দেশের ধর্ম্ম প্রবল বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আপনাদের সত্তার ধাতু পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারত-ধর্ম্মকে তাহা করিতে হয় নাই। ভারতের ধর্ম্ম বৈদিক ধারায় সুস্নাত হইয়া শত পরীক্ষিত হইয়া আপনার ধারা অদ্যাপি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। যুগে যুগে ধর্ম্মে তথা সমাজে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন ধারা বরাবর অক্ষুন্ন, অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া ধর্ম্মকে, সমাজকে সনাতন করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের এই সংস্কৃতির সহিত বাঙলার সম্বন্ধ কি তাহা আমাদিগকে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের শুধু মুখে বলিলে চলিবে না—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদিগকে আত্মস্থ হইতে হইবে। নিজের ধাতু ও স্বরূপ চিনিতে হইবে। চিনিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃহত্তর বঙ্গের সহিত, বৃহত্তর ভারতের সহিত যোগ রাখিয়া অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমরা ইতিহাস পড়ি, অর্থনীতি পড়ি, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের প্রয়োজন ও উপযোগিতা বুঝি না। বর্ত্তমান বিষয়ে তাই আমাদের এত সমস্যা। কিন্তু সব সমস্যার সমাধানের মূল সেই শ্রীভগবানকে সকল কাজে মিশাইয়া লইতে হইবে। কর্ত্তব্যে অবহিত হইলে আমাদের অচিরে সকল সমস্যার সমাধান হইবে, ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

*দিল্লী সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

আঘাত

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

তীব্রতর সে বেদনা ভুলি নাই আমি ভুলি নাই
দিয়াছ যা জীবনের পাত্রখানি ভরে
নীল করি অধরের রক্ত অরুণিমা
নিঃশেষিয়া হৃদয়ের আরক্ত রুধিরে।

না ফুটিতে তুমি যার ঝরাইলে দল
বিবশিয়া জীবনের শ্যামলিয়া তীরে
সে কি আর বিতরিবে স্নিগ্ধ পরিমল ?
সৌন্দর্য্যে পথিকের আঁখি লবে হরে ?

মৃত্যু নহেক শুধু জীবনের পারে
মরণ আসিয়া কাঁদে জীবনের দ্বারে।

আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

জগতের বিদুষী এবং শ্রেষ্ঠা রমণীনেত্রীগণ কয়েক দিন কলিকাতার টাউন হলে একত্রিতা হইয়া যে সমস্ত ভাব-ধারা প্রচার করিয়া গেলেন তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম এই নারী প্রগতির দিনে নারী-জাতির ভাবধারার পূর্ণতায় বিকাশ ঘটিতে এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। সভানেত্রী এবং অন্যান্য নারীনেত্রীগণ যে সমস্ত দাবী দাওয়ার কথা সভায় উল্লেখ করিয়া আপনা-দের অস্তিত্ব দৃঢ় করিতে চাহেন তাহা খুবই পুরাতন এবং উহাদিগকে যদি পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন মনোবৃত্তি বলি তাহা হইলেও মনে হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবেনা।

নারীজাতির ইতিহাস না আলোচনা করিয়া নারী জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ দাবী দাওয়া উত্থাপন করিতে যাওয়া শুধু অযৌক্তিকর। নারী-জাতির ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন নারী মহিয়সী শক্তি-শালী ছিলেন। আমাদের পুরাণে এবং শাস্ত্রে যে মহা-শক্তির কথা স্বীকার করা হইয়াছে তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ও জননী, তিনি অন্নরূপা এবং জগতের অন্নদাত্রী—অন্নপূর্ণা। স্বয়ং দেবাদি-দেব মহাদেব অন্নের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ। উপমা ছাড়িয়া দিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব প্রাগৈতিহাসিক যুগে রমণীগণ সম্পত্তির মালিক এবং অধিশ্বরী ছিলেন। তাবৎ কৃষি কার্য্যই তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচলিত হইত। দুহিতা ইত্যাদি শব্দ উক্ত সামাজিক অবস্থার ভগ্ন নিদর্শন মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাবৎ আর্য্য, অধ্যুষিত দেশ-গুলিতেই রমণীজাতিকে শস্য বা শস্য পূর্ণক্ষেত্র গুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী যে সমস্ত Amazonian রমণীগণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহিয়সী রমণীগণের বংশধর মাত্র।

এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের কোনরূপ সমাজগত অধিকার বা position ছিল না। আদিম মানব বন জঙ্গলে বাস করিত, বন্যপশু শিকার করিত এবং উদ্দাম স্বাধীনতায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। সৃষ্টির প্রয়োজন এবং কতকটা স্বভাব সুলভ প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই তাহারা বসন্তের সমাগমে নারীগণের সহিত একত্রিত হইয়া খুব স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি কার্য্যে সাহায্য করিয়া যাইত। বসন্ত কাল সৃষ্টি কার্য্যের পক্ষে সুন্দর Back-ground. পারস্পরিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে হয় এবং এইরূপে সৌন্দর্য্যের সৃজনে সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করা হইয়া থাকে। বসন্তের সমাগমে পৃথিবী নবীনের আহ্বানে অত্যন্ত আপ্লুত হইয়া উঠে, বহু পুরাতন ধরিত্রীও নবীন সৌন্দর্য্যে সজ্জিত হইয়া তখন অভিসার গমনোন্মুখ নায়িকার রূপ পরিগ্রহণ করেন। ইহাই সুন্দর Back ground. গ্রীক ও হিন্দু-গণের পুরাতত্ত্বে বসন্তোৎসব একটি বিরাট ব্যাপার। এই উৎসবে তরুণ তরুণী পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করিত এবং সৃষ্টিকার্য্য ইহা দ্বারাই অজ্ঞাতসারে সুন্দর রূপে পরিচালিত হইয়া যাইত। বসন্তের পর বর্ষা হেমন্ত ও শীতে তরুণীগণ গৃহ কার্য্য ও সন্তান প্রসব লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন এবং শাস্ত্রের বচনের যদি কোন অর্থ থাকেত আমাদের মনে হয় এই জন্যেই শাস্ত্রকারগণ কার্ত্তিক ও পৌষমাস কে বহির্গমনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলেন নাই। অগ্রহায়ণের কার্য্যাবলী শস্য কর্ত্তন এবং সংগ্রহ ব্যাপার গুলিকে লইয়া উহাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। শীত ঋতুর অবসানে আবার বসন্ত, আবার অদম্য উৎসাহ ও প্রমোদের সময়।

ঐতিহাসিক যুগে নারী-জাতির বন্ধন সুরু হয়। ভ্রমণ-শীল মানব সম্প্রদায় ভ্রমণজাত ক্লান্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাহারা নরীজাতির ন্যায় শস্য ও গৃহ পালিত পশু-গুলির অধিকারী হইয়া গৃহে বাস করিবার জন্য ব্যস্ত

হইয়া উঠে। এই যুগে নারীজাতির সহিত পুরুষ জাতির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। নারীজাতি পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহাদের গৃহপালিত পশুদের ন্যায়ই দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইয়া পড়েন। এই পরাজয়ের ইতিহাসে প্রকৃতিদেবী ও অনেকটা সাহায্য করেন। Calcium আমাদের শরীর পুষ্টির একটি অব্যর্থ উপাদান। Calcium দ্বারাই আমাদের অস্থি ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। Calcium এর অভাবে শরীর দুর্ব্বল হয়। এই Calcium গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নারীজাতির অত্যন্ত কম। তাঁহারা অত্যাধিক Calcium গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া প্রত্যেক নারী বয়ো প্রাপ্ত হইলে এই Calcium ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। গর্ভের সঞ্চারের সহিত গর্ভজাত সন্তানের জন্য Calcium প্রয়োজন হওয়ায় এই Calcium ত্যাগ আবার বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য রমণীগণ স্বভাবতঃ শারীরিক বীর্য্যে নরগণ অপেক্ষা হীন এবং এই প্রাকৃতিক অসমঞ্জতার সাহায্যেই নরগণ অনায়াসেই নারীগণকে কবলগ্রস্ত করিয়া পরাজিত করিতে সমর্থ হন। নারী জাতির ইতিহাসে এই পরাজয়ই তাহাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ।

তাহার পর বীরত্বের বা Chivalryএর যুগ আসে। এই যুগে মানব বিশেষ দেবতার বংশধর বলিয়া পূজিত হইত। তাহার ভোগের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু নিচয়ের সমাবেশ হইত। Heroic যুগে রমণীগণ সামান্য পণ্যের ন্যায় হস্তান্তরিত হইতে থাকে। হোমারের কাব্যে দেখা যায় যে সুন্দরী রমণীগণের তাহাদের নিজস্ব কোনরূপ অস্তিত্ব ছিলনা এবং তাহাদের যে নিজেদের একটা নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে তাহাও স্বীকার করা হইতনা। Agamemnon বা Achilles এর যে কলহকে অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মহাকাব্য ইলিয়াড রচিত হয় তাহার মূল ভিত্তিই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে গৃহীতা হতভাগিনী দুই রমণীকে লইয়া। Heroic যুগের পর chivalry যুগে রমণীগণকে যে position দেওয়া হয় উহা heroর ইচ্ছানুযায়ী। সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য তখন অনেকটা মাদকতার কার্য্য করিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরকে ভজনা করিতে হইতই, রমণীর ইচ্ছা ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিলনা। সৌন্দর্য্যের রাণী টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী বীরকে চাহে কিনা একবারও জিজ্ঞাসা করা হইতনা। Dryden বোধ হয় এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন, None but the brave deserves the fair. বসুন্ধরা যেমন বীরভোগ্যা হইয়া উঠিলেন, এক যুগের পর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও সেইরূপ বীর ভোগ্যা হইয়া উঠিল। এই ধারণা এত স্বাভাবিক ও স্বতঃ প্রচলিত হইয়া উঠিল যে মানব সমাজে উহার কোনরূপ প্রতিবাদ হইত না।

Heroic যুগে এবং তাহার পরবর্ত্তী Chivalry যুগে রমণীগণকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রবর্ত্তিত হয়। টেনিসনের Queen of Sherlot এই যুগের একটী সুন্দর আলেখ্য, নায়ক যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলে, Andromache হোমারের যুগে যেমন গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন, Chivalry যুগে নায়িকার কোনরূপ গৃহ কার্য্য না থাকায় তাহাকে এইরূপ আত্মশক্তিক্ষয়কারী কার্য্যে নিযুক্তা থাকিতে হইত। গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং সকল প্রকার শারীরিক কার্য্য হইতে চ্যুতা হইয়া রমণীগণ ক্রমশঃই দুর্ব্বল ক্ষীণ বীর্য্যা হইয়া পড়েন। শরীর ও মনের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহারই কল্যাণে রমণীগণ ক্রমশঃ আপনাদিগকে দুর্ব্বল পরাধীনা অসহায়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়া মানব জাতির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে থাকেন। যে সতীত্বের দোহাই দিয়া নারীগণ আপনাকে বর্ত্তমান যুগে ধন্যা মনে করেন, এই সতীত্বের ভাব ধারণা এইরূপেই সৃষ্ট হয়। সতীত্ব এবং সম্পত্তি দুইটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখনও আমরা দেখিতে পাই যে সতীত্বের ভাব ধরণা অভিজাতদের মধ্যে যতটা সুস্পষ্ট অপেক্ষাকৃত নিম্নতর মানব স্তরগুলিতে যেখানে সম্পত্তির বালাই নাই, সেখানে সতীত্বের ভাব ধারণাও খুব কম। মনুর যুগে রমণীকে যেমন পূজনীয়া বলা হইয়াছে, স্মৃতিকার সেইরূপ আবার বলিয়াছেন, রমণীকে কখনই স্বাধীনতা দিবেনা অর্থাৎ রমণী তাহার সর্ব্বাবস্থায়ই

কাহারও না কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিয়া সমাজে বাস করিবে। এমন কি বয়োপ্রাপ্ত পুত্রও তাহার জননীর অভিভাবক। সতীত্বের ভাব ধারণা লইয়াই এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। সম্পত্তি থাকিলেই উহাকে চিরস্থায়ী এবং বংশগত করিবার ইচ্ছা মানব জাতির স্বভাব জাত ভাবেই আসিয়া পড়ে। এই জন্যই মানবগণ পুত্রের জন্য ভার্য্যাকে বরণ করিয়া ভার্য্যার সতীত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। রাজপুত জাতির মধ্যে Clannish ভাব প্রবল ছিল বলিয়াই জহরব্রত ধর্ম্ম তথায় সবস্তপর হইয়াছিল। পুত্রের জন্য ভার্য্যা ইহা এত স্পষ্ট করিয়া মনু-সংহিতায় বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তি রক্ষার জন্য ভার্য্যাকে পর পুরুষের অঙ্কগতা করিয়া দিয়া ক্ষেত্রজাত সন্তানের বিধান পর্য্যন্ত আছে। সতীত্ব যদি স্বভাব জাত ধর্ম্মই হয় তবে এই ব্যতিক্রমের আদেশ কেন? রমণীগণ যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী না হইতে পারেন, অর্থাৎ রমণীগণ সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে তাহারা দ্বি-চারণী হইবেন এই ভাব বশেই, রমণী সমাজকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে শুধু ভরণ পোষণের দাবীদার করিয়া স্বীকার করা হইয়াছে মাত্র। সম্পত্তিই যে সতীত্বের মূল কারণ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাকে আর উদাহরণ সন্নিবেশ করিতে হইবে না।

তাহার পর আসে বর্ত্তমান যুগের প্রথম ভাগ। নারীজাতি তাহার সমস্ত গৌরব কাহিনী বিস্মৃতা হইয়া ভাবিতে থাকে যে সে মানবের ক্রীড়া পুত্তলী এবং স্বামীর ভোগ্যা মাত্র। এই মনোবৃত্তিকে দৃঢ় করিয়া দিবার জন্য লৌকিক সাহিত্যকারগন আবির্ভূত হন। Tennyson তাঁহার বিখ্যাত পদ্য গ্রন্থ Princess এ যখন বলেন, **Man is for the sword** এবং **woman is for the hearth** তখন তিনি খুবই দক্ষতার সহিত এক পুরাতন Propaganda এর অবতারণা করেন। আমাদের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু শৈবলিনীকে আজীবন প্রতাপের সহচরী করিয়া কেবলমাত্র কয়েকটী বিবাহ মন্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাকে নরক পর্য্যন্ত দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। এই নরক দর্শন দৃশ্যটা অনেকটা Homeric। ইহার যে অবতারণা আমরা মেঘনাদবধ কাব্যে দেখি ইহা তাহার রকম ফের মাত্র। তাহার পর সতীত্বের গৌরব গাথায় ভরা কত কথা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধ্যয়নে আমাদের এই কথাই যে সত্য তাহা প্রতীয়মান হইবে।

বিখ্যাত দার্শনিক মিলই বর্ত্তমান যুগে রমণীগণকে মানব জাতি সুলভ সকল অধিকার দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। আমি ঠিক জানিনা তিনি কতটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার যুক্তির মূলে অনেকটা সহৃদয়তা ছিল। তাহার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল নারী জাগরনের দিন আসিল। নারীগণ আন্দোলন সুরু করিলেন যে তাঁহারা পার্লামেণ্ট মহাসভায় মেম্বর হইবেন, তাহার পর মানব জাতির ন্যায় শিক্ষা লাভ এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। পুরুষজাতি তাহাদের দাবী দাওয়া একটু একটু করিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও নারী যে নারী অর্থাৎ সে যে তাহাদের ভৃত্যা বিশেষ ইহাই বোধ-গম্য করাইবার জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার পর আসে মহাযুদ্ধ। বাধ্য হইয়া নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার এবং তাহাদের বৃত্তি প্রদান করিতে হয়। এই মহাযুদ্ধের পর হইতেই নারী আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু মহিয়সী মাতৃজাতি রমণীগন যদি এখনও মনুষ্যত্বের পূর্ণ দাবী না করিয়া যদি সেই পুরাতন এবং মামুলী ভাষায় আপনা দিগকে ক্ষুদ্রা এবং হীন ভাবিয়া তুচ্ছ দাবীগুলিই করেন, তাহা হইলে বলিতে ইচ্ছা করে নাকি সহস্র সহস্র বৎসরর পরাধীনতা তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলা ও অসহায়া করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের এই মনোভাব। এই জন্যই বলিতেছিলাম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে কোন রমণী-কেই মানব জাতির জন্মগত দাবী উথাপন করিতে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মহাপ্রয়াণ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে জগৎ একজন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান লোক হারাইল। রাজকীয়-জীবনে ও সংসার-জীবনে সম্রাট ছিলেন আদর্শ পুরুষ। জগতের ইতিহাসে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইবে। সম্রাটের মৃত্যুতে চারিদিকে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে—আমরা মহানুভব সম্রাটের আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

নবীন সম্রাট

পরলোকগত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস অষ্টম এডওয়ার্ড নাম লইয়া সম্রাট হইয়াছেন। নূতন সম্রাটের জীবনও বৈচিত্র্যে ভরা—ইনি এখন ও অবিবাহিত, বোধ হয় চিরকুমার থাকিবারই ইহার অভিপ্রায়। ইনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—অশ্বারোহণ, বিমান চালনায় ও পুরুষোচিত নানা ক্রীড়ায় ইনি সুদক্ষ। আশা করি ইহার রাজত্বকাল ও সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস বরাবর নিখিল ভারত জাতীয়তা বোধকে জাগ্রৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—জাতীয় স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। এদিক দিয়া ভারতের ইতিহাসে কংগ্রেসের দান অমূল্য। কংগ্রেসকে যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজ নাই—কোন সময়ে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনে যাঁহারা ইহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহারাও এই শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার মিলিত হইতে ইচ্ছুক—যদি কংগ্রেস তাহার নীতির কিঞ্চিৎ রদ বদল করে। এই উপলক্ষে ডাঃ পট্টভি সীতারাময়া কংগ্রেসের ১২০০ পৃষ্ঠার এক ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন. এই গ্রন্থের মূল্য আড়াই টাকা। বহু ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছে ও বহু খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। ডাঃ পট্টভি কংগ্রেসের পূর্ণ ইতিহাসই দিয়াছেন—কিন্তু তিনি যে যুগে কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন সেই গান্ধীযুগের ইতিহাসই অতি বিশদ হইয়াছে।

—•—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবার কয়েকজন মনীষীকে উপাধি দানে সম্মানিত করিতেছেন। বাংলার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহারা ডক্টর অব লিটারেচর উপাধি দিবেন জানিয়া আমরা অতি প্রীত হইয়াছি। শরৎ চন্দ্রকে এ উপাধিতে ভূষিত করা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই উচিত ছিল। শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করুন ভগবানের কাছে ইহাই কামনা।

অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত

রিপন কলেজের খ্যাতনামা ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুরাতন প্রসঙ্গ প্রভৃতি রচয়িতা বিপিন বাবু আর ইহলোকে নাই। ইনি নানা জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন—বাংলা ভাষায় ইহার দান সামান্য নহে। আমরা বিপিন বাবুর আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানাইতেছি।

কামিনী কুমার চন্দ

আসাম শিলচরের প্রসিদ্ধ উকিল ও দেশ নেতা কামিনী কুমার চন্দ মহাশয় আর ইহলোকে নাই। বঙ্গ ভঙ্গের সময় বিভিন্ন জেলায় যে সব খ্যাতনামা নেতার আবির্ভাব

হইয়াছিল কামিনী বাবু তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার পুত্রেরাও সকলেই কৃতী। তাঁহার জেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত অপূর্ব্ব কুমার চন্দ প্রথম বাঙ্গালী ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনসট্রাকসন হইয়াছিলেন। আমরা কামিনী বাবুর স্বজনদের সমবেদনা জানাইতেছি।

পল্লীর উন্নতি

বাংলার পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের নদ-নদী গুলির সংস্কারের প্রয়োজন। বাংলার অধিকাংশ নদী মরিয়া যাইতেছে—নদীগর্ভ বলিয়া কোন জিনিষ কোন নদীতে প্রায়ই দেখা যায় না। বর্ষার জলপ্লাবনে বহু গ্রাম ভাসিয়া যায় আবার বর্ষা অন্তেই শূন্য বালু চর ধূ ধূ করে। জলকষ্ট বাংলার অধিকাংশ গ্রামেই অবর্ণনীয় এবং ক্রমশই ইহা বাড়িতেছে। কচুরীপানায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—বহু স্থানেই ইহা নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তার উপর প্রতিবৎসরই স্রোত জলে ইহা অসংখ্য আসিতেছে। জলাভাবের দরুণ বহুব্যাধি বিস্তার লাভ করিতেছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্য চালানও অতি কষ্টকর ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। দেশের এই সব প্রধান অসুবিধা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেরই প্রধানতঃ হস্তক্ষেপ করা উচিত কিন্তু জনসাধারণেরও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্থানীয় লোক চেষ্টা করিলে স্থানীয় অসুবিধা কি ভাবে দূর করিতে পারে আচার্য্য রায় 'হরিজন' পত্রে তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—ফরিদপুরের মহবৎপুর পরগণায় একটা প্রকাণ্ড খাল শুকাইয়া যাওয়াতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য এসবের বেলায় লোকসান ও প্রচুর জলকষ্ট হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা সরকার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করিলে চীফইঞ্জিনিয়ার এক পরিকল্পনা স্থির করেন, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগিবে ধরা হয় কিন্তু অর্থের অভাব হেতু কোন কাজ হয় নাই। স্থানীয় লোকদের এই অসহায় ভাব দেখিয়া চন্দ্রনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক এই দুর্গতির প্রতিকারের উপায় নিজ হাতে গ্রহণ করেন। একটা প্রকাণ্ড সভা করিয়া স্থির করেন যে তাহারা নিজেরাই কায়িক শ্রম করিয়া খাল খনন করিবেন। ১৪।১৫ হাজার লোক সেই দিন হইতে ঝুড়ি কোদালি প্রভৃতি লইয়া কার্য্যে রত হইল এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিন মাইল লম্বা খাল এবং পাশ দিয়া একটা সুন্দর রাস্তা তৈরী হইয়া গেল।

উপসংহারে আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—এমন এক একটী চন্দ্রনাথ যখন প্রত্যেক গ্রামে দাঁড়াইবে তখন আমাদের গ্রামগুলি আবার পূর্ব্ব সম্পদ ফিরিয়া পাইবে।

—•—

ভারতে বিদেশী দ্রব্য

অটোয়া চুক্তির ফলে বৃটেনের এদেশে মাল রপ্তানী বহু বাড়িয়াছে কিন্তু এদেশী মাল বৃটেনে রপ্তানী সে তুলনায় কিছু বাড়ে নাই। ইহা ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্যের শুভ লক্ষণ নহে। জাপান বলিতেছে যে ভারতের কাঁচা মাল যখন সে আমদানী করিতেছে বেশী তখন তাহার উপর বাণিজ্য শুল্ক বেশী চাপাইয়া রাখা ভারত সরকারের উচিত নহে। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক জার্ণাল অব কমার্স' বলিতেছেন ভারতে জাপানের প্রচুর রপ্তানী হইতে বুঝা যায় যে ভারত বৃটিশ বাণিজ্যের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত স্থান নহে। ভারতের বিপুল জন সংখ্যা, মালপত্র বহনের আধুনিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক শান্তি ভারতকে আমেরিকার পণ্য বিক্রয়ের উপযোগী চমৎকার বাজারে পরিণত করিয়াছে। ভারতের আমদানী মালের হিসাব লইলে দেখা যায় বেশী দামের উচ্চ শ্রেণীর শিল্পজাত পণ্য ভারত যথেষ্ট ক্রয় করিয়া থাকে। জাপান বা আমেরিকার পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়াই আছে—তবে সস্তা খেলোমালে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু ইহাদের দৃষ্টি ভারতের দিকে নিত্যই নূতন ভাবে পড়িতেছে অথচ ভারতে কাঁচা মাল যখন প্রচুর রহিয়াছে তখন উচ্চ শ্রেণীর বা খেলো শিল্পজাত পণ্য ভারতে হইতেছে না কেন? এই শিল্প জাত পণ্য ভারতে হইলে ভারতের অনেক অভাবই দূর হইতে পারে।

—•—

ভারতে জাপানী মহিলা

টোকিও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মিসেস টোমি কোরা সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন, ইনি বলেন ভোটাধিকার সম্বন্ধে প্রায় দশ বৎসর হইতে জাপানী মহিলারা আন্দোলন করিতেছেন, এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে জাপানে শতকরা ৯৮জন শিক্ষিত বাকী ২জনকেও শিক্ষিত করা হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ জাপানে প্রচলিত হইবার সময় অনেক বাধা আসিয়াছিল কিন্তু তাহা এখন নাই। এই আন্দোলনে জাপানের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, ভারতেও ইহার আবশ্যকতা আছে। জাপানেও ২০ বৎসর আগে জাতিভেদের কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। সরকারের সাহায্যে ও রাজপরিবারের অগ্রানুবর্ত্তিতায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ইহা জাপান হইতে লোপ পাইতেছে।

হিন্দুসমাজে অনুন্নত সমস্যা

হিন্দু সমাজ নামে এক হইলেও বহুধা বিচ্ছিন্ন। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক মহাত্মার এই মর্ম্মস্পর্শী নিবেদন এখনও অনেক স্থানেই কার্য্যকরী হয় নাই। অথচ হিন্দু সমাজ সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের এই অধিকার দিতে কার্পণ্য করায় হিন্দুস্থানের হিন্দুদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়া ক্রমশই তাহাদের সংখ্যায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। সঙ্ঘশক্তিতে তো তাহারা হীন আছেই। হিন্দু সমাজের হরিজনেরা আজ মানুষের অধিকারই দাবী করিতেছে এবং এসব সাধারণ অধিকার পাইলে তাহারা উন্নত হইবে, হিন্দু সমাজও ক্রমশঃ সংখ্যায় ও সঙ্ঘশক্তিতে বলীয়ান হইবে। হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত ধর্ম্মগুরুও এই সব প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের কোলে টানিয়া লইতে আর শৈথিল্য বা কালবিলম্ব করা উচিত নয়। জগতের সমক্ষে জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে সর্ব্বসাধারণকে লইয়াই তাহা হইতে হয়। আজ ডাঃ আম্বেদকর হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া যাইবার ভীতি দেখাইতেছেন, কত হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান হইয়া গিয়াছে, ইহা হওয়া সম্ভব হইত না যদি হিন্দু সমাজ একটু উদার হইতেন—যদি নিজের ভাইদের তাহারা দূরে সরাইয়া না দিতেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া প্রত্যেক হিন্দুরই একান্ত কর্ত্তব্য যে আর কোন হিন্দুই যাহাতে হিন্দু সমাজের বাহিরে না যায় সেই দিকে চেষ্টা করা। অনুন্নত হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে—তাহাদের উন্নত করিতে হইবে প্রত্যেক হিন্দুর এই আদর্শ হওয়া উচিত।

কর্পোরেশনে মুসলমান

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের মুস্লেম সদস্যেরা সংখ্যানুসারে মুসলমানের চাকুরী প্রাপ্তি দাবী করিয়া তাহাতে নিরাশ হওয়াতে একযোগে কাউন্সিলারী ইস্তাফা দিয়াছেন। এমন কি মেয়র মিঃ ফজলুল হক পর্য্যন্ত মেয়রীতে ইস্তাফা দিয়াছেন। এ সম্পর্কে কর্পোরেশন সভায় ডেপুটিমেয়র বিবৃতি দিয়াছেন—১৯২৪ সালে কর্পোরেশনে বেয়ারা দারোয়ান ছাড়া মুসলমান চাকুরীয়ার সংখ্যা ছিল ১৫৬ জন। ১৯২৮ সালে কর্পোরেশনে কংগ্রেসী সদস্যের আগমনের পর ঐ সংখ্যা ৪৩১ জনে দাঁড়ায়, ১৯৩৩ সালে হয় ৯৫৬ জন, ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে তাহা আরও বাড়িয়াছে গত এক বৎসরের ৬ বড় পদের লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। এই ৬টি পদের মধ্যে বাহির হইতে যে একটি মাত্র লোক লওয়া হইয়াছে তিনিও মুসলমান। ১৯২৪ সালে কোন বিভাগীয় কর্ত্তার পদেই কোন মুসলমান ছিলেন না। বর্ত্তমানে ডেঃ একজিকিউটিভ অফিসার, জেলা ইঞ্জিনিয়ার, জেলা হেল্‌থ অফিসার, সেণ্ট্রাল রেকর্ড কিপার পদে ও অস্থায়ী বস্তি সার্ভেয়ার পদে মুসলমান নিযুক্ত রহিয়াছেন। ডেপুটি মেয়র আশা করেন প্রকৃত তথ্য জানিয়া মুসলমান সদস্যেরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিবেন। যোগ্য মুসলমানেরা সর্ব্বত্র যথাযোগ্য চাকুরীতে বহাল হউন তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা। কিন্তু ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যাপার হইতেছে তাহা অনেকেই সমর্থন করিতে পারিবেন না। আর যোগ্য হইলেই যে আজকালের

বাজারে সর্বত্র চাকুরী জোটে তাহাও নয়—তাহা হইলে শিক্ষিত বেকারের এত সংখ্যাধিক্য ঘটিত না। মুসলমান নেতাগণ দেশব্যপী এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে ব্যাপারটি সুখের হইত।

—০—

ঢাকায় অর্থনীতিক সম্মেলন

ঢাকায় ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের সভাপতি মিঃ মনোহরলাল যে তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা যাহারা করেন তাহাদের বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। মিঃ মনোহর লাল বলেন— আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতিকার সাধন কল্পে কেবল কুটীরশিল্পের দিকে দৃষ্টি দিলে কোন ফল হইবে না। আমাদিগকে বর্তমান উন্নতশিল্পের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কুটীর শিল্পের দাবী যথেষ্ট আছে কিন্তু ভারতের ৩৭ কোটি লোকের জীবিকা সংগ্রহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের অর্থনৈতিক সাম্যভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে নানা ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় আদর্শ সংরক্ষণের জন্য সরকার পক্ষের কোন সদিচ্ছাপূর্ণ চেষ্টা দেখা যায় না। ফলে ২০ বৎসর মধ্যে দারিদ্র্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেশের দারিদ্র্য জাতীয় অগ্রগমনের এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সকল অবস্থাকেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। যখন পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহ স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য উন্মাদ ঠিক সেই সময়ে ভারত হইতে অত্যধিক স্বর্ণ রপ্তানী হইয়া গেল। ভারতের অর্থনীতির ইহা শোচনীয় অবস্থা। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের হ্রাস পাওয়ায় ভারত এখন আর তাহার ঋণের এবং হোম চার্জের দাবী পূরণ করিতে সমর্থ নহে।......বৈজ্ঞানিকের এই ভবিষ্যদ্বাণী—'১৯৪৪ সালে খাদ্য শস্যের মূল্য এত কমিয়া যাইবে যে কৃষিপ্রধান দেশের অধিকাংশ ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। ইহা সত্য হইলে ভারতের কি ভাগ্য বিপর্য্যয় হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর জীবন কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে পরন্তু বিদেশাগত শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া যে দেশের লোক ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অসুবিধায় বিপর্য্যস্ত হইতেছে হতভাগ্য ভারতের সেই অন্ধকারময় ভবিষ্যতের বিষয় কি আমরা কেহ অনুভব করিতে পারিতেছি? ......ভারতের ক্রমঃবর্দ্ধমান লোকসংখ্যাই তাহার অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে অথবা বিদেশ হইতে খাদ্য শস্যের আমদানি করিতে হইবে।......লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনৈতিক অপচয় সূচনা করে। বৃথা সন্তান জনন এবং শিশু ও প্রসূতির অকাল মরণ জনবাহুল্যের পরিণতি। পারিবারিক অবস্থা অনুসারে জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়—আর জনসংখ্যা বাড়িলেই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের আদর্শ হীন হইয়া আসে।......এখানে প্রধান সমস্যাই হইতেছে লোক সংখ্যার ও উৎপাদিকা শক্তির আনুপাতিক ক্ষমতা রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি যথাযোগ্যরূপে কার্য্যকরী হইতেছে কিনা তাহা বিচার করা।

"নিউজিলণ্ডের সরকারী কাগজপত্রে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষময় ফলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাই নূতন নূতন শিল্পে কতক লোককে নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। সেইজন্য দেশের মধ্যে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, বিদেশ হইতে সেই সকল দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্যদিকে জাপানে লৌহ নাই, কার্পাস নাই, কয়লারও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সেখানে শিল্পোন্নতিরও যথেষ্ট অন্তরায় আছে। তথাপি সেদেশের নীতি অন্যরূপ। সেখানে শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত এমনই নীতি অবলম্বিত যে, লোক-সংখ্যামূলক সমস্যার সমাধান সেই শিল্প বাণিজ্য-মূলেই হইতে পারে। ইংলণ্ডের অনুকরণে জাপান বুঝিতে পারিয়াছে যে, বর্দ্ধিত সংখ্যায় জন্য শিল্পের বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্য শস্য আমদানি করা একান্ত প্রয়োজন। জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষার বিষয়, এই সম্পর্কে আমাদিগকে একটী জরুরী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের বাণিজ্য নীতি তিনটী কথায় ব্যক্ত করা

যাইতে যাইতে পারে—(১) ডিসক্রিমিনেটিং প্রটেকশন (২) ফিসকেল অটোনমি কনভেনসন এবং (৩) অটোয়া প্যাক্ট এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা। এদেশে কোনও গঠনমূলক বাণিজ্য প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতি বিষয়ক নীতির কতকটা পরিবর্ত্তন করিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সতর্ক অর্থনীতিকের অভিমত এই যে,—ভারতের শিল্পোন্নতি ভ্রম পথে চলিয়াছে কেন না আমরা মূল ও প্রধান শিল্পজাত উৎপাদনে অবহেলা করিতেছি। জাপানে যাহা সম্ভব নয় ভারতে তাহা সম্ভব হইতে পারে। ভারত জন বহুল সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও অধিক, বাজারও বহু বিস্তৃত। জগতের সকল জাতিই ভারতের বাজার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের এমন উপায় বহুল্য সত্ত্বেও আমরা সহজেই অপরের কবলে পতিত হইতেছি।

গান

কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

আসে হিমেলা বালা,
হাতে শিশির ডালা।
বুঝি স্বপন রাতি,
সখি, তোমারি সাথী ;
গাঁথে ধরার তরে
—দেবে মুকুতা মালা।
ওগো হিমের রাণী,
বল, কিসেরি গ্লানি!
কেন নয়ন নীর ওই
ঘাসেতে ঢালা।



৯ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪২ | ১১শ সংখ্যা

অপরিবর্ত্তনীয়

(Thomas Hardyর Breaking of Nations হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

একটি কৃষক শ্রান্ত চরণে লাঙল দিতেছে ক্ষেতে,
কঙ্কালসার বৃষ টানে হাল যেন পড়ে যেতে যেতে,
আধ ঘুম ঘোরে প্রাণপণ জোড়ে হোঁচট্ সামালি চলে,
রৌদ্রকঠিন মাটি ঢেলা হয় তাহাদের পদতলে।

শুকো পাতার সম্ভার জ্বলে, শিখা হীন ধূম রেখা
স্বচ্ছ আকাশে টেনে নিয়ে যায় ধূসর তুলির লেখা,
কত সম্রাট্ বংশাবলির চিহ্ন মুছিল ভবে,
তবু এ পুরান পল্লীচিত্র চিরদিন এক র'বে।

ওই যায় ধীরে কৃষাণের মেয়ে প্রণয় ভিখারী পাশে,
মৃদুগুঞ্জনে প্রেম আলাপনে মুচকি মুচকি হাসে।
কত সমরের অগ্নি পুরাণ আঁধারে হবে নিলীন,
এদের প্রণয় মুখর কাহিনী ফুরাবেনা কোনদিন।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় অস্বাভাবিকতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্ত-বিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল, সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে, তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতি প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন, অদালত, সকল প্রকার সরকারী কার্য্যবিধি, যা বহু কোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধানবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে, তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলিতে পারি এহ বাহ্য। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিষ না হওয়া তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্প সংখ্যক পেটেই পৌঁছায় এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরপ্রশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি,—আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম, যেখানে ব্যথা, সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না, কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরাণো কথা পৌঁছায়নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে, তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসিনি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলিরও সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য্য নয়, একথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্য্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীর দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হোতে পারে, এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্ত্তব্যতা স্মরণ ক'রে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা হয়েছে যেন সিঁড়িহীন বাড়ী। নীচের তলার সহিত উপরের তলার কোন সম্পর্কই নাই। এই সম্পর্কহীনতার ফলে দেশের সকল লোকের সঙ্গে একতা অসম্ভব হইয়াছে। গোড়ায় যাঁরা এদেশে তাঁদের রাজভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইট কাঠ চুণ সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের ও নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম অন্য এক প্রদেশের রাজ্য-সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিৎ পত্তনের সময় বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা ত কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো দালানে ব'সে পড়াশুনা করা সেও একটা শিক্ষা অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বই কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামী করা অর্থাভাববশতঃ

অসম্ভব হ'লে সংবাদ পাই, সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে লাগিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্য বিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করিনে। বিদ্যা জিনিষটা অমৃত, ইটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্যরূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হোলেও চলে। অন্ততঃ এতকাল সেই রকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুতঃ আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারৎ, না আছে অতি জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা প্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে, কেননা সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্যদেশের কারিগররা যে রকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি ক'রে থাকে, পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিষ তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিষটি চাপা পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরীব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে, তখন এই রকমই বুদ্ধি বিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইট কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিষের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশী। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই পূর্ব্বদেশে জীবন-সমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলি আমরা স্খলিত হচ্চি। তার ফলে হোলো এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ব্ববৎ, এমন কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী নীচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি, অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে ক'রে দেখো না, এদেশে বহু রোগ জর্জ্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জ্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে সব অভাবে দেশ অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্চে, তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই, অথচ এদেশে শাসন ব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেশনের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া ক'রে তোলবার খাতিরে ফল



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফলাবার রস জোগানে টানাটানি চলেছে। তাহোক এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্ম্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই, সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব। আজকালকার অস্ত্র-চিকিৎসায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে থেকে জোড়লাগা জিনিষটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হোলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যাণ্ডেজ বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব্ব এবং তৃপ্তি হোতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণ-পুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্ব্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে, ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে ছণ্ডিকাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা ব্যবসায়ে মুনফা ব'লে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্ব্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষিশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানব সমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষি-মহারাজের একাধিপত্য ঘটে, তাহোলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে?

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্ব্বজন স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্ব্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতঃই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতে দেখা যায়, বাংলা বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল; দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্ততঃ ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া, প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্ত্তব্যের অনুরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষর পরিচয় আমাদেরই বাড়ীর দালানে প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে, এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন, তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরও অনেক বেশী অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য 'শিশুশিক্ষা' প্রভৃতি যে সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে অবকাশকালেও বারবার তার পাতা উলটিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষাপরিবেশনের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরীবভাবে ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল—এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল বিল নদী নালায় আজ জল শুকিয়ে এল তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্ব্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারী কারখানা আছে, তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হোলে অনেক হাতুড়ি পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে মশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জে মশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্য্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎ শক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরো এগোত। হয়ত সেই চালনার সঙ্কেত মন্ত্রণাদফতরে এখনো পরিণতির দিকে উন্মুখ

আছে। তবু আমি যে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলা ভাষার পথ এখন কাঁচা পথ। এই সমস্যার সমাধান দুরূহ ব'লে পাছে হোতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর—এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি, পরিপূর্ণ সুযোগের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা না ক'রে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ ক'রে দেওয়া ভালো, যেমন ক'রে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভালো। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে, বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায় এমন নয়, একটা ঘরে বছর দুয়েক ধ'রে ছেলেটার কেবল পাখানা তয়ের হচ্ছে, আর একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্য্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্ত্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে। তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্ত্তি দেখতে চাই। সে মূর্ত্তি কারখানা ঘরে তৈরী খণ্ড-খণ্ড বিভাগের ক্রমশঃ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক-বিদ্যালয় হয়ে। তার বালক মূর্ত্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্ত্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন অধিকারের প্রথম টিকা। বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন একদল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে মাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় ব'সে পড়ে আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলি কারন আছে, একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজী ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরৎ। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না ব'লেই গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সে রকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়। শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে অপমানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলণ্ডে একদিন চুরির অপরাধ ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাশ করা কি চুরি ক'রে পাশ করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কি বলব? আস্ত-বই-ভাঙ্গা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে, তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়। তা হোক্ যে উপায়েই তারা পার হোক নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহু সংখ্যক যে সব হতভাগা পার হোতে পারল না, তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হয়েছে কিন্তু কোন রকমেরই সরকারী খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না, একটা লাইসেন্স দেওয়া প্যান্‌সি, মোটর চালিত নাই বা হোলো না হয় হোলো বিশি হাতে দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শিখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশী তাদের না শিখলেও চলে। কেন না তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজী ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্ব্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্ব্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজী ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে, সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্ত্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ রবীন্দ্রনাথের

রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙ্গালী বক্তাদের মধ্যে যাঁর যা বক্তব্য ছিল বলা হোলো পর ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে হোলো, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্ত্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজী বক্তৃতা এই মাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশী আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই জানতেন, তাঁর বাংলা কথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যাহার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক। তাই নিয়ে তিনি হেসেও ছিলেন। আমরা হোলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হোতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ৎ আত্মীয় বা অনাত্মীয় সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ তত্ত্বজ্ঞানী অয়কেনের ইংরেজী বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি—সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধাঁ লেগেছিল। এ নিয়ে অয়কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এই দশা আমার হোলো কি হোত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। 'বাবু ইংলিশ' নামে নিরতিশয় অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে। কিন্তু ইংরেজি বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হোলেও ওটাকে অনিবার্য্য বলে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারিনে। আমাদের কারো ইংরেজিতে ত্রুটি হোলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে, ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজী ভাষার পেটাই করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য্য। কেননা ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হোতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি তাই মন বলতে থাকে কি জানি। আমার সেই অভিভাবকের মতো অভিভাবক বাংলা দেশে বেশী পাওয়া যাবে না, তাই বেশী দাবী করে লাভ নেই। বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার সেফগার্ডসের দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায়, বিলিতি ডেকচিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভুরি ভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর মহলেই বসুক আর যারা রবাহূত, বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক না। টেবিল পাতা নাই হোলো, কলা পাত পড়ুক।

বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরবাসখশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই,—এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা কাটাকাটীর ঘূর্ণি হওয়াতেই আবর্ত্তিত হতে পারত, দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিন হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প, সেই জন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া একথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হয়েছে যে, শিক্ষা বিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর কিছুই হোতে পারেনা। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দ্দ

ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারি প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারৎও হোলো, সিঁড়িও হলো নীচে থেকে উপরে লোক যাতায়াত চলেছে। হোতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারিদিকে প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে যিনি এমন মহৎ সঙ্কল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন, সেই স্যার আকবর হায়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান সাধনার দুর্গমতাকে তাঁহাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দ্দু ভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষা সংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন স্পর্দ্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি, সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা আত্মপরিবর্দ্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হোতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্ত্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে সেখানেও ছাঁচ উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছিনে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি ইউনিভার-সিটির গায়ের মাপে ছেটে ছুটে কুর্ত্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাশুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদাল কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত করে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদঘর্ম্ম চেষ্টা করছি তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারিদিকে, না পৌঁছচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা ব্যবস্থার দেশের সামনে এনেছি, তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য্য এই যে তখন অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারী ব্যবস্থা ছিল। তখনো সে সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা ইউনিভারসিটি প্রবেশ দ্বারের দিকে জড়িত, যারা ছাত্রদের অবৃত্তি করাচ্ছিল he is up তিনি হন উপরে, যারা ইংরেজি I সর্ব্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল, I by itself I তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্র সমাজে উচ্চপদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূরপার্শ্বে সঙ্কুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষা বিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী তাদের শেষ সম্পতি ছিল নর্ম্মাল স্কুল নামধারী মাথা হেঁট করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা বিদ্যালয়ের স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা পণ্ডিতী ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্ম্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্ত্তি করে দিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিলনা। আমার ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইংরেজী বর্জ্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি স্কুলমাষ্টারের শাসন হতে উর্দ্ধশ্বাসে পলাতক। এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশু মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখায় সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হোতে হয়নি। এমন কি সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে 'মেঘনাদ বধ' পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা

বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধনাই সুস্থপ্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশ চর্চ্চায় প্রধান অবলম্বন হোলে সেটাতে যেন মুখোসের ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোস-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাঁচে গড়া ভাবকে অবিচল ক'রে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে. তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষায় আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চ্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজী বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোসের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হোলো। রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পর ভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্ম্মালস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলুম, তাই কচিবয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক ক'রে তুলতে হয়নি; চলা এবং রাস্তাখোঁড়া ছিল না এক সঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে-তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষার রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস পূর্ব্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না, ইংরেজির অতি প্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না। স্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজী পথে পথে সংগ্রহ করেছি, সেটুকু নিজের খুসিতে ব্যবহার করে থাকি তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্ততঃ আমার এগারো বছর বয়স পর্য্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। রাজসম্মানগর্ব্বিত কোনো সুয়োরাণী তাকে গোয়াল ঘরের কোণে মুখচাপা দিয়ে রাখিনি। আমার ইংরেজি শিক্ষার সেই আদিমদৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্ত বৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি জ্ঞান। ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা কিছু ছেঁড়া ফাটা যা কিছু মাপে খাটো তাকে কোনো রকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে; নিশ্চিত জানি তার কারণ শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল না দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্য-বস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য প্রাণ ছিল, যে খাদ্য-প্রাণে সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর যাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনীধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।



ঠেকে শেখা

নক্সা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী

ঠিক মনে পড়িতেছেনা। কোনও একটা বিশেষ কাজের জন্য আফিস হইতে ১২টায় ছুটী লইয়া কলিকাতায় কাজ সারিয়া বেলা আন্দাজ ৩৷০ টার সময় রাজা উডমট ষ্ট্রীট দিয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিতেছিলাম। সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পারত জন্ম না কেউ বিষ্যুৎবারের বার বেলায়' কিম্বা দুই চারিটা দুর্ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া বৃহস্পতিবারের বার বেলার উপর আমার একটু স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য আছে এবং পঞ্জিকাকারেরাও যে সে বিষয়ে কোনও সাহায্য করেন নাই তাহা আমি হলপ করিয়া বলিতে পারিনা কারণ গুরোসপ্তাষ্টকশ্চৈব ইত্যাদি বারবেলার নিষেধ প্রকরণে বিশেষভাবেই প্রকট আছে। যাহা হউক, একটু তাড়াতাড়িই ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে আসিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে আরে নন্দী যে, ও নন্দী ও নন্দী আওয়াজে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। দেখি আমাদের স্কুলের সরকারি বিনুদা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে। মধ্যে মধ্যে সমপাঠি ও সমবয়সীদের কাছে বিনুদার খবর পাওয়া যাইত কিন্তু পানের দোকানে বিনুদাকে দেখিবার আশা করি নাই।

এইখানে বিনুদার একটু পরিচয় না দিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে। আমাদের পাড়া হইতে প্রায় ৪॥ মাইল তফাতে বিনদা মামার বাড়ীতে মানুষ হয়। তাহার বাপ ছেলের উপর স্নেহের আতিশয্যে সুদূর পল্লীপ্রান্তে সামান্য একখানি মুদিখানা দোকান ও কয়েক বিঘা জমীর আবাদ করিয়া যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাতের প্রত্যাশায় তাহাকে খরচপত্র যোগাইয়া মামার বাড়ী রাখিয়াছেন। স্কুলের বার্ষিক ফলাফল বিচার করিয়া মামারা তাহাকে দেশে যাইয়া বাপের সাহায্য করিতে বলায়, বিনুদা রাজী থাকিলেও বিনুদার বাপের কিছুতেই মত হয় নাই। ফেলের খবর পাইলে বিনুদার বাপ আরও ভাল করিয়া পড়িবার উপদেশ দিয়া খবর পাঠাইয়া দিতেন এবং ছেলে খুব পাকা হইতেছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

আমার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর বিনুদাকে সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীতে রাখিয়া যাইবার পর চতুর্থ শ্রেণীতে আমার সঙ্গে দেখা। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরেরাও বিনুদাকে দাদা বলিতেন বলিয়া সামাজিক শাসন ও অনুশাসনের জের টানিয়া আমিও অন্যান্য সকলেই তাহাকে সরকারি বিনুদা বলিয়া ডাকিতাম। তাহার মধুর সংস্রবে যে আসিয়াছে সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। যদি পূর্ব্বতন কেহ তাহার সমপাঠী ভাল চাকরি কিম্বা ভাল ভাবে পাশ করিয়া নাম করিত, বিনুদা বুক ফুলাইয়া তাহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িয়াছে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। বাগদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলেও মা ষষ্ঠীর অজস্র কৃপার অজুহাতে বিনুদা স্কুল হইতে সংসার সংগ্রামে বাহির হইলেন। তাহার পর বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ ঐ ভাবে ডাকায় এবং মুখোমুখী দেখা দেওয়ায় অনেক দিনের প্রায়-ভুলে-যাওয়া অনেক ঘটনা দুজনেরই মনের মধ্যে যুগপৎ উদয় হয়েছিল। যাই হউক, বিনুদাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমারও ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। বিনুদা দোকানের পাটাতন ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলে। সে কিছুদিন রেলে কাজ করার পর কোন জেটীতে সরকারী করিত শুনিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বিনুদা তুমি রেলে না কোন জেটীতে কাজ করতে সে সব ছেড়ে পানের দোকানে, আমি যে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিনা। ব্যাপার কি বল দেখি।

বিনদা—সে সব হবে'খন, এখন এই বারবেলায় কোথায় তাড়াতাড়ি চলেছ? অনেকদিন পরে দেখা, চল আমার বাসায় যাই। আজ বাড়ী যাওয়া Post

mortem করতে হবে। কালও তোমার কথা, পরিবারের সঙ্গে হচ্ছিল। তোমার সব খবরই রাখি। পাছে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালাতে গেলে তুমি অপছন্দ কর কিম্বা কিছু মনে কর বলে দেখা করিনা। আমি বলিলাম বাড়ীতে হাঁড়ি ফেলে দিয়ে হাসপাতালে Post mortem দেখতে বাড়ী থেকে সবাই ছুটবে। যাক সে কথা এখন থাক। বিনুদা তোমার মুখে ওকথা শোভা পায় না। যাক, আমি যা জিজ্ঞাসা করলুম তার জবাব কই? ছেলে পুলেরা সব কি কচ্ছে, কেমন আছে?

বিনুদা—তোমার এতগুলো প্রশ্নের জবাব একেবারে ত দেওয়া যায় না। চল বাসায় গিয়ে একটু জিরিয়ে ধীরে সুস্থে সব কথা হবে।

ইতি মধ্যে একটি ছেলে দোকানে আসিতেই কাকাকে নমস্কার কর বলিয়া আমার তরফ হইতে শুষ্ক আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে একটা আভূমি নমস্কার আদায় দিয়া তাহাকে দোকান দেখিতে বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাসায় যাইতে উদ্যত। আমিও একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি দেখিয়া সে একরূপ পথ আটকাইয়া বৃহস্পতিবারের বারবেলায় ছাড়িয়া দিতে একান্ত নারাজ জানাইল। অগত্যা অনেকদিনের পর তার প্রাণখোলা কথা শুনিবার লোভ ত্যাগ না করিয়া তাহার সঙ্গ হইলাম। বাসাটী একটু দূরে, পটলডাঙ্গার কাছাকাছি কিন্তু কথায় কথায় বেশ চলিয়া যাইলাম। পথিমধ্যে যাহা শুনিলাম তাহার মোদ্দা কথাটা এই যে বিনুদা স্কুল ছাড়িয়া বাপের দোকানে কাজ করিবে জানাইলে, তার বাপ অনেক পয়সা খরচ করিয়া লেখাপড়া শেখানর পরিবর্ত্তে যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত প্রবচন আওড়াইয়া তাহাকে সমকর্ম্মী করিতে নারাজ হইলেন এবং দিনদিন অনেকগুলির মুখের অন্নসংস্থানের জন্য তাহাকে চাকরির জন্য বাহিরে আসিতে হইল। অনেক কিছু চেষ্টা করিয়া ও যখন কিছু করিতে পারিল না তখন রেল আফিসের গুদামে ২৭৲ টাকা মাহিনায় একটি চাকরি সৌভাগ্য ক্রমে যোগাড় হয়। কিছুদিন কাজ করিবার পর যখন ৩১৲ টাকা মাহিনা পায়—তখন রেলের সর্ব্বনেশে ১৯২১ সালের strike হয়। ধর্ম্মঘটীরা হাতে স্বর্গ তুলিয়া দিবে যদি কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে বলিয়া নোটীশ দেওয়ায় বিনদা কাজে কামাই করে। সে সাধারণতঃ একটু ভীরু ও গোলমালের মধ্যে থাকিতে পারিত না। তাহার উপর দেশোদ্ধারের টনিকের মত গরম গরম বুলি শুনিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। বাড়ীতে বৃদ্ধ বাপও সহরের গোলমাল হইতে ছেলে সুস্থ শরীরে ও বহাল তবীয়তে বাড়ী ফিরিয়াছে জানিয়া আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। বিনুদা ও যেমন কুড়ে গরু অমাবস্যা খোঁজে, কুড়ে চাষী অম্বুবাচী খোঁজে, নুতন উপবীত ধারীরা পাঁজি খুঁজিয়া সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি দেখে, টোলের ছাত্ররা অনধ্যায় খোজে, কারখানার কারিগরেরা বিশ্বকর্ম্মা পূজা খোঁজে, মা লক্ষ্মীরা অরন্ধনের খোঁজ নেন, কেরাণীরা সরস্বতী পূজার অপেক্ষায় থাকেন, স্কুলকলেজের ছেলেরা চশমা ধারণের জন্য দৃষ্টিহীনতা প্রমাণ করিয়া আনন্দ পান, সেইরূপ বিনুদাও ধর্ম্মঘটের সুবিধা লইয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিল। ইতি মধ্যে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গেল এবং অনুপস্থিত লোকেদের ও চাকরী গেল। বিনুদাও বাদ পড়িল না। কিছুদিন আবার বড় কষ্টে পড়িয়া অনেক যায়গায় ঘোরা ঘুরির পর কোন ও একটা জেটিতে ১৬৲ টাকা মাহিনায় সরকারী জুটিল কিন্তু অনবধানতা বশতঃ যে জিনিষটা নাই তাহার ও পক্ষে পঞ্জুড়ী অর্থাৎ ।/০ পাঁচ পণের আকারে দাগ দেওয়ায় অপরাধে চাকরী যাওয়ায় সুপ্তসিংহ জাগ্রত হইয়া "আর চাকরী করিব না" প্রতিজ্ঞা করিয়া সামান্য মূলধনে এই পানের দোকানটী করিয়াছে। ইহাতেই কোনও রূপে কায় ক্লেশে এবং কোন রকম বাবুয়ানী ও অযথা খরচ না করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে। শেষে বিনুদা বলিল—"ভায়া! বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ, রাজসেবায় কত খচমচ। বেদের বচন, না হয় খণ্ডন, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ। এখন এই Trade & commerce নিয়ে আছি আর I have the honour to be sir, your most obdt servant, লিখতে হয় না। দেহের মধ্যে বাপ পিতোমোর রক্ত বইছে, তাঁরা সব এই কাজ করেই

মোটা ভাত মোটা কাপড় পরে গেছেন, আর আমরা যদি না পারি তাহলে বংশে দুর্নাম হবে না?

আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই। তুমি যে পথ ধরেছ, ঐ পথই ধরে থাক, ভগবান মুখ তুলে চাইবেনই। কথায় বলে "মানুষের দশ দশা, কভু হাতি কভু মশা।" কথায় কথায় বিনুদার বাসায় পৌঁছিলাম। বাড়ীতে ঢুকিয়াই উচ্চৈস্বরে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—এই দেখ নন্দীকে ধরে নিয়ে এসেছি। এতদিন নয় তত দিন নয়, কালই নন্দীর কথা হচ্ছিল। আমি বড় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া বিনুদা বলিল আরে তুমি কিন্তু কিন্তু মনে কচ্ছ কেন।

দেখিলাম সামান্য দুখানি ঘরের বাসা কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে মনে হয় মা লক্ষ্মীর আসন পাতাই আছে এবং তিনি একদিন চঞ্চলা নামের পরিবর্তে অচলা হয়ে বসবেনই। পাশের ঘরে একটী যুবক খাতা পেন্সিল লইয়া লেখা পড়া করিতেছে দেখিয়া বিনুদা তাহাকেও কাকাকে নমস্কার কর বলায় বুঝিলাম, এটীও বিনুদার পুত্র। তাহাকে কিছু ম্রিয়মান দেখিয়া বিনুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বিনুদা এটী কি করিতেছে।

বিনুদা জবাব দিল ওটী আমার বড় ছেলে। সদাগরি আফিসে কাজ করত। দিন কতক পরে থাকায় আফিস যেতে না পারায় কাজের অনেক area পড়ে যায় এবং সময়ে সব কাজ করে দিতে না পারায় ওকে production করে দিয়েছে।

আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু বিনুদার arrear (বাকী) এর বদলে area এবং reduction এর বদলে production শুনিয়া একটু রহস্য করিয়া কিছু বলিব মনে করিতেছি কিন্তু তখনই বিনুদার ছেলেটীর মুখের দিকে চাহিয়া নিবৃত্ত হইয়া যাইলাম। ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান এবং তাহার সাক্ষাতে তাহার বাপকে লইয়া কিছু রহস্য না করি সেই জন্য মুখে অনুনয়ের ভাব প্রকাশ করিল। এমন সময় পাশের ঘর হইতে বিনুদার স্ত্রী চা ও কিছু খাবার লইয়া কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহার পলকমাত্রে আমাকে জানাইয়া দিল যে আমার নাম এ বাটীর বিশেষ অপরিচিত নহে এমনকি বিশেষ ঘরের লোকেরই মত। আমি বিনুদাকে বলিলাম, বিনুদা চা টুকুর সৎব্যবহার তুমি কর আমি "ওরলে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ" বিনুদা বলিল সে কি হে! তুমি চা খাও না? অবাক করলে যে হে! চা এর চেয়ে কি আর সদ্য মোক্ষ প্রাপ্তির জিনিস কিছু earth এ আছে? গুরু পুরোহিত মহাশয়রা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া মাত্র কয়েক কাপ চা খেয়ে চণ্ডীপাঠ, দুর্গোৎসব, রক্ষাকালী, শীতলামাতা পূজা সবই করেন শুনেছি। এই একটী আমাদের দেশে না হলে পশ্চিম রসাতলে যেত, এই একটী জিনিষের জন্য হাজার হাজার দেশী লোক অন্নসংস্থান করছে, এই একটী জিনিস না হলে ভদ্রতা gentleness কুটুম্বিতা relativity সবই পানসে হয়ে যায়। দরিদ্র কেরাণীর দুই পয়সায় এক কাপ চা tiffin এর জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম। অবশ্য বলতে পার আচার্য্য রায় চাএর very against এবং চা বাগানে পীলে ফাটাও শুনতে পাওয়া যায়। তা ভাই কজনই বা আচার্য্য রায় এবং এই তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে কটারই বা পীলে ফাটে। আর যে গুলার ফাটে তাদের ফাটাই উচিৎ কারণ 'মরিছে তারাই যারা চিরকাল মরে।'

আমি বলিলাম—না ভাই মাপ করো ও জিনিসটা খুব ভাল সন্দেহ নাই, চা এর কারবার, চাএর বাগানের বাড় বাড়ন্ত হোক ক্ষতি নাই কিন্তু আমার কাছে ওটা অচল। যাক, কিছু জলযোগান্তে উঠিতেছি দেখিয়া বিনুদা বলিল—তুমি কি এই বার বেলায় যাই হউক একটা আস্তানা থেকে বেরুবে নাকি?

আমি বলিলাম—যখন বাড়ী থেকে সকালে বেরিয়েছি তখন ত আর তোমার বার বেলা ছিল না। তবে আর বারবেলা লাগবে যাবে কেন?

বিনুদা সজোরে মাথা নেড়ে বললে—কেন? তবে তোমাকে আমার experiment টা শুনাই।

আমি অবাক ভাবে বলিলাম,—বার বেলার experiment? সে আবার কি?

আমার প্রশ্ন শুনিয়া বিনুদার ছেলেটি বিনুদা কিছু

বলিবার পূর্ব্বেই বলিল বাবা তাড়াতাড়িতে experience বল্‌তে গিয়ে experiment বলে ফেলেছেন।

বিনদা ঠকার পাত্র নয়। সে বলিল, ও একই কথা। যাক তার আগে আমার একটি অনুরোধ আছে আর আমার বিশ্বাস যা তুমি একটু attempting character চেষ্টা চরিত্তির করলে হতে পারে। সেই বিষয় নিয়ে তোমার বৌদির সঙ্গে কাল ও তোমার নাম হচ্ছিল।

আমি কিছু ভীত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল বুঝি বা কারও চাকুরী করিয়া দিবার অনুরোধ করে। প্রধান মুস্কিল এই যে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না যে আমাদের দ্বারা এবিষয়ে কোনও সাহায্যই হবার যো নাই। আমি বলিলাম, অনুরোধটা কি শুনি।

বিনদা বলিল তোমার বৌদির ইচ্ছা যে একবার pilgrim করতে কাশীধাম যায়। তুমি যদি একখানা পাস যোগাড় করে দাও।

আমি হাসিয়া একটু রহস্য করিয়া বলিলাম বিনদা বৌদিকে কি বলে পাসে লেখান হবে? বিনদা অম্লান বদনে বলিল, কেন আমায় যখন তুমি দাদা বল তখন brother-in-law অর্থাৎ brother এর স্ত্রী।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম বিনুদা তোমার মত যদি একজন মাষ্টার পাওয়া যেত, তা হলে গ্রামে আরে কেউ বই না পড়ে কেবল তোমার বক্তৃতা শুনে P. R. S. হতে পারত?

বিনদা বললে, তবে শোন আমাদের হুটু মাষ্টারের কথা। সে ২৲ টাকায় আমার মেজ ছেলেটাকে বাড়ীতে পড়াত। ৪৲ টাকা চেয়েছিল, কিন্তু বুঝতেই ত পাচ্ছ, যোগাই কেমন করে। অনেক হজ্জাহজ্জি ঘসামাজা করে ২৲ টাকাতেই agree করালুম। মাস পাঁচ ছয় পরে তার থানা জংশনে transference হল। সে হাওড়া রেল ষ্টেশনে তার পিশতুতো ভগ্নিপোতের অণ্ডারে shifting duty করতে কখনও সকালে, কখনও বৈকালে, কখনও রাত্রে পড়াত। স্কুলে, শুন্‌তে পেতাম, মাষ্টার মশাই পড়া না ঠিক করে বলতে পারার জন্ত ছেলেকে মারধোর করতেন। যা হোক যখন তার বদলি হল, আর একজন মাষ্টারকে আমার অবস্থা বলে ছুটাকাতেই পড়াতে রাজী করালুম। আমার ত Trade and Commerce যাই বলনা কেন ঐ দোকানটাই ভরসা তাও তোমার বৌদির হাত খালি করে গহনা বিক্রি করে দোকান করা। পরের দিন নূতন মাষ্টার বললেন মশাই, আপনার ছেলেকে পড়াতে ৪৲ টাকার কমে আমি পারব না। আমি বললাম সে কি মশাই, কাল ২৲ টাকায় পড়াতে রাজী হলেন আর আজ আবার ৪৲ টাকা চাইলেন কি হিসাবে?

মাষ্টার বল্লেন, এখনও পড়াতে ২৲ টাকাতেই রাজী কিন্তু যেগুলি শিখেছে, সেগুলি ভোলাতে আরও ২৲ টাকা লাগবে।

আমি বললাম—সে কি রকম কথা? আমি বুঝতে পারছি না।

মাষ্টার বল্লেন আপনার ছেলেকে ডাকান। ছেলেকে ডাকান হলে, মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন Make a cage মানে বলত?

ছেলে একটুও না ভাবিয়া মুখস্থ বলার মত বললে Make a cage—গজায় ময়ান দাও—Make মানে ময়ান দাও—Cage মানে গজা। মাষ্টার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন One morn I met a lame man in a lane close to my firm —মানে কি?

ছেলে জবাব দিলে, একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, in a lane বিস্তর চেষ্টায়, close to my firm বাঘ হইতে হাড় বাহির হইল না।

ছেলের বিদ্যার বহর দেখে ত আমি একেবারে thunder, শেষে বাধ্য হয়ে ৩৲ টাকায় রফা করে মাষ্টার রাখতে হল আর বড় ছেলেকে কেমন পড়ছে দেখবার জন্ত C. I. D. লাগিয়ে দিলাম।

আমার দিকে চেয়ে বিনুদা বল্‌লে। আমি কি তা'বলে হুটু মাষ্টারের চেয়ে ভাল মাষ্টারী করতে পারিনা মনে করেছ।

আমি বললাম—বিনুদা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকেদের বরাত ভাল যে মাঝে মাঝে তোমার ঐ হুটু মাষ্টারটী সরে গেল না হলে কোন দিন আর কোথাও চালাকী করতে গেলে পৈত্রিক গায়ের চামড়া কিম্বা কাঠামো খানির

কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ঘটত। যাই হউক বিনদা কিছু মনে করো না তোমাকে একটু রহস্য করছিলাম এই দেখে যে তোমার স্কুল জীবনের কথায় কথায় ইংরাজী বুকনির মায়া এখনও ছাড়তে পার নাই। পাসের নিয়ম কানুন বড় শক্ত এবং অন্য লোককে পাস দেওয়া যায় না। ভগবানের দয়া হলে তোমার বড় ছেলেটীর একটা কিছু হিল্লে হলেই বৌদি পয়সা খরচ করে তীর্থ দর্শন করে আসতে পারবেন।

বিনুদা একটু মনমরা হয়ে বল্লেন, দেবে না তাই বলনা কেন? widow sister mother and wife অর্থাৎ widow wife এর যদি পাস পাওয়া যায় তাহলে Brother-in-lawর পাস পাওয়া যায় না? ওকি একটা কথার মত কথা হল? যাক্ তোমাকে পিড়াপিড়ি আর করব না।

আমি বলিলাম বিনুদা, ৫।৫৪ মিঃ ট্রেনটা ধরব, আর দেরী করবনা, আর একদিন না হয় আসব।

বিনুদা আঁৎকে উঠে বল্লেন, আবার বারবেলায় পা বাড়াবার কথা বলছ। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার ঠেকে শেখা ঘটনাটী শুনে, যদি ইচ্ছা হয় তাহলে যাও আমি মানা করবনা।

আমি বলিলাম তবে বল তোমার experiment না হয় ৭টার ট্রেনেই বাড়ী ফিরব। তখন বিনুদা তাহার নিজের অভিজ্ঞতা এইরূপে বর্ণনা করিল। এইখানে পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিই যে বিনুদা স্কুলে এক এক শ্রেণীতে কয়েক বৎসর করিয়া বাস করায় ইংরাজি বুকনি তাহার কথার মধ্যে কেবল যে উঁকি মারিত তাহা নহে বেশ ভাল ভাবেই প্রকাশ পাইত।

বিনুদা বলিতে লাগিল—সেদিনটাও একটা বৃহস্পতিবার ছিল। বেলা প্রায় ২।২॥ টার সময় হঠাৎ একটা লাল কাগজের telegraph আমার Trade and commerceএর পীঠস্থান পানের দোকানে পাইলাম। হঠাৎ telegraph পাইয়া আমার ভ্যাবাচাকা লেগে গেল। খুলে দেখি করুণা, আমার Sister-in-law, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বড় জখম হয়েছে আর তাকে বর্দ্ধমানের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি বিশেষ একটু অবাক হয়ে গেলাম। বিনুদার Sister-in-law কি তাহলে বিশিষ্ট প্রগতি সম্পন্না নারী। মনে ভাবিলাম হবেও বা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার Sister-in-law ঘোড়ায় চেপে কি করেন।

বিনদা বলিল, করুণা যে বগিলার ডাক্তার। তার এত পসার যে নাইবার খাবার সময় পায় না। সেইজন্য একটা ঘোড়া রেখেছে। সেখানকার রাস্তা ত ভাল নয়, হয় পাল্কী, না হয় গরুর গাড়ী, না হয় ঘোড়া। একেই বলে বরাৎ। সামান্য fifth class পর্য্যন্ত পড়ে তিনটী বৎসর হুগলীর রামনাথ ডাক্তারের শিশি ধুয়ে, এক Sign Board লাগিয়ে সে একজন নামজাদা ডাক্তার। সম্বলের মধ্যে Quinine mixture, castor oil না হয় ত mag sulph। এখন ধুলোমুঠো তুললে কড়িমুঠো হয়। কথায় বলে না "ক্ষুধার নাম তরকারী, ঘুমের নাম মশারী, আর পরমায়ু পরম ঔষধি।"

আমার এখনও খটকা যায় নাই, আস্তে আস্তে বলিলাম তোমার শালী ডাক্তারী করেন কি রকম বুঝতে পাচ্ছি না।

বিনদা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লে শালী কি হে, করুণা আমার ভগিনীপতি, sister-in-law। যাক্ যা বলছিলাম। বর্দ্ধমানে যেতে হবে মনে করে একটু ভয় হ'ল। যতগুলি বকারান্ত ষ্টেশন আছে সবগুলিকেই আমি নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করি। আমি বলিলাম বকারান্ত ষ্টেশনের দোষ কি শুনি। বিনদা বল্লে গাড়ী হ'তে নূতন জুতা, ছাতা ও মাছ সরাতে বকারান্ত ষ্টেশনের Daily passenger গুলির একটু বিশেষ খ্যাতি আছে। এই যেমন ধরুণ কেন E. I, Ryর main line এর বালী, chord লাইনের Begumpore. E. B. Ryর বজবজ সেকৃশনের বালিগঞ্জ, main line এর বেলঘরিয়া, B, N, Ryর বাগনান, আমতা লাইনের বাঁকড়া, শিয়াখালা লাইনের বড়হাটী সব সমান। শীত কালের একটু ফুলকপি কিনে যে কামরায় কেউ মাছ নিয়ে যাচ্ছে সেই কামরায় উঠে মাছের কাছে নিজের ফুলকপিটী রেখে দিল এবং নেমে যাবার সময় ফুলকপির সঙ্গে মাছটী ও সংগ্রহ করে নিল। যদি মাছের অধিকারী সাবধানী ও হুঁসিয়ার

হন তা' হ'লে ধরে ফেললেই অম্লান বদনে বলে, আমি ফুলকপি কিনেছি আর মাছ কিনি নাই, এওকি একটা কথা মশাই। তাহার পর পিড়া পিড়ি হ'লে মাছটী রেখে বেপরোয়া ভাবে চলে যায় নচেৎ দ্যাখ ত তোর না দ্যাখত মোর। এই রকম ব্যাপার নিত্যই ঘটে। তবে যে ভদ্রলোক নাই তা বলছি না। কারণ অনেক সময়ে ভদ্রলোকেরাই ধরিয়ে দেন। যাক্ তারপর টেলিগ্রাফ খানি নিয়েই বাসায় রওনা হ'লাম। তোমার বৌদি শুনে বললেন, ঠাকুরজামাই যখন হাঁসপাতালে গিয়েছেন, না হয় কা'লই যেও, আজ আর বৃহস্পতিবারের বারবেলা যাবার দরকার নাই। এই কথা শুনেই আমার male spirit একবারে ফুটে উঠল, বল্লাম, তাত বলবেই, যদি তোমার ভগিনীপতি হত তাহলে যাধাত দিতেই না, বরং নিজেই accompaniment করবার জন্ত জেদ ধরতে আর কতকটা নাকের জল আর চোখের জল ফেলে ঘর দোর সব commit no nuisance করে ফেল্‌তে। বৃহস্পতিবার তা কি হয়েছে? এত বড় ইংরাজ রাজত্ব English mail থেকে আরম্ভ করে মাড়য়ারীদের import, diport সবই ত বৃহস্পতিবারেই হচ্ছে। কই তাদের ত কখনও বারবেলা লাগে না? ওসব বাজে কথা বলে মন খারাপ করে দিও না। তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আমি তখনই ৪৷৷০ টার ট্রেনে যাব শুনে তাড়াতাড়ি গরম জল করে খানিকটা orange peacock চা একটু condemned milk দিয়ে ছকাপ চা তৈরি করে দিলে। আমি দু চুমুকে সেরেই আমার সখের পকমলের কোটটী হাতে ফেলেই বেরিয়ে পড়লাম। যখন হ্যারিসন রোড দিয়ে আসছি দেখতে পেলাম, একখানি থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে বুড়ো, বুড়ী, ছেলে, মেয়েতে ভর্ত্তি এবং ছাদের উপর বাক্স, প্যাঁটরা, বিছানা, ছেলের দোলনা, মায় কুলের আচারের হাঁড়িটী পর্য্যন্ত ঠেশাঠেশিত এবং শোভিত হয়ে আমার আগে আগে চলেছে। গাড়ীর পিছনে চাকা রাস্তার উপর অনবরত বাঙলা হরফের চার আর ইংরাজি অক্ষরের আট আঁকিতে আঁকিতে চলিয়াছে। বিশ্বপ্রবার বংশধর অশ্বিনী কুমার যুগল বিক্ষুপঞ্জর বাহির করিয়া কোচম্যানের অবিরত পিতৃ মাতৃ ও উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম ধরিয়া অখ্যাতি শুনিতে শুনিতে এবং চাবুকের বাঁট ও Dalhousie kick হজম করিয়া চলিয়াছে। কেন মনে পড়ে না, হঠাৎ আমার মনে হইল যে এখন যদি একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গাড়ীখানি আরোহী সমেত রাস্তার এক অংশ দখল করে তাহা হইলেও কি বৃহস্পতিবারের বার বেলার দোষ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সত্য সত্যই পিছনের একখানি চাকা ট্রাম লাইনের ভিতর হইতে বাঁকিয়া উঠিবার সময় ভাঙ্গিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত্তনাদ কোলাহল, কান্না এবং ছাদের সমস্ত জিনিস রাস্তায় ভীষণ শব্দের সঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। আমিও বর্দ্ধমান, ৪৷৷০ টার ট্রেন, বার বেলা টিকিট কেনা সব ভুলিয়া গিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে সকলকে বাহির করিবার জন্ত সাহায্য করিতে লাগিলাম। একে দিনের বেলা, তার হ্যারিসন রোডের উপর, এবং স্কুল কলেজের ছুটীর পর লোকের ভিড়ে আমি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। constable, mountain police, দোকানী, রাহীলোক সকলে ভাঙ্গা গাড়ী ও আরোহীদেরে একেবারে surrender করে ফেল্লে। এই শুভ সুযোগ যাহাতে হেলায় না যায়, একটী উদার চরিত এবং বসুধৈব কুটুম্বকম্ লোক ছোট একটী বাক্সের মত জিনিস যাহা গাড়ী ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তোরঙ্গ হইতে ছটকাইয়া দূরে পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে সরাইয়া লইয়া একটু জোরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া একটী স্কুলের ছেলের নজরে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চোর পালায়, বলিতে সকলেই ধাবমান চোরের পিছনে পিছনে ছুটিয়া যাইয়া ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই বামাল সমেত চোরকে বেদম প্রহার করিতে করিতে ভাঙ্গা গাড়ীর কাছে আনিয়া হাজির করিল। এমন মার সহ্য করবার ক্ষমতা ঐ উদারচরিতগণ ছাড়া আর কাহারও আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাই হউক, যাহার জন্ত ঐ বেদম প্রহার সেই বামাল বাহির করিয়া দেখা গেল, একটী দুই আনার ছোট্ট টিনের বাক্স এবং তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল, একটী চিনামাটীর পুতুলের কবন্ধ ও খঞ্জ দেহ, একটী পুঁতির মালা, ৩।৪ খানি ছোবান রঙ্গিন স্তাকড়া টেলিফোন ট্রেডমার্ক কাপড়ের একখানা

ছবি, এক টুকরা ভাঙ্গা শ্লেট পেন্সিল ও একটী Dunlop rubber solution এর ছোট এবং চোপসান টিউব। চোর মনে করিয়াছিল ক্যাশ বাক্সে না জানি কত দামী দামী হীরা মতির গহনাই না আছে। সে ঐসব জিনিস দেখিয়া বলিল এই ত জিনিস এর জন্য আর পুলিশ পুলিশ কেন মশাইরা। দুটো কান মলে ছেড়ে দিন গায়ের ব্যথা মারতে এখন অন্ততঃ ১৫ দিন বিছানায় আশ্রয় নিতে হবে। সমবেত সদাশয় ভদ্রলোকেরা তার কান মলে দেওয়ার প্রার্থনা পর্য্যন্ত না মঞ্জুর করে তাকে honorably acquitted করে ছেড়ে দিলেন ও অন্য একখানা গাড়ী ডেকে এনে সচল এবং অচল মাল পত্র-গুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রওনা করিয়া দিলেন।

তখন বর্দ্ধমান যাবার হুস এল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে এমন কি ভদ্রতাসুলভ ধন্যবাদ আদান প্রদান পর্য্যন্ত না করিয়া সোজা হাওড়া ষ্টেশনে run over।

ষ্টেশনে গিয়ে বড় ঘড়িতে দেখি যে পুরা ৪টা বাজিয়াছে। আমি Enquiry officeএ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বর্দ্ধমান যাবার ট্রেন ৫নং প্ল্যাটফরম হইতে ছাড়ে। Trainএর time ৪া০টা জানা আছে এবং ঘড়িতে ৪টা বাজিয়াছে দেখিয়া একটু হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তখন ধীরে সুস্থে একখানি টিকিট করিয়া third class waiting hall ঘুরিয়া ঘুরিয়া Iraq Railway, Westminister Abbey, Zoological garden এর জিরাফ, Elgin ও Arbind mill এর বিজ্ঞাপন হইতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিসের নানা রংএর ও রকমের তালিকা পড়িতে লাগিলাম।

একটী বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে গিয়া দেখি তাড়াতাড়িতে দেশালাইটা বাড়ীতে ষ্টোভ ধরাইবার সময়ে গৃহিণীর হস্ত হইতে আর পুনরুদ্ধার করা হয় নাই। সেই বিড়ীটী একবার মুখে একবার কানে একবার হাতে করিয়া ঘুরিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম যে একজন লোক দেশলাই জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইতেছে। তাহাকে কাটি ফেলিও না ফেলিও না বলিতে বলিতে সে ফেলিয়া দিল। তাহার নিকট হইতে একবার দিয়াশালাইটা চাহিতে জবাব পাইলাম যে দিয়াশালাই বড় মাগ্গি এবং যে বাক্সে ৪০ কাটির বেশী না থাকে তাহার দাম এক পয়সা। মুখের বিড়ি মুখে করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম একজায়গায় লেখা রহিয়াছে—gentlemen। মনে হইল নিশ্চয়ই ভদ্রলোকদের বিশ্রাম স্থান এবং তাঁহাদের নিকট একবার দিয়াশালাই চাহিলে নিশ্চয়ই পাইব। কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখি ওঃ হরি gentlemen মানে পায়খানা। মনটা বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই বিগড়াইয়া আছে তাহার পর ঘোড়ার গাড়ী বিভ্রাট, দিয়াশালাইএর মহার্ঘতা প্রভৃতি অপূর্ব্ব উপদেশ এবং translation এর আদ্যশ্রাদ্ধ gentlemen মানে পায়খানা দেখিয়া আর কাহারও নিকট দিয়াশালাই না চাহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম লাল লাল বালতি ঝুলিতেছে এবং তাহাতে fire লেখা। দেখিয়া মনটায় রেল কোম্পানির উপর একটু শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল এবং সময় নষ্ট না করিয়া একটু ন্যাংচাইয়া বালতির মধ্যে বিড়িটি প্রবেশ করাইয়া দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনের ও মুখের যে ভাব বিপর্য্যয় ঘটিল চেনা লোক থাকিলে একটু করুণা না দেখাইয়া থাকিতে পারিত না। বালতির ভিতর হইতে যখন হাত বাহির করিলাম তখন দেখি আমার সাধের এবং সখের পক্‌মলের কোটের আস্তিন সুদ্ধ বিড়িটী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আবার সেই translation এর আদ্যকৃত্য—fire মানে রেলের অভিধানে জল। তখন ছুত্তোর বলে, বিড়িটা ছুড়ে ফেলে একেবারে ৫নং প্ল্যাটফরমের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

ঘড়িতে ৪া০ টা বাজিয়া কয়েক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল। মনে হইল বোধ হয় মালপত্র উঠাইতে এবং আরোহীদের সুবিধার জন্য কিছু দেরী করিয়া গাড়ী ছাড়িতেছে। যাই হউক, সব দুঃখ কষ্টের অবসান হইল ভাবিয়া একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিব ভাবিতেছি এমন সময় দেখিলাম, train খানি Bally ষ্টেশনের দিকে না গিয়া বাঁদিকে চলিতেছে। আমি উৎসুক দৃষ্টিতে বালি ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি একজন passenger বলিলেন আপনি কি ঠিক গাড়ীতে আসেন নাই। আমি বলিলাম বর্দ্ধমান যাইব বলিয়া ৪া০ টার ট্রেন

Enquiry office হইতে জানিয়া ৫নং প্ল্যাটফরমের ট্রেনে চাপিয়াছি। সেই passengerটী বলিলেন এটা ৪।৫৬ মিঃ ছাড়ে অর্থাৎ পাঁচটার ট্রেন এবং চন্দনপুর পর্য্যন্ত যাইবে। ৪।০টার ট্রেন অর্থাৎ ৪।৬ মিঃ ট্রেন ৫নং প্ল্যাটফরম হইতেই আগে চলিয়া গিয়াছে। একই প্ল্যাটফরমে এখন দুখানি ট্রেন থাকে তখন আমার সব হাল মালুম হয়ে গেল এবং বেশ বুঝতে পারলাম যে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়া প্রথমতঃ জিব ও গলা গরম চায়ে পোড়ান, দ্বিতীয়তঃ গাড়ী ভাড়া, তৃতীয়তঃ দিয়াশালায়ের মিতব্যয়িতায় অনাহুত উপদেশ, চতুর্থতঃ gentlemen মানে পায়খানা, পঞ্চমতঃ fire মানে জল, ষষ্ঠতঃ ৪।০টা মানে রেলের ৪।৬ এবং সপ্তমতঃ আমার miscarriage, তার পর পড়ুর ষ্টেশন ডানকুনি হইতে রাত্রে ডায়মণ্ডকাটা চারটী মাইল রাস্তা double march করে উত্তরপাড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৯টার ট্রেনে রওনা হইয়া রাত্রি ১১টার সময় বর্দ্ধমানে নামিয়া সারারাত্রি অনাহার, দুশ্চিন্তা মশার কামড় এবং দেশোয়ালী ভায়াদের নাসিকা গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে মুসাফির খানায় রাত্রিবাস। আমি এই সঠিক বর্ণনা শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক ততক্ষণে বারবেলা কাটিয়া গিয়াছিল এবং বিনুদা ও বৌদিকে আবার দর্শন দিব প্রতিশ্রুতি দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

মরণে

শ্রীমনোরমা ঘোষাল

হৃদয়ে জাগিত বড় বিরহের ভয়
মরণে সে ভয় মোর গিয়াছে টুটিয়া;
ভাঙ্গিয়াছে এবে সেই উদ্বেগ সংশয়
রহিব কেমনে আমি, তোমারে পাসরি।
তুমি মোর সর্ব্বস্ব করি অধিকার,
পাসরি থেকনা মোর প্রেম পারাবার।
শত স্মৃতি বিজড়িত জীবন আমার
তোমার মিলন সুখ ভুঞ্জে অনুক্ষণ।
নির্ম্মল প্রণয়ে চিত্ত ছিল ভর পুর,
এখন আছ গো, কোথা বল কতদূর?
সরল উদার প্রাণ কর্ত্তব্যে অটল,
দীন, দুঃখী স্মরি তোমা ফেলে আঁখিজল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগেরই মানুষ—এযুগেরই বহু জ্ঞানী বিজ্ঞানবিদ আধুনিক নরনারী ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ও তাঁহার জ্ঞান গর্ভ বাণী শুনিয়া ধন্য হইয়া



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

গিয়াছেন। বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহারই শিষ্যবর্গ নিঃসম্বল অবস্থায়ও শুধু ঠাকুরের আশার্ব্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া জগৎজয়ী হইয়াছেন। ভারতে নানা ধর্ম্মের সমন্বয় কি ভাবে হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহা সুন্দর ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সমন্বয় পন্থায় বিজ্ঞান গর্ব্বী পাশ্চাত্য পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ। বর্ত্তমান ধর্ম্মান্ধতার যুগে ভগবান রামকৃষ্ণের বাণীর প্রয়োজনীয়তা আছে। আজ ভগবান রামকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রম, রামকৃষ্ণ সাহিত্য এ সব ভারতের এক মহান সম্পদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম চন্দ্রাদেবী। তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল গদাধর।

গদাধর বাল্যকাল হইতেই সাধারণ শিশু অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন।

ধনি কামারনী গদাইয়ের জন্মকাল হইতে তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন। তাঁহার বাসনা—গদাইয়ের উপনয়নের সময় ভিক্ষামাতা হন। উপনয়নের দিন বালককে সেই কথা জানাইলেন। বালক তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। সকলে এই কথা শুনিয়া অবাক্—শূদ্রের দান বংশের কেহ কখনও গ্রহণ করে নাই। আজ শূদ্রাণী ভিক্ষামাতা হইয়া অগ্রে ভিক্ষা দিবে—তবে অন্য সকলে ভিক্ষা দিতে পাইবে? পিতা কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। গদাইকে অনেক বুঝাইয়াও মত ফিরাইতে পারা গেল না। বালক কেবল বলিতেন—"ঐ ধনিই আমার ভিক্ষামা হবে।"

নিরুপায় দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার পিতার অনভিমতেই ধনিকে গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হইতে দিলেন।

একদিন ধনি কামারনী নিজ বাড়ীতে রান্নায় ব্যস্ত এমন সময় গদাই যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ধনি বালককে মাঝে মাঝে নিজ বাড়ীতে আনিয়া নিজের হাতে রান্না করা খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহাকে খাওয়াইতেন। আজ অযাচিতভাবে গদাই স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ধনীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। বালককে খাওয়াইবার জন্য ধনীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গদাইকে যত্নের সহিত গৃহমধ্যে বসাইয়া, চিংড়ি মাছের তরকারী অতি উত্তম প্রস্তুত হইয়াছে—একথা জানাইয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন—"যদি খাস ত ভুলতে পারবিনি।" গদাই হাসিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং অতিশয় আনন্দে ধনী কামারনীর দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিলেন।



ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরের পৈতৃক ভবন

পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন—উদ্দেশ্য কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করা। লেখাপড়া হইল না। ঘটনাচক্রে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির

কালীবাড়ীতে পূজকের পদে নিযুক্ত হইলেন। গদাধরও ভ্রাতার সহিত মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকুমার অসুস্থ ও অক্ষম হইলে গদাধর পূজকপদ গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজাভার গ্রহণ করেন। এই ঘটনাই গদাধরের জীবনে একটি স্মরণীয় ব্যাপার। কেননা প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই তাঁহার চরিত্রগঠনের ও সাধক জীবনের আরম্ভকাল বলা যাইতে পারে। গদাধর ঠিক গতানুগতিকভাবে



পরমহংসদেব ও তাঁহার হস্তাক্ষর

পূজা করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার স্বভাবতই অন্তর্মুখী মন পূজার বস্তুকে লইয়া তন্ময় হইয়া গেল।

মনের গতি পরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয় বর্গের চেষ্টায় ১২৬৬ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহ তাঁহার মনকে পরিবর্ত্তিত করিল না। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগকে তিনি ধর্ম্মজীবনের প্রধান সোপান বলিয়া জানিতেন। সেইজন্য তিনি ঐহিকভাবে তান্ত্রিকমতে সাধনা করিয়া তন্ত্রের বিবিধ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করেন।

কিন্তু এইখানেই তাঁহার সাধনার শেষ হইল না। তিনি অপরাপর মতের ও সম্প্রদায়ের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য ১২৭১ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তোতাপুরীর নিকট



ভাবসমাধিমগ্ন ঠাকুর

স্ত্রীকে কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই। তিনি উত্তর জীবনে স্ত্রীকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মজীবনে উন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন।

১২৬৮ সালে জনৈকা তান্ত্রিক সাধিকা দক্ষিণেশ্বর দেবীমন্দিরে আগমন করেন। তাঁহারই সাহায্যে তিনি বেদান্ত সাধনা গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার নামকরণ হয় রামকৃষ্ণ। ১২৭১-১২৮০ সাল পর্য্যন্ত তিনি বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি মতের ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনি আসিয়া উপস্থিত

হয় শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু ভক্ত ও শিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি এই সময় তাঁহার নিকট ধর্মলাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ নামক একজন যুবকও ছিলেন। এই যুবকই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই যুবককে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, পরবর্তীকালে যে রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহার নামে গঠিত হইয়াছে তাহার গঠনের বীজ বপন করিয়া যান।

শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি লোক কল্যাণ সাধন করিয়া ১২৯২ সালে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়

"আন্তরিক হলে সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খৃষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। বৈষ্ণব বলে—আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছু হবে না; শাক্ত বলে—আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা—তাঁকে



শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণী

না ভজলে কিছুই হবে না। খৃষ্টানেরা বলে—আমাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম না মানলে কিছুই হবে না। এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।

বস্তু এক নাম আলাদা, সকলেই এক জিনিষকে চাচ্ছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী—সকলেই এক বস্তুকে চাইছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা নাম একটা পুকুরের অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে—বলছে জল। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ডোল করে—তারা বলছে পানী। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে ওয়াটার। যদি কেউ বলে—না, এ জিনিষটা জল নয়—পানী; কি পানী নয়—ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়—জল; তা হলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া—ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি কাটাকাটি—এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই—তাঁকে লাভ কচ্ছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায় আর কারুকে চায় না।

"ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই—কেবল নামে তফাৎ। কেউ বলছে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলছে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যিশু, দুর্গা। এক রকম তাঁর হাজার নাম।"

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

আবার কেউ কেউ বলে,—আমরা নিরাকার বলছি অতএব ঈশ্বর নিরাকার, সাকার নন; আমরা সাকার বলছি অতএব তিনি সাকার, নিরাকার নন। এই বলে আবার ঝগড়া কচ্ছে,ও এর সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে—হিন্দু মুসলমান ব্রহ্মজ্ঞানী শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সব পরস্পর ঝগড়া। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো, "আমার বিশ্বাস এইরূপ, আরও কত কি হতে পারেন—তিনি জানেন, আমি জানি না; বুঝতে পারি না।" মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি আর চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তা হলে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।"

প্রতিমা পূজা

দেখ ছোট মেয়েরা পুতুল খেলে কত দিন? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস হয়। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমা পূজায় কি দরকার?" (কথামৃত)



দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির

অবতার

ভবানীপুরের একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই বন্ধুকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য তিনি বলিলেন, 'আজ একজন খৃষ্টীয় প্রচারককে আপনার নিকট এনেছি। তিনি আমার কাছ থেকে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে খুব ব্যগ্র ছিলেন।' রামকৃষ্ণ



স্বামী বিবেকানন্দ

তখন ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমি যীশুর পায়ে বার বার প্রণাম করছি।' তাহার পর এইরূপ কথোপকথন হইল :—



শ্রীশ্রীভবতারিণী

খ্রীষ্টান বন্ধু—আপনি যীশুর পায়ে প্রণত হচ্ছেন এ কেমন কথা? আপনি তাঁকে কি মনে করেন?

রামকৃষ্ণ—কেন আমি তাঁকে ঈশ্বরের একজন অবতার মনে করি।

বন্ধু—ঈশ্বরের অবতার! আপনি কি দয়া ক'রে বলবেন আপনার কথার অর্থ কি?

রামকৃষ্ণ—আমাদের রাম বা কৃষ্ণের মত একজন অবতার। সমুদ্রের কথা ধর না। মহাসাগর বিশাল ও প্রায় অপার জলরাশি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে, মহাসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে, জল জমে বরফ হয়ে যায়। যখন তা জমে বরফ হয়, তখন তা সহজে নাড়া-

ছাড়া করা এবং বিশেষ বিশেষরূপে ব্যবহার করা যায়। অবতার কতকটা তার মত। যেমন মহাসমুদ্র, তেমনি আছেন জড়ের ও চেতনের মধ্যে অনন্ত শক্তি; কিন্তু কোন কোন উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ঐ অনন্ত শক্তির এক একটি অংশ যেন ইতিহাসে মূর্ত্তিমান হন। তাঁকে তোমরা বল মহাপুরুষ, মহামানব। কিন্তু তিনি ঠিক বলিতে গেলে সর্ব্বব্যাপী ঐশশক্তির স্থানীয় প্রকাশ, অর্থাৎ কি না ভগবানের এক অবতার। মহাপুরুষদের মহত্ত্ব সারঃ: ঐশীশক্তির প্রকাশ।

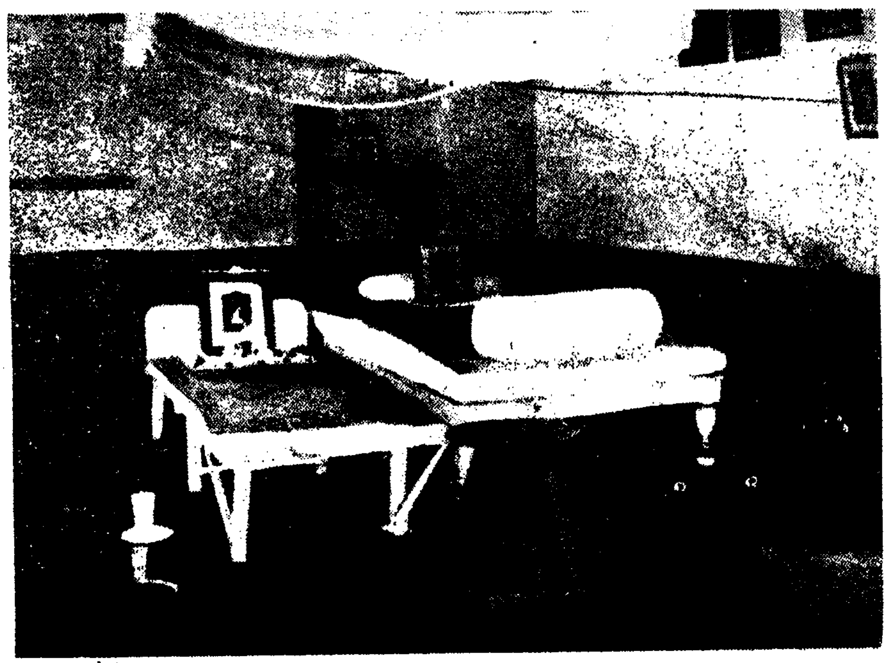
আর কোনও তীর্থস্থানে যাত্রা করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি?

"মানুষের পবিত্রতাই স্থানকে পবিত্র করে, নইলে একটা বিশেষ স্থান কেমন করে মানুষকে পবিত্র করতে পারে?"

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন। তিনি আমাদের মধ্যেও আছেন।

ভগবানের স্তবস্তুতি

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি)। ব্রহ্মজ্ঞানী



দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শয়নগৃহ

তীর্থস্থান

"অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানে ডেকেছেন...কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে এসে আমার স্বরূপ দেখ' এই বলে তিনি তাঁকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওটা কি দেখছ?' অর্জ্জুন জবাবে বললেন, 'একটা বড় জাম গাছ, তাতে থোবা থোবা জাম ঝুলছে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'না বন্ধু, আর একটু এগিয়ে কাছে গিয়ে দেখ। ওগুলো কালো জাম নয়, ওগুলো অনন্ত কোটী শ্রীকৃষ্ণ।'—

অতো মহিমা বর্ণন করেন কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ' এসব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ, বাবুকে দেখতে চায় ক'জন। বাগান বড় না বাবু বড়।

"নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, 'তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের ক'খানা বাড়ী?"

কি জান? মানুষ নিজের ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব'লে, ভাবে, ঈশ্বরও আদর করেন; ভাবে তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করলে তিনি খুসি হবেন।



দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী—এখানে ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেন।

বাজে আচার

যারা বাজে আচারকে ধরে আছে, তাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"এমন অনেক লোক আছে পূজাআর্চ্চার সময় যাদের জিহ্বায় যত রাজ্যের কথা এসে জমা হয়। কথা বলা নিষেধ, তাই উঃ, আঃ করে। 'এটা এনে দে··· এটা নিয়ে যা...থু থু!...' সঙ্গে সঙ্গে জপ চলছে। আর জেলে এসেছে মাছ নিয়ে, তার সঙ্গে কথা চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জপের মালা ঘুরছে. আর আঙুল দিয়ে মাছ দেখিয়ে দিচ্ছে।... এক রমণী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে, তখন তার মন ভগবানের চিন্তায়ই ভরে থাকবার কথা. কিন্তু তা-ত নয়, সে হয় ত পাশের সঙ্গিনীকে শুধাচ্ছে, হ্যাঁগা, তোমার ব্যাটা বৌয়ের কি কি গয়না তারা দিলে?...জান, অমুকের বড় ব্যামো, বাঁচবার আশা নেই।...আচ্ছা, ওদের বিয়েতে যৌতুক কি ভাল দিবে না?...হরিশ আমায় বড় শ্রদ্ধা করে, একদণ্ড আমায় ছাড়া তার চলবে না।...অনেক দিন আসতে পারি নি দিদি, কেমন আছ? নাতনীর বিয়ে, তাই বড় ব্যস্ত ছিলাম।··· গঙ্গা স্নানের পবিত্রতার কথা তার মনে এতটুকু নেই, যত বাজে কথায় মন তাঁর ভরে আছে। কেবল আচরণকে একান্তভাবে ধরে আছে।"

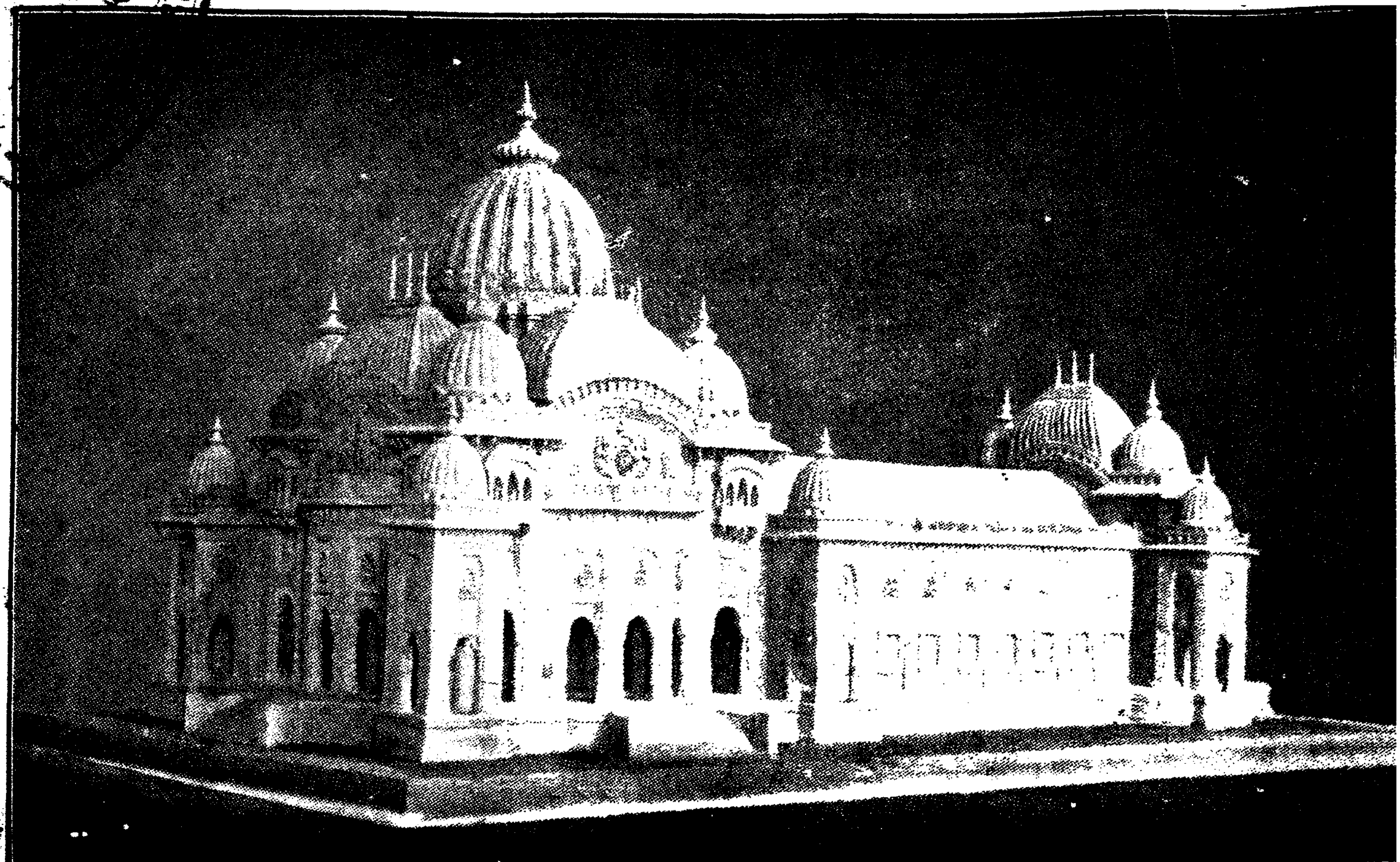
তিনি বলিতেন—

"কোন কোন খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলতে বোঝেন—'আমি পাপী, আমি পাপী'—এই রকম একটা মনোভাব। তাদের কাছে ভক্তের আদর্শই হচ্ছে এই যিনি প্রার্থনা



বেলুড়ে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির

করেন এই বলে, 'হে প্রভু, আমি পাপী। আমার সকল পাপ মার্জ্জনা করে দাও।' তাঁরা ভুলে যান যে, পাপের জ্ঞানই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম ও সর্ব্বশেষ ধাপ। তাঁরা আচরণের শক্তিকে গণনার মধ্যেই আনেন না। তুমি যদি বল, 'আমি পাপী' তাহলে চিরকালই পাপী



স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত মন্দির। ইহা বেলুড়ে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইতেছে

হয়েই থাকবে।'...বরং তোমার বলা উচিত 'আমি মুক্ত' আমার বন্ধন নাই···কে আমারে বাঁধতে পারে? আমি সকল রাজার রাজা ভগবানের সন্তান'...তোমার এ ইচ্ছাকে খাটাও, তাহলেই হবে মুক্ত! যে বোকা কেবলই বলে বেড়ায় 'আমি দাস', সে শেষে পর্য্যন্ত খাঁটি দাসই বনে যায়। যে হতভাগ্য কেবলই বলে, 'আমি পাপী' সত্য সত্যই সে পাপী হয়ে পড়ে। সেই লোকই মুক্ত যে বলে "আমি জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। আমি স্বাধীন। তিনি কি আমাদের পিতা নন?" বন্ধন হচ্ছে মনের, আবার মুক্তি,···হচ্ছে মনের।···



প্রভিডেন্সে (আমেরিকা) বিবেকানন্দ সোসাইটীর গৃহ

সংসার ও বৈরাগ্য

পরমহংসদেব বলিতেছেন—

তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়! গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হ'লো। তিনি বল্লেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হ'লো। তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্টকে পাঠিয়ে দিলেন।

বশিষ্ট বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বলছো? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর-ছাড়া। যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার—ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই, তা হলে তুমি সংসার ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন,—কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

সংসারের নানা উদ্বেগ ও কর্ত্তব্যের মধ্যে পারমার্থিক বিষয়ে কিরূপে মনঃসংযোগ করা যায়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া পরমহংসদেব বলেন,—

"ঢেকিতে মেয়েদের চিঁড়া তৈরি করতে দেখেছ। ঢেকির মুশল যে গর্ত্তটিতে ক্রমাগত পড়ে ও তার থেকে ওঠে, তার কাছে একটি স্ত্রীলোক ব'সে থেকে তাতে ধান দেয় আর কুটা ধান সাবধানে সরাতে হয়, নইলে তার আঙ্গুলগুলি থেতলে যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটির কথা ভাব। আর এও বিবেচনা কর যে, সে তখন অন্য কাজেও ব্যাপৃত থাকে। তার কোলে একটি শিশু আছে, তাকে সে মাই দিচ্ছে, হাতটা দিয়ে কুটা ধান রোদে দিবার জন্যে ছাড়াচ্ছে, অপর একজন প্রতিবেশীকে কিছুক্ষণ আগে যে চিঁড়া দিয়াছিল তার সঙ্গে তার দামের কথাও বলছে। ঐ স্ত্রীলোকটির মন সকলের আগে সকলের চেয়ে বেশী কিসে আছে মনে কর? নিশ্চয়ই সেই ঢেকির গর্ত্তে ঢুকান হাতটিতে যাতে করে মুশলে হাতটা থেতলে না যায়। সেই রকম তোমরা এই সংসারে নানা ব্যাপারে লিপ্ত থেকো, নানা কর্ত্তব্যে ব্যস্ত থেকো, কিন্তু সকলের আগে সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়ে, যাতে তা নষ্ট না হয়।"



হলিউডে (আমেরিকা) বিবেকানন্দ ভবন

লোকশিক্ষা দান

লোকশিক্ষা দান সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলেন,—"জ্ঞান লাভ করে চুপ করে থাকলে লোকশিক্ষা কি করে হবে? বিজ্ঞানী স্বার্থপর নয় যে আপনার হলেই হলো। সে আম সব্বাইকে দিয়ে খায়, আপনি খেয়ে মুখ মুছে বসে থাকে না।



বরাহনগরে পরমহংসদেবের সমাধিক্ষেত্র। এখানে বর্ত্তমানে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আমি।

—

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উহাদের পূর্ব্বে জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানশাস্ত্র কখনো এতো উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এই যুগে ইহার চরম উৎকর্ষ। বায়ু পুরাণও এই যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পুরাণগুলিও যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকিলেও এই যুগেই পুনঃ সঙ্কলনের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সাহিত্য ক্ষেত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি ভারত স্থান কাল বিবেচনায় সর্ব্বসময়েই তার ধর্ম্ম আচার রীতিনীতি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইয়াছে এবং তদনুযায়ী তৎকালীন হিন্দু সমাজও নিজেকে মানাইয়া (adjust) লইতে কখনো বিশেষ আপত্তি করে নাই। ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মনীতি যাহা যুগে যুগে সঙ্কলিত হইয়া প্রথম সৃষ্টি কালের সহিত পার্থক্য বক্ষে লইয়া অধুনা অনুসৃত হিন্দু শাস্ত্রের ধর্ম্মগ্রন্থরূপে যদি স্থান পাইতে পারে তবে আজিকার যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের বা সমাজনীতির যুগোপযোগী অদল বদলে সনাতন হিন্দু সমাজ এত আপত্তি উত্থাপন করেন কেন?

তাহারা কি এইটুকু চিন্তা করেন না যে পুনরায় ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্মাধীন করা সম্ভবপর না হইলেও এক সমাজনীতি ও আচারগত নীতির অনুবর্ত্তী করিয়া না লইতে পারিলে ভারতের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। অবশ্য এক সম্প্রদায় এক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। তাহারা হয়তো বলিবেন যে তখনকার যুগের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্ভব ছিল কারণ তাহা রাজানুমোদিত ছিল। কিন্তু এ তর্ক তাহাদের যুক্তি সাপেক্ষ নহে। কারণ হিন্দুযুগে আমরা কি পাইলাম? দেখিলাম রাজা হয়তো বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বা শৈব কিন্তু তিনি তদানীন্তন সমস্ত ধর্ম্মের সহিত খাপ খাওয়াই (adjust) লইলেন। অবশ্য তখন রাজশক্তির এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার হেতু ছিল যে তখন দেশের সর্ব্বসাধারণ যুক্তি অনুসরণে শিক্ষিত ছিল না। কিন্তু অদ্য সে তর্ক অচল। কারণ ভারত এখন বাছিয়া লইতে শিখিয়াছে কোনটী তাহার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ধাতে সহ্য হইবে এবং কোনটী তাহাকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইবে। প্রমাণ স্বরূপ আজি ভারত তাহার সামাজিক সভ্যতার রীতিনীতি বহু পশ্চাতে ফেলিয়া এক নব পন্থা উদ্ভাবনে দেশ মধ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়া তুলিয়াছে। ইহা কি রাজানুমোদিত? কিম্বা রাজা কি ইহার প্রচলনের জন্য ভারতবাসীকে কোন বাধ্যতামূলক আইন প্রচলনে বাধ্য করিয়াছেন? যদি তাহা না হয় এবং যদি ইহা ভারতবাসীর প্রয়োজনানুমোদিত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে, উপরোক্ত রীতি নীতির পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভারতের সমগ্র জাতির প্রয়োজনানুমোদিত রীতিনীতি প্রচলনের বেলায় রাজশক্তির সাহায্যের দোহাইর কথা উঠিবে কেন? হ্যাঁ, আছেন একদল গোঁড়া হিন্দু যাহারা কোন পরিবর্ত্তনের নাম শুনিলেই যেনো আঁৎকাইয়া উঠেন কিন্তু তাহাদের এইসব হাব ভাব দেখিয়া এবং যুক্তিতর্ক শুনিয়া আমার কেবলই বলিতে ইচ্ছা হয় আপনারা একবার দয়া করিয়া কি ইতিহাস অনুসরণ করিয়া ঘটনা রাজ্যে পদার্পণ করিবেন না? আজি যে রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের নামে আপনারা আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিতেছেন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে যদি ভারতে সমগ্র জাতিকে আপনারা বক্ষে টানিয়া লইতে না পারেন তবে হয়তো আপনাদের এই হিন্দু সমাজের নাম আর বহুদিন পৃথিবীবক্ষে রক্ষিত হইবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে।

একবার ভারতের চতুর্দ্দিকের ঘটনারাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। দেখিতে পাইবেন চতুর্দ্দিকে তুষানলের ন্যায় সেই অগ্নি তিল তিল করিয়া আপনাদিগকে তাহার গর্ভস্থ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। অতএব পূর্ব্ব রীতি অনুসরণে আপনারা আপনাদের সঙ্কীর্ণতা পরিবর্জ্জন করিয়া একবার বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধদেব যেমন সমগ্র ভারতকে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন সেইরূপ আবার স্বীয় সামাজিক বক্ষে টানিয়া লউন।

ইতিপূর্ব্বে মৌখরী বংশের ইতিহাস আলোচনা কালে গ্রহবর্ম্মন যে প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন সে কথা লিখিয়াছি এবং গ্রহবর্ম্মন যে মালব রাজ দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন ও তাহার পত্নী রাজ্যশ্রী যে বন্দী হন এ কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এখন আমার আলোচ্য প্রসঙ্গ থানেশ্বরের রাজবংশ।

রাজশ্রীর পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রাজবংশ পূর্ব্ব পাঞ্জাবের একটী ক্ষুদ্র জিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন এবং দিল্লীর সন্নিকটে স্থানেশ্বরে রাজধানী স্থাপিত ছিল। ইনি গুর্জ্জর ও মালবদিগকে ও হুন দিগের সমস্ত অন্যান্য শাখাকে বালাদিত্য, যশোধর্ম্মন এবং মৌখরীগণের ন্যায় পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। তাহার শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ খ্যাতি আছে। প্রভাকর বর্দ্ধনের বিষয় আর বিশেষ কিছু লিখিলাম না।

প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হুনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মালবের গুপ্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মণের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।—কিন্তু সেই সময়েই তিনি পশ্চিম বঙ্গের গৌড় বা কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হন।

হায়রে! সপ্তম শতাব্দীতেও বাঙ্গালী বিশ্বাস ঘাতকতার ঘৃণিত আখ্যায় লাঞ্ছিত হওয়ার দায় এড়াইতে পারিল না। বাঙ্গালা! বিশ্বাস ঘাতকতাই কি তোমার ভাগ্যলিপি? কি লজ্জা!

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে রাজ্যবর্দ্ধনের পারিষদ ও অমাত্যবর্গ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসন গ্রহণে তেমন আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় হর্ষবর্দ্ধন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজা উপাধি গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এ ষোড়শ বর্ষীয় বালকের উপর তখন রাজকার্য্য ও উত্তর ভারতের অরাজকতা দমনের গুরুভার আসিয়া পড়ে। এই ইতিহাসের সহিত মোগল কুলতিলক জলাল উদ্দিন আহম্মদ বা পরে মহাত্মা আকবরের রাজ্য গ্রহণের ইতিহাসের সহিত অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়। একটী প্রবচন আছে যে প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের প্রতিভা বাল্যেই বিকশিত হয়। এখানে মহাত্মা আকবর প্রসঙ্গের অবতারণা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে হর্ষবর্দ্ধন ও জলাল উদ্দীনের বাল্যজীবনের একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এইখানে উল্লেখ করিলাম।

হর্ষবর্দ্ধনকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে শুধু যে তাঁহার অমাত্যবর্গ অনুরোধ করেন এমন নহে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গ্রহবর্ম্মণের অভাবে ও তদীয় পত্নী রাজ্যশ্রী শশাঙ্ক বন্দিনী স্বরূপ অবরুদ্ধ হওয়ায় কান্যকুব্জ রাজ্যও অধিনায়কহীন হইয়া পড়ে। রাজ্য শাসনে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। একজন প্রবল অধিনায়ক ভিন্ন রাজ্যে শৃঙ্খলা পুনঃ সংস্থাপিত হইবে না বলিয়া হর্ষবর্দ্ধনকে শূন্য অধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কান্যকুব্জের অমাত্যবর্গ ও রাজ্যবাসীগণের আগ্রহাতিশয্যে হর্ষবর্দ্ধন অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ ও থানেশ্বর উভয় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই প্রতিজ্ঞা করেন শশাঙ্ককে ভ্রাতৃহত্যার যথোচিত শাস্তি দিতে হইবে এবং ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে হইবে। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাইয়া শত্রুগণ রাজ্যশ্রীকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু তিনি মুক্তি পাইয়া অপমান ও লজ্জায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। বহুদিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের পরে বিন্ধ্যপর্ব্বতে অরণ্যমধ্যে হর্ষবর্দ্ধন

ভগিনীর সাক্ষাৎ পাইলেন। সেই সময়ে রাজ্যশ্রী দুঃখ দুর্ভাগ্যের অসহ্য যন্ত্রণা সহনে অধৈর্য্য হইয়া স্বীয় সহচরীগণ সহ চিতানলে প্রবেশ পূর্ব্বক সকল জ্বালা জুড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময় হর্ষবর্দ্ধন উপস্থিত হইয়া তাহাকে এ ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন ও ভগিনীর অনুরোধে স্বীয় রাজধানী থানেশ্বর হইতে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত করেন।

ভগিনীর উদ্ধারসাধন করিয়াই তিনি শশাঙ্ককে পরাজিত করিবার নিমিত্ত কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে পূর্ব্ব ভারতে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাহার সংঘর্ষের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তবে ৬১৯ খৃষ্টাব্দের পরে হর্ষের মিত্র কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্ম্মন শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। এইরূপে হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য গ্রহণকালীন প্রতিজ্ঞাদ্বয় পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধন মগধরাজ উপাধি ধারণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ জয় করিয়া তাহার রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাঁথিয়ারের অন্তর্গত বল্লভী রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। চীনে রাজদূত প্রেরণ করেন। পশ্চিমে বল্লভী রাজা ও পূর্ব্বে কামরূপের রাজা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যেও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষিণাপথে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু শত্রু হইলেও চালুক্যগণ উত্তরাখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

হর্ষবর্দ্ধন কেবল মাত্র যে যোদ্ধাই ছিলেন এমন নহে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ ছিল বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহার রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাদম্বরী ও হর্ষ চরিত প্রণেতা বানভট্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং হর্ষবর্দ্ধন নিজেও রত্নাবলী ও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকও রচনা করিয়া ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যবিস্তার নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এখন তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন বিশেষ অতিথি সৎকারপরায়ণ, গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ও দানবীর ছিলেন। তিনি তাহার অতিথিবর্গকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তাহারই রাজত্বকালে চৈনিক দ্বিতীয় পরিব্রাজক হিউএনসাঙ ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কালে আসামের ভিতর দিয়া চীনদেশে যাতায়াতের পথ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ হিউএন-সাঙ এই পথেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিম্বা অন্য আর একটী পথ যেদিক দিয়া শক, হুন, ইউয়েচীগণ ভারতে আসিয়াছিলেন অর্থাৎ তদানীন্তন গান্ধার রাজ্য ইদানীন্তন আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া। হিউ-এন-সাঙ গান্ধার রাজ্যের ভিতর দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া Vincent Smith এর ইতিহাসে দেখা যায়। হিউ এন সাঙ চৈনিক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং নিজেরও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অতিথি সৎকারের একটী দৃষ্টান্ত তিনি কিভাবে হিউ এন সাঙকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা হইতেই পাওয়া যাইবে। হিউ এন-সাঙের সহিত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বঙ্গদেশে। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের পতনের পর বঙ্গবিজিত হইলেও বঙ্গদেশে শাসন সুনিয়ন্ত্রণ ব্যাপদেশে তিনি ঐ দেশ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন। সম্মানিত চৈনিক পরিব্রাজকের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার যোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্যে অতিথি সমভিব্যাহারে মহারাজ স্বয়ং স্বীয় রাজধানী কান্যকুব্জে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিউ-এন-সাঙ অধুনা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন সম্মানিত ব্যক্তিকে Dr উপাধিতে ভূষিত করা হয় সেইরূপ চীনদেশের হিউ-এন-সাঙের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ

তৎকালীন ভাষায় তাহাকে Master of Law উপাধিতে ভূষিত করা হয় (Vincent Smith এর ইতিহাসে এইরূপ উল্লিখিত আছে) এবং স্বয়ং চৈনিক সম্রাট পর্য্যন্ত তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন ইহাও বর্ণিত আছে।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় রাজধানী কান্যকুব্জে উপনীত হইয়াই এক বিরাট অভ্যর্থনা সভা আহুত করেন। তাহাতে ২০জন করদ নৃপতি ৪০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ৩০০০ দেখা যায় যে তিনি কখনো তাহার নিজের বাসের জন্য রাজ্য ভ্রমণকালীন কোন মূল্যবান গৃহাদি নির্ম্মাণের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সামান্য কাষ্ঠ ও বংশদণ্ড নির্ম্মিত গৃহে রাজ্য পরিদর্শনকালীন বাসই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। এবং দর্শনান্তে রাজ্য ত্যাগ কালীন উক্ত গৃহ ভস্মীভূত করিতেন। কেনো যে এই নীতি অনুসরণ করিতেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে ইহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ এই হইতে পারে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মে আসক্তিহীন ভাবে জগতে বসবাস করাই হয়তো তাহার এইরূপ আচরণের কারণ হইতে পারে। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মনস্তত্ত্বের সহিত মোগল সম্রাট আলমগীরের মনস্তত্ত্বের কথঞ্চিৎসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। ইনি দান করিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া পরিশেষে সামান্য বস্ত্রে নিজের দেহাবৃত করিতেন আর সম্রাট আলমগীর দেখিতে পাই মোগল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়াও শুভ্রবস্ত্রে নিজের দেহাবৃত করিতেন এবং নিজের হস্তে টুপি রচিয়া ও কোরাণ লিখিয়া নিজে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। সম্রাট আলমগীর ছিলেন গোড়া মুসলমান আর ইনি গোড়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সম্রাট আলমগীর রাজকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে আর হর্ষবর্দ্ধন সব রাজকার্য্যের ভিতরে ধর্ম্মের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। কাজেই বোধহয় আমার এই সামঞ্জস্য একেবারে যে অহেতুক তাহা বোধহয় কেহ বলিবেন না।

যদিও নিজের বাসভবন সম্বন্ধে হর্ষবর্দ্ধন এরূপ ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতেন কিন্তু তা বলিয়া স্বীয় রাজ্য বা জনসাধারণের উপকারার্থ অট্টালিকা, উদ্যান বা দীর্ঘিকাদিখনন কার্য্যে তাহার আগ্রহের অভাব লক্ষিত হয়না। ইতিহাসে উল্লেখ আছে তিনি চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার প্রভৃতি তাহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠার উল্লেখও ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিনি তাহার সুবিস্তীর্ণ কনৌজ রাজধানী যাহা দৈর্ঘ্যে চার মাইল ও প্রস্থে এক মাইলেরও উপর ছিল তাহা সুন্দর উদ্যান সুরম্য অট্টালিকা ও দীর্ঘিকা খনন পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

তাহার রাজত্বকালে মগধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখও দেখা যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কারণ উহা বিশ্ব বিদিত।

শাসন সম্বন্ধে কিছু কঠোরতর নিয়ম পদ্ধতি অনুসৃত হইত বলিয়া আমার বিবেচনা হয় যথা—গুরুতর অপরাধে নাসিকা, কর্ণ হস্তপদাদি ছিন্ন করার ব্যবস্থা। আজিও ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন রাজ্যে এরূপ শাসনের ব্যবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। অগ্নি, জল অথবা বিষ অপরাধ পরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এতো কঠোরতা সত্ত্বেও রাজ্য যে একেবারে অপরাধীর অস্তিত্বশূন্য হইয়াছিল তাহা নহে। স্বয়ং হিউ এন সাঙ দস্যু তস্করাদির হস্তে বহু বার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ

খাঁড়াতী পিনাকীমোহন

গল্প

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পাবনা জিলার নন্দনপুর গ্রামে ভাদুড়ী বাড়ীতে বরাবরই পুজায় খুব ধুম হয়। ভাদুড়ী বাড়ীর বড় কর্ত্তা নরেশ বাবু ভারি কড়া মেজাজের লোক। তার ভয়ে সকলেই তটস্থ থাকিত। ঠিক সময়ে কাজটি না হইলে রক্ষা নাই, বাড়ী একেবারে তোলপাড় করিয়া তোলেন। এবারকার পূজায় কলিকাতা হইতে তাহার কয়েকটি বিশেষ বন্ধু আসিয়াছেন তাই আড়ম্বরটা হইয়াছে খুব জাঁকাল রকমের। মহা সমারোহের সহিত সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে। অষ্টমীর দিন ভোর হইতেই কাজের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। একজন চন্দন ঘষিতে বসিয়াছে, দুইজন ফলমুল কাটিয়া থালায় রাখিতেছে। একজন পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতেছে, দুইজন নৈবেদ্য আমান্ন তৈয়ার করিতেছে, বাহিরে কয়েকজনে বিল্বপত্র বাছিতেছে, কেহবা ধুপদানীতে আগুন দিতেছে, কেহ দুর্ব্বা বাছিয়া দিতেছে, এইরূপ সকলেই নিজ নিজ কাজ লইয়া ব্যতিব্যস্ত পুরোহিত ঠাকুর প্রাতঃস্নান করিয়া পূজায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

পূজা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিছুকাল বাদেই মালী খাঁড়ায় ধার দিতে লাগিল। যথার্থে চারিটি ছাগ সন্তানকে স্নান করাইয়া মণ্ডপের বারান্দায় আনা হইয়াছে। খাঁড়াতীর কিন্তু তখন পর্য্যন্তও দেখা নাই। সকলেই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, বড় কর্ত্তাকে কিন্তু কাহারও বলিবার সাহস নাই। আজ কি যে কাণ্ড হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই ভয়ব্যকুল। ছাগ উৎসর্গ হইতে চলিল অথচ তখনও তাহার দেখা নাই। দুজন লোক খাঁড়াতীর বাটী ছুটিল, সেখানে যাইয়া দেখে বাড়ীতে কেহই নাই, গৃহ তালা বন্ধ। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বাটীর অপর কর্ত্তাদের সমস্ত অবস্থা জানাইল। তাহারা ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন, বড় কর্ত্তাকে জানাইতে কিন্তু কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না, বড় কর্ত্তা তখন বন্ধুদের লইয়া, বৈঠক খানায় গল্প পরিহাসে মত্ত। এই খাঁড়াতী বহু দিন যাবৎ এই কার্য্য করিতেছে, একদিনও বিলম্ব হয় নাই, ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিত। কিন্তু আজ একি ব্যাপার, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাহার দেখা নাই। আরও একবার তাহার বাটীতে লোক পাঠান হইল। কিন্তু তখনও দরজা তেমনি বন্ধ। না, বড় কর্ত্তাকে আর না জানাইলে ত চলে না। আজ যে কী ভীষণ কুরুক্ষেত্র হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই ভয়ানক ভীত হইয়া উঠিল। ছোট কর্ত্তা বড় কর্ত্তাকে ডাকিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। তিনি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—

বল কিহে, সে হারামজাদার এখনও দেখা নাই। দুজন সর্দ্দার পাঠাও, যেখান থেকে হোক ধরে আনুক। সময়ও ত আর বেশী নাই, আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন। বেটার কাঁধে কি মাথা নাই, বোধ হয় মরণ ডাক ডেকেছে।

সেত পরের কথা, এখন বর্ত্তমানের উপায় কি? কোন বিপদে পড়েছে নিশ্চয়, নইলে না আসবার ত কোন কারণই নাই।

বিপদ কিহে? নিশ্চয় বদমাইসী। ব্যাটাকে আজ কাটব তবে ছাড়ব। অ্যাঃ—এত বড় সাহস! আমি এখনওত বেঁচে আছি—না কি?

বড় কর্ত্তার তর্জ্জন গর্জ্জন সমান চলিতে লাগিল। অন্য কোন খাঁড়াতীও নিকটে নাই। বাড়ীর কর্ত্তারা ত এ সম্বন্ধে পরম বৈষ্ণব, পাটা কাটা দূরের কথা একটি মাছ কাটিতেও অসমর্থ। তখন নানা দিকে খোঁজ বলিল। সময়ও ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিল। যে দু একজন বা কাটিতে পারিত তাহাদের কাহারও প্রতিবন্ধক, কাহারও বা হাত কাঁপে, কেহ বা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া পুরোপুরি বৈষ্ণব সাজিয়াছেন। অপ্রয়োজনে অনেককে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কাজের বেলায় অধিকাংশই হাত গুটাইয়া বসেন। তখন একটা মহা হট্টগোল বাঁধিয়া গেল। বড় কর্ত্তার চেচামিচি, লোকজনের হৈ চৈ, ছাগ নন্দনদের করুণ আর্ত্তনাদ, সব মিলিয়া ভয়ানক একটা কোলাহলের সৃষ্টি হইল; এই সব দেখিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ বাহির হইয়া আসিলেন এবং বড় কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

এই হৈ চৈ কিসের হে? কি হয়েছে বলত নরেশ? ব্যাপার অতি গুরুতর, বলির সময় উপস্থিত, ছাগ সকল উৎসর্গীকৃত, কিন্তু নবাব নন্দন খাঁড়াতীর দেখা নাই। অন্য লোকও পাওয়া যাচ্ছে না, পূজাই পণ্ড হবার জোগাড়। একবার পাই সে শালাকে তবে তাকেই ফেলি হাঁড়ী কাঠে। আঃ এত বড় বুকের পাটা।

এই কথা। এরি জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ? একটিবার আমাকে জানালেই পারতে? আমাদের হরিদাস রয়েছে যে,—এ কার্য্যে সে ভারী পাকা। দুটো চারটে কি বলছ, দু চার'শ কাটতে হলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। ওকে দিয়েই কাজ শেষ করে নেওয়া যাক্।

সত্যি বলছ? যাক্ বাঁচা গেল। এই যে হরিদাস, নরেনদা যখন ব'লছে তখন ঘ্যাচাং লাগাতেই হবে, আমি প্রস্তুত।

ওরে বাজা রে বাজা, চট করে তুমি কাপড়টা বদলে নাও, কাজ চুকে যাক্ ত।

তখন ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, বাহির দিক হইতে মা মা ধ্বনি, ছেলেদের চীৎকার, মেয়েদের উলুধ্বনি, সব মিলিয়া এক বিরাট কলরবের সৃষ্টি হইল এবং একে একে বারটি অজনন্দনই মায়ের সম্মুখে ছিন্নমস্ত হইয়া পশুজন্ম হইতে মুক্ত হইল। তখন সকলে দেবী প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইল, মায়ের প্রসন্ন মুখের হাসি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বাদ্য তখনও থামিয়া যায় নাই। খাঁড়াতী পিনাকী মোহন দৌড়াইয়া আসিয়া উঠানের মধ্যে ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। বড় কর্ত্তা সে খানেই ছিলেন—পিনাকীকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

ব্যাটা হারামজাদা,—ঢং করতে এসেছ! ও সব চালাকীতে চলছে না, গাঁজা টেনে কোথায় পড়ে ছিলে চাঁদ? এত বড় বুকের পাটা যে বলি বন্ধ করে মায়ের পূজা পণ্ড করার মতলব। আরে আমি নরেশচন্দ্র বেঁচে থাকতে তাও কি কখন হয়? আমার কাজের জন্য মাটি খুঁড়ে লোক বেরুবে। শিক্ষাটি তোর ভাল করেই দিচ্ছি। বল্ বেটা কোথায় ছিলি?

পিনাকীমোহন হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে, একটি কথা বলিবার শক্তি নাই। শুধু একবার ওষ্ঠ নড়িয়া উঠিল কিন্তু ভাষা উচ্চারিত হইল না।—ও সব ফন্দিবাজীতে চলছে না। হাঁড়ি কাঠে ফেলে আজ তোকেই বলি দেব। এই শ্যামলাল, ওরে হরিচরণ, ধরত, বেটাকে, দেখি আজ কে রক্ষা করে শালাকে।

এই বলিয়াই পিনাকীর উপর অজস্র পদাঘাত চলিল। তখন নরেন বাবু বলিলেন—,ক্ষেপলে নাকি হে নরেশ, পদাঘাতেই ওকে শেষ করলে যে—আবার হাঁড়ি কাঠ। যথেষ্ট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও। ওর কোন কথা না শুনে এমন অবিচার ত ভাল নয়।

ছেড়ে দেব ওই শুয়োরটাকে তা হলেই হয়েছে, এমন শিক্ষা চাই আর জীবনে ভুলবে না।

তার আর বাকী কি? যথেষ্ট হয়েছে। এই বলিয়াই তিনি নরেশ চন্দ্রকে জোর করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন।

ওদিককার কথা বলা হয় নাই। সপ্তমী পূজার দিন যথারীতি বলি দিয়া, রাত্রে আরতি দেখিয়া ও প্রসাদ পাইয়া অনেক দেরীতে সে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাটীতে কেহই ছিল না। পরিবারের মধ্যে সে নিজে, তাহার স্ত্রী ও পাঁচ বছরের মেয়ে বীণা। স্ত্রী কন্যাটিকে লইয়া মাত্র পনর দিন আগে চার মাইল দূরে বেলতায় পিত্রালয়ে গিয়াছে। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রের দিকে দরজায় শিকল নাড়ার শব্দে জাগিয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া শ্যালক সারদাকে দেখিয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইল এবং ত্বরিতে জিজ্ঞাসা করিল,

ব্যাপার কি হে? সব ভাল ত? এমন অসময়ে আসায় ভারি ভাবিত হয়েছি।

বীণার বড়ই অসুখ, মাঝরাত্রি থেকে বাহ্য, বমি করে ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তুমি এক্ষুনি চল।

মা আমার বেঁচে আছে ত? ওরে কেন কাছছাড়া করেছিলুম—? না জানি কতই কান্নাকাটি করছে।

বেঁচে আছে সত্যি, তবে কেবল বাবা, বাবা ডাকছে। সে করুণ আর্ত্তনাদ সহ্য করতে না পেরেই ছুটে এসেছি। আর কথায় কাজ নাই, দরজা বন্ধ করে চল।

তা ত যাচ্ছি, এদিকে আজ অষ্টমী পূজা, বাবুদের বাড়ীর বলির কি ব্যবস্থা হবে, আমি ভিন্ন ত আর লোক নাই। এমন অসময়ে খবরই বা দিই কি করে।

সে যা হয় করা যাবে। এখন চলত। বলিত সেই অনেক বেলায়, তার মধ্যে চাইত ফিরেও আসতে পারে।

যা করেন মা দুর্গা, চল।

দরজা তালা বন্ধ করিয়া উভয়ে নিঃশব্দে বেলতার দিকে ছুটিল, একরূপ দৌড়াইয়াই গেল। যখন পৌঁছিল তখন প্রভাত হইবার বিলম্ব নাই। সে চিন্তাকুল প্রাণে গৃহে প্রবেশ করিল। মা, মা, রবে কন্যার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, মেয়ে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বাবা! পরে দু'টি ক্ষীণ বাহু বাহির করিয়া বাবার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কয়েকবার ভেদ বমি হইয়া মেয়ে একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে।—কথা কহিবার শক্তি নাই, চোখ বসিয়া গিয়াছে। সমস্ত লক্ষণই কলেরার। এযে কি ভীষণ রোগ তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। এই গলা শুকাইয়া প্রাণ যায়,—দারুণ পিপাসা। এই হাতে খিল ধরিল, পরক্ষণে পায়ে খিল ধরিয়া পা গেল, এই বুকে খিল ধরিল, শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণ যায় আর কি। চক্ষের আলো ক্রমেই নিবিয়া আসে। শরীর জলশূন্য হইয়া একেবারে শুকাইয়া উঠে। হাইড্রোলিক প্রেসের চাপে ফেলিয়া দেহের সমস্ত জল বাহির করিয়া দিলে যে কঙ্কাল অবশিষ্ট থাকে এও সেই প্রকার। কণ্ঠে কথা সরে না অথচ জলের জন্য যে করুণ আকুলতা তাহা দেখিয়া কাহার হৃদয় না ভাঙ্গিয়া পড়ে? মেয়ের অবস্থা দৃষ্টে পিনাকী একেবারে আত্মহারা হইল। ইতিমধ্যে আর একবার বাহ্যে হইল, এক ফোটা প্রস্রাবও হইল না। এ পর্য্যন্ত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। সারদা তাড়াতাড়ি ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে বলিল। বেলতা গ্রামে কোন ডাক্তার নাই। দুই মাইল দূরে নগরবাড়ীতে একটি ডাক্তার আছে তাও পাশ করা নহে। পাশ করা ডাক্তার ডাকিতে হইলে ৮ মাইল দূরে সাজাদপুর হইতে আনিতে হইবে। এ শঙ্কটের কালে অত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই নগরবাড়ীর ডাক্তার আনিতেই ছুটিল। দীন দরিদ্রের চিকিৎসার এমনই অবস্থা। আসিবার কালে একটি পয়সাও লইয়া আসে নাই। ডাক্তার আসিলে দুটো টাকা নিদেন একটি টাকাও ত দিতে হইবে। তাই বা কোথায় পায়। ভাল সময়ে চেষ্টা করিলে যদিই বা কাহারও নিকট ধার পাওয়া সম্ভব হইত এ বিপদের মুখে সে আশা বৃথা। স্ত্রীর কানে দুগাছি মাকড়ী ছিল, উহাই বন্ধক রাখিয়া অতি কষ্টে কয়েকটি টাকা সংগ্রহ হইল। এই সব গণ্ডগ্রামে বন্ধক রাখিয়াও কেহ টাকা দিতে চাহে না। দেশের মর্ম্মস্থল গ্রামগুলির অবস্থা ত এই।

ডাক্তার আসিল। শিরা ফুঁড়িয়া 'সেলাইন' দেওয়া তাহার দ্বারা হইল না। ঔষধ খওয়াইয়া চিকিৎসা চলিল ও মলদ্বার দিয়া ৩,৪ ঘণ্টা অন্তর লবণ জল পিচকারী যোগে দেওয়া হইতে লাগিল। ঘণ্টা দুই বাদে অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল কিন্তু প্রস্রাব তখনও হয় নাই।

তখন পিনাকীমোহনের মনিব বাড়ীর কথা মনে হইল। বলির সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। বড় কর্ত্তার যে কঠিন মেজাজ তাহাতে উপস্থিত না হইলে রক্ষা থাকিবে না ও লাঞ্ছনার একশেষ হইবে। উভয় শঙ্কটে পড়িয়া সে গলদ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। সে যদি একটা খবরও দিয়া আসিতে পারিত। সে ভিন্ন এ কাজ করিবার দ্বিতীয় লোকও নাই। মনে করিতেছে এক ছুটে কাজ সারিয়া আসিবে কিন্তু যেই কন্যার মুখ পানে চায়, তখনই হৃদয় হইতে সে চিন্তা অন্তর্হিত হয়। মেয়ের অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—

মা তুইত একটু ভাল আছিস আমার মাথার উপরে আর এক বিপদ এক মিনিটে যাব আর আসব, নইলে যে কি হবে তা শুধু মা ভগবতীই জানেন।

না বাবা, যেয়ো না তুমি, তুমি গেলে বাঁচব না কিন্তু। আমার কি যাবার ইচ্ছা মা এ যে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাওয়া।

না,--না—বাবা তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না? গেলে আর দেখা হবে না।

মা দশভূজা—তুমি কি মানুষকে এমনি করেই সাজা দাও? ও রাজা পায় না জানি কি অপরাধই করেছি!

আরও আধ ঘণ্টা গেল। মনিব বাড়ীতে কি হইতেছে সে কথা মনে হইয়া প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। শেষে কি তারই কারণ মার পূজা পণ্ড হইবে? না তার যাইতেই হইবে। যাবে আর আসবে সে কতক্ষণ।

মেয়েকি বলিল—,তোর জন্য বেদানা কমলা নিয়ে আসি মা, মায়ের চরণামৃতও আনব। এই টাকাটা নে, তোকে সুন্দর খেলনা কিনে দেব,—কিছু ভাবিস না,—এই এলাম বলে—।

সত্যিই যাচ্ছ বাবা, শুনলে না আমার কথা, এই তবে শেষ দেখা বাবা।

পিনাকীমোহন আর সহ্য করিতে পারিল না। হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও মেয়ের নিকট যাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সংসার এমনি বিচিত্র স্থান যে ইহার আবর্ত্তে পড়িলে মায়া, দয়া, ভালবাসা সময়ে সবই বিসর্জ্জন দিতে হয়। পিনাকী মোহন স্থির করিল সে কিছুতেই যাইবে না, তাহাতে তাহার যে শাস্তি হয় হইবে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল মায়ের পূজায় বিঘ্ন ঘটিয়া তাহার প্রাণধিক কন্যার অমঙ্গল ঘটিবে না ত? সে উঠিয়া পড়িল ও এবার মেয়েকে কিছু না বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। যে অবস্থায় সে মনিব বাড়ী পৌছিল এবং তথায় তাহার যে অপমান ও দুর্দ্দশা হইল তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

ঐ অবস্থায় সে প্রায় আধ ঘণ্টা পড়িয়া রহিল। বাড়ীতে লোক গিজ গিজ করিতেছে কিন্তু সাহস করিয়া কেহই একবার কাছে যাইতেছেনা। বাড়ীর বড় কর্ত্রী এই সব সংবাদ পাইবা মাত্রই উহার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। একজন চাকরকে ডাকিয়া উহার মুখে চোখে জল দিতে বলিলেন এবং একটু সুস্থ হইলেই তাহার নিকট নিতে বলিলেন, এই খাঁড়াতী অনেকদিন হয় এ বাড়ীর কাজ করিতেছে আর একদিন আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়াই বিনা জিজ্ঞাসায় তার উপর এই অত্যাচার এযে কতদূর অন্যায় তাহা কহিবার নহে। এই ঘটনায় তাহার কোমল প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

চোখে মুখে জল দিতে পিনাকীর সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। সে ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিলে, জল দেওয়ায় গলা ভিজিয়া,—কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া পাইল। মায়ের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, মা জগদম্বে, আজ তোর কাছে প্রাণ গেলেও ত এর চেয়ে ভাল ছিল। ওমা পাষাণী, মানুষকে কি এমনি করেই পেষণ করতে হয়? তুই না মা সবই জানিস, তবুও তোর এই বিচার? হউক তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক মা।

এই বলিয়াই ত্বরিতে উঠিয়া সে রওনা হইল। যে লোকটি জল দিতেছিল সে বলিল—কোথায় যাচ্ছ হে—খাঁড়াতী মশাই, বড় মার সঙ্গে দেখা না করে যাবার হুকুম নাই।

তাই হউক, অদৃষ্টে যা বাকী আছে হয়ে যাক। মা কালিকে, বুকের সব টুকু রক্ত পান করলেই ত ল্যাটা চুকে যেত। আর যে সহ্য হচ্ছে না,—ওদিকে মার আমার না জানি কি হল!

ততক্ষণ তারা বড় কর্ত্রীর নিকট পৌছিয়াছে। সঙ্গের লোকটি বলিল,—একটু জ্ঞান হতেই পালাচ্ছিস মা, এই আমি বলেই ধরে আনতে পেরেছি। ব্যাটা ভারী বদমাইস।

থাম্ তোকে আর বকতে হবে না। বাবা পিনাকী তোমার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল। আজ এই মহাষ্টমীর দিনে তোমার এই দুর্দ্দশা চোখে দেখবার নয়। কেন যে মা বিমুখ হলেন তা জানি নে। বাবা তুমি ত জানই যে বড় কর্ত্তার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। কবে যে ওর এ স্বভাব দূর হবে তা মা দুর্গাই জানেন। কি বিপদ হয়েছিল আমায় একবার বলত! খুব গুরুতর কিছু না হলে ত এমন হতে পারে না। তোমাকে ত বরাবরই

জানি, যাবৎ একটী দিনও ত্রুটি হয় নাই। দুঃখ করো না বাবা, জগতে নিত্যই এমনি ঘটছে, শত নিরপরাধীরা শাস্তি ভোগ করছে। মা আমাদের দুঃখহরা, তিনিই আবার সকল দুঃখ দূর করবেন। আমায় সব খুলে বল।

বলবার আমার সময় নাই মা, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার প্রাণ ছটফট করছে। আমায় আজ ক্ষমা করুন;—যে নিদারুণ কষ্ট ও অপমান বরাতে ছিল তা হয়েছে। শেষ-রাত্রি হতে মেয়েটি কলেরার মৃত্যুমুখে। এক মাত্র কর্ত্তব্যের জন্যই তাকে এমন অবস্থায় ফেলেও দৌড়ে এসেছিলাম। কি অবস্থায় এসেছিলাম তা দেখেছেন, গলা শুকিয়ে যাওয়ায়—কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। হয়ত ফিরে যেয়ে তাকে আর দেখব না। আহা কত করেই মা আসতে বারণ করলে। বললে, যদি যাও আর দেখা হবে না। ওমা সর্ব্বনাশী, তোর মনে শেষে এই ছিল। এই বলিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইল।

ওরে একটু কিছু মুখে দিয়ে যা। আমি টাকা এনে দিচ্ছি, ডাক্তার দেখাবি। যা কিছু প্রয়োজন হয়, আমাকে জানাস। কোন ভাবনা করিস না।—এইসব বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

আর কিছুরই দরকার হবে না মা, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি আর থাকতে পারছি না। মা আমার—এই বলিয়াই উল্কার মত ছুটিল।

যখন পৌছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মা, মা বলিয়া মেয়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। ওরে সত্যি সত্যিই তুই ছেড়ে গেলি সত্যিই আর দেখা হল না। না জানি মা আমায় কতই ডেকেছে?

সারদা বলিল, শেষ সময়েও বাবা বলিয়াই সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

পিনাকী সেই যে বাবুদের বাড়ী হইতে আসিয়াছে, আর যায় নাই। বলি দেওয়ার কার্য্যও সেই হতে শেষ। দিবারাত্রি শুধু—মা, মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, আর দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরে।

স্বর্গ রচনা

(Herbert Trench এর "Come let us make love deathless, thou and I" হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

অমর কবির প্রেম মরলোকে মোরা দুজনায়,
দুদিনের হাসি খেলা হেথা হায় দুদিনে ফুরায়।
মৃত্যুমুখে ধায় যারা দলে দলে, সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসে
ধরিতে পারেনা যাহা, উড়ায় তাহারে পরিহাসে।
যে আদর্শ ধরে তারা প্রণয়ের, মোদের তা নয়।
আজি যদি আমাদেরে এ সংসার ছেড়ে যেতে হয়
এ ভঙ্গুর পানপাত্রে যে মদিরা ঢালিব দুজনে
সে সুধার আস্বাদন কভু তারা লভেনি জীবনে।
নাই হেন স্বর্গ এই প্রাচীরের আড়ালে, যেথায়
মৃত সুখ বাঁচে পুন, যৌবন ফিরিয়া পাওয়া যায়।
তোমার অম্লান শিখা করিবনা ধূমল মলিন
মোদের গৌরবটুকু দিব নাক হতে দীপ্তি হীন।
মহৎ সে প্রেম যাহা লুপ্ত হয় প্রেমিকের সাথে,
মোরা যবে যাব চলি সে মহত্ব র'বেনা ধরাতে।
সে প্রেম গৌরব আরো সমধিক গরীয়ান্ হবে
মোদের দেহান্তে যদি চিহ্ন তার নাহি রয় ভবে।

নারীর দাবী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ,

ছাত্রীদিগকে উদ্দেশ করিয়া সরোজিনী নাইডু এইকথা সম্প্রতি বলিয়াছেন। "নারীর দাবী বলিয়া কোন পৃথক দাবী তুলিও না। যদি সংগ্রাম করিতে হয়, তবে মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম কর।"

মহিয়সী মাতৃজাতি রমনীগণ যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণ দাবী না করিয়া যদি সেই পুরাতন ও মামুলী ভাষায় আপনাদিগকে ক্ষুদ্র এবং হীন ভাবিয়া তুচ্ছ দাবী গুলিই করেন, তাহা হইলে বলিতে ইচ্ছা করে নাকি সহস্র সহস্র বৎসরের পরাধীনতা তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল ও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের এই মনোভাব। নারী আন্দোলনে যাঁহারা বক্তৃতা করেন এবং যাহারা নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা নারী জাতির দাবী গুলির জন্য পক্ষ সমর্থনের পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বেতিহাস ও সভ্যতার কথা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ যে সমস্ত মহিলা কর্ম্মী এই আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে এই সমস্ত বিষয়ে বিবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি। পরাধীনতার সূত্রপাত অক্ষমতা হইতে হইয়া থাকে সত্য কিন্তু অক্ষমতাই প্রথম স্তর নহে। অন্যায়ের ভিত্তির উপর যখন প্রবল দণ্ডায়মনে হয় তখনই দুর্ব্বলের অক্ষমতা বিশেষ ভাবে প্রকট হয় এবং তখনই অক্ষমতাকেই ভিত্তি করিয়া পরাধীনতার প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নারী আন্দোলনের কর্ম্মী স্বয়ং নারীগণ যদি পুরুষ জাতির শেখান বাক্যেরই আলোচনা করিয়া নিরস্ত হন তাহাতে উক্ত আন্দোলনের জন্য শক্তি সংগ্রহে সমূহ বাধা উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্য আমি সরোজিনী নাইডুকে সত্য তত্বের অবতারণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

গ্রেজিয়া ডেলেডা একজন বিদুষী রমণী। তিনি ইতালীর ভাষায় দি মাদার নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নাম ও শক্তির সহিত পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের পরিচয় আছে একথা বলিতে পারা যায়। পুস্তকখানি নারী আন্দোলন লইয়া ঠিক রচিত না হইলেও উহা যে নারী প্রগতিরই এক অংশ তাহা কোন রূপেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যাঁহাদের পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ পড়িবার অবসর এ অবধি হয় নাই আমি তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য গল্পটীর সারাংশ প্রদান করিয়া উহার সমালোচনা এবং নারী আন্দোলনের সহিত উহার সংস্পর্ক কতটা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। গল্পটী খুবই ছোট এবং চির পুরাতনী ঢংয়ের—প্রণয়সংক্রান্ত। কিন্তু উহাতে মৌলিক তত্ব ও আধুনিক আবহাওয়া যথেষ্ট আছে।

একটী গ্রাম্য বালিকা দারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া একটী বুড়ার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়। বুড়ার ঔরসে একটী পুত্র জন্মাইবার পর বুড়া মরিয়া যায়। বালিকা বিবাহটীকে খুব সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই বৃদ্ধ পতির মৃত্যু তাহাকে তেমন বিচলিত করিতে পারিলনা। তাহার অনেক উচ্চাশা এবং আকাঙ্ক্ষাও ছিল। আত্ম জীবনে তাহাদের পূর্ণ হইবার কোন আশা না দেখিয়া তাহার সদ্যজাত শিশুকে বক্ষের মধ্যে ধারণ করিয়া তাহার মধ্যে আপন আকাঙ্ক্ষিত বীজগুলি উপ্ত করিয়া বিরাট মহীরুহ সৃজনের স্বপ্ন তাহাকে মাতাইয়া তুলিল। ফলে হইলও তাই। ক্ষুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও পুত্রকে পাদরী করিবার মোহ মাতার হৃদয় আকুলিত করিতে লাগিল। বালকের জন্ম সুলভ প্রবৃত্তি কিন্তু তাহাকে এই পথে না যাইবার জন্য যথেষ্ট বাধা দেয়। মাতার দারুণ উৎসাহে ও অত্যন্ত আগ্রহে বালক ক্রমশঃ পাদরীর

শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে বংশ পরিচয়হীন এই বালক পাদরী হইয়া যে গ্রামে তাহার মাতার বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, সে গ্রামের যাজকতা গ্রহণ করিয়া মাতার সহিত আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে বলা বাহুল্য যে এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে মাতার হৃদয় এক অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ হয়। মাতা পুত্র পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এই গ্রামের যে ব্যক্তি পূর্ব্বে পাদরী গিরি করিত—গুজব হল সে তাহার নৈতিক অধঃপতন হয় এবং সেইজন্য তাহার আত্মা মুক্তিলাভ না করিতে পারায় পাদরীর বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। নিদ্রিতাবস্থায় মাতা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে মৃত পাদরীর প্রেতাত্মা তাঁহাকে বলিতেছে—যে বংশ পরিচয় হীনা রমনী তুমি যে দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় দিয়া আমার ত্যক্ত আসনে তোমার সন্তানকে বসাইয়াছ তাহার প্রতিশোধ একদিন আমি লইব, যদি না তোমরা স্বেচ্ছায় এখান হইতে প্রস্থান কর। স্বপ্ন সর্ব্বদাই স্বপ্ন, মানবকে ভাবাইয়া তুলিলেও মানব তাহার জন্য বড় আগ্রহ দেখায় না। মাতা আকুল হইলেন কিন্তু সন্তানের নিকট স্বপ্ন ঘটিত ব্যাপারটী গুপ্ত রাখিলেন।

উক্তগ্রামে একজন ধনশালিনী রমণী বাস করিতেন। তিনিই উক্ত গীর্জ্জা এবং গ্রামের স্বত্বাধিকারিনী। তাঁহার নিকট তাঁহার কোন নিকট আত্মীয় বাস করিতেন না। এই রমণীটীর সহিত নূতন ধর্ম্ম যাজকের প্রণয় হয় এবং এই অবধি ঠিক হয় যে ধর্ম্মযাজক তাহার বৃত্তি এবং মাতাকে ত্যাগ করিয়া সুন্দরী এবং প্রিয়াকে লইয়া কোন দূরস্থানে চলিয়া গিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কথা যখন এইরূপ পাকাপাকি চলিতেছে, তখন মাতা একদিন পুত্রকে গভীর রাত্রযোগে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনোদ্যত দেখিয়া উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। এই অনুসরণের কালে তিনি ক্রমশঃ তাবৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয় তাহাও বুঝিতে পারেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে স্বপ্নের কথা বলিয়া রমণীর প্রেম প্রত্যাখান করিবার জন্য আদেশ দেন। এইবার মনাস্তর আরম্ভ হয়।

গল্পের আরম্ভই এখান হইতে; এবং সমস্ত ঘটনাটী গ্রীক্-ট্রাজেডীর মতন ২৪ ঘণ্টার ব্যাপার লইয়া লিখিত। হোমারের মতন ঘটনাবলীর গল্পটী আরম্ভ করিয়া শক্তিশালী লেখিকা ক্রমশঃ ঘটনাবলীর অনুপাতে ঘটনার ও মনোস্তত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

পুত্র মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক পাহাড়িয়া শিকারীর অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়ার জন্য যখন যাইবেন তখন একটী মাতা তাহার ভুতে পাওয়া মেয়ে আনিয়া বাইবেল পাঠ দ্বারা তাঁহাকে ভূত ছাড়াইবার অনুরোধ করেন। ধর্ম্ম যাচক বিশেষ বিচলিত হইয়াও খুব হৃদয়তার সহিত কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গেলেন। কন্যা অতি অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে নিরাময় হইয়া উঠিল। ধর্ম্মযাজকের অদ্ভুত ঐশ-শক্তির কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ধর্ম্মযাজক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য চলিয়া গেলেন। গভীর রাত্রে ফিরিবার সময় তিনি দেখিলেন তাঁহার গ্রামবাসী ভক্তগণ এক উন্মাদ আনন্দ-নৃত্যে মগ্ন। অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন তাহারা তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে পাইয়া তাহারা তাহাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন জ্ঞাপন করিল। ধর্ম্মযাজক আরও অধিক বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং আপনাতে মূল গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক দেবত্ব আরোপিত হইতেছে বলিয়া একটু উষ্মা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিলেন। সমস্তদিন দারুণ দুশ্চিন্তায় আলোড়িতা মাতা তখনও নিদ্রাহীন কক্ষে পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ভোজনের জন্য শয়ন করিবার সময় তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে তাহার মাতার নিকট লইয়া যাইবার আগ্রহ দেখাইলে মাতা আপত্তি করিলেন। ধর্ম্মযাজক মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই যুবকটীর জননীর সহিত রাত্রে সাক্ষাৎ করিল। প্রাতঃকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য গমনকালে ধর্ম্মযাজক ধনী রমণীকে তাহার নিজের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া একখানি পত্র দিয়া গিয়াছিলেন। এই রমণীর নিকট উক্ত রমণীর একজন সহচরী আসিয়া তাহাকে জানায় যে তাঁহার কর্ত্রী অত্যন্ত

পীড়িতা এবং সকাল হইতে রক্তবমন করিতেছে, তাহার নিকট যে বিশেষ মাদুলী আছে উহা তাহার খুব প্রয়োজন। ধর্মযাজক তাহার প্রিয়ার এই সাংঘাতিক রোগের বিষয় অবগত হইয়া এবং আপনাকে এই বিপদের কারণ স্থির করিয়া তাহাকে দুই একটী প্রশ্ন করিবার পর অতি দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিয়া সেই রমণীর কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি মাতাকে তাঁহার গন্তব্যস্থল ও কারণ বলিয়া গেলেন।

ধনী রমনীর গৃহে আসিয়া দেখিলেন তাহার শারীরিক অসুস্থতা ভান মাত্র। তিনি খুব জোর গলায় ধর্মযাজককে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন। কতকটা ক্ষোভে এবং কতকটা মাতার উপর ভক্তি হেতু ধর্মযাজক রমনীর প্রেম পূর্ব্ববৎ প্রত্যাখ্যান করেন এবং আপনার হৃদয়কে সবল করিয়া তুলেন। অপমানিতা রমণী তখন তাহাকে বলিল, যে কল্য প্রাতঃকালে গীর্জ্জায় তিনি যখন প্রার্থনা করিবেন, তিনি ঐ গ্রামের মালিক হিসাবে এবং গীর্জা প্রতিষ্ঠানকারীর বংশধর হিসাবে গিয়া তাঁহাকে সেই লোকসমাজে তাঁহার সহিত ব্যাভিচার এবং প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গের কথা জ্ঞাপন করিবেন। নতুবা তিনি গ্রামের অধিশ্বরী হিসাবে তাঁহাকে সেই রাত্রেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। ধর্মযাজক এই পৌরুষবাক্যে ক্ষিপ্ত হইয়া রমণীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন। ধর্মযাজক কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার কোন চেষ্টাই কার্য্যকরী হইবে না তখন তিনি সে স্থান ত্যাগ করেন।

গৃহে আসিয়া মাতাকে এই সংবাদ প্রদান করিলে মাতা স্তম্ভিতা হইয়া যান; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য এবং তাহার পর পুত্রকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া সকাল বেলায় প্রার্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। প্রাতঃকালে মাতাপুত্র গির্জায় উপস্থিত হইয়া যথোচিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন, ধনী মহিলা তখনও উপস্থিত হন নাই। মাতা বেদীর পাদমূলে উপবিষ্টা হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমশঃ ধনী মহিলা আসিলেন। প্রার্থনা শেষ হইল। ধনী মহিলা তাঁহার অনুযায়ী কার্য্য করিবেন বলিয়া দুই একবার ইচ্ছা করিলেন সত্য, কিন্তু বংশমর্য্যাদার ভয়ে মুখ খুলিতে পারিলেন না। এমন সময়ে ধর্মযাজক পিছনের দিক দিয়া বেদী হইতে অবতরণ করিয়া গেলে, সমাগত জনতাকে বলিতে শুনা গেল, মা মারা গেছেন। ধনী মহিলা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কম্পিতপদে ধর্মযাজকের মাতার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা তখন প্রস্তর মূর্ত্তির মতন নির্ব্বাক ও নিশ্চল। প্রণয়ী যুগলের চক্ষু পরস্পর পরস্পরের উপর পড়িল। এইখানে আখ্যান বস্তুর শেষ করা হইয়াছে।

বিষয়টী খুবই উচ্চ। নবীনই চিরকাল সৃজন করিয়া থাকে। বৃদ্ধের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মৃত্যু। বৃদ্ধা নারী নবীন নারীর (মাতার) হৃদয়ে কোন প্রেম সম্পদ দান করিতে পারে নাই, মাতার এই ধারণা তাঁহার হৃদয় মধ্যে যখন উপলব্ধি হইয়াছিল, তখন তাঁহার এই ধারণানুযায়ী কার্য্য করাই উচিত ছিল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার আসিয়া আঘাত দেয়। স্বপ্নই তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার। এবং এই কারণে ট্রাজেডির উৎপত্তি হয়। মানব যখন সৃষ্টি করিবার বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে সৃষ্টি করিতেই দেওয়া উচিত। নতুবা সত্যের অপলাপ করা হয়। এই সত্যটী খুব সাধারণ ভাবেই ফোটাইয়া তুলা হইলেও ইহা সত্য যে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার সে বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। ধনী মহিলা যখন অপমানিত এবং প্রত্যাখ্যাত হইলেন তখন তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইতেছে তাঁহার প্রতারককে সমাজের নিকট অভিযুক্ত করা। নারী লাঞ্ছিতা হইয়া অপযশের ভাগী হয় তখনই যখন সে স্বেচ্ছায় অপযশ বরণ করিয়া লয়। লোক লজ্জা যদি পুরুষের না থাকে তবে নারীর থাকিবে কেন? ধনী মহিলাকে গ্রন্থকর্ত্রী মানবত্বের দাবীদার বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই আমরা এই অসমাঞ্জস্যের সমালোচনা করিতেছি নতুবা করিতাম না। যশস্বিনী লেখিকা সম্পূর্ণ প্রশ্নটী খুব সরল ভাবে আনিয়া কেমন একটু থতমত খাইয়াছেন। এই জ্ঞানটুকুই আমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। উপসংহারে আমি আবার মাননীয়া সরোজিনী নাইডুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহার ভাষা যেমন পরিষ্কার, তাঁহার ভাবও সেইরূপ সরল। এইরূপ সহজ ভাষায় এবং সরলভাবের দ্বারাই ভবিষ্যৎ সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।

অপমান বর

গল্প

শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(এক)

গজানন বাবুকে নিয়ে বেজায় রগড়।

সাব ডেপুটী হরেন বাবু বললেন,—কী শুভ অমৃত যোগেই দাদার আমার নামটী রাখা হয়েছিল! নামের সাথে [illegible] মিল—একেবারে সব দিক দিয়ে!

অমূল্য বাবু ডেপুটী বললেন,—নামে গজানন, চেহারা গজ-রাজ জিনি, গজেন্দ্র গতি, গজ-গজে রাগ, গজা খাওয়ার যম,—

হেসে বৃদ্ধ বামুন-গো হরিহর বাবু বললেন,—সম্প্রতি কলা-বউটী বিহনে নেহাৎ মন মরা হয়ে আছেন। প্রিয়-তমার বিরহে বিরহী যক্ষের মত,—কী আর করবেন! ভায়া আমার রাতদিন কাঁদি কাঁদি কলা খাচ্ছেন। চা পাউরুটী? আ—হা! ভায়ার তা যদি একটুও রোচে! স্রেফ বিতৃষ্ণা। বাজারে কলার দাম রীতিমত বাড়িয়ে দিয়েছেন হে!

আর দাদার বাহনগুলির জ্বালায় রাত্রে ঘুম বলতে যদি একটুও উপায় আছে! এই বৃদ্ধ বয়সে সারাদিন মোষের মত খাটুনি, গা হাত পা ব্যথায় যেন বিষ,—তারপর আবার যে পাগলা এই কমিশনার সাহেবটা! ছোটে যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া! মশাই, স্কটল্যাণ্ডীয় হাই-ল্যাণ্ডারী ধাঁচের পাহাড় লাফানো পেল্লায় সাত ফুট লম্বা যমদূতের মত চেহারা, all bone মেদ মাসের লেশটুকু মাত্র নেই,—পৈত্রিক জানটা যাবার জোগাড় হয়েছে। এখন দাদাকে স্তব স্তুতি করে জানাচ্ছি রাতের বেলায় বাহনগুলিকে একটু সংযত করুন, পাউরুটী মাখন চিনি বিস্কুটতো রাখবারই যো নেই, তা না হয় যাক—দেবতার বাহন ঐটুকু খেয়েই যদি থামতো তাতেও রাজি ছিলাম, কিন্তু মশাই সারারাত যে হুটো-পুটী লাফালাফি আরম্ভ করে দেয়, তা আর কি বলবো? ঘুমের দফা রফা!—

বলে হরেন বাবু একবার আড় চোখে গজানন বাবুর দিকে চেয়ে হাসি লুফে নিলেন।

গজানন বাবু রাগে কি করবেন কি বলবেন ঠিক মনস্থ না করতে পেরে বসেই একবার এদিক একবার ওদিক চাইতে লাগলেন।

অমূল্য বাবু একটু ফোড়ন দিয়ে বললেন,—দাদা আমার রাগলে বড়ই ভয় পাই, কারণ সর্ব্ব দেবতার মধ্যে সেরা দেবতা গজানন, সবার আগে দাদার পুজো, তার পরে আর কথা।

হরেণ বাবু হাসির লহর তুলে বললেন,—সে আর বলতে! রোজ সকালে চা তৈরী হ'লে অগ্রভাগ দাদাকে দিয়ে তবে আর সবাইকে তার প্রসাদ বিতরণ হয়। কিন্তু এত যে রোজ রোজ চা বিস্কুট ডিম রুটীর ভোগ জোগাচ্ছি, দাদাও আমাদের oblige কচ্ছেন খেয়ে খেয়ে, কিন্তু একবার চেয়ে দেখো তো দুটী কি একটী কলা! দাদা আমার সে বেলায় বেজায় টঙ্ক!

বৃদ্ধ হরিহর বাবু হেসে একবার চোখ ঠেরে বললেন,—আরে ভালো কথা বলেছো হে! পরস্মৈপদীতে ভায়া আমার সব পারে; চা, রুটী ডিম চাইকি সাপের বিষ পর্য্যন্ত; কিন্তু দেখেছো কোন দিন আর কারো বাবদ একটী পয়সাও খরচ করেছে ও?

হরেন বাবু উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর একটা কিল মেরে বললেন,—আমি হলফ করে বলতে পারি, এই ছমাস ট্রেনিং এর মধ্যে দাদা আমার কলা ছাড়া আর কিছু যদি একটী পয়সারও কিনে থাকেন! তাও রোজ সকালে একবার বিকালে একবার গুনে গুনে দেখেন, ভয়—পাছে আর কেউ ওর থেকে একটীও যদি সরায়! দাদা আমার রীতিমত miser কৃপন একেবারে Shylock the jew।

তবে পরের চা রুটীর পরে এত লোভ কেন?

we do to you, do so to us—কথিত প্যারী সরকারী নীতিটা দাদার ভুল হয়ে যায় নাকি?—বলেই অমূল্য বাবু একবার জিভ কাটলেন।

গজানন বাবুর রক্ত জবার মত আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে হরিহর বাবু একটু ঠেঁস দিয়ে বললেন,—সে কি আজকের কথা? অন্ততঃ চল্লিশ বছর আগের কথা। তারপর কত সরকারী বে সরকারী সুনীতি কুনীতি দুর্নীতি হজম করতে করতে ভায়ায় আমার প্যারী সরকারী নীতিটাকে যে ভুল হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

নাঃ, ধৈর্য্যের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে। গজানন বাবু গজ গিরি সদৃশ গজাকার বর বপু সহসা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—আমার, পাঁঠা আমি লেজে কাটবো তা আপনাদের কি? আমি কলা খাই মুলো খাই আমার পয়সায় খাই। সেধে কারোকে খাওয়াতেও চাইনে খেতেও চাই নে। কবে আমি সেধে চা বিস্কুট খেয়েছি? আপনারা খাওয়ালে আমি কি করবো? ভালো রে ভালো! খেলেও দোষ না খেলেও দোষ? ভদ্র বংশে জন্মে অভদ্র অপবাদটাতে বড ভয় পাই, তাই সেধে দিলে না বলি নি। এতেও কথা শুনতে হবে? আমার নাম গজানন, আপনাদের নাম হয় মদন মোহন রমণ। রঞ্জন তাতে ঠাট্টা করবার কি আছে? নামের মধ্যে কি আছে? কাজ নিয়ে কথা!

হরিহর বাবু হেসে বললেন,—লাখ কথার এক কথা কাজ নিয়ে কথা। ভায়া আমার কত বড়ো কেম্মাৎ লোক! একযুদিন তো হরেন ভায়ার মারফৎ প্লেন টেবেল সার্ভের হাত এড়িয়েছেন, আজ থেকে লেভেলিং আরম্ভ মনে আছে তো হরেন!

হরেন বাবু বললেন,—খুব আছে। আজ থেকে কাজ নিয়ে কথা। দাদার পাঁঠা আজ থেকে দাদা লেজেই কাটুন আর ঘাড়েই কাটুন আমি আর কিচ্ছুর মধ্যেই নেই। সেধে কারে কিছু করে দিতেও চাইনে, করে নিতেও চাইনে।

এইখানে গজানন বাবুর বড় মুস্কিল। বিরাট গোলাকার চেহারা, হাটতে লাগলে মনে হয় যেন একটা ফুটবল গড়িয়ে যাচ্ছে। একটু জোরে হাটতে প্রাণ আঁই ঢাই করে, উঁচু নীচু হ'তে গেলে বুকে হাঁটুতে টান লাগে—হেঁচে কেঁশে ঘেমে অস্থির; একটু রোদ লাগলেই গায়ের চর্ব্বি চড়বড় ক'রে ওঠে, এবং মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে নাকালের একশেষ হ'তে হয়।

প্রথমদিন তো কমিশনার ম্যাক্‌-হার্ডি সাহেব ওকে দেখে হেসেই খুন। জনিয়ার সিভিলিয়ান জ্যাক্‌সনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,—'Who is that funny fellow?' (এই মজার লোকটী কে?)

ছোকরা জ্যাক্‌সন ফুর্ত্তিবাজ লোক, হেসে ব'ললে,—Funny indeed, he is a Kanungoe in training? (মজারই বটে; ও একজন শিক্ষানবীশ কানুন গো)

সেই থেকে সাহেবের সবিশেষ দৃষ্টি। হরেন যে গজাননবাবুর প্রায় সব কাজই ক'রে দেয় তা ম্যাক্‌ হার্ডির নজর এড়ায় নি, এবং কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ঠাওরালেও মুখে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই কেন সেইটেই সকলের বোধের অগম্য। কারণ ম্যাক্‌-হার্ড জাতে ও স্বভাবে খাঁটি স্কচ; মাতামহের তরফ থেকে কিঞ্চিৎ প্রুসিয়ান রক্ত থাকার দরুণ দো আসলা স্বভাবটা দাঁড়িয়েছে এই যে বাহ্যিক ব্যবহারে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, বজ্রের মত কঠোর এবং বন্য পশুর মতই হিংস্র, যদিও অন্তরটা ছিল শিশুর মত সরল এবং সহানুভূতিপ্রবণ। কিন্তু সে খবর বড়ো কেউ জানতো না। সাত ফুট লম্বা অস্থিসার নির্মেদ চেহারা আর লম্বে লম্বে কাঁটা বেড়া নালানর্দ্দামা-পগার পয়ঃ-প্রণালী পারাপার বন্য মহিষের মতো হতস্ততঃ ক্ষিপ্র উল্লম্ফন ও তূর্ণ গতি। একেতো মাথা পাগলা সাহেব তার উপর বেজায় কাজ পাগল; এই দুইয়ের মণি কাঞ্চন যোগ হওয়াতে সাহেবকে এঁটে উঠা দুষ্কর, বিশেষতঃ শাক ভাত খাওয়া মেদ-মাংস-গঠিত বাঙালী দেহে। জ্যাক্‌সন সাহেব তো যেন একটা তরুণ জোয়ান কিন্তু তাই-ই হিম-ঝিম খেয়ে যায়; অন্যে পরে কা কথা। আজকে লেভেলিংএর ইনস্ট্রাকশান এবং সারকুট দেখিয়ে দেবেন স্বয়ং খোদ বড়ো সাহেব; সুতরাং বিশেষ চিন্তার কথা আছে।

হরেনবাবু হঠাৎ ব'লে উঠলেন,—আজকে চাচা

আপন প্রাণ বাঁচা নীতি, আজকে যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করেন। যার যার নিজের চরকায় তেল দেবেন, তা কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখছি ভদ্র বংশে জন্মে অভদ্র অপবাদটা নেবেন না কিন্তু।

এর পরেই সাতটার ঘণ্টা বেজে উঠলো, সুতরাং সকলকে দ্রুত ক্যাম্পের দিকে দৌড়াতে হ'লো।

(দুই)

একজন সিনিয়ার অফিসার ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ম্যাক্‌ হার্ডি সাহেব ইতস্ততঃ পায়চারি ক'রছেন এবং নিজেই একটা যন্ত্র মাঝে মাঝে ফিট করবার চেষ্টা কচ্ছেন, দুই একটা প্রশ্নও ক'রছেন, আর হরেন বাবু পটপট ক'রে তার উত্তর দিচ্ছেন।

এক এক ব্যাচে ছয়জন। দুর্ভাগ্যক্রমে হরেনের ব্যাচে যথারীতি গজাননবাবু এসে জুটলেন। ম্যাক্‌হার্ডি সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে ব'ললেন,—Come on, I shall show you the circuit, ব'লতে ব'লতে একেবারে দুই তিন রসি মাঠ মাঝে মস্ত বড়ো এক পগার পেরিয়ে একেবারে একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর এসে দাঁড়ালেন। পাছ পাছ হন্ত-দন্ত হয়ে কুলি আরদালী এবং শিক্ষানবীশ হাকিমবাবুরা ছুটছেন। তাদের পাছে সমান তালে পাল্লা দিতে গিয়ে গজাননবাবু একটা ইটে ঠোক্কর খেতে একেবারে উপুড় পড়া পড়লেন, এবং বাবাগো…গেলুমগো—ব'লতে একেবারে গড়াতে গড়াতে পগার সই। পগারটা ছিল পচা-কাদা বোঝাই। সুতরাং মিনিট পাঁচ সাত পরে অতি কষ্টে গজাননবাবুর সকর্দ্দম দেহ-বর্ত্তুল মাটির উপর উঠে দাঁড়ালো, তখন তার অতি বড় বিপদেও অন্য সকলের হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়েছিল। সাহেব ততক্ষণ রেগেই খুন, পাঁচ সাত মিনিট এদিক ওদিক তাকিয়ে গজাননবাবুকে দেখতে না পেয়ে আগে থাকতেই রেগে হয়েছিলেন অগ্নিশর্ম্মা, তারপর যখন অভিনব পঙ্কলিপ্ত বরাহাবতার মূর্ত্তিতে গজাননবাবু এসে দেখা দিলেন, তখন আর রাগে সাহেবের দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে গেছে। দৌড়ে এসে বিরাট দু'টী বাহুমুষ্টি দিয়ে গজানন বাবুর গজস্কন্ধটা ধরলেন জোরে চেপে তারপর You fcol! you idict! ব'লতে ব'লতে স বপু গজাননবাবুকে একবার ঊর্দ্ধে তুলে সবেগে মারলেন ছুঁড়ে একেবারে আট দশ হাত দূরে। ধাক্কা খেয়ে কবন্ধ রাক্ষসের মতো গড়িয়ে পড়ে গজাননবাবুর যে কী দশা হ'লো তা চোখে দেখবার কি মনে ভাববার সময় না দিয়েই সাহেব আবার ছুটে চললেন, এবং সানুচর হরেন্দ্রবাবুর দল ঊর্দ্ধশ্বাসে মনে মনে পরিত্রাহি দুর্গানাম জপতে জপতে ফল্যাট রেস দৌড়াতে দৌড়াতে চ'লতে লাগলেন। কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি ঘটনা এত দ্রুত ক্রমে ঘটে গেল যে হাসবার কাঁদবার কিংবা কোনোরূপ অনুভূতি দিয়ে অনুভব করবার সময়ও কারো হ'লো না।

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখা গেল গজাননবাবু উপুড় হয়ে চারি হাত পা পরিপূর্ণ বিস্তার করে একখানা খাটিয়ার উপর পড়ে আছেন। কি জানি কি একটা ভাব হলো কারো মুখে একটা কথাও নেই। কখন কার কি হয় এই ভাব, হাসি ঠাট্টা আসবে কোন ভরসায়? সহানুভূতি দেখাতেও ভয় হয়, ডেকে দু'একটী কথা বলতেও ভরসা হয় না। যে সাহেব, বাবা! পড়েছি পাঠানের হাতে, এই রকম ভাব সকলেরই মনে। এ যাত্রা প্রাণে প্রাণে বাঁচলে এবং কল্প-বৃক্ষের চাকুরি-রূপ কাম্য ফলটী বজায় থাকলেই বাঁচাও; সুতরাং গজানন বাবুর ভবিষ্যতে কোন দিকের দিক্‌ গজত্ব বজায় রইবে কিনা ভাববার মতো অবস্থা তখন কারো নয়। এর চেয়ে ওকালতি করা কিংবা অন্য কোনো স্বাধীন ব্যবসা করা ভালো ছিল কিনা তাই মনে মনে ভাবতে ভাবতে সকলের স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন ও শয্যা লাভ।

তিন

পরদিন প্রত্যুষে বড় সাহেবের তাঁবুতে গজাননবাবুর ডাক হলো। সকলের বুঝতে বাকী রইল না যে গজানন বাবুকে সাহেব ঠিক সন্দেশ খেতে ডাকেন নি। সুতরাং আর সকলে করে রইলেন চুপ, কিন্তু গজাননবাবুর আজ যেন অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ মরিয়া ভাব দেখা দিয়েছে।

অতি সযত্ন রক্ষিত বাকী যে কয়টা কলা অবশিষ্ট ছিল তা নীরবে অসম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ ক'রে গজাননবাবু যখন

বুকের ছাতিটা বেশ একটু ফুলিয়েই উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেশ পরিষ্কারই বোঝা গেল ভদ্রবংশে জন্মিয়ে তিনি একটা অভদ্রোচিত কাজই করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ কেঁদে কেটে চাকরী রাখাটাই ভদ্রতার লক্ষণ বটে; কিন্তু জেদ করে চাকরীটা ছাড়া ঠিক ভদ্রজনোচিত না হলেও গোঁয়ার গজানন আজ যেন একটা লঙ্কাকাণ্ড করতেই উদ্যত।

হাক সুরেন্দ্র বাবুর দিকে চেয়ে গজানন বাবু কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু না বলেই বেরিয়ে গেলেন।

You are Mr. Gajanon (তুমি মিষ্টার গজানন ?)

Yes sir, (হাঁ, মহাশয়)

গজাননবাবু ছোট্ট একটু সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেন।

You are a kanungoe ? (তুমি কানুন-গো ?)

Yes sir ? (হাঁ মহাশয়)

What have you to say, if you are thought quite unfit for the Service ? (তুমি চাকরির অনুপযুক্ত, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার কি আছে ?)

Nothing sir. (কিছুই নয়, মহাশয়)

Nothing you say in all earnest !

উত্তর,—Nothing. absolutely nothing, I say in all earnest. (কিছুই নয়, একেবারেই কিছুই নয়; আমি সত্যসত্যই বলিতেছি।)

সাহেব একটু অবাক্ হলেন; এমন উত্তরটা ঠিক তিনি আশা করেন নি।

হটাৎ সাহেব বলে ফেললেন;—Suppose I let you off this time ! I say you deserve dismissal; but willy nilly I am a bit ill disposed to do away with you anyway (মনে কর আমি তোমাকে এবার যদি ছেড়ে দিই। তোমার চাকরি যাওয়াই উচিত। কিন্তু তোমাকে ছাড়াইয়া দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়।)

গজাননবাবু সাহেবের কথায় বাধা দিয়েই যেন বললেন;—আপনার দয়াতে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আর ঠিক চাকরী করতে প্রস্তুত নই।

কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরেজিতেই হচ্ছিল।

সাহেব বললেন,—কেন ?

গজাননবাবু যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন;—আপনি কাল আমাকে দশজনের সামনে—এমনকি কুলী আরদালীদের সামনে যেমন ভাবে অপমান করেছেন তারপরে জিজ্ঞেসা করছেন, কেন ?

সাহেবের প্রুসিয়ান রক্তে যেন একটু দোলা লেগেছে। হঠাৎ সাহেব অনুতপ্ত সুরে বলে উঠলেন;—What did you then think of me, Gajanon Babu ? (গজানন বাবু, তুমি আমার সম্বন্ধে তা'হলে কি ভেবেছিলে ?)

আমি ? কিছুই না। শুধু এই টুকুই ভেবেছিলাম যে আমি আপনার এই চাকরীর যোগ্য নই।

আহা সাহেবের চেহারা হয়েছে কী ? সাদা মুখে যেন কে কালী লেপে দিয়েছে! সাহেব বললেন;—না বাবু, না, তুমি কি ভেবেছিলে তা—তা আমি বলতে পারি; তুমি—তুমি ভেবেছিলে Mac Hardy is a brute—

অবাক! এর পরে কি যে বলবেন ভেবে না পেয়ে গজাননবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে যাবারও উপক্রম করছিলেন।

হঠাৎ সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন;—বাবু কতদিন তোমার এই চাকরী ?

গজাননবাবু অবাক হয়েই উত্তর করলেন;—বিশ বচ্ছর।

Then you long deserve promotion ! (তাহলে তোমার প্রমোশন হওয়া উচিত)

ইয়েস্—বলতে গজাননবাবুর গলায় ঢোক বেধে যাচ্ছিল। আবার ভাবলেন কোন মুখে ইয়েস বললাম! যে পাগল সাহেব, হয়ত আবার যাবে চটে। প্রোমোশন ! বলে এই কানুনগোর চাকরী নিয়েই সাই সাই; বিদ্যে তো কেবল এণ্টান্স পাশ। অনেক ভেবে আবার মুখ কাঁচু মাচু করে বললেন;—হুজুর, আমি quite unfit, সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই কানুনগোর চাকরীতেই quite unfit; আপনি আমাকে ডিসমিসই করুণ।

সাহেবের হাতে একটা কাচের কাগজ চাঁপা ছিল,

সেইটে হাতের উপর বার দুই নাচিয়ে টেবিলের উপর ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ;—And so you are quite fit as a Sub Deputy Collector. Never mind my boy. I shall make amends for the inhuman treatment meted out you last morming. I am really a brute. (এবং সুতরাং তুমি সবডেপুটি কালেক্টরের কাজের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি গত সকালে তোমার উপর যে অমানুষিক ব্যবহার করেছি, তার প্রতিকার করব, আমি সত্যই পশু।)

বাব্বা!!!

যো হুকুম—বলে সাহেবকে খুব লম্বা এক সেলাম বাগিয়ে গজাননবাবু ইষ্টনাম জপতে জপতে কোনো রকমে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকে সেই পগারটা দেখে গজানন বাবু হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক বুঝতে পাচ্ছিলেন না।

তাঁবুতে ফিরবার পূর্ব্বেই একজন আরদালী দৌড়ে এসে হরেনবাবু প্রভৃতিকে খবরটা দিয়েছে। সুতরাং ঢুকবামাত্রই চারিদিকে থ্রি চিয়ার্স ফর গজাননবাবু... জয় গজাননবাবুজীকি জয়...ইত্যাদি উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো। হরেনবাবু তো কোঁচার কাপড় খুলে বেড় দিয়ে পরে বাইজীর মতো একবার নেচে নিলেন ; অমূল্যবাবু তাড়াতাড়ি কোত্থেকে একগাছ ফুলের মালা এনে পরিয়ে দিলেন গজাননবাবুর গলায়। চারিদিকে হৈ হৈ হল্লোড়ের একশেষ।

হেসে হরিহর বাবু বললেন ;—আমরা ভাবলুম ভায়ার উপর বুঝি শনির দৃষ্টি পড়ে পড়ে।

গজাননবাবু বৃদ্ধ হরিহরের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, সে একবার সত্য যুগে পড়েছিলো, আবার কেন? শনির সাথে আমার আপোষ রফা হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ হরিহর গজানন বাবুকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে বললেন ;—শনির দৃষ্টি লাগলে একটা কিছু পোড়ে এই ই জানতুম।

হেসে গজাননবাবু বললেন ;—আমার কানুনগুইত্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আর কি চান!

হরেনবাবু রুমাল উড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন ;—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে! আজ থেকে দাদা আমার সিদ্ধিদাতা...সর্ব্ববিঘ্ন হর...সকালে ঘুম থেকে উঠে সত্ত দাদার নাম নিও হে! দাদা আমার শুষ্ক কাষ্ঠের কাছে রস বের করেছেন। ম্যাক হার্ডির কাছে প্রোমোসন!

হেসে গজানন বললেন ;—তাও আবার পচা নর্দ্দমায় গড়িয়ে পড়ার কৃতিত্ব নিয়ে!

বলা বাহুল্য, কৃপণ গজাননের সেদিন বেশ কিছু খসেছিলো।

কুমুদ কলি

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ওগো কুমুদ কলি
তব নয়ন পাতে,
কত চাঁদের আলো
ঝরে আধেক রাতে।
কত আলো জোনাকি,
তোরে রাখেগো ঢাকি ;
কত শালুক বালা
খেলে তোমারি সাথে।

কত তারকা ভাসে
ওই শীতল জলে
তারা গোপনে কথা
কত তোমারে বলে।
রোজ শিশির ঝরে
ওগো তোমারি তরে,
তোরে পরাবে বলে
তারা মালাটী গলে।

স্বরলিপি

কথা—কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়   সুর—কাজি নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

কার রঙিন তরী
ওই উড়ে চলে যায়,
    কোন অজানা দেশে
বলাকা যেন ভেসে যায়
সোনার তপন মাখি গায়
    দখিন হাওয়ায় যায় ভেসে।
মুখখানি দেখে সে যে তটিনীর জলে,
এলায়ে কালো কেশ কতই ছলে;
রূপালী পাল তুলে চলে সে যে নভতলে
    বিজলী ভরা মধু হেসে।

ণা ণা II { ধা ধা না না | র্সা -া র্সা র্সা | ধা ধা না না | র্সা -া -া র্সা |
কা র { র ঙি ন ত | রী ০ ও ই | উ ড়ে চ লে | যা ০ ০ য় |

ণা ধা ণা ণা | পা -া -া পা | মা পা মা পা | জ্ঞা -া -া -া |
উ ড়ে চ লে | যা ০ ০ য় | কো ন অ জা | না ০ ০ ০ |

রা -া -া -া | সা -া ণা ণা } II
দে ০ ০ ০ | শে ০ কা র }

II { মা মা ণা -া | ধা ধা না না | সা -া -া -া | -া -া -া সা |
{ ব লা কা ০ | যে ন ভে সে | যা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য় |

না র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্রা র্সা র্সা | ণা -া -া -া | -া -া ধা -া } I
সো না র ত | প ন মা খি | গা ০ ০ ০ | ০ ০ য় ০ }

ণা ধা ণা ণা | পা -া -া পা | মা পা মা পা | জ্ঞা -া -া -া |
দ খি ন হাও | য়া ০ ০ য় | যা য় ০ ভে | সে ০ ০ ০ |

মা -া মা রা | সা -া ণা ণা II
যা ০ য় ভে | সে ০ কা র

II { সা মা মা মা | মা মা মা মা | মা পা পা পা | মা পা জ্ঞা -া |
{ মু খ খা নি | দে খে সে যে | ত টি নী র | জ ০ লে ০ |

মা মা মা মা | রা জ্ঞা সা সা | ণা -া ণা ণা | ধা ণা পা -া } I
এ লা ০ য়ে | কা লো কে শ | ক ০ ত ই | ছ ০ লে ০ }

{ পা র্রা -া র্রা | র্রা র্রা র্রা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্সা র্সা } I
{ রূ পা ০ লী | পা ল তু লে | চ লে সে যে | ন ভ ত লে }

র্সা র্সা র্সা ণা | পা -া -া -া | মা পা মা পা | জ্ঞা -া -া -া |
বি জ লী ভ | রা ০ ০ ০ | ম ০ ধু হে | সে ০ ০ ০ |

মা -া মা রা | সা -া ণা ণা II
যা ০ য় ভে | সে ০ কা র

কলঙ্ক

গল্প

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

বামুনডাঙ্গা হইতে সাতরাগাছি পুরা আড়াই ক্রোশের পথ, মাঝে আবার কুসুমপুরের সাঁকো পার হইতে হয়। ময়নামতীর জলে ভীষণ তোড়, ফি বছরেই সাঁকো না বদলাইলে চলে না। তারপর এই বৎসর অবস্থাটা হইয়াছে আরও ভয়ঙ্কর, বামুন ডাঙ্গার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সাঁকো একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে।

সাতরাগাছি হইতে বামুনডাঙ্গা ইষ্টিশানে আসিবার ঐ একমাত্র পথ। লোকে যাইয়া সাতরাগাছি কাছারীর সরকার ত্রিলোচনকে ধরিল, "ওটাত' সাতরাগাছির জমিদারের কৃপায় আমরা পেয়ে থাকি. এ বছর সাঁকোটা কায়েমী হয়ে যাক্, দেশের লোক ধন্যি ধন্যি করবে! জমিদারকে ধরে এটা কিন্তু আমাদের করিয়ে দিতেই হবে সরকার মশাই!"

সরকার ত্রিলোচন মনিবের নিকট সমস্ত ঘটনাটা খুলিয়া লিখিয়া দিল। উত্তর আসিল। সাঁকো বানাইতে কলিকাতা হইতে লোহা লক্কড় আসিল. ওস্তাদ কনট্রাকটর মিস্ত্রী আসিল, আরও আসিল নিতান্ত একটা দুঃসংবাদ যাহাতে নায়েব গণেশচন্দ্র, সরকার ত্রিলোচন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; দুঃসংবাদটা আর কিছুই নহে, সুদীর্ঘ বিশবৎসর পরে গ্রামের জমিদার আবার গ্রামে ফিরিতেছেন।

সাতরাগাছির সুরেশ্বর মুখুজ্যে ছিল ডাক সাইটে জমিদার, প্রজা সায়েস্তা করিতে, লাঠির জোরে পরের জমি দখল করিতে তাহার আর জুড়ী ছিলনা। লোকে বলিত, অর্থ পিশাচ। গ্রামের ঐ অতবড় চৌমহলা বাড়ীটার প্রতি ইষ্টক খণ্ডটাও নাকি প্রজার রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত জমিদারও অবশেষে সুশ্রান্ত হইয়া গেল একমাত্র পুত্র শিবসুন্দরের অকাল মৃত্যুতে। 'সংসারে ছয় বৎসরের শিশু পৌত্র ছাড়া আর কেহই ছিল না। শোকে দুঃখে বৃদ্ধ জমিদার পৌত্র লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। জমিদারী শাসন প্রকৃত পক্ষে নায়েব এবং সরকার মশাইই করিতেন; সুদূর সহরে বসিয়া জমিদার আয়ের টাকাটাই কেবল মাত্র গণিয়া লইতেন। ক্রমে সুরেশ্বরও মরিলেন, তরুণ জমিদারও কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া জমিদারীতে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া পর পর টাকাকড়ি লইয়া গণ্ডগোল হওয়ায় এবং বহু প্রজার বহুবিধ আবেদন নিবেদনে বিরক্ত হইয়া তরুণ জমিদার গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবেন ঠিক করিলেন।

জমিদার হইলেও শ্যামলের বয়স ছাব্বিশের বেশী হইবে না। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়াছিল, সে বয়সে গ্রামের কিছুই তাহার মনে থাকিবার কথা নহে। নিজের জন্মস্থান হইলেও সাতরাগাছি তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে নূতনরূপে নূতন ঠেকিল। কুসুমপুরের সাঁকো, ময়নামতীর ঢেউ, নিজেদের অতবড় বাড়ী সবই তাহার বিস্ময় বাড়াইয়া তুলিল। নিজেদের চৌমহলা বাড়ীটা একবার ঘুরিয়া দেখিতে সময় লাগে কম নয়।

ত্রিলোচন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যামলকে তাহাই দেখাইতেছিল। এই বিরাট অট্টালিকার প্রতি অঙ্গটা, প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী. কাছারীখানা, বাগানবাড়ী, যদিও বহুদিনের অব্যবহারের ফলে হইয়াছে জরাজীর্ণ, ভঙ্গুর. ফাটলে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন যাহা একদিন শত কলরব মুখর ছিল, সেখানে বন বাদাড়ে ভরিয়া গিয়াছে, সমগ্র মহলটা আজ কলরব বিহীন, তথাপি ইহাদের প্রতি অনুপরমানুতে শ্যামল তাহাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের বিত্তের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছিল। ঠাকুর্দার মুখের প্রতি কথাটী আজ তাহার মনে পড়িল।

ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ ত্রিলোচন বহু পুরাতন একটা হলঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরটীর দিকে শ্যামলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিয়া চলিল, সেত' আর আজকের কথা নয়! সেবার কোজাগরী পূর্ণিমায় পাইক গাছার জমিদার কোলকাতা থেকে এক বাইজী নিয়ে এল। সাতরাগাছির কাছে পাইকগাছা! আমরা এসে জমিদার বাবুর কাছে পড়লাম ওরা এনেছে কোলকাতাই বাইজী আমাদের আনতে হবে পশ্চিমে বাইজী। আপনার ঠাকুর্দ্দার ছিল দরাজ হাত, নোটের তাড়া আমার কাছে ফেলে বল্লেন, ত্রিলোচন, সাতরাগাছির মান যেন থাকে। শত শত টাকা ব্যয় করে আসর বসলো এই হল ঘরটায়। এই এত বড় ঘর, একদম ঠাসাঠাসি লোকে ভর্ত্তি, অথচ টুশব্দটী পর্য্যন্ত নাই। আপনার ঠাকুর্দ্দা ছিলেন এসবের বড় সমঝদার, নাচের শেষে আমায় ডেকে নিয়ে বল্লেন, ত্রিলোচন, গুণী যাচাই করতে তুমি ওস্তাদ—সরকার কথটা বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে।

শ্যামল ঘরটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, আজ ইহার দেখিবার কিছুই নাই, একদিন এইখানেই বাইজীর নূপুরের মধুর নিক্বণ শত শত দর্শকের মন ভুলাইয়াছিল, সেইদিন এইঘরের প্রতি কোণটী পর্য্যন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আজ সেখানকার দেওয়ালে, মেঝেয় আগাছা ধরিয়াছে, স্যাঁত স্যেঁতে অন্ধকার, বিশ্রী গন্ধে ভরপুর! বুনো পাখী আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে!

নীচের বা পাশের বড় হল ঘরটী সংস্কার করিয়া শ্যামল তাহার দপ্তরখানা বসাইয়াছে, প্রজার আবেদন নিবেদন এইখানে বসিয়াই শুনিয়া থাকে। ঠিক তাহার উপরের ঘরটী হইয়াছে তাহার শয়ন কক্ষ। নীচের দুই একটা ঘরে দুই চারজন পাইক পেয়াদা থাকিলেও, দ্বিতলের ঐ নির্জ্জন ঘরটীতে একলা রাত্রি কাটাইতে শ্যামলের ভয়ই করিত। শেষ রাত্রির দিকে কাহাদের গম্ভীর পদশব্দ, ফিস ফাস আওয়াজ স্খলিত দুই একটা কথাবার্ত্তা তাহার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিত।

গ্রামের লোকে বলে, দুর্দ্দান্ত জমিদার অসংখ্য প্রজার মাথায় লাঠি মারিয়াছে, তাহাদেরই অশরীরী আত্মা আজ আবার জমিদার বংশধরকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! কথাটা মুখে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শ্যামলের মন প্রবোধ মানিল না। সুতরাং পাশের ঘরটীতে রাত্রে ত্রিলোচনই থাকিবে ঠিক হইল।

গ্রামে আসিয়া শ্যামলের আর বিরাম নাই, সমস্ত গ্রামটী সে ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। গ্রামের সামাজিক সভা ছেলেদের স্কুল ক্লাব লাইব্রেরী সকল প্রতিষ্ঠান হইতেই নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, আবেদন আসিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ মিটাইতে, গ্রামের সংস্কার করিতে অর্থ নেহাৎ কম খরচ হইলনা। গ্রামের লোক হাঁকিয়া বলিল জমিদার বটে! যেমন দরাজ মন, তেমন দরাজ হাত।

সকাল বেলায় নিজের শয়ন কক্ষে বসিয়া শ্যামল একটা বিলাতী ম্যাগজিনের পাতা উলটাইতেছিল। বাহির হইতে ত্রিলোচন বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা জরুরী কথা ছিল, এখন সময় হবে কি? ম্যাগ্যাজিন রাখিয়া শ্যামল সোজা হইয়া বসিল, বলিল, হ্যাঁ আসুন। ত্রিলোচন ঘরে ঢুকিল, হাতে তাহার প্রকাণ্ড এক হিসাব নিকাশের খাতা। ঘরে ঢুকিয়া সবিস্তারে সে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই,—গাঁয়ের কৈলাস চক্রবর্ত্তীর বকেয়া খাজনা দাঁড়াইয়াছে বত্রিশ টাকা আট আনা দেড় পয়সা। কয়েকদিন ধরিয়া খাজনাটা আদায়ের চেষ্টায় ক্রমাগত সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তাগিদ দিতেছে। আজও গিয়াছিল কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় অসুস্থ থাকায় কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহারই এক নাতিনীর সহিত! মেয়েটী সহরের কলেজে পড়ে সুতরাং চোখা চোখা কথায় আজ নাকি শুনাইয়া দিয়াছে যে জমিদার বাঘও নয়, ভালুকও নয় সুতরাং ভয়ে পড়িয়া তাহার এই জুলুম মানিতে তাহারা রাজী নয়। তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধাও দেখিতে হইবে, জমিদারের আদেশই সব নয়…এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কথাগুলি শেষ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে ত্রিলোচন বলিল, সাতরাগাছিতে জমিদারের বিরুদ্ধে এতবড় কথা কিন্তু কেউ কোনদিন বলতে পারেনি। পাঁচশ ঘর লেঠেল যার কথায় আজও ওঠে বসে…

ত্রিলোচনের বিক্রম দেখিয়া শ্যামল হাসিয়া ফেলিল, বলিল, থাক থাক সাতরাগাছির মস্তবড় জমিদার একটা মেয়ের বিরুদ্ধে বীরত্বটা নাইবা প্রকাশ করলে সরকার মশাই! কিন্তু দেখি খাতাটা!

ত্রিলোচন মনিবের সম্মুখে খাতাটা খুলিয়া ধরিল।

শ্যামল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হিসাবটা দেখিতে দেখিতে বলিল, সত্যি বড্ড বেশী বাকী ফেলেছেন দেখছি, জমিদারী রক্ষা করতে হলে এত খাজনা বাকী রাখলে চলবেনা। পরে একটু হাসিয়া ত্রিলোচনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আপনি এক কাজ করুন সরকার মশাই আপাততঃ সেঠেলমেন্টের খবরটা না দিয়ে চক্রবর্ত্তী মশাইকে বরং এই খবরটা দিয়ে আসুন যে একটু সুস্থ হলেই যেন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। খাজনা আমি বাকী ফেলে রাখতে পারব না..সবটা না দিতে পারেন, যতটা তিনি পারেন নিজেই না হয় ঠিক করে যাবেন।

মনিবের এইরূপ আচরণে ত্রিলোচন বিস্মিতই হইয়াছিল। জমিদারের যে এত ঠাণ্ডা রক্ত হয় ইতিপূর্ব্বে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। জমিদারের আদেশে নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সে প্রস্থান করিলে।

বৈকালের দিকে শ্যামল নীচের দপ্তর খানায় বসিয়া কতকগুলি জরুরী কাগজপত্র দেখিতেছিল। এমন সময় একুশ বাইশ বছরের একটী মেয়ে আসিয়া বিনানুমতিতেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, একটু উষ্ণ কণ্ঠে শ্যামলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, দাদামশাই আসতে পারলেন না আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনার খাজনাটা নিয়ে আমরা পালাচ্ছিলুম না! আমার দাদুকে আপনি ভদ্রলোক বলে না হয় নাই গ্রাহ্য করলেন, কিন্তু অসুস্থ তিনি এইটুকু মনে রেখে আপনার ঐ পশু চাকর গুলোকে অন্ততঃ আজকের দিনটা বীরত্ব জাহির করতে হুকুম না দিলেও ত পারতেন। নায়েব জমিদারের সামান্য এই ভদ্রতাটুকুও কি প্রজারা আশা করতে পারে না! যাকগে এই রইলো আপনার খাজনার টাকা, আশাকরি এরপর থেকে আর আমাদের জুলুম সইতে হবে না। শ্যামলকে একটী কথাও বলিবার অবসর না দিয়া টাকা কয়টী টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটী যেমন আসিয়াছিল তেমন বাহির হইয়া গেল।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শ্যামল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মেয়েটীর গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারটীর কূল কিনারা সে খুজিয়া পাইতেছিল না। মেয়েটী হয়ত ত্রিলোচন বর্ণিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাতিনীই হইবেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল যাহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্মানের হানি হইল। শ্যামল বুঝিল যে হয়ত সুযোগ বুঝিয়া ত্রিলোচন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে সুতরাং তাহারই ডাক পড়িল।

ত্রিলোচন নিকটেই ছিল, আসিয়া বলিল, আপনি যা বলতে বলেছিলেন তাই-ই-ত বল্লুম, তবে বেশীর মধ্যে বলেছিলুম, আজই যেতে পারলে ভাল হয়। তাতেই মেয়েটী রেগে একেবারে হনহন্ করে আপনার এখানে উপস্থিত! জমিদার বলে একটা সমীহ নেই! এমন চড়া গলায় সাতরাগাছির জমিদারের সামনে কেউ কোন দিন বলতে পেরেছে

বাধা দিয়া শ্যামল চড়া গলায় বলিল, ঐ বেশীটুকু বলে একটা বিশ্রী গণ্ডোগোল করে জমিদারের মানটা বেশী দিলেন না? কী অন্যায় কথা বলুনত, ওরা হয়ত কি মনে করছেন! যান এরপর থেকে যেন এসব বিশ্রী ব্যাপারে আমার না পড়তে হয়!

ত্রিলোচন মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া নীরবে চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল, সাতরাগাছি—জমিদারী শাসন করা এ ছেলেটার কর্ম্ম নয়!

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বৈকালে শ্যামল একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল, প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় পথের মাঝে হঠাৎ সেই মেয়েটীর সহিত দেখা. সেও বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

শ্যামলকে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল, হাসিয়া বলিল, সন্ধ্যার এই হিম কি না লাগালেই চলেনা! গাঁয়ের ম্যালেরিয়া কিন্তু জমিদার বলে রেহাই দেবেনা, ওর খাজনা ও জুলুম করে আদায় করে নেবেই!

শ্যামল পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। সেদিনকার সেই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য ও বড় লজ্জিত ছিল। কিন্তু মায়ার কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, অবস্থা দেখিয়া মায়া উত্তরের আশায় না থাকিয়া বলিল, দুঃখের কথা কি বলব, মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি কিন্তু বেড়াবার একটা সঙ্গী পর্য্যন্ত পাইনা! কপাল ভাল

আজ আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু ভরসা পাইনা, গাঁয়ের জমিদার, শুনি বড় কড়া মেজাজী—

তাহার কথা বলিবার ভঙ্গিতে শ্যামল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না হাসিয়া বলিল, ভরসা করবেনও না, বড় পাজী জাত!

মায়া হাসিয়া বলিল, সহরের মেয়ে ওতে বড় ভয় পাবেনা। কিন্তু সে কথা যাক সেদিন আপনার সাথে ঝগড়া করতে যেয়ে, এক ফাঁকে অনেকগুলি বই টেবিলের উপর দেখেছিলুম। ছেলে বেলা থেকেই বই পড়ার বদ অভ্যাসটা আছে। গত বছর ঐ জন্যেই বি, এ, টাও ফেল করলুম কিন্তু নেশা তবু ছাড়তে আর পারি কৈ! কাল একবার আসব কিন্তু।

শ্যামল গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলে, কিন্তু ঐ যে বল্লুম গাঁয়ের জমিদার কিন্তু!

মামা বাড়ী যাইবার পথে যাইতে যাইতে মায়া হাসিয়া বলিল, সে আমি বুঝব।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শ্যামল বৈকালের ব্যাপারটা চিন্তা করিতেছিল। মায়ার আচরণের মধ্যে সে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছিলনা। সেদিনকার সেই ঝাঝালো কথাগুলিও আজিকার যাচিয়াপড়া এই সহজ সরল কথাগুলিতে কত প্রভেদ! যাক শ্যামলের মনের ভারটা কমিয়া গেল। বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব সে উপভোগ করিল।

শ্যামল কিন্তু নিজের জড়তা ভাঙ্গিতে পারেনা, অথচ মায়া মেয়ে হইয়াও তাহার কেমন সুন্দর সাবলীল গতি, আচরণে কথাবার্ত্তায় তাহার জড়তার লেশ মাত্র নাই। মায়া আসে কিন্তু বই পড়া লইয়া শ্যামল ও মায়ার আকাশ পাতাল প্রভেদ! মায়া চায় সহজ সরল গল্প, নাটক শ্যামল ওগুলি পছন্দ করে না, তাহার মগজে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন বড় বড় থিয়োরিষ্টের দল!

কয়েকদিন হইতে মায়া আসিতেছে না, অকারণে শ্যামলের মন খাঁ, খাঁ করিতে থাকে। পরের জন্য নিজের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া সে লজ্জা পায়।

শ্যামল নিজের ঘরেই বসিয়াছিল। বাহির হইতে প্রশ্ন আসিল, জমিদার মশাই অনুমতি দিলে ভেতরে ঢুকতে পারি।

শ্যামল ঘাড় ফিরাইয়া দেখে মায়া হাসিয়া দুই হাতে কপালে ঠেকাইয়া বলিল, সুস্বাগতম!

ঘরে ঢুকিয়া মায়া বলিল, কদিন বাদে আজ একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, ভাবলুম দেখা করে একটা বই নিয়ে যাই, পরে ঘরের চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে অনুযোগের সুরে সে বলিল, আচ্ছা জমিদার মানুষ আপনি, এতগুলি পাইক পেয়াদা, চাকর, সবাইকে কি খাজনা আদায় করতেই লাগিয়েছেন নাকি! ঘরটার অবস্থা দেখনা, টেবিলটা একটু পরিষ্কার করবার লোকও কি নাই! সরুন দেখি—কোণ হইতে ঝাড়ুনিটা লইয়া সে আগাইয়া আসিল।

শ্যামল মহা বিস্মিত হইয়া বলিল, আরে, পাগল হলেন নাকি রাখুন রাখুন!

মায়া গম্ভীর হইয়া বলিল, চুপ জমিদার বলে ভয় করব না। একটু বাহিরে গিয়ে দাঁড়ানত, পাঁচ মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্ছি! অমন করে তাকাবার কিছু নেই নোংরামী আমি সইতে পারি না,—এ আমার স্বভাব! শ্যামলের অসীম দৌর্ব্বল্য, এই মেয়েটীর মুখের উপর ও যেন কথা বলিতেই পারে না। নিতান্ত গোবেচারীর মত সে ঘর হইতে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

ঘরটীর অবস্থা ফিরিয়া গেল। টেবিলের উপর বইগুলি সাজাইতে সাজাইতে মায়া বলিল, ভেবে ছিলুম ঐ কাটখোট্টা পেয়াদাগুলির মনিব হয়ত ঐ রকমেরই একটা বৃহদাকার হবেন। কল্পনাও করে নিলুম বেশ মোটা সোটা বেঁটে একটা লোক, নাকের তলায় ঝাটার মত প্রকাণ্ড একটা গোপ,—বলিতে বলিতে মায়া নিজেই হোঃ, হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্যামল ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল, ঐ রকমই হওয়া উচিত ছিল, নইলে—

মায়া হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, নইলে?

শ্যামল বলিল, এই দেখুন না জমিদার বলে একটা মান্য গণ্য নাই, নিজের ঘর থেকে বের করে দেওয়া—

মায়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, বাপরে বড্ড আপত্তীর

দেখছিযে! আর কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা জমিদার মশাই বেশত ছিলেন কলেজে আড্ডা দিয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে গল্প গুজব করে! সহরে বসেইত টাকাটা পাচ্ছিলেন এসব ঝকমারি পোহাতে কেন এলেন বলুন দিকি।

শ্যামল হাসিয়া বলিল, সাত পুরুষের জমিদারী, প্রজা ঠেঙানোর লোভটা কিছুতেই ছাড়াতে পারলেমনা!

মায়া শঙ্কার সুরে বলিল, কিন্তু এখানে শরীরত আপনার টিকবেনা আপনার কলির দ্রৌপদীটীর রান্নার যা নমুনা ও আপনার খাবার যে বর্ণনাটা শুনলাম তাতে ভয় হবারই কথা!

শ্যামল বিস্মিত হইল, তাহার সম্বন্ধে এত খবর মেয়েটী জানিল কি করিয়া! নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল কলকাতায়ও ঠিক ঐ সংসারে আপনার বলতে কেউ নাই। ওরা যা রাঁধে, মানুষ হয়ে তা মুখে দিতে বাঁধে এক একদিন রাগকরে খাওয়াই হয় না। ওতে কিন্তু কষ্ট আমার কিছুই হয় না, দিন বেশ কেটে যায়।

এই হতভাগ্য যুবকের প্রতি মায়ার দুঃখ হয়। ধনী হইয়াও শ্যামল যে কত বড় অসহায় তাহা সে বুঝিতে পারে।

বেলা হইয়া গিয়াছিল টেবিল হইতে একখানা বই লইয়া মায়া বলিল, চল্লুম, দাদামশাই ভাল করে সুস্থ হতে পারেন নাই, তাকে আবার আমার দেখতে হয়। সময় পেলেই জ্বালাতন করতে আসব কিন্তু।

শ্যামল মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার অনুমতির অপেক্ষা ত আপনি রাখেন না! মায়া হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

ময়নামতীর চরের একটা অংশ লইয়া সাতরাগাছির ও পাইকগাছার জমিদারদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই একটা গণ্ডগোল ছিল। এতদিন চুপচাপ ছিল কিন্তু কয়েক দিন হইল তাহা লইয়া আবার গণ্ডগোল সুরু হইয়াছে। পাইকগাছার জমিদার খবর পাঠাইয়াছে, তাহার অংশ এবার সে যেমন করিয়াই হউক উদ্ধার করিবেই এবং এই সঙ্গে আরও কতকগুলি অনর্থক কথা বলিয়া সে সাতরাগাছিকে রীতিমত শাসাইয়াছে! শ্যামল পুরাতন নথিপত্র দেখিয়াছে, উহাতে পাইকগাছার একচুলও অধিকার থাকিতে পারেনা, অথচ লোকটা কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত বর্ব্বরের মত শাসাইতেছে। শ্যামলের মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন দপ্তরে বসিয়া শ্যামল পাইকগাছার এই অন্যায় জুলুমের কথাটা ভাবিতেছিল। ঠাকুর্দ্দার মুখে শোনা নিজেদের বীরত্বের কথা আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল।…পাইক, পেয়াদা, লাঠিয়াল, গ্রামে সেদিন কেহই ছিলনা, একা ঠাকুর্দ্দা। পাইক গাছার জমিদার বিশ পঁচিশ জন লাঠিয়াল লইয়া চর অধিকার করিতে আসিল। ঠাকুর্দ্দা একা লাঠি বাগাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল, মরতে যদি ভয় না পাস, তবেই এগো। হাতের লাঠি বন বন করিয়া ছুটিল, ময়নামতীর চর রক্তে ভিজিয়া গেল! পাইকগাছার জমিদার সেদিন ঠাকুর্দ্দার পায়ের তলায় বসিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিল…ভাবিতে ভাবিতে শ্যামলের রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিল, ঘরময় সে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া ত্রিলোচন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ওদিকে অবস্থাটা বড় গুরুতর হয়ে উঠেছে! পাইকগাছা ময়নামতীর চরে লেঠেল মোতায়েন রেখেছে, বলেছে, শক্তি থাকে ত সাতরাগাছি আজ মাথা ফাটিয়া জমি দখল করুক!

শ্যামলের বিবেচনা করিবার শক্তি তখন ছিলনা, সে ক্ষেপিয়া উঠিল, বটে! সাতরাগাছির প্রত্যেক লেঠেল যেন এখুনি চরে উপস্থিত থাকে, আমি চল্লুম! উত্তেজনায় সে বাহির হইয়া পড়িল।

ত্রিলোচন ইহাই চাহিতেছিল, নিজের বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কতক গুলি লোক শ্যামলের ক্ষত বিক্ষত দেহটা বহিয়া আনিয়া দাওয়ার উপর রাখিল। সর্ব্বাঙ্গে রক্তে আপ্লুত হইয়া তাহাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে, বিকৃত কণ্ঠে তখনও সে গোঙাইতেছিল। অনর্থক চীৎকার করিয়া লোকগুলি গ্রামটা মাতাইয়া তুলিল!

দাঙ্গার খবরটা মায়াও শুনিল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! শ্যামল শিক্ষিত যুবক, মিষ্টভাষী অথচ সামান্য একহাত জমির জন্য দস্যুর মত রক্ত

লইতে সে ক্ষেপিয়া উঠে, মায়ার অনুরোধও সে মানে না।

মামাত ভাই পলটু হাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল, বুঝলেন মণিদি শ্যামল বাবুকে যা মারটা মেরেছে, উঃ! রক্তে দাওয়াটা ভেসে গেছে! যাবেন একবার দেখতে!

মায়ার সমস্ত অভিমান তাহার উপর গিয়া ফাটিয়া পড়িল, শ্লেষের সুরে সে বলিল, ইসরে জমিদারকে মেরেছে, তার পাইক পেয়াদা আছে, আমার এত কী গরজ পড়ল।

পলটুর চোখ বাহিয়া জল পড়িল, মায়ার হাত জড়াইয়া অনুনয়ের সুরে সে বলিল, চলুন না মণিদি, ওকে দেখবার কেউ-ই নাই! আমায় দেখে আপনার কথাই যেন বল্লেন! সত্যি বড় কষ্ট পাচ্ছেন!

মায়া ধমক দিয় উঠিল, যা যা তোর আর বকামো করতে হবেনা, গোয়ার্ত্তুমি করতে গেলে ঐ দশাই ঘটে!

পলটু ইহা আশা করে নাই, বেচারী ব্যস্ত হইয়া আবার জমিদার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল!

মায়ার সর্ব্ব শরীরে যেন আগুন লাগিয়াছে। অভিমান ছুটিয়া গেল, শঙ্কায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম! আর সে সহ্য করিতে পারিলনা, রুদ্ধশ্বাসে সে একরকম দৌড়াইয়া চলিল!

যাইয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একা দাওয়ায় পড়িয়া শ্যামল যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে কিন্তু জনতার সেই দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা নিজেদের বীরত্ব কাহিনী বলিয়াই চলিয়াছে। সবার উচ্চে ত্রিলোচনের গলা শুনা গেল, মেরে গেলেই হ'ল! সাতরাগাছির কাছে পাইকগাছা! দিয়েছি না কটাকে ঠাণ্ডা করে।

মায়া অগ্রসর হইয়া দৃঢ় উচ্চ কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে কহিল, বীরত্ব জাহির পরে করলেও চলবে কিন্তু এদিকে যে একজনার প্রাণ যাবার জোগাড় হল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে জনতা শান্ত হইয়া গেল! ত্রিলোচন আগাইয়া বলিল, এই দেখুন, আমরা ত রয়েছি, ওঁর কি না গেলেই চলতনা, মিছে মিছি—

মায়া ধমক দিয়া বলিল, হয়েছে, এদিক আসুন দিকি।

সকলে ধরাধরি করিয়া শ্যামলকে ঘরে খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া দিল।

ক্ষতগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে শঙ্কাকুল কণ্ঠে মায়া কহিল, এভাবে এখানে রেখেত ওকে বাঁচান যাবেনা। কাছেই ত্রিলোচন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে মিনতি করিয়া সে বলিল, আপনি যাননা সরকার মশাই, বামুনডাঙ্গার ষ্টেশনে যেয়ে এখুনি একখানা বার্থ রিজার্ভ করে আসুন! আজই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাব!

জনতা বিস্ময়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাইয়ি করিতে লাগিল। মায়া সজল কণ্ঠে ব্যস্ত হইয়া বলিল, দেরী করলে ওঁকে বাঁচান যাবে না। ত্রিলোচন চলিয়া গেল।

শ্যামল ধীরে ধীরে মায়ার হাতখানি দুইহাতে ধরিয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না, বদ্ধ চোখের ভারী পাতা বাহিয়া অজস্র ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল!

আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে মায়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, ভয় কি শ্যামল বাবু, এইত আমিই রয়েছি!

ভয় শ্যামল আর পাইলনা। অসহ্য বেদনার মধ্যেও এই আশা তাহার মনে বারে বারে জাগিতে লাগিল, এবার হয়ত সে বাঁচিয়া উঠিবে!

ষ্টেশন হইতে ফিরিবার পথে, কুসুমপুরের বারোয়ারী তলায় ত্রিলোচনের সহিত গোবিন্দশা'র দেখা।

ত্রিলোচন এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে ফিস ফাস করিয়া তাহাকে বলিল, জমিদারের সব কাণ্ডগুলো দেখলে দাদা!

হাত ঘুরাইয়া মুখ ঘুরাইয়া গোবিন্দ চাপা কণ্ঠে বলিল, আর বোলনি ভাই, বোলনি, অতো বড় সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘরে বাইরে চলাচলি কে না দেখছে! টাকা পয়সা থাকলেই হোল! সবার বাড়া যে চরিত্তির সেই চরিত্তির যদি,—আরে ছ্যা ছ্যা!

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস্

আট

কত দিবসের পথ চাহিবার শেষে
লিপিখানি তব পঁহুছিল আজ এসে।
আজ প্রভাতের পূর্ব গগনে কোমল মধুর আলো
বঙ্গবালার বিকচ রূপের মতো—
কত শুভখন উদাসে কেটেছে স্মৃতি তার ঘনকালো
ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগে মনে অবিরত।

এই যে লিপির মদির পরশ খানি
সবুজ প্রাণের পুষ্পবেদন বাণী,—
চম্পকবন তালের শাখার দেশে
মনকে আমার টেনে নেয় নিঃশেষে।

দীরঘ গের-নিদ-নয়নার সুপ্তচোখের পাতে
সোনার কাঠির পরশ লেগেছে আজি বসন্ত প্রাতে।
নয়ন মেলিয়া জেগেছে রাজার মেয়ে—
আধ ঘুমঘোর এখনো রয়েছে ছেয়ে।
ক্ষীণ সুকুমার অঙ্গুলিঘেরা অঙ্গুরীয়ের পানে
তাকায় কেবল, কে পরাল তাহা ভালো করে নাহি জানে।
আসিবার কালে চুপি চুপি তার ঘুম-অচেতন কানে
এসেছিনু রেখে বিদায় দিনের ভাষা
আজি কি সে-বাণী জেগেছে প্রিয়ার প্রাণে—
মূর্তি নিয়েছে ভীরু দুর্বল আশা?

আজি জীবনের বন্ধ তোরণ চকিতে খুলিল ধীরে
ক্লান্ত নয়নে নিভৃত দেউলে চাহিলাম ফিরে ফিরে।
কোথা সেথা মোর প্রেমের দেবতা, শুধু অশরীরী বাণী
ব্যথা-সঙ্কুল স্মৃতি জেগে আছে, আছে শুধু ছায়া খানি।
আকাশে চলেছে তরুণ অরুণ নবীন প্রণয় রথে
গলিত সোনার কিরণ লেগেছে ফুল্লবনের পথে।
সারা হয়ে গেছে আঁখি ঝরাবার পালা
পাতা ঝরাবার তপস্যা হল সারা—
তুলে নিতে গলে মিলন ফুলের মালা
ফাগুন বাতাস সাধিছে আত্মহারা।

আজি বক্ষের দ্রুত হিন্দোলে লেগেছে প্রেমের দোলা—
ভালবাসা শুধু ভালবাসিবার তরে।
আজি প্রণয়ের রুদ্ধ বাহিনী মাগিছে পন্থা খোলা
থাকিবেনা বাঁধা পঞ্জর-পিঞ্জরে।

হে মোর লিপিকা। তুমি আনিয়াছ তব করপুট বহি
শুধু ছায়ালোক, শুধু আশাপথ চাওয়া।
কেমনে এ মোর প্রেমদুর্বার চিত্তে ডাকিয়া কহি—
স্বপ্ন রচিয়া রোধ এ ফাগুন হাওয়া।



অশ্লীল (?)

গল্প

শ্রীভূপেশ সেন

মনীষ ও হীরেন বিমলের অন্তরঙ্গ দুটি বন্ধু। বিমল গল্প লেখক,—তার লেখার বিশেষত্ব, তার গল্পগুলি সাধারণতঃ ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট কি বড়জোর এক ঘণ্টার একটা ঘটনার বাহুল্য-বর্জ্জিত অতি সাধারণ চিত্র। যেমন রেইস কোর্স কি সিনেমায় দেখা, নয়তো দোতালবাসে কি লেকের ধারে ১০ মিনিট—এই গোছের। কারো সারা জীবনের গুচ্ছের এক ঘেয়ে ঘটনাগুলিকে কচ্লানো তার ধাতে সয় না। মনীষ সটাইলিসট্ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই তার রোমাঞ্চপূর্ণ। অজস্র গার্ল-ফ্রেন্ড। কাজেই তার যে কোন মুহূর্ত্তকে নিয়েই গল্প কবিতা লেখা চলে। বিমল করেও তাই।

হীরেন ধীর গম্ভীর মনস্তাত্ত্বিক সমালোচক। কাজেই বিমল তার গল্পের সমালোচনার ভার হীরেনের ওপরেই দিয়ে দিয়েছে। ফাল্গুন পেরোতে-না-পেরোতেই কোলকাতায় বেশ গরম পড়ে উঠেছে। ঘরে আর মন টেকে না—কিন্তু আড্ডা বেশ জমে। এর স্থান অস্থান নেই। এ জিনিষটা এমনই যে ক্ষুধা তেষ্টা মায় শোক তাপ পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। নেশার ভায়রা ভাই আর কি। তাই চলছিল ওয়েলসলি স্ট্রিটের হীরেনের লন্ড্রি 'বেঙ্গল-ক্লিনার্স'-য়ে বসে। সে দিনের প্রসঙ্গটা ছিল—বিমলের একটা আনকোরা গল্পের সমালোচনা। মনীষ জিজ্ঞেস করলো,—এবার নায়ক নায়িকার কি নাম দিলে?'

বিমল বললো, 'নির্ম্মল ও শান্তি—'

মনীষ হেসে বললো, 'উঁহু, এবার আমি সিলেকট করে দিচ্ছি, এবার দেয়া যাক্ 'মণি ও আশমানী—'

বিমল হাসতে লাগলো। 'মণি নামটা বরং চলতে পারে.' হীরেন বললো, কিন্তু আশমানাটা যেন কেমন একটু—আচ্ছা আশমানী কেটে বীণা করলে কেমন হয়? কি বল হে মনীষ?' মনীষ ভ্রূকুঞ্চিত করে যেন কিছুদিন আগের একটা ঘটনাকে স্মরণ করে বললো, 'বাণা? বী—ণা, আচ্ছা বীণাই সই। হাঁ,—এবার বেশ একটু জোরে জোরে পড়ে শোনাও তো বন্ধু—'বিমল ছোট, একটা খাতা বের করে পড়তে সুরু করলো।

'রাত তখন বারটা। সাউথ মালাকার একটা হাল-ফ্যাসানের বাড়ীর একটা জানলা দিয়ে প্রজ্বলিত ইলেক্‌ট্রিক্ বালবটা দেখা যাচ্ছিল। বাইরের জোছনা ব্যাচারাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। সে তেজ আর ওর নেই। ও ঘরে কে থাকে সাউথ মালাকা কেন এলাহাবাদের কোন্ বাঙ্গালী ছেলে না জানে? বীণা ক্রসথওয়েট কলেজে বি, এ, পড়ে ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে। পাস হলে সে বড় একটা কেয়ার করতো না—অনার্স নিয়েই তার যা একটু মেহনৎ করতে হচ্ছে। তা রাত জেগে পড়া তার মোটেই অভ্যেস নেই। দিনে ঘুমিয়ে আর অনভ্যাসে চা খেয়ে আজ তার এই দুর্দ্দশা। অনেক চেষ্টার পরে ও যখন ঘুম এলো না তখন সে ঠিক করে ফেললো আজকের রাতটা এই নিয়েই কাটিয়ে দেয়া যাক্। কিন্তু তা কি হয়?

'Hallow darling still awake? বলতে বলতে মণি ঘরে ঢুকলো। কাঁধের scarf টা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে আবার বললো, 'Do you mind my coming,'

বীণা মাথা নেড়ে জানালো. না, খুব আস্তে আলস্য-জড়িত কণ্ঠে বললো, দরজাটা খোলা ছিল?

মণি; নৈলে কি আমি ভেঙ্গে এসেছি?—সুইচ অফ করে দিতে দিতে বললো,—এটা জ্বেলে রেখেছ কেন?

এক ঝলক জোছনা এসে বীণার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। এতক্ষণে ওর খেয়াল হলো বাইরে আজ চাঁদ উঠেছে। এক গালে জোছনা পড়ে কানের ঝুমকোটা চকমকিয়ে উঠলো। বীণার ঠিক এই চেহারাটার ওপরই মণির সব চেয়ে বেশী লোভ। বড় বিরক্ত করে এমনি

ভাবে বীণাকে পেলে। বীণা সরে বসলো। মণি বললো, 'এসো না বাইরের ছাদে দুজনে মিলে খানিকটা বেড়ান যাক্—দেখেছ কেমন ফুটফুটে জোছনা—'

বীণা হাইতুলে বললো, 'পাগল—পাশের ঘরে বাবা শুয়ে আছেন—বাবার বড় পাতলা ঘুম। লক্ষ্মীটি আমার আজকের দিনটা যাও—

মণি; তুমিও কি পাগল! আজ আমি চলে যেতে এসেছি?'

মণি বীণার পাতা বিছানার ওপর টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ে একটা আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'সকাল হয় ক'টায়? ছ'টায়? তা হলে আমি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় চলে যাব। অন্ততঃ আমার একটা কথা আজ তুমি বিশ্বাস কর বীণা, আমার বেডসিটটা লনড্রিতে আরজেনট কাচতে দিইচি। ওরা বলেছে কালকেই ফিরিয়ে দেবে।

বীণা গম্ভীর হতে চেষ্টা করেও পারলো না—হেসে উঠলো। বললো, 'এবার ও কি একজামিন না দেবার মতলব নাকি?'

মনি বিরক্ত হয়ে বললো, 'পাকামো কর না—মেয়েরা দু'পাতা পড়লেই সেটা জানিয়ে দেবার সুযোগ খুজতে থাকে। জেনে রেখো তোমার কাছে দু'এক রাত কাটিয়ে গেলে একজামিনের ক্ষতি হয় এমন ছেলে মনি রায় নয়—,

বীণা চোখ টেনে ব্যঙ্গ করে বললো, 'তা বটে,—দু'দুটা বছর শুধু—'

মনি; 'এয়ো সাটাপ—'একটু পজ নিয়ে, 'উঃ কী নিষ্ঠুর তুমি বীণা, একমাস অন্তর একদিন আসি তাতেও তোমার—'

বীণা; একমাস অন্তর? গেল রোববার ও তো—'

মণি; য়্যা তাই নিকি! ভুলে যাই। তা শরীরটা যেমনই বেজুৎ হয়েছে—

মণি চাল বদলালো। অবিশ্যি এ গোছের চাল বীণা যথেষ্ট শুনেছে এবং বইতেও পড়েছে। সে তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সুদক্ষা অভিনেত্রীর মত বললো, 'শরীর খারাপ হয়েছে! আহা নিশ্চয় নিশ্চয় exactly so—নৈলে কি এই রাত দুপুরে হোলটেলের দেয়াল টপকে একমাইল দূরে ছুটে এসেছো?' বীণা বুকের কাছে হাত ক্রশ করে ওপরের দিক তাকিয়ে প্রার্থনা করলো, 'জগদীশ্বর এর সুমতি দাও—I mean শরীর ভাল করে দাও—বলে দাও প্রভু এ অসুখের কি remedy আছে?'

মনি যেন আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠলো, ~~'reme~~— re-me-dy?'

বীণা তাড়াতাড়ি মণির মুখের কাছে হাত নিয়ে বললো, 'আ—হা—হা চুপ করো—কথা কয়ো না, অসুখ বেড়ে যাবে,—মাথাটা কি বড্ড বেশী ধরেছে? অডিকলোন্ লাগিয়ে দেবো? না? ও হরি,—ভুলেই যাই,—তুমি তো আবার বিলিতী ওষুধ ব্যবহার করো না। তা বেশ, তোমাদের দিশি অডিকলোন, ষড়বিন্দু তেল লাগিয়ে দেবো? তাও না? তবে কী? আচ্ছা দাঁড়াও ফ্যানটা চালিয়ে দি—'

বীণা আজকাল বেশ একটু ফাজিল হয়ে উঠেছে ভেবে মণি যেন একটু আরাম পেল। বীণা মণির জুতোর ফিতা খুলতে বসলো। মণি সুর করে করে বলতে লাগলো, মেয়ে (girl) আমাদের অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, excuse me darling, প্রাণ আছে যার এই অর্থে প্রাণী ব্যবহৃত হয়েছে। তাহারা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, প্রভু মানে স্বামী কিংবা প্রিয়জন। তাহারা flirt করতে ভালবাসে, অবশ্য সকলে না। refuse করা তাহাদের একটা mania অাদতে সেটা veiled request—

বীণা চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসলো, খবরদার বলছি সাইকোলজি আওড়াতে বসেছেন পাণ্ডিত—

মণি আরো সহজ ভাবে বললো, পাগল, মেয়েদের মনের কথা? দেবা ন জানান্তি কুতো মনুষ্যাঃ—আর আমি তো মানুষেরও অধম অবিশ্যি তোমার মতে। কিন্তু ডার্লিং—এখন যদি তোমাকে আমি শুধু চুম্বন দিতেই চাই, তুমি নিশ্চয়ই তের বছরের খুকির মত নাকাসুরে refuse করে বসবে—

বীণা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, সে কী গো—, এই না বললে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে? আবার—

মণি মদখোরের ভঙ্গীতে বললো, Infinite thanks my sweet ha.—one more for your sharp memorys sake! আজ এখনো সেই পুরোনো কথা মনে করে বসে আছ? ডার্লিং তোমার ও গালে দু'একশো smack অাম ডেথবেডে থেকেও দিতে পারবো। কাছে এসো বীণা লক্ষ্মীটি আমার, কী? বাবার বড় পাতলা ঘুম? ঘাবড়িও না,—শব্দ করে চুমু খাওয়া আমি পছন্দ করি না, ওটা নেহাৎই কাঁচুনে ছেলেদের ...

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা ছাড়া তোমার এই গাল দুটো good conductor of Kiss,—এতো পালিশ যে চুমু খেতে ঠোঁট পিছলে যায়। কারণ friction খুব কম হয়। friction থেকেই sound energyর জন্ম জান তো?

বীণা নিরুত্তর! মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও আদিমতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু মণি পয়লা নম্বরের eudemonist নিজের যা ভাল লাগবে তাই করবে। হে মোর বীণা ভীমপলশ্রী সুরে গাইতে গাইতে বীণার কোন কথার অপেক্ষা না করে মণি চেয়ার থেকে বীণাকে আলগোছে তুলে আনলো, ও বাবা বীণা কী অসম্ভব ভার! ঢেপসী—

হীরেন চেঁচিয়ে উঠলো অশ্লীল অশ্লীল বলে। যেন ছোটখাটো একটা explosion। বিমল বললো অশ্লীল? আচ্ছা বেশ তুলে আনলো না—

বিমল লিখে যেতে লাগলো, বীণা চেয়ারেই বসে রইল। মণি মৃদুস্বরে বললো কাছে এসো। বীণা অতোদূরেই যদি বসে রইলে তবে কেনই বা লুর মত ছুটে এলাম। এ টুকুও বোঝ না, পাঁচ গজ আর পাঁচশ গজের দূরত্ব একই? একই আকাশের নীচে আছি ভেবেই সুখী এমন অন্তঃসার শূন্য প্রেমিক আমি নই—

বীণা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে, কী বকর বকর করছো। পাগলামি না করে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাক, চারটে বাজতেই তুলে দেবো।

মণি নেহাৎ আবদারের সুরে বললো তুমি কাছে না বসলে আমার ঘুম আসবে না—

বীণার সত্যি বড় মায়া হয় মণিকে নরমসুরে কিছু বলতে শুনলে। এটা যে ওর অন্তরের কথা। মণির ছেলেমানুষের মত বিরক্ত করা, কি আদর করার ওপর কি বীণার লোভ নাই? যথেষ্ট আছে। কিন্তু কি করবে? সব সময় পেরে উঠেনা। তা ছাড়া মণি বড় একগুঁয়ে। যা করবে করবেই। বীণা চেয়ার ছেড়ে উঠে আসলো। বললো, আচ্ছা ঘুমোও আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, পিঠে সুরসুড়ি দিচ্ছি। কিন্তু হাঁ বলে রাখছি একটু বেয়াদবি করেছ কি অমনি চেঁচিয়ে বাবাকে ডেকে ধরিয়ে দেবো—

মণি স্বীকার করলো। কিন্তু মনে মনে ভাবলো, আহা বীণার কী বুদ্ধি! বি, এ, পড়া মেয়ে হলে কি হবে। ধরিয়ে দেবেন। আচ্ছা সাপোজ বাবা [illegible] এলে আমাকে ধরবেনই। কিন্তু য়্যাডভোকেটী করে যে বাবা সমস্ত চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, তিনি এসেই কি জিজ্ঞেস করবেন বীণার তা খেয়াল আছে? এসেই জিজ্ঞেস করবেন হতভাগাটা কি করে ঢুকলো? হতভাগা বললেও প্রশ্নটা অবিশ্যি আমার ক'রেই হবে। কারণ বীণা আর যাই করুক মিছে কথা বলবে না। কাজেই ওকে বলতে হবে, দরজা খোলা ছিল। য়্যাডভোকেটী মতে তখন আবার প্রশ্ন হবে এতো রাত্রে দরজা খোলা ছিল কেন? আপনি কি কাউকে expect করছিলেন? বাস বীণা defeated—

বীণা আস্তে আস্তে মণির পিঠে হাত বুলাতে লাগলো। মিনিট পাঁচেক শান্ত ছেলের মত চুপ করে থেকে মণি আবার আবদারের সুরে বললো, রাগ করো না বীণা, তুমি না শুলে আমার ঘুম আসবে না—

বীণা মনে মনে মনে বললো, হোসটেলে রাতগুলি তুমি না ঘুমিয়েই কাটাও কিনা—কিন্তু মুখে কিছু বললো না। কথা বললেই কথা বাড়ে। মণির কথা না বললেও বাড়ে। মণি আবার বললো, শোও না, বিরক্ত করবো না। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি এমন কিছু আমি করবো না যাতে তোমার দুমাস বাদের একজামিনের ক্ষতি হয়। সত্যি—হাঁ সত্যি—

বীণা দু'হাতে মণির গাল দুটোয় চাপ দিয়ে হেসে বললো, এতো বয়েস হলো এখনো ছেলে মানষি গেল না খালি ইয়ার্কি—মণি লাই পেয়ে গেল। দুহাত উঁচু করে বীণার গলা জড়িয়ে ধরলো। বীণার শরীর বঁড়শীর ছিপের মত বেঁকে পড়লো মণির বুকে। বীণা বলে উঠলো, উঃ ছাড়ো লাগছে। মানে, যা ওরা বলে থাকে। মণি শুধু বললো, সকাল পাঁচটায়।

বীণা কাতুকুতু দিয়ে মণির হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে অস্ফুট স্বরে বললো, ছাড়ো ঠিক হয়ে শুই।

হীরেন আবার বললো, অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে—

বিমল বললো, এও অশ্লীল? আচ্ছা তবে শোনো,—

বিমল লিখে গেল, বীণা মণির বিবাহিতা স্ত্রী। দু'জনার ইচ্ছে করে (এম, এস-সি) একজামিন না দেওয়ায় মণির বাবা রেগে সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন, পাশ না করা পর্য্যন্ত মণির হোসটেলে নির্ব্বাসন এবং বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিষেধ—

হীরেন বললো তা হোক কিন্তু তোমার এ গল্প কোন সম্পাদক গ্রহণ করবেন বলে তো ভরসা হয় না—

মনাবের আগ্রহ বেশী, বললো দেখা যাক না একটা chance নিয়ে। পাঠিয়ে দাও কোথাও—

বিমল তাই করলো।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোক কমলা নেহেরু

দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহেরু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সুইজারল্যাণ্ডের লোজান সহরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে নেহেরু পরিবারের দান ও আত্মোৎসর্গ অতুলনীয়।" শ্রীমতী কমলাও কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন ও ১৯৩১ সালে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ধন গৃহের কন্যা ও বধূ হইয়াও আত্মসুখ ও পারিবারিক সুখের দিকে কমলা মোটেই চাহেন নাই—দেশের সেবাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ধরিয়া লইয়াছিলেন। পণ্ডিত জহর লাল পত্নীকে দেখিবার জন্যই কারামুক্ত হইয়া ইওরোপে গিয়াছিলেন এবং শেষ সময়ে পত্নীর পার্শ্বে ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা কুমারী ইন্দিরা ইওরোপেই অধ্যয়ন করিতেছেন। শাশুড়ী শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহেরু বৃদ্ধা, রোগজর্জ্জর—ভগবান ইহাদের শান্তি দিন, শ্রীমতী কমলার মৃত্যুতে ভারতের সর্ব্বত্র শোকের ছায়া পড়িয়াছে—লণ্ডনেও শোক সভা হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন আগামী ১১ মার্চ্চ ভারতে শ্রীমতী কমলার মৃত্যুতে শোক দিবস প্রতিপালিত হইবে।

—০—

জাপানে বিপ্লব

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী জাপানের তিন হাজার পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মেসিন গান প্রভৃতি লইয়া মন্ত্রীদের বাসভবন আক্রমণ করে। তাহারা নৌ সেনাপতি কাউণ্ট সাইটো, প্রধান মন্ত্রী ওকাদা ও অর্থ সচিব তাকাহাসিকে হত্যা করিয়াছে খবর পাওয়া গিয়াছিল পরে খবর আসে প্রধান মন্ত্রী ওকাদার পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্যালককে হত্যা করা হইয়াছে। টোকিও সহরে সামারিক আইন জারী হইয়াছিল এবং কাজ কর্ম একেবারে বন্ধ ছিল। জাপানের উগ্র জাতীয়তা বাদী চরম পন্থী সামরিক দল ও নরম পন্থী দলের মধ্যে বহুদিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনেও নরম পন্থী দলই জয়লাভ করিয়াছে—তাই চরমপন্থী দল এই ভাবে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহিতেছে। জাপানের বিদ্রোহী সামরিক কর্ম্মচারীদের অনেকে মনে করেন দেশ সোভিয়েট হইবার আগেই তাহাদের অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে হইবে নতুবা উপায় নাই। ১৯১৪ সালে জার্ম্মান সৈন্য বিভাগের যে অবস্থা হইয়াছিল বর্ত্তমানে জাপানী সৈন্য বিভাগের অবস্থাও সেইরূপ। জাপানের এই সৈন্য বিদ্রোহ বর্ত্তমানে কোন রকমে প্রশমিত হইলেও তথায় স্থায়ী মন্ত্রী মণ্ডল গঠনের সমস্যা বর্ত্তমানে আরো সমস্যাপূর্ণ হইল। জাপানে পরোক্ষভাবে সামরিক রাজত্ব চলিলেও যদি তাহাই প্রত্যক্ষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতেই কি এই দলের বিশেষ সুবিধা হইবে? পররাজ্য আক্রমণ স্পৃহা জাপানের ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে এতদিন অপর দলের অবিরোধিতায় জাপানী সামরিক দলকে একটু সংযত হইয়া চলিতে হইয়াছে কিন্তু সে বাধাও যদি না থাকে তবে জাপান বিশ্বগ্রাসের ভরসা না করিলেও প্রাচ্যের অধিকাংশ গ্রাসের উদ্যম করিবে আশা করা যাইতে পারে। এ অবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়া বা প্রশান্ত মহাসাগরের সাম্য শান্তি রক্ষা প্রয়াসী অপর শক্তিদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাও বিচিত্র নয় আর তাহারা সকলেই যে চীনের মত অন্তর্বিদ্রোহে অন্তঃসার শূন্য নহে জাপান তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারে। জাপানের এই প্রত্যক্ষ সামরিক অভ্যুত্থান তাহাকে কোন পথে লইয়া যাইবে কে জানে?

—০—

ভারত সরকারের বাজেট

ভারত সরকারের বাজেটে এবার একটু আশার লক্ষণ দেখা গিয়াছে—কোন নূতন কর ধার্য্য হয় নাই বরঞ্চ নিম্ন লিখিত বিষয়ে জনসাধারণকে একটু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। বার্ষিক ২ হাজার টাকার কম আয়ের উপর ইনকম ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না। আয় করের সারচার্জ্জ ও সুপার ট্যাক্স বর্ত্তমান হারের অর্দ্ধেক করা হইয়াছে—অর্থাৎ উহা পূর্ব্বের হারের এক তৃতীয়াংশ করা হইল। খামে চিঠি পাঠাইতে এক আনায় অর্দ্ধ তোলা স্থলে এক তোলা পর্য্যন্ত পাঠানো যাইবে। তাহার উপর প্রতি তোলায় দুই পয়সা বেশী লাগিবে। এ সব ব্যবস্থাই ভাল হইয়াছে তবে পোষ্টকার্ডের মূল্য দুই পয়সা, বুক পোষ্ট পাঠাইতে দুই পয়সা ও পাঁচটাকা পর্য্যন্ত মনি অর্ডারের মাশুল এক আনা করা হইলে ঠিক হইত। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তাহা হইবে। গ্রাম উন্নতি কল্পে এবারও এক কোটি, আট লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে ইহাও বিশেষ সুখের বিষয়।

গ্রামের উন্নতি

গ্রামের উন্নতির জন্য ভারত সরকার প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রদেশকে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশ নানাভাবে সেই অর্থব্যয় করিয়া গ্রামগুলির উন্নতির চেষ্টা করিবেন ইহাই সকলে আশা করিতেছে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের অধিকাংশ পল্লীতে জলকষ্ট যেরূপ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের এই জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বিশেষ ভাবে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় ভারত সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থের সমস্তটাই যদি দু'পাঁচ বছর বাংলার পল্লীর জলকষ্ট দূরের জন্য ব্যয় করা হয় তাহাতেও বাংলার অধিবাসী কাহারও বিন্দুমাত্র আপত্তি হইবে না। বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিজের দিক হইতে দেখা উচিত বাংলার নদীগুলির সংস্কার কি ভাবে হইতে পারে। নদীমাতৃক বাংলা দেশের অধিকাংশ নদীর অবস্থা শোচনীয়—ইহাতে দেশব্যাপী জলকষ্ট, অস্বাস্থ্য, অজন্মা, লাগিয়া আছে যাতায়াতের, ব্যবসা বাণিজ্যের কত যে অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বলা যায় না—বাংলা গবর্ণমেণ্টের এদিকে অবহিত হওয়ায় একান্ত কর্ত্তব্য।

—০—

সাহিদগঞ্জ আলোচনা

লাহোর সাহিদগঞ্জ মসজিদ সম্পর্কে আপোষ আলোচনার জন্য মিঃ জিন্না তথায় গিয়াছেন। মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিয়াছেন—গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যে সমস্ত মুসলমানদের দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে—এ সম্পর্কে শিখ যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহারা মুক্তি পাইয়াছেন কিনা জানিনা। কিন্তু দু'সম্প্রদায়ই—দাবী কেহই কমাইতেছেন না বরঞ্চ দাবী রাখিয়া সম্মানজনক আপোষ চাহিতেছেন—তাহা কি করিয়া সম্ভব? আমাদের মনে হয় এত রক্তারক্তির স্থান যে মসজিদ বা গুরুদ্বার তাহাকে সাধারণ সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের স্থান বা মিলন স্থান রূপে ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। এবং তথায় ইহাও লিখিয়া রাখিলে ভাল হয় যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধি হইতে এই স্থানটুকু লইয়া বহু নরহত্যা ও বিবিধ গ্লানি হইয়াছে, পরে দু' সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি আসায়—দু'সম্প্রদায়ই স্বেচ্ছায় সানন্দে সগর্ব্বে ইহা ধর্ম্মের মিলন স্থান বলিয়া সাধারণের দৃষ্টার্থে উৎসর্গ করিলাম। আর কখনো ভারতের কোন স্থানে যেন এরূপ সাম্প্রদায়িক কাণ্ডের উদ্ভব না হয়। মিঃ জিন্না ও হিন্দু মুসলমান অপরাপর নেতারা এইরূপ মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারেন কি—এরূপ করিলে সাহিদগঞ্জ ভারতে নব জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করিতে পারে।

—০—

কেশরী

বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকাগুলি মধ্যে কেশরী অল্পদিনের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক পয়সা মূল্যে এরূপ একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার অত্যন্ত অভাব ছিল, এবং কেশরী সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রতি সোমবারের পত্রিকায় নানা তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ থাকে। আমরা কেশরীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—০—

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকার চৈত্রমাসে বার্ষিক মূল্য শেষ হইবে তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ

আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ অথবা ষান্মাসিক ১৸৹

মনি অর্ডারে

এই বৈশাখের পূর্ব্বে পাঠাইবেন।

ভি-পিতে গ্রাহকের অযথা বেশী খরচ হয়।

যাদের মনি অর্ডার না আসিবে ১৫ই বৈশাখ ভি-পি করিব।

নূতন বৎসরে পুষ্পপাত্রের জন্য বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে এবং খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে।



আরব্য উপন্যাস



৯ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪২ { ১২শ সংখ্যা

ঘট্‌কালী

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তখন কাউকে ভাল বাসিনি।
আলোক বিজ্ঞানে নাকি বলে,
—সূর্য্য উঠ্‌বার আগে তার একটা চপল ছায়া
সোজাসুজি না এসে
বাঁকা পথে এসে দেখা দেয় দিক্‌চক্রবালের কোলে।
আমরা দেখি নব ভানু,
কিন্তু আসলে সেটা মায়া,
অনুদিত রবির অপসারিণী ছায়ামূর্ত্তি মাত্র।

আমার চোখে-না-দেখা প্রিয়া
তেমনি পূর্ব্বাশায় এনেছিলেন উষালোক।
কথাটা প্রকাশ করে বলি।
ঘট্‌কালি চল্‌ছিল বিয়ের।

কিন্তু কবিতা-নভেল-পুষ্ট চিত্ত
এরূপ দর-দস্তুর করা প্রিয়া
বউ বাজারে সংগ্রহ কর্‌তে নারাজ।
যার সঙ্গে চোখে চোখে হ'লনা মালা বদল,
তাকে কেমন ক'রে আন্‌ব ঘরে ?
আমার ছিলেন এক পাতানো দিদি।
আমাকে স্নেহ করতেন খুব,
চিনতেন বোধ করি হাড়ে হাড়ে,
তাঁর উপর ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস।

ভাই ফোঁটার চন্দন তিলক ললাটে ধারণ ক'রে
ফরেশ্‌ ডাঙার ধুতি চাদরে শোভিত হ'য়ে
বসেছি ভূরি ভোজে।
দিদি আমাকে খাওয়াচ্চেন পরম সমাদরে,
অর্থাৎ ছুটো বাক্সের মাল
ঠেলে গুঁজে দিচ্চেন ভ'রে একটা তোরঙ্গে।
যখন আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে
আচমন পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণ করছি,
তখন কাছে এসে বসে বল্লেন,
—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে
কাউকে বলিস নি কিন্তু।
বল্লাম, ঠোঁটে দিলাম চাবী,
চাবী রইল তোমার হাতে।
বিশ্বাসের পাত্র হবার প্রলোভন অসম্বরণীয়।
যা বল্লেন, সংক্ষেপতঃ এই।
প্রমীলা তাঁর খুড়তুতো বোন।
খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল তার জন্য।
কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসেছে,
কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না।
অমন কার্ত্তিকের মত বর, অতবড় ঘর,
সর্ব্ব গুণাধার পাত্রে তার অভিরুচি নাই।
কেন ? মনে মনে সে আমাকে করেছে বর মাল্যদা

আমাকে চায় সে, আমাকে।
আমি তার গোপনের মনোনীত বঁধু?
পৃথিবীতে সে কথা কেউ জানে না
একমাত্র আমার দিদি ছাড়া।
তাঁর কাছে চোখের জলের সঙ্গে
বলেছে সব কথা খুলে।
তৎক্ষণাৎ, তৎক্ষণাৎ করে এলেম বাক্‌দান,
যথা সময়ে শাঁক বাজল, গাঁঠ-ছড়াটি পড়ল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।
পুত্র কন্যার সংখ্যাও কম নয়।
তবে, যে ছায়ামূর্ত্তিটী আমার উদয়াচলে দেখা দিয়েছিল
তার সঙ্গে প্রমীলার মুখের বড় একটা আদল নাই।
অবশ্য দুপুর সূর্য্যের সঙ্গে
ভোরের ভানুর হয়েই থাকে একটু আধটু গরমিল।
সে জন্য আপ্‌শোষ্ নাই।
কিন্তু যে দিন প্রমীলার মুখে শুন্‌লাম,
প্রাগ্‌বৈবাহিক বরমাল্য দান করা দূরে থাকুক্
আমাকে সে কখনো স্বপ্নেও দেখেনি,
এবং দেখ্‌লে হয়ত—থাক্ সে কথা,
তখন মনে হল বড় ঠকেছি।
কোত্থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসল আমার বাঁ হাতে।
দেখি, আস্তে আস্তে পাখা নাড়ছে
আর মিটি মিটি হাসছে।
তার মুখের আদলটা কতকটা সেই দিদির মত।

রোগশয্যায় স্বপ্নবিলাস

গল্প

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ বি, এ

শীতের সন্ধ্যা—গোধূলীর আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির ঘন নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ভরে গেছে। ইলা একটা ছবির দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলো। ইলা একটি তরুণী মেয়ে—বছর খানেক হল সে বি, এ, পাশ করেছে ও বিয়েও হয়েছে তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বিয়ের পর সে তার স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থল ডুমকাতে এসেছে। ইলা বাংলাদেশের মেয়ে চিরকাল প্রায় কলকাতাতেই কাটিয়েছে—সাওতাল পরগণার জল হাওয়ার সঙ্গে তার পরিচয় ছিলনা—সে জানতোনা যে এখানে দিনে গরম থাকলেও তাতে রাত্রে শিশির বর্ষণের বিরাম হয়না—ফলে আশ্বিনের শেষে—শীত পড়বার মুখে ঠাণ্ডা লেগে তার খুব অসুখ করলো। পনর কুড়ি দিন ধরে খুব অসুখে ভোগবার পর আজ দুদিনমাত্র সে একটু ভাল আছে। সাবু ও বার্লি থেকে সবে হরলিকক্স, ওভালটিন ও সুপ খাবার অনুমতি পেয়েছে। নির্জ্জন ঘর, নিস্তব্ধ গৃহ—স্বামী একটা জরুরী কাছে বেরিয়ে গেছেন;—বাইরে অবশ্য চাকর বাকররা আছে কিন্তু তাদের কল কোলাহলও সম্প্রতি নীরব।

দূর থেকে খালি সাঁওতালদের নাচগানের মিষ্টি একটানা সুর ও মাদলের গুরুগম্ভীর শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁপোকার একঘেয়ে শব্দ ও মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক।

সন্ধ্যার মাধুরী, নির্জ্জনতার মোহ—আর এইসব বিচিত্র শব্দ লহরীর অপূর্ব্ব সমাবেশ—সবশুদ্ধ মিলে ইলার রোগদুর্ব্বল মনে বেশ একটা মধুর, স্বপ্নময় অনুভূতির সঞ্চার করেছিলো। বিনয় বেরিয়ে যাবার আগে ঘরে একটা ছোট নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো—আর বিশেষ ভাবেই নিষেধ করে গিয়েছিলো কোন কিছু পড়তে—সেই স্বল্প ম্লান নীল আলোতে ঘরের সব জিনিষে যেন স্বপ্নলোকের ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হচ্ছিল—আর সেই নীল আলোর আভা ইলার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের বিবর্ণতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে ইলা শুয়েছিলো—তার শরীর দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত, মনন শক্তিও ক্ষীণ, দুর্ব্বল—কোনকিছু বিচার করে, যুক্তি সঙ্গতভাবে চিন্তা করবার বা ধারণা করবার ক্ষমতা নেই—কিন্তু কল্পনাশক্তির প্রখরতা আছে, প্রাচুর্য্য আছে, উৎসাহ আছে। একরকম তার অজ্ঞাতেই তার মন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নানাকথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। অসুখটা যেন কেমন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরের মত আচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেছে—কোন চেতনা বা সাড়া তার ছিলনা; এখনও তার নিজেকে যেন কর্ম্মপ্রবাহময় বহির্জগৎ থেকে একান্ত পৃথক বলে মনে হয়—তার চারিপাশে কত জনতা কত কোলাহল—রাস্তায় ফিরিওয়ালা ডেকে যায়, ছোট ছেলেমেয়েরা কলহাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত করে খেলা করে, সাওতাল মজুর ও মজুরণী উৎসাহ ভরে দিনের কাজে যায়,—গরুর গাড়ী ভরে জিনিষ নিয়ে হেটুরেরা হাটে যায়,—প্রভাত সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষীণ অপরিসর মেঠোপথ—সকলই কর্ম্মব্যস্ত জনগণের উৎসাহ-দীপ্ত আনন্দ কোলাহলে ভরে ওঠে—ঘরে পরিজনদের গৃহকর্ম্মের নানা শব্দ, বাহিরে মাঠে চাষীদের ধানকাটার শব্দ কারখানায় মিস্ত্রীদের হাতুড়িপেটার শব্দ—এ যেন এক বিপুল কর্ম্মস্রোত অনুক্ষণ ইলার চারিপাশ দিয়ে প্রবহমান—আর ইলা তার থেকে একেবারেই পৃথক—সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—সে যেন এই বিরাট রঙ্গমঞ্চের একক দর্শকমাত্র—এ অভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই—এর কোন ঢেউ তাকে স্পর্শ করবেনা—এমনি একটা উদাসীন ভাব। সেও যে কোনদিন এই কর্ম্মস্রোতে মিশে চলেছিলো—এই অভিনেতাদের সঙ্গে সেও যে

একদিন রঙ্গমঞ্চের একপাশের স্থান অধিকার করে থাকতো—তা যেন আর তার অনুভবগম্য হয়না।

সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইলার চিন্তাধারা বদলে গেল।—তার মনে পড়ে গেলো সেই পরিকল্পনার কথা—অসুখের আগে যেমন করে সে তার ঘর সাজাবে ভেবেছিলো—ঘরটাকে খানকয়েক ভাল ভাল ছবি দিয়ে সাজানো দরকার। বিনয়ও ইলার শ্রদ্ধেয় কয়েকজন মনীষীর যে সম্মিলিত ছবিটা দু'একদিন হল বাঁধিয়ে আনা হয়েছে, সেটা রাখতে হবে পশ্চিমের দেওয়ালে—প্রভাতসূর্য্যের পূতোজ্জ্বল প্রথম কিরণ এসে পড়বে তার উপর—ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সেইদিকে তাদের চোখ পড়বে ও সেই পবিত্র মহান আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিদিন তাদের প্রভাত আরম্ভ হবে। পশ্চিমের দেওয়ালে থাকবে দেশী ও বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা খানকয়েক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি—গোধূলির অস্পষ্ট রাঙ্গা আলো তাদের উপরে পড়ে তাদের রহস্য—মধুর করে তুলবে। দক্ষিণদিকে—তাদের পূজনীয়, নিকটতম দু'একজন আত্মীয়ের ফোটো—আর উত্তরের দেওয়ালটা থাকবে একেবারে খালি—দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে গাছের ছায়া ও আকাশের আলো এসে তাতে সর্ব্বক্ষণ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল চলমান ও সূক্ষ্ম নানা দৃশ্যের সৃজন করবে—বাস্তবিক রোগশয্যার ক্লান্ত অবসন্ন বিরস দিনগুলির অনেক সময়ই আলোছায়ার এই মন ভোলানো খেলা ইলার মনে খানিকটা বৈচিত্র্য ও আনন্দ এনে দিয়েছে।

আবার ইলা ভাবতে লাগলো তার বহুদিন থেকেই ইচ্ছা আছে যে সে তার ঘরে সাজিয়ে রাখবে একটি পিতলের বুদ্ধমূর্ত্তি, শ্বেতপাথরের একটি সিংহবাহিনী ও কৃষ্ণনগরের কারিগরদের তৈরী একটি নটরাজ মূর্ত্তি। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সেগুলিকে সে ফুলের মালা চন্দন, ধূপ ধুনা ও প্রদীপ দিয়ে আরতি করবে।...ফুলের কথা মনে হতেই ইলার মনে পড়লো তার নিজের ফুলবাগানের কথা। স্বহস্ত প্রস্তুত তার কত সাধের ফুলবাগান—তার প্রত্যেকটি গাছ প্রতিটি লতার সঙ্গে তার কত স্মৃতি, কত বন্ধন জড়িত হয়ে গেছে—এই বাগানটা করেইতো সে শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের মর্ম্ম তবু কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পারছে—তার সেই প্রিয় বাগানে সে কতদিন যেতে পারেনি—না জানি তার কি দশা হয়েছে—তার অসুখে বিনয় এত ব্যস্ত ছিল সে কি আর বাগানের খোঁজ রাখতে পেরেছে? এদিকে সবে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে—এই সময়টাতেই তো বাগানের বেশী কাজ—গোলাপের ডালগুলো সব কেটে দিতে হবে—দোপাটী জিনিয়া প্রভৃতি বর্ষার ফুলের শুকো গাছগুলো তুলে ফেলে, পপি, ডালিয়া, ডেজী গাঁদা লারবস্পার প্রভৃতি শীতের ফুলগাছ লাগানর ব্যবস্থা করতে হবে।

চন্দ্রমল্লিকার গাছগুলো তুলে অন্য টবে বসাতে হবে—কুন্দফুলের গাছগুলোয় তাড়াতাড়ি করে গোঁড়া খুঁড়ে সার দিয়ে প্রচুর জল দেবার ব্যবস্থা করতে হবে—"কুন্দধবলা" সরস্বতীর পূজা কুন্দফুল না হলে যে মোটেই মানাবে না।

তারপর তার ছোট্ট তরকারীর ক্ষেতটাতেও অনেক কাজ রয়েছে—পালংশাক, টম্যাটো ও মটরশুঁটির বীজ শীঘ্রই বুনতে হবে—কপিও দু'চারটা লাগালে হয়—তাছাড়া চৈতালী কুমড়া ও ঝিঙ্গে লতা—ঝিঙ্গে ফুলগুলি কি সুন্দর!

একান্তচিত্তে ইলা মনে মনে তার ফুল ও সব্জী বাগানের পরিকল্পনা করতে লাগলো। পর মনশ্চক্ষে মাটী তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে বীজ পোঁতা, চারা বেরুন—শেষ পর্য্যন্ত ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে ওঠা সবই একে একে ভেসে উঠতে লাগলো—এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই ইলার পক্ষে এক একটি পরম আনন্দের কারণ। ইলার মনে হল ফুল একটু যত্ন করলেই এত সহজে হয় অথচ এত আনন্দ দেয় তবু কিন্তু লোকে ফুলের কদর তেমন বোঝেনা আমাদের দেশের আ-পামর সাধারণের মধ্যে সহজ সৌন্দর্য্যজ্ঞান সূক্ষ্ম রসবোধের বড়ই অভাব—আগে যাও ছিল এখন যেন ক্রমশঃই আরো কমে যাচ্ছে। ... তো মনে হয় যে নিজের হাতে পোঁতা ... প্রথম ফুল বা ফল হয় তখন যত আনন্দ ...

কঠোর অধ্যয়নের পরে সাফল্য পুরস্কারলাভেও বোধ হয় তত আনন্দ হয় না।

শিশুকাল হতে সহরের বুকে মানুষ হবার পর এই সাঁওতাল পরগণার প্রকৃতির কোলে এসে ইলার ভারী ভাল লাগছিলো। এই উন্মুক্ত প্রান্তর উদার আকাশ, প্রচুর বায়ু ও সুবিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে তার প্রাণের প্রাচুর্য্য যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টির যতদূর বিস্তার অনবারিত গতিতে চেয়ে থাকা, খালি পায়ে ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে চলা, বিস্তীর্ণ বিজন প্রান্তরের মধ্যে একাকী অকারণ ঘুরে বেড়ানর মধ্যে যে এত পুলক সঞ্চিত থাকতে পারে তা কে জানতো?

এমনি সব নানাকথার মাঝে হঠাৎ ইলার মনে হলো এইযে সে কত কি সব ভেবে চলেছে, এমনি রোজই প্রতিমুহূর্ত্তে কতকি ভাবে তার জাগ্রত জীবনের প্রতিটি ক্ষণের যত বেদনা, যত অনুভূতি তার সঙ্গে কি তার পরিচিত কোন কারুরই সম্পূর্ণ পরিচয় আছে? তার মা তার পরমবন্ধু, তার স্বামী—কেউ কি তার সমগ্র চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত—কেউ কি কোনোদিন ছিল,—কেউ কি কোনদিন থাকবে তার সমগ্র আত্মার সকল চেতনার সঙ্গে কি কখনো ক্ষণিকের জন্যও কারুর একান্তভাবে মিলন হয়েছে? ভাবতে ভাবতে ইলার মনে হলো মানুষের মন কত নিঃসঙ্গ—দু'য়েকটি বিশেষ ক্ষণ ছাড়া মানুষ কি তা জানে! মানুষের সঙ্গে মানুষের কত সম্পর্ক—মা, বাপ, ভাই, বোন, বন্ধু, প্রিয়—কিন্তু কোন মানুষের সমগ্র অন্তরের সবখানি কথাই কি কেউ জানে? মা হয়ত কিছু ভাগ নেন, বন্ধু হয়ত কিছু জানে—কিন্তু মানুষের সচেতন আত্মা তার মননশক্তি দিয়ে যে সাগরের সৃষ্টি করে তার প্রতি তরঙ্গের সবটুকু ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে অপর কার সম্পূর্ণ পরিচয় হতে পারে? যদি এমন কোনো প্রিয়ের দেখা মেলে যে এমনি ভাবেই চিনে নেবে—সেতো পরম ভাগ্য—তপস্যার ফল—কিন্তু সেকি পৃথিবীতে কখনও হয়—তাকি কেউ কখনও পেয়েছে—কখনও কি পাবে—আদিম মানুষ যেমন একাকী ছিল, এত শতাব্দীর পর আজও মূলতঃ সেই একাই থেকে গেল। অংশে অংশে তার মনের সাথী সে পেল, কিন্তু পরিপূর্ণ যে বিরাট এক—তাকে কেউই জানলোনা—তাছাড়া, আমাকে কেউ পরিপূর্ণভাবে নাইই চিনলো—আমিই কি আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোন মানুষের সমগ্র সচেতন জগতের প্রত্যেক অলিগলির সন্ধান জানতে পারি? ইলা ভাবতে লাগলো—বিনয়কে সে পরিপূর্ণভাবে—তার নারীচিত্তের আত্মোৎসর্গের সবটুকু প্রেরণা দিয়ে ভালবাসে—বিনয়ও তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে নিশ্চয়ই—এ অল্প কদিনের মধ্যে তাদের উভয়ের চিন্তাধারা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একই স্থানে এসে মিলতেও আরম্ভ করেছে—কিন্তু তবুও কি সে বলতে পারে সে বিনয়ের মনের সবটুকু ছায়াই তার অন্তরে প্রতিফলিত হয়? সে তার সঙ্গে প্রকৃতই একাত্ম? সাধারণভাবে তারা পরস্পরকে যথেষ্ট চেনে—উভয়ের মনোবৃত্তি, ধারণা, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি প্রভৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্ধান—কিন্তু প্রতি সূক্ষ্ম ভাবের রেশমাত্র, প্রতি মনোভাবের আভাসটুকুও দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার মত যে একাত্মভাব—বেদের সেই,

যদিদং হৃদয়ং মম
তদিদং হৃদয়ং তব

এইরূপ একেবারে বাধাহীন, পরিপূর্ণ, একান্ত নিবিড় মিলন কই? সেকি শুধু কল্পনার সামগ্রী হয়েই থাকবে? বাস্তবে কি কোনদিনই ধরা দেবেনা? তাছাড়া আর কি? আদর্শ চিরদিন আদর্শ হয়েই থাকে—বাস্তবতা লাভ করলেই তো তার আদর্শতার মৃত্যু হবে…ইলার মনে পড়লো কবির কথা;—

'হায়রে দুরাশা,
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
একি দুঃসাহস!'

কিন্তু মন তা মানে কই! ইলা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

রোগশয্যায় নিজেকে যেমন সমস্ত পৃথিবী থেকে পৃথক বলে বোধহয়, তেমনি এমন অনেক চিন্তা জাগে মনে যা সুস্থাবস্থায় হয়ত কখনো মনে হতোনা—বহুদিন যাবৎ নিষ্ক্রিয় ও একক হয়ে থাকার ফলে কল্পনা হয়ে ওঠে অত্যন্ত প্রবল, চেতনা হয়ে ওঠে উদ্বুদ্ধ ও মনের সৃজনী শক্তি যায় আশ্চর্য্য রকম বেড়ে—কল্পনা অতিশয় উগ্র, প্রখর ও উর্ব্বর হয়ে ওঠে। মন অত্যন্ত অনুভূতি প্রধান ও উত্তেজনা প্রবণ হয়ে যায়, সামান্য কারণেই আহত হয়, আবার সামান্যতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সহজেই আনন্দ পায়, বেদনাও পায় সহজেই।—তাছাড়া নিত্য নৈমিত্তিকতার আবরণ খসে পড়ার দরুণ মন দার্শনিকের মত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও সত্যদর্শন পিপাসু হয়ে ওঠে—ফলে জেগে ওঠে কত সংশয়, কত প্রশ্ন যা হয়ত সুস্থাবস্থায় বর্ত্তমান চৈতন্যের প্রাধান্যের চাপে পড়ে মগ্নচেতনার অন্তরালে সুপ্ত হয়ে থাকে।

হঠাৎ ঘড়ীতে ঢং ঢং করে নয়টা বেজে উঠে ইলার চিন্তাধারার সূত্র ছিন্ন করে দিল—তার মনে পড়ে গেল এইবার বিনয়ের আসবার সময় হয়েছে—এইবার সে আসবে। ইলার সমস্ত ভাবনা এসে এবার একস্থানে আবদ্ধ হলো—সে ভাবলো কই এতক্ষণের মধ্যে, এত কথার মধ্যে বিনয়ের কথা তো সে এক রকম ভাবেই-নি—অথচ আজ সন্ধ্যার সময় জরুরী কাজের তাগাদায় বিনয়কে যখন বাইরে যেতে হল—দু'জনেই তারা এই ভেবে ব্যাকুল হচ্ছিল যে এতটা সময় একাকী ইলা কেমন করে কাটাবে...ইলার মনে হলো আশ্চর্য্য মানুষের মন ও আশ্চর্য্য কবিদৃষ্টির সর্ব্বব্যাপী সত্যদর্শনক্ষমতা। ...মাত্র অল্প কিছুদিন আগে বিনয় ও ইলা তাদের আত্মীয়ের বাড়ী দিনপনরর জন্য বেড়াতে গিয়েছিলো—সেখানে দিনকয়েক থাকবার পরেই সহসা প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে ছুটীর মধ্যেই বিনয়কে চলে আসতে হয়—ইলাও চলে আসতো কিন্তু সেটা নেহাতই অভদ্রতা হয় বলে ইলাকে সেকটা-দিন সেখানে কাটিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সে দিনকটা যে ইলার কিভাবে কেটেছিল, তা ইলাই খালি জানে। প্রতিদিন, অনুক্ষণ খালি বিনয়ের কথাতেই তার মন ভরে থাকতো, চেষ্টা করেও সে তার চিন্তাকে অন্যপথে নেওয়াতে পারতোনা। কবি যে বলেছেন, বিরহেই প্রেমের পূর্ণতার প্রকৃত অনুভূতি হয় এবং মিলনেরও সত্য স্বরূপের উপলব্ধি হয় বিরহেরই মাঝে...সে কথা কি অভ্রান্তভাবেই না সত্য! বিচ্ছেদের সেই দিনগুলোতে ইলা তার সমগ্র অনুভবশক্তি দিয়ে সর্ব্বক্ষণ বিনয়ের কথাই ভাবতো—সব কাজে, সব হাসি গল্প—সমস্ত আনন্দোৎসবের মাঝে ঐ একটি সুরের রেশই প্রধান হয়ে—তাঁর মনপ্রাণ অধিকার করে থাকতো! সে সময় তার কল্পনার এমন একটিক্ষণও ছিলনা, যখন সে বিনয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকেনি, তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে বিরাজ করতো ঐ একই ভাবনা—কিন্তু এখন সান্নিধ্যের উত্তাপে ও আলোয় সে চিন্তার আবরণ অপসৃত হয়ে গেছে—এখন অন্য অনেক কথা চিন্তা করবার অবসর সে তাই পেয়েছে। আজ বিনয় এতক্ষণ কাছে ছিল বলেই, একটু পরেই বিনয় আবার আসবে জানা আছে বলেই, এতক্ষণ তার মনে বিনয়ের কথা না জেগে অন্য কথা জেগেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মনো বৃত্তি মানবহৃদয়ের! যখন বিনয়ের দেখা পাওয়া যেতনা, তার কণ্ঠস্বর শোনা যেতনা, তার প্রতি-মুহূর্ত্তের চিন্তাধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সম্ভাবনা ছিলনা;—তখন ঐ দূরের মানুষটির জন্য কল্পনার জাল বোনবার তার আর অন্ত ছিলনা, কিন্তু এখন যে সে এত দিন ধরে এই নির্ব্বান্ধব বিদেশে বিরস রোগ-শয্যায় সঙ্গ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, সান্ত্বনামধুর বাক্যে, স্নেহ-কোমল সহানুভূতি স্পর্শে তার রোগ বেদনার যন্ত্রণাকে সহনীয় করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে—এখন যে তাকে একান্তভাবে আপনার বলে ভাবতে আর কোন বাধা মনে জাগছেনা, পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জানবার ফলে হৃদয়ের যোগ এখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে—তবু আজ সে একান্ত নিকটে—সান্নিধ্যের মধ্যে রয়েছে বলে তার কথা ভাববার দরকার বোধ করলনা! ইলা আবার ভাবলো কি অতলস্পর্শ রহস্য গভীর মানবহৃদয়—ইলার চোখ ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলো।

সাড়ে নটার সময় বিনয় যখন ফিরে এলো, ইলা তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

বেকার সমস্যা

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়

বেকার—বেকার—বেকার—সমস্যার কারণ অনেক এবং তাহার দূরীকরণের প্রস্তাবও ততোধিক। বেকার লোক বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যাহাদের চাকুরী মিলেনা-এই চাকরী না-মেলা দলের মধ্যে আবার কয়েক রকম বেকার আছে, একদল আছে যাহারা মাত্র বিদ্যালয় ছাড়িয়া চাকুরীর আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে চাকুরী পাইতেছেনা, চাকুরী পাইতে হইলে যে অভিজ্ঞতার আবশ্যক তাহা ইহাদের নাই; পূর্ব্বে শিক্ষানবিশী না করিলে চাকুরী মিলিতনা এবং দুই তিন বছর ধরিয়া ঘরের খাইয়া পরের কাজ উঠাইয়া দিতে হইত, এখন আর এ শ্রেণীর শিক্ষানবীশ দেখা যায়না; পূর্ব্বে প্রত্যেক সরকারী ও সওদাগরী আফিসে শিক্ষানবীশের দল দেখা যাইত ফলে পরদেশী ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষীর দল এখানে পাড়ি জমাইতে পারিত না। বেতনও তখন ছিল প্রথমে মাত্র ১৫৲ হইতে ২০৲, আর এখন বেতন হইয়াছে বেশী কিন্তু বৃত্তিহীন শিক্ষানবীশ আর এখন নাই। তারপর তখনকার বড় সাহেবেরা সুপারিশ ভিন্ন অপরিচিত লোককে চাকুরী দিতে ভরসা করিতনা, কাজেই আফিসের বড় বাবুদের সুপারিশ বা সাহেবের বন্ধু বান্ধবের সুপারিশ না হইলে কেহ চাকুরী পাইতনা, এজন্য আত্মীয় পালন তখন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল কিন্তু আফিসের শৃঙ্খলাভঙ্গ বা তহবিল তছরুপাতের এত ভয় ছিলনা। এখন যেমন তহবিল তছরুপাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ঘটনা আফিসাঞ্চলে ঘন ঘন শুনা যায়, সেকালে এ সকল দুর্ঘটনা বিরল ছিল। যখন হইতে সংবাদ পত্রাদিতে আফিসের বড় বাবুদের পক্ষে আত্মীয় পালন দোষণীয় বলিয়া ঘোষিত হইল এবং প্রতিযোগিতায় চাকুরী প্রদানের ব্যবস্থা ব্যাপ্ত হইতে থাকিল তখন হইতেই আফিসের মধ্যে নানারূপ পাপের অবতারণা হইতে লাগিল।

এখন আফিস সকলে বড় সাহেব হইতে বড় বাবু পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পরের উপর সন্দিগ্ধ এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা প্রচারে সকলেই ব্যস্ত; তখন এক বড় বাবুই সকলকে শাসনে রাখিতেন এবং অধস্তন কর্ম্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বড় সাহেবের সাহায্য বা হুকুম আবশ্যক হইত না ইহার ফলে স্থানীয় লোকদেরই চাকুরী মিলিত এবং অজ্ঞাতকুলশীল, সুপারিশ বিহীন লোকের পক্ষে কোনও আফিসে কার্য্য মেলা দুষ্কর হইত, পরদেশীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম। হেলিবেরি কলেজের ছাত্রের স্থানে যখন হইতে প্রতিযোগী I. C. S. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইল, তখন হইতে I. C. S. কর্ম্মচারীদের মধ্যে যেমন নিম্ন শ্রেণীর শাসন কর্ত্তার আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ সুপারিশ উঠিয়া প্রতিযোগিতায় কর্ম্মচারী নিয়োগের পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় এদেশের লোকের স্থান পরদেশী আসিয়া অধিকার করিতেছে. ফলে স্থানীয় লোকের চাকুরী মেলা দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে—বেতনের হার ১৫৲ হইতে ৪০৲ হওয়ায় তাই আজ এত মান্দ্রাজী চাকুরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে; মাদ্রাজে এখনও বেহারের বেতন প্রচলিত তাহার তুলনায় বাঙ্গালার বেতন হার অত্যধিক হওয়ায় বাঙ্গালায় মাদ্রাজী কর্ম্মচারীর এত ভিড় জমিয়াছে।

বাঙ্গালার আনকোরা বিদ্যালয় ত্যাগী ছাত্রেরা যদি বৃত্তিহীন শিক্ষানবিশী করিয়া চাকুরী লইতে সম্মত হয় এবং বেতনের প্রাথমিক হার যদি ২০৲ ২৫৲ করা যায় তাহা হইলে পরদেশী চাকুরিয়ার দলকে এদেশ হইতে বিদায় করা যাইতে পারে। যাহারা দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অপরিচিত লোককে দায়িত্বপূর্ণ কেন দায়িত্বহীন কাজ দিতেও শঙ্কিত হ'ন, পরিচিত বা আত্মীয়কে কার্য্যভার দিয়া যতটা নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন বোধ করা যায় অপরিচিত পরদেশী, ততই গুণ সম্পন্ন

হউক, তাহাকে বিশ্বাস করিতে বহু সময় লাগে এবং কোনও কাজ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়না। স্বীকার করি যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী অপেক্ষা ইহারা অধিকতর পদানত, বাধ্য, সেবাপরায়ণ ও শঙ্কিত অবস্থায় কার্য্য করে কিন্তু বিশ্বাস ও নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। প্রত্যেক আফিসে যদি পুনরায় বৃত্তিহীন শিক্ষানবিশী প্রথা এবং তৎসঙ্গে সুপারিশ প্রথা প্রচলন করা সম্ভবপর হয় এবং শিক্ষনবিশী ভিন্ন চাকুরী দেওয়া হইবে না এমন নিয়ম করা যায় তাহা হইলে চাকুরী-সন্ধানী বাঙ্গালী যুবকের চাকুরির পথ আবার নিষ্কণ্টক হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট আফিস সমূহেও এবম্বিধ নিয়ম হওয়া উচিত এবং স্থানীয় সরকারী আফিস সমূহে প্রাদেশিক লোক ভিন্ন অন্য পরদেশীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবেনা; এরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক।

ইহার পর অন্যজাতীয় বেকার হইতেছে যাঁহারা কার্য্যক্ষম, অভিজ্ঞ অথচ চাকুরী পাইতেছেননা; ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ কারণ ইহারা প্রায় পরিবারের কর্ত্তা, ধারক ও বাহক, ইহারা একবার কর্ম্মচ্যুত হইলে ইহাদের কর্ম্ম মেলা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। যদি কোনও বিশেষ দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য কার্য্য সম্বন্ধে ইহাদের অভিজ্ঞতা থাকে তবে সহজে কাজ মিলিলেও মিলিতে পারে কিন্তু স্বল্পতর বয়সী লোক যদি অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা হইলে দীর্ঘতর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা স্বল্পতর বয়স অধিকতর আকর্ষণীয় হয়। এই জাতীয় বেকার অল্প বেতনে কাজ করিতে পারে না, কিন্তু অল্প বয়স অথচ অভিজ্ঞ লোক সর্ব্বদাই স্বল্পতর বেতনে কাজ করিতে প্রস্তুত। তাহার তখন স্বাস্থ্য আছে, উচ্চাশা আছে, সাংসারিক দায়িত্বও হয়ত স্বল্পতর সুতরাং স্বল্প বেতনে তাহার কাজ করা সম্ভবপর কিন্তু বয়স্ক অভিজ্ঞের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। এখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা যুবকত্বের সম্মান বা চাহিদা অধিক কিন্তু পূর্ব্বে বয়স অপেক্ষা অভিজ্ঞতার কদর বেশী ছিল, ইহার কয়েকটী কারণ আছে যাহা উপেক্ষা করা যায় না। পৃথিবী এখন দ্রুততর বেগে চলিতেছে; পূর্ব্বে যে পথ অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা লাগিত এখন তাহা কুড়ি মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টায় অতিক্রম করা যাইতেছে, সুতরাং মানুষের কর্ম্মশক্তিও এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত বৃদ্ধি না পাউক কতকগুলি যান্ত্রিক ও আনুষঙ্গিক কারণে প্রত্যেক মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিকতর পরিমাণ কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে, চিন্তাশীলতা বা বুদ্ধি প্রবণতা অপেক্ষা কার্য্যের পরিমাণের উপর এখন মানুষের ঝোঁক পড়িয়াছে, যেখানে দিনে ৫।৭ খানি চিঠি লেখা হইত এখন সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী ও টাইপরাইটারের সাহায্যে সেখানে ২৫।৩০ খানি চিঠি বাহির হইতেছে ফলে খরচ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমন স্বল্পতর সময়ে কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহার ফলে এখন সরকারী চিঠিপত্রে আর সেরূপ উচ্চাঙ্গের লিপি সাহিত্য বা লেখকের চিন্তা বা সুদূর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনও রকমে নির্ভুল বোধগম্য ভাষায় চিঠি লিখিতে পারিলেই হইল। হিসাবের বহি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়; যান্ত্রিক গণনা পদ্ধতি ও নানা রকম গণনা-কলের আবির্ভাবে হুসিয়ার সুলেখক ও লিপি-কৌশলী হিসাবী লোকের আর সেরূপ কদর নাই। কাজেই যন্ত্রজ্ঞ হিসাবী লোক এখন পুরাতন শ্রেণীর হিসাবী লোককে স্থানচ্যুত করিয়াছে। পাঁচজন লোকের জায়গায় একজন যন্ত্রজ্ঞ লোকে কাজ চালাইতেছে এবং স্বল্পতর সময়ে কাজ উঠিতেছে, কাজেই বেকার বৃদ্ধি সুনিশ্চিৎ। অথচ যান্ত্রিক পর্ব্বে যন্ত্রকে উপেক্ষা করা চলে না। যেখানে পাঁচজন লোকে পনর দিন খাটিয়া একটী হিসাব শেষ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ আজ সে স্থলে একটী যন্ত্রের সাহায্যে সেই হিসাব ৩।৪ দিনে একজন যন্ত্রজ্ঞ লোক শেষ করিয়া দিতেছে, খরচ ও যথেষ্ট কম, একজনের বেতনও খরচ হয় না; ব্যবসায়ী হিসাবে এ সুযোগ ত্যাগ করি কেন?

বেকার বৃদ্ধির ইহাও একটী কারণ কিন্তু ইহাও সংযত করা অসম্ভব নহে যদি আমরা এই যন্ত্রজ্ঞটীকে নিজের দেশের লোকের মধ্য হইতে বাছিয়া লই, এখানেও আমরা তাহা করিনা। আমাদের একজন মধ্যবিত্ত কেরাণীর পক্ষে দেড় হাজার দুই হাজার টাকার একটী গণনা যন্ত্র ক্রয় করা সম্ভবপর নহে, দেশের ধনীরা

যন্ত্রক্রয়ে সাহায্য করেন এবং কিস্তিবন্দীতে নিজের লোককে যন্ত্র কিনিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা শুধুই যে কেরাণী বিশেষকে সাহায্য করিবেন, তাহা নহে, নিজেও ন্যস্ত মূলধনের উপর বেস দু'পয়সা রোজগার করিতে পারিবেন ; কিন্তু কিস্তিবন্দীতে কল বিক্রয়ের ব্যবসাটাও আমরা ছাড়িয়া দিই বিদেশী বা পরদেশী ধনীদের হাতে ; সেক্ষেত্রে আমরা কি প্রকারে দেশের ব্যবসা বা বেকার সমস্যা দূর করিতে পারি ?

আমি অনেক ঘটনা জানি যাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ধনীগণ ইচ্ছা করিলে নিজেরা দুই পয়সা অধিক রোজগার করিতে পারেন এবং অনেক বেকারের মুখেও অন্ন যোগাইতে পারেন, তাহা বেশী কষ্ট বা অধিক অর্থ সাপেক্ষ নহে। পদচ্যুত বেকার টাইপিষ্ট কোথাও উপযুক্ত বেতনের চাকুরী যোগাড় করিতে না পারায় কিস্তিবন্দী হিসাবে একটা ইংরাজী ও পরে একটী বাঙ্গালা টাইপ রাইটার কিনিয়া আদালতের বৃক্ষতলে বসিয়া আদালতের দরখাস্ত টাইপ-কাপি করিতে সুরু করেন এবং ক্রমশঃ তিনি ৪।৫ জন বেতন ভোগী ও ঠিকা হিসাবে সহকারী টাইপিষ্ট রাখিয়া পূর্ব্বের বেতন অপেক্ষা ৫।৭ গুণ অর্থ রোজগার করিতেছেন ; প্রথম টাইপ রাইটার কিনিতে তাঁহার পরিবারের অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, কারণ তখন তাঁহাকে ধারে কিস্তিবন্দী হিসাবে কল ছাড়িয়া দিতে কেহই রাজী ছিলনা, এবম্বিধ ক্ষেত্রে ধনীগণ যদি কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হন তাহা হইলে অনেকটা সুরাহা হয়।

হিসাব লিখন যন্ত্র সম্বন্ধেও আমি এমন কয়েক জনকে জানি যাঁহারা একটী মাত্র কলের সাহায্যে মাসে দুই তিন শত টাকা বিনা চাকুরী গ্রহণে অর্জ্জন করিয়া থাকেন, লিখন ও গণন যন্ত্রের এজেন্সী লইয়া ঐ সকল যন্ত্র যদি বিশ্বাসী বেকারগণের মধ্যে কিস্তিবন্দী হিসাবে বিলি করা যায় তাহা হইলে অনেক ঠিকা পরদেশী টাইপিষ্ট ও হিসাবরক্ষককে সহর হইতে বিতাড়িত করা যায়। পথ উন্মুক্ত না হইলে বেকারদের স্থান হইবে কোথায় ?

মোট কথা হইতেছে দেশের ধনী যদি দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, দোকানদারী ইত্যাদিতে অর্থ ন্যস্ত না করেন তাহা হইলে তাহাদের স্বদেশের লোক কি প্রকারে প্রতিপালিত হইবে ? বিদেশী রাজা বা ধনীর কথা ছাড়িয়া দিই, কিন্তু মাদ্রাজী, বা মাড়োয়ারী ; ভাটিয়া বা পাঞ্জাবী তাহার যে ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিবে, সে ব্যবসায় বা দোকানে বাঙ্গালীর আশা করিবার কি থাকিতে পারে ? স্বপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে না হয় প্রাদেশিকতার কথায় দু'কথা বলিলে বা দুইটা কাজে করাইলে কিন্তু পরদেশী ধনী কেন, কি সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাসী আত্মীয়কে উপেক্ষা করিয়া অপরিচিত পরদেশীকে বিশ্বাস করিবে ? এ সহজ কথা আমরা ভুলিয়া যাই কেন ? অর্থ যার ব্যবসা তার ; ব্যবসা যার, লোক নিয়োগ—বিয়োগ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা তার ; একের ধনে অন্যের পোদ্দারী করা চলিবে কেন ? বাঙ্গালীর দেশ, তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে বলিয়াই কি পাঞ্জাবী বা বোম্বাইওয়ালা তাহার স্বীয় অর্থ বা ব্যবসা নিজের লোককে ফেলিয়া বাঙ্গালীর হাতে তুলিয়া দিবে ? অদূরদর্শী অবিবেচক রাজনৈতিক চাতুর্য্যপূর্ণ লোক ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ কথা বলিতে পারে না ; রাজনীতির পাণ্ডাদের কথা ধনী বা ব্যবসায়ীদের নিকট গ্রাহ্য নহে। কথায় বলে 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর ?' কড়ি ফেল, কথা শুনিব নচেৎ কথা কহিবার কাহার অধিকার আছে ?

কলিকাতায় বহু রকমের ছোট বড় ব্যবসা চলিতেছে. দেশী বিদেশী সব রকম কারবারই চলিতেছে কিন্তু "এই সকল কারবারের ধনী কে ? কারবারী হয়ত পরদেশী মূলধন যোগাইতেছে বিদেশী ব্যাঙ্ক, সুতরাং কারবারের মূল হইতেছে বিদেশী ব্যাঙ্ক, তথাকথিত কারবারী ব্যাপারী বা দালাল মাত্র ; তাহারা মাথায় মোট বহিয়া ধনী ব্যাঙ্কের মুনাফা যোগাইতেছে আর সেই মুনফার অংশ পাইতেছে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ। এক সময়ে যখন খুব রব উঠিয়াছিল যে বিদেশী অর্থাৎ বিলাতী ট্যাক্সি কোংকে পরাজিত করিয়া এদেশী পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীরা ট্যাক্সি কারবারের রাজা হইয়া উঠিল, কথাটা সাগর পারে বিলাতী কোনও ব্যাঙ্কের অংশীদারদের কর্ণে উঠায় তাহারা এখানে সরজমীনে তদন্তের জন্য একদল প্রতিনিধি পাঠান. তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে বিদেশী

ট্যাক্সি চালক কারবারী এখন ট্যাক্সি না চালাইয়া নূতন ও পুরাতন ট্যাক্সি গাড়ী আমদানী করিয়া উহা এদেশীয়গণকে দৈনিক ভাড়া হিসাবে খাটাইতে দিতেছে অথবা মাসিক কিস্তিবন্দী হিসাবে বিক্রয় করিতেছে এবং এই কারবারের টাকা যোগাইতেছে তাঁহারই ব্যাঙ্ক আর এবম্বিধ কারবার করিয়া কোম্পাণী শতকরা ২৫।৩০ টাকা লাভ করিতেছে, ব্যাঙ্ক শতকরা ১০।১২॥ লাভ করিতেছে। তখন তিনি খুসী হইয়া গেলেন এবং এই কারবার বৃদ্ধির জন্য ঐ কোম্পাণীকে আরও অধিক Over draft এর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ট্যাক্সি গাড়ীতে দেশ ভরাইবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। বাহিরের লোকে দেখিতেছে ট্যাক্সি বা বাসের কারবারে পাঞ্জাবী একচ্ছত্র অধিপতি, বস্তুতঃ তাহা নহে, অধিপতি তাঁহারা যাঁহারা এই ব্যবসায়ের পিছনে অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। পাঞ্জাবী গাড়ীর চালক ও তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। বাঙ্গালী যদি এই কার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিত তাহা হইলে ব্যবসাটী তাহাদের হইত, বিনা ঢাল তলোয়ারে নিধিরামের মতন সর্দ্দার হওয়া যায় না। ব্যবসায়ী বা কর্ম্মচারী মহলের বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে উহাতে স্বদেশের ধনীদিগকে অর্থ ন্যস্ত করিতে হইবে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনা। এতো গেল বেকার সমস্যার এক দিকের কথা, এসব কথা পণ্ডিত তাত্ত্বিকগণের কানে অকিঞ্চিৎকর, অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া উপেক্ষিত হইবে, কিন্তু পরদেশী প্রবেশ ও বিস্তার নিবারণের যে এ ব্যবস্থাগুলি মহাস্ত্র বিশেষ তাহা অস্বীকার করিবার নহে।

বেকার সমস্যার মধ্যে চাষী ও শিল্পীর কথা আনা হইয়াছে; যাহারা পরের কাজে "গতর" খাটাইয়া নগদ পয়সা রোজগার করে বেকার বলিতে সেই শ্রেণীর লোকের কথাও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত কিন্তু চাষী বা শিল্পী যাহারা নিজের নিজের ক্ষেত বা কারখানা চালাইয়া খায় তাহাদের বেকার হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যদি মাল না বিক্রয়ের দরুণ বা মালের যথোপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার দরুণ তাহাদের অর্থকৃচ্ছতা ঘটিয়া থাকে তাহাকে বেকার সমস্যার ভিতর টানিয়া না আনাই ভাল; টানিয়া আনিলে সমস্যার জটীলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সংজ্ঞার অপব্যবহার হেতু প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ ও জটীল হইবে মাত্র। কৃষি ও শিল্পজীবির অর্থকৃচ্ছতা দূর করিতে হইলে মাল ধরিয়া রাখা, বা কম উৎপন্নের কথা আলোচনা করিতে হয়। উৎপন্ন মালের বিক্রয় ও বাজার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে উৎপন্নকারীকে পরের হাতে থাকিতে হয়, ইহার বিষময় ফল ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় একবার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং আমিও সে সম্বন্ধে অনেক সময়ে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গালীর উৎপন্ন জিনিষের বেচা-কেনা যদি বাঙ্গালীর হাতে না থাকে তাহা হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই অজ্ঞতার দরুণ বাঙ্গালায় অনেক শিল্প গতায়ু হইয়াছে। কৃষিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ঐ কথা সমভাবে প্রযোজ্য নিজের দেশের উৎপন্ন মাল কোন্ দেশে যায় সে দেশে কত দরে বিক্রয় হয়, কত পরিমাণ তথায় আবশ্যক এবং কি কার্য্যে উহা আবশ্যক হয় ইহা যদি না জানা থাকে তাহা হইলে সে ব্যবসায়ের কখনও কি লাভ, বিস্তৃতি বা উন্নতি হইতে পারে? বাঙ্গালী যদি বাণিজ্যের সকল প্রকরণ পরদেশীর হস্তে অর্পণ করিয়া কেবল উৎপন্ন লইয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে জগতে তাহার স্থান কোথায়? "তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি" তেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং ক্রমশঃ অর্থকৃচ্ছতাহেতু উহার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় জটীল কথা যাহা এদেশে আদৌ প্রযুজ্য নহে বা যাহার কারণ এদেশে, অন্ততঃ বাঙ্গালায় স্পর্শ করে নাই তাহা লইয়া টানাটানি করিবার আবশ্যকতা কি? এযেন "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" বিশেষ। যদি মানিয়াই লই আমরা আমাদের উৎপন্ন জিনিষের দর পাই না, তাহা হইলে কেন পাই না তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত, অনুসন্ধানে জানা যাইবে যে যে দর আমরা পাই তাহার বহুগুণ দর পায় যে রপ্তানী করে বা যাহার এজেন্ট বিদেশে উহা বিক্রয় করে। এই দর যদি বাঙ্গালী দালাল, ব্যাপারী, রপ্তানীকারকের হাত দিয়া আসে তাহা হইলে বাঙ্গালীর কি অর্থ কৃচ্ছতা উপস্থিত হইতে পারে? এই সব পদ্ধতির মধ্যে যদি পরদেশী না থাকিয়া স্বদেশী বাঙ্গালী থাকিত তাহা হইলে বেকার

বা অর্থকৃচ্ছতা কখনই বাঙ্গালায় দেখা দিতে পারে না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভয় বিদেশী আততায়ীকে; কারণ ইহাদের স্বার্থরক্ষার ভার গভর্ণমেণ্টের হস্তে এবং তজ্জন্য বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত ভারত ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নানারূপ চুক্তি ও সন্ধিতে আবদ্ধ, সে কারণ বৈদেশিক সওদাগরের সহিত দ্বন্দ্বের বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে যদি আমরা নিজের ঘরের কারবারের সুবন্দোবস্ত করিতে পারি তাহা হইলে মধ্যস্থ পরদেশী ব্যাপারীগণের লভ্যাংশটা অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরে আসে এবং সে লভ্যাংশ বড় অল্প নহে।

যাহারা "পাট" "পাট" করিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যদি পাট বোনা হইতে বিদেশে পাট রপ্তানী ও তথায় বেপারীর সমুদয় ক্রয় পদ্ধতি অবগত থাকিতেন এবং চেম্বার অফ কমার্সের কার্য্য পদ্ধতির সঠিক সংবাদ জানিতেন তাহা হইলে আমাদের আন্দোলন অন্য পথে চালিত হইত এবং তাহা হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বাগ্রে সেই সকল একদেশদর্শী প্রথা সকলের মূলোৎপাটনে যত্নবান হইতেন। যে দুই চারি জন বাঙ্গালী বা পরদেশী এই সকল পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজেরা এদেশে ও বিদেশে আফিস করিয়া কার্য্য চালাইয়াছিলেন বা চালাইতেছেন তাঁহাদের আদর্শে যদি আমাদের উৎপন্ন পণ্যের কারবার চালান যায় তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের রাত্রে আলোকের খরচ ও মস্তিষ্ক চালনায় অনেক সাশ্রয় হইবে। ইহা ব্যতীত অনেক কারণ আমাদের নিজেদের অক্ষমতা ও ঔদাস্যের ফলেই ঘটিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সে সকল সংশোধন না করিয়া বড় বড় মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া কাগজে ও সভাক্ষেত্রে নাম লইলে দেশ এক অঙ্গুলিমাত্র ধনী বা বেকারশূন্য হইবে না। আইন সংস্কারক দলের এদিকে সমাধিক দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাণিজ্য ব্যবসার নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার প্রচলিত পদ্ধতিসকল জ্ঞাত না হইয়া কেবল নীতি ও তাহার ব্যাখ্যা প্রচার করিলে কোন ফলোদয়ই হইবে না, ইহা সুনিশ্চিৎ।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠে যাহার ঝরিল অমৃত, মুগ্ধ করিল বিশ্বজন,
দিব্য-কান্তি সৌম্য মূর্ত্তি বঙ্গবাণীর কাম্য ধন,
বক্ষে যাঁহার মণি-মঞ্জুষা, নয়নে বিভা জ্যোতির্ম্ময়,
হিমাচল হ'তে কুমারিকা যার পুলকে, হর্ষে গাহিছে জয়,
জ্ঞানে গৌরবে তুমি গরীয়ান্ আমরা নিঃস্ব বিত্তহীন,
প্রাণের অর্ঘ্য চরণে ঢালিয়া রয়েছি দাঁড়ায়ে শ্রদ্ধালীন।

ত্রিভুজের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র

গল্প

শ্রীঅমলেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী

সেদিন রবিবার। আপিস ছিলো বন্ধ। সকাল বেলার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে বেশ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেম। তারপর মেঝে থেকে উড়ন্ত খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে অলসভাবে, আবার পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে—স্ত্রী অনীতা। পরণে তার ডুরে সাড়ী। মাথায় উদাস এলো খোঁপার পরে ঘোমটাটী অযত্নে বসানো, ঠোঁটের কোণে চাপা মৃদু চপল হাসি। দরজায় একখানা হাত রেখে পরিক্লান্ত পথিকের মতো দাঁড়িয়ে বললে—আসতে পারি কি ?

মুখ তুলে বললেম—এসো।

অনীতা এসে বসলে আমার পাশের একখানা শূন্য চেয়ারে। হেসে বললে—কি করবো বলো, তোমার মেজাজ না জেনে তো বিনা পারমিশানে ঘরে ঢুকতে পারিনে!

কেন, ভয় করে নাকি ?

না করে উপায় কি ?

তার গলার স্বরে বুকের ভেতরটা আমার মোচড় দিয়ে উঠলো। সত্যি, কথাটা মোটেই ভালো হয়নি। কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে সামান্য একটু ত্রুটিতে রাগের মাথায় ওকে অকস্মাৎ যা তা বলে গালাগাল দিয়েচি। এখন সে কথাগুলো একে একে মনে পড়ে যাওয়াতে ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হয়ে উঠলেম। নীরবে স্ত্রীর একখানা তৃষিত কম্পিত হাত ধীরে ধীরে নিজের হাতে টেনে নিলেম।

অনীতা খুসী হোয়ে হেসে বললে—আচ্ছা, মেয়েদের পরে তোমাদের এতো আধিপত্য কেন বলতে পারো ?

আমিও হেসে উত্তর দিলেম—তারা নিজেরা অধীনতা স্বীকার করে নেয় বলেই তাদের ওপর আধিপত্য খাটাই।

ইস্, স্বীকার করে নেয়, কে বললে ? অন্যেরা জোর করে তাদের মত করিয়ে নেয়—নিজের মতে।

মোটেই না। দেহের পর চলে জোর খাটানো, মনের পর চলে না।

কিন্তু মেয়েদের মন বলে কি কোনো উপসর্গ আছে ? বিয়ের সময় কে তাদের সম্মতি চায় ?

চায় না, স্বীকার করি। তবে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখবে ?

কি ?

মেয়ের বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে—বাপের মনে হয়তো তখনো চিন্তার ছায়া পড়েনি, এদিকে মায়ের গলা দিয়ে উঠবে না ভাত। প্রতিবেশীর চেয়ে প্রতিবেশিনীরি হয়তো ভালো ঘুম হয় না রাত্রে।

লজ্জায় অনীতা লাল হোয়ে উঠে ওর আরক্ত মুখ নিলে নামিয়ে। আমার মাথার মধ্যে ঝাঁ করে একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেলো। গম্ভীর হোয়ে বললেম,—তোমার কি বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিলো না ? বোধ হয়, আমাকে না ?

যাওঃ—কি যে বলো!

কেন, অন্যায়টা কি বলেচি ? না, সত্যি বলচি, চাপা-চাপি আমি ভালো বাসিনে। তুমি ঠিক করে বলো, তোমাকে মুক্তি দিতে রাজী আছি। ত্যাগ করবো না, অথচ, তোমাকে রেখে দেবো তোমার পছন্দ সই যায়গায়, কোনোদিন কোনো কষ্ট পেতে হবে না, তাধা শুনোও আমাদের মধ্যে একেবারে বন্ধ। তুমিও—

আমার মুখ চেপে ধরে অনীতা রেগে বললে—ফের যদি ঐ সব বলবে তো আমি উঠে যাবো এখান থেকে।

কোনোরকমে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে অস্পষ্ট স্বরে বললেম—কিম্বা অন্য কাউকে যদি তোমার পছন্দ—

অসভ্য।—অনীতা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

আমি হোঃ হোঃ করে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেম—তুমিই তোমার শত্রু।

সে-কথা তার কানে গেলো কিনা, কে জানে! আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে ও ম্লান মুখে বেরিয়ে গেলো।

মনটা খারাপ হোয়ে উঠলো—এক নিমেষে। বিরক্ত হোয়ে খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেম।

বাহিরে তখন ধোঁয়া উড়িয়ে চলেচে একটা ভাঙা মোটর গাড়ী। তাঁর পিছনে ছুটেচে মুটে—আলুর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। ওদিকে সরবতের দোকানে কি নিয়ে যেন একদল পাঞ্জাবী লাগিয়ে দিয়েচে গণ্ডগোল।

মেজদা।—

মুখ ফিরিয়ে নিলেম।

রেখা ঘরে ঢুকে মুখ টিপে হাসলে। কথায় বিষ মাখিয়ে বললে—দাদা, আজকে র দিনে তোমার আনন্দের মাত্রাটা কিছু বেশি হয়েচে বুঝি?

কেন?

বৌদিকে কাঁদিয়ে দিলে যে।

কাঁদিয়ে দিইনি। সে নিজেই কেঁদে গেচে।

ছিঃ দাদা, মিথ্যে বলো না। ও গুলো কি না বললেই পারতে না। জানোই তো মেয়েরা ওসব সইতে পারে না!

কি সব?

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না আমি পাশের ঘরেই ছিলেম।

মুহূর্ত্তে কে যেন আমার মুখে একরাশ কালি ঢেলে দিলে। লজ্জিত হোয়ে চুপ করে রইলেম। রেখা কাছে এসে হাতটা ধরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে—আমার অপরাধ হয়েচে ক্ষমা করো।

বিস্মিত হোয়ে চোখ তুলে বললেম—বাঃ, তোর আবার অপরাধ কিসের?

তোমাদের কথা শুনে ফেলেচি।

সে তো আর তোর দোষ নয়, দোষ হোল কানের। কান দুটোকে তো আর বুঁজিয়ে রাখা যাবে না। আর এ-ঘরে কথা কইলে, তোকে তো বাধ্য হয়েই শুনতে হবে ও-ঘর থেকে।

তা নয়। বৌদি যখন এলো, আমার উচিত ছিলো ও-ঘর থেকে চলে যাওয়া।

আচ্ছা আচ্ছা—সে ভাবা যাবে। পান নিয়ে আয় এখন। মুখটা বড়ো ইয়ে হোয়ে গেচে।

কিন্তু, স্বীকার কারো আগে, বৌদিকে ওসব কথা আর কখনো বলবে না?

তোর দাদার কথার কি কিছু মূল্য আছে?

হ্যাঁ আছে। আমার কাছে তো!

নারে না! এখন যা হয়ত স্বীকার করলেম দেখবি মিনিট পাঁচেক পরেই ঠিক তার উল্টোটা হোয়ে গেচে।

যাঃ—কেবল তোমার বাজে ঠাট্টা! এতোও বকতে পারো তুমি?—

বুঝলি, যারা বেশি বকে তাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

তা বটে। তবে তাদের ভেতরে ময়লা জমে না—এই যা লাভ।

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললেম,—দাদার মোসাহেবী করতে খুব যে ওস্তাদ হোয়ে উঠেচিস,—বিশেষ কিছু লাভ নেই এতে। তবে একটা কথা জেনে রাখ,—যারা বেশী বক্ বক্ করে, তারা সহজে রাগে না। কিন্তু, একবার যদি তাদের মাথা চড়ে যায়, সে-মাথা ঠাণ্ডা করতে অনেক সময় লাগে। আর, তারা হয় অত্যন্ত জেদী!

ঠিক তোমার মতো। তোমার মতোই তারা আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রশংসা করতে পটু। বলে হাসতে-হাসতে ওঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পান নিয়ে এসে বললে,—দাদা, চার-পাঁচ মাস ধরে বিয়ে হ'য়েচে, নতুন বৌ! কোথায় আজকালকার ছেলেদের মতো বৌকে আদর যত্নে পাগল ক'রে তুলবে, তা নয়—!

মাথায় তুলে নাচলে পাগল হওয়ার সৌভাগ্যটা আরো শীঘ্র আসবে।

যাওঃ,—রেখা চ'লে গেলো।

নাঃ, কথার মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয়া উচিত হয়নি।

এতে বন্ধুমহলে হোতে হ'য়েছে উপহাসাস্পদ। কেউ বা পরিহাস ক'রে বলেন,—বাচাল। যদি বা রাগ ক'রে, হোতে যাই গম্ভীর, তখন বলেন,—কালপ্যাঁচা। তবু গাম্ভীর্য্যের মুখোস না পড়ে আমার উপায় নেই। কেননা গাম্ভীর-প্রকৃতির লোক যাঁরা, সবাই চলে তাঁদের একটু সমীহ ক'রে। এমন কি,সময়ে মান্য করতেও কুণ্ঠিত হয় না, ভয় তো করেই। জানি, এজন্য বন্ধুরা আমাকে উত্যক্ত ক'রে তুলবেন, সইতে হবে তাদের ধারালো তীব্র বিদ্রূপের খোঁচা। কিন্তু, প্রথমে বন্যা আসে বেগে—দু'কূল ছাপিয়ে। তারপর আবার ব'য়ে যায় সাধারণ গতিতে। তখন আর থাকে না উগ্রতা, থাকে না তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। রেখার কালকের কথাগুলো আমার মনে তুলেছিলো বেশ একটা আন্দোলন। তাই পরদিন সকালে গম্ভীর মুখে ব'সে ছিলেম একটা বই নিয়ে।

অনীতার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে রেখা ঘরে প্রবেশ ক'রলে—হাস্‌তে-হাস্‌তে। আমার সাম্‌নে এসে প্রথমটা থমকে পিছিয়ে গেলো, তারপর হঠাৎ খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে,—দোহাই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি গম্ভীর হোয়ো না।

হেসে ফেল্‌লেম। চিরকালের স্বভাব!

আরো একটু এগিয়ে এসে বৌকে ধাক্কা মেরে আমার গায়ে ফেলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

কোনো রকমে টাল সামলে অনীতা লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে রইলো দাঁড়িয়ে। আমি মুখ তুলতেই ও ফিক করে ফেললে হেসে। আমিও না হেসে পারলেম না।

ওকে সুমুখের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেম—ব্যাপার কী! কাল রাত্রে যে শুতে এলে না?

কে বললে, আসিনি! আমি তো গিয়েছিলেম, দুয়ার বন্ধ দেখে ফিরে এলেম। ও মুখ টিপে হেসে বললে—কেন, কণ্টক-শয্যা হোয়েছিলো নাকি কাল?

উঃ, কী অহঙ্কারী! নিজের বড়াই নিজেই করা হচ্ছে। কিন্তু, যাই বলো, তোমাকে আমার বড্ডো ভয় করে।

আমাকে? ও আশ্চর্য্য হোয়ে উৎসুক দু'টী চোখ তুলে বললে—কেন?

মেয়েরা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। তারা কখোন যে হাসবে আর, কখোন যে তাদের চোখ দিয়ে জল গড়াবে, আমার পক্ষে এ বুঝে ওঠা অসাধ্য।

তাইতো, নিজে আর কোনদিন কাঁদোনি, না?

দেখেছো কোনোদিন?

না দেখলে বুঝি হয় না! আর, কান্নারি মতো দোষ, রাগটা কিছুই না নয়?

মোটেই না। হাঁসতে হাসতে বললেম—আচ্ছা, এখন উঠি, আপিসের সময় হোয়ে এলো।

ওঠো। কিন্তু, কালকের মতো যা তা করে খেয়ে যেয়ো না।

খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে তো?

না, আমি পারবো না।

তবে আমার খাওয়াটা ভালো হবে না।

অসভ্য কোথাকার! বলে হেসে ও বেরিয়ে গেলো। ওর হাসি আমার মনের স্তরে স্তরে, বুকের শেষে দিলে আনন্দ শিহরণ জাগিয়ে।

আপিস থেকে যখন ফিরে এলেম ক্লান্ত হোয়ে, তখন সন্ধ্যার ধূসরতায় আর ধোঁয়ায় হয়েচে নিবিড় আলিঙ্গন, চাঁদের ক্ষীণালোকের সঙ্গে চলেচে বৈদ্যুতিক আলোর সংঘর্ষ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেম, এমন সময় দোতালা থেকে একটা গানের সুর এলো ভেসে। বোধহয়, অনীতা গাচ্ছিলো—তবে স্পষ্ট বুঝতে পারলেম—আধুনিকার মতো অর্গ্যান নিয়ে নয়, খালি মিষ্টি গলায়—

অরুণ রাগে
মম পরাণ জাগে,
প্রণয় নীরে
প্রাতে
নলিনী সাথে।

নিঃশব্দে দোতালায় উঠে এলেম। দেখলেম—অনীতা গাইচে—দরজার দিকে পিছন ফিরে। আগের সুরে

একটা পরিপূর্ণ আনন্দ ছিলো এসুরে তা নেই, এসুরে আছে শুধু বিষণ্ণতা, বুকভরা ব্যর্থতা—

দিনের শেষে
যাবে সকলি ভেসে
রহিবে আভা
শুধু
গোধূলি মাথে।

সমস্ত ঘরখানাকে আচ্ছন্ন করে, আচ্ছন্ন করে আমাকেও, হয়ত যে গাচ্ছিলো—তাকেও, ধীরে ধীরে সুর গেলো মিলিয়ে। পিছন ফিরতেই হঠাৎ আমাকে দেখে অনীতা লজ্জায় একেবারে গোলাপের মতো লাল হোয়ে উঠলো। কোন রকমে সামলে নিয়ে হেসে বললে—বাঃ, তুমি যে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছো? কখোন এলে?

বেশিক্ষণ নয়, এই মিনিট পাঁচেক হবে। তোমার গলাটী কিন্তু ভারী সুন্দর অনীতা, ভারী মিষ্টি!

অনীতা আমার কাছে এগিয়ে এসে জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললে—এ তোমার ভারী অন্যায়!

কি অন্যায়! এই চোরের মতো দাঁড়িয়ে শোনাটা!

হ্যাঁ।

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেম, ও আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো—থাম, এই সন্ধ্যে বেলায় বক বক করে আর মাথা চড়িয়ে দিয়ো না। আমি আসচি জলখাবার নিয়ে। দেখো বেরিয়ে যেয়ো না যেন! তারপর ঘর ছেড়ে ও চলে গেলো—দ্রুতপদে।

হাত মুখ ধুয়ে, সুইচ টিপে, পাখাটা চালিয়ে দিয়ে অবসন্নভাবে এসে বসলেম—আরাম চেয়ারে। ফিরে এলো অনীতা জলখাবার নিয়ে। একটা থালায় যৎসামান্য মিষ্টি, কিছু ফল, ও এক গ্লাস সরবৎ। চেয়ারের হাতলে আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে বললে—খাও, আমি আসচি এক্ষুণি।

ও চলে যাচ্ছিলো, আমি ওর রঙীন আঁচলটা খপ করে ধরে বুকের কাছে ওকে টেনে এনে বললেম—খাওয়া হয়েচে তোমার?

হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা। এই যে, হ্যাঁ, এইবার আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বলোতো খাওয়া হয়েচে কিনা!

ও ফিক করে ফেললে হেসে। ওকে হ্যাঁ করিয়ে ওর মুখে একটা গোটা সন্দেশ ঢুকিয়ে দিয়ে বললেম—নাও, খেয়ে ফেলো চট করে। না না—ও কোনো আপত্তি শুনচিনে তোমার!

ও অতিকষ্টে খানিকটে সরবৎ খেয়ে কোনোরকমে সেটা গলাধঃকরণ করলে। হাসতে হাসতে আরেকটা মুখে তুলে দেবার উপক্রম করছিলেম,—অনীতা সরে গিয়ে রেগে উঠে ভারী গলায় বললে—যাওঃ—সেই জন্যেই তো খাবার সময় আসিনে তোমার কাছে। সেদিন তো, গোটা মাছটা গলায় ঠেলে দিয়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিলে, আর কি!

শক্ত করে ওর একখানা হাত চেপে ধ'রে চেয়ারে বসিয়ে বললেম,—লক্ষীটী আমার, এইটে খাও। বাস্ আর না!

ও জোরে মাথা নেড়ে বললে,—না, না—আমি খাবো না, কিছুতেই না। আঃ, ছাড়ো বলচি লাগে। কই, ছাড়ো—উঃ—

ছেড়ে দিতেই ও স'রে গিয়ে চেষ্টা ক'রে একটু হাসতে যাচ্ছিলো, কিন্তু, না পেরে, কেঁদে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কী অভিমান! কত চেষ্টা করলেম, কতো সাধ্যসাধনা যে আমাকে করতে হোল, তবু পারলেম না ওর মান ভাঙাতে। কী-ই বা এমন ব'লে ছিলেম, যার জন্যে দুয়ারে খিল এঁটে রাগ ক'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে প'ড়লে। আমার ছুটির দিনের সারা দুপুরটা দিলে নষ্ট ক'রে।

শুধু তো পরিহাস করেছিলেম :—অনীতা, তোমার বর খুঁজতে যাচ্ছি,—এতেই যদি এতো রাগ, তবে আর ঘর-সংসার করা চলে না। নাঃ, এদেশের মেয়েদের ধাতই আলাদা,—হালকা কথাকে ওরা নেয় গভীরভাবে, সোজা কথাকে ভাবে বাঁকা ক'রে—তাই একটুতেই পড়ে নেতিয়ে।

কি করি, উপায় নেই। সোজা চ'লে গেলেম বাজারে। বাজার থেকে ফিরে যখন বাসায় এসে পৌছলাম,

দেয়ালের বড়ো ঘড়িটাতে তখন বেজে গেচে রাত্রি আট্‌টা।

ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেম, অনীতা কি একটা সেলাই নিয়ে ব'সেচে! পথে আস্‌বার সময় মন ভেজাবার যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম মনে-মনে, আস্তে-আস্তে সেগুলো খাটিয়ে দিতে লাগলেম। মুখের ভাবে বোঝা গেলো, মনটা ওর প্রসন্ন হোয়ে এসেছে। তখন কাগজের বাক্সটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেম,—ছাখো তো, পছন্দ হয় কিনা।

ও আনন্দে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রেই হঠাৎ রেগে উঠে বল্‌লে,—যাও,—বাজে ফাজলেমি করতে হবে না!

বাঃ, ফাজলোমটে কি হোল এতে?

ও হেসে ফেলে বল্‌লে,—আরেকবারের মতো একটা খালি বাক্স দিয়ে, ঠকিয়ে, মজা দেখতে চাও, কেমন?

আমিও হেসে ফেললেম,—মেয়েদের স্মরণ-শক্তি আছে, দেখচি!

গেলো বছরে কি নিয়ে যেন ও একদিন অভিমান ক'রেছিলো। তারপর দোকান থেকে একটা কাগজের বাক্স চেয়ে এনে, তাই দিয়ে ওকে ঠকিয়ে—সে কী হাসাহাসি! ওর সকলের সাম্‌নের তখনকার সেই করুণ অবস্থাটা স্মরণ ক'রে একটু দুঃখিত হোয়েই ব'ল্‌লেম—না, এবারে মিথ্যে নয়, খুলেই ছাখো। ব'ল্‌তে-বল্‌তে নিজেই ডালাটা খুলে ফেললেম। শাড়ীর পাড়টা আলোতে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌তে ওর সুন্দর মুখখানা গেলো খুসীতে ভ'রে। সত্যি, নারীর প্রাণ পূর্ণ হোয়ে ওঠে তৃপ্তিতে,—যদি সে পায় তা'র পরিচ্ছদ, পায় তা'র অলঙ্কার, আর প্রসাধনের সামগ্রী। সে ভালবাসে নিজের রূপকে ফুটিয়ে তুলে তা'র মর্য্যাদা রাখতে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেম,—কি, পছন্দ হ'য়েচে তোমার, না হয় তো, বলো, ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

না, পছন্দ হ'য়েচে।

তবে দেখচি বরাতটা আমার ভালোই। পুরস্কারের দাবী নিশ্চয় ক'র্‌তে পারি!

ওর কর্ণমূল লাল হোয়ে উঠলো। অনীতাকে আর কোনও অবসর না দিয়ে, গলা জড়িয়ে ধ'রে, সাদরে ওকে টেনে নিয়ে এলেম—বুকে। ও ধীরে দিলে ওর লজ্জিত ঠোঁট দু'টী এগিয়ে।—

মেজ দা!—

রেখা ঘরে ঢুকে হেসে অপ্রস্তুত হোয়ে বেরিয়ে গেলো।

আমার বাহুপাশ থেকে চকিতে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে অনীতা স'রে গেলো বিছানার শেষ প্রান্তে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে প'ড়লে। আমিও যে অপ্রতিভ হইনি, তা নয়! তবে পুরুষের লজ্জা! ওর কাছে স'রে গিয়ে ওর বাঁ হাতের চাঁপাকলির মতো কচি আঙুলগুলি নাড়তে-চাড়তে ব'ল্‌লেম,—কি, শুলে যে! রাগ হোল নাকি?

ও মাথা তুলে একটু হেসে বল্‌লে,—আচ্ছা, কি কাণ্ডটা বাধালে তুমি? যাও:—তোমার যদি এতোটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ঠাকুরঝি মনে-মনে কি ভাবলে, বল'তো?

মুখ টিপে বল্‌লেম—কেন, হ'য়েচে কি!

হ'য়েচে কি, তা তুমি জানো না? ন্যাকা কোথাকার—

যাক্‌, শোনো।

কি?

একটু গম্ভীর হোয়ে ব'ল্‌লেম,—লোকে কি দেখলে-না-দেখলো, কি ভাবলে-না-ভাবলো, তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই। তুমি-আমি অন্তরে তৃপ্তি পেলেই হোল। আমি তো পেয়েচি,—তুমি?

বেহায়া! ও হাস্‌তে-হাস্‌তে উঠে চ'লে গেলো।

রেখা ঘরে ঢুকে ব'ল্‌লে,—মেজদা, আমায় ডেকেচো?

হ্যাঁ।

আমার কঠিন মুখ দেখে ওর অন্তরাত্মা বোধ হয় কেঁপে উঠলো। মুখ গেলো শুকিয়ে! মেঝের দিকে চোখ রেখে ভয়ে ভয়ে ব'ল্‌লে,—কেন?

কেন আবার? জিজ্ঞেস্‌ ক'রতে লজ্জা করে না? বাবার কাছে কী লাগিয়েচিস্‌ আমার নামে?

কই, আমি তো কিছু লাগাইনি!

না, লাগাস্নি ? মিথ্যাবাদী কোথাকার !—

ও, মনে প'ড়েচে এবার ! রেখা ম্লান হেসে ব'ল্‌লে,—কা'ল রাত্রে বন্ধুদের অনুরোধে প'ড়ে যে মদ খেয়ে এসেছিলে, সেইটে ব'লেচি, এবং তাইতেই তিনি হয়তো তোমার ওপর এত চ'টে গেচেন !

আপাদমস্তক জ্বলে গেলো আমার। হাতে বেত ছিলো। টেবিলের ওপর সজোরে আঘাত করে বললেম—পাকা মেয়ে ! বাবা তোকে ডেকে জিগ্যেস করেছিলেন, না, তুই নিজে গিয়ে বলেচিস ?

আমি নিজে গিয়ে বলেচি।

কে তোকে বলতে পাঠিয়েছিলো ? তোর বৌদি নিশ্চয় !

না বৌদির এতে কোনো দোষ নেই।

আমি মদ খেয়েচি, তুই ঠিক জানিস ?

চোখে দেখিনি। তবে কাল যখন ঘরে ঢুকছিলে তোমার মুখ থেকে গন্ধ পেয়েছিলাম মদের এবং সারারাত্রি ধরে বৌদিকে যা তা বলে গালাগালিও দিয়েচো !

আমি মদ খেয়েচি, তা'তে তোর কিরে ? ব'লে সপাসপ ওর কাঁধে দিলেম দু'তিন ঘা বসিয়ে। ও কোন মতে উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে গিয়ে বল্‌লে,—খাবে কেন ?

খাবো না, কেনরে ? তোর ভয়ে ভয়ে এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াবো, কেমন ? চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আরো কয় ঘা সজোরে বসিয়ে দিয়ে বাইরে চ'লে এলেম। সঙ্গে-সঙ্গে ওর অস্ফুট আর্ত্তনাদ কানে এলো এবং তার পরেই দ্রুত অনীতা গিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। ও, বোধ হয়, পাশের ঘরেই ছিলো।

বাইরে অনেকক্ষণ অশান্তভাবে পায়চারি ক'রে আবার যখন ফিরে এলাম অনুতপ্ত মন নিয়ে, দেখলাম,—রেখার হাত বেয়ে চ'লেচে রক্তের ধারা, আর, অনীতা ন্যাকড়া ভিজিয়ে-ভিজিয়ে সযত্নে কাঁধের ওপর চেপে ধ'রে রক্ত বন্ধ ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রচে যথাসাধ্য। মুখ ওর উৎকণ্ঠিত, চুলেগুলো ওর বিশৃঙ্খল। রেখা শ্রান্তভাবে শুয়ে আছে ওর কোলে মাথা রেখে।

আমায় দেখে অনীতা কিছুই বল্‌লে না। শুধু জলভরা ব্যথাতুর দু'টী চোখ নিলে ফিরিয়ে।

আলমারি থেকে ওষুধ বের ক'রে রেখার কাটা যায়গাটায় লাগিয়ে দিতে, ও আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লে—ব'সো দাদা, রাগ কোরো না।

আমি একটু হাসলেম। সে তো আমার হাসি নয়—চাপা কান্না।

প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে রেখা সুস্থ হোয়ে উঠে ব'স্‌লে। ব'ল্‌লে,—দেখো দাদা, বৌদিকে দোষী কোরো না যেন। আর একটা কথা—

কি ?

রেখা হেসে উঠে বল্‌লে,—দাদা, আমায় যেমন মার্‌লে, তেমনি এর ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। কা'ল আমাকে ও বৌদিকে সিনেমায় নিয়ে যাবে সঙ্গে ক'রে। কেমন, রাজী তো ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেম।

শেষটায় ফাঁকি দিয়ো না যেন। ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে রেখা বেরিয়ে গেলো।

আমি চোখ তুলে অনীতার দিকে চাইলাম। ওর ম্লান কপোল বেয়ে তখন জল গড়িয়ে প'ড়চে বুকের পর। আমার চোখেও হয়তো বা অলক্ষ্যে জল এসে প'ড়েছিলো !—

পাশাপাশি

গল্প

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাড়ীতে যেন উৎসব লেগে গিয়েছে—চারদিকেই হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ব্যস্ততা। কিন্তু সত্যিই উৎসব কিছু নয়—মনোরমার মেয়ের অসুখ! বড়লোক যারা অসুখের ভেতরেও তাদের আভিজাত্য ফুটে ওঠে—ঝকঝকে গাড়ী করে সহরের বড় বড় ডাক্তার ছুটে আসে, সাহেবী দোকান থেকে দ্বিগুণ দাম দিয়ে দামী ওষুধ আসে, নার্স আসে আরও কত কী।

মনোরমার স্বামী বড় চাকরী করেন। ঐ তাঁদের এক মেয়ে—নাম তার উৎসা। কি জানি কি করে একটু ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ায় প্রথমে হয় তার অল্প সর্দ্দি জ্বর। তারপর ক্রমান্বয়ে দিন সাত জ্বর ছাড়ে না। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তার আসেন। রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি বলেন, এখনও ঠিক কিছু বোঝা গেল না। ঠাণ্ডা লেগে ব্রঙ্কাইটিসের সূত্রপাত হয়েছে বলেই মনে হয়। খুব সাবধানে রাখবেন চারদিকেই খুব নিউমোনিয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, যে মিকসচারটা লিখে দিলাম দু ঘণ্টা অন্তর সেটা দিয়ে আজ সন্ধ্যা নাগাদ আবার আমার কাছে খবর পাঠাবেন।

বত্রিশ টাকা ভিজিট নিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে দামী মোটারে করে তিনি চলে যান।

মনোরমার স্বামী সুরেশ অফিস থেকে এক মাসের ছুটী নিয়ে নিয়েছেন। আরও কিছু ছুটী নেবার ইচ্ছে তাঁর আছে—উৎসা সেরে গেলে তাকে নিয়ে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় চেঞ্জে যাবার জন্যে।

সোফার বাদামী কাগজে মোড়া মিকসচারটা দিয়ে যায়। মেজার গ্লাসে ওষুধ ঢালতে ঢালতে মনোরমা সোফারকে বলেন ছুটো আইস ব্যাগ আর কএকসের বরফ কিনে আনতে।—কি জানি বলা যায় না যদি নিউমোনিয়া হয়, যদি জ্বর বেড়ে যায় হঠাৎ তখন হয়ত মাথায় আইস-ব্যাগ দিতে হবে।

নার্স এসে পড়ে।—ভালো আইসব্যাগ, দামী ওষুধ বরফ কিছুই বাদ যায় না।

সেই ডাক্তারই আবার আসেন—আবার তিনি মিকসচারটা বদলে প্রেসক্রপশান করে দিয়ে যান। বাড়ীর মোটার ওষুধের দোকান আর ডাক্তারের বাড়ী ছুটোছুটি করে। তবুও কারুর দুশ্চিন্তা কমে না—হঠাৎ যদি খারাপের দিকে টার্ন নেয়।

সুরেশদেরই বাগানের মালি—ভজুয়া। বাড়ীর পেছনের দিকটায় একটা ছোট টিনের চালায় সে থাকে তার স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে। গ্রীষ্মের দুপুরে টিনের চালা এত তেতে ওঠে যে তার ভেতরে থাকা যায় না। বর্ষার চালা ফুটো হয়ে বৃষ্টির জলে মেঝে ভেসে যায়, আর শীতকালের রাতে কনকনে ঘরে ছেঁড়া কম্বলের ভেতরে শুয়ে তিনটি প্রাণী কাঁপতে থাকে!

তবুও তাদের চলে যায় এক রকম। কিন্তু মুস্কিল হয় কারুর অসুখ বিসুখ করলেই। সে যা রোজগার করে তাতে মাসের শেষাশেষি ভাতের পাতে হয়ত একটু নুনও জোটে না—দামী ওষুধ ডাক্তারের ভিজিট তারা পাবে কোথা থেকে?

কিন্তু না চললেও হবে কি? অসুখ হয়—অসুখ হয় তাদের ছোট ছেলেটির। শীতের মুখে হিম লাগিয়ে তারও সর্দ্দিজ্বর হয়। কিন্তু তার ওপরেও অনিয়ম করার দরুণ অসুখ যায় বেড়ে।

আজ পাঁচদিন তার জ্বর হয়েছে খুবই বেশী। গত কাল থেকে হুসও নেই বিশেষ কিছু। মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে আবল তাবল কি সব বকে। টাকা নেই—তাই ডাক্তার আসে নি কেউ।—বড় ডাক্তার ত দূরের কথা! পাড়ার এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে ভজুয়া শাদা শাদা কতকগুলো বড়ি এনে ছেলেকে খাইয়েছে। এর চেয়ে বেশী সে কিছু করতে পারে?

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। ভজুয়া বাগানের কায সেরে ঘরে ফিরে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়ে দেয়। ঘরের ভেতরটায় দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অস্পষ্ট আলোতেই! ভজুয়া এসে ছেলের শীয়রে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে শুধু অল্প অল্প ঠোঁট কাঁপিয়ে তার ছেলে কি যেন বলতে চায়, মাঝে মাঝে কিসের ভয়ে সে যেন চমকে চমকে ওঠে।

দরিদ্র পিতা মাতার মুখে কথা ফোটে না। দুজনেই দুজনের অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলে।

মাস খানেক পরের কথা। সুরেশরা চেঞ্জে যাবার জন্তে বাক্স বিছানা বাঁধাবাঁধি সুরে করে দিয়েছেন। দার্জ্জিলিঙ্গে যাবেন তাঁরা ঠিক করেছেন। উৎসায় অসুখ সেরে গিয়েছে—নিউমোনিয়ার দিকে তা আর মোড় বাঁকায় নি।

এদিকে ভজুয়ার ছেলেও সেরে ওঠে ক্রমে ক্রমে। তার বোধ হয় নিউমোনিয়াই হয়েছিল। তাদের দিন চলে যায় সেই জীর্ণ টিনের চালাইতেই।

দু' পরিবারের সন্তানেরাই ওঠে সুস্থ হয়ে। একজন সারে বড় বড় ডাক্তারের দামী দামী ওষুধে আভিজাত্যের মাঝে—আর একজন সেরে ওঠে পিতা মাতার অশ্রুজলের ধারায়!

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ওগো আমার পরাণ প্রিয়
ওগো চিরসাথী,
রাঙ্গা হাতে বাঁশী নিয়ে.
বাজাও সারারাতি।
লুকাবে শ্যাম নিঝুম রাতে,
খেলব আমি তোমার সাথে,
তোমার সুরে পাগল হবে
এই ধরণী মাতি।
শুনব আমি তোমার নূপুর
সারা গগন তলে,
ধরা দিয়ে অ-ধরা গো
যেও নাকো চলে,
পূজব আমি তোমার চরণ,
যে চরণে জীবন মরণ,
নানা রঙের বাছা ফুলে
দিব মালা গাঁথি।

"কেরেন্টিন"

গল্প

এম, ছোনাওর আলী

(১)

সাগর মায়ের ঢেউ বুকে ঠেলে পূর্বাকাশে সূর্য্যি মামা উঠছিলেন ধীরে ধীরে···হিঙ্গুল বরণ গায়ে মেখে। দু চার খানা জলো মেঘ আমার আসে পাশে...ছুটা ছুটী করছিল···হাওয়ায় দুলে।

S.S.Santhia আজ বেলা ১০টার সময় 'সিঙ্গাপুর' পৌছবার কথা, মায় খালাসি থেকে 'ক্রু' পর্য্যন্ত···এমন কি ডেক-পেসেঞ্জারদের মুখে ও হাসি ফুটেছে··· মাটীর মায়ের স্নেহ জড়িত আভাস পেয়ে, চোখে মুখে বিপুল আনন্দ ও তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আর 'কাপ্তেন' সাহেবদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফলে তারা—চিরানন্দ। তাদের কাছে যেমন জল···তেমন স্থল; অসুবিধা কোন খানেই নাই। যত কিছু দুনিয়ার আবর্জ্জনা···আর জঞ্জাল, তা কেবল এই গরীব দেশের হতভাগাদের জন্য। যাক্! আদার বেপারী আমরা জাহাজের খবর নিয়ে লাভ?

একটু বেলা হওয়ার সঙ্গে দূর পাহাড় গুলো চোখের সামনে আস্তে আস্তে বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। জাহাজের সকলেই রেলিং ধরে সাগর পারের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছিল···দুনিয়ার সবুজ রঙ্গ···যা গত ৫।৭ দিন চোখে পড়ে নাই।

কিন্তু আর একটু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে চোখে আবার একটু ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। অস্ফুট শব্দ কানে আসতে লাগল কেরেন্টিন—কেরেন্টিন। কিছু বুঝতে পারলুম না। এই মানুষ জীবনের জীবন দোলার, এই বা সুখের মদিরাবেশে মাতোয়ারা, আবার এক মুহূর্ত্ত, যেতে না যেতেই দুঃখের অতল জলে তলিয়ে যাওয়া. ভেবে চিন্তে চিফ ক্লার্ক কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। বেশ অমায়িক ভদ্রলোক, হেসে বললেন আপনার কি এই প্রথম Sea Voyage? আমি বল্লুম না মশায়, একেবারে ফাষ্ট বলা যায় না. আর একবার রেঙ্গুণ গিয়েছিলুম, তবে সেবার কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রী ছিলুম।

ভদ্রলোকের আর বুঝতে পারলুম আসল কথাটি Quarantine, তার অপভাষা হল কেরেন্টিন. এক দেশের লোক অন্য দেশে গেলে, তাহাদের সঙ্গে কোন না কোন মারাত্মক রোগ বীজাণুও সাথী হয়ে যাবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে! তাই মলয়া গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সাবধান হয়ে ···সহর হইতে পৃথক একটি ছোট Island এর উপর, অনেকটা স্থান কাঁটা-তারে ঘিরে নিয়ে তার মধ্যে কতক গুলো সারি সারি পায়রার খোপের মত কুড়ে ঘর তৈরি করে রেখেছেন...কেরেন্টীন বাসের জন্য। ডেক পেসেঞ্জারদেরই কেবল সেখানে থাকতে হবে···দশ দিন। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথা ত' আগেই বলেছি,··· তাদের সাত খুন মাফ. যত কিছু লাঞ্ছনা তা কেবল এই গরীবদের জন্যই,···কেননা টাকা জিনিষটা যেমন গোল ···তেমন গোল তার সবখানে। মানে···'গোল' এর অভাব হইলেই যত কিছু গোলমাল।

মনটি ঘাবড়ে গেল কথা শুনে, কি করা যায়। আইনের গণ্ডীত পেরুবার জো নাই। তা ছাড়া আবার সামুদ্রিক আইন। এ কয় দিন জলের উপর ভেসে ভেসে মনটা কেমন এক ঘেয়ে হয়ে পড়েছিল, তাই মাটিতে পা দিয়ে হাপ ছাড়ব ভাবছিলুম কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন আর। ভারি বেখাপ্পা হয়ে উঠল মেজাজ। ছন্ন-ছাড়ার মত ঘুরে বেড়ায়ে ও জীবনে সুখ নাই, ধিক্কার এ জীবনে।

হঠাৎ আমার রেলিং এ ধরা দক্ষিণ হস্তের উপর কি যেন একটু চাপ পড়ল অনুভব করলুম চেয়ে দেখি ছায়া।— চোখ মুখে সারা বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে. 'বব' করে কাটা রেশমি চুল গুলো হাওয়ায় আছড়ে পড়ছিলো চারিধারে

টানা টানা ভ্রূ দুটী যেন হাতে আঁকা। মৃদু হেসে বললুম "কি ফায়া, কি হয়েছে।" সে করুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল "বাবু আমাদের নাকি কেরেন্টীনে যেতে হবে, দশ দিন সেথা কি করে থাকব বাবু।" একটু সান্ত্বনার স্বরে বললুম "যখন যেতেই হবে তখন আর ভেবে কি লাভ! তোমার কোন কষ্ট হবে না ফায়া, যাও তোমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নাও"।

এ মেয়েটিকে নিয়ে বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলুম। রেঙ্গুন থেকে সে আসছে, রেঙ্গুনে জাহাজ নঙ্গর করার পর একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে দেখলুম একটী বার্মিজ মেয়ে আমার সিটের পাশে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, সেই থেকেই এক সঙ্গে আস্‌ছি। সব থেকে আমার কাছে এইটিই আশ্চর্য্য ঠেকছিল যে কেমন করে এই মেয়েটি ৬.৭ দিন একটী ইজি চেয়ারে দিন রাত বসে আসছে, দরকার হলে উঠে একটু ঘুরে ফিরে... আবার তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ে।

কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখি নাই, তা যা আমার সঙ্গেই একটু কথা বার্ত্তা বলত, তাও দরকারে ও গরজে পড়ে। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্ত্তি, দিনরাত যেন চিন্তায় বিভোর। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলত, আর অস্পষ্ট উচ্চারণে তা জড়িয়ে আসত তার গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে। বাস্তবিক এ মেয়েটী এই ভয়াবহ সমুদ্র যাত্রাটী আমার কাছে বেশ সহজ করে দিয়েছিল। তার মুখে হাসি খুব কমই দেখেছি, আর যদি দেখেও থাকি তা বিদ্যুৎএর মত ক্ষণিক। তবুও তাকে সুন্দর মেনে নিতে বাধ্য। জানি না প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা তার মুখখানাকে আরও কত সুন্দর করতে পারত, তা চক্ষে দেখি নাই। সে প্রায়ই দু চারটী কথার পর ভাঙ্গা গলায় ভাঙ্গা কথায় বলত "Oh babu, my life very trouble !! very bad luck !" তখন দুই বিন্দু অশ্রু ভেসে উঠত তার চোখে, আর সারা বুক খানা দুলে উঠত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। আমি অবাক হয়ে সাগরের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ঢেউএর তালে তালে চোখ বুলিয়ে ভাবতুম। এর দুঃখ কোনখানে। সবে মাত্র ত কুড়ি, ফুটবে না ঝরবে !!"

বাবু কথাটী সে বোধ হয় রেঙ্গুণেই শিখেছিল, কেন না এই শব্দটী বোধ হয় দুনিয়ার আর কোন জায়গায় নাই, অন্ততঃ আমি ত পাই নাই। সে জাতিতে বর্ম্মী পুরো নাম 'অংফয়া'। আমি কিন্তু তাকে 'ফায়া বলেই ডাকতুম, প্রথম এতে সে বিশেষ আপত্তি করেছিল, সে বলে বার্ম্মিজরা খোদাকে ফায়া বলে। আমি তাকে বুঝালুম, যদি খোদা বলে ডাকলেই খোদা হয়ে যায়, তবে এই 'খোদাবক্স' 'খোদাদাদ' নামধারী ব্যক্তিগুলো সকলই 'খোদা হয়ে উঠত, এটা কুসংস্কারমাত্র। আর অং' আং ইং শব্দগুলো আমার মুখে বড় আসে না সুতরাং কেবল—'ফায়া' বলেই আমি ডাকব। সে মুচকে হেসে জবাব দিয়েছিল একটী ছোট্ট কথায় "বেশ"। প্রথমটা সে আমায় বিশেষ কিছু বলতে চায় নাই, কিন্তু পরে সব বলেছিল, তাঁর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, আজও সে কথাগুলো গোলামির ফাকে ফাকে মনে হয়, আর বুকটী দুলিয়ে দিয়ে যায় তার নির্ম্মম কশাঘাতে।

তা পরে বলছি—

(২)

দূরে আধ মাইল দূরে 'সিঙ্গাপুর'। সাগর পারের বড় বড় কারখানাগুলোর গগনস্পর্শী চিমনির ধূয়া দেখা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে জাহাজের গতি মন্দীভূত হয়ে আসছিল। জানতে পারলুম, জাহাজ বন্দরের এলাকায় এসে পড়েছে, তাই পাইলট্ না আসা পর্য্যন্ত জাহাজ এগুতে পারবে না তাঁদের অধিকারে, কারণ সামুদ্রিক 'কাপ্তেন' 'হারবার' পথে অভিজ্ঞ নহে। একখানা 'মটর বোট' ও দূরে দেখা যাচ্ছিল, মাথায় একখানা লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে, সকলে বলছিল "পায়লট অফিসার আসছে।"

জাহাজের অপর দিকে 'কেরেন্টীনের' ছোট্ট ছোট্ট ঘর গুলো দেখা যাচ্ছিল বিন্দুর মত, এখানে সব ডেক পেসেঞ্জারদের নামতে হবে তল্পিতল্পা নিয়ে কেরেন্টিন বাসের জন্য।

'ফায়া' তার ইজি চেয়ারখানা আগেই গুটিয়ে নিয়েছিল, এখন সুটকেসটী বন্ধ করে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে ও আস্তে আস্তে ডাকলে "হুসেন।" স্থাদন থেকে

সে আমার নাম ধরে ডাকতে শিখেছে, আমার নামটী জানতে অবশ্য তাকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল, এবং আমি নিজে যদিও তাকে নামটী বলি নাই কিন্তু আমার একখানা নভেলের পৃষ্ঠায় তা লেখা ছিল।

আজকে তাকে একটু আনন্দিত দেখলুম, তার পোষাক-পরিচ্ছদের ধরণ ধারণে, একখানা রেশমি 'লুঙ্গি' আর একটী নূতন 'ব্লাউজ' সে পরেছিল আশমানি রঙ্গের ফুল কুঁড়ির মত তার মুখের রঙ মিশায়ে। হাতে একটি ছাতা, আর পায়ে বার্ম্মিজ সেণ্ডেল, বেশ মানিয়েছিল তাকে তার জাতীয় পোষাকে। এ কয় দিনের আলাপে জানতে পেরেছিলুম, সে তার দাদার কাছে সিঙ্গাপুর যাবে। তিনি সেখানে কাষ্টম অফিসে কাজ করেন। দেশে এক মা ছিলেন সম্প্রতি তিনি মারা যাওয়ায় ভাইয়ের কাছে যাচ্ছে।

একটু পরে আমাদের কেরেন্টীন বোট এসে দাঁড়ালে জাহাজের পাশে, নিয়ে যেতে দশ দিনের কারাবাসে, সে এক মহা দুর্ভোগ, না আছে কুলী না আছে জিনিষপত্র নেবার কোন উপায়। সামুদ্রিক আইনে ডেক পেসেঞ্জাররা কুলী-শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত, সুতরাং প্রভুদের মতে তাহাদের অন্য কোন বাহনের দরকার পড়ে না।

কোন রকমে বাক্স বিছানা নিয়ে বোটএ নামা গেল, তার উপর আবার ফায়া একান্ত নিসম্বল নিঃসহায় হয়ে আমার উপর নির্ভর করছে, বাধ্য হয়ে তাকেও কিছু সাহায্য করতে হল। তবে তার জন্য আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয় নাই একটু কেবল ভুগতে হয়েছিল তার ইজি চেয়ারখানা নিয়ে; সুটকেসটী সে নিজেই হাতে উঠায়ে নিয়েছিল।

তারপর দ্বিতীয় পর্ব্ব, সে এক মহা কেলেঙ্কারী। জিনিষ পত্রগুলো খুলে লণ্ড ভণ্ড করে দেখা হল সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করে। দেখলুম, এখানে ও একটু পার্থক্য আছে; কুলী মজুর যারা তাদেরকে বিশেষ যত্ন সহকারে steam দিয়ে শুদ্ধি করা হল। আমাদের কাপড় চোপড় ছিল একটু ভদ্রগোছের তাই সে যাত্রা রক্ষা হল, হাসি পেল এর ভেতরও আবার classified করা হল অর্থাৎ বড় কুলী আর ছোট কুলী।

ফায়াকে নিয়ে আবার এক বিপদ, সকলের কাছেই একটী না একটী কৈফিয়ৎ দিতে হল; মিথ্যার আশ্রয় ও নিতে হয়েছিল দুএকবার, পোড়ারমুখীর আপোড়া মুখ খানাই ছিল এর প্রধান কারণ, বিরক্তিও এসেছিল দুএক বার, মর হতভাগী! মরতে যদি এসেছিস, তবে একা মরতে এলি কেন? আবার মনে হল সাথীই বা পাবে কোথায়। কিন্তু কি ছোট এই মানব জাতির মন,...গায়ে পড়িয়া মানবাত্মাকে এমন অপমানিত করে। নারী ভোগের সামগ্রী না হয়ে কি কন্যা, ভগিনী বা জননীর জাজি হতে পারে না! এই যে কাপুরুষগুলো কুটিল-কটাক্ষে এই নারীটির কোমল বুকে বেদনার বোঝা চাপাইয়া তাহার কচি হৃদয়ে ব্যথা দিতেছে, সেই আক্রোশ-টাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতেছিল জানি না এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের... এই দুঃখী মেয়েটাকে সাহায্য করে।

একজন মাদ্রাজি ডাক্তার আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "এ তোমার কে হয় মিষ্টার!"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললুম "এ আমার এক বন্ধুর বোন হয় মিষ্টার। তাকে তাঁর দাদার কাছে পৌছে দিতে হবে—রেঙ্গুন থেকে আসা হচ্ছে কি না।"

"আপনি বোধ হয় অনেক দিন রেঙ্গুনে ছিলেন, আমার এক বন্ধু রেঙ্গুনে মিউনিসিপালিতে ইঞ্জিনিয়ার, তা... সিঙ্গাপুর কি করেন!" আমি বললুম, সিঙ্গাপুরে কিছু করি না,...তবে আপাততঃ জাপান এর একটী Mining Concern এ যাচ্ছি...টেনিং এ"।

ভদ্রলোকটী বোধ হয় একটু অবাক হলেন, হয়ত বা বিশ্বাস করলেন, নয়ত বা নাই করলেন ... যেমন মরজী, আমার তাতে বয়ে গেল।

একটী করে রুম সবকে দেওয়া হল,...তবে পাঞ্জাবী আর শিখরা পাঁচ সাত জন করেই থাকেন এক এক রুমে যুথ-ভ্রষ্ট হলেত আর ঝগড়া চলে না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা দেখতে ভদ্রগোছের তাই A Class এর ঘর দুখানা অনুগ্রহ করে দেওয়া হল, যাক্, এখানেও বড় কুলীর আর ছোট কুলীর পার্থক্য দেখে সুখী হলুম।

ঘরে ঢুকেই দেখলুম চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘৃত

ইত্যাদি এমন কি হাঁড়ি পর্য্যন্ত মজুত, মনে মনে মলয়া গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিলাম...এ উদারতার জন্য। প্রত্যেক ঘরে এক এক খানা করে খাট ছিল বেশ করে বিছানা পাতা হল তার পর রান্না-বান্নার-পালা...কেননা আজ সমস্ত দিন কফি ছাড়া বোধ হয় কারও পেটে কিছু পড়ে নাই। টাকা জিনিষটা যে কত বড় কাজের তাহা ভুক্তভোগীরাই বিশেষ করে জানেন। আমার মনে হয় যদি 'নরক' বা 'দোজখ, বলে সত্য কোন স্থান থাকে আর সেখানেও কিছু টাকা কোনরূপে নিয়ে যেতে পারা যায়; তবে সে দুর্দ্দান্ত প্রহরীদেরকে ও কিছু ঘুস দিয়ে শাস্তির লাঘব করা বিচিত্র নয়, কেননা দুই টাকা দিব বলতেই যখন একটি হিন্দুস্থানী বাবুচি এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ল তখন এ কথাটি মনে করা অপ্রিয় বা অসত্য হবে না। এহেন যায়গায়, কোথায় মনে করেছিলুম না খেয়ে মরব কিন্তু এক টাকার জোরেই ইহা সম্ভব হয়েছিল।

ফায়া কিন্তু এখানে গোল বাঁধালে সে বলে এখানে এমনিই কোন কাজ কর্ম্ম নাই, সুতরাং বসে বসে কি রকম দিন কাটবে অতএব সে নিজেই রান্না করবে, আর বাবুর্চ্চিটা জল তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদি বাকী কাজ করবে, আমি বললুম, না ফায়া! ও সব তুমি পারবেনা। সে মুখখানা ভার করে বসে পড়ল। বলল আমাকে এতই ঘৃণা কর হুসেন? তার চোখ গুলো জল ভরে আসল। আমি বললুম তুমি রান্না করতে জান না কি ফায়া? সে মুখ খানা ঘুরিয়ে বলল না যত কিছু তোমাদের বাঙ্গালীরাই জানে, আমরা ত না খেয়ে থাকি সুতরাং জানব কোথা থেকে। অগত্যা স্বীকার করতে হল যে সেই রান্না করবে। হাসিমুখে সে রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

(৩)

কোরেণ্টীন কারাবাসের দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল এক দুই করে, প্রথম বেশ একটু ভয় হয়েছিল, কেমন করে এ দশটা দিন কাটবে এই সাগর বুকের ছোট্ট দ্বীপ টুকুতে, কিন্তু কালের প্রলেপ আর ফায়ার সঙ্গ বেশ উপভোগ্য করে তুলেছিল এই নির্জ্জন কারা বাস। ফায়া বেশ রান্না করতে পারে। জিজ্ঞাসা করলুম কোথা থেকে সে এই বাঙ্গালীর পাক শিক্ষা করলে। সে হেসে বলল, আমি আমার এক মাসিমার কাছ থেকে শিখেছি, আর তিনি তোমাদেরই দেশের লোক। আমাদের দেশের মাসিমা এ আবার বলে কি! একটু বিস্মিত হয়ে বললুম, সে আবার কে। একটা দুষ্ট হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠল, ঘাড় নেড়ে বলল, বললামইত মাসিমা, তা আবার কে কি? তুমি বড় বোকা হুসেন। বলে মুখ চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরে জানতে পেরেছিলুম যে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাদের বাড়ীর কাছে ভাড়াটীয়া ছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী তাকে নিজের মেয়ের মত ভাল বাসতেন।

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে ঘরের সামনে, সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা মেঙ্গোষ্টিন (Mangosteen মলয়ার একটী বিখ্যাত ফলের গাছ) গাছের ছায়ায় তাঁর ইজি চেয়ার খানি বিছিয়ে বসে পড়তুম, আর চেয়ে দেখতুম প্রকৃতি মায়ের উদ্দাম লীলা। ফায়াও বসত একখানা আসন পেতে সুতী আর কাঠী নিয়ে হাতে মোজা বা গেঞ্জি বুনতে। ঝির ঝির করে মালয়া মলয় সাগর পারের খবর নিয়ে কানে কানে বলে যেত কত গোপন কথা, আর লজ্জায় তার মুখখানায় ফুটে উঠত লালের আভা। হঠাৎ সে বুনতে বুনতে হাতের কাঠী ফেলে বলত, না হুসেন আর পারিনা। একটা গল্প বল দেখি। আমি হয়ত হাতের বই খানা আর একটু মনযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে বলতুম, আমার সময় নাই ফায়া। তখন সুরু হত তার আব্দার আর অভিমান! বাধ্য হয়েই বলতে হত সব আষাঢ়ে গল্প। কিই বা বলব আর ছাই। ওসব কি আর মনে আছে। সেই ছোট বেলার ঠাকুর দাদার—আর মার ঝুলি গুলোই ঝেড়ে দিতে হয়েছিল তার কাছে। সেই রাক্ষস আর খক্কোস। ভয়ে তাঁর দেহখানি আৎকে উঠত। কখনও বা বলত এসব কি বিদঘুটে গল্প হুসেন, আমার বড্ড ভয় করে। আমি হেসে বলতুম এই দিন দুপুরে ভয় কি তোমার! আর এত সত্যিকারের কথা নয়, গল্প মাত্র। তার পর আবার সেই ঘুমন্ত রাজকন্যা সোনার কাঠী রূপার কাঠী

আনন্দে তাঁর পদ্মের মত ডাগর চক্ষু জড়িয়ে আনত রূপ-কথার রঙ্গিন ভাবাবেশে।

কিন্তু এর মধ্যেও' লক্ষ্য করতুম কি যেন একটী বিষণ্ণতা মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে তাঁর কোমল হৃদয়-খানাকে ব্যথিত করে তুলত। কথা বলতে বলতে অন্য-মনস্ক হয়ে যেন কি ভাবত। হয়ত বা কখন আকাশের দিকে বা সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে কি ভাবত আপন ভোলা হয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে। হয়ত আকাশের মেঘ গুলোকে ছুটো ছুটী করতে দেখে হঠাৎ বলে উঠত ওকি হুসেন! আমি—বলতুম ও মেঘ, এমন ভাবে ছুটা ছুটী করে কেন?—আমি বলতুম প্রিয়তমের সন্ধানে। একটু বিস্মিত হয়ে বলত তাই নাকি! তবে ত ওরা বড় সুখী। আবার খানিক পরে হয়ত সমুদ্রের ঢেউ গুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলত আচ্ছা ওরা কেন এত আছড়ে মরছে। আমি বলতুম প্রিয়তমের বিরহে। তাঁর পাংশু মুখ আর মলিন চোখ দুটী ছল ছল করে উঠত...অশ্রু গোপন করতে উঠে যেত তার ছোট রুমটির ভেতর।

বাস্তবিক, পরীর মত ছোট এই হাল্কা তরুণীটিকে বুঝা আমার দায় হয়েছিল...সব দিকে,...আর সেখানেই ছিল যত ব্যথা।

আজ আমাদের কেরেন্টীন বাসের নবম দিন, কাল আমরা মুক্ত। ফায়াকে বেশ প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছিল আজ সন্ধ্যায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম, ফায়া বললে চল হুসেন, ঐ Durian ডুরিয়ান গাছটার নীচে বসা যাক বেশ যায়গা। আমার যেন আজ কিছু ভাল লাগছিল না কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে বসলুম। পশ্চিমে সূর্য্য এই মাত্র ডুব দিচ্ছিল আর নবমীর চাঁদ লোহিত আভা নিয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে। পায়ের তলায় অশান্ত ঢেউগুলো মুষড়ে পড়ছিল কোন অজানা ব্যথায়, একটী সাঁজের পিদিম দেখা যাচ্ছিল দূরে কোন জেলে বস্তিতে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আমি বল্লুম কাল ত আমরা সিঙ্গাপুর যাব ফায়া! তারপর কে কোথায় ভেসে যাব কাল স্রোতে, অনেক কিছু বলেছি কয়েছি ফায়া, আমায় মাপ কর।

বাদল ভরা চোখ নিয়ে সে আমার দিকে তাকালে, কি করুণ সে চাহনী, আস্তে আস্তে বলল এত যখন করেছ হুসেন, তবে আর একটু কষ্ট স্বীকার করে আমায় দাদার কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে। তুমি ত বলেছিলে সিঙ্গাপুরে মোটে ২৪ দিন থাকবে, তা আমাদের ঘরেই থাকবে কদিন; বোধ হয় হোটেলের চেয়ে খরাপ হবে না, বল থাকবে। বলে আমার হাত খানা চেপে ধরে মুখের দিকে তাকালে।

আমি বললুম, তা কি উচিত ফায়া! তোমার দাদা কি মনে করবেন, আর তা ছাড়া আমাদের এখন দূরে সরে যাওয়াই ভাল।

এক ঝলক রক্ত তার মুখ খানাকে আরক্তিম করে দিল। মাটির দিকে তাকিয়ে বলল তা দূরে ত সরেই যাবে হুসেন, কে কাকে ধরে রাখতে পারে। তবে বলছি কি না হোটেলে তোমার ভারি অসুবিধা হবে। আমার দাদা অবশ্য কিছু মনে করবেন না। সে ত আমারই দাদা, তোমার চেয়ে তাঁকে আমি ভাল জানি। তার পর হঠাৎ এই কাণ্ড জ্ঞান বিবর্জ্জিত বোকা মেয়েটা আমার একখানা হাত চেপে ধরে বলে উঠল আর আপত্তি করোনা লক্ষ্মিটী তোমাকে থাকতেই হবে বলে রাখছি। আমার হাত খানা তখন ভিজে যাচ্ছিল তাঁর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুতে।

এক ঝলক জ্যোৎস্না পড়েছিল তার মুখে আর রেশমি চুলে। ভ্রম হচ্ছিল; আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, চাঁদ কোথায়।

কয় দিন থেকে তাঁকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করব—ভাবছিলাম, তাই সুযোগ পেয়ে বললাম "তোমার ত সব কথা গুলো আমায় রাখতে বাধ্য কর ফায়া। কিন্তু আমার একটা কথা কি রাখবে?"

"কি!" বলে সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, আমি বললুম "তোমার কি দুঃখ! আমায় কি বলবেনা"!". সে যেন একটু দমে গেল বুঝলুম, একটু হেসে হেসে বলল

"আমি বড় দুঃখী! তা তোমাকে—আগেই বলেছি, এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার যে আর নাই হুসেন।"

একটু রাগ হল মনে, বললুম, তা যদি বিশ্বাস না করতে পার তবে বলে দরকার নাই। আমায় মাপ কর তার জন্যে।

এক মিনিট সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল আমার দিকে যদি বা কোন আভাষ পায়, তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে আরম্ভ করল ভাঙ্গা গলায়—

"আমি জানি হুসেন তোমাকে বললে কোন ক্ষতি হবে না—আমার। তবে শুনবার মত এমন কিছু নাই। একটি নিরাশ্রয় নিঃসম্বল দুঃখী মেয়ের ছন্ন ছাড়া জীবনের একটু কণা জীর্ণ ইতিহাস" সে একটু থামল তারপর বলতে লাগল—

পেগু জেলার একটি গণ্ড গ্রামে আমাদের ছোট্ট একখানা কুঁড়েঘর, বাপের মুখ জীবনে দেখি নাই, আর দেখে থাকলেও মনে নাই, শুনেছি আমার তিন মাস বয়সে তিনি মারা যান। সংসারে এক ভাই, অভাবের তাড়নায় ১৪ বৎসর বয়সেই সে বেরিয়ে গেল রোজগারে। সুতরাং বর্ম্মা চুরুট তৈরীকরে ও তা বিক্রি করে মা কোনরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগলেন। আমার বয়স যখন ৫ বছর তখন মা আমাকে স্কুলে দিলেন। দাদা তখন রেঙ্গুনে Custom এ চাকুরি করে, সবে মাত্র বিয়ে করেছে। মাইনে যা পেত, তা দ্বারা নিজেরই কুলিয়ে উঠত না। সুতরাং মাকে তেমন কিছু সাহায্য করতে পারত না, টানা টানিতে আমাদের দিন গুজরান চলত, আজ ৮ মাস মা গেলেন আমাকে ফেলে একা—নিঃসম্বল নিরাশ্রয় করে। দাদাকে চিঠি লিখলুম, দাদা জবাব দিলেন, আমাদের দূর সম্পর্কীয় এক পিসি আছেন 'মান্দালয়ে' তাঁর কাছে গিয়ে কিছু দিন থাকতে। তারপর ২।৪ মাসের মধ্যে ছুটী নিয়ে তিনি দেশে আসবেন ও যাবার সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তাই গেলুম সেখানে থাকতে। বিরাট সংসার তাঁদের। দাসী বাঁদীর মত খাটতে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক মুঠা ভাতের জন্য, অথচ মা বেঁচে থাকতে সে সব কাজ আমাকে একদিনও করতে হয় নাই। তা ছাড়া সব চেয়ে ইওং এর ব্যবহার আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। ইওং আমার পিসির ছেলে, সংসারে যত কিছু কু-কাজ আর দোষ আছে ভগবান দয়া করে তার উপরেই ঢেলে দিয়েছিলেন সব উজাড় করে তার ভাণ্ডার। পথে ঘাটে বা বাড়ীতে একা পেলেই কেবল কুৎসিত ও অকথ্য কথা বলত। আমি তাকে একদিন বুঝিয়ে বললুম দেখ ইওং, সংসারে আমার কেউ নাই। তাই তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি, আমাকে এরূপ অত্যাচার করে লাভ কি তোমার! সে কৃত্রিম হেসে বলল, আমি যে তোমায় ভালবাসি ফায়া। আমি তোমায় বিয়ে করব। তারপর হি হি করে হাসতে লাগল। ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে, আমার পিলা ভয়ে কেঁপে উঠল তার কথা শুনে।

এ বলে সে একটু থামলে, তারপর চোখ মুছে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগল তুমি ত জাননা হুসেন, আমাদের সমাজের রীতি নীতি—এমন বিশ্রী নিয়ম কানুন বোধ হয় আর কোথাও নাই. সুতরাং ভয় হবারই কথা। সে দিন রবিবার, মান্দালয় হাট করে বাড়ী ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল, ঘরের কাজ শেষ করে যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। কি বিদঘুটে অন্ধকার করেছিল সেদিন দু এক ফোটা করে বৃষ্টি ও পড়ছিল টুপটাপ করে। বাড়ীর আধ মাইল দূরে একটা জঙ্গলাবৃত স্থানের মধ্যে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয়, তাই একটু তাড়াতাড়ি চললুম। গা ছম ছম করছিল ভয়ে, অর্দ্ধেক রাস্তা বোধ হয় গিয়েছি, এমন সময় দেখি মাতালের মত টলে টলে ইওং আসছে. বুঝতে পারলুম পাঁড় মাতাল ভয়ে গা শিউরে উঠল। আমায় দেখে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল এই যে, ফা ফায়া আ. আমি যে যে, তো তোমার জন্যেই ব বসে আ ছি। আরও কত বিশ্রী কথা জড়িয়ে আসছিল মদের নেশায়! সামনে এসেই আমার হাত ধরল আমি মিনতি করে বললুম ইওং! এমন ভাবে আমায় অত্যাচার করনা, তোমার ও মা বোন আছে, আমাকে অন্ততঃ তোমার ছোট বোন মনে করেও কি এ অপমান থেকে রেহাই দিতে পারনা। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, আমার হাত ধরে সে টানা হেঁচড়া করতে আরম্ভ

করল, আমি কি করে পারব অতবড় মোষের সঙ্গে—তাই হাত ছাড়াতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেলুম নিকটস্থ একটা আধ কাটা গাছের গোড়ার উপর, একটু ব্যথা পেলুম, চেয়ে দেখি ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে আমার হাঁটুর নীচে; কতকটা যায়গা কেটে, আর সহ্য করতে পারলুমনা, উত্তেজনায় শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠছিল, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, আমাদের বার্ম্মিজদের সুপারি কাটবার জন্য বা অন্য যে কোনও কারণে হউক, একখানা করে ছুরী প্রায় সব সময়ই সঙ্গে থাকে, বসিয়ে দিলুম মাতালটার বুকে সে এলিয়ে পড়ল মাটিতে।

এই বলে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল, তার পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার বলতে লাগল, তখন বুঝি নাই হুসেন—উত্তেজনার বশীভূত হয়ে কত বড় ভুল করেছি, তার বুকে ছুরি না দিয়ে নিজের বুকেই বসান উচিত ছিল. সব আপদ চুকে যেত কিন্তু তখন কি এসব তলিয়ে দেখবার সময় ছিল। দেখত হতভাগার কাণ্ড! এই বলে লুঙ্গিখানা একটুখানি হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়ে ধরল। চেয়ে দেখলুম গভীর ক্ষত. এক টুকরা মাংস যেন কোন ভোঁতা জিনিষে চেঁছে নিয়েছে; নিটোল পাখানায় বেশ একটু খুঁৎ রেখে। টপ টপ করে তার চোখের জল পড়ছিল ঝরে।

আকাশ বাতাস তখন নিস্তব্ধ. এক মস্ত মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিয়েছিল। ঢেউগুলো আর তেমন আছড়ে মরছে না, পায়ের তলায়। সকলেই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে ঝিম ঝিম করছিল, এই সর্ব্বহারা বালিকার দুঃখের ব্যথায়।

জানি না কেন যে একটু আমোদ করবার ইচ্ছা এ সময় হল। বললুম আচ্ছা ফায়া! তখন ত তোমার নিজের দেশ, ঘাট মাঠ ছিল বলেই এতটুকু সাহস করতে পেরেছিলে একজনের বুকে ছুরি বসাতে। এখন ত তোমার কেউ নাই, সম্পূর্ণ নিঃসহায়। ধর যদি আমিই ইওংএর মত ব্যবহার করতে চাই তবে কি করতে পার?

সে চমকে উঠে দুহাত পিছিয়ে গেল, যেমন সাপ দেখলে লোক আৎকে উঠে, এক পলক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আর্ত্তস্বরে বলে উঠল "তুমি! তুমি হুসেন!! না তোমার মুখ চোখ ত তা বলছে না। না না, তুমি তা পারবে না, আর তাই যদি হয় তোমার পায়ের তলার সাগর বুকেও কি আমার একটু জায়গা হবে না? মুখ গুঁজে সে মাটিতে পরে গেল।

মনে পরিতাপ আসল নিজের আহম্মকি নিয়ে, আস্তে আস্তে তাকে টেনে উঠালুম। দুই গণ্ড বেয়ে তার চোখের জল পড়ছিল, রুমাল দিয়ে মুখ মুছায়ে বললুম আমায় মাফ কর ফায়া! না বুঝে তোমার মনে আঘাত করলুম।

অনেকক্ষণ দুজনই চুপচাপ, তারপর সে নিজেই কথা বলল, এখন ও'ত শেষ হয় নাই হুসেন শেষ পাতাটি বাকি আছে! তারপর ইওংএর দিকে একবার চেয়ে ও দেখবার ইচ্ছা হল না. চলে এলুম সোজা ষ্টেশনে ও একখানা টিকেট কিনে আসলুম রেঙ্গুন, সেখানে আমার দাদার এক বন্ধু কাষ্টমএ চাকুরি করতেন, তার বাসায় এসে উঠলুম; এবং তার পত্নীর কাছে বলে কয়ে আমার ১টা নেকলেশ ও মায়ের দেওয়া একটা চুণীর আংটী রেখে দু'শ টাকা ধার নিলুম। তারপর দিনই জাহাজ ছিল টিকেট কিনে জাহাজে উঠে বসলুম, সমুদ্র পাড়ি দিতে জানি না বরাতে আরও কত আছে।

সে থামল হাঁ করে চেয়ে থাকলুম তার দিকে, একটা আর কথাও মুখে জগাল না তাঁর এই বুক-চেরা কাহিনী শুনে।

(৪)

সিঙ্গাপুর গিয়ে চারদিন ছিলুম। এবং তারি দাদার ঘরেই থাকতে হয়েছিল; পারলুম না তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা এড়িয়ে যেতে। ফায়ার দাদা বেশ লোক, গোল গাল মুখখানায় হাসি লেগেই আছে; এবং তার পত্নীটী ও ঠিক তদ্রূপ, তা ছাড়া লিসি লিজি তার মেয়েদুটি তাদের ত কথাই নাই! এমনি করেই তাঁরা আমাকে আপন করে নিয়েছিল।

একদিন তাঁর দাদা বললেন, হুসেন ফায়ার কাছে সব শুনলুম, তুমি আমার ভাই এর কাজ করেছ, আমার নিজের যদি ভাই থকত তবে সেও বোধ হয় ফায়ার বিপদে এরকম সাহায্য নিশ্চয় করত। আজ থেকে তুমি

আমার ভাই। চেয়ে দেখলুম একটা বিরাট আনন্দ তার প্রশান্ত মুখখানা ছেয়ে ফেলেছে।

এজেন্ট অফিসে গিয়ে দেখা করতেই তাঁরা আমাকে তাদের বোর্ণীয় Borneo স্থিত Mining Field এ জয়েন করতে আদেশ দিলেন। পরশু ষ্টিমার তাই তাড়াতাড়ি এসে সব গুছিয়ে নিলুম।

ষ্টিমার ঘাটে ফায়া তার দাদা বৌদি লিসি ও লিজি সবই উপস্থিত ছিলেন। ফায়ার দিকে সেই সন্ধিক্ষণে চেয়ে দেখতে ও সাহস পাই নাই, তার ফ্যাকাশে মুখ আর জবাফুলের মত চোখ অনেক কিছু আমাকে বলে দিয়েছিল।

জাহাজের সিঁড়ি তোলা হচ্ছে, সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, লিসি ও লিজিকে চুমা খেয়ে গেলুম ফায়ার কাছে বিদায় নিতে। সে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভাষা নির্ব্বাক হয়ে আসল; কিছু খুঁজে পেলুম না বলবার বললুম তা এখন চললুম ফায়া, চিঠি পত্র লিখবে। একটী কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরুলনা, অস্পষ্ট কি যে বলল; তা ঠোঁটের কোনেই মিলিয়ে গেল; কিন্তু জবাব দিল দুটী সুন্দর চোখের দু ফোটা অশ্রু।

বোর্ণীয় পৌছে ফায়ার চিঠি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পেতুম একখানা। সে কত কথা, জানিনা চাপা মেয়েটী কোথা থেকে শিখল এত কথা, দু বছর পর যখন হঠাৎ দেশের খবর পেয়ে দু মাসের ছুটী নিয়ে চললুম দেশে মাকে দেখতে তখন সকলের আগেই মনে পড়ল ফায়াকে তাড়াতাড়ি জাহাজ আফিসে গিয়ে তাঁকে একখানা 'তার' করলুম।

জাহাজ সিঙ্গাপুর ভিড়তেই দেখলুম ফায়া তাঁর বৌদি ও লিসি লিজি দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের দিকে চেয়ে, তার দাদা আসতে পারেন নাই তিনি তখন আফিসে।

ফায়া বেশ মোটা সোটা হয়েছে তাঁর যৌবনে বসন্তের হিল্লোল দিচ্ছিল। যখন জিনিষ পত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করা হল তখন বললুম আসল কথা, সকলেই মুষড়ে পড়ল কিন্তু ফায়া একটু বেশি, তার আনন্দ মাখা মুখখানায় কে যেন এক চোপ কালী মিশিয়ে দিল দেখতে দেখতে, কাছে গিয়ে বল্লুম এমন করছ কেন ফায়া দু মাস পর ত ফিরে আসছি আবার।

আজ যেন এ মেয়েটীর ঘাড়ে ভূত চেপেছে ছোট মেয়ের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল সকলকে অবাক করে দিয়ে, মহা ফাঁফরে পড়লুম! অনেক করে বলে কয়ে শান্ত করলুম।

জাহাজের শেষ ঘণ্টা বাজল—সকলের চক্ষেই জল, ফায়ার যেন আজ কি হয়েছে, এ লাজুক মেয়েটী যেন আজ কেমনতর হয়ে পড়েছে। সকলেই সামনেই দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে বলে উঠল হুসেন! আমার মন বলছে, তুমি আর আসবেনা। কিন্তু ফায়া তোমার পথই চেয়ে থাকবে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

মুখে বেশ তৃপ্তির ছায়া, বুঝতে পারলুম না এ মেয়েটীকে শেষ পর্য্যন্ত।

দেশে এসেছি, মা বর্ত্তমানে ভাল। এক দুই করে দু বছর আজ হয়ে গিয়েছে।

এখনও ফায়া ভুলে নাই, প্রত্যেক মেইলে এ তার এক খানা চিঠি পাই, কত কিছু লিখে সে এখনও বলতে বুকে বাজে।

সে না হয় আর এক দিন বলব।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা

কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজার প্রাপ্য কর অত্যন্ত স্বল্প ছিল ও বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করা হইতনা।

হর্ষবর্দ্ধন তাহার জীবনের প্রারম্ভে হিন্দু শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও জীবন সন্ধ্যায় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান হইয়া পড়েন।—তিনি ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচনায় দেখা যায় যে হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি হইলেও রাজকার্য্য পরিচালনে তিনি কাহারো প্রতি তেমন আস্থাবান ছিলেন না এবং নিজ ক্ষমতার উপরই একমাত্র নির্ভর করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার ও সম্রাট আলমগীরের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে সে স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর বিশ্বাসহীনতাতেই তাঁহার রাজ্যের শাসন-নীতি মধ্যে এতো বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইত কিনা। আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নীতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। সেটী এই যে সত্ত্ব গুণান্বিত চিত্ত লইয়া কখনো রজঃ গুণের কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় না। সত্ত্ব গুণের উৎকর্ষ যদি জীবনে সাধন করিতে হয় তবে তাহার রজঃগুণান্বিত কার্য্যাবলী একেবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই ঐতিহাসিক সত্য পৌরাণিক যুগেও যেমন প্রযোজ্য দেখিতে পাই যথা হরিশ্চন্দ্র, রাজা নল, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, ঐতিহাসিক যুগেও উহার কোন অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণ স্থলে আলোচ্য উপাখ্যানের কথাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজ নীতিতে তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

তস্মাত্বমুর্ত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব।
জিত্বা শত্রুং ভুংক্ষ্ব রাজ্যম সমৃদ্ধম।
ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্ব্বমেব।
নিমিত্ত মাত্রম্ ভব সব্যসাচিন॥

তিনি কখনো বলেন নাই রাজ্য জয় করিয়া ডোর কৌপীন পরিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় গায়ে ভস্ম মাখিয়া বসিয়া থাক। অবশ্য সত্ত্ব গুণেরই গুণ কীর্ত্তন বিশেষ ভাবে করিয়াছেন কিন্তু তা বলিয়া একক্ষেত্রের ব্যক্তিকে অপর ক্ষেত্রের গুণানুশীলন করিতে কখনো উপদেশ দেন নাই। তাই বুঝি তিনি গীতায় বলিয়া গিয়াছেন স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়োঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ। অনেকে এই স্বধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন পুরুষানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম। ঐরূপ ব্যাখ্যার সারবত্তা আমার হৃদয়ে স্পর্শ করেনা। আমার মনে হয় এই স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষেত্রপোযোগী ধর্ম্ম। এবং পরধর্ম্ম অর্থে এখানে পরগুণান্বিত ধর্ম্ম। তাই বুঝি দেখিতে পাই চাণক্য মন্ত্রীত্ব করিলেন, রাজত্ব করিলেন চন্দ্রগুপ্ত। বিসমার্ক মন্ত্রীত্ব করিলেন সাম্রাজ্য পরিচালনা করিলেন কাইসার। সত্ত্ব গুণানুশীলনে মস্তিষ্কের ক্রিয়া হয়তো প্রকৃষ্টতর হইতে পারে কিন্তু রাজাকে রজঃ গুণানুসরণই করিতে হইবে। তাই বুঝি শিবাজীর গুরুদেব রামদাসস্বামী শিবাজীকে স্বীয় গৈরিক উত্তরীয় মহারাষ্ট্রের পতাকা স্বরূপ প্রদানকালীন উপদেশ দিয়াছিলেন—বৎস আমি সন্ন্যাসী। রাজ্য ভার গ্রহণ আমার শোভা পায়না। তুমি ছত্রপতিরূপে সিংহাসনে উপবেশন কর। তখন শিবাজি প্রত্যুত্তরে গুরুদেবকে কহিয়াছিলেন গুরুদেব! আমি যখন সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি তখন আমার আর রাজ বেশ ভূষার প্রয়োজন কি! রামদাস স্বামী উত্তরে কহিলেন বৎস! যতকাল তুমি সিংহাসনে উপবেশন করিবে ততকাল রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত তোমাকে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। এবং প্রজা সাধারণের ভক্তি আকর্ষণের জন্য জাঁকজমক পূর্ণ রাজ পরিচ্ছদও পরিধান করিতে হইবে।

অবশ্য আমরা হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস অনুসরণে দেখি-

তেছি তিনি পূর্ব্ব হইতে রাজ্যকামী ছিলেন না। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যেনো এক সন্ন্যাসীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে হইল কি সাত্বিক সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে ভারতে এক রাজসিক সন্ন্যাসী ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যদি হর্ষবর্দ্ধন দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত না হইয়া ভারতের চতুস্পার্শ্বস্থ লোলুপ রাজগণের ভারত লালসার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ভিত্তি সুদৃঢ় করণে মন সংযোগ করিতেন তবে হয়তো আজ ভারতের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত।

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়া কোন ফল নাই, তবে ইহা সুনিশ্চিত ক্ষেত্রোপযোগী ধর্ম্ম অনুশীলন না করিলে ধর্ম্মানুশীলনও সময় সময় অধর্ম্মানুসরণের ন্যায় ফলদায়ী হইয়া পড়ে।

সম্রাট আলমগীরের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ইসলাম ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহার সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, ফলে হইল কি তাহার গোঁড়ামির ফলে চতুস্পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গ ও রাজ কর্ম্মচারী বর্গ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন তাহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

ভারতের উপস্থিত আমাদের দেশীয় রাজনীতিক্ষেত্রও যে একেবারে এ দোষে দুষ্ট নহে একথা কেমন করিয়া বলিব? তবে এ যুগের মাপকাঠি হইতেছে স্বার্থ, কাজেই স্বার্থের মাপকাঠিতে যেটা আবশ্যক সেটাই গৃহীত হইতেছে। ভারতের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় মাথা ঘামাইবার মত অবসর কাহার আছে? ভারতবাসীর অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিতেছে।

উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় হর্ষবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করায় পুনরায় ভারতে হর্ষ পরিত্যক্ত সিংহাসন লইয়া এক বিপ্লবের সূচনা হয়। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর অভাব হইলে গৃহে যেমন স্ত্রীনায়ক শিশু নায়ক বা ভৃত্য নায়ক হইলে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার সূচনা হয় ঠিক সেইরূপ এইস্থানে হর্ষের অন্তর্ধানের পর ভৃত্য নায়কের আবির্ভাব ঘটিল। মহারাজ হর্ষের এক অমাত্য, ইতিহাসে তাহার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়নৎ, হর্ষপরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীন দেশীয় একজন রাজদূত ৩০ জন রক্ষীসহ ভারতবাসী চৈনিকদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজধানীতে বসবাস করিতেছিলেন এবং রাজ সভায়ও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। অধুনা যেমন নানা দেশীয় কনসাল জেনারেলগণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য বসবাস করিতেছেন। সেইরূপ বৈদেশিক রাজদূতগণের ভারতের রাজসভায় উপস্থিতি ও ভারতে বসবাসের রীতির উল্লেখ আর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। এই রাজদূতের নাম ওয়াঙ্গ হিউয়েন সি।

অমাত্য কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন অধিরোহণ চৈনিক রাজদূত কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। তৎকারণে সিংহাসন অধিকারী অমাত্য চৈনিক রাজদূত ও তাঁহার দেহরক্ষীগণকে আক্রমণ করেন। ও তাহার ফলে দেহরক্ষীগণ মধ্যে কতক বন্দী হয়, কতক নিহত হয়। হত ও বন্দী অবশিষ্ট দেহরক্ষী সম্ভবতঃ ২।১ জন লইয়া চৈনিক রাজদূত কোনক্রমে পলায়ন করিয়া তখনকার তিব্বতের করদরাজ্য নেপালে যাইয়া উপনীত হন। তিব্বত রাজ সুবিখ্যাত স্রঙ্গসান গাম্পা চৈনিক সম্রাটের জামাতা ছিলেন। তিব্বত রাজ শ্বশুরের দূতের অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিব্বতীয় ও নেপালী সৈন্য বাহিনী সজ্জিত করিয়া চৈনিক রাজদূতের অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ কনৌজ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। তিব্বত রাজ প্রেরিত সৈন্য বাহিনী ত্রিহুত-পথে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে অবতরণ করিয়াই তাহারা ত্রিহুত নগরী প্রথমে ধ্বংস করে ও তৎপরে কনৌজের সিংহাসনগ্রাহী অমাত্যকে সপরিবারে বন্দী করিয়া চৈনিক রাজদূতের অবমাননার প্রতিশোধ লয়। বন্দীকৃত রাজ অমাত্যকে সপরিবারে চীনদেশে লইয়া যাওয়া হয়। ইতিহাসে উল্লেখ আছে চীনদেশে পৌঁছিয়াই অমাত্যের মৃত্যু ঘটে কিন্তু তাহার পরিবারবর্গের কি অবস্থা ঘটিল তাহার কোন উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই যুদ্ধের পর হইতে ৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিহুত তিব্বতের অধীনে থাকে।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অন্তর্ধানের পর ভারতে পুনরায়

৩য় ও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের স্থায় এক মেঘাচ্ছন্ন যুগ আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইতিহাসকারগণ উল্লেখ করেন। ঐ সময়ে ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ লইয়া আবির্ভূত হয়। কারণ প্রবল শক্তিশালী সম্রাট বা Paramount power এর অভাব ভারতে সেই সময়ে ঘটে—। ঐ যুগে দৈব উৎপাত ও বড় কম ভারতেকে প্রপীড়িত করে নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রভৃতির আবির্ভাব ও ঐ যুগে দেখা যায়। তৎসঙ্গে আসিল অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার ও অবিচার। কাজেই ঐ যুগে ভারতের অন্যতম মহানিশার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ হর্ষের স্বর্গারোহণের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চালুক্যরাজ পুলকেশী কাঞ্চীর পল্লবরাজ (অধুনা কাঞ্জিভরম) নরসিংহ বর্ম্মন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। অবশ্য ইহাও এস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক, চালুক্যগণ কাঞ্চীরাজ্যের অপমানের প্রতিশোধ দিতে বিস্মৃত হন নাই তাহার বিবরণ চালুক্য সম্রাট বিক্রমাদিত্যের যুগের ইতিহাস আলোচনা সময়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

রাজাপুলকেশীর মৃত্যুর পর কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন এবং দাক্ষিণাত্যে এক সুদূর রাজত্ব স্থাপন করতঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

তিব্বত রাজ কর্ত্তৃক বন্দী অমাত্যকে চীনদেশে গৃহীত হইবার পর যশোবর্ম্মন নামে এক রাজা কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশের গৌড়াধিপতিকে হত্যা করিয়া গৌড় জয় করেন। এবং মগধরাজকেও পরাজিত করেন। তাহার সময় চীনরাজ সভায় তাহার দূত উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহার সময় রাজনৈতিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। তবে দেখা যায় তিনি ও হর্ষবর্দ্ধন ও যশোধর্ম্মন বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সভায় ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজ সভাপণ্ডিত ছিলেন। বাক্‌পতিরাজ গৌড়বাহা অথবা গৌড়বধ নামীয় একখানি কাব্য লিখিয়া তাহাতে যশোধর্ম্মনের গৌড়বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যশোবর্ম্মন চীন রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় এ দূত তিনি তাহার ভারতীয় শত্রু রাজগণকে নিগৃহীত করার উদ্দেশে সেনা সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনরাজ সেনাবল দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তাহার এ অভিসন্ধির আভাস পাইয়া কাশ্মীরের তদানীন্তন রাজা দিগ্বীজয়ী ললিতাদিত্য কনৌজ আক্রমণ করেন।

কাশ্মীরের কর্কোট বংশোদ্ভূত মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য অষ্টম শতাব্দীতে উত্তরে তুষারগণকে ও তিব্বতের ভোট্টদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি যশোবর্ম্মনের পরাভব। যশোবর্ম্মনের সহিত যুদ্ধ বহুকাল ব্যাপী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। পরে যশোবর্ম্মন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং তদবধি কান্যকুব্জ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কনৌজ জয়ের পর ললিতাদিত্য পূর্ব্বদিকে দিগ্বিজয় উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং মগধ, বঙ্গ, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন। এই সময়ে ইতিহাসে দেখা যায় ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ বিজিত হইয়াছিল এবং তাহারা সিন্ধুদেশ শাসন করিতেছিলেন। অবশ্য যদিও আরব ৭১২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে অর্থাৎ সিন্ধুরাজ দাহিরের সময় হজ্জাজের সেনানায়ক কাশীম পুত্র মহম্মদের পূর্ব্বে কোন ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ভারত জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয় কালে সিন্ধুদেশ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। এবং ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক গুজরাট বিজিত হওয়ার পর সিন্ধুদেশের মুসলমান গণ ও বিজিত হইয়া পলায়ন করেন। এইরূপ দেখা যায়।

এইখানে ললিতাদিত্যের বিজয়ে একটি নূতন পন্থার প্রথম আবির্ভাব প্রথম ভারতভূমে দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে যত রাজা যথায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন তথায়ই তাহারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাদের রাজত্বকে সমৃদ্ধ

করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এমন কি তিব্বত সৈন্য কর্ত্তৃক ত্রিহুত ধ্বংস ও কনৌজ বিধ্বস্ত হইলেও ঐ সময়ে ধনরত্ন ভারত হইতে তিব্বতে বা চীনদেশে বিজয়লব্ধ ধনরত্ন স্বরূপ গৃহীত হওয়ার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়ে প্রথম দেখিতে পাই কনৌজ, মগধ, বঙ্গ, কামরূপ, কলিঙ্গ, মালব, গুজরাট ও সিন্ধু জয় করিয়া তিনি প্রভূত ধনরত্ন তাহার রাজধানী কাশ্মীরে লইয়া যান, এবং ঐ লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য দ্বারা কাশ্মীরের মনোহর নগরাবলী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন এবং দেখিতে দেখিতে নগর বিচিত্র অট্টালিকা ও দেবমন্দির শোভিত উঠে।

কাশ্মীরে ললিতাদিত্যের সময়ে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অদ্যাপিও মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে মোটামুটী অনুমান করা যাইতে পারে যে কি পরিমাণ ধনরত্নাদি ভারত হইতে কাশ্মীরে ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কনৌজের ধনরত্ন লুণ্ঠনে ললিতাদিত্য এতোই প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন যে তদীয় পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য পুনরায় ধনরত্ন লুণ্ঠন আশে কনৌজ আক্রমণ করেন, এবং পুনরায় যথেষ্ট ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান।

আমাদের অনেকের ধারণা যে বৈদেশিকগণ বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতাগণ ভারত বিজিত হইবার পূর্ব্বে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া একরাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে গ্রহণের প্রথা ভারতে ছিল না। এ শ্রেণীর ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিজেতাদিগের অনুষ্ঠিত আচরণাবলীর সমালোচনা কালে কাশ্মীরের ললিতাদিত্যের অনুষ্ঠিত দিগ্বিজয়ের নীতি একটু প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি।

আমরা কেহই প্রকৃত ভারতবাসী নহি। তবুও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, সনাতন বা আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসীত্বের দাবি করি, আমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখি এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় যদি চিন্তাধারাকে ক্রমাগত রাজত্ব পরিবর্ত্তনের, তথা বিভিন্ন বিজেতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রাজনীতির সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবিজেতা যাহারা অধুনা হিন্দুনামে খ্যাত তাহাদের কৃতকর্ম্মের একটু সামঞ্জস্য করণের যদি একটু কষ্ট স্বীকার করি, তবে দেখিব, আমরা যাহারা ইদানিং ভারতবাসী বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করি তাহারাই ভারতের সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের মূলবীজ স্থাপন করিয়াছি। কাজেই অন্য কাহাকেও দোষী করিবার পূর্ব্বে বা অন্য কাহারও স্কন্ধে কুৎসার ভার চাপাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের আচরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অভিজ্ঞতা লাভের পর সমালোচনা পূর্ব্বক যদি নিন্দা বন্দনা করি তবে উহা অধিকতর সমীচীন ও শোভনীয় হইবে। নতুবা কেবল পর ছিদ্রান্বেষণের উদ্দেশে কটূক্তি করিলে তাহা উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবণের ন্যায় আমাদের নিজেদের মস্তকে নিপতিত হইবে।

ইহার পরে রাজপুতগণের অভ্যুত্থান। অতএব এক্ষনে রাজপুতজাতির উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ কি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। পাত্রী নির্ব্বাচন কালে যেমন হিন্দু সমাজ "সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা." এক প্রবচন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ঠিক সেইরূপ ইহার পরবর্ত্তী যুগে. ভারতে যখন যে জাতি তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া রাজ্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন তখনি তিনি তাহাকে রাজপুত নামে খ্যাত করিয়াছেন এবং সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি নাম সংযোগে বংশোৎপত্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ পদ্ধতি অনুসরণের অসদ্ভাব কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানেও দৃষ্ট হয় না। আমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা ইতিহাসে পাইয়াছি তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। এখন সাধারণের বিবেচ্য ইহারা কোন দেববংশ সম্ভূত অথবা কোন দেবতা সশরীরে ভারতে আবির্ভূত হইয়া ইহাদের তাঁহাদের বংশধররূপে রাখিয়া ভারত পবিত্র করিয়া গেলেন।

তবে এই রাজপুত জাতির অভ্যুত্থানই যে ভারতের প্রাচীন যুগের সহিত মধ্যযুগের ইতিহাসমালার সূত্র ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সময়কার ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে বহু বৈদেশিক জাতি ভারতের বিভিন্ন পথে দলে দলে প্রবেশপূর্ব্বক তদানীন্তন ভারতবাসীর হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহণে হিন্দুসমাজের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যান। ইহারাই ক্রমে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে আপনাদের বাসস্থান গঠন করিয়া লয়েন এবং ক্রমে উহাদের মধ্যে কেহ পরাক্রান্ত হইয়া রাজ্যস্থাপনে পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া এক নূতন শ্রেণী-গঠনে ভারতে আপন পরিচয় দেন। ইহারা ছত্রী, ঠাকুর এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণী বলিয়া তদানীন্তন হিন্দু সমাজে আপনাদের স্থান নির্ণয় করেন ঐতিহাসিক Vincent Smith বলেন—

"The term Rajput, as applied to a social group, has no concern with race, meaning descent or relationship by blood. It merely denotes a tribe, clan. sect or caste of warlike habits, the members of which claimed aristocratic rank and were treated by the Brahmans as representing the Kshatriyas of the old books. The huge group of Rajput clan-castes includes people of the most diverse descent. Many of the clans are descended from the foreigners who entered India during the fifth and sixth centuries while many others are desended from indigenous tribes now represented, so far as the majority of their members is concerned, either by semi-Hinduised peoples or by inferior castes.

Probably it would be safe to affirm that all the most distinguished clan-castes of Rajputana or Rajasthan are decended mainly from foreigners, the 'Scythians' of Lod. The upper ranks of the invading hordes of Hunas, Gurjaras, Maitrakos and the rest became Rajput clans, while the lower developed into Hindu castes of less honourable social status such as Gujars, Ahirs, Jats, and others.

Such clan-castes of foreign descent are the proud and chivalrous Sisodias or Guhilots of Mewar, the Parihars, (Pratiharas) the Chaubanas, the Pawars (Pramaras), and the Solankis, otherwise called Chaulukyas or chalukyas.

The Rastrakutas of the Deccan, the Rathors of Rajputana, whose name is only a vernacular form of the same designation ; the Chandels and the Bundelas of Bundelkhand are examples of ennobled indigenous peoples. The Chandels evidently originated from among the Gouds, who again were closely associated with the Bhars. It is impossible to pursue further the subject, which admits of endless illustration.

In ancient times the line of demarcation between the Brahmans and the Kshatriyas, that is to say, between the warrior and the learned and the warrior groups of castes was not sharply defined. It was often crossed, sometimes by change of occupation, and at other times by intermarriage. Ordinarily, the position of the leading Brahman at court was that of minister……when a Brahman succeeded in founding a dynasty, and so definitely taking up Kshatrya work, his descendents were taken up as Kshatryas, and allowed to intermarry freely with established Kshatrya families. It must be remembered that the Brahmans themselves are of very diverse origin, and that many of them, as for instance the Nagar Brahmans, are descended from the learned or priestly class of the foreign hordes. The Maga Brahmans were originally Iranian magi. During the transitional stage, while a Brahman family was passing into the Kshatriya group of castes, it was often known by the composite designation of Brahma Kshatri. Several cases of the application of that term to royal families are recorded, the most promi-

nent being those of the Sisodias of Mewar and the Senas of Bengal.

Rajputs not a race. The Rajputs, as already stated, are not to be regarded as a people originally of one race, bound together by ties of blood descent from a common ancestor. Even within the limits of Rajputana the clans were originally decended from many distinct racial stocks. Such common features as they presented depended similarity of their warlike occupations and social habits. Now, of course, the operation of complicated caste rules concerning intermarriage during many centuries has produced an extensive net work of blood relationship between the clans which have become castes.

These condensed observations may help the student to understand in some measure why the Rajput clans begin to play so prominent a part in Indian history from the eighth century. The Hun invasions and their consequences, as observed in the chapter preceding, broke the chain of historical tradition. Living clan traditions rarely if ever go back beyond the eighth century and few go back as far. The existing clan castes only began to be formed in the sixth century. The Brahmans found their advantage in treating the new aristocracy, whatever its racial origin, as representing the ancient Kshatrya class of the scriptures, and the moral term Raja-Putra or Rajput, meaning kings son or member of a ruling family, or clan came into use as an equivalent of Kshatrya."

ইতিহাস হইতে এতটুকু উদ্ধৃত করার আবশ্যক বিবেচিত হইতনা যদি রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে তাহারা দেব অংশ সম্ভূত এবং তন্নিবন্ধন তাহারা পরম পবিত্র জাতি বলিয়া নিজকে জাহির করিয়া এক বিশেষ স্থান সমাজে দাবী না করিতেন। ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে রাজপুতগণ কতখানি সমাজের নিকট আভিজাত্যের দাবী করিতে পারেন, এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে এই রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজ ভারতে কোন হিসাবে অতখানি উচ্চাসনের প্রত্যাশা করেন তাহাও সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য আমাদের বঙ্গের ঐতিহাসিক নাট্যকারগণ ইহাদিগকে যে অনেকখানি স্বর্গের দিকে ধাপে ধাপে উঠাইয়া দিয়াছেন তাহাও অস্বীকার করা যায়না। এবং তাহাদেরই লিপিকুশলতায় ভারতবাসী অন্ততঃ দেশবাসীর অনেকটা সংস্কারও যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজপুতানা ভ্রমণ করিলে, এবং তন্ন তন্ন করিয়া এই রাজপুত জাতির সর্ব্বসাধারণের সহিত আচার ব্যবহারের আলোচনা করিলে কতখানি যে তাহাদের নাট্যকে সংস্কার মনমধ্যে স্থান পাইবে তাহা যাঁহারা রাজপুতনায় ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

জহর ব্রত যদি রাজপুতের পবিত্রতার চরম আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে অনেক অসভ্য জাতিকেও বীর আখ্যান দিতে হয় এবং পবিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। গ্রীক সম্রাট সেকেন্দর শাহা যখন ভারত বিজয় করিতে আসেন তখন সিন্ধুনদ তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য দেশবাসী গ্রীক ভাষায় বর্ণিত 'Agalassoi' জাতি ভীষণ জহর ব্রত করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। এখানে ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া

"A neighbouring tribe called "Agalassoi by the Greeks, who dared to resist the invader, met with a terrible fate. The inhabitants of one town to the number of 20,000 set fire to their dewellings and cast themselves with their wives & children into the flames——an early and apalling instance of the practice of Jauhar, so often recorded in Muhammaden times"

আফ্রিকার ইতিহাসে এবং ইরাণেও জহর ব্রত অনুষ্ঠানের ইতিহাস পাওয়া যায়। যদি জাতির পবিত্রতার মাপকাঠি জহর ব্রতই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে যে সব জাতি ঐ অনুষ্ঠান রাজপুতদিগের পূর্ব্বেও করিয়াছে

তাহাদিগকে কেনই বা মানিয়া লওয়া হইবে না। বীর্য্যে বা ঔদার্য্যে ভারতের অন্যান্য জাতি যে রাজপুত অপেক্ষা কম বীরত্ব বা ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছে তাহা নহে। জাতির বীরত্ব ও ঔদার্য্যের ইতিহাসের আমি কতক আমার পূর্ব্ববর্ণিত আখ্যায়িকাতেও আলোচনা করিয়াছি। কাজেই এদিকেও যে রাজপুতগণ একটা কিছু অভূতপূর্ব্ব করিয়াছেন তাহা নহে। তবে কোন সর্ত্তে উঁহারা ভারতের নিকট এতোখানি প্রভুত্ব ও সম্মান দাবি করিতে পারেন তাহা আমি এখনো ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

মহামতি টড তাঁহার "রাজস্থানে" রাজপুত জাতির যে মহান গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার বিশ্বাস তিনি ভারতের অন্যান্য জাতির বীরত্বের ইতিহাস, ত্যাগ ও অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর আলোচনা না করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি নিরপেক্ষভাবে ভারতের হিন্দু জাতির আলোচনা করিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় রাজস্থান অন্যরূপে লিখিত হইত, এবং রাজপুত জাতির গৌরবময় আখ্যানগুলি ভারতের অন্যান্য জাতির তুলনায় অতি নগণ্য বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইত।

রাজস্থানের একটী দৃষ্টান্তের এ স্থলে উল্লেখ নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আশা করি। বাপ্পারাও স্বীয় মাতুল কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলেন পরে বাপ্পার যখন রাজ্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল, তখন বাপ্পা স্বীয় মাতুলকে হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলেন। ইহা কি ঔদার্য্যের পরিচয়? অম্বর রাজ জয়সিংহ সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। যখন ঔরঙ্গজেব দারাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন তখন জয়সিংহ দারার সজ্জিত সৈন্য শিবিরে বসিয়া যে পরাজয় দেখিলেন, ইহা কি বিশ্বস্ততার পরিচয়? না রাজপুতের ঔদার্য্যের পরিচয়? যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহ আলমগীরের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন স্বীকৃত হইয়া রণস্থলে আলমগীরের শিবির লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন ইহা কি মহত্ত্বের পরিচয়? এইরূপ কত দৃষ্টান্ত দিব?

আমার আখ্যায়িকায় এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। তাই এস্থলে আর বিশেষ উল্লেখ করিলাম না।—এখানে আমার রাজপুতজাতি সম্বন্ধে মন্তব্যের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম মাত্র। রাজপুত জাতির ইতিহাস আলোচনাকালে আরো বিশদভাবে ইহার আলোচনা করিব। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এই রাজপুত জাতি ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ।

আজ কয়েক মাস অতীত হয় রবিবারের Statesman পত্রিকায় গুজর জাতির এক প্রবন্ধ স্ত্রী পুরুষের চিত্র সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহারা বেদেদিগের ন্যায় গৃহহীন জাতি। ইহারাও নাকি তাহাদের পরিচয় প্রদানকালে রাজপুতানার রাজবংশসম্ভূত বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়া থাকে। অন্ততঃ Statesman পত্রিকায় ইহাই প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব এ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে এবং দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাসকে আর ধারাবাহিকরূপে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই যুগ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে এই যুগকে গভীর তমসাচ্ছন্ন যুগ বলা যায়। এবং ইহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা ইতিহাস অনুসরণ করা যায় তাহাও ছিন্নসূত্রের ন্যায় অসংলগ্ন ও জটিলতাপূর্ণ।

এই যুগকে ভীষণ পরিবর্ত্তনের যুগ (Transitional period) বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহারাজ স্বর্গারোহণের পর হইতে কণোজের আধিপত্য লইয়া বহু যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছে। ভারতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত নরপতিগণ "মহোদয় শ্রী" অর্থাৎ কণোজের রাজৈশ্বর্য্য অর্জ্জন পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। এই নগর বিজয় যে ললিতাদিত্য ও তাঁহার পৌত্র বিনয়াদিত্য কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের স্বর্গারোহণের পর কণোজের গৌরবরবি অস্তমিত তো হইয়াই ছিল, তাহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন না। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসানের সূচনা হয়।

তাই আমি এই আখ্যায়িকার মধ্যে আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি যে ভারতের সর্ব্বনাশ সর্ব্বতোভাবে ভারতের সন্তানগণই ঘটাইয়াছে। ইহার জন্য অন্য আর কাহাকেও দোষী করা চলে না।—

(ক্রমশঃ)

ভারতের ছায়াচিত্র পরিচালকগণ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ

বর্ত্তমানে যাঁহারা ছায়াচিত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা স্বোপার্জ্জিত। ইউরোপে মহাযুদ্ধ-বসানে জগতের অন্যান্য জাতিবৃন্দের সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ছায়াচিত্রে প্রভূতলাভের আশা আছে দেখিয়া উহাকে স্বদেশী শিল্পে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে বোম্বাই যেরূপ উৎসাহ ও প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হয়, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ তাহা করিতে পারে নাই। বোম্বাই সাধারণতঃ দেশীয় ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। বোম্বায়ের ধনীগণ যুদ্ধাবসানে নূতন নূতন ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন। এই জন্য বোম্বায়ে লৌহ-জাহাজ, কাপড় প্রভৃতি শিল্পের ন্যায় ছায়া-চিত্র শিল্পও গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। বাংলায় যাঁহারা সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকেন—তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরাজ, নতুবা ভিন্ন প্রদেশবাসী। বাংলায় খাস বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠান দুই একটা থাকিলেও উহার সংখ্যা যথেষ্ট নহে। বাংলার ধনী সম্প্রদায় জমিদারী তেজারতী ও কোম্পানীর কাগজের সুদ ব্যবসায় যেরূপ বুদ্ধিমত্তার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারেন, ঐরূপ সামর্থ্য, তাঁহারা অন্য ব্যবসায়ে প্রদর্শন করিতে প্রায়ই পারেন না। এই সমস্ত কারণে এবং কতকটা তখনকার মদন কোম্পানীর সর্ব্ব-মুখীন ছায়া-চিত্র ব্যবসায়ের জন্যও, বাংলার ছায়া-চিত্র ব্যবসায় ঠিক যুদ্ধাবসানেই আরম্ভ হয় নাই। বোম্বায়ের আরদেশীর ইরাণী বা চণ্ডুলাল সা পুরাতন লোক। তাঁহারা দেশীয় ছায়া চিত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না।

ছায়া চিত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিলেই কতকগুলি Director বা পরিচালক ছায়া-চিত্র জগতে আসিয়া দেখা দেন। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা এখান হইতেই আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা ছায়া-চিত্র জগতে পরিচালক তাঁহাদের কথাই আলোচনা করিব। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলায় দেবকী বোস ছায়াচিত্র জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার 'অপরাধী' সাধারণকে দেখাইয়া দেয় যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছায়াচিত্র জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার 'চণ্ডীদাস' ও 'পুরণ-ভকত' তাঁহার যশোসূর্য্যকে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যায়। 'রাজরাণী মীরা' এই উন্নত যশ গৌরবের মর্য্যাদা কোন রকমে রক্ষা করে মাত্র। তাহার পর আসে তাঁহার 'সীতা'। ব্যবসার দিক হইতে ছবিটী ফলপ্রসূ না হইলেও উহা বসু মহাশয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে একথা সত্য। তাহার পর দুইখানি চিত্র—After the Earthquake এবং জীবন-নাটক এখনও বাংলায় প্রদর্শিত না হইলেও, যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে বসু মহাশয়ের যশো-সূর্য্য আর সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান নহে।

যাঁহারা ছায়াচিত্র পরিচালক দেবকী বসু মহাশয়ের সব ছবিগুলি বা দুই একখানি দেখিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে তাঁহার ছবিগুলির বিশেষত্ব উহাদের Lyric বা গীতি কবিত্বের আতিশয্য। তাঁহার হিন্দি ছবি সীতায় এই গুণ অতি অধিক মাত্রায় আছে। ছবির মধ্যে Lyricএর সমাবেশ এক অভিনব ব্যাপার এই জন্যই বসু মহাশয় অত্যল্প সময়ের মধ্যে অধিক যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া আজীবন আর্টের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা কতকটা ভারতের বাহিরেও হয়। নীরব কবির ন্যায় কুমার তাঁহার পিতার আনুকূল্যে এবং উৎসাহ নিজেকে গড়িয়া তুলিয়া 'রূপলেখা' ও 'দেবদাসে' যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বমুখীন

এবং যে উন্নতি করিতে তিনি তপস্বীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে গভীর আরাধনা করিয়াছেন, তাহার স্থায়িত্ব কিছুকালের জন্য সুনিশ্চিত। আমাদের এই অনুমান তাহার ভবিষ্যৎ চিত্র 'গৃহদাহে' প্রমাণিত হইবে।

আলোকশিল্পী শ্রীযুত নীতিন বসু মহাশয় 'ভাগ্যচক্রে' পরিচালক হিসাবে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নীতিন বসু মহাশয়কে অনেকেই দেবকী বসুর স্রষ্টা বলিয়া থাকেন। আমরা অবশ্য এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত না থাকিলেও একথা সত্য কুমার বড়ুয়ার ন্যায় নীতিন বাবুও একজন সাধক। চিত্র জগতে যাঁহারা তাঁহার ছবির পর ছবি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে নীতিন বাবু পরিশ্রম ও অধ্যবসারের জলন্ত প্রতীক এবং আমাদের যুবক মণ্ডলীকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে আমাদিগকে আর জন কয়েক বাঙ্গালী পরিচালকের নাম করিতে হইতেছে।

শ্রীযুত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয় ভারতীর আড্ডা হইতেই সুকুমার চারু শিল্পগুলির সহিত পরিচিত হন। পরে কোন বিদেশী ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া এবং শিল্পী চারুরায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত থাকার দরুণ ছায়াচিত্রের কিছু তত্ত্ব তিনি জানিতেন। কিন্তু একথা সত্য যে নিউথিয়েটারে যোগদান না করিলে তাঁহার প্রতি-ভার স্ফুরণ কখনই হইতে পারিতনা। যাঁহারা তাঁহার ইহুদি-কা-লেড়কী এবং ভারত কী বেটী দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের এই কথা সমর্থন করিবেন।

পরিচালক জ্যোতিষ বাবু মদন কোম্পানীতে কার্য্য কালে কিছু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাধা ফিল্মে অবস্থান কালে তিনি সেই সুনাম বজায় রাখিয়াছিলেন মাত্র।

শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ বোম্বায়ে নাম করিলেও বাংলায় তাঁহার শক্তির তেমন বিকাশ ঘটে নাই।

শ্রীযুত চারুরায় পরিচালক না হইয়া ছায়াচিত্রের শিল্প-কলার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় তাঁহার চাঁদ সদাগরে যতই নাম করুন, এখন আর তাঁহার নাম শুনা যাইতেছে না।

শ্রীযুত ফণী বর্ম্মা সবেমাত্র পরিচালক রূপে দেখা দিয়াছেন, শক্তির পরিচয় এখনও তেমন আমরা পাই নাই।

বোম্বায়ের পরিচালকগণের মধ্যে শ্রীযুত শান্তারামই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই অদ্ভুত যাদুকর তাঁহার অসাধারণ যাদু মন্ত্র বলে যে সকল মায়াজাল রচনা করেন তাহার তুলনা প্রায়ই পাওয়া যায়না। চণ্ডুলাল সা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণকারী হিসাবে বিশেষ পরিচিত। শ্রীযুত চৌধুরীর সুনাম থাকিলেও তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ইম্পিরিয়ালের বাহিরে প্রায়ই দেখা যায়না। শ্রীযুক্ত দেশাই জন সাধারণের মনোরঞ্জনকারী চিত্রের স্রষ্টা বলিয়া যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলার শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বাবুও বোম্বায়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই সমস্ত পরিচালকগণের মধ্যে কুমার বড়ুয়া ব্যতীত প্রায় প্রত্যেকেরই শিক্ষা দীক্ষা আমাদের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা আর একটী প্রতিভার সহিত জন সাধারণের পরিচয় করিয়া দিতে চাই। ইনি একজন ইহুদি যুবক। ইঁহার নাম এডউইন মায়ার কিন্তু চিত্র জগতে ইনি এজরা মীর নামে পরিচিত। এজরা মীর কলিকাতা নগরীতে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাত্র ২১ বৎসর বয়সে আমেরিকায় যাত্রা করিয়া তথায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইউনিভার্সাল ছবির প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গল্প লেখক ডিপার্টমেণ্টে ভর্ত্তি করিয়া লন। মীর সাহেব একাদিক্রমে সাত বৎসর আমেরিকায় অবস্থান করিয়া চিত্র ব্যবসায়ের যাবৎ গূঢ়তত্ত্ব গুলি অবগত হইয়া ১৯৩০ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। বোম্বায়ে ইম্পিরিয়াল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া তিনি নূরজাহান নামক একটী অপূর্ব্ব ছবি হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় তুলেন। এই চিত্র পরিচালনার পর তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর তিনি সাগর কোম্পানীর হইয়া **Phantom of the Hills** নামক একখানি চিত্র তুলিয়া বোম্বাই চিত্র জগতে নূতন স্পন্দন আনিয়া দেন। কলিকাতারি অতিকায় মদন কোম্পানী যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত

হয়, তখন এই কৃতী পুরুষকে তথায় নিয়োগ করা হয়। তাঁহার নিয়োগের পর হইতে মদন কোম্পানীতে নূতন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এখানে তিনি দুইখানি হিন্দি ছবি তুলিয়াছেন। তাঁহার রসিদা ও আমার প্রিয়তম ছবি শুধুই যে অনুপম ও অতুলনীয় তাহাই নহে উহাতে নূতন 'টেকনিক্' ও যথেষ্ট আছে। বর্ত্তমানে উক্ত কোম্পানীর হইয়া Regoneration নামক একটী হিন্দি ছবি তিনি তুলিতেছেন। মদন কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে দুই একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ছবি তুলিয়া বাজারে যথেষ্ট অপযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে মিঃ মীরের সাহায্যে একখানি বাংলা ছবি তোলাইয়া তাঁহাদের হৃত যশ উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বিদায়

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সায়াহ্নের রক্ত-রাঙা দিবাকর ধীরে ডুবে যায়,
হে বন্ধু বিদায়!
জীবনের পার হতে যায় যারা মরণের পারে
তারা যেন ইসারায় হাত তুলি ডাকে বারে বারে,
ওরে আয়—আয় চলে আয়,—
হে বন্ধু বিদায়!

আমারে রাখিও মনে নহে মোর অনুরোধ তায়,
হে বন্ধু বিদায়!
স্মৃতি সব মুছে ফেলো, ভুলে যেও, করিওনা শোক,
আমার বরণ লাগি চেয়ে আছে সে আনন্দ লোক,
ঐ তারা ডেকে ডেকে যায়,—
হে বন্ধু বিদায়!

আজি তাই চলিয়াছি—মরণের আঁধার বন্যায়,
হে বন্ধু বিদায়!
নগণ্য ধরার শিশু, কবি আমি নহি কোন দিন,
দিবার ছিলনা কিছু—শুধু হায় করিয়াছি ঋণ,
তোমাদের অসীম ক্ষমায়,
হে বন্ধু বিদায়!

তোমাদের ছেড়ে যেতে গুমরিয়া প্রাণ কাঁদে হায়!
হে বন্ধু বিদায়!
আজি শেষ অনুরোধ—মৃত্যুহীন দেহখানি প্রিয়,
অকূল নদীর জলে ভেলা'পরে ভাসাইয়া দিও,
তৃপ্তিময়ী নীরব সন্ধ্যায়,
হে বন্ধু বিদায়!

সে মোর পরম শান্তি, প্রাণ আর কিছু নাহি চায়,
হে বন্ধু বিদায়
নির্ম্মেঘ আকাশ পথে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে তারা,
তন্দ্রা ঘিরি জোনাকিরা—দূর বনে ডাকিছে ঝিঁঝিরা,
তার মাঝে ভেলা ভেসে যায় যায়,
হে বন্ধু বিদায়!

সুদূরের যাত্রী আমি ভেলা নাচে তরঙ্গের ঘায়,
হে বন্ধু বিদায়!
এ পথের শেষ কোথা, কোন দেশে ভিড়িবে এ-ভেলা?
সাঙ্গ হবে যৌবনের গর্ব্বময় এদেহের খেলা
স্বপ্ন হবে পূর্ণ সত্যতায়
হে বন্ধু বিদায়।

স্বরলিপি

ভজন—তেতালা

মোর অসীম প্রেমের গিরিধারী,
মন্দিরে তব বসি একা সখা
দিবারাতি নাম স্মরি তোমারি।
মানস কমলে গাঁথিয়া হার
কণ্ঠে দুলাব শ্যাম তোমার;
হৃদয়ের মেঘ গলিয়া পড়িয়া
চরণ ধোয়াবে আঁখি বারি।
হৃদয় আসন দিব পাতিয়া,
বাঁশরী বাজায়ে যাবে নাচিয়া;
জীবন মরণ হে চির শরণ
তুমি যে গো চির বেদনা-হারী।

কথা—কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
(সা সা) II জ্ঞা সা জ্ঞা রা | সা ধ্‌ ণ্‌ -া | সা গা মা রগা | মপা মা -া -া I
মোর অ সী ম প্রে | ০ মে র ০ | গি ০ রি ধা০ | ০০ রী ০ ০

মা ধা ধা ধা | -া ধা ধা -া | র্সা সা ণা ধা | -া পমা গা -া I
ম ০ ন্দি রে | ০ ত ব ০ | ব সি এ কা | ০ স০ খা ০

জ্ঞা সা জ্ঞা র্জ্ঞা | সা ধ্‌ ণ্‌ া | সা গা মা রগা | মপা মা -া -া II
দি বা রা তি | ০ না ম ০ | স্ম রি তো মা০ | ০০ রি ০ ০

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩

II মা মা মাধা | -া ধা ণা -া | র্সা র্সা সা র্সা | -া র্সা -া -া I
মা ন স ক | ০ ম লে ০ | গাঁ থি য়া হা | ০ র ০ ০

মা র্সা র্সা ণা | -া ধা ধা -া | না র্সা ণা ধা | -া পমা -া -া I
ক ০ ণ্ঠে তু | ০ লা ব ০ | শ্যা ম তো মা | ০ র ০ ০

র্সা র্মা র্মা র্জ্ঞা -া র্রা র্সা -া | র্সা র্সা ধা র্সা | -া ণা ধা -া I
হৃ দ য়ে র ০ মে ঘ ০ | গ লি য়া প | ০ ড়ি য়া ০

মা গা মা জ্ঞা | রসা ধ্া ণ্া -া | সা গা মা রগা | মপা মা -া -া II
চ র ণ ধো | ০০ য়া বে ০ | আঁ ০ খি ঝা০ | ০০ রি ০ ০

২য় অন্তরা

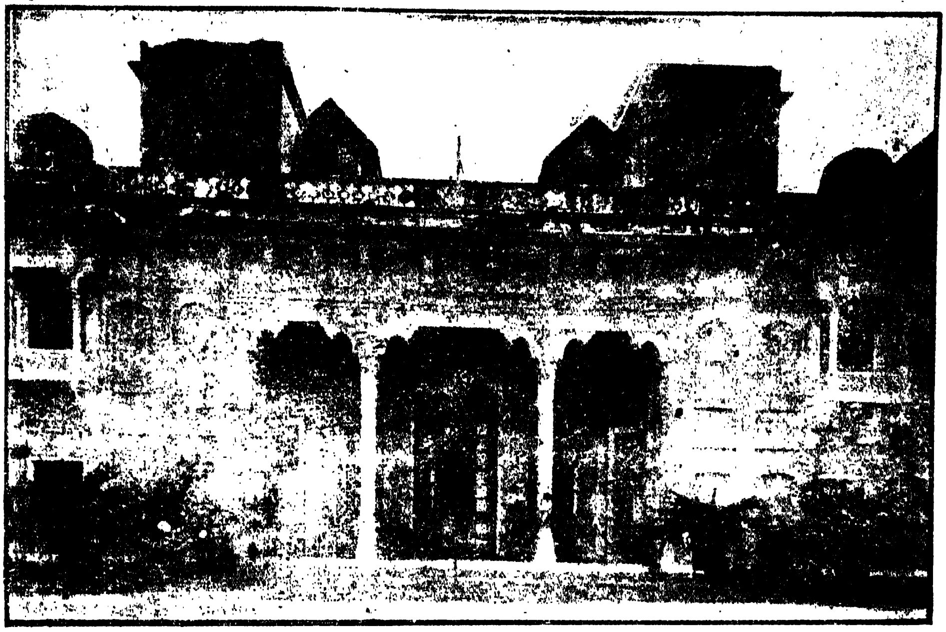
০ | ১ | + | ৩

II মা মা মা র্সা | -া র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা র্সা | -া র্সা -া -া I
হৃ দ য় আ | ০ স ন ০ | দি ব পা তি | ০ য়া ০ ০

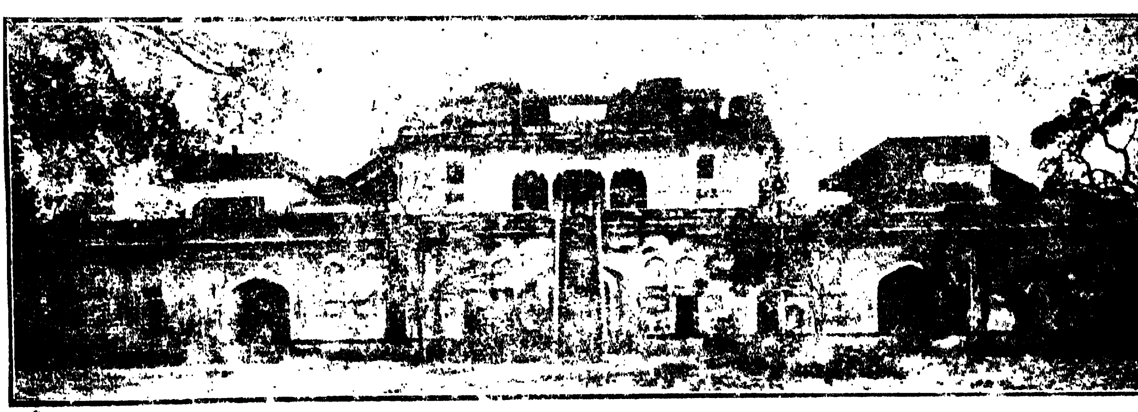
র্সা র্সা র্রা ণসা | র্রজ্ঞা র্রা র্সা -া | সা র্সা ধা র্সা | ণা ধা -া -া I
বাঁ শ রী বা০ | ০০ জা য়ে ০ | যা বে না চি | ০ য়া ০ ০

ধা ধা ধা ধা | ণা ণা ণা -া | মা গা মা জ্ঞা রা সা -া -া I
জী ব ন ম | ০ র ণ ০ | হে চি র শ ০ র ণ ০

সা সা জ্ঞা রা | সা ধ্া ণ্া -া | সা গা মা সগা | মপা মা -া -া II
তু মি যে গো | ০ চি র ০ | বে দ না হা০ | ০০ রী ০ ০



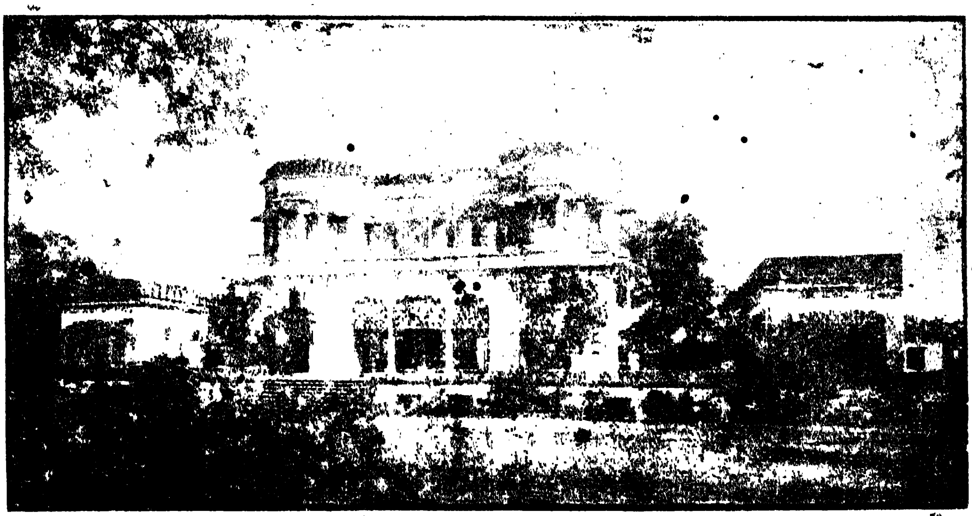
সাহীবাগ প্রাসাদের তৃতীয় স্তর



শাহীবাগ—প্রথমস্তরের উদ্যানের ধ্বংশাবশেষ

"ক্ষুধিত-পাষাণ" রবীন্দ্রনাথের একটী সুপ্রসিদ্ধ ছোট গল্প। বহুপূর্ব্বে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যখন আহমেদাবাদ জেলার জজ ছিলেন, তখন এই শাহীবাগে বাস করিতেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে এইখানে বাস করিয়া "ক্ষুধিত-পাষাণের" ভিত্তি স্থাপিত করেন। সাজাহান যৌবনে যখন গুজরাটের সুবাদার ছিলেন, তখন শাবরমতী নদীতীরে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—তাহারই বর্ত্তমান নাম শাহীবাগ।

"ক্ষুধিত পাষাণে"র মূল



শাহীবাগ প্রাসাদ—দক্ষিণ দিক



শাহীবাগ প্রাসাদ—শাবরমতী নদীগর্ভ হইতে

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রী সুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এস

(চিঠি)

নয়

ভুলি নিকো ওগো বাংলা দেশের তরুণী কমল-বধূ
এতদিন পরে মোর তরে তব হৃদয়ে জেগেছে মধু।
দুজনার মাঝে বহু যোজনের বাধা
কণ্ঠ নাহলে কিসে সুর হবে সাধা।
নাহিক প্রতিমা, অমৃত সরস মদির পরশ নাহি
শুধু নিশিদিন স্বপ্ন গাঁথিয়া কত আর দিন বাহি!
স্বপ্ন পশরা, ওগো নিঠুরা, সেও ত রেখেছ খালি,—
জীবন-পাত্রে শুধু ফুটা আর তালি!

আসিবার কালে যদি লভিতাম শুধু এক ফোঁটা
তোমার আঁখির জল—
গড়িতাম তাহে মায়ার মন্ত্রে প্রেমের তাজ-মহল।
যদি শুনিতাম একটি বিদায় বাণী,
একটু দীরঘ শ্বাস,—
তাই দিয়ে বুক ভরে রাখিতাম রাণী,
সেই হ'ত মোর প্রেমবন্ধন পাশ।

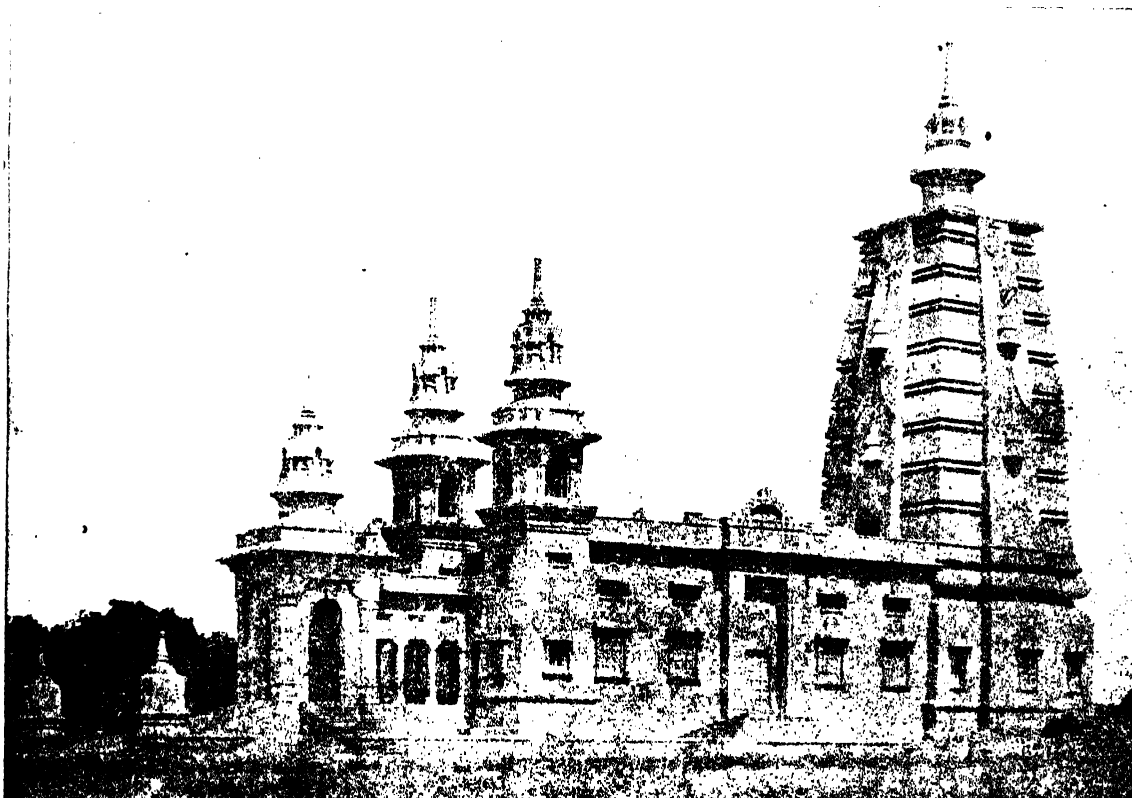
লিখেছ লিপিকা অনেক দিনের শেষে
হয়ত কেবল অনুকম্পার ঘোরে
আজি যদি যাই, নেবে কি গো ভালবেসে,
এত বড় আশা করিব কেমন কোরে?

দেখেছি তোমার কঠিন নীরব বেদনা-মলিন মুখ,
নিজেরে আমার অপরাধী বলে জ্বালায় ভরেছে বুক!
জ্বালাতে পারিনি হৃদয়ে প্রেমের আলো,
আর কাহারেও হয়ত বাসিতে ভালো।

লজ্জা আমার, নিষ্ফলতার গোপন দংশ ক্ষত
বিষের মতন দহিতেছে অবিরত।
ফিরিতে চাহিনা, থাকিতেও নাহি চাহি,
যে-ঝড় আমার মনেতে বহিছে বুঝাবার ভাষা নাহি।

এই চিঠি খানি তোমারে পাঠানু প্রিয়া
বুঝিতে চাহিলে বুঝিও হৃদয় দিয়া।
আর যদি ভাবো এ কেবল কবিয়ানা,
উপেক্ষা কোরো, তাহাতেও নাহি মানা।
যদি ভাবো শুধু করিয়াছি ছেলে-খেলা,
এত কি কঠিন কুটি কুটি করে ইহারে ছিঁড়িয়া ফেলা!





কাশীর নিকটে সারনাথের বৌদ্ধ মন্দির



অরোরা বরিয়ালিস্

যুগের আলোয়

শ্রীকনকলতা ঘোষ

জগতের মেলায় বহু দূর অতীত কাল হইতে কত লোক যে আসা-যাওয়া করিতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এমনি ভাবে কতকাল ধরিয়া যে মানুষের আসা-যাওয়া চলিবে তাহাও একমাত্র তাহাদের সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন আর কেহ জানেনা।

শুনা যায় পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা প্রভৃতি পুণ্য যুগে জগতে শান্তি ছিল, সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল, আর সকল মানুষের অন্তরে ছিল মহত্ত্বের গৌরবপূর্ণ দীপ্তি, অর্থাৎ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব।

কিন্তু হায়! কলিযুগের মানুষ আমরা যাহা শুনিতে পাই তাহা দেখিতে পাইনা। কোথায় শান্তি, কোথায়ই বা সত্যের প্রতিষ্ঠা। এ যুগে আমরা কদাচিৎ কয়েকটী মনুষ্যত্বের মহিমায় পূর্ণ আদর্শ মানুষ দেখিতে পাই, বাদ বাকী অধিকাংশের মধ্যেই দেখি, হিংসা স্বার্থপরতা লোভ ও পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ এক একটী সঙ্কীর্ণচেতা লোক, তাহার মধ্যেই হয়তো কেহ একটু ভাল, কেহ বেশী মন্দ, মিথ্যাকে তাহারা নিতান্ত আপন করিয়া লয়, এবং সত্যকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলে। তাহারা যে মানুষ তাহার প্রমাণ দেয়, ব্যবহারে কূট কৌশল ও বাক্যের মায়াজাল বিস্তার দ্বারা। অর্থাৎ ভাবটা ঠিক যেন 'মানুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন যেমন করিয়া হউক ছলে বলে কৌশলে আপনার স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবেই, বরং অধিকন্তু ন দোষায়। আঠার আনা হইলে আরো ভাল। বন্ধুর দল বাহবা দিবে ও শত্রুদল হিংসায় জ্বলিয়া মরিবে বাঃ এইত চাই!' মনে হয় এই রকম মনোভাব বর্ত্তমান সময়ের লোকেদের মধ্যে অধিকাংশের, অর্থাৎ আমাদের প্রায় সকলেরই। জানিনা ইহা কলিযুগের প্রভাব, অথবা মানুষের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল। কারণ যাহাই হউক, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব দেখিলে মন বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাই এই আলোচনা। সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবের এবম্প্রকার শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে কে জানে? মানুষ দুর্ব্বল, তাহারা বহুযত্নে যাহা গড়িয়া তোলে, তাহার ধ্বংসপ্রায় অবস্থা হইতে দেখিলে ক্ষোভে অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের যিনি স্রষ্টা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং সদা সক্রিয়, ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবকাশ তাঁহার নাই, আবশ্যক ও নাই। হয় তো তাঁহার বড় সাধের সৃষ্টির একটী সুন্দর অংশকে এমনি ভাবে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভাবিত হইতে হইয়াছে, এবং কিরূপে তাহা আবার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ মানুষ কেমন করিয়া আবার ধীরে ধীরে তাহার স্ব-ভাবে ফিরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণের জন্য সবার অলক্ষ্যে বসিয়া, মানুষের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা, চলিবার নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়কে নূতন ও পুরাতনের মধ্যবর্ত্তী বিপ্লবের যুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আলো ও অন্ধকারের, পতন ও উত্থানের সন্ধিস্থলের যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক, এখনকার মানব সমাজের অবস্থা প্রায় সেই প্রকার হইয়াছে। দেখা যাইতেছে; উন্নতি হইয়াছে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়াছে জ্ঞানের। উন্নতি হইতেছে বহির্জগতের শিক্ষাও সভ্যতার অবনতি ঘটিতেছে অন্তর্জগতের ন্যায়পরায়ণতার ও সরলতার। স্বভাব হইতেছে বিলাস অভাব ব্যসন আরাম প্রয়াসী, হইতেছে অর্থের ও সামর্থ্যের। কর্ম্মক্ষম দৃঢ়সঙ্কল্প লোকও এখন কম দেখা যায়, অনভ্যাস ও স্বাস্থ্যের অবনতি ইহার বিশেষ কারণ বলিয়া মনে হয়।

দুইটী বিপরীত ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ বাধা এ জগতে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার মধ্যে শক্তি যাহার বেশী

জয়লাভ তাহার পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জয় পরাজয় নির্ণীত হয় পরে, আগে চলে সংগ্রাম। বিপরীত ভাবে ভাবিত সংগ্রামরত দুইপক্ষ যদি শক্তিশালী হয় তাহা হইলে যে কোনও সংগ্রামই অধিকদিন স্থায়ী হয়, অল্পদিনে মীমাংসা হয় না। পরে যখন দুইদিকের বহু শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়, সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন হয় উভয় পক্ষের মধ্যে হয় সন্ধি আর না হয় বিজয়ীর নিকটে পরাজিত হয় বন্দী, এইরূপে সংগ্রামের শান্তি হয়। বর্তমানে জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জগতের আবহাওয়া সাহায্য করিতেছে অধর্ম্মকে, অর্থাৎ মিথ্যার দিকেই তাঁহারা আনুকূল্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বা দূরদৃষ্টি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা চাহিয়া আছেন দূরের পানে, যতদূরে দৃষ্টি চলে সাগ্রহে চাহিয়া দেখিতেছেন,—বহু দূরাগত একটী অতি সূক্ষ্ম অথচ স্নিগ্ধ সতেজ আলোকরশ্মি, সম্মুখের ঘন অন্ধকার রশি ভেদ করিয়া আসিয়া জগতে আপনার উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সম্মুখের পথ এত বেশী ঘন তমসাবৃত যে বহু দূরাগত আলোকরশ্মির পক্ষে সহসা তাহাকে দূরীভূত করিতে পারা সহজ নহে, হয় তো মানব সমাজের পক্ষে তাহা কল্যাণকরও নহে। সেজন্য, সময়ের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কালের প্রভাবে যেমন ধীরে ধীরে মানুষের মনে মোহান্ধকার আপনার পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তেমনি আবার ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কালের প্রভাবেই তাহাকে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে হইবে নিশ্চয়।

তবে মানুষের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া যে একবার আসিয়া দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে, তাহাকে এখন যাও বলিলেই সে যাইবেনা, এবং শুধু মুখে চাইনা আধুনিকতা বা চাইনা বিজাতীয় সভ্যতা, বলিয়া চীৎকার করিলেও কোনো ফল হইবেনা। মনুষ্যত্বের অপহ্নবকারী সেই মোহকে অজ্ঞানতাকে বিদায় করিতে হইলে, আমাদের সর্ব্বাগ্রে মানসিক শক্তি লাভের জন্য সাধনা করা আবশ্যক। তাহার অভাবেই যে এত দুর্গতি, একথা সকলের পক্ষেই স্মরণ করা ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

জগতে যাহা কিছু আপাতঃ মধুর ও সহজলভ্য বস্তু এবং কার্য্য আছে, দুর্ব্বলচিত্ত লোকের পক্ষে সে সকলের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া চলা সহজ নহে, বোধহয় সম্ভবও নহে।

এখনকার দিনে, নানাকারণে অধিকাংশ লোকের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, দূরদর্শীতা লাভ করিবার ও জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য যে পরিমাণ মানসিক শক্তি থাকা আবশ্যক তাঁহা তাহাদের নাই। সুতরাং দুর্ব্বল চিত্ত অপরিণামদর্শী লোক যাহারা তাহারা যদি ক্ষণিকের সুখ ও আনন্দলাভের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া আপনাদের ধর্ম্মভীরুতা ও বিবেকবুদ্ধিকে হেলায় হারায়, তাহা হইলে ব্যথিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কিছুদিন এমনি হাল্কাভাবের ও বিলাস বাসনার প্রবল স্রোতে আপনাদের ভাসাইয়া দিয়া, হৃদয়ে উন্মত্ত কামনার বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া মরণোন্মুখ পতঙ্গের মত বাহ্য আড়ম্বরের তীব্র ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া চলিবে এ যুগের লোকেরা, (মনে হয় তাহাদের এই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য উদ্দাম গতিরোধ করিবার সাধ্য জগতে কাহারো নাই, এ যেন শেষ দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অন্ধকার গহ্বরের অতল তলে মরিয়া হইয়া নামিয়া যাওয়া।)

তাহার পর কিছুদিন এমনি ভাবে চলিয়া যখন দেখিবে প্রাণের বুভুক্ষা ইহাতে মিটিলনা, অন্তরের অতৃপ্ত বাসনার শান্তি হইলনা, বরং তৃষ্ণা আরো বাড়িয়া উঠিল, তখন বুঝিতে পারিবে নিবৃত্তির শান্তিজল ভিন্ন এ তৃষ্ণা মিটিবার নহে। কিন্তু ফিরিয়া অন্যপথে যাইবার উদ্দেশ্যে পথের বাঁকে আসিয়া দেখিবে, এতদিন ভুলপথ ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে মাকড়সার মত আপনার জালে আপনি এমনি ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্যপথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার মত সামান্য মাত্র ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট নাই। তখন সেই ভীত ও দুর্বল মানব সমাজ আবার আগ্রহে চাহিবে

মুক্তি, শান্তির জন্য প্রাণ তাহাদের হাহাকার করিয়া উঠিবে, এবং আর কোনো উপায় না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে শরণাপন্ন হইবে তাঁহার নিরুপায়ের উপায় যিনি অনন্ত শান্তির অক্ষয় ভাণ্ডার যাঁহার করতলগত।

সেই শুভ মুহূর্ত্তে বিশ্বনিয়ন্তার কৃপা আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহাদের অন্তরের নিভৃত কক্ষ আলোকিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে আধ্যাত্ম জ্ঞানের পবিত্র আলোক, তাহার সাহায্যে পথ চিনিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই সমস্ত মানব সমাজ আবার ভক্তি ও শান্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী হইবে।

যে অধ্যাত্মিকতার পবিত্র মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে শ্রদ্ধেয় মুনি ঋষিরা সাধনাদ্বারা দেবশক্তির অংশ লাভ করিয়া মহাশক্তিশালী হইয়া দিব্য ও ভবিষ্যত দৃষ্টি লাভ করিতে পারিতেন, সেই আধ্যাত্মিকতার দিক্ হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া লইয়া বাহির্মুখী করার ফলেই যে বর্ত্তমান জগতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের এবম্প্রকার শোচনায় অধঃপতন ঘটিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বোধহয় যে কোনো দেশের কোনোও চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক একথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

ইতিমধ্যেই জগতে অশান্তির বাতাস প্রবলবেগে বহিতে সুরু করিয়াছে, দিকে দিকে অতৃপ্তির হা-হুতাশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া খেয়ালের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! ক্রমে যতদিন যাইবে এইসব ব্যাপারের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নাই। তাহার পরে, শান্তির ও পরিতৃপ্তির প্রকৃতি পথ খুঁজিয়া লইবার দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

সময় থাকিতে সাবধান হইবার মত বুদ্ধি যাঁহাদের আছে তাঁহারা, এবং যাহা অন্তঃসারশূন্য তাহার বাহ্যিক জৌলুষে যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, শান্তিলাভের প্রকৃতি পথ যাঁহারা চিনেন ও সে পথে অগ্রসর হইবার মত শক্তি যাঁহাদের আছে. তাঁহারা এই যুগের লোক হইলেও যুগ স্রোতে ভাসিয়া যান নাই এবং যাইবেন না নিশ্চয়। পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে মনোবল ও দৈবপ্রেরণা তাঁহাদের পরম সহায়।

স্বপনের মাঝে আসিলে ফিরে

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

আসি বলে তুমি গিয়েছিলে চলে,
নিশি শেষে তাই, এলে কি ফিরে?
বিদায়ের কালে নয়নেরি জলে,
চির দুখ মাঝে, গিয়াছিলে ফেলে,
(আজি) গোপন বেদনা, মোর, সাড়া দিছে বুঝি।
তোমারি মুক্ত হৃদয়েরি পুরে।
যাতনায় মাখা, সে মুখ তোমার,
ভাসে নিশিদিন, নয়নে আমার,
তাই বুঝি তুমি, হাসিমুখে ওগো,
স্বপনের মাঝে আসিলে ফিরে।

কলঙ্কিনী

হরি দাশগুপ্ত বি, এ

গল্প

সেদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,—নিধু বোসের অবিবাহিতা কন্যা পূর্ণিমা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ণিমাকে সকলেই ভাল বলিয়া জানিত। বারো বছরে পা দিবার পর বাইরের কোন লোক তাহাকে দেখে নাই। তাহার বিধবা মার সংসারে সে দিন দিন বাড়িতেছে। পাড়ার সকল মেয়ের সঙ্গে তাহার ভাব। সে স্কুলে পড়ে নাই সত্য, কিন্তু গৃহকর্ম্মের অবসরে সে অপর মেয়েদের বাড়ী হইতে বই আনিয়া পড়ে। নানা-দেশের খবর সে রাখে। দু'পুর বেলা বসিয়া সে তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে।

তাহার প্রকৃতি বড়ই গম্ভীর। অযথা বাক্যব্যয় সে করেনা। তাই অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে. তাহার সহিত সংযত হইয়া চলে। তাহার চোখে মুখে এক প্রশান্ত জ্যোতিঃ, এক স্বর্গীয় পবিত্রতা তাহার দেহখানিকে আরো উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কোনদিন বিশ্বাস করিতে পারে নাই—পূর্ণিমা অপবিত্রা। তাই এই খবর অনেকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলনা।

বেলা যতই বাড়িতে লাগিল—পূর্ণিমাদের বাড়ীতে ভিড় ততই জমিতে লাগিল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—পূর্ণিমার কোলে এক দেবোপম শিশু,—সে অজস্র চুম্বনে তাহার গাল দু'টি ভরিয়া দিতেছে।

কাহারো সন্দেহ রহিলনা—পূর্ণিমাই এই অবৈধ সন্তানের জননী। জীবনের একটি দিনের ভুলের পরিণাম স্বরূপ হয়তো পূর্ণিমা এই শিশু কোলে পাইয়াছে; কিন্তু তাহার এ কি ব্যবহার? কোথায় সে তাহার জন্য লজ্জিত হইয়া মরিবে, তাহা না করিয়া সে নির্লজ্জের মতো সেই শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে!

সকলেই ভাবিল—প্রদীপের নীচের অন্ধকার আপাত-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ধরা না পড়িলে উহার অস্তিত্বের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেনা। পূর্ণিমা বাইরে সকলের কাছে ভাল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়।

গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যে গুপ্ত প্রণয়ের ফলে সন্তানের অধিকারিণী হইয়াছে, তাহাকে কিছুতেই সমাজে রাখা যায় না। তথাপি গ্রামের মোড়লগন উহার একটা উপায় করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু পূর্ণিমা তাহার ছেলেটাকে ছাড়িতে রাজী হইলনা। সে কহিল, তাহার সেই শিশুকে বুকে করিয়া অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিতেও প্রস্তুত।

পূর্ণিমার বৃদ্ধা মা কন্যার এই ব্যবহারে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই তাঁহার বুদ্ধিতে আসিলনা। সকলে স্থির করিল—তাহাকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেই সকল গোলমাল চুকিয়া যায়।

তাহার কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে সে সহজেই রাজী হইল। পরদিন সে সেই সদ্য প্রসূত সন্তানটিকে কোলে করিয়া হাসিমুখে অনাথ-আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সেখানে যাহারা আছে—সকলে তাহাকে পাইয়া ঘিরিয়া বসিল। কে তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল। তাহার উত্তরে সে বলিল, কেউ আমার সর্ব্বনাশ করেনি। এ শিশু ভগবানের দান!

তাহার প্রেমের কাহিনী উদ্ধার করিতে না পারিয়া তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।...

পূর্ণিমার মতো মেয়ে অনাথ আশ্রমে নাই। তাহার মধ্যে যৌবনসুলভ কোন চাপল্য নাই, অপবিত্রতার ছাপ তাহার দেহে পরিলক্ষিত হয় না।—স্থির, প্রশান্ত, সুন্দর তাহার মুখখানি।

সুপারিনটেনডেন্ট আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়া

তাহাকে কাছে ডাকিলেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—সে বিবাহ করিতে রাজি আছে কিনা। তাহা হইলে তিনি তাহার জন্য একটি উপযুক্ত বর ঠিক করিয়া দিতে পারেন।

সুপারেনটেনডেণ্ট ও মহিলা। তিনিও এমন একটি কারণে সমাজ-পরিত্যক্ত উহা এখন তাঁহার পুরস্কারস্বরূপই হইয়াছে। একদিন যিনি সমাজ হইতে বহিস্কৃতা হইয়াছিলেন, তিনিই আজ সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সুপারিনটেনডেণ্ট হিসাবে তাহার মর্য্যাদা কম নহে।

তাহার কথার উত্তরে পূর্ণিমা বলিয়াছিল; আমাদের মতো মেয়ের বিবাহ না হওয়াই ভালো, কারণ, আমাদের নিয়ে সংসার করা চলে না। যারা নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে শেখেনি তারা তো পশুর চেয়েও হীন। তাদের স্থান সমাজের বাইরে।

সুপারিনটেনডেণ্ট কিছুই বলিলেন না। বুঝিলেন—সত্যই সে তাহার কার্য্যের জন্য অনুতপ্তা। হায়, সে যদি এমন একটি ভুল না করিত, তাহা হইলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুন্দর সংসার গড়িয়া উঠিত, জগতে হয়তো তাহাকে দিয়া কত উপকার হইত!

পূর্ণিমা তাহার ছেলেটার নাম রাখিয়াছে—'সুধা'। পুরো নাম সুধাকর। সে স্কুলে পড়ে। সকলেই তাহাকে স্নেহ করে। ক্লাসের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুন্দর, লেখাপড়ায় সকলের চেয়ে ভাল; তাই সকলে তাহার পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পিতার নাম বলিতে না পারিয়া সে অনেকসময় লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে, মা-কে আসিয়া তাহার বাবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পূর্ণিমা তাহার অশ্রুসজল চোখ দুটী সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া বলে ভগবান্ তোর বাবা। এর বেশী পরিচয় আমি যে জানিনে।

অবোধ শিশু তাহার পিতার এই পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সুধাকর এখন বড় হইয়াছে। এবার ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইলে, পিতার নামের প্রয়োজন। তাই প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাকে তাহার পিতার নাম জানিয়া আসিবার [illegible]গিদ দিতেছেন। বাড়ী আসিয়া মা-কে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না তাই লজ্জায় মরিয়া আছে।

অনাথ আশ্রমের পাশে গৌরীদের ঘর। গৌরীর স্বামী গবর্ণমেণ্ট আপিসের হেড কেরাণী। একদিন গৌরীর সঙ্গে পূর্ণিমার পরিচয় হইয়া গেল। গৌরী সন্তানহীনা। বিবাহ হইয়াছে পনরো বৎসর, ইতোমধ্যেও কোন সন্তান হয় নাই। তাই সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার আশাও তাহার নাই। সে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মাতৃস্নেহ, বিলাইয়া দিবার জন্য একটি সন্তান চায়। সুধা বড় সুন্দর ছেলে, সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বভাব, সৎ চরিত্র। তাহাকে সন্তানস্নেহ দান করিতে পারিলে যেন তাহার জীবন ধন্য হয়।

দুপুরবেলা পূর্ণিমা গৌরীর সঙ্গে বসিয়া আলাপ করে। মাঝে মাঝে গৌরীর অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে। তাহার এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া পূর্ণিমা তাহার অন্তরের ক্রন্দন শুনিতে পায়। বলে, তোমার দুঃখ কি বোন?

গৌরী বলে, না, দুঃখ তেমন কিছু নেই, তবে একটি সন্তান হোলনা। ভাই তোমার ছেলেটী আমায় দাও না। তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

পূর্ণিমা বলে, তাকে ছাড়লে আমি যে বাঁচবোনা ভাই! তাকে বুকে করেই যে আমি সকল দুঃখ ভুলে আছি।

তাহার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসে। জলের প্লাবনে তাহার মুখখানির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য যেন ঝাপসা হইয়া যায়।

পূর্ণিমার বাঁচিবার আশা নাই। ডাক্তারেরা আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৌরী তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কদিন পরেই সুধাকরের পরীক্ষা, তাই সে স্কুলে গেছে।

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুসজল নয়নে সুধাকর মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল। গৌরী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, কাঁদছ কেন বাবা তোমার মা শিগ্গির ভালো হয়ে উঠবেন।

গৌরী একমনে তাহার মুখখানির দিকে চাহিয়া

থাকে। তাহার মনে হয়—জন্মান্তরে যেন সেই এই সন্তানের মা ছিল। নইলে তাহাকে দেখিলে কেন তাহার মনে মাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠে, তাহাকে পাইবার জন্য তাহার বাহু দুটি প্রসারিত হয়?

সুধাকর তখনো কাঁদিতেছে।

সুধাকর বলিল; মা আমার বাবার পরিচয় আমায় দাও। নইলে, আমি কোথাও চলে যাবো যেখানে কেউ আমায় চিনবেনা। এখানে শত লোকের সহস্র উৎসুক দৃষ্টির সামনে আমি কিছুতেই থাকতে পারছিনে।

পূর্ণিমা বলিল; পাগল ছেলে কিছুই বুঝতে পারেনা। আরে তোর বাবা নেই তোকে আমি পেয়েছি আমার কোলে। তোর মাতাপিতার কোন পরিচয়ই যে আমি জানিনে। তোকে অজ্ঞাত কুলশীল জেনেই যে আমি পালন করেছি।

—না মা, আমার আর ভুলাতে চেষ্টা কোরোনা!

—সত্যি বলছি আমি তোর মা নই। তোর পিতৃ পরিচয়ও আমার জানা নেই!

গৌরী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল; সে কি দিদি। তুমি তার মা নও?

না বোন আমি তার মা নই।

গৌরীর সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। তবে একে তুমি কোথায় পেলে?

—সেদিন ছিল পূর্ণিমা তিথি। আকাশ ভরা জ্যোৎস্নাধারা। রাত তখনো পোহায়নি আমাদের বাড়ীর সামনের পুকুরে আমি জল আনতে যাচ্ছিলাম—। পথে দেখলাম—এই দেব বিনিন্দিত শিশু ছিন্ন কাঁথার ভেতর পড়ে কাঁদছে। জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম তার সরল পবিত্র মুখখানি! বড় মায়া হলো। আমি তাকে তুলে নিলাম।

—তারপর।

—তারপর তারই জন্যে আমার ঘর ছাড়তে হোল। সবাই সন্দেহ করলো—আমার সতীত্বে। আমার বিবাহ হবার আশা রইলোনা।

গৌরীর সারাদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার রক্তিম গণ্ডদ্বয় আরো রক্তিম হইয়া গেল। তবে তবে কি এই শিশুর জননী সে? তাই যদি হয়—সমাজের ভয় না করিয়া তাহার সন্তানকে সে বুকে তুলিয়া লইবে, যে এতকাল মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, তাহাকে অপার মাতৃস্নেহের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে।

কুড়াইয়া পাওয়া শিশুটীকে কোথায় কি অবস্থায় পাইয়াছিল, উহার একটী বর্ণনা প্রদান করা হইলে গৌরীর মনে আর সন্দেহের লেশমাত্র ও রইলনা যে এই শিশু—তাহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বর্ত্তমান স্বামীই উহার পিতা! রুদ্ধ বাষ্পাকুল কণ্ঠে গৌরী বলিল; দিদি, আমায় রক্ষা কর। তোমায় প্রথমদিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল—তুমি বিশুদ্ধা, কোন মলিনতা তোমায় স্পর্শ করেনি। তাই ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছি। এর উপর সম্পূর্ণ অধিকার ভগবান আমায় দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর আদেশ উপেক্ষা করে, তাকে বিসর্জ্জন দিয়েচি-শুধু সমাজনির্য্যাতনের ভয়ে। কারণ সন্তানের মা হবার সামাজিক অধিকার আমি তখন পাইনি! তাকে এমন ভাবে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম বলে ভগবান আমায় এত শাস্তি দিয়েছিলেন। —আমায় মার্জ্জনা কর। তুমি দেবী—তোমায় আমি চিরদিন দেবীজ্ঞানে পূজা করবো। একে আমায় দাও। আর তুমি আমার গৃহে চল, সেখানে তুমি হবে আমার দিদি, আমি হব তোমার বোন্। দুজনের স্নেহ এ শিশুকে বিলিয়ে দোব।......

পূর্ণিমা অদূরে দণ্ডায়মান বিস্মিত সুধাকরের দিকে চাহিয়া বলিল: তোমার মার নাম গৌরী মিত্র, বাবার নাম প্রকৃতি মিত্র। তোমার মাকে প্রণাম করো আর তোমার পিতৃ-পরিচয়ের জন্য ভাবতে হবেনা।

আনন্দে দুজনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!